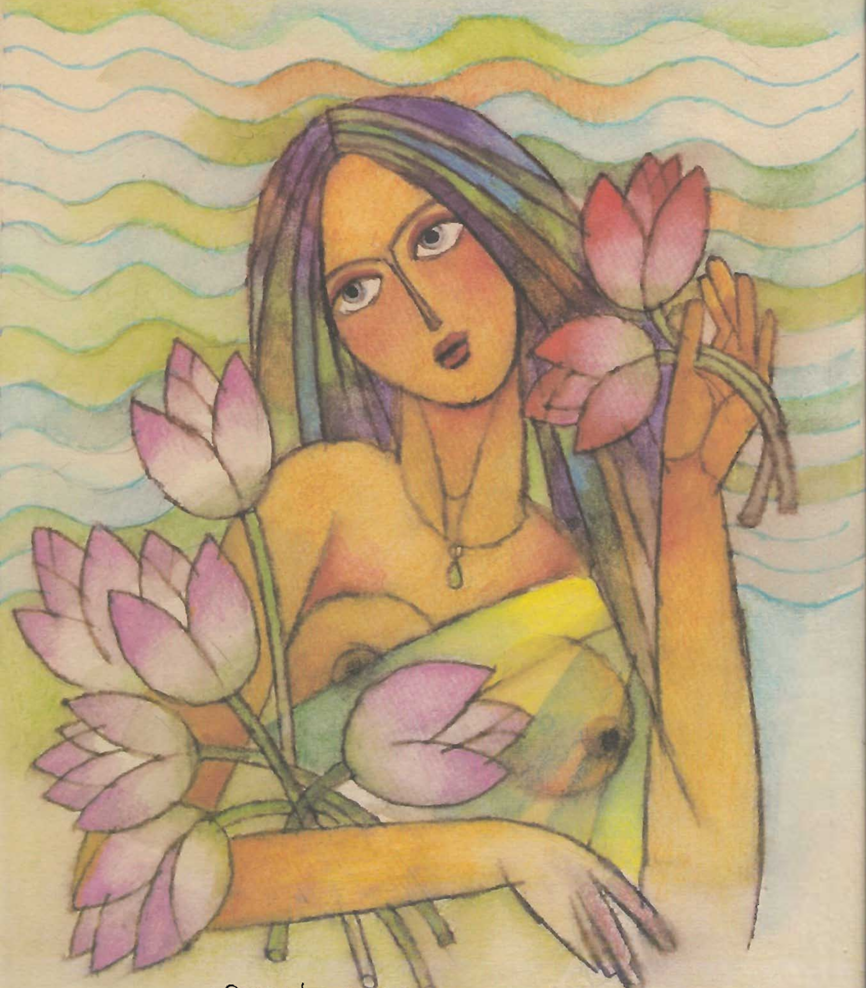
কমলকুমার মজুমদার

উপন্যাস সমগ্র



এক দুরূহ, ব্যতিক্রমী গদ্যশৈলীর প্রাচীর তুলে পাঠকের অস্তিত্বকে কমলকুমার মজুমদার একদা যেন বিপন্ন করে তুলেছিলেন। অথচ তাঁর কথাসাহিত্যের অন্তর্লোক প্রথমাবধি জীবনমায়ার সৃজনে ও রহস্যে ভরপুর। জীবনের সংজ্ঞা, বিস্ময় ও জিজ্ঞাসা এক অপার তাৎপর্যে মণ্ডিত করে তাঁর উপন্যাস-গল্পে তিনি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। সান্ধ্যভাষার মতো এক দুস্তর গদ্যচর্চায় তিনি অকম্পিত। অথচ প্রকরণগত দুরূহতার আবরণ সরিয়ে, কমলকুমারের সৃষ্টির জগতে প্রবেশের পর, পাঠক ক্রমশ আবিষ্কার করেন এই লেখকের অনন্যতা। পাঠক অনুভব করেন, মানুষের সংকট ও সমস্যা নিয়ে তিনি যে-শিল্পভুবন সৃষ্টি করেছেন, তার ব্যঞ্জনা আবহমান কালের।

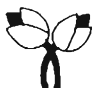
কমলকুমারের উপন্যাসের পটভূমি বহুরঙে বর্ণাঢ্য। বর্ণনার অনুপুঙ্খতায় তিনি সনিষ্ঠ। তাঁর সীমিত সংখ্যক ও মিতায়তন উপাখ্যানমালায় হয়তো বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা কম, কিন্তু গভীরতায় সেগুলি অসাধারণ। প্রত্যেকটি কাহিনীতে তিনি চিত্রিত করেছেন নিগূঢ় অনুভূতি ও মননপ্রবাহকে। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রসমূহ জীবনমুখী। জীবনবিমুখ নয়। তারা একই সঙ্গে জৈববৃত্তিতে ভরপুর বাইরের মানুষ, আবার মরমী অস্তিত্বে চিরন্তন ভেতরের মানুষ।

কমলকুমারের স্বসৃষ্ট গদ্যভাষা বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে একেবারেই স্বতন্ত্র। তাঁর ভাষা যেন এক অদ্বিতীয় লেখকসত্তার বাণীবাহক। বর্মাচ্ছাদিত এই ভাষা গীতময়, পাশাপাশি চিত্ররূপময়। হয়তো গীতিময়তার চেয়ে ভাস্কর্যধর্মিতা তাতে বেশি। কল্পচিত্র, শব্দচিত্র ও উপমাচিত্র নির্মাণে তিনি প্রায়শই অননুকরণীয় স্রষ্টা। এ ভাষা অনবদ্য 'এক আশ্চর্য মিনার।' চলিত বাংলাতেও কমলকুমার বিপীরতযাত্রার স্বাক্ষর রেখেছেন। কখনও জটিলতম বাক্যবন্ধে আকীর্ণ, কখনও বা পূর্ণচ্ছেদহীন অথচ গূঢ়ার্থবাহী এই গদ্যশৈলী কমলকুমার সচেতনভাবেই তাঁর উপন্যাসের মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের অনুভবে, 'একটি ছোট অথচ মনোযোগী পাঠকগোষ্ঠী তৈরি করবেন বলেই যেন কমলকুমার তাঁর কাহিনীগুলিতে ভাষার বর্ম দিন দিন আরও সুদৃঢ় করেছেন।' তাঁর এই চেষ্টাকৃত আয়োজন সত্ত্বেও, কমলকুমার বাংলা সাহিত্যে এক স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত কথাশিল্পী। কথাসাহিত্যের মূল্যমানের আলোচনায় ও বিচারে তাঁর উপন্যাসসমূহকে তাই বাদ দেওয়া যাবে না। বরং সাহিত্যের এক প্রবাদপুরুষরূপে তিনি স্মরিত ও পঠিত হবেন। তাঁর এই উপন্যাস সমগ্রে গৃহীত হয়েছে অন্তর্জলী যাত্রা, গোলাপ সুন্দরী, অনিলা স্মরণে, শ্যাম-নৌকা, সুহাসিনীর পমেটম, পিঞ্জরে বসিয়া শুক, খেলার প্রতিভা এবং শবরীমঙ্গল। সঙ্গে বিস্তৃত গ্রন্থপরিচয় ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ভূমিকা।

ISBN 81-7756-177-4

উপন্যাস সমগ্র

কমলকুমার মজুমদার



ভূমিকা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়



প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০০২
চতুর্থ মুদ্রণ জুন ২০১১

ISBN 81-7756-177-4

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং ক্রিয়েশন ২৪বি/১বি, ড. সুরেশ সরকার রোড কলকাতা ৭০০০১৪ থেকে মুদ্রিত।

UPANYAS SAMAGRA
[Novel]
by
Kamalkumar Majumder

Published by Ananda Publishers Private Limited
45, Beniatola Lane, Calcutta-700009

ভূমিকা

জীবনানন্দ দাশের অন্তত বারো কিংবা চোদ্দোটি উপন্যাসের (দু'টিকে বড়গল্প বলা যায়) সন্ধান পাওয়া গেছে এ পর্যন্ত এবং সম্ভবত আরও চারখানি উপন্যাস লুক্কায়িত আছে তাঁর পাণ্ডুলিপির জীর্ণ স্তূপে। সেগুলি পুনরুদ্ধার কাজে ব্যাপৃত রয়েছেন ভূমেন্দ্র গুহ। এবং ছোটগল্প লিখেছেন প্রায় একশো কুড়িটি। তাঁর জীবদ্দশায় এগুলির একটিও প্রকাশিত হয়নি। রবীন্দ্রনাথেরও উপন্যাসের সংখ্যা বারোটি এবং ছোটগল্পও একশো'র কমই হবে। সবই তিনি দেখে গেছেন মুদ্রিত অবস্থায়। রবীন্দ্রনাথ একই সঙ্গে কবি ও কথাসাহিত্যিক। কিন্তু জীবনানন্দের এই দ্বিতীয় পরিচয়টি গুপ্ত ছিল বহুদিন। কেউ শখ করে একটি-দুটি উপন্যাস রচনা করতে পারেন, মুদ্রণের সম্ভাবনা থাক বা না থাক। কিন্তু এতগুলি উপন্যাস ও গল্প রচনা, যা বেশ পরিশ্রমসাধ্য কাজও বটে, কোনো রকম পাঠক-প্রত্যাশা না করেও একজন মানুষ, বিশেষত একজন কবি, কেন করেছিলেন তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

কমলকুমার মজুমদার উপন্যাস লিখেছেন আটটি এবং কিছু গল্প। উপন্যাসগুলি এবং প্রায় সব গল্পই প্রকাশিত হয়েছে এক্ষণ, কৃত্তিবাসের মতন পত্রিকায়, কোনো বহুল প্রচারিত, অভিজাত বা সওদাগরি পত্রিকায় সে সব রচনার স্থান হয়নি। ব্যতিক্রম শুধু দুটি ছোট গল্প, 'মতিলাল পাদরি' ও 'তাহাদের কথা' মুদ্রিত হয়েছিল সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকায়। কমলকুমার জীবনানন্দের মতন নিঃসঙ্গতা বিলাসী ছিলেন না। জীবনানন্দ যেন ইচ্ছে করেই তাঁর উপন্যাস-গল্পগুলি রেখেছিলেন পাঠকদের চোখের আড়ালে, কেন না, যে-সব পত্র-পত্রিকায় তিনি কবিতা লিখতেন, তার কোনোটিতে একটু চেষ্টা করলে তাঁর উপন্যাস-গল্প ছাপা হতো না, এটা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। বাংলার অনেক কবিই কিছু কিছু গদ্য-কাহিনী লিখেছেন, যেমন মাইকেল মধুসূদন, নজরুল ইসলাম, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ, সবই মুদ্রিত, শুধু জীবনানন্দ তাঁর একটিও গদ্য কাহিনী কেন প্রকাশ করতে চাননি, সে রহস্য আর বোধহয় উদ্ঘাটিত হবার সম্ভাবনা নেই।

কমলকুমার অল্প সংখ্যক পাঠক পেয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন, সেই জন্যই তিনি একটার পর একটা উপন্যাস লিখে গেছেন ছোট পত্রিকায়। হয়তো তিনি সচেতন ছিলেন, তাঁর রচনারীতি বৃহত্তর পাঠক সমাজের জন্য নয়। রচনাগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশের ব্যাপারেও তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল না, যতদূর জানি, তাঁর একটি মাত্র উপন্যাস 'অন্তর্জলী যাত্রা' এবং একটি গল্প সংকলন 'নিম অন্নপূর্ণা' প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর জীবিতকালে। আর একটি উপন্যাস 'পিঞ্জরে বসিয়া শুক' প্রকাশের প্রস্তুতি চলছিল, মুদ্রণ সম্পূর্ণ হবার আগেই তাঁর অকালমৃত্যু ঘটে।

এর পর কমলকুমারের উপন্যাসগুলি পত্রিকার পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধার করেন তাঁর স্ত্রী দয়াময়ী মজুমদার। তিনি স্বয়ং বিদুষী এবং সুলেখিকা। কিন্তু কোনো বিচিত্র কারণে সধবা অবস্থায় তাঁর এই সব পরিচয় কিছুই জানা যায়নি, তিনি ছিলেন অন্তরালবর্তিনী। এমনকী কমলকুমার তাঁর প্রথম উপন্যাস গ্রন্থটি পত্নীকে উৎসর্গ করলেও সেখানে সহধর্মিণীর নাম উল্লেখ করেননি, শুধু লিখেছিলেন 'স্ত্রীকে'।

খ্যাতির আকাঙ্ক্ষায় লেখেননি কমলকুমার, অর্থের জন্য তো নয়ই। এক্ষণ পত্রিকায় সম্মান দক্ষিণা দেবার রেওয়াজ ছিল না, কমলকুমার কিছু পেয়েছিলেন কি না জানি না। কৃত্তিবাস পত্রিকা থেকে তিনি একবারই চেয়ে নিয়েছিলেন মাত্র তিরিশ টাকা। (প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়,

যে গুটিকয়েক ছাত্রকে তিনি ফরাসি ভাষা শিক্ষা দিতেন, তাদের কাছ থেকে গুরুদক্ষিণা নিতেন মাসিক একটাকা।)

তবে কমলকুমারের সাহিত্য রচনার প্রেরণা কী ছিল? তিনি ছিলেন উত্তম পড়ুয়া, তাঁর সময়ে, একশো বছরের বাংলা গদ্য সাহিত্য ছিল তাঁর নখদর্পণে, বিশেষ অনুরাগী ছিলেন বঙ্কিম এবং রাজশেখর বসুর, এই ভাষার ঐশ্বর্য নিয়ে তাঁর গর্ব ছিল, তবু কিছু একটা অভাববোধও ছিল। ধনী ভাষাগুলির সাহিত্য ঠিক একমুখী হয় না। অনেকগুলি ধারা থাকে, বাংলা গদ্য সাহিত্যে ঘটনা পরম্পরার ধারাটিই অতি প্রবল, অন্য আর কোনো ধারাই নেই বলতে গেলে। বাস্তব কখনো উত্তীর্ণ হয়নি পরা বাস্তবতায়। লোককথা, রূপকথা, প্রবাদ, ছড়া, হেঁয়ালি ইত্যাদির মধ্যেও থাকে যে সব লুক্কায়িত কাহিনী, সেগুলিও যে আধুনিক সাহিত্যের অন্তর্গত হতে পারে, তা নিয়ে পরীক্ষা হয়নি বিশেষ।

সেইজন্যই কমলকুমার শুধু সাহিত্য রচনায় প্রবৃত্ত হননি, তিনি নতুন ধারার প্রবর্তনে উদ্যত হয়েছিলেন, তাঁর প্রথম উপন্যাস 'অন্তর্জলী যাত্রা' বাংলা সাহিত্যে এসে পড়েছে আচম্বিতে, এর কোনো পূর্ব প্রস্তুতি ছিল না, এই গদ্যরীতি ও কাহিনী বিন্যাস সম্পূর্ণ অভিনব। এরকম রচনার আস্বাদের জন্য বাংলার পাঠকরা দীক্ষিত নয়, সেইজন্যই কমলকুমার হয়তো আশা করেছিলেন, ছোট সাহিত্য পত্রিকার যে একটি নির্বাচিত পাঠকগোষ্ঠী থাকে, যাদের অধিকাংশই সাহিত্য রচনায় প্রয়াসী তারা অন্তত অনুধাবন করার চেষ্টা করবে। আমার মনে আছে, 'অন্তর্জলী যাত্রা' প্রকাশিত হয়েছিল একটি অল্প পরিচিত পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায়, কমলকুমার সেই পত্রিকাটি থেকে নিজের উপন্যাস-অংশ ছিঁড়ে নিয়ে, বেশ কিছু কপি আলাদা ভাবে সেলাই করে কিছু নবীন লেখককে উপহার দিয়েছিলেন এবং আমাকে দশ-বারোটি কপি দিয়ে বলেছিলেন, অন্য লেখকদের মধ্যে বিলি করে দিও, তারা পড়লেই আমি খুশি।

কমলকুমারের সমস্ত রচনার উপাদান দেশজ এবং মূলত গ্রাম ভিত্তিক। আমাদের সাহিত্যে গ্রাম-বাস্তবতা বড় বেশি গ্রাম্য এবং আঞ্চলিক শব্দে কণ্টকিত। কমলকুমার গ্রামের মানুষদের তুলে দিয়েছেন উচ্চ পর্যায়ে, তারা হয়ে গেছে চিরকালীন মানুষ। 'খেলার প্রতিভা' উপন্যাসে একটি মৃত ভিখিরির লাঠিটা নিতেও যাদের বিবেক-দ্বন্দ্ব হয়, তারা অনায়াসেই মহাভারতীয় চরিত্র হয়ে ওঠে।

তাঁর ভাষা শুধু সাধু বাংলা নয়, বাক্য বিন্যাস একেবারে স্বতন্ত্র। তিনি যে সাবলীল, ঝকঝকে চলিত ভাষাও লিখতে পারতেন, তার অনেক নিদর্শন আছে। বড় পত্র-পত্রিকায় শিল্প সমালোচনা এবং নানা বিষয়ে নিবন্ধ লিখতেন চলিত ভাষায়। কমলকুমারের বয়েসী অনেক লেখকই সাধু বাংলা চিরতরে পরিত্যাগ করে চলে এসেছিলেন চলিত ভাষায়, দৃষ্টান্ত ও প্রেরণা স্বরূপ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু কমলকুমার সাধু ও চলিত এই দুটি বাংলাই পোষণ করেছেন। অর্থাৎ, উপন্যাস-গল্পের ভাষা সম্পর্কে তাঁর বিশেষ চিন্তা ছিল, এ ভাষায় দায় নেই সহজ বোধ্যতার, এ শিল্প-নির্মাণের ভাষা, যে-কোনো উচ্চাঙ্গ শিল্পের মতনই এর রস গ্রহণ করার জন্য পাঠকদের দীক্ষিত হতে হবে। যে-হেতু কমলকুমারের ভাষার আর কোনো পূর্ব-নজির নেই, অন্য কোনো লেখকের সঙ্গেই তাঁর ভাষার তুলনা চলে না, তাই কমলকুমারের রচনাই বারবার পড়ে এর মর্ম উদ্ধার শিখতে হবে। সেই জন্যই কমলকুমারের যে-কোনো রচনাই বারবার পড়তে হয়।

তিনি নিজে অনেক সময় বলতেন, বাংলা গদ্যের সিনট্যাক্স হুবহু ইংরেজি গদ্যের অনুকরণে, তিনি সেই প্রথা ভেঙে ফেলে ফরাসি গদ্যের প্রকরণ আনতে চান। তাঁর এই উক্তি আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। লিঙ্গ ভেদ কিংবা একবচন-দ্বিবচন-বহুবচন অনুযায়ী ক্রিয়াপদ বাংলায় কোনোক্রমেই সম্ভব নয়, এ ব্যাপারে বাংলা সংস্কৃত থেকেও পৃথক। বিশেষণের সংস্থানের অদল বদল, যেমন কালো বেড়ালের বদলে বেড়াল কালো, ফরাসি অনুযায়ী এমন ব্যবহার কোথাও কোথাও আছে মাত্র। অন্য ভাষার অনুসরণে নয়, সম্পূর্ণ অভিনব বাকভঙ্গি নির্মাণেরই দুঃসাহস দেখিয়েছেন কমলকুমার। এ ভাষা অবশ্যই অনবদ্য কিন্তু বাংলা গদ্যের অন্তর্গত হবার মতন নয়। আর দ্বিতীয় কোনো লেখকের পক্ষে এই ভাষা রীতি গ্রহণ করা

অসম্ভব। কেউ কেউ কিছুটা চেষ্টা করেও পশ্চাৎ অপসরণে বাধ্য হয়েছেন, এমন দেখেছি। এ এক আশ্চর্য মিনার, যা বাংলা সাহিত্যে চিরকাল স্বতন্ত্র হয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকবে। জীবনানন্দ দাশের সঙ্গে কমলকুমারের তুলনা এ কারণেই মনে আসে। গদ্যে নয়, দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ থেকে জীবনানন্দ যে কাব্য ভাষা গ্রহণ করেছিলেন, তা অননুসরণীয় এবং বাংলা কবিতায় তা পূর্বাপর রহিত। জীবনানন্দীয় গোত্রের দ্বিতীয় কোনো কবিকে খোঁজা নিরর্থক।

একটি ছোট অথচ মনোযোগী পাঠকগোষ্ঠী তৈরি করবেন বলেই যেন কমলকুমার তাঁর কাহিনীগুলিতে ভাষার বর্ম দিন দিন আরও সুদৃঢ় করেছেন। তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে তুলনামূলক ভাবে 'গোলাপ সুন্দরী'র ভাষা ততটা দুর্বোধ্য নয়, মাঝে মাঝেই ঝলসে ওঠে কবিত্বের মাধুর্য। 'গোলাপ সুন্দরী' পড়ার পর 'অন্তর্জলী যাত্রা' ফিরে পাঠ করলে অনেক জট খুলে যায়। 'অন্তর্জলী যাত্রা'র বিশ্বস্ত ভাবে চলচ্চিত্র রূপ দিয়েছেন গৌতম ঘোষ, সেটি যারা দেখেছেন, তাদের আর কাহিনী অনুসরণে কোনো অসুবিধে হবার কথা নয়। তবু, কাহিনী জানা সত্ত্বেও এর ভাষা সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য এ উপন্যাস বারবার পড়া যায়। সব সাহিত্যেই এরকম দৃষ্টান্ত খুব কমই থাকে।

অনেক লেখকেরই প্রথম জীবনের তুলনায় পরবর্তীকালের ভাষা ক্রমশ সরল হয়ে আসে। কমলকুমারের সব ব্যাপারেই বিপরীত যাত্রা। তৃতীয় ও চতুর্থ উপন্যাসে তাঁর ভাষা আরও জটিল হয়েছে, যেন তিনি খেলা করছেন পাঠকদের সঙ্গে, কিংবা তাদের পরীক্ষা নিচ্ছেন। কোনো কোনো বাক্যে রেখে দিচ্ছেন ব্যাসকূট। পঞ্চম উপন্যাস 'সুহাসিনীর পমেটম'-এ এই রচনা প্রক্রিয়া আমি নিজেই প্রত্যক্ষ করেছি। লেখাটি সম্পূর্ণ হবার পরেও তিনি আঙ্গিক বদল করছেন বারবার। ছোট ছোট বাক্যগুলি তিনি জুড়ে দিলেন অসমাপিকা ক্রিয়ায়, তারপর বলতে গেলে বাক্যই থাকছে না, পাতার পর পাতা পূর্ণচ্ছেদহীন ঠাসা রচনা। আর সময় নেই বলে আমি যখন তাঁর কাছ থেকে শেষ পাণ্ডুলিপি কেড়ে নিয়েছি কৃত্তিবাস পত্রিকায় প্রকাশের জন্য, তারপরেও তিনি চুপি চুপি প্রেসে গিয়ে প্রচুর পরিবর্তন করেছেন, প্রুফের পৃষ্ঠা কণ্টকিত করে তিনি সব সরলকে করেছেন জটিল, পরিবর্তিত প্রত্যেকটি শব্দ আগেরটির চেয়ে কঠিন।

কঠিন বলতে কিন্তু আভিধানিক শব্দ বোঝায় না। ব্যবহারের অনন্যতা। বাঙালি পাঠক তাতে অনভ্যস্ত বলেই হোঁচট খায়। যারা তাতে পেছন ফেরে, তারা কমলকুমারের পাঠক হবার যোগ্যতা তখনো অর্জন করেনি, বুঝতে হবে। যারা কাব্যপাঠে অভ্যস্ত, তারাই এগিয়ে যেতে পারে। এ ঠিক গদ্য নয়, কাব্যের সৌরভ সর্বত্র অথচ চকিতে এক একটি দেশজ শব্দ এসে ঘোর ভেঙে দেয়। 'ঐ চন্দ্রালোক, তাহারা নিজেদের বড়ই ঘোলা বুঝিতে আছিল; নদীর ঝিল্লির ইত্যাদির আওয়াজ তাহাদের জানিত সমস্তবিধ শব্দের বাচকতাকে নষ্ট করিয়াছে; বস্তু দর্শনে নাম, নাম শ্রবণে বস্তু মনেতে আসে না; প্রায় প্রত্যেকেই এমন অবস্থা আপন অজ্ঞাতসারেই টের পাইতেছিল।" (খেলার প্রতিভা) এই যে 'শব্দের বাচকতা' এটা কমলকুমারের ভাষার সঠিক পরিচয়।

কমলকুমার মজুমদারের উপন্যাসগুলি আসলে আধুনিক চম্পূ, যেরকম চম্পূ ইদানীংকালে অন্য কেউ লেখেন না, আর কেউ লিখতে পারবেন বলেও মনে হয় না।

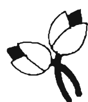
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সূচিপত্র

অন্তর্জলী যাত্রা • ১
গোলাপ সুন্দরী • ৭৭
অনিলা স্মরণে • ১০৭
শ্যাম-নৌকা • ১৫৩
সুহাসিনীর পমেটম • ১৭৭
পিঞ্জরে বসিয়া শুক • ২৫৭
খেলার প্রতিভা • ৩৪৩
শবরীমঙ্গল • ৪৪৯

গ্রন্থপরিচয় • ৫২৭

উপন্যাস সমগ্র



অন্তর্জলী যাত্রা

এই গ্রন্থের ভাব বিগ্রহ রামকৃষ্ণের, ইহার কাব্য বিগ্রহ রামপ্রসাদের। রামপ্রসাদ আমাদের শুদ্ধ মন আনিয়া দেন ॥ মা আমারে দয়া করে শিশুর মত করে রেখো ॥ অথবা ॥ যে দেশে রজনী নেই মা ॥ অথবা ॥ কেলে সর্ব্বনাশী আমায় সন্ন্যাসী করেছে ॥ —এ সকল কাব্যে তিনি ব্যক্ত।

জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর দর্শন।

এই উক্তির মধ্যে যাঁহার কণ্ঠস্বর ধ্বনিত, যাঁহার স্মরণ মননে নব্য-বাঙলা সৃষ্ট; যিনি মানুষকে, প্রাকৃতজনকে, আপনার জাগ্রত অবস্থার খানিক অভয় দিয়া বলিয়াছিলেন—"মানুষ কি কম গা!"

এই গল্প সেই গল্প, ঈশ্বর দর্শন যাত্রার গল্প।

ভগবতী-তনু লাভ না হইলে ঈশ্বর দর্শন হয় না, ঠাকুর বলেন ভক্তের প্রেমের শরীর ভগবতী-তনু। চৈতন্য স্বরূপিণীর বাস মানুষে, পদ্মের পর পদ্মে অবশেষে পদ্মে তাহার সাক্ষাৎকার, সুদীর্ঘ ষটচক্র ভেদে তাহার দর্শন হইবেই।

আমি নিশ্চিত, আমাদের দেশ এখনও গঙ্গাকে আপনার প্রাণ জ্ঞান করে, আমাদের দেশ এখনও অমরতাকে স্পর্শ করে, সকলেই আমাদের গল্প বুঝিবেন।

পাঠক আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

এখানে, গ্রন্থ প্রকাশের ব্যাপারে কয়েকজন ভদ্রমহোদয়ের নিকট আমি ঋণী, কৃতজ্ঞ। বাবু শ্রীরাধাপ্রসাদ গুপ্ত টাইটেল পৃষ্ঠা ইত্যাদির অক্ষর আজ্ঞা দিয়া আমাকে সুখী করিয়াছেন। বাবু শ্রীঅবনীরঞ্জন রায়, বাবু শ্রীইন্দ্রনাথ মজুমদার এবং বাবু শ্রীনির্মাল্য আচার্য আমাকে সর্ব্বরূপে সাহায্য করত বাধিত করিয়াছেন।

ইতি—

শ্রীকমলকুমার মজুমদার

আলো ক্রমে আসিতেছে। এ নভোমণ্ডল মুক্তাফলের ছায়াবৎ হিম নীলাভ। আর অল্পকাল গত হইলে রক্তিমতা প্রভাব বিস্তার করিবে, পুনর্ব্বার আমরা, প্রাকৃতজনেরা, পুষ্পের উষ্ণতা চিহ্নিত হইব। ক্রমে আলো আসিতেছে।

অনতিদূরে উদার বিশাল প্রবাহিণী গঙ্গা, তরল মাতৃমূর্ত্তি যথা, মধ্যে মধ্যে বায়ু অনর্গল উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে; এইস্থানে, বেলাতটে, বিবশকারী উদ্বিগ্নতা ক্ষুদ্র একটি জনমণ্ডলীকে আশ্রয় করিয়া আছে। কোথাও কারণের বিকার মাত্র নাই, প্রতিবিম্ব নাই, কোথাও স্বপ্ন পর্য্যন্ত নাই; এ কারণে যে, একটি মুহূর্ত্তের সকল কিছুকে বাস্তব করত স্মরণীয় করিয়া একের যে নাম ভিন্ন ক্রমাগতই অপ্রাকৃতিক পার্থিব, তাহারই প্রাণবায়ু নিষ্ক্রান্ত হইবে এবং তাই মানুষমাত্রই নিশ্চল, ম্রিয়মাণ, বিমূঢ়। ইহাদের প্রত্যেকেরই মুখে মুখে নির্ব্বোধ গাম্ভীর্য্য আরূঢ় হইয়া রহিয়াছে মনে হয়, কখন তাহারা কপালে করাঘাত করিবার অমোঘ সুযোগ পাইবে তাহারই যেন বা কাল গণনা করিতেছে। কেননা চির অসূর্য্যম্পশ্যা জীবন এই প্রথম আলোকের শরণাপন্ন, কেননা শূন্যতা লবণাক্ত এবং মহাআকাশ অগ্নিময় হইবে।

আমাদের স্নেহের এ জগৎ নশ্বর, তথা চৈত্ররুক্ষ অগণন অন্ধকার সকলই, মৃন্ময় এবং অনিত্য; তথাপি ইহার, এই জগতের, স্থাবর ও জঙ্গমে পূর্ণিমা; ইহার চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বে, মানুষের দুঃখে, কোমল নিখাদে—সর্ব্বত্রে, এরূপ কোন তন্মাত্রা নাই যেখানে যাহাতে—হাসি নাই, কারণ সর্ব্বভূতে, বহুতে, তিনি বিরাজমান।

হায়! ইদানীং সেই বহুর মধ্যে একটিকে পরিত্যাগ করত মহাব্যোমে, বিরাট শূন্যতায়, চক্ষুহীন জিহ্বাহীন স্তব্ধতায় তিনি অব্যক্ত হইবেন; চির রহস্যের, অনন্তের রূপ একই রহিবে। গঙ্গাতীরে অন্তর্জলী উদ্দেশ্যে আনীত সীতারাম চট্টোপাধ্যায় এই অগণিত বহুর মধ্যে—সেই নিঃসঙ্গ একটি।

সীতারাম অতীব প্রাচীন হইয়াছেন; শুষ্ক খড়ের বিছানায় শায়িত, তিনি, যেমত বা স্থিতপ্রজ্ঞ, সমাধিস্থ যোগীসদৃশ, কেবল মাত্র নিষ্পলক চক্ষুর্দ্বয় মহাকাশে নিবদ্ধ, স্থির; তিলেক চাঞ্চল্য নাই, প্রকৃতি নাই—ক্রমাগতই বাঙ্‌ময়ী গঙ্গার জলছলাৎ তাঁহার বিশীর্ণ পদদ্বয়ে লাগিতেছিল।

অন্তবস্ত, অন্তরঙ্গ এ দেহ যে বৈরাগ্য আনিবার পক্ষে যথেষ্ট অঢেল তাহা অতিবৃদ্ধ সীতারামের দেহের প্রতি তাকাইলেই সম্যক্ উপলব্ধি হয়; তদ্দর্শনে, আপনার হস্ত হইতে শিশুর কপোলস্পর্শজনিত যে রেশমী অনুভব তাহা অচিরেই উধাও হইবে; আপনার সকল স্মৃতি—একদা হয়ত যে মানসবেগ চম্পকে জড়াইয়াছিল, কখন হয়ত দূর পথশ্রমের পর—স্রোতস্বিনী দর্শনে যে শান্তি অনুভব, অথবা পরিপ্রেক্ষিত হইতে সৃষ্ট হইয়া ক্রমে দিনের আলোয় ভাঙিয়া পড়া যেমন বুদ্বুদের চরিত্র এবং তাহা অনুধাবনে মানুষ যেমন বিনয়ী হইতে গিয়া অহঙ্কারী হইয়া উঠিয়াছে—এই সকল স্মৃতি মাত্রই ভ্রংশ হইবে এবং দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করত আপনাকে নিশ্চিত বারম্বার বলিতেই হইবে, হায় এ-দেহ কি গোলাপের অন্যতম দীর্ঘতম পুরস্কার! এবং অজানিতের প্রতি বালকের মতই, আপনার অনার্য্য অভিমান জন্মিবে।

বৃদ্ধের দেহে দেহে কালের নিষ্ঠুর ক্ষতচিহ্ন, অসংখ্য ঘুণাক্ষর, হিজিবিজি। মনে হয়, এ-দেহে পাপ অথবা পুণ্য, কিছুই করিবার যোগ্যতা নাই। বিশুষ্ক চর্ম্মের আবরণে কঙ্কালসমান মুখমণ্ডল—এখানে, কপালে চন্দন প্রলেপ অধিকন্তু বীভৎসতা হানিয়াছে। ভাববর্ণহীন চক্ষুর্দ্বয় কালান্তরে আপনি নিমীলিত হয়, পুনর্ব্বার কিসের আশায় খুলিয়া যায়। অব্যক্তের লীলা-সহচরী মাতা, কোন মাতা এ-দেহ হইতে বারেক সৃষ্টির বীজ সঞ্চয় করিয়া আপনার সঙ্গোপনে রাখিবেন কে জানে!

বৃদ্ধের ওষ্ঠদ্বয় বিচ্ছিন্ন এবং এই অপরিসর ফাটলে বিন্দু বিন্দু গঙ্গোদক পড়িতেছে, এক একটি বিন্দু কুঞ্চিত ওষ্ঠে পড়িয়া চমকাইয়া টলিয়া স্থির হয়, পরক্ষণেই অতর্কিতে কোনরূপে মুখগহ্বরে প্রবেশ করে; কোনটি বা, কীট-পতঙ্গ যেমত, জীবন লাভ করিয়া চিবুকের অঙ্কুরিত দাড়িমধ্য দিয়া পথ পায়, নামিয়া

যায়। এই সঙ্গে বিলম্বিত লয়ে 'গঙ্গা-নারায়ণ-ব্রহ্ম বলো'র দুঃসহ নিপীড়িত মর্ম্মান্তিক ভৌতিক ধ্বনিবিস্তার উত্থিত হইতেছে। তবুও সীতারাম প্রৌঢ়শিলার মতই অনড়, গঙ্গা-নারায়ণ-ব্রহ্ম বলিবার কোন ধৈর্য্য তাঁহার আয়ত্তের মধ্যে ছিল না।

শিয়রের নিকটে কুলপুরোহিত কৃষ্ণপ্রাণ, কণ্ঠলগ্ন চেলীতে নারায়ণ শিলা, অত্যন্ত সন্তর্পণে কুশী হইতে গঙ্গাজল (চরণামৃত) বৃদ্ধের ওষ্ঠে ঢালিতেছেন। সীতারামের মস্তক তাঁহারই জ্যেষ্ঠপুত্র বলরামের ঊরু-উপরে ন্যস্ত। দক্ষিণে কনিষ্ঠ পুত্র হরেরাম। ইহারা সকলেই বৃদ্ধের আত্মার সদ্‌গতি নিমিত্ত 'গঙ্গা-নারায়ণ-ব্রহ্ম' পদটি আবৃত্তি করিতে যত্নবান। হরেরাম ঠোঁট কম্পিত করিতেছিল, ঝিমাইতেছিল, এবং মাঝে-মাঝে চক্ষুদুইটি বড় করত আপনাকে সজাগ করিয়া আবৃত্তির সুরের সহিত কণ্ঠস্বর মিলাইতেছিল।

মধ্যে, একপার্শ্বে, কবিরাজ বিহারীনাথ হাতের নাড়ী টিপিয়া অনন্য মনে বৃদ্ধের মুখপানে চাহিয়া আছেন। তাঁহার স্পর্শের মধ্যে নীলাব্ধিবসনা এই পৃথিবীর বাঁচার তির্য্যগ্‌ সূক্ষ্মগতি এবং তৎসহ সংখ্যাবাচক একের প্রথম উপলব্ধি ছিল। কবিরাজের পিছনেই একজন সর্ব্বাঙ্গ চাদরে আবৃত করিয়া, অথচ মুখটুকু খোলা, দুলিয়া দুলিয়া গীতাপাঠ করিতেছে। লোকটির সম্মুখে পুঁথি, কিন্তু পুঁথি দেখিবার আলো নাই, প্রয়োজনও নাই একারণে যে লোকটির গীতা কণ্ঠস্থ। কখনও বা তাহার ঘুম বিজড়িত স্বরে শ্লোক পরম্পরা ব্যাখ্যাও শুনা যায় যথা "কৌমার যৌবন কিছুই স্থির নয়, আত্মার হেতু নাই, মৃত্যু নাই—আশ্চর্য্য, কেহই আমরা থাকিব না, আমরা অমৃতে যাইব..." সমস্ত কিছুই একসঙ্গে লোকটি বলিতে চাহে।

এবম্বিধ পাঠ, মরণোন্মুখ সীতারাম ব্যতীত আর আর যাঁহারা উপস্থিত তাঁহাদের মনে স্বতঃই নৈরাশ্যের সঞ্চার করিতেছিল। এই পরিবেশকে, গীতা ব্যাখ্যার গোঙানি ছাড়াও, এইক্ষণে অধিকতর ভয়ঙ্কর রহস্যময় করিয়াছিল নিকটবর্ত্তী চিতা নির্ব্বাপিত করার উদ্দেশ্যে জল নিক্ষেপের ফলে হস্‌ হস্‌ শব্দ, তৎসহ অনর্গল ধূমরাশি, যাহা বিচিত্র আকারে কুণ্ডলী সৃষ্টি করত এক এক সময়ে ইহাদের অতিক্রম করিয়া অন্তর্হিত হইতেছিল। এবং অস্বস্তিকর নরবসার গন্ধ এখানে উদ্দাম। উপস্থিত সকলে, প্রতীয়মান সমস্ত কিছুর মধ্যে ভয়ঙ্কর চিরসত্যটি দেখিতে পাইতেছিল। কীর্ত্তনীয়ারা, তাহারা হতাশার চোখ দিয়া একটি গীত গাহিতেছিল। উপস্থিত সকলে মন দিয়া অনেক গীত শুনিতেছিল।

সীতারাম ও নিকটবর্ত্তী সকলকে পরিক্রমণ করিয়া একটি আধো-ঘুমন্ত কীর্ত্তনের দল মণ্ডলাকারে ঘুরিতেছে। দলটি ইহাদের পরিক্রমণ করিতে গঙ্গার উপর দিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিল, যেহেতু সীতারামের পদদ্বয় গঙ্গা স্পর্শ করিয়া আছে। কীর্ত্তনের দল শ্রান্ত, তাহারা উৎসাহহীন, তাহারা ক্ষুধার্ত্ত, তাহারা শিথিল গতিতে মনে হয় যেমন বা পলাইতেছে, তাহাদের নৌকার-গাত্রে-লাগা তরঙ্গরাজির শব্দের মত ভয়প্রদ ভাঙা ভাঙা স্বরে নাম গান স্থানটিতে যথার্থই অন্ধকারের সৃষ্টি করিয়াছিল।

এই গোষ্ঠীর কিছু দূরে; জ্যোতিষী অনন্তহরি উবু হইয়া বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন, তাঁহার মন তখন সৌরজগতে বিচরণ করিতেছে, বিরাট অনৈসর্গিক জ্যোতির্মণ্ডলে তিনি যেন হারাইয়া গিয়াছেন। যেমন বা অশরীর হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার হুঁকার গম্ভীর শব্দ এবং কভু বা হুঁকা হইতে মুখ সরাইয়া বিড় বিড় করিয়া কথা বলা, তাঁহারই পার্শ্বস্থিত অন্য এক ব্যক্তিকে ক্রমাগতই রোমাঞ্চিত করিতেছিল, এই ব্যক্তি লক্ষ্মীনারায়ণ। জ্যোতিষী অনন্তহরির ব্যবহারের কিঞ্চিন্মাত্র ইতর-বিশেষে লক্ষ্মীনারায়ণের ধৈর্য্যচ্যুতি এবং অতি উগ্র-আগ্রহের কারণ হইতেছিল, লক্ষ্মীনারায়ণ যেন বা শীতকাতর; তিনি বারম্বার উদ্‌গ্রীব হইয়া অনন্তহরির নিকটে মুখ সরাইয়া আনিতেছিলেন, এ কারণে যে, তাঁহার মনে হইতেছিল জ্যোতিষী তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া কিছু বা বলিতেছেন; ইহাই সত্য যে তিনি কিছু শুনিবার আশায় বসিয়াছিলেন। এই স্থানে কাহার কণ্ঠস্বর আসিতেছিল, "হিঃ ইরে ডরে গেলে হে, হারে মন নিছুনি জান না গো, উ ঠাঁই মরণ নাই গো, লাও গো আঁট করি কলসটা ধর বটে লীচ্চু করি হে, একঠাঁই শান্তি দাও হে"—এ স্বরগভীরে এতাবৎ মিলন অভিলাষী হরিণীর কণ্ঠ ছিল। এ স্বর প্রাণময়, কেননা 'শান্তি দাও' কথাটি উচ্চারিত হয়।

একটি চিতা সাজান হইয়াছে, উপরে বর্ত্তমান সত্য যেন বা স্মৃতি হইয়া দেখা দেয়, যেখানে নক্ষত্র নাই। চিতার নিকটে বসিয়া একটি ক্রন্দনরত বালক, সে লাউডগা-রুগ্ন সুন্দর, পিণ্ড হাতে করিয়া বসিয়া

আছে, তথাপি তাহার ক্রন্দনে আকাশ আঁকা ছিল, তখনও লহরীতত্ত্ব ছিল। বালকের সম্মুখেই ব্রাহ্মণ। তাঁহার মুখে ভয়জনিত ক্লীব অবিশ্বাস; কিন্তু অনর্গল শ্লোক ধারা উৎসারিত হয়, এবং মাঝে মাঝে অঙ্গুলীস্থিত কুশ-অঙ্গুরীয় যথাযথ করার ইচ্ছাও দেখা যায়, মনে হয় যেন বা এই বন্ধনে সমস্ত কিছু বাঁধা আছে। এই নূতন আয়োজনের পাশেই আর একটি চিতা প্রায় নির্ব্বাপিত। যেখান হইতে উক্ত কণ্ঠস্বর আসিতেছিল।

ক্রমাগত জল দেওয়ার ফলে এই চিতা প্রায় নির্ব্বাপিত হইয়া আসিতেছে; এই স্থান হইতে গঙ্গাজল পর্য্যন্ত অনেক জন লোক দণ্ডায়মান : যে ব্যক্তি গঙ্গায় দাঁড়াইয়া, সে কলস পূর্ণ করিতেছে—তাহার হাত হইতে পূর্ণ কলস হস্তান্তরিত হইয়া আসিয়া এই চিতায় নিঃশেষিত হয়। ভস্মরাশি বিরক্ত হইয়া উঠে। কিন্তু প্রতিবারই দেখা যায় দণ্ডায়মান লোকগুলি এ কার্য সম্পাদন করিতে, কলসটি হাতে লইয়া, কেমন যেন বা ভীত। পয়ারবিলাসী মন উধাও, পা কাঁপিয়া উঠে। সকলেই নির্ব্বাক, সকলেই এই ত গাছ নড়ে, এই ত অন্য সকলে রহিয়াছে—এই কথা ভাবিয়া সমস্ত কিছুকে কলস প্রমুখাৎ যুত করিতে চাহে, তত্রাচ কলস প্রায় হস্তচ্যুত হয়। সকলেরই কলস বাঁচাইতে দেহ বাঁকিয়াছিল।

কেবলমাত্র বৈজু চাঁড়াল, রূপরসগন্ধের সততা মানিয়া নির্ভীক, দাঁড়াইয়া আছে, সে তাহার দুঃসাহসিক মোচে দৃপ্ত চাড়া দিয়া অদ্ভুত করুণাবাচক হাসি হাসিয়া অনেক কথাই বলিতেছিল, তাহার চোখে ঘুম নাই। কহিল, "আই গো, হুঁশিয়ার গো খুব হে, মনকে আঁচ ঠেল, হিঃ গতর খুব খাড়া রাখ মন" পুনর্ব্বার দু' এক কদম নিকটে আসিয়া বলিল, "ওগো মশাই গো, উটি কলসটি, তোমার হৃদয় গো, আবার উটি তোমার স্মৃতি বটে, দেখ যেন ভাঙেনি, উটি ভেঙে দিয়ে যাবে চিতায় হে" বলিয়া মাথাটি দিয়া এখানকার আলোকে ঈষৎ নাড়া দিল।

বৈজু কারণসলিলে একটি ক্ষুদ্রপল্লবিত শাখাবৎ, দূরে কোথাও দ্বীপ প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে, সুতরাং তার প্রতি সকলের আকর্ষণ অহেতুক নহে। তথাপি বৈজুর কথায় জনগণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছিল, শুধু কথা কেন, তাহার তুচ্ছ হেরফের গভীর হইয়া দেখা দেয়, যেহেতু তাহার দেহকে অবলম্বন করিয়া একটি চাকচিক্য যেন স্বস্তিলাভ করিয়াছে। জনগণের একজন বৈজুর কথার উত্তরে, কেবলমাত্র নিজের অস্তিত্ব উপলব্ধির কারণেই বলিল, 'এতেক কথা কিবালে কে বটে হে!'

বৈজু-আশ্রিত চাকচিক্য দুলিয়া উঠিল! বৈজু চাঁড়াল হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না। ভোরের হাসিতে যে ভাই-ভাই ভাবটুকু থাকে, সেইটুকু এ-হাসিতেও ছিল। কিন্তু বৈজু একটু বেশী রকমে অভিমানী, সে নীচ কুলোদ্ভব, পাছে তাহার হাস্যধ্বনি কাহারও দেহে লাগে সে-কারণে সে ঊর্দ্ধ আকাশে হাস্যধ্বনি ছড়াইয়া দিয়া কহিল, "কেনে গো বাবু মশায়, এখনও (!) অবাক কি হেতুক, তোমার কি মনে লয়!" বলিয়া আয়ত নয়নে ঈষৎ বিস্ময় হানিয়া তাহার দিকে চাহিল।

বৈজুর হাস্যধ্বনি শ্রবণে লোকটি ভয়ার্ত্ত হয়, অত্যধিক অস্বস্তি সহকারে তাহার প্রতি সকলেই তাকাইয়াছিল, কারণ এরূপ হাস্য স্থানকালপাত্র ভেদে যারপরনাই অসংযত বলিয়া মনে হয়। অন্যপক্ষে বৈজু চাঁড়াল বুঝিল, লোকটি এক্ষেত্রে ছায়াবৎ, কোন স্বাভাবিকতা নাই, এবং তাহার যাহা কিছু বোধ ছিল, তাহার কিছুটা শবদাহের সহিত পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে। সুতরাং সে এই শ্মশানভূমি নির্দ্দেশ করিয়া কহিল, "তুমি কি ভাব মনে রাত্তদিন শুধু জোড় খায় ই ঠাঁই।" এই উত্তরে ভীত লোকেরা ধরা পড়িয়া গেল। "ই যে মহাটোল বটেক, কত ডাগর ডাগর পণ্ডিত আচাজ্জি ই ঠেন পাঠ দেয় গো, কত যুক্তি আঁটে, আমি শুনি ...হ্যাঁ...আমি শুনলাম বটে, তত্ত্বকথা বেজায় জানি হে, আত্মার সাকিম কুত্থাকে তার থানা কোথা; আমি যে তার সরিক!" বলিয়া আনন্দে ডানহাতখানি বাঁ হাতের এবং বাঁ হাতখানি ডানহাতের পেশীকে চাপড়াইল। ইহার কিঞ্চিৎ পরে অত্যন্ত গোপন খবর দিবার মত করিয়া বলিল, "কলস? সে যে হ্রিদয়! ইটা যে স্মৃতি, সি-কথা গোবিন্দ আচাজ্জি বললে, মড়া পুড়াতে এসে বললে, বৈজু এ-ইটা ঘটাকাশ, ভাঙলেই পটাকাশে মিলবে বটে, হিসাব মিলে যাবে, আমরা ভাবি কলসটা স্মৃতি... হে হে অমনভাবে না...না...গো বাবু মশায়।"

বৈজুর কথার মধ্যেই নির্ব্বাপিত চিতার নিকটে এক কলস জল রাখা হইয়াছিল, শ্মশান যাত্রীদের একজন এই কলসটিকে ভাঙিয়া, এই স্থান পরিত্যাগ করত চলিয়া যাইবে; যে জন ভাঙিবে সে বাঁশটিকে ঠিক যুত করিয়া ধরে নাই দেখিয়াই, বৈজু তাহার কথা থামাইয়া হাঁ-হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিল। পাছে

চণ্ডালের ছোঁয়া লাগে তাই সকলেই যথাসম্ভব সরিয়া গেল। বৈজু আপনাকে সামলাইয়া বলিল, “খুব ডাগর জোর ধর হে বটে, এ হে বাবু...উ তো কলসী—তোমার মাগ লয়।” এবার মুচকি হাসিয়া কহিল, “আর কেনই বা তা লয়, হ্যাঁ জোর করি ধর, অন্যদিকে চাও, লাও মার শালা জোর গুঁতো, যাক শালা ঘটাকাশ পটাকাশে।”

রুদ্ধশ্বাস-স্তব্ধতা দেখা দিল, বৈজু পুনরায় বলিল, “ভাঙার শব্দ হলে ইদিক পানে আর চাহিবে না গো, শুধু হরি বোল দিবে...হরি বোল।”

এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে বিকট ভাঙার শব্দ হইল, শূন্যতা বাড়িল। এই সঙ্গে অযুত হরিধ্বনি শোনা গেল, বৈজু তাহার কথা কয়েকটি বলিয়া মুখখানি অর্দ্ধ-উন্মুক্ত করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সেও শব্দ শোনা মাত্র বলিয়া উঠিল, “সাবাস সাবাস” এবং ইহার ক্ষণেক পরেই, সে চকিত হইয়া বলিয়া ছিল, “হে রে রে রে...ই দিকে চেওনা...সোজা ঘরকে যাও...।”

তাহারা সকলেই ত্বরিত পদে, শ্মশান পরিত্যাগ করিয়া সুউচ্চ ভেড়ীপথে উঠিল, অদৃশ্য হইয়া গেল। ইহারা সকলেই—যে ইতিপূর্ব্বে ছিল—তাহার প্রমাণস্বরূপ বৃক্ষাদির পাতা কম্পিত হইতে লাগিল; কেননা তাহারা ভেড়ীপথ হইতে নামিবার কালে বৃক্ষের ডাল আকর্ষণ করত নামিয়াছিল।

কম্পমান পত্রাদির দিকে বৈজু কিয়ৎকাল চাহিয়া রহিল, কাহাকেও সে দেখিতে পায় নাই, সহসা নির্ব্বাপিত চিতার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, এখন সে তাহার পৌরুষে দুর্দ্ধর্ষ ঘাড়খানি ঘুরাইয়া দেখিল, ছোট ছোট প্রজ্বলিত পাটকাঠির টুকরা মাটিতে পতিত হইয়া ক্রমে নিভিতেছে, এবং তৎসহ গম্ভীর মন্ত্রোচ্চারণ উৎসারিত হয়, “যে তোমার শোক মোহ এ সকল গেল” (শুধু মাত্র প্রেম রহিল সম্ভবত)। বৈজুনাথ, চিতাপ্রদক্ষিণকারী বালকের হস্তধৃত মুখাগ্নিনিমিত্ত প্রজ্বলিত পাটকাঠির আলোকে ভাঙা কলসের অনেক টুকরার মধ্যে পুনরায় কি যেন অনুসন্ধান করিতে ব্যস্ত হইল।

দুই একটি সেই ভাঙা কলসের টুকরা পা দিয়া সরাইতেই একটি রৌপ্যখণ্ড তাহার চোখে পড়িল, ইহাই সে খুঁজিতেছিল। সত্বর রৌপ্যখণ্ডটি কুড়াইয়া লইয়া সেই উল্লাসে এক কদম, বগল বাজাইয়া, নৃত্য করিতে গিয়া সে একীভূত স্থির!

ক্বচিৎ কখনও সেও স্থির হয়!

সমীপস্থ চিতাস্থিত মৃতের কণ্ঠলগ্ন ফুলমালা জ্বলিতেছে, আর অন্য পাশে, বালকেব বিহ্বল বিমূঢ় সদ্য স্তনছিন্ন অসহায় মুখমণ্ডল আর ইতিমধ্যেই অগ্নিশিখা, এবং বালকের সম্মুখে ঘূর্ণিহাওয়া যেমত আবর্ত্তিত হয় তদ্রূপ সমস্ত সৃষ্টি ঘুরিয়া উঠিল। পরক্ষণেই, 'বাবা গো' বলিয়াই বহ্নিমান চিতার দিকে সে ছুটিতে উদ্যত হইল।

বৈজুনাথ অন্যমনস্ক, তথাপি আপনার দায়িত্বজ্ঞানে হাঁ-হাঁ করিয়া বাধা প্রদান করিতে গিয়াছিল। বালকটির বয়সী সঙ্গীরা বালককে ধরিয়া ফেলিল; তবুও এখনও, বালক স্বীয় আবেগ সম্বরণ করিতে সমর্থ হয় নাই। একথা সত্য যে, মৃত্যুর গভীরতায়, এক মুহূর্ত্তের জন্য চন্দ্র সূর্য্যকে হারাইবার মত স্থিরতা তাহার নাই। যদিচ, সবুজতা তাহার কাছে নিশুতি রাত্রের ঝিঁঝি স্বর এমত, যদিও আপনার নিঃশ্বাস পরিদৃশ্যমান আলোকে আড়াল করিয়াছিল, যদিও স্পর্শবোধ ভোরের পাখীর কণ্ঠস্বরে উধাও।

বয়সী সঙ্গীরা তাহাকে, এমত মনে হয়, যেন বা দাঁত দিয়া টানিয়া ধরিয়া আছে। সুতরাং সান্ত্বনা দিবার ভাষা থাকিলেও উপায় ছিল না। সকলেরই জিহ্বা কটু কোন স্বাদে লিপ্ত, মুখ বিকৃত। তথাপি শুধুমাত্র একজনা কহিল, “ছিঃ পাগল” একথা সংস্কারবশতঃই সে বলে।

এই ছোট মন্তব্যটি বালকের সম্বিৎ ফিরাইয়া দিল; চিতাপ্রসূত, উত্থিত ধূম্রজালের দিকে তাকাইয়া, অন্যেরা ভীতভাবে মাথা নাড়িল। বৈজু বালকের দিকে ব্যাকুলভাবে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিল, “হা রে ননু, খোঁকা গো, মন তোমার পুঁড়ে” এবং পরক্ষণেই অতিশয় কোমল কণ্ঠে উচ্চারণ করিল, “দেহ চিতায় মন পুঁড়ে গো” এ কথার আবৃত্তির রীতিতে মনে হইল, সে কোন এক গীতের প্রথম কলি উদ্ধৃত করিল।

সমবেত জনমণ্ডলী, অল্পক্ষণের জন্য ক্ষিতিতত্ত্বের অনিত্যতা হইতে মন ফিরাইয়া তাহার দিকে আগ্রহভরে দেখিতে লাগিল। ইহাদের সকলেরই আশা, সে কিছু বলুক, কেননা তাহাদের তালু শুকাইয়াছে, কেননা মনে নানাবিধ হাড় স্তূপীকৃত হইয়াছে, কেননা তাহারা অলৌকিক পথশ্রমে ক্লান্ত।

বৈজু পুনর্ব্বার বলিল, “কেঁদোনি খোঁকা, একটি গল্প শুন—যে দিলে সেই নিলে, তুমাকে ভাল'র

মধ্যে লোভী করে দিলে, কি করবে হে”—তাহার গলার স্বরে সহজ ঠিকানা ছিল, ফলে বালক ডুকরাইয়া কাঁদিয়া ক্ষণিক জিহ্বা দ্বারা ওষ্ঠ বুলাইয়া, একহাতে চোখ কচলাইতে কচলাইতে আপনার পিতার দেহের দিকে চাহিয়াছিল। এবং ক্ষণেক পরেই বৈজুনাথের বিষাদক্লিষ্ট স্মিতহাস্যময় মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

অন্যপক্ষে বৈজু আপনার কণ্ঠকে ঈষৎ সরস করিবার মানসে একটি ঢোক গিলিয়া নিতান্ত মেটে হইবার চেষ্টা করে। কিন্তু বালকের লাল চক্ষুর্দ্বয়—যেখানে কোন ভোর নাই, তাহাকে বিভক্ত করিয়া দিয়াছে। সে বিমূঢ়, কোনরূপে আপনার লাঠিখানি তুলিয়া লইয়া মুখখানি নীচু করিল, হস্তধৃত লাঠিখানি সে মৃদু মৃদু মাটিতে ঠুকিতেছিল। একবার কি এক কথা বলিতে গিয়া মুখ তুলিয়াই তৎক্ষণাৎ নামাইয়া অতি ধীরে বলিল, “কেঁদনি গো, খোঁকা গো” এই কথার পর একটি বিদেশী নিঃশ্বাসের শব্দ পাওয়া গেল, এবং তদনন্তর আপনার রোমশ বক্ষে হাত বুলাইতে বুলাইতে সে কহিল, “ওগো বাবু ইঠাঁই একো জীব আছে হে, ধুক ধুক ধুক ধুক করে, আমার যেটা সেটা লোহার” ইহার পর আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল, “লোহারই বা কেনে, দধীচির অস্তি দিই গড়া, পালোয়ান পালোয়ান বাজ দিই গড়া, গড়া হঁই গেল? আকন্দ ফুল এমন কি, আমি দেখলে চিন্‌তে লারবো, টুকুন ভাত গরাসে মনে লেয় আকাশ খাইছি। তবু তোমার চোখের জলের ভূতে আমাকে পেল।...হারে বাবু মানুষ, দেখনা কেনে গ্রামে গাঁয়কে হলুদ নিশান দিঁইছে, ভারী গরম (কলেরা) হ’ল, তার উপর বলে কার্ত্তিক মাস যমের দক্ষিণ দুয়ার খোলা, কত থানা মুলুক ঠেনে মড়া এল, এই দেখনা কেনে দড়িতে গিঁটদি...” বলিয়া কোমরের দড়ি দেখাইয়া পুনরায় কহিল, “সব শালা গরমের দেনাদার প্রজাখাতক, কত যে অনাথ হইল তা পাইমাপে আসে না খোঁকা, তাদের দেখলে আর কানতিসনা গো...উই যে শালা উপরে, যে শালা সবার ভিতরে, তার কলম মানতে হবেক...সে বড় কঠিন প্রাণ গো, কোন বোধ নাই, কান নাই, হাত নাই,...বিকার নাই—এতবড় সংসারটা...চালায় হে...আইগো কথা শুনছো তোমরা...মড়ার হাত যে...মাটি ছুঁতে চায়, মাটি হা হা মাটি...”

এইদৃশ্যে তাহারা সকলে যারপরনাই তটস্থ হয়; কিন্তু দক্ষতা এবং দূরত্ব বিচার তখনও পরিচ্ছন্নভাবে আসে নাই, তখনও তাহারা ললাটে করাঘাত-সুখে অলক্ষী ফলে বৈজুর সাবধান বাণী কাজে দেয় নাই।

“হে হে গো, বাবু গো, হাতকে ঠেকা দাও ঠেকা দাও, না হলে জীবন বড় লষ্ট করবেক হে” এ কথার পর খানিক দ্রুত অগ্রসর হইয়া অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বৈজুনাথ বলিয়াছিল।

হাতটিকে তুলিবার জন্য, একজন একটি বাঁশ দিয়া তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করিল, মৃত সাপের মত শ্লথ এ হস্ত—সৌহার্দ্দ্য অভিমানী, এ হাতখানি ব্যগ্রতার স্থির নশ্বর রূপ! ইদানীং পুনর্ব্বার অগ্নিতে সে মনোরমত্ব ঠেলিয়া দেওয়া হয়, লাখ প্রবাদবচন এবং দিগ্‌দর্শন পুড়িয়া পুড়িয়া ছাই হইবে।

বালক এ হেন দৃশ্য যে সহিতে পারে নাই, তাহা বৈজুনাথের চোখ এড়াইল না। বালক দৃঢ় করিয়া আপনকার নয়নযুগল মুদ্রিত করিল, আপনকার মুষ্টির মধ্যে কাহার মুষ্টি প্রবলভাবে ধরিতে চেষ্টা করিতেছিল। তাহার দেহ প্রদীপের শিখাবৎ।

বালকের স্বভাব বৈজুনাথকে আমোদের সন্ধান দিল। সে হাসিয়া উঠিল—আর অন্ধকার নাই, ব্যাঘ্র লীন হয়। সে কহিল, “লাও গো মানুষ বাবু, ভয়ে না ভালবাসায় চোখ বুঁজলে, এমন যেন শত্রুর না হয়—বলে সবাই শুরু করে, অথচক এমনি হয়।”

আর আর সকলেই তাহার ইত্যাকার বাক্যবাণের জন্য প্রস্তুত ছিল না। সকলেই তাহাকে শক্ত করিয়া দেখিল, ইহাদের দৃষ্টিতে ভর্ৎসনা ছিল। বৈজুনাথ বুঝিল, মুখ দিয়া অনেকটা হাঁফ ছাড়িয়া কহিল, “হে গো, আমার কথা ধর না হে, কথায় আমার আঁকসা’ট নাই, আমি জাতচাঁড়াল গো, আমি তারাগুলা জলে দেখি আমার মাস শেয়াল শকুনে খায় না গো!”

এইটুকু মাত্র পদবিন্যাসে সকলেই মোহগ্রস্ত, এ কারণে যে তাহার বাক্যসমূহে জীবনের ক্লান্তি ছিল।

‘মড়া দেখি দেখি আমি মাটি হইছি গো, আমি তো শব গো, বহুদিন মরে আছি হে...লাও বাবু মশায়, তোমাদেরই ই চিতা ত এখন গোড়া গাঁথছে, খোঁকাকে লিয়ে উ ঠাঁই বস গা, মনের কথা বল গা উ ঠাঁই...” বলিয়া বৈজু গঙ্গার দিকে অগ্রসর হইল।

সকলেই চলমান বৈজুনাথকে লক্ষ্য করিল, তাহার কোথায় যেন রঙের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস আছে—সে

নিঃশ্বাস নেয়, না নিঃশ্বাস তাহাকেই নেয়—এ প্রশ্ন তাহাদের মনে উদয় হয়।

ইদানীং গঙ্গা, হাস্যময়ী, বহু বহুদূরে বজ্রমুষ্টি রক্তিমতা, বায়ুচিহ্ন—কোদাল কোপান যেমত—ঢেউয়ে ঢেউয়ে ফুলমৃদু জাম রঙ। ক্রমাগতই জলজ পানা ভাসিয়া যাইতেছে, নিম্ন আকাশে ডানার হিলমিল, শূন্যতাকে অপহরণ করিতে আপনার সত্তা হারাইতেছে।

বৈজুনাথ গঙ্গার কিনারে দাঁড়াইয়া পৃথিবীর প্রত্যহের সূক্ষ্মতা দেখিল, বিস্মিত হইল, বার বার ডাকিল, "মা মা, মা গো।" তাহার কণ্ঠস্বরে শিশুহস্তের ছবি মুদ্রিত ছিল। ইহার পর শ্রদ্ধাভরে পুনর্ব্বার আপনার মস্তকে গঙ্গোদক লইয়া ছিটাইবার কালে মাতৃনাম উচ্চারণ করিল। মুখ ধুইল এবং এই সময়ে ঘাড় ফিরাইয়া কহিল, "ঠাকুর, বুড়ো কর্ত্তার কি দশা গো, গোণ ত পার করলেক, হে হে।"

যেহেতু এখন ফরসা হইয়াছে, ফলে এখন অক্ষর চিনা যায়, সংখ্যা স্বাভাবিক হয়। লক্ষ্মীনারায়ণ জ্যোতিষী অনন্তহরির সম্মুখে লম্বমান কোষ্ঠীপত্র খুলিয়া ধরিয়া আছেন, কোষ্ঠী যেমত আয়না। জ্যোতিষী অন্যমনে বিচার করিয়া, কিছু পরে একটি কাঠি দিয়া নরম বেলাতটে কি লিখিতে লিখিতে অনেকখানি দূরে সরিয়া গিয়াছিলেন। এখন বৈজুনাথের প্রশ্নে একবার ফিরিয়া তাকাইলেন মাত্র, পরক্ষণেই লক্ষ্মীনারায়ণের দিকে চাহিয়া অন্যমনস্ক হইয়া হতবাক হইয়া রহিলেন।

লক্ষ্মীনারায়ণ তাঁহার বিচারের ফলাফল শুনিবার আশায় উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলেন; এক্ষণে জ্যোতিষীকে এইভাবে তাকাইয়া থাকিতে দেখিয়া, যারপরনাই অস্বস্তি বোধ করত সহজ হইবার ভঙ্গী করিলেন। ইহাতে তাঁহার, লক্ষ্মীনারায়ণের, দেহ যেন বিকলাঙ্গ হইল। একদা তিনি গঙ্গার দিকে, যেখানে অন্যমনা হইবার অব্যর্থ সুযোগ স্রোতরূপে বর্ত্তমান, অন্যবার পরিক্রমণকারী, বৃত্তাকারে ক্রমাগতই, ভ্রাম্যমাণ কৃষ্ণকায় কীর্ত্তনের দলকে দেখিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণকে দেখিলে সত্যই মায়া হয়, কালের প্রতি চোখমুখে কোথাও সম্মানের লেশমাত্র উল্লেখ নাই। কাহাদের জিহ্বার আস্বাদনের, তৃপ্তির শব্দ—চক্‌চক্ শব্দ তিনি বাতাসে বাতাসে শুনিতে পান! এই শব্দ তাঁহাকে একীভূত করে। অতিকায় হিম জলজ দুর্ভাবনায় তিনি মূর্খ। এখন, কোনক্রমে আপনার একটি পা, মাটি হইতে উঠাইয়া, বাঁকাইয়া, ছড়াইয়া, পক্ষীরা যেমত করে, কিছুটা অবশতা দূর করত পুনরায় জ্যোতিষীর প্রতি কহিলেন, "বৈজু চাঁড়াল বেটা কি বলছে গো" বলিয়া আপনার মুখ দিয়া বৈজুকে নির্দ্দেশ করিলেন। নিজের মনোভাব যাহাতে প্রচ্ছন্ন থাকে সে কারণে তিনি একথা ঈষৎ হেনস্থা সহকারেই বলিয়াছিলেন। তথাপি তাঁহার বাক্যসকল কিছু পরিমাণ আর্দ্র।

জ্যোতিষী অনন্তহরির স্থির মুখখানি কঠিন হইয়া উঠিল, কহিলেন, "আঃ, চুপ কর ত।" ইঁহার মুখমণ্ডলের কঠিনতা যেন অগ্রবর্ত্তী অন্ধকারকে চাপিয়া ধরিল।

লক্ষ্মীনারায়ণ ইহার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, তাঁহার দেহে এই বিরক্ত-উক্তি পাথরের মত আঘাত করে। ফলে মাথাটি নড়িয়া উঠিল। তিনি একটি শতছিদ্র সম্ভ্রম দিয়া নিজেকে ঢাকিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং এখন সত্যই, মাত্র এখনই তাঁহার গাত্র সকালের শুদ্ধ শীতল হাওয়া স্পর্শ করিল।

বৈজুনাথ একদা স্রোত, অন্যপক্ষে শ্মশানভূমি দেখিয়াছিল। সে গঙ্গা হইতে উঠিয়া, নির্ব্বাপিত চিতা অভিমুখে গিয়া তত্রস্থ গহ্বর হইতে একটি কাঠকয়লা তুলিয়া লইতে তাহার দেহ অসম্ভব বাঁকিয়াচুরিয়া গিয়াছে, এখন ছাই-কালোর উপরে দেখা যায় ভূমিস্পর্শরোদে তাহার পিঠ লাল, সে একটি অনিবার্য্যরূপে প্রতীয়মান হইল; মুহূর্ত্তের মধ্যেই একটি কাঠ-কয়লা বাছিয়া দাঁত মাজিতে মাজিতে বালকটির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল; বালকের চোখে জল আছে তাহা সত্ত্বেও, তাহার, বৈজুনাথের, রীতিনীতি দেখিয়া বিস্ময়ও বর্ত্তমান এবং বালকের সঙ্গীদল এরূপ কার্য্যে বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মুখ বিকৃত করিয়াছিল, নিশ্চয়ই তাহাদের মনে হয়, যে সে মানুষের ভীতিজনিত শ্রদ্ধাকে অবমানিত এবং ভালমন্দের সাধারণ রৌদ্রবহুল বিচারকে নষ্ট করিতেছে। ইহারা যেন বলিতে চাহে, 'এ কি কর গো?'

বৈজুনাথ ভ্রূদ্বয় কুঁচকাইয়া তাহাদের বিস্ময়কে সকালের প্রথম সূর্য্যে শুকাইয়া লইল, কহিল, "কি, আমার গতিক দেখে বেজার নাকি!"

সম্মুখের লোকটি এখনও গভীরভাবে তাহার প্রতি চাহিয়া আছে, অন্যান্য সকলে বিদ্রূপের স্মিতহাস্য রেখা আপন আপন শুষ্ক ওষ্ঠে মিলাইয়া, গম্ভীর। কেননা বৈজু এখনও ছায়া, কেননা বৈজু এখনও ব্যতিক্রম, কেননা বৈজু এখনও স্বেচ্ছাচারিতার বেদনাদায়ক নাম।

বৈজু অল্প আয়াসেই অনাদৃত দেহভঙ্গিমায় ইতোমধ্যের কবিপ্রসিদ্ধ সেই মোহকে চূর্ণ করিয়া না দিয়া

সহজ কণ্ঠে কহিল, কেননা সে রঞ্জিত স্তব্ধতার সহিত অমোঘ শূন্যতার, শূন্যতা বোধের পার্থক্য, পার্থক্যের মধ্যে যে যুক্তিপূর্ণ স্বাভাবিকতা তাহা সে অবলীলাক্রমেই বুঝিত। বলিল, "কেইবা বেজার গো, এ আগা দেখে তুমিও সন্ন্যাসী হও না, আমি ত বেজার নই, মনে পড়ে বকাধাম্মিকের পালা? তুমিও আবার নাচতে নাচতে লাঙল ধরবে, ছেলে দুখালে, বউকে বলবে, মাই দে না কেনে? হা হা তুমি বলবে, 'হারে এত ডালপালা, দাঁত মাজতে একোটা ভাঙলে পাত্তিস রে' কিন্তু ঘাটকে মড়া থাকলে ছেড়ে যাবার হুকুম নাই গো।"—এ কথার মধ্যে স্পষ্টত দেখা গেল, সে রক্তে না হৃদয়ে অথবা স্মৃতিতে, কোথাও না কোথাও স্থির হইয়াছে।

"তাই ব'লে...?" লোকটি বলিয়াছিল।

ইহাতে সত্যই তাহাকে পীড়া দিয়াছিল। সে নিশ্চয়ই দুঃখী, ক্ষণেকেই ইতস্ততার মধ্যে আপনাকে দেখিতে পায়; বুঝিল পৃথিবীটা তাহার আপন নয়, আপনার নহে; এ কথায় সে যেমত বা ঈষৎ স্ফীত, সে কারণে তাহার অধিকারের চারিদিকে পলকে, ঝটিতি, আপনাকে সামলাইয়া ভ্রূকুটি সহকারে তাকাইয়া একটি নিঃশ্বাস গ্রহণ করিল, এখানে সকালের গাঙ্গেয় শৈত্যে দ্রবীভূত বাতাস আপনকার চরিত্র, নিঃশ্বাসের কারণে হারাইল না—অন্তরীক্ষে হানা দিয়া ফিরিল। হায়, তাহার কোন দেবতা নাই, যে তাহার সহিত শুইয়া শুইয়া প্রীতিপদ, সুন্দর, সবুজতার, সন্ধ্যার, নক্ষত্রনিচয়ের, তীরদর্শনের, পক্ষিকুলের অবিমৃষ্যকারিতার, মিনতির, রাখালের গল্প সুর সংযোগে সূক্ষ্মতম নিঃশ্বাসের আওয়াজ করিয়া যাইবে। হায় সে বড় একা! বৈজুনাথ কয়লায় কালো তর্জনীটা তুলিয়া উত্তর করিল, "বাবু বলি এক কথা, আচাজ্জিরা (আচার্য্যরা) সতীদাহে যখন হাঁক তুলে, এয়োরা তোমরা সোনা দাও, স্বগ্যে সোনা ছাড়া কিছুই যায় না, স্বগ্যে যায় না—তা পরে চিতা লিভিয়ে সোনা তুলে তখন..." বলিয়াই বাচাল বৈজুনাথ দ্রুতপদে সে-স্থান পরিত্যাগ করিল।

সে এত দ্রুত গতিতে আসিয়াছিল যে আর একটু হইলেই অনন্তহরির অঙ্কের উপর পা পড়িত। লক্ষ্মীনারায়ণের হুমকিতে সে কোনরূপে আপনাকে সামলাইয়া কহিল, "ই গো ঠাকুর, পুণ্যাত্মা বুড়ার দশা কি গো?"

লক্ষ্মীনারায়ণ বলিয়া উঠিল, "হে বেটা চাঁড়াল, তুই বড় জ্বালাস দেখছি...যা বেটা..."

কাঠকয়লালিপ্ত হইলেও মুখখানিতে বোকা অপ্রস্তুতের ভাব লক্ষিত হইল। কাহারও গোণা কয়েকটি নিঃশ্বাসের পথ সে যেমত বা ভুলক্রমে রোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

এমত সময় অনন্তহরি কহিল, "আর একটু বাঁকি ওকে বল...'

লক্ষ্মীনারায়ণ ভয়মিশ্রিত চোখে ভিখারীর মত কিয়ৎক্ষণ জ্যোতিষীর দিকে চাহিয়া থাকিয়া, আর খানিক বৈজুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আর একটু বাঁকি।"

লক্ষ্মীনারায়ণ আকাশের দিব্যভাবের দিকে চাহিলেন। তাঁহার দেহ যেন গীতার উক্তি, অথবা পুরাণে লিখিত। গ্রহনক্ষত্রের সাক্ষাৎ নাই, তবু সৌরজগতের ভার তাঁহাকে দিক্‌ভ্রান্ত করিয়া দিল, রহস্যময় পরিক্রমণ বহুদূর হইতে নামিয়া আসিয়া তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া ইদানীং আবেগ সঞ্চারী; আপনার বদ্ধতাকে লইয়া কে মহা উল্লাসে খেলা আরম্ভ করে; ফলে আপনার ভার অনুমান ও উপলব্ধি করার মধ্যে যে ত্রাসের সঞ্চার অতীব সাধারণ, তাহা তাঁহার হইয়াছিল। এই উপলব্ধি হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত কোন এক সূত্রে হঠাৎ তিনি বলিয়া ফেলিলেন, "আ মর, তু বেটা জাত জন্ম খোয়াবি? সরে দাঁড়া না মরণ!"—ইহা বলিতে লক্ষ্মীনারায়ণ রাগতভাবে স্ত্রীলোকের মত ঢং করিলেন, তাঁহার ব্যবহার অনেকাংশে ভাঁড়ের মতই।

বৈজুনাথ তাঁহার বাক্যে থতমত স্তূপীকৃত, কেন না বিচারের আঁচড় ইকড়ি ছাড়িয়া বেশ কিছুটা দূরে সে দাঁড়াইয়াছিল, এবং পরে, অতর্কিত কিছুটা দূরে পুনরায় সরিয়া গিয়া বলিল, "বিধান বল?... কাঁহাতক বুড়া মানুষটা হিম খাবে গো, আর মড়াবসার, মড়া পুড়ার গন্ধ শুঁকবে...বড় পুণ্যাত্মা গো...শুকনা ডালে পাখী দুটো বড় হিমসিম খায়।"—বুড়া অর্থে গঙ্গাতীরে আনীত সীতারামকে উদ্দেশ্য করিয়াই, বৈজু এ সকল কথা বলিয়াছিল। তাহার এহেন সরল শেষ উক্তিতে পুরাতন মধুর পত্রের মায়া ছিল; সময় যেখানে শেফালি, সময় যেখানে অল্পবয়সী, সময় যেখানে হস্তীশাবকের ন্যায়...দর্শনের উপমা নহে—সত্যই পদ্মবনে জলকেলী করিতেছে। বৈজু একথা বলে নাই, সে আবৃত্তি করিয়াছিল, রমণীর বস্ত্রাঞ্চল

যে বিশেষ মনোভাব প্রকাশের বাক্যরূপ, সেই গভীরতার, বাস্তবতার অনুভবের আস্থার হৃদয়াবেগের আদ্য অক্ষর এখানেও অস্থির, কেননা এই সূত্রে সূক্ষ্ম রেখার তথা সনাতন সৌন্দর্য্যের শুভ্র মাধুর্য্যের আখ্যানের ইঙ্গিত, প্রাকৃতজনের মঙ্গলজনক ইঙ্গিত সে করিয়াছিল। আঃ সে এক অপূর্ব আখ্যান। তাহা আদি-অন্তহীন উষ্ণতাকে কাব্যময় এবং উপত্যকা হইতে উপত্যকা অন্তরে তাহাকে বহন না করিয়া, যেখানে সুউচ্চ গৈরিক স্বর্ণাভ শীর্ষযুক্ত পর্ব্বতের ছায়া চলমান স্রোতধারার উপর বিস্তৃত, তাহারই তীরে স্থিত করত উপলব্ধি করে। লক্ষ্মীনারায়ণের ইহা ভাল লাগে নাই, তখনও তিনি আপনার দেহস্থিত অন্ধকারে ছুটাছুটি করিতেছিলেন। তিনি বিরক্তি সহকারে কিছু বলিবার পূর্ব্বেই জ্যোতিষীর কথা শোনা গেল।

"ভবিতব্য...ভাগ্য" বলিয়া জ্যোতিষী অনন্তহরি হাতের কাঠি তুলিয়া, প্রাচীন একটি হাসি হাসিলেন—কিছুদূর পর্য্যন্ত পথ অনুধাবন করার এ হাস্য, এ হাস্যের বাস কোথায় কে জানে, তবে একথা আমরা জানি, এ হাস্য রাত্রের অন্ধকার দিয়া তন্তু প্রস্তুত করে, এবং যাহা নিষ্ঠুর হইলেও অমোঘ। এ হাসিকে কোন হাতই বুঝিয়া লইতে তথা প্রকাশ করিতে অদ্যও পারে নাই। কহিলেন, "ওরে চাঁড়াল, শিবের কলম মানবে না? কি! চন্দ্র সূর্য্য সব কিছুকে আক্কেল দিয়েছে রে,...তা ছাড়া তুই জানিস্ না এ বড় পুণ্যের ঘাট, পঞ্চমুণ্ডীর ঘাট। এখানে বুড়োর বাপ-ঠাকুরদা সব গঙ্গা পেয়েছে, তাই সে..."

পঞ্চমুণ্ডীর নাম শ্রবণ মাত্র বৈজুনাথের ঈষৎ রোমহর্ষ হয়। এ দেহের পৃষ্ঠদেশ সত্যই কি কিছু পূর্ব্বে লাল হইয়াছিল, যে চন্দ্র সূর্য্যকে সাক্ষ্য করিয়া অনেকবার আপনার বজ্রমুষ্টি দেখাইয়াছে, পৃথিবীতে সে সহজেই অযাচিতাবলম্বী হইয়া, কৌতুক পরতন্ত্র হইয়া অন্ধকারকে আপনার খেলার সঙ্গী হিসাবে আমন্ত্রণ করিয়াছে—সে এখন একীভূত; তাহারও সংস্কার ছিল, যুক্তি যেখানে কুসুমাদপি কোমল, অবশ। পঞ্চমুণ্ডী নামে সে চোখ দুইটি বড় করিয়া যেন বিপদ গণিল, ইহার পর জ্যোতিষীর পাশ দিয়া গঙ্গায় মুখ প্রক্ষালন করিতে করিতে আপন মনে কহিল, "পুণ্যি না শালা হাতী"—তাহার পর হঠাৎ সে জ্যোতিষীকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিল, "অত পুণ্যের ঘাটে ত গঙ্গা খেলে কেনে গো" বলিয়া নিজের বিদ্রূপে নিজেই হাসিয়া উঠিল, এবং কেহ উত্তর করিল না দেখিয়া নিজেই উত্তর করিল, "গঙ্গা খেলে কেনে, বলব? সে ঘাটকে গঙ্গা থাকতে দিবে কেনে, কত কটা মানুষ জলজ্যান্ত ধাঁই ধাঁই পুড়ল—বল"—এই উত্তর, তাহার আচারের প্রতি যাহাদের কোন বিশ্বাস নাই, তাহাদেরই যেন বা ঘোর অভিমানে বলিয়াছিল।

ইহারা দুইজনেই কিঞ্চিৎ ভয় ভয়, বৈজুনাথ যাহার পিছনে গঙ্গা, তাহার দিকে তাকাইলেন।

বৈজুনাথ ইঁহাদের অবস্থা দেখিয়া খানিক বিশ্বাস লাভ করিয়া পুনরায় আরম্ভ করিল, "কত কটা ডাগর সতীদাহ হল বল, লোকে শাঁখ বাজালে, উলু দিলে, আমার শ্বশুর বলত শ'শয়ে গেছে, আমি যেখন এ ঘাটকে জামাই হই এলাম—তারপর কত কটা গেল" বলিয়া গঙ্গা ছাড়িয়া উঠিয়া আসিয়া থমকাইয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখ লজ্জায় অথবা দুঃখে নীচু হইয়াছিল; একটি গভীর নিঃশ্বাস লইয়া, ঝটিতি মুখটি ঘুরাইয়া আঙুল দিয়া পশ্চাতের প্রবাহিণী গঙ্গাকে নির্দ্দেশ করত পুনরায় কহিল, "তাই বুঝি গঙ্গা, চোখের জলকে লোনা হল—কে জানে? বল ঠাকুর তোমরা পাঁচজন।" এরূপ কথা গল্প যখনই সে সু. াগ পাইয়াছে তখনই, হয় শবযাত্রীদের জাগাইয়া রাখিবার জন্য, নয় কেবলমাত্র অবসর বিনোদনের জন্য বলিয়াছে। হায়, শ্মশানেরও সুদীর্ঘ গল্প আছে। তথাপি এখন—তাহার কণ্ঠস্বরে এ কথা স্পষ্টতর হইল যে পৃথিবী বড় অন্ধকার আচ্ছন্ন, এ কারণে যে, তাহার বেদনায় নিয়মের প্রতি ক্ষোভ ছিল।

এ ক্ষোভ, নিমজ্জমান ব্যক্তির শূন্যতা আকর্ষণ উদ্যত হাতের মতই জ্যোতিষীর চোখে প্রতিভাত হয়, ফলে ভীত জ্যোতিষী আপনার শরীরকে মৃদু আন্দোলিত করিয়া কহিলেন, "থাম্ থাম্ বেটা চাঁড়াল, সে ঘাট কেন গেল, সে কথায় তোর কি দরকার।" একথা জ্যোতিষী শুধুমাত্র নিজেকে সহজ করিবার জন্যই আপনাকে আড়াল করিবার হেতু বলিয়াছিলেন, যেহেতু বৈজুনাথের বাক্যে ক্ষণিকের জন্য আপনার মোহ অহঙ্কার বিগত হয়, সেই হেতু সহসা এই সৃষ্টির রেখা সমূহ যাহা কখন ফুলে কভু ফলে, প্রায়ই শিশু আলিঙ্গনের বিচিত্র ভঙ্গিমায় প্রতিভাত—তাহা সকল বুদ্ধি হারাইয়া স্মৃতিকে ভ্রংশ করত অসংলগ্ন এলোমেলো হইয়া, অবশেষে—তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখে অনাদি অনন্ত হইয়া দেখা দিয়াছিল। কিন্তু তিনি

অতীব চতুর, পলকেই বেলাতটের অঙ্কে মনসংযোগ করিলেন।

"আঃ...রে" বলিয়া বৈজু জ্যোতিষীর কথা কয়টিকে যুত করত কহিল, "হায় কপাল, ছি ছি ছি গো আচাজ্জি" বলিয়া কেমন যেমন খুব সহজ নৃত্যের পদবিক্ষেপ একটু এদিক সেদিকে করিয়া পুনর্ব্বার কহিল, "সুতাহাট-থানার-বাপ-মা তুমি মোড়ল, আমরা আবার কথা কইব কোন মুখে গো, ছোট জাত মোরা—বল? আমরা গল্প বললাম হে। আমরা গল্প বলি। বুড়া ঠায় শুই আছে আর মড়াবসার গন্ধ, তাই বললাম হে..." বলিয়াই আপনার ভ্রূভঙ্গিমায় বেলাতটের অঙ্ককে ভয়ার্ত্ত করিল।

"থাক থাক, চুপ কর বেটা" লক্ষ্মীনারায়ণ বলিলেন, কেন না তিনি আশায় উত্তেজনায় অসহিষ্ণু হইয়াছিলেন, অবাধ্য অনন্তহরির অঙ্কের ফলাফলের প্রতি তাঁহার মন ছিল না।

তাঁহার ভর্ৎসনার সঙ্গে সঙ্গেই বৈজুনাথ উত্তর করিল, "আহা, নিজেকে রাগাইছ কেনে? বলি 'রাগ না চাঁড়াল'?"—বলিয়া কিশোরীসদৃশ হাসি হাসিল—তাহার বক্রোক্তি শুনিয়া অন্য দুইজন কিছুই করিতে পারিলেন না। বৈজুনাথ আবার সূত্র ধরিল, "আমার কথা মান কিন্তুক, শালা। এই ঘাট ভারী খানকী খচ্চর ঘাট। পঞ্চমুণ্ডী ছিলেন সে-ঠেন, মা গঙ্গার কাছে চালাকি, মা'ই বটে কোম্পানী, ডুবে গেল শালা পঞ্চমুণ্ডী"—এইটুকু বাক্যের মধ্যে সে উচ্ছ্বাসে স্ফীত বলীয়ান হইয়া উঠিয়াছিল, তবু এখন একটি নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া অসহায়ভাবে—যে অসহায়তার মধ্যে গোধূলিলগ্নের অস্পষ্টতা, দূরাগত শঙ্খধ্বনির মায়া, বৎসহারা গাভীর আর্ত্তরবের রেশ ছিল অথচ আর এক স্বরে বলিল, "জল যখন নেমে যায়, তখন কখনও কখনও সেই পাঁজা—মুণ্ডী গাঁথা পাঁজা দেখা দেয়, বলে কি জানো? বলে, 'হেরে বেটা, ভাল করে চিতা সাজাস, আমার হাঁড়ি চড়বেক...' আমি শালা ডর করি না...দু শালা! মা আমার কোম্পানী, আমার আবার ডর কিসের...ভাবি দি শালা এক কুড়ুল মেরে...শালা বলে কি না আমি তোকে শাস্তি দেব, হা! শাস্তি! ভাবি...থাক শালা চোখের জলের লোনা জলে ডুবে...এ ঘাটে বুড়োক না শোয়ালেই পারতে গো।" এ কথা বলিতে বলিতে বৃদ্ধ সীতারামের মুখখানি তাহার মানসপটে ভাসিয়া উঠে। বৈজুনাথ নিশ্চয় শব সহ্য করিতে পারে কিন্তু মৃত্যু [illegible] পুনরায় ইহা একটি সুবৃহৎ গ্রন্থ—যাহাতে ফুলসকল লবণাক্ত, যাহাতে বিদ্যুৎ-দীপ্ত সবুজতার [illegible]তার কথা, যাহা বৃত্তাকার ভ্রমণের অবশ্যম্ভাবী পরিপ্রেক্ষিত, যাহা দৃশ্যত নাই—তাহারই সূচনা করে। একারণে চাঁড়াল বৈজুনাথ কোনক্রমেই মৃত্যুকে সহ্য করিতে অক্ষম, কারণ তাহার আপনকার পূর্ণতা আর যে সেই হেতু সে বৃদ্ধকে এখনও পর্য্যন্ত ভাল করিয়া দেখিতেও যায় নাই।

"জয় জয় মা...তারা ব্রহ্মময়ী গো" বলিয়া জ্যোতিষী উল্লাসে যেন বিদীর্ণ হইয়া গেলেন, হস্তস্থিত হুঁকা বেসামাল হয় এবং সত্বর উঠিয়া এক দৌড়ে, না লম্ফে, লক্ষ্মীনারায়ণের নিকটে প্রায় আসিয়া স্থির হইয়া বেলাতটের আঁকাজোকার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন, এসময় তাঁহার গভীর নিঃশ্বাস পড়িতেছিল, তাঁহার আপনার ছায়া অঙ্কের উপর বিস্তৃত, সে ছায়াকে অনভিজ্ঞ বালকের মত সরাইবার বৃথা চেষ্টা করিয়া এবার অন্য দিকে গিয়া তাঁহার মনঃ সংযুক্ত হইল। সীতারামের জীবন যে এইভাবে সংখ্যায় থাকিবে কে জানিত! সংখ্যার পিছনে আমি আছে, অহঙ্কার আছে, নিঃশ্বাসও বর্ত্তমান। বৈজুনাথ তাঁহার নিকটে আসিয়াছিল, অন্যত্রে লক্ষ্মীনারায়ণ খানিকটা উঠিয়া পুনরায় ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িলেন। জ্যোতিষী আপনার হাতের কাঠি দিয়া কি যেন ঠিক দিবার পরে ক্রমে পিছু হটিতে হটিতে যেখানে আঁকজোক সমাপ্ত হইয়াছে, সেখানে কয়েক মুহূর্ত্ত অতিবাহিত করিয়া কোন সত্য দুর্দ্ধর্ষ অনিবার্য্যতা ঘোষণা করিবার মানসে এখন তাহার দুইহাত খানিক উত্তোলিত হইল, এ সময় আপনকার ওষ্ঠদ্বয় খানিক খুলিয়া নিবিষ্ট মনে নিম্নে লক্ষ্য করিলেন।

বৈজুনাথের আয়ত চক্ষুর্দ্বয় কোথায় যে স্থায়ী হইবে, তাহা ঠিক পায় নাই। এমত সময় শুনিল, জ্যোতিষী আস্ফালন করিতেছেন, "শালা যাবে কোথায়", এ কথা শুনা মাত্রই সে যেমন নির্ব্বোধ, তাঁহার দিকে তাকাইল। জ্যোতিষী তখনই জিহ্বার দ্বারা আপনকার ওষ্ঠ তৃপ্তির সহিত লেহন করত করিলেন, "শ্যাল্লা! ভৃগু যাবে কোথায়...।" এক হস্ত হইতে অন্য হস্তে হুঁকা লইয়া মহা দম্ভে টানিতে লাগিলেন। এইবার হুঁকা হইতে মুখ সরাইয়া কিঞ্চিৎ ধোঁয়া ছাড়িয়া সদর্পে হাসিয়া উঠিলেন। সৌরজগৎ তিন সত্য করিল।

"অনন্ত..." কম্পিতকণ্ঠে লক্ষ্মীনারায়ণ অনন্তহরির উত্তেজনার প্রতিক্রিয়ার বেগ সামলাইতে না

পারিয়া ডাকিয়া ছিলেন। তাঁহার স্বরে যাত্রার শেষ দৃশ্যের শেষ রাত্রের অসংযম ফুটিয়া উঠিল।

"সাত্ তাড়াতাড়ি ঘর থে কেন বার করলে বুড়োকে হে? বড় কঠিন জান!" বলিয়া মাথা দুলাইয়া "হ্যাঁ হ্যাঁ" বলিয়া আপনার বিশ্বাসকে দৃঢ় করিয়া পুনরায় কহিলেন, "বড় কঠিন জান গো।" বলিয়া, হুঁকা নিকটের মালসার কাছে রাখিলেন।

বৈজুনাথ জ্যোতিষীর অসংলগ্ন বাক্যে বড়ই ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল, সে একদা অনন্তহরির মুখপানে অন্যবার মানসিক যন্ত্রণা পীড়িত লক্ষ্মীনারায়ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করত আপনার পরনের ঠেঁটিতে ক্রমাগতই হাতের তালু ঘষিতে ঘষিতে কহিল, "সে কি?" এ সময় তাহার কথায় এলোমেলো অবিশ্বাসের ব্যঞ্জনা ছিল।

লক্ষ্মীনারায়ণ প্রায় বৈজুনাথের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া বলিয়াছিলেন, "বল কি?"

জ্যোতিষী কিঞ্চিৎ সমতা লাভ করিয়াছিলেন, কেননা গ্রহ সকল তিন সত্য করিয়াছে, তাহা স্বকর্ণে তিনি শুনিয়াছেন, ফলে আর চাপল্য নাই। তাঁহার দৃষ্টি এখান হইতে সোজা গিয়া পড়িল অদূরবর্ত্তী কীর্ত্তনদল বেষ্টিত স্থানে, যেখানে একটি স্খলিত পদবিক্ষেপে ভ্রমণরত বৃত্তের মধ্যে সীতারাম শায়িত। এই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে তিনি যেন নিজেকে হারাইয়া ফেলিলেন। একটি নিঃশ্বাস ত্যাগ করত কহিলেন, "সীতারাম! ভাগ্য! পূর্ণিমায় যাবে" বলিতে বলিতে তিনি অতি ধীরে আপনার মুখমণ্ডল ঘুরাইতে লাগিলেন।

"পূর্ণিমা? বল কি ঠাকুর!" বৈজুনাথ ভীত হইল।

"পূর্ণিমা! পূর্ণিমা! চাঁদ যখন লাল হবে" বলিয়া উঠিতেই তাঁহার সর্ব্ব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমত বা একটি বিন্দুতে পরিণত, রক্তিম চন্দ্রিমা আখ্যাটিতে তাঁহার অন্তরীক্ষ রহস্যময় দিব্য বিদ্যুতের আলোয় সমাকীর্ণ; এমন একদা চন্দ্র লাল হয়, যোদ্ধ সকল সমবেত হন, পাঞ্চজন্য বাজিয়া উঠে, ঘোর যুদ্ধের রক্তে ধরণী প্লাবিত হইয়াছিল—আকাশে পক্ষী ছিল না। এই যুদ্ধ-চিত্র দেখিয়া তিনি, অনন্তহরি, নিষ্ঠার সহিত নমস্কার করিয়া কহিলেন, "চাঁদ যখন লাল তখন ওর প্রাণ যাবে...যাবে কিন্তু একা যাবে না হে। দোসর নেবে..." একথা তিনি সকালের উদ্বেলিত গঙ্গার দিকে চাহিয়া বলিয়াছিলেন। হয়ত একথা বলিতে তাঁহার ইতস্ততা ছিল।

এই ভয়ঙ্কর আজ্ঞা, লক্ষ্মীনারায়ণ ও বৈজুনাথ দুইজনেই শুনিয়াছিল, দুইজনেই বিশেষ বিভ্রান্ত, দেহের নিকটে ভীমরুল আসিলে মানুষ যেমত ব্যতিব্যস্ত হইয়া কাঁপিয়া উঠে, তেমনি বৈজুনাথ কম্পমান, রোমাঞ্চিত। সে খানিক অস্ফুট শব্দ করত কহিল, "বল কি দোসর!"

জ্যোতিষীর এখনও ধ্যানস্থ অবস্থা, দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর করিলেন, "দোসর!"

"দোসর!" বলিয়া বৈজুনাথ এক-পা পিছু হাটিয়া গিয়া মুখে কিঞ্চিৎ হাসি ফুটাইয়া, একদা গঙ্গার দিকে পরক্ষণেই শ্মশানের চারিদিকে চাহিয়া, কুকুরের মত ঘ্রাণ লইবার চেষ্টা করত ভৌতিক প্রমাদ গণনার মধ্যে দণ্ডায়মান থাকিয়া হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। ইহার পর যখন প্রশ্ন করিল, "সে কি ঠাকুর, দোসর পাবে কোথা থেকে?" তখন তাহার কণ্ঠস্বরে জীরেন রসের হিম ছিল। কৌতুক ছিল না। এ প্রশ্নে, নিমেষেই সে যেন ঊর্দ্ধ জ্যোতির্মণ্ডল হইতে ছুটিয়া আসিয়াছে এমত মনে হইল; যে বিরাট সৃষ্টির আর এক অঙ্গের তথ্য সম্যকরূপে জানে, পৃথিবীর স্বভাবময়ী প্রকৃতি যাহার আদিঘর, বন্ধন যাহার বীজমন্ত্র। যদিও 'দোসর' বাক্যের আপনকার সৌন্দর্য্য বিদ্যমান, যদিও হাটে মাঠে সে বাক্যের নিয়ত প্রতিধ্বনি শ্রুত, যদিও সে বাক্য অনন্ত জ্যোতির্মণ্ডলের এক নির্ঝঞ্ঝাট ত্রিগুণামিতিক বিচিত্র আকর্ষণ; কিন্তু সে বাক্য দেহ ধারণ করিয়াছে। ব্রাহ্মণ দুইজন আর এক ভাবের মানুষ, আপনকার গাত্র লেহন করিয়া পশুসকল যেমত আরাম পায়, তেমনি ইহারা আপন আপন চক্ষুর্দ্বয়কে, মনকে, শ্বেতপদ্মকুসুমাদপি বিবেককে জিহ্বা দ্বারা লেহন করিতেছিলেন।

প্রথম অধীর বৈজুনাথ, আপনার পতিত জমির ন্যায় অনাদৃত বক্ষে হস্ত বুলাইয়া উর্ব্বরতা, আদিম উর্ব্বরতাকে উত্থিত করত বেলাতটের ধূসর তান্ত্রিক যন্ত্রসমূহের মত অসংখ্যের হেতু, প্রক্ষিপ্ত অঙ্কের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিল। যাহা কালকে ইদানীং আপনার বাস্তবতা-বলে এ হেন রূপ দিয়াছে যাহাতে তাহার ছায়া পর্য্যন্ত দৃশ্যমান। দুঃসাহসী বৈজুনাথ অধিকন্তু অনুধাবন করে যে রৌদ্রকর্ম্মা অমোঘ বীভৎসতা এ সকল প্রতীকের পশ্চাতে ঘূর্ণায়মান, এবং ক্রমান্বয়ে আঘাত হানিতেছে। ইহাকে পরাস্ত

করিবার মানসে অনন্তর এমন এক অঙ্গভঙ্গী করে যাহার অর্থ এই যে, এ বিশ্ব সংসারের উর্দ্ধে, নভে, জ্যোতির্মণ্ডলে কোথাও যদি সে পাচন হস্তে স্থিতবান হইতে পারিত, তবে ভালবাসার এই পৃথিবীকে অন্যত্র, আর এক ঘরে, লইয়া যাইত; ইহাতে তাহার ঔদ্ধত্য প্রকাশ হইত না এবং নিঃসন্দেহে দেবতাগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতেন। সেই অঙ্গভঙ্গীর কারণ এই যে, সে নিজস্ব প্রশ্নের গুরুভারে অত্যধিক হতবুদ্ধি হইয়া বিশেষরূপে নিষ্পেষিত হইতেছিল, কেননা সে ক্ষণিকের জন্য অনুভব করিল, স্বকর্ণে শুনিল, আধো স্বরে সমগ্র বসুন্ধরা—যাহা অন্তরে অনির্ব্বাণ, মধ্যে সুপ্তি আচ্ছন্ন, এখানে শ্লেষাত্মক ভাষার উদর বিশিষ্ট—সেই বসুন্ধরা তাহাকে পিতারূপে সম্বোধন করিতেছে। ইহা শ্রবণে এই প্রথম সে, বৈজুনাথ, আপনার নিঃশ্বাস বায়ুকে আপনার সহজ চোখে দেখিয়াছিল। সে বুঝিল যে তাহার শ্বাসকষ্ট হইতেছে, রোমসকল হরষিত, গাত্র রিমঝিম; কেননা আমরা জানি স্তনহীন মৎস্যসংসার যেমত স্বীয় দৃষ্টি দ্বারাই আপন আত্মজগণকে লালন পালন করে, তেমনি সে, বৈজুনাথ, পদতলে যাহার মৃত্তিকা বিস্তার, আর এক হতভাগ্য! তাহার উপায় অন্তর নাই, তবু সে আপন বক্ষ হইতে আদিমতা উজ্জীবিত হস্তখানি উঠাইয়া প্রকাশ্যে সমর-আহ্বান ভঙ্গীতে, আপনার তন্ময়তার মধ্যেই, আন্দোলিত করিয়া পরক্ষণেই মহা কৌতুকে কহিল, "দোসর! দোসর বলতে তবে বুঝি আমি! বুড়া বুজ্‌ঝি আমায় লিব্‌বে গো" তাহার শেষ পদটিতে ঝুমুরের ছন্দ ছিল এবং বলিতে বলিতে সে মহা উৎসাহে লাফাইয়া উঠিয়াছিল। এখন সে আপনার উরুদেশে অতীব আহ্লাদে চাপড় দেয়।

"ফের বেটা হারামজাদা চাঁড়াল! বড় বাড় বেড়েছে তোর...খড়ম পেটা করে আমি তোর নাম ভুলিয়ে দেবো...ছোট জাত।"—জ্যোতিষী তাহার উল্লাস দর্শনে রাগতভাবে এবম্বিধ কহিয়াছিলেন; ইহা অকৃত্রিম কিম্বা ইহার মধ্যে ইতস্ততা ছিল তাহা সঠিক বলিবার উপায় নাই; অন্যপক্ষে স্মৃতি-উদ্ভূত সম্ভবতার সম্মুখে যে অস্পষ্টতা, তাহা তাঁহাকে এক অলিখিত স্বরভঙ্গতার মধ্যে আনে; পুনর্ব্বার, হয়ত এই সত্য যে, সম্ভবতা যাহা বর্ত্তমানবৎ তাহা যে ভোজবিদ্যা দেখাইয়াছে, উহা যদিচ ভয়ঙ্কর তবু নির্ঘাত নিশ্চিত অব্যর্থ, সে কারণে মনুষ্যপদবাচ্য যে কোন জীব—এখন চাঁড়াল বৈজুনাথ, যে তাহার বিরোধিতা করিবে, উহাকে উপহাস করিবে—তাহা অপ্রমত্ত অন্যায্য বালখিল্যতা এবং ইহা বাঞ্ছনীয় নহে। কারণ কোথাও না কোথাও উহা শ্রীসম্পন্ন, সুন্দর, স্বাভাবিক!

নিরভিমান বৈজুনাথ দমিল না, প্রসন্ন মনে তাহার কথার উত্তর দিল, "আর কোত্থাকে দোসর পাবে গো...তাই না বুললাম বটে, আমায় লিবে"—বলিয়া এই দুইজন ব্রাহ্মণ ছাড়া তাহার আপনার কথার সায়-সাক্ষী লাভ করিবার আশায় অন্যান্য দিকে পর্য্যবেক্ষণ করিল।

জ্যোতিষী তৎক্ষণাৎ মুখভঙ্গী সহকারে কহিলেন, "হেঃ হেঃ আমায় লিবে"—ইহার পর আপনার কণ্ঠস্বরে সাবধানতার ছল আনিয়া বলিলেন, "হারামজাদ্‌, তোর সাহস ত বড় কম নয়। সাধে কি চাঁড়াল জন্ম হয় তোর, কুট হবে, বেটা কুট হবে, বেটা বামুনের দোসর!" এইখানেই থামিতে হইল, এই জন্য যে সহসা এক ঝলক উগ্রতীব্র নরবসার গন্ধসহ ধূম ব্রাহ্মণের মুখখানিকে বিকৃত করে, তাঁহাদের দুইজনের অবয়বকে ধূসরে সমাচ্ছন্ন করিয়াছে; এবং জ্যোতিষীর শোষোক্ত কথা এ ধূমরাশি বহুদূরে লইয়া গিয়াছিল, এবম্প্রকার বাক্যে বৃক্ষের পত্রনিচয় চুপ, পক্ষিসকল উধাও। এখন আর পাণ্ডুর অস্পষ্টতা নাই। জ্যোতিষী চিক্‌ করিয়া থুতু ফেলিয়া কহিলেন, "পাষণ্ড, বেটা তুই কুকুর হয়ে জন্মাবি।"

ব্রাহ্মণের বাক্যে মুহূর্ত্তের জন্য সকল কিছুই যেমত বা বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করে; বৈজুনাথ, আশ্চর্য্য যে, কোন দৈববশে সহসা যেন ক্ষুদ্রকায়া হইয়াছিল, তাহাকে দেখিলে মনে হয়, পৃথিবী নহে—আপনার আকাশ লইয়াই বহু দেশে দেশে সে ভ্রমণ করিয়াছে, এখন বেচারী ক্লান্ত; এখন সে আপনকার নাসাপুট কম্পিত করত নিঃশ্বাস লয় এবং কহিল, "সে বড় ভাল হবে গো ঠাকুর—কুকুর হওয়া ঢের ভাল"—বলিয়া অসহায়ভাবে হাসিল। ইহার অর্থ, হয়ত এই হয়, আহার-নিদ্রা-মৈথুন-ভয়ই আমার ভাল। এখানে প্রকাশ থাকে, কিছুদিন পূর্ব্বে এক সাধকের নিকট 'আয় মন বেড়াতে যাবি' গীতটি শুনিয়া সে ভাবিয়াছিল শিখিবে; বিশেষত, 'কল্পতরুমূলে চারি ফল কুড়ায়ে পাবি' পদটি ভাবিয়াছিল গঙ্গায় পা ডুবাইয়া অন্ধকার রজনীতে প্রাণ-ভরিয়া গাহিবে। সে আশা নিশ্চয়ই আর নাই। অনন্তর কাতর কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "তবে, তবে কাকে লিবে গো ঠাকুর?"

এ হেন সরল প্রশ্নের বাক্যনিচয়ে সকালের আলোক পরিচ্ছিন্নরূপে দেখা গেল।

"ফের হারামজাদা! যা বলছি এখান থেকে"—বলিয়া জ্যোতিষী আর আয়ুক্ষয় না করিয়া লক্ষ্মীনারায়ণের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

লক্ষ্মীনারায়ণ ভূমিতে বসিয়া পড়িয়াছেন, আপনকার জানুর উপর হস্ত স্থাপন করিয়া অধুনা বিনিদ্রা-জনিত ভারে অবসাদতিক্ত মস্তক রাখিয়া চক্ষু বুজাইয়াছিলেন। তাঁহার শরীর এই গণনার ফল ঘোষণায় অধিকন্তু নির্জ্জীব, শীত-উষ্ণ বোধের সাধারণত্বের বাহিরে তিনি আপনা হইতেই সরিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন; আবার মনে হয়, তিনি নিশ্চিতভাবেই স্থির। যতক্ষণ গণনা চলিতেছিল, মন্ত্রপড়ার মত ভৌতিক শব্দ হইতেছিল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত পূর্ব্ব-পশ্চিম জ্ঞান তাঁহাকে স্বাভাবিক বৈষয়িক রাখিয়াছিল; এখন নিছক বিকারগ্রস্ত, স্নায়ুসকল পিঙ্গলকৃষ্ণ—বৃক্ষে পত্রাদি তিরোহিত কখনই হয় নাই, ভেকেকুলকে হরষিত করিবার নিমিত্তই প্রাবৃট পটলে মেঘমালা দেখা দেয়—লক্ষ্মীনারায়ণ, এরূপ প্রত্যয় হয় যে অঘোরে ঘুমাইতেছেন।

"আই লক্ষ্মীনারায়ণ খুড়ো" জ্যোতিষী ডাকিলেন। কোন সম্পর্কে লক্ষ্মীনারায়ণ অনন্তহরির খুল্লতাত হইতেন।

লক্ষ্মীনারায়ণ এই ডাকে জাগিলেন সত্য, কিন্তু মাথা তুলিতে সমর্থ হইলেন না। কে যেমন বা জোর করিয়া তাঁহার চক্ষু দুইটি মেলাইয়া ধরিয়াছে, যাহার একটি উস্কো চুলের তলে বিশ্রীভাবে চাহিয়া আছে। নিকটস্থ শব সৎকারের ধূমে তাহা যারপরনাই লাল, তৎসহ নরবসার গন্ধে দেহ ইন্দ্রিয়হীন অশরীরী বিকল, স্মৃতি তাঁহার এমন কি ধমনীর আশ্রয় ত্যাগ করত বহুদূরে কোন গ্রামে বিশৃঙ্খল আলুথালু প্রতীক্ষারত, এবং কৃতসঙ্কল্প বিমূঢ় তাঁহার চেতনা। বস্তুত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের ব্রণবিরহিত সৌন্দর্য্যে রাত্র কিম্বা দিনের কোন প্রভাব নাই, আশ্চর্য্য অথচ ভ্রমরের বিচিত্র ভাব সিদ্ধির অন্যতম কল্পনা বিদ্যমান; উহা অজর—শুভ্রতায় যাহার জন্ম, পদ্মে যাহার জৈব ধর্ম্মের সর্ব্বার্থসাধক বিহারভূমি, মৃত্যু যাহার নাই, সমাধিতে যাহার অস্তিত্ব। শ্মশান উহার ইহজনমের উপলব্ধি নহে, জীবনকে ভালবাসার সম্যক কারণও নহে। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম এক এবং ব্রাহ্মণ আর এক, ইহা ভাবিবার মত ধৃষ্টতা আমাদের নাই। তথাপি কেন যে অতর্কিতে এ হেন শূন্যতা,—মীন হইতে মানুষ যাহার আধার মাত্র—সেই শূন্যতা বাক্য-দেহ-মনকে আচ্ছন্ন করিয়া উপছাইয়া পড়িয়াছিল; তাহা আংশিকভাবে কল্পনা করিতে পারিলেও লক্ষ্মীনারায়ণ স্বীয় জিহ্বায় অন্য এক স্বাদ পাইবার চেষ্টা করিলেন, এবং অপ্রয়োজনে এদিক-সেদিক চাহিয়া মনে হইল, কোথাও কেহ নাই, ভয়াবহ নির্জ্জনতায় এ স্থান পূর্ণ আর এ শ্মশানভূমি আপনার শায়িত ভৈরব রূপ, শবাসন পরিত্যাগ করিয়া দৃষ্টির সমক্ষে অতিকায় প্রাচীরবৎ দণ্ডায়মান। কারণ বারম্বারই একটি বালিকার, যে তপ্ত কাঞ্চনবর্ণা সর্ব্বাংশে লক্ষ্মীপ্রতিমার ন্যায়, তাহার সরল নির্ম্মল মুখমণ্ডল তাঁহার মানসপটে ভাসিয়া উঠিয়া তাঁহাকে সর্ব্বরূপে বিমূঢ় করিয়াছে এতদ্দৃষ্টে লক্ষ্মীনারায়ণ ঈষৎ শঙ্কিত হইয়া অপ্রস্তুত হইয়া জ্যোতিষীকে ঝটিতি বলিলেন, "বলো।"

"বলো কি গো, তুমি কি ঘুমিয়ে পড়েছিলে নাকি?..." অনন্তহরি প্রশ্ন করিলেন। অনন্তহরিকে তাঁহার দক্ষতার গর্ব্ব এখনও অনেকটা স্ফীত করিয়া রাখিয়াছে। এ জয়ের নিকটে যে কোন মনোভাব তুচ্ছ, দুর্ব্বল।

লক্ষ্মীনারায়ণ এমত মনে হয় বৃক্ষরোপণ দেখেন নাই, হরিৎক্ষেত্র বলিতে কোন পাখী অথবা নদীর নাম বুঝায় তাহা যেন তাঁহার জানা নাই, মেলা খেলায় বাজিকরকে ডম্বরু বাজাইতে দেখিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। তিনি জড়বৎ সম্বিৎহীন, কোনক্রমে মাথা দুলাইয়া, যেহেতু অনন্তহরির গর্ব্ব তাঁহাকে আহত করিয়াছিল, উত্তর করিলেন, "বোধ হয়...কিন্তু আমার কি হবে?" তাঁহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইল, এ কথায় দীক্ষালোভীর তীব্র ব্যাকুলতা ছিল, এবং তাঁহার দেহ দিয়া আশ্বিনের প্রমত্ত ঝড়ের ক্রমাগতই শব্দ নির্গত হয়; পূর্ব্বে ঐ নির্ব্বাক জবুথবু অবস্থার মধ্যেও হয়ত বা লক্ষ্মীনারায়ণ আপনার নাম মনে করিতে পটু ছিলেন, ফলে সহজেই এ প্রশ্নও তাঁহার মনে আসিয়াছিল, ইহা কি সত্য! এবং এখন বেলাতটের আবছায়া ইয়েরোগ্লিফিক বিশ্লেষণের প্রতি ক্ষণেক দৃষ্টিপাত অন্তে জ্যোতিষীকে জিজ্ঞাসাও করিয়াছিলেন, "সত্যি অনন্ত...দোসর..." বলিবার কালে তাঁহার অঙ্কুরিত কাঁচাপাকা দাড়িসমেত মুখখানি অত্যন্ত কিম্ভূত হইয়াছিল। যদিচ তাঁহার বদনমণ্ডল আর্য্যশোভা বিমণ্ডিত।

এ প্রশ্ন একাধারে তাঁহাকে কোথায় যেমন বা তলাইয়া দিয়াছিল; আপনার দৃষ্টি দিয়া গুরুভারসম্পন্ন

দেহকে রক্ষা নিমিত্ত চেষ্টা করিবার সুযোগ পর্য্যন্ত পান নাই, তেমনি অন্যত্রে হাজার কণ্ঠে জয়ধ্বনি তাঁহাকে নির্ভীক করিয়া তুলিয়াছিল।

জ্যোতিষী অনন্তহরি তাঁহার এ প্রশ্ন শুনিবামাত্র বিশাল হইয়া উঠিয়া সদম্ভে উত্তর করিলেন, "আরে বাবা এ কি চন্দ্র সূর্য্যের বিচার! তাদের বাপের ইচ্ছে; ভুল যদি হয়...আমার মাথায় ঘোল ঢেলে দিও। কার কলম তা জান?"

লক্ষ্মীনারায়ণ, বালিকাবধূ যেমত বা, জন্মগত সংস্কারবশে শিহরিয়া উঠিলেন; তাঁহার শত সহস্র রোমকূপে স্বেদবিন্দু সকল আসিয়া থমকাইল, যেহেতু তিনি অনুধাবন করিতে পারিয়াছিলেন ইহাই সত্য, ইহাই পথ। কেননা তাঁহার সমক্ষে অক্ষয় পরিক্রমণ সশরীরে আবির্ভূত, যেখানে সূর্য্যচন্দ্রগ্রহনক্ষত্ররাজি স্তন্যপায়ী উলঙ্গ শিশুমাত্র! তদনন্তর হাতে হাত ঘর্ষণে আপনাকে অনুভব করিয়া সাহসে সহজ হইয়া দেখিলেন অশীতিপর কালাহত সীতারামের গলে দিব্য বনমালা দুলিতেছে, আর যে বৃদ্ধ সীতারাম কোন এক ঐশ্বর্য্যভাবে বাঁকা—সর্ব্বলোক আরাধ্যা প্রাণাধিকা রাসেশ্বরীর ভাবে যেমন কৃষ্ণচন্দ্র বাঙ্কম—তেমনি; তিনি, স্থিতপ্রজ্ঞ সীতারাম অনাগত কাহার মধুরভাবে বঙ্কিম হইয়া আছেন। লক্ষ্মীনারায়ণের ঘুণাক্ষরেও মনে হয় নাই জ্যোতিষীর দম্ভ সর্ব্বৈব মিথ্যা হইতে পারে, মনে করিবার আর কোন তর্কও উপস্থিত নাই, কারণ তাহা সত্য, অবশ্যম্ভাবী, কেননা অশরীরী কাহারা ঊর্দ্ধলোক হইতে তিন সত্য করিয়াছিল।

লক্ষ্মীনারায়ণ আপনার আবেগ রোধ করিতে অপারগ, এবং তদ্দণ্ডেই উঠিয়া দৌড়াইয়া গিয়া জ্যোতিষী অনন্তহরির হস্তধারণপূর্ব্বক রোরুদ্যমান কণ্ঠে ক্রমে ক্রমে কহিলেন, "ভাই অনন্ত, মান বাঁচাও, মান বাঁচাও আমার। ব্রাহ্মণের ইহকাল পরকাল রক্ষা কর...কোন উপায়ে ওদের রাজী করাও...যদি না হয় আমি গঙ্গায় ঝাঁপ দেবো তুমি তুমি..."

লক্ষ্মীনারায়ণের কম্পমান হস্তের মধ্যে, মনুষ্যোচিত ব্যাকুলতার মধ্যে যেখানে ত্রিসন্ধ্যা এক হইয়া শান্তি লাভ করে, যাহার দ্বারা সমগ্র পরিদৃশ্যমান বিশ্বকে আপনার বাতায়নে দাঁড়াইয়া অক্লেশে আপনার মত দেখিতে গিয়া মানুষ আপনাকেই প্রমাণরূপে জানিয়াছে, এবং সর্ব্বপ্রথম সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়াছে, তখনও রাত ছিল, আকাশে তারা ছিল—এবম্প্রকার হস্তের মধ্যে অনন্তহরির হাতও কাঁপিতেছিল, ফলে আপন হস্তধৃত কাঠির কলম, যাহাতে অনন্ত জ্যোতির্মণ্ডলের ধূলিকণা লাগিয়াছিল—তাহা যেন বা শীতকাতর।

অনন্তহরি লক্ষ্মীনারায়ণের এহেন ব্যবহার দর্শনে, যাহার মধ্যে বজ্র ছিল, রমণীর ন্যায় তিনি ঈষৎ লজ্জাশীল বটে এবং কথঞ্চিৎ নড়বড়েও হইয়াছিলেন। পরক্ষণেই আশপাশ দেখিয়া দ্রুত বলিলেন, "আঃ খুড়ো ছাড় দিকি"—বলিবার কালেই অতর্কিতে চিতাধূম আসে, আর যে তিনি নিজের মুখখানি আড়াল করিতে ব্যস্ত হন, তাই "লোকে কি বলিবে" একথা তাঁহার অব্যক্ত রহিল, অথবা চিরআয়ুষ্মান্ ধূম্ররাজি তাঁহাকে সচেতন করিল।

লক্ষ্মীনারায়ণের এইরূপ বন্ধনে পুরাতন সনাতন প্রকাশের মধ্যে নিটোল সম্পূর্ণ মুক্তি ছিল, জ্যোতিষীর অনুরোধ সত্ত্বেও হাত দুইখানি ছাড়িয়া দিবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না, কেননা আপনার বিশ্বাস, আপনার ধর্ম্মের নয়নাভিরাম রূপ এখানে দেখা দিয়াছিল; আরও দেখিয়াছিলেন, তাঁহার কর্ম্ম, বায়ুচালিত চৈত্রের বিশুদ্ধ পাতার মত উধাও হইবার পূর্ব্বমুহূর্ত্তে কামজ্বর পীড়িত জীবের মত চঞ্চল!

এই শ্মশানের ভয়ঙ্কর ধূমরাশি, ইদানীং যাহা কিয়দংশে সবুজ, তাঁহাকে মোহগ্রস্ত করিতে সক্ষম হয় নাই, চক্ষুকে রক্তিম করিয়াছিল সত্য, কিন্তু তাঁহার অন্তস্থ সঙ্কল্প হইতে তাঁহাকে মনে বিচলিত করিতে পারে নাই! লক্ষ্মীনারায়ণ সংস্কারহীন নির্লিপ্ত বাস্তব জগতকে পর্য্যবেক্ষণ করিলেন, একটি দুর্দ্ধর্ষ দেহ—তথা বৈজুনাথ ধীর পদবিক্ষেপে ঘোরা ফেরা করে, নিকটে প্রজ্জ্বলিত চিতা যাহার মধ্যে অস্থিমেদ মাংস কৃষ্ণবর্ণ, ক্রমে পৃথিবীর আয়তনকে নিশ্চয়ই স্ফীত করিতেছে—এপাশে জলধারা অন্যদিকে পত্রবাহার। ইহারা কেহই সত্য নহে; কিছুই, না শ্মশান না জলধারা কিছুই তাঁহাকে নির্ব্বোধ করিবার মত পূর্ণতা লাভ করে নাই। এই সসাগরা বসুন্ধরা তাঁহার জন্য বাঁচিয়া থাকুক, ইহাদের দিয়া তাঁহার ব্যক্তিগত কাজ আছে—কেননা তিনি সংস্কার আচ্ছন্ন—এমত মনে হয় নাই। ঈষৎ পূর্ব্বের অবসাদগ্রস্ত মনোভাব এখন

অপাংক্তেয়, বুদ্বুদধর্ম্মী। লক্ষ্মীনারায়ণের লক্ষ মনোবাসনা আর এক, তাহা এই হয় যে, কাল ক্রন্দনের অন্তর্গত, কিন্তু স্পন্দন নিশ্চিন্ত সত্য, কেননা উহা বিনিষ্কম্প স্তব্ধতায় ফুটে-উঠার একমাত্র দুর্দ্ধর্ষ যুক্তি। পুনরায় তিনি, অল্প সুস্থতা পাইয়া জ্যোতিষীর হাত ঝাঁকানি দিয়া কহিয়াছিলেন, "তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই। অনন্ত আমাকে বাঁচাও—তুমি যদি বলে দাও—তাহলেই হবে...এখনো ত আয়ু আছে..."

অনন্তহরি এক প্রকার জোর করিয়া আপনাকে মুক্ত করিয়া বিরক্তি সহকারে উত্তর করিলেন, "আঃ খুড়ো, তুমি বৃথা বাক্যব্যয় করছ; ওরা, মানে...ছেলেরা, কুলপুরোহিত কৃষ্ণপ্রাণ এরা সবাই ত রাজী। শুধু বিহারীনাথ—অবশ্য তখন বুড়ো অবস্থা...বেগোড় হয়েছিল..."

"এখন তোমার কথা..." লক্ষ্মীনারায়ণ ইহাতে তাঁহাকে পুনরায় অনুরোধমাত্র করিয়াছিলেন।

"আমার? আমি ত নিমিত্ত...শিবের কলম..." বলিয়া জ্যোতিষী লক্ষ্মীনারায়ণের পদদলিত আঁকের দিকে চাহিলেন, যেখানে জীবনের কিছুটা ছিল, ব্রাহ্মমুহূর্ত্তের প্রাকৃতিক শোভা যাহার আয়ু।

বৈজুনাথ তাঁহাদের যেন বা আপনার দ্বারদেশ হইতে দেখিয়াছিল, প্রিয়জন যেন বিদেশ যাত্রা করে। অল্পকাল পরেই, তাহার দৃষ্টি খসিয়া তাঁহাদের ছায়ার উপর পড়িবামাত্রই সঙ্গে সঙ্গেই, সারা গাত্রে—তাহার আপনকার—নিম্ন শ্রেণীর আধা-নিরীহ পশুর ক্ষুব্ধ, অসংযত, মর্ম্মভেদী যন্ত্রণার, বিলাপের, ক্রন্দনের হৃদয়বিদারক শব্দসমূহ ধ্বনিত হয়, এবং ইহা সে নিরীক্ষণমানসে চঞ্চল চিত্তে, একদা দেহের দিকে ক্রমে বাঁধপ্রতিম বাহুর প্রতি মহা উদ্বেগ লক্ষ্য করত অস্থির। একথা সত্য, অদ্যাবধি কোন রাত্রই তাহার দোয়াঁশা হইয়া দেখা দেয় নাই, কোনদিন তাহার হস্তরেখার খাত ছাড়িয়া, অন্যত্রে যায় নাই। এখন, অনন্তর সে ভয়ে তৃষ্ণার্ত্ত হইয়াছিল।

অনন্যমনে সে এক রাত্রের মধ্যে, অর্থাৎ গতরাত্রে ভেড়ীপথ হইতে দেখিয়াছিল, স্রোতবিকার চন্দ্রালোক এবং বেলাতটে পরিক্রমণরত বৃত্ত, যাহাদের নামগান হিম বাতাসে কিয়ৎপরিমাণে দুষ্ট, উপরন্তু যখন তখন কাশির আওয়াজ সমস্ত কিছু অন্ধকারের বক্রোক্তির মত শুনাইতেছিল। বৈজুনাথ তদ্দর্শনে যারপরনাই ত্রস্ত, ফলে সীমাহীন হইয়া গিয়াছিল—এমত অবস্থায় তাহার সুন্দর চক্ষুদ্বয়ের সম্মুখে আধিদৈবিক ভোজবিদ্যার কৌশল চকিতে বলিয়া যায়, অবলীলাক্রমে প্রতীয়মান হইল, ক্রমাগত পরিবর্ত্তনশীল বৃত্তের তথা যেমত বা রশ্মিগুলের কেন্দ্রে যে জন একটি অভিব্যক্তিমাত্র, সে যেন নিকটের আকাশে বারেক উঠানামা করিতেছে। বৈজুনাথ বিস্ময়ে অস্ফুট বচনে প্রশ্ন করিয়াছিল, ইহা কি সত্য! এই সীতারাম, কীর্ত্তনের দলের কাশির আওয়াজ, বেলাতট এ সকল কিছুই কি স্বপ্ন! দেহ-মায়াবন্ত বৈজুনাথ ভয়ে শঙ্কায় কেমন যেন হইয়া শিবার মত ধ্বনি করিয়া উঠিতে চাহিল; তদনন্তর এক মুহূর্ত্ত ভেড়ীপথে না অতিবাহিত করিয়া সবেগে দৌড়াইয়া তখনও প্রজ্বলিত একটি চিতার নিকট আসিয়া, গ্রীষ্মকালীন দ্বিপ্রহরের কুকুরের মতই জিহ্বা প্রলম্বিত করত হাঁপাইতে লাগিল। বারবারই তাহার মনে হইতেছিল, বাঁচিয়া গিয়াছি। যদিচ একথার কোন যুক্তিপূর্ণ, আপাত দৃষ্টিতে, হেতু ছিল না। পুনরায় সে সুস্পষ্টরূপে ভাবিল, চিতার কাছে আসিয়া সে নিশ্চিত বাঁচিয়াছে। এবং কোনসূত্রে কিঞ্চিৎ মনোবল সঞ্চয় করত স্পন্দনশীল রহস্যটিকে আর একবার দেখিয়াছিল। কিন্তু পলকের জন্য তাহার এ হেন অনার্য্য বিমূঢ়তা ছাড়াইয়া, ইহা সহজ হইল না যে সত্যই উহা সুন্দর।

পুনর্ব্বার বৈজুনাথ ফিরিয়া আসিয়াছিল। তখনও দুই ব্রাহ্মণ অগ্রসর হইতেছিলেন; উহাদের দেখিয়া সহসা তাহার মনে হইল, ইহাদের পদযুগল একজনেরও মাটিতে নাই, তাঁহাদের পিঠে রাত্র, তাঁহারা শীর্ণ, সূক্ষ্ম, স্বপ্নহীন। এবং এখন সে বেলাতটে ধর্ষিত আঁকের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল, সেখানে একটি ক্ষুদ্রকায়া ব্যাঙ, এই শায়িত ব্রহ্মাণ্ডের উপর দিয়া লাফাইয়া লাফাইয়া চলিতেছে। এ-সময় তাহার কানে কাকুতি-মিনতির স্বর আসিতেছিল; সেই হেতু চক্ষুর্দ্বয় তুলিতেই সম্মুখে অদূরে স্পষ্ট হইল, দুই ব্রাহ্মণ তখনও দাঁড়াইয়া, একজন যেন বা কর্দ্দমাক্ত প্রতি অঙ্গই অসম্ভব এলোমেলো, অন্যজন ক্রমান্বয়ে আশ্বাস দিতেছেন, এবং ইহাতে বৈজুনাথের অতীব ঔৎসুক্য দেখা দেয়। এখন, তাঁহারা চলিতে আরম্ভ করিলেন। পরিক্রমণরত বৃত্তাকার কীর্ত্তনের দলের নিকট আসিয়া লক্ষ্মীনারায়ণ থমকাইয়া গিয়াছিলেন; এখন এই দল থামিয়াছিল, কেননা উঁহারা পথ করিয়া যাইবেন, ফলে দলটি পাশাপাশি দুলিতেছিল।

অনন্তহরি তাঁহাকে, লক্ষ্মীনারায়ণকে, একপ্রকার টানিয়া ভয়ঙ্কর ব্যূহর মধ্যে প্রবেশের পরক্ষণেই পুনরায় উচিতমত কীর্ত্তনের দল চলিতে লাগিল।

এই শ্যামা আরামহীন ব্যূহ-মধ্য প্রতিনিয়ত অক্ষ ঘর্ষণের বিকট কর্কশ বীভৎস রোমহর্ষক শব্দে মথিত; পূর্ব্বেকার মত আর সকল কিছুই স্থির। ইহা—অনেকাংশে মনে হয় সুগভীর কূপ-নিম্নে আলোকপাত হইয়াছে, সেখানে জলস্তর আয়না, উপরিস্থিত আমাদের প্রতিবিম্ব দূরত্ব নিবন্ধে সবিশেষ আবছায়া; অন্যপক্ষে আকাশ প্রতিভাত, দেখা যায়, নির্ভুল সম্যক আর্থিক। আর সকল কিছুই স্থির, পত্রচ্যুত শিশিরবিন্দুর ন্যায় গঙ্গোদকের বিন্দুর শব্দ, স্তব্ধতা অনেকানেক সন্দিগ্ধতাকে জলদান করিয়া পুনরায় আত্মসাৎ করিতেছে, এবং একের ঐশ্বর্য্যশালী নক্ষত্রখচিত উপাধিসমূহ ধীরে অন্তর্হিত হয়।

তথাপি কীর্ত্তনের ধ্বনিমধ্যে কোন আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা নাই, তৎসহ গম্ভীর কণ্ঠে 'গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম' আবৃত্তি-উচ্চারণের ভীতিপ্রদ রেশ অদ্য সকালের স্বর্ণাভ তীক্ষ্ণ রৌদ্রে খেলনার মত নিরীহ। আর যে সমবেত জনমণ্ডলীর চোখেমুখে—যাঁহারা আসীন তাঁহাদের মুখমণ্ডলে—কেশে, ভস্মকণা যায়, অনিবার্য্যতাকে লইয়া ইহারা প্রহর জাগিয়াছে, ভূতপূজকদের মত ইঁহারা একনিষ্ঠ বিশ্বাসী; গ্রন্থি নির্ম্মাণের মধুর, সুচতুর, মনোরমা, দিব্য, ছবিলা, চারুকলা-সুকুমার কৌশলখানি মহা ঘোরে বিমোহিত আচ্ছন্ন, ইহা সত্ত্বেও এই মরজগত হইতে অতীব প্রাচীন যে বীজময় শরীর তাহা নির্লজ্জ উন্মুখ, মৃত্যু মৃত্যু মৃত্যুকে তাহা নিতান্ত অবহেলায় চপলমতি বালকের মত তুড়ি মারিতেছিল; প্রত্যেকের মনে ইদানীং বাস্তবতাকে শ্মশানের ক্ষিপ্রতাকে অগ্রাহ্য করত আপন আপন গৃহকোণের প্রতিচ্ছবি চিত্রিত হইয়াছিল।

অনন্তহরি এবং লক্ষ্মীনারায়ণের বৃত্ত ভেদ করিয়া আগমনে শুধুমাত্র যে আলোআঁধারের তারতম্য, কেবল যে স্থান পূর্ণাঙ্গ নিপট, আর সময় পরোক্ষ অনুভূতির বিষয় হইল, তাহা নহে, জাগ্রত সকলেই আপনকার দৃষ্টি তুলিয়া উহাদের মহাআবেগে আহ্বান করিল; একারণ যে, তাঁহারা মনে হয় সেই দেশ হইতে আসিয়াছেন, যেখানকার সকল সংবাদ কুশল, যেখানে বারিপাত আশাতীত, সংক্রামক ব্যাধি যেখানে নাই, যেখানে প্রতিটি চতুর্দ্দশী বালিকাবধূ অন্তঃসত্ত্বা; ফলে তাঁহাদের দর্শনমাত্রই অনেকেরই রক্তে, স্ফীতনাসা-শঙ্খিনী-রমণীর কাম লালসা উন্মত্ত আঁচড় কাটিতে শুরু করে, সে রমণী—নিদাঘের দগ্ধ দ্বিপ্রহরে আপন স্বেদবিন্দু স্বীয় দেহোপরি গতিচাঞ্চল্যে মদন দহনে নিপীড়িত, ক্ষিপ্ত, অধীরা, তাই সে আপন শরীরকে কভু বিরাট কখন অতল গভীর [illegible]তে সমুৎসুক। ইহারা প্রত্যেকেই জাগিয়াছিল।

সীতারামের দেহের এক পাশে জ্যোতিষী অনন্তহরি বসিয়া পড়িলেন, ঠিক তাঁহার সম্মুখেই অন্যপার্শ্বে বিহারীনাথ। লক্ষ্মীনারায়ণ এখনও দণ্ডায়মান, কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ, ঈষৎ অপ্রস্তুত। এই হেতু যে তাঁহার মনে সংশয় ছিল, নিরাশাও ছিল, উপরন্তু উদ্বেগে বিনিদ্র শরীর বেপথুমান, কোন উপায়ে যে আপনাকে সুসংযত করিবেন তাহার ঠিক-ঠিকানা পাইতেছিলেন না, একদা সীতারামের যুদ্ধ-তিরোহিত নৈষ্কর্ম্মসিদ্ধ মুখখানি দেখিলেন, অন্যবার ভৌতিক গীতা-পাঠকের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতেই অহেতুক ত্রাসের সঞ্চার হইল।

এতদূর অগ্রসর হইয়া নিশ্চয়ই লক্ষ্মীনারায়ণ গীতা পাঠ শ্রবণে ত্রস্ত হন নাই, ইহার হেতু এই যে এইস্থানের একজনকে তিনি অবশ্যই এড়াইতে চাহিয়াছিলেন। তিনি বিহারীনাথ। বিহারীনাথ আয়ুর্ব্বেদিক, বিহারীনাথ নাড়ীজ্ঞানী। প্রবৃদ্ধ সীতারামের নাড়ী ধরিয়া বসিয়া আছেন। প্রতিমুহূর্ত্তের নিয়ত কর্ম্মশীল জগত, একটি সূক্ষ্ম প্রতিউত্তরকে কায়মনোবাক্যে প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন—এ-কর্ম্মশীল জগতের যদিচ রূপ রস গন্ধ বর্ণ ইত্যাদি কোন অবস্থা নাই। ইঁহাদের আগমনে তাঁহার মনোযোগের কোন ব্যাঘাত ঘটে নাই।

এখন তিনি বিহারীনাথ—মুখখানি তুলিতেই, বুঝা গেল তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় আশ্চর্য্য স্ফীত, এবং সেই কালে লক্ষ্মীনারায়ণের প্রতি কঠোর তথা ঘৃণাভরে, আর জ্যোতিষী অনন্তহরির প্রতি শান্তভাবে দৃষ্টিপাত করিয়া মস্তক আন্দোলিত করেন; ইহা তিনি যেন একটি লোক-গল্প আরম্ভ করিবেন, তাহারই প্রস্তুতি; ইহার মধ্যে মীমাংসা ছিল, সিদ্ধান্তও বলবান।

বিহারীনাথ ইঙ্গিতে যে কথা স্বীকার করিলেন, তাহাতে জ্যোতিষীর দৈববুদ্ধি ও দূরদৃষ্টির চেতনা-মিলিত যে অস্তিত্ব, তাহা নিমেষেই অতিকায় হইয়া উঠিল, অন্তরে তাঁহার ঘনঘটা, বাহিরে—গর্ব্বে, তাঁহার ব্রাহ্মণসুলভ চক্ষুর্দ্বয়, যাহা নক্ষত্রলোকের বিহার দর্শন করিয়াছে, উহা চকিতে ঝটিতি তড়িৎময় হইল। অনন্তর তাঁহার দক্ষিণ হস্তখানি উত্তোলিত হইয়া সদম্ভে সজোরে আঘাত করিতে গিয়া—সহসা সীতারামের নাভির নিকট থামিয়া, ত্বরিতে সরিয়া খড়ের উপর পড়িল, ধর্ষিত খড় মস্‌মস্‌

করিয়া উঠে। পরক্ষণেই, জয় উল্লাসে অথচ দৃঢ় ভারী সংযত স্বরে জ্যোতিষী কহিলেন, "জয় জগদম্বে—বলুন কবিরাজ মশাই! বলুন, আমার গণনা ঠিক কি না? যথার্থ কি না!"

এ হেন প্রশ্নে নাড়ীজ্ঞানী বিহারীনাথ পুনর্ব্বার মাথা দোলাইয়া সম্মতি জানাইয়া, অতি সন্তর্পণে সীতারামের হাতখানি খড়ের উপরে রাখিলেন, এবং এই কার্য্য করিতে তাঁহাকে কিঞ্চিৎ পিছনে সরিতে হয়। তদ্দর্শনে, এই সুযোগে লক্ষ্মীনারায়ণ সাহস সঞ্চয় করিয়া কোন মতে হাঁটু ভাঙ্গিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িলেন। বিহারীনাথ তাঁহাকে কঠিন ভাবে পলকের নিমিত্ত দেখিয়া, আপনকার ট্যাঁক হইতে নস্যের ডিবা বাহির করত কিঞ্চিৎ নস্য তালুতে ঢালিয়া, যুত করিয়া টিপ লইবার ছলে আপনাকে সংযতভাবে সামলাইয়া সশব্দে একটি টান দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চক্ষু দিয়া খানিক জল নিঃসৃত হয় এবং এক নিমেষের আরাম উপভোগের পর কহিলেন, "আপনি যা বলেছিলেন তাই ঠিক।"

অনন্তহরি যারপরনাই আত্মহারা হইয়া বাঁকিয়া চুরিয়া একটি পায়ের উপর ভর দিয়া বসিলেন এবং খানিক, কি যেমন বা সীতারামের দেহের বিস্তৃতির মধ্যে খুঁজিবার কালে, হঠাৎ তাঁহার হস্তে সীতারামের এক সরল তেজোময় নিঃশ্বাস লাগিল, সন্ধ্যায় গৃহাভিমুখী রাখালেরা যে নিঃশ্বাস ফেলিয়া থাকে। তৎক্ষণাৎ মাতৃসুলভ চাহনিতে সীতারামকে দেখিয়া সহাস্য বদনে অবশেষে বিহারীনাথের কোলের নিকট যে হাতখানি সেইটি পলকে তুলিতে গিয়া ধীরতা অবলম্বনে আস্তে আস্তে মেলিয়া ধরিলেন।

বানরতুল্য টানা টানা দীর্ঘ সীতারামের বিশীর্ণ হাতখানির প্রতি সকলেই, দৃষ্টিক্ষম বলিয়াই, অন্যমনস্কতার সহিত লক্ষ্য করিয়াছিলেন। সেখানে সকালের রোদ একদা খরতর শ্বেত অন্যবার আঁধার, কেননা কীর্ত্তনের দল এখনও পরিক্রমণ করিতে ব্যগ্র, তাহারা নামগানে এখনও মুখর; হাতখানি, চিরদিন নিদ্রালোককেই আহ্বান করিয়াছে, তাই ইহা বনবাসী তাপসচারীর হস্তের ন্যায় শুষ্ক, রসহীন। জ্যোতিষী অনন্তহরি বৃদ্ধের হাতখানি লইয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। অনেকবার ইহার উপর দিয়া ধূমরাশি খেলিয়া দুমড়াইয়া বক্র হইয়া ভয়াবহ কুহক সৃষ্টি করিয়া চলিয়া গেল, ইতিমধ্যে তিনি বার বার আপনার হাত দিয়া বিশীর্ণ করতল মুছিলেন, পরে গভীর রেখা সমন্বয়ের দিকে, মনে হয় যেমন, অর্থাৎ আপনারই পরিশ্রম কৃতকর্ম্মের প্রতি স্ফীত চক্ষে অবলোকন করত দেহকে স্বেচ্ছায় কাঁপাইতে লাগিলেন, যাহাতে যে-মন দেহের সর্ব্বত্রে ছড়াইয়া পড়িয়াছে তাহাকে পুনরায় একত্রিত করিতে পারেন। এ-সময় বিশীর্ণ রোগা অতি বৃদ্ধ হাতখানি চমকাইতেছিল।

সম্ভবত একমাত্র লক্ষ্মীনারায়ণই এহেন হাতখানির আদলে, চিতাধূমের মধ্যেও যাহা পরিচ্ছন্ন, যাহা এখন শ্বেত তখন ছায়া আবৃত, পরিব্যাপ্ত প্রকৃতির হর্ষ দেখিয়াছিলেন। তাঁহার মানসচক্ষে ক্রমে উদ্ভাসিত হইয়াছিল নামহীন পক্ষীর বক্ষদেশের উপর দিয়া, আপন ঐশ্বর্য্যরাশি ও বিলাসসামগ্রী লইয়া, দ্বিপ্রহরের নীল লবণসমুদ্র পার হইয়া যাইতেছে; দেখিয়াছিলেন, প্রকৃতি আপনার বিন্দুবৎ শরীর লইয়া স্বহস্তের ডম্বরু বাজাইতে বাজাইতে স্থবির পুরুষকে কেন্দ্র করিয়া নৃত্যময় পদবিক্ষেপে ভ্রমণশীলা। মানুষ বালকমাত্র, একথা মনে হয় নাই। একমাত্র তিনি, লক্ষ্মীনারায়ণ গঙ্গাতীরে আনীত সীতারামের প্রাণবায়ু নির্গমনের কালবিলম্ব-সমাচারে চোরা আনন্দের গুরুভার বহন করিতেছিলেন।

এমত কালে তীব্র কলহের অসভ্য ভয়ঙ্কর শব্দে সকলেই শশব্যস্তে, ব্যগ্রতা সহকারে মন ফিরাইলেন। এমনকি কীর্ত্তন সম্প্রদায়ের প্রত্যেকেরই চক্ষু তির্য্যকভাবে পড়িয়া যাইতে চাহিল। দুই ভাই, বলরাম এবং হরেরাম, প্রখর হইয়া উঠিয়াছে, ক্ষুরধার বচসায় দুইজনে ক্ষিপ্ত, শির সঞ্চালনে দুইজনেই অকাতর।

হরেরাম তখন বলিতেছিল, "তুমি ওখানে বসতে পাবে না।"

"কেন পাব না শুনি...ওঃ ওনার কথায়..."

"না পাবে না...ভাব আমি ঘাস খাই...বুঝি না...না?"

"বলি বোঝাটা কি শুনি...মাড়ভেতো বুদ্ধি..."

"খবরদার বলছি...চোর কোথাকার!"

"এই মুখ সামলে...না হলে আমি খড়ম পেটা..."

হরেরামের উত্তর করিবার পূর্ব্বেই বিহারীনাথ রাশভারী কণ্ঠে ধমক দিয়া উঠিলেন। "ছিঃ ছিঃ তোমরা কি মানুষ না পশু? লোকটা এখন-তখন, ছিঃ ছিঃ তোমাদের কি কোন ধর্ম্মজ্ঞান নেই!"

দুইজনেই ধমক খাইয়া বাক্য ত্যাগ করিলেও, অস্পষ্ট ক্রোধবাচক শব্দ তখনও করিতেছিল।

"ছিঃ ছিঃ! তোমরা..."

"ও-ই ত শুরু করলে...দেখুন না সেই কখন থেকে বাবা আমার কোলে মাথা দিয়ে আছেন, তাতে আমার পা অবশ হয়ে গেছে, তাই সাড় ফিরাবার জন্য একটু আঙুল মটকাচ্ছি...অমনি..."

"আঙুল মটকাবার জন্য বাবার পিঠের তলায় তোমার হাত চাবি খুঁজছিল..."

"হরে হরে আমি পৈতে ছিঁড়ে তোমায় অভিশাপ..."

"আবার বলরাম..." বিহারীনাথ দৃঢ়ভাবে কহিলেন।

বচসা থামিল। জ্যোতিষী পুনরায় বৃদ্ধের হাতের প্রতি মনঃসংযোগ করত ধীরে ধীরে বলিলেন, "কর-কোষ্ঠীর কথা আর এক, তবু এখানেও দেখুন...কোন..."

বিহারীনাথ বৃদ্ধের হাতের দিকে শিশুসুলভ মনে দেখিতেছিলেন। এই সময় জ্যোতিষী, বৃদ্ধের দেহের উপর দিয়া, শরীরকে বাঁকাইয়া কবিরাজের কানে কানে কহিলেন, "আর একটা কথা বলি, বুড়ো সীতারাম একা যাবে না,...সর্ব্বস্ব পণ করতে রাজী, কবিরাজ মশাই—সীতারাম দোসর নিয়ে যাবেই..." বলিয়া যেক্ষণে বৃদ্ধের দেহ হইতে আপনকার দেহ সরাইয়া লইলেন, তৎক্ষণাৎ সকলেই বৃদ্ধের বক্ষে, যেখানে কতিপয় রোমরাজি—সেখানে এক অলৌকিক বিস্ময়কর দৃশ্যে হতবাক আশ্চর্য্য হইলেন।

সেইখানে এক নয়নাভিরাম, বাবু, সুন্দর প্রজাপতি চুপ হইয়াছিল; সকালের রোদ এবং রোদের অভাবে যাহার মনোহারিত্ব একই। এ জীব যেমন বা সোহাগের আরশিতুল্য, ফলে সকলেরই আসক্তির পরিসীমা ছিল না। সকলেই এই সৌন্দর্য্য দর্শনে অভিভূতের ন্যায় 'আঃ' বিস্ময়বাচক শব্দ করিয়াছিল সকলেরই মুখ এখনও অর্দ্ধ উন্মুক্ত!

লক্ষ্মীনারায়ণ এই বিভূতি দর্শনে স্তম্ভিত হইলেও একমাত্র তিনিই বলিয়া উঠিয়াছিলেন "প্রজাপতি প্রজাপতি" এবং তাঁহার চোখে জল দেখা দিল।

এখনও সকলেই মোহগ্রস্ত, শুধু বৈজুনাথ কীর্ত্তনের দলের ফাঁকে ফাঁকে উঁকি মারিয়া এই দৃশ্যটি দেখিবার চেষ্টা করিতেছিল।

এ-পতঙ্গ যে পতঙ্গ সৃষ্টির সাক্ষাৎ পরমাণু, অক্ষর এবং রঙের মধ্যবর্ত্তী বাসনা, দুঃখীর মনচোরা ভ্রম স্বাধীনতা!

জ্যোতিষী অনন্তহরি ভূতাবিষ্টের মত কহিলেন, "কি(ম) আশ্চর্য্যম্! প্রজাপতি সিন্দূর।" এই দৃশ্যের সহিত তাঁহার দৃষ্টি যেমন বা জুড়িয়া গিয়াছিল, কোন ক্রমে সে-জীব হইতে দৃষ্টি ছাড়াইয়া আনিয়া কবিরাজের দিকে তাকাইলেন, বুঝা গেল তিনি অনন্তহরি, অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছেন। আধো আধো স্বরে, "প্রজাপতি, দোসর...দোসর নিবে" অন্যমনস্কভাবে বলিয়াছিলেন।

কবিরাজ এই যুক্তিহীন দৈব-ঘটনাকে প্রীতির চক্ষে না দেখিলেও, এ মহা আশ্চর্য্যে তিনি সত্যই হতবাক হইয়াছিলেন। সুন্দর তুচ্ছ পতঙ্গটি এরূপ ভয়ঙ্কর খেলা খেলিবে তাহা তাঁহার জানা ছিল না।

অনেকক্ষণ ধরিয়া সকলেই পতঙ্গটি দেখিল, এখনও যাহা স্পন্দনরহিত নির্ব্বিকার। এ কথা নিমেষেই সকলে বুঝিল যে ইহা কোন সৌভাগ্যবতীর বারতা বহন করিয়া আনিয়াছে, জীবনই যাহার জীবিকা, উপাধান যাহার মনের কথার শ্রোতা, লতা পাতা কীট পতঙ্গ যাহার আপনজন, আপনার প্রতি বিতৃষ্ণাই যাহার কর্ত্তব্য; যে বালিকা নিজহাতে শিব গড়িয়া ভক্তিভরে তাহার পূজা করিয়াছে, প্রণাম করিয়াছে। সেই মৃত্তিকা স্তম্ভে (!) আপনকার সুখমোক্ষ দাতাকে প্রত্যক্ষ করত আপনার জীবনে চন্দ্রালোক আনিয়াছে। সিন্দূরকে অক্ষয় করিবার মানসে কায়মনোবাক্যে দেহকে শুদ্ধ এবং মনকে সুন্দর রাখিয়াছে। এই কল্পনা লইয়া যে নিদ্রাচ্ছন্ন এই প্রজাপতি বুঝি তাহার সংবাদ আনিল!

এতক্ষণ পরে প্রজাপতি উড়িল, কীর্ত্তনের দল পথ ছাড়িল। ক্রমে উর্দ্ধে আরও উর্দ্ধে, নামিল, চলিল! এখন বৈজুনাথের দিকে পতঙ্গটি যাইতেই বৈজুনাথ বোকার মত সরিয়া গেল। এবং এই সময়

শুনিল কে যেন হাঁকিতেছে, "আঃ মরণ, গোখোর বেটা...তোর গায়ে যেন না লাগে..."

বৈজুনাথ আর এক-পা ভূতচালিতের মত পিছু হটিতে গিয়া বেসামাল হইল।

কিন্তু লক্ষ্মীনারায়ণ এখনও প্রজাপতিটি লক্ষ্য করিতেছিলেন এবং অনবরত বৈজুনাথকে সরিতে বলিতেছিলেন, কারণ তাহার অঙ্গ যদি স্পর্শ করে তাহা হইলে তাহা অমঙ্গলসূচক হইবে।

কিন্তু হায়, প্রজাপতি শ্মশানে বিভ্রান্ত হইয়াছিল। তাহাকে চিতাধূমের মধ্যে দেখা গেল, অনন্তর তাহাকে চিতার প্রায় নিকটে দেখা গেল এবং কালক্রমে সে যেন বিমোহিত হইল, রঙ হারাইল, চিতার শিখার রেখার মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। ধূম অধিকমাত্রায় নির্গতবান, ইদানীং পতঙ্গ অপ্রকট—শেষ অশ্রুজল যদি সে পতঙ্গের, বাষ্প হইয়া দূর উর্দ্ধে, ক্রমে শিশুর চাপল্যরীতি-মেঘকায়া—নবজলধরে পরিণত, পুনশ্চ বিদ্যুল্লতায় তাহার নশ্বরতা দেখা দিবে এবং মরলোকের প্রেম সে বিভায় উদ্ভাসিত হইবে, রমণীর সৌন্দর্য্য ষটচক্র বাহিয়া পদ্মে মতিত্ব দিবে, আর যে আমরা স্থির হইব।

প্রজাপতি ফাঁকি দিয়াছিল। গোচরীভূত সম্বন্ধে—সম্পর্কে চক্ষু হাইয়া গিয়াছে মাত্র, অনেকক্ষণ পরে লক্ষ্মীনারায়ণ এবং অন্যান্য সকলেই জমিয়া উঠা রুদ্ধশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। বৈজুনাথের তীব্র অথচ হতাশ স্বরে সকলেই ইহকাল ফিরিয়া পাইয়াছেন, সে বলিয়াছিল, "হায় গো, গেল গো ছাই হঁইয়ে, বীজ রাখলেন না হে—এ বড় অবাক কথা।"

মন পুনর্ব্বার শিরা-উপশিরায় তৎপর হইয়া উঠিল—তখনও স্তব্ধতা ছিল।

বিহারীনাথ আপনাকে সর্ব্বপ্রথম, বিবেচনার মধ্যে পাইলেন; কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া কহিলেন, "তাহলে জ্যোতিষী, দোসর তো নেবেই" এই বাক্যে নিঃশ্বাসের আওয়াজ ছিল, ইহার পর যোগ দিলেন, "তাহলে আর কি, তাহলে, মহাব্যোম বড় 'একা' জায়গা, অবশ্য প্রকৃতি সেখানেও আছে, দোসর দেখলে চিনে নেবে সীতারাম...বৈকুণ্ঠ বাস হবে।"

সকলেই বিহারীনাথের কথা বুঝিবার ভাণ করিলেন মাত্র, বিহারীনাথ তাহা বুঝিতে পারিলেন না, তিনি নিজের মনোভাবকে আরও রূঢ় করিয়া বলিলেন, 'সাতশ' মন কাঠ যোগাড় কর, সাত বেড়া পেরোতে হবে ত..." অতঃপর সঞ্চিত উষ্মায় দাঁতে দাঁত ঘষিতে লাগিলেন, এই যন্ত্রণাদায়ক বিরক্তিকর শব্দ সকলকেই বিশ্রী করিয়া তুলিয়াছিল।

তটপ্রপাতে তীরবাসীরা যেমত আতঙ্কিত হয়, উৎসাহী ব্যক্তিরাও তেমনি হইয়াছিলেন। একে অন্যের মুখপানে তাকাইয়া পরে অন্যমনা, অনন্তহরি একস্থ, খুব ধীরে আপনার ওষ্ঠের একান্ত ফাঁক করিয়া, একটি ভ্রূ উঁচু করত কহিলেন, "কবিরাজ মশাই, আপনার নাতির শ্বশুরের কোন এক আত্মীয় ফিরিঙ্গী ভাষা জানে তাই আপনি..." ইহার পর কণ্ঠস্বর আরও দৃঢ় করিয়া বলিলেন, "এ ব্যবস্থা আজকার নয়, মাদ্রীকে মনে পড়ে...।"

এই শ্লেষে বিহারীনাথ চকিতেই মুখ ফিরাইয়া জ্যোতিষীর প্রতি কঠিনভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। জ্যোতিষীর ঠোঁটে ভ্রূকুঞ্চিত-হাসির রেশ ছিল, তাঁহার প্রতিপক্ষ যে সঙ্কটাপন্ন তাহা বুঝিয়া লইতে তাঁহার বিলম্ব হয় নাই, এবং তিনি সদম্ভে ঘোষণা করিলেন, "দোসর সীতারাম নেবেই, এ কথা ধ্রুবসত্য, মঙ্গল রাহু বৃহস্পতি ঘর..."

বিহারীনাথ আপনার ক্রোধ শান্ত করিতে সমর্থ হন নাই। বিবাহের প্রস্তাবে এতাবৎ একমাত্র তিনিই বাধা দিয়া আসিয়াছেন, এখন তাঁহার পরাজয় অবধারিত বুঝিয়া তাচ্ছিল্যভরে কহিলেন, "অবশ্যম্ভাবী..."

"শিবের কলম..."

"শিবের কলম, আপনারা দেখছেন সীতারামের কর্ম্মপাশ ক্ষয় হয়ে এসেছে..."

"ছিঃ ছিঃ কবিরাজ মশাই, সীতারামবাবুর জ্ঞান ফিরে এসেছে...সে শুনতে..." লক্ষ্মীনারায়ণ কোন রকমে বলিয়া ফেলিলেন।

"আঃ সত্য কথা ত..."

"বুঝলাম, বুঝলাম কবিরাজ মশাই, কিন্তু আমি কি মহাপাতক হব! আপনিও ত বর্ণশ্রেষ্ঠ, আপনিও কন্যার .পিতা"—লক্ষ্মীনারায়ণ এই পর্য্যন্ত বলিয়া সাধু ভাষা খুঁজিতে লাগিলেন।

"আপনি এখানে সম্প্রদান করিলেই কি..." বিহারীনাথ বলিতে ছিলেন।

"স্বর্গ না লাভ হোক, জাতি কুলমান রক্ষা পাবে নিশ্চিত...এতে কোন সংশয় নেই"—অনন্তহরি কাতর লক্ষ্মীনারায়ণের হইয়া, কবিরাজকে বাধাদান করিলেন এবং পুনর্ব্বার কহিলেন, "দেশে বিদেশে পাত্র যদি লক্ষ্মীনারায়ণ খুড়ো পেত, সহৃদয় কাউকে পেত, নিশ্চয় এখানে আসত না। তারপর বিধির লিখন এমন কি স্ত্রীলোকেও জানে জন্ম মৃত্যু বিবাহ..."

বিহারীনাথ সবই জানিতেন। সীতারামের প্রৌঢ় পুত্রদ্বয়ও পর্য্যন্ত বিবাহ করিতে স্বীকৃত হয় নাই! কেহই হয় নাই, সকলেই প্রয়োজন বুঝিয়াই বিবাহ করিবে। তথাপি কবিরাজ বলিয়া মানুষের প্রতি সংস্কার ছিল, আপনার ভিতরে কে যেমন বা আস্ফালন-ব্যস্ত, তিনি আরম্ভ করিলেন, "আপনি জ্যোতিষী, তবু বুঝুন যে লোকের অহোরাত্র পার হয় কিনা..."

"অহোরাত্র নয়, চাঁদে যখন লাল পূর্ণিমা, সীতারাম পুণ্যবান, যাবার সময়েও সে মানরক্ষা করে যাবে" বলিয়া জ্যোতিষী অতি শ্রদ্ধাভরে সীতারামের মুখের দিকে লক্ষ্য করিলেন।

"কিন্তু সত্য কি কন্যার বৈধব্য-যোগ, আছে? না..." বিহারীনাথ দন্তাঘাত করিবার প্রয়াস পাইলেন।

অনন্তহরি তাঁহাকে তুচ্ছ করিয়া কহিলেন, "আগেই ত বলেছি দোসর..."

"বাঃ তাহলেই সব চুকে গেল!" পরাজিত বিহারীনাথ অদ্ভুত বিকৃত স্বরে এই কথা বলিলেন, তাঁহার মনোবৃত্তি ক্ষুণ্ণ, ক্ষুব্ধ, লজ্জিত, অপমানিত, বিপন্ন হইয়াছিল। তাঁহার রোমরাজি কণ্টকিত এবং স্বভাব নষ্টপ্রায়!

লক্ষ্মীনারায়ণ বিক্ষুব্ধ; পুত্রদ্বয় এবং কৃষ্ণপ্রাণ—ইহাদের ক্ষণকালের জন্য স্পষ্ট করিয়া দেখিয়া লইলেন। অনন্তহরির পদতলগত খড়গুলি এক প্রকার শব্দ করিয়া উঠিল, তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়াছিল, ক্রোধান্ধ বিড়ালের মতই সাপাট ছাড়িয়া কহিলেন, "বলি আপনি ত জ্ঞানী সাজছেন, কেন, আপনারা বংশপরম্পরা ওষুধ এত্যাদি দেন না..."

"দেব না কেন, না দিলে ঘর দোর জ্বালাবে বলে..."

"বটে, ঘর রাখতে আপনি যেমন উপায়হীন তেমনি লক্ষ্মীনারায়ণ আপনার ধর্ম্ম...আপনার সঙ্গে বাক্য নিষ্প্রয়োজন; এক্ষেত্রে ওঁদের কুলপুরোহিত, পুত্রেরা বর্ত্তমান...অমত নেই...ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম রক্ষা করতে ব্রাহ্মণই আছে..."।

কৃষ্ণপ্রাণ কহিলেন, "অনন্তহরি, সীতারামের যখন জ্ঞান এসেছে, আর্ত্ত নয়, তখন তার একটা মত নেওয়া প্রয়োজন।"

ইতিমধ্যে রিক্ত-মেদ কুঞ্চিত হাতখানি ক্রমে ক্রমে অপগত হয়, তথা সীতারাম আপনার হাতখানি অপসারণ করিল, বিষাক্ত সর্পের ল্যাজ যেমন গহ্বরে অদৃশ্য; তদ্দর্শনে নিকটস্থ মানুষেরা নিশ্চিত হইয়াছিল, শুধুমাত্র লক্ষ্মীনারায়ণ ভীত।

সীতারাম প্রমাণ করিলেন, তাঁহার জ্ঞান আসিয়াছে এবং কৃষ্ণপ্রাণ দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "জ্ঞান ফিরে এসেছে।"

'জ্ঞান এসেছে' উক্তিতে জলে নোঙ্গর নিক্ষেপ করার আওয়াজ ছিল, অনন্তহরি ইত্যাদির মধ্যে এক অপরিজ্ঞাত ভাবান্তর হয়—ক্রমাগতই কাহারা জপ করিতেছে, কাহারও মধ্যে শেষোক্ত চন্দ্রকলা পুনরায় দৃশ্যমান, কাহারও সম্মুখে জোনাকী খেলিতে লাগিল, কাহারও মধ্যে বর্ণচ্ছটা আলোড়িত হইল, কোথাও বিন্দু স্ফীত হইতে চাহিল!

সকলেই কিছুক্ষণ এইভাবে অতিবাহিত করিবার পর, সত্বর বৃদ্ধকে স্পর্শ করিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইলেন। কেহ বা আপন আপন ইষ্টনাম জপ করিতে লাগিলেন, আরও মনে হয় কেহ বা নিদ্রাকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিলেন।

জ্ঞান আসিল। বৃদ্ধের পুনরায় 'আমি' বলিবার ক্ষমতা আসিল। পৃথিবীর চক্রবৎ পরিবর্ত্তনের শব্দ শ্রুত হইল।

বৃদ্ধের দৈহিক জ্ঞান বিষয়ে অনন্তহরি অত্যধিক আস্থাবান; লক্ষ্মীনারায়ণ অনবরত দুর্গা নামে ব্যস্ত, তৎসহ তাঁহার করজোড় কভু বক্ষস্থলে ক্বচিৎ কপালের আজ্ঞাচক্রে আবেগে উত্তেজনায় উঠানামা করিতে লাগিল। তাঁহার দেহের অনিশ্চয়াত্মক দ্বন্দ্ব তাঁহার নিঃশ্বাসে এখন যন্ত্র আঁকিয়া বীজমন্ত্র লিখিতেছিল।

জ্যোতিষীর হাতের মধ্য হইতে সীতারাম আপনার হাতটি সরাইয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার চোখের পাতা দুই চারিবার উঠাপড়া করিয়া প্রমাণ করিল যে জ্ঞানলাভ হইতেছে। কবিরাজ তাঁহার বক্ষের কাছে মাথা রাখিয়া বুঝিলেন, পৃথিবীর জন্য আবার হৃদয় স্পন্দিত হইতেছে। এবং তিনি মাথা উঠাইতেই কুলপুরোহিত কৃষ্ণপ্রাণ সীতারামের কান হইতে তূলা খুলিয়া বলিলেন, "সীতারাম..."

সীতারাম তাঁহার দিকে চাহিলেন।

"তোমার বিয়ে..."

সীতারাম নির্ব্বাক।

"তোমার বিয়ে, তুমি রাজী..."

দ্বিতীয় প্রশ্নে মনে হয় কৃষ্ণপ্রাণের কথা বুঝিয়া লইবার ইচ্ছা থাকিলেও এখনও, একাধারে কীর্ত্তন ও ব্যাখ্যার জন্য সীতারাম সঠিকভাবে শুনিতে পান নাই; কাতর মুখখানি কোনরূপে ঈষৎ নাড়িলেন; কৃষ্ণপ্রাণ তাহাতে যেন বুঝিতে পারিলেন, এবং সেই সঙ্গেই কীর্ত্তনকারী ও গীতাপাঠকারীকে থামিতে কহিলেন। তাহারা থামিল। পুনর্ব্বার তিনি সীতারামের কর্ণকুহরে বলিবার জন্য গলা পরিষ্কার করিয়া কহিলেন, "সীতারাম, ব্রাহ্মণের কন্যাদায়, তুমি তাকে আমাদের ইচ্ছা, বিয়ে করে, ব্রাহ্মণকে বাঁচাও...তুমি রাজী..."

অধুনা শায়িত সীতারামের মুখে কীর্ত্তন থামার দরুণ সকালের আলো পড়িয়াছিল; তিনি—টিয়াপাখী আপনার নাম শুনিলে যেমত মাথা ঘুরায়—তেমনি, মাথা ঘুরাইতে লাগিলেন, এমন মনে হয় উপস্থিত সকলকে যেন ঠিক দিয়া লইলেন, এবং ইহার পর ঊর্দ্ধ আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন! সীতারাম চাটুজ্জ্যের ইত্যাকার ভাব দেখিয়া কৃষ্ণপ্রাণ কাতরভাবে মাথা দুলাইয়া বলিলেন, "সম্ভবত রাজী নয়..."

এই কথায় লক্ষ্মীনারায়ণ কাঁদ কাঁদ হইয়া কহিলেন, "আর একবার..."

"রাজী হতেই হবে! না হলে সাবালক দুই পুত্র বর্ত্তমান, তারাই মত দেবে...আমার গণনা মিথ্যে হতে পারে না..." অনন্তহরি মহা দর্পে বলিলেন।

"নাড়ী ফিরলেই যে সকল জ্ঞান থাকবে এমন নয়, মাঝে মাঝে লুপ্ত হবেই..." কবিরাজ মন্তব্য করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং ঘৃণায় বলিলেন, "অনেক পাপ ত করেছি, এটা নয় নাই করলাম...আমি যাচ্ছি, তবু বলি বাঁড়ুজ্জ্যে মশাই, আমার কাছে অনেক বিষ আছে...তার একটু আপনি..."

লক্ষ্মীনারায়ণ নিজের কানে আঙ্গুল দিয়া কহিলেন, "ছিঃ ছিঃ আপনি কি ব্রাহ্মণ!"

কবিরাজ আর অপেক্ষা করিলেন না।

"ঠাকুর মশাই আপনি বলুন" জ্যোতিষী অনুরোধ করিলেন।

"সীতারাম, ব্রাহ্মণের কন্যাদায়, বিয়ে করবে? রাজী..."

এই কথায় সীতারামের নাসিকাগহ্বর দিয়া জল আসিল। ধীরে ধীরে শীতকম্পিত হাতখানি মুখমণ্ডলে বুলাইয়া কোনমতে বলিলেন, "দাড়ি..." দন্তহীন, মাড়ি দেখা গেল; বাক্যের শব্দের পরিবর্ত্তে হাওয়াই বেশী করিয়া শোনা গেল।

'খেউরি হইব' কথাটি বলিতে হইল না, সকলেই বুঝিয়া লইল।

লক্ষ্মীনারায়ণ বোকার মত হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহার শরীর কিছুটা বাঁকিয়া নীচু হইয়াছিল, তাঁহার মুখের ঠিক নিম্নস্থান দিয়া অনুচ্চ হাসির স্রোত চলাফেরা করিতেছিল, এবং ইহার সহিত জ্যোতিষীর সরস মন্তব্য, "কবিরাজ বলে নাকি জ্ঞান নেই? না না জ্ঞান মাঝে মাঝে লুপ্ত হবে! এই জ্ঞানটুকুই যথেষ্ট...ব্রাহ্মণ বাঁচলো...যাও দাঁড়িয়ে কেন, লক্ষ্মীনারায়ণ, যাও মেয়ে আন।"

"এ্যাঁ"...

"হ্যাঁ হ্যাঁ..."

লক্ষ্মীনারায়ণ যে কি করিবেন তাহা ঠিক পাইলেন না। মাটি দেখিলেন, আকাশ দেখিলেন, পৈতা দেখিলেন, তাহার পর অদূরে গঙ্গা, পাগলের মতই দৌড়াইয়া গিয়া, "মাগো মা মা, এতদিন বাদে দয়া করিলে মা" বলিয়া হাত দিয়া জল মাথায় দিতে গিয়া, হঠাৎ গঙ্গায় নামিয়া অনবরত ডুব দিতে লাগিলেন। তাহার কিয়ৎক্ষণ পরেই উঠিয়া আসিয়া, জলসিক্ত-বসনে, রুদ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করিবেন বলিয়া মুখ

বলিলেন, কিন্তু ওষ্ঠদ্বয় বাঁকিল কিন্তু শব্দ বাহির হইল না। এমত সময় ইষ্টদেবতা স্মরণ নিমিত্ত হাতখানি বক্ষের নিকটে স্থাপিত ছিল।

"কি, এই শ্মশানঘাটে স্নান করলে? মাথা খারাপ না কি?—কি বল...?"

"হবে ত..." লক্ষ্মীনারায়ণের তখনও প্রত্যয় হয় নাই।

"সীতারাম নিজে রাজী, আবার...! কিন্তু হ্যাঁ, একটা কথা কি জান তোমায় বলে রাখা ভাল, এখনি কথা হচ্ছিল, কি হে বলরাম...কি বল আগের কালের মত ধর্ম্ম সত্যরক্ষা একালে নেই, বিয়ের পর তেমন যদি..."

"দেখবেন ঠাকুর মশাই, আমার মেয়ে তেমন..."

"তা নয়, কোম্পানীর রাজত্ব, ঘোর কলি, সহমরণে যে পুণ্য আছে একথা কেউ বিশ্বাস করে কি...যাই হোক যদি না হয় তোমাকে নিতে হবে...শেষে স্ত্রী বলে একটা মামলা রুজু করে দিলে, এরা বলছে কন্যাদায় উদ্ধার করতে গিয়ে..."।

"আপনি আমায় তামা তুলসী দিন, গঙ্গা আছেন, আমি..." লক্ষ্মীনারায়ণের সখেদ উক্তি শোনা গেল।

দূর হইতে কবিরাজের কণ্ঠ আসিল, "আর প্রয়োজন নেই, অল্প বয়সী বিধবার ভার কোন বাপ নেয়, বুঝি বুঝি না।" নিম্নকণ্ঠে মনে হয় বৈজুকে কহিলেন, "একবেলা খাওয়া উপোস, চুল কপচে দেবে, তবু কলঙ্ক ঘোচে না...ইস, কিছু করবার যো নেই..."

"ঠাকুর ম'শায় বারুণ কর তুমি"—বৈজুনাথ অনুরোধ করিয়াছিল।

"আমার কে শুনবে? কৃষ্ণপ্রাণ, জ্যোতিষী অনন্ত এদের ত লাভ—সতীদাহ যখন হয় তখন।"

"হাঁ হাঁ জানি জানি, বলবে সোনা ছাড়া স্বগ্যে কিছু যাবে না, ওগো সোনা দাও, অক্ষয় স্বগ্য হবে সোনা...আমায় বলবে, তুই শালা চাঁড়াল, বামুন কায়েতের সতী, এর ছায়া মাড়াবি না...তারপর ছাই নিভিয়ে সোনা খুঁজবে, আমায় বলবে বেশী গর্ত্ত কর।"

"ত কেন বলবে না, যদি থানাদার..."

"কি হত? সে শালা ঘুষ লিত..."

একথায় বিহারীনাথ অন্যমনস্ক হইয়াছিলেন।

বৈজু মহাআক্রোশে বলিল, "একটু উঁচুজাত না হলে শালা আমি লাঠি ঘুরাতাম..."

"চুপ চুপ..."

"না, বড় প্রাণে লাগে, তোমরা ভাব আমি চাঁড়াল—মড়া দেখতে আমার বেজার নাই, সত্য, কিন্তু জ্যান্ত মানুষ দেখলে বেজার লাগবে না..." থামিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "আমি চিতা সাজাব, সব পাপ আমার লাগবে, সেই পাপে বউটাকে কুমীরে নিয়ে গেল..."

কবিরাজ উঠিয়া কাহারও কাছে বিদায় গ্রহণ না করিয়া চলিয়া গেলেন—বৈজুও উঠিয়া মাটিতে একটি লাথি মারিল, তাহার পর বলিল, "কি ঠাকুর, কি হল...?"

লক্ষ্মীনারায়ণ যাইতে যাইতে বলিলেন, "হয়েছে, তোকে পেট ভরে খাওয়াব।"

"খাওয়া ছাড়া আমার কি আছে ঠাকুর!"

বেলা এখন প্রায় শেষ! একটি চিতার কোণে প্রজ্বলিত কাঠের উপরে হাঁড়ি টগবগ করিয়া ফুটিতেছে, এক একটি সুসিদ্ধ চাল লাফাইয়া উঠে; বৈজু 'এ দেহ তরণী ডুবে যাবে' গাহিতে গাহিতে একটি কঞ্চি দিয়া ভাত তুলিয়া দেখিবার সময় কান খাড়া করিল। কপাল কুঞ্চিত করিয়া কি যেমন একাগ্র মনে শুনিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

দূরাগত শব্দ আসিতেছে, সম্মুখে স্রোতময়ী গঙ্গার কল্লোল, পাতায় পাতায় হাওয়ার চপলতা শব্দকে ক্রমাগত বাধা দিতেছিল; বৈজু একান্তে ভাতের কাঠি রাখিয়া, অল্প শতচ্ছিন্ন চ্যাগড়া কুড়াইয়া হাঁড়ি ধরিয়া ফেন গালিতে লাগিল। এতাবৎ দূরাগত শব্দ এক্ষণে কিঞ্চিৎ স্পষ্ট রূপধারণ করিল, ক্রমশঃই বিরক্তি-উৎপাদনকারী ক্রমান্বয় দেশাড়ী সানাইয়ের আওয়াজ ঢাক ভেদ করিয়া ট্যাঁ ট্যাঁ করিয়া উঠিতেছে, আর ট্যাং ট্যাং করিয়া কাঁসির বজ্জাতি; বৈজু আর স্থির থাকিতে পারিল না। কোনমতে হুড়মুড় করিয়া ফেন গালাইয়া, আড়ায় রাখিয়া পরক্ষণেই দৌড়াইয়া গিয়া উচ্চ ভেড়ীর উপর উঠিল

সম্মুখের দূরান্ত নিখোঁজ পৃথিবী দেখিতে গিয়া তাহার অসম্ভব ঘোর লাগিল। হয়ত মনে হইয়া থাকিবে এখন সন্ধ্যা হইলে ভাল হইত। অবিশ্রান্ত দূরত্বকে সম্ভবত বুঝিয়া লইবার কারণেই আপনার ছোট সীমাকে একদা দেখিয়া লইল, যাহার নিম্নে হিম জলরেখা, অজস্র প্রতিবিম্ব-সম্ভবা। এভাবে দেখা তাহাকে কোন দিব্য-সাহস দেয় নাই—শুধু তাহার বর্ত্তমানতা, বাস্তব, সাধারণভাবে অস্তিত্বকে স্পষ্ট করে।

বহুদূরে ধান্যক্ষেতের মধ্য দিয়া ক্ষুদ্র একটি শোভাযাত্রা আসিতেছে। বৈজুনাথ বুঝিল যে ইহা কোন নিম্নজাতির শব নহে। স্পষ্টত দেখিল মধ্যবর্ত্তী ডুলির লাল কাপড়, তাহার এক এক প্রান্তে হেমন্তের হাওয়া উড়িতেছে। সম্মুখে সানাই-বাদক, কখনও বা কাঁসিবাদক আলের উপর দিয়া গমনে টাল সামলাইতে না পারিয়া ধান ক্ষেতে নামিয়া পড়িতেছে; যদিচ শরৎ চলিয়া গিয়াছে তথাপি ধান নুইয়া পড়ে নাই—বৈজু এক দৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে, 'হায় গো' বলিয়া আপনকার গালে দুইহাত দিয়া চপেটাঘাত করিতে লাগিল। "হায় গো বাবা পঞ্চমুণ্ডি লেমিনাথ, তোমার নৈবিদ্য, দোসর বুঝি।"

কে একজন ঘাট হইতে ডাকিল, "হেই বৈজু চাঁড়াল, ঢাকের বাদ্দি শুনলে চলবে? এদিকে মড়া পড়ে।—কোথায় হে?"

এ হেন ডাক অধুনা হাওয়া সংখ্যার মত ভাস্বর, ক্রমে ক্রমে বৈজু শুনিয়াছিল এবং এই প্রথম, হয়ত বা, সে আপনকার পিছনে যাইতে সক্ষম হইয়াছিল। যেখানে সে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ লাভ করিয়াও অপটু। যেখানে সে ক্রন্দনে সর্ব্বরূপে দক্ষ, কেননা তাহাই উহার একমাত্র ভগবদ্দত্ত ক্ষমতা। আপনার নগ্নতা যেখানে সূর্য্যের আলঙ্কারিক বিচিত্রতা, আর একটা দিক।

কিয়ৎক্ষণ ধান্যক্ষেত্রের প্রতি তাকাইয়া সহসা হঠাৎ বৈজু ভেড়ী পথ হইতে ভয়ঙ্কর ভাবে চীৎকার করিল, "ওগো তোমাদের পুণ্যাত্মা বুড়ার ক'নে আসছে", এদিকে শ্মশান যাত্রীদের বলিল, "বস গো বস, এনেছ তো মড়া, কাঠ তো এলো না এখনও, কত ধূম হবে, কত আলোচনা গাওনা হবে, দেখবে না?" ইহার পরে সুরে গাহিল,—

"তুমি আমার বাবার ঠাকুর,
টোপর মাথায় দিয়ে এলে,
বুড়ী হয়ে বসে থাক প্রাণ,
মাঝে মাঝে এসে ছোঁব—
তুমি আমার বাবার ঠাকুর"

ভেড়ীর উপরেই বৈজুনাথ নৃত্যের ভঙ্গী দেখাইয়া তেহাই দিল। বৃদ্ধ ব্যতীত সকলেই তাহার এই অসভ্য গান শুনিল, হরেরাম হাসিতে গিয়া গম্ভীর।

শ্মশানযাত্রী দলের অযোগবাহশব্দ স্পষ্ট আপ্লুত স্বর স্বাভাবিক হইয়াছিল। শবের পাটছোঁয়া লোকটি বলিল, "সে কি গো, বউ? বিয়ের ক'নে!" এবং পরক্ষণেই আপনার অসংযম স্মরণ করিয়া সহসা উচ্চৈঃস্বরে, "ওগো খুড়ো গো" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

"ক'নে গো ক'নে, বাবা পঞ্চমুণ্ডি লেমিনাথের নৈবিদ্যি..."

"বলে কি!"

বৈজুনাথ কলম-কাটা ভেড়ী পথ বাহিয়া নামিয়া আসিয়া ছোট দৌড়ে এখানে উপস্থিত হইয়া স্ত্রীলোকের মত ভান করত কহিল, "ওমা, অবাক বললে বাছা! বাছা, বলি তোমার কি জাত গো? কেনে, শোন নাই...বামুন কায়েতের ঘরে সব সময় হয়..." বলিয়া ঝুমুরওয়ালী কেষ্টদাসীর মত ভান করিয়াছিল।

"এই শ্মশানে?"

এ বাক্যে বিস্মৃতি; যে লোকটি এ কথা বলিয়াছিল সে চির-চেনা একটি অন্ধকারকে ইদানীং অপরাহ্ণের আলোকে যাহা রেখাবৎ—তাহাকে পথ ছাড়িয়া দিল। যাহা সর্পগতিতে দূর কোন রক্তস্রোত দর্শনে অদৃশ্য।

'শ্মশান' কথাটা শুনিয়া বৈজুনাথ শ্লেষ্মায় ভারাক্রান্ত, কটাক্ষ করিতে উন্মত্ত হইয়া উঠিল, "তবে! পরলোকে সংসার কি খামার বাড়ী থেকে পাতবে? এই লাও! এই তার চারবাগাল বাড়ী, চালাকাঁৎ ঘর

গো...” বলিতে বলিতে পশ্চিমে ফিরিয়া তাকাইল। কেননা বিরক্তিকর বাজনা এখন অতীব নিকটে।

ভেড়ীর একস্থানে শ্মশানে আসিবার সঙ্কীর্ণ পথ বর্ত্তমান, ইহার পুনরায় হঠাৎ বেশ প্রশস্ত স্থান সিঁড়ির মত এবং নীচে শ্মশান ভূমি।

এক একজন বাজনদার বেসামাল পায়ে নামিল। তাহার পর মুরারী নাপিত; তাহার পর লক্ষ্মীনারায়ণ দ্রুতপদে আসিয়াই পিছন ফিরিয়া বাঁশের ছাতা ঘাড়ে করিয়া ডুলি বাহকদের নির্দ্দেশ দিতে লাগিলেন, কিন্তু দেখা গেল ডুলি বাহকের পরিবর্ত্তে একজন কাঠ লইয়া আসিতেছে। লক্ষ্মীনারায়ণ বলিলেন, “আঃ তুমি আবার কোত্থেকে এলে হে? একটু সবুর সয় না...”

সে কহিল, “বাঃ মড়া পড়ে আছে...”

লক্ষ্মীনারায়ণ তাহার কথায় ‘নারায়ণ নারায়ণ’ করিয়া বলিলেন, “যত অলুক্ষণে কাণ্ড, যাও যাও— ওরে তুই খুব সাবধান গা, দেখিস...হা হা কোন বিঘ্ন না হয়, আয় আয়...,

সঙ্কীর্ণ পথ, একটি ডুলি দেখা গেল।

সুন্দর লাল কল্কা ছাপ ‘আরকট’ ছিটের কাপড়ের মধ্যে অসম্ভব করুণ স্তিমিত ক্রন্দনের শব্দের আধার এই ডুলিখানি, জালা যেখানে রাখা সেখানেই সন্তর্পণে রাখা হইল।

এইস্থান হইতে বুড়া সীতারামকে—তথা বরকে স্পষ্ট দেখা যায়।

লক্ষ্মীনারায়ণ এখন তৎপর, ডুলির খুরা হইতে একটি কাঠি মাদুর বাঁধা ছিল, খুলিয়া লইয়া এখানে পাতিলেন। এখনও সীতারামের মাথার উপর হইতে ছাউনি, যাহা দুপুরের রৌদ্রের জন্য খাটান হইয়াছিল, তাহা খুলিয়া লওয়া হয় নাই। পুরোহিত বৃদ্ধের কানের তুলা খুলিয়া, “সীতারাম, ক’নে এসেছে” বলিয়া উঠিয়া, লক্ষ্মীনারায়ণের নিকটে আসিলেন। ডুলির মুখের পর্দ্দায় ‘অযোধ্যায় রাজকর্ম্ম ব্যাপৃত রামচন্দ্র পার্শ্বে সীতা’ ছাপা, সেখানে, ইহার সম্মুখে লক্ষ্মীনারায়ণ দাঁড়াইয়া আপন কন্যাকে আহ্বান করিলেন, “এস মা এস।”

কিয়ৎক্ষণের পরে বলিলেন, “লজ্জা কি মা লক্ষ্মী...নেমে এস” ইহার পর নিজেই অধৈর্য্যতার সহিত ডুলির পর্দ্দা খুলিয়া দিলেন। যশোবতীকে দেখা গেল।

অনিন্দ্যসুন্দর একটি সালঙ্কারা কন্যা প্রতীয়মান হইল, ক্রন্দনের ফলে অনেক স্থানের চন্দন মুছিয়াছে, আকর্ণবিস্তৃত লোচন রক্তাভ, হলুদ প্রলেপে মুখমণ্ডল ঈষৎ স্বর্ণসবুজ। সর্ব্বলক্ষণে দেবীভাব বর্ত্তমান, ফলে সহজেই মনে হইবে এ যেন বা চম্পক ঈশ্বরী, লক্ষ্মী প্রতিমা। শুধুমাত্র মুখখানি জন্ম দুঃখিনীর মতই বিষাদময়।

বৃদ্ধ সীতারাম কোনক্রমে মুখ আড় করিলেন, ক্রমাগত নিজের গাল চুষিবার শব্দ, সহসা কিঞ্চিৎ লালা গড়াইল, তিনি দেখিলেন, পটে আঁকা একটি বড়ঐশ্বর্য্যময়ী দেবীমূর্ত্তি, এখন তাঁহার পায়জোড় পরিহিত পা মাটিতে ছোঁয়ান, দুটি হাতে দুইদিকের ডুলির চৌকার বাঁকা ধরিয়া আছেন।

এই ডুলির পশ্চাতে বাজনদাররা এ দৃশ্যে, বৃদ্ধদর্শনে, বাজনা ভুলিয়া গেল। কেহ ফুঁ দেয় আবার ঠিক হয়, কেহ বেতালা ঢাক বাজায়, কাঁসি খন খন বাজিয়া উঠে।

যশোবতী বৃদ্ধকে দেখিয়াই চক্ষু তুলিলেন, সীতারামের পিছনে, নিম্নে প্রবাহিণী গঙ্গা। দেখিলেন, স্রোতে গলিত দেহে শকুন বসিয়া মনঃসংযোগ করিতে চেষ্টা করিতেছে, তাহারই পার্শ্বে চক্রাকারে ঘুরিয়া কাক তাহাকে বিরক্ত করে। বেলাতটে একটি অকেজো ভাওলিয়া, যাহার গায়ে মেটে সিন্দূর দিয়া আঁকা চক্ষু, নিম্ন দিয়া ধ্বনিসহকারে জল বহিয়া যাইতেছে। ক্বচিৎ জলজ পানা।

পুনর্ব্বার তিনি, যশোবতী, বৃদ্ধকে নিরীক্ষণ করিলেন।

পাতার ফাঁক দিয়া কঠোর সূর্য্যালোক পড়িয়াছে, বৃদ্ধের নাক দিয়া কাঁচা জল গড়াইতেছে, এবং অন্যান্য সকল কিছু শব্দকে পরাজিত করিয়া গাল চোষার আওয়াজ ক্রমবর্দ্ধমান, তদ্দর্শনে ডুলিস্থিত প্রতিমা চৈত্রের পাতার মত কম্পিত, তাঁহার ভ্রূ-যুগলে যেন গুণ টানা হইল। দৃষ্টিকে ছাড়াইয়া চক্ষুর্দ্বয় আগাইয়া আসিতে চাহিল।

“সীতারামের বেশ জ্ঞান আছে, বিয়ের সময়ও উঠে বসবে, তুমি গিয়ে সীতারামের সঙ্গে একটু কথা বল, মেয়ে দেখে ওর পছন্দ হয়েছে কিনা...” নির্লিপ্তভাবে কৃষ্ণপ্রাণ ইহা বলিয়া লক্ষ্মীনারায়ণের নিকট

দায়িত্বজ্ঞানের পরিচয় দিলেন। প্রথমতঃ ইহা যথারীতি আচারবিরুদ্ধ, তাহা কোনক্রমে মনে হইল না।

এই কথা কয়টি যশোবতীর যৌবন উচ্ছল শরীরখানিকে যেন বা নিঙড়াইয়া দিল, তাঁহার কণ্ঠ মধ্যে পাখীর বাসার স্বাদ ও গন্ধে রুদ্ধ, তাঁহার মুখখানি ডুলির পর্দ্দার আড়ালে চকিতে অদৃশ্য এবং পরক্ষণেই মুখমণ্ডলের অর্দ্ধভাগ পরিদৃশ্যমান হইল। অচৈতন্য হইবার পূর্ব্বলক্ষণ জানিয়া পিতা লক্ষ্মীনারায়ণ সত্বর আসিয়া কন্যাকে ডাকিলেন, "যশো, যশো!"

যশোবতীর আয়ত চক্ষুর্দ্বয় এখন উন্মীলিত, তিনি আপনার আদরের পৃথিবী দেখিলেন, যে পৃথিবী শূন্যতার, সৌন্দর্য্যের, বাস্তবতার আধিভৌতিক সমস্যা এবং শুধুমাত্র তিনি উচ্চারণ করিলেন, "বাবা!"

এই স্বরের মধ্যে বিড়াল ও পাখীর ঘোরতর যুদ্ধের আওয়াজের রেশ ছিল। মুক্তাসদৃশ দন্তপাতি দিয়া তিনি তাঁহার নিম্ন ওষ্ঠ চাপিয়া ধরিলেন, এমত সময়ে মানসচক্ষে দেখিলেন, এক বৃক্ষ, শিকড় যাহার উচ্চে, শাখা নিম্নে, এবং পুনরায় তিনি, সমুদয় তাঁহার কাছে!

"আয় মা আয়, আমার মান রক্ষা কর।" তাহার পর ধীরে ধীরে সান্ত্বনার ছলে বলিলেন, "মঙ্গল কাজের সময় চোখের জল ফেলতে নেই মা।"

যশোবতী পিতার মুখের দিকে চাহিয়া নিজের দুর্ব্বলতার হেতু সত্যই লজ্জিতা হইলেন, অত্যধিক দৃঢ়তার সহিত ডুলির বাঁশ চাপিয়া ধরিয়াছিলেন, ফলে হাত ছাড়াইয়া লইবার পরেও হাত অর্দ্ধ উন্মুক্ত হইয়া রহিল। কন্যাকে ধরিয়া লক্ষ্মীনারায়ণ মাদুরের উপর বসাইয়া দিলেন।

এইস্থানের পরিবেশ দেখিয়া আপনার হতভাগ্যের কথা ভাবিবার মত কোন মনোবৃত্তি যশোবতী খুঁজিয়া পাইলেন না। শুধুমাত্র চক্ষু বুজাইয়া ঘুম চাহিলেন।

বাজনদারদের তখনও স্বাভাবিকভাব ফিরিয়া আসে নাই। কৃষ্ণপ্রাণ কন্যাপক্ষের হইয়া তাহাদের ধমক দিলেন, তাহারা যুগপৎ নানাবিধ শব্দ করিয়া উঠিল; নাপিত সত্বর ক্ষুরে ধার দিতে লাগিল, তাহার মাথায় কৃষ্ণপ্রাণ গঙ্গাজল দিয়া শুদ্ধ করিয়া বলিলেন, "হরেরাম, নাপিতকে নিয়ে যাও—বলরাম তুমি ওখানটা পরিষ্কার কর।"

দ্রুতগতি কাজ শুরু হইয়া গেল। লক্ষ্মীনারায়ণ ছাতার আড়া হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মোড়ক, ডুলির বাঁশ হইতে হাঁড়ী কলস নামাইলেন, কৃষ্ণপ্রাণ কলাপাতা কাটিলেন। সকল কিছুর ব্যবস্থা হইল।

যশোবতীকে যখন তাঁহার পিতা ডাকিতে আসিলেন তখন তিনি ডুলির উপর মাথা রাখিয়া প্রশান্তচিত্তে ঘুমাইতেছিলেন। পিতার ডাকে উঠিয়া বস্ত্রাদি সম্বরণ করিয়া একটি হাই তুলিবার কালে চারিদিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। আলস্যত্যাগ করা আর হইল না। কিছুকাল স্থির থাকিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া পিতার দিকে শিশুর মতই তাকাইলেন। অনন্তর শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, "কি করবো?"

"তাড়াতাড়ি নে মা, লগ্নের আর দেরী নেই।"

নাপিত তাহার ছোট বিলাতী আয়নাখানি এখানে বসাইয়া দিয়া গেল। যশোবতী ধীরে ধীরে সাজিতে লাগিলেন। দেহ কাঁপিয়া কাঁদিয়া চমকাইতেছিল, কপোল বহিয়া অশ্রুধারা বর্ত্তমান, কিন্তু তথাপি মনে হয় যেন ক্রন্দনের সেই মনোভাব নাই; কেননা তিনি, যশোবতী, গঙ্গার জলোচ্ছ্বাসে পুনঃ পুনঃ শুনিয়াছিলেন, 'হে কৌন্তেয়—হে কৌন্তেয়!' সাক্ষাৎ ভগবান আপনার প্রাণপ্রিয় সখাকে যেন ডাকিতেছেন। হঠাৎ দেখিয়াছিলেন, কে যেমন বা নাড়ীসমূহ লইয়া নেতি ধৌতি করিতেছে।

চতুর্দ্দিক অবলোকন করত যশোবতী বলিয়াছিলেন, 'এ কি খেলা!' এবং শ্মশানের ধূম তাঁহাকে মলিন করিতে পারে নাই।

যশোবতী বধূবেশ আপনি ধারণ করিলেন।

বরবেশে সীতারাম সত্যই আকর্ষণীয় হইয়াছিলেন; কেবলমাত্র ক্রমাগত গাল চোষা ছাড়া তাঁহার মুখে

অন্য শব্দ ছিল না। বলরাম পিছন হইতে তাঁহাকে বেশ কিছুটা তুলিয়া ধরিয়াছে। এখন তাঁহাদের পরিক্রমণ করিয়া সাত পাক চলিতেছে, সীতারাম অনেকবার আপনার ভারাক্রান্ত মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া দেখিতে চাহিলেন, ফলে তাঁহার দুর্ব্বল স্কন্ধই কাঁপিয়াছিল।

শুভদৃষ্টির কালে, লক্ষ্মীনারায়ণ কন্যাকে বরের দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিতে অনুরোধ করিলেন। সীতারাম যশোবতীকে দেখিতেই গাল চোষার গতি বাড়িয়া গেল, বৃদ্ধ যেন উত্তেজনা সহ্য করিতে পারিলেন না, অপ্রকৃতিস্থ হইয়া আপনার পুত্রের হাতে মাথা হেলাইয়া দিলেন, কে জানে হয়ত আপনার প্রৌঢ়ত্ব পার হইয়া যৌবনের উপর হেলিয়া পড়িতে চাহিয়াছিলেন! কিয়ৎকাল এইভাবে অতিবাহিত হইল। তিনি আবার ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার হস্তে মালা দেওয়া হইল, জরাগ্রস্ত হস্ত মালা লইয়া আগাইতেছিল, সহসা কোথা হইতে কাশি আসিল, তবুও বৃদ্ধ মালা পরিত্যাগ করেন নাই, কিন্তু আর সম্ভবপর হইল না; দমকা হাওয়া তাঁহার হাত হইতে মালা খসাইয়া লইয়া গেল। সকলকে আশ্চর্য্য করিয়া মালাটি ধরিবার জন্য সীতারামের বাহু প্রসারিত হইয়াছিল, মালা দূরে গেল, হরেরাম মালা আনিতে ছুটিল কিন্তু অবলীলাক্রমে বৈজুর ছাগল সে মালাখানি সদ্ব্যবহার করিতে তখন মুখ আগাইয়া দিয়াছে।

সীতারাম তখনও প্রবল বেগে কাশিতেছিলেন, এমতাবস্থায় মন্ত্রচালিত পাষাণপ্রতিমা যশোবতীর হস্তধৃত মাল্যখানি আসিয়া বৃদ্ধের কণ্ঠলগ্ন হইল।

এসময় বায়ু স্থির, গৃহাভিমুখী পক্ষীরা মুখরিত, স্রোত শান্ত এবং প্রকৃতি স্তব্ধ নিথর হইয়াছিল।

সীতারামের অবস্থার কথা স্মরণ করিয়া, শুভকার্য্য যত সংক্ষেপে করা যায় তাহা করা হইতেছিল। ইতিমধ্যে কৃষ্ণপ্রাণ, দক্ষিণা আচারবিরুদ্ধ হইয়াছে, এই কথা বুঝিতে পারিলেন। পুরোহিতোচিত কণ্ঠে কৃষ্ণপ্রাণ কহিলেন, "নিয়ম এই যে, আমি আর একটি মুদ্রা বেশী পাইব..."

লক্ষ্মীনারায়ণ ট্যাঁক খুঁজিলেন, কাপড় ভাল করিয়া ঝাড়িলেন। কোন মুদ্রাখণ্ডের সন্ধান পাওয়া গেল না। তখন তিনি শুধু মাত্র অসহায়ভাবে বলিলেন, "তা হলে..."

"সর্ব্বনাশের কিছু নেই, ভালমত অনুসন্ধান কর, ক্ষুণ্ণমনা ক্ষুব্ধ ব্রাহ্মণ দ্বারা শুভকার্য্য সম্ভব নয়" বলিয়া কৃষ্ণপ্রাণ স্মিতহাস্য করিলেন।

তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া কোন মুদ্রার সন্ধান পাওয়া গেল না। লক্ষ্মীনারায়ণ আপনার লোকেদের কাছে কর্জ্জ চাহিলেন, কিন্তু তাহাদের সকলের কাছেই কিছু কড়ি ছিল, রৌপ্যমুদ্রা ছিল না। সুতরাং লক্ষ্মীনারায়ণ আসিয়া অনুনয় বিনয় করত কহিলেন, "ঠাকুর মশাই, এখন..."

"রৌপ্যমুদ্রা বিনা শুভকার্য্য হয় না..."

অদূরে বসিয়া বৈজুনাথ এই ব্যাপার দেখিতেছিল, সে একটি ঝাঁপা হইতে খানিক তাড়ি নিজের মুখে ঢালিয়া মন্তব্য করিল, "যাঃ শালা——পাকা ঘুঁটি বুঝি কাঁচে গো—" তাহার কথা কাহারও কর্ণে প্রবেশ করিল না। তখনও লক্ষ্মীনারায়ণ দাঁড়াইয়া অপদস্থ হইতেছিলেন; বৈজুনাথ উচ্চৈঃস্বরে কহিল, "আমি ধার দিতে পারি" বলিয়া ঠেঁটির ট্যাঁকে হাত দিয়া অনুভব করিতে লাগিল।

লক্ষ্মীনারায়ণ অত্যন্ত রাগান্বিত, বৈজুনাথের কথায় তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ যেন হোমাগ্নিতে পরিবর্ত্তিত হইল, তিনি ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, "হারামজাদা ইতর চাঁড়াল..."

শান্তকণ্ঠে বৈষ্ণব কৃষ্ণপ্রাণ সহাস্যবদনে কহিলেন, "কন্যা সম্প্রদানকালে ক্রোধ পরিত্যাজ্য" বলিয়া ক্রমাগত সাধুভাষায় আপনার মনোভাব ব্যক্ত করিতে লাগিলেন, "যে কোন জাতি বর্ণের নিকট হইতে ধাতু তথা অর্থমুদ্রা গ্রহণযোগ্য, একমাত্র মুদ্রার ক্ষেত্রে জাতিবিচার চলে না...এতদ্ব্যতীত শ্মশানে উচ্চ নীচ ভেদ নাই।" মনে হইল কোন অকাট্য সংস্কৃত শ্লোকের ইহা সরল ভাষায় অনুবাদ।

এই বিচারে সমবেত জনমণ্ডলী গভীর শ্রদ্ধার সহিত কৃষ্ণপ্রাণের প্রতি অনিমেষ নয়নে চাহিয়াছিল। লক্ষ্মীনারায়ণ বিভ্রান্ত, একবার ইঁহাদের দিকে অন্যবার তাঁহার নীচকুলোদ্ভব মহাজনের দিকে তাকাইলেন। বৈজু ইঁহাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়াছিল, সে হাতের কব্জিতে মুখ মুছিয়া একটি মুদ্রা লইয়া দাঁড়াইয়া অন্যহাতে আপনার মোচ চুমরাইতেছিল। জ্যোতিষী অনন্তহরি লক্ষ্মীনারায়ণকে খানিক

সৎসাহস দিলেন।

লক্ষ্মীনারায়ণ লজ্জিত পদে বৈজুর নিকট আসিয়া হস্ত প্রসারিত করিলেন। চণ্ডাল তাঁহার হস্তে মুদ্রাটি দিবার জন্য আপনার নেশা-বেসামাল দেহকে সংযত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড রোল উঠিল, "ওরে ব্রাহ্মণের চরণে দে, না হলে মহাপাতক হবি"; বৈজুর অবস্থা বুঝিয়া ব্রাহ্মণ এক-পা পিছাইয়া গিয়াছিলেন। সে টাল সামলাইতে না পারিয়া পড়িয়া গেল, তাহার হাত হইতে মুদ্রাখণ্ড গড়াইয়া প্রায় গঙ্গার কিনারে গিয়া পড়িল। বৈজু নেশাবিজড়িত কণ্ঠে বলিল, 'আমি শালা ত প্রণামী দিচ্ছি না যে পায়ে দেবো...।" অবশ্য তাহার এ উক্তি কেহ নিশ্চিত শুনিতে পাইল না।

লক্ষ্মীনারায়ণ গঙ্গাজল মুদ্রাটির উপর ছিটাইয়া তাহাকে শুদ্ধ করিয়া লইয়া আসিলেন। পুনর্ব্বার এই শ্মশানভূমিতে পুণ্য বিবাহমন্ত্র উচ্চারিত হইল, আসন্ন সন্ধ্যার গঙ্গার কল্লোল-ধ্বনিকে আহত এবং স্তব্ধ করিয়া দূর গগনে আবর্ত্তিত হইতে লাগিল। এই মন্ত্রশক্তি, মানব দেহের হিঙ্গুল রক্তস্রোতকে উদ্ধতনখর ও প্রকৃতিস্থ করিতে সক্ষম হয় নাই। ইহা মায়িক সুতরাং হৃদয়ের স্পন্দন পাতালগত শিকড়মতই স্থবির হইয়া রহিল।

বিবাহের প্রথম অধ্যায় নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইল। মৎস্যক্রীড়া কড়ি খেলা পর্য্যন্ত হইল, পুরাতন ঊর্ণনাভের মত হাতখানি ক্রীড়াচ্ছলে, কখন বা কড়ি সন্ধানকালে, যশোবতীর দেহের সর্ব্বত্রে কর্ষণ করিল। তিনি ভীতা হইলেন না, নিঃশ্বাসের গতির সমতার কোন ব্যতিক্রম ঘটিল না; নবোঢ়া বধূর মত ক্লান্ত হইয়াও তিনি যে সহজ হইয়াছিলেন, এমতও নহে। কৃষ্ণপ্রাণ গঙ্গাতীরের বাসর পরিত্যাগ করিয়া লক্ষ্মীনারায়ণের নিকটে গিয়া বলিলেন, "কি বলব, আমার মনে হয় আমরা যেন সত্যযুগেই আছি, মায়ের কি শক্তি!"

এখন আকাশ তারাতৃষ্ণ, তবু দেখা গেল লক্ষ্মীনারায়ণের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

যশোবতী বসিয়া আছেন। তিনি যেন বা ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার দ্বারা পীড়িতা নহেন। অথবা স্বাভাবিক জ্ঞান তাঁহা হইতে অপহৃত হইয়াছে। সম্মুখে উদার গঙ্গা ইদানীং চন্দ্রালোকে বেলোয়াড়ী। তিনি কৃষ্ণতম অন্ধকারের আধার মাত্র, পরিদৃশ্যমান স্থূলতা যে অন্ধকারে অপ্রকট হইতেছে; যাহা ঘটিল তাহার স্মৃতি পর্য্যন্ত তাঁহাকে ক্ষেত্র করিয়া জাগিয়া উঠিতেছে না। অনেক প্রাণ আছে যাহার স্পন্দন নাই, ক্ষুধা নাই। শুধু মরণোন্মুখ ঘুমে তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় খসিয়া আসিতেছে। তথাপি বেশ কিছুক্ষণ ধরিয়া তিনি যেমন বা কাশির মত আওয়াজ শুনিতেছিলেন। অনন্তর কোনক্রমে একবার পাশ ফিরিয়া দেখিলেন যে, আত্মরক্ষায় বদ্ধপরিকর পোকার মত দুটি চোখ তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে, এতদ্দৃষ্টে তাঁহার দেহ রোমাঞ্চিত হইল না, শুধু মাত্র অল্প ভাঙন দেখা গিয়াছিল। বৃদ্ধের হাতে মৃদু স্পন্দন ছিল, মনে হয় তাহা গঙ্গার হাওয়া-সম্ভব। যশোবতীর মুখে কালোচিত অবগুণ্ঠন ছিল না, তিনি অপলক নেত্রে বৃদ্ধের দিকে চাহিয়া রহিলেন, এ সময়ে তাঁহার দেহস্থিত কূট অন্ধকার যৌবশরীরকে আলোড়ন করিয়া সুদীর্ঘ দীর্ঘনিঃশ্বাস হইয়া চলিয়া গেল, নাসার বেসরকে তাহা লাল করিয়াছিল, নোলক তটস্থ হইয়াছিল, এবং জীবন সুদৃশ্য হইয়াছিল।

বৃদ্ধ সীতারাম অনেকক্ষণ একভাবেই ছিলেন, হয়ত নববধূর সহিত বাক্যালাপ করিবার তাঁহার বাসনা হইয়াছিল; তাহার জন্য শক্তি সঞ্চয় করিতেছিলেন। তিনি কি যেন বলিলেন...।

যশোবতী সত্যই তাঁহাকে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, অভিমান তাঁহার হয় নাই। অন্তত তাঁহার মুখে একটি সপ্রতিভ লক্ষণ দেখা গিয়াছিল।

যশোবতীকে সীতারাম দেখিতে লাগিলেন। নববধূর দৃষ্টি এখন অন্যত্রে নিবদ্ধ ছিল। যেখানে মাদুরে বিশ্রামরত সকলের সম্মুখে উবু হইয়া বসিয়া, বৈজু গান শুনাইতেছিল। রামপ্রসাদী শেষ হইল। যাহাদের এখনও তেজ ছিল তারা 'আর একটা, আর একটা', বলিয়া অনুরোধ করিল; তাহার প্রত্যুত্তরে সে কহিল, "বাবু মশায়, আমি এবার নিজ মন মত একটা গান বলব...।"

বৈজুর বাক্যে কৃষ্ণপ্রাণ ইত্যাদি যাঁহারা জাগিয়াছিলেন তাঁহারা হরিধ্বনি করত কহিলেন, "তাই হোক।" বৈজু তাহার জোয়ারী গলায় হস্তের ঝাঁপা বাজাইয়া ধরিল, "বলি শোন—"

বিবাহ এক রক্তের নেশা,
বর বউ যেন বাঘের মত...”

গীতের বাণী পোড়া কাগজের মত গঙ্গার হাওয়ায় ফর্ ফর্ করিয়া উড়িয়া যাইতেছিল, তথাপি শ্রোতাদের কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল; বৈজু এখনও তাহার হাঁটুর প্রায় কাছেই চাপড় মারিয়া হৈ হৈ করিয়া গাহে।

ব্রাহ্মণেরা এ উহার দিকে চাহিয়া তারস্বরে হো হো শব্দ করিয়া উঠিয়া তাহার পরেই কিয়দংশ সমস্বরেই কহিলেন, “মর হারামজাদা...বেল্লিক...শালা...চাঁড়াল...”। কৃষ্ণপ্রাণ আপনার খড়ম হাতে লইয়াছিলেন।

বৈজুনাথের কোন কিছুই হয় নাই। সে উঠিয়া নেশা বিবশ পা ছড়াইয়া আবার চলিতে আরম্ভ করিল, গান তাহার কণ্ঠে ছিল।

“বিবাহ এক রক্তের নেশা—
বর বউ যেন বাঘের মত,
বাঘ বাঘিনী রক্ত চোষা ॥”

যশোবতী অত্যধিক বিস্ময় সহকারে এই গান শুনিতেছিলেন। বৈজুর দেহ দুলিতেছে। সহসা কৃষ্ণপ্রাণ ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, “দেখ ব্যাটা চাঁড়াল, আমি তোর গান ঘুচিয়ে দেবো...”

“হেরেরেরে—কি অল্ল্যায় হলো...” বলিয়া বৈজু ঈষৎ টলিয়াছিল।

“ন্যায় অন্যায় তুই কি করে বুঝবি বজ্জাত হারামজাদা...” নিজের ব্যাঘ্রস্বর শুনিয়া কৃষ্ণপ্রাণ নিজেই চমকাইয়া শঙ্কিত এবং নিজের হস্তধৃত খড়মের দিকে চাহিয়া কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন।

“তা বটে তা বটে, ন্যায় অন্যায় বুঝবই যদি তবে চাঁড়ালির পেটে জন্মাব কেনে...”

“ফের যদি গাইবি হারামজাদা তো...” তদনন্তর কণ্ঠস্বর মিহি করিয়া কৃষ্ণপ্রাণ কহিলেন, “বিয়ের ক’নে বসে—”

“তা বাসরঘরে গোঁপ চোমরান গান হবে না ঠাকুর, এ কি হবিষ্যি গান হবে...”

“তুই মাতাল, তা না হলে...”

বৈজু ঐ স্থান হইতে বিবাহের বাসর দেখিল। কি দেখিল সেই জানে, হয়ত বা নানা আসনে চন্দ্রালোকই দেখিয়া থাকিবে। সে গম্ভীর হইয়া অল্পক্ষণ দাড়ি চুলকাইল। তাহার পর সজল নেত্রে কহিল, “চাঁড়ালের ঘরে জন্মেছি ঠাকুর, ন্যায় অন্যায় জানিনা। তবু তুমি শেখালে গো” বলিয়া প্রণাম করিল। কৃষ্ণপ্রাণ তাহাকে প্রণত রাখিয়া ফিরিয়ে গেলেন।

প্রভুভক্ত কুকুর যেমন প্রভুর দিকে মুখ তুলে, তেমনই সীতারাম নববধূর দিকে মুখ তুলিয়া কিছু বলিতে চাহিলেন। বৈজুর গানের অসৎ কলিগুলি যশোবতী শুনিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার মনে কোন বিকার উপস্থিত হয় নাই, এ কারণ যে সেখানে পুষ্পের অজ্ঞতা ব্যতীত কিছুই ছিল না।

বৈজুর দিক হইতে মুখ ফিরাইয়াই বৃদ্ধের দিকে দৃষ্টি পড়িল। গাল চোষার অল্প আওয়াজ এখন আগ্রহের সৃষ্টি করিয়াছিল, তিনি স্বীয় মুখখানি তাঁহার প্রায় নিকটেই আনিলেন, কিন্তু চোক্ চোক্ আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই শুনিতে পাইলেন না। কিছুক্ষণ পরে মুখ তুলিতে গিয়া দেখিলেন, আপনার বসন প্রান্ত বৃদ্ধ মুঠা করিয়া ধরিয়া আছেন, অতঃপর ক্ষিপ্রবেগে তাঁহারই হাতের কব্জি ধরিতেই তিনি সবিস্ময়ে দেখিলেন, অঙ্গুলিগুলি একটির পর অন্যটি নামিতেছে উঠিতেছে। ইহাতে, ইহাতেই মনে হয় যশোবতীর চক্ষুর্দ্বয় কিঞ্চিৎ উদ্গ্রীব হইয়াছিল।

যদিচ আপাত দৃষ্টিতে এহেন অঙ্গুলি আন্দোলন সত্যই ত্রাসের সঞ্চার করে, তবু তাহারই মধ্যে প্রেমিকের হৃদয়ের উষ্ণতার, গভীরতার, সুকুমার ব্যঞ্জনা ছিল; সুকুমারস্বভাবা যশোবতী হাতটি ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলেন, ইদানীং অনুভব করিলেন, বৃদ্ধের এই বিশীর্ণ হাতখানির মধ্যে বলবতী ধাবমান ইচ্ছা প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে এবং তাঁহার সমস্ত হাতখানিকে উর্দ্ধে লইয়া যাইতে চাহিতেছে। যশোবতীর সাহায্যে প্রবীণ হাতখানি শক্তিলাভ করিল, যেন আপনা হইতে উঠিয়া তাঁহার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়াই সেখানে স্থির হইয়া রহিল।

এই দেহের অথৈ সৌন্দর্য্য যেমন বা সন্ন্যাস লইয়াছে। স্তম্ভিত বৃদ্ধাকে মুহূর্ত্তের মধ্যেই চরিত্রবান

করিল, সীতারাম আমিত্ব-অহঙ্কার বর্জ্জিত, কিন্তু মানুষের দন্তপাতি অদৃশ্য হইলেও, জিহ্বা অক্ষয় হইয়া আপন স্থানে বসিয়া থাকে, রস উপলব্ধি করে। উদ্ভিন্নযৌবনার হেমদেহ স্পর্শে বৃদ্ধের গায়ে যেন মাংস লাগিল। সীতারাম কি যেন বলিলেন। যশোবতী তাহা সঠিক বুঝিয়ে না পারিয়া নূতন করিয়া ঘোমটা রচনা করিবার জন্য দুই হাতে বসন প্রান্ত উত্তোলন করা মাত্রই প্রাচীন হাতখানি তাহার বক্ষে আসিয়া দারুভূত হয়, শতাব্দীক্লিষ্ট বল্কলসদৃশ অঙ্গটি দেখিয়া যশোবতী এককালে অন্ধকার-শঙ্কিত, উৎখাত হইলেন। তাঁহার দীর্ঘশ্বাসের আঘাতে বৃদ্ধের হাতখানি ক্রমে যেমন বা নামিয়া গেল।

"বউ বউ" মর্ম্মান্তিক শব্দ হইল। যশোবতী মুখখানি নিকটে আনিলেন, এখন বৃদ্ধের চোখদুটি আয়ত হইল, কহিলেন, "ঘোমটা...না না।"

যশোবতী ঘোমটা খুলিয়া, পরমুহূর্ত্তে যথাস্থানে রাখিয়া সকল দিক নিরীক্ষণ করত অতি সন্তর্পণে ঘোমটা উন্মোচন করিলেন।

পককেশ-চন্দ্রালোকে যশোবতী চির-রহস্যের সম্মুখে আসিয়া নিঃসঙ্গ; বৃদ্ধের গূঢ় অন্ধকারকে সুযোগ বলিয়াই মনে হইল। আবেগে কহিলেন, "বাঁচব—বাঁচব" ফলে মুখের কষ বহিয়া লালা নিঃসৃত হয়।

নিঃসঙ্গতা-আহত যশোবতী কেবলমাত্র মস্তক আন্দোলিত করিলেন।

"তুমি...এসেছ" ইহার পর কম্পিত অঙ্গুলি দ্বারা আপনাকে নির্দ্দেশ করিয়া নিশ্চয় বলিয়াছিলেন, "বাঁচব"; সীতারামের কথা স্পষ্ট না হইলেও তাঁহার আকৃতিতেই বক্তব্যকে প্রকাশ করিতেছিল। অনন্তর বৃদ্ধ একটি দম লইয়া, পদাঘাত করিবার অমানুষিক ঔদ্ধত্যের সহিত কহিলেন, "বাঁচব" এবং যুগপৎ মহা আক্রোশে আকাশের দিকে—এখন যে আকাশ চন্দ্রাহত তারা ভরা—তাহার দিকে চাহিলেন।

আকাশে, ঊর্দ্ধে, ক্রমাগতই হংসবলাকাযূথ, যাহাদের ছায়া ইতঃমধ্যের শূন্যতায় নিখোঁজ সুতরাং তাহারা অশরীরী; তথাপি, কভু নিম্নের স্রোতের শব্দকে নিষ্ফল করত তাহাদের মুখনিঃসৃত ধ্বনি শোনা যায়; যশোবতীকে এ শব্দনিচয় দিকভ্রান্ত করে—কেন না তিনিও দেখিতেছিলেন, একদা মনে হইল এ-শব্দ বৃদ্ধের মুখপ্রসূত শব্দ বৈ অন্য নহে; সেই হেতু বৃদ্ধের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। সেখানে এখনও বৃদ্ধের চোখে শিশির তত্ত্ব। আরবার তিনি, যশোবতী, উড্ডীয়মান হংসশ্রেণী দেখিলেন।

অকস্মাৎ দেখা গেল, এ-উড্ডীয়মান হংসশ্রেণী কি যেমন বা পরিত্যাগ করিল, ফলে এ-দিঙমণ্ডল চকিতেই নিষ্ঠুর কুটিল, আকাশপথে কি যেন পালক যেমত, ভাসিয়া ভাসিয়া নামে। ক্রমে ইহা স্পষ্ট। একটি ঊর্ণা তথা ব্যাধের জাল খসিয়া আসিতেছে যাহা কিছুকাল পূর্ব্বে নিশ্চয়ই হংসশ্রেণীকে রুদ্ধ করিয়াছিল।...অনূঢ়া, রম্য, প্রাণময়ী অদ্যও—এ হংসশ্রেণী; জালটি আকাশে যদিও একাকী, তথাপি সৌখীন, বাবু, নয়নাভিরাম! এ দৃশ্যে সীতারাম পশুশাবকের মতই কুঁ-কুঁ শব্দ করিতেছিলেন, এখন শিহরিয়া প্রাণান্ত মুখব্যাদান করিয়া তড়িৎ বেগে একটি হাত আপনার চোখের উপর রাখিতে চেষ্টা করিলেন, কেননা জালের ছায়া তাঁহার দেহে পড়িয়াছিল।

যশোবতী এতক্ষণ বিন্দু মাত্র, যেহেতু এই নৈশ সৌন্দর্য্য, তাঁহার বালিকা মনে ভয়াবহ রূপে দেখা দেয়, নির্ব্বাসিত লহমার ব্যথায় তাঁহার জানকীসদৃশ শরীর জর্জ্জরিত, এবং রোমহর্ষে যে অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন—তাহার বলে পার্শ্বস্থিত নিপীড়িত বৃদ্ধকে দেখিয়াই বস্ত্রপ্রান্ত দ্বারা তাঁহার, বৃদ্ধের, স্বামীর মুখমণ্ডল আবৃত করিলেন।

সীতারামের ক্রন্দনের আপ্লুত স্বর ও মুখ মারুতে বস্ত্রখণ্ড উঠা নামা করিতেছিল। ভৌতিক ভাবে সহসা বস্ত্রপ্রান্ত উড়িয়া গেল, একটি কণ্ঠস্বর হাওয়ায় উড়িল, "ভয় ভয়।"

যশোবতী বুদ্ধিভ্রংশ হইলেন না, বৃদ্ধের কপালের দুইপার্শ্বে হাত রাখিয়া আকাশ ঢাকিলেন। কামযোগ দূরত্বের মধ্যে দুজনে মুখোমুখী। সহসা যশোবতী কেমন যেন পাগলিনী হইলেন, নোলক কম্পিত, নথ রাশ মানিতেছে না।...সীতারাম বলিলেন, "ভয় ভয়।" দিশাহারা যশোবতী মুখখানি আরও নীচু করিলেন, অঙ্গের মাংসল খেমটা সাহস বৃদ্ধের চোখে মুখে বর্ষিত হইল।

চকিতা হরিণীর ন্যায় তাকাইলেন, তাঁহার মুখে লালার চিহ্ন! এ সময় দূরাগত হাস্যধ্বনি। গঙ্গার নিকটে বসিয়া একটি পা ছড়ান অন্ধকার সেই উলঙ্গ গীতখানি ধরিয়াছে।

যশোবতী যেমন বা অপমানিত হইয়াছিলেন।

তথাপি উঠিয়া চারিটি খুঁটিতে চাঁদোয়া বাঁধিয়া আসিয়া বৃদ্ধের পাশেই বসিলেন। সীতারাম এই

চাঁদোয়ার জন্য কিছুটা সোয়াস্তি বোধ করিয়াছিলেন, কেননা মৎস্য-পিত্ত আকাশ নাই, কেবলমাত্র চাঁদোয়ার কতক ছিদ্র বহিয়া আলোক সম্পাত হইয়াছে। ভয় যেন অন্য কোথাও স্তন্যপানরত।

সীতারাম ডাকিলেন, "বউ"...তাহার অনেকক্ষণ পর আবার শোনা গেল, "আমি আবার—আমার জমি—" আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এইবার স্পষ্টই শোনা গেল, "বউ তোমাকে নিয়ে ঘর ঘর" এই কথা তিনি এক নিঃশ্বাসে বলিয়াছিলেন। ছেলেমানুষের মত তাঁহার বাচন ভঙ্গি, ছেলেমানুষের মত আশা। যশোবতী সম্মুখের স্রোত দেখিতে দেখিতে এই বাক্যগুলি শুনিয়াছিলেন।

"বউ, গান বল—"

যশোবতীর চক্ষুর্দ্বয় বিস্ময়ে ভরিয়া গেল, জীবনে এই বোধহয় প্রথম হাসি আসিল, পাছে অন্য কোন লোক তাঁহার হাসি শুনিতে পায়, সেই হেতু মুখে সত্বর বস্ত্রপ্রদান করিয়াছিলেন। হাস্য সম্বরণ যখন হইল না তখন স্বামীর দেহের পাশেই মুখ গুঁজিয়া কুকুর-কুণ্ডলী থাকিয়া হাসিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ সীতারাম ইহাতে উৎসাহিত বোধ করিয়া গীত ধরিলেন, শুদ্ধবঙ্গভাষা অপহৃত হইয়াছে, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা দিয়া শব্দ উৎসারিত হইতে লাগিল। 'রেনিটি'র ঘরের কীর্ত্তন 'কি হে বাঁশী বাজায়, বধূ' এ গীতের অন্যকলি অস্পষ্ট, ক্রমাগত বধূ'ই শুনা গেল। আর যে যখন তিনি খাদ হইতে (!) স্বর আনিবার চেষ্টা করিতেছিলেন তখন একনিষ্ঠ গাম্ভীর্য্য মুখ চোখে ঠিকরাইয়া প্রকাশ পাইল। বৃদ্ধ থামিয়া যুগপৎ হাসিতে ও নিঃশ্বাস লইতে লাগিলেন। যশোবতী অন্যদিকে মুখ করিয়া থাকা সত্ত্বেও যেন স্বামীর দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে হাসিতেছিলেন।

সীতারাম উত্তেজনায় অস্থির, এইবার 'কালীয়দমন' যাত্রার একটি টপ্পা ধরিলেন। "বলি পরাণ বাঁশী ফেলে দাও, আমাকে মজিও না প্রাণ তোমাতে মজাও"—এই মধ্যরাত্রে গঙ্গাযাত্রী বৃদ্ধের বুকে পীতধড়া বনমালা পরিহিত কালো ছোঁড়ার চাপল্য জোয়ার হানিল। আশ্চর্য্য হাতের ফেরতাই দেখা দিল, তেহাই পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে হিক্কা উঠিল। যশোবতী তখনও হাসিতেছিলেন।

তিনি এই ভয়ঙ্কর পরিবর্ত্তনের কথা কোনক্রমেই জানিতে পারেন নাই। আপনার কোমরের কষি আলগা হইল, তিনি উঠিয়া স্বামীর এই বিকট মূর্তির দিকে চাহিয়া যেন ফুলিয়া উঠিলেন। বস্ত্রের কষি হইতে হস্তদ্বয় মুক্ত করিয়া তাঁহার বুকে হাত বুলাইতে লাগিলেন, কি করা কর্ত্তব্য তাহা তিনি জানিতেন না।

অতি প্রত্যুষে কুশণ্ডিকা হইয়া গেল। ঢাকি বাহক সকলেই চলিয়া গেল। বৃদ্ধের পৃষ্ঠের রক্তিম নারায়ণ-চিহ্ন তখনও নববধূর চোখে ভাসিতেছিল, কখন স্রোত কভুবা মৎস্যের লাফান তাঁহার দৃষ্টিপথে পড়িয়াছিল। কোন কিছুকে অর্থ করিবার মত তাঁহার মন ছিল না।

লক্ষ্মীনারায়ণ গঙ্গার নিকটে বসিয়া যশোবতীকে উপদেশ দিতেছিলেন। পুরাকালের রমণীগণের নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের মহিমা কীর্ত্তন হইতেছিল। যশোবতী একদৃষ্টে পিতার কথা শুনিতেছিলেন, এই চাহনির মধ্যে এতেক সরলতা ছিল, যে...লক্ষ্মীনারায়ণের মনে হইতেছিল, যশোবতী তাঁহার কথা ঠিক বিশ্বাস করিতেছেন না, ফলে তিনি ঈষৎ নির্ব্বোধ বনিয়া ছোট ছোট অঙ্গ ভঙ্গিমায় তাহা ঢাকিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

"বাবা" যশোবতী ডাকিলেন।

গঙ্গার হাওয়া এবং জলোচ্ছ্বাসে যে রৌদ্র, তাহা উচ্চারিত বাক্যটিকে লিখিত করিয়া দেয়; এ কারণে যে যশোবতীর 'বাবা' কথাটি বলার ভঙ্গিতে যে নিঃসঙ্গতা ছিল, যে নিঃসঙ্গতায় বাদল ছিল, যে বাদলে আদিম উষ্ণতার হেত্বাভাস—তাহা তাঁহাকে, লক্ষ্মীনারায়ণকে, বিবৃত করিয়াছিল।

লক্ষ্মীনারায়ণের মনের কোথাও যেন সে কথা, শিশুসুলভ হাতের নরম স্পর্শ করিয়াছিল, ব্রাহ্মণদেহে যোগসাধনার ধারা বর্ত্তমান, মূঢ় জনের মত অল্পেই হা-হা করিয়া কাতর হইয়া উঠে না। কারণ মনে পাণ্ডিত্যের ধারা বর্ত্তমান, তবু প্রবহমান গঙ্গার দিক হইতে সুযোগ বুঝিয়া দৃষ্টি ফিরাইলেন। কেননা

সেখানে, এ গঙ্গায় উপত্যকার অন্তস্থিত পার্ব্বত্য ছায়ায় যে মাতৃত্ব উৎপন্ন উৎসাহিত উৎসারিত বর্দ্ধিত হয়, তাহারই দ্বাপরকালিক আভাস ছিল!

ইদানীং সে গঙ্গা—শিবের জটা বহিয়া যাহা নামিয়াছে, যাহাতে কোন গল্প নাই—তাহা, পিতা ও কন্যার ইতঃমধ্যে সঞ্চারিত। যশোবতী স্বচক্ষে সেই পবিত্র স্রোতোধারা দেখিয়াছিলেন; এখন মুগ্ধ, তিনি মনে মনে আকাশ লইয়া খেলিতে মুখর বাঙ্ময়; যে অমরতা লইয়া ইহজগত, তাহার আলো তাহার পুষ্পরাশি নয়ছয় করিয়াছে, কাব্যে যাহা ছন্দ-মিলের ধ্বনি মাত্র, সুশীল ও সুবোধ মানুষের মৃত্যুতে যাহা সান্ত্বনা বচন, তাহা, এখন, এই খেলার বস্তু এবং যাহা যশোবতী অবোধ পৃথিবী হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি অন্যমনস্কা অথবা সংস্কারবশতভাবে ডাকিলেন, "বাবা।"

এই সম্বোধনের মধ্যে ত্রিসন্ধ্যা এক হইয়াছিল! লক্ষ্মীনারায়ণ অন্ধকার হইয়া নিশ্চিহ্ন, ক্রমাগত গ্রহনক্ষত্রের স্বভাব সুলভ আবেগসঞ্চার তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া দৃঢ় হইয়া উঠিল, যাহাকে নিগ্রহ করিতে তিনি শক্তিহীন। তাঁহার মন যুক্তির জগতের জন্য চঞ্চল; সেখানে শস্যের জীর্ণতা মনকে সহজ করিলেও মন বীজকে সাদরে রাখে, জীর্ণতাকে সঙ্গোপনে লালন করে। লক্ষ্মীনারায়ণ অগোচরে আপনার নাম, নিজেই, ধরিয়া ডাকিয়া পরে কহিলেন, "মা গো, সব কপাল! তুমি সীতাকে জান মা, রাবণবধের পরে রাম তাঁকে ত্যাগ করেন সীতা সহ্য করলেন, লক্ষ্মণ চিতা সাজালেন...মে হৃদয়ং নিত্য নাপসর্পতি রাঘবাৎ, কোন ক্রমেই তাঁর মন রাঘব থেকে ছেড়ে যায়নি। মা আমার কত ব্যথা সহ্য করেছিলেন, তবু পতিভক্তি..." লক্ষ্মীনারায়ণের চোখে জল আসিল। নিশ্চয়ই পৈতা দিয়া চোখ মুছিলেন।

যশোবতীও পিতার চক্ষু মুছাইয়া কহিলেন, "তুমি তুমি..." আর কিছু বলিতে পারিলেন না। অথচ নির্ভীক গম্ভীর সুন্দরী মনোরমা যশোবতী বলিতে চাহিয়াছিলেন, 'পিতা তুমি আমাকে সনাথ করিয়াছ—ইহা হইতে আর কি রমণীর প্রেয় হইতে পারে; তিনি উর্দ্ধে আছেন ইহা আমি জানিতাম, পরে অন্তর্যামী জানিয়াছিলাম, এখন...' বলিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন—যাহা ডালিমের বেদনাময় যৌবনের দ্বারা সম্ভব।—কারণ এ সময় শোনা গেল, চণ্ডাল হাঁকিতেছে, "ঠাকুর এস, এস হে। এখুনি আবার যাত্রী আসবে...গো।"

বৈজুনাথের ডাকে লক্ষ্মীনারায়ণ যেন বা মুক্ত আকাশ দেখিলেন, কন্যাকে তদবস্থায় রাখিয়া কয়েক পদ আসিয়া মনে হইল যেন আপন গৃহদ্বারে পৌছিয়াছেন। নিশ্চিন্তভাবে খানিক দণ্ডায়মান থাকিয়া সহসা ঘুরিয়া দেখিলেন, যশোবতী সীতা[illegible] হইতে এখন দূরে।

লক্ষ্মীনারায়ণ কন্যাকে ডাকিলেন। যশোবতী বলিলেন, "বাবা আমি এখানে..."

"ছিঃ ছিঃ অমন ক'র না, লোকে কি বলবে? তোমার দুই ছেলে রয়েছে...তাছাড়া যেটুকু সময় পাও স্বামীসেবা কর মা...।"

যশোবতী স্বামীর নিকটে গিয়া বসিলেন।

বৈজুনাথ এ জমিকে প্রণাম করিয়া চিতার মাপ লইতে লাগিল। মাটির উপর হামাগুড়ি দিয়া হাত মাপিতে মাপিতে অনেক দূর পর্য্যন্ত গেল; খুঁটি বসান হইল, সে গান গাহিয়া উঠিল, সে গান, "যে দেশে রজনী নেই মা, সেই দেশের এক লোক পেয়েছি"। দাঁড়াইয়া হাঁটু ঝাড়িয়া খুব বিজ্ঞের মত কহিল, "বেশ হয়েছে, লাও এবার নিকিয়ে ষটকোণে বীজমন্ত্র লেখ...জয় গুরু।"

"মর হারামজাদা। ওরে চাঁড়াল, চিতাটা যে একটু বড় হল, তোর কি মনে হয়?"

"চিতা বড় হবে কেনে...উত্তর দক্ষিণে গঙ্গা, একজন জ্যান্ত...শালা হাওয়া ভারী খচ্চড় জাত, জ্যান্তই থেকে যাবে. .তখন হা হুতাশ...করবে কে..." এই বলিয়া পুনর্ব্বার হাঁটুতে হাত দিল।

"লে শালার আবার মায়া ফুকারি..." অনন্তহরি ছ্যাঁচড়া কণ্ঠে বলিলেন।

বৈজুনাথ রুখিয়া উত্তর করিল, "না শালা আমরা কাঁদি না, মুতি—চোখে ত জল নেই।"

"আঃ আস্তে আস্তে, আমার মেয়ে রয়েছে বসে...তোর একটা..."

"ওহো এখনও ত তার নাড়ী আছে ঠাকুর..."

"হারামজাদা তোর জ্বালায় পৃথিবীতে কি চন্দ্র সূর্য্য উঠবে না...মারের চোটে..."

"বাবু তোমাদের থেকে উঁচু জাত নেই...যারা...আচ্ছা আচ্ছা ঠাকুর, বুড়ো আর ক'নে বউ যদি..." বলিয়াই বৈজুনাথ যশোবতীর দিকে তাকাইল। ঘাসে মুখ রাখিয়া হরিণী যেমত চাহিয়া থাকে, সেইরূপ দৃষ্টি দেখিতে পাইয়া সে থ' হইয়া গেল। সে বলিতে চাহিল, 'আচ্ছা সারা দুনিয়ার লোক মিলে যদি হা-হুতাশ করে, আকাশে কি তাহলে টেলিগ্রাফ হবে?' পরক্ষণেই অতি সন্তর্পণে মুখ ফিরাইল। স্বগত উক্তিতে ওষ্ঠ কম্পিত, অস্পষ্ট পাখোয়াজের বোল শুনা যাইতেছে।

ব্রাহ্মণেরা সকলেই প্রশ্ন করিল, "কি রে..."

"না, ভাবছি বাবু..."

"ভাবনার কি আছে..." কৃষ্ণপ্রাণ কহিলেন।

"বাবুমশায় সুখে পুড়তে পারে সেটাও ত দেখতে হবে...। আমার মতে চিতা আরও বড় দরকার..."

মুখভঙ্গী করিয়া অনন্তহরি কহিলেন, "তুই শালা কাঠ দিবি? শালা আমার খাঞ্জা খাঁ। এত কাঠ পাবে কোথায়..."

"বাড়ীর খরচার মত কাঠ লোকে জমা রেখেছে—তারা দেবে কেন?" কৃষ্ণপ্রাণ কহিলেন।

"ওই ত বলে কে..." লক্ষ্মীনারায়ণ শুধুমাত্র সায় দিলেন।

"লে লে চিতা ছোট কর..."

"ভাবছ কেনে গো, কত কর্পূর আসবে, মাখন ছুঁড়বে, এইটা সতীদাহ বলে কথা! এ কি তোমার আমার লাস? পুড়ল না পুড়ল কি এসে গেল? মড়ার মুখ থেকে ছাগল পিণ্ডি চাটবেক..."

বলিয়া সে গর্ব্ব অনুভব করিল।

ব্রাহ্মণেরা সকলেই মুখ বিকৃত করিয়াছিলেন। বৈজুনাথ একের পর এক সকলের মুখের দিকে তাকাইয়া নিজের মধ্যে যেন ফিরিয়া গেল। অনন্তর গভীর নিঃশ্বাস ত্যাগ করত কহিল, "কত সোনা পড়বে, ইঃ—সতীদাহ বলে কথা।" বলিয়া সেই ভাবেই দাঁড়াইয়া রহিল, পরক্ষণেই অদূরে দেখিল, সেই সীতা-স্মৃতি নয়নযুগল।

এহেন দৃষ্টি তাহাকে যেন আকর্ষণ করিতেছিল; সে চণ্ডাল বৈজুনাথ, আপনার অজ্ঞাতেই দুই এক পা আগাইয়া গেল। ব্রাহ্মণ সকলেই তাহাকে সন্দেহ করিলেন। সে অন্যমনস্কভাবে ঘুরিয়া দাঁড়াইল, সম্মুখের উচ্চবর্ণের মুখগুলি সে এমত দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিয়াছিল, যাহাতে প্রত্যেকেই তাহার কাছে বীভৎস প্রতীয়মান হয়। ইঁহাদের, ব্রাহ্মণদের, সাধারণ কথাবার্ত্তায় কলহরত খানকীদের আওয়াজ ছিল; সে আপনকার ভারাক্রান্ত মুখখানি উঠাইবার চেষ্টা করিল, আবার প্রয়াস পাইল; একারণে যে, সে অদ্য ফুটন্ত ফুলের বীরত্বের উপর দিয়া বহমান একটি কাকলী শুনিল, এই পাখী হলুদ, অভিমানী বধূদের কথা কহিতে অনুরোধ করে। মনে হইল তা'রা, কাহারা বাতায়নে দাঁড়াইয়া সুদুরতা দেখে।

ইতিমধ্যে কে যেন কহিল—"তাহলে...কি হবে...?"

"আর মাপের দরকার নেই..."

"খেলা করবার জন্য মাপ নেওয়া হচ্ছে..." এই উষ্মাপ্রকাশ করিয়াই তৎক্ষণাৎ লক্ষ্মীনারায়ণ মিষ্টকণ্ঠে কহিলেন, "নে বাবা...কত কাঠ লাগবে বল, সেই অনুপাতে কাঠ যোগাড় করতে হবে ত...!"

চণ্ডালের চোখে জল ছিল না, তবু যেন তাহার মনে হইল তাহার চোখে জল আছে, সে হাত দিয়া চক্ষু মুছিয়া কহিল, "বললাম হে...তুমি গুঁড়ি দশ বার যোগাড় কর, চেলা ক'গাড়ি আর যারা আসবে সবাই কাঠ আনবে বয়ে গো। আগে আমার মনে পড়েনি...তুমি..."

"না না...খুঁটি ছোট কর..."

চণ্ডাল আবার মাপিতে হামাগুড়ি দিতে বসিল, দুই হাত মাপিয়াই সে স্থির; এক অনৈসর্গিক অনুভব বৈজুনাথকে আকাশ বাতাসের সংস্পর্শে আনিয়া দিল, মাটির প্রতি গভীর মনোযোগে একনিষ্ঠ একাগ্রতা সহকারে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, কাহাকে যেন সে দেখিতে পাইয়াছে—শাস্ত্র যাহাকে ভাবময় তত্ত্ব বলে, তাহার সহিত সে অনায়াসে কথা কহিতে পারে। সে অবাক, সে অভাবনীয় স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিল, অনন্তর আপন ধীর কণ্ঠস্বরে তাহাকে গল্প বলিতে সুরু করিল, "রাম নামে অযোধ্যার রাজার পুত্র ছিল..." এসময় দৃশ্যমান মায়া অন্তর্দ্ধান হয়, সে রুষ্ট হইয়া মহা আক্রোশে মাটিতে চপেটাঘাত করিল। নিজের ওষ্ঠদ্বয় কামড়াইতে লাগিল; মনের মধ্যে অগণন কালো সাদা দেখিল, তাহার অর্থ এই হয় যে 'এ মাটি

আমার আমি তার—' এক মুহূর্ত্তের জন্য মুখখানি জন্তুর মত বাঁকা করিয়া দণ্ডায়মান ব্যক্তিদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, আরবার যশোবতীকে দেখিল। ইহার পরে তাহার বিরাট দেহটা উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, সে হাঁটু ঝাড়িতে ঝাড়িতে কহিল, "আমি পারব না...চিতা করতে।"

"সেকি...বেটা মহাপাতক হবি রে।"

পলকের জন্য যশোবতীর দিকে চাহিয়া লইয়া সে কহিল, "আমার খিদে পেয়েছে..."

পুনরায় সে কহিল, "আমার খিদে পেয়েছে।" ইহার অর্থ আধ্যাত্মিক, বৈজ্ঞানিক না ভৌতিক তাহা কেহ নির্ণয় করিতে সময় ক্ষয় করিলেন না।

"কেন চণ্ডাল হয়ে জন্মেছিস জানিস, তুই বেটা জাত বজ্জাত...তোর পাখা উঠেছে..."

বৈজুনাথ কোন উত্তর করিল না। তাহার গতি আসন্ন-প্রসবা গাভীর মতই ভারাক্রান্ত, কখনও বা সে শান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। আবার চলিল, গঙ্গার জল মাথায় দিল।

সম্ভবত, রাত্র দিন যদি সত্য হয়, তাহা হইলে, সালঙ্কারা যশোবতী ইহা দেখিয়াছিলেন। উহা বৈশাখের শূন্য প্রান্তরের দ্বিপ্রহরের নভ-আগত নূতন ধূলার সূর্য্যমুখী ঘূর্ণি যেমত স্পন্দিত একটি দেহ বৈভব—যাহার অন্তরীক্ষে নরকপাল এবং অন্য অন্য অস্থিনিচয় এবং বহির্দেশে, পাহাড়ী গ্রামের নিরবচ্ছিন্ন অপরাহ্ন! অবশ্য যুগপৎ যশোবতীর সমস্ত দেহমন বৈজু-আলোড়িত গঙ্গা হইতে ভগবানের পূর্ব্বশ্রুত কণ্ঠস্বর শুনিল।

অনন্তর বৈজুনাথ গঙ্গা ত্যাগ করিয়া বিমূঢ়ভাবে সকলকে দেখিয়া বিড়ালের মতই চক্ষুর্দ্বয় সঙ্কীর্ণ করে এবং পরক্ষণেই এক দৌড়ে আপনার আড়ায় গিয়া রক্ষিত ঝাঁপা হইতে তরল জ্ঞানহীনতা পান করিল।

সমবেত ব্রাহ্মণগণ বৈজুনাথের ব্যবহারে যারপরনাই আশ্চর্য্যান্বিত; কিছুকাল অতিবাহিত হইল, অনন্তহরি কহিলেন, "ওর জন্যে ভেব না, বেটা নেশাখোর... কাঠ এসে পড়লেই সব ঠিক হবে...তুমি আর দাঁড়িও না খুড়ো।"

কৃষ্ণপ্রাণ তাঁহার কথায় সায় দেওয়াতে লক্ষ্মীনারায়ণ কালবিলম্ব আর না করিয়া আপন কন্যার কাছে আসিলেন, যশোবতী তখনও সেইভাবে বসিয়া আছেন। পিতা কন্যাকে দেখিয়া চমকাইয়া উঠিলেন, কেননা যশোবতীকে অপরিমিতা কৃষ্ণবর্ণা দেখাইতেছিল; তথাপি তিনি কোনমতে অসংলগ্নভাবে অনেক কথাই কহিলেন, "কি মা, বেশ ভাল লাগছে ত...যাক সব ভালয় ভালয় হল। মা, ভগবানকে ডাক...মন বসছে ত মা...তিনি বল দেবেন, আমি...আমি এবার যাব।" পিতা যেন আদিমতা।

"বাবা..."

"কোন ভয় নেই, তোমার পুণ্যে মাগো—আমাদের স্বগ্‌গ বাস হবে, মৃত্যু মরণ যদি...কেউ আগে, কেউ পরে; আবার এমনও হতে পারে" বলিয়া জিব্ কাটিয়া কহিলেন, "সীতারাম পুনর্জ্জীবন লাভ করতে পারে...তোমার কপাল জোর" বলিয়াই নিকটে অপেক্ষমাণ ব্রাহ্মণদের সমর্থনের আশায় তাকাইলেন।

তাঁহারা, ব্রাহ্মণেরা, ইহাতে পুঁথিগত মস্তক আন্দোলন করেন। ইহার পর তাঁহাদের মৃত্যু সম্পর্কে অসংখ্য যোগের প্রেরণা, যুবতীজনের বক্ষের বসন্তকে ভিখারী মায়াবাদে সম্মোহিত করিল; কিন্তু একথা প্রকাশ থাক, কিছু পূর্ব্বাহ্নে—যখন লক্ষ্মীনারায়ণ তাঁহাকে কৃষ্ণবর্ণা দেখেন, তখন তাঁহার কন্যার চতুর্থ অবস্থা আগত; ফলে, যশোবতীর কেমন এক বিশ্বাস হইয়াছিল যে তিনি নিজেই সাধক রামপ্রসাদকে বেড়া বাঁধিতে সাহায্য করিয়া থাকিবেন। এবং একারণে এখনও সর্ব্ব দেহে বিদ্যুৎ খেলিতেছিল। তিনি আপনার সেই অন্তরঙ্গতা লইয়া ইঁহাদের স্নেহ-বচন শুনিতেছিলেন, এমত সময়ে তাঁহাদের বাক্যে সতীমাহাত্ম্য গর্জ্জন করিয়া উঠিল—কৃষ্ণপ্রাণ যথাযথ অলঙ্কার দিয়াছিলেন।

যশোবতী কর্ত্তব্যবশে একদা স্বামীর প্রতি অবলোকন করিয়া ভাবিলেন, জীবন যৌবন দিয়া অমোঘকালের সহিত যুদ্ধ আর কতকাল। ঝটিতি তাঁহার সম্মুখে উদ্ভাসিত হইল জগজ্জন-চিতচোর নারায়ণ, শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম, তাঁহার মুকুটের ময়ূর-পুচ্ছে ইহলৌকিক যোনি-চিহ্ন!

যশোবতীর দৃষ্টিপথে, মানস চক্ষে, কল্পনায়, সতীদাহ অনুষ্ঠান ভাসিয়া উঠিল; অনেক সতীদাহ

দেখিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার পক্ষে এ কল্পনা কষ্টসাধ্যের নয়। দেখিলেন, অসংলগ্ন অনেক রূপ কর্ম্ম ভাসিয়া উঠিল, কখন আপনার প্রায়শ্চিত্ত পিণ্ডদান কখন বা আপনার তর্পণাদি উদক ক্রিয়ার নিমিত্ত, গঙ্গা অভিমুখে ধীর মন্থর গতিতে তিনি গমনশীলা, এ গতি অতীব সুদারুণ। প্রতি পদক্ষেপে অতীত পদদলিত হইতেছে, সম্মুখে জাগ্রত অবস্থামাত্র। তিনি যেমত বা নীড়েকলম্পট শ্যেনপক্ষীর ন্যায়, ক্রমাগতই ধাবমান। এখন ত্রিতাপহারিণী গঙ্গায় তাঁহার সুন্দর তড়িৎ-সম্ভবা তপ্ত কাঞ্চনবর্ণ দেহের অধোভাগ নিমজ্জিত, সুখস্পর্শ হস্তের অঙ্গুলিতে কুশ অঙ্গুরীয় ইদানীং কিয়ৎ পরিমাণে আপনাকে ভেদজ্ঞানে রাখিয়াছে, দ্বিবিধবোধের মধ্যে তাঁহার চেতনা অলস। একদিক আয়ুষ্মান্—অন্যপক্ষে রথের শব্দ, শূন্যে পক্ষীরা উড্ডীয়মান।

সহসা বায়ু স্তব্ধ, আলোকরশ্মি বস্তুরূপ ধারণ করত ধ্বংসপ্রাপ্ত, দুঃখ অস্ফুট আঃ ধ্বনি সহকারে লুপ্ত হইল। আতপ-তপ্ত পদ্মের ন্যায়, পরিক্লিষ্ট উৎপলের ন্যায় ধূলামলিন স্বর্ণের ন্যায় যশোবতী, মুখমণ্ডল তুলিয়া দৃষ্টি নিক্ষেপ করত চাহিলেন, পারিপার্শ্বিক দিকসমূহে শূন্যতা মেঘসন্নিভ; কাব্যঘন কিছুকাল পূর্ব্বের আপনার গাত্রহর্ষে লোক চরাচর যে আবেগে স্পন্দিত হইয়াছিল, তাহারই ক্ষীণ, সূক্ষ্ম, ম্লান, ধীর, অস্পষ্ট, অল্পকম্পন তরঙ্গস্তর এখানে পরিব্যাপ্ত। পিতৃলোকগত যশোবতী! আপনাকে আহ্বান করিতে গিয়া স্বপ্নহীন; তাঁহার ওষ্ঠদ্বয় কম্পিত হইল—সঙ্গে সঙ্গে বনান্তরাল চমকিত সবুজতা ফুঁসিয়া উঠল, অন্তঃসত্ত্বা সর্পের গর্ভপাত হইল। শ্রাবণমেঘের কিশোর বজ্র সকল দিঙ্মণ্ডলে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতে লাগিল।

যশোবতী নির্ব্বিকার, গঙ্গার শৈত্য আর নাই, কুশ অঙ্গুরীয় অজগলস্তন; গম্ভীরকণ্ঠে কহিলেন, "তুমি পিতৃলোকে গমন করিয়াছে, মদ্দত্ত সুনির্ম্মল স্বচ্ছ জল গ্রহণ কর", বলিতে 'তুমি' শব্দ উচ্চারিত হইল না, বলিলেন, "আমি পিতৃলোক গমন করিয়াছি মদ্দত্ত সুনির্ম্মল জল গ্রহণ করি..." এসময় তাঁহার স্বরভঙ্গ, জিহ্বা কণ্ঠগত শুষ্ক হইয়াছিল, স্তন্যপানে সুতৃপ্ত শিশুর ন্যায় তাঁহার কণ্ঠস্বর বিশ্বসংসারে আলোড়িত হয়। ক্রমে আপনার মুখগহ্বরে সকল কিছু দান করিতে গিয়া হতচেতন হইয়া গঙ্গায় পতিত হইলেন। সকলে তাঁহাকে কোনরূপে গঙ্গা হইতে উদ্ধার করিয়া এখানে আনিল। জ্ঞানের পর তাঁহার ওষ্ঠপ্রান্তে মৃদু হাস্য ছিল।

চতুর্দ্দোলার আসনে যজ্ঞবাট করা হইয়াছে, চারিভিতে ছোঁড়া কদলীবৃক্ষ লাল সূতা দিয়া গণ্ডীবদ্ধ, উপরে মালাকার মেড় ঝুলাইতে ব্যস্ত, প্রতিটি মেড়ে দশমহাবিদ্যার এক এক রূপ আলেখ্য, শেষ কয়েকটি মালাকরের ছেলেরা আঁকিতেছে, তাহাদের বধূরা ফুলমালা গাঁথে, ধান্য কঙ্কন, খৈয়ের সাত নহর তৈয়ারী হয়। দিকে দিকে হরিধ্বনি, কাঁসর ঘণ্টা ঢাক বাজিতেছে, পক্ষীরা ভয়ার্ত্ত পলায়মান, গাছে গাছে 'চালকা' কাপড়ের নিশান উড়িতেছে। কীর্ত্তন হয়, কোথাও খাঞ্চে করিয়া সামলা মাথায় একজনা ঢপ গাহিতেছে, তাহার সামলার চুমকী পুঁতি আবেগে চঞ্চল। সিন্দূর বিক্রেতা' গেরী মাটিতে লা মিশাইয়া ভাটি বসাইয়াছে; নূরীরা রুলী গড়ে, তাঁতিরা এবং কাপালিরা সূতা কাটিয়া আলতায় রঙ করিতেছে, ছুতার আপন মনে তুলসীমালা গাঁথিতে ব্যস্ত; বাটাদার কড়ির পাহাড় করিয়াছে; লোয়াদার বাতাসাওয়ালারা একদিকে বাতাসা কাটিতেছে (যাহা অসম্ভব কারণ লোয়াদা এইস্থান হইতে, পদব্রজে, প্রায় চল্লিশ মাইল)। পুণ্যলোভী স্ত্রীলোকেরা স্থানচ্যুত হইবার আশঙ্কায়, পার্শ্ব পরিবর্ত্তন পর্য্যন্ত করিতেছেন না, ফলে অনেকেই স্থান অপবিত্র করিতেছেন। কেহ কেহ উত্তম স্থানের লোভে দৌড়াদৌড়ি করিতেছেন। ব্রাহ্মণেরা শশব্যস্তে পাঁজী পাঠ করিতেছেন, অন্যান্যেরা পরামর্শে নিশ্চল, সহসা নস্য লইয়া পুনর্ব্বার শাস্ত্রীয় বুদ্ধিযুক্ত। যশোবতী একভাবে বসিয়াছেন, বর্গভীমা মন্দিরে ইষ্টকে প্রতিমা উল্লিখিত ভঙ্গীতে; অভিজাত গৃহের রমণীরা তাঁহাকে সাজাইতে ব্যস্ত, তাঁহারা আপন আপন গৃহ হইতে প্রসাধন সামগ্রী আনিয়াছেন, গোলাপ-পাশে সূক্ষ্ম কারুকার্য্য, ইঁহাদের আনীত দর্পণের পিছনে কলাইকৃত প্রসাধনরত রাধা প্রতিমা, জড়োয়া সুখপক্ষী অঙ্কিত কাজললতা। স্বর্ণভৃঙ্গার হইতে তাঁহাকে উম্মল-পানি দেওয়া হইতেছে, তিনি সহাস্যবদনে তাহা পান করিতেছেন এবং তাঁহার চক্ষু আরক্ত। হায় মোহিনী মায়া! গোলাপের সহচরী, ফলে গোলাপের ম্লান তাঁহাকে পাইয়াছিল। নিকটে বন্ধ-চিত্র জাঁতি দিয়া একজনা গুবাক কাটিতেছেন। জাঁতির সুরত ক্রীড়ারত স্ত্রী-পুরুষের হেবজ্র হাস্য, লোকক্ষয়কারী প্রবৃদ্ধকালের অহঙ্কারকে চূর্ণ করিতেছে। এয়োস্ত্রীগণ চুল দিয়া পথ মার্জ্জনা করিলেন, জল সিঞ্চিত

হইল। অধুনা যশোবতী চতুর্দ্দোলায়, তিনি যেন লক্ষ্মীমূর্ত্তি, একহস্তে প্রস্ফুটিত পদ্ম, কখনও বা দেখিলেন পঞ্চ পল্লব, অন্য হাতে বরাভয়। যশোবতী ইদানীং সাক্ষাৎ চম্পক ঈশ্বরী। তাঁহাকে নামান হইল। হাজার হাজার স্ত্রী শরীর তাঁহার পায়ের কাছে কাছে গড়াইয়া পড়িতেছে। কাহারও মস্তকে তাঁহার পা পড়িয়া পিছলাইতেছে; কোন কোন রমণী অজ্ঞান হইতেছেন। কত শাঁখা তাঁহার পায়ে লাগিতেছে সিঁন্দুর পড়িতেছে। চতুর্দ্দোলা হইতে নামিবার পরে অনেকেই তাঁহার স্মৃতি সংগ্রহের জন্য কেশ আকর্ষণ করিতে তৎপর..., একটি একটি চুল গেল, অনেক কিছুই গেল, ক্রমে বীভৎস রূপ ধারণ করিলেন। তিনি দৌড়াইয়া চিতায় উঠিলেন...অগ্নি সংযোগ করা হইল, শাঁখা কড়ি স্বর্ণালঙ্কার উড়িল। লেলিহান শিখায় গৃহাভিমুখী সুখপক্ষীর দল ছত্রাকার, কোনটি বা বিমোহিত হইয়া চিতার মধ্যে নিশ্চিহ্ন। প্রলয়ের শব্দ ধ্বনিত হইল। একটি রমণী তাঁহাকে দেখিয়া অচেতন হইলেন, ক্রোড়ের শিশু স্তন্যপান করিতে লাগিল আর কাঁদিতে লাগিল। চিতা হইতে দেখিলেন—পার্থিব মায়াবন্ধনে অধীর হইয়া একটি লোক লাঠির উপরে মুখ ন্যস্ত করিয়া আছে, আর কখনও কখনও লোকটির দৃষ্টি ধূম উদ্‌গীরণকে অনুসরণ করিতেছে।

যশোবতীর ভ্রম দর্শন অপগত হইল। তিনি যেন বা ঝুঁকিয়া পড়িতেছিলেন, কোনক্রমে টাল সামলাইয়া কহিলেন, "বাবা তুমি" বলিয়া লক্ষ্মীনারায়ণের কানে কানে কহিলেন, "ভয়!" ভয় বাক্যটিতে যে তৃণগুল্ম জড়াইয়াছিল তাহা সকলই কাঁপিয়া উঠিল।

"কোন ভয় নেই মা, তোমার ছেলেরা রইল, আমিও যত তাড়াতাড়ি..."

যশোবতী আশ্বস্ত হইলেন।

লক্ষ্মীনারায়ণ অন্য পার্শ্বে, বেলাতটে শায়িত বলরাম ও হরেরাম উদ্দেশ্যে কহিলেন, "তোমাদের বাড়ীতে কি খবর দেবে...।"

"একটা খবর...চিঁড়ে গুড় ত বহু আছে...এখন,...থাক আপনি তাড়াতাড়ি আসবেন" বলরাম কহিল।

সীতারাম চক্ষু বুজিয়াছিলেন। তাঁহাকে বিরক্ত করা বাঞ্ছনীয় নহে। যশোবতী সম্মুখের কলাপাতা হইতে একমুঠা ধান্য লইয়া পিতৃঋণ শোধ করিবার কালে অশ্রুসম্বরণ করিতে পারিলেন না। বন্ধনের সকল কিছু সামগ্রীর উপর তিনি ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। লক্ষ্মীনারায়ণের বুক ফাটিয়া গেল, তিনি চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে স্থান ত্যাগ করিলেন; অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা তাঁহার জন্য ভেড়ীর উপরে অপেক্ষা করিতেছিলেন, এবং পরে তাঁহাদের আর দেখা গেল না।

একমাত্র, যশোবতী এই দিবালোকে, মানুষের সহজাত বেদনা লইয়া রোরুদ্যমানা, এ সময় একখানি ভয়ঙ্কর হাত তাঁহার চোখের সম্মুখে গাছ কৌটা এবং বিক্ষিপ্ত ধান্যের মধ্যে ভেকের মত স্তব্ধ। নড়িল। পাখীরা উড়িয়া গেল। হাতখানি যশোবতীকে আশ্বাস দিয়া উঠানামা করে, ধীরে আপন সম্বিতের সূক্ষ্মতার কলমকাটা পথ বহিয়া তাঁহার, যশোবতীর মুখমণ্ডলে উঠিল। এখনও তাঁহার মুখে চোখে ধান লাগিয়া আছে, তথাপি বৃদ্ধের দিকে তাকাইলেন, কাল আহত, বৃদ্ধ কুঞ্চিত, অভিজ্ঞ ওষ্ঠদ্বয় কম্পিত, তাহা হইতে, "আমি আছি...আছি..." একথা আসিল।

যশোবতী এই উক্তি আপনার ধর্ম্মের ঘোরে বিশ্বাস করিয়াছিলেন; নির্ভরতা যাহাতে অনায়াসে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে, সেই হেতু আপনার চক্ষুর্দ্বয় স্ফীত করিলেন।

সীতারাম বলিলেন, "বউ বউ...জোর পাচ্ছি...।"

যশোবতী উদ্‌গ্রীব আগ্রহভরে তাঁহার দিকে চাহিলেন; দেখিলেন, সীতারাম তাঁহার বাম হস্তের তর্জ্জনী কোনমতে নাসা গহ্বরের নিকটে লইয়া যাইতেছেন, পুনর্ব্বার কিঞ্চিৎ সরাইয়া আনিতেছেন, এদৃশ্য তাঁহার মত সুকুমারমতি যুবতীর মনে ক্লৈব্যের সঞ্চার করে, তথাপি তিনি নিশ্চলা। এহেন আশ্বাস লইয়া সুখনিদ্রার জন্য চক্ষুর্দ্বয় নিমীলিত।

তখন বৈকাল হইবে। সীতারাম বেশ তৎপরতা ফিরিয়া পাইয়াছেন, শিশু যেমন ঊর্দ্ধে হস্ত উত্তোলন

করে তেমনি আপনার হস্তদ্বয় উঠাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। সহসা আপনার জানুর নিকটে শায়িত যশোবতীকে দেখিবার চেষ্টা করিয়া কহিলেন, "বউ, সকাল কখন হবে!" আশ্চর্য্য যে এই শব্দগুলি স্পষ্টই বাহির হইয়া আসিল। বৃদ্ধের আপনার কানে তূলা থাকা সত্ত্বেও নিজেই পরিষ্কার শুনিতে পাইলেন। এ কথাও তিনি বুঝিয়াছিলেন নিশ্চিত যে তাঁহার প্রশ্নের কোন অর্থ হয় না।

যশোবতী নিশ্চিত জাগ্রত ছিলেন, তিনি ধীরে চক্ষু উন্মীলন করিলেন। ইত্যাকার কথায়, কিছু মনে হইবার পূর্ব্বেই দেখিলেন একটি অদ্ভুত লম্বা শলাকার মত চাবিকাঠি সমেত হাত তাঁহার দৃষ্টি সমক্ষে নড়িতেছে।

যশোবতীর হঠাৎ মনে হইল 'এ চাবি স্বর্গের নাকি', এই সঙ্গে সীতারামের গলার স্বর, "মোহর মোহর"—সত্যই চাবিকাঠি নববধূকে পরিহাস করিয়াছিল, নিঃশ্বাস-কাঙাল জীবনের কাছে ইহা ভ্রূকুটি মাত্র; জমি হইতে উচ্ছেদ হওয়া কৃষক যেভাবে আপনার জমিতে পা দিতে ভীতি অনুভব করে, সেইরূপ তাঁহার মনোভাব; পৃথিবী তাঁহার কাছে পারঘাটা বৈ অন্য কিছু নহে! অভিমানে ক্ষোভে যশোবতী উন্মাদ, তাঁহার রগ স্ফীত, স্বীয় চূর্ণ কুন্তলের নিম্নে নীলাঞ্জনছায়াকে তাঁহার রেশমী নখগুলি ক্ষত বিক্ষত করিল, রোমকূপে জোনাকি জ্বলিল; ক্ষিপ্ত হইয়া তিনি চাবিকাঠি লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন। চাবিকাঠি গঙ্গার প্রায় নিকটে পড়িল। যশোবতী আপনার ক্রোধ সম্বরণ করিতে অপারগ হইলেন, তাঁহার কল্যাণময়ী হস্ত বৃদ্ধের ব্যাকুল হস্তকে নিপীড়ন করিল! বৃদ্ধ শিশুর মত কাঁদিয়া উঠিলেন।

চাবিকাঠি গঙ্গার কিনারে পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে বলরাম ছুটিয়া আসিয়া চাবিটি তুলিয়া লইয়া দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। হরেরাম পিতাকে ক্রন্দনরত দেখিয়াও শুধু মাত্র প্রশ্ন করে, "মা, তুমি কি চাবিকাঠি..." আর কিছু জানিবার নাই, কারণ পলায়মান ভ্রাতাই তাহার সদুত্তর, সুতরাং সেও তাহার পশ্চাদ্ধাবনে ব্যাপৃত হয়।

দূরে বৈজুনাথ, এ দৃশ্য তাহার সমক্ষে ঘটিতেছিল, এবং সে নিমেষেই ভেড়ী পথে উঠিয়া দেখিতে লাগিল, ধাবমান দুই ভাই দৃষ্টির বহির্ভূত হইতেই সে সরল ভাবে হা-হা করিয়া হাসিয়া অতর্কিতে থামিয়া শ্মশানের দিকে তাকাইল, কেননা এমত সময় তাহার কানে ক্রন্দনধ্বনি পৌঁছায়।

বৃদ্ধের শিশুহারা-রমণীসুলভ ক্রন্দন নিকটস্থ সৃষ্টিসমূহকে, সৃষ্টির অন্তরীক্ষের সহনশীলতাকে, সহনশীলতার মধ্যে হিরণ্ময় কোষকে, হিরণ্য কোষের সহজ তত্ত্বকে আগ্রহান্বিত করিল।

এবং যশোবতী—তাঁহার আত্মা যেরূপ দেহকে ভালবাসেন, দেহ যেরূপ আত্মাকে, এবং এই বিচ্ছেদশীল অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের গুণে বাহিরের জগতেও সাড়া দিলেন, তিনি বিচলিত। একথাও সত্য যে, তিনি অনুতপ্তা। ত্বরিতে তিনি উঠিয়া বৃদ্ধের ব্যথিত হস্তখানি যেমন বা শিশুহস্ত, তাহার ব্যথা মহা আবেগভরে আপনকার কপোল দ্বারা ধীরে ধীরে অপনোদন করিবার চেষ্টা করিলেন। একারণে তাঁহার যৌবন-বিলাসপটু শরীর করুণা রসে পরিষিক্ত হয়।

বৃদ্ধ এখনও ক্রন্দনরত; যশোবতী সস্নেহে স্বীয় আঁচলপ্রান্ত দ্বারা তাঁহার চক্ষু মুছাইলেন, নাক মুছাইলেন, সহসা তিনি বুঝিলেন, যে বৃদ্ধ হাতখানি ঘুরাইতে চাহিতেছেন, ইদানীং বিচলিত যশোবতী তাঁহাকে সাহায্য করিলেন। সীতারামের হাত এখন তাঁহার গালেই ছিল, সুতরাং নববধূ স্মিতহাস্য করত মুখ আনত করিলেন।

অদূরে কাহার চিতা জ্বলিতেছিল, তাহারই আঁধার আসে। এবং এ-সময় বিরাট রাজসিক একটি দীর্ঘশ্বাস—স্বভাবত মেঘ দর্শনে উতলা, দূর পথদর্শনে প্রগল্ভা, নবোঢ়া দেহের বিসর্পিল চক্রান্ত ভাঙ্গিয়াই ক্রমে উঠিল; বৃদ্ধের হাত বাদুড়সদৃশ এবং তাঁহার, যশোবতীর কপোল—প্রত্যূষের প্রথম আকাশে যাহার উপমা—সেই কপোল অবলম্বন করত ঝুলিতেছিল।

যশোবতী যিনি স্বয়ং মোহিনী মায়া, তিনি অকাতর, এখন আর হায়া ছিল না, তাঁহার শূন্য দৃষ্টি চিতার প্রতি নিবদ্ধ; সহসা লক্ষ্য করিলেন যে সেই চিতার উপর দিয়া অর্থাৎ এক পার্শ্ব দিয়া একটি দৃপ্ত ভাবগম্ভীর মুখমণ্ডল উঠিতেছে, ফলে তিনি চকিত হইয়াছিলেন। কোথাও বা দগ্ধ অর্দ্ধদগ্ধ দেহবিকারের পশ্চাতে এই মুখখানি, ঐশ্বর্য্যশালিনী নীলাব্ধিবসনা এই ধরিত্রীর দাম্ভিক প্রতিভা যেমত বা। এই

মুখমণ্ডলের বর্ণচ্ছটায় উদাত্ত ধীর গম্ভীর বেদগান ছিল; এ বেদগানের মধ্যে যেমন আনন্দ, আনন্দের মধ্যে যেমন প্রণাম, প্রণামের মধ্যে যেমন পুষ্পের রহস্য, পুষ্পের রহস্যের মধ্যে যেমন সরল রেখা—তাহা ওতপ্রোত হইয়া উদাত্ত, এতদ্ভিন্ন যুধিষ্ঠিরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন উত্তরের রূপময় বাস্তবতা। পৃথিবীতে বার্দ্ধক্য নাই, জরা নাই, একই ভাব স্থির। তদ্দর্শনে বালিকাবধূর শরীর যেমন বা আপনার মেরুদণ্ডে দৃঢ়ভাবে গাঁথিয়া যাইতে লাগিল।

বৈজুনাথ কোন এক শবদাহে ব্যাপৃত, কেননা শবযাত্রীগণ শব ফেলিয়া পলায়ন করিয়াছে।

সে চিতাগ্নির মধ্যে বীভৎস অঙ্গগুলিকে লাঠিদ্বারা একত্রিত করিতে করিতে কহিল, "হারে, মায়াকান্নায় ড্যাঙা ভাসে, লাস ফেলে পালান। ...ওলাউঠো হোক ওলাউঠো...শাল্লা কান্নায় পোঁদের তেনা সপসপ করে, মরি কি মায়ার বাহার গো" বলিয়া অতঃপর অনতিদূরে গিয়া একটি কাষ্ঠখণ্ড তুলিয়া চিতায় নিক্ষেপ করিল, আর একটি খণ্ড উঠাইতেই এক অপার্থিব বিভূতি দর্শনে আপনার দমের 'হুঁঃ' আওয়াজ করিয়াই সে জ্ঞানরহিত, সে চলৎশক্তিহীন, অত্যধিক বিস্ময়ে মন্ত্রমুগ্ধ এবং একারণে দেহ বক্র, ওষ্ঠদ্বয় বিভক্ত, সময়ও দিকবিরহিত।

পশ্চাতে পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গা জবুস্থবু, ঊর্দ্ধে অম্বর, সম্মুখেই স্বামী-সোহাগলালিত যশোবতী, এ কোন ঘোর বাস্তবতা! এই কি পৃথিবী! তথাপি এ হেন দৃশ্যে গোলাপ ছিল, এ হেন দৃশ্যের স্বাদ ছিল। অন্যপক্ষে, লজ্জিতা যশোবতী ধীরে স্বামীর হস্তখানি নামাইয়া লইতে প্রয়াস পাইলেন, এবং নিজের বাম হস্তদ্বারা আপনার বক্ষের সুসজ্জিত বস্ত্রকে সুরক্ষিত করিলেন। বৈজুনাথ, তদ্দৃষ্টে, জিহ্বাদ্বারা আপনার ওষ্ঠ চিন্তিতভাবে লেহন করত হস্তধৃত কাষ্ঠখণ্ডে শ্বাপদ আক্রোশে থুথু দিয়া চিতায় নিক্ষেপ করিল। সে যেমত বা পরাভূত। মনে হয় ধরিত্রী যেন তাহার বাদ সাধিয়াছে।

সেইহেতু সে, বৈজুনাথ, মতিভ্রমে উন্মাদ। কণ্টকিত, ধর্ম্মশূন্য রূপচরিত্রহীন, তামসিক, অবিচলিত, খর পায়ে নবদম্পতির অভিমুখে যাইতেই প্রজ্বলিত চিতা তাহার পথ রোধ করিল।

প্রজ্বলিত চিতা তাহার পথ রোধ করিল; যে চিতা, যাহা দাহ্যমান, যাহা অনির্ব্বাণ, যাহা শেষ, যাহা বন্ধুহীন! বৈজুনাথ আপনার জিহ্বা দ্বারা আপন গাত্র বুলাইতে চাহিল। কিন্তু হায়, অমোঘ অবস্থা, শুধু মেদ গন্ধ, নিষ্ঠুর অগ্নি ও তাহার দাহিকা শক্তি—মানুষদের দেওয়া নাম ও বাস্তবতা—এক হইয়া ক্রমাগত সেখানে অঙ্ক কষিতেছে। এবম্প্রকার মহামারী অজর সত্য হইতে চক্ষু তুলিল, অথবা—সত্য ক্ষণেকের জন্য নিমেষেই অচিরাৎ আপন মায়া অপসারণ করে, সে অনতিদূরে দেখিল।

উহারা কে এখন যাহারা এক! কোথাও তাহার, অবোধ কোমলাঙ্গ কৌমার্য্য রসময়ী, কোথাও বীজবৎ শুষ্ক, কভু পাণ্ডুর, হঠাৎ শুভ্র, পরক্ষণেই আরবার রক্তিম! এই অবাস্তব—এই কঠিন, অন্ধকারহীন দাম্পত্যজীবনমিথুন তাহাকে এককালে অলৌকিক, এবং বিস্ময়ে আরূঢ় করিল—অদ্ভুত এক অনুভবে, যদিচ তাহা রম্য উপলব্ধি, সর্ব্বাঙ্গ সঙ্গীন। চণ্ডাল বৈজুনাথের বিভ্রম ঘটিল হয়ত বা, চিতার অন্যধারে ইদানীং যে দাম্পত্য মাটি স্পর্শ করিয়া আছে—তাহা যেন তাহারই সমগ্র অন্তর! এখনও সে স্তম্ভিত, আচম্বিতে সে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া কয়েক পদ অগ্রসর হয়। বেলাতটের ঐ দৃশ্য তাহাকে গুণ করিয়াছিল, সে কয়েক ছটাক্ পিছু হটিল; তদনন্তর নিজের হস্তদ্বয় দেখিয়াই জন্তুর মত শব্দ করত ঊর্দ্ধে লম্ফ প্রদান করিয়া ভূপতিত হইল।

এ হেন তেজোময় শরীর রৌদ্রকর্ম্মা আক্রোশে ঝটিতি ধরাশায়ী। ইহাতে শ্মশানভূমির ধূলিকণাসকল চমকিত, আর যে, তাহার পতনে স্থাবর জঙ্গম অতিমাত্রায় বিষাদগ্রস্ত; এই ঘটনার পিছনে কতটুকু অভিমান—যতটুকু অভিমানে পিতা কর্ত্তৃক ধৃত স্বীয় হস্ত মুক্ত করিয়া যে কোন শিশু আপনার স্বাবলম্বন চায়। এখন বৈজুনাথের চক্ষুর্দ্বয় তমসাচ্ছন্ন, আঁখিপল্লব মুদিত, অনন্তর সে কোনক্রমে, সাহসে চোখ খুলিল, দেখিল। দৃষ্টি ফিরাইয়া ভয়ার্ত্ত চোখে নৈকট্য, সান্নিধ্য, সাযুজ্য দর্শন করে—যাহার এক অংশ ব্রীড়া, অন্য অংশ জটিল বাস্তবতা! পতনের বেদনা এসময় তীব্র হইয়া দেখা দেয়, আর মাথা তুলিয়া থাকা সম্ভবপর নয়। সে ধীরে ভূমি উপরি আপনার মস্তক স্থাপনা করিল। সমগ্র বিশ্ব যেমন বা চক্রাকারে শরীরের মধ্যে ঘূর্ণায়মান, আপনার দেহগত ভাবনা তাহাকে বিশেষ আলোড়িত করিতে থাকিল। হায় সে সামান্য জীব—সে বড় দুঃখের! মন হইতে ভালবাসা ধীরে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যে অধঃ মধ্য নভের অনৈসর্গিক মহিমা রহস্যে রূপান্তর লাভ করত পুনরায় সৌন্দর্য্য নামে প্রত্যাবর্ত্তন করে, কোন সূত্রেই

তাহা সে টের পায় নাই। অদ্যও সে নির্ব্বোধ, দিনের পর দিন মৃতকে লইয়া কালাতিপাত করিয়াছে। মড়া পুড়াইয়াছে।

এখন বৈজুনাথ কিয়ৎপরিমাণে সুস্থ; সে আকাশের দিকে মুখ রাখিয়া তাহার বজ্র-দেহটি মেলাইয়া দিল। অনেকক্ষণ এইভাবে অতিবাহিত হওয়ার পর, সহসা বুঝিল, কাহার কণ্ঠস্বরকে সুগম সুস্পষ্ট করিবার নিমিত্ত সমগ্র শব্দ তরঙ্গ অনড়, নিথর এবং লোকচরাচরে কেহ নাই এবং শুধু ক্রমাগত একটি 'ডাক' ধ্বনিত হইতেছে। ঔৎসুক্যপরতন্ত্র চণ্ডাল তাহার মর্ম্ম গ্রহণ মানসে একাগ্র। কে যেমন বা তাহাকে ডাকিতেছে, এবং আশ্চর্য্য তাহাকে 'ও ঘুম, ও ঘুম' নামে সম্বোধন করে। নিয়ত এই 'ও ঘুম' বাক্যটি শুনিতে শুনিতে তাহার চিত্তে দুর্য্যোগময়ী ঘোর সমুপস্থিত। তথাপি ইহা বোধ করি সত্য যে, তাহার সাড়া দিবার বাসনা জাগরূক হইল। এমত অবস্থায় সে অনুভব করে আপনকার দীর্ঘ ক্ষমতাবান শরীর যেমন বা কর্দ্দম-স্বরূপ, অবলীলাক্রমে তাহার চক্ষুর্দ্বয় উন্মীলিত হইল, নিষ্প্রভ দৃষ্টিতে অনেক কিছুই দেখিতে চাহিল কিন্তু পারিল না; আপনার বক্ষের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল, দেখিল, তাহার নিঃশ্বাস-বাত্যায় বক্ষস্থিত লোমরাজি শরৎকালীন ধান্যক্ষেত্রের মত ব্যস্ত; বেলাভূমির মাটিতে তাহার হস্ত দুইখানি আঁকড়াইয়াছিল। তাহার দৃপ্ত চোখের তারকায় সফরী চঞ্চলতা, তাহার অন্তরীক্ষ স্ফীত।

যদিও সে জাগ্রত, যদিও নরবসার গন্ধে এ স্থান পার্থিব, যদিও বেদনা অনুভব এখনও তাহাকে নিঃশ্বাস লইতে সাহায্য করিতেছিল, তবু ইতিপূর্ব্বের সৃষ্টিছাড়া ডাক তাহাকে কণ্টকিত করিয়াছিল। অনন্তর আপনার সম্পর্কে তাহার অসম্ভব সন্দেহ উপস্থিত হইল। তাহার অস্তিত্ব কেহ কি জানে! না সত্যই সে ঘুম! ঘোর বিপৎকালে মেঘঘটা যামিনীর তীক্ষ্ণ মুহুর্মুহুঃ বজ্রপাতে, অথবা ভূমিকম্পে আপনার কুশলবার্ত্তা অর্থাৎ আমি আছি, এ বার্ত্তা গ্রামান্তরে শঙ্খধ্বনি করত সে কখনই পৌঁছাইয়া দেয় নাই।

'আমি কি ঘুম!'

'আর জন্মে আমার নাম কি ঘুম ছিল?' বৈজুনাথ, যাহার কোনদিন ভয় ছিল না অথবা যে কোনদিন চকিত নয়, সে ইদানীং যারপরনাই ভীত, শঙ্কিত, ত্রস্ত আতুর। এ মহাশ্মশান, যেখানে সে একাকী, নির্ভীক কালযাপন করে, এখানকার রাত্র তাহার নিকট স্বাভাবিক যন্ত্র মাত্র। গঙ্গার জড়-মধ্যরাত্রের বায়ু সঞ্চালনে এ স্থানসমূহ যখন বিশ্রী তখন তাহার, বৈজুনাথের, বন্ধুগণ—ক্রীড়াসহচরগণ আইসে। বীভৎস, চৈত্যবৃক্ষ সম ভয়ঙ্কর প্রেত সকল মিলিয়া নৃত্য আরম্ভ করে, বিপুল আনন্দে দিগ্বিদিক অধৈর্য্য; কিছু দূরের নিদ্রা, কিছু অজানিত বিশ্রাম, অন্তরালে বীজদৃপ্ত ভাবনাকে—মার্জ্জার যেমন মূষিককে—ব্যতিব্যস্ত করে সেইরূপ বিঘ্ন সাধন করিয়া থাকে। এ খেলায় অবৈধ প্রণয়ের গর্ভপাত-হেতু ভ্রূণপিণ্ড যাহা প্রেত-পরিণত সেও আপন পিণ্ডময় শরীর আন্দোলিত করত মহানন্দ প্রকাশে অস্থির; অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় মৃত রমণীর প্রেত অধিক রসময়ী; ক্রমাগত ইহারা, ভয়ঙ্করদর্শন প্রেত-সকল, এবং বৈজুনাথ ঘুরিয়া ঘুরিয়া খেলা করে; খেলার শেষে তাহারা ক্রমান্বয়ে বলে, "তেষ্টা তেষ্টা।"

বৈজুনাথ বালকসুলভ চাপল্যে তাহার অঙ্গুলিদ্বারা গঙ্গাকে নির্দ্দেশ করে।

কখনই সে ভয় পায় নাই।

সে প্রশ্ন করিল, 'আমি, আমি কি ভূত! না না না...নিশ্চয় প্রেত...না আমি চণ্ডাল? হয়ত আমি চিতা!' এখন পুনরায় তাহার কণ্ঠে প্রসন্নতা বর্ত্তমান। কেননা গঙ্গার স্রোত তাহার সহিত কথা কহিয়াছে।

এখন অপরাহ্ণ সন্ধ্যাগত।

যশোবতী কেশবিন্যাস কালে কিছু কিছু অনাবৃত হইয়া পড়িবার ভয়ে সকল দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। তবুও প্রসাধনরত এই ডালিমের বাস্তবতাকে আর একজন অলক্ষ্য হইতে দেখিতেছিল। স্বামী সীতারাম অধুনা যেন কেমন অনড়, ফলে যশোবতীর নিজের মধ্যে অস্থিরতা দেখা দিয়াছিল; পুত্রদ্বয়ের কথা তাঁহার স্মরণ হইল, অবশ্য তাহাদের যে কি হইল তাহা ভাবিবার পর্য্যন্ত তাঁহার উৎসাহ ছিল না। তথাপি তিনি বেণী রচনা করিতে করিতে চকিত পদে খানিক দূর অতিক্রম করিয়া থমকাইয়া দাঁড়াইলেন, আপনার স্বাধীনতাকে অচিরাৎ সাক্ষাৎ করিয়া গম্ভীর, যতদূর এখান হইতে দেখা যায় ততদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত, টিয়ার ঝাঁকে তাহা যেন আত্যন্তিক প্রসারী, এই স্বাধীন মনোভাব দিয়া আপন বেণী

বন্ধন কার্য্যে মনঃসংযোগ করিলেন।

পদচারণে ব্যাপৃতা, এ শ্মশানে নির্ভয়ে আপন গোপনতাকে সন্ধ্যা সমাগমের জন্য প্রস্তুত করা একমাত্র তাঁহার দ্বারাই সম্ভব; তৎকালে নিশ্চয়ই পুষ্পবৃষ্টি হইয়া থাকিবে, তৎকালে ধ্রুবসত্য যে, গোলাপ তাঁহার অনুগামিনী হইয়া থাকিবে। তিনি আবার ফিরিয়া আসিলেন।

সীতারাম প্রশ্ন করিলেন, "কি?" অর্থাৎ কোথায়?

যশোবতী এমত প্রশ্নে ঈষৎ অবাক। তাহার পর কহিলেন, "ছেলেরা" এবং স্বামীর কানের তূলা সরাইয়া কহিলেন, "আঁধার হল...ছেলেরা ত কেউ..."

"মরুক...আমি আছি..."

বৃদ্ধের ঘোষণাউক্ত 'আমি' বাক্য সৌষ্ঠবে যে ক্ষুদ্র তন্মাত্রা বর্ত্তমান, তদনুরূপ ক্ষুদ্র একটি ক্ষণস্থায়ী নির্ভরতা যশোবতীর মনে সঞ্চারিত হইয়াছিল। তিনি নোলকটি একটি অঙ্গুলিদ্বারা ঈষৎ আন্দোলিত করিতে করিতে অন্যমনস্কা হইলেন এবং এককালেই শুনিয়াছিলেন "কাজল"।

বৃদ্ধের চোখে দিবার নিমিত্ত একটি কাজললতা ছিল, তাহা খুলিয়া, যশোবতী সস্নেহে তাঁহাকে কাজল পরাইতে লাগিলেন। এখন, নিশ্চয়ই মনে হইল এ কাজল—এ অন্ধকার, শিখাতে দাহ্য হয় নাই, আলো পার হইয়া আসিয়াছে। পথশ্রমে উহা কাতর বা ম্লান কভু নহে।

কাজলচর্চ্চা কালে তিনি বার বার স্বামীর মুখাবলোকন করিয়াছিলেন, এ কারণে যে, তাঁহার সকল সময় মনে হইতেছিল, সীতারাম এখনও হস্তের আঘাত-প্রসূত ব্যথায় মর্ম্মাহত, এখনও তাঁহার অশ্রুসিক্ত নিঃশ্বাস ক্রমে ক্রমে পড়ে, এবং এইহেতু এই প্রথম যশোবতীর চিন্তাসূত্র গৃহী হইল। ইতঃপূর্ব্বে শুধু সংস্কার ছিল। এক্ষণে বুঝিলেন সম্মুখে যাহা, তাহা গঙ্গা, তাহার প্রতিটি জলবিন্দুতে মেঘ এবং সে মেঘের পিছনে প্রশান্ত, সুন্দর, শান্ত, অক্ষয়, পিতা নীলিমা—সুতরাং বৃদ্ধের জন্য ব্যাকুলতায় পদদ্বয় নাচিয়া উঠিল, তিনি যেমন স্বামীর জন্য বিশ যোজন পথ অক্লেশে দৌড়াইতে দৌড়াইতে আসিতেছেন—রক্ত, মাংস, গোঙানি, জিহ্বা—তাঁহার এ পথে মায়া সৃষ্টি করিতে পারে নাই। তিনি সিদ্ধা।

সীতারামের চক্ষুর্দ্বয়ে বিদ্যুৎ খেলিতে আরম্ভ করিয়াছিল, কোথা হইতে জোয়ালঠেলা ক্ষমতা সঞ্চয় করিয়া তিনি নিজেকে প্রকাশ করিতে চাহিলেন, সন্তরণ অভিজ্ঞ পুরুষ যেমত সহজেই জলের তলদেশ হইতে উল্কা গতিতে উপরের দিকে আসে সেইরূপ তিনি উঠিয়া আসিলেন, বারম্বার ওষ্ঠদ্বয় কম্পিত হইল, কিন্তু বাক্যস্ফূর্ত্তি হয় নাই। করুণভাবে আপনার স্ত্রীর প্রতি চাহিয়া, প্রাণান্ত করিয়া কণ্ঠে শুদ্ধ স্বর আনিতে চাহিলেন, চক্ষে জল আসিল।

পতি-ব্যাকুলা যশোবতী বস্ত্রপ্রান্ত দ্বারা স্বামীর ওষ্ঠভাগ, যাহা জলসিক্ত, সযতনে মুছাইলেন, কেননা ইদানীং তাঁহার আপনকার দেহবর্ণের স্বর্ণ-পীত এবং দূর অম্বরের নীল, আর এক অনন্য সবুজতার সৃষ্টি করিয়াছে—তিনি আড়নয়নে এ-শোভা দেখিয়া সম্মোহিত রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিলেন। এই গূঢ় উপলব্ধিতে আপনার দেহের ভিতরে কাহারা...যেন বা আলিঙ্গন করিতে লাগিল।

"চাঁদ"...

যশোবতী 'চাঁদ' বুঝিয়া লইয়া স্বামীর প্রতি স্মিতহাস্য করত চাহিলেন।

"চাঁদ"...

যশোবতী এক্ষণে তাঁহার বাক্য, বোধ করি, অনুধাবন করিতে পারিয়া চাঁদোয়া টানাইবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। সীতারাম অত্যধিকভাবে প্রতিবাদ করত করিলেন, "না না...।"

যশোবতী ইহাতে স্বামীর কানের তূলা বিশেষ সন্তর্পণে বাহির করিয়া কল্পনাতীত স্নেহস্বরে বলিলেন, "হিম পড়বে যে..." একথা বলিতে বলিতে হঠাৎ তাঁহার বাল্যের স্মৃতি জাগিল। একদা ঝড় বৃষ্টির মধ্যে ত্রস্ত দুধের লাউ গাছ দেখিয়া মনে বড় দুঃখ হইয়াছিল।

সীতারাম আকাশ দেখিয়া, হিম স্মরণে, সম্মত হইলেন।

চাঁদোয়া খাটান হইল। সীতারাম এই মুহূর্ত্তটুকুর জন্য যেন বা সকল শক্তি সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন; তিনি যে অথর্ব্ব একথা ভুলিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। নববধূর প্রতি তাকাইয়া বলিলেন, "আকাশ...বড় ভয়..."

উদ্‌গ্রীব হইয়া তাঁহার কথা শুনিয়া, যশোবতী সগর্ব্বে বলিলেন, "কেনে গো, আমি আছি" আবার স্পষ্ট করিয়া বলিলেন, "ভয় কি, ভগবান আছেন।"

তাঁহার কথা যেন বা বৃদ্ধের মনঃপূত হইল না, অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া নববধূর হস্তটি স্পর্শ করিয়া বুলাইতে চাহিলেন, পরে কোনমতে আপনার গণ্ডদেশে লইয়া চাপিয়া ধরিয়াছিলেন। যশোবতী অনুভব করিলেন, বৃদ্ধ কাঁদিতেছেন।

বার্দ্ধক্যের অশ্রু যশোবতীকে বহু জন্মের পুঞ্জীভূত সঙ্গ, বন্ধুত্ব, সৌহার্দ্দ্য, অন্তরঙ্গতা, মিত্রতা, মিত্রতার মধ্যে যেমন গঙ্গাজল, গঙ্গাজলের মধ্যে যেমন আপনি, আপনার মধ্যে যেমন অক্ষর, তাহা এক নিমেষেই দান করিল।—এখন তিনি যেন তাঁহার স্বামী হইতেও আতুর, একদা মনে হইল সীতারাম শিশুবৎ, ইঁহাকে সাদরে কোলে লওয়া যাইতে পারে, পরক্ষণেই কর্ত্তব্যজ্ঞান ফিরিয়া পাইয়া তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় মুছাইয়া বলিলেন, "কাঁদো কেনে গো..."

"আমি...বাঁচব..."

সীতারামের উক্ত 'আমি' কথাটা যশোবতীকে অভিমানী করিল, যেখানে তিনি, যশোবতী, বন-মায়া, তিনি বলিতে চাহিলেন, 'আমি' বল না, শুধু বল বাঁচব—কিন্তু তবু আপনার বিরক্তি দাঁতে কাটিলেন।

"আমায় ত ভগবান এনেছেন তোমায় বাঁচাবার জন্য গো।"

"বউ ভয় মায়া" বলিয়া অঙ্গুলি দ্বারা যশোবতীর প্রতি ইঙ্গিত করিলেন।

"মায়া..."

"আমার জন্য?" এইটুকু মাত্র প্রশ্ন করিতে যশোবতী কোনক্রমে সক্ষম হইয়াছিলেন।

তাঁহার আজন্ম সযত্নে রক্ষিত অভিমান, দেহের মধ্যে পলকেই কুম্ভকের সৃষ্টি করিল, প্রথমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিঃশ্বাস এবং তদনন্তর নেত্রে অশ্রু দেখা দিল, এখন বিগলিত হয়; তবু এ সত্য অনস্বীকার্য্য যে, অষ্টলক্ষণ সমুদয় প্রভাবসম্পন্ন, ফলত ললাটে স্বেদবিন্দু ও অন্তরের পুলক আকল্প-নবীন একভাবের সূচনা—নয়নে উন্মীলন আকাঙ্ক্ষায়, কৃষ্ণ মেঘোদয়ে ময়ূরসমান; এবং ধীরা, নবোঢ়া, লাজুক, শীলা, বিহ্বলা, বিড়ম্বিত, মুহ্যমান—বিষাদময়ী যশোবতী প্রগল্‌ভা হইলেন, আপনকার দেহ হইতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইল; তিনি মুহুর্মুহুঃ বলিতে লাগিলেন, "সত্যিই...সত্যিই মায়া হয়" বলিতে বলিতে আপনার ভগ্নস্বরে আপনি সম্মোহিত হইয়া, জরাজীর্ণ কালাহত স্বামীর কণ্ঠ ঝটিতি আবেষ্টন করত রমণী জীবনের, প্রকৃতি জীবনের, প্রথম, মধ্য এবং শেষ এবং শ্রেষ্ঠ আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

তাঁহার, যশোবতীর জীবন সার্থক হইয়াছিল।

অদ্যের এই বেলাতটের পড়ো-নিঃসঙ্গ সৌন্দর্য্যের বাস্তব-বিদ্যমানতার জন্য, এই আদিষ্ট ভূমি—ভূতগ্রামের জন্য, তিনি নিজেই বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন; এবং বালকস্বভাব ভোলানাথ, যিনি সর্ব্বমঙ্গলময়, যিনি চিৎস্বরূপ, যাঁহার বিভূতির অন্তর্গত দৃশ্যাদৃশ্য সৃষ্টি, যিনি অদ্বিতীয় পুরুষ, ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী শ্যামার চরণাশ্রিত প্রৌঢ়শিলাবৎ অনড়; ইদানীং যিনি শঙ্কর, যাঁহার বাম জঙ্ঘাপরি নবারুণ প্রকট-চম্পকদীপ্ত-বিদ্যুৎপর্ণা আসীনা, অর্থাৎ পার্ব্বতী, অধরে মধুরার 'মিথুন-হাস্য' এবং উদাসীকে প্রেক্ষণব্যস্ত—সেই পার্ব্বতীপ্রিয় শঙ্কর, যিনি অবিচারিত চিত্তে মানুষকে চারিফল দান করেন, তিনি নিশ্চয়ই, যশোবতীর প্রার্থনায়, বলিয়াছিলেন—"তাহাই হউক"। এবং তিনি, যশোবতী, বৃদ্ধকে জড়াইয়া ধরিলেন।

উদ্ভিন্ন বনজযৌবনার মৃণালসদৃশ ভুজবন্ধনে 'বৃদ্ধ' পরিত্রাহি ডাক ছাড়িলেন, আকুল সমুদ্রের প্রায়-নিমজ্জমান ব্যক্তির ন্যায় মুখব্যাদান করিলেন। আকাশ অন্ধকার হয়। যশোবতী ভীতা হইয়া তাঁহার হাতখানি অপসারণ করিতে গিয়া পুনরপি কণ্ঠ আবেষ্টন করিয়াছিলেন। বৃদ্ধের কণ্ঠরোধ হইবার উপক্রম হইল। নববধূর হাতখানি সরিয়া গেল, তিনি শশব্যস্তে ব্যগ্রতার সহিত, "কি হয়েছে গো অমন করছ কেনে...লেগেছে?" অত্যন্ত সরল কণ্ঠে বলিলেন।

অনন্তর, বিশুদ্ধ বায়ু লইবার মানসে সীতারামের মস্তক সঞ্চালিত হয়, তাঁহার প্রাণ বুঝি যায়; ইদানীং যে প্রাণ তাঁহার সহজ বন্ধন মাত্র। যশোবতীর শরীর আড়ভাবে ন্যস্ত ছিল। তিনি উপস্থিতবুদ্ধিরহিত, কেবলমাত্র আকর্ণবিস্তৃত নয়ন যুগল তড়িৎ ভঙ্গিমা চকিত, কোনমতে আলুথালু বেশে উঠিয়া বৃদ্ধের প্রতি মনোনিবেশ করিলেন।

বৃদ্ধ স্বাভাবিক ভাবে শুইয়া আছেন।

দুঃখিনী বন্ধুহীনা যশোবতী উন্মত্তের ন্যায় সমস্ত দিগ্‌দর্শন করিলেন, কেহ নাই। সর্পদেহী—আপৎকাল দেখিয়া তিনি শঙ্কিতা, জরায়ুস্থিত আসনে তাঁহার সর্ব্ব শরীর বক্র হয়। কিয়ৎক্ষণ পরে নির্জ্জীব কণ্ঠে বারংবার কহিলেন, "ওগো কথা বল, কথা বল..." এবং স্বামীর কর্ণের নিকটে মুখ লইয়া তারস্বরে বলিলেন, "কথা বল"। এই ব্যাকুলতা শূন্যতায় প্রতিধ্বনিত হইল, তাঁহার শিহরণ উপস্থিত, মুখ তুলিয়া প্রতিধ্বনির দিকে তাকাইবার চেষ্টা করিয়া চন্দ্রালোক দেখিলেন, যে চন্দ্রালোক জলে স্থলে—এখানে সেখানে।

"বউ..."

নাগরাজ বাসুকির দ্বারা নববধূর দেহটি আন্দোলিত হইল। বিস্ময়ে যশোবতীর মুখ খুলিয়া গেল, পলকেই মুখনিঃসৃত লালা আসিয়া পড়িল। তিনি তৎপরতার সহিত তাহা অপসারিত করিয়া বলিলেন, "এই যে আমি, খুব লেগেছিল হ্যাঁ গো" এবং সেইকালে সর্ব্বদিক অবলোকন করিয়া 'আমি' প্রতিধ্বনি বাক্যটিকে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। পরে অতীব মধুর কণ্ঠে কহিলেন, "খুব লেগেছিল।"

"না না" বলিয়া বৃদ্ধ অতি ধীরে তদীয় পত্নীর হস্ত স্পর্শ করিলেন।

যশোবতী অতি সন্তর্পণে স্বামীর অভিপ্রায় মত পুনর্ব্বার কণ্ঠ আলিঙ্গন করত আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। উপত্যকার শান্ত হ্রদের ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে সন্তরণরত শ্বেত মরাল আপনার দীর্ঘ, ব্যগ্র, সর্পিল গ্রীবা বাঁকাইয়া এই সপ্তবন্ধনের নিঃশ্বাসকে তির্য্যকভাবে দেখিয়াছিল। বৃদ্ধের ভাঙা ভাঙা কুঞ্চিত ওষ্ঠে নিশ্চিত হাসি ছিল। রাত্রনিহিত, তৃপ্তির অনন্য মরীচিকা, সুন্দর জোছনায় হেমন্তের শিশিরসিক্ত শেফালিকার মধ্যস্থতায় ব্যক্ত, উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

"আমি খুব ভয় পেয়েছিলুম"—নববধূ কহিলেন। এমন যে তাঁহার গাত্রবাস স্পন্দিত হইয়া উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করে।

"ভয়!" এ বাক্য উক্তির সহিত তাঁহার, বৃদ্ধের, মুখগহ্বর দেখা যায়, মাড়ি অস্পষ্ট, উল্লিখিত ফলে, তাহা নিজেই ভীতির কারণ হইল।

এ কথা শ্রবণে যশোবতী সমস্ত প্রকৃতি আলোড়ন করিলেন, আপনার সুবৃহৎ চক্ষুদ্বারা দিক সকল দেখিয়া কহিলেন, "ভয় কি গো?" এবং পুনরপি বাস্তবজগৎ নিরীক্ষণ করত বলিলেন, "এই দেখ" বলিয়া কাংস্যবিনিন্দিত কণ্ঠে "ইংহি ইক্ ইক্" বলিয়া রক্ত মন্থনকারী এক অদ্ভুত ধ্বনি তুলিলেন। এই হৃদয়-উদ্বেল-পটু শব্দে একমাত্র রাহুই সাড়া দেয়—জলপানরত ভয়ঙ্কর জীবসকল প্রাণভয়ে স্থির। চাঞ্চল্য দারুভূত। তিনি যেন হাসিয়াছিলেন।

একমাত্র বৃদ্ধ তাঁহার এ হেন দুর্দ্ধর্ষ ডাকে নিশ্চিন্ত হইয়া জাগিয়া উঠিলেন। কিছুই তখনও চক্ষু মেলিতে সাহস করে নাই।

গঙ্গার শীতল বায়ুচাঞ্চল্যে জোনাকি-ঝাঁক তরঙ্গায়িত কভুবা ছত্রভঙ্গ, কোথাও কেহ নাই; লোক চরাচর স্তব্ধ। অলৌকিক দাম্পত্যজীবন যাহা তেজোময় দুষ্প্রধর্ষ, আমাদের ক্রন্দন, আমাদের প্রতিবিম্ব, শ্মশানভূমিতে ইদানীং অশরীরী।

যশোবতী তপ্ত-উষ্ণ নিঃশ্বাস-বায়ুর মধ্য হইতে প্রশ্ন করিলেন, "হ্যাঁ গো তোমার কত কষ্ট হয়েছে, না গো..."

"না...না...ভাল..."

নববধূ স্বামীকে সচেতন মায়াময় করিবার মানসে শ্রীযুক্ত কণ্ঠে কহিলেন, "তোমার যদি কিছু হত, আমি গঙ্গায় ঝাঁপ দিতুম..."

বৃদ্ধ অবাক হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তিনি যেমন বা ধারাবর্ষণ-ক্ষান্ত ধরিত্রী দর্শন করিলেন। অনর্গল বৃষ্টি হেতু সমস্ত প্রান্তর জলময়, তথাপি প্রাণকুল ব্যস্ত।

"এ জীবন গেল, কি হয়েছে? আবার জন্মাব আবার ঘর পাতব"—এ কথায় এই লোকক্ষয়কারী শ্মশানভূমি যেন পক্ষীশাবকের ন্যায় কাতর হইয়া উঠিল। কেননা তাঁহার, ভাগ্যবতী যশোবতীর, অঞ্চলে

তুরুপের ইহলোক, তাহার বীজ এবং বাঁচিবার ইচ্ছা-চিন্তা সকলই বাঁধা ছিল।

"আমার...সঙ্গে?"

শিশুর মত মাথা দোলাইয়া যশোবতী কহিলেন, "হিঁ গো, তুমি ছাড়া আর কে...! জান, আর জন্মে না নিশ্চয় তোমায় কষ্ট দিয়েছিলুম, তাই এত দেরী হল আসতে। জান আমি ভূত হয়ে ঘুরছিলাম। তুমি যখন মাঠে মাঠে খেলেছ, ফড়িং ধরেছ, তখন কত হাততালি দিয়েছি, আমি সব দেখেছি..." এ কথায় যশোবতীর গভীর সংস্কার ছিল না। বিশ্বাস ছিল। সীতারাম যুবকের মত স্ত্রীর উরুতে চাপড় দিলেন, শাশ্বত সত্য কম্পিত; রমণীর জরায়ু মহানন্দে মহুয়া-বেসামাল নৃত্য করিতে লাগিল, আর যে কাহারা—মর্ত্ত্যবাসী সম্ভবত, ঘোররবে অট্টহাস্য সহকারে মাদল বাজাইতে উন্মাদ। সমগ্র চক্ষুষ্মান্, সমগ্র পরমায়ু আশ্বস্ত, একারণ যে তাহারা এক মনোহর দিব্য দৃশ্য দেখে—যে, এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড একটি মহতী জরায়ু, যেখানে বাঁশরী-গীত প্রতিধ্বনিত এবং আপাতত বলিলেন, "আবার হবে"।

বৃদ্ধ সীতারামের সরল বাক্যে যশোবতী অল্পমাত্রায় স্থানীয় হিমবায়ু অনুভব করিলেন। তন্নিবন্ধন শুধুমাত্র বুঝিয়াছিলেন তাঁহার ইদানীং আদিত্যবর্ণ দেহ নানাবিধ অলঙ্কারভূষিতা, এবং এমন কি যাহা ধূলা, তাহাই তাঁহার স্নেহাস্পদ, কেননা ধূলাই তাঁহার প্রথম সন্তান; তিনি রমণী।

প্রৌঢ়শিলাসম সীতারাম এখন স্পন্দিত, প্রথমত যশোবতীর প্রাণ উচাটনকারী ঘোর রবে, দ্বিতীয়ত আপনকার দেহে ক্ষণমাত্রস্থায়ী বিদ্যুৎ দর্শনে, স্বভাবে অধিষ্ঠিত হইয়া কহিলেন, "বউ গান বল।"

এ কথায় যশোবতী হাস্য সম্বরণ করিতে অপটু, মুখে বস্ত্রখণ্ড প্রদান করিলেন, দেহ—সকালের উড্ডীয়মান পারাবত যূথ যেমত সহসা ছত্রভঙ্গ হয়, তেমনি—ছত্রভঙ্গ হইল।

"বল" বৃদ্ধ কহিলেন। এ বাক্যের ভিত্তিতে এই ইচ্ছা ছিল যে কাল পরাস্ত হউক।

যশোবতী সেই ভাবেই মাথা নাড়িয়া প্রকাশ করিলেন, সঙ্গীত তাঁহার আয়ত্তে নাই। অনন্তর মহা আগ্রহে বলিলেন, "তুমি বল না।"

"না তুমি...";

বৃদ্ধ অপেক্ষা করিলেন, তাহার পর অভিমানে মুখ ঘুরাইয়া লইলেন। যশোবতী অভিমানী স্বামীকে তুষ্ট করিবার জন্য, কোন মতে 'বেহাগে' গাহিতে লাগিলেন।

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা,
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরি॥"

সদ্য যৌবনপ্রাপ্তির সুললিত মধুস্বর লীলা ভক্তির ঔদার্য্যে বাঙ্ময় হইয়া উঠিল। হাজার হাজার বৎসর, তাহার সেতু, তাহার হর্ম্ম্যরাজি, জলযান, তাহার যুদ্ধ বিগ্রহ, তাহার প্রমোদকানন, রভস, ছুন্নৎ, হারেম, একটি আদরণীয় নবপ্রসূত মেষ শাবকের চপলতায়, রম্য ছায়ায় অবাক হইল। এমত সময় একটি বিরক্ত স্বর মৃত্যুমুখী। নিঃশ্বাসের গড় গড় ধ্বনি তাঁহাকে বাধা দিল, বৃদ্ধ তিক্ত স্বরে কহিলেন, "হরিধ্বনি দাও না তার থেকে"...।

পতিপ্রাণা যশোবতী অপ্রস্তুত হইয়া থামিলেন, এখন তাঁহার শিরায় রক্ত প্রবাহ নিখাদকে কেন্দ্র করিয়া মন্থর গতিতে আবর্ত্তিত হইতেছিল, তিনি সৃষ্টি ও স্থিতির মধ্যবর্ত্তী কোন স্বর যুক্ত করত ভাবিলেন, কি গাহিবেন! অবশেষে ধরিলেন—

"যাই যাই যাই যাই লো আমায় বাঁশীতে কে ডেকেছে,
পড়ে থাক ভেসে যাক কলস আমার—যমুনায়,
আমায়—বাঁশীতে কে ডেকেছে..."

যশোবতীর করতল মৃদু মৃদু বৃদ্ধের হস্তে আপনার গীতের তাল রক্ষা করিতে ব্যস্ত। গানের অন্তরীক্ষে যে সৌখীনতা তাহা নিয়ত জোনাকির পশ্চাদ্ধাবন করিল। সীতারামের শিরা উপশিরা, ঝড় সমাগমে স্খলিত কবরীর কেশরাশির ন্যায় ইতস্ততঃ প্রক্ষিপ্ত, উড়ন্ত, বাউরী, আসক্ত, বলবান, কোটি সর্পের মত—সম্মুখে বিদ্যমান মুখমণ্ডল তথা দেহটিকে কখনও বাঁধিতে কখনও বা কশাঘাতে সুস্ফীত করত—দীর্ঘায়ত করত মধুপান করিতে চাহিতেছে।

ঐ গীত ভেদ করিয়া হরিধ্বনির অট্টরোল উঠিল। পুনরায় জলদ্গম্ভীর শ্লেষাত্মক ক্রুর নিষ্ঠুর কর্কশ কণ্ঠে 'হরিধ্বনি' শ্রুত হইল। বৃক্ষস্থিত পক্ষীসকল ত্রাসিত, কাহারও বা স্বীয় অসাবধানতা বশত, বক্ষ

রক্ষিত ডিম্ব সকল, পরস্পর আঘাতে শব্দ করিয়া উঠিল।

যশোবতী গীত না থামাইয়াই এই ভয়ঙ্কর আওয়াজ শুনিয়াছিলেন এবং তদবস্থায় ভেড়ীপথের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করত দেখিলেন, ইহা শব যাত্রীদের হরিধ্বনি নহে, মাত্র একজন লোকই স্কন্ধে একটি বাঁক লইয়া অল্প দুলিতেছে। দেখিলেন, এই কায়ার পদনিম্ন হইতে মৃত্তিকা খসিয়া গেল, সে কোনমতে আপনাকে সামলাইয়া কিছুক্ষণ পরে বাঁক লইয়া একভাবে নামিয়া গেল। কায়াটিকে আর দেখা গেল না। কেন কি জানি, তাঁহার মনে হইল, পুনর্ব্বার বিকট হরিধ্বনি হইবে। তিনি গীত থামাইয়া স্বামীর কানে তূলা ভরিয়া দিবার কালে দেখিলেন, সীতারাম অদ্ভুত আরামে নিশ্চিহ্ন। তাঁহার দেহ যশোবতীর সুখকর প্রীতিবর্দ্ধক স্পর্শ দ্বারা আমোদিত, প্রহৃষ্ট করিতে প্রয়াস পাইলেন।

যশোবতী অন্যমনা হইয়া ভেড়ী পথের দিকে দৃষ্টি ফিরাইলেন। সেখানে কেহ নাই। কেবলমাত্র পূর্ব্বকার ঘটনার স্থানটি দর্শনে নববধূ শিহরিয়া উঠিলেন, একদা যাঁহার স্বরভেদ প্রলয়কালীন অবস্থার সূচনা করিয়াছিল, তাঁহার এ বৈলক্ষণ সমুৎপন্ন! এই ক্ষুদ্র ছাউনির আশ্রয় যতটুকু আশ্বাস নির্ভর, তাহা তাঁহার দেহে সঞ্চারিত করিয়াছিল! এখনকার ছায়াই তাঁহার নির্ভরতা!

"বউ..." ইহার পর বৃদ্ধ অসম্ভব শক্তি সঞ্চয় করিয়া কহিলেন, "মাটি মাটি, ভিজে ভিজে..."

যশোবতী ইহার অর্থ সঠিক করিতে না পারিয়া ভাবিলেন স্বামী বোধ করি কোন ঔষধ চাহিতেছেন। ইতিমধ্যে বৃদ্ধ কিছু বলিবার আপ্রাণ চেষ্টায় পরিশ্রান্ত। যশোবতী অত্যন্ত ব্যগ্র তৎপরতার সহিত মস্তকের নিকটে রক্ষিত ছোট হাঁড়ি খুঁজিতে গিয়া তুলসী গাছটি হেলিয়া স্বামীর কাঁধে পড়িল, যশোবতী এক হাতে তুলিয়া ধরিলেন।

"গাছ..."

যশোবতী, তুলসী চারাটি তাঁহার কাছে লইয়া যাইতেই গাছটি নিকটে পাইয়া বৃদ্ধ যেন উচ্ছ্বসিত; তিনি কী অনুযোগ করিয়াছিলেন তাহা আর স্মরণ ছিল না। গাছটি যেমন প্রস্ফুটিত চম্পকদাম, বৃদ্ধের আগ্রহ-আতিশয্যে যশোবতী ইহাকে বৃদ্ধের হস্তস্পর্শ করিবার সাহায্য করিলেন।

বৃদ্ধ সীতারাম এক্ষণে তাঁহার হস্ত দ্বারা যশোবতীর সাহায্যে গাছটির নিম্নে কি যেন খুঁজিতে খুঁজিতে—অন্ধকারে এতদিন পরে সর্ব্বার্থসাধক কিছু অন্বেষণে একাগ্র, হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "শিকড়" কোন ক্রমে নিজের নাসিকার নিকটে আনিলেন। কণা কণা মৃত্তিকা পড়িল। মুখগহ্বরে প্রবেশ করিল, তিনি আস্বাদ গ্রহণ করিয়াই "মাটি" বলিয়াই অসম্ভব জোরে স্ত্রীর উরুদেশে আহ্লাদে এক চাপড় মারিলেন। তুলসী গাছটির নিম্নের মৃত্তিকাকে এই আশ্চর্য্যভাবে আস্বাদন করিতে দেখিয়া নববধূর মনে হইল যেন স্বামী তাঁহারই, যশোবতীর, প্রথম সন্তানের আস্বাদ গ্রহণ করিতে উৎফুল্ল।

বৃদ্ধের মস্তক উত্তেজনায় অনেকখানি ছাড়িয়া উঠিয়া আবার যথাস্থানে ফিরিল। "আঃ আঃ বউ..." কোন ইন্দ্রিয় যেন চরিতার্থ হইয়াছে। যদিও যশোবতী স্বামীর এরূপ ব্যবহারকে উন্মত্ততার লক্ষণ বলিবার মত সময় পান নাই, তথাপি ইহা যথার্থ যে, তিনি কিঞ্চিৎমাত্র বিচলিত হইয়াছিলেন। সকল সময়ই তাঁহার মনে হইতেছিল, বাবলাকাঠ নির্ম্মিত হালের ফলা যেমত বৎসরে একদা লক্ষ মাণিক্যের বিভা ফিরিয়া পায়, তদ্রূপ, বৃদ্ধ যেমন বা শক্তি ফিরিয়া পাইয়া বলীয়ান হইয়া উঠিয়াছেন। ইহাতে, তাঁহার ইচ্ছা হইল, তিনি যেন স্বামীর ছায়ার মত হইবার সৌভাগ্য লাভ করেন, তাঁহার ইচ্ছা হইল ইঁহার আড়ালে যেন তাঁহার স্থান হয়।

গাছটিকে বৃদ্ধের মস্তকে স্পর্শ করাইয়া যথাস্থানে রাখিয়া বস্ত্র সম্বরণপূর্ব্বক একটি স্বস্তির নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করত স্বামীকে সহসা নূতন করিয়া আবিষ্কার করিলেন।

বৃদ্ধের ক্ষীণ চক্ষু বৈদূর্য্যমণির ন্যায় প্রভাসম্পন্ন এবং বৃদ্ধ ওষ্ঠ বিভক্ত করিয়া মহাবিশ্বাসে ক্রমে ক্রমে, "বউ আমি আবার ঘর পাতব..." এবং কিয়ৎ পরিমাণে দম লইয়া কহিলেন, "ছেলে দুব"। এ হেন অহঙ্কারে স্থাবর ও জঙ্গমসমূহ উলুধ্বনি ক'রে, বিশাল বিন্দুতে পরিণত হইল। হায়, ইহার পরই কি ঘোর যুদ্ধের শুরু, ইহার পরই কি বসুধা শিশু হস্তীর মত মহারঙ্গে দুলিয়াছিল? ব্রীড়াবনত নববধূ মুহূর্ত্তের জন্য দিকসমূহ এবং ত্রিলোক লইয়া নিশ্চিন্তে কড়ি-খেলা করিলেন।

"এখন থাম, তুমি আর কথা বল না" বলিয়াই স্বামীর কর্ণের নিকটে গিয়া গান শুরু করিলেন। বুঝিলেন তাঁহার কর্ণের তূলা অপসারণ করা হয় নাই, তদ্দণ্ডেই তূলা অপসারণ করিয়া কহিলেন, "কি

হচ্ছে গো...”

“বড় মন কেমন করছে।”

একথা শুনিয়া দয়িতার মন ভাবাবেগে অধীর; তদুত্তরে কিছু বলিবার ছিল না, আপনার পুষ্প-তীর্থ নয়নের, এক্ষেত্রে, অবলোকনই সৰ্ব্বেব সত্য। তবু তাঁহার স্বর শ্রুত হইল। “আর ভেব না গো...” বলিয়া স্বামীকে ঘুম পাড়াইবার চেষ্টায় তাঁহার সুখস্পর্শ হাতখানি পালকের মত অনুভব বৃদ্ধের কপালে দান করিল।

সীতারাম সম্ভবত ঘুমাইলেন।

যশোবতী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বৃদ্ধের সমান নিঃশ্বাস বায়ুর গমনাগমন নিরীক্ষণে বিস্ময়াভিভূত তন্ময়। একদা আপন সরলতাবশে, স্বীয় নিঃশ্বাস প্রশ্বাস কিঞ্চিন্মাত্র অনুভব করত তিনি স্বাভাবিকতা আশ্রয়ী। তাঁহার নিদ্রা নাই, জাগরণ লইয়া অপেক্ষমাণ হওয়া, বসিয়া থাকার এই সূত্রপাত, তৎকালেই তিনি ইহাও দেখিয়াছিলেন যে, নিকটে, দূরে, বায়ুও দুর্দ্দিনকারিণী মহতী মায়ায় আরূঢ় হইয়া তথা প্রতিকূলতা স্ফীত হইয়া উঠিয়া ইতস্ততঃ বিচরণশীল এবং মধ্যে মধ্যে ভস্মরাশি লঘু স্বচ্ছ মেঘের ন্যায় বেলাতট অতিক্রম করিয়া অবশেষে লতাগুল্মতরুরাজির গহনতায় বিলুপ্ত। আর যে, যশোবতী এ জাগরণ লইয়া একভাবে বসিয়া কালক্ষয়ে নিমগ্না, যে জাগরণের কোন চিত্র-রূপ নাই, ইহা মনোরম দীপ্তি সমন্বিতা সর্ব্বদাই বাস্তবতাকে পরোক্ষভাবে জ্ঞান করে, পদ্ম এবং ভ্রমরের মিলন, একটি অভিনব ইসারায় তাঁহারই সমক্ষে উপস্থিত; যদিচ ইহা অমোঘ সত্য যে, এখন পুত্রবৎসলা তথাপি এখন মদিরনয়না চন্দ্রনিভানন গুরুনিতম্বিনী যশোবতী আপনার জাগরণে বিনিদ্র।

অনেকক্ষণ পরে যশোবতী ধীর কণ্ঠে সলজ্জভাবে স্বামীর দেহের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, “হ্যাঁ গো, আমার তরে তোমার মায়া হয়?”

ইহা কি জিজ্ঞাসা? অথবা সন্দেহ? এ জিজ্ঞাসার উপর কি যাযাবররা পুনরায় অশ্ব ছুটাইবে; রাত্রে, অগ্নিকে কেন্দ্র করত মণ্ডলাকারে জনগণ, ইহাকে বেষ্টন করিয়া শুধু গীত গাহিতে গাহিতে শুধুই নৃত্য করিবে; দুঃখময় অজস্র বৃত্তাকার পদক্ষেপ।

এ প্রশ্নে সর্ব্বত্রেই বিষাদ দেখা দিল। যশোবতী আবার এই পুরাতন প্রশ্ন করিলেন, “হ্যাঁ গা, আমার তরে তোমার মায়া হয়?”

তাঁহার এই অনাথা, নিঃস্ব, ভিখারী, ভাঙাকপালে, কাঙাল প্রশ্নের উত্তরে সহসা শুনিলেন, “কনে বউ, কনে বউ।”

খুব চাপা স্বর এবং খুট্ খুট্ শব্দ। এ স্বর যেন অন্নময়। এ স্বর মধুর হইলেও ক্ষেত্র-দাহের বীভৎস নিষ্ঠুর আওয়াজের বিকার ছিল। এই ডাকে গোলাপের শোভা নষ্ট হইল; যেন কাব্য প্রলয়ে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে, যেন চিত্র-সংজ্ঞা ধূলাদষ্ট হইয়াছে, যেন মহতী কীৰ্ত্তি অবসন্না হইয়াছে, যেন শ্রদ্ধা অপমানিতা, প্রজ্ঞা ক্ষীণ, যেন দেবস্থান বিধ্বস্ত হইয়াছে, নদী স্বল্পতোয়া, বেদ-ব্রাহ্মণ ধূসরিত হইয়াছে। অথচ বৃদ্ধের ওষ্ঠদ্বয় নির্ব্বাক। ফলে এখন, তিনি চারিভিতে চাহিলেন। একদা ভেড়ীপথের দিকে, আচম্বিতে গঙ্গার প্রতি; দিঙ্মণ্ডলে আলোকিত অন্ধকার। তখনও নববধূ উপলব্ধির অবকাশ পান নাই যে, তাঁহার চিত্ত ঝঞ্ঝাক্ষিপ্ত। তিনি বিমূঢ় অন্যথা তিনি চঞ্চল। ঝটিতি গঙ্গা প্রতি দৃষ্টিপাতে যশোবতী ভূতগ্রস্ত; গঙ্গা চন্দ্রালোক বিচ্ছুরিত উদ্বেল, বেলাতটে মাংসপিণ্ডবৎ, কৃষ্ণবর্ণ স্পন্দিত শরীর—কুম্ভীর যেমত, কে যেন আসিতেছে দৃশ্যমান হইল; তদ্দর্শনে তিনি সম্মোহিতা, আবিষ্ট, নাস্তিক, শক্তিরহিত। একদা তাঁহার স্বীয় অজর-প্রশ্নআত্মক গীতের রেশ তাঁহার কানে আসিল এবং চকিতে তিনি সম্বিত ফিরিয়া পাইয়া পদদ্বয় গুটাইয়া লইয়া আধো-উঠা অবস্থায় স্বামীর দিকে সরিয়া গিয়াছিলেন।

পুনরায় “কনে বউ কনে বউ” ডাক।

সম্মুখে অপকীর্ত্তি। নীল মেঘসদৃশ অবয়ব এখনও গতিশীল। তিনি ব্যাঘাক্রান্ত যূথভ্রষ্টা হরিণীর ন্যায়, যেন নিজ শরীর মধ্যে প্রবিষ্টা হইয়া অধিকতর কম্পিত হইলেন। ইহা ব্যাকরণ-সংস্কারহীন অর্থান্তর প্রতিপাদক বাক্যের ন্যায়, অনেক কষ্টে বুঝিতে পারিয়াছিলেন উহা একটি দেহ; উহা শ্মশান ও চৈত্যবৃক্ষের ন্যায়, উহা চণ্ডাল।

চণ্ডাল বৈজুনাথ সাষ্টাঙ্গ বিস্তার করত, বুকে হাঁটিয়া আসিতেছে আর মধ্যে মধ্যে কলস ভাঙ্গানি

খোলামকুচি—যাহা তাহার আগমনে বিঘ্ন উৎপাদন করে, তাহা কুড়াইয়া ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া পিছনের দিকে ফেলিতেছে; এই ভয়ঙ্কর সর্পিল গতিকে ছাপাইয়া বড় আপনার করিয়া 'কনে বউ' ডাকটি শোনা যাইতেছিল, সে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। ইহাতে যশোবতী ত্রস্ত হইয়া, কি জানি কেন, অচিরেই স্বামীকে আগলাইয়া দেহটির দিকে চাহিলেন। কি জানি কেন এই মরু-রাত্রে এ হেন বাধাকে, সহসা হাস্যোদ্দীপক মজার, রগড়, আমোদজনক মনে হয় কিন্তু নিমেষেই সেই প্রতিক্রিয়া আবছায়া, ক্রমে লুপ্ত এবং তিনি পদাঘাত নিমিত্ত পা উঠাইয়া ক্ষণেক তদবস্থায় রাখিয়া ধীরে ধীরে যথাস্থানে পা'টি রাখিলেন, একারণে যে তিনি বুঝিয়াছিলেন, শত্রু তাঁহার আস্ফালনের বহু দূরে।

সেখানে এখনও ভাঙা খোলামকুচির টুকরা উর্দ্ধে উঠিয়া অদৃশ্য, এই খোলামকুচির টুকরা অগণন দেহের পথ প্রদর্শন করে—যে দেহগুলি বীভৎস, ভয়াল, শ্লেষ্মাবৎ এবং অশরীরী; তাহারা সকলেই তৃষ্ণার্ত্ত, তাহারা সকলেই বৈজুর অন্তরঙ্গ; যাহাদের লইয়া সে খেলা করে। নববধূ উপলব্ধি করিলেন সেই প্রেতগুলির—কাহারও হস্তে মরুভূমি, কাহারও হস্তে অপঘাত, কাহারও বা হস্তে চোরাবালির আজ্ঞা। ইহারা অগ্নিকে স্বীকার করে না। ইহারা অন্তঃসত্ত্বা ছাগলকে ভালবাসে...। এই ভয়ঙ্কর শোভাযাত্রা বৈজুর উর্দ্ধেই প্রতিভাত, তাঁহার তালু শুষ্ক, যেখানে সিক্ততা নাই আর্দ্রতা নাই জল নাই, সেখানে শব্দও নাই; যশোবতী তৃষ্ণার্ত্ত; আর ভৌতিক দৃশ্য ক্রমশঃ অগ্রসর হয়।

বৈজুনাথ অনুচ্চ রবে হাসিল, এ সময় বক্ষখানি তুলিয়া ধরিয়াছিল, এবং একটি নিঃশ্বাস লইয়া কহিল, "কনে বউ, আমি ভূত নই, প্রেত নই...। আমি বৈজু বটে গো।"

যশোবতীর সঘন, উপর্য্যুপরি নিঃশ্বাসে কবরী খুলিয়া গেল, তাঁহার মস্তক আন্দোলিত হয়।

"তবে বটে, ভূত প্রেতের সঙ্গে আমার কথা হয়, তারা আমার স্যাঙাৎ" বলিয়া মাটির নিকটে মুখ রাখিয়া হাস্য করিতে কিঞ্চিৎ ধূলা উড়িল এবং সে যুগপৎ কহিল, "আমাকে এক বেটা 'ও ঘুম এই ঘুম' বলি ডাকে, আমি সে শালার বুকে লাথি মারি"—একথা শেষ হওয়ায় উর্দ্ধস্থিত অশরীরী যাহারা তৃষ্ণার্ত্ত—তাহারা হা-হা করিয়া হাসিয়া খুসী হইল। পুনরপি ভগ্নস্বরে সে বলিতে আরম্ভ করিল, "তুমি জান...তুমি কি? দোসর...ভাঙ্গা কুলো। আমি বৈজুনাথ, আমার বটে মড়া পুড়বে সহ্য হয়" বলিয়া বালকের ন্যায় আহ্লাদিত হইয়া, ভঙ্গী সহকারে কহিল, "চিতায় যে কত লোক আমার হাতে ঠেঙা খায়, আমার দরদ নাই..." আবার অনুচ্চ হাসির শব্দ করিয়া দৃষ্টি নামাইল। পরক্ষণে বুকফাটা কণ্ঠে কহিল, "কিন্তু জ্যান্ত কেউ পুড়বে আমার আমার কষ্ট হয়..." বলিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া, আপনার হস্ত ঠোঁটিতে ঘষিতে লাগিল; তাহার পশ্চাতে, নিম্নে, সমতল গঙ্গা স্রোতোময়ী।

"ওগো বাবু আমি ভাবের পাগল নই—আমি ভবের পাগল! তুমি পুড়বে চচ্চড় করে...ভাবতে আমার—চাঁড়ালের বুক ফাটছে গো" এবং বৈজুনাথ কহিল, "তুমি পালাও না কেনে।" এ স্বর যেমত বা দাড়িম্বকে বিদীর্ণ করিয়া উৎসারিত।

যশোবতী একথা শুনিবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, তিনি আপনার হস্তের একটি বলয় তাহার প্রতি নিক্ষেপ করিবার মানসে প্রায় খুলিতে গিয়া মৃতপ্রস্তর; তিনি প্রমাদ গণিলেন।

বৈজুনাথকে নববধূর দেহস্থিত কিয়দংশে অবিড়ম্বিত চন্দ্রালোক যেন উৎসাহিত করিল, ধীরে ধীরে কহিল, "আমি বড় গতরক্যাঙলা লোক গো, কনে বউ, তুমি পুড়বে, আকাশ লাল হবে, ভয়ে গোরু পর্য্যন্ত বিইয়ে ফেলবে গো। তুমি গেলে, কি আর বলব আমি চাঁড়াল, দেশে আকাল দেখা দেবে...লাও...লাও তুমি পালাও...কনে বউ পালাও।"

ইতিমধ্যে হস্ত হইতে বলয়খানি বিচ্যুত হইয়া তাঁহার হিতাহিত জ্ঞানকে স্পষ্টতর করে, পুনরপি বলয়টি ঝটিতি তির্য্যকভাবে দেখিলেন, দেখিলেন গত সন্ধ্যায় তিনি সম্যক স্বাধীনতা দিয়া তিনিই বন্ধনলীলায় মুমুক্ষু; আর যে বন্ধন-তিতিক্ষার নামই ত স্বাধীনতা! এবং ভগবান তাঁহার কোলে, ফলে নয়ন নিমীলিত করত পথ অনুসন্ধান মানসে কিয়ৎক্ষণ যাপন করিলেন। অনন্তর যশোবতী বৈজুনাথের সকল কথা যাহা তখনও নিকটস্থ শূন্যতাকে বিচলিত করিয়া ঘূর্ণায়মান, তাহা শুনিতেছিলেন; কিন্তু কতখানি যে তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা নির্ণয় করা কঠিন নহে। অসম্ভব রাগান্বিত হইয়া কি যেন বলিলেন; হায় এখনও তিনি তৃষ্ণার্ত্ত অথবা উর্দ্ধলোকের বীভৎস প্রেতসকলের, যাহারা নিয়ত তৃষ্ণার্ত্ত—তাহাদের প্রতিধ্বনি মাত্র; শুধু শব্দ হইল। যে শব্দের অর্থ নাই। ইহার পর তিনি শক্তি সঞ্চয়

করিয়া মাটিতে একটি পদাঘাত করিলেন...।

...সঙ্গে সঙ্গে বৈজুনাথ গড়াইয়া কিছু দূরে গেল, তাহার গাত্র ধূসরিত হরিৎশোভা, সে সংযত চিত্তে বলিল, "কনে বউ তুমি আমাকে ভয় পাচ্ছ, আকাশের লেগে ভয় পাও হে, মাটির লেগে ভয় কেনে?" বলিয়া আর এক পাক দিল; ইহার পরে বেলাতটের দিকে চাহিয়া কহিল, "তুমি আকাশ কালো করবে গো, হাতী হাতী ধোঁয়া উঠবে, সতী হবে, তোমার নামে কত মানত, কত নোয়া শাঁখা জমা হবে। তোমার নামে অপুত্রের পুত্র হবে, নির্ধনের ধন হবে।" ক্ষিপ্রবেগে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "তোমার বরে হিজড়ে ঢ্যাঁড়া দিবে হাটে—হো সতীর বরে গো মানুষ হইলাম" বলিয়া হাসিয়া আরবার কহিল, "তোমার স্বগ্‌গে বাস হবে, পান তামাক পাবে। হ্যাঁ গা কনে বউ, স্বগ্‌গটা কেমন গো—দুধ আলতায়?" ইহার পর অদ্ভুত হাস্য করত আপনকার মস্তক মাটিতে স্থাপনা করে; এ-মাটি বড় সুন্দর, তাহার কেশরাশিতে মৃত্তিকা লাগিল।

যশোবতীর হিম রোমাঞ্চ ক্রমে শব্দ হইয়া আসিল।

বৈজুনাথ, তদ্রূপ, পূর্ব্বের ন্যায় পাক দিয়া ঘুরিয়া গেল। বলিল, "কনে বউ ভাবের ঘরে চুরি...ভাল লয়..." এই বচনের মধ্যে শ্লেষময় সাবধানতার হুঙ্কার ছিল। কহিল, "ভাবের ঘরে চুরি ভাল লয়" মনে হয় সে যেন কানে কানে কথাটি কহিতেছে। বাণবিদ্ধ পশু যেমত মুখখানি হন্তার দিকে তুলিয়া চাহিয়া থাকে, সেইভাবে বৈজুনাথ মুখটি তুলিল। ক্রমে পতিতপাবনী গঙ্গার দিকে চাহিয়া উচ্চারণ করিল, "ভাবের ঘরে চুরি।" অবশেষে তাহার মুখটি নিস্তব্ধ 'না'য় পরিস্ফুট।

"ছাই মেখে বসে থাকলে কি মতে ঠাকরুণ, তুমি ত আর পান্না ভৈরবী লও গো, যে নোড়াকে শিব বলবে হে! যত ছাই মাক্‌খো হে, সোনার প্রতিমা সূর্য্যি সূর্য্যিই; তুমি বড় সুন্দর গো, শ' শয়ে দেখেছি, তোমার মত দেখি নাই" বলিয়াই পাক দিয়া আবার সে ঘুরিয়া নিকটে আসিল। খোলামকুচি সকল গায়ে বিদ্ধ হয়। বলিল, "আমি ভাবের কথা বললাম না হে...আমি ভাবের পাগল, আমি জাত চাঁড়াল, ভাব পাব কোথা গো, ভাব আকাশগাছের ফল, তবে হ্যাঁ তুমি যদি বল...কেনে গো চাঁড়াল? হাটভাতারী খানকি মাগীর দুয়ারের মাটি যেমন সত্য হয়, পুণ্যের ভোগ; তেমনই হে, শ্মশান মশানের মাটিতে" বলিয়া এক মুঠা মাটি তুলিয়া মুষ্টি উন্মুক্ত করিতে করিতে বলিল, "তুমি বলবে, এই মাটিতে ভাবের কথার হরিনুট...তুমার আবার ভাবনা কি গো" ইহার পর নিজেই উত্তর করিল, সে মাগী যেমন খানকিই থাকে পুণ্য পায় না; হারে কপাল! তেমনি, আমি ভাব পাই না গো, খোল বড় ভালবাসি গো, দেখনা কেনে ভূতগুলো আমার পড়শী স্যাঙাত!" বলিয়া হাতের উপর মস্তক রাখিয়া শুইয়া একদৃষ্টে যশোবতীর প্রতি চাহিয়া রহিল।

কিছুকাল অতিবাহিত হইয়াছে, যশোবতী হৃত শক্তি ফিরিয়া পাইয়াছেন। দক্ষিণহস্তে কাজললতা মুষ্টিবদ্ধ করিয়া কহিলেন, "চাঁড়াল"—এই সম্বোধন-বাক্য তাঁহার কণ্ঠবিবর হইতে ক্ষিপ্ত জন্তুর মত লম্ফ দিয়া বাহির হইল। এবং করস্থিত বলয় ছুঁড়িয়া অন্যান্য দুই একটি অলঙ্কার ঝটিতি খুলিয়া উন্মত্তের ন্যায় ছুঁড়িয়া বলিলেন, "এই নাও...ডাকাত..." তাঁহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইল।

চণ্ডাল বৈজুনাথ ইহার জন্য প্রস্তুত ছিল না, তাহার দশাসই দেহ বাঁকিয়া চুরিয়া গেল। যশোবতীর উক্ত বাক্য প্রতিধ্বনিত হইল। অলঙ্কার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া চণ্ডাল মাটি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখে ক্ষুব্ধ অসহায়তা, ক্রমে ভ্রূকুটির হাসি, পদ্মপত্রে জলের মত চঞ্চল। সে তাহার বাম পদখানি মৃত্তিকার উপর দিয়া সম্মুখে পশ্চাতে লইয়া যাইতে লাগিল গোরু যেমনে ক্ষুর ঘর্ষণ করে, এবং শেষ বারের মত দৃষ্টি নিক্ষেপ করত কহিল, "মর" বলিয়া দ্রুতপদে স্থান পরিত্যাগ করিয়া সে এখন আপনার আড়ায় অদৃশ্য, আর যেন তাহার ছায়াও অন্তর্হিত হইল। ইদানীং তাহার স্থানেই নিম-শূন্যতা, ভ্রমর, দিবাস্বপ্ন।

জ্যোতির্ম্মণ্ডলের যে মনঃস্থিতা অবলীলায় শ্যামঘন পৃথিবীকে আপনার বিচিত্রতায় রাখিতে চাহিয়াছিল, উদ্বুদ্ধ করে, তাহা যেন নাই। যশোবতী ছাউনিতে চিত্রার্পিতের ন্যায়, তিনি নববধূ, তিনি মিলন অভিলাষিণী তাঁহার মাংসল যৌবনকে লইয়া, যে, দূরত্বের ইঙ্গিত সকল, সাফল্যের তন্দ্রা সকলই, হিম তুষার সফেন তরঙ্গ, লাল কম্পনে অরুণাভ গিরিপ্রান্তর সকল যে খেলা করিবে, এ গীত আমন্ত্রণ তিনি শুনিয়াছিলেন। তাহারা বলিয়াছিল, আমাদের বাহু নাই তথাপি তোমাকে তড়িৎ-আলিঙ্গন করিব,

আমাদের ওষ্ঠ নাই তথাপি তোমাকে চুম্বন করিব, আমরা সদেহে তোমার মধ্যে প্রবেশ করত তোমাকে আনন্দ দান করিব। কেননা আমরা নব্য, কেননা যেহেতু আমাদের কল্পনা নাই। তিনি একদা রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়া সম্মুখবর্ত্তী অবকাশ দেখিলেন, আপনার অলঙ্কারগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, ক্লান্ত পতঙ্গ যেমন বা; সোনাকে অবলম্বন করিয়া কোন ঝঞ্ঝা শ্বেত হয়! যশোবতী একইভাবে আপনার মিলন-আগ্রহকে স্পর্শ করিয়াছিলেন।

চণ্ডাল সূক্ষ্ম হইতে পারিল না, আপনার ছোট আড়ায় আসিয়া, সঘন নিঃশ্বাস ফেলিল; সে মনে হয় পলাইয়া আসিয়াছে, সে মনে হয় পথ হারাইয়াছে।

বৈজুনাথ যে দুই কলস মদ আনিয়াছিল তাহার একটি হইতে নরকপালে ঢালিয়া পান করিল, পরক্ষণে নরকপালের দিকে চাহিয়া বিড় বিড় করিয়া কি যেন বা বলিল, রুক্ষ আড়ষ্ট নিঃশ্বাস-কণ্ঠস্বরে পাতা পোড়ার শব্দ, যাহা শুদ্ধ ভাষায় সম্ভবত বলিয়াছিল, "হায় কার অঞ্জলিবদ্ধ হাত, তুমি হাড় হয়ে আছ। এ কপাল কাহাকে আহ্বান করে। মন কি সকল সময় উর্দ্ধলোকে—সেখানে যায়!"

ইহার পর অঙ্গুলি দিয়া আসব গ্রহণ করত চুষিতে লাগিল। যদিও সে এ প্রশ্ন করিয়াছে, যদিও সে আপনার মধ্যে শ্রান্তিকে দর্শন করিয়াছে, আপনার অনুভব স্রোতকে তাহার নিজস্ব প্রকৃতিতেই দেখে, তবু পুনরায় ঢালিল। পান করিয়া গঙ্গার তীরে গিয়া দাঁড়াইয়া ব্যাকুল স্বরে কহিল, "মা মা গো লেমিনাথ শালাকে জরিয়ে দাও গো, আর পাপ নয় মা গো...পাপীকে উদ্ধার কর।" বলিতে বলিতে বৈজু তাহার নিজের দেহের মধ্যস্থিত এক অত্যাশ্চর্য্য গাম্ভীর্য্যের সম্মুখীন; অন্যপক্ষে হ্রদ, তুষার, বহু বহু, জলে স্থলে উর্দ্ধে যাহা কিছু বাক্যের অন্তরালে অশরীরী হইতেছে, ইহারা তাহার স্বপ্নের সামগ্রী, ইহারা তাহার পথিপ্রজ্ঞার ফলক, যে সে সুখে নিদ্রা যাইতে পারিবে তাহারই এই অপরিমিত আয়োজন। অনন্তর রাগত স্বরে কহিল, "শালী", বলিয়া কয়েক পদ ছুটিয়া আসিয়া হয়ত সংস্কার বশে, হয়ত রুষ্টকর্ম্মা নিয়তি তাহাকে বিড়ম্বিত করে, অগ্নিহীন চিতায় নামিয়া স্থির; ভস্মরাশি, তাহার সহসা পদাঘাতে চকিত, বিভ্রান্ত; বৈরাগ্যজননী এই চিতায় এখন সে এবং তাহার ছায়া। সে ঘোর শেষ লইয়া একা; অদূরে অসংখ্য বাক্যনিচয় নিরর্থক। এত দুর্দ্ধর্ষ শরীরে এক ভীম উর্ব্বরতা এখন দারুভূত; উপরের উৎকৃষ্ট প্রতিবিম্ব এবং নিকটের স্রোত সর্প-মিথুনের মত, দিব্য, সুস্থ, চিত্তহারী বন্ধনে দীপ্যমান। চিতামধ্য হইতে এ লীলাচাতুর্য্য দেখিয়া সে যুগপৎ বিহ্বল, চমকিত, রিক্ত। ঝটিতি আপনার বল লাভ করিয়া উন্মত্ত হইয়া হুঙ্কার দিয়া হরিধ্বনি করিল, উত্তরোত্তর তাহার কণ্ঠ উচ্চগ্রামে উচ্চগ্রামে।

মনুষ্যদেহী চণ্ডালের ঈদৃশ দুঃসহ সঘন চীৎকারে দিকসকল আর এক চক্ষুতে পরিণত, ভ্রাতৃজীবনসকল ত্রাসযুক্ত; বৃক্ষ পত্রাদি থরহরি এবং সুখ-নীড় এ পৃথিবী এক মহাধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইল, বিশ্বসংসার বুঝি যায়!

তাহার কণ্ঠনাদে এ-বাক্যই ঘোষিত হইল যে আমি, বৈজুনাথ, মাতা যেমন দেহ দেন, তেমনি নরদেহকে আমি সৎকারে সাহায্য করি। সেই বৈজুনাথ এক অবৈধ প্রণয় দেখিয়াছে, এক বিসদৃশ মিথুনের সে দ্রষ্টা, যে মিথুন অন্যায়, যুক্তিহীন। আপনাকে স্বকীয় চীৎকারে সম্মোহিত করত চিতা হইতে এক লম্ফে উঠিয়া অসূর্য্যম্পশ্যা ব্যাকরণশুদ্ধ অন্ধকারকে আপনার ভাই সম্বোধন করিয়া দাম্ভিক হইল এবং কিছুক্ষণ পরে নবদম্পতির চাঁদোয়াকে বেষ্টন করিয়া, বৈজয়ন্তীমালার ইঙ্গিত ধরিয়া, সহুঙ্কারে ছুটাছুটি করিতে লাগিল, মুখে "ওই লম্বোদরজননী হাই শিবশম্ভো" এবং তাহার দক্ষিণ হস্ত উর্দ্ধে ঘুরিতে ব্যস্ত।

যশোবতী বিস্মিত হইবার পূর্ব্বেই সীতারাম, এই ভয়ঙ্কর শব্দে, কাঁদিয়া উঠিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "শীত শীত..." বলিয়া স্ত্রীকে আঁকড়াইয়া ধরিতে চাহিলেন। যশোবতী স্বামীর হস্তদ্বয় আপনার কণ্ঠে স্থাপনা করত এখন অন্য হাতে কাজললতা মাটিতে ঠুকিতেছিলেন।

বৈজুনাথ এখন শুধু "বল হরি হরি বোল...লম্বোদর" বলিয়া তাঁহাদের চক্রাকারে পরিভ্রমণ করিতেছে। তাহার পদখনিত ধূলা উড়ে, ছায়া মাটিতে নাই, যাহা জৈবিক, যাহা মনহীন, যাহা হয় অহিতৈষী।

যশোবতী আর সহ্য করিতে পারিলেন না। আপনার দুর্জ্জয় সাহস নিজেকেই আতঙ্কিত করিল, তিনি শুধু নানাবিধ একত্র মিশ্রিত—ব্যাঘ্র কভু কর্কশ, চক্রবাক সহসা তীক্ষ্ণ, বায়স কভু দীর্ঘ, ঋষভ ঝটিতি উদ্ধত—নিনাদে উচ্চারণ করিলেন, "এই...এই।"—অর্থাৎ খবরদার খবরদার।

নয়ন সমক্ষে এ কোন ভীম তীব্রতা!

সীতারাম এখনও তেমনি আলিঙ্গন করিয়া আছেন, যে আলিঙ্গনের প্রতি বিন্দুতে, কেয়ারিতে, বিশাল দিব্য সুদীর্ঘ শেষহীনতা ঝিম; যে, অতিবড় গঞ্জের-বারাঙ্গনায়ও পর্যন্ত সে-সুদীর্ঘতা বুঝিতে সমুৎসুক; এবং এই অপ্রাকৃতিক আরাম যাহার অন্তর্ব্বর্ত্তী চন্দ্রালোক, যে চন্দ্রালোকের অন্তর্ব্বর্ত্তী ভ্রমণশীলতার অভিধা, যে ভ্রমণশীলতার অন্তর্ব্বর্ত্তী সুন্দরের উষ্ণতার বিচিত্রতার মাধুর্য্যের সুধার লৌকিকতার জ্যামিতির ভূমিকার উৎপ্রেক্ষা অবর্ণনীয়া; তাহাকেই, সেই আরামকেই রমণীকুলশ্রেষ্ঠা যশোবতী আপন রোমকূপ-সহস্র, যাহা পুরুষ মানুষের, ইতরজনের অবাঙ্‌মনসগোচর, তাহা দ্বারা স্বাদ গ্রহণে প্রগল্‌ভ; এই হেতু যে ইতঃপূর্ব্বের বৈজুনাথের চক্রান্ত যাহাতে শ্মশানের মেদগন্ধযুক্ত মৃত্তিকা চিরতপ্ত এবং সে তাপ হরিৎহরণকারী, তাহা মৃত্যুকে বীভৎস ফলে জীবনকে জঙ্ঘাদ্বয়ের মধ্যে লুক্কায়িত করিতে উৎসাহদানে—বিফলকাম হইয়াছে, একারণ জঙ্ঘা যেহেতু তাহাই মানুষের একমাত্র পলায়নের ক্রোড়, অন্যপক্ষে স্বাধীনতা। চক্রান্ত বিফলে যশোবতী জয়গর্ব্বিত, ফলে তিনি ভাবনাবিরহিত মনে তখন সেই অলঙ্কার বলয় ইত্যাদি, যেগুলি আত্মরক্ষাকল্পে ব্যবহার করিয়াছিলেন, সে সকল পুনরায় সংগ্রহে ব্যাপৃতা হন। অদূরে চণ্ডালের দেহ চিহ্ন, বেলাপৃষ্ঠে মুদ্রিত, বৈজুনাথ যেন বা আপনার এই ছায়াকে পাহারায় রাখিয়া গিয়াছে। তাঁহার এই অলঙ্কার সংগ্রহ যাত্রা না অভিসার, শূন্য তীর ঝটিতি মহাগুল্ম, তৃণস্থান, লতাবিতান গহন কাননে আচ্ছাদিত। শুধু মৃত্তিকা ও তাহার অচ্ছেদ্য সম্পর্ক এখানেই তিনি অলঙ্কারাদি অন্বেষণ করেন, হৃত সম্পদ লাভ করিয়া একদা গঙ্গায় তাহা শুদ্ধ করিবার নিমিত্ত কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াছিলেন, তিনি তীরে দণ্ডায়মানা, নিম্নে জলোচ্ছ্বাস; সহসা তাঁহার ধারণা হয় স্রোতোধারার উপর আপনার সম্পদ সমুদয় মেলিয়া ধরিলেই শুদ্ধ হইবে, ইহাতে পর আবার এই আক্রমণ।

উগ্রতেজা বলিষ্ঠ বৈজুনাথ এখনও তেমনিভাবে তাঁহাদের বেষ্টন করিয়া সবেগে ধাবমান, তাহার পদদলিত তপ্ত ও তীব্রতর প্রভাবিশিষ্ট ধূলারাশি শূন্যমার্গে উত্থিত; সে দাম্ভিক, তাহার ঔদ্ধত্যের পরিসীমা নাই, তাহার বেগবিক্রমে একথাই প্রকাশিত যে, আমি মহাবিটপীসকল অক্লেশে উৎপাটন করিব, আমি উত্তুঙ্গ গিরিসকল বিদারণ করিব, আমি মত্ত সাগরকে সংক্ষোভিত করিব। স্বপ্নের দ্রষ্টাকে আমি দাস রাখিব, আমার গতি অব্যর্থ, কি সাগরশৈলে কি বনে অথবা পাতালে—কোথাও আমার গতি প্রতিহত হয় না।

সীতারাম-অভিলাষিণী যশোবতী দুরদৃষ্ট দর্শনে প্রমাদ গণনা করিলেন; একধারে, অতি প্রতীক্ষার অরুণাভ ভেদ করিয়া মনসিজ আলিঙ্গন; অন্যত্রে জাগরণে, প্রত্যক্ষে—নাদ উচ্চনাদ গর্জ্জন মেঘরব, এবং ধূলারাশি! সাধ্বী আর এক মুহূর্ত্তকাল বিলম্ব না করিয়া স্বামীর আলিঙ্গন এক স্থানে রাখিয়া অর্থাৎ স্বামীর ভয়ার্ত্ত হস্তদ্বয় হইতে আপনাকে মুক্ত করত কোমরে কাপড় জড়াইয়া কোন সময় যে কাজললতা হাতে দুষ্টকর্ম্মা চণ্ডালের পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাহা তিনি নিজেই জানিতেন না। কালসর্পের মত বেণী চমকাইতে লাগিল, এবং তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের সাধনার দেহখানি শুধুমাত্র শব্দময়। আননে চন্দ্রালোক নাই, নিয়ম লঙ্ঘন করত এখন, ওতপ্রোত সূর্য্যালোক দীপ্তি দান করে।

চণ্ডাল তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিল; বৈজুনাথের দেহ যেমত বা একটি সাষ্টাঙ্গ খাড়া প্রমাণ; দেখিল গঙ্গায় যেন ঢল নামিয়াছে; দেখিল, যাহা ভয়ঙ্কর উহা দুষ্প্রধর্ষ, তাহা অভিরাম, হাজার জোনাকি। সে গতি কোনক্রমে সম্বরণ করিয়া দুই পা পিছাইয়া গিয়াছিল, নিরক্ষর বিড়ম্বনায় তাহার শ্রবণশক্তি ক্লীব, দৃষ্টি হস্তীদলিত অন্ধকার মাত্র; গঙ্গাতীরে, স্তব্ধতার তলে, কেন না স্রোত অধুনা রেখানিচয়, বৃদ্ধের গোঙানির শব্দ শোনা যায়। চণ্ডাল ভূত-চালিতের মত কি জানি কেন আপনার হস্ত প্রসারিত করিয়া ক্রমে ভীতভাবে নামাইয়া লইল, আপনার ওষ্ঠ লেহন করিল।

"চণ্ডাল"—শুদ্ধভাষায় মানিনী যশোবতী তারস্বরে হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন; ইনি সেই যিনি আপন দয়িতের ভয় নিবারণার্থে ভয়ঙ্কর ডাকে একদা সমস্ত মেদিনীকে প্রকম্পিত, সমস্ত স্পন্দনকে শিথিল করিয়াছিলেন। অতএব তাঁহার নির্ভীক উচ্চনাদে বৈজুনাথ বিহ্বল; সে কোনক্রমে আপনকার চক্ষুর্দ্বয়

তুলিয়া সেই অপূর্ব্ব রমণীকে অবলোকন করিতে গিয়া আকল্প নবীন অতি সূক্ষ্ম স্পন্দনের বিভূতি দেখে, যাহা দিব্যচক্ষুর অন্তর্গত, যাহা কাব্য-মনসার চিৎস্বরূপ; তথাপি মূঢ় বৈজুনাথ, যে সন্ধ্যা এবং ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত সম্পর্কে নিশ্চেতন অনভিজ্ঞ, সে আপনার সুদীর্ঘ নিঃশ্বাসে আপনাকে বলবান করিয়া রূঢ় চক্ষে চাহিল, এবং নির্ব্বোধের ন্যায় ঈষৎ হাস্য করিল।

যশোবতী সরোবর সরিৎ, নদী, লতাগুল্মাদি সপ্তপর্ণবনানী, গিরিসমূহ, ভূতগ্রাম সকলের, মৎস্যাদি উভচর সকলের যেন—পথরোধ করত এখনও দৃঢ়, একক; তাঁহার অবগুণ্ঠন নাই, হস্তে সীতারামের কাজল চর্চ্চা নিমিত্ত ফলক ইব কাজললতা, মারাত্মক ছুরিকার ন্যায় শোভা পাইতেছে; ঈদৃশী লজ্জাহীনতা এবং দুর্জ্জয় আভঙ্গ দেহসৌষ্ঠবের মধ্যে তিনি নিশ্চয়ই বিদ্যমান ছিলেন, তন্নিবন্ধন অনন্তর চণ্ডালকে পূর্ণভাবে নিরীক্ষণ করত কহিলেন, "তোমার...তোমার মনে কি কোন মায়া-দয়া নেই" একথা বলিতে বলিতে তাঁহার, হরিণনয়না যশোবতীর, সুতপ্ত অশ্রুধারা নামিল।

এ হেন বাক্যে অনার্য্য চণ্ডালের শিরা-উপশিরা হা-হা করিয়া উঠিল, আজন্ম ক্ষুৎপিপাসা কাতর তাহার মন, কথাগুলিকে যেমত বা আহার করিবার মানসে আঘ্রাণ করিল এবং উত্তর দিল, "দয়া মায়া..." এ উচ্চারণে ভ্রূভঙ্গ ছিল।

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিধ্বনিত করিলেন, "হু"—তখন তিনি ক্রোধে ফুঁসিতেছিলেন।

"বটে বটে, এ শ্মশানে" বলিয়া বৈজুনাথ অত্যধিক তাচ্ছিল্য-সহকারে সমগ্র শ্মশানকে অঙ্গুলিদ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া পুনরায় যোগ করিল, "এ শ্মশানে পাব কুথাকে গো কনে বউ"—এ সময় তাহার অঙ্গুলিতে চন্দ্রলোক লাগিয়াছিল, এবং ইহার পর আপনার মনে 'দয়া মায়া' বলিয়া হাসিয়া উঠল।

যশোবতী চণ্ডালের হাস্য তরঙ্গের প্রতি মনোনিবেশ করিলেন, তখনও তিনি যথার্থ সম্বিৎ ফিরিয়া পান নাই, তিনি এখনও অনবগুণ্ঠিতা, তবু ইহা ধ্রুব যে, তিনি আলোতে, অন্ধকারে, একাকিনী, লোকচক্ষে, রক্তমাংসে বধূ; তাঁহার তীক্ষ্ণ রূঢ় সাহসদীপ্ত গম্ভীর কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল "তুমি কি ওঁকে মেরে ফেলতে চাও? তোমার মনে কি ভগবান এতটুকু মায়া মমতা..."

"ভাল গল্প গো ভাল গল্প! মায়া মমতা একমাত্তর আমার থাকার কথা, না? আমি জাত চাঁড়াল, বলি মায়া মমতা কোথাকে পাব গো, ও সব ত বামুন মেয়েতের ঘরে মরাই মরাই...বেশ মিঠে হিম হাওয়া, না গো..."

"চাঁড়াল"

"ভুল বেগোড় বুঝলে বটে বামুনের মেয়ে, এক গল্প বলি, এখানে যা ছিল, একটু একটু করে সবই পাঁচ ভূতের চিতায় গেছে...মায়া দয়া!"

"তুমি"...

"হ্যাঁ গো কনে বউ তুমি কখন কেঁদেছ?"

যশোবতী সহসা মৃত্তিকায় পদাঘাত করিয়া দর্পভরে কহিলেন, "তুমি ওঁকে শাস্তিতে..." এবং উক্তির সঙ্গে সঙ্গেই এ-বাক্যের ম্লান নিদারুণ ছায়া দুইজনের ইতিমধ্যে নিপট হইয়া দেখা দিল, আর যে ক্রমে তাহা বিলীয়মান। যশোবতী চণ্ডালকে নিরুত্তর দেখিয়া আরবার সুন্দর করিয়া কথা কয়টি উচ্চারণ করিলেন, "তুমি কি শাস্তিতে..."

"মরতে"—ইহা বৈজুনাথ প্রশ্ন করে নাই, তাহার কণ্ঠস্বরের বেদনা কোন তুমুল সমুদ্র পার হইতে চাহিল, অনন্তর কুয়াশায় আবছায়া স্বরে কহিল "কনে বউ তুমি খুব খাসা, তাই হে যা বল তাই সে কথাই তোমার লাগসই হে, এখন তুমি বল দয়া মায়া আছে কি না, বাঃ!"

বাক্য, শব্দের পূর্ব্বের এক অচিন নিস্তব্ধতা এখানে আবর্ত্তিত হইল! মিলন অভিলাষিণী সুন্দরী, অন্যধারে শ্মশান পরিচর্য্যাকারী নরদেহ।

বৈজুনাথের ওষ্ঠ ওঠানামা করে; ঝটিতি, এই গহনরাত্রে যাহার একান্তে কুয়াশা আবৃত খরধারা, তাহার ভগ্নস্বর শ্রুত হইল, "বামুনের মেয়ে, কনে বউ, আমি আকাশ খাই গো, তুমি পূব দক্ষিণ দশ দিক কখন দেখেছ...এখানে তোমার তরে সব সোনা হবে" বলিয়া কিঞ্চিৎ শ্মশান-মৃত্তিকা তুলিয়া আরম্ভ করে, "দেখ, দেখ তুমি হেঁটে গেলে, এ মাটি আবাদ হবে..." বলিতে বলিতে বৈজুনাথ ষড়ৈশ্বর্য্যময়ীর প্রায় নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল।

চণ্ডালের করপুটে মৃত্তিকা, কুয়াশা নাই, যশোবতী সজল স্নেহময়ী চক্ষে এ মৃত্তিকা দেখিয়া, চকিতে কয়েক পদ পশ্চাদপসরণ করিলেন। বৈজুনাথ হস্তস্থিত মৃত্তিকারাশি ফেলিয়া দিয়া ম্লান হাস্যে কহিল, "কাল শালা যাকে লিয়েছে সে যাক্। কিন্তু কেউ কাউকে ঠেলে চিতায় ফেলবে, এটা কি বল? ওগো বাবু, আমার দোষ লিও না," এ সময় তাহার আওয়াজ কুয়াশা-বিজড়িত, আর্দ্র, শ্রমখিন্ন; দীনমানসে আন্তরিক ভাবে বলিল, "আমি মারলে ঠেঙ্গা ফিরলে লাঠি নই, উঁচু নই চাঁড়াল গো, চাঁড়াল...পুঁথিপাঠ নাই, তোমার চিতা করব না হেঁকে বললুম...আমি ঠাকরুণ ইন্দ্রত্ব আশা করি না, বৈকুণ্ঠবাস চাই না, নয় হে দুঃখ হয়েছিল...দেহ বড় ভালবাসি মড়াকে যত্ন করি..."

"চণ্ডাল"—যশোবতী উচ্চৈঃস্বরে তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিতে চাহিলেন, সমস্ত আবহাওয়া এখন তাঁহাকে কিয়দংশে শান্ত করে, আর তিনি সম্যক, হয়ত বুঝিয়াছিলেন, বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এই, ইহা শ্মশানভূমি হইলেও ইহা আদর্শতুল্যা অলাতচক্রাকৃতি পৃথিবীর, যাহা উত্তম হাস্যধ্বনি পরিমণ্ডিত, অংশ; নিম্নে, উগ্র তীব্র ক্ষিপ্ত বেগবতী স্রোতস্বিনী!

যশোবতীর কণ্ঠস্বর সঙ্গীতময় হইত যদি তাহা আকাশচারী; কাব্যময় হইত যদি তাহা সৃজনক্ষম; চিত্রমায়া হইত যদি তাহা বর্ণিকাভঙ্গধর্ম্মী।

"হা হা, বুঝি বুঝি গো রহ রহ...কনে বউ, যে মানুষ নিজে ভস্ম হতে চায়, সে এ সোনার ত্রিভুবন জ্বালাতে পারে গো...ছিলাম শব তোমায় দেখি শিব হইলাম গো," এইটুকু বলিয়াই আপনার জিহ্বা কাটিয়া কান মলিয়া কহিল, "না হয় ভস্ম হব গো, তবু আমি তোমার হাতেই হব গো, রামের হাতেই হব হে..."

"তুমি যাবে কি না"—এ বাক্য সাগর অভিমুখী, সাগররূপ কান্তর মিলন অভিলাষিণী স্রোত-কান্তার একনিষ্ঠতা দর্শনে সাহসী হইয়া তিনি বলিয়াছিলেন।

"আমি এ হতে দিব না গো...তুমি পালাও হে, দুনিয়াটা খুব বড় কনে বউ—দুনিয়াটা খুব বড় বলতে, আমার কেমন রোমাঞ্চ হচ্ছে হে...পালাও কনে বউ।"

"মড়াই তোমার বুদ্ধিতে চলে..."

"মড়া" বৈজুনাথ এবম্প্রকার বিস্ময়ে এ বাক্য উচ্চারণ করে যে, বাক্যের সহিত চিত্র এই প্রথম একক হইয়া, একটি বিস্ফারিত নেত্র, পরিক্রমণশীল; ইহা সে দর্শনে অনড়, আপনকার ক্ষোভ, মর্ম্মবেদনা, অপ্রসন্নতা, কিছু প্রশমিত হইবার পর সে ধীরে ধীরে কহিল, "মড়া!" ক্ষুদ্র একটি নিস্তব্ধতা দেখা গেল, ইহাও তাহার বাক্য বৈ অন্য নহে, এবং করুণ আর্ত্তনাদে কহিল, "নর দেহ, নর দেহ যার কেউ নেই—যে নিজে ছিল" পরক্ষণেই আপনার দুর্ব্বলতা বুঝিয়া সশ্লেষে বলিল, "মড়া আই গো কি গেদা গো তোমার কনে বউ...আমি কি মানুষ হব না, বামুনের মেয়ে, কখন হয়ত বলবেক হ্যারে তোর বড় নপর চপর, বেটা তুই পাতকুড়নোর অধম ছোট জাত...হাঁটছিস আমাদের মত, কনে বউ আমার হাতে জল চলে না রূপো চলে...বুদ্ধি..."

"তুমি যাবে কি না..."

বৈজুনাথ হয়ত তাঁহার মানরক্ষা নিমিত্ত দুয়েক পদ ধীর পদক্ষেপে সরিয়া আসিয়া হঠাৎ বসিয়া পড়িয়া কুয়াশা পরিবৃত গঙ্গার দিকে চাহিল, ছোট একটি দীর্ঘশ্বাস, সম্ভবত তাহার, চণ্ডালের, ঘুরিতে ঘূর্ণায়মান অপসারিত; ক্রমে শান্ত কণ্ঠে আপন মনে বলিতে লাগিল, "তোমার বিয়ে দেখলাম গো, গান গাইলাম গো, আমি তারাগুলোকে জলে দেখি, জাত চাঁড়াল এমন বিয়া-সাদি আমি দেখি নাই, মাগভাতার মাদুরে এক, হেঁসেলে দুই, প্রকারে তিন—আমার বউ বলত; তোমার বিয়ার দিন তারিখ নাই কিন্তু তুমি দিয়ে দিলে বুড়ার হাঁড়িতে চাল, তাই বলে...এমন বিয়ে এ যে ভেল্কী...বুঝাও কোন মতে সিদ্ধ, তবে হ্যাঁ খুব খেয়েছিলাম গো—এ এক অবাক গল্প না গো কনে বউ?"

যশোবতী চণ্ডালের গতিবিধি অনুসরণ নিমিত্ত এখনও সেখানেই; আপনার ছায়ার প্রতি তীব্র ভ্রূকুঞ্চিত দৃষ্টি হানিয়া বৈজুনাথকে দেখিলেন, যাহার গাত্রবস্ত্র, গামছা, আলুলায়িত যাহা মন্থর বায়ুতাড়িত।

যশোবতী বাক্যহীনা, তথাপি বেলাতটে, এখন আসীন বৈজুনাথের মনে হইল, কনে বউ তাহার বোকা সরল কথায় বিদ্রূপ করিলেন, ফলে সে গম্ভীর স্বরভঙ্গে বলিল, "আমরা আর কি বল আমাদের ত

জ্বললে আঁধার, নিভলে আলো—এ বড় ভাগ্য যে আমা হেন মানুষ নিঃশ্বাস নেয়!"

যশোবতী হেঁয়ালী বুঝিলেও একথা তাঁহার বিশ্বাস ছিল, যে বৈজুনাথ সেইটুকুর মধ্যে বাঁচিয়া নাই, তাহার পিছনে সম্পর্ক আছে, অনেক ঔদ্ধত্য আছে, সে দুৰ্দ্ধর্ষ; অনন্য মনে এ সকল কিছু তিনি স্তান করিতেছিলেন এবং এই সূত্রে হয়ত তাঁহার মনে হইয়াছিল তিনি যশোবতী, কি এখনও দিক নির্ণয় করিতে সক্ষম, তিনি কি প্রহর মানিতে পারদর্শী, তিনি কি ফুলসকল ফলসমূহ মৎস্যাদিকে চিনিয়া লইতে অভিজ্ঞা! এবং ঠিক এই সময়ই প্রত্যক্ষ করিলেন যে চণ্ডাল বৈজুনাথ বাঁকিয়া সম্মুখে তাহার হস্তদ্বয় ভূমি'পরি ন্যস্ত, পদদ্বয় কিছু বিস্তৃত, অবাক নয়নে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াছে। তাঁহার, যশোবতীর, দৃষ্টি অনুভব করিয়া কহিল, "তুমি কি সুন্দর..."

"চণ্ডাল" তাঁহার বাক্য মেঘরহিত আকাশকে বিদীর্ণ করিল।

"সত্যিই তুমি সুন্দর কনে বউ..." বলিয়া বৈজুনাথ উঠিয়া দাঁড়াইয়া ধূলা হাতে হাত আঘাত করত ঝাড়িয়া ফেলিয়া কহিল, "যাক আর সময় বেশী নেই, কাল...কাল যখন চাঁদ লাল হবে কিন্তু তবু বলব কনে বউ তুমি সত্যই মাটি ছুঁয়ে বলছি কাল চাঁদ যখন লাল হবে," বলিতেই সে, চণ্ডাল, অচিরাৎ ত্রাসে বিমর্ষতায় নিদ্রিত, স্বপ্ন তদীয় রজনী লইয়া নিঃশ্বাস তাহার মিত্র হইয়া দেখা দিল; অঙ্গুলি যেখানে হাসে, সেই দুর্জ্ঞেয় হাস্যধ্বনি, মত্ত মাতঙ্গ স্বভাব এবং তাহা ঘোর, মেঘদর্শন, অধুনা তরঙ্গায়িত! বৈজুনাথ আত্মসম্বরণ করিল, জাগিল; সমস্ত, প্রতিবিম্বিত দীপ্তিতে, আধোউদ্ভাসিত বৰ্ত্তমানতা সমাকীর্ণ উদ্ভট ব্যাকুল দৃশ্যমানতা অবলোকনে তাহার মনে হয়, আপনার স্বপ্নকে লইয়া এখানেই ঘর করিবে, কেন না এই লোক চরাচর তাহার স্যাঙাৎ, ইহার সহিত তাহার বহুকালের প্রণয়, তথাপি যাহাকে কিছুক্ষণ পূৰ্ব্বে আপন আত্মম্ভরি মনে, 'পৃথিবীটা খুব বড়' বলিতে রোমাঞ্চিত হয়, কেননা সে ঐ সূত্রে সুমহান বিরাটত্ব অনুভবে ক্ষণমাত্র বীতচেতন। ক্রমে বৈজুনাথ মায়িক স্বরে কহিল, "কিন্তু তবু বলি সময় নাই গো, আমার এক গল্প শুন হে তুমি, তুমি কনে বউ তুমি লিজে নারী কি পুরুষ একথা জানি না, তুমি কোন দেশের কোন মাহালের তা জানি না, কিন্তু পুড়বে ভাবতে যেন আমি চৌচির, এ কথা ভাবতে আমি মুরারী গো (অর্থাৎ দারুভূত)" ইহার পর চণ্ডালের কণ্ঠস্বর যেন শায়িত এবং শোনা গেল, "অহরহ তুমি তুমি ভাবতে আমি যেন তুমি হই যাই হে" এবং পুনরায় তাহার শব্দপ্রবাহ ব্যক্ত করে, "মনে লয়, মন মানে ভরত—আহা জনক রাজা হরিণ হরিণ হরিণ করতে হরিণ" বলিতেই তাহার দেহ হরিণের নিরীহগতি প্রযুক্ত, সে কিছুটা চলিল।

অন্যপক্ষ এতাবৎ, সূক্ষ্ম যশোবতী, নিম্নে, নিকটে, আপন ইহকাল দিয়া স্বামীর অস্তিত্ব-অভিজ্ঞান সকল দেখিয়া লইতে কৃতনিশ্চয়; ফলে এই হয় ধ্রুব যে, বাগ্মী চণ্ডালের অজস্র ধ্বনিপ্রবাহ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করে নাই; শুনিতেন যদি, তাহা হইলেও, তাঁহার কোনই বিচ্যুতি ঘটিত না, তাঁহার সঙ্কল্পের নিকট উহা বালখিল্য উচ্ছ্বাস পরম্পরা, যাহাকে নিমেষেই, ধরিত্রীপৃষ্ঠের বারিপাত হেতু ক্ষেত্রের অলীক ঝরণা পরাস্ত করিতে এক লহমা, তথাপি তাঁহার একথা মনে হইলেও হইতে পারে, যে, ইহা কি শ্মশান? বীজ বপন করিলে যথার্থই এখানে কি অঙ্কুর দেখা দেয় না!

বৈজুনাথ হরিণগতি সম্বরণ করত চকিতে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া অব্যর্থ কণ্ঠে বলিল, "তোমাকে আমি মরতে দিব না হে",—পুনরায় দ্রুত পাশ হাঁটিয়া কহিল, "পারতুম যদি, তোমায় ছুঁয়ে দিতুম গো কনে বউ।"

এবম্প্রকার ভাষায় যশোবতীর দেহ, শিখা যেমত, ভ্রমর যেমত, পদ্মপত্র যেমত, তড়িৎ প্রবাহ যেমত, অতীব চঞ্চল, আপনার মস্তক সঞ্চালন করিয়া অন্তর্মুখী হইতেই হস্তধৃত কাজললতা মাটিতে খসিল। তিনি, ইহা কি সত্য, সম্মোহিতা হইলেন।

বৈজুনাথ যশোবতীর এ বৈলক্ষণ্য অনুধাবন করে নাই, সে উদ্দীপ্ত, সে আপনার কথা সাজাইতে ব্যস্ত, "হ্যাঁ গো, তোমার সত্যি সত্যি বিয়ে হয়েছে, না সেটা স্বপ্ন...কে জানে বাপু...আমার কেমন আঁট নাই...মনে হয় দশ রাত জাগা...কখন কোথায় মনে লেয় না, 'কখন' না থাকলে 'কোথায়' সেটা নাই...মনে লেয় আমার গা-চাটা বয়েস..." বলিয়াই অতি সূক্ষ্মভাবে হাসিয়া নববধূর প্রতি দৃষ্টিপাত করিল।

যশোবতী পৰ্ব্বতছায়ার মত স্থির।

এতদ্দৃষ্টে, চণ্ডাল স্তম্ভিত, নিস্পৃহ; ইহার কিছুক্ষণ পরে সে কেমন এক ভাবের ভাবী হইয়া, ঘোর বশে মৃত্তিকা তুলিয়া করজোড়ে, চণ্ডাল বৈজুনাথ, সুন্দর প্রার্থনার কণ্ঠে বলিতে আরম্ভ করিল, "তোমায় মান্য করি কনে বউ, তুমি—বামুনের মেয়ে—আমার দোষ লিও না, তুমি একবার ভাব আমি খল কটু নই, তুমি হে গহনা ছুঁড়লে...আমি কিন্তুক সে মনা নই হে, তঞ্চক বঞ্চক...সত্যিই যদি, তাহলে লিয়ে ফেরার হতুম..." বলিয়া সে অল্পকাল থামিল, মৃত্তিকারাশি ঝরা শব্দ শোনা গেল।

সহসা ঐ শান্ত একটানা শব্দ ভেদ করিয়া বিদ্রূপাত্মক এক ঘোষণা হইল, "মাতাল বজ্জাত।" ইহা যশোবতী বলিয়াছিলেন।

বৈজুনাথ যুগপৎ, অন্যরূপে ইহার প্রতিধ্বনি করিল; মৃত্তিকা সকল সদম্ভে ফেলিয়া, আপনার গণ্ডে বার বার চপেটাঘাত করত কহিল, "হা কপাল, কপাল, চেনা মানুষকে চিনতে লারলে গো, চোখ কালো বলে কি দিনমান আঁধার হবে হে? মদ! বলি গল্প শোন, মদ আমাকে সৎ করেছে তাই না এতেক বললুম...মদকে দুষো না, মদের নাম প্রমোদন...মদ আমায় সংযম করে,...তোমাকে খোলাখুলি বললাম হে তারই জোরে..."

"তুমি যাবে না..."

"ওই গো ভাবের ঘরে চুরি," এবং পরক্ষণেই মুখভঙ্গী সহকারে কহিল, "তুমি কি ভাবো ওই ঘাটের মড়া তুমার সোয়ামী..."

"হ্যাঁ, স্বামী" যশোবতীর এই উত্তরে সমগ্র বিশ্বের প্রতি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ছিল, এ স্বীকারোক্তির অখণ্ড তৈলধারাবৎ পতিভক্তিতে কাল বিমর্দ্দিত হইল; স্পন্দন গতি যাবতীয় দ্রব্যসকলের আর প্রয়োজন নাই—চন্দ্র সূর্য্য অচিরাৎ দায়মুক্ত।

বৈজুনাথ একমাত্র জীব যে আপনার মাথা তুলিতে এখনও সমর্থ, সে যারপরনাই শক্তিতে ফুৎকার দিয়া উঠিল, "মিছা মিছাই মিথ্যা হে কঠিন মিথ্যা গো" সমস্ত জীব জগতের হাহাকার তাহার এই আর্ত্তনাদ, যাহা দিগ্বিদিকে মাথা ঠুকিয়া ফিরিল; অতঃপর সে দন্তঘর্ষণ করিতে করিতে ব্যক্ত করে, "আ হা...মানুষ এক অচিন গাছ, মানুষ বড় ডাগর জীব গো, কাঠের বিড়াল দিয়া ইন্দুর ধরে....তাই না?" বলিয়া হা-হা রবে হাস্য করিয়া আবার জলদগম্ভীর কণ্ঠে কহিল, "মিথ্যা।"

তাহার, বৈজুনাথের, বাক্যশব্দ যেমন বা সূর্য্যকে নাম ধরিয়া ডাকিল, ধ্বনি প্রতিধ্বনি আকারে সময় আরূঢ় হইয়া উদ্দাম, কর্ম্ম প্রতিশ্রুত হইয়া আবর্ত্তিত হইল।

বৈজুনাথ আর বাক্যক্ষয় করিল না, সে শ্লথ পদবিক্ষেপে অগ্রসর হয়; সে যেমন বা কিয়দংশে মর্ম্মাহত, চন্দ্রালোকে এত বড় মিথ্যার জন্য সে প্রস্তুত ছিল না, ফলে তাহার মস্তক অবনত; একবার, সে মুখ ফিরাইয়া যশোবতীকে নিরীক্ষণ করে, দেখিল, তিনি তখনও তেমনভাবেই দণ্ডায়মানা।

যশোবতী ইদানীং একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করত, আত্মকেন্দ্রিক, এবং নিমেষেই সহজ, এবং অতি দ্রুত আপনার অঙ্গাভরণ সংযত বিন্যস্ত করিয়া,. যেন বা দৌড়াইয়া, স্বামীর নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অর্দ্ধ-আস্বাদিত আলিঙ্গন, চাঁদোয়ার ছোট অন্ধকারে, যাহা তিনি রাখিয়া সম্মুখ সমরে নামিয়াছিলেন তাহা সন্ধান করিতে এখন প্রয়াসী।

বৃদ্ধ সীতারাম তখনও কাঁদিতেছিলেন; ধীর বিলম্বিত লয়ে ক্রন্দনের ধারা শূন্যতায় উঠে নামে। যশোবতীর কেমন যেমন ভাবান্তর দেখা দিল, অবশ্য তাহা কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য, যদিও তিনি স্বামীর নিকটেই তথাপি আর্ত্ত ত্রাস আবিষ্ট রোরুদ্যমান বৃদ্ধের সযত্নে চক্ষু মুছাইবার মত স্নেহ তাঁহার মধ্য হইতে অন্তর্হিত; ভূতগ্রস্তের ন্যায় তিনি বসিয়া আছেন, কৃষ্ণপক্ষের শশিকলা যেরূপ ক্রমশঃ ক্ষীণা, তেমনই তিনি, যশোবতী, অঘোরচারী ঈপ্সিত অমাবস্যা তাঁহার ধমনীতে, রক্তে, পরিপ্লাবিত। কিছুকাল পূর্ব্বের কথা, তামসিক চণ্ডালের রাজসিক কণ্ঠে সত্ত্বগুণ দীপ্ত বাক্যালাপ সম্ভবত তাঁহাকে, তাঁহার দেহ হইতে উচ্ছেদ করিয়াছিল, অবশ্যই সত্যই অমৃতবারি সেচন করে নাই। কখনও কখনও তাঁহার পলাতক মন দেহের সহিত সহজ বন্ধন লাভ কালে, তথা দেহের সহিত মন সংযুক্ত হইবার কালে, দেহ ওতপ্রোতভাবে দুলিয়াছিল; যশোবতী আপনার ললাটে, এ সময়, দক্ষিণ হস্ত প্রদান করিয়াছিলেন; তাহা

কি করাঘাত সূত্রে অথবা স্বেদ মুছিবার কারণে তাহা জানিবার উপায় নাই—কেন না উহাতে কোন চিত্রসংজ্ঞা ছিল না। আর যে এইক্ষণেই তিনি মানসচক্ষে অবলোকন করেন, কাহারা যেমত বা এক মধুর গীত গাহিতে গাহিতে আসিতেছে, ইহাদের স্বেদ নাই, ইহারা ক্লান্ত নহে, যে গীতের মধ্যে আশা, যে আশার মধ্যে গোলাপের গন্ধ, যে গোলাপ গন্ধের মধ্যে বাল্যকাল, যে বাল্যকালের মধ্যে নিরীহতা, কাহার অন্তরীক্ষ আলেখ্য বহনে গর্ব্বিত।

এই দৃশ্যকাব্য তিনি যেন পান করিতেছিলেন, কিছুকাল এইভাবে অতিবাহিত, পরে আপনার দেহভার অনুভব হয়। চণ্ডালের সহিত সাক্ষাৎকার অতীব আশ্চর্য্য, শরীর তদবধি সন্তপ্ত, তিনি জল লইয়া চক্ষু কর্ণে এবং আপনার পদযুগের বৃদ্ধা অঙ্গুষ্ঠার উপর দিয়া, অতি বিস্ময়কর কথা যে, তিনি আপনার বিকলাঙ্গ ছায়ার উপর জল সিঞ্চিত করিয়া, এখন আলগোচে কিঞ্চিৎ পান করিলেন। শীতল জলের স্পর্শে বুঝিয়াছিলেন, মস্তক শিরঘূর্ণনে উপদ্রুত, যদিচ শিরঘূর্ণন এখনও প্রশমিত হয় নাই, তথাপি তদবস্থায় আপনার চমৎকার সুডৌল মৃণালভুজদ্বারা জন্মান্তরের স্বামীকণ্ঠ, মহতী গভীর হৃদয়ে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন।

সপ্তর্ষি মণ্ডলের অনতিপূর্ব্বে চন্দ্র প্রতিভাত।

অলৌকিক দম্পতি ঘুমে নিশ্চিহ্ন, খুব ধীরে শয্যার খড় বায়ু-সঞ্চালিত। ইহা শ্মশানভূমি, এখানে ঘুমন্তরা আনীত হয়, এখানেও ঘুম আসে; দুজনেই স্বামী এবং স্ত্রী ঘুমে দৃষ্টিরহিত। এক পার্শ্বে মৃতকল্প বৃদ্ধ, অন্যপার্শ্বে পরিশ্রান্ত যশোবতী, ঘুমঘোরে অনেকখানি শয্যাচ্যুত হইয়া বাহিরে, হিমক্লিষ্ট ভূমির উপরে আসিয়া পড়িয়াছিলেন, দেহ ত্রিভঙ্গ, কুণ্ডলীকৃত নহে, কর্কশ ধ্বনি ব্যক্ত, এবং তাঁহার অর্দ্ধ উন্মুক্ত মুখ বহিয়া লালা নিঃসৃতবান। এমত অবস্থায় তাঁহার নিঃশ্বাস-আলোড়িত বক্ষের উপর একটি ছায়া পড়িল।

'ভাবের ঘরের চোর' এই উক্তিও শোনা গেল।

হঠাৎ ছায়া উধাও; কেননা যাহার ছায়া সে কিঞ্চিৎ দূরে সরিয়া যায়। এ ছায়া চণ্ডালের, চণ্ডাল এখনও সম্ভবত নিশ্চেষ্ট হয় নাই, ধৃষ্টতা এখনও প্রধর্ষিত হইতেছিল; বৈজুনাথের সহসা অপসরণের কারণ এই যে, সে এক অদ্ভুত কিছু এই সান্নিধ্যের মধ্যে দেখে।

একদা যশোবতীর বিবাহের পূর্ব্বে, এক রাত্রে সে ভেড়ীপথ হইতে অন্তর্জলীসূত্রে আনীত, সীতারামকে কেন্দ্র করিয়া কীর্ত্তন পরিক্রমণ দেখিয়াছিল; চক্রাকারে ভ্রমণকে মাঝে মাঝে শ্মশানের চিতার আলোকচ্ছটা উল্লেখ করিতেছিল, আর কুয়াশাবৃত চন্দ্রালোকে যাহা প্রহেলিকা। মন্দিরগাত্রে রাশমণ্ডলের আলেখ্যর ন্যায় সমস্ত সংস্থান, নেহাৎ সহজ হইলেও উহা অতিকায়, উহা ভয়প্রদ। সেই অনুভূতির কথা মনে করিয়া বৈজুনাথ এখন শুষ্ক, দুর্ব্বল; তাহার কেমন যেন মনে হইল সে কীর্ত্তনের চক্রকে ভেদ করিয়া আসিয়াছে; সত্যই, সে শঙ্কিতচিত্তে আপনার চারিপার্শ্বে লক্ষ্য করিল। সত্যই সেই রহস্যময়, মস্তক আবৃত, শীতকুণ্ঠিত লোকগুলি ভ্রাম্যমাণ কিনা!

পুনরায় একই মনোভাবে ঘুমন্ত যুগলমূর্ত্তি দর্শনে সে নিঃসন্দেহে হতজ্ঞান, সম্মুখে রাশমণ্ডলের প্রাণস্বরূপ কেন্দ্র চারিভিতে আলোক উদ্ভাসিত, আর মধ্যে চাঁদোয়ার অন্ধকার, বৃদ্ধ আবছায়া, যশোবতী প্রতীয়মানা; বৈজুনাথ সম্যক উপলব্ধি করে যে তাহার শক্তি অপহৃত হইয়াছে, ক্ষমতা বাষ্পময়, পদদ্বয় রোগীর ন্যায় কম্পিত। কিন্তু তাহার পূর্ব্বমুহূর্ত্তের চিন্তার আলোড়ন এখন ছিল; সে একদা শুনিল, তাহার আপনার দেহমধ্যে উন্মত্ত 'মাভৈঃ' ধ্বনি। ক্রমাগত একই ধ্বনি শুনিতে শুনিতে তাহার চক্ষু সঙ্কীর্ণ হইয়া উঠে, এবং স্বীয় মৃদু হাস্যে সমস্ত সকল বিড়ম্বনাকে উচ্ছেদ করত কহিল, "হা রে ভাবের ঘরের চোর কনে বউ, এই ত দেমাক, টিকারী, চৈত্রের দুপুরের ক্ষেতের মত পড়ে আছে, রহো রহো হে হে মরণের ছাঁচ হে, মিথ্যেবাদী আমি! সতী হব লোকমান্যি হব...সতী রাণী হে, আমি জাত চাঁড়াল আকাশ বাতাস ভালবাসি না, গঙ্গা লয়, ধুক ধুক করা নরদেহ বড় ভালবাসি...আমি..." এ সকল কথা যখন সে বলে, তখন তাহার ছায়া পুনরায় শ্রীঅঙ্গের উপর বিস্তৃত হয়। 'আমি' বলার পরক্ষণেই তাহার ছায়া অদৃশ্য।

বৈজুনাথ চাঁদোয়ার একপার্শ্বে এখন, খড় চড় চড় করিয়া উঠিল, বৃদ্ধ সীতারামকে আচম্বিতে দুই হাতে

তুলিয়া দাঁড়াইবার কালে, তাহার একটি হাত যশোবতীর কোমল অঙ্গ স্পর্শ হয়। এইভাবে বৃদ্ধকে নির্ব্বোধের মত তুলিয়া লওয়াতে চাঁদোয়ায় বৃদ্ধদেহটি আবৃত হইয়া পড়িয়া সাক্ষাৎ বিঘ্ন উৎপাদন করে, বেচারী অশীতিপর মরণোন্মুখ বৃদ্ধের প্রাণান্ত আকুল দুঃখধ্বনি একবার মাত্র শ্রুত হয়। তাহার পর নির্ব্বিকার! ইহাতে চণ্ডাল, সত্যই বিমূঢ়, স্থির; সে যেন চন্দ্রালোককে জিজ্ঞাসা করিল, সে যেন শ্মশানভূমিকে জিজ্ঞাসা করিল, সে যেন পারিপার্শ্বিক অন্ধকার সকলকে প্রশ্ন করিল—কি ব্যাপার? কিন্তু পরক্ষণেই সে কৃতনিশ্চয়, বদ্ধপরিকর, চাঁদোয়া-আবৃত অবস্থায় বৃদ্ধকে দক্ষিণে কভু বামে আন্দোলিত করিল, দ্রুত কার্য্য সম্পাদন নিমিত্ত চণ্ডাল হিতাহিত কাণ্ডজ্ঞানরহিত; সীতারামের সূত্রবৎ দেহ এমত মনে হয় যেন জালে পড়িয়াছে; শত চেষ্টাতেও বৈজুনাথ কোনরূপে তাহাকে মুক্ত করিতে সমর্থ নহে। কখন মহা আক্রোশে দাঁত দিয়া চাঁদোয়ার কাপড় ধরিল, কখনও বা চুপ কখনও বা খুঁটিতে পদাঘাত করিল; পদাঘাত করিতেই হাঁড়িকুড়ি লণ্ডভণ্ড ছত্রাকার। বৈজুনাথ দেহ লইয়া অন্তর্দ্ধান করিল।

এই শব্দে যশোবতীর ত্বক, সূক্ষ্মতা জাগ্রত হইল সত্য কিন্তু গভীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল না। তিনি অভিভূত অবস্থায় গাত্রবস্ত্র আপনার শরীরে আচ্ছাদিত করিয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলেন। নববধূর প্রাণ, জীবনঅভিলাষী দুদ্ধর্ষ চণ্ডাল আপনার কার্য্যসিদ্ধি নিমিত্ত দ্রুতগ হইল। সীতারামের পদদ্বয় এবং বামহস্ত ভৌতিকভাবে আন্দোলিত, ঘর্ম্মাক্ত চণ্ডাল দাঁত দিয়া রজ্জুবন্ধন ছিন্ন করিয়া পলায়ন করিবার পূর্ব্বে যশোবতীকে দেখিয়া লইবার ইচ্ছা করিল, কিন্তু তাহা সম্ভবপর হয় নাই কারণ চাঁদোয়া ছিঁড়িয়া যবনিকার সৃষ্টি করিয়াছিল। অভাগিনী তখনও ঘুমে অচেতন। বৈজুনাথ বৃদ্ধকে লইয়া ক্ষিপ্রবেগে ক্রমশঃ ঢালুতীরে নামিয়া গেল।

পরোপকারে দৃঢ়সংকল্প বৈজুনাথ বৃদ্ধকে লইয়া বিশেষ সন্তর্পণে গঙ্গায় পদক্ষেপ করিতে করিতে নামিতে লাগিল। তাহার কণ্ঠে বার বার ধ্বনিত হইল, "পাপ আবার কি—পাপ শালা...তুমি শালা যত নষ্টের গোড়া, হ্যাঁ...দোসর লাও শালা বুড়ো—" বলিতে বলিতেই সে কিছুটা গঙ্গায় নামিল। একবার মুমূর্ষু দেহটি দক্ষিণে বামে আন্দোলিত করে। ইহার একটি পা গঙ্গাস্রোতে, অন্যদিকে হস্ত গঙ্গার জলস্পর্শ করিয়াছে। বৈজুনাথের উরু জলমগ্ন, সে পা টিপিয়া টিপিয়া অগ্রসর হইতেছিল।

অচৈতন্য সীতারামের হস্ত সহসা যেন দৈববলে মন্ত্রবলে বৈজুনাথকে হতচকিত করিয়া তাহার কণ্ঠ আবেষ্টন করিল। সে টলিয়া গেল, তাহার পর সম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়া কহিল, "ওরে শালা বিট্‌লে দোসরখোর" বলিয়া আপনার চিবুক দ্বারা আঘাত করিল, দুইহস্ত প্রসারিত করিয়া দেহটি দূরে সরাইল, তথাপি বন্ধন মুক্ত হইল না। সে পদদ্বয় হইতে ডান হাতখানি সরাইয়া লইতে বৃদ্ধের দেহ জলে পড়িল। তথাপি আলিঙ্গন মুক্ত হইল না—পুনর্ব্বার চেষ্টা করিল; তাহার পর আস্তে আস্তে কহিল, "কি রে বাবা, আমায় দোসর লিবি নাকি" সঙ্গে সঙ্গেই বৈজুনাথ ভীত।

বৃদ্ধকে আর কোলে লওয়ার কথা তাহার স্মরণ হইল না, সে দুই হস্ত ছাড়িয়া পালাইবার চেষ্টা করিল। ...বৃদ্ধ তাহার কণ্ঠে জগদ্দল হইয়া আছে। সে যেমত ভাঁড়ে বাঁধা নেউলের দশাপ্রাপ্ত হইল। গঙ্গার জল চোখে মুখে দিল এবং সিক্ত বৃদ্ধকে কোনক্রমে তীরে লইয়া উঠে।

সীতারামকে মাটিতে রাখিতেই দ্বি-খণ্ডিত লতার মত বৈজুকণ্ঠলগ্ন হস্তদ্বয় খসিয়া পড়িল। বৈজুনাথ অবাক হইয়া তাঁহার হাতের দিকে তাকাইল; এখন তাহার সাহস ফিরিয়াছে, দৌড়াইয়া আপনার আড়ায় ঢুকিয়া মদ্য পান করিয়া কিছু রজ্জু ও ছোট একটি কলস হস্তে এখানে উপস্থিত হইল। বৃদ্ধের হাত দুটি একত্রিত করিয়া বাঁধিবার কালে বারবার সে পিছনে তাকাইয়াছিল।

যশোবতীর হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হয়, উঠিয়াই তিনি কবরী রচনার জন্য বেণীতে হস্তদ্বয় প্রদান করিয়া পক্ষীর মত মুখখানি ঘুরাইতেই, ছিন্ন চাঁদোয়ার প্রতি লক্ষ্য পড়িল, হাই মুখে রহিয়া গেল, আর যে, চাঁদোয়া কিছুমাত্র উত্তোলন করিতেই, যখন দেখিলেন যে সেই প্রিয় বৃদ্ধ দেহটি নাই তখন নির্ব্বোধের মত হস্ত দিয়া বিছানা অনুভব করিলেন। চাঁদোয়া পড়িল, তিনি তাহা ছিন্ন করিয়া যখন দেখিলেন কেহ নাই, তখন তাঁহার মস্তক শুষ্ক পাতার মত কাঁপিল। 'বুড়ো' বলিয়া তারস্বরে চীৎকার করিয়াই জিব কাটিলেন। নিজের উন্মুক্ত মৎস্যচিহ্ন উরুদেশে আপনাকে উদ্বুদ্ধ করিবার নিমিত্ত চিমটি কাটিতে

লাগিলেন, আর যে তৎকালে হৃতবৎসা গাভী যেমত চীৎকার করে সেইরূপ তারস্বরে গগন বিদীর্ণ করিলেন—"কর্ত্তা—কর্ত্তা—কর্ত্তা।"

যশোবতী কোনদিকে খুঁজিবেন! বিভ্রান্তভাবে দৌড়াইলেন, স্রোত পথরোধ করে অন্যদিকে নিঃসঙ্গ নৌকা, অন্যদিকে ভেড়ীপথের লতাপাতা আগাছা পথরোধ করিল। তাঁহার পায়ে লতা জড়াইয়া গেল, তিনি বৈজুনাথের আড়ার দিকে গতি ফিরাইলেন, খানিক পথ আসিতেই তিনি স্তম্ভিত, শ্বাসহীন, দেখিলেন—ব্যগ্র, ব্যস্ত বৈজুনাথ স্বামীর হস্তে রজ্জু বাঁধিতেছে; কলসটি যেমন বা ভূতগ্রস্ত। কি যে করা উচিত তাহা তিনি ভাবিয়া পাইলেন না। আপনার তর্জ্জনী গণ্ডদেশে স্থাপিত হইল। ভ্রূদ্বয় সচাপশরযোজিত ধনুলতার মত বক্র, নয়নযুগল স্ফীত।

বৈজুনাথের দেহ চঞ্চল, সে ক্রমাগতই রোমাঞ্চিত; অথচ কোনক্রমেই তাঁহার আগমন উপলব্ধি করিতে পারে নাই, এ কারণে যে, তাহার কণ্ঠ হইতে অনর্গল কটূক্তি আক্রোশ বাহির হইতেছিল, যথা—"দোসর শালা।"

যন্ত্রচালিতের মত দু'এক পা অগ্রসর হইয়া যশোবতী অতর্কিতে দৌড়াইয়া গিয়া নিকটস্থ ভস্মপরিবৃত একখানি অৰ্দ্ধদগ্ধ কাষ্ঠ হস্তে তুলিয়া লইয়া উন্মাদিনীর মত ছুটিয়া আসিয়া বৈজুনাথকে আঘাত করিলেন। বৈজুনাথের পিঠ বাঁকিল দড়িসমেত হাত কিছু দূরে গেল, যশোবতী থামিলেন না। বৈজুনাথ কোন অঙ্গ দিয়া নিজেকে রক্ষা করিবে ভাবিয়া পাইতেছিল না, পশুর মত চীৎকার করিতে করিতে ধরাশায়ী হইল।

দেবী প্রতিমার ভঙ্গীতে দণ্ডায়মানা যশোবতী, হস্তে কাষ্ঠ খণ্ড। পায়ে ছিন্নলতা চমকিত, ক্রোধে জ্ঞানরহিত—অপরিসীম ক্রোধ দেহের মধ্যে শব্দ করিয়া যেমত বা কম্পমান, সহসা তাঁহার কি এক রূপান্তর হয়।

ক্রোধ হইতে কাম সঞ্জাত (!) হইল, দিকমণ্ডল তমসাচ্ছন্ন, তিনি এহেন ঘনঘটায় একাকিনী, আপনার সুদীর্ঘ অন্তরীক্ষে প্রবেশ করিতে সাহসী হইলেন, আপনার আয়ত্তের বহির্ভূত হইলেন। পলাশের উষ্ণতা এখানে নিঃশেষিত বিকারগ্রস্ত হইবেক, বহুধা ধমনীর মধ্যে কখনও সুঙ্গ-হাস্য খিলখিল করিয়া উঠিল, এখন স্ফীত হয়; সুন্দর সূক্ষ্ম ভঙ্গিমায় ঊৰ্দ্ধে চিত্তশরীরে উঠিয়া সৌরজগতে পথ হারাইল। নির্ব্বিকার সমাধি—অল্পকাল পরে, ক্রমে বিস্ময় আসিল, তথাপি মনে হয় তিনি যেমত বা সনাথ আছেন এবং এরূপ অনুভবে, লোকচক্ষুর সম্মুখে তিনি যেমন বা বিবসনা হইয়া গেলেন, ব্রীড়াবনত মুখে শঙ্কায় প্রমাদ গণিলেন, কেননা চতুঃষষ্ঠি প্রকার লক্ষণসমূহ দেখা দেয়, কেননা মৎস্যচিহ্ন উরুদেশ সিক্ত এবং আপন জিহ্বা দংশন করত দক্ষিণ পা বাম পদের পার্শ্বে স্থাপিত করিয়া কিয়ৎকাল নিৰ্জ্জীব অবস্থায় রহিলেন। তাঁহার পিছনে, গঙ্গায়, কারণ সলিলে স্রোত ছিল। ...আঃ রমণী! আঃ আশ্চর্য্য! যে তুমি দুটি অব্যক্তকে একই দেহে—যে দেহে, সূক্ষ্মতা, আলো পায়, ধারণ কর। এক হৃদয়ে অন্য জরায়ুতে। তুমি সেই লীলা সহচরী।

এখন যশোবতী হস্তধৃত কাষ্ঠখণ্ড গঙ্গায় নিক্ষেপ করিলেন। কাষ্ঠের অন্তস্থিত অগ্নি সশব্দে নির্ব্বাপিত হইল।

ক্রমে তাঁহার জ্ঞানের সঞ্চার হয়, ত্বরিতে নতজানু হইয়া বসিয়া দেখিলেন, চণ্ডাল বৈজুনাথ শুইয়া পড়িয়া ছটফট করিতেছে, নিজের কাঁধের একস্থানে বুলাইতে বুলাইতে বলিতেছে, "তোমার তরে কনে বউ..." মাটি হইতে মুখ না তুলিয়াই সে এই কথা বলিয়াছিল।

যশোবতী ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া ক্রমে ক্রমে দেখিলেন, বৃদ্ধের আপনার মস্তক অতিক্রম করিয়া হস্ত দুইখানি বিস্তৃত, দেহ যেন একটি রেখাবৎ, বসন সিক্ত, স্বামীর দুরদৃষ্ট দর্শনে পাগলিনীর মত ছুটিতে, যাইতে, লজ্জিত হইয়া ক্ষণকাল দাঁড়াইলেন। পরক্ষণেই চীৎকার করিয়া উঠিলেন। অসহায় ক্রন্দনরোলে ত্রিভুবন বিদীর্ণ হয়। পৃথিবী আর একবার দুঃখময়ী হইল। বিদ্যুৎবেগে স্বামীর নিকট গিয়া, তাঁহার হস্ত

নিজ বক্ষে ধারণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন, কখনও কখন 'ঠাকুর' এই বাক্য শুধুমাত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন।

"কর্ত্তা কথা কও গো" বলিয়া তিনি গঙ্গার বেলাতট চাপড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

সীতারাম এখন দেহমাত্র। যশোবতী কোনরূপে তাঁহার উর্দ্ধাঙ্গ আপনার উরুর উপরে স্থাপন করিয়া অঞ্চলপ্রান্ত দিয়া মুখ মুছাইতে মুছাইতে স্বরভঙ্গ কণ্ঠে নানা কথা বলিলেন। "কর্ত্তা কোথা গেলে গো, আমাকে ফেলে..."

মধ্যে মধ্যে "কথা কও কথা কও"...এই অনুরোধ বাক্য পৃথিবীকে মায়া-বশীভূত করে। কালক্রমে তাঁহার ধারণা জন্মিল ইনি, বৃদ্ধ, প্রাণহীন নহেন, অচৈতন্য মাত্র। এবং এই বোধে, তাঁহার সহজ জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, মুহূর্ত্তেই তিনি আপনার বস্ত্রদ্বারা গাত্র মুছাইয়া, অনন্তর, স্বামীদেহ যতনে তুলিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পুনঃপুনঃ বলসঞ্চয়হেতু, গভীর নিঃশ্বাস লইলেন; আপনাকে প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত জিহ্বা নোলকে ঠেকিল। তথাপি এ অধ্যবসায় বিফল হয়।

যশোবতী বিমূঢ় হইয়া গঙ্গার দিকে চাহিলেন। এক্ষেত্রে কি করিবেন তাহা মনে আসিলেও তিনি সঙ্কুচিত হইয়াছিলেন, তাঁহার পদনখগুলি চঞ্চল।

বৈজুনাথের কাষ্ঠের আঘাতপ্রসূত জ্বালাভাব তখনও ছিল, ভাগ্যশঃ কাষ্ঠের উপর ভস্ম আবৃত এবং তাহার একটি স্থানেই অগ্নি প্রজ্বলিত থাকার ফলে বিশেষ কিছু আহত করিতে সক্ষম হয় নাই। তথাপি সে কোনক্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া স্খলিত পদে দম্পতির নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—"এ তোমার স্বামী..."

মুখমণ্ডল আন্দোলিত করিয়া তুলিয়া যশোবতী কহিলেন—"হ্যাঁ।"

বৈজুনাথ কহিল—"সরো গো।"

যশোবতী দৃঢ়তার সহিত আপন স্বামীকে আঁকড়াইয়া রহিলেন।

"লাও সর কনে বউ—উঠ, দিয়ে আসি।"

এ অনুরোধে যখন যশোবতীর ভাবান্তর হইল না, তখন বৈজুনাথ ঝটিতি দেহটি তুলিয়া লইল, চণ্ডালের হস্তস্পর্শে ব্রাহ্মণকন্যা ক্ষিপ্রবেগে জাতিসম্ভ্রম রক্ষা মানসে সরিয়া গিয়াছিলেন। তিনি মাটি ছাড়িয়া সত্বর উঠিয়া স্বামীর জন্য পাগল হইয়া কাড়িয়া লইতে গেলেন। চণ্ডালের অঙ্গস্পর্শ হইবামাত্র তিনি যখন ইতঃস্তত করিতেছিলেন, তখন চণ্ডাল সীতারামের মস্তক দ্বারা তাঁহাকে ঠেলা দিয়া সীতারামকে গালাগাল দিতে দিতে অগ্রসর হইল।

বৈজুনাথ লম্বা লম্বা পা'য় চলিতেছে। তিনি আধো ছুটন্ত, স্বামীর মাথাটা ঝুলিয়া পড়িয়াছে দেখিয়া তিনি ব্যথিত হইয়া অনেক কথাই বলিতেছিলেন। কখন বা মস্তকটি তুলিয়া ধরিবার ইচ্ছা ব্যগ্র হইয়াছিল!

বৈজুনাথ সীতারামকে শোয়াইয়া দিয়া হাঁফ ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "লাও ঘর কর!"

যশোবতী তাহার দিকে এখন কঠিনভাবে কটাক্ষপাত করিলেন, আর সে নির্ব্বোধের মত স্থানত্যাগ করিতে উদ্যত হয়।

চণ্ডাল বৈজুনাথ কিছুকাল সম্মুখের সংস্থানটির বিদ্যমান আলো অন্ধকারের উপর নিজের মুখখানি বুলাইয়া, ফিরিয়া দাঁড়াইয়া, আপনার স্তব্ধতাকে এই শ্মশানে শায়িত দেখিয়া একটি পা বাড়াইল; সে, সম্বিৎ, নিশ্চয়ই লাভ করে। তাহার পৃষ্ঠস্থিত আঘাতের চিহ্ন, এ হেন চন্দ্রালোকে, যশোবতীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। একারণে, তর্দ্দশনেই তিনি এককালে ম্লান এবং গম্ভীর হইয়াছিলেন।

বৈজুনাথ, আপনার হৃতস্তব্ধতা আবার পাইয়া, ঘুরিয়া, তাঁহাকে তদবস্থায় দেখিয়া অবাক হয়, নিঃশ্বাস লইয়া কহিল, "কনে বউ, বেগোড় বুঝ দিও না গো।" বলিয়াই সে প্রস্থান করিল।

যশোবতী তাহার বাক্যে কর্ণপাত করিলেন না, কেননা শ্মশান আর শবাসনে নাই, ইহা খাড়া—এ সত্য হইতে তিনি ধীর নিঃশ্বাস লইয়াছিলেন। নিজেই আপনার অশ্রুজলের উষ্ণতা অনুভব করত রোদন করিলেন, এমত সময় দৃষ্টিপথের উপর দিয়া একটি শুষ্কপত্র—শুষ্কপত্রের মধ্যে যেমন অভিজ্ঞতা, অভিজ্ঞতার মধ্যে যেমন স্বীকারোক্তি, স্বীকারোক্তির মধ্যে যেমন বেদনা, বেদনার মধ্যে যেমন আলিঙ্গন,

আলিঙ্গনের মধ্যে যেমন বুদ্বুদ, একটি শুষ্কপত্র খর খর খর করিয়া চলিয়া গেল। তিনি স্বামীর দিকে চাহিলেন, বৃদ্ধকে সিক্ত দেখিয়া, কর্দ্দমাক্ত দেখিয়া, তাঁহার কর্ত্তব্যবোধ আসিল; সুতরাং বৃদ্ধের নোংরা বস্ত্র—কারণ বৃদ্ধ অসংযত হন, খুলিয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ সযত্নে সংস্কার করিয়া, একটি অন্য 'কটে' পরাইয়া দিলেন, তদনন্তর বস্ত্র ধৌত করিবার জন্য মনস্থির করিতে প্রস্তুত হইলেন।

ক্রমাগত স্রোতের দিকে চাহিয়া, তাঁহার আপনাকে বড় সহায়সম্বলহীন, ফলত বড় আপনার বলিয়া বোধ হয়; কোন কিছুর স্মৃতি মনে উদয় হইল না, শুধু মাত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অন্ধকার ছোটাছুটি করিতেছে; যিনি উপরে আছেন, মাটিতে আর আর যাহারা, সকলই এক্ষণে নামমাত্র বৈ অন্য নহে।

এক এক সময় আত্মনিগ্রহ করিতে বাসনা হইল, দংশন করিতে ইচ্ছা করিল। এ কারণ যে, এই দুর্ব্বৃত্তের অস্তিত্ব তাঁহাকে অধিকতর কাতর করিয়াছিল। স্বাভাবিক বিচার বুদ্ধি পর্য্যন্ত রহিত হইয়াছিল। এক্ষণে যে কি করা উচিত তাহা ভাবিয়া কিনারা করিতে পারিতেছিলেন না। অথচ সত্বর বস্ত্র ধৌত না করিলে শুচিতা রক্ষা হয় না। স্বামীকে চক্ষের আড়াল করিতে তাঁহার কোন ক্রমে সাহস হইতেছিল না।

অনন্যউপায় তিনি স্বামীর কাপড়টি, আলগোচে লইয়া নৌকার পাশে যে অল্প আড়াল ছিল, সেখানে বসিয়া কাপড়টি কাচিলেন এবং এ-কার্য সম্পাদনের মধ্যে বার বার উঠিয়া স্বামীকে দেখিয়াছিলেন। নিজের পট্টবস্ত্র অশুদ্ধ হওয়াতে ভাল মত ভিজাইয়া তীরে উঠিয়া স্বামীর কাপড়টি নৌকায় মেলিয়া দিয়া দেখিলেন, স্বামী শয্যায়, এবং কোথাও কেহ নাই; সত্বর জলের নিকটে আসিয়া গামছাখানি কোনমতে অঙ্গাচ্ছাদন করিয়া আপনার কাপড়খানি কাচিয়া মেলিয়া দিয়া পুনর্ব্বার গঙ্গার মাটি ভালভাবে গাত্র মার্জ্জনার পর, স্নান সমাপন করত তীরে উঠিয়া, আপনকার বক্ষ সংলগ্ন গামছাপ্রান্ত খুলিয়া নিঙড়াইতে লাগিলেন, এ সময় তাঁহার দেহ বক্র হয়।

বৈজুনাথ এই বস্ত্রসংস্কার দেখিল; স্নানলীলা দেখিতে দেখিতে সে উজ্জ্বল হইয়া গেল, ক্ষীণমধ্যা অপূর্ব্ব ললিতপদ বন্ধনে দেহ তাহাকে, চণ্ডালকে, যেন বা মনুষ্যোচিত করিল। ভেড়ীর পিছনে সে দণ্ডায়মান, একটি পা শীতকাতর কম্পিত! নিঃশ্বাসে সম্মুখের বৃক্ষপত্র সরিয়া যায়, এবং একারণে চক্ষুর্দ্বয়ের মধ্য দিয়া জিহ্বা বাহির হইয়া পড়িতেছিল। সে আর স্থির থাকিতে পারিল না, জন্তুর মত সেই স্থান বাহিয়া উঠিবার চেষ্টা করিল। মাটি ধবসিল, পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করিয়া ভেড়ী পথে উঠিয়া দাঁড়াইয়া, আপনার গতি সংযত করিতে না পারিয়া, এই পার্শ্বের কলমকাটা পথ বাহিয়া,—'মাভৈঃ মাভৈঃ' গর্জ্জন করিতে করিতে নামিয়া আসিয়া, গঙ্গার তীরে কর্দ্দমের উপর পড়িয়া গেল; তাহার, সম্মুখের হস্ত দুইখানি কর্দ্দমে, সে পশুর মত তাঁহার, যশোবতীর, দিকে চাহিয়া স্থির। যশোবতী এখন বিমূঢ়, সমস্ত দেহ যেন তাঁহার বক্ষে আশ্রয় করিয়াছে, দুই হস্ত সেখানে স্থাপন করত লজ্জায়, শঙ্কায়, ত্রাসে সঙ্কুচিত হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। এবম্প্রকার অঘটনের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। বৈজুনাথ কাদা ভাঙ্গিয়া পশুর মতই থপ থপ করিয়া আসিতেছে, লোলজিহ্বায় জোনাকির আলো। ভূততাড়িতের মত তিনি পলাইতে উদ্যতা হইলেন।

বৈজুনাথ উঠিয়া এক লম্ফে আসিয়া তাঁহার গামছাপ্রান্ত আকর্ষণ করিল, তিনি অনিচ্ছাসত্ত্বে ঘুরিয়া গেলেন; সে অতর্কিতে তাঁহার একটি হাত ধরিল এবং নিজের হস্তের গামছা মাটিতে ফেলিয়া একটি লাথি মারিয়া—কেননা এ-নীচ কার্য্যে সম্ভবত বসুন্ধরা বাধাদান করিয়াছিলেন—ইহার পরক্ষণেই যশোবতীর সুন্দর রূপলেখা, নশ্বর দেহখানি দুই হস্তে তুলিয়া ধরিল।

যশোবতী প্রথমত আপনকার বিবস্ত্র অবস্থার নিমিত্ত, দ্বিতীয়ত যে তাঁহার দেহ পরপুরুষের বন্ধনে উপলব্ধি করিয়া এককালে লজ্জায়, ক্ষোভে, নিশ্চয় দুঃখে, নিশ্চিত ব্যথায়, কাতরতায়—নির্ব্বাপিত, বিন্দুমাত্র, চেতনাহীন হইয়া গিয়াছিলেন। সহসা স্বীয় দেহের মধ্যে অসম্ভব বিস্ফোরণের শব্দ শুনিতে পাওয়া মাত্রই, পলকেই এ দুর্য্যোগময়ী অজ্ঞানতা নিশ্চিহ্ন হয়, এবং ক্রমে অধীরতায়, ক্রোধে, অপমানে, মুখ দিয়া দেখিতে, কান দিয়া বলিতে, নাসিকা দ্বারা শুনিতে চাহিলেন।

বৈজুনাথ মুখখানি তুলিয়া মুখখানি এমত ভাবে ঘুরাইল যেন সে আপনার দৃষ্টিপথকে পরিষ্কার করিয়া লইতেছে, যেহেতু তাহার ভ্রম হইয়াছিল মনে হয়, কেননা সে, যশোবতীর অনাবৃত দেহে, স্পষ্টতই শুভ্র সুদীর্ঘ উপবীত দেখিয়াছিল, যেমন পান্না ভৈরবীর অঙ্গে সে ইতঃপূর্ব্বে দেখিয়াছে—ফলে সে বড় দ্বিধায় পড়িল, একদা আপন মনে প্রশ্ন করিল, এই কি কনে বউর সাধনা...? এবং এ-প্রশ্নের কি যে উত্তর

দিয়াছিল সে-ই জানে। তবে একথা সত্য যে তাহার মন পূৰ্ব্ব হইতেই পৃথক হয়, কেননা সে বলিয়া চলিয়াছে, "এখন তুমি শব, শব ছাড়া কিছু নও।" এ হেন নেতি-বিচারসম্মত উক্তিতে সে আপনাকেই সম্মোহিত করিবার অবশ্যই চেষ্টা করিতেছিল, যেরূপে কালিনী কন্যার সম্মুখে ভক্ত শূন্যতার মন্ত্র উচ্চারণ করে, আপনার দেহস্থিত অস্থিমালা ঘুরায়।

যশোবতী রাবণ কর্ত্তৃক ধৃত সীতার মতই আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন, এবং যুগপৎ এই নীচকুলোদ্ভবকে আঁচড়াইতে চেষ্টা এবং দংশন করিবার জন্য মরীয়া হইয়া উঠিলেন, প্রচণ্ড দুৰ্দ্ধর্ষ বৈজুনাথ ক্রমাগতই তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতেছিল এবং এ সময় তিনি 'কৰ্ত্তা কৰ্ত্তা' বলিয়া এত উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়াছিলেন যে, নিশাচর পক্ষিকুল ইহাতে বিমোহিত হয়।

"কনে বউ, কনে বউ শব হয়ে থাক।...মিছাই রাত কাটাও হে...মিছাই...মা আমার কোম্পানী, তিনি বলেছে গো, তুমার মরণ নাই; মেয়েদের মরণ নাই..."

"কৰ্ত্তা কৰ্ত্তা..."

"অখণ্ড তোমার কৰ্ত্তা, তুমি মরবে কেনে গো...আমি আছি, বাঁচাব...এমন ঠাঁই ছেড়ে আসব তোমাকে, ফরসা হবে, তেনা (কাপড়) নাই আসতে লারবে, তুমি ইহকাল পাবে..." সে ইহার পর অনেক কিছু বলিতে চাহিল, কিন্তু পৃথিবী তাহার কাছে অতীব ডাগর, ডবকা, দশাসই, মনোরম; ছোট করিয়া কিছু বলিতেও পারিল না...।

"চাঁড়াল, চণ্ডাল...তোমার ভাল ..."

"আমার আবার ভাল, কি বল্লিস গো কনে বউ...চুপ চুপ, আমার ঘরণী হাসবে বটে!"

"চণ্ডাল আমি যদি বামুনের মেয়ে..."

"আমার যেন সতীদাহ হয়, ভাবের ঘরে চুরি ভাল লয় গো..."

"চণ্ডাল আমি অভিশাপে..."

এই কথায় সে, বৈজুনাথ, উল্লসিত হইয়া চৌকিদারের মত 'হোই' দিয়া কহিল, "গল্প জান গো, অভিশাপ লাগবে না, দেহচিতায় মন যার পুড়ে" বলিয়াই হাসিল; একারণে যে এ বাক্য দ্ব্যর্থবোধক।

দুঃখিনী যশোবতী কহিলেন, "আমি জানি, শয়তান তুমি বজ্জাত।"

বৈজুনাথ থামিতে থামিতে, থামিল।

"নরকের কীট হয়ে জন্মাবি...খল।"

এবম্প্রকার উক্তি বৈজুনাথ এমনভাবে শুনিতে চেষ্টা করিল যেমন বা, মনে হয়, এ কথা অন্যত্র হইতে আসিতেছে।

"তোর (!) মতলব...আমি..." যশোবতীর কণ্ঠ লজ্জায় ক্ষোভে রুদ্ধ হইল।

বৈজুনাথ ইহাতে অধার্ম্মিক, নিন্দনীয় ইঙ্গিত বুঝিল। তাহার ডাগর চক্ষুর্দ্বয় রাগে বন্ধ হইল; যশোবতীর উক্তি যেন বা তাহার চোখে পড়িয়াছে, সে কয়েক মুহূর্ত্ত চোখ বন্ধ করিয়া মুখ দ্রুত সঞ্চালিত করত, আপনাকে সুস্থির করিবার প্রয়াস পাইল। আর যে, চকিতেই সে অস্ত্রাঘাতপ্রাপ্ত শ্বাপদের ন্যায়, আকাশকে ফুঁড়িয়া, ফুঁসিয়া গর্জ্জিয়া, উঠিয়াছিল। সেই হেতু যশোবতীর ক্রন্দন, ক্ষণেকের জন্য থামিয়া যায়, এবং সে, বৈজুনাথ, আপনার দাঁতে দাঁতে ঘর্ষণ করত কহিল, "কি বল্লিস গো কনে বউ, তুমার মনে এই ছিল হে, শ্মশান আমার ঘরণী আমি তার শ্বশুর ঘর, ছি গো ছি, তুমি নারী কি পুরুষ তা আমি জানি না, ভেবেছিলুম তুমি পান্না ভৈরবীর মত সাদা!" বলিয়াই সে অত্যধিক ঘৃণ্য সামগ্রীর মতই যশোবতীকে যেমত বা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

যশোবতী নিশ্চয়ই আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিছুকাল এলো এঁটেল বেলাতটে অদ্ভুতভাবে পড়িয়া রহিলেন, কেবল ক্রন্দনের হেতু তাঁহার সোহাগের শরীর উঠে নামে। এখন অপমান এবং ক্ষুব্ধধৰ্ম্ম তাঁহার মনোযন্ত্রণার কারণ হইয়াছিল। অগণন সিক্ত কেশরাশি ঝটিতি মস্তক আন্দোলনে সরাইয়া একটি হাতের কনুইয়ের উপর সমস্ত উত্তমাঙ্গের ভার ন্যস্ত করিয়া, অন্যহাতের তর্জ্জনী দ্বারা তাঁহাকে ইঙ্গিত করত শোকাভিভূত স্বরে কহিলেন, "বদমাইস শয়তান, আমার স্বামী অথৰ্ব্ব...তাই তোর এত আস্পৰ্দ্ধা"—এইটুকুতেই বুঝা গেল যে তাঁহার স্বরভঙ্গ হইয়াছে।

বৈজুনাথ অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে শুধু কহিল, "ছি গো গো, ছি" এবং ইহার পর

বারম্বার শুনিল 'আমার স্বামী অথর্ব্ব'—ইত্যাকার কথা তাহাকে বড়ই ছোট করিয়াছিল, এবং সে যথাযথ উত্তর মুখে আসিলেও বলিতে পারে নাই; পরক্ষণেই সে দ্রুত পদবিক্ষেপে ভাওলিয়া নৌকার কাছে আসিয়া, খানিক দূরে শায়িত বৃদ্ধকে দেখিল। এখন সে একটি ডাল কুড়াইয়া যশোবতীর পট্টবস্ত্র যাহা কিঞ্চিৎমাত্র শুষ্ক হইয়াছে, তাহা কোন উপায়ে ডাল দ্বারা তুলিয়া, কিছুদূর পর্য্যন্ত আসিয়া তদনন্তর নৌকাভিমুখে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া, বেলাতটে এখনও ক্রন্দনরত যশোবতীর দিকে পিছু হাঁটিতে লাগিল। বেশ নিকটে পৌঁছাইয়া কোনরূপে পট্টবস্ত্র প্রদান করত কহিল, "কাপড়—কনে বউ যেন শ্মশান আমার ঘরণী, আমি কিছু নই, কেউ নই, 'নই'-এর আমি কিছু..."

বস্ত্রখণ্ড, যশোবতীর অনতিদূরে, বজ্রাহত পক্ষীর মত পড়িল; বিদ্যুৎবেগে কাপড়খানি ধরিতে গিয়াই তিনি প্রায় উম্মাদের ন্যায় হইয়াছিলেন, দেহ পুড়িতেছে, বস্ত্রদর্শনে লজ্জা বেশী করিয়া তাঁহাকে গ্রাস করিল। অপমান তাঁহাকে নিগৃহীত, নিপীড়িত করে; মনে হইল বস্ত্র তাঁহার এ-লজ্জাকে কোন ক্ষেত্রেই ঢাকিতে সমর্থ হইবে না, এবং নিঃস্ব মুষ্টি আস্ফালন করিয়া, 'আমি' বলিয়াই তিনি মুহ্যমান, বিমূঢ়; সর্ব্বসময় তাঁহার মনে হইতেছিল যেমত বা কোন অমূল্য সম্পদ হারাইয়াছেন, ফলে 'আমি যদি সতী' একথা তাঁহার বাধিল, অশ্রুপ্লুত নয়নে স্পন্দিত ওষ্ঠে তিনি কহিলেন, "তুই কৃমি কীট হয়ে থাকবি..." এ-ভয়ঙ্কর অভিশাপ তাঁহার বক্ষ উদ্বেলিত, স্বরকে আপ্লুত করিয়া উচ্চারিত হয়।

"মনুষ্য জনমে গড় করি, আমি আর চাইনা কনে বউ...কৃমিকীট কুকুর হওয়া ভাল গো, তাদের জাগা-ঘরে চুরি নেই, যাতনাও দেয় না। হে মা আমার কোম্পানী, সামনে আছেন, তোমার শাপ যেন ফলে।" এইসকল মনোভাব ব্যক্ত করিবার কালে, বৈজুনাথের হস্ত অঞ্জলিবদ্ধ ছিল, যে অঞ্জলির মধ্যে দক্ষতা ছিল না, এ কারণে যে তাহা করযোড়ে পরিণত হয় নাই, তথাপি তাহা দ্বিধা দোমনা নয়। এখন সে আবার কহিল, "লাও তোমার হইয়ে আঙুল মটকালুম গো, তিন সত্য করে কলির পাপ সত্যযুগ ঘুরে এল। ...বড় বেগোড় বুঝলে হে..."

"দেখতুম শয়তান, উনি যদি জোয়ান হতেন..."

বৈজুনাথ এই বাক্যে খুব মজা পাইল, জিহ্বা দংশন করত কহিল, "ইঃ...হায় হায় গো! কি পাপ। তখন আমি তোমার সামনে দাঁড়াবার ভরসা রাখতুম। কি ইব্‌লিস গো কনে বউ, তখনও কুকুর বেড়ালের সঙ্গে গা চাটাচাটি করে মণ্ডা খেতুম হে, আমি জাত চাঁড়াল।...ঘাট মানছি..." বলিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল; পৃথিবী শুদ্ধ হইল।

যশোবতী রোদনে যেন কূল পাইতেছিলেন না, ফলে বৈজুনাথ তাহার কণ্ঠ কিঞ্চিৎ উচ্চগ্রামে তুলিয়া বলিল, "শ্মশান আমার ইহকাল, আমার মনে পুণ্য নাই পাপও নাই, যদি থাকত!... তুমিই কাল হতে কনে বউ...লাও, আমি দাঁড়াব না তোমারও সময় হয়ে এল, কাল পূর্ণিমা...আমি যাব। লাস যদি আসে...তারাই দেখবে; তুমি পুড়বে আমি দেখতে...হ্যাঁ জেনো হে আমার মনে শুকের (শুকদেব) বাস" বলিয়া সে চলিয়া গেল। চন্দ্রালোক বর্দ্ধিত হইল।

যশোবতীর আপনকার ব্যথা ইন্দ্রিয়সমূহকে এরূপ জর্জ্জরিত করিয়াছিল যে বৈজুনাথের কোন কথাই তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করে নাই। তিনি নিজেকে একা পাইয়া, অবুঝের মতই কাঁদিয়া উঠিলেন, বারম্বার মিলন অভিলাষিণী নববধূ বলিলেন, "আমার কেউ নেই গো, আমার কেউ নেই।"

ভেড়ীর উপর হইতে বৈজুনাথ দেখিল।

দূরে, স্রোতক্ষুব্ধ বেলাতটে, একাকিনী যশোবতী, তিনি দণ্ডায়মানা, হস্তোপরি মুখমণ্ডল ঢাকিয়া ক্রন্দনরত, একপার্শ্বে কেশদাম হাওয়ায় সর্পিল, নিম্নে জলোচ্ছ্বাস। এখন তিনি ঊর্দ্ধে মুখ তুলিয়া হস্তদ্বয় আশায় উত্তোলন করত ডাকিলেন, "ভগবান ভগবান" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। একদা, কাহাদের যেন বা সম্মুখের আকাশে দেখিলেন, দেখিলেন... আরব্য রজনী সমূহ এখানেই স্বপ্ন কুড়ায় আর কাহারা তাহাদের অনুনয় করে, "আমাদের বিনিদ্র রজনীর বারমাস্যা নিয়ে যাও, নিয়ে যাও..." তিনি আরও দেখিলেন, গোলাপের কেশরাশ্রিত পরাগ, যাহা ভ্রমরের অঙ্গীভূত হয়, আঃ ভ্রমর! তুমি বুদ্বুদের বাহন, দুঃখের বাহক। সে পরাগ শূন্যতার মোহিনী মায়াতে বিমোহিত হইয়া অচিরাৎ ভ্রমর অঙ্গচ্যুত—খসিয়া

পড়িয়া ইদানীং উঠানামা করে...এরূপ নানাবিধ দর্শনে তিনি ভীতা, আর্ত্ত। কাক যেমত সূর্য্য দর্শনে ত্রাসিত হয়—কেননা, সূর্য্য অন্ধকারকে নিশ্চিহ্ন করিয়াছেন, অন্ধকার কালো, যেহেতু, সে, কাকও কালো, তাই ভয়ার্ত্ত—তেমনি সেইরূপ ত্রস্ত শঙ্কিত হইলেন। তাঁহার ক্রন্দন উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইল, সে ক্রন্দনধ্বনি পত্র-মর্ম্মরের সংঘাতে বর্ণ, এবং বর্ণসমূহ স্রোতের সংঘর্ষে এবং শূন্যতার গভীরতা দ্বারা শব্দব্যঞ্জনালাভে একটি পদবিন্যাস সৃষ্টি করিল...ভগবান তোমার চাতুর্য্য মেলা-বিলাসী বালককে মোহিত করুক; আমি জানি জল বাষ্প হয়, আমি মধ্যপথে নিশ্চিহ্ন হয় না, আমি জানি বাষ্পবিন্দুকে সূর্য্যতেজ ধ্বংস করিতে সক্ষম হয় না, আমি জানি যখন তাহা মেঘতনু লাভ করে তখনই বিগলিত—এ চাতুর্য্য, এ বিভূতির জন্য, আমার মন নাই, মোক্ষ নাই, কেননা আমিই বিভূতি, আমিই তোমার চাতুর্য্য, আমি তোমার সুদীর্ঘ স্বাধীনতা, এ জীবনকে 'খেলা' বলি; তুমি আমার স্বাধীনতা, আমি বন্ধুহীন, দীন, তুচ্ছ। ইদানীং তোমার ক্ষণিকত্ব বহনে আমি বড় ক্লান্ত।

তিনি উর্দ্ধলোকে নির্ভীকভাবে অবলোকন করিলেন, যেখানে বিন্দুর অণিমার ক্রমাগত উঠানামা—ইহার পর স্বামীর কাপড়খানি তুলিয়া স্খলিতপদে স্বামীর শয্যাপার্শ্বে আসিয়া কিঞ্চিৎ গঙ্গাজল আপনকার মস্তকে ছিটাইলেন। মানুষের কখনই কেহ নাই একথা সত্য, নিকটে কেহ নাই একথা ভয়ঙ্কর সত্য। নিভৃত গোপন নিঃসঙ্গ নির্জ্জনতা লইয়া কতকাল কাটাইবে, বিরহ কবে অরুণোদয় দেখিবে—যে ভগবান আমার জন্য ক্ষুদ্র হইয়াছেন...

"বউ"...

"কিগো" বলিয়াই মনে পড়িল স্বামীর দুর্গতির কথা, তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। বারম্বার বলিতে লাগিলেন, "তুমি তুমি..."

"তুমি...কোথা..."

"এই কাপড় কাচতে..."

"এ্যাঁ"...

যশোবতী কানের তূলা খুলিয়া বলিলেন, "তোমার কাপড় কাচতে..."

"কেন?"

যশোবতী আশ্চর্য্য হইলেন, বৃদ্ধের মুখপানে চাহিয়া দেখিলেন, কহিলেন, "তোমার কাপড় নোংরা হয়েছিল যে"...

"কষ্ট কষ্ট"

"না না..." তাঁহাকে আশ্বস্ত করিতে চাহিলেন। হঠাৎ কিসের শব্দ হইল। তিনি দেহকে খানিক উঁচু করিয়া লইয়া চারিদিকে দেখিলেন, অনন্তর শুনিলেন ছাগলের স্বর। দেখিলেন, বৈজুনাথের নৌকার ছইএর মত আড়াখানি, যাহা উল্টাইয়া পড়িয়া আছে, এবং অন্যদিকে ভেড়ীপথের উপর দাঁড়াইয়া কে একজনা ছাগলটিকে টানিতেছে। সে নিশ্চয়ই সে, এবং সেইক্ষণে একথা বুঝিলেন যে বৈজুনাথ সত্যই চলিয়া গেল।

যশোবতী স্বামীর পাশ ঘেঁষিয়া বসিলেন। কিছু পূর্ব্বে সংগ্রাম এবং ইদানীং ক্লান্তি অবর্ণনীয় নির্লিপ্ততার মধ্যে তাঁহাকে আনিতেছিল; বৈজুনাথের বিদায় গ্রহণ তাঁহাকে জাগ্রত করে, ক্রমে শৈত্য অনুভব এবং কিছুপরে শিবা ধ্বনি এবং তদুত্তরে পেচকের পীড়াদায়ক খর স্বর তাঁহাকে একীভূত করিল। ক্রমে দিঙ্মণ্ডলের বিনিষ্কম্প্র মৌনতা ত্রিতাপহারিণী বহমান গঙ্গাকে ভয়াল করিয়া তুলে। ইহাতে যশোবতী সত্যই আতঙ্কিত, অনন্য উপায়ে নির্জ্জীব প্রাচীন স্বামীর দিকে ভরসা করিয়া তাকাইলেন, বক্ষে হস্ত স্থাপন করত ইষ্ট দেবতা গোপীবল্লভকে স্মরণ করিতে বসিলেন। বারম্বার চক্ষু খুলিয়া গেল, অর্দ্ধসিক্ত বসনের হিম তাঁহাকে শিহরিত করিল, ওষ্ঠ দংশন করিয়া কি যেন ভাবিলেন, রাত্র গণনা করিলেন; জাঁতিটি লৌহ, ফলে স্বামীর শিয়রের তলে গুঁজিয়া নিজের হস্তমধ্যে অস্ত্রস্বরূপ কাজললতাটি লইলেন। চণ্ডাল নাই একথা ভাবিতেই—একাকী এই শ্মশানে, দংশনোম্মুখ বৃশ্চিকের মতই যাহার বর্ত্তমানতা—স্বামীকে লইয়া সমস্যা বিড়ম্বনায় সঙ্গীন অবস্থায় পড়িলেন; আর একবার চণ্ডালের আড়ার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।

"বউ..."

স্বামীর ডাকে তাঁহার দেহ যেমত বা মোচড় দিয়া উঠিল, এ ডাকটিকে হস্তদ্বারা ধরিতে চাহিলেন; কেননা, মনে হয়, এহেন দুর্ব্বিপাকে তাহা ব্রহ্মাস্ত্রের মতই কাজ দিবে, এবং এ ডাক শ্রবণমাত্রই তিনি উত্তর করেন, "এই যে গো, কেনে?" কিন্তু সীতারাম কোনই সাড়া দিলেন না, নিশ্চয়ই তিনি ঘুমের মধ্য হইতে আপন পত্নীকে সম্বোধন করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ ঘুমে অচৈতন্য, কারণ পরিশ্রান্ত, তাঁহার নিঃশ্বাসে বক্ষের ঘড় ঘড় ধ্বনি এই চক্ষুহীন নির্ম্মম স্থানটিকে পুনঃপুনঃ রক্তাক্ত, পাংশু, ফ্যাকাশে, শব, অস্বাভাবিক, রুক্ষ, প্রেতাত্মক করিতেছিল।

যশোবতী, এ শ্মশান—যাহার পৈশাচিক রূপটি, প্রত্যেক জিহ্বাকে নাবালক, প্রত্যেক দৃষ্টিপথে জ্যোতির্মণ্ডলের বীজ ছড়াইয়া দেয় এবং এখানকার কিঞ্চিন্মাত্র শব্দে অন্য স্তব্ধতা থরহরি—এই সেই রমণী একদা যাঁহার মারাত্মক প্রলয়ঙ্করী শব্দে ত্রিভুবন মথিত হয়—তিনি আর্ত্ত, তিনি আর সহ্য করিতে অক্ষম। পলাতক জন্তুর পদধ্বনি শ্রবণে কতবার চমকাইলেন, তিনি যেন প্রাণপণ মাটি আঁকড়াইয়া থাকিতে প্রস্তুত, আর সম্ভব হইল না, হিতাহিত বিবেচনা অদৃশ্য হইল, তিনি আপন স্বামীকে ছাড়িয়া দৌড়াইয়া ভেড়ীপথে উঠিলেন।

মাঠে আবছায়া কুয়াশা, যে কোন বস্তুতেই নীচকুলোদ্ভব চণ্ডাল বিদ্যমান হইল, যশোবতী ছোট করিয়া হাঁক ছাড়িলেন, স্বর বক্র হইল। কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া চৌকিদারী কণ্ঠে হাঁকিলেন।

এ এক অদ্ভুত স্থান হইতে তিনি আর এককে ডাকিতেছেন, যে মানুষ তাঁহার আসন্ন ভীতি হইতে রক্ষা করিবে। এ স্থান লতা গুল্ম তৃণ বৃক্ষে আচ্ছন্ন, আর তিনি একটি 'বেশী প্রকাশ'। এ ভাবনায় তাঁহার দেহ দুলিয়া উঠিল, তথাপি আত্মসম্বরণ করিলেন।

অনেকবার এইরূপ করা হইল, কিন্তু প্রতিটি হাঁকই করুণ প্রতিধ্বনি হইয়া ফিরিয়া আসিল। মহা আক্ষেপে যশোবতী বৃক্ষ আঁচড়াইলেন, এবং প্রত্যাবর্ত্তনের উদ্যোগ করিবার কালে তাঁহার মনে হইল শেষবারের মত ডাকিয়া চলিয়া যাইবেন। সুতরাং এইবার হাঁক দিলেন।

তদুত্তরে নিকটস্থ বৃক্ষের পার্শ্ব হইতে ছাগধ্বনি আসিল। দুঃখিনী যশোবতী মহাউদ্বেগে যত্রতত্র দৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন। আর, আবার, ছাগলের খেদধ্বনি শোনা গেল। যশোবতী বালিকাই বটে...তাঁহার মধ্যে ছাগটিকে আলিঙ্গনের বাসনা দেখা দেয়, আর যে, পরক্ষণেই মনে হইল, ছাগ আছে বলিয়াই যে চণ্ডাল আছে এমন নহে; এ বড় ন্যায়ের কথা। পলকেই সবিস্ময়ে শুনিলেন ছলাৎ করিয়া একটি শব্দ; ব্যগ্র নয়নে দেখিলেন, একটি বাঁকলগ্ন কলস হইতে জলীয় কিছু পড়িল; যদিচ আধো আলো আধো অন্ধকার, ইহার পর প্রকৃতির রজগুণরাশির তথা পাতা লতাগুল্মের ছায়া যাহার সর্ব্বশরীরে—সশরীরে বাঁক কাঁধে বৈজুনাথকে দেখা গেল।

যশোবতী প্রথমে সচকিত, কেননা ভয়, দ্বিতীয়ত লজ্জিতা যেহেতু আত্মাভিমান, বৃক্ষের পিছনে মুখ লুকাইলেন।

"কনে বউ"—বৈজুনাথ কোনক্রমে উচ্চারণ করিল।

অন্ধকার তাঁহার মুখমণ্ডলকে বৈচিত্র্য দান করত চলিয়া গেল, কেননা মলয় পবন ক্ষণিকের জন্য পত্র-রাশিকে শতচ্ছিন্ন করে, এ হেন সময়ে সহসা আলো আসিল; যশোবতী আপনার মধ্যে পদ্মগন্ধ উপলব্ধি করিলেন, অল্পক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বৃক্ষ গাত্রে নখরাঘাত করিতে করিতে বলিলেন, "আড়া ভেঙে দিলে যে..." ইহা ব্যতীত তিনি কি আর প্রশ্ন করিতে পারেন!

"আড়া ছাড়া কি আর ভাঙব হে, উঁচু যারা তারা উনুন ভেঙে চলে যায়, আমার উনুন চিতা...তাই আড়া...তুমি আমায় ডাকতে কেনে এসেছ হে তা জানি বটে, বলব..."

যশোবতী তাহার দিকে চাহিলেন, দেখিলেন পত্রগুল্মের ছায়াচিত্রিত একটি মানুষ।

"শ্মশানে একা বড় ডর, না হে? শব না হলে শ্মশানে থাকে কে গো, শিব নিজে এখানে শব হয়ে থাকে, আমরা কোন ছার—এ বড় কঠিন ঠাঁই, দিন রাতে দেখা নাই। ভয় কেনে গো, তিনকুড়ি তন্ত্র আরজন্মে করেছ, এখনও মায়া...তাহলে? আমি কলসীর ভার কমাবার জন্য একটু সেবা করেছিলুম হে তাই...দেখা, কনে বউ। চণ্ডাল হয়ে জন্মেছি বলে আমি দোষ দিইনি রাগ করিনি, আমি ধম্ম খোয়াইনি, লাথি ঝ্যাঁটা খেয়ে আছি...কিন্তু তুমি..." বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠে যেন বা পোকা ঢুকিল। সে

কিছুকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বাঁক নামাইয়া সত্বর মদ্যপান করত দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিল, "এক গল্প বলি হে, তোমার রঙ যেমন দুধে আলতায়, আমার রক্তে তেমন দুধে আলতায়...কেনে? যে কোম্পানী উপরে, সে আমাদের রক্তে দুধ দিইছে, যেমন তোমাদের বুকে দুধ দেয় গো, আমাদের রক্তে দুধ দেয় হে। চিতার আগুন আমার কিছুই চ্যামটে খয়রা করেনি হে, বড় কষ্ট হয় তাই...যা কিছু; জেনো বটে হে শ্মশানেই আমার আঠা...তোমার শাপ মনে লয়, আমার মনে ড্যাঙ্গাডহর আছে, বীজ বৈখরী...চায়...পাপ আছে..."

"চণ্ডাল, আমি..."

"আমি! আমি! তুমি কার আমি। তুমি ত এক প্রহরের শ্বাস টানা শব; কাল এতক্ষণ চাঁদ যখন লাল, তখন লয়...তাই আমি বলেছিলুম বটে হে...রক্ত আমার দুধে আলতায় গো।"

"এখন না মরে আমার উপায় কি বলতে পার...আমায় ফেন দেবার লোক কই..."

"তোমার কেউ নেই...তোমাদের জাতে কুটুম..."

"আমাদের, কেউ থাকে না..."

"বড় ডাগর জটাধারী কথা গো, গঙ্গার সামনে দাঁড়িয়ে বলতে পার..."

"তুমি ভুল বুঝলে হে, আমার স্বামী ত আছেন, যাক ও কথা, তুমি আজ রাত্রে যেও না" বলিয়া চলিয়া গেলেন, কেননা এ সময় পুনরায় আপনার দেহে তীব্র পদ্মগন্ধ আলোড়িত হয়।

ক্রমাগত পাখী ডাকিতেছে, হাওয়া ছিন্নভিন্ন; সীতারাম যেন প্রাণ লাভ করিয়া শ্বাসটানা কণ্ঠে ভোরাই গাহিতেছিলেন, "রাই জাগো রাই জাগো।" যশোবতী, শ্রান্ত, ঝড় বিলুণ্ঠিত বৃক্ষ বা, ঘুমে অচৈতন্য। ক্রমাগত গীত আসিতেছিল, ক্রমে তিনি নয়নযুগল উন্মীলন করিলেন; যে পৃথিবী প্রাণময়, যে পৃথিবী প্রতিবিম্বময়, তাহা রঙীন হইল; স্বামীর গান তাঁহাকে মোহিত করিয়াছিল। ভাবের ভাবি করিতেছিল। ভালো লাগিতেছিল।

"বউ ভোর গো"...

যশোবতী কোনমতে স্বামীর কানের তুলা খুলিয়া, "এখানে শ্বশুর শাশুড়ী ত কেউ নেই, ঘুমোই না—" শিশুর মত কহিলেন।

"ঘুমাও ঘুমাও"...

"না গো, আমি" বলিয়া উঠিয়া বসিলেন, আলস্য বিদূরিত করিবার পর স্বামীর প্রতি চাহিলেন।

"বল তুমি আছ বলে বড় বাঁচবার সাধ হচ্ছে..."

"কি করে এত স্পষ্ট বলছ গো, ওমা..."

বৃদ্ধ হাসিলেন। "তোমার জন্য বাঁচবার..."

"ঠাকুর ঠাকুর...তোমাকে বাঁচতেই হবে।"

"তোমার উপর বড় মায়া পড়ে গেছে, মায়া হয়...বুক চিরে দেখাব..."

যশোবতী অবাক হইলেন, নিঃশব্দে কহিলেন, "ঠাকুর ঠাকুর..."

"আমার বড় খিদে পাচ্ছে..." বৃদ্ধ কিছু পরে কহিলেন।

"চিড়ে খাবে? পারবে?"

"হ্যাঁ!...আচ্ছা আমায় তোমার মনে ধরেছে..."

"ছিঃ ছিঃ...কি যে..."

"আমার বড় আয়না দেখতে সাধ হয়।"

"ফর্সা হোক..."

অনেকক্ষণ পর ইতস্ততঃ করিয়া সহসা কি যেন বা তাঁহার, বৃদ্ধের, স্মরণ হয়; ফলে তিনি অবিচারিত চিত্তে বলিলেন, "আচ্ছা বউ, আমাদের ফুলশয্যা..." এবম্প্রকারের কথা বলিবার পরক্ষণেই তাঁহার

সম্ভবত লজ্জা হইল।

যশোবতী নীরব থাকিয়া কহিলেন, "কেন হবে না..."

সম্ভবতঃ পূর্ব্বের উক্তি চাপা দিবার জন্য বৃদ্ধ কহিলেন, "বউ...আমি যদি মরি তোমার মন কেমন করবে?"

অকপটে যশোবতী কহিলেন, "খুব"—এ বাক্যে আন্তরিকতা ছিল, গঙ্গার বাস্তবতা ছিল।

"হুঁ"...মিছাই"

"মিথ্যা আমার মরণেও নেই, কর্ত্তা।"

"সত্যি"...

"সত্যি"...

যখন রীতিমত আলো হইল তখন সীতারাম সলজ্জভাবে স্ত্রীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বউ আমি উঠব, বসব।"

"কষ্ট হবে না..."

"না, বসে একটু ডাকব..."

সীতারামের ঠিক পিছনে, যাহাতে তিনি হেলান দিতে সমর্থ হন, তাহার উপযোগী করিয়া একটি কলস উল্টাইয়া বসাইয়া দিয়া বৃদ্ধকে কোন ক্রমে উঠিয়া বসিতে সাহায্য করিলেন। এ সময়, সীতারাম বক্ষে কর স্থাপন করত আকল্পনবীনা এই পৃথিবী দর্শন করিয়া ইষ্টমন্ত্র জপ করিয়া, "রাধা শ্যাম" স্মরণ করিলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই চক্ষু খুলিয়া গেল, চতুর্দ্দিকে চাহিয়া ভারী খুসী হইলেন, "বউ বড় ভালো লাগছে গো—"

ইহাতে যশোবতীর বড় আনন্দ হয়, এবং বৃদ্ধের ক্রমাগত গাল-চোষার মুদ্রা-দোষ আর তাঁহার চোখে পড়িল না।

"বহুদিন পরে যেন দেখছি..." বলিয়া তিনি একটি গভীর নিঃশ্বাস লইয়া পরে ত্যাগ করিবার কালে অল্প কিঞ্চিৎ কাশিলেন এবং তৎসহ একটি "আঃ" শব্দে স্বস্তির ধ্বনি শোনা গিয়াছিল। গঙ্গাকে প্রণাম করিতে করিতে কহিলেন, "মা মা মাগো"—পুনর্ব্বার খুসী মনে, টপ্পাগায়কের মত, চারিদিকে চাহিলেন। বলিলেন, "মনে হয় সব যেন আমার..."

অনন্তর মাটিতে হাত চাপড়াইতে চাপড়াইতে কহিলেন, "আঃ কি সুন্দর..." সহসা হাতটি লইয়া লেহন করিলেন।

যশোবতী সত্বর তাঁহার হস্তটি ধরিয়া ব্যাকুলভাবে আপনকার অঞ্চল প্রান্ত দ্বারা পরিষ্কার করিতে করিতে বলিলেন, "ছিঃ গো ছেলেমানুষী করছ গো, শ্মশানের মাটি...কেউ মুখে দেয়...বৈরাগ্য হবে যে গো, আমার থেকে মন উঠে যাবে, এ দেহ দেখে নেতিবিচার করবে" বলিয়া স্বেচ্ছায় আপন লজ্জা ত্যাগ করত চটুল হাসি হাসিয়া বৃদ্ধের-দেখা পৃথিবীটিকে নিরীক্ষণ করিলেন।

"তা বটে তা বটে...আচ্ছা বউ আমার বুক দশ মরদের মত না, আ... আয়না..."

"আয়না কোথায় পাব...আমি তো জলে..."

"আমাকে দাও..."

যশোবতী একটি মালসায় জল লইয়া আসিলেন। অধৈর্য্য বৃদ্ধ জলপূর্ণ মালসাটি লইবার জন্য মন্ত্রবলে অত্যুগ্র আগ্রহ হস্ত প্রসারিত করিলেন, যশোবতী তাঁহার হস্তে দিলেও মালসা ছাড়েন নাই, তিনি নতজানু হইয়া স্বামীর সম্মুখেই বসিয়া ছিলেন। বৃদ্ধ যশোবতীকে অজস্রবার মৃদু ভর্ৎসনা করিলেন, "আঃ ঠিক করে ধর না—কি কচ্ছ পাগল—" কখনও স্থিরভাবে নিজের, একদৃষ্টে প্রতিবিম্বের দিকে, জীবনের দিকে চাহিয়া রহিলেন—তাঁহার শীর্ণ স্কন্ধ স্পন্দিত হইল—ধীরে মুখখানি তুলিয়া পত্নীর দিকে তাকাইয়া কহিলেন, "আমায় সুন্দর—"

যশোবতী আপনকার সুন্দর মুখখানি আন্দোলিত করিলেন, বৃদ্ধের, স্বামীর, উক্তি সমর্থিত হইল।

বৃদ্ধ সীতারাম স্বীয় প্রতিবিম্বের পশ্চাতে অম্বর, কখনও মেঘমালা এবং উড়ন্ত পক্ষী দেখিলেন—দুস্তর গাম্ভীর্য্য আসিল, এবং প্রশ্ন করিলেন। বৃদ্ধ আপনার চক্ষু দেখিলেন, মমত্ববোধ আসিল এবং সেই প্রশ্ন করিলেন, বৃদ্ধ আপনার দন্ত দেখিতে মাড়ি দেখিলেন, ঝটিতি জিহ্বা দেখিলেন ভয় আসিল, সত্বর

প্রশ্ন করিতে গিয়া দেখিলেন, ভয়ঙ্কর কাশির ধমকের মধ্যে মালসা দু'জনের হস্তচ্যুত হইয়া ভাঙ্গিয়া খান খান হওয়ার মধ্যে, এ বিপর্য্যয়ের মধ্যেও একটি প্রশ্ন শোনা গেল। যশোবতী বারম্বারই বলিয়াছিলেন, "তুমি সুন্দর তুমি সুন্দর তুমি সুন্দর।"

যশোবতী তাঁহার স্বামীকে ধরিয়া যত্নে কলসে ঠেস দিয়া ধরিয়া রহিলেন। অসুস্থতা প্রশমিত হইল। গঙ্গোদক দিয়া স্বামীর চোখ মুছাইয়া দিলেন।

"আমায় সত্যিই সুন্দর দেখতে, না..."

"হ্যাঁ..."

"তুমি...ঠাট্টা? আমায় রাজ-পুতুল বলত..."

যশোবতী করুণ স্বরে উত্তর দিলেন, "কেন এ কথা বলছ গো"

বৃদ্ধ রূঢ়ভাবে তাঁহার দিকে কটাক্ষপাত করিয়া একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন। যশোবতী বুঝিলেন স্বামী মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছেন; কি ভাবে যে বুঝাইবেন তাহা ভাবিয়া পাইলেন না, অবশেষে তাঁহার বক্ষ স্পর্শ করিয়া কহিলেন, "মিথ্যা বললে পাপ হয়, আমার মরণে মিথ্যা নাই গো...সত্যিই তুমি সুন্দর—"

বৃদ্ধ আনন্দে বিহ্বল হইয়া কি যে বলিবেন স্থির করিতে পারিলেন না, "জরা যেন কে নিয়েছিল?"

"তোমার তো জরা নেই, যদি থাকে জরা সে তো আমি, আবার জন্মাবে আবার আসব..."

বৃদ্ধ পত্নীর আশা শুনিয়া কহিলেন, "আমাকে তোমার মনে ধরেছে..."

"মনই তো সব।"

এখনও জলের আয়নার প্রতিবিম্ব বৃদ্ধের অঙ্গে খেলিয়া উঠিতেছিল। যশোবতী খোলামকুচি দিয়া অন্য মনে নির্লিপ্ত ভাবে এতল-বেতল খেলিতেছিলেন। বৃদ্ধকে এই ক্রীড়া উৎসুক করিয়াছিল, তিনি নিবিষ্ট মনে তাহা লক্ষ্য করিতেছিলেন, তদবস্থায় কহিলেন, "মানুষ এমন ঘুরে ঘুরে আসে..." একটি শ্বাসের শব্দ শোনা গেল, শূন্যতা সৌখীন হইল। যশোবতী নিমেষের জন্য খেলা স্থগিত রাখিয়াছিলেন, পর মুহূর্ত্তেই আরম্ভ করিলেন।

বৃদ্ধ খেলা দেখিতে দেখিতে প্রস্তাব করিলেন, "এস এস আমরা বাঘবন্দী খেলি..."। খেলিবার কালে কতবার যশোবতীকে, "জুয়াচোর, এ ঘুঁটি কি করে এল" ইত্যাকার দোষারোপ করিয়াছিলেন। এমত সময় ঘোর হরিধ্বনি শোনা গেল। বৃদ্ধ কর্ণে হস্তপ্রদান করিলেন।

"তূলা দি..."

"না..."

"ধর আমি যদি যাই, তুমি..." বলিয়া বৃদ্ধ একটি চাল দিলেন।

যশোবতী একদৃষ্টে স্থির থাকিয়া স্মিতহাস্য করত মস্তক আন্দোলিত করিয়া আপনার দৃঢ় সংকল্প প্রকাশ করিলেন, "জাল ছিঁড়ে যাবে, পুকুর ছেড়ে ত যাবে না।"

"না, ওটা দিও না তোমার ঘুঁটি মার খাবে...ভয়...করবে না।"

"তুমি আছ আমার ভয় কি...আমি যে তোমার মধ্যেই" সরলভাবে যশোবতী একান্ত নির্ভরতা প্রকাশ করিলেন।

তথাপি বৃদ্ধের মন মানিল না, ঘুঁটি ধরিয়া কহিলেন, "টক্কা না ফক্কা..."

"টক্কা..."

দেখা গেল বৃদ্ধের হাতে ঘুঁটি রহিয়াছে; বৃদ্ধ আনন্দে আটখানা, "তাহলে বাঁচবো গো...আবার মড়া পোড়ার গন্ধ আসছে, বাঁচবো? তুমি ধর।"

যশোবতীর ক্ষেত্রে দেখা গেল সেখানেও একই ফল। উল্লাসে বৃদ্ধ বলিলেন, "আর ভাবনা নেই...আমি কিন্তু পাল্কীতে যাবো...তুমি আমার কাছে...বড্ড খিদে পাচ্ছে গো।"

"চিঁড়ে ছাড়া..."

"দ্যুৎ—দুধ"

"কোথায় পাব গো..."

"আমার বাড়ীতে কত গোরু...তুমি উঠে দেখ না, মাঠে কত...চণ্ডালকে ডাক না..."

"আমি ডাকবো কি করে?" বলিয়াই যশোবতী আপন অন্তরে শিহরিত হইলেন।

"তাতে কি..."

ক্রমে বৃদ্ধ অবোধ হইয়া উঠিলেন। "একটু দুধ তা-ও" হুঁ হুঁ করিয়া কান্নার শব্দ আসিল। যশোবতীর তাঁহাকে বুঝানোর চেষ্টা বিফল। তবু বৃদ্ধ পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতে লাগিলেন, "দুধ না হলে জোর পাব কি করে? তুমি যোগাড় কর..."

যদিও স্বামীর জন্য নববধূ কাতর হইয়াছিলেন, তথাপি কহিলেন, "আমি বউ মানুষ...তা'রা এখুনি আসবে, তখন নয়...লক্ষ্মীটি অমন ক'র না..."

"আমি আমি... "

যশোবতী অগত্যা উঠিলেন, ভেড়ীপথের উপর হইতে দেখিলেন অনতিদূরে বুনোদের বাড়ী, কিছু উত্তরে। তিনি ভেড়ীপথ ধরিয়া গিয়া দাঁড়াইলেন, এখান হইতে বুনোদের গৃহপ্রাঙ্গণ দেখা যায়। যশোবতী ভেড়ীপথেই—তাহাদের গৃহসম্মুখে দাঁড়াইয়া, একটি স্ত্রীলোককে তিনি ইঙ্গিত করিয়া ডাকিলেন, তাঁহার ক্ষুদ্র কলসটি দেখাইয়া কহিলেন, "একটু দুধ দেবে..." বলিয়া তাহার দিকে একটি সিক্কা পয়সা ফেলিয়া দিলেন। স্ত্রীলোক সিক্কা পয়সা কুড়াইয়া লইয়া দুধ আনিয়া দিল, দুধ তিনি কাঁখে লইতে শুনিলেন, "কি কনে বউ?"

যশোবতী কিঞ্চিৎ বিচলিত হইলেন। যাহা কিছু ঘটিয়াছে তাহা এতক্ষণ মনেই ছিল না, এবং তাহার কোন কিছুই তাঁহার স্মরণ ছিল না। চণ্ডালকে আপাদমস্তক দেখিয়া চিনিতে পারিলেন, গুণ্ঠন টানিয়া চলিতে শুরু করিলেন।

"দুধ আনতে এসেছিলে...হে হে আমি ছিলাম ঠায়, আমাকে বললে না কেনে, পাঠিয়ে দিতাম গো...তুমি বউ মানুষ," চণ্ডাল কহিল।

"এলাম..."

"এখন বুড়ার গায়ে গত্তি লাগবে বটে...এ হে হে এখানে লামছ কেনে গো..."

তাহার কথা শেষ হওয়ার পূর্বেই যশোবতী ভেড়ীপথ ভাঙ্গিয়া নামিয়া পড়িলেন। অল্প দুধ ছলকাইল, চণ্ডাল পিছু ছাড়িল না।

এক্ষেত্রে যশোবতী তাহাকে কিছু বলিতে চাহিলেও লজ্জায় বলিতে পারিতেছিলেন না। কখনও তাঁহার গতিকে দ্রুত করিয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি চণ্ডাল তাঁহার পিছু পিছু আসিতেছিল।

"কয়েক প্রহর বাদে গো, এসব মাটি নিয়ে খেয়োখেয়ি হবে গো"—বৈজুনাথ নিজের দিকে চাহিয়া বলিল।

যশোবতী চলিতে লাগিলেন।

"হে গো আমার কথার উত্তর দাও না কেনে..."

"এখন যাও..."

"আহা" বলিয়া বৈজুনাথ কিঞ্চিৎ সহজ হইবার চেষ্টা করিল।

"চণ্ডাল..."

"তোমার কথায় কনে বউ আমার জন্মান্তর হল, আমি এখন..."

"এখন যাও..."

চণ্ডাল বৈজুনাথ স্থির হইল; তাহার পর, তিনি অগ্রসর হইলেন। এ সময় সত্বর চণ্ডাল তাঁহাকে অনুসরণ করিতে গিয়া পিছলাইয়া পড়িতে যশোবতী এ শব্দে সচকিত হইয়া ঘুরিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না।

বৃদ্ধের কর্ণে একটি হাস্যের শব্দ আসিল। তিনি কোথা হইতে হাস্যধ্বনি আসিতেছে তাহা অনুধাবন করিবার চেষ্টা করিয়া, বক্রদৃষ্টিতে দেখিলেন; দেখিলেন, যশোবতী এবং চণ্ডাল। সীতারাম অসম্ভব চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, শিরা-উপশিরা স্ফীত হইল, অভ্যন্তরে কে যেন ধূম্রজালের সৃষ্টি করিল, আপনকার মাড়ি ঘর্ষণ করিলেন, ইহার শব্দ শয্যার খড়ে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। যুগপৎ বিস্ময়ে ঈর্ষায় বার্দ্ধক্য যেন যৌবদশা প্রাপ্ত হইল। তিনি ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। ভাবিলেন, আমার আকাশই ভাল; কিন্তু সহস্র ধিক্কার

তাঁহাকে মাটিতেই ধরিয়া রাখিল। চক্ষুর্দ্বয় কোনক্রমেই বন্ধ রাখিতে পারিলেন না। আক্ষেপে ক্ষোভে অভিমানে তিনি পুড়িতে লাগিলেন। একবার মাত্র কহিলেন—"তুমি না বামুনের বউ, ছিঃ" বলিয়া, ক্ষোভে দুঃখে অন্যদিকে মুখ করিয়া রহিলেন, তাঁহার শরীর তরঙ্গায়িত, সম্মুখে শ্মশান।

যশোবতী স্বভাবসুলভ স্থিরভাবে, দুধের কলস রাখিয়া নিকটে ভেড়ীর খাঁজনে, ঝিক্ করিয়া পালা দিয়া, তুষের মালসা হইতে অগ্নিসংযোগ করত দুধ গরম করার পর বৃদ্ধের নিকট আসিয়া বলিলেন, "দুধ পাওয়া গেল" বলিয়া স্বামীর প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখলেন, তিনি যেমত বা মৃগী রোগাক্রান্ত। তিনি তাঁহার গায় ব্যাকুল চিত্তে হস্তপ্রদান করিবামাত্র বৃদ্ধ মহারোষে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। যশোবতীর তাহাতে কোনরূপ মান হইল না। স্বামীর জন্য চিন্তাকুল হইয়া পুনরপি সস্নেহে তাঁহার সেবা করিবার জন্য তৎপর হইবামাত্র বৃদ্ধ যেন রাগতস্বরে এক কালেই অজস্র কথা বলিয়া গেলেন—কহিলেন, "কোথা মরতে গিয়েছিলে?"

"দেরী হয়ে গেল বড়, না গো..."

পত্নীর সরল কণ্ঠস্বর তাঁহাকে, বৃদ্ধকে, অতিমাত্রায় কুপিত করিল। "খাব না ও দুধ..."

"সে কি..."

"না" বলিয়া আরবার মুখ ফিরাইলেন।

"আর দেরী হবে না...লক্ষ্মীটি...তুমি যদি রাগ কর তাহলে আমি যাই কোথা...রাগ ক'র না...।" বৃদ্ধ স্বামীর রাগের কারণ বুঝিয়া, অভাগিনী তাঁহাকে তুষ্ট করিবার মানসে যত্নবান হইলেন। অঙ্গুলিপ্রদান করত বুঝিলেন, দুধ প্রায় ঠাণ্ডা হইয়া যায়।

"দুটি পায়ে পড়ি...দেরী..."

"ফেলে দাও দুধ..."

যশোবতী তাঁহার পদদ্বয় ধরিয়া অনেক কাকুতি মিনতি করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ কহিলেন, "মরণকালে আমার এই ছিল! ছুঁয়ো না আমাকে...হারামজাদী নষ্ট খল খচ্চর মাগী..."

হরিণনয়না যশোবতী, পবিত্র যশোবতী স্বামীর পদদ্বয় হইতে মস্তক তুলিয়া বিস্ময়াবিষ্টের মত তাকাইলেন। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় যেন কাঁচে রূপান্তরিত হইল। যেন দ্রুতগতি অসংখ্য পতঙ্গ তাঁহার কানে গুঞ্জন করিতে লাগিল। সত্ত্বরজস্তম গুণাবলী হইতে কে যেন তাঁহাকে অব্যাহতি দিল।

বিকৃত মুখব্যাদান করত কহিলেন, "রাক্ষুসী ন্যাওনী মাগী—লেথিয়ে তোর মুখ ভাঙ্গি..." অনেকবার তাঁহার কুৎসিত মাড়ি বাহির হইল, যাহা বন্যবরাহের মুখগহ্বরসদৃশ রেশমী, অনেকবার তাঁহার গাল-চোষার বিকৃত আওয়াজ শোনা গেল।

ভগবান। তুমিও বোধ করি অদ্যাবধি এত গঞ্জনা শোনো নাই। এ হেন অশ্রাব্য ঘৃণাসঞ্জাত কুকথায় বাত্যাক্ষুব্ধ লতিকার মতই যশোবতী থরহরি। অধর দুটি আপনাদের আকর্ষণ অমান্য করত মুক্ত হইতে চাহিতেছে, কে যেন বা তাঁহার কর্ণে, 'তোমরা আমাকে কি পেয়েছো, তোমরা কি!' বাক্যাবলী বলে।

সম্মুখে উৎক্ষিপ্ত বৃদ্ধ সরলরেখা। ক্রোধে হস্ত মস্তকের নিকটে—এবং কেশ বর্ত্তমান এরূপ স্থানে আকর্ষণ করিয়া—ফিরিতেছিল। মধ্যে মধ্যে 'ওহো হো হো' শব্দ।

নদীসৈকত, শ্মশান, অশরীরী মায়া এই নির্ম্মমতা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল!

যশোবতী স্বামীর দুর্ব্বল একটি পা, বক্ষে স্থাপন করত কি যেন বলিতে চাহিয়াছিলেন, ইহাও সত্য তাঁহার মধ্যে কে যেন একটি শ্লোক জপ করিতেছিল—'ন পতিঃ সুখমেধত যা স্যাদপি শতাত্মজা।' পরক্ষণেই বিশুদ্ধস্বভাবা, নিষ্কলুষ, পাপবিরহিতা যশোবতী ইত্যাকার শ্লোক শ্রবণ কালে, আপনার অভ্যন্তর বিহ্বল লোচনে নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন, সেখানে অল্পবয়সী ঘুম ছিল, সেখানে ঘোর জটাজাল আবৃত মধ্যরাত্র। কোন এক দুর্ব্বৃত্ত তস্কর ছিদ্র করিতে যত্নবান, ক্রমাগত খর খর শব্দ। তাঁহার শিরাসমূহ টঙ্কার দিয়া উঠিল। স্বামীকে তিনি তবু শুধু মাত্র বলিলেন, "বাঁচাও বাঁচাও..." কিন্তু শোনা গেল "ওগো ওগো..."

বৃদ্ধ তখনও ক্ষান্ত হন নাই।

"আমায় আর কষ্ট দিও না—আমার..." একদা তিনি শ্মশানের দিকে ভয়ঙ্করভাবে চাহিলেন। সেখানে আবছায়া চণ্ডাল, বুক যেন তাহার অধিকতর স্ফীত, যেন ব্যাঘ্র খেলিয়া ফেরে, যেখানে চন্দ্রালোক উৎসবে লতাপত্রের ছায়া ছিল।

সীতারামের পদদ্বয় অশ্রুসিক্ত, তবু, তাঁহার ক্রোধে যেমন বা নূতন করিয়া দন্তপাতি দেখা দিয়াছে। তিনি পৈতা ছিঁড়িয়া অভিশাপ দিতে গেলেন। দুগ্ধপাত্র স্থানচ্যুত হইল। এখন কাক আসিয়া সেই দুগ্ধ পানে ব্যাপৃত।

অভিশাপের উত্তরে যশোবতী বলিলেন, "আর জন্মে যেন তোমাকে পাই..." আপনার সত্ত্বগুণকে রক্ষার নিমিত্ত এ আপৎকালেও ক্রমাগত অনেক কথার মধ্যে এই কথা বলিয়াছিলেন যে, "সমুদ্র যেমন তীরভূমিকে লঙ্ঘন করে না, তেমনি আমিও আপনাকে কখনই লঙ্ঘন করিব না।"

"মাগী...পটানি ফাজিল—গঙ্গা ডুবে মর গা—"

এসময় বৃদ্ধের মুখের কষের পাশেই মাড়ি, কিছুটা নাসা-গহ্বর এবং অদূরে সুন্দর পবিত্র মুখখানি দেখা গেল।

"বেশ আমি যাচ্ছি...তাই যাব..."

"মর মর...মরগে..."

স্খলিত জড়িত পদে যশোবতী কয়েক পদ বায়ুতাড়িত—গঙ্গাতীর ঢাল বশে—তাঁহার গতি দ্রুত হইল। হাহাকার করত গঙ্গার দিকে ছুটিয়া গেলেন।

সীতারামকে এই দৃশ্য প্রবুদ্ধ করে। শায়িত দেহ যেন ঊর্দ্ধে লম্ফপ্রদান করিল—চক্ষে উল্কার বেগ, তিনি উচ্চৈঃস্বরে থমকাইয়া বলিলেন, "বউ বউ চণ্ডাল চণ্ডাল" বলিয়াই মুখ হাঁ করিয়া আপনার সহধর্ম্মিণী যশোবতীর নীতিজ্ঞানহীন সংকল্প দেখিতে লাগিলেন।

এবম্প্রকার দৃশ্যে চণ্ডাল বৈজুনাথ স্থির, তর্জ্জনী তুলিয়া দিক্‌নির্ণয় করিতেছিল, না হিসাব করে তাহা প্রমাণসাপেক্ষ, এখন সে স্বর-বৈষম্য শুনিল, গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া এক দমে দুঃখিনী যশোবতীর নিকটে গিয়া পড়িল। যশোবতী তখন ডুবিতে গিয়া ক্রমাগতই ভাসিয়া উঠিতেছেন।

"কনে বউ...লাও চল...তুমি কি আর গঙ্গায় ডুবিতে পার গো? গঙ্গা যে তোমার মধ্যে ডুব্‌বেক...হে হে গো...লাও চিৎ সাঁতার দাও গো—কেঁদে কেঁদে দম নাই তোমার যে," বৈজুনাথ কহিল।

অসহায়ভাবে চণ্ডালের প্রতি চাহিয়া কহিলেন, "না আমি কি খেলা..."

"এ যে গঙ্গার জল-বাড়ান কথা গো, জমি-হাঁসিল কথা বটে তোমার মুখে...কনে বউ, ড্যাঙায় দাঁড়িয়ে বল, লাও চল..."

"না আমি মরব..."

"কোন দুঃখে! মরতে পারলে তুমি বাঁচতে..."

তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করত কহিতে লাগিল, "এখন খ্যান (ক্ষণ) আসে নাই...বললেই হল হে—চল চল—হরগৌরী দেখে আমাদের পাপ যাবেক গো..."

"না..."

"শেষ মেষ কি আমায় ধরতে হবে হে—বামুনের মেয়ে আমার পাপ বাড়িও না। লাও মাথা খাও—তোমার পায়ে পড়ি, চল..."

দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া ঝটিতে উল্টাইয়া সাঁতার কাটিতে লাগিলেন। তীরে উঠিয়া অবনতমস্তকে স্বামীর নিকটে আসিলেন।

যশোবতী সিক্তবসনে দণ্ডায়মানা, আপনকার অঙ্গুলিতে তাঁহার দৃষ্টি, নিম্নেই বৃদ্ধ স্বামী। বৃদ্ধ অন্যদিকে চাহিয়া অনুযোগ করিলেন, "তুমি না আমায় ছেড়ে যাবে না...ছোট ছেলে মাকে হয়ত মারলে...তাতে মা তাকে ছেড়ে যাবে...আমি বুড়ো..." বলিয়া সীতারাম দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন, ইহার পর কহিলেন, "তা ছাড়া এই শ্মশানে মড়ার গন্ধে আমি কি আর আমি আছি বউ..."

যশোবতী ইত্যাকার কথায় ব্যথিত হইলেন, তিনি ক্ষণেকের জন্য চারিদিকে অনুভব করিলেন, নিজের চিতা-চিহ্নের দিকে নজর পড়িল, তথাপি স্বামীর জন্য ব্যাকুলতা ছাড়া আর কোন ভাবান্তর আসিল না।

"তুমি রাগ করলে গো, সীতাকে কিন্তু তুমি ত জান..."

"জানি..."

"তবে? রাম তাকে দুষ্ট বললেন, তবু তিনি...আমার কথা...দেহের বিকার গো..."

যশোবতীর দেহলগ্ন বস্ত্র শুকাইতেছে, মনোবেদনা ক্ষয় হইতেছিল, পুনরায় সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চন বুদ্ধির প্রত্যাবর্ত্তন হইল; কেবলমাত্র নাসার বেসর চমকিত, নিঃশ্বাসে কম্পিত। তিনি যে দেহ বহিয়া বেড়াইতেছিলেন, সে দেহ শূন্য কলসের মত—তবুও তাহার গুরুভার ইদানীং জ্ঞান হইতেছিল—ক্লান্তিতে তাঁহার আঁখিপক্ষ্ম নামিয়া আসিতেছিল। মধ্যে মধ্যে ভিজা চুল এলো করিয়া দিয়াছিলেন।

"বউ কিছু খাও..."

"ভাল লাগছে না..."

"কেউ ত এল না—তাহলে তুমি চাট্টি ভাত খেতে...তা'রা কখন আসবে..."

"কি জানি..."

"তুমি রাগ করছো..."

"না গো..."

"আমায় ছুঁয়ে বল।"

"সত্যি..."

"তুমি আমার কে জান না...তুমি এই আকাশ ঢেকে দাঁড়াবে...তুমি শ্মশানকে..."

যশোবতী স-নাথ হইলেন। বৃদ্ধের পার্শ্বেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন।

বেলা যখন প্রায় লাল হইয়াছে, তখন যশোবতীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল। চক্ষু মেলিয়া সহসা কি জানি কেন গাছ পাতা নদী জলকে তাঁহার বড় পরিচিত বোধ হয়। ইহা সেই বৃদ্ধের দেখা পৃথিবী মনে হইল, তাহাদের তিনি যেন নিঃশ্বাস দান করিতেছেন। শ্মশানের বহু কিছুই তাঁহাকে বিকল করিল না, আবালবৃদ্ধবনিতা যেরূপ এ শ্মশানকে মহৎ বোধে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে, সেইরূপ শ্মশানকে, তাঁহার, মহৎ বোধ হইল না—এই তিনি শ্মশান দেখিলেন, আর এক প্রসূতিগৃহে যাহা কূট গতিস্পন্দনে অধীর, যাহা মৃচ্ছকটিকসদৃশ ওঙ্কার, যাহা জাতিস্মর স্তব্ধতা।

তবু মাত্র চঞ্চল পদধ্বনি শ্রুত হয়, অষ্টসাত্ত্বিক বিকার সম্ভব মহাপ্রসাদের গন্ধ নর-বসার গন্ধে, ভরপুর বহু মেঘমালার সখেদ ক্রন্দনধ্বনি, কভু, এ ক্ষেত্রে, সবুজতা আনিতে সক্ষম হইবে না। স্বাহাবিরহী লেলিহান শিখা দিঙ্মণ্ডলে পরিব্যাপ্ত, লক্ষ মায়া ছাই হইয়া গিয়াছে, লক্ষ ক্রোড় খার হইয়া যায়—শোণিতস্রাবী বজ্রযান অন্ধকার। এ শ্মশানে শিব শব হইয়া আছেন, মহাবিদ্যা—আলুলায়িত কেশরাশি যাঁর, তিনি আনন্দে শিহরিত। কারণ সলিল বাষ্প হইয়া যায়—শ্মশানকে মণ্ডলাকারে অমর হ্লাদিনী শক্তি পরিক্রমণ করিতেছে। ঘুম মৃত্যুর নির্জ্জন প্রতিবিম্ব—মৃত্যুর ভালবাসা, ঘুমই সে-ভালবাসা বিলায়, জীবনে ফুলকারী সোহাগ আনে। যশোবতী ঘুম চোখে দেখিলেন, যেখানে তিনি অমর।

সহজেই যশোবতীর মনে হইয়াছিল, এ দেহসকল দৃশ্য—আমি তাহার সাক্ষীস্বরূপ।

তিনি সন্ন্যাসিনীর ন্যায় সকল কিছুই আলো এবং অন্ধকার দেখিলেন। সদ্য নিদ্রোত্থিতা হওয়ায় তাঁহার ভ্রম হয়, ইদানীং অপরাহ্ণকে তাঁহার অকারণেই মনে হইল যে, পুনরপি ভোর হইল। যেমন বা তাঁহার জন্মান্তর আসন্ন, বহু প্রাচীনতম 'আমি' ক্রমে ক্ষীয়মাণ হইতেছে। যশোবতী বৃদ্ধের দিকে চাহিলেন।

"বউ ঘুম ভাঙল..."

যশোবতী অল্প হাসিলেন।

"বউ আমার উপর রাগ নেই ত?"

"না গো তুমি আমায় অন্যায় কিছু ত বলনি" বলিতে বলিতে এতক্ষণ পরে তাঁহার শ্মশান দর্শনের ভীতি হইল।

"আমায় দুঃখু দিও না" দীর্ঘশ্বাসকে সংযত করিতে করিতে বৃদ্ধ বলিলেন, "তুমি আমায় ছেড়ে যাবে না ত?"

সঙ্গে সঙ্গে যশোবতী তাঁহার মুখ চাপিয়া ধরিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার চম্পকসদৃশ হস্তকে ক্রমে ক্রমে ঠেলিয়া কয়েকটি কথা আসিল, "আমার কেউ নেই।"

"আমি আছি—কর্ত্তা তুমি ছাড়া আমি কই" বলিয়া পুনর্ব্বার যশোবতী সেই অব্যবহিত অহৈতুকী অবিচ্ছিন্ন মনে বৃত্তি লাভ করিলেন। ললাটে স্বেদবিন্দু দেখা দিল। দেহের রুক্ষতাকে চমকিত করিয়া যৌবন চঞ্চল হইল।

অনুক্ষণ ডাক ছাড়িয়া কে যেন বলিতেছিল, "আমি আছি—" মধ্যরাত্রে সে স্বর ধৈবতে দুঃখিত হইয়া, গান্ধারে কাঁদিয়া পুনরায় বিদ্যুৎ রেখাব দেখিয়া শুদ্ধ স্বরে ফিরিয়াছিল।

বৃদ্ধের চোখে জল আসিল। আপনাকে সম্বরণ করিয়া কহিলেন, "বউ চুল বাঁধবে না..."

"হ্যাঁ..."

বৃদ্ধ কি যেন বলিতে গিয়া থামিলেন।

"কি গো..."

"তুমি ভুলে গেছ..."

যশোবতী ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন।

"তুমি ভাবছ বুড়ো বরের আবার অতশত..."

"আহা বল না কেনে..."

"ফুলশয্যা..."

যশোবতী জিব কাটিয়া গণ্ডস্থলে অঙ্গুলিপ্রদান করত কহিলেন, "আই গো, দেখেছ...মরণদশা, আমার একেবারে খেয়াল নেই গো...ছিঃ..."

"চুলটা বেঁধে লাও',—বৃদ্ধের স্বর গদগদ হইল।

"না, সন্ধ্যে হয়ে এল, গাছে হাত দেওয়া যাবে না...কর্ত্তা আমি দুটো ফুল নিয়ে আসি।"

"কি ফুলই বা পাবে..."

"তোমার পূজার ফুল সব ঠাঁই জন্মায় গো, কেনে আকন্দ। তুমি ত শিব...। না পাই বেলপাতা।"

বৃদ্ধ আচম্বিতে তাঁহার হস্তধারণ করিয়া আঙ্গুলের কম্পন অনুভব করিয়াই স্থির, এই মুহূর্ত্তে আসন্ন সন্ধ্যায় দুজনে দুজনের প্রতি গভীরভাবে দেখিলেন। দুজনে দুজনকেই পান করিলেন। সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল। নববধূ আর দেরী করিলেন না।

যশোবতীর দেহ যেমত জ্বরে উষ্ণ; গায়ে জল বসিয়াছিল অথবা যোগনিদ্রাপ্রসূত দেহ ভারাক্রান্ত। তিনি ধীর পদক্ষেপে ভেড়ীপথে উঠিলেন, চারিদিক প্রেক্ষণ নিমিত্ত লক্ষ্য করিলেন, সম্মুখে চারিদিকে শ্মশান, শায়িত স্বামী, নিম্নে গঙ্গা। অন্যত্রে ধান্যক্ষেত্র, বহুদূরে গ্রাম, রাখাল গোরুসকল লইয়া ফিরিতেছে, এমত সময়ে তাঁহার শ্রবণে আসিল ক্রমাগত 'আয় আয়' ধ্বনি। সম্ভবত বুনো স্ত্রীলোকেরা তাহাদের পালিত পশুপক্ষীকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বলিতেছে। এই 'আয় আয়' ধ্বনি তাঁহার দেহের নিকটে আসিয়া পরিক্রমণ করিতে লাগিল। তিনি আপনকার দেহের উষ্ণতা অনুভব করিলেন। অধৈর্য্য হইয়া ভেড়ীর ঢাল বাহিয়া দ্রুতপদে নামিলেন, নামিবার কালে তিনি বৃক্ষাদি ধরিয়াছিলেন, যাহাতে অসাবধানতাবশতঃ পদস্খলন না হয়। এবং ঝটিতি একটি কচু পাতা লইয়া ফুল চয়নে ব্যাপৃত হইলেন। এখনও শুনা যায় 'আয় আয়' ধ্বনি।

ফুল লইয়া আসিয়া মালা গাঁথিলেন—চাঁদোয়ার খুঁটি মালার হারে সজ্জিত হইল। সীতারাম যশোবতীকে দেখিলেন, আর তিনি দেখিলেন পিছনে লাল চাঁদ। মিলনের অভিলাষে নববধূ পূর্ণাঙ্গ। ফুল অনটন হইল। ফলে, যশোবতীকে পুনরায় ফুল আনিতে যাইতেই হইল। এই সেই লতাবিতান পরিমণ্ডিত উৎকৃষ্ট কানন, এখানে নববধূ আরবার ফুলচয়নে ব্যাপৃতা।

'আয় আয়' ধ্বনি তাঁহার গাত্রে যেমত লাগিয়া যাইতেছে, তিনি বিরক্ত একারণে যে, বড়ই তাঁহার অসোয়াস্তি হইতেছিল, এবং ঠিক এই সময়ই কাহার গলার স্বর, ক্রমাগত কথার স্রোত শুনিয়াই সচকিত হইয়া প্রথমে নির্লিপ্ত, পরে আগ্রহের সহিত অনুধাবন করিতে সচেষ্ট হইলেন, তাঁহার কর্ণমূল রক্তিম হয়। দেখিলেন, চণ্ডাল বৈজুনাথ, মনে হয় শায়িত, গাছে গাছে অনেকটা অদৃশ্য, কিন্তু তাহার মুখমণ্ডল সম্পূর্ণ দেখা যায়, হস্তদ্বয় উত্তোলিত। ইহাতে মনে হয় কাহাকে যেন উর্দ্ধে ধারণ করত সে এ-সকল কথা

কহিতেছে। এখন বৈজুনাথ বলিল, "তুমি কি গো, তোমার মন কি গো; মোষের শিঙে সরষে দাঁড়ায় না, তার বেহদ্দ গো ধনি।"

যশোবতী ইত্যাকার বাক্যে অন্ধ হইয়া গেলেন, নথ কম্পিত হয়, তাঁহার রাশ আন্দোলিত।

বৈজুনাথ ছড়া কাটিল—

"হেই বড়াই, হে বড়াই মেরো না আমলার ছড়ি,
কাটান কাটায়ে দিব খাজনার কড়ি,
ঘরকে ঠায় নিমগাছটি নিম ঝুরঝুর করে,
সদাই বিড়ালী বিটি লিওলিয়াই করে,
ফল লিবি না কোদাল লিবি সত্যি করে বল,
নয়ত ভাশুর ভাতার ধর"

ইহার সহিত তাহার উচ্চ হাস্যধ্বনি শোনা গেল।

"কুথাকে ছিলে হে ধনি এতে কাল, মনের মানুষকে ভুলে, কত আকাশ গেল, বাতাস গেল, এতদিন পরে—তবু ভাল হে, তবু ভাল হে—বিনিসুতোর মালা গাঁথুনী মালিনী গো।"

এক একটি কথা এমন যেন বা উহা কর্দ্দমের ঢেলা, ক্রমাগত তাঁহার দিকে আসিতেছে, আর যে, তিনি, যশোবতী, কোনক্রমে আত্মরক্ষা করিতেছেন। কখনও বা গাছের সঙ্গে মিশিতেছেন; এখন হস্তচ্যুত ফুলগুলি কুড়াইতে বসিয়া মুখ ঘুরাইয়া যাহা দেখিলেন, তাহা বীভৎস এবং পলকের জন্য জ্ঞানশূন্য হইলেন।

এ সময় চণ্ডাল বৈজুনাথ ঝটিতি আপনার মুখের সম্মুখে একটি নরকপাল আনিল, যাহার সহিত এতাবৎ কথা কহিতেছিল।

চণ্ডাল নরকপাল লইয়া মহা আদর করিতেছিল, কাকুতি মিনতি করিতেছিল, বাক্যের দাসখত দিতেছিল। "তুমি ত আমার সব গো—এখন এত কথা বলছি? বেঁচেছিলাম কি করে? কেনে? ডিমের মত নড়ন নাই চড়ন নাই, ধুক ধুক নাই...পায় পড়ি গো...প্রত্যয় যাও—ওমা", অতঃপর সহসা সে মুখ ঘুরাইয়া কপট আশ্চর্য্য সহকারে কহিল, "ওমা, কনে বউ যে!"

এই ডাকই তাঁহার সম্ভ্রম নষ্ট করিল, তিনি আত্মরক্ষায় প্রয়াসী হইলেন।

"দে দে, ঘোমটা দে লো—লোকে বলছে কি? হায়া নাই সরম নাই, কোথাকার খড়মপেয়ে, খোয়াড়ে লিয়ে যাবে হে...কনে বউ..." বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল, "আমার বউ এসেছে গো এতদিন বাপের ঘরে হাঁড়ি ঠেলত, ধান ভানত...লে লে শালী আবার হায়া কি গো—ই ছি ছি তোমায় দেখি সরমাইছে, হারে কপাল বৃষভানুনন্দিনীর আবার সরম—মেয়েমানুষ শালী পুরুষের হাড় লিয়ে খেল মাঠে বসি যখন, ডুগডুগি বাজাতে যখন, এত হায়া কোথায় থাকে...হে হে...বিবাহ এক রক্তের লেশা—" বলিয়া নরকপালে ঠোনা মারিল, নাচাইল।

যদিচ নির্ম্মাল্যবৎ যশোবতীর অনেক অভিজ্ঞতা হইয়াছিল, চৈত্র প্রান্তরের ঘূর্ণি হাওয়ার ন্যায় সোজা হইয়াছিলেন, এরূপ কাণ্ড তিনি আশা করেন নাই, সংক্রান্তির সাগরসঙ্গমের হিম হাওয়া তাঁহার গায়ে বিষক্রিয়া করিতেছিল। চণ্ডালের হস্তে নিঃসঙ্গ চন্দ্রালোকে মধ্যরাত্র খেলিতেছিল।

"সুন্দরী তুমি" নিশির ডাকের মত আওয়াজ আসিল "চন্দন চাঁদ তোমার কাছে পোড়া কাঠ...গো...তুমি সত্যই সুন্দর, তুমি ত্রিলোকেশ্বরের ঘরণীর থেকে সুন্দর...তুমি..." । বৈজুনাথ এখন প্রায় যশোবতীর নিকটে আসিয়া পড়িয়াছিল। তাহার আর পিছু হটিবার পথ নাই, আকন্দ বৃক্ষ তাহা রোধ করিয়াছে, আর অল্প দূরে ঢাল-নিম্নে খালের মত, যাহা জলাশয়।

যশোবতী উন্মাদ কণ্ঠস্বরে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন, "চণ্ডাল"—

"ওলো! ওলো! সরে আয়, ওলো, তোকে দেখে কনে বউ ভয় পাচ্ছে লো" বলিয়া এক হাতে নরকপালকে লইয়া প্রায় স্কন্ধের কাছে স্থাপন করিয়া কিঞ্চিৎ ঘুরিয়া দাঁড়াইল।

"তুমি কে?" 'কি' বলিতে গিয়া যশোবতী 'কে' প্রয়োগ করিলেন। তাঁহার কণ্ঠে ক্রন্দন ছিল।

"বড় আধ্যাত্মিক প্রশ্ন গো কনে বউ...শেষ নিঃশ্বাস নিয়ে যে জীব বেঁচে থাকে, আমি সেই জীব বটে গো..."

"পথ ছাড়..."

"কনে বউ, একে দেখে...কঙ্কাল দেখে ভয় পাচ্ছ কেনে? এ তো তোমার ভিতর আছে, তোমাকে খাড়া রেখেছে। একটু চেয়ে দেখ—কত সুন্দর, কত মায়া, আকাশ বাতাস গঙ্গার থেকে এ বড় সুন্দর বটে...তুই খুব সুন্দর না রে," বলিয়া তাহার চিবুক ধরিল।

যশোবতী বুঝিলেন, বৈজুনাথ মাতাল। তাহার গাত্র হইতে নর-বসার গন্ধ, তাহার মুখে প্রকৃতির গন্ধ।

"চণ্ডাল ওটা ফেলে দাও..."

"সে কি গো আমার ঘরণী যে/বটে, আমি গেরস্থ...ঘরণীকে ফেললে মহাপাতক হব যে..."

"চণ্ডাল!" এ স্বরে যশোবতীর ইহকালের প্রতি বাসনা ছিল।

"অমন কথা তুমি ব'ল না, তুমি কে? না সতী। তোমার নামে কুট সারবে...লে লে সতী মাকে গড় কর, সেবা দে বউ" বলিয়া তাঁহার পায়ের নিকটে নরকপাল রাখিতে গেল।

যশোবতীর ভয়ে যেন গায়ে কাঁটা দিল, "পিশাচ চাঁড়াল!"

বৈজুনাথ উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাসিল, "ওগো সতী হুজুর, আমি মড়া পোড়াই, চাঁড়াল বটে, তবু পুরুষ মানুষের জান বটে, পুরুষের হৃদয়, এখানটা পুড়তে সময় লেয়, তোমার এখানটা পুড়তে সময় লেয়" বলিয়া আপনার উদর দেখাইয়া কহিল, "তুমি এখানের কথা কি জান, মনের জন্য পিশাচ আমি হই—এই আমার ঘরণী, তুমি যদি...বুড়ো যদি তোমার ইহকাল পরকাল হয়, এই বা কি দোষ করলে গো কনে বউ। লে লে বউ গড় কর, সবই মায়া বটে।"

"না না..." যশোবতীর কণ্ঠস্বরে যেন আকাশ বিদীর্ণ হইল।

"একটুক্ সিন্দূর দাও গো—তোমার নামে এর গায়ে মাংস লাগবে...এই আবার ভাতে কাঠি দিবে, বিয়োবে, মাই দিবে গো। টুকুন সিন্দূর, সতীর সিন্দূর মেঙ্গে লে বউ..."

"চণ্ডাল...আমাকে কেন ভয় দেখাচ্ছ?"

"ভয় দেখাব কেনে, বউ দেখাই, সিন্দূর মাঙ্গি, এ শ্মশানে আর আমি পাব কোথাকে? এ শ্মশানে এক সিদ্ধ ছিল, মেয়েদের চুলের পৈতা ছিল, এক কঙ্কালকে 'ওগো ভৈরবী গিন্নী' বলে ডাকত যে হে..."

যশোবতীর চর্ম্ম লোল, জিহ্বা শুষ্ক হইয়াছিল, নরমুণ্ডের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তিনি অনাদি অনন্তকালের দৃশ্য দেখিয়াছিলেন।

চণ্ডাল কহিল, "অনেক ভেবে চিন্তে আমি একে ঘরে তুললাম...আমি...তোমাকে কনে বউ, আগে বাঁচাতে চেয়েছিলাম...তুমি গালমন্দ করলে, তখন ভাবলাম এ আমি কি ভুল করছি। তোমাকে না বাঁচাবার সুকৃতি ফলে তুমি যে যে ঘরে জন্মাবে আমিও কাছে জন্মাব—এটা কি বেশী চাওয়া?"

যশোবতীর মনে, নিশ্চয় একথা সত্য যে, যিনি মায়া বহির্ভূতা তাঁহার মনে, তপোবন-বিরোধী বিকার উপস্থিত হইল।

বৈজুনাথ নরকপালে সস্নেহে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "না, সতীকে পেলে হনুমানের মত আয়ন ঘোষ হয়ে থাকতে হবে, বুড়ো তখন কেলে ছোঁড়া হয়ে" বলিয়া নরকপাল বংশীর ন্যায় ধরিয়া কহিল, "বাঁশী বাজাবে, তুমি জল আনতে ছুটবে—তার থেকে এই ভাল..."

যশোবতী এ ইঙ্গিত বুঝিতে পারেন নাই, একারণ যে তাঁহার ভীতি তখনও ছিল।

যশোবতী ইতিমধ্যে ক্ষিপ্রবেগে নরকপাল তাহার হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া উর্দ্ধে ধারণ করিলেন, চণ্ডাল তাঁহাকে ধরিতে গেল, হাত দিয়া কঙ্কাল লইতে গেল। কোন মতে যশোবতী আকন্দ গাছ অতিক্রম করত পলায়ন করিতে গিয়া সহসা পড়িয়া গেলেন; এক হাতে নরকপাল জলাশয়ের কহ্লারের মধ্যে প্রতীয়মান!

চণ্ডাল পশুর মত হাতে ভর দিয়া, হামাগুড়ি দিয়া স্থির।

উন্মাদহাস্যে কহিলেন "না"...তাঁহার একটি হাত নরকপালের কাছে যেখানে কহ্লার, যেখানে জলজ লজ্জাবতী, তাহার উপর অদ্ভুতভাবে আন্দোলিত হইল, লজ্জাবতী লতা ব্রীড়াবনত হয়।

চণ্ডাল তাঁহার একটি হাত ধরিয়াছে, সহসা কিসের শব্দ হইল।

বায়ু স্থির, পাখীরা উড়িয়া গেল, ধরিত্রীর বক্ষে কে যেন হাঁটু ডলিতেছে। ত্রিলোক এক হইয়াছে।

ওজস্বিনী বিশাল তরল সমতল শ্মশান দাম্ভিকভাবে আসিতেছে, মহাব্যোমে স্ফুলিঙ্গ উদ্ধত।

চণ্ডালের ঘরণী কহ্লারের মধ্যে ডুবিয়াছিল, ইন্দ্রিয়াসক্ত, সমগুণপ্রধাণা যশোবতী বেপথুমানা; মহা আবেগে মুষ্টিতে দূর্ব্বাদল আকর্ষণ করিয়াছিলেন। নিঃশ্বাসে অজাগর ঠিকরাইতেছে। নীহারধূমার্কানিলনলান খদ্যোৎ বিদ্যুৎ স্ফটিক শশীসম্ভব আলো আপনার কপালে খেলিতে লাগিল।

"কনে বউ...কোটাল।"

কপাল কুঞ্চিত করিলেন, সুখশয্যা ত্যাগ করিবার তাঁহার ক্ষমতা নাই। "কোটাল কোটাল" বলিয়া যেমন সে উঠিতে যাইবে, কনে বউ তাহার হাত বজ্রজোরে ধরিলেন। তিনি দেহাভিমানিনী, কেননা সম্ভবত অষ্টপাশ ছিন্ন হয়।

"কোটাল বান হে আসছে হে বুড়ো..."

"কনে বউ এসো...বুড়ো...তোমার বর।"

"মরুক..."

একটি নিঃশ্বাসের পরেই তিনি, যশোবতী, পরিশ্রান্ত ঘর্ম্মাক্ত অশ্বের মত ছুটিয়া আসিলেন। ভেড়ী পথে উঠিলেন। এক দিকে বিগলিত লৌহের মত, জল-পর্ব্বত আসিতেছে, নিম্নে ফুলশয্যা, আর অপেক্ষমাণ বৃদ্ধ স্বামী। ফুলহার সকল দোলায়মান, যাহা দূর হইতে—বিছানা, ফুলহার, যেমন বা গোলাপশীতল পোম্পাইয়ের আতিশয্য।

সহসা বৃদ্ধের সঙ্গে কে যেন বিশ্বাসঘাতকতা করিতে আসিতেছে। বাণবিদ্ধ পাখীর মত কর্কশ করুণ স্বরে ডাকিলেন—"বউ..."

বিস্ফারিতনেত্রা যশোবতী দুর্দ্দশা দেখিলেন, তাঁহার পদদ্বয় ঘর্ম্মাক্ত হইল, তাঁহার কর্ত্তব্যবুদ্ধি ফিরিয়া আসিল। তিনি ছুটিতে গিয়া দেখিলেন তাঁহার হাত এখনও চণ্ডাল ধরিয়া আছে। তিনি শিশুর মত আপনকার পা মৃত্তিকায় ঠুকিতে লাগিলেন, গগন শঙ্কিত হইল। আর যে, হঠাৎ তিনি চণ্ডালের হস্তে কামড় দিতেই বৈজুনাথ হাত ছাড়াইয়া লইল। এত জোরে তিনি কামড়াইয়াছিলেন যে বৈজুনাথের হাতের চুল ছিঁড়িয়া মুখে আসিয়াছিল। থু-থু করিতে করিতে তিনি তড়িৎবেগে ভেড়ীপথেই ছুটিতে লাগিলেন, কখন আপনার হস্ত দংশন করিলেন, কখনও আবার দেখা গেল আপনার গণ্ডে চপেটাঘাত করিতে করিতে ছুটিতেছেন।

গুপ্তঘাতকের হস্তে বৃদ্ধ সীতারাম আহত। জল আলোড়নে, বৃদ্ধদেহ চক্র দিয়া উঠিল, মৃত্তিকা তৈজস ছত্রাকার হইল। এতদ্দর্শনে যশোবতী জলে নামিয়া পড়িলেন। একটি বৃষকাষ্ঠ ধরিলেন, ক্রমাগত "কর্ত্তা কর্ত্তা" চীৎকারে হাত ছাড়িয়া গেল! বান...সহসা তাঁহাকে লইয়া গেল। কোনক্রমে একটি প্রতিমার কাঠামো ধরিলেন। পরমুহূর্ত্তে বানের তোড়ে প্রতিমার কাঠামো তাঁহাকে লইয়া খাড়া হইয়া দাঁড়াইল।

একবার বৃদ্ধকে দেখিলেন।

অল্পবয়সী ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী পতিপ্রাণা "কর্ত্তা-কর্ত্তা" বলিয়া প্রতিমার কাঠামো ছাড়িয়া জলে লাফ দিলেন। ক্রন্দন করিতে করিতে সন্তরণের বৃথা চেষ্টা করিলেন, দু'একবার "কর্ত্তা" ডাক শোনা গেল। ইহার পর শুধুমাত্র রক্তিম জলোচ্ছ্বাস! কেননা চাঁদ এখন লাল।

একটি মাত্র চোখ, হেমলকে প্রতিবিম্বিত চক্ষুসদৃশ, তাঁহার দিকেই, মিলন অভিলাষিণী নববধূর দিকে চাহিয়াছিল, যে চক্ষু কাঠের, কারণ নৌকাগাত্রে অঙ্কিত, তাহা সিন্দূর অঙ্কিত এবং ক্রমাগত জলোচ্ছ্বাসে তাহা সিক্ত, অশ্রুপাতক্ষম, ফলে কোথাও এখনও মায়া রহিয়া গেল।



গোলাপ সুন্দরী

গোলাপ সুন্দরীর পটভূমিকা

কমলকুমার মজুমদারের 'গোলাপ সুন্দরী'র পটভূমিকা সম্পর্কে বলতে গেলে কিছু কিছু ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ এসে পড়বেই। তাতে একালের পাঠকদের পক্ষে কমলকুমারের রচনা সঠিকভাবে উপলব্ধি করার কিছুটা সুবিধে হতে পারে।

১৯৫৩ সালে কমলকুমারের সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় হয়। তখন তিনি পরিণত যুবা পুরুষ। বলিষ্ঠ দেহ, মসৃণ কালো রং, চোখ দুটি অতি উজ্জ্বল এবং ওষ্ঠে সব সময় কৌতুক হাস্য। আমরা তখন কলেজীয় ছোকরা, পৃথিবী তো দূরের কথা, এই কলকাতা শহরটাকেই তখনো ভালো করে চিনি না।

তাঁকে আমরা প্রথমে দেখি একজন নাট্য পরিচালক হিসেবে। সেই সময় 'হরবোলা' নামে একটি থিয়েটার ক্লাব খোলা হয়েছিল, যার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন সিগনেট প্রেসের দিলীপকুমার গুপ্ত এবং পরামর্শদাতাদের মধ্যে ছিলেন সত্যজিৎ রায়, সৈয়দ মুজতবা আলী, আবু সয়ীদ আইয়ুব, নীহাররঞ্জন রায় প্রমুখ। পরে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র এসেছিলেন আমাদের সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে এবং প্রথম থেকেই ফৈয়াজ খাঁর সাক্ষাৎ শিষ্য হিসেবে সন্তোষ রায় নিযুক্ত ছিলেন গান শেখাবার জন্য। আমরা 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' পালার মহড়া শুরু করার কয়েকদিনের মধ্যেই কমলকুমার মজুমদার এসে যোগ দিলেন আমাদের মোশান মাস্টার হিসেবে।

পরিচয়ের আগে আমরা তাঁর নামও শুনিনি। তিনিও যে লেখক এটা জানতে আমাদের ঢের দিন লেগেছিল। তার আগে আমরা জেনেছিলুম যে আমাদের এই নাট্য পরিচালক খুব ভালো ছবি আঁকেন, প্রায় সময়েই মার্গ সঙ্গীত গুনগুন করেন, ফরাসী ভাষা অতি উত্তম জানেন এবং কথা বলেন উনিশ শতকের বাঙালীদের বৈঠকী কায়দায়।

আমরা নাটকের দল খুলেছিলুম বটে, কিন্তু নাট্য জগতের চন্দ্র-সূর্য হবার কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমাদের ছিল না। সাহিত্যের প্রতিই ছিল আমাদের সর্বাঙ্গীণ টান। নাটক মঞ্চস্থ করার চেয়ে মাসের পর মাস ধরে শুধু মহড়া দিয়ে যাওয়াতেই ছিল আমাদের বেশী আগ্রহ এবং সেই সঙ্গে আড্ডা। দিলীপকুমার গুপ্ত যেমন ছিলেন এই নাটকের দলের মধ্যমণি, আবার তাঁরই উৎসাহে ও ঔদার্যে আমরা প্রকাশ করতে শুরু করি তরুণতম কবিদের কবিতার পত্রিকা 'কৃত্তিবাস'। তিনি ছিলেন বিদগ্ধ ব্যক্তি, বাংলা ও ইংরেজি সাহিত্যে গভীর জ্ঞান ছিল, বিশেষত বাংলা কবিতার প্রতি ছিল তাঁর তীব্র ভালোবাসা। 'হরবোলা'র আসরে তিনি সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের বিষয়ে নানান অশ্রুতপূর্ব কাহিনী শোনাতেন আমাদের। এবং আমাদের সৌভাগ্য এই যে, আমাদের সঙ্গীত পরিচালক জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র একজন বিশিষ্ট কবি, তিনিও যোগ দিলে আমাদের সেই আড্ডায় আমরা উচ্চাঙ্গের সাহিত্যরস পেতাম এবং পরের সপ্তাহের জন্য তৃষিত হয়ে রইতাম। কিছুদিন পরেই আমরা আবিষ্কার করলাম যে আমাদের নাট্য পরিচালকেরও প্রধান আসক্তি সাহিত্যে, অগাধ তাঁর পড়াশুনো এবং দেশী-বিদেশী সাহিত্যের বিশ্লেষণ করার ক্ষমতাও তাঁর অসাধারণ। অবশ্য তখনও টের পাইনি যে তিনি নিজেও একজন লেখক।

আমরা অল্পদিনেই তাঁর অনুরক্ত হয়ে পড়লুম এবং হরবোলার আড্ডার শেষে আমরা একই সঙ্গে বাসে চেপে বাড়ি ফিরতুম বলে (হরবোলার দপ্তর ছিল এলগিন রোডে সিগনেট প্রেসের বাড়িতে, আর আমরা প্রায় সকলেই থাকতুম শ্যামবাজারের কাছাকাছি, কমলকুমার আরও উত্তরে) আরও অনেকক্ষণ তাঁর সঙ্গ পেতুম, এর পরেও পাঁচ মাথার মোড়ে দাঁড়িয়ে গল্পে গল্পে মধ্য রাত্রি পার করা। শব্দ ব্যবহারের অসীম ক্ষমতায়, শুধু কথা দিয়ে তিনি আমাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতে পারতেন।

হরবোলা নামের প্রতিষ্ঠানটি বেঁচে ছিল কিঞ্চিৎ-অধিক চার বছর। এর পরেও আমরা কমলকুমার মজুমদারের প্রতিদিনের সঙ্গী হয়ে যাই।

কমলকুমারের রচনা প্রসঙ্গে এই হরবোলা-পর্বটি তুলে ধরার বিশেষ কারণ আছে। এর আগে তিনি সাহিত্যপত্র ও চতুরঙ্গে কয়েকটি ছোট গল্প লিখেছিলেন মাত্র এবং মাঝখানে বেশ কিছুদিন সাহিত্যরচনা থেকে সম্পূর্ণ বিরত ছিলেন। হরবোলা-আসরের ধারাবাহিক সাহিত্য প্রসঙ্গ নিশ্চয়ই তাঁকে নতুন ভাবে উদ্বুদ্ধ করে। এই সময়েই তিনি হাত দেন তাঁর প্রথম উপন্যাস রচনায়। অকস্মাৎ একদিন তিনি আমাদের একটি অখ্যাত পত্রিকা উপহার দিলেন, তাতে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর সম্পূর্ণ উপন্যাস 'অন্তর্জলী যাত্রা'।

পুস্তকাকারে প্রকাশের পর 'অন্তর্জলী যাত্রা' পাঠক মহলে কোনো সাড়া জাগায়নি। তাঁর খ্যাতি কিছু নবীন লেখকদের, বিশেষত কবিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আমরা এই উপন্যাস পড়ে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়েছিলুম বলা যায়। এরকম কোনো রচনা আমরা বাংলা ভাষায় আগে পড়িনি। প্রথমে বেশ শক্ত লেগেছিল, এক একটি বাক্য, খুবই দীর্ঘ, বারবার পড়েও সঠিক অর্থ বোঝা যায় না, কিন্তু শব্দ ব্যবহারের অপূর্ব ব্যঞ্জনায় এটা ঠিকই বুঝতুম যে অসাধারণ কিছু আস্বাদন করছি। ফৈয়াজ খানের তালগুলির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ছন্দ এবং কারিকুরি আমরা যেমন সব বুঝতে পারি না কিন্তু অনুভব করতে পারি যে একজন মহৎ শিল্পীকে শ্রবণ করছি। অন্তর্জলী যাত্রা সাধু ক্রিয়াপদে লেখা এর বাক্য গঠনরীতির সঙ্গে পরিচিত বাংলার কোনো মিলই নেই। আমরা তখন কারংকা ও জয়েসে দীক্ষিত হয়েছি, তবু বুঝেছিলুম, কমলকুমারের রচনার জাত ওঁদের থেকেও আলাদা।

এবার 'গোলাপ সুন্দরী' প্রসঙ্গে আসি। এই রচনাটির সঙ্গে গোড়া থেকেই আমরা কয়েকজন জড়িত। আমাদের 'কৃত্তিবাস' ছিল তখন শুধুই কবিতার পত্রিকা, অন্য কিছু তাতে ছাপা হতো না। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই গদ্য লেখক বন্ধুরাও এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হন। তখন আমরা ঠিক করেছিলুম যে কবিতার কৃত্তিবাসে গদ্যের অনুপ্রবেশ ঠিক হবে না বটে, কিন্তু ঐ কৃত্তিবাস নামেই আর একটি গল্পের পত্রিকা প্রকাশিত হবে। অর্থাৎ গল্প ও কবিতার জন্য একই নামে দুটি আলাদা পত্রিকা। এই গল্প-কৃত্তিবাসের প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয় কমলকুমারের গল্প ফৌজ-ই-বন্দুক। দ্বিতীয় সংখ্যার জন্য তিনি রচনা করতে শুরু করেন 'গোলাপ সুন্দরী'।

প্রত্যেকদিন আমরা গোলাপ সুন্দরীর একটু একটু অগ্রগতির কথা শুনতুম। যেমন, টি বি স্যানাটোরিয়ামের রোগীদের জন্য একজন বিনামূল্যে এপিটাফ লিখে উপহার দিতে চায়; একটি নারী যে একবার জল রং-এর চিত্র আবার কখনো ভাস্কর্য; একজন কারুর ছেলেবেলা তার বাগানের গোলাপে ফুটে উঠবে; একজন কারুর খরচ করার মতন নিঃশ্বাস কম আছে বলে সে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে না,...ইত্যাদি। ছোট গল্প হিসেবে শুরু হয়ে লেখাটি ক্রমশ বড় হতে থাকে। গোলাপ সুন্দরী সমাপ্ত হবার পর এক সন্ধ্যায় ওয়েলিংটনের মোড়ে একটি সাঙ্গুভেলি রেস্তোরাঁয় আমাদের কয়েকজনকে কমলকুমার সেটি পুরো পাঠ করে শোনান। মনে আছে, প্রচণ্ড নেশার ঘোরে বাড়ি ফিরেছিলাম সেই রাত্রে। সেই বয়েসে, এ রকম একজন লেখককে সামনাসামনি দেখছি, এজন্য আমি নিজেকে ধন্য জ্ঞান করেছিলুম।

প্রবল অর্থাভাবে আমরা গল্প-কৃত্তিবাসের দ্বিতীয় সংখ্যা আর প্রকাশ করতে পারিনি। সেই সময় আমাদেরই বন্ধু নির্মাল্য আচার্য ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'এক্ষণ' নামে একটি নতুন পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ হচ্ছিল, লেখকের সম্মতিক্রমে 'গোলাপ সুন্দরী' দেওয়া হয় সেই পত্রিকায়। পরে তিনি 'এক্ষণ' পত্রিকার নিয়মিত লেখক হয়ে যান এবং তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পগুলির মধ্যে 'দেশ' পত্রিকার দুটি বাদে বাকি সব ঐ পত্রিকাতেই বেরিয়েছে। এই সূত্রে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ হয় ইন্দ্রনাথ মজুমদারের, যিনি কমলকুমারের বাকি জীবন ভাই-বন্ধু-পুত্রের মতন সঙ্গে থেকেছেন এবং কমলকুমার মজুমদারের গল্প সংগ্রহ প্রকাশ করে তাঁকে বৃহত্তর পাঠক সমাজের কাছে পৌঁছে দেন।

গোলাপ সুন্দরী কমলকুমারের শ্রেষ্ঠ রচনা কি না জানি না, তবে তাঁর সম্পূর্ণাঙ্গ সার্থক দু' তিনটি রচনার অন্যতম নিশ্চয়ই। 'গোলাপ সুন্দরী' অনেককাল দুর্লভ হয়ে ছিল, পুস্তকাকারে প্রকাশিত হবার ফলে বাংলা সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি হলো।

যাঁরা কমলকুমারের রচনায় দীক্ষিত, তাঁদের কাছে গোলাপ সুন্দরীর ভাষারীতি বেশ সহজ ও সাবলীল মনে হবে, কেন না, শেষের দিকে ক্রমশ তাঁর রচনা আরও জটিল ও দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছিল। একেবারে শেষ জীবনের দু' একটি লেখা বারবার পড়ে আমিও যেন সঠিক মর্ম-উদ্ধার করতে পারছি না মনে হয়েছে। সেই তুলনায় গোলাপ সুন্দরী সরল নিশ্চয়ই। তবু, সদ্য নতুন পাঠকদের কাছে এই

গোলাপ সুন্দরীর ভাষাও প্রাথমিক বাধার সৃষ্টি করতে পারে বোধহয়। সেই জন্য কয়েকটি কথা বলা দরকার।

কমলকুমারের ভাষা একেবারেই অন্য রকম। কেন এরকম ভাষায় তিনি লেখেন, সে প্রশ্ন অনেকবার করেছি। এক এক সময় এক এক রকম উত্তর দিয়েছেন তিনি। যেমন, বাংলা গদ্যের বাক্য বিন্যাস তৈরি হয়েছে ইংরেজির অনুকরণে। কমলকুমারের মতে, যদি বিদেশী রীতি নিতেই হয়, তবে ফরাসী বাক্-ভঙ্গী অনেক বেশী কাম্য। তিনি ইংরেজি-প্রভাব অস্বীকার করে ফরাসী-রীতিতে বাংলা গদ্য লেখেন। আবার কখনো কখনো বলেছেন, হাটে-বাজারে, বাড়ির লোকজনদের সঙ্গে যে-ভাষায় আমরা কথা বলি, সে ভাষায় সাহিত্য রচনা উচিত নয়। সাহিত্য হচ্ছে সরস্বতীর সঙ্গে কথা বলা, তার জন্য সম্পূর্ণ নতুন ভাষা তৈরি করে নিতে হয়।

তবে, এগুলোও বোধহয় সঠিক যুক্তি নয়। আধুনিক বাংলা গদ্য অনেকখানিই রবীন্দ্র-অনুসারী গদ্যে এই রবীন্দ্র-প্রভাব তাঁর তেমন মনঃপূত ছিল না, তিনি পছন্দ করতেন বঙ্কিমের গদ্যের দৃঢ়তা এবং মনে করতেন, বাংলা গদ্য বঙ্কিম-দৃষ্টান্তেই চলা উচিত ছিল। তবুও, সাধু ক্রিয়াপদ আঁকড়ে ধরে থাকলেও, কমলকুমারের গদ্য ঠিক বঙ্কিমী গদ্য নয়, এ তাঁর নিজস্ব তৈরি করা ভাষা। নিজের লেখার জন্য একজন লেখক আলাদা ভাষা তৈরি করে লিখেছেন, এমন দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে বেশী নেই।

তাঁর বিষয়বস্তুও অভিনব। তিনি বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদের লেখক হলেও তাঁর গল্প-উপন্যাসে সমসাময়িক জীবন প্রসঙ্গ কদাচিৎ এসেছে। তিনি গত শতাব্দীর বাঙালী-গৌরবে মুগ্ধ ছিলেন বলে তাঁর অনেক রচনারই পটভূমি গত শতাব্দী। অথবা, এই শতাব্দীর গোড়ার দিক। তাঁর শৈশব-কৈশোরের পর্যবেক্ষণ ও স্মৃতি নিয়ে লিখতেই তিনি ভালোবাসতেন। গোলাপ সুন্দরীর পটভূমিও স্বাধীনতার আগের আমলের।

তাঁর গল্প-উপন্যাসের প্রথম পৃষ্ঠাটিই বেশী জটিল। যেন তিনি পাঠকদের পরীক্ষা করতে চান। শাল-সেগুনের জঙ্গল দেখেই যারা ফিরে যেতে চায় তাদের তিনি চন্দনের বনে পৌঁছোবার পথের সন্ধান দিতে চান না। সেইজন্য পাঠকদের বিশেষ মনোযোগ প্রয়োজন। যেমন, গোলাপ সুন্দরীর প্রথম বাক্যটি: "বিলাস অন্যত্রে, কেননা সম্মুখেই, নিথর আকাশে, তরুণসূর্য্যবর্ণ কখনও অচিরাৎ নীল, বুদ্বুদসকল, যদৃচ্ছাবশতঃ ভাসিয়া বেড়াইতেছে।" প্রথমেই তিনি একটা রঙের প্রেক্ষাপট সৃষ্টি করলেন, এবং এর একজন দ্রষ্টা আছে, তার নাম বিলাস, সে একজন যুবক, তার মন এখন অন্যত্র। কমলকুমারের একটা বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি মানুষের অনুভূতি, তার পরিবেশ, তার রচিত দৃশ্যের বর্ণনা দেন পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে, সেই তুলনায় চরিত্রগুলিকে আঁকেন কয়েকটি মাত্র আঁচড়ে। বিলাসের জামাইবাবু মোহিতের চেহারাটি কেমন তিনি বললেন না, কিন্তু তার গাড়িটির বর্ণনা চমৎকার। মোহিতকে অবশ্য তার বাক্-ভঙ্গীর জন্য আমাদের চিনতে একটুও অসুবিধে হয় না, কারণ সে নিজের কাছে নিজেই অত্যন্ত ফেমাস ম্যান।

গল্পের শুরু একটি স্যানাটোরিয়ামে। যক্ষ্মা যেমন এক সময় ছিল রাজরোগ, তেমনি এক সময় সাহিত্যে বিষয়বস্তু হিসেবেও এই রোগটি রাজ-স্থান পেয়েছিল। দেশ-বিদেশের অনেকগুলি বিখ্যাত উপন্যাস লেখা হয়েছে এই রোগীদের নিয়ে। স্যানাটোরিয়ামের বর্ণনা টমাস মান-এর উপন্যাসে আছে অসাধারণ, কমলকুমার সেই স্যানাটোরিয়ামকে আনলেন সম্পূর্ণ নতুন রূপে। হাসপাতাল মানেই রক্তহীনতা, আর তিনি প্রথমেই সেই হাসপাতালকে ভরিয়ে দিলেন রক্তে। বিলাস হাসপাতাল থেকে ছুটি পেয়েছে, তার দিদি-জামাইবাবু তাকে নিতে এসেছে, সেই সময় বাইরে মোহিতের গাড়ির ফুটবোর্ডে (এখনকার গাড়িতে এ জিনিস থাকে না) বসে একটি গ্রাম্য বালক সাবানজলের ফেনার বুদ্বুদ ওড়াচ্ছে অসংখ্য। সেই সব 'সুডৌল, দ্যুতিসম্পন্ন, সুন্দর, উজ্জ্বল, বাবু, অভিমানী, আশ্চর্য' বুদ্বুদগুলি ভরিয়ে দিয়েছে হাসপাতাল। সেই ভ্রাম্যমাণ বুদ্বুদ, গতিশীল বর্ণচ্ছটা, যা কয়েক মুহূর্তেই অদৃশ্য হয়ে যায়, তা দেখে বিলাস মুগ্ধ, কারণ সে ছুটি পেয়েছে। কিন্তু অন্য অনেক রোগী চঞ্চল ও ব্যথিত হয়। চেট্টি নামে একজনের মনে হয় সেই বুদ্বুদ 'ভ্রাম্যমাণ নিদ্রা, চলন্ত এপিটাফ'। এবং সে তার প্রিয় এপিটাফটি উচ্চারণ করে। এখানে লেখক বাংলা অক্ষরে আট লাইনের একটি ফরাসী এপিটাফ লিখে দিলেন, অর্থ বলে দেবারও চেষ্টা করলেন না, পাঠককে তিনি এমনই শিক্ষিত মনে করেন। গোলাপ

সুন্দরী প্রথম পাঠের সময় আমরা অবশ্য সেরকম শিক্ষিত ছিলুম না, তাই অনুসন্ধান করে জেনেছি, সপ্তদশ শতাব্দীর ফরাসী কবি স্কারোঁ-র রচনা ঐটি, তাঁর নিজের এপিটাফ, কেউ যেন শব্দ না করে, কারণ এই প্রথম রাত্রে স্কারোঁ ঘুমোচ্ছে।

এই পর্যন্ত দু' তিনগুণ মনোযোগ দিয়ে অনুধাবন করলে, গোলাপ সুন্দরীর বাকি অংশের রস গ্রহণ করতে কোনো পাঠকের অসুবিধে হবার কথা নয়।

গোলাপ সুন্দরীর মূল কাহিনীটি অতিশয় রোমান্টিক। হাসপাতাল থেকে ছুটি পাবার পর বিলাস কোনো স্বাস্থ্যকর নিরালা জায়গায় একটি বাগান বাড়িতে একা থাকে। সে বাগানে গোলাপ ফোটায়, বিশেষত একটি গোলাপ, যার রং ঠিক কী রকম লাল হবে তা সে নিজেই জানে না; যে গোলাপের জন্য নির্দিষ্ট একটি নারী আছে, সেই নারী কখনো সেই গোলাপের কাছে এলে তাকে আর ভালোবাসার কথা মুখে উচ্চারণ করতে হবে না। এক সময় আসে সেই নারী, তার নাম মনিক চ্যাটার্জি। সত্যিই সে এক সময়ে জলরঙের চিত্র, পরে ভাস্কর্য হয়। কাহিনীর চেয়েও বড় এর কাব্য সৌন্দর্য, কয়েকটি মাত্র চরিত্র তবু জীবনের কত দিক উদ্ভাসিত করেছেন লেখক, মৃত্যুকে দিয়েছেন মহান সংজ্ঞা।

এই বই একাদিক্রমে বারবার পড়তে হবে। এমন বই বাংলা ভাষায় তেমন বেশী নেই, যা প্রত্যেকবার নতুন করে পড়লে প্রত্যেকবারই নতুন নতুন সূক্ষ্ম রসের সন্ধান পাওয়া যাবে।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

বিলাস অন্যত্রে, কেননা সম্মুখেই, নিম্নের আকাশে, তরুণসূর্য্যবর্ণ কখনও অচিরাৎ নীল, বুদ্বুদসকল, স্বেচ্ছাবশতঃ ভাসিয়া বেড়াইতেছে। একটি আর একটি এইরূপে অনেক অনেক—আসন্ন সন্ধ্যায়, ক্রমে নক্ষত্র পরম্পরা যেমন দেখা যায়—দূর কোন হরিত ক্ষেত্রের হেমন্তের অপরাহ্ণ মন্থনকারী রাখালের বাঁশরীর শুদ্ধনিখাদে দেহ ধারণ করত সুডৌল দ্যুতিসম্পন্ন বুদ্বুদগুলি ইদানীং উঠানামা করে, এগুলি সুন্দর, উজ্জ্বল, বাবু, অভিমানী আশ্চর্য্য! এ কারণেই বিলাস, চমৎকার যাহার রূপ, যে বেশ সুস্থ, এখন অন্যদিকে আপনার দৃষ্টি ফিরাইয়াছিল কেননা এ সকল বুদ্বুদ সম্মুখে থাকিয়াও পশ্চাদ্ধাবন করে কিন্তু এ-দৃষ্টিতে তাহার কোনরূপ অভিজ্ঞতা ছিল না, এ কথা সত্য যে, তাই মনেতে নিশ্চয় সে কুণ্ঠিত কেননা ইতঃপূর্ব্বে অজস্র দিনের আত্মসচেতনতার কুজ্ঝটিকার মধ্যে সে একা বসিয়া কবিতা লিখিবার মনস্থ করে—কবি হইবার নয়, যেহেতু, সম্ভবত, রূপকে রূপান্তরিত না করিয়া ভালবাসার শুদ্ধতার দিব্য উষ্ণতা ক্রমে অস্পষ্ট অহঙ্কার পর্য্যন্ত, তাহার ছিল না যদিও—তাহার নিঃসঙ্গতা নাই শুধুমাত্র স্বতন্ত্রতা ছিল।

ক্রমাগতই সকালের আলোকদীপ্ত বুদ্বুদসকল ইতস্তত ভ্রাম্যমাণ।

বালকটি, কালো সুঠাম ন্যাংটো, মোটর গাড়ীর ফুটবোর্ডে বসিয়া একটির পর একটি বুদ্বুদ নির্ম্মাণ করিয়া চলিয়াছে; ক্বচিৎ ঊর্দ্ধে অদ্ভুত ভাবে, যে ভাবে পলাতক কাঠবিড়ালীকে দেখে, অর্থাৎ মাটির দিকে চাহনি লইয়া, বালক আপনার আয়ত চক্ষুর্দ্বয় তুলিয়া কি যেন বা দর্শনে হাসিয়াছে সম্ভবত প্রথম রৌদ্র অথবা গতিমান দিগ্‌ভ্রান্ত বুদ্বুদনিচয়। তাহার, বালকের, পিছনেই দরজায় এবং মাড্‌গার্ডের অবিশ্বাস্য ধূলার স্তরে অসংখ্য রেখাচিত্র, না শিশুওষ্ঠের অজস্র এলেবেলে স্পন্দন। এগুলি প্রতীকমাত্র কারণ ইহার ছায়া আতপ নাই, এগুলি প্রতীকমাত্র কারণ ইহা গণিতের সংখ্যা আত্মিক নহে; ইহাতে দৃষ্টির অভিজ্ঞতার স্বকীয়তা নাই, শুধুমাত্র খুসীর ব্যক্তিগত অনুভব আছে। কখনও বা দুঃসহ ঝটিতি আরবীটান যখন মানসিক অধৈর্য্য, নিঃসন্দেহে, অনুভূত হয়। হায়! বালকের মধ্যেও ক্ষুব্ধ বিরক্তি আকাশ হইয়া আছে। এই গাড়ীতেই বিলাস যাইবে।

গাড়ীখানি দাঁড়াইয়াছিল, মরুপথিপ্রজ্ঞ উট যে উট বৃদ্ধ যে উট ক্লান্ত, যাহার সমক্ষে দৃশ্যমান জগতই পথ বৈ অন্য নহে; ইহার ড্রাইভার, দেখা যায়, আরামে ঘুমায়, তাহার রুক্ষ গৈরিক চুলগুলি, যাহা রঙিন রুমালে বাঁধা, এখনকার হাওয়ায় ত্রস্ত, স্বস্তিহীন প্রমত্ত। এই গাড়ীর ফুটবোর্ডে, চিত্রসমূহের সম্মুখে বসিয়া বালকটি, সে শুধু বা সকালের—এখন রাত্রি শেষে দিনের সুরু হয় এ-খেলা খেলিতেছিল। তাহার হস্তধৃত এনামেলের বাটির সাবানজল-সম্ভব ফেনিল উচ্ছ্বাসের নিকটে তাহারই দীঘল নয়ন যুগল যাহা অযথা ক্রূর; এবং পদদ্বয় দ্রুত ব্যগ্রভাবে নাচিয়া উঠে কখন সখন, এ-হেন বালখিল্য আধিক্য বিলাসকে যারপরনাই ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল; ফলে ক্ষণেকের জন্য তাহার, বিলাসের, মনে হয় সে খাটে শুইয়া আছে, এবং মাথার কাছে শুভ্র চার্ট করা কাগজ হাওয়ায় হাড়ের শব্দ করিতেছে ফলে ইদানীং আপনার সুমার্জ্জিত রুচিসম্পন্ন পোষাক কেমন গুরুভার—এতকাল ধরিয়া যাহা পরিধেয় ছিল, তাহা হাল্কা যাহাতে সে অভ্যস্ত—তাহার জন্যই বিলাসের মনে এরূপ বিকার উপস্থিত এবং এই একই মুহূর্ত্তেই রেশমী রুমালের সিভেটের দন্তযুক্ত সৌরভকে বিদীর্ণ করিয়া আবছায়া একটি প্রায়-হারমানা-পৃথিবীর হিমবাহ তৎসহ উৎকট রাসায়নিক গন্ধ পরিব্যাপ্ত হয়। সে, বিলাস, আপন অস্বাচ্ছন্দ্যের কারণে, দ্রুত একটি কোটের বোতাম খুলিতে উদ্যত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই 'প্যাচ' পকেটের দিকে লক্ষ্য করিয়াছিল, এবং এ সময়ে তাহার বাম ভ্রূ বিস্ময়কর ভাবে উপরে উঠে, সে অত্যন্তই উদ্‌গ্রীব কাহার একটি মন্তব্য পুনরায় শুনিবার জন্য আপনাকে একাগ্র করে। বিলাস স্থির হইয়াছিল। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে ডাক্তার রঙ্গস্বামীর ঘরে প্রবেশ করিবার সময়, এই করিডোরেই দাঁড়াইয়া মোহিতদা বলিয়াছিলেন "প্যাচ পকেট তোমার কেমন লাগে ডিয়ার? অফুলি (হাসিয়া) স্পোর্ট নয়? দারুণ স্পোর্ট!" আরও কিছু কথা হয়ত মোহিতের

বলার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ওমি অর্থাৎ বিলাসের দিদি তাঁহাকে এক প্রকার টানিয়া লইয়া অদৃশ্য হয়।

'স্পোর্ট' কথাটা বিলাসকে বড় খুসী করে, বড় সুন্দর করে, উহা যেন বাক্য নয়, তাহা যেন সত্যই নয়ন-অভিরাম সহজ, একটি ব্রাহ্মণী হংস, যে হাঁস তুষার অভিমানী, যৌবনশালিনী এবং যে হাঁস শূন্যতা লইয়া খেলা করে। 'স্পোর্ট্‌স' কথাটার উচ্চারণের সঙ্গেই—ইচ্ছাকৃত কষ্টসাপেক্ষ স্বরভঙ্গের সময়ই—মোহিতের পুরুষালি মুখখানি সুপ্রসন্ন সুপ্রভ নাটকীয় হইয়া উঠিয়াছিল। বিলাস দেখিল কালোসাদা ব্রোগ, সিয়াসেকার কাপড়ের, সোজা ইস্ত্রির, পাতলুন এবং কোট, পোলকা ডট সার্ট, সুঠাম বো, পকেটে ব্লু রুমালে স্থাপত্যের পরিচ্ছন্নতা, বাটনহোলে সোনার চাকতিতে M লেখা এবং সেখান হইতে ঘড়ির চেন নামিয়া আসিয়াছে। বঙ্গের গোলাপ বলিতে যে আহ্লাদ উদাত্ত হইয়া উঠে তাহা নিশ্চয়ই মোহিতকে ধারণ করিয়াছিল। এইটুকু ভাবিবার পরক্ষণেই, বিলাস অস্থির হইল, এমত সময়ে কাহার জুতার শব্দ পাইয়া দৃষ্টি ফিরাইতেই দেখিল মোহিত।

মোহিত তাঁহার সরু ভ্রূ যুগল তুলিয়া আপনকার হস্তদ্বয় ছেলেমানুষের মত ইতস্তত বিক্ষিপ্ত করিয়া কহিলেন।—"আও গাড্ অয়লমাইটি তোমার দিদি কি গল্পই করতে পারে" বলিয়াই প্রথমে বাঁ হাতে আপনার পিছু পকেটে পরে চঞ্চলতা সহকারে আপনার ডান হাতে ডানদিকের পকেট হইতে লিমুজকৃত রৌপ্য নির্ম্মিত ফ্লাস্ক বাহির করিয়া ছিপিটি খুলিয়া এক ঢোক গলায় ঢালিয়া দিলেন।—এই ছোট সুরা আধারেও তাঁহার নামের আদ্য অক্ষর ছিল—ঝটিতি সুন্দর মুখমণ্ডলে তড়িৎ প্রবাহ খেলিয়া গেল। বিলাস দেখিল মোহিতের চক্ষুর্দ্বয় অসম্ভব মঙ্গলীয়; সে স্থির ভাবে মোহিতের প্রতি চাহিয়াছিল। মোহিত রৌপ্য আধারটি তাহার দিকে ধরিয়াই অতিভদ্র 'সর্ রে' বলিয়া যথাস্থানে আধার রাখিয়া, সৌখীন সিগারেট কেস বাহির করিল, এখানেও লেখা 'M'...।

বিলাস যেমন করিয়া ডাক্তারের সহিত এতদিন ধরিয়া কথা বলিয়াছে, তেমনি ওষ্ঠদ্বয় কাঁপাইয়া ধীরে ধীরে কহিল "এম এম এম, এত মোনগ্রাম তোমার ভাল লাগে?"

মোহিত কি যেন বলিতে গিয়া খুব সাধারণ করিয়া উত্তর করিল "হ্যাঁ...আমার কাছে আমি যে অত্যন্ত ফেমাস ম্যান" বলিয়া হাসি দিয়া আপনার উচ্ছল রসিকতাকে বাঁধান দিল না, বরং সিগারেটে একটি টান দিয়া কহিল "আমার এক মুহূর্ত্তও এখানে ভাল লাগছে না, পাগল হয়ে যাচ্ছি...কি অদ্ভুত dull জায়গা, নিঃশ্বাসের কি বিশ্রী শব্দ..."

বিলাসের রুগ্ন বরফচাপা রঙটা মোহিতের এহেন কথায় রক্তিম হইয়াছিল, শিশুসুলভ মুখখানি তুলিয়া সে সভয়ে সজল নেত্রে তাঁহার প্রতি চাহিয়া, পরে, ধীরে, আপনার চতুষ্পার্শ্ব উপলব্ধি করিল; এই করিডোরের সাদা একটানা দেওয়াল—মধ্যরাতে রমণীর চোখের পলকের মত—মধ্যে মধ্যে, সোনার জড়োয়া ফ্রেমে প্রসিদ্ধ ডাক্তারদের ছবি; নিকটেই কোক! সমস্ত দেওয়াল আলোর তারতম্যে, কখন বা অতীব দীন, এখানে চাপাগলার শব্দ, কোথাও অভিমান, এমন কি করাঘাত কভু বা দীর্ঘশ্বাস! এ দীর্ঘশ্বাস সম্ভবত তাহার নিজের, বিলাসের। বোধ হয় বিলাস এই বাড়ী, তথা স্থান—অথবা তাহার ইহকালের কিছুটা—সমস্ত অতীত ভালবাসিয়াছে।

এরূপ আত্মস্থ মুহূর্ত্তে সহসা বিলাস আপনার পকেটে হস্ত প্রদানের সঙ্গেই বেপথুমান, যে কি সে অনুভব করে? অস্ফুট নিবিড় ঘোর এক খস্‌খস্ কাগজের শব্দ; এ রৌদ্রকর্ম্মা শব্দ তাহাকে চকিত রোমাঞ্চিত করিয়াছিল। কাংড়া কলমের 'অভিসারিকা' চিত্র দর্শনে মানুষের যেরূপ একা বোধ হয়, ধৈবতের গাম্ভীর্য্যের রাজ্যে যেরূপ একাকী বোধ করে, সেইরূপ এইক্ষেত্রে বিলাসকে পকেটস্থ এই খস্‌খস্ শব্দ—যাহা অন্ধকারকে নাম ধরিয়া ডাকে—বড় একা করিয়াছিল।

অন্যপক্ষে মোহিত দেখে নাই, যে সেইক্ষণে বিলাস আপনার উদ্বেগ চাপিবার জন্য, আপনার ওষ্ঠের একপাশ দাঁত দিয়া চাপিয়া ধরিয়াছিল, হঠাৎ সে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করত, পকেটের কাগজের টুকরো দুটিকে মুঠা করিয়া ধরিয়া ঝটিতি বাহিরে নিক্ষেপ করিতেই একটি ত্রস্ত উড়ন্ত পাখীর ছায়া পলকেই সবেমাত্র-পতিত কাগজের পিণ্ডের উপর দিয়া রেশ টানিয়া চলিয়া গেল। ইহাতে মনে হয়, কাগজের পিণ্ড বিলাসের সমক্ষ হইতে বহু বহু কাল দূরে সরিয়া চলিয়া গিয়াছে, নিশ্চয়ই সেখানে গাঢ় অন্ধকার। ভগবানকে ধন্যবাদ অন্ধকারের রেখা নাই।

এ কারণে মোহিত অনভিজ্ঞ চোখটি বাঁকাইয়া, নীল কাগজের পিণ্ড যাহা ইদানীং গাড়ীর ড্রাইভারের

ঘুমন্ত মাথার নিম্নে বুদ্বুদ-নির্ম্মাণকারী বালকের এবং এইখানকার সিঁড়ির মধ্যবর্ত্তী যে জমি—এখানে ফুলের কেয়ারী বর্ত্তমান—সেখানে খেলিয়া বেড়ায় তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কহিল—"বিলে দু?"

মোহিতের এ প্রশ্ন বিলাসের নিকট রূঢ় বিদ্রূপ হইয়া দেখা দিল, সে কঠিন ভাবে চাহিতে জানে না শুধুমাত্র আপনার সৃজিত পৃথিবীতে চিত্রার্পিতের মত দাঁড়াইয়া রহিল। সে নিশ্চয়ই বলিতে চাহিয়াছিল "ও নো..." উহা বিলে দু নহে তথা পুনরায় জাগিয়া, পুনরায় বিশ্বাস ফিরিয়া পাইয়া প্রথম ভোরের দিকে চাহিয়া শাশ্বত হইবার মানসে কোন যুবতীজন কর্ত্তৃক লিখিত উহা কোন ডাগর বিদ্রোহের জয়ধ্বনি নয়। কিন্তু বিলাস মরিয়াছিল ফলে কোন কথাই সে বলে নাই, এ কারণে যে এখনও স্বতন্ত্র নিঃসঙ্গতার দুর্জ্জয় বীরত্ব তাহার নাই!

বিলাসকে আর উত্তর করিতে হইল না, এ-হেন সময় অদূরে ডাক্তার রঙ্গস্বামীর কক্ষের দোলান-দরজাটা একটু ফাঁক করিয়া ওমি বিলাসকে ইসারা করিল। বিলাসকে যাইতে দেখিয়া মোহিত অসম্ভব চঞ্চল হইয়া উঠিল।

রঙ্গস্বামীর ঘর।

রঙ্গস্বামীকে দেখিবা মাত্রই বিলাসের মনে হইল সে যেমত বা শুইয়াই আছে, পরক্ষণেই সহজ হইয়া অল্প একটু হাসিল। আশ্চর্য্য, এই ঘরে ঔষধের কোন গন্ধ নাই, পরিচ্ছন্ন এবং পবিত্র, এ-ঘর বিল্বদলের মত শুদ্ধ। একমাত্র রঙ্গস্বামীর আঙুলের নখগুলি প্রতীয়মান হয় যে, অদ্ভুত শক্ত, কেন যে শক্ত তাহা কাহারও এতাবৎ মনে হয় নাই; এখন বিলাস যেমন বা এ নখগুলির সম্মুখেই দাঁড়াইয়া ছিল, নিমেষেই সে অনুভব করে, যে না তাহা নয়, সে ঐ নখগুলির পিছনেই আছে, নিশ্চিন্তে, সুখে নিদ্রায়, এ নখে বন অন্ধকার নাই!

রঙ্গস্বামী মুখ তুলিয়া হাসিলেন "হ্যালাও ডিয়ার" ইহার পরে কণ্ঠস্বরকে সঠিক কর্ত্তব্যপরায়ণ করিয়া কহিলেন "মাই চাইল্ড, সব কথা তোমার ভগনীকে আমি বলেছি, তেমনভাবে চলবে, আমাকে চিঠি লিখবে, অবশ্য যার উত্তর আশা করা বৃথা...নিশ্চয়ই আমি তোমার চিঠি পড়ব...কোন রকম ভারী কাজ" বলিয়াই হাসিয়া উঠিয়া কহিলেন "তোমার কর্ম্ম উঠে গেছে" এখানে গলার স্বরটা কেমন যেন বা অস্পষ্ট হইয়া চকিতেই পুরুষালি সদা রসিক আওয়াজ থেমে গেল "হ্যাঁ কর্ম্ম নয় কোনরূপ নয়..." এসময় একটি ভ্রূ অত্যধিক উঁচু হইয়া উঠে "কর্ম্ম নেই—মুক্ত...সম্পূর্ণ অনাসক্ত...খ বৎ"

বিলাসের নবতম দিব্য জামা কাপড়—যাহা স্পোর্টস ধরণের—তাহার নীচে অতি সূক্ষ্ম দেহ যেন বা প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল, একদা তাহার মনে হইল, রঙ্গস্বামী কি এই যশস্বিনী ধরিত্রীর লোক নহে? এ কথা এ অভিমান মনে উঠার সঙ্গে সঙ্গেই মিলাইয়া গেল, কেন না রঙ্গস্বামী উচ্চশ্রেণীর দক্ষিণ ভারতীয়—ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের স্বর্গীয় সুষমায় যে জীবনধারা গঠিত, ফাঁকি নাই। এখন, বিলাস—সাঁওতাল রমণীরা যেরূপ হাটে আসিয়া আপনার বিক্রয়ার্থে ঠেকাপূর্ণ সামগ্রীর সম্মুখে, মুখে একটি হাত দিয়া নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে সেইরূপ দণ্ডায়মান।

সঘন ট্রাজিডির অভিনেতার মতই টেবিলের সবুজ বনাতের উপর দিয়া বার বার ঘুরাইয়া গভীর কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন "ভগবানকে ধন্যবাদ যে তুমি এই শতাব্দীতে জন্মেছ...(তবু এখানে রঙ্গস্বামীর স্বর নিদাঘের দ্বিপ্রহরের ফেরিওয়ালার ডাকের মতই ক্লান্ত শোনাইল) যখন দিন দিন রাত্র রাত্র—আপনার সহজ রূপে এসেছে; বহু মহাপুরুষকে তুমি স্মরণ করতে পারো, বহু বহু যুগে যে কোন মুহূর্ত্তে তুমি চলে যেতে পারো, যে কোন বাস্তবকে তুমি কল্পনা করে নিতে পারো...আমার বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে..."

বিলাস সত্যই রঙ্গস্বামীর এই সরলতায় মুগ্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল, সহসা তাহার মনে হইল, এই স্যানাটোরিয়ামের সাজগোজ আসবাবপত্রের সহিত কি মিল আছে? এখানে ওখানে সর্ব্বত্রে লুই কাতজ আমলীয় সাজসজ্জা তাহাকে এখন বুদ্ধিহীন করিল, কেন এত ঝাড় লণ্ঠন, সেজ, বাতিদান, ঈবনী, গোল্ড ওরমলু, কারপেট...এক মাত্র এপরন, চার্ট, খাট এবং এটা সেটা ছাড়া সবই ভারী সুন্দর শান্ত উপত্যকা! এই স্যানাটোরিয়ামকে সাজাইতে যখনই মহামান্য রাজা বাহাদুরকে কোন কিছু প্রয়োজন এ-প্রার্থনা জানাইয়াছেন, তৎক্ষণাৎই তাহা মঞ্জুর হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে নয়টি পরীধৃত সোনার সৌখীন কাজ করা একটি ঘড়ি পাঠাইয়া দিয়াছেন—রঙ্গস্বামী ঘড়িটি ঈবনীর ম্যানটেল-পিসে রাখার সময় হাঁকিয়া

বলিয়াছিলেন "চিলড্রেন...জগতের যত সুসময় এই ঘড়িটিতে জমা হয়ে আছে...তোমরা যদি লাভ করতে চাও...এটার দিকে তাকিও" বিলাস ছেলেমানুষ যেমত কঠিন অঙ্কের সামনে ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠে, তেমনি অদ্ভুত অদ্ভুত কথা এবং আপনার অভিজ্ঞতার সমক্ষে সে অস্থির।

"আমি অনেক দূরে চলে যাচ্ছি...ভগবানকে বিশ্বাস ক'রো" রঙ্গস্বামী বলিতেছিলেন। 'বিশ্বাস ক'রো' কথাটা ভোরের হাওয়ার মত বিলাসের শীর্ণ মুখে আসিয়া লাগিল; এবং সে উদ্‌গ্রীব হইয়া রঙ্গস্বামীর মুখপানে তাকাইল, পুনরায় তাঁহার স্বর শোনা গেল "মাই ডিয়ার এ এক অদ্ভুত শতক, দেখ না একজনকে একজনের বলতে হয়, তাঁকে বিশ্বাস করো..." বলিয়াই আপনার দুঃসাহসিক হাতখানি বাড়াইয়া দিলেন, এখন তাঁহার সার্টের হাতার হীরকখণ্ড দেখা দিল। ওমি হীরকখণ্ড দেখিয়া মনে মনে প্রশংসা করিয়াছিল।

বিলাস ইদানীং আপনার ব্যাধিমুক্ত হাতখানি বাড়াইয়া দিয়াছে, এ সময় তাহার সুন্দর কালো দুখানি চোখ জলসিক্ত হয়, কম্পিত কণ্ঠে সে কহিল "আমি জানি না কেমন করে..."

"আ আ...ধন্যবাদ দেবো এই ত"

"পুনরায়"

"ও ডিয়ার ও ডিয়ার...বলো না বলো না" বলিয়া চক্ষুর্দ্বয় বড় করিয়া রঙ্গস্বামী পুনর্ব্বার কহিলেন "বলো...বিদায়"

বিলাস হরিণশাবকের মত করিয়া মুখখানি তুলিয়া কহিল "কেমন করে বলি আপনাকে..."

ঠিক এই সময় পাশের হল হইতে কেমন যেন ভৌতিক গোলমাল ভাসিয়া আসিল; অনুচ্চ এবং মর্ম্মান্তিক, গুহার প্রতিধ্বনি যেমন, গহ্বর আপনার প্রাচীনতম আবহাওয়া লইয়া দীর্ঘকায়া হইয়া উঠিল। এ কক্ষের সকলেই উৎকীর্ণ, ঝটিতি উদ্বিগ্ন হয়; স্নেহপ্রবণ রঙ্গস্বামী আপনার চেয়ার ছাড়িয়া দ্রুতপদে ঘর ছাড়িয়া যাইবার কালে, বিলাসের উদ্বেগ ব্যস্ততা লক্ষ্য করিয়া কহিলেন "উত্তেজিত হ'য়ো না, দৌড়ো না"

বিলাস এবং ওমি ডাক্তারের পিছন পিছন করিডোরে আসিতেই দেখিল, মোহিত সবেগে হাতছানি দিয়া তাহাদের ডাকিতেছে। বিলাস কর্ত্তব্যপরায়ণ এবং ওমি কৌতূহলপরতন্ত্র, দুইজনে হল অভিমুখে অগ্রসর হইল। হলের দরজার অনতিদূরে মনোরম আঙুরলতার কেয়ারি করা সিল্কের খাড়া স্ক্রীনের পাশ দিয়া দেখে, প্রত্যেক বিছানায় শুয়ে-শুয়ে নিরাকার রোগীসকল ঊর্দ্ধে দৃষ্টি রাখিয়া আত্মঘাতী সর্ব্বনাশের আওয়াজ করিতেছে, সে আওয়াজে গিরিনদী ভূমিকার পূর্ব্বেকার স্তব্ধতা ছিল, যে স্তব্ধতায় দশাসই উৎকণ্ঠিত যৌবনার কেশরাশির আঁধার ছিল, যে আঁধার বাঁশরীর বিচিত্র অন্তরীক্ষ—তথাপি বিলাস আপনার সংযম হারায় নাই, স্পষ্ট করিয়া চাহিতে চেষ্টা করিল।

বিলাস দেখিয়াছিল, হলের প্রায় মধ্যস্থলে চেট্টি—সে আপনার খাট ছাড়িয়া এখন ঐখানে—তাহাকে দেখিয়া মনে হয় যে ঘোর উত্তেজনাবশত তাহার প্রায় নির্ব্বাপিত শরীরের মধ্যে যেটুকু ঔদ্ধত্য ছিল, তাহাও কম্পমান, সে ঊর্দ্ধে দৃষ্টি রাখিয়া অতি পরিশ্রান্ত নৃত্যরত বাইজীর মত তাহার ঠোঁট অদ্ভুত ভঙ্গিমায় বিকৃত হইতেছে মাত্র, কিন্তু স্বর নাই...এইবার চেট্টি, ভয়ঙ্করভাবে আহত যেমন, টলিতে টলিতে অন্য আর খাটের বাজু ধরিয়া একটি হাত সঞ্চালন করিয়া সহসা উদাত্ত কণ্ঠে কহিল "ইয়া চলন্ত নিদ্রা অহো ভ্রাম্যমাণ এপিটাপ"

সকলেই দেখিল একটি বুদ্বুদ—সাবানজলের বুদ্বুদ—এ হলে হাওয়া খেলিয়া বেড়াইতেছে, এখন এইমাত্র, ঝাড়ের কলমে লাগিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। (ফলে পুনরায় আমরা বিস্ময় ফিরিয়া পাইলাম)। কালহত ঘরটিকে বুদ্বুদ ভীত হইল না।

অথচ বিলাস স্বচক্ষে দেখিল, স্বল্পালোকিত রঙ্গমঞ্চ, তাহার গভীরতা হইতে একটি কিশোর আপনার বক্ষদেশে একটি হস্তস্থাপন করিয়া অন্য হস্তটি ডানার মত মেলিয়া এই বলিতে বলিতে অগ্রসর হইতেছে যে, "আর নয় আর নহে আমারে ফিরায়ে দাও মোর মনোভাব"। বিলাস স্তম্ভিত হইয়াছিল।

রঙ্গস্বামীকে হলের অস্থিরতা যারপরনাই বিমূঢ় করিয়াছিল, কর্ত্তব্যজ্ঞান সত্ত্বেও তিনিও হয়ত বা মুগ্ধ

হইয়াছিলেন। সাবানজলের বুদ্বুদটি লুপ্ত অদৃশ্য হইবার পরক্ষণেই দেখা গেল, চেট্টির ব্যাধি-ক্লান্ত শরীরটি উৎসাহিত, উত্তেজিত, হিম, বীরদর্প, গীতব্যঞ্জক উদাত্ত কণ্ঠস্বরের উপরেই যেন বা ঝরিয়া পড়িল, এতদ্দর্শনে হলময় সকরুণ ব্যথিত বাণবিদ্ধ কষ্টের ধ্বনি উৎসারিত হয় এবং আপনা হইতে একটি বর্ত্তমানকাল দেখা দিল, আর যে বাস্তবতা ঝটিতি অনিত্যতাকে কেন্দ্র করিয়া সকলের সমক্ষে অত্যন্ত সহজরূপ পরিগ্রহ করিল।

চেট্টি এখনও সেইভাবে পড়িয়া আছে, সমস্ত দেহে হারমানা লাঞ্ছিত ভাব, উপরের জানালার লিনটেলের লাল নীল সবুজ কাঁচের আলো-খেলান ছায়া ইদানীং চেট্টির মুখে দেহে পড়িয়াছিল, ওষ্ঠের এক কোণ বাহিয়া চাপ রক্ত অনেক দূর আসিয়াছে, কাঁচের লাল সবুজ ছায়ায় রক্ত অধিক কালো, ওলিভকুঞ্জের ঘনঘটা করা রাত্র যেমন বা তার বক্ষে ছিল, ইদানীং ঝরিয়া পড়িল। বিলাস শান্তভাবে ইহা দেখিতে লাগিল।

যে নাপিত ৬নং রোগীকে কামাইতেছিল, সে খুব ব্যগ্রভাবে ধরিয়া এতাবৎ ঘটনা পরম্পরা সাক্ষ্য দিবার মত করিয়া দেখিতেছিল; হঠাৎ নিস্তব্ধতায় সে পুনরায় আপনার কার্য্য করিবার মানসে ডান হাতের খুর বাম হস্তে লইয়া বুরুশ জলে ডুবাইয়া যেন সম্বিৎ ফিরিয়া পাইল।

বিলাস এখনও ঝরিয়া পড়া রক্ত দেখিতেছিল, অনেকদিন পূর্ব্বে বিদ্যুতের আলোয় আর একজনের মুখে এরূপ রক্ত দেখিয়াছে,—সে আত্মারাম। বেচারী আত্মারাম, অনেক কথাই বিলাসের মনে পড়িল, যখন প্রায় সে হার স্বীকার করিয়া আসিয়াছে, তখন কোথা হইতে একটি থারমোমিটার সে যোগাড় করিয়াছিল, আপনার টেম্পারেচার দেখিয়া রুদ্ধশ্বাসে জিগির দিয়া উঠিল "নর্ম্মাল নর্ম্মাল—দেখ ডাক্তার" রঙ্গস্বামী তাহার থারমোমিটার দেখিয়া কিছুটা সন্দেহের বশে অন্য রোগীকে দিলেন, সেখানেও 'নর্ম্মাল'; এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের থারমোমিটার বাহির করিতেই ব্যাপারটা যেন তাঁহার বোধগম্যে আসিল। অবশেষে তিনিও সায় দিয়াছিলেন "হ্যাঁ নর্ম্মাল—তোমার বাড়িতে চিঠি দেবো।" তারপর পরদিন আত্মারামকে কেহ আর দেখে নাই...কেহ কোন প্রশ্নও করে নাই। এই আত্মারাম বিলাসকে দু'তিনটি প্রেমপত্র লিখিয়াছিল, তারপর একদিন রাত্রে বিলাস ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখে আত্মারাম *তাহাকে সস্নেহে চুম্বন করিতেছে, এবং ধীর কণ্ঠে বলিতেছে* "আমি তোমায় ভালব্যাসি বিল্যাস" এবং ঠিক তখনই বিলাস চমকিত বিদ্যুৎ আলোকে শাপগ্রস্ত আত্মারামের মুখে রক্ত রেখা দেখে।

এতক্ষণে ডাক্তার রঙ্গস্বামী প্রায় চেট্টির কাছে। চেট্টি যারপরনাই শান্ত। তথাপি তাহার গর্ব্বিত দৃষ্টি এখনও উর্দ্ধে বুদ্বুদ অনুসন্ধানে ব্যস্ত, যদিচ বুদ্বুদ আর নাই তবুও তাহার খরচৈত্রে বিদীর্ণ পলিমাটিপ্রায় ওষ্ঠযুগল কোন এক এপিটাপ আবৃত্তিতে চঞ্চল।

বিলাসের, এতদ্দর্শনে, আপনার যুবরাজ সদৃশ মুখমণ্ডল কালো হইয়া উঠে, আর যে চেট্টির দূরদৃষ্টি তাহাকে নিঃসন্দেহে অতিমাত্রায় মর্ম্মাহত করিয়াছিল, ফলে তাহার সুন্দর রাধিকার ন্যায় চক্ষুর্দ্বয় আরক্ত হইল; সে কেবল মাত্র অস্ফুট অসংযত কণ্ঠে বলিয়া উঠিয়াছিল "ও চেট্টি" এবং যুগপৎ অনুভব করিল আসন্ন সন্ধ্যায় কোন বেলাতটে দাঁড়াইয়া নিকটের, নিম্নে, বহমান উচ্ছ্বসিত জলধারার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া সে অদ্ভুত টানা টানা সুরে বলিয়া চলিয়াছে।

সলুই কি সি ম্যৎনাঁ দোর
ভি প্লু দ্য পিতিয়ে ক্য দাঁভি
এ সুফরি মিল ফোয়া লা মোর
আভাঁ ক্য দ্য পারদ্যর্ লা ভি
পাসাঁ ন্য ফে ইসি দ্য ব্রুই
গারদ বিয়াঁ ক্য তু ন্য ল্য ভেই
কার ভোয়াসী লা প্রমিয়ের নুই
ক্যা ল্য পভ্যয়র স্কারোঁ স্যমেই।

এইটি চেট্টির খুব প্রিয় এপিটাপ, এইটি তাহার নিকট হইতেই শেখা। এ-আবৃত্তির কালে বিলাসের মুখ-নিঃসৃত একটি গুনগুন আওয়াজ শোনা গেল, নিশ্চয়ই বিলাস সম্ভবত, সদর্পে এ সময়ে আপনার প্যাচ-পকেটে—যাহা অত্যন্ত স্পোর্টস—একটি হাত ঠেলিয়া রাখিয়াছিল। এবং আরবার আপনার

মস্তকখানি আন্দোলিত করত চেট্টির মুখের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিয়াছিল "এ সুফরি মিল ফোয়া লা মোর, আভাঁ ক্য দ্য পারদ্যর্ লা ভি" এক্ষেত্রে তাহার কণ্ঠস্বর শুনিলে মনে হয় সে যেমন বা বেদান্তের অভিধা ক্রমে ক্রমে মিশাইয়া ফেলিতেছে, পরক্ষণেই মনে হয় যে তাহা স্বপ্নমাত্র, উক্ত এপিটাপের অতি সাধারণ মায়াপ্রবণ অর্থই তাহা জ্ঞাপন করিতেছে যথা "এবং সহ্য করেছে হাজারবার মরণ, ঠিক পূর্ব্বে জীবন হারাবার অর্থাৎ জীবন হারাবার পূর্ব্বে সে হাজার বার মরিয়াছে" একথা অবশ্যই যে বিলাসের এই আবৃত্তির পশ্চাতে যথাযথ শ্লেষ ছিল।

চেট্টির এপিটাপ উদ্ধৃতির জ্বালায় সকলেই পাগল হইয়াছে, তাহার লাল চামড়ায় বাঁধান সোনার কাজ করা খাতাটিতে অজস্র এপিটাপ সংগ্রহ, নিজেও সে এপিটাপ রচনা করিত। সে নিজের বিছানায় বসিয়া, ইদানীং জৌলুষহীন মরা এককালের সুন্দর মুক্তার মত দাঁত চাপিয়া ধীরে ধীরে আবৃত্তি করিত তখন অন্যান্য বিছানার স্বাস্থ্যহীন মানুষেরা ভয়ে শুষ্ক হয়। বাক্যগুলির মধ্যে বাঘের গন্ধ ওতপ্রোত হইয়া উঠিত। পাঠের পরই চেট্টির বিদ্রূপাত্মক হাস্যে সারা হল ত্রাহি ত্রাহি, কে জানে চেট্টি অত্যন্ত নির্দ্দয় ছিল কিনা! হয়তো ছিল! চেট্টির নামে অনেকেই ডাক্তারকে বলিয়াছে কিন্তু কোন ফল হয় নাই।

বিলাস প্রথম চেট্টির গলার স্বর শুনিলেই ত্রস্ত হইয়া উঠিত, তাহার পর একরূপ সে চেট্টিকে সহ্য করিয়া ফেলিয়াছিল। অদ্য সকালে যখন সে অন্যান্যের নিকট হইতে বিদায় লইয়া, চেট্টির কাছে দাঁড়াইল, চেট্টি তাহার হাতে নীল কাগজটি দিয়া কহিল "বিদায়"

"এটা কি"

"তোমার নামে এপিটাপ, পড়"

বিলাস সহাস্যে কহিল "কি নির্দ্দয় তুমি" বলিয়া সে কাগজটি ধীরে আপনার পকেটে রাখিয়া দিল...এবং চেট্টির একটি হাত লইয়া আপনার সুন্দর গণ্ডদেশে বুলাইয়াছিল।

হলের এ দুর্ঘটনার সামনে দাঁড়াইবার মত শিক্ষা তথা ধৈর্য্য ওমির ছিল না, তথাপি সে স্ক্রীণ পার হইয়া খানিক অগ্রসর হইয়াছিল। হলের এ-ঘটনা এত বেশী গোপনীয় ব্যক্তিগত (?) যে তাহার এখানে দাঁড়ান এক প্রকার দুঃসহ বলিয়া বোধ হইতেছিল, ফলে একবার সে জানালা দিয়া দূর পর্ব্বতমালার দিকে চাহিল। এবং এই নির্য্যাতন হইতে অব্যাহতি পাইবার নিমিত্ত বিলাসের কোটে মৃদু আঘাতও করিল। বিলাসের বস্তুত, তখন কোন ব্যবহারিক জ্ঞান পর্য্যন্ত ছিল না।

হলের অবস্থা যখন প্রায় শান্ত তখন ওমি বিলাসকে জোর করিয়া ধরিয়া পুনরায় করিডোরে আসিল। উহাদের দুজনকে দেখিয়া মোহিত উচ্চকণ্ঠে সুরু করিবামাত্র নিম্নকণ্ঠে কহিল..."তোমাদের সাধারণ কাণ্ড পর্য্যন্ত নেই...এখান থেকে চল্লিশ মাইল তারপর ট্রেন..."

"সরি"—বলিয়াই ওমি ভাইকে কহিল..."বিলা খুব সাবধান...এতটুকু একসাইটমেন্ট নয়"

"আমার কিন্তু বড্ড কষ্ট হচ্ছে..."

"টমিরট...থাকলেই পারতে" মোহিত কহিল...এবং পরে মহাবিরক্তি সহকারে যোগ দিল "এক মুহূর্ত্ত থাকতে ভাল লাগছে না..."

গাড়ীতে জিনিসপত্তর তোলাই ছিল। মোহিত সত্বর গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। বিলাস একবার বলিবার চেষ্টা করিল ডাক্তারের কাছ হইতে বিদায় লওয়া উচিত। মোহিত সাধারণভাবেই কহিল "পরে হবে" পরক্ষণেই নিজের কথা সংশোধন করিয়া কহিল..."মানে কতবার নেবে...চল...চল ট্রেন ফেল হবে।"

এখন বিলাস সিঁড়ির কাছেই, তাহার চোখ সম্মুখের জমিতে কি যেন বা খুঁজিতেছিল; যাহা খুঁজিতেছিল তাহা তাহার নজরে পড়িল, সেই নীল কাগজের পিণ্ড, এখন ঘুমন্ত পক্ষীশাবকের মত চুপ! বিলাস এক পা অগ্রসর হইতে গিয়া থামিল, এতকাল সে শুধু আশাই করিয়াছে, মানুষ যে মনস্থ করিতে পারে এ ক্ষমতা তাহার জানা ছিল না। মনস্থ করিতে গিয়া হঠাৎ সে এক দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল; এ-শ্বাস যে কি হেতু তাহা ভাবিবার মত সময় ছিল না; এবং সে আর সময়ক্ষেপ না করিয়া কাগজের পিণ্ডটি তুলিয়া পকেটে রাখিল। এইসূত্রে রঙিন কাঁচের ছায়ায় চেট্টির মুখখানি তাহার দৃষ্টিপথে ভাসিয়া উঠে।

এ ব্যাপার মোহিত অথবা ওমির দৃষ্টি এড়ায় নাই, মোহিত সোল্লাসে বলিয়া উঠিল "বলিনি প্রেমপত্তর"

বিলাস স্বভাবত লাজুক, তির্য্যক দৃষ্টিতে মোহিত এবং দিদির দিকে চাহিল, মনে মনে নিশ্চয়ই সে বলিয়াছিল "সত্যিই প্রেমপত্র, আত্মারামের লেখা নয় বা অন্যান্য ছেলেদের লেখা নয়"

গাড়ীতে উঠার সময় মোহিত প্রশ্ন করিল "বিলা কখন প্রেমপত্তর লিখেছ..."

বিলাস কি যেন বলিতে যাইতেছিল, সম্ভবত "না"। সহসা ওমি বাধা দিয়া কহিল "না আবার সুধীরকে...লোকনাথকে..."

"মেয়েদের নয়?" মোহিত কহিল।

"আমার মেয়ে ভাল লাগে না"

"কিন্তু ছেলে দিয়ে কি হবে...গোঁফ দাড়িতে গাল বড় কড়া হয়"

ওমি ক্ষুদ্র একটি ধমক দিয়া কহিল "ও না থাম"

বিলাস বাল্যের এবং কৈশোরের কোন বন্ধুকে একদৃষ্টে এবং আড়ে তাকাইয়াও বিশেষ স্পষ্ট করিয়া স্মরণ করিতে পারিল না...। কেবল একবার যেমত বা দেখিল, লোকেন সবুজ মাঠে বলের উপর একটি পা দিয়া দাঁড়াইয়া, চুল হাওয়ায় দোলে, পিছনে কালোমেঘ, ওমির ধমকে মোহিত স্ত্রীর মুখপানে চাহিয়া স্মিতহাস্য সহকারে আপনকার বেতের টুপিতে ঈষৎ ঠিক দিয়া কহিল "স্যানাটোরিয়ামটা অদ্ভুত টেরিব্‌ল না" বলিয়া আধো রক্তিম চক্ষু দুইটি মেলিয়া অতীব দূরের দিকে ভয়ে ভয়ে নিরীক্ষণ করত ক্রমে ক্রমে আপনাকে ব্যক্ত করিল adoring garlic with humble face. সেই দলই আমার ভাল..."

ওমি আপনার স্বামীর দিকে তাকাইয়া ছেলেমানুষের মত হাসিয়া মন্তব্য করিল "ও ডিয়ার...স্যানাটোরিয়াম জিনিষটা তোমার কাছে হাইলি ইন্টালেকচুয়াল বলে বোধ হল..."

"সত্যি" প্রতিউত্তর করিয়া মোহিত বিলাসের মুখের দিকে লক্ষ্য করিল, ওমির মুখের মত গাড়ীর কম্পনের সহিত থর থর করিয়া তাহা কাঁপিতেছে না, উহা সহজ এক সুন্দর। বিলাস খুব সোজা করিয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিবার জন্য আপনার দেহটি হেলাইয়া দিয়াছিল। মোহিত ঝটিতি "আঃ" স্বরে চীৎকার করিয়া কহিল "ড্রাইভার রোকও..." মুখে হাত দিয়া "সস" শব্দে কথা কহিতে মানা করিয়া বলিল "আঃ কি সুন্দর হরিণটা—বন্দুকটা ওমি"

ওমি শুধুমাত্র আপত্তি জানাইল "আঃ মোহিত" যেমন সে আপত্তি জানাইয়াছিল তেমন অন্যপক্ষে সে হরিণশাবকের দিকে শুদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল। আশ্চর্য্য এখানকার হরিণরা চলন্ত গাড়ীকে নিশ্চয়ই ভয় পায় না বিলাস, আপনার সম্মুখে ওমির স্তব্ধ দৃষ্টি তথা নয়নযুগল এবং ক্ষণিক পরেই হরিণটিকে দর্শন কালে শুনিল যে মোহিতের কথাটি তাহার কানের কাছে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। বিলাসের কেন বার বার "কি সুন্দর—বন্দুকটা" এ-হেন বাক্য পরম্পরা গুঞ্জন করিয়া ফিরিতেছিল, নিঃসন্দেহে কথা দুইটি দৈনন্দিন সহজ গোলমালের মধ্যে মিশিবে না: এ কারণে যে, এ-প্রকাশের অনেকটা মনোভাব একদা আকাশে উড়িয়া খেই হারাইয়াছে, কিছুটা স্থাপত্যের অহঙ্কারে কিছুটা সঙ্গীতের নিখাদ পর্য্যন্ত আবিষ্কারে ক্ষয় হয়, যেটুকু আছে এটুকু আছে। এ-কথায় মনুষ্যোচিত ভাবধারা অদ্য বর্ত্তমান। এখন সে, বিলাস ঘুরন্ত হরিণ এবং পশ্চাতে সুঠাম বনরাজি ও পর্ব্বতমালা হইতে চক্ষুর্দ্বয় ফিরাইয়া মোহিতকে দেখিল, দেখিল মোহিত কালহত নহে। এতদ্দর্শনে মন্দিরের অভ্যন্তরস্থ, আশ্চর্য্য, তাহাকে ছাইয়াছিল। শ্রদ্ধায় তাহার মধ্যে যেমন রৌদ্র দেখা দিল, সূক্ষ্মতা গণিতের মানকে ক্ষুব্ধ করিতে চাহিল, মধ্যরাতের নৈসর্গিক স্তব্ধতার আশ্রয়ে উপলব্ধ নম্র উষ্ণতা সারাদেহে প্লাবিত হইল। এ সময় বিলাসের দৃষ্টি যে শূন্যতায় নিবদ্ধ ছিল, সে শূন্যতা গোলাপের রক্তিমতা বহন করে। ফলে বিলাস অতিমাত্রায় উৎফুল্ল হইয়া আপনাকে জ্ঞাপন করে "আমায় বন্দুকটা দাও..."

"ও না পাগল, ড্রাইভার...গাড়ী চালাও...রিকয়েল করবে না..." ওমি বলিয়াছিল।

"তাহলে গান নিয়ে বার হওয়া কোন মানেই হয় না" মোহিত উত্তর করিল...!

"না বার হবে না, যে স্বদেশীর যুগ...বন্দুকটা চুরি যাক" ওমি কহিল।

বিলাস কি একটা কথা বলিতে যাইতেছিল কিন্তু হঠাৎ তাহার চোখে লিনটেলের ফুলকাটা লাল নীল ভাসিয়া উঠিল, আশ্চর্য্য এই যে এই আলোর মধ্যে সে হারমানা মুখখানি নাই...। বিলাসের মনে হইল, ছেলেবেলার জ্বর উপশমে প্রথম মাগুর মাছের তেজপাতা জীরে মরিচ বাটা ঝোলের মধ্যে যেরূপ মুখচোরা লাজুক পৃথিবীর নিমন্ত্রণটি থাকিত, এখানেও মোহিতের উক্তির মধ্যে সেই বাহু বিস্তার করা

স্বাগতম স্বাগতম ধ্বনিটি ছিল।

বিলাস আপনার সহিত একটি সমান্তরাল রেখা টানিয়া আপনাকে স্বতন্ত্র করত, শ্যাম মোহিনী মায়ার সচেতন রূপ এই সুবিস্তৃত পৃথিবীকে মহা আবেশভরে দেখিয়া লইল। তবু কি হেতু জানা নাই, যে—চাতুর্য্য অথবা সরলতা—সে বলিল, "ওমি আমার কাশী থাকাই ভাল" এবং এক নিমেষে ওমি প্রশ্নমান দৃষ্টি লক্ষ্য করিয়া কহিল, "কাশীতে গঙ্গা আছেন..."

এ-হেন উক্তিতে স্বামী ও স্ত্রী দুজনেই ছোট করিয়া হাসিল।

ঐ হাস্যের উত্তর না করিয়া অন্যপক্ষে বিলাস পুনরায় এই যশস্বিনী সৃষ্টিকে দর্শন করিয়াছিল, এ পৃথিবীতে অদ্যও নিশ্চিন্ত নিদ্রা আছে এবং আরবার জাগিবে বলিয়াই, জানিয়াই যেখানে মানুষে ঘুমায়।

হায় গোলাপের মত বিস্মৃত ফুল আর নাই সমস্ত মুহূর্ত্ত যাহার অনিত্যতা; প্রথমে শুকায় ধীরে ঝরিয়া চুপ, ক্ষণেকেই কোথাও ফুটিয়া উঠে, সমক্ষে থাকিয়াও চির-বিস্মৃত।—বিলাস এই রুগ্ন কথাটি, প্রত্যহই, বারবার উদ্ভিন্ন প্রস্ফুটিত গোলাপের প্রতি চাহিয়া ভাবিয়াছে; এ-সত্য তাহার নিজস্ব অভিজ্ঞতা। এবং এ-কারণে তাহার দুঃখময় শরীরে আক্ষেপ ছিল, অস্থিরতা ছিল। গোলাপক্ষেত্রে কার্য্যের মাঝে সে যখন দূর রাস্তার প্রতি চাহিয়াছে যে পথ ঝিনকীর ঝরণার পাশ দিয়া গিয়াছে, যে পথে কখনও স্তন্যদানরত মা আসে, বাঁকবাহী লোক আসে। বিলাস ঝরণার কথা ভাবে নাই, যদিও ঝরণাটি অতীব বিস্ময়কর, এখন যাহা মৃত তথাপি কিছুকাল যাবৎ তাহার দিকে চাহিলে অবর্ত্তমান জলধারার গুঞ্জনধ্বনি শুনা যায়, যে গুঞ্জনধ্বনি ভ্রমরগুঞ্জন সদৃশ্য, ফলে যখন এ ঝরণায় উল্লসিত আছে, তখন অনেক পথহারা ভ্রমর যাহারা সঙ্গলোভী তাহারা এ ঝরণা পরিক্রমণ করে; এখন শুষ্ক তবুও ভ্রমর দেখা যায়। এ-ঝরণার দিকে চাহিয়াও গোলাপের দূরদৃষ্টের কথা ভাবিতে ভাবিতে আপনার হাতে লাগা লাল মৃত্তিকা ঝাড়িয়াছে। কেবলমাত্র স্মরণ করিয়াছে, কিন্তু গোলাপের উপর হাজার হাজার রোদ আসিয়াছে, চন্দ্রালোক মথিত করিবার আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু অদ্যও গোলাপকে কেহ দেখে নাই।

অদ্য এখন সকাল, একটি গোলাপের প্রতি বিলাসের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল; সে-গোলাপের পিছনে অসংখ্য যোজন অবকাশ, চড়াই উৎরাই কখনও বা সমতল অনেক দূরে অজস্র পাহাড়ের সারি—যাহা এখন গম্ভীর নীল। ইতিমধ্যে মিয়ানী মোক্তার ছোট বিলাতী কটেজ, কটেজের গেটের দুই পার্শ্বের বগনভেলিয়ার কমলানেবু রঙের ফুল সহ লতাছড়ির অসহায়তা দৃশ্যমান; আজ এই কুটিরখানি বিলাসকে কিছুটা বিমনা করিয়াছিল। এবং এ-কারণে গোলাপ সম্পর্কে নিত্যকার ভাবনা এবং সে-ভাবনা হইতে কোন এক আকাশ পন্থায় তথা শূন্যতায়, যে শূন্যতায় স্যানাটোরিয়াম হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে, মোহিতের কথা সূত্রে তির্য্যক দৃষ্টিতে সে দেখিয়াছিল যে, যে-শূন্যতা গোলাপের রক্তিমতা বহন করে—সে শূন্যতায় দৃষ্টি নিবদ্ধ-করা তাহা আজ তেমন করিয়া ঘটিয়া উঠে নাই।

কেননা উক্ত বিলাতী কটেজে ইদানীং মনিক চ্যাটার্জ্জি আসিয়াছেন।

দিশড়া মৌজার এক প্রান্তে বিলাস, অন্যপ্রান্তে গোলক মিত্তির। ইতিমধ্যে অনেক বাড়ী আছে, কিন্তু ক্বচিৎ কখনও কেহ আসে, এখন সব বাড়ীই ফাঁকা। প্রতিদিন বৈকালে, গোলকবাবু বিলাসকে দেখিতে আসেন, গোলকবাবু অসম্ভব—বারান্দায় আরাম কেদারায় আপনাকে নির্ব্বিকারে ছাড়িয়া দিয়া যে কোন আকাশের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আপনার একদার সময় ও সমৃদ্ধির গল্প করেন, কেননা ইদানীং তিনি সত্যই দুঃস্থ; এখন তাঁহার ক্ষেতে পেঁয়াজ উঠিতেছে, ফলে জামার গায়ে অযথা পেঁয়াজের গন্ধ, গল্প করিতে করিতে যখন এখনকার জীবনের কথা মনে হয়, তখনই আরামকেদারা ছাড়িয়া বেতের চেয়ারে বসেন; বিলাসের এ ধরনের ছড়া-কাটা গল্প শুনিতে কোন দিনই ক্লান্তি বোধ হয় না, একটি মুহূর্ত্তের লোভে সে উদ্গ্রীব হইয়া থাকে, বেতের চেয়ার ছাড়িয়া হঠাৎ যখন গোলকবাবু বিলম্বিত রুষ্ট সর্পের ন্যায় মহাদর্পে উঠিয়া একখানি হাতদ্বারা আপনাকে সুস্পষ্ট করতে কহিতেন "দেখে নেব সব শালাকে...এইসা দিন নেহি রহে গা" বলিয়া অন্ধকারে তিনি প্রস্থান করিতেন।

যে অন্ধকারে বৃদ্ধ গোলকবাবু—ইঁহার বয়ঃক্রম প্রায় সত্তর—সে অন্ধকার কিছুক্ষণ যাবৎ লাল হইয়া থাকে, এ-লাল মহাঈর্ষ্যাবশত মহা আক্রোশ যে নিরীহ পশুবলি (ভুলক্রমে) সংঘটিত হয় তাহার

রক্তধারা যেরূপ; এরূপ অশরীরী রক্তিমতা দর্শনে বিলাসের ত্রাসের সঞ্চার হয় নাই, যেহেতু তৎক্ষণাৎ আপনার মানসচক্ষে সুদীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ কালে গোলকবাবুর কণ্ঠে শিরা উপশিরা সকল কি ভয়ঙ্কর ভাবে ফুলিয়া উঠিত তাহা দেখিতে পাইত। এই গোলকবাবুই মনিক চ্যাটার্জ্জির খবর আনিয়াছেন।

তখন সন্ধ্যা হয় হয়, তখন চন্দ্রমাধববাবু, দূর বিসর্পিল রাস্তা যেখানে চড়াইয়ে উঠিয়া হাওয়া, সেখানে সর্ব্বপ্রথমে বিন্দুবৎ এবং কিছু উর্দ্ধমুখিন ধুলার ছটা, ক্রমে পরে, ঝিনকীর মৃত ঝরণার পাশ দিয়া, এখানে ক্ষণেকের জন্য তাহার ঘোড়া স্থিতি লাভ করে, পরে এ ঝরণাকে দক্ষিণে রাখিয়া চন্দ্রমাধববাবুর ঘোড়া ছোট-ছুটে অগ্রসর হয়, এবার তাঁহার বিরাট পাগড়ী দেখা যায়। গেটের নিকটে আসিয়া, ধীরে নামিয়া শ্লথ পদে বারান্দার দিকে যান। বিলাস গ্রাভেল ফেলা রাস্তায় সংযত পদক্ষেপ শুনিয়াই বাহিরে আসিয়া যথারীতি অভ্যর্থনা করে।

চন্দ্রমাধববাবু মাথা হইতে বিরাট পাগড়ীটা নামাইয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে প্রশ্ন করেন "বল ছোট সাহেব তোমার গোলাপের খবর কি? বৃয়ার বড় শক্ত হে, কারণ কি জান এই যে গরম ছুটে আসছে না, তোমাকে খুব সাবধান হতে হবে হে, বেচারী গাছগুনো...আজ কিন্তু কালো-কফি"

"বেশ" বলিয়া বিলাস তাহার অন্য কথার অপেক্ষার জন্য থাকে, আপনার হস্তদুটিকে লইয়া কি যে করিবে তাহা সে ভাবিয়া পায় না। চন্দ্রমাধববাবুর বয়স গোলকবাবুর না হইলেও ষাটের উর্দ্ধে নিশ্চয়ই, কিন্তু আশ্চর্য্য একই জিনিযকে নূতন করিয়া দেখিবার মন অনেক নির্ম্মমতায় খোয়া যায় নাই "কফি পটের লতাপাতাগুনোর উপরে সন্ধ্যার আলো পড়লে বেশ দেখায় না, মনে হয় চেঞ্জে গেছি" আবার খানিক স্তব্ধতা "ঝিনকীর ঝরণার সঙ্গে আমাদের কেমন মিল আছে না, অথচ শুষ্ক একবার একবার জল...চতুর্দ্দিকে মানুষ আয়না খাড়া করচে..." আবার স্তব্ধতা "খোলা মাঠে যখন বাছুর লাফায় তখন—আজ দেখলুম—তখন বেশ লাগে না—তখন মনে হয় বাঃ বেশ?" আবার স্তব্ধতা—বিলাস এসকল স্তব্ধতার সঙ্গে বিশেষ পরিচিত, এ স্তব্ধতা তথা বিরাম সঙ্গীতের—শেষ স্তব্ধতার পরেই অবলীলাক্রমে আসন্ন সন্ধ্যার আলোর সহিত চন্দ্রমাধববাবুর কণ্ঠস্বর এক হইয়া যায়, তখন কানে ভাসিয়া আসে "তুমি নেহাৎ ছেলেমানুষ না হলে তোমাকে অনেক কথা বলতুম" নিমেষেই তাঁহার আয়ত চক্ষুর্দ্বয় অত্যধিক করুণ হইয়া উঠে এবং দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করত বলিলেন "অত্যন্ত শকড হয়ে এখানে এসেছি...এই চল্লিশ বছর কেটে গেল—আচ্ছা ছোট সাহেব...কাল দেখা হবে"। গমনোদ্যত চন্দ্রমাধববাবুর পিছনে অস্তমিত সূর্য্যের শেষ রশ্মিটুকু দেখা গিয়াছে। অদ্যও নিশ্চয়ই, যদি বিলাস স্মরণ করে তাহা হইলে তাহার মনে পড়িবে, লিখারী পরগণার রানীর পূজা উপচার লইয়া যাইবার কালে, সম্মুখেই ঢাক ঢোল তূরী পিছনে, সাদা ঘোড়ায় ম্যানেজার চন্দ্রমাধব ঘোষাল, রাজকীয় বেশ মাথায় উষ্ণীষ সবুজ ভেলভেটের খাপে তরোয়াল—তাহার পিছনে বিচিত্র সজ্জায় পাঁচটি হাতী, মধ্যেরটি শ্বেত। সে অবস্থাতেও চন্দ্রমাধববাবু নামিয়া বিলাসের সহিত দেখা করিবার সময় সেই এক কথা "নেহাৎ ছেলেমানুষ না হলে, বড় শকড হয়ে এখানে এসেছি—না না কফি না জল না...আজ শিবরাত্রি যে...যদি মোক্ষ দেন...আর মনুষ্য জীবন নহে" বলিয়া সবেগ প্রস্থান করিলেন; লাল কিংখাবের ছত্রের রক্তিম আভা তখন তাহার মুখমণ্ডলে...বৃদ্ধ হাসিলেন।

চন্দ্রমাধববাবু আসিয়া বসিলেন। বিলাস তাহাকে দেখিয়া অল্প হাসিল, কহিল "বলুন চা না কফি...না..."

চন্দ্রমাধববাবু বিলাসের সুন্দর মুখখানির দিকে তাকাইয়া ভ্রূ তুলিলেন। বিলাস কহিল "হুইস্কি, ব্রাণ্ডি, ওয়াইনজাতীয়...কোন...মোহিতদার জন্য ওমি সব রেখে যায়—কখন..."

"হুইস্কি..."

বিলাস ঈষৎ উচ্চৈঃস্বরে তাহার কথার প্রতিধ্বনি করিয়াছিল।

"জান মনিক এসেছে...সারা জীবন ত ফাঁকা, মানুষ আবার ফাঁকায় আসতে চায় মজা দেখ...মনিক বললে কি না...এখানটা বেশ ফাঁকা তাই বেশ লাগে...কে কোথায় হাঁপিয়ে উঠছে বলা ভার কি বল..." বলিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিলেন, বিলাস বুঝিল এই মুহূর্ত্তটি চন্দ্রমাধববাবুর আপনার কথায় ভরিয়া ছিল, পরক্ষণে শোনা গেল "গ্রাণ্ড মেয়ে দারুণ স্কলার তেমনি অপূর্ব্ব সুন্দরী...বিয়ে যে কেন...বুঝি তা ওদের সমাজে...এই বয়সেই সেণ্ট স্কুলের হেডমিস্ট্রেস...বেরি বেরি...কলকাতা অতি নচ্ছার জায়গা হয়ে

উঠেছে...হ্যাগা ছোট সাহেব তুমি ওকে নেমন্তন্ন...”

“আজ্ঞে আজ্ঞে মানে...বুঝলেন নেমন্তন্ন ঠিক নয়...লিখেছিলুম কারণ এ কয়েকদিন আগে হঠাৎ সকাল বেলা তখন বেলা ৮টা হবে জানেন...” বলিতে বলিতে সেই শূন্যতার দিকে চাহিতেই কয়েকদিন পূর্ব্বেকার পাহাড়ী সকালে গিয়া পৌছিল, দেখিল, তখন মেঘাচ্ছন্ন সূর্য্য ফলে আলো অতীব, মেষশাবকের গায়ের মত, কোমল, একজন অপূর্ব্বরূপসী আপনার এলোখোঁপা বাঁধিতে বাঁধিতে সম্মুখের গোলাপের ইতস্তত প্রমত্ততা দর্শনে মগ্ন। মেঘ ছিন্ন হইল, তৎক্ষণাৎই সর্ব্বকালের আলোর কল্পনা আসিয়া সারা মুখমণ্ডল এবং অবয়বটি উদ্ভাসিত করে। এই অপসরা তাহারই বেড়ার ধারে তখনও দণ্ডায়মানা, গোলাপ দর্শনে স্থাবর। বিলাস তাঁহাকে দর্শন করিয়াও বুদ্ধি হারায় নাই, শুধুমাত্র একটি কুহকের মধ্যে ছিল যে কুহকের অর্থ মোহিনী মায়ার শ্বেত কবিপ্রসিদ্ধি ইঁহার চারি দিকে খেলা করিতেছে; এই সেই লাল, আরবার মনে হইল, ওমি বোধ হয় ইঁহা হইতেও সুন্দরী কিন্তু বড় বেশী সোফিস্টিকেটেড। সেদিনকার অভিজ্ঞতা সাধারণভাবে চন্দ্রমাধববাবুকে নিবেদন করে।

“ও বলেছে একদিন বাগান দেখতে আসবে...ব্যাপারটা কি জান, ওর মা...যাক, তাই বড় একা, একা মিশতে চায় না...”

“আমি ভাবলুম...আমার ত টিবি, তাই হয়ত...”

সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রমাধববাবু এমন ব্যস্ত হইয়া বিলাসের গায়ে হাত দিয়া আদর করিতে গেলেন যে হুইস্কির গেলাসটি প্রায় পড়িয়া যাইতেছিল। বিলাস গেলাসটি ধরিয়া ফেলিল, চন্দ্রমাধববাবুর বড় আপনার করিয়া তাহাকে আদর করিলেন। ইহার পর হুইস্কিতে ঠোঁট ভিজাইতে ভিজাইতে কহিলেন “ও গো বাবু বেরি বেরি কি কম ছোঁয়াচে...যাক আজ রানীর জমিদারীর উত্তর দিকে গিয়েছিলুম, জানো সেখানে একটা ছোট নদী আছে...আহা, বলতেও কষ্ট হয়, গেল “এইখান যাত্রায়” (পরব) সাঁওতালরা, সেই নদীর তীরে বেশ কিছু হুপ্‌পি ছিল...সব মেরেছে গা...পাখী আমার বড় ভাল লাগে যখন এখানে আসি কত পাখী...এখন...আচ্ছা এখানে বেশ মন বসেছে ত...।”

“হ্যাঁ তবে একটু আপনার মত বেড়াতে পারলে...”

“না না বিলাস ছেলেমানুষী করো না...তোমার থেকে দুয়েক বছর বড় হব, তখন, আমি এ অঞ্চলে আসি, এখানকার মজা কি জান, নিজেকে পরিষ্কার দেখা যায়”

“সে ত আয়না!...”

এর উত্তরে চন্দ্রমাধববাবু চেয়ারে সজোর চাপড় মারিয়া কহিলেন “আঃ কচে বারো...দারুণ বলেছ...হ্যাঁগো গোলাপের কতদূর, খবর নেওয়া হয় না...”

“তাহলে তো ডায়েরী পড়ে শোনাতে হয়...একটু হুইস্কি...”

“আঃ গুড...তবে তোমার ডাইরী বড্ড বেশী সরলতা—ওটা বুঝতে আমার...”

“সত্যিই...”

“ওই যে ডাইরীর মাথায় লেখা—art is too long life is too short—এ সব কথা দুঃখ থেকে বঞ্চিত করে...তুমি ত দুঃখ পাওনি তুমি ভয় পেয়েছ...তাই...থাক বৃয়ার রোজ কি বলে...”

এ সময় আঁধার করিয়া আসিয়াছিল ফলে নগেন আলো লইয়া আসিতেই, হাত তুলিয়া বিলাস তাহাকে নিষেধ করিল। বিলাস মন খারাপ করিতে গিয়া চন্দ্রমাধববাবুর দিকে তাকাইল, বুঝিল এই কয়েক আউন্সেই তাহার জিহ্বা বজ্জাতি করিতেছে। সহসা আপনার ভারী মাথাটা তুলিয়া নগেনকে দেখিয়া চন্দ্রমাধববাবু কহিলেন ‘নগা...তোর দাদার বৌ কেমন রে...”

বিলাস নগেনের পূর্ব্বেই উত্তর করিল “আর বলবেন না, বড় মুস্কিলে আছি, যক্ষ্মা তো, বলে কিনা রক্ত পিত্ত! হাঁসপাতালে গেল না...যখন যা পারি দি, অনবরত সেই টাকা দিয়ে রঙ্কিলি টিলায় পাঁঠা কাটাচ্ছে, আর ঢাকি ভাড়া কচ্ছে...”

“এ্যাঃ” চন্দ্রমাধববাবুর ম্যানেজারি ভাব ফুটিয়া উঠিল “শালা শুয়োরের বাচ্চা—হারামজাদা—ডাক শালা...তোর দাদাকে ছোট জাত...”

“আহা থাক্ চন্দ্রমাধববাবু...”

“কি সর্ব্বনাশ গো...তোমার ত বড্ড অসুবিধে হচ্ছে...একমাত্র চাকর ভরসা...তা তার বৌ মরবে

কবে?"

"এখন ভূষণ বলছে গণৎকার বলেছে...একাদশী-দ্বাদশী কাটলে হয়"

"বাঃ সিদে কথা...হ্যারে তা মরবে, কত কাঠ যোগাড় করেছিস..."

"ভূষণ ত কাঠ কাঠ করে লাফাচ্ছে...বলছে গোলকবাবুর উঠোনে মণ মণ কাঠ আছে...আচ্ছা বলুন তো সে ভদ্দরলোক কাঠ নিজের জন্যে জমিয়েছে...বিদেশ বিভুঁয়ে যদি..."

"আমাদের খেদুড়ী জঙ্গলে গেলে কাঠ দিতে পারি...তবে যে আবার যাবে সে ত মহুয়া খেয়ে বেহুঁস হয়ে থাকবে—তুমিও যেমন, মরুক শালারা..."

এখান হইতে দেখা যায়, হল-ঘরে এক পাশে, রাত্রের খাবার জন্য টেবিল সাজানো হইতেছে; অসম্ভব গোপনীয় দৃশ্য, এই দিক হইতে চক্ষু ফিরাইয়া চন্দ্রমাধববাবু কহিলেন "তুমি কোথায় ছোট সাহেব"

প্রথম আঁধার, দ্বিতীয় অনন্ত দূরত্ব মানুষের অস্তিত্ব ফুৎকারে উড়াইয়া দিতে চাহিতেছে, উপরন্তু এই অসহায় জিজ্ঞাসায় বিলাস রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, আপনার অভ্যন্তরে অসংখ্য পরি-প্রেক্ষিতের যাওয়া আসা চলিতে লাগিল, আর সে, বিলাস, অদ্ভুত ভাবে মাথায় হাত দিয়া এক হাত উর্দ্ধে তুলিয়া কি যেন বলিবার জন্য ওষ্ঠবিদীর্ণ। চতুর বিলাস পলকেই এ দৃশ্য হইতে মন ঘুরাইয়া লইল।

চন্দ্রমাধববাবুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল "বিলাস, তুমি বেশী ভূষণের ওখানে যেও না..."

"না গিয়ে কি করি বলুন, ওরা ভাববে..."

"তুমি ভয়ে..."

"আজ্ঞে তাই...তাই যেতে হয়..."

"যাতে ওরা বিশ্বাস করে তুমি মোটেই ভয় পাও না...যাক সব মার ইচ্ছা..."

চন্দ্রমাধববাবু, শেষোক্ত কথায়, বিলাস কালো হয়, এ-কারণে যে এক্ষণি তিনি প্রশ্ন করিবেন, "কি বিলাস তারা ব্রহ্মময়ীকে দেখছ ত" সে-ছবি মেরুদণ্ড সরল করিয়া দেখার মত সুযোগ সে খোঁজে নাই; প্রকৃতি মাঠ ঘাট তেপান্তর লোক গল্পই ভাল, তাঁহাকে এরূপে দেখা তাহার পক্ষে সম্ভব নয় তবে এইটুকু সে বুঝিয়াছিল, সে-ছবি যখন চন্দ্রমাধববাবু তাহাকে উপহার দেন, তাহার মধ্যে প্রাচীন ভালবাসা ছিল।

"মা মা" বলিয়া এমত কাতর উক্তি করিলেন, সম্মুখের বিলাস শিশু হইয়া গেল, যে বিলাস এতাবৎ ষড়যন্ত্র করিতেছিল, বাঁচিবার নামে জীবন ধারণের নামে, বহু বহু যুগের অনর্থ, ময়লা, অন্ধকার এবং কূট পদ্ধতি লইয়া খেলা করিতেছিল, সে বিমূঢ় হইল, বিলাস আর যাহা আকাঙ্ক্ষা করুক, কোন ক্রমেই শিশু হইতে চাহে নাই। ফলে বৃক্ষলতাদি এবং নিকটের গোলাপ ক্ষেত্র, উপরে নক্ষত্ররাজি সকলেই সাক্ষী রহিল যে, বিলাস রুক্ষ হইল..."রাত হয়েছে..."

বিলাসের এ কথা চন্দ্রমাধববাবু অল্প নেশার ঘোরে শুনিয়া কহিলেন "কথাটা বড় অর্থব্যঞ্জক, ইচ্ছা করলে আমি এখনি সন্ন্যাস নিতে পারি...যাক গোলাপের লাল, হ্যাঁ যে লাল তুমি বলেছিলে সে লাল অতীব গূঢ় সূর্য্যের আছে...আর আছে উষ্ণতার মধ্যে..." এইটুকু বলিয়াই চন্দ্রমাধববাবু কোথায় যেমন বা অন্তর্দ্ধান করিলেন।

বিলাস যেন বা হাঁফ ছাড়িল, কেন না ভাগ্যে চন্দ্রমাধববাবু বলেন নাই তাই জগজ্জননী তারা লাল ভালবাসেন।

বিলাসের সমস্ত দেহ সম্পূর্ণভাবে রোমাঞ্চিত হইয়া আছে। মৃদু শব্দে, ছোট স্পন্দনে সাধারণ হাওয়ায় সে বার বার চমকাইয়া উঠিতেছিল, এমন কি কিছুক্ষণ আগে, ওমিকে চিঠি লিখিবার কালে তাহার অনবরত একাগ্রতা ভাঙ্গিতে ছিল, চিঠি হইতে মুখ ঘুরাইয়া সে বলিয়া উঠিয়াছে "কে?"

একদা এ প্রশ্ন তাহার আপনার দিকে চক্রাকারে ঘুরিয়া আসিল, এ প্রশ্নে সর্ব্বভুক্ দেদীপ্যমান শিখা ছিল। এহেন উপলব্ধিতে বিলাস বুঝিল তাহার আপনার মধ্যে মহাবায়ু—যে বায়ু ভাস পাখীর আকাশ পন্থায়—চলা ফেরা করিতেছে, না না তাহা নহে মনে হইল সে নিজেই যেমন বা চলিতেছে। বন্ধু নাই,

কবি নাই, পথপ্রদর্শক নাই। একটি দুঃসহ অমাত্রিক ছন্দ ক্রমে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পরিক্রমণ করিতেছে। একদা ক্ষীণ চেতনায় দেখিল, সে যেন বা কোন এক বেলাতটে আপনার ছায়ার উপরে অচেতন, অদূরে ঘোর তরঙ্গভঙ্গ—এখন মধ্যরাত।

দুর্দ্ধর্ষ সুপ্তি হইতে উঠিয়া পুনরায় বেশ গভীর করিয়া প্রশ্ন করিবার মানসে ওষ্ঠদ্বয় বিভক্ত করে, এবারে তার স্বর ছিল না। সম্মুখের ওমির ফোটোর দিকে চাহিয়া অসহায় ভাবে আপনার মস্তক আন্দোলন করিল। এই আশ্চর্য্য বিকারের মধ্যে সে গোলাপ ফুটিবার অপেক্ষার হেতু নির্ণয় করে, মনে হইল তাই কি? তবে কেন পড়িয়া-থাকা-চাবি দর্শনে, দরজা দর্শনে, শিশু দর্শনে, তাহার দেহ শিহরিয়া উঠে। যে বিলাস, যে কোন চিত্তবিভ্রান্তকারী দৃশ্যকে বৃক্ষস্থিত কাঠঠোকরা দেখিয়া, পাতার আন্দোলন মনস্থির করিয়া ঠেকাইয়াছে, আজ আর পারিতেছে না, সে হার মানিতেছিল, প্রত্যেক বস্তু হইতে এক অজর বাস্তবতা তাহাকে আক্রমণ করিতেছিল। সমস্ত যেমন বা প্রহেলিকাময়! অথচ হায় তাহার কোন বিস্ময় নাই! একদা ভাবিতে চাহিল আমার বন্ধু নাই, কবি নাই, পথপ্রদর্শক নাই। কিন্তু বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হইল না। বিলাসের গলার প্রথমোক্ত আওয়াজ পাইয়া, নগেন আসিয়া বিনীত কণ্ঠে কহিল "আমায় ডাকছেন হুজুর"

বাতিদানের আলো পড়িয়া নগেনকে ভীতিপ্রদ লাগিতেছিল, বস্তুত একধরনের লোক আছে যাহাদের অন্ধকারেই ভাল লাগে, সহ্য করা যায় যেমন হাটুরিয়ারা হাট সারিয়া ঘনরাত্রে প্রত্যাবর্ত্তন করে। নগেন তখনও দণ্ডায়মান, নিশ্চয়ই অস্বস্তিতে এক কাঁধের তোয়ালে অন্য কাঁধে রাখিল; কেন না প্রভুর দৃষ্টি তেমনই এখনও শূন্য; সহসা ভৃত্য দেখিল যে, বিলাস হস্তধৃত কলম দিয়া বাতিদানের কলমে আঘাত করিতেছে ফলে নম্র আওয়াজ খেলিয়া উঠিল, তবু বিলাসের মুখে মৃদু হাস্য দেখা যায় নাই, হয়ত নগেনের মুখে কূট বিষের প্রতিক্রিয়া সে দেখিতে পাইয়াছিল, সে ঝটিতি বলিয়া উঠিল..."না ডাকিনি" নগেন যেন বাষ্প হইয়া নিশ্চিহ্ন।

এখন বিলাস পত্র লিখিবার কারণে মনোনিবেশ করে, ওমির ফোটোর পাশেই মোহিতদার ফোটো, মনে হইল যে কোন শতাব্দীর আনন্দ সে, মোহিতদা জানিয়াছে—কোন ঝড় জল জানে না...বেশ! পরক্ষণেই চিঠির সূত্র ধরিল।

ওমি ডিয়ার, মনটা আমার তোমার জন্য পাগল হয়ে আসছে, কবে তুমি আর মোহিতদা আসবে? আমার আজকাল বড় একা একা বোধ হয়, যতই সুস্থ হচ্ছি ততই খালি মনে হচ্ছে...জায়গাটা সত্যি বড় নির্জ্জন! ভূষণের বৌর অবস্থা প্রায় শেষ হয়ে আসছে, ফলে লোকজনের বড় অসুবিধে, ওরা এই আছে এই ছুটে ছুটে যাচ্ছে...কি যে করি...

মিয়ানার 'লিলি কটেজে' মনিক চ্যাটার্জ্জি এসেছেন, ভদ্রমহিলা আমাদের গোলাপবাগের বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন, আমাকে দেখেই স্থান ত্যাগ করলেন। নেমন্তন্ন করেছিলুম আসেননি। আশ্চর্য্য নয়! অদ্ভুত নেটিভ। যাক, সব থেকে মন আমার উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে, যে গোলাপ নিয়ে এতদিন কাজ করছিলুম, তাতে কুঁড়ি এসেছে। তোমার থাকার সময় যদি ফুটত আমি ভারী খুসী হতুম কেন না তুমি খুসী হতে! মনে হচ্ছে যেন সমস্ত ছেলেবেলাটা আমার এবার গোলাপ হয়ে ফুটে উঠছে। নিজে যেখানে নিজের সব থেকে বড় সঙ্গী। আজকাল এইসব কারণে আমার নিঃশ্বাস বড় দ্রুত হয়েছে। স্বপ্ন নয় ঘুমের মধ্যে বেশ বুঝতে পারি, জেগে আছি! এক এক সময় মনে হয়, নিমেষেই কোন সৃজনক্ষম নগরে চলে যাই, একটা হোটেলের ঘর ভাড়া নিয়ে ঘুমাই। এ ঘুমটার চেহারা অনেকটা নব্যধারার শিল্পসাধনার এবষ্ট্রাক্ট প্রজ্ঞানের মত সুঠাম!

চন্দ্রমাধববাবু আসেন, বলেন আমি নাকি দুঃখ কি তা জানি না (ঠাকুরের কৃপা) গোলকবাবু আধিভৌতিক দুঃখেই কাৎ...। আমার গোলকবাবুকে সত্যি বেশ লাগে, এই বয়সেও লোকটা লড়তে রাজী, মনে হয় যদি একটা বেতো ঘোড়া একটা হিরট ব্লেডের ভোঁতা তরোয়াল এবং পুরাতন যে কোন সেঞ্চুরী ওকে দেওয়া যায়—ও গড্ অউল মাইটি! উনি যে কি ভাবে দেশ জয় করবেন তা ভাবাই যায় না। অদ্ভুত দর্প ভদ্রলোকের। মানুষের মত। আমি খুব ভালবাসি, লোকটি একদিন না এলে মন কেমন করে।

ওমি ডিয়ার কবে আসবে, আজকাল আমার বড় ভয় হয়, এখুনি দরজাটা দেখে চমকে উঠেছিলুম,

সকালে ভূষণের ন্যাংট ছেলেটাকে দেখে মনে হল এক থাপড় দি—কেন না ভয় পেয়েছিলুম...কোথাও দাঁড়াতে পাচ্ছি না।

অজস্র অফুরন্ত ভালবাসা ওমি ডিয়ার!

চিঠি হঠাৎ রাখিয়া বিলাস উঠিয়া পড়িল, হাতে টর্চটি লইয়া বিরাট গোলাপ বাগে আসিয়া চারিদিকে চাহিল, সম্মুখের আকাশ, এমত ধারণা হয় পৃথিবীর অংশ, মাথার উপর যে আকাশ সে দিকে তাকাইতে বিলাসের দৈহিক কষ্ট (?)

সে দিকে সে চাহিতে আদতে ভরসা পায় না, সহসা মনে হইল বহু ঊর্দ্ধের আকাশ, মসৃণ পেলব কোমল কুহকের ছদ্মবেশে সমস্ত গোলাপ বাগে, অদ্বিতীয় রম্য স্থান জ্ঞানে নামিয়া আসিয়া আপনার দেহ এলাইয়া দিয়াছে, এতদ্দর্শনে বিলাস গতিহীন অনড়। আপনার দেহ মনে হইল, গুরু কোন ভারে জগদ্দল, এরূপ আর একবার হইয়াছিল যখন বহুদিন পূর্বে ভূমিতে পতিত চেট্রিকে সে দেখে! কিছু কাল পরে বিলাস যেমন বা এই বিচিত্র বর্ত্তমানতাকে প্রশ্ন করিতে চাহিল 'এ কি তুমি!' আবার মনে হইল হায় যদি একটি বক্র তুলির টান পাইতাম যাহার উপরে মাথা রাখিয়া কাল অতিবাহিত হইত। এখন সে টর্চ জ্বালিয়া সমস্ত গোলাপ ক্ষেত্রের উপর বুলাইয়া দিল। আলো আর নাই, সে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া কি যেন অনুভব করিতে পারে! ধন্য সে, যে আকাশ হইতে তাহার জন্য নিঃসঙ্গতা নামিয়া আসিয়াছে। কিন্তু এই সমগ্র সত্যটি একটি বুক চেরা ভাব লইয়াই উদয় হইয়াছিল—কোন বাক্যরূপে আসে নাই—। তথাপি বিলাস অগ্রসর হইল যেখানে এখন গোলাপ ইদানীং কুঁড়ি এবং মুখ তুলিয়া চাহিল যেখানে, মনিক কয়েকদিন পূর্ব্বে সকালে দেখা দিয়াছিল।

ইতিমধ্যে কে একজন আসিয়া হন্তদন্ত হইয়া দাঁড়াইল, বিলাস কহিল "কে"

"আমি ভূষণ"

"কি খবর"

"আমরা কাঙাল মানুষ বুঝেতে লারছি—তার কোন খোড় নাই...নাড়ী কেউ বুঝে না..."

"আঃ" অত্যধিক মনুষ্যোচিত ঘৃণায় বলিয়া উঠিল "তা সে খবর এখানে কেন..." একথা সে এমতভাবে কহিল যেন বা বাগানের শুদ্ধতা নষ্ট হইয়াছে।

ভূষণ পশুর মত কাঁদিয়া উঠিতে গিয়া কহিল "হুজুর যদি"

বিলাস আত্মস্থ হয়, একবার আপনার গোলাপ বাগ দেখিল, এবং শোনা গেল যে সে বলিল "চল"

ইতর জাতির গ্রাম যেমন হয়, বিলাস আসিয়া সম্মুখের খোলা জায়গাতে দাঁড়াতে, আর আর যাহারা ছিল তাহারা কাঁদিবার জন্য প্রস্তুত হইল, অশান্ত হা-হুতাশের শব্দ যেমন বা তাহারা হাতের মুঠায় রাখিয়াছে, বিলাস দাওয়ায় উঠিতেই লক্ষ্য করিল ভূষণের বোন সত্বর, কঙ্কালসার অচেতন পদার্থ বৌটির মাথায় খুব পরিপাটি করিয়া ঘোমটা টানিয়া দিল। বিলাস আর সহ্য করিতে পারিতেছিল না, একারণে সে পিছনে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল; যেখানে তাহার আপনার সুদীর্ঘ ছায়া অল্পবিস্তর অস্থির।

বিলাস আসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া ভূষণের বৌর নাড়ী দেখিতে লাগিল, এখানে বলা উচিত বিলাস তাহার গাত্রে হস্ত প্রদান করিতেই যে শৈত্য অনুভব করে, সে শীতলতায় তাহার, বিলাসের, ব্যবহারিক জ্ঞান পর্য্যন্ত মিলাইয়া গিয়াছিল। বিলাস ধীরে হাত রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, আশ্চর্য্য কেহ তাহার পার্থিব নিঃশ্বাসটি শুনিতে পায় নাই। সে ডাকিল—"ভূষণ"

"হুজুর"

ভূষণের হাতে টর্চ দিয়া চলিতে আরম্ভ করিল, পৃথিবীর কোন দিকে চাহিয়া ভূষণকে, সেই ভয়ঙ্কর খবর দিবে? অনেকবার সে গতি শিথিল করিয়াছে অনেকবার নূতন করিয়া নিঃশ্বাস লইয়াছে, একদা মনে হইল, আসফাকের কথা, যে সকল সময় আপনার নাসিকা গহ্বরের কাছে হাত রাখিয়া ঠিক লইত যে নিঃশ্বাস পড়িতেছে কি না। এই ব্যক্তিই তাহাকে বলে, এই ভয়ঙ্কর খবর দেওয়ার জন্য মানুষে কিছু করে নাই—ইহার উচিত স্থান স্টেজ ব্যতীত অন্যত্র হইতে এ খবর ঘোষণা করা বাতুলতা।

বিলাস ক্রমে আপনার গোলাপ বাগে আসিল এবং অবলীলাক্রমে এখানেই স্থিতিবান হইয়া কহিল..."ওদের কাঁদতে বল, তোরা ব্যবস্থা কর" নিজের কানে এ-হেন ভাষায় সহজ কথা বলা বড় হাস্যকর লাগিল। বিলাস একথা আর মনে করিতে না চাহিয়া ঝটিতি তাহার হস্ত হইতে টর্চটি লইয়া,

বাগানের মধ্যে চলিয়া গেল, হাত ধোয়ার কথা একবারও মনে উদয় হইল না।

একটি গোলাপ গাছে টর্চ পড়িতেই আশ্চর্য্য হইয়া একটি ফুটন্ত গোলাপের মধ্যে অমোঘ দুর্ব্বিনীত জোয়ার খেলা করিতেছে, কম্পমান একটি পাপড়ি রমণসুখ অনুভবের পর যোড়শী যেমত নিশ্চিন্ত ভাবে এলাইয়া পড়ে তেমনই ক্রমে ধীরে এলাইয়া পড়িল; বিলাসের উল্লাস অথবা বেদনার ধ্বনি, কি জানি কোনটি—শ্রুত হইল। এ ধ্বনিকে পাপিয়ার আহ্বান ডাক প্রতিধ্বনিত করে, যে আহ্বানকে বহন করিয়াছিল উৎসারিত মর্ম্মর, যে মর্ম্মরকে পথ দান করিয়াছিল অযুত স্তব্ধতা। বিলাস আচম্বিতে রুদ্ধশ্বাসে এই গোলাপের নিকটে ছুটিয়া আসিয়া তাহার কণ্টকময় দণ্ড সর্ব্ব শক্তি দিয়া ধরিয়াছিল। একারণে, এক্ষণে, তাহার কোনরূপ বেদনাই অনুভূত হয় নাই; কেন না সে আশ্রয় চাহিয়াছিল, আশ্চর্য্য এতদিন পর সুস্থতার পর সে অদ্ভুত ভাবে কাশিল।

অনেকক্ষণ গোলাপের কাছেই, ত্রিগুণাত্মিক ক্রিয়ার ভুবনমোহিনী মায়ার মধ্যে সে মহা আনন্দে সাঁতার দিয়া বেড়াইতেছে, এখন রাত্র, রাত্র তাহার নৈসর্গিক বিহ্বলতা লইয়া দূর দুরান্ত তাহার চির রহস্য লইয়া জীবন, জীবন তাহার চির পৌত্তলিকতা লইয়া এ সন্তরণলীলা দেখিয়াছিল। বিলাস এই প্রথম সকালের আলোর জন্য মরিয়া অস্থির ব্যাকুল; এ উন্মত্ততা তাহাকে রমণী করিয়া তুলিল। 'কখন আলো দেখা দিবে' বালকের মত কণ্ঠে সে নিশ্চিত বলিয়াছিল।

কখন যে সে ইতিমধ্যে নগেনকে ডাকিয়াছিল তাহা সে নিজেই অবগত নহে, নগেন প্রুনিং নাইফটি আনিল। ফুলটি কাটিয়া ঘরে লইয়া আসিতেই আলোয় দেখিল যে আপনার হস্তের তালুর কয়েকস্থানে রক্ত বিন্দু, এই প্রথম নিশ্চয়ই সে রক্ত-কে গর্ব্বভরে তথা ভ্রূক্ষেপ না করিয়া মানুষের মতই দেখিয়াছিল, কারণ তাহার হস্তে তখন আর এক লালের প্রতিমা ছিল।

রূপার পাত্রে এখন সে গোলাপ, যে গোলাপের জন্য বিলাস আপনার মধ্যে দুঃখ সৃষ্টি করিয়াছিল (অবশ্য এ দুঃখের মধ্যে বিগত শতাব্দীর পূর্ব্বেকার রোমান্টিক কবিদের চোরা-অহঙ্কার ছিল; সে, বিলাস, ছিল না) সে গোলাপ সম্মুখেই ক্ষুদ্র একটি শূন্যতাকে বন্দী করিয়া নির্ব্বিকার, বৃত্তাকারে কখন বা স্রোতের মত ইহার পাশে কাহারা আসে যায়, পকেটে হাত দিয়া সুন্দর রূপবান বিলাস দাঁড়াইয়া কতবার সে জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়াছে, মনে হইয়াছে যে কোন মুহূর্ত্তেই ভোর হইতে পারে। এবং নানান দৃষ্টিকোণ হইতে এ গোলাপের রক্তিমতা অনুধাবন করিয়াছে, কখনও দূরে গিয়াছে কখনও নিকটে আসিয়াছে; সে-শূন্যতাকে ভাবিতে চাহিয়াছে, সে গোলকবাবুর প্রস্থান কালের অন্ধকার উদ্ভাসিত করা রক্তিমতাকে ভাবিতে চাহিয়াছে, চন্দ্রমাধববাবুর কথায় উষ্ণতাকে কল্পনা করিয়াছে। বহুকাল পরে আত্মারামের ছোট রাজস্থানী আধা মৈথিলী পদ যেন তাহার মনে পড়িল "কিথে লু মেহেরো আব জব ঝড় পড়িয়া" হে লু তুমি কোথায় মেঘ যখন খর ধারা বরষণ করে? তখন লু উত্তর দেয় আমি বালিকা বধূর চিরবিরহী বুকে বাসা বাঁধি দেখ না তাহার পীন ডগমগ মদমত্ত স্তনযুগ কি দারুণ রক্তিম। বিলাস অনেকদিন পর মৃদু হাস্য করিল । এবং এই সময় সে গোলাপের অতীব নিকটে মুখ লইয়া গিয়াছিল।

তাহার মুখ তেমনি ভাবে সেখানে স্থির, বিশাল চক্ষুর্দ্বয় যেন বা অধিক আয়ত হইয়া উঠিল। সে অনুচ্চ ম্যানটেল পিসের কিনারে হস্ত দ্বারা ধরিয়া আছে, তাহার চক্ষুতারকা স্থির, ক্রমে কখন যে তাহার কান প্রায় গোলাপের মুখোমুখি হয় তাহা তাহার অজ্ঞাত; তাহার চক্ষুর তারকাকে কেহ যেমত আকর্ষণ করিল...হলের এক কোণে এবং বিপরীত কোণে বিভিন্ন কোণে তাহা ছোটাছুটি করিয়া ফিরিল। মহা বেদনায়, কিছু তাহাকে যেমন দংশন করিয়াছে—মহা যন্ত্রণায় বলিয়া উঠিল "হা ভগবান" কোনরূপে মন্ত্রমুগ্ধ মস্তকটি উঠাইয়া মুখ খানিক ফাঁক করিয়া বিস্ফারিত নেত্রে গোলাপের দিকে তাকাইল, সে স্পষ্ট শুনিল কাহার ক্রন্দনধ্বনি দুরন্ত সমুদ্রের হাওয়ায় ভাসিয়া আসিতেছে। আর বার শুনিল, একি চিত্তবিভ্রম?

পুনরায় শুনিল, অতি ক্লান্ত দুঃখময় ক্ষুব্ধ, আর্ত্ত নিপীড়িত মর্ম্মাহত যে ধ্বনি, বিলাস ধীরে অতীব সন্তর্পণে এ-ক্রন্দনের সহিত আপনার কণ্ঠস্বর মিলাইতেই দুটি স্বর মিলিয়া এক হইল, তাহার কণ্ঠ যেন বা স্ফীত হইয়া উঠিল। মহা আবেগে গোলাপকে ধরিতে গিয়া হাত ফিরাইয়া আনিল, এবং সে নিজে এবং এ কক্ষের সকল কিছু এবং দিকসকল এই মহা করুণ ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়াছিল।

এ কারণে বিলাস সকালের প্রতীক্ষার কথা ভুলিয়াছিল।

সারা রাত্র ব্যাপী বিলাস এ-ক্রন্দন ধ্বনি মধ্যম এবং পঞ্চমে লাগিয়া যখন ভাঙ্গিয়া উঠে তখন বিলাসও তাহার সহিত রোমাঞ্চিত শিহরিয়া উঠে। কখন যে ভোর হইল বিলাস তাহা দেখে নাই; সহসা দেখিল পূর্ব্ব দিককার বারান্দার আরাম কেদারায় ছোট্ট একটু আলো শুইয়া আছে। আরও দেখিল নগেন তাহার প্রাতঃকালীন চায়ের সরঞ্জাম ঠিক করিতেছে। এবং আর কিছুদূরে বাবুর্চিখানার সামনে কতকগুলি লোক পাথর হইয়া আছে। বিলাসের এ-দৃশ্য ভাল লাগে নাই, আজ আর কাহাকেও ভাল লাগিতেছিল না কারণ বিগত রাত্রের অভূতপূর্ব্ব অভিজ্ঞতা তাহাকে অন্য আর লোকে লইয়া গিয়াছিল। তথাপি সত্বর প্রস্তুত হইয়া সে তাহাদের জন্য বারান্দায় আসিল, সমস্ত কথা শুনিয়া কহিল "বেশ তোমরা একজন খেদুড়ীর জঙ্গল যাও...চন্দ্রমাধববাবুর সঙ্গে দেখা করে যেও..." বলিয়া অতি দ্রুত চা পান সারিয়া পুনরায় গোলাপের নিকটে আসিল...।

গোলাপের ক্রন্দন এখন কিছুটা অস্পষ্ট, বিলাস ভাবিল হয়ত এখন দিবালোক এই আলোতে ক্রন্দন সম্ভবত শুকাইয়া যাইতেছে। অথচ জানালা দিয়া দেখিল আলো তেমন নাই; এখন সারা আকাশে মেঘ। অল্প অল্প হিম হাওয়া বহিতেছে।

বৈকাল না হইতে ঘনঘটা করিয়া বর্ষণ সুরু হইল, বিলাস গোলাপটিকে নিকটে রাখিয়া প্রায় আত্মস্থ। দুর্দ্দান্ত ঠাণ্ডা হাওয়া বহিতেছিল, বিলাস তাহার শরীরের জন্য পায়ে কম্বল ঢাকা দিয়া বসিয়াছিল, এমন সময় ভূষণ আসিয়া দাঁড়াইল, মস্তকের টোকা বহিয়া অনর্গল জল পড়িতেছে; বিলাস প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে চাহিল, জানালার নিকট আসিয়া কহিল "কেরোসিন না হলে কাঠ ত ধরবেক না...হুজুর"

বিলাস তৎক্ষণাৎ কহিল "দেখ টিনে...কত আছে...আর..."

ভূষণ ছাদের সিঁড়ির নীচে যেখানে কেরোসিন থাকে...সেখান হইতে ঘুরিয়া আসিয়া কহিল "আদ্‌টিন"

"মাত্র! তাহলে?...আর এক কাজ কর-না গোলকবাবু...উঁহু...তার ত নেই লিলি কটেজ..."

"সেখানে কেউ নেই"

"তাহলে লণ্ঠন থেকে ঢেলে দেখ...আমার টর্চ আছে মোমবাতি আছে"

যখন আর একটু অন্ধকার তখন পুনরায় ভূষণ আসিল "হুজুর ও রাস্তায় অনেকটা ভেঙ্গে গেছে—আমবা কি এই বাগান দিয়ে চলে যাব..."

বিলাস তাহার করজোড়ের দিকে তাকাইয়া একবার দেখিল, এবং তৎক্ষণাৎ তাহার নিকট হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য কহিল "যাও" কেন না এত দুরন্ত আবহাওয়ায় সে ক্রমাগত ক্রন্দন ধ্বনি শুনিতে পাইতেছিল। শুধু ভূষণকে বলিয়াছিল "কোন শব্দ কর না" অর্থাৎ হরিধ্বনি করিও না।

আর কিছুক্ষণ পরে বিলাস দেখিল তাহার জানালা দিয়া তির্য্যকভাবে আলো আসিয়া পড়িয়াছে, এবং এবার তাহার দৃষ্টিতে পড়িল, সেই গোলাপবাগের উপর দিয়া শবযাত্রীরা আসিতেছে, শবযাত্রীদের, পথ কর্দ্দমাক্ত হওয়ার কারণে, পা বেসামাল ভাবে পড়িতেছে, শব সমেত পা-টা কখন অন্যপাশে ঢলিয়া পড়িতেছে, সঙ্গে সঙ্গে অন্য যাত্রীরা গরু তাড়ানর মত শব্দ করিয়া উঠে "হিরে হিরে লে লে সামাল গো"।

এ দৃশ্যে বিলাস অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইল, যেখানে তাহার পার্শ্বস্থিত গোলাপ ফুটিয়াছে; যেখানে গতরাত্রে উর্দ্ধ আকাশকে দেহ এলাইতে দেখিয়াছে যেখানে...অনেক ভ্রমর গুঞ্জন করিয়াছে—তাহা অবশেষে শবযাত্রার একটি সহজ পথ হইল। বিলাস আরও আশ্চর্য্য সহকারে দেখিল শবযাত্রীরা শব লইয়া সেখানেই দাঁড়াইয়া; ইহারই নিকটে একটি ছাতা যাহা নগেন তাহার ভ্রাতৃবধূর মৃত মুখের কিছুটা উপরে ধরিয়াছিল প্রায় তাহারই তলে দাঁড়াইয়া কি যেন কথাবার্ত্তা পরামর্শ করিতেছে। হঠাৎ উহাদের কথাবার্ত্তার খানিক মন্ত্রমুগ্ধ বিলাসের কানে ভাসিয়া আসিল "তাহলে মাগী...ভূত হয়ে ঘুরবে...আত্মা বটে সামগ্রী...উয়ার পাট পর্য্যায় আছে...বল না শালা হুজুরকে..."

একবার কাঠ, একবার কেরোসিন উপরন্তু গোলাপবাগের মধ্য দিয়া শবযাত্রা, তাহার শান্তি ভঙ্গ নিশ্চয়ই এবং নবতম একাগ্রতা অনুধাবনকে ব্যাহত করে, বিরক্ত হইয়া সে জানালার কাছে আসিতেই বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিয়া বজ্রাঘাত হইল, চকিতে নগেনের ছাতা সরিয়া যাইতেই...ক্রমাগত বৃষ্টিধৌত একটি মুখ বীভৎস হইয়া দেখা দিল। বিলাস পুনরায় শুনিল "আত্মা বটে সামগ্রী" (হায় স্ত্রীলোকটির

আত্মা ছিল!)

তিন চারজন এই ঠাণ্ডা হাওয়া ও বৃষ্টিতে কাঁপিতে লাগিল, হাতগুলি চুপসাইয়া গিয়াছে, কহিল "বামুন পাওয়া গেল না, আমাদের বামুন শিখরভূমে, এ বামুন যে ছিল এখন নেপাল তাঁতির ছেলের বিয়ে গেছে ফাল্গুনমাস...আত্মার..."

"আমি কি করবো"

"আত্মার"

এই অদ্ভুত কথাটা বিলাস ত্বরিতে থামাইয়া দিতে চাহিল, কেন না এই বাক্যের পিছনে বিদ্যুতের আলোক ছিল। এবং খুব শক্ত কণ্ঠে কহিল "সবাই চলে গেলে বিকালে রাঁধবার..."

"আজ্ঞে চাঁপার বাবা সব কচ্ছে"

"হুজুর মা বাপ" যে একথা বলে সে হয় ভূষণের শ্বশুর "জানি হুজুরের কষ্ট হবেক, হুজুরের শরীল গতিক ভাল লয়, হুজুর আত্মার সদ্গতি...পিণ্ডদান করা মুখাগ্নি..."

বিলাস গরম জামা কাপড়ের মধ্যে চমকাইয়া উঠিল।

"আমাদের সঙ্গে পাঁজি আছে—এই আমার লাতি (অধুনা প্রায় কোপনী মত করিয়া কাপড় পরা দুই হাত বুককে বেড় করত কাঁধে উঠিয়া গিয়াছে) মুখাগ্নি করবে আমরা লেখা পড়া জানি না...বাবু" বলিয়া মেঘগর্জ্জনকে স্তম্ভিত করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, বিলাস দৃষ্টি তুলিতে পুনরায় দেখিল, নগেনের ক্রমাগত চেষ্টা সত্ত্বেও মুখখানির উপর হইতে ছাতা সরিয়া যায়, বৃষ্টি ভেজা ভারী চুলগুলি ফণার ন্যায় ফুঁসিয়া উঠিতেছে। এবং বিদ্যুতে উদ্ভাসিত জীর্ণ তাপিত মুখমণ্ডল তাহাকে যেমন বা আর এক আহ্বান করে। তবু বিলাস কহিল..."আমি ব্রাহ্মণ নই জান ত..."

"আপনি শুধু পড়ে দেবেন বাবু, হুজুর আত্মা..."

গোলাপের ক্রন্দন ছাড়িয়া, বিলাস ম্যাকিনটসটি তুলিয়া লইল, মাথায় টুপি পরিল ছাতা লইল! নিজের মনেই বলিল "ওখানে গিয়ে জুতো খুলব"

ঝিনকীর ঝরণা এখন প্রমত্ত। এই ঝরণার উত্তরে যে নাবাল জমি সেখানেই দিশাড়ার শ্মশানভূমি। পাশেই অশ্বত্থ ও বেল এক সঙ্গেই উঠিয়াছে। বিলাস এখানে দাঁড়াইয়া প্রথমেই সমস্ত দেহ সূক্ষ্মভাবে অনুভব করে যে, এতটুকু ভিজে নাই। ভূষণের ছেলে একটি গামছা দিয়া সযত্নে কঙ্কালসার মুখখানিকে মুছাইয়া দিতেছিল, এবং ঠিক এ সময়ই মনে হইল, ওমি যদি শোনে, আর ভাবিতে পারিল না, নিজেকে খানিক সাহস দিল, যাক পোর্ট ওয়াইন খাব তাহলেই...কিন্তু আশ্চর্য্য এতক্ষণে একবারও তাহার গোলাপের কথা মনে হয় নাই। সহসা তাহার গোলাপের কথা মনে হইল, এ কারণে যে শবযাত্রীরা কেমন একটানা স্বরে দেহেলা ধরণের গান গাহিতেছিল

"পরান ময়নারে এ বাসা ছেইড়ে
কোথাকে যাও বারেবার"

বিলাস আপনার চেয়ারে আশ্রয় লইয়াছিল, সে আপনাকে শক্ত করিয়া গৃহস্থিত গোলাপের দিকে মন রাখিয়াছিল। সম্মুখের ইহজগৎ বিদ্যুতে বীভৎস ভাবে পরিদৃশ্যমান হইতেছিল, উপরে ভয়ঙ্কর মেঘগর্জ্জন। নিম্নে ছাতার তলে রমণীর শবদেহ। বিলাস কোন দিকে চাহিবে ভাবিয়া পাইল না, একবার মনে হইল চক্ষু বুজাইলে বোধহয় ভাল হয়।

অনেক তালপাতা কাটিয়া আনিয়া কাঠ ঢাকা দেওয়া হইয়াছে, সেগুলির উপর তুমুল বৃষ্টিধারা অদ্ভুত শব্দ সৃষ্টি করিতেছে। এদিকে দুই চারিজন অসম্ভব যত্নে কাঠ সাজাইতে ব্যস্ত ছিল, এখন চিতা নির্ম্মাণ হইয়াছে। হরিধ্বনি করিয়া ভূষণের স্ত্রীকে চিতায় শায়িত করা হইল। ভূষণের শ্বশুর বিলাসকে কহিল "আসুন হুজুর"

যন্ত্রচালিতের মত বিলাস জুতা খুলিতে যাইবে তৎক্ষণাৎ একজন আসিয়া বিলাসের জুতা খুলিয়া দিল—, বিলাসের জন্য এখান হইতে তালপত্র পাতা ছিল, বিলাস তাহার উপর দিয়া যাইবে। বিলাস তখনও চলিতে আরম্ভ করে নাই শুধু অবাক হইয়া ভূষণের মত স্ত্রী, যে ইদানীং চিতায় শায়িত তাহাকে

দেখিতেছিল; বিজুরী রেখার আলোক, তাহাকে চির হতভাগিনীকে, শুধু রাজরাজেশ্বরী নহে অপূর্ব্ব সুন্দরী বলিয়া মনে হইতেছিল, সে যেন বা ওমি হইতে গোলাপবাগের বেড়ার ধারে দেখা মহিলা হইতে অপূর্ব্ব রূপসী। একদা বিলাসের মনে হইল চিতায় শুইলে মানুষকে কত সুন্দর দেখায় (যেহেতু তখন আকাশের দিকে মুখ করিয়া শয়ান দেওয়া হয় হয়ত)।

পাঁজির নির্দ্দিষ্ট পাতার চিহ্ন হিসাবে একটি পলিতা দিয়া রাখা হইয়াছিল পাঁজি ভেজে নাই তবে বড় হিম, যে লোকটি জুতা খুলিয়া দিয়াছিল তাহার দিকে বিলাস মোজা খুলিয়া ফেলিবার নিমিত্তে পা অল্প তুলিয়া ধরিল। ভূষণ বলিল, "গরম মোজা ত শুদ্ধ না কি গো...হুজুর খুলবেন না" এ কথার শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিলাস তালপাতার উপর পা দিতেই পাতা-দলিত অদ্ভুত অশরীরী এ শব্দ হয়—শ্রবণে বিলাস বিমূঢ় হইয়া স্থির তাহার মনে হইয়াছিল সে যেমন বা পড়িয়া যাইতেছে। তাহার এরূপ বিকার দর্শনে সকলেই একসঙ্গে সাহস দিল, বিলাস তখনও পদক্ষেপ করে নাই এ কারণ যে বিদ্যুৎ বিভায় বীভৎস রূপ পরিগ্রহ করিয়া পৃথিবী তাহার সমক্ষে দৃশ্যমান হয়। এ দুরন্ত হাওয়া হইতে কোন মতে একটি নিঃশ্বাস লইয়া সে অগ্রসর হইল।

"লে লে বস না শালা...লে ধর পিণ্ডি ধর শালা...বাবুর কত কষ্ট...লিন বাবু"

বিলাসের মন শূন্য হইয়া গিয়াছিল, কেন না তাহার অত্যন্ত প্রিয় যশস্বিনী পৃথিবী ইদানীং অপ্রকৃতিস্থ, অদূরে মৃত দেহ এবং টর্চের আলোকে নিদারুণ শ্লোক। ভূষণের বৌকে সম্মুখে রাখিয়া সমস্ত লোকচরাচর যেন একটি পলের মধ্যে মিলাইয়া গেল, তাহার বিশ্বাস হইল সেও অনেকদিন মরিয়াছে—অনেকদিন তাহার আত্মা খেইহারা ছিল। সে বন্ধুহীন। আজ তার পিণ্ড দান হইতেছে। কোন এক ভয়ে রূপবান বিলাস পাংশুবর্ণ, কে যেন ডাক ছাড়িয়া বলিয়া উঠিতেছে "মা জননী মা গো, জীবন হারাবার আগে কতবার মানুষ মরবে, বাঁচাও বাঁচাও।" পাঠ শেষ হয়।

আমি...লণ্ঠনের কেরোসিনটাও ঢাল ভূষণ, টর্চটা থাক"

"হুজুর—"

"আমি চলে যাব—"

"সাপ টাপ—"

"আঃ—থাক"

বিলাস ঘুরিয়া দেখিল না তালপত্রের ছাউনি এই বিচিত্র চিতা কি জ্বলিয়া উঠিয়াছে। কোন ক্রমে বৃষ্টির সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে সে আপনার গৃহে ফিরিল—। মনে হইয়াছিল গভীর রাত্র, এবং কখন যে গোলাপের পাশে আপনার শূন্য মনকে বিচিত্র অভিজ্ঞতার অধিকারী করিবার জন্য দাঁড়াইয়াছিল তাহা সঠিক স্মরণ নাই। এখন সে আর সেই সমুদ্র বায়ু দ্বারা আনীত ক্রন্দন ধ্বনি শুনিতে পায় নাই; হয়ত কিছুকাল পূর্ব্বেই প্রবল দূরদৃষ্ট মুহূর্ত্তের মধ্যে সে অচেতন হইয়া আছে, যেখানে সে দাঁড়াইয়া আপনাকে, আপনার সকল কিছুকে নির্ম্মম ভাবে পরিত্যাগ করিয়াছে। এরূপ মনে হয় তাহার কোন বোধশক্তি নাই—ভাল মন্দ নাই। তথাপি সে, একাগ্রভাবে এ কক্ষে প্রতিটি বস্তু অবলোকন করিল, যে বস্তু সকলের অজর বাস্তবতা তাহাকে রুগ্ন করে, সে দরজা দেখিল, পুনরায় গোলাপের নিকটে আপনার চিত্তকে লইয়া গেল।

কখন মনে হয় সে সঙ্গীত আসিতেছে কখন বা মনে হয় আশ্চর্য মিথ্যা! সে, বিলাস, দেখিল পা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগিতেছে, এইটুকু বোধকে সুচতুর বিলাস আশ্রয় করিল; দ্রুত আপনকার শরীরের যত্ন লইতে সে ব্যগ্র হয়। সে বুঝিল সে ক্ষুধার্ত্ত! এই সূত্রেই সে মনস্থ করে কডলিভার আর এক চামচ বেশী করিয়া সেবন করিবে।

এখন সে এই হলে আসিয়া একটু পোর্ট ঢালিয়া অল্প চুমুক দিতে কেমন যেন সাহস ফিরিয়া পাইল, চকিতে চেট্টির লিখিত এপিটাপের কথা স্মরণে আসে, যে স্মরণ এতকাল রৌদ্র আর আশা লইয়া দিনক্ষয় করিয়াছে—এবং এমত সে ভাব করিল যেন এখনি সে সেই এপিটাপ খুঁজিয়া বাহির করিবে, এবং এই মুহূর্ত্তে মেঘগর্জ্জন শোনা যায়, আর তাহারই শেষে আবার সেই ধীর মন্থর মর্ম্মান্তিক ক্রন্দন

ধ্বনি যাহা গোলাপের অন্তর হইতে—গোলাপ ত স্বল্পায়ু মানুষের অনন্ত সুপ্তি—এই সুপ্তি হইতে, স্থানসমূহকে আচ্ছন্ন করে। বিলাস কোথায় যেন অন্তর্দ্ধান করিয়াছিল।

এখন দরজায় করাঘাত পড়িল, বিলাস যেমন চোখে প্রথম ক্রন্দন ধ্বনি শুনে, তেমনই আশ্চর্য্য হইয়া হয়ত বিরক্ত হইয়া দ্বারে করাঘাত শুনিল, চাঁপার বাবা ত চলিয়া গিয়াছে তবে শ্মশানযাত্রী? পুনরায় করাঘাত। বিলাস অত্যন্ত বিরক্তি সহকারে দরজা খুলিতেই, দূরস্থিত আলো, ছবির কাঁচে লাগিয়া আলোকিত করিয়াছে দেখিল, আশ্চর্য্য একটি চক্ষু তাহারই আশে, শিকড়াকৃতি কেশরাশি, ক্রমাগত সম্ভবত বৃষ্টিজল গড়াইয়া পড়িতেছে, যন্ত্রচালিতের মতই দরজা মেলিয়া ধরিল, এবং স্পষ্ট দেখিল, সুন্দর একটি মুখমণ্ডল, সুদীর্ঘ পক্ষ্মযুক্ত পদ্ম-পলাশ লোচন, চুলগুলি ঝুরি ঝুরি হইয়া নামিয়াছে এবং ক্রমাগত জলধারা, আর যে মেজেতে পড়িয়া জলবিন্দুর শব্দ হইতেছে। সম্মুখের রমণীর মুখখানি অল্প অল্প আন্দোলিত।

বিলাস, নিশ্চিত ইহার জন্য প্রস্তুত ছিল না।

"আমি এলাম"

বিলাস এখনও তাহাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইতে পারে নাই, এ কারণ যে দূর কোন ঐতিহাসিক প্রাসাদের মধ্যে সে আশ্রয় লাভ করে নাই।

রমণী কহিলেন "চিনতে পারছেন না"

বিলাস এমত জড় অবস্থাতেও আপনার মস্তক হেলাইয়া সায় দিল। পরক্ষণে সে সংজ্ঞা ফিরিয়া পাইয়া অসম্ভব আপনার করা কণ্ঠে কহিল "আরে আসুন আসুন...বেচারী আপনি...ঠিক আছে...চলে আসুন কার্পেট আঃ...আর দেরী নয়..." মনে হইল সে যেন বা ওমির সঙ্গে কথা কহিতেছে।

"সত্যি আমায় চিনতে পেরেছেন..." ঘরের চারিদিক রমণী শিশুর ন্যায় মাথা দুলাইয়া দেখিতে লাগিলেন।

"নিশ্চয়...কথা পরে হবে...এখন...কাপড় না বদলালে আপনি ত..."

"কিছু নয় কাপড়টা নিঙড়ে নিয়ে বসে থাকব, বৃষ্টি..."

"তা হয় না...আমার কাপড় ত নেই...সবই" এইটুকু মাত্র বলিয়া বিলাস সহসা গম্ভীর হইয়া উঠিল, এসব কথাবার্ত্তা বলিতে তাহার কেমন লজ্জা হইল, প্রথমত ভদ্রমহিলা, অথবা প্রথমত সে ভদ্রলোক...। তথাপি অত্যন্ত কর্ত্তব্যপরায়ণ কণ্ঠে কহিল "এক কাজ করুন," বলিয়া তৎক্ষণাৎ বাতিদানটি লইয়া পূর্ব্ব দিককার ঘরের দেরাজের উপর রাখিয়া যোগ করিল "পাশে বাথরুম আছে, আপনি অনায়াসে এখানে আপনার মত করে এ ঘর ব্যবহার করতে পারবেন" এবং কক্ষ পরিত্যাগ কালে মুখ না ফিরাইয়া কহিল "সত্যিই আমি বড় লজ্জিত তবু যা যা আছে আমি দিয়ে যাচ্ছি—"

বিলাস অন্ধকার হলে একা বসিয়াছিল, আপনার অজ্ঞাতসারে একবার দেখিল তাঁহার সুন্দর হাত দুটিকে আরাম দিবার মানসে বাতিদানের কাঁচের আশেপাশে নামা উঠা করিতেছে; বিলাস ভাবিল ভদ্রমহিলাকে একটু পোর্ট...না কোন প্রয়োজন নাই, হয়ত গর্হিত হবে।

সে জানালায় দাঁড়াইয়া ঘোর মেঘলিপ্ত আকাশের প্রতি লক্ষ্য করে, জানালার গরাদে তাহার হস্তদ্বয় এবং সেখানেই আপনার মুখমণ্ডল স্পর্শ করত লৌহের শৈত হইতে ঈষৎ আরাম পায়, আজিকার সারাদিনটা তাহার এক ভাবে কাটিয়াছে, যেখানে সে কারণ মাত্র; যে অহঙ্কার যে মনোভাব লইয়া ওমিকে সে চিঠি লিখিতে পারে তাহার এক কণা মাত্র অদ্য মাথাও তুলিতে পারে নাই, পিণ্ডদানের কথা মনে এতাবৎ আসে নাই, শ্লোক পাঠ কালে একদা সে উর্দ্ধের আকাশকে, নিঃসঙ্গতাকে শায়িত স্ত্রীলোকের মধ্যে দেখিয়াছে—সে কথা আরও স্পষ্ট করিয়া মনে হইতেছিল।

বিলাসের এই দুর্য্যোগময়ী রাত্রের অতিথির কথা একবারও মনে হয় নাই, এ কারণে যে সে যে-সমাজে মানুষ সেখানে নারী জাতি সম্পর্কে সাধারণ লজ্জা তথা বিমূঢ়ভাব নাই যদিচ পূর্ণ ধর্মজ্ঞান আছে। বিলাস এখান হইতে কাহার যেন কণ্ঠস্বর শুনিল "আমার আর আলোর প্রয়োজন নেই"

বিলাস অনন্যসাধারণ লীলাময়ী প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করে, তাহার ধারণা এ কণ্ঠস্বর ইদানীং মন্থিত ধরিত্রী হইতে আসে, অন্য কোথাও হইতে বিলাস মহাউৎকণ্ঠায় কিছুকাল কাটাইবার পর একদা তাহার খেয়াল হইল, উহা রমণীর কণ্ঠস্বর। সে তৎক্ষণাৎ ভদ্রভাবে দাঁড়াইয়া অত্যধিক সহবত সহ কহিল "না

থাক আমি” তাহার শেষ কথাটা কক্ষস্থিত অন্ধকারে মিলাইয়া গেল, ইহাতে প্রতীয়মান সে স্বল্পভাষী, কিন্তু সত্যই সে সমস্যায় পড়িয়াছিল, কেন না গৃহে অন্য আলোর ব্যবস্থা আর নাই, ইহা ব্যতীত ভূষণ যে মোমবাতি কোথায় রাখে তাহা জানা ছিল না।

“আপনাকে খুব মুস্কিলে ফেলেছি”

এ কণ্ঠস্বর পুনরায় সাধারণ ভাবে আসিল না, সমুদয় দিক প্রদক্ষিণ করিয়া দূর পাহাড়ের পাশ দিয়া আসিয়া তাহার তন্দ্রায় লাগিল যেখানে দর্শক তথা শ্রোতা ব্যতীত অন্য অস্তিত্ব তাহার ছিল না, এমন কি সে ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণে আপনকার সূক্ষ্ম দেহ দিব্য কম্পন অনুভব করিত যে সে একনিষ্ঠ এরূপ নিশ্চয়তার কোন চিহ্ন সেখানে নাই। এ তন্দ্রা হইতে সে, বিলাস, পুনরায় ঘোর যামিনী আবৃত বসুন্ধরা দর্শন করিল, এবং চকিতে সোজা হইয়া পূর্ব্বদিককার কক্ষ অভিমুখে চাহিল।

আর কোন শব্দ নাই, মুখচোরা লজ্জা সে ঘরে যেমত বা ছাইয়া আছে। ইহার পর কুণ্ঠাবিজড়িত কণ্ঠের স্বর আসিল “কি কুক্ষণে যে শহরে গিয়েছিলুম...গরুর গাড়ীও এগোতে পারলে না...মাইল খানেক পথ...হেঁটে” তাঁহার স্বর মসৃণ আলোর মত হলঘরে ভ্রমণ করিতে লাগিল।

“বৃষ্টি কখন যে থামবে...”

“ব্যস্ত হবেন না”

একটি যুদ্ধ স্থিরনিশ্চয় জয়পরাজয়ের মত সময় গিয়াছে; ভূষণের স্ত্রীর অবশিষ্ট আর কিছু হয়ত আছে, তথাপি বিলাস যেমত বা একই সময়ের মধ্যে স্থিতিলাভ করিয়া আছে, লোকগীতির মত বিলাপমুখর ক্রন্দনধ্বনি তাহাকে জড়ীভূত করিয়াছে, সে এখন গোলাপের নিকটেই, চক্ষু তাহার বন্ধ ছিল। গোলাপের ক্রন্দন ধ্বনির মধ্যে প্রকৃতির উন্মাদনা শোনা যাইতেছিল, ভয়ানক বিপৎকাল সমুপস্থিত, সৃষ্টি নিশ্চয়ই হিম হইতে চলিয়াছে, কক্ষমধ্যে যাহা কিছু দুর্ব্বল তাহা ত্রাহি ত্রাহি করিয়া উঠে, বাহিরের মাঠঘাট লতাবৃক্ষাদি পর্ব্বতমালা উদ্দাম বায়ুর আঘাতে মনে হয় এখনই উড়িয়া যাইবে, মানুষকে একাকী বোধ করাইবার মানসে এ রৌদ্রকর্ম্মা কুটিল আয়োজন। বিলাস তাহার তন্দ্রার মধ্য হইতে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া এ মূর্খতা অবলোকন করে, এ প্রকৃতির কথা পুনরায় যখন চক্ষু বুজাইয়া স্মরণ করিয়াছে তখনই এ-হলঘর আলোয় থৈ থৈ হইল।

গোলাপের পাশ দিয়া দেখিল, পূর্ব্বদিকের দরজার চৌকাঠে রমণী দণ্ডায়মান, হস্তে বাতিদান ছিল, তাহার অজস্র চুলগুলি দুই পাশ বহিয়া নামিয়া গিয়াছে। এ এক আধুনিক চিত্র। বিলাস তাহাদের রীতি অনুযায়ী সচেতন হইয়া সসম্ভ্রমে অভিবাদন করা থাক সে গ্রাম্য চোখে সবিস্ময়ে চাহিয়া ছিল; তাহার, বিলাসের, দেহে শবযাত্রার ক্লান্তি ছিল, গোলাপের আশ্চর্য্য ছিল।

রমণীর চিত্রের ন্যায় রূপ তাহাকে বিমোহিত করে। কেন কি কারণে সহসা তাহার বোধ হইল, বাহিরে যিনি ভয়ঙ্কর সংহার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ক্রমাগত বজ্রাঘাত হানিতেছে ইদানীং বাতিদান লইয়া দরজায় প্রতীয়মান। অদ্যকার ঘোর প্রকৃতি আর এক প্রকৃতিকে এখানে আনিয়াছে। দরজার চৌকাঠ হইতে তিনি কহিলেন “যদি এ ঘরে আসি”

“নিশ্চয়”

টেবিলের উপর বাতিদান রাখিয়া রমণী বসিলেন, পরনে এখন ওমির শুদ্ধ কাপড়, যে কাপড় পরিয়া ওমি ঁকাল ভৈরব দর্শন করিতে যায়; রমণীর প্রতি বিলাসের অসম্ভব শ্রদ্ধা আসিল, এবং আপনার হাতখানি বক্ষে ও কপালে স্পর্শ করিয়াছিল।

রমণী মৃদু হাস্য করিলেন। “আপনার মনে পড়ে যেদিন আমি...প্রথম বেড়ার ধারে...”

বিলাস এখনও গোলাপের নিকটেই, সে কোন প্রকারে উত্তর করিল “হ্যাঁ হ্যাঁ” তাহার উত্তর ভদ্রমহিলাকে সে ক্ষুব্ধ করিয়াছে তাহা সে বুঝিল, কেন না রমণী আপনার গর্ব্বিত মুখখানি তুলিয়া তাহাকে দেখিয়াছিল। সে ত্বরিতে আপনাকে সামলাইবার জন্য কহিল “আমার মনটা শ্মশানে পড়ে আছে...ভূষণ আমার চাকর...”

তাহার কথা শেষ হইতে না দিয়া কহিলেন “মনে পড়ে সেদিন গোলাপ-বাগানের বেড়ার ধারে” এই

উক্তিতে এইরূপ মনে হইল, বিলাসকে তিনি ক্লান্ত দেখিতে চাহেন না, অথবা 'শ্মশান' শব্দটি তাঁহার খুব প্রীতিপ্রদ নহে।

"ও আপনি মনিক চ্যাটার্জ্জি" বলিয়া বিলাস তাঁহার সুন্দর কপালের দিকে লক্ষ্য করিল। এ-কপালে একটি তারা আসিয়া দেখা দিতে পারে।

মনিক বিলাসের সম্বিৎ লাভে অত্যন্ত আমোদ পাইলেন এবং ভদ্রতা করিয়া কহিলেন "খুব বিরক্ত করছি আপনাকে, আপনি সত্যিই যথেষ্ট ক্লান্ত..."

"ও ডিয়ার না" এরূপ ধরণের সম্বোধন তাহার ওমির সহিত করিয়া অভ্যাস, ফলে সে সত্যই লজ্জিত হয় এবং ভুল সংশোধনের নিমিত্ত কহিল "অত্যন্ত দুঃখিত, আপনি..." বলিয়া সে যে কি বলিবে তাহা ভাবিয়া পাইল না, তাহার জড়ীভূত তন্দ্রা উধাও, এবং সত্বর আপনকার ইদানীং অভিজ্ঞতার কথা বলিয়া চলিল "আমার মন বড় এলোমেলো হয়ে আছে জানেন, আজকে মানে গতকাল রাত্রে যখন—আপনার আমার কথা..."

"খুব ভাল লাগছে...তবে শ্মশান শুনলে বড় ভয়"

"আমি গোলাপের কথা...বলব"

"আঃ গোলাপ..."

"Rose is a cure."

"তাই না?"

এখন বিলাসের দৃষ্টি তাহার, মনিকের, সুন্দর সুলক্ষণা কপাল হইতে ভ্রূ-যুগলের বেড়া আপনার অজ্ঞাতসারে পার হইয়া কালো দুটি চোখের উপর থামিল, তাহার কণ্ঠস্বরও থামিয়া ছিল, মনিকের চোখের তারা ঈষৎ চঞ্চল হইতেই বিলাস অনর্গল বলিয়া চলিল, এখন তাহার স্বর নামিয়াছে এবং ক্রমে ক্রমে সে কহিল "গতকাল সেই গোলাপ ফুটল, আনন্দে আমি এমন হয়েছি...দেখুন" বলিয়া আপনার হাত মেলিয়া ধরিল, মনিক কিন্তু সে হাতের দিকে চাহিল না, তখনও সে বিলাসের মুখের দিকে অনিমেষে চাহিয়া আছে...বিলাস আরবার অনুরোধ করিল "দেখুন হাত" এবং পরক্ষণেই হাত সরাইয়া ইঙ্গিত করিল এই সেই গোলাপ, যে লাল চেয়েছিলুম সে লাল হয়েছে কিনা তা আমার দেখা হয়নি কেন জানেন..."

মনিক শিশু হরিণের মত তাহার দিকে তখনও চাহিয়া আছেন।

"ও ডিয়ার আমার কথা..." এই কথার 'ডিয়ার' শব্দটি বিলাসের আপনার কানে যায় নাই।

মনিকের কণ্ঠস্বর ছিল না, তিনি শুধুমাত্র মুখখানি আন্দোলিত করত এ কথা প্রকাশ করিলেন যে তিনি শুনিতেছেন।

"যখন আনলুম খুব আশ্চর্য্য হয়ে দেখেছিলুম, হঠাৎ শুনলুম এর মধ্যে কান্নার ধ্বনি..."

এ কথা শ্রবণমাত্রই মনিক একবার সূক্ষ্ম নিমেষেই স্ফীত হইয়া উঠিলেন, তাঁহার সোনার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, তিনি চেয়ার হইতে আচম্বিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন "তাই..."

"এ কান্নার ধ্বনি মনে হয় বহুদূর কোন দেশের সমুদ্রের হাওয়ায় করে আসছে"

"ও না আমাকে পাগল করবেন না..."

"সত্যি আপনি শুনবেন..."

"আমার বড় ভয় করছে, আমার বড় ভয় করছে"

"ভয় কি, আমি ত আছি"

চেয়ার ত্যাগ করিয়া এক পা অগ্রসর হইয়া থমকিয়া স্থির, নিশ্চয়ই তাঁহার মনে হইয়াছিল যেন কোন এক অন্য দেশে, বড় আদরের চিরপরিচিত রাত্রিদিন ফেলিয়া চলিয়া যাইতেছেন। তাঁহার অঞ্চল খসিয়া ধূলায় পড়িয়াছিল। তিনি যেমত বা এইটুকু পথের মধ্যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, নিদ্রার মধ্য হইতে কহিলেন "কোন দিকে যাব—কোন দিকে যাব..." এ জিজ্ঞাসা এ কক্ষের দিকসমূহে বাজিতে লাগিল, যেমন বা মনিক অন্ধ।

বীরের মত বিলাস উত্তর করিল "এই যে—গোলাপ"

রূপার সৌখীন আধারে গোলাপ, অনাদি অনন্ত কালের মধ্যে মানুষের প্রতিভা যথা মনিক ত্রস্ত

অবস্থায় দুটি হাত দুপাশে মেলিয়া, ক্রমে আসিয়া থ, আপনার স্বর্গীয় সুষমাদীপ্ত মুখমণ্ডল, গোলাপের অনতিদূরের শূন্যতার উপর দিয়া বুলাইয়া দিল, আর একবার বুলাইবার সঙ্গে সঙ্গে কি যেন শুনিতে পাইল—হয়ত এসময় গোলাপক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া বিলাস যে ভূষণকে বলিয়াছিল "কাঁদতে বলো" সেই আজ্ঞাটা এখানে ধ্বনিত হয়—মনিক শুনিবামাত্রই সূক্ষ্ম চতুর নর্ত্তকীর মত (কিম্বা বাণবিদ্ধ নিরীহ জীবের মত) নিমেষেই, ঝটিতি, চকিতে গোলাপের নিকট হইতে অনিন্দনীয় ভঙ্গী সহকারে, হলের এক কোণে এক পা মেলাইয়া দিয়া হস্তদ্বয় শেল্ফের নিকটে রাখিয়া, অসম্ভব ভাবে স্থির করিয়া এখন, "আঃ" বলিয়া মহা যন্ত্রণায় মাথা দুলাইতে লাগিল। সেখানে বাতিদানে আলো নাই, আঁধার নাই। এবার মনিক ক্রমে মৎস্যের মত বাঁকিয়া উঠিলেন। এবং সেখান হইতে যে দৃষ্টিতে চাহিলেন তাহাতে সেই পুরাতন উপলব্ধি ছিল, ঝিনুকের বাস্তবতা, বিদ্রোহের রক্তিমতা—তিনি বক্ষের নিকটে হাতের উপর হাত রাখিয়া কহিলেন "আমি শুনেছি আমি শুনেছি" ইহার পর আপনার আঙুলের উপর ভর দিয়া আসিয়াই আপনাকে ঋজু করিয়া দণ্ডায়মানা করিয়া কহিলেন "সেদিন সকালে হায় আমার নিঃশ্বাস পড়েছিল তোমার গোলাপের উপর...গোলাপের উপর..."

রূপবান বিলাস তাঁহার বাক্যে ঘর্ম্মাক্ত হইয়া গেল। শ্লোক উচ্চারণের সময়ের বন্ধন হইতে তাহার যেন মুক্তি হইল। তথাপি মনে হইল, ট্রাজেডীর অভিনেতার মত তাহার পায়ে বুট—সে যেমন বা আরও দশাসই—এ কারণে যে মনিক পালকসদৃশ। কতিপয় অপসরার ভূমিকা একাই গ্রহণ করিয়াছেন, সর্ব্বক্ষণ, এতাবৎ কোরাসের ধরণে সকল কথা প্রকাশ করিয়াছেন। সহসা, আপনিই যেমত বা বিদ্যুৎ, ভয়ঙ্কর ভাবে চমকাইয়া ব্যক্ত করিলেন "আমার মা পাগল ছিলেন আমার মা পাগল ছিলেন"

এই উক্তিতে একদা গোলাপটি দেখিয়া অন্যবার বিলাস জানালা দিয়া অস্থির উন্মাদ লোকচরাচর অবলোকন করে, অনুধাবন করে।

মনিক, এখন, আপনার শুদ্ধ বস্ত্রের দিকে চাহিয়া বৎসহারা গাভী যেমন দিশাহারা তেমনি এক ভাবকে আপনার সুদীর্ঘ কেশরাশিতে যাহা এখন শীতল—হাত দিয়া শান্ত করিতে করিতে কহিলেন "আর নয়... আর নয়...আমি বাড়ী যাব বাড়ী যাব" বলিয়াই ঝটিতি পূর্ব্বদিককার কক্ষে বাতিদান লইয়া অদৃশ্য।

বিলাস ইদানীং অন্ধকারে দাঁড়াইয়া কহিল "সুযোগ এখনও আছে...কেমন করে যাবেন..." ইহার পর অনুচ্চ কণ্ঠে শ্রদ্ধায় বলিয়াছিল "গোলাপ সুন্দরী"

যদিচ বিলাসের স্বর অনুচ্চ ছিল, তবু তাহা হাওয়ায় পূর্ব্বকক্ষে ধ্বনিত হইল, সেখানে কাহার, নিশ্চয়ই সুন্দরী মনিকের পদক্ষেপ বর্দ্ধিত হইল, অভিমান নিঃসন্দেহে আলোর সামনে "কেন সে-কথা বল নাই?" তারপর শান্ত।

বিলাস আশ্চর্য্য হয় যে, সমস্ত ঘর ভরিয়া ক্রন্দন ধ্বনি ঝঙ্কার দিয়া উঠিতে লাগিল। হয়ত তাহার এ ধারণা হয় যে, গোলাপ সুন্দরী কাঁদিতেছেন আর যে সেই ঝঙ্কার অন্ধকারকে আরও নিবিড় গূঢ়তর করিতেছে, যেখানে দাঁড়াইয়া শুধু মাত্র 'জগৎজননী মা ব্রহ্মময়ী' বলিয়া খেদোক্তি করা বিধেয়।

বিলাস এখন আপনার ঘরে জানালা খুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল। এমত সময়, প্রবল মেঘ-ঘর্ষণ শুনিল; সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিল যেটুকু আলো ছিল তাহাও নাই এবং কে যেন ত্রাসে ভয়ে এইমাত্র দ্রুতপদক্ষেপে যাওয়া-আসা করিতেছে। যে দরজাকে সে একদা ভয় করিয়াছে সেই দরজার দুই পাশ ধরিয়া দাঁড়াইল। বুঝিল মনিক এই অন্ধকারে ঘুরিয়া বিভ্রান্ত হইতেছেন, আর যে তিনি ভীত কণ্ঠে কহিলেন "আলো নিভে গেছে"। বিলাস এ কথায় এক মুহূর্ত্ত দেরী করিল না, দেশলাই খুঁজিতে লাগিল। আঁধারে আর এক নিদ্রিত অবস্থা, অন্ধের মত হস্তদ্বারা সমস্ত বস্তু স্পর্শ করিতে করিতে চলিয়াছে, অনেক দূর, না অনেক সময়ের পারে সে গিয়াছে, ইতিমধ্যে একবার মনে হইল মনিকও দেশলাই খুঁজিতেছেন। এইভাবে খুঁজিতে খুঁজিতে যে হাতে বিলাসের একদা কাঁটা ফুটিয়াছিল, যে হাতে গ্রন্থ ধরিয়া শ্লোক পাঠ করে, সেই নিমিত্তমাত্র হাতে, উষ্ণতার স্পর্শ লাগিল মানবীর দেহ অথবা নিঃশ্বাস! বাষ্পসম্ভূত মেঘ, মেঘ উৎপন্ন আলোকে...ভাস্কর্য্যের বিপুলতা বিলাস দেখিল। এইটুকু দেখা লইয়া

তাহার মনে হয় যে ঘুম ভাল।

"আমাকে ছেড়ে যেও না...আমি ভীত" এবং ইহার পর মাথা নত করিয়া মনিক বলিতে চাহিয়াছিলেন যে শুদ্ধ বস্ত্র পরিবর্ত্তনকালে আলো নিভিয়া যায় ফলে...।

মনিকের কথার উত্তরে বিলাস গভীর কণ্ঠে বলিল "গোলাপ সুন্দরী" এ কথা সত্যই অনুক্ত ছিল, সে কেবল মাত্র তাহার দিকে চাহিয়াছিল। পুনরায় মনিকের কণ্ঠস্বর "গোলাপের মধ্যে আমারই ক্রন্দন...যে কান্না আমি বহুকাল ধরে কাঁদছি। তোমাকে আমি..."

ইহার পর—মুহূর্ত্তের জন্য দুজনকে পরাজিত করিবার চেষ্টা করিল, একে অন্যের দেহের সুমধুর আনন্দধারা নিঃশেষ করিয়া শুষিয়া লইতে চাহিল। সহসা অশরীরী বজ্রাঘাতে দুইজনেই বিক্ষিপ্ত হয়। সহসা যেমত পাখী ডাকিয়া উঠিল, লজ্জা আসিল। বিলাস চকিতে উঠিয়া শায়িতা বিপুল রমণীকে দেখিয়া যেন শিহরিয়া উঠিল। সত্বর সে কক্ষ ত্যাগ করে। হলে আসিয়া যেখানে সে হাত রাখিল সেখানেই দেশলাই ছিল, বাতি জ্বালিয়া সে মাথায় হাত দিয়া বসিয়াছে। এমত সময় তিনি, মনিক, এই আলোতে আসিয়া এমন প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে চাহিলেন যাহার অর্থ "আমি কি অপূর্ব্ব সুন্দরী নই, গোলাপ সুন্দরী নই" মনিক পুনরায় তাঁহার হাত ধরিল, বিলাস আপনার কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার দিকে লক্ষ্য করিল, নিরাভরণ দেহের সমস্ত রোমকূপ দিয়া মহা উল্লাস নিঃসৃত হইতেছে।

বিলাস যেন কহিল "বেশ, এখানে দাঁড়ান" বলিয়া সে তাঁহাকে মর্ম্মর মূর্ত্তির ভঙ্গিমায় দাঁড় করাইয়া ড্রয়ার খুলিয়া মোহিতদার জন্য রক্ষিত সিগারেটের টিন কাটিয়া, সিগারেট ধরাইয়া, অনিমেষ নেত্রে তাঁহাকে যেমন বা অনুসন্ধান করিতে লাগিল। মনিক আপনার পদদ্বয় ঈষৎ বিভক্ত করিয়া দুই হস্তে সমস্ত কেশরাশি ধরিয়া স্থির। সিগারেট ফেলিয়া ঝটিতি বিলাস তড়িৎ বেগে তাঁহার নিকটে গিয়া একটি নিঃশ্বাস ফেলিল। তাহার স্পর্শে মর্ম্মর মূর্ত্তিও রক্তমাংসের দেহ পরিগ্রহ করিল। মনিক অদ্ভুতভাবে হাসিলেন।

* * *

"এখন ঘুমান যাক"

"পৃথিবীতে কি ঘুম আছে"

বিলাস এই জাড্যবিজড়িত উক্তিতে বিছানায় উঠিয়া বসিল—বহুদিন পূর্ব্বে যে এপিটাপ তাহার—স্কাঁরোর লিখিত—মুখস্থ ছিল যাহা সে ভুলিয়াছিল তাহা স্মরণে দ্বিপ্রহরের চেতনা হইতে রাত্রের চেতনা পারাবারের মধ্যে জাগিয়াছিল—আসিল "পথিক শব্দ করিও না কারণ এই প্রথম রাত্রে স্কাঁরো ঘুমায়"।

"ওঠো" মনিক কহিলেন।

'হল-ঘরে' বলিয়া শ্লথপদে ক্লান্ত বিলাস তাঁহাকে অনুসরণ করিল।

দুজনে এখানে আসিয়া স্তম্ভিত; বিলাস সম্পূর্ণ শান্ত, গতিরহিত—কিন্তু বিলাস অত্যন্ত আধুনিক, একটু পোর্ট ঢালিয়া, সিগারেট ধরাইল, এবং মনিককে নিরীক্ষণ করিতে করিতে সিগারেটটি তাঁহার হাতে দিয়া কহিল "প্লিস আমার দিকে চাও...মানে তাদের মত করে অর্থাৎ..."

মনিকের নিকট হইতে যাহা সে আশা করিয়াছিল, অর্থাৎ বেশ্যার মত তাহাকে প্রলুব্ধ করিবে তাহা শতগুণ সে পাইল, মনিক আশ্চর্য্যভাবে সিগারেট ধরিয়া এক মহার্ঘ্য আবেশে আপনাকে পূর্ণ করিলেন, এখন স্তন বহিয়া সিগারেটের নীল ধোঁয়া ছত্রাকার হয়...কেমন একভাবে মনিক—যিনি সুন্দরী সুলক্ষণা—আপনার জঙ্ঘায় জঙ্ঘায় সশব্দ আঘাত করিলেন যে অধুনা ধর্ষিত পৃথিবীর মেরু পর্য্যন্ত কম্পিত হয়, আর যে তাঁহার সুরম্য উরু যুগকে আশ্রয় করিয়া আলো উঠা নামা করে।

ক্লান্ত বিলাসও অস্থির।

ভোর যখন হইল, তখন বিলাস দেখিল, মনিক নাই। শুদ্ধ বিছানায় বিশেষত বালিশে ওলিভ কুঞ্জের রাত্রির ছাপ—পোর্টের মাত্রা আধিক্যে যাহা সে বুঝিতে পারে নাই। ত্বরিতে উঠিয়া সে দক্ষিণের ঘরে

গিয়া আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইল। তাহার মুখ বহিয়া পুনরায় রক্ত আসিল। এক মুহূর্ত্ত সে স্থির থাকিতে পারিল না। একবার চন্দ্রমাধববাবুর সহিত দেখা করার কথা মনে করিতেই ভয়ে সে, বিলাস, আকাশের মত হয়।

অনেকদিন পার হইয়াছে।

স্যানাটোরিয়ামের খাটে এখন সে শুইয়া, এইমাত্র রঙ্গস্বামী চোরা একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া গেলেন। বিলাস আপনার মনকে দৃঢ় করিয়া ফেলিয়াছে, সে ধীরে বালিশের তলা হইতে চেট্টি লিখিত এপিটাপ বাহির করিয়া খুলিতে যাইবে...যে এপিটাপে লেখা ছিল

"চল যাই—পর্ব্বতের শৃঙ্গে, যেথা
পার্পাল কবরী বাঁধে,
প্রত্যূষের প্রথম সূর্য্য,
তোমাদের শব্দ যেথা বর্ণ হয়ে যায়
সঙ্গীহীন ভালবাসা
হেম অন্ধতায়—

এমত সময় একটি টাইপ করা চিঠি আসিল, এখন সে চিঠি খুলিল।

চিঠিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ ছিল, এবং গোলাপ সুন্দরীর খবর ছিল, যে তিনি একটি পুত্র রাখিয়া মরিয়াছেন। আঃ মনিক! একবার বিলাসের মনে হইল, যাঁহাকে সে প্রথমে পবিত্র শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান নিমিত্ত দেয়, তিনি বলিয়াছিলেন "আমার মা—পাগল ছিলেন" এবং একথা শ্রবণে তখন সে, বিলাস, বাহিরের মহাপ্রলয় দেখে।

বিলাসের নিঃশ্বাস দুর্ব্বল হইয়া আসিয়াছিল তথা আর কয়েকটি নিঃশ্বাস মাত্র সম্বল এ কারণে দীর্ঘ নিঃশ্বাস তাহার ছিল না। শুধু, ইতিমধ্যে, সম্ভবত, মনে হইল মৃত্যুকে অমোঘ করিবার জন্য পুনরায় সে শিশু হইতেছে।



[illegible]মিলা স্মরণে

উনিশশো চুরাশীর বইমেলায় কমলকুমার মজুমদারের "অনিলা স্মরণে" বইটি প্রকাশিত হয়।

[এখানে "........... অতি আধুনিক বুর্জোয়াভাবাপন্ন বর্ত্তমানতার সঙ্গে, লেখক তাঁর সৃজনশীল স্বাভাবিকতায়—পুরাতন এক প্রাকৃত দৃষ্টিভঙ্গির সহজ সামঞ্জস্যের খুব অনায়াস সমঝোতা করেছেন এবং তুলে ধরেছেন—রচনার প্রামাণ্য চিত্রটি......"]

"অনিলা স্মরণে" উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬৫ সালে, 'দর্পণ'-এর শারদীয় সংখ্যায়।

প্রয়াত লেখক কমলকুমার মজুমদার এবং তাঁর প্রিয় প্রণবের মধ্যে ছিল এক গভীর স্নেহ সৌহার্দ্যের সম্পর্ক, সেকথা স্মরণ করেই বইটি প্রণব বসুরায়কে উৎসর্গ করা হল।

দয়াময়ী মজুমদার

লাবণ্য দেবীর মনে সহসা নির্ভরতা আসিয়াছিল, কেননা এখন বৃষ্টি হয়; বৃষ্টি পরিবর্ত্তনের চক্রবৎ সূত্র বৈচিত্র্যের নিত্য হেম অনেকখানির পরেও—যেখানে জানালা আছে এবং দূরত্ব সকলই বাঁকা রেখা—আর একদিকে ষোড়শী, মৌন আবেগ; ইহা অনায়াসে ঘরে আসে, ইহা কাজরী, ইহা মোহউচ্ছল, উহা ময়ূর অমোঘ বাস্তবতায় রূপান্তর হওয়ার বীর লহমা; এবং এই, ইহাই ধ্রুব হেনো সূক্ষ্মতম অজস্র সুহউদর সুকুমারী গোপনতা যেখানে ধূলা নাই।

উহাই লাবণ্য দেবীকে নির্ভরতা দেয়, সাধারণত ব্যোমচারী সংখ্যাহীন অন্ধকারের কুটিরে-আগত-খানিকের-উপর যে নির্ভরতা, স্বভাবত ভাজের গোলাপের উপর যে নির্ভর, ঐখানে তিনি নিজেকে অঞ্জলি ভরিয়া একা পাইয়াছিলেন—যাহা, বিশেষ এক রহস্যময় চাতুর্য্যে মুখমণ্ডল আবর্ত্তন করিলে দৃষ্টিপথে আসে, এই একা যাদু জানে; এ হেন সহজ নরম মনোলোভা অনুভবের মধ্যে তিনি একটি ব্রণবিরহিত সুখ স্বপ্নদায়িকা শয্যা দেখিয়াছিলেন, এবং দৈবাৎ এতাদৃশ, দর্শনমাত্রই মধুর ঋজু আরাম স্পর্শ তাঁহাকে গীত গাহিতে মিনতি করে, যাহাতে পঞ্চদশীর স্তনবৃন্ত কণ্টকিত হইয়া দেখা দেয় আর যে লাবণ্য দেবীর বহুদিন পূর্ব্বে ফেলিয়া আসা যাহা মুহূর্ত্ত সকলের মধ্যে অন্তর্হিত, সেই চিকণ বয়সী তড়িৎ দেহের উন্নত বক্ষ পীন হইয়া উঠিল; তদানীন্তন ডাগর নয়নে পুনরায়, এখন, ঘুম আসিল, ইহার স্বপ্নে কালসর্প দংশনের কোন সম্ভাবনা নাই।

এবং আজ, এই মুহূর্ত্তে আপন সু-অঙ্কিত দেহ আপনারই অশরীরী আলিঙ্গনে, জিহ্বায়ে লালা, বিমোহিত, এখানে, যাহার মধ্যে দিগমণ্ডলের সাক্ষাৎ ছিল—

তাই লাবণ্য দেবী কিছুটা অদৃশ্য।

সেই মোহপাশ হইতে, আপনাকে জানিতে না দিয়াই তিনি আড়নয়নে দেখিলেন, একটি ময়ূর একটি ভাবুক প্রক্রিয়ার মধ্যে নাচে, আরও উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, যে তাহার চেতনার উপলখণ্ডবাহী স্রোতস্বিনীর জলধারায় বিকার হয় না, তাহার ছায়া একই; এবং এমন মানসিকতার মধ্যে অনেকদিন পূর্ব্বে তিনি যাহাকে দেখিয়াছিলেন, এখন এই মনোভাবের অবস্থায়, নিশ্চয়ই তাহাকে তিনি স্মরণে আনিতে চাহেন নাই; সে তাঁহারই শাশ্বততা ক্লাসিসিজম।

সেদিন, আপনার দেহের বৈদিক সৌন্দর্য্যকে স্পর্শ করত বিরাট হল-ঘরে বসিয়াছিলেন, সে সৌন্দর্য্য অস্বচ্ছ নিপট দেওয়ালেও প্রতিবিম্বিত হয়, উহা এই রাজসিক বাড়ীর চারিদিকে ছড়াইয়া আছে, সোনার গিলটি করা ফ্রেমের বিখ্যাত চিত্রগুলিও, এমনকি যে তাহার সৌন্দর্য্যদ্বারা প্রভাবান্বিত, তখন দ্বিপ্রহর, পূবে হাওয়া আনিত রৌদ্র তাঁহার অজস্র চুলে; সুদীর্ঘ পর্দ্দাগুলি মন্থরে আন্দোলিত হয়, ওপাশের খাবার ঘর হইতে কাঁচের ও ধাতু মিশ্রিত আওয়াজ আসে, তাঁহার সোনা হাতের বোনায় মুখচোরা ছোট একটি মৌ বাগান সোহাগ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিতেছে; লাবণ্য দেবী হঠাৎ চোখ তুলিয়া চাহিতেই দেখিলেন, কিছু যেন।

কিন্তু এক অপূর্ব্ব শান্ত মহিমা, যাহা আলোকে বাধা দেয় নাই, কিন্তু উহা কেহ নয় অথচ সুন্দর দিব্যবর্ণরাজি, অনেক অতীব উৎকৃষ্ট সুগন্ধ সূক্ষ্ম মনীষাসম্পন্ন সূর্য্য উপাসনাযোগ্য ওষ্ঠ কম্পন তরঙ্গ, এবং তৎসহ বিভিন্ন পরমরমণীয় রেখা সকল; তদ্দর্শনে, তিনি সবিস্ময়ে একটি ধ্বনিমাত্র হইয়া গেলেন, যে ধ্বনি বিরহ ভাবনায় আছে সম্মুখে তপ্তকাঞ্চন আভাযুক্ত রোদে, হামাদান কার্পেটের উপর এই অলৌকিক দৃশ্য—উহা তাঁহার নিঃশ্বাসে ফুলমুকুটের ভাববিগ্রহ দিতে সমুৎসুক।

ঐ দৃশ্য বিদ্যমানতাকে লাবণ্য দেবী আপনার অজানিতে প্রাচীনতা দিয়া চিনিয়া লইয়া মৃদু স্মিতহাস্য সহকারে আপনার মস্তক আন্দোলিত করত বলিয়াছিলেন "এসো, সনির্বন্ধ অনুরোধ আমার কাছে

বসো” বড় খুসী হইয়াছিলেন।

পুনরায় আপনার সৌখীন পদ্মপলাশ নয়ন দুইটি মেলিয়া যোগ করিলেন “মনে হচ্ছে তুমি বড় ক্লান্ত, লক্ষ্মীটি বসো, রোদে এলে কেন?” এ সময় লাবণ্য দেবী উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, এবং একদা তির্য্যক কটাক্ষপাতে আর কাহারও উপস্থিতি আছে কিনা ঝটিতি দেখিয়া লইয়াছিলেন।

“রোদে?...রোদ যেহেতু আমি খুব স্পষ্ট হতে চাই, গণনায় সংখ্যায় উদ্ভাসিত হতে চাই—”

“কেন রাতে...রাত!”

“রাত!”

লাবণী দেবী সরল ভাবে উত্তর করিলেন “হাঁ রাতে রাত তো বৃত্ত-সম্ভবা।”

“নিঃসন্দেহে, তবু বড় তৈলজাতীয় গন্ধ, বড় উরুৎ শব্দ ক্লিষ্ট...মনের ভুল...মনের ভুল বলে আমাকে স্বভাবতই মনে হবে।”

এ কথায় পরমা সুন্দরী কহিলেন 'আমার হবে না' এবং শেষে একটি বিচারের হাসি হাসিয়াছিলেন।

“আমি তোমার নিঃশ্বাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি এতে তোমার কষ্ট হচ্ছে না...”

লাবণ্য দেবী এই পদবন্ধনের দিকে একবার চাহিয়া, শিশু কণ্ঠে উত্তর দিলেন “কই না তো...বসো?”

“বসছি কিন্তু আগেই বলছি, দোহাই আমাকে তুমি ভগবানের প্রতি বিদ্রূপের...প্রতিহিংসা নেওয়ার একটা চোরা যন্ত্র বলে ভেবো না?”

* * * *

লাবণ্য দেবী উত্তর না দিয়ে কিছুকাল কার্পেটের উপর পদশ্চারণা করিয়া করিয়া মোহিনী দৃষ্টি সঞ্চালিত করত কথা বলিতে গিয়া অচিরাৎ এ লজ্জায় স্থবির, তাঁহার শবরী ডায়নার স্তনদ্বয় বিগলিত, দুগ্ধে বস্ত্র সিক্ত। তথাপি লজ্জা তাঁহাকে কুৎসিত করে নাই।

ইদানীং এই মোহপাশের নির্ভরতায়, আরামে নিজ চম্পকদাম অঙ্গুলি নিচয় দ্বারা আপন করে কণ্ঠ—যে কণ্ঠ গ্রীবা ক্রমবর্দ্ধমান সুন্দরতর—মৃদু চাপ দিলেন আর যে তৎক্ষণাৎ আশ্চর্য্য! হাতখানি সত্বর ফিরিয়া আসে, এবং ওষ্ঠ কম্পিত হইল, হাতখানি ফিরিয়া আসাকালীন যে অদৃশ্য রেখা সূচিত হয় তাহা মানসপটে রমণীর সুঠাম রেখায়িত দেহের অংশ!

কণ্ঠমধ্যস্থিত শুষ্কতা তাঁহাকে এইভাবে আহত করে, তাঁহার কণ্ঠ শুকাইয়াছে, উহাতে চিত্র আরোপিত কুসুমরাজির বিষণ্ণতা ছিল, এবং তাঁহার অভিজ্ঞতার—মধ্যরজনীতে একাকিনী কালো লিলি-পুলে খেয়ালে অবগাহনকালীন অতলতার অনুভবে শ্বেত। তিনি ক্ষণেকের জন্য চকিত।

তথাপি, বৃষ্টিজাত শীতলতার হেতু, যদিও এই বৃহৎ রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মের দশাসই ছাউনির নীচে, এখানে অনেক অনেক লাল, পিতলের তকমা, রেলের সময়, লোহার আওয়াজ, নানাবিধ ত্রিভুজের নিয়ম এবং মানুষের অধৈর্য্য উদ্বেগ উত্তেজিত অভিজ্ঞ নিঃশ্বাস উষ্ণতার অভাব ছিল না তবু তিনি হাতে হাত ঘর্ষণে শাবক অঙ্গ উষ্ণতা—আশ্চর্য্য পৃথিবীর অনেক কিছুই তাঁহার স্মরণে ছিল—আনিবার সময়, অনিচ্ছা সত্ত্বেও, আপনার ছবিলা হস্তদ্বয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।

এবং তাঁহার মন তখনই হস্তদ্বয়ের প্রতি আকৃষ্ট, এ কারণ যে হাত দুইখানি অদ্ভুত বিস্ময়কর; মন হইল ক্রমে উহা কৃষ্ণবর্ণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে যে কৃষ্ণবর্ণ তরঙ্গমালাকে বিরক্ত ও অধস্তন পুরুষকে বড় একা করিয়াছে—এ হস্তদ্বয় বহুবারই প্রজাপতি ধরিবার মানসে স্থির হইয়াছে, সন্তর্পণতা কৌশল, কৌশল আনন্দে স্ফীত হইয়াছে, ক্রমে নিষ্ঠুরতা; ফলে তাঁহাকে বড় একা করিয়াছে। সহসা আপনকার বাম হস্তের অঙ্গুলির দাম্ভিক হীরকখণ্ড—বন্ধুহীন সরীসৃপের সখেদ উত্তপ্ত নিঃশ্বাস সঞ্জাত—লাবণ্য দেবী আরবার দমকা ফুৎকারে নিভাইয়া দিল।

তাঁহার সৌখীন দেহখানি, অঙ্গুরীয় দর্শনে, বক্র হইয়া একভাবে ঘুরিয়া অত্যন্তই যারপরনাই বিদ্রাবিত হইল। একমাত্র স্থূলতা ব্যতীত কিছুকেই যিনি ভয় করেন না, পৃথিবীতে চাঁদ যাঁহাদের জন্য অনেকক্ষণ থাকে, সূর্য্য আজ্ঞাবহ তাঁহারাও কত অসহায়! তথাপি তিনি পরাস্ত হন নাই, নিজেকে উদ্‌বুদ্ধ

করিয়াছিলেন, এখানে প্ল্যাটফর্মে পদার্পণ করিয়া অজস্র লাল আর লাল আর লালের মধ্যে যে দৃশ্য সর্ব্ব প্রথম উপলব্ধি করিয়াছিলেন পুনরায় তাহা দেখিতে চাহিলেন কেননা উহা তাঁহার নির্ভাবনা।

সমগ্র নিয়ম, এ প্ল্যাটফর্মের, রক্তধারায় ভাসিয়া গিয়াছিল, এই রক্তের মধ্যে তিনি বিজয়িনী, লাবণ্য দেবী সকল কিছু ভুলিয়া আপনার শবরীডায়না স্তন খুলিয়া অদ্ভুত ভাবে ধরিয়াছেন এবং তাঁহারই কন্যা যদিও বালিকা মহা আবেগে ক্ষুধা ও তৃষ্ণা যাহার একই, সে স্তন পানে নিশ্চিন্ত। লাবণ্য দেবীর নগ্ন পদদ্বয় রক্ত ধারায় হিমে দারুভূত, নিজে আতঙ্কিত, তবু নির্ভীক ভাবে তিনি স্তন্যদানে ব্যাপৃতা! এ দৃশ্য তাঁহাকে হয়ত নহে, নিশ্চয়ই মহীয়সী করিয়াছিল।

তবু কোথায় একটি ভয় ছিল।

অসামান্য হীরকখণ্ড তাঁহাকে ধূমায়িত করিল, এযাবৎ যে শীতলতার অনুভব তাহা বৃষ্টির কারণে নহে; উহা নিশ্চয়ই মূল্যবান, উৎকৃষ্ট সীমাহীন হীরক অঙ্গুরীয়প্রসূত যাহা একাধারে অগ্নি, বৃশ্চিক, তুষার।

অতি সহজেই রূপসী মহিলা আপনাকে অন্যমনস্কা করিতে পারেন, কিছু পূর্ব্বাহ্ণেও নিজেকে উহার অস্তিত্ব হইতে—আমি আছি এবং একটি এক বিশেষ জগত, সুখ আছে, ফলে নিজের জানিত অজানিত চাওয়ার মধ্যে পাহাড় পর্ব্বত নদী পর্য্যন্ত আসিয়াছে—এই অস্তিত্ব হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন। এবং এই ভৌতিক শীতলতার জন্য—বৃষ্টির আবেশ অর্থে গোপনতা নয়ছয় উধাও; এই ব্যতিব্যস্ত দীঘল রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মের অসংখ্য মতভেদের এটা সেটা, তাঁহার, লাবণ্য দেবীর দৃষ্টিতে আঁশছায়া মাত্র। অজমুখ কুটিল দুশ্চিন্তা তাঁহাকে বিমর্দ্দিত করে।

দেহলিপ্ত ফরাসী পারফিউমের গন্ধ তাঁহার সুষমা সত্তা, স্বীয় দূরত্ব লইয়া তাঁহার অন্তরীক্ষে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল তাই বহুদিবসপূর্ব্বের একটি ফোট, এখন এ ফোট হলুদ, মনে পড়িল। তিনি এবং ফোয়ারা, ফোয়ারার কিনারে তিনি আর তাঁহারই পিছনেই উৎসারিত লীলায়িত তথা শূন্যতা ছেদকারী অজস্র আঁকাবাঁকা জলোচ্ছ্বাস, এবং তাঁহার আপনকার একখানি হাত এমন ভঙ্গীতে উত্তোলিত যে সহজেই মনে হয় সে-হাত নিকটস্থ শূন্যতায় দূরত্ব অভিমানী নির্বিকারের অনন্তকে স্পর্শ করিয়া আছে।

এ কথা স্মরণে, লাবণ্য দেবীকে নিমেষেই অত্যধিক রুগ্ন করিয়াছিল, তাঁহার মস্তক অবনত, তথাপি ভয়ঙ্কর ক্ষুব্ধ, রুষ্ট এক শ্বাস প্রকাশমান হয়; ঝটিতি, বেচারী, নিম্নে লাইনের গহ্বরের পরিত্যক্ত ছেঁড়া ভাঙা টুকরা অনেক কিছু সামগ্রীর প্রতি ক্ষণেক পুনঃসংযোগ করত, বিভিন্ন ফ্রেমে সেগুলিকে আরোপিত করিবার পর, ছোট একটি নিঃশ্বাস লইয়া, অনন্তর, পিছনে গরাদ করা গেটের দিকে চাহিলেন, সেখানে আরও দূরে সুউচ্চ দেওয়ালের ভিতর দিয়া পুনর্ব্বার সকালের সূর্য্যের কিরণ সম্পাত, হয়ত, ইহাই তাঁহার পথ রোধ করে তবুও লাবণ্য দেবী এ প্ল্যাটফর্ম ত্যাগ করিয়া পলাইতে চাহিলেন।

কিন্তু ভদ্রমহিলার দেহ, এখন, যদিও যেন পালকের আওয়াজহীন হল্কা তবু তিনি কোনই গতি খুঁজিয়া পাইলেন না, দেহ অনড় বা ক্ষণেকের জন্য উহার দিকভ্রম হয়, এ কারণ যে এ হেন সায় তীব্র রেলের বাঁশী বাজিয়া উঠে, ফলে সেই হেতু, তাঁহার মধ্যে নিঃসঙ্গ খর দ্বিপ্রহর দেখা দেয় এবং হেমন্তবর্ণালী সন্ধ্যার ন্যায় আচরণ করিতে থাকে!

সদ্য ক্লান্তি বেপথুমান হৃদয়ের গূঢ় অন্ধকার বাঁচিয়া ক্রমে সমগ্র লোভনীয় শেফালি দেহলতাকে আচ্ছন্ন করিল, লাবণ্য দেবী দুঃখী জনের মতই বলিয়া উঠিলেন 'ভগবান'; আপনার কপালে করাঘাত মানসে ঈষৎ হস্ত উত্তোলন করিলেন মাত্র, কেননা, হয়ত, তিনি তাঁহার বর্ত্তমানকে অস্বীকার করিতে মনস্থ করেন নাই।

আপনার মধ্যবর্ত্তী কোন স্থান হইতে আর একবার পর্য্যবেক্ষণ করিলেন, অনেক পাতা উল্টানর ক্ষিপ্র শব্দ শোনা গেল, দেখিলেন, আধা-গোলাপী ওরগেণ্ডীর সংযত লেশ মাধুর্য্যের বিন্যাসের মধ্যে, তাঁহার সুখী মুখমণ্ডল বিলাসী মার্ব্বেল মহিমা; তখনও নাকখানি তত সেয়ানা হয় নাই, আধো আধো আত্মগত নিরীহভাব অন্তর হইতে কক্ষচ্যুত হইয়া উজ্জ্বল নবোজ্জল লাবণ্যময় ত্বকের শোভার কারণ—কিছু সময় জন্য, এই স্মৃতির দ্বারা স্বাভাবিক বিশ্বাসকে লাবণ্য দেবী উজ্জীবিত করিতে প্রয়াস পাইলেন কিন্তু নিঃশ্বাস আপনারই বক্ষে চৌকোণা হইয়া অকথিত গুরুভার।

স্মৃতির অল্পবয়সী এ-প্রতিচ্ছবি, তাঁহাকে আরবার সহসা সম্পূর্ণতা দিতে চাহিয়াছিল; কেননা ঔৎসুক্য তখনও ফড়িঙেরা পিঠে সোয়ার করত যত্রতত্র, খুসীতে ভ্রমণ করিতেছে; ভ্রান্তি তখনও রাত্রে বিলাস

হইয়া দেখা দেয় নাই, প্রকৃতির স্নান তখনও দুরন্ত ঝরণায়; বাস্তবতা, তখন বটছায়াকে ফল পতনের জন্যই বলি বুঝিয়াছিল—তবু এ হেন ভ্রাম্যমাণ জীবনের অবশেষ, পিছনে কাহার বিনীত কণ্ঠস্বর শ্রুত হয় 'ক্ষান্ত হও', তখন উচ্ছ্বসিত বালিকা স্মিত-হাস্য সহকারে পিছু-ডাকাইন্‌ন্যাকে দেখিয়া লইবার মানসে অনিন্দনীয় গ্রীবাখানি বাঁকাইয়াছিল।

অন্যপক্ষে সে ঔৎসুক্য সম্মুখের, নিমেষেই, আলো এবং ছায়াকে পাঠ করিতে উদ্যত হইয়াছে, কেননা প্রাচীন অতীতের স্বাভাবিকতা শুদ্ধিপত্র লইয়া ওতপ্রোত, ভয় বা ভ্রান্তির কোন হেতু ছিল না; এ সময়ও দূরাগত ম্লান কণ্ঠস্বর শোনা যায়, উহা বাংলা না অন্য কোন ভাষা, বৃথাই অনুনয় করে, অনন্তর আপৎকাল ফণা তুলিয়া উঠিল, ভগবান অপ্রকট হইলেন, এবং প্রস্ফুটিত গোলাপ গর্দ্দভ!

পুনরায় রেলের বাঁশী তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল; লাবণ্য দেবী, যিনি নিরবধি কাল অনুভবে আবেগের মধ্যে ছোট; আর যে নানান দিনের কথায় উদ্‌ভ্রান্ত, তিনি—তাঁহার এখনকার অস্তিত্বের কিছু স্মরণে ছিল না, তীব্র নখিলা আওয়াজে হঠাৎ সম্বিৎ ফিরিয়া পাইলেন, অতীব দ্রুত, সত্বর দেহের এখানে সেখানে হস্তদ্বারা স্পর্শ করিতে ব্যগ্র, ইতিমধ্যে একদা তাহার নিতান্ত অপরিচিতের মতই মনে হইল, এ বেদনা কোন যন্ত্রণা-সম্ভব? স্নায়ু দুর্ব্বল বৃদ্ধের মত তাঁহার মস্তক কম্পিত, এ অবস্থায় অন্য দিকে চাহিতেই তাঁহার চোখে পড়িল, একটি পুরাতন মডেলের মিনার্ভা আসিয়া প্ল্যাটফর্মের পাশেই থামিল।

গাড়ীখানি ভারী চমৎকার, দরজা খুলিতেই অতর্কিতে চকলেটের বাক্স খুলিয়া পড়িয়া যাওয়ার মতই একটি বাচ্চা নামিয়া পড়িল; একজন সুসজ্জিত ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রলোক প্ল্যাটফর্মে ধীরে পদার্পণ করিলেন, ভদ্রলোক কোটের হাতা সরাইয়া ঘড়ি দেখার পর আপনার টাই-গ্রন্থিতে মৃদুভাবে আঙুল ছোঁয়াইয়া, ছোট একটি আদৃত কুসংস্কার, কিছু বলিয়াছিলেন।

ভদ্রমহিলা সপ্রতিভ দক্ষতায়, ভদ্রলোকের উচকিত রুমালকে ঠিক দিবার পরক্ষণেই স্বস্তির নিঃশ্বাস এবং আধো হাসির আওয়াজ এই স্থানটিকে রসাস্পদ করিল, অপরাহ্ণ সম্মেলনের বেতের চেয়ারের শান্তি, নির্বিঘ্নতার সঙ্কেত আনিয়াছিল।

শুধু অযথা-তৎপরতার রুদ্ধশ্বাসে একমাত্র তাঁহারই, নবাগত মহিলার, দেহে ক্রমে স্থির হইতে চাহিয়াছিল, এবং প্রায় মহিলার পশ্চাতেই গাড়ীর চাকর পালক হাতে গাড়ীর ধূলা ঝাড়িতে একাগ্র—তাঁহার এ রুদ্ধশ্বাসে যেন বা ভয়ঙ্কর বন অতিক্রম হেতু ফলে তিনি আপনার নিমিত্ত দুর্ভাবনায় সবিশেষ প্রাণময়, তাঁহাকে বেশ দেখাইতেছিল, তিনি দেখিতে সত্যই মোহিনী; দিব্য মুখমণ্ডলের নিম্নে কণ্ঠের এক পাশে কণ্ঠার হাড়ের আভাস এবং আর একটু নীচে আদখোলা ব্লাউজের কিছু উপরে, ক্রমে মুক্তার সুতলীর মালা, বহু পূর্ব্বে যে ডৌলত্বের প্রতি আমাদের বাৎসল্য ভাব ছিল, যাহা এখন হারাইয়া গিয়াছে এ মালা তাহারই মনস্তাপ, মহিলাকে দেখিলে সহজেই মনে হয় ইনিই ফিডিং বটলের আবিষ্কারের জন্য যুগপৎ ভগবান এবং দক্ষতাকে ধন্যবাদ সর্ব্বপ্রথম দিয়াছেন।

নবাগতা আপনাকে খানিক সহবতের মধ্যে আনিয়া, ছোট একটি সুগন্ধযুক্ত লিওঁ সিল্কের রুমাল যাহা গলি কখনও দেখে নাই—তাহা দ্বারা বালকটির গালে অতীব উচ্চাঙ্গের, খুব সতর্কে, যত্ন ছোঁয়া দিবার কিছু চেষ্টার পর, কি যেন বলিতেছিলেন, নিশ্চিত "ও ডিয়া ডিয়া বেচেঃ অরী" এবং বেশ বুঝা যায়, তাঁহার এই সরল বাক্যে নিজেকে আয়নাতে প্রতিফলিত করার সহজ বুদ্ধিই ছিল; এবং সেই স্নেহব্যস্ততা, কর্ম্মের, যাহার বিবিধ রূপান্তর ঘটিলেও, এখনও মানুষের, মন হয়ত নিকটেই তবু আছে—তাঁহার দেহ বিদেশী ভঙ্গিমায় চপল, অঙ্গনে যে ভাললাগাটুকু গভীর বিশ্বাস হইয়া আছে, ইনি তাহারই একটি চতুর আদল, তাই প্রতীয়মান হয় রক্তশূন্য তবু এ কথা সত্য কণ্ঠার হাড় ব্যাকুলতায় সুস্পষ্ট।

একদা হঠাৎ মুখমণ্ডলখানি তুলিয়া কহিলেন, "ডি পি ট্রেন কি সময় আসছে" বলিয়া কোন উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই ওয়ালেট খুলিতে গিয়া চুপ! সমবেত জনপ্রবাহ তাঁহাকে বাধা নিশ্চয়ই দিয়াছিল।

লাবণ্য দেবী এই প্ল্যাটফর্মে এই প্রথম স্থিরতা লাভ করিলেন, তাঁহার নিজ জীবন যাত্রার ঘোরের, গতিকে লইয়া, এখন, এতক্ষণ পর্য্যন্ত, যে বচসার মধ্যে পড়িয়াছিলেন, আপনাকে বড় একা বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন, তাহারই এ হেন অচিরাৎ মীমাংসায় তিনি পুনরায় আপন শরীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অনিমেষ নয়নে নবাগতার প্রতি চাহিয়া অনেক ভাবে নিজেকে অনুভব হইল।

অবশ্য বালকের প্রতি স্নেহের মনোরমত্ব বৃদ্ধির—যদিও তাঁহাকে, লাবণ্য দেবীকে সজাগ করে—প্রকাশকে তিনি নবাগতার দেহ তরঙ্গায়িত রমণীত্ব অবজ্ঞা না করিয়া—যেহেতু লাবণ্য দেবী নিজে যে কোন কিছুকে উপেক্ষা, এবং সমস্ত কিছুকে আদর করিতে মানিয়া লইতে পারেন; পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন নবাগতা মহিলা গাড়ী হইতে নামিবার পূর্ব্বাহ্নে, কত ক্ষিপ্রতায় সাদা ওয়ালেট খুলিয়া আপনাকে সুন্দর মোহিনী করিয়া লইতে ব্যস্ত, তখন ছোট আয়নার চারকোণা আলো তাঁহার মুখে প্রতিভাত, তাঁহাকে তিনি দেখিয়াছিলেন। অতএব মহিলার আপনার প্রতি এবং পরে বালকের প্রতি (ইতিমধ্যে পুরুষ মানুষের প্রতি) অভিব্যক্তি, এই দুইটি সত্য বলিতে চাহিলেও, অতীব স্বাভাবিক বুঝিলেও—তাঁহার লাবণ্য শুধুমাত্র দেবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

তাঁহাকে বিভ্রান্ত করে, হয়ত; অথবা এ-দৃশ্য তাঁহার জীবনযাত্রার স্মারক যাহা তিনি পাঠ করিতে তন্ময়; তবু এই প্রতীয়মানতার উদ্দেশ্যে লাবণ্য দেবীর ওষ্ঠ স্পন্দিত; কোন প্রাচীন ভাষায়, সুছন্দিত বাক্যাবলীতে আপনার শিরাউপশিরাজাত প্রতিক্রিয়ার স্বগত উক্তি এতাদৃশ স্পন্দনের মূল।

এবং এই সময়, এই নিঃসঙ্গতার মধ্যে, প্ল্যাটফর্মে, ভাস পাখীর উচ্চতায় যে চিল তাহারই কণ্ঠস্বর এখানে আসে, অনতিদূরবর্ত্তী কুলিদের শান্ত কণ্ঠস্বর শোনা যায়, "পর শাল গহুঁ হুয়া থা সার পানি বরখা বস্তি জিলা" ইত্যাকার বাক্যালাপ তাঁহাকে মন্থন করিতে তৎপর।

রেলওয়ের ঘড়ির ছোট অতীত, চব্বিশ মিনিটের, তাঁহাকে আপনার অগোচরেই তারুণ্য দিতেছিল; কিন্তু হায় এই অতীতের মধ্যে তিনি একাই ফিরিয়াছিলেন; এখানে ভাজের এমারেলিশ জাগিয়া উঠিল না; এ-তারুণ্য কুটিল; এখানে পঙ্কের দেওয়ালের রঙে নর্ম্মদা নদীতীরের অপরাহ্ণ কখন যে বিল্ববনের অন্ধকারে পরিণত হইয়াছে তাহা লিখিত নাই।

যদি এমন ভাবনাকে কপালে-করাঘাত বলা যায়, যদি তাহা সত্যই, ইহার মধ্য হইতে লাবণ্য দেবী একটি নরম গলার আওয়াজে ক্রমে সচেতন হইলেন, চেনা স্বরটিকে তখনই তখনই বড় ভাল লাগিল।

উহা নবাগতার কণ্ঠস্বর "আঃ মাই গুডনেস্ মর্ণিন, মিসেস রয়-ই (রায়)—ও কতদিন পর কেমন আছেন ভাই" ভদ্রমহিলার স্বরে অতিমাত্র বিস্ময় ছিল, এবং আরও যে ইহার চোখে মানসিক সপ্রতিভতা, বনছায়া অন্ধকারে সঙ্গ-সুখ লালসে অভিসারগত রমণীর সুঠাম পদদ্বয়ের উচকিত ক্ষণপ্রভা দ্বন্দ্বের মীমাংসার বিনিদ্রার সূত্রপাত করিয়াছিল।

এক লোকশিল্পের পৃথিবী দেখা দিয়াছিল, সব কিছু একই স্তরে থাকিয়াও বড় নাটকীয়; ফলে লাবণ্য দেবী নবাগতার—মিসেস মিটা(র)-কে চিনিতে পারিলেও, যাঁহার কণ্ঠস্বর এখনও তাঁহার সর্ব্বত্রে ফেনিল, তথাপি 'মিসেস রয়ই' এ বাক্য তাঁহাকে এক অর্থে, গরীব করিয়াছিল। অন্যপক্ষে রোমহর্ষভাবের তিক্ততা নখরাঘাত করে, এবং এ কারণে তাঁহার কাঁধ দুইখানি চকিতে উঠিয়া পরে ধীরে স্থির।

মিসেস রয়ই কি সত্যই তাহার নাম, না এ-নাম অন্য কাহারও? এ প্রশ্ন তিনি একবার ক্ষণিক নিমিত্ত নিমেষ বন্ধ করত ভাবিয়াছিলেন। আর যে তির্য্যকভাবে পাশের দিকে, অনন্তর পিছনের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন।

ইতিমধ্যে মিসেস মিত্র প্রায় তাঁহার নিকটে আসিয়া হাতখানি প্রসারিত করত কহিলেন, "কেমন আছেন মিসেস রয়ই কবে এলেন।"

"ভাল, আপনি" বলিয়া মিঃ মিত্রর প্রতি চাহিয়া ছোট হাস্যঅভিবাদন করার পর ধীরে উত্তর করিলেন "কয়েকদিন" পরক্ষণে "ও ডিয়া" বলিয়া বালককে আদরের নিমিত্ত ঝুঁকিয়া পড়িলেন।

লাবণ্য দেবী নিজেকে ঐ সময়টুকুর মধ্যে অতিস্বচ্ছ পরিচ্ছন্ন দেখিয়াছিলেন, কোথাও ভুল নাই, প্রতিটি মুহূর্ত্তই চমৎকার, ইহাতে প্রখর বিশ্বাস ফিরিয়া আসিয়াছিল। শুধু মিসেস রয় বলার জন্য যে শ্রেণীগত বিরক্তি তখনও ইহার মধ্যে আসিতে পারে নাই।

"স্টেশানে কাকে?"

"ওনিলা"

"আঃ—ওনিলা কি সুইট মেয়ে...ওনিলা...ডিপি, ওনিলা আসছে..."

লাবণ্য দেবী মিসেস মিত্রর স্বভাবগত উৎসাহে, খুসী কিছুটা এবং কেমন যেন পুনরায় অন্যমনস্ক

হইয়াছিলেন; এই সঙ্কীর্ণ তির্য্যক অবসর, এ কারণ যে সম্মুখে মিসেস মিত্র, যিনি তাঁহারই মত আর একজন, মহা পরিনির্ব্বাণের গল্প কেহই জানেন না—তবু ইহারই মধ্যেই তিনি নিজ দেহ অভ্যন্তরে অনিলা নামটির শব্দময় হেরফের শ্রবণে নীল।

অনিলা একটি দীর্ঘশ্বাস বহিয়া আসিতেছে।

অনিলা আসিতেছে। সে আসিবে বলিয়া আজও পৃথিবী কক্ষচ্যুত হয় নাই, অপেক্ষা করার মনোবৃত্তি তীব্রতর হইয়াছে, যে তাঁহার মধ্যে, সমগ্র মুহূর্ত্তে, প্রবাহের অতি নির্জ্জন সত্য হইয়া, একদা, গম্ভীর রূপ ধারণ করিয়াছে; তাঁহার পরোক্ষ উপলব্ধি নিশ্চিহ্ন হইল, সুদীর্ঘতম আখ্যান মঞ্জরীর গূঢ়তম পদ্ধতি, নিজেকে, দেখিয়াও সেদিন তিনি ক্ষুব্ধ হন নাই—মাছের সরলতা ভাবিতে ভাল লাগিয়াছিল—চামচের ঝিনুক আকৃতি বড় সঙ্গত, এ কথা তিনি স্পর্শে অনুভব করেন। এবং তখনই দেখিলেন নিজে, তিনি সম্যক সুলিখিত চরিত্র।

অনিলা জন্মগ্রহণ করিল।

অনিলা বাথটবে খেলায় উচ্ছল, কটে কি আশ্চর্য্যভাবে তাঁহারই দৃষ্টির উপর হাত রাখিয়া ঘুমায়; তাহার অনেক পরে, দুষ্টমী করিলে দরজার পাশে লুকায়, তাহার বোকামী শুধুমাত্র খাবার টেবিলেই ঘটিয়া উঠিত, এ সময় তাহার কণ্ঠস্বর স্পষ্ট টু টু জা ফোঃ টু থি জা সিক্স, ক্রমে অনিলা একা থাকিতে শিখিল, জানালায় পিতার প্রতীক্ষায় অদ্ভুত ভাবে দাঁড়ায় এবং কখন সখন ক্ষয়িষ্ণু দিন অথবা সুদূরতা দেখিবার মানসে। এ সকল পুরানো কথার সামনে দাঁড়াইয়া লাবণ্য দেবী মহাস্নেহ ভরে সজল, "ওনি অনিলা ওনিল" বলিয়া হয়ত ডাকিয়াছিলেন, কেননা তাঁহার ওষ্ঠদ্বয় দ্বিধা দেখা যায়।

কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত যাহার চিঠি পাঠে নিজে ভারাক্রান্ত অবশ হইয়াছেন; "আমার বাবার কথা সব সময় মনে পড়ে"।

"মাদার সুপ্যেরিয়রে কাছে যাই, তিনি জানো আমাকে বলেন, শোক (দুঃখ) তোমাকে ঠিক রাস্তা দেবে, বাবাকে সমস্ত সময় মনে রেখো ক্রমে তুমি উপলব্ধি করবে তাঁকে তিনিই মোক্ষ (!) দেবেন"।

"জানো মা স্বপ্নের মধ্যে আমি বাবাকে ডেকে উঠি—আমার মোটে ভয় করে না, আমি জানলায় দাঁড়াই, কোয়াডর‍্যাঙ্গলের ওদিকে ক্লাইষ্টারের আর্চগুলি দেখে অন্য মেয়েরা ভয় পায়—আমার ভাল লাগে, ওখানকার অন্ধকার নরম শান্ত সুখকর।

"বাবাকে আমি জীবনে ভুলতে পারব, যদি কখনও ভুলি আমি, মা, ও মা আমি ভাবতে পারি না—তার আগে যেন মরে যাই, তুমি আমাকে ভুলতে দিও না"।

এ সকল চিঠি একটার পর একটা পড়ার পরক্ষণেই, অপূর্ব্ব কেয়ারি-করা জবা রঙ মখমলে আচ্ছাদিত বেয়ারজেরে (বসবার গদীকরা চেয়ার) আপনাকে এলাইয়া দিয়াছেন।

তাহাদের বংশের কোথাও কখনও দহনপীড়া ছিল না, আর্ত্ত বলিয়া কিছু নাই; স্বস্তি সমতা যে কোন মূল্যে আসিয়াছে, বন্দুকেও পর্য্যন্ত সোনার ড্যামাসেনড করা; এই সুন্দর হস্তাক্ষরের বন্ধন তাঁহাকে যারপরনাই উৎপীড়িত করে, যন্ত্রণা তাঁহাকে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলে; প্রথমেই তাঁহার প্রতি চিঠি, পাঠে, মনে আসে অনিলাকে এই স্কুল ছাড়াইয়া কোন প্রটেষ্টানট স্কুলে দেওয়া দরকার। এখানে বড় বেশী ভগবান, অহরহ মালা জপ, দূরবীক্ষণ যন্ত্র যে বিশ্বাসের মূলে কোন অনিষ্ট হানিতে পারে নাই।

লাবণ্য দেবী এই বিরোধিতার পরক্ষণেই আপনকার দেহ এলাইয়া পুনরায়, সগর্ব্বে দিয়াছেন; মনে হইয়াছে কার্পেটের অন্যপার্শ্বে যে রোদ—তাহাকে বিমর্দ্দিত করিতে পারেন, এবং এখনই আপনার গোপনে এক বীজগত অন্ধকার রচনা করিতে সমর্থ, আর যে, এ রচনা কৌশল প্রাচীনতার শিল্প-নিদর্শন যদিও কিছু যাহার নদীমাতৃক—সময়ের বিশেষত্ব; আশ্চর্য্য! যে সেই অনেক করার সময়, সামনের অলিভ-তেলের—হেম সবুজতা তাঁহাকে অন্যমনা করিয়াছে, না কাজ তাহাকে সচেতন করিয়াছে! রচনাকে প্রবৃত্তিকে তাঁহার ভাল লাগে নাই—অপ্রীতিকর বলিয়া হয়ত বোধ হয়। এবং একাই অনিলা বলিয়া উচ্চস্বরে ডাকিয়া উঠিয়াছেন, আয়া ছুটিয়া আসিয়াছে, বেহারাও সচেতন হয়।

মিসেস মিত্রর সান্নিধ্যে যে প্রেরণা যে অভয় যে অস্তিত্বর সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাহা লাবণ্য দেবীকে সহজ করে; এই তাহাদের নিজস্ব সমাজ, এখানে প্রার্থনা নাই, জীবন শুধু বাকারো খেলার দাম্ভিকতা; তিনি আপনার সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়া এ বাস্তবতাকে লেহন করিয়াছিলেন। তাঁহার ঐ পরিচ্ছন্ন ছক দর্শনে,

চক্ষুর্দ্বয় কূট হইয়া উঠে—অনন্তর সুস্থির নিঃশ্বাসে স্বাভাবিক কপোল—তখনও আরক্তিম; এক সঙ্কল্প তাঁহাকে রোমাঞ্চিত করে।

যদিও এখন তাঁহার আবাল্য রূপের প্রাণ প্রাচুর্য্য কিছু বিষাদময়, তিনি অহেতুক রুগ্ন—উন্নত গ্রীবা শিথিল, পুনর্ব্বার তিনি আপনার চক্ষুর্দ্বয় কোন রূপে তুলিয়া মিসেস মিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। এ দৃষ্টি অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহের অগণন দর্শক মণ্ডলীকে দেখিতে পারে এবং তাহাদের প্রতিক্রিয়া জানিতে সক্ষম।

মিসেস মিত্র, লাবণ্য দেবীর দেহের সমস্ত বিলাসিতার, রুচি বোধের চিহ্নগুলি প্রকৃতরূপে, নিমেষেই পাঠ করিয়াছিলেন; তাঁহার আপনকার শরীর মধ্যে আজও শবর রমণী মরে নাই, এবং উহাই তাঁহার টোরসো; এখানেও, এক্ষেত্রেও অর্থাৎ লাবণ্য দেবীর মধ্যে তাহা বর্ণাঢ্য সজীব যাহার হাতে দিবসের সকল বাস্তবতা পুতুল; যে, যে কোন দিগন্তের পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্টিই হইতে পারে না। মিসেস মিত্র এইটুকু জানিয়া কহিলেন "ও আপনাকে মানে আ! কি মিষ্টি কি সুন্দর...অনিলা"।

লাবণ্য দেবীর নিকট ভদ্রমহিলার প্রতিটি বিশেষণ প্রশ্ন হইয়া দেখা দেয়, এ প্রশ্নগুলি যে স্তব্ধতা লইয়া বসিয়াছিল তাহা বিগত কয়েক মাস তাঁহাকে ঝটিতেই স্থবির করিয়াছে, এসময় তিনি অনেক কিছু দেখিয়াছেন, টাপেস্ট্রী, কাজ-করা আচ্ছাদনে ফুলগুলি কি রহস্যময় অথবা পেলমেট হইতে আলুলায়িত পর্দ্দার চঞ্চলতার ভাঁজ, অনিলার ঘোড়া 'রোজি'র অপূর্ব্ব ভঙ্গিমায় ঘুরিয়া ফেরা; এবং তিনি নিজে কি অদ্ভুতভাবে বসিয়া থাকেন পারিপার্শ্বিক জগত—তাঁহারাই সাক্ষাৎ কাছে—শুধু কারণ আবদ্ধ বাস্তবতা তাহা হয়ত মনে আছে গ্রামাঞ্চল এখানে ক্ষেতখামার হয় ইহার সহিত তাঁহাদের কোন সম্পর্ক নাই। বার বার তিনি এই সত্যে পৌঁছাইতে চাহিয়াছেন নিজের হাতের রূপা বাঁধান চিরুণীর প্রতি চাহিয়াছেন।

লাবণ্য দেবী শূন্যদৃষ্টিতে সহসা বলিলেন, "অনিলা এখন খুব বড় হয়েছে।"

কেন যে একথা বলিলেন তাহার সুসঙ্গত সংযত কারণ ছিল না। অন্যপক্ষে এ উক্তির আওয়াজে গর্বের রেশ নাই; অথচ যদি মিসেস মিত্র মনোযোগ দিয়া শুনিতেন তাহা হইলে অসহায়তার লক্ষণ অনুভবে আপনকার তীক্ষ্ণ ভ্রূ সবিস্ময় কুঞ্চিত করিতেন নিশ্চয়; মিসেস মিত্র অহেতুক চোখ দুইটি বড় করিয়া কহিলেন "আ গুডনিস" ইহার পরক্ষণেই অভিযোগ করিয়া বলিলেন, "এতদিন এসেছেন অথচ আমাকে একটা..." বলিয়াই মনে লাগা ভাবাপন্ন হইয়া লাবণ্য দেবীর দিকে স্পষ্ট করিয়া নিরীক্ষণ করিতেই তাঁহার মুখখানি উন্মুক্ত হইয়া গেল।

লাবণ্য দেবীর আঙুলের হীরকখণ্ড তাঁহাকে বিদ্যুত আহত করে তাঁহাকে প্রথমে ছোট বিন্দুমাত্র পরক্ষণেই সুদীর্ঘ করিয়া তুলে, এ কারণে যে এই উজ্জলতার কাছে হার স্বীকার করিতে পরম সুখ, এ মর্ম্ম বেদনা তাঁহাকে গভীরতা দিয়াছে, নিজের অলক্ষ্যেই মিসেস মিত্র আপনার সুতলী মুক্তার হারে হাত স্পর্শ করেন; এবং নিজেকে প্রস্তুত করিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, "কি স্পেনডিড্ অসম্ভব চোমৎকার...অদ্ভুত..."

লাবণ্য দেবী এ হীরকখণ্ড হইতে এক আশ্চর্য্য শীত বোধ করিয়াছিলেন। আপেলের রক্তিমতার পিছনে শৈত্য নিশ্চিত সহজতা, এবং স্বাভাবিক। কিন্তু শীত যে কোন সম্বন্ধকে—খুসীভরা আহ্বানে, ডাকে, যে ডাকে মাঠে প্রান্তরে অদ্ভুত ভাবে প্রতিধ্বনিত হয়—যে ডাকে, তাহাকেই নিজের কাছে নিজেকেই নিকটতম করে, উহাকে তাহাকে পাংশু বর্ণ করে।

"এমন আংটি মানে হীরে দেখেছিলাম জানেন, দি ডাউয়জ্বার রাণী...এটা কবে কিনলেন, বেলজিয়াম কাট...প্লেটিয়াম হীরে খুব মানিয়েছে...আপনার স্বামী কি ভালবাসেন আপনাকে..." ও কথাগুলি আলগা কিন্তু এই ভাবে এখানে নিজেকে ব্যক্ত করা সমীচীন। পরে হঠাৎ লাবণ্য দেবীর মুখের প্রতি চাহিয়া কহিলেন "আঃ কি ক্লান্ত লাগছে আপনাকে...মনে হচ্ছে আপনার ঘুম ভাল হয়নি।"

লাবণ্য দেবী এ সহানুভূতিতে, তীব্র দৃষ্টিতে নিজের আশপাশ লক্ষ্য করত আপনাকে কিছুটা সজাগ করিয়াছিলেন, একদা মনে হয়, যে স্বীয় মনোভাব সুস্পষ্ট হইয়া হয়ত উঠিয়াছে, উত্তর করিলেন, "একটু ক্লান্ত..."

লাবণ্য দেবীর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া মিসেস মিত্র আধো গলায় ডাকিলেন, "ডি পি এই হীরেটা দেখ, দারুণ নয়...দেখ বেচারীকে কি ক্লান্ত লাগছে..."

'একটু ক্লান্ত লাগছে' এই উত্তর যখন আপনার ধমনীতে পথ করিল, তখন অন্য আর এক সংজ্ঞার আশ্রয় নয়; তিনি অচিরাৎ দেখিলেন, পিয়ানোর মাওঃগনী পালিশে আপনকার দ্বীপময় প্রতিবিম্ব, কপোলোর বর্ণচ্ছটা স্থির, ইহার জন্য কোন...পূরকের হয় নাই, একমাত্র মৃদু হাস্য দ্বারা উহা দিব্য হয়। ধীরে লাবণ্য দেবী ডালা খুলিয়াছেন, আঙুল পর্দ্দার উপর দিয়া এলোমেলো, ভাবময়; কর্ড নাই, তাহার মাত্রায় কিছু একটা সঙ্কেত আনয়ন করিত হয়ত, এবং এসময় তাঁহার মুখনিঃসৃত একটি মাত্র পদ শ্রুত হয়, যে "অনিলা বড় হয়েছে" নানাভাবে তিনি বলিয়াছিলেন।

কিন্তু কখনই, ছন্দে বা সুখকর আওয়াজের সহিত সে পদ মিলাইতে পারেন নাই। বারম্বার উচ্চারণে যে বিচারটি বুঝিয়া লইতে চাহিয়াছিলেন তাহা হয় এই যে, 'অনিলা বড় হয়েছে'।

এই কথাগুলি তাঁহাকে নিঃশেষিত করে 'এখন বড় হয়েছে' বলিতে কি অর্থ হয়, শুধু সে কি তাহার গোলাপী-ফিতা বন্ধ বোকামীকে ছেলেমানুষীকে নিজেই বিদ্রূপ করিতে পারিবে—একদা অনিলা সহিসের মেয়ের পায়ে স্বহস্তে জুতা পরাইতে সাহায্য করে, যেমন রোজির সহিত সে অনর্গল কথা কহিত, উহার ছোলা পর্য্যন্ত মুখে দেয়—সে যে যে সে আর এক।

আর এক বলিতে সকল অর্থে, ক্রমাগত স্বতন্ত্রতার মধ্যে! কিন্তু লাবণ্য দেবীর এই সূত্রে মনে পড়া উচিত ছিল, অনিলার অনেক বিস্ময়ও ছিল, যথা পিয়ানোর চাবি এতটুকু কেন? এ ধরণের বহু প্রশ্ন। এইসকল সৌন্দর্য্যের মধ্যে দিয়া অনিলা কি বয়ঃসন্ধির দিকে অগ্রসর হইতেছে।

এ ক্লান্তি আজ নয় বহুদিনের, অনিলার জন্যই এ ক্লান্তি, একটু রোদ, একটু বৃষ্টি, একটু ঠাণ্ডা, নিয়মিত তাহার প্রতি যত্নবান হওয়া, তাহার জন্য ঘরের চারিপাশে, এমন কি বাগানেও তাহার জন্য আপনার ঐতিহ্য দ্বারা পূর্ণ প্রকৃতি সৃষ্টি করিয়াছেন, যেখানে অনিলা কালযাপন করিবে তাহাকে সুখী করিবে।

অবশ্য, আমরা জানি, যদি কখনও ইহার পরও অনিলা অসুস্থ হইয়াছে, তিনি গৃহের কাহাকেও নিদ্রা যাইতে দেন নাই, একদা অনিলার হাতে ভিখারীর হাত সংযোগে, লাবণ্য দেবী কালো দুশ্চিন্তায়, কতশতবার না লাইজল দিয়া তাহার হাত ধুয়াইয়াছেন; মনে পড়ে, এই প্রক্রিয়ার মধ্যে অনিলা তাঁহার প্রতি বিমূঢ়ভাবে চাহিয়াছিল।

এসকল বিচার তাঁহার পূর্ব্ব দক্ষিণধর্ম্মী জ্ঞান দ্বারা ক্রমান্বয় নিষ্পত্তি করিতে যখন তেজহীন, তখন ক্ষিপ্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "আমি যে অনেক বড়..." এ ক্ষিপ্ত-উন্মত্ততা বড় ভয়ঙ্কর, একারণে যে অসহায়তা তাহার সকল কিছু বিনিদ্রতা লইয়া লাবণ্য দেবীর ইদুউয়ম রাত্র বৈখারী কেশরাশির কবরীবন্ধন রীতি।

তবু সাহস সঞ্চয় করত দেখিতে চাহিলেন, রক্তবিধৌত প্ল্যাটফর্মের মধ্যে অনিলাকে স্তন্যদানে গম্ভীর, সহজ, তন্ময়, আত্মস্থ অথচ ঘুমন্ত নহে, অলৌকিক সচেতনতা তাঁহাকে কম্পমান, রোমাঞ্চিত করে; রক্তের আভায় মাতা ও কন্যার এ-দৃশ্যে পোড়া মাটির মাধুর্য্যে সুললিত ইহাকে প্রতিধ্বনি করিয়া শিঙা বাজিয়া উঠিয়াছিল।

মিসেস মিত্রর ডাকে তাঁহার স্বামী আসিয়া, অতীব সহবত বিনয়ে, হীরকখণ্ড দেখিয়া প্রথমে মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আঃ সত্যই বাস্তবিক...চমৎকার...আপনি কেমন আছেন...রয় কেমন আছে...?"

রয় কথাটির সঙ্গে সঙ্গে লাবণ্য দেবীর মারাত্মক...'ইস্' বলিয়া উঠেন, এখন, এখানে শুধু ভ্রূদ্বয় কুঞ্চিত করাতেই, এ উক্তি নিশ্চয়ই শ্রুত হয়, তবু এরূপ বিলাপ পূর্ব্বে, বলিয়াছিলেন যেন, তারপর লক্ষবার নিঃশ্বাসের মধ্যে কখন মিলাইয়া গিয়াছে, এখন তাঁহার কানের পান্না বসান ট্যাবগুলি ইতঃস্তত করে, মনে মনে তিনি ইস্ কথাটি এবার, আর একবার উচ্চারণ করিলেন, এমনি ক্ষোভ ও আর্ত্ত জনিত "ইস্" একদা তিনিই বলিয়া উঠিয়াছিলেন। কে একজন, তখন সকাল, কেয়ারিকরা চেয়ারে বসিয়া সাদা কাগজে চোখ রাখিয়া একাগ্র, তাহারই নিকটে কালো পাথরের পাশ-টেবিলে কিছু সোনার জলের কাজ এবং অতৃপ্ত অন্ধকারের ফুলকারি শিল্পকর্ম্ম চেতনায় লাস্যময়, ইহারই উপর, একটি জাপানী ফুলসজ্জার গ্রন্থ, পাশেই তিব্বতীয় আধারে গঙ্গা যমুনা করা তাম্র পাত্রে শ্বেত পদ্ম—পাপড়ীর জলকণা, বহু বিলুপ্ত নগরীর রাত্র-আকাশের ইঙ্গিত—কর্ম্মব্যস্ত লোকটি সহসা অন্যমনস্কভাবে কলম ঝাড়িতেই কালির বিন্দু পড়িয়াছিল প্রত্যক্ষভাবে পাপড়ীতে পরোক্ষভাবে সকালের রোদের রশ্মিতে। লাবণ্য দেবী ইস্ বলিয়া উঠিয়াছিলেন। ক্ষুধার জ্বালায় তাঁহার আস্বাদ তিক্ত, তাঁহার বস্ত্র কেহ ঝটিতি হরণ করিল, এবং

এবম্প্রকার নিষ্ঠুরতা দর্শনে তিনি 'ইস্' বলিয়াছিলেন। তাঁহার এ কণ্ঠস্বরে বহু তাত্ত্বিকের চিন্তা সূত্র ছিল—ইহার ফলে লাবণ্য দেবী, বিমর্ষ হইয়াছিলেন।

এখন 'রয় কেমন আছে'র উত্তরে তিনি 'ইস্' বলিয়া উঠিতে বাধ্য হন, পদদ্বয় অতিশয় ভারী বোধ হয়, এবং তিনি ঈষৎ বেসামাল, এ কারণে খুট খট শব্দ শোনা যায়, অজস্র নিঃশ্বাস পার হইয়া সেই গলিত সকাল বেলাটা—যে মুহূর্ত্তে তিনি এবং তাঁহার সম্মুখে পদ্ম ব্যতীত আর কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না, এখন তাঁহার দৃষ্টিকে পীড়িত করিতে থাকে, হায় মানুষ নিজের মনকে কবে অমানুষের মতন নিজেদের হাতে পাইবে! ঐ স্মৃতি না মনে করিলেই ছিল ভাল, সে দিনকার সূক্ষ্মতা-বোধ সত্যই কি অদৃশ্য হইয়াছে।

মিসেস মিত্র খুব খুসী সহকারে বলিলেন, "কালকে আসুন না, আমরা একজন দারুণ রাঁধুনী পেয়েছি ঠিক ঠিক পোষান, মনে রাখবেন, আপনি একে খুব ভালবাসেন, মনে আছে..."

লাবণ্য দেবীর সত্যই মিসেস মিত্রকে প্রয়োজন ছিল, নিজেকে কোনরূপে প্রস্তুত করত, তাহার প্রতি কিছুক্ষণ অবাক মনে তাকাইয়া ধীরে বলিলেন, "আপনারা দুজনে আমার সঙ্গে চা খান, বিকেলে হোয়াইট ওয়েজে..."

"হোয়াইট ওয়েজ খুব ভাল ডিপি..."

"আমি দুঃখিত, সময় করে উঠতে পারব না...আঃ ট্রেন..."

অর্থাৎ অনিলা আসিতেছে। সে পুত্র না কন্যা! সে নিশ্চয়ই জানে একটা পর্দ্দা কোন সম্পূর্ণ রাগ নির্ণয় করে না, এইটুকু ভাবনা তাঁহার শেষ সম্বল হইয়াছিল। তবু এতাবৎ মানসিক বহুধাবৃত্তি সংবদ্ধ হইয়া তাঁহাকে ধীরে স্থূলতায় পরিবর্ত্তিত করে।

মিসেস মিত্রকে বিকালে চায়ে নিমন্ত্রণ করিতে পারার জন্য ছোট একটি স্বস্তি ছিল, এই স্বস্তি তাঁহাকে কিয়ৎ পরিমাণে সাধারণ করিয়া রাখে। তিনি ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন, অন্য প্ল্যাটফর্ম হইতে লাল পোষাক পরিহিত অগণন কুলি ইতঃমধ্যে লাইন-গহ্বরে নেমে, হাতের ভর দিয়া এই প্ল্যাটফর্মে উঠিয়া পড়ে, আদ-ভেজা প্ল্যাটফর্মে নানান হাত আর পায়ের ছাপ, এই দুর্দ্ধর্ষ ব্যস্ততায় তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল, সমস্ত কিছুর উপর একরঙা টান, লাবণ্য দেবীকে অহেতুক দুর্ব্বল করে, তিনি যে কোন অবলম্বন চাহিলেন।

এখানকার সমস্ত শূন্যতা একটি, পতঙ্গ-খচিত ব্যস্ততায় নিপট আকার ধারণ করে, পারিপার্শ্বিক সকল কিছু বাঙ্ময়, আসন্ন মিলনের উদ্বেগ অর্থাৎ প্রতীক্ষার দুর্ব্বিনীত শীতে সমবেত সকলেই বিহ্বল। লাবণ্য দেবী আপনকার ছোট বিশ্বাস লইয়া দণ্ডায়মানা, গোপন অভিমান কখন যে তাঁহার ওষ্ঠ দংশনে অস্থির তাহা তিনি জানিতেন না।

লাবণ্য দেবীর মুখখানি আগত ট্রেনের কামরা পার হওয়া অনুযায়ী মন্ত্রচালিতের মত আন্দোলিত হয়; অবশেষে এই বহুভাবনার ট্রেন হাওড়ায় পৌঁছিল। অনিলার ট্রেন আসিয়াছে।

ঈষৎ সম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়া চারিদিকে তাকাইতে, দেখিলেন, আলিঙ্গন, ভূমিষ্ঠ প্রণাম, করমর্দ্দন, চুম্বন, এ সকল কিছু তাঁহাকে এতই বিমোহিত করে যে তিনি নিশ্চল, বিশেষ নক্ষত্রের সহায় ছাড়া তাঁহার অগ্রসর হইবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত নাই। অথচ জানালার বাটে অনিলাকে দেখিয়াছিলেন।

অনিলা তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল; তাহার সৌন্দর্য্য দর্শনে লাবণ্য দেবী নমনীয়; হয়ত একই সঙ্গে, খুসী এবং ভীতি দুইই তাঁহার মধ্যে সঞ্চারিত হয়। অদূরে শুভ্র পোষাক পরিহিতা; মস্তকে সাদা বনেট, একটি আবাল্য কৃচ্ছ্রসাধনে প্রশান্ত মুখমণ্ডলের নিম্নে ভাস্বর ক্রুশ, শেষ বিবৃতি, দ্বিধার মধ্যে স্থির হইতে চাহে, ইহা তাঁহাকে, লাবণ্য দেবীকে, স্পর্শ করে, এবং তিনি আপনার কণ্ঠে আঙুলের চাপ দিলেন। একারণে যে, এ ক্রুশের পাশেই আর একটি সম্ভ্রান্ত অনির্ব্বচনীয় মুখমণ্ডল ছিল, যাহার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করার ইহা প্রস্তুতিমাত্র।

অনিলা তাহার মাকে অনুসন্ধান নিমিত্ত অতি শান্তভাবে এদিক সেদিকে চাহিতেছিল, সুদীর্ঘ মঙ্গোলীয় চক্ষুর্দ্বয় সুদূর পথশ্রমে ক্লান্ত অথবা উহাদের প্রকৃতিই এই, তাহার চাহনিতে মনে হয়, কোন মরুভূমিতে শুইয়া রাত্রের ছায়াপথে, তারকায় আপনার হারমানা-মন দিয়া প্রিয়জনের আলেখ্য আঁকিতে নিযুক্ত ছিল। এখন দেখা যায়, অতীব নিষ্ঠার শ্রদ্ধার ভাঙন রক্তিম ওষ্ঠে চমকিত, মনোরম দন্তঃপাতি

উল্লসিত হয়, ফলে ধারণা করা যায় নিশ্চয়ই সে বলিয়াছে, 'ভগবানকে ধন্যবাদ' এবং এই সঙ্গে তাহার সুগঠিত গ্রীবা নিনীত হইল।

লাবণ্য দেবী আপন কন্যাকে এখন, এখানে দাঁড়াইয়া, অনেক মনে নিরীক্ষণ করত অনুচ্চ স্বরে ডাকিয়াছিলেন "ওনিলা ডার্লিং"; সে ডাক প্ল্যাটফর্মের গোলমালে মিশিয়া গেল। আজ হইতে এক যুগ আগের, কিছু বেশী, যে যন্ত্রণা কন্যার কারণে তাহার সর্ব্বশরীরকে নিপীড়িত করে, শুধুমাত্র ওষ্ঠ দংশনে যে যন্ত্রণার উপশম করিতে চেষ্টা করেন, সেইরূপ দংশন আরবার করিবার স্পৃহা জাগিয়া উঠিল।

দুরন্ত অচেনা ভীড় লাবণ্য দেবীকে ক্রমে, একদা, আপন দেহজাত শুভ্রতার সম্মুখে আনিয়া দিল; তাঁহার ভিতরের জামা (ব্রা) দুগ্ধক্ষরণে সিক্ত মনে হইল, তিনি যে কি করিবেন তাহা মনস্থ করিতে দ্বিধা আক্রান্ত, এ-শুভ্রতা অতি বিচিত্র, এখানে, হৃদিস্পন্দনের ছায়া পড়ে, তাঁহাকে খানিক মুহ্যমান করিলেও উহা আকর্ষণ করে, যদিও আপনার ব্যবহার সম্পর্কে আপনাকে শিক্ষিত করিয়া উঠা সম্ভব হয় নাই তবু কিছু সংযতভাবে আপন কন্যাকে প্রথমে ধীরে ধীরে ক্রমে বিশেষভাবে আলিঙ্গন আবদ্ধ করিল।

অনিলার কাছে লাবণ্য দেবীর সে তাপ যন্ত্রণা নয়; সে শুধু স্তব্ধভাবে মায়ের অস্থিরতা অনুভব করে, মনে মনে নিশ্চয়ই বলে "বেচারী মা", কতটা সান্ত্বনা দেওয়া যায় সে ভাবিতে চেষ্টা করে এবং আপনার সরলতা দিয়া মাকে দেখিয়া লইয়াছিল। এ সময়, নিকটে, দূরে খুব কাছে অজস্র ভক্তিপূর্ণ ভূমিষ্ঠ প্রণাম সে লক্ষ্য করে।

মায়ের এই সাদা সাধারণ বস্ত্র তাহাকে ব্যথা দেয়, জর্জ্জেট হাল্কা সবুজ রঙ বেশ ভাল হইত, অথচ মার দেহ হইতে সৌরভের গন্ধ, তাহাকে স্বাভাবিক করে, লাবণ্য দেবীর দৃঢ়তাকে সে স্পর্শে পাইয়াছিল, ফলে এবং গর্ব্বে আপনার মস্তক উন্নত হয়।

এমত সময়ে অন্য প্ল্যাটফর্মে ট্রেন ছাড়ার হৃদয় বিদারক শব্দ আসিল, বিচ্ছেদের, রুমাল নাড়ানর কারণ, এই হিম আহ্বান মা ও মেয়েকে যুগপৎ উন্মাদ করিয়া তুলিল; দুইজনেই বিভ্রান্ত, চকিতেই একে অন্যের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিল, দুজনেই আশ্রয়প্রার্থী।

অনিলার পাশেই তখনও সন্ন্যাসিনী দণ্ডায়মানা, লাবণ্য দেবী তাঁহাকে ভীত নয়নে দেখিয়াছিলেন; তাই চারিদিকের বিরাট লৌহ কাঠামোর প্রতি দৃষ্টি ফিরাইতে তৎপর। লাবণ্য দেবী এ সময় আশ্রয়প্রার্থী হইলেও কন্যাকে আপনার শরীর দিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন, সংস্কার হয় যে অনিলা তাঁহারই অংশ।

অনিলা বুঝা যায়, আপনার আবেগ সম্বরণ, এযাবৎ, করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, আর সম্ভব হইল না। চক্ষু লাল, অভিমানী জলধারা।

সন্ন্যাসিনী ধীর কণ্ঠে কহিলেন, "আর নয় ডিয়া তোমার বাবা তাঁর কাছে গেছেন তিনিই শান্তি।"

অনিলা মনে হইল যেন বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়া দাঁতে ওষ্ঠ চাপিয়া উত্তর করিল, "জানি কিন্তু আমরা কি পাপ করলাম।"

"আঃ ডিআ বিশ্বাস রাখ ভগবানকে বিশ্বাস কর, তারই ইচ্ছা—।"

এই ইচ্ছা বাক্যটি একমাত্র মরজগতের ধীসম্পন্ন কথা, কি অমোঘ আবিষ্কার, ইহাতে অনিলার চোখের জল আপনি শুকায়, সে তাহার মার দিকে প্রীতির চোখে চাহিল; দেখিল মা কেমন একটু অসহায়। ইতিমধ্যে অনিলার হাত যাহা এতক্ষণ মুঠা করিয়াছিল, অনিলা 'মা' মৃদু কণ্ঠে বলিয়া তাঁহারই চোখের নিম্নে আপনার হস্ত প্রসারিত করে।

লকেটে তাহার পিতার ছবি। যে পিতা তাহার কাছে গিয়াছেন, যিনি একমাত্র শান্তি।

লাবণ্য দেবীর ছবির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেই প্রথমেই ভাবিলেন, কি ছেলেমানুষী—এই স্টেশনে।

অনিলা সুন্দর করিয়া বলিল—"দেখ মা—"

লাবণ্য দেবী মুখ কেমন ভূতগ্রস্ত, চক্ষু দুটিতে কর্কশ আওয়াজ, তিনি নিজেই, চিত্রের মানুষটিকে এক ভয়ঙ্কর রমণীসুলভ হুঙ্কারে বিদ্রাবিত করিবার মানসে মুখ, মনে হয় ব্যাদান করিতে উন্মাদ। তবু রমণী আপনাকে ঝটিতি সম্বরণ করিয়াছিলেন, এবং ম্লানভাবে হাসিয়া, নিজের এই উন্মাদনার কথা ভ্রূকুঞ্চিত করত ভাবিতে ভাবিতে, ধীরে প্রকাশ করিলেন "বেচারী" বলিয়া তখনই যুক্তিপূর্ণ মনে আপনার এ হেন অশ্লীলতা বিষয়ে ভাবিয়া শঙ্কিত হইয়াছিলেন। কেননা ঘুমের মধ্যে তিনি জাগিয়া থাকিতে আগ্রহান্বিত। পুনর্ব্বার স্নেহসিক্ত কণ্ঠে বলিয়াছিলেন "ওনিলা ডিয়া"।

অনিলার সুন্দর লাল হাতের মধ্যে ছোট ছবিটি অসম্ভব জীবিত, মানুষের এত ভালবাসা স্মৃতিতেও আবদ্ধ। এই তাহার দিনা পরিচ্ছন্ন ইঙ্গিত, সে ছবিটির প্রতি দৃষ্টিপাত করত কহিল "বাবা", গভীর আনন্দে তাহার মুখ নিঃসৃত লালা বহির্গত হয়, এবং সে দেহ আন্দোলিত করিয়া আগু পাছু করে। তাহার প্রার্থী কণ্ঠস্বর মধ্যে আলো আলো ভাব ছিল যে ভাব যে ভাবে আমাদের কল্পনা বড় বিস্তীর্ণ দূরে, আলো তাহার সংখ্যায় আপনাকে নিঙড়াইয়া একটি মুহূর্তের ছবিকে বুকে করিয়া আসিয়া পরিদৃশ্যমান পৃথিবীকে তাহার কাণাকড়া হইতে মুক্তি দিয়াছে। অল্প লালা অনিলার অজ্ঞাতসারে তাহার পেলব অধরকে রসালাঞ্চিত করিল।

অনিলার অনাকাঙ্ক্ষণীয় সৌন্দর্য্য রসসিক্ত অধর লাবণ্য দেবী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। কোনক্রমে একটি নিঃশ্বাস লইতেই বুঝিলেন তিনি এখনও ভীতা! একবার মনে হইল, অনিলা কি উন্মাদ, কেননা এসময় অনিলা লকেটটি নিজের উন্নত বক্ষে বারম্বার স্পর্শ করিতেছিল। পরে সুডৌল কপালে লাগিয়া রাখিল।

অনিলা মার দিকে গভীর চোখে চাহিয়া কহিল, "মা তোমাকে বড় ক্লান্ত লাগছে—বেচারী মা।"

লাবণ্য দেবী অনেকক্ষণ পর স্বাভাবিকতা লাভ করিলেন, "ও না এমন কিছু নয় ডিয়া—চল যাওয়া যাক" বলার সঙ্গে সঙ্গে অনিলার জিনিষপত্তরের দিকে লক্ষ্য করিতেই আহত হইলেন, তাঁহার চোখে পড়ল বড় বড় হরফে লেখা অনিলার বই। তখনই দৃষ্টি ফিরাইয়া অন্যত্রে চাহিলেন।

লাবণ্য দেবী অবশ্যই অনেক সহজভাবে ইহা গ্রহণ করিতে চাহিলেন।

অনিলা এখন সহসা বলিল, "অন্য অন্য বার বাবা আসত—এবার—ছোট দীর্ঘশ্বাস শোনা গেল। শিশুর মত ছোট শ্বাস এ নয়, আজ অনেকদিন ধরিয়া জমিয়া উঠা—অজস্রবার করাঘাতের সঙ্কেতে গভীর।

তাহারা দুইজনে, এবং সন্ন্যাসিনী জনস্রোতের পিছনে পিছনে ধীরে অগ্রসর হইতেছিলেন। মার একটি হাতের মধ্যে তাহার হাত, লাবণ্য দেবীকে সে স্পষ্ট করিয়া নিরীক্ষণ করিয়াছিল, সরু চিকণ রেখার এখানে সেখানে তাহার মা সারা মুখখানিতেও ভাঙা কপাল—অনাদৃত জীবনের বিষাদ, সে অভিজ্ঞতাপূর্ণ ভাষায় ধীরে বলিল, "বেচারী মা" বলিয়া লাবণ্য দেবীর বাহুতে মস্তকটি হেলাইয়া দিল। অনিলা যখন 'মা' বলে তখন মনে হয় কোন আদর্শবাদকেই নিজস্ব বিচার নহে, তাহার সে আহ্বান করিতেছে।

মার সাজসজ্জা দেখিয়া সত্যই দুঃখ হয় (অবশ্য ঠিক বাঙালী বিধবাদের মত সাজ নয়) এবং গর্বও হয়, অন্যান্য অনেককে সে দেখিয়াছে তাহারা কেহ লাবণ্য দেবীর মত নহে, তাহাদের হাতের সিগারেট ইত্যাদি তাহাকে বিরক্ত করিত, অবশ্য ইহা তাহার নিজস্ব বিচার নহে, তাহার বাবা ভালবাসিতেন না।

লাবণ্য দেবী এক মনে সন্ন্যাসিনীর নিকট হইতে অনিলার কথা শুনিতে ছিলেন; সন্ন্যাসিনী অভয় দিয়াছিলেন, "হয়ত আপনার কাছে এসে খানিকটা অন্যরূপ হতে পারে—তা না হলে পাগল হয়ে যাবে; সবই থাকে বড় ভালবাসে কিন্তু এই ভাবে অনবরত বাবার সঙ্গে কথা বলা—"

"চিন্তার কথা।"

অনিলা যোগ দিল, "তা নয় মাদা সুপেরিঅর আমাকে প্রার্থনা করতে বললেন—এখন আর তেমন নেই"

"এখন আর তেমন নেই না আছে একা চুপ করে বসে থাকা—ছবি মুঠো করে—।"

"জানো মা বাবা আমার কাছে ভগবান জানো—"

"কি যে বলো" বলিয়াই লাবণ্য দেবী আপন মনোভাবকে পরিষ্কার করিলেন, "এ সব মনেই রাখতে হয় ডিয়া না হলে"

"পাগল বলবে আমি চাই।"

লাবণ্য দেবী তাহার, হয়ত এখন সম্ভব নহে, উক্তিতে সহসা থামিয়া পড়িয়াছিলেন, একটি পাঞ্জাবী রমণী তাহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। এবং তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া, আবার চলিতে আরম্ভ করেন। শুধু অল্প দৃঢ় স্বরে বলিয়াছিলেন, "অমন কর না ডিয়া আমার ভয় করে আর উনি বা

কি ভাবেন।"

"ওরা জানে না, তবে তোমাকে আমি দুঃখিত করব না"।

অনিলার এই সরল প্রতিজ্ঞা তাঁহাকে সাহস দেয়, পরক্ষণে নিজের দুর্জ্জয় ক্ষমতাকে তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন, যাহার দ্বারা সমস্ত কিছুকে আপনার মত গড়িয়া তুলিতে পারিবেন। এবং এ সময় অনিলাকে কটাক্ষপাতে দেখিয়া হর্ষ হয়, আলিঙ্গনে যাহা উপলব্ধি হইয়াছে যে অনিলার মধ্যে সত্যই সমগ্র লক্ষণ আসিয়াছে। যে অনিলার রমণী দেহে ব্যাঘ্র বিশদ রূপের খর দাপট পাহাড়ী বুলির বেদনা সম্ভূত—অবশ্য যদিও বালকবৎ ভাব এখনও আছে, তাহা উধাও হইতে কতক্ষণ, নিশ্চয়ই সে তাঁহাকে বুঝিবে।

পরক্ষণেই কন্যাকে লক্ষ্য আরবার করিয়া ভীত হইলেন, এবং তিনি আপনকার সমস্ত আন্দোলন করত দাঁতে দাঁত ঘর্ষণ করিয়াছিলেন, "তাতে কি হয়েছে কি হয়েছে" শুধু ইহাই নহে, নিজ দেহকে সদর্পে আপনার মনের মধ্যে লইয়া যাইতে প্রস্তুত, চারিদিকের বস্তুসমূহকে তাহার আয়ত চক্ষুর প্রখরতা মর্দ্দিত করিতে চাহিল, আর যে, ক্রমে, অন্যপক্ষে, তিনি নিজেই শঙ্কিত ফলে হস্তদ্বয় বাষ্পময়।

অনিলা যে এইরূপ দুর্দ্ধর্ষ সত্য, একথা তিনি মনে জানিলেও চোখে ছিল না, এই নবতম সত্যটি, বিড়ালের কঙ্কালে পেচকের কণ্ঠস্বর নির্ম্মিত দেহ লইয়া পদশ্চারণা করিতেছিল, আসে যায়। এখন, স্খলিত বস্ত্রপ্রান্ত যথাযথ করার কৌশল যুক্ত অতি সাধারণ মন দিয়া অনায়াসেই ঘোষণা আর করিতে পারিলেন না 'তাতে কি হয়েছে'। অনিলাকে এবং মানসিকতাকে বড় কঠিন বলিয়া বোধ হয়। কেননা অনিলার গলার আওয়াজ সুদৃঢ়।

এই বিরাট ইস্টিশানের ফেঁসে ফেঁসে পড়া আলোর মধ্যে দিয়া তাঁহারা চলিয়াছেন, লাবণ্য দেবী এতক্ষণে অনুভব করিলেন, 'তাতে কি হয়েছে' বলিতে পারার জন্য যে সিদ্ধির উপর তিনি বিশ্বাস করিয়াছিলেন তাহা সর্ব্বৈব অর্থহীন, যদি তাঁহার কোন যোগ্যতা থাকিত, তাহা হইলে, তিনি সহজেই এই প্রত্যয়ে আসিতে পারিতেন যে, ফুলের রেখা আর আলোকের বাস্তবতা মিলিয়া যে ন্যায় সৃষ্টি করিয়াছে তাহা শুধুমাত্র তাঁহারই যে কোন পদবিপক্ষকে যুক্তিযুক্ত করার জন্যই—আর যে এখনই দূর কোন দেশে গোলাপের ক্ষেতে যাহারা কর্ম্মক্লান্ত হয়, তাহা শুধু এই বিশাল পরিদৃশ্যমান বাহ্যজগতকে কেবলমাত্র তাঁহারই অন্তরজগতে পরিবর্ত্তিত করার উদ্দেশ্যে উহাদের, ঐ কণ্টকিত পরিশ্রম। কিন্তু লাবণ্য দেবী অনিলার মা, যে অনিলার বহুদীর্ঘকাল উপস্থিত, যে অনিলা জ্যোতির্ম্ময়ী।

লাবণ্য দেবী মনস্থ করিয়াছিলেন, কোন অনুতাপ নয়, তবু অনিলাকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার যে ভালবাসা উজ্জীবিত হইয়াছিল, ইদানীং, অস্বীকার করিবার নয়, যে অতিশয় ছেলেখেলায় উহা পরিণত; অনিলার 'বাবা' বলিয়া ডাকিয়া উঠা তাঁহাকে অনেক কথাই স্মরণ করাইয়া দিয়াছিল।

গঙ্গাকিশোরকে লাবণ্য দেবী বহুদিন পর প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলেন। গঙ্গাকিশোর যে ঘরে মারা যায়, সেখানকার ভীতিপ্রদ অন্ধকার, তবু সেখানে, ঘরে, কে একটি প্রদীপ জ্বালিয়া দিয়াছিল, (নিশ্চয়ই রুক্মিণী আয়া) প্রদীপের শিখা একের বিদ্যমানতার সাক্ষ্যরূপে কম্পিত; লাবণ্য দেবীর তাহা মনে আছে; এ-শিখা শুধু অন্ধকার আছে ইহাই ইঙ্গিত করিয়াছে—এবং প্রথমে শোকাতুরা ভীত হইয়াছিলেন।

এই ঘোরকর্ম্মা বাস্তবতা তাঁহার জানা ছিল না; লাবণ্য দেবীকে ইহা আকর্ষণ করে, স্থান ভেদে দূরত্ব, অন্য ঘর হইতে এইটুকু আসার মধ্যে, কিছু নয়; তিনি আলুলায়িত কেশে, উৎকৃষ্ট আঙুরলতা-কেয়ারী-করা দরজার বাজু ধরিয়া দাঁড়াইলেন, কাঁচের এচিঙের ছায়া তাঁহার দেহে, কখনও মুখে; কক্ষস্থিত পিলসুজ আর প্রদীপ তাঁহাকে একনিবদ্ধ করিল। পিলসুজের সাদা শিল্পকর্ম্ম এখানে অনিবার্য্য একমাত্র—যাহার পাশে শিশুরা নিশ্চিন্তে ঘুমায়—ইহার যথাবিধি আকার তাঁহার গভীরতা হইতে কখন যে তাঁহার অগোচরে বাহির হইয়া, এ ক্ষেত্রে উপস্থিত, তাহা জানিবার অবসর হয় নাই, কেননা গঙ্গাকিশোরের মৃত্যু তাঁহাকে যারপরনাই পীড়িত করে, কেননা তাঁহার দিগ্‌ভ্রম হইয়াছিল, কেননা সৌন্দর্য্য বিনষ্ট হইয়াছিল, নাসার বেসর শ্রীহীন লাল।

তবু তিনি, এখানে দণ্ডায়মানা, অপলক নেত্রে অনুধাবন করিলেন কিম্বা সংস্কারেই, যে পিলসুজ মুহূর্ত্তকে অবলম্বন করত ক্রমাগতই আরও আরও ঊর্দ্ধে উঠিতেছে, নীলাম্বরী অবকাশ যেখানে; উহা এক বিরহী শেষহীন স্তম্ভ! হয়ত, পিলসুজের পলকাটা কারুকাজ লইয়া ইহার কারণ; অদর্শনে, লাবণ্য

দেবীর মনোহারী পদ্মযুক্ত চক্ষুর্দ্বয় ঝটিতি ছোট, তীক্ষ্ণ হইয়া যায়, ওষ্ঠদ্বয় ফুলাইয়া মনস্থ করিতে দ্বিধা করিলেন না যে "আমি পিলসুজ কিনিব প্রদীপ কিনিব"।

ইহা তাঁর দাম্ভিকতা, ইহা হয়ত খেয়াল, ইহা হয়ত অভিজাতের তেজ, তবু যে কোন সূত্রেই দাম্ভিক আত্মবিশ্বাস, যে দৃঢ়তা সহকারে, কারুকারিতার, রুপোর, আসনের, ফুলদানির প্রতি নানাবিধ দৃষ্টি কখনও দরজাকপাটের প্রতি, কন্যাকে অবলোকনে; এবং এ সময়ে, শুধুমাত্র তিনি যে বোধ করিয়াছিলেন, তিনি ক্লান্ত, এবং সময়ে, এখন, রাতের শয্যার মলিন দুষ্টতা। এইবার তিনি স্পষ্ট অক্ষরে, তাঁহার মুক্তার ন্যায় দন্তপাতি দেখা যায়, বলিলেন, "এ প্রদীপ পিলসুজ আমি ক্রয় করিব" কেননা উহা আমার দুঃখকে প্রচার করিবে।

এই সকল বাক্য দিয়া, কাচকে কূর্মপৃষ্ঠ, আর যে অনাদ্যন্ত বহমানতার আঙ্গিক যন্ত্র সকলকে নিখুঁত করে। লাবণ্য দেবী অসম্ভব নিশ্চিন্ত, আপনকার আলুলায়িত কেশরাজি নিমেষেই সুবিন্যস্ত হইল, অন্ধকারের পানে তিনি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

এ কক্ষ অন্ধকার, শবদেহ লইয়া যাওয়ার পরক্ষণেই বিধৌত হওয়ার ফলে, ইহার অলৌকিক ভিজা চেহারা এখনও, এখনও, থমকাইয়া আছে; নীলারুণ রঙ, কোথাও কোথাও, শূন্যতায় দুমড়াইয়া অবশ, জলাভূমি মোচড় দিয়া উঠিয়া অভাবনীয় নিমিত্ত হইয়া উন্নত, এই প্রথম অন্ধকারের ক্ষেত্রকে দেখা গেল। লাবণ্য দেবীর জিহ্বা, ওষ্ঠ ধীরে লেহন করে; এ কারণে যে তিনি এই দ্রবীভূত অন্ধকারকে আপনার রক্তগত সীমাহীনতা বলিয়া অনুভব করিয়াছিলেন, জ্ঞান করিয়াছিলেন, আপনার উদর শূন্য এবং সেখানেই উহা ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। ফলে গাত্রে ঝিলিক দেয়।

লাবণ্য দেবী এই অন্ধকার হইতে মুখখানি তুলিয়া চাহিতেই দেখিলেন, অন্যপার্শ্বে দরজার কাচের পাল্লা নক্সী কাজের মধ্যে রাতকামিজ পরা অনিলা, দুটি হাত ছাপের মত কাচের সমতল ক্ষেত্রে স্থাপিত, এক মনে এই কক্ষের দিকে চাহিয়া আছে, ধীরে সে চক্ষুদুটি তুলিয়া মার প্রতি নিবদ্ধ করে।

লাবণ্য দেবী তাঁহার প্রতি বিদ্যুতে চমকাইয়া উঠিলেন! চেতনা আলুলায়িত কেশরাশির দ্বারা আলোড়িত, ক্রমে তিনি সূচাগ্র, এবং এ সময়েও অন্ধকারকে অবলোকন করিতে ভুলেন নাই, যে হেতু উহা তাঁহার অমোঘ সীমাহীনতা যাঁহাকে তিনি দেহ দিয়াই বুঝিয়া লইতে সমুৎসুক - আর যে, এই কথার মধ্যে হইল, অনিলা কি করিয়া আসিল, সে ত এখানে নাই।

এমত সময়ে, তাঁহার হাত দুইটি উত্তোলিত হয়, হয়ত সেই সীমাহীনতা অবলম্বন করার জন্য অত্যাগ্রহে টাটা করিয়া উঠে, অথবা অন্য কোন কিছুকে পরক্ষণেই তাঁহার কণ্ঠ হইতে, অসংযত ভাবে, দেহ দমকিত হওয়ার বিকট বীভৎস পতঙ্গমিশ্রিত পাশবিক আওয়াজ নির্গত হইতেই তিনি ধরাশায়ী হইলেন, এখন, সেই আওয়াজ তাঁহার দেহ কম্পনে।

এ সময় যিনি তাঁহার সাহায্যের জন্য সত্বর ছুটিয়া আসিয়াছিলেন, তিনি এই সুন্দর বয়োত্তীর্ণ দেহ কম্পন দর্শনে ভয়ে, বিমূঢ়! অথবা এ কম্পনকে তিনি অনুধাবন করিতে, যে হেতু ইহার মনোহারিত্ব ছিল, একান্ত, তবু এই ত্রস্তপদ দৃশ্য হইতে ঝটিতি আপনাকে মুক্ত করত ইনি "রুকমি রুকমি" বলিয়া চীৎকারিয়া কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে গিয়া অবশেষে ছোট পাশ-টেবিল হইতে স্মেলিং সল্টের শিশিটি লইয়া আসিলেন। কেননা, লাবণ্য দেবী, এখন স্ত্রীলোক মাত্র—তাঁহার গুমরান আওয়াজ তাঁহাকে লোকটিকে সাধারণ করে।

রুকমি কোন রকমে আসিয়াছে, এখন সে আপনার বস্ত্র সম্বরণ করিতে পারে নাই, এ দৃশ্য দেখিয়া অদ্ভুত হা, মুখখানি শঙ্কায় উন্মুক্ত, কোন স্বর নাই, অনন্তর একটি বিকৃত স্বর নির্গত হওয়ার পর, সে বারবার ত্রাসে বলিয়াছিল "মেম সাব। মেম সাব?"

লাবণ্য দেবীর কাছে উহা অদ্ভুত সঙ্কেতময়, এ পালঙ্ক বিরাট আকাশের নীচে বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে আমাদের মনোভাবকে বিযুক্ত করে, এ দৃশ্য তাঁহার জানালা দিয়া তাহার প্রশস্ত ছাদের উপর হইতে দৃশ্যাবিষ্কার। পালঙ্কটি সরাইয়া লইবার আজ্ঞা দিতে তাঁহার বড় সঙ্কোচ হইয়াছে, এখন রঞ্জিত চ্যাটার্জির চোখের দিকে চাহিয়া একটু সাহস হইল, মনে মনে আপনার বক্তব্যকে সাজাইলেন "তুমি কি ঐ পালঙ্ক আড়াল করে দাঁড়াতে পারো কেননা এই চৌকোনা চেহারাটি কি চাঁদের আলোয়, কি রৌদ্রে আমাকে আক্রমণ করে, ক্রমাগতই আমার নিশ্বাস হরণ করিতেছে, আমি ক্ষুদ্র হইয়া যাই, তুমি আমার জন্যে এটুকু

প্রস্তুত করার পর বলিলেন, "আমি বড় একা...বড় একা।"

ক্ষয়িষ্ণু বিমূঢ় রঞ্জিত চ্যাটার্জ্জি তাঁহার একথা শুনিয়া নিমগাঢ়ে কহিলেন "আমরা আছি।"

লাবণ্য দেবীর মন মানিল না, তিনি বলিতে চাহিলেন, পালঙ্কটিকে আমার বড় বিশ্রী লাগে, বিশ্রী লাগে। পালঙ্কের দৃশ্য পালঙ্কের উপস্থিতি, এই প্রকৃতির মধ্যে একধারে অঙ্কুরিত ক্ষেত্র, কোথাও কর্ষিত জমি স্রোতউল্লিখিত কখনও, সমস্ত সৃজনকে বজ্রাহত করিয়াছে, কেননা আমার শয়নকে উহা পরিহাস, দেহকে ধূলিসাৎ, স্তনকে স্ফটিকময় করিতে উদ্যত; তুমি কি পালঙ্ককে আড়াল করিতে পার?

ইহার পর এই আর্ত্ত অবস্থাতেও লাবণ্য দেবী রঞ্জিত চ্যাটার্জ্জিকে ভালরূপে দেখিলেন, এবং মৃদু ওষ্ঠ কম্পিত হইল, সম্ভবত তিনি হাসিয়াছিলেন, এ স্মিত হাস্যের অর্থ, এই, যে প্রশ্ন করিব তাহার উত্তর কি তুমি দিতে সক্ষম। তাই যদি হয়, আড়ালই যদি নাই করিতে পার—তুমি কি ঐ পালঙ্কে শয়ন করিতে সাহসী...

রঞ্জিত চ্যাটার্জ্জি এই স্মিত হাস্যের দিকে অনিমেষ নয়নে চাহিয়াছিলেন। সহসা আপনার বেশের প্রতি তাহার লক্ষ্য হইল এবং ঘড়ি ড্রেস ওয়াচটি অতীব সন্তর্পণে, লাবণ্য দেবীর অলক্ষ্যে, কোন মতে বাহির করত দেখিলেন এখন রাত আটটা; ঘড়িটি যথা স্থানে রাখিয়া নিজেকে প্রস্তুত করিয়া বলিলেন "মিসেস রয়..."

লাবণ্য দেবী আপনকার ভারাক্রান্ত মস্তক এমত ভাবে নামাইলেন, যেন তিনি বলিয়াছেন "ঐ ঘরের অন্ধকারকে আমি জন্ম দান করতে পারি"।

"আপনি কি এখন...উঠতে পারবেন"

"কোথায় যাব?"

"ও ঘরে, মিসেস রয়, আপনি বড় অসুস্থ" ইহার পর যে কথা বলার প্রয়োজন, রঞ্জিত চ্যাটার্জ্জি তাহা বলিতে ইতস্তত করিলেন; যে তাঁহার নিমন্ত্রণ আছে; শুধু বলিলেন "আপনার ঘুম দরকার"।

লাবণ্য দেবীকে সাহায্য করিতে হয় নাই; তিনি স্খলিত পদে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; রঞ্জিত চ্যাটার্জ্জি নিজের পোষাক পরিচ্ছদের ঠিক দিতে বুঝিয়াছিলেন কোথাও কোথাও পাট নষ্ট হইয়াছে; আপনার গোপনেই বিন্যস্ত করিবার প্রয়াস পাইলেন; ইনি দরজার চৌকাঠে, লাবণ্য দেবী খাটে বসিয়াছেন।

"একটা টেলিফোন করবো..."

লাবণ্য দেবীর অবস্থা রঞ্জিত চ্যাটার্জ্জিকে যারপরনাই দুঃখ দেয়, বেচারী, বেচারী ছাড়া তাঁহার কিছুই বলিবার ছিল না, তাঁহার জন্য মন সমবেদনায় ব্যথিত হইয়াছিল, সকল সময়ই ইহার মনে হয় অন্তত অনিলাকে স্কুলে যাইতে দেওয়া উচিত হয় নাই? এই বিরাট বাড়িতে আপনার বলিতে কেহই নাই; শুধু লোকজন চাকর খিদমদগার।

লাবণ্য দেবী এখন খাটের বাজুতে হাত রাখিয়া বসিয়াছিলেন। রঞ্জিত চ্যাটার্জ্জির এইবার বিদায় লইবার সময়, টেলিফোন হইয়াছে ধীরে বলিলেন "এবার আমাকে..."

"আমার বাড়ীতে ভাল লাগছে না..."

"আমার সময় থাকলে, ডিনার নিশ্চয়ই..."

"না না আপনার, ধন্যবাদ আমি একাই..."

"সে কি হয় বরং আপনি এক কাজ করুন আমাকে..."

"বেশ এক ঘন্টা...আমি কোথাও যেতে চাই"।

লাবণ্য দেবী রঞ্জিত চ্যাটার্জ্জির কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করিয়াছিলেন, সেই একমাত্র, যদিও তিনি মৃত্যুর সময় উপস্থিত ছিলেন না, তথাপি যখনই এখানে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তাহার পর হইতে প্রত্যহ আসিয়াছেন; তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়াছেন এবং নিজে হাতে এখানকার সমস্ত ভাজে ফুল সাজাইয়াছেন, লাবণ্য দেবী সে চাতুর্য্য কখন সখন দেখিয়া এ হেন দুঃখেও কৌতুক অনুভব করিতে গিয়া আপনাকে সংযত করিয়াছেন।

এই লোকটি শোকাতুরা, বিহ্বলা সদ্যঃস্বামীহারা লাবণ্য দেবী যাহার নিকট সংসার এক লহমায়, তাহাকেই, অতীব সরল নিপুণতা সহকারে আপন তর্জনী তুলিয়া দশদিককে স্বাভাবিক করার হেতুতে, যখন, কল্পনা পাথের, লীলায়িত রেখাসীন, রক্তের এবং স্পন্দনের প্রতি ইঙ্গিত করত চিরবিশ্বাসী অন্যান্যদের মধ্যে ইহলোকের অনিত্যতার কথা উপাখ্যানগত করিয়া স্রোতের প্রসঙ্গ উত্থাপনে, বাঁচার, জীবন ধারণের সহজ সাহস দেন। প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, নিজে হাতে গং খাওয়াইয়া তাহাকে খাইতে বসাইয়াছেন।

বাল্যকালের অসংখ্য টেলিগ্রাম, চিঠি এখনও আসিতেছে, যাহার উত্তর লিখিতে লাবণ্য দেবীর সারা সকাল যায়, চিঠি লেখার কাগজ ফুরাইয়াছে, সোনগ্রাম ও ক্রেস্টের ডাই দিয়া কলিকাতায় লোক পাঠান হইয়াছে, করোনেটের তলায় এল আর উবল করা পপের তলায় সুন্দর হস্তাক্ষরে—বহু ধন্যবাদ, শ্রদ্ধা, শুভ প্রার্থী। কি সুন্দর, ভগবান আমাদের এইভাবে লেখা। ভদ্রমহিলার বড়ভাই এবং তাঁহার ইংরাজ স্ত্রীকে ফেলিয়া আসিয়াছিলেন, পুনরায় চলিয়া গিয়াছেন।

লাবণ্য দেবী একদা রূপার ডাজের ফুল সজ্জা দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে তিনি মরেন নাই, কেননা সেখানে কিছু ভুল ছিল, অন্য পার্শ্বে রঞ্জিত চ্যাটার্জ্জি, যে বলিয়াছিল "আপনার মেয়ের জন্য অন্তত ..."

লাবণ্য দেবী তির্য্যক নয়নে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করত মেজরুমাল (নপেকিন) নক্সার প্রতি মনোনিবেশ করত ভাবিয়াছিলেন এখনও এ গৃহ শোক-আচ্ছন্ন, ফলে রঞ্জিত চ্যাটার্জ্জির আসা যাওয়া খুব সহজ, কিন্তু তাহার পর, নিশ্চয়ই, তাঁহার নিকট ইহা সহজ মনে হইবে না, ফলে ছোট একটি শ্বাস ত্যাগ করিয়া এ জগতে পুনরায় ফিরিয়া আসেন।

রুকামের পিছনে, সাদা উর্দ্দি পরা খিদমদগার দুগ্ধ ইত্যাদি আনিয়াছে, রাত্রে তিনি খাবার-ঘরে খাইতে পারেন না। রুকাম কহিল "মেমসাব হুজুর।"

"রুকাম আজ কয় দিন হল"?

"আজ সাত দিন হুজুর"।

"আমার মনে হচ্ছে যেন কিছুই হয়নি, মনে হচ্ছে সায়েব ও ঘরে..."

রুকাম অসহায়ভাবে মৃদু হাসিতে গিয়া গম্ভীর, কেননা মেম সাহেবের চোখে যে বিদ্যুৎ দেখিয়াছিল রুকাম স্তব্ধ কেননা লাবণ্য দেবী অল্প হাসিলেও মনে হইল তিনি অট্টহাস্য করিতেছেন।

"মেম সাব আপনি পাগল হয়ে যাবেন...আপনার আত্মীয়..."

* * * *

এই সময় গাড়ীর শব্দ হইল। লাবণ্য দেবী সত্বর খাদ্য সমাধা করিয়া নিজের সংস্কার বশত আয়নার সামনে আসিলেন, ছোট কুর্শীতে বসিয়া নিজেই স্তম্ভিত মুগ্ধ, প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা হইল, আয়না যাহার প্রতিবিম্ব সে কে?

জুতার শব্দ সোপানে দ্রুত ক্রমে ধীর ভদ্র হইয়া যায়, লাবণ্য দেবীর নিকট দ্রুত পদশব্দ যেমন ভাল লাগিয়াছিল তেমনি ভদ্র আওয়াজ তাঁহাকে স্থির করে এবং তখনই পারফিউমের শিশিতে হাত স্পর্শ করে, আর যে তিনি আপনার রুমালে খানিক পারফিউম দিয়াছিলেন। যখন উঠিয়া দাঁড়াইলেন তখন রঞ্জিত চ্যাটার্জ্জি দরজায় উপস্থিত, তাহার পেটেন্ট লেদারের জুতা, কালো পাতলুন, সাদা সার্কস্কিন কোট, কালো বো দেখিয়া লাবণ্য দেবীর মনে হইল তিনি যেন কোন পার্টিতে যাইতেছেন।

"এখন কেমন আছেন"

"একটু" লাবণ্য দেবী কথা বলিতে গিয়া বুঝিলেন দেহ এখনও কেমন যেন অবসাদ, শোক এখন শিরা উপশিরাকে নিস্পন্দ করিয়া রাখিয়াছে।

'আমি বড় ভয় পেয়েছিলাম'

লোকটি তটস্থ, কণ্ঠনালীতে কহিলেন, "বালিশ আনাও "

রুকমি এই আওয়াজে সত্বর সে স্থান পরিত্যাগ করত চলিয়া যায়, লোকটি খোলা দরোজার পাশাপাশি দিকে চাহিলেন মাত্র, সম্মুখে ভৌতিক বাণবিদ্ধ দেহ; এ দেহ তাঁহাকে এমনভাবে বিমোহিত করিয়াছে, তবু এই মুহূর্ত্তে আপনার নাম মনে পড়িয়াছিল, রঞ্জিত চ্যাটার্জ্জি! এবং শায়িত শাড়িতো যিনি, তিনি মৃত গঙ্গাকিশোরের স্ত্রী, লাবণ্য দেবী, মিসেস রয়! তবু এখানকার আলো জ্বালিতে তাঁহার মনে হয় নাই।

রুকমি একটি বালিশ আনিয়া লাবণ্য দেবীর মাথার তলে কোনরূপে স্থাপিত করিবার পর রঞ্জিত চ্যাটার্জ্জির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

রঞ্জিত চ্যাটার্জ্জি এখানের আধো অন্ধকারে রুকমির চোখ দুটি অন্যমনে দেখিতে দেখিতে, ভদ্রমহিলার শুশ্রূষায় ব্যস্ত হইলেন। এবং ভদ্রলোক কিয়দংশে নিজের কাছেই অহরহ অপ্রতিভ হইয়া পড়িতেছিলেন, প্রতিনিয়ত আপনারই সামনে অপ্রস্তুত। গঙ্গাকিশোরের মৃত্যুর এ কয়েক দিনের শোক, রুক্ষতা, অবহেলাতেও লাবণ্য দেবীর দেহ হইতে একটি মৃদু বাস আসিয়া এই অল্প অবকাশটিকে মথিত করিতেছিল। এবং এ বাসকে প্রত্যক্ষ করিতে মানুষের স্বাভাবিকতা ধূমায়িত হয়।

ভদ্রলোক নিজেকে অতীব শক্ত করিয়া রাখিয়াছেন, মোহকে তথা অন্যমনস্কতাকে যথাসম্ভব বিতাড়িত করিয়া সম্মুখের মৃতের কক্ষের প্রতি চাহিয়া কহিলেন, "আয়া...আলো জ্বাল"

রুকমির মুখ তিক্ত কিছু আস্বাদনে বিকৃত হইয়াছিল, সহসা গলাভারী কথায় সে উঠিয়া দাঁড়াইল। তবু রঞ্জিত চ্যাটার্জ্জি আরবার তাহাকে দেখিতে সম্ভবত চেষ্টা করেন! কিম্বা ইহা অজুহাত মাত্র, কেন না, এসময় আর্ত্ত লাবণ্য দেবী তাঁহার হস্তকে বিশেষ অবলম্বন রূপে ধরিয়াছিলেন।

রঞ্জিত চ্যাটার্জ্জি অকথিত সঙ্কোচ সত্ত্বেও মনে মনে আস্থাবান হইয়াছিলেন যে তিনি পুরুষ মানুষ, যে, তাহা ব্যতীত, আর কোন অস্তিত্বই তাহার নাই যে তিনি ভদ্র।

লাবণ্য দেবী নিশ্চেতন আড়ষ্ট কণ্ঠে কহিলেন, "আলো না, আলো না..."

রঞ্জিত চ্যাটার্জ্জি কিঞ্চিৎ পাশ ফিরিতেই দেখিলেন, রুকমি তখনও সুইচের দিকে অগ্রসর হইতেছে, একবার সে তাঁহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করে, তিনি বলিলেন "আলো থাক"।

ক্ষীণ অথচ তন্দ্রাজড়িত লাবণ্য দেবীর কণ্ঠস্বরে পুনরায় শোনা গেল "আলো থাক"।

"আপনি...আপনি"

"আলো থাক..." আবার শোনা গেল, লাবণ্য দেবীর সংজ্ঞা অনুমান হয় ফিরিয়াছে, একারণ যে তাহার কণ্ঠস্বরে কেমন এক অনুরোধ ছিল; আলো তিনি চাহেন নাই, অন্ধকারকে অন্যমনে উপভোগ করিতে নিশ্চিত অভিলাষ জন্মে, এ অন্ধকার বড় ভাল, সুখকর। ভীত, শঙ্কিত, আতঙ্কিত হইবার কোন হেতু নাই, ইহা সত্যই বড়ই আপনার।

তবু এই গতিহীন অবস্থা হইতে আবছায়া হইতে এই সুসংবদ্ধ দূরত্ব হইতে লাবণ্য দেবী বলিলেন, "জি, কে (গঙ্গাকিশোর) কি মরে গেছে..."?

হলঘর আঁধার, তিনি, অনেকক্ষণ বারজের দেহ এলাইয়া, একভাবে, বসিয়াছিলেন, অপরাহ্নে গঙ্গাকিশোরকে লইয়া যাওয়া হয়, ক্রন্দনের রোল এখন ছিল, দেশোয়ালি ক্রন্দন! শোককে লাবণ্য দেবী আপন দেহে হস্তদ্বারা অনুভব করিতে চাহিলেন, বুঝিলেন, গাত্রে দাহিকা শক্তি চলাফেরা করে, তিনি ধীরে অন্ধকার হলঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, সিঁড়ি দিয়া বাগানের ক্রেজি পথ ধরিলেন, সহসা দেখিলেন, লিলি-পুল, আর ধৈর্য্য রহিল না, অবগাহন নিমিত্ত, আশ্চর্য্য! এখানেই, নামিলেন।

অনিলা তখনই তাহাদের কুয়ার ধারে বসিয়াছিল, তাহার প্রিয় কুকুর পায়ের কাছে কাছে, দেশোয়ালি ক্রন্দন কুয়াতে প্রতিধ্বনিত, সে অনেক কাঁদিয়াছে, এখনও দেহ চমকায়, সে মাকে লিলি-পুলে নামিতে দেখিয়া ছুটিয়া আসিয়াছিল।

রঞ্জিত চ্যাটার্জ্জি এ প্রশ্নের উত্তরের জন্য কিছু সময় লইয়াছিলেন, তাঁহার সন্ত্রাস্তদৃষ্টি চারিদিকে পরিক্রমণ করে এবং প্রদীপ আলোক অস্থির সুন্দর মুখখানির প্রতি চাহিয়া কহিলেন "হ্যাঁ আমি দুঃখিত..."

লাবণ্য দেবী এতদুত্তর শ্রবণে তাঁহার বিশাল চক্ষুর্দ্বয় উন্মীলিত করিবার প্রয়াস করত দৃঢ়ভাবে কহিলেন "কে তাকে গঙ্গাকিশোরকে মারল...হত্যা করল..."

লাবণ্য দেবী পুনরায় একই প্রশ্ন করিলেন।

রঞ্জিত চ্যাটার্জ্জি তাঁহার প্রশ্ন শুনিতে শুনিতে রুকমিকে কহিলেন, "গরম দুধ...দুধ" এবং গমনরত অকারণ শব্দ শ্রবণে তাঁহার দেহ ছ্যাৎ করিয়া উঠে।

"আলো কি এখানে...এখনও"

"কোথায় আলো"?

"আমি যে দেখলাম..."

রঞ্জিত চ্যাটার্জ্জি উত্তর দিলেন "না সে ত এখানে নেই তার স্কুলে চলে গেল..."

"চলে গেছে" বলিতে বলিতে লাবণ্য দেবী ঝটিতি উঠিয়া বসিলেন, দেহ মন বস্ত্রসজ্জা সকল কিছুই বিস্মিত, তিনি উন্মাদের ন্যায়, চারিদিক শঙ্কিত চিত্তে, নিরীক্ষণ করত কহিলেন "আমি একা...একা" এ কথার পর, তাঁহার ওষ্ঠদ্বয় কম্পিত হয়, হয়ত বলিয়াছিলেন "সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত...সম্পূর্ণ একা...স্বাধীন"।

রঞ্জিত চ্যাটার্জ্জি সস্নেহে অনুরোধ করিলেন, "মিসেস রয় আপনি চলুন, ধরে চলুন...পারবেন"।

লাবণ্য দেবী, তির্য্যক চাহনিতে কক্ষস্থিত প্রদীপটি পাঠ করিয়া তৎক্ষণাৎ রঞ্জিত চ্যাটার্জ্জির পুরুষালি চক্ষু দুটি দর্শন করত স্তব্ধ, কেননা এমত সময়ে তাঁহার মানসপটে একটি ছবি ভাসিয়া উঠিয়াছে: তেরখাই নদীর পাড়ে, একটি সৌখীন পালঙ্ক পড়িয়াছে, তেরখার চারিধারে দূরব্যাপী মাঠ, কোথাও কেহ নাই দূরে গ্রাম ইতিমধ্যে কিছু নাই স্রোতে পাড়ে এ পালঙ্কটি রাতে চাঁদের আলোয়, দিনে সূর্য্যের আলোয় অতীব ভয়প্রদ।

এ পালঙ্ক অদ্যাপি কেহ লইতে ইচ্ছা করে নাই; সাহস করে নাই।

লাবণ্য দেবী, এ কথা শ্রবণে, সহসা যারপরনাই দশাসই সুদীর্ঘ হইয়া যান, মুহূর্তগুলি তাঁহার পায়ের নিকট লোটাইতে আনন্দিত; একজন প্রকৃতই, রমণী যে কি দুর্জ্জয় তাহা শুনিতে পারিয়া আপনি বিভ্রান্তিত, তখন একটি প্রদীপ স্থাপিত ঘরখানি তাঁহার দৃষ্টিতে আসে, উহার ঘন অন্ধকার তাঁহাকে দর্শনে ক্ষিপ্ত ঘোর আহ্লাদিত হইয়া উঠিল; তিনি স্থির হইয়াছিলেন।

"আপনার শরীর কি..."

লাবণ্য দেবী এ কথায় দয়াপরবশ হইয়া রঞ্জিত চ্যাটার্জ্জির প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন, দেখিলেন তিনি অনেক মুহূর্তের মধ্যে একটি; যাঁহার দেহে তাঁহারই অন্ধকারের ছায়া পড়িয়াছে ফলে গাম্ভীর্য্য সহকারে উত্তর দিলেন, "না"।

লাবণ্য দেবীর জন্য রঞ্জিত চ্যাটার্জ্জি তাঁহার গাড়ীর হুড খুলিয়াছিলেন, ভদ্রমহিলাকে অত্যন্ত যত্নে পিছনের সীটে উঠাইয়া, নিজেই গাড়ী চালাইতে লাগিলেন, লাবণ্য দেবী দেহকে একেবারে সভাভাবে যতদূর সম্ভব মেলিয়া দিয়াছিলেন পারফিউমের গন্ধ তাঁহার নিঃশ্বাসকে সহজ করিতেছিল।

এমন, যে দীর্ঘশ্বাস, চম্পকের অস্তিত্ব হরণ করত মিথ্যায় নামাইয়া আনে, তাহাকে পর্য্যন্ত সুবাসিত করিয়া লয় করে, লাবণ্য দেবী এই গতির মধ্যে, যদিও মন্থর গন্ধের আনুকুল্যে তাঁহার ধমনীতে ঘোর নিলীকতা দেখা দেয় ফলে তিনি স্বপ্নকে স্বপ্নই, জীবনকে অবিমিশ্র রাখিতে চাহিয়াছিলেন, এবং আপন দেহে অন্য হস্তদ্বারা বুলাইতে বুলাইতে তাঁহার তন্দ্রা আসিল।

কর্ত্তব্যপরায়ণ রঞ্জিত চ্যাটার্জ্জি একমনে চালাইতে ব্যস্ত; প্রত্যেকটি খন্দরে গর্ত্তে গাড়ী এমত সাবধানে, ধীরে পার হইয়া যায়, যে ভদ্রমহিলার স্বস্তিতে কোন ব্যাঘাত না হয়, সম্মুখে পোকাগুলি তাঁহার একমাত্র দৃষ্টি আকর্ষণ করে, একদা তাঁহার মনে হয়, এ এক অদ্ভুত সফর...এবং তখনই লাবণ্য দেবীকে দেখার, কর্ত্তব্যের দিক দিয়া, ইচ্ছা হয়! কিন্তু তাঁহার চোখের পাতা দুচারবার উঠা পড়া করিল মাত্র, সে ইচ্ছা দিয়া তিনি কি একটি সিগারেট ধরাইলেন?

"আমরা কোথায় এলাম — তেরখাই এর..."

"তেরখাই ত অন্য রাস্তা"।

"তেরখাই চলুন না প্লিজ আপনার..." আরও বলিতে চাহিলেন। "আমার মধ্যে পদবিন্যাস কাঁপছে, আমার অশেষ্য সাগর স্নান চাইতেছে..."

"ব্যস্ত হবেন না আমি এখুনি গাড়ী ঘোরাচ্ছি"

গাড়ী মন্থর গতিতে চলিতে লাগিল, রঞ্জিত চ্যাটার্জ্জি তেরখাই এর কথায় কেমন যেন হইয়া গেলেন, তেরখাই-এ এ রাত্রে, সেখানে কেন; এমন প্রশ্ন নিজের মনে আনিতেও সাহস করিলেও কিছু বলিতে ইচ্ছা হইল না! পরক্ষণেই মনে হইল ভদ্রমহিলা শোকে অভিভূত এবং তাঁহার বাক্যালাপ অসংলগ্ন, ক্রমে রঞ্জিত চ্যাটার্জ্জিকে একটি বিভ্রান্তির দিকে আকর্ষণ করিতেছে।

বিভ্রান্তি অথবা কঠিন অব্যর্থের নিকট,—এ সত্য, পুরুষ মানুষটি আপনার শরীরের প্রতি বিন্দুতে বুঝিতে, বোধ করিতে পারিতেছিলেন, অথচ একথাও ঠিক, যে তিনি অসংখ্য কিছুর দ্বারা নিজের স্থান নির্ণয়ে সমর্থ; ফলে ছোট আয়নায়, গাড়ীর, পিছনের উপস্থিতি দেখিলেন; এখানে, ভূতভবিষ্যৎ বর্ত্তমান প্রতিফলিত, কিন্তু কোন বস্তুর উপর দিয়া সে-সময়! পুনরায় লক্ষ্য করিতে মনস্থ করিলেন। গাড়ীর ষ্টিয়ারিঙে মাথা আপনা হইতে নামিয়া আশ্রয় চাহিল। রঞ্জিত চ্যাটার্জ্জির বহু চিত্রশালার কথা স্মরণে আছে; ভাস্কর্য্যের নিদর্শন অনেক তাহার মনে নিশ্চয়ই সাময়িক গাম্ভীর্য্য আনিয়াছে, কিন্তু রক্তমাংস শিল্পের শিল্পত্বটুকু অপহরণ করত যখন বিদ্যমান তখন, সে ক্ষেত্রে মন কেন বাক্যহীন, বিস্ময়ে নির্জ্জীব কেন।

স্পিড, মিঃ চ্যাটার্জ্জি স্পিড! হেলুভা স্পিড!

রঞ্জিত চ্যাটার্জ্জি, লাবণ্য দেবীর অনুরোধ শুনিতে পাইলেও, যেহেতু অন্যমনা, ফলে অর্থ করিতে পারেন নাই, স্পিড কমাইয়া, নিঃসঙ্গ প্রান্তর হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিছু বলছেন"

"স্পিড"?

"রাস্তায় খানা-খন্দর, গাড়ী বড় বাম্প করবে, আপনার..."

"কিন্তু আমি চাই, সমস্ত জগত, আশপাশ, আবছা হয়ে যাক,..."

রঞ্জিত চ্যাটার্জ্জি একথায় যুগপৎ আলোর সুইচে হাত দিলেন, ও আয়নার প্রতি বিমূঢ়ভাবে একদা চাহিলেন।

"আমি দুর্দ্দান্ত স্পিডে তেরখাইর পাড়ে পৌঁছাতে চাই...দুর্দ্দান্ত স্পিডে..."

রঞ্জিত চ্যাটার্জ্জি ছোট একটি নিঃশ্বাস লইয়া জানিতে চাহিলেন "কিন্তু কেন মিসেস রয়"?

লাবণ্য দেবী আপনার আলুলায়িত উড়ন্ত চুলগুলিকে একটি হাতে উর্দ্ধে তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার স্মিত হাস্যের শব্দ শোনা গেল।

"আপনি...অসুস্থ...বাড়ী..."

"আমি দুর্দ্দান্ত স্পিডে তেরখাই-এ পৌঁছাতে চাই..."

"সেখানে..."

লাবণ্য দেবী এখন, আড়নয়নে রঞ্জিত চ্যাটার্জ্জির প্রতি দৃষ্টিপাত করত হয়ত বলিয়াছিলেন, "ও ডিয়া তুমি কি কিড্!" স্পষ্টত তাঁহার কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল, "প্রয়োজন আছে"।

নাবালকের মত রঞ্জিত চ্যাটার্জ্জি "কিছু মনে করবেন না, আপনার মনের অবস্থার কথা ভেবে...কিন্তু সেখানে কেন..."

"গঙ্গাকিশোরকে সেখানে"

"জানি তাই...সে স্থান আপনাকে...বড় ব্যথিত করবে..."

"ভাববেন না, মিঃ চ্যাটার্জ্জি...আপনি সত্যই খুব কাইণ্ড...কিন্তু প্রথম গঙ্গাকিশোর সত্যই মরেছে কিনা আমি জানলা থেকে দেখেছি...আমি বিশ্বাস করতে চাই..."

রঞ্জিত চ্যাটার্জ্জি কেন যে হঠাৎ একসীলারেটের চাপ দিলেন, গাড়ী ভীষণ শব্দ করিয়া উঠে, এবং গতির এই পরোক্ষ শব্দ লাবণ্য দেবীকে দুর্দ্ধর্ষ করিয়া তুলিল, কখনও হাতে হাত ঘর্ষণ, কভু কপাল হইতে চুলগুলি তুলিয়া বলিতে সুরু করিলেন, "আমি ভয়কে দেখিতে চাই..., ক্রমাগত ভয়..."

রঞ্জিত চ্যাটার্জ্জি এ হেন উক্তি শ্রবণে, তখনই মনে মনে বিন্দুমাত্র, এ কোন দুর্য্যোগের তিনি সম্মুখীন, এই ভয়ঙ্কর প্রমত্ততাকে লইয়া তিনি বিব্রত, তাঁহার আঙুলগুলি কম্পিতবান, নিঃশ্বাসে ওষ্ঠ শুকায়,

এমতাবস্থায় অনুভব করিলেন ভদ্রমহিলা উঠিয়া বসিয়াছেন, এবং ঝটিতে তাঁহার, রঞ্জিত চ্যাটার্জ্জির পিঠে আলতো আঘাত করত কহিলেন "ভয়কে দেখতে চাই"।

"কিন্তু কেন..."

"কেন আনেন... কেন আনেন..., জীবনটাকে নিজের হাতে পেতে চাই..."

"মানে"?

লাবণ্য দেবী সত্যই কী বলেন তাহা নিজেই জানিতেন না, শুধু তন্ত্রের হাস্য তাঁহার দেহে খেলিয়া গেল, তিনি তীক্ষ্ণ কটাক্ষে চাহিলেন।

"না মিসেস রায় আপনি এখন বাড়ী যাবেন...লোক আপনাকে..."

"পাগল করেছে... না আপনি যদি না যান...আমি একাই ছুটে চলে যাব..."

"মিসেস রায় ভগবানের দোহাই..."

"এক জীবন কত শত ভীতি মানুষকে কি চমৎকার করেছে, প্রাচীনতা থেকে আজকের, ক্রমশঃ আমি নিঃশেষ, তাই এ ভয়কে আমি দেখতে চাই।"

এ কথা এখানেই, এ বাসনা এখানেই, বাক্যের মধ্যে, তাহার বিন্যাসের মধ্যে শেষ হয় নাই, সহসা উৎকট বিস্ময়ের আবেগ হেতু ক্ষিপ্র শ্বাস রোধের ফল তাঁহার সর্ব্বশরীরকে স্থির করে; ক্রমে গুমরাইয়া উঠে, কেননা তিনি নিশ্চিত; যদিও উহার কোন রূপ ছিল না—চাহিয়াছিলেন, এ ভয় জনিত চিত্ত বিক্ষোভের কোন স্মৃতি নাই; সুতরাং ইহার জন্য, সন্ধ্যা সৃজিত হয় নাই, অঙ্গুলি নিচয় ওষ্ঠের কম্পনকে প্রতিবাধিত করে না, নিজ দেহে একে পরবাসী নয়, ইহার চীৎকারের নিমিত্ত কোন স্থাপত্য নিদর্শনের প্রয়োজন অকারণ, কেননা ইহার প্রার্থনা নাই! ইহার প্রার্থনা নাই!

রঞ্জিত চ্যাটার্জ্জি এ নিশ্চিতত্বের তুফান উপলব্ধি করিলেন।

লাবণ্য দেবী পুনরায় নিঃশ্বাস লইলেন, তাঁহার উত্তোলিত হাতের নিকট কয়েকটি জোনাকী, সে দিকে চাহিয়া কহিলেন, "ভয়কে দেখতে চাই—"

রঞ্জিত চ্যাটার্জ্জি, লাবণ্য দেবীর অনুরোধে সম্বিৎ ফিরে না, একই সঙ্গে তিনি অনেক কিছু করিলেন, যাহা ইহার জন্য গাড়ী হইতে ভয়ঙ্কর প্রপাতের শব্দ উঠে, গাড়ী লম্ফ দিতে ক্ষিপ্ত; পরক্ষণেই, অবশ্য, গাড়ী স্বাভাবিক বেগ ধারণ করিল, দুপাশের রাস্তার শুষ্ক পত্রাদি উড়িয়া নয়ছয়, কখনও বা খন্দর গর্তে চাকা পড়িয়া বিকটভাবে চমকাইয়া উঠিতেছিল; তখনি দূরচুম্বী হেড লাইটের আলোয় সব কিছুই বিকারগ্রস্ত, মাঝে মাঝে শিয়ালের ছুট দেখা যায়।

এখন, গাড়ীখানা চলিয়াছে। উত্তেজনার মধ্যে চালক পথচারী কুকুরকে, বাঁচাইয়াছে, যাহারা পরিত্রাহি ডাকিতেছিল।

পালকি পর্যাঙ্ক দেখা গেল, এখানে সেখানে আগাছা, কোথাও উহার পার্শ্বে, এবং তলে; ভোমক বাজু ভাঙ্গিয়া কিছুটা নীচে; এই পর্যাঙ্ক, এই জনহীন নির্জ্জন প্রান্তরে আপনার বস্তুহীনতা লইয়া ম্রিয়মাণ; ইহা মানুষের অজস্র নিশ্চয়ের স্থবিরতার মধ্যে অমোঘ কল্পনা অগ্নির চমৎকারিত্ব লইয়া, নৌকার প্রাবল্য লইয়া, দম্পতি, ইহা দিয়াছে যে স্বতন্ত্রতা, যে অনুধাবন, যে সামঞ্জস্য, যে নিঃসঙ্কোচ, যে প্রিয়তা যে পারত্রাণ, স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম, যে ভ্রান্তিহীনতা বাঙ্ময়, তাহাকে নমস্কার।

ধীরগতিতে গাড়ী চলিতেছে, রঞ্জিত চ্যাটার্জ্জি একমনে এই দৃশ্য দেখিতে আত্মস্থ, মনে হইতেছিল, এ পালঙ্ক পথ রোধ করিয়া, ক্রমে গাড়ী অগ্রসর হইতেছে, ঝটিতে রঞ্জিত চ্যাটার্জ্জি প্রাণপণে ষ্টিয়ারিং ঘুরাইয়াছিল, একই সঙ্গে ব্রেকও সজোরে চাপে, এবং ক্ষণিকেই দাঁতে দাঁত দিয়া হাত-ব্রেক টানিয়াছে। কয়েক আঙুলের জন্য পালঙ্ক বাঁচিয়া গেল।

এইভাবে অপ্রত্যাশিত মোচড়, পেচক তীক্ষ্ণ আওয়াজ মহা আলোড়নে থমকাইয়া থামা, লাবণ্য দেবীকে কোনরূপ বিচলিত করে নাই, তিনি অস্পষ্ট ভাবে প্রশ্ন করিলেন, "কোন অ্যাকসিডেন্ট..."

"না কিছু নয়, আপনাকে কষ্ট দেওয়া হল..."

"কষ্ট" বলিতে বলিতে তিনি, লাবণ্য দেবী উঠিয়া বসিলেন, চারিদিকের প্রতি মন্থরগতিতে দৃষ্টি ঘুরাইয়া দেখিতে লাগিলেন, হঠাৎ তাঁহার চোখে পালঙ্কটি পড়িল, কেমন যেন, মনে মনে, উন্মাদ হইয়া উঠিলেন, দরজা সজোরে খুলিয়া নামিয়া গেলেন।

রঞ্জিত চ্যাটার্জ্জির এ দৃশ্য ভাল লাগিয়াছিল, অথচ তাহাকে হতচকিত করে, সুন্দর রমণী মূর্ত্তি, তেরখাই-এর পাড় দিয়া চলাফেরা করিতেছে, মাঝে মাঝে আপনকার বেদনা সকল, ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া হাওয়া ভাসাইয়া দেয়, কখনও বা কিছুকে আহ্বান করে, কখনও শরীর টলিতেছে, চুল সকল উড়িয়া তাহার পদ প্রদর্শন করিতে ব্যস্ত, রমণী মূর্ত্তি প্রতি পদবিক্ষেপে স্থির।

রঞ্জিত চ্যাটার্জ্জি সত্বর তাহার উন্মাদনা বিপত্তি দর্শনে আলো জ্বালিয়া দিয়াছিলেন, হঠাৎ আলোয় লাবণ্য দেবী বিভ্রান্ত, ক্ষণেকেই ক্ষিপ্ত হইয়া দুই হাতে চক্ষু চাপিয়া পরে এক হাতে আলো নিভাইতে আদেশ করিলেন, আলো নিভিয়াছিল। এখন দূরে, মস্তকটি ঘাড়ে স্পর্শ করত, রমণী মূর্ত্তি নিস্পন্দ। রঞ্জিত চ্যাটার্জ্জি বলিয়া উঠিলেন, "বেচারী" এসময় একটি সিগারেট ধরাইয়া ভাবিয়াছিলেন, গঙ্গাকিশোরের জন্য উনি কি পাগল হইবেন। তবু এ ভাবনার পশ্চাৎ, যেহেতু রঞ্জিত চ্যাটার্জ্জি সুদীর্ঘ টান দিতেছিলেন, কোথাও একটি আতঙ্ক, ভয় ছিল।

রঞ্জিত চ্যাটার্জ্জি এ-আতঙ্কে পারিপার্শ্বিক দূরত্বের প্রতি নিরীক্ষণ মানসে দৃষ্টি সঞ্চালিত করিতে মনোযোগী, এই ক্ষণে দ্রুত পদশব্দ, বুটের আওয়াজ বিকটশব্দ শ্রবণে, সর্ব্বপ্রথম কোন দিকে লক্ষ্য করিতে হইবে, ইহা মনস্থ করিতে পারিলেন না, নিমেষেই এদিক সেদিক করত ঝটিতি অবাক, বিদ্যুৎ প্রবাহে তাঁহার দেহ সর্পিল, পথ। দেখিলেন, লাবণ্য দেবী দুঃসহ বেগে পালঙ্ক অভিমুখে ধাবিত, এবং এখন, তিনি আপনকার বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া পালঙ্কের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।

ঝাঁপাইয়া পড়া মাত্রই, পালঙ্ক হইতে মৃত্যুর কালিমা উৎসারিত হইল, সমগ্র শূন্যত্ব কপিশ বর্ণ ধারণ করে, বৃক্ষস্থিত ফল সকল আপনাকে বিদারণ করত বীজকে ছড়াইয়া দেয়, পক্ষিকুল জাগ্রত হয়, রঞ্জিত চ্যাটার্জ্জি বহুক্ষণ যাবৎ আপনার মানসিকতার স্থৈর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন, এখন এতাদৃশ ঘটনায় তিনি শ্বাসহীন; এবং তাঁহার প্রতিটি ইন্দ্রিয় বলিয়া উঠিয়াছে 'ইনি কি লাবণ্য দেবী' এবং তাঁহার আপন সভ্যতা ঐতিহ্য তাহাকে জড় পঙ্গু করিয়াছিল; অন্তর প্রদেশে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল, 'ইহা শোক...আর যাহা যাহা লাবণ্য দেবী বলিয়াছেন তাহা কিছু নয়!' ভয় নহে শোক তাঁহাকে এখানে আনিয়াছে, শোকে তাঁহার হিতাহিত জ্ঞান শূন্য!

তবু রঞ্জিত চ্যাটার্জ্জি, মৃত্যুর গন্ধকে অবয়ব আকারে তখনও প্রত্যক্ষ করিতে পারেন নাই; কেবল মাত্র মনে হয় আপনার মস্তকের হাড় দ্রবীভূত, জীব আর যে, ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র হইল, একটি পতঙ্গে সমস্ত শরীর রূপায়িত, লক্ষ্য করিলেন, হস্তদ্বয় পক্ষের ন্যায় সঞ্চালিত হইতেছে অথবা কোন আদিম নৃত্যের ভঙ্গীতে; এখনও, একদা দেখিলেন, উৎকৃষ্ট করিন্থিয়ান স্তম্ভ যাহার শীর্ষে মৃত্তিকার প্রতিজ্ঞা; তিনি ভীত ত্রস্ত অভিভূত; অদূরে লাবণ্য দেবী এক অপার্থিব ভঙ্গিতে; ইঁহাকে দর্শনে মর্ম্মাহত রঞ্জিত চ্যাটার্জ্জি! কোন ক্রমে আপনাকে মুক্ত করত ওষ্ঠ দংশনে আপন ঔচিত্য বোধকে ফিরাইয়া আনিতে যত্নবান; মনে হইল ক্রন্দনের, হুতাশের নিনাদে সমস্ত দিক সকল বিদীর্ণ হইতেছে, মনে হইল এভাবে বসিয়া থাকা রীতিবিরুদ্ধ, তিনি গাড়ী হইতে অতি সন্তর্পণে নামিলেন।

কিছু মুহূর্ত্ত এখানে পদশ্চারণা করার পর সিগারেট কেস পকেট হইতে বাহির করিয়া খুলিতে গিয়া স্থির, ভাবিলেন, নিশ্চয় ইহা ঠিক নয় অথচ লাবণ্য দেবীর নিকট যাইতেও বাধিতেছিল, এহেন শোক তাঁহাকে মূর্খ করে অসহায় উপায়হীন আওয়াজ ছোট একটি দীর্ঘশ্বাসের সহিত মিলিত হইয়া জিহ্বায় ধ্বনিত হইল, কিন্তু সান্ত্বনার কথা কিছুই সঠিক করিতে পারিলেন না; কিন্তু এই ভাবে স্তব্ধ হইয়া থাকাও অস্বস্তিকর; তিনি পদক্ষেপ করিলেন এবং কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াই চুপ, একারণে যে তিনি দেখিলেন লাবণ্য নির্ব্বিকার চিত্তে আপনার কেশরাশি এক হাতে উত্তোলিত করত হাওয়া ছাড়িয়া দিতেছেন। এ-চিত্র রঞ্জিত চ্যাটার্জ্জিকে বিশুষ্ক করিল কেননা ইহা এক অশরীরী দৃশ্য, পরিত্যক্ত মৃতের শয্যায়, রমণীর উন্মাদনা। তিনি আপনার সাহস সঞ্চয় করত ডাকিলেন, "মিসেস রয়..."।

লাবণ্য দেবী ইহার উত্তর করিলেন কিনা তাহা বুঝা গেল না, জড়ীভূত আড়ষ্ট গোঙানর একটানা শব্দ আসিল এবং এ শব্দ পরিচ্ছিন্ন বাক্যতে পরিবর্ত্তিত হইল "আঃ উপত্যকার মানস...পুত্র"

রঞ্জিত চ্যাটার্জ্জি এ বাক্যনিচয়ের অর্থ খুঁজিতে আপন পোষাকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।

"এসে—"

রঞ্জিত চ্যাটার্জ্জি আপন সংস্কারবোধ, যেহেতু ভদ্রমহিলা আগুঅসার হইলেন এবং এখন অভ্যাস

বলাৎ ঠোঁটিক দিলেন! যখন বেশ কাছে তখন, তাঁহাকে — লাবণ্য দেবীকে, দেখিয়া আর তাঁহারই চিন্তায় নগ্ন দর্শনে তাঁহার মাথা নত হইল, সৌন্দর্য্য এবং অন্য আর কিছু, হয়ত বীভৎসতা মৃতের বিছানায়।

অদ্ভুত গম্ভীর রঞ্জিত চ্যাটার্জ্জি গায়ে যেন কুট হইয়া গেল।

"আমি কি সাপের উপরে ঘুমাই!"

"এখানে আপনার শোওয়া উচিত নয় বড় নোংরা ছি-ছি জায়গা।"

"হা ভগবান একি উত্তর"!

"অনুরোধ বড় বিশ্রী—"

"খুব অভিশপ্ত যথেষ্ট অশরীরী..."

"তা খুব খারাপ বিশ্রী অসুখ হতে পারে—"

"চ্যাটার্জ্জি আমাকে অন্য ভাষায় উত্তর দাও, রূঢ় হও কেন"?

"অন্যভাষা — এটা মৃতের—"

মৃতের বলিয়া সহস্র চুলের গুচ্ছে আপনার নিঃশ্বাস দিবার পরক্ষণেই সুন্দর হাত তুলিয়া উহাদের বাতাসে ছাড়িয়া দিলেন।

"বাঃ" হয়েছে বলিয়াই রঞ্জিত চ্যাটার্জ্জি স্তব্ধ কেননা তিনি বলিতে চাহিয়াছিলেন "আপনার মাথার ঠিক নাই শোক..." মৃত্যু মৃতের বিছানা আমার যথার্থ শয্যা, আমার ভয় নাই, কেননা আমি জন্মদানে সমর্থ, আমি জন্মদানে সমর্থ..." বলিয়া উৎক্ষিপ্ত, এবং তাঁহার স্বরভঙ্গ আস্ফালনে ত্রিভুবন চমকিত হইল।

রঞ্জিত চ্যাটার্জ্জি রক্তশূন্য জীবনে এই প্রথম রমণী দেখিলেন মনে হইল।

"বাটন হোলের ফুলটা দাও...দেখি, দেখি, আমি সত্য কি না...

রঞ্জিত চ্যাটার্জ্জি এমনভাবে ফুলটি তুলিতে গেলেন, যে চেনওয়াচ, বাহির হইয়া দুলিতে লাগিল, লাবণ্য দেবী উঠিয়া অদ্ভুতভাবে বসিয়া ফুলটি গ্রহণ করত তাঁহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহার বস্ত্র এখানে সেখানে সরিয়া গিয়াছে, কহিলেন, "এ সত্য নিয়ে আমি ফিরে যাবো"।

রঞ্জিত চ্যাটার্জ্জি প্রত্যক্ষ করিলেন, নয়ন-অভিরাম, সবল, দিব্য লাবণ্য দেবীর উন্মুক্ত উরুদেশে আপনার প্রতিবিম্ব, রঞ্জিত চ্যাটার্জ্জি তবু তাঁহাকে সমস্ত কিছু বাস্তব অবাস্তব, দিগন্ত রেখা, নক্ষত্র, গাড়ী দূরে শহর আলো এবং শৃগালের পলায়ন দেখিয়াছিলেন। একবার বিছানায়, হাত স্পর্শ করত ধুলা অনুভব করিলেন, কিন্তু রমণী তাঁহাকে দ্বিধা করিবার অবসর দিলেন না।

"রঞ্জু"

"বলো" পালঙ্কের পাশে রাখা কোট হইতে সিগারেট বাহির করিয়া একটি ধরাইলেন।

"তুমি কিছু বলো আমি শুনি..."

"আমি তোমাকে বিবাহ করব,"

লাবণ্য দেবী আশ্চর্য তখনই..."তোমাকে বিবাহ করব"— বলিয়াছিলেন।

"তাই — কেন..."

"তুমি আমাকে অদ্ভুত আস্বাদ এনে দিয়েছ।"

"মানে..."

"আমি কিছুই জানি না, পড়িনি তবে...দেখছি...দেখ আমাদের শহর...

লাবণ্য দেবী চাহিলেন, দূরে আকাশ আলোকিত।

"ওইটুকু শুধু জেনেছিলাম, কলকারখানা, বাড়ির সামনের বাগান, রবিবারের বেতের চেয়ারে বসে চা চিঠিলেখা, ডিনার পার্টি...সব কিছু আজ এক হয়ে গেল"

"মানে?"

"জানি না আমি কি বলতে চাইছি...বড় ভাল লাগছে..."

"যেহেতু তুমি, রমণীকে জেনেছ, শুধু তাই নয় তাকে সুখী করেছ"

"তুমি ভারি চমৎকার লেডী, যাকে এই প্রথম সাক্ষাৎ করলাম..."

গঙ্গাকিশোরের এই প্রথম মৃত্যু হল।

এখন ধূসর চাঁদের আলোয় রমণীর, একাধারে স্থূল ও সূক্ষ্ম, অসংখ্য দেহটি নিথর; অলৌকিক কম্পনের নির্বিঘ্ন রেখাগুলির উল্লেখ; স্তনদ্বয়, যাহা উন্নত পীন, স্থিতিমানগুণ্য হারাইয়া, টলিয়া, স্বভাব পরিধি আয়ত বর্দ্ধিত, স্তন স্থূল নিম্নে পাঁজরার কাছে বিশেষ মেদ বৃদ্ধি করিয়াছে, যেহেতু রমণী শায়িতা; উরুদ্বয় কি অদ্ভুত অনেকক্ষণ! সেখানে ক্রমাগত বিন্দু হইতে বিন্দু অপসারিত, একটি মসৃণ ভাঁজ চিহ্ন এবং তাহার পর বক্র-রেখা অথবা শুধুই উবল, আশ্চর্য্য কাপড় পরার রুচিহীন, কষা বিশ্রী বৃত্তচিহ্ন নারীর মান নষ্ট করে নাই। এত চাকচিক্যময়, গম্ভীর, কল্পনাতীত, সুষমাময় দেহের জন্য কেন এত লজ্জা!

রঞ্জিত চ্যাটার্জ্জি এ দেহ দর্শনে চমৎকৃত; হয়ত ইতিমধ্যে রমণীর, লাবণ্য দেবীর, অসংলগ্ন মনোভাব তাঁহাকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল—বহু মনোজাত, যদিও সংবদ্ধ নহে এমন পদ তাঁহার জিহ্বায় আসিল, "আমি ন্যুব্জ দেখিয়া নির্য্যাতিত হই না, মদ্যপকে জ্ঞানহীন, বৃক্ষকে পত্রশূন্য, গাড়ীর আঘাতে মৃত্যু দেখিয়া নির্য্যাতীত হই নাই, এখন কেন আমি ক্লিনিক্যাল গন্ধ পাই...আমি কি নির্য্যাতিত, আমি কি নির্য্যাতিত, হা বিবাহ তুমি কোন নির্য্যাতনের ঔষধ।

লাবণ্য দেবীর সমগ্র মোমনিভ দেহ চন্দ্রালোকে সবুজ!

রঞ্জিত চ্যাটার্জ্জি আপনাকে সুসংযত-করা নিমিত্ত সিগারেটে টান দিলেন, ইহার বহ্নি নিম্নে শায়িত দেহে, এক অপূর্ব্ব রঙ স্ফুরণ সম্ভব হয়; এ স্ফুরণ সারা দেহে নিজেকে বিস্তার করিল; তাহা অনুশীলনে রঞ্জিত চ্যাটার্জ্জির দেহ চক্রাকার; ঐ দেহ কি বীভৎস, ঐ দেহে কি অন্বেষণ! আরবার জিহ্বায় বাক্য ধ্বনিত হইল "আশা, আমি আশা! চাই—দিক বোধকে আমি আশা বলি না, তৃষ্ণা ক্ষুধা নিদ্রা এ-তিন যেখানে সগর্ব্বে মিলিত হয়...যেখানে আমার নির্য্যাতন হইবে..."

বিবাহ একমাত্র বাক্যে, এই পর্য্যঙ্কে, এক অভিমানী ইঙ্গিতে ঠেলিয়া উঠে; এতক্ষণে দুজনের মনে হইল, সম্মুখে উহা গাড়ী, অকস্মাৎ বজ্রাঘাতে মানুষ মারা যায়, শস্যকে পতঙ্গ জীর্ণ করে, একে অন্যকে চিঠি লেখে। রঞ্জিত চ্যাটার্জ্জিকে লাবণ্য দেবীর দেহ ভীত করে, নির্য্যাতিত করে, এবং অন্যপক্ষে তিনি স্বীয় দেহকে তরঙ্গ বিভঙ্গে আলোড়িত করত আপনার উদ্বৃত্ত উন্মাদনাকে দেহাভিমুখী করিতে প্রয়াসী—কেননা মৃত্যু তাঁহার অন্তরীক্ষে!

দুজনেই সমস্বরে, নিশ্চয়ই, প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন আমরা বিবাহ করিব। লাবণ্য দেবী, এ কারণে সমুৎসুক যে আপনার প্রিয়তম ভীতিকে, দেহলালসা নহে, তিনি উপভোগ করিতে চাহেন, রঞ্জিত চ্যাটার্জ্জি যে নিশ্চিতত্ব রুদ্রতা হানিয়াছিল তাহাকে অস্বীকার করিতে বদ্ধপরিকর।

স্টেশনের বাহিরে প্রচণ্ড আলোয়, লাবণ্য দেবী অনিলার প্রতি চাহিলেন, এবং সগর্ব্বে খুসী হইয়াছিলেন, কেননা অনিলার রূপে সর্ব্বত্রে একটা পাশ্চাত্ত্য ভাব আছে, (শুধু রঙে ব্রাহ্মণ্য স্নিগ্ধতা।) এ পাশ্চাত্ত্য ভাব দর্শনে সত্যিই স্বস্তির নিঃশ্বাস আসিয়াছিল; তিনি সহজ হইতে পারার আশা রাখিয়াছিলেন! সন্ন্যাসিনীকে বিদায় দিয়া তাঁহারাও একটি ট্যাক্সী লইলেন।

"তুমি মা আমাকে এত দেখছ কেন?"

"কত দিন পরে অনিলা কত দিন পরে ডিয়া..."

"সত্যিই।"

"তোমাকে কি সুন্দর দেখতে হয়েছে...কত বড় কত বড়..."

অনিলা লাবণ্য দেবীকে অদ্ভুত চোখে দেখিয়া কহিল, "তুমি কত কষ্ট পাচ্ছ মা" বলিয়া পুরুষ মানুষের মত মায়ের হাতে দু একটি ছোঁয়া দিয়া সান্ত্বনা দিল।

লাবণ্য দেবী কিছু উত্তর করিবার পূর্ব্বেই অনিলা কহিল, "আমরা কি আজই শাহনপুর যাব?"

"না ডার্লিঙ, এত ট্রেন জার্নিতে তুমি বড় ক্লান্ত।"

"ও না কখনও নয়, আমি এখনই যেতে পারি, আমি প্রথমেই গিয়ে কি করবো বল ত? আর দেখ বাবার প্রত্যেকটা ছবিতে জামায় জুতায়" বলিয়া নিজেকে বুঝিয়া লইয়া কহিল, "চুমু খাব, আমি প্রার্থনা করবো, কি বলবো জানো, বাবা তুমি একবার আমাকে দেখা দাও। তুমি আমার বাবা, তুমি আমার সব

থেকে প্রিয়তম, আমি, জানো, কাগজ থেকে কত শোকালাপ কেটেছি...জানো...মা তোমাকে বড় ক্লান্ত বোধ হচ্ছে মা..."

"না আমি ঠিক আছি...ঠিক আছি" লাবণ্য দেবী আপনাকে সম্বরণ করত অনিলার দেহে পাশ্চাত্য লক্ষণটি আবার দেখিতে চাহিলেন।

"আচ্ছা মা সত্যিই কি বাবাকে ভালবাসতাম, না তাঁকে ভালবাসিনি বলে এটা আমার আপশোষ...একি তুমি...ও বেচারী তোমাকে আমি কষ্ট দিচ্ছি অথচ তুমি কত কাইণ্ড...মা...কিছু বলছ না...কি সিলি আমি...কি ফুল...!...আচ্ছা তাহলে কবে যাব...?"

"দু একদিনের মধ্যেই।"

ওয়েলিংওয়ার্থ হোটেলটি বড় রাজকীয়, সবুজ মাঠের দু পাশে, দুইটি বৃহৎ অট্টালিকা, ইহার একটিতে প্রশস্ত সুইট লাবণ্য দেবী লইয়াছেন। অনিলা ঘরের চারিদিকে নজর করিয়া স্প্রীং-এর খাটে শুইতেই, স্প্রীং নামিয়া গেল, অনিলা বিরক্ত হইয়া উঠিয়া কহিল, "ও কি নুইস্যান্স...ব্যাপার..."

"বেচারী তোমার লাগল না কি...তুমি এইটাতে এসো আমি এখনি ওদের বলছি..." বলিয়া লাবণ্য দেবী বেল টিপিলেন। সঙ্গে সঙ্গে লোক আসিল, লাবণ্য দেবী অত্যন্ত তীক্ষ্ণ স্বরে কহিলেন, "বাবা কো বহুৎ চোট লাগা, খাটিয়া আচ্ছা..." বলিতে বলিতে তিনি যারপরনাই খুসী হইতেছিলেন, যে অনিলার অন্যান্য বোধ এখনও আছে, এবং এই মুহূর্ত্তটি লইয়া তিনি সোজা হইয়া উঠিলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সে খাট বদল হইল।

অনিলা অন্য খাটে শুইয়াছে। পা দুইটি মাটিতে ঝুল; তাহার লকেটটি এক পাশে সরিয়া প্রায় হাতের উপর; চোখ বুজাইয়া হয়ত সে ক্লান্তির উপশম করিতেছিল; লাবণ্য দেবী তাহার পায়ের জুতার বাকলস খুলিতেই সে তখনই উঠিয়া কহিল, "কি...তুমি...পাগল...আমি তো..." বলিতে বলিতে আর একটি বাকলস খুলিয়া, পা এমত ভাবে সঞ্চালন করে যে জুতাটি শূন্য দিয়া দূরে পড়িল।

"ওয়া অমন কর না।"

"আমার যে খুব আনন্দ হচ্ছে, শাহানপুর যাব, কাল, কাল নয়, তারপর তারপর তারপর দিন...আমরা পৌঁছব মা...কি খুসী..."

লাবণ্য দেবী, তাহার, অনিলার, জামার বোতাম খুলিতে লাগিলেন, অনিলা সহসা দুই হাত দিয়া আর বোতাম লাগাইতে গিয়া কহিল, "এস মা আমরা কথা বলি।"

"নিশ্চয়ই অনেক কথা হবে, তুমি স্নান সেরে নাও এখনই ব্রেকফাষ্ট দেব..."

অনিলা জামার বোতাম খুলিয়া হঠাৎ লজ্জায় উন্মোচিত কাঁধ ও বাহু হইতে জামা তুলিল, মার দিকে চাহিল!

লাবণ্য দেবী মনে মনে মৃদু হাসিলেন। এবং তৎক্ষণাৎ মনে মনে, অনেক কিছু সংহত করিলেন; কি ভাগ্যে অনিলা কন্যা! প্রথমত, তাহাকে পাশ্চাত্ত্যের মত দেখিতে, তাহার মনোভাবে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা আছে—সমাজের সাধারণত্ব নিশ্চয় অল্পবয়সী হইলেও বিশ্বাস করে, ইহার পর আরও ভাবিলেন সে যাহাই হউক সে স্ত্রীলোক।

অনিলা কিন্তু জামা খুলে নাই, সহসা তাহার ছোট এ্যাটাচে খুলিয়া একটি ফোটো ফ্রেম বাহির করিল, মায়ের অলক্ষ্যে সেটি লইয়া নিকটের পাশ-টেবিলে রাখিল। লাবণ্য দেবী এখন আয়না কুর্শীতে, আয়নায় দেখা যায় অনিলা কার্পেটের সীমানা পার হইয়া, পাথরের মেজেতে খালি পা দুখানি অদ্ভুত আড়ষ্টভাবে (জুতা পরার অভ্যাসে) ফেলিতে ফেলিতে চলে। এরূপ সশ্রদ্ধ চলা তিনি কখনও দেখেন নাই; একটি নিরীহ ভাব, তাহাকেই অনুসরণ করিতেছিল, এখন সে খাটের লতান বৈচিত্র্যের নিকটে সত্যই খুব কাছে, এবং তাহার হাতে কতক ফুল, পাশ টেবিলস্থিত ফোটো ফ্রেমের কাছে রাখে; নতজানু হইয়া বসিয়া সেই দিকে, একনিষ্ঠভাবে, সেই ফোটোর প্রতি চাহিয়া রহিল, পরক্ষণেই বালকসুলভ চাপল্যে খাটে এক লাফে উঠিয়া হামাগুড়ি দিবার মত বাসিয়া পিতার ফোটোর দিকে দেখিতে লাগিল। এখন তাহার কণ্ঠলগ্ন লকেট ঝুলে, এখন তাহার অসাবধানতাবশত গোলাপী আঙ্গিয়ার লেশ দেখা যায়,

সে প্রভুভক্ত কুকুরের মত দুলিতেছিল, ঝটিতি হাত দুটি ভাঙ্গিয়া মুখখানি তাহার উপর ন্যস্ত করত ডাকিল, "মা—মা তুমি এত কাঁপছ কেন?"

আপনার গোপন উন্মাদনাকে প্রাকৃতিক সাধারণভাবে অভিহিত করিতে বার বার বিফল মনোরথ লাবণ্য দেবী হইয়াছেন, এটোমাইজার চাপিতে গিয়া, চিরুণী বাছিতে গিয়া সর্ব্ব সময় অন্যমনা, নিজের কাছে, কোথাও, কত কিছুই-নয় তাহা নিয়ত পরিচ্ছন্ন হইয়াছে, নিজেকে 'অতি তুচ্ছ সামান্য ব্যাপারকে এত জটিল করিয়া তুলিতেছি কেন' বলিয়া ধমকাইয়াছেন, কোনই বল পান নাই; তিনি সত্যই, অনিলার কাছে কত ভূমিষ্ঠ কত নিস্তেজ। ক্রমে অনিলার প্রশ্নের উত্তর দিলেন—"কই না ত ডিয়ার।"

"কই মা তুমি ত জিজ্ঞাসা করলে না এ ফ্রেম কে দিয়েছে?"

'আঃ ডিয়ার' এইটুকু বলিয়াই চিন্তার ভাণ করত লাবণ্য দেবী তাঁহার ক্লান্ত মুখখানি আরবার আয়নায় আরোপ করিলেন। অনিলাও এ-আয়নার এক পাশে আছে, প্রতিভাত; ভয়ঙ্কর প্রত্নতত্ত্বের নিদর্শন যত অবহেলারই হউক না কেন, তবু সে আর এক সভ্যতার ইহকাল, ফলে ক্রমান্বয়ে অনিলার গুরুভার তাঁহার গায়ে লাগিতেছিল।

সহসা অনিলা উঠিয়া বসিতেই তাহার নবাগত দেহ শিহরিত হইয়া উঠিল, লাবণ্য দেবীকে উহা গম্ভীর করিল। অনিলা মহা উৎসাহে শুরু করিল, "দেখ মা, যখনই দেখি আমি একটা পাখী দেখি কেন?"

"কেন ডিয়ার।"

"দুঃখ—আমরা বড় দুঃখী—তাই নয়!"

এ কথায় লাবণ্য দেবীর মনে হইল যে তাঁহার হাত দুখানি হারাইয়া গিয়াছে, যে হাত মনকে ব্যাখ্যা করে—অথবা বলিতে পারিলেন না "ভগবান আছেন তোমার ভয় কি..."

অনিলা এখন বিছানায় কাত হইয়া শুইল, তাহার মুখ হইতে নিঃসৃত হইল "সরো", দুঃখ বাক্যটি সুজনীর উপর দিয়া, নকসায় আশ্রয় চাহিয়া, অবশেষে [illegible] হাওয়ার আকারে, সটান ঘূর্ণিত, খানিক চলমান হইয়া অদৃশ্য।

লাবণ্য দেবী সে দৃশ্য নিশ্চয়ই দেখিয়াছিলেন, ফলে তাঁহার দেহে এক তীব্র শীত বোধ হয়, তবু কোন মতে "স্যাস" বলিয়া উঠিয়া পড়িলেন, দেহে এক অশরীরী স্থূলতায় পরিপূর্ণ, তথাপি কন্যার কাছে যাইবার নিমিত্ত যেক্ষণে পদ সঞ্চালন করিয়াছেন দেখিলেন, অনিলাও উঠিয়া তাঁহার সুন্দর পাখানি কার্পেটের উপর রাখিয়াছে। সে মাকে বুঝিতে পারিয়া কহিল, "ওগ আমি তোমার কাছেই যাচ্ছিলাম।"

লাবণ্য দেবীকে মহা আগ্রহে, অতি বেদনায়, যাহা তাহার মধ্যে এতদিন ধরিয়া সঞ্চিত—জড়াইয়া ধরিয়া ডাকিল 'মা', নিমিষেই বুঝিল, তিনি কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করিতেছেন, যদিও এ সময়ে হস্তধৃত চিরুণী কন্যার মাথায় চালনা করত স্নেহ বর্ষণে শান্তি পাইয়াছিলেন। অন্য পক্ষে কন্যা মায়ের অস্বস্তি অসুবিধার কারণ অনুমানে নিশ্চিত হইয়া এক হাতে, লকেট—যাহার চারিপাশে তরঙ্গায়িত জড়োয়া কাজই কারণ, সরাইয়া দিতে দিতে কহিল, "এটাতে তোমার খুব অসুবিধা হচ্ছে না..." বলিয়াই সে রূপকথার সংলাপের মত "মা...মা" আবৃত্তি করিয়া উঠিতে ইচ্ছা করিল।

"অনিল ডার্লিঙ তোমার গা কি গরম" এ উক্তির পরক্ষণেই লাবণ্য দেবী আপনার গ্রীবা বাঁকাইয়া, এ স্বর শুনিতে চাহিয়াছিলেন, এ কারণে যে এ শব্দ প্রবাহে আপনার মনের স্বাভাবিক অবস্থার প্রকাশ ছিল, এ স্বর তাঁহার স্মরণে রাখা একান্ত প্রয়োজন।

অনিলার মনে হইল, তাহার দাঁত উঠে নাই...লাবণ্য দেবীর শিল্প আরাধিত চিবুকটি দুর্দ্দমনীয় লোভে কামড়াইতে গিয়াছে, কেননা এ আলিঙ্গনের মধ্যে সে নিজে আরও সুন্দর হইয়াছিল; কিন্তু পলকেই দেখা যায়, চাবুক আওয়াজে দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া এই কক্ষের গোলাপী দেওয়ালের দিকে চাহিয়াছিল, তন্দ্রায় চোখ বুজাইয়া বলিল, "না আমরা বড় দুঃখী না..." এবং পরে অত্যধিক মর্ম্মপীড়ায় ক্ষোভে বলিয়া উঠে, "আঃ ভগবান!"

লাবণ্য দেবীর চোখে জল আসিল, তিনি ক্রমে নিরাকার, আপনার চিবুক ধীরে ধীরে স্বীয় কাঁধে ঘর্ষণ করিয়া অবশেষে ওষ্ঠদ্বয় পৃথক করিয়াছিলেন, অবশ্য, সত্যিই তাঁহার বলার কিছুই ছিল না, শুধু মাত্র অনিলার দুঃখময় বাক্য ধারাকে, ভাবনাকে বাধা দিবার মানসেই এরূপভাবে দাঁড়াইয়াছিলেন।

সহসা তাঁহার চোখে পড়িল, অনিলার মাথার উপর আতঙ্কের 'আঁ' শব্দে তাঁহার মুখ আরও উন্মুক্ত দেখিলেন অজস্র রক্ত, জমাট, অন্যত্রে রক্ত ঝরিতেছে; কেহ নির্ম্মমভাবে বেচারীকে আঘাত করিয়াছে, সে মৃতপ্রায়; তিনি, লাবণ্য দেবী, চীৎকার করিয়া উঠিতে চাহিলেন। আপনার মুখ কুণ্ডলী পাকাইয়া উঠিল।

কেননা এ সময়, লাবণ্য দেবীর বক্ষে মাথা ন্যস্ত করিয়া অনিলা বলিতেছিল, "মা আমি কখনও বিয়ে করব না, আমি আর তুমি চিরকাল, শাহানপুরে থাকব..."

লাবণ্য দেবী অনিলাকে বড় কঠিন ভাবে, অতীব জোরে চাপিয়াছিলেন। বলিলেন, "আঃ তুমি বড় রূঢ় কথা বল...অনিল ছিঃ ছিঃ এসব কথা বড় যাচ্ছেতাই...যাও স্নান কর।"

"কেন রুড হচ্ছ মা..."

"রুড নয় ডার্লিঙ, তুমি পাগল হয়ে যাবে..." বলিয়া চকলেটের বাকস খুলিয়া বলিলেন, "নাও চকলেট..."

চকলেটের রাঙ্‌তা খুলিতে খুলিতে, অনিলা বলিল, "জান, আমাদের হস্টেলের পাশে ঝাউ গাছের সারি, সেখানে কতবার আমি বাবাকে দেখেছি তোমাকেও...জানো তোমরা দুজন বলেছো...ওনিল ডিয়ার তুমি বড় দুঃখ পাবে।"

"আঃ আঃ" লাবণ্য দেবী অসম্ভব রাগান্বিত হইয়া উত্তর করিলেন "আমি খুব ধমকাবো "থাম—তুমি স্নান কর।"

অনিলা মায়ের প্রতি করুণ দৃষ্টিতে দেখিয়া, কেমন এক শব্দ করিতে করিতে বাথরুমের দিকে অগ্রসর হয়, যাহাতে মনে হইল কোন ধর্ম্ম-মন্দিরে মাত্র একটি লোকই প্রার্থনা করে এবং তাহার হৃদয়ের স্পন্দন উদ্ভ্রান্ত হইতেছে উর্দ্ধে বক্র গাম্ভীর্য্যে!

ধরিয়া বাঁকিয়া নীচু হয়, ছোট তোয়ালে দ্বারা পুনশ্চ অক্ষেপে পিঙ্গল সুশীতল একরাশ চুলকে এলোমেলো করিতে লাগিল।

লাবণ্য দেবী দেখিলেন, এখন, যে অনিলার কানের পাশে সাবানের ফেনার রূপালীর কিছু কিছু; পিঠ—হাতের-শেষে পাখনার মত হাড় দুটি উর্দ্ধসীমা করে, আর যে মেরুদণ্ডের হাড়ের গভীরতার অবশেষে, রুক্ষ-চন্দন-সম্ভব ফরসা নগ্নতা, আর উপরেই হরিত-ফেরোজা রঙের তোয়ালের একপাশে খোলা বাথরুমের সাজ; গেজিয়ার অন্য পাশে, তাকে বাথসল্টের শিশি, গোলা-সাবানের বোতল, কামরার নীল আলো আর ঠাণ্ডা ভাব; তাহাকে এক মুহূর্ত্ত লজ্জিত হইতে হয় নাই।

তাঁহার মনে হয়, এই সেই উপযুক্ত সময়, যখন নির্ব্বিকার ভাবে আপন কথা বলা যায়। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইয়াছিল, "ভাল, এর থেকে ভাল...কিছু খাওয়া", কেন যে এই মন-করা, তাহা তিনি নিশ্চিত বলিতে পারেন না। একবার এমত মনে হয়, এইটুকুই স্মরণে আছে, যে, 'সময়' কথাটিকে মনে-হওয়ার, মাথায়-আসার, রক্তে দেহে কাঁপার সঙ্গেই দেখিয়াছিলেন, বড় হাজামজা চামটে উহার রূপ, না উদ্ভিদ না জল না স্পন্দন কোন কিছু না, কেহ নাই—বাসি রুটির মত মাতৃত্বহীন সময়; এমন কি কোন শব্দ যেখানে আসিতে পারে না।

লাবণ্য দেবী নিজে ঠিক ঠিক জানিতেন না যে, সত্যই, তিনি কি বলিতেছেন, "ভাল, এর থেকে ভাল কিছু খাওয়া..."

অনিলা একথায় পলকেই, তেমনি ভাবেই সে ছিল, মুখখানি ঘুরাইয়া সে বলিয়াছিল, "আ ম্মা কেন তুমি সে কথা এদের বলনি, বেচারী..."

তিনি সত্বর চিরুণীখানি আপনার, দৃষ্টির মধ্যে আনিয়া বুঝিয়াছিলেন 'আমি কে' এবং দ্রুত উত্তর করিলেন, "ও না ডিয়ার আমি আমি...তোমার জন্য শুধু" সাহস করিয়া অনিলাকে স্বাভাবিক ভাবে দেখিতেই শক্ত হইয়া গেলেন; পায়রা যেমত আপন খোপে অনবরত ঘোরফেরা করে তেমনি যৌবন যেনবা সারা অঙ্গে অস্থির হইতে চাহে।

"ম্মা ওদের ব্রেক ফস্ট দিতে বল..."

'অনিলা জানো' বলিয়াই তিনি শিহরিত হইলেন, আশ্চর্য্য, লাবণ্য দেবী এখনও নিজেকে ধিক্কার দিতে সমর্থ, কেননা তিনি মেয়েকে একটি কল্পিত-চিঠির কথা বলিতে গিয়া স্তম্ভিত, যে চিঠি অনিলার

নামে আসিয়াছিল, যাহাতে তাঁহার অজানিত, নিশ্চয়ই অনিলার জানিত কোন বালক লিখিয়াছে,—যাহা প্রেম কথা, হাজার চুম্বনের কথা ছিল—এরূপ কল্পনা-করার জন্য নিজে উত্তপ্ত এবং অনিলার উপর তীক্ষ্ণ হইলেন। ধীরে একটি শ্বাসত্যাগ করত কহিলেন...“অনিলা বই আছে?”

“নিশ্চয়ই মা” বলিয়া অনিলা চোখের পাতা পুনঃ পুনঃ ফেলিয়াছিল, এবং যোগ করিল, “কি বই চাও মা বলিয়া একটা ট্রাঙ্ক নির্দ্দেশ করিয়া কহিল “এতে উপন্যাস নেই...ষ্টিভেনশন, কনানডয়াল, ওতে আছে—এতে সেন্টদের জীবনী...তুমি চাও...মা?”

‘তুমি চাও’ এ প্রশ্নে সন্দেহ ছিল মনে হইল লাবণ্য দেবী, বিশ্রীভাবে হাসিয়া কহিলেন—“কেন এ কথা বলছে, আমি ভাল...”

অনিলা মার কাছে চকিতে আসিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া কহিল, “ও! ম্মা তুমি কি বলছ এত বড় কেন...ছিছি...”

লাবণ্য দেবী আপনার সম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়া, আপনার কপালে করাঘাত করত শূন্য দৃষ্টিতে ধীরে ধীরে কহিলেন, “আমার যেন কি হয়েছে” অবশ্য এ বাক্যে যে বিশৃঙ্খলতা মনে উদ্ভব হয় তাহা নাই। যদিও সংস্কার বশত স্মরণ হয় যে, অনিলার আসা-লইয়া কত না বিকার তাঁহার কল্পনাকে ক্লিষ্ট করিয়াছে, তিনি ভীতা হইয়াছেন, ট্রেন-বিচ্যুতি অসুস্থতা অন্যান্য বিপত্তিতে তিনি কণ্টকিত। ভ্রূকুঞ্চিত করত, বিষণ্ণ ভাবে অনিলাকে দেখিলেন, অথচ সম্যক উপলব্ধি হয় যে তাঁহার গাত্র কর্কশ, মসৃণতার লেশ মাত্র ভাগ নাই।—অতীব তিলে তিলে তাঁহার পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। বিজাতীয় উষ্মা ক্ষোভকে পর্য্যুদস্ত ধিক্কারকে নিশ্চিহ্ন করে।

অনিলা এক নিঃশ্বাসে আপনকার বৈপরীত্য ঃ অবাক হওয়াকে উড়াইয়া দিয়া, খানিক পদ অগ্রসর হয়, এখন সুটকেশের সম্মুখে জানুতে বসিল, এটা সেটা ঘুরাইয়া ডালা খুলিয়াছিল; দু-একটি বই বাছিবার পর হঠাৎ একটি বই বাহির করিয়া আপনার মাথায় স্পর্শ করে, বুকে রাখে, চুম্বন করিল, এবং এমত ভাবে কিছুক্ষণের পর “আঃ!” বলিয়া উঠিয়াই সুগভীর ভক্তিপূর্ণ চুম্বনে এ কক্ষ সমগ্র স্থানকে গম্ভীর করিয়া তুলে; সে অনিমেষ নয়নে বইখানির প্রতি চাহিয়াছিল এ কারণ যে, সেখানে একটি দেবতুল্য মুখের প্রতিকৃতি আঁকা, এ ছবি পৃথিবীর যে কোন মানুষের স্বাভাবিক ছবি, যখন সে মানুষ আপনার অতীতকে দেখে।

অনিলার খানিক ঘাড়, কিছুটা মুখ, এবং চোখ বইখানি লাবণ্য দেবী দেখিয়াছিলেন, কন্যার এই ভাব বৈলক্ষণ্য তাঁহাকে একাধারে শঙ্কিত, নির্ব্বোধ করে; পরিহাস, বিড়ম্বনা, লজ্জা, কাতরতা, অবসাদ, জাড্য তাঁহাকে নির্জ্জীব করিয়া তুলিয়াছিল, কেননা অনিলার গোপনতাকে তিনি প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হইলেন; এ কি অনিলার নিজস্ব অন্য কিছু, না আকাশ এবং মানুষ যুগপৎ মিলিয়া মিশিয়া এক, ফলে, যে গোপনতার সৃষ্টি করে, কতবার যাহাকে স্থাপত্যের মধ্যে আনয়নের নামে মন নিজেই কোথায় চলিয়া গিয়াছে আর ফিরে নাই—এই কি সেই প্রাচীনতা। লাবণ্য দেবী বলিতে চাহিলেন, “অনিলা আমি তোমাকে আর এক সিদ্ধি দিতে পারি যেখানে হেলিওলিথিক সংস্কৃতির মধ্যে বসিয়া তুমি অদ্যকার পারফিউম ব্যবহার করিতে পারিবে...”

অনিলা লাবণ্য দেবীর প্রতি ঝটিতি ঘুরিতে, ক্রমে নিজেকে সামাল দিয়া উচ্ছ্বাসে, বলিল “কি সু এটা ন্দর এ বই” এবং শব্দ স্রোত কানে যাইতে বড় অপ্রতিভ হইয়া কহিল “ডিয়া মি...বেলস্ মাই সোল” আর যে পূর্ব্বের উল্টাপাল্টা কথা যেন লিখিত, আপনার মুখদ্বারা মুছিয়া, নাসিকা কুঞ্চিত করত ফেরঙ্গউচিত হাস্যে কহিল “ও ম্মা কি প্রিটি বিশ্রী। গড ডায়মড বোকার মতন বলেছিলাম না?” ইহার পর বিশেষ স্পষ্ট এক-মনা কণ্ঠে ব্যক্ত করে “অসম্ভব ভাল বই...” এবং হাঁটুতে ভর করিয়া মার কাছে আসিয়া তাঁহার কোলে বইটি রাখে।

লাবণ্য দেবী বইখানির দিকে চাহিতে কুণ্ঠা বোধ করিতে ছিলেন; বই খানিতে হাত দিতেই তাঁহার দেহ মধ্যে সমস্ত সচেতনতার উপর দিয়া তড়িৎ প্রবাহ খেলিয়া গেল, বইখানি অত্যন্ত উত্তপ্ত, এ কথা উপলব্ধি করিয়া আরবার হাত দিতে সাহস দেখা দেয় নাই। শিশু সুলভ নয়নে কন্যাকে দেখিলেন।

অনিলার আরও কাছে আসিয়াছে, ইদানীং সে তাহার মার উরু উপর আপনি চিবুক স্থাপন করত, চিবুক মার গাত্রে আন্দোলিত করে, পরে মুখমণ্ডল ন্যস্ত হয় বলিয়াছিল—“পড়”।

একদা মনে হইল, যে তিনি নিজে সত্যই দুর্ব্বল না ইহা তাঁহার সম্পূর্ণ মন ভাবনা।

"এ বই খুব সুন্দর, সাহস দেবে"

লাবণ্য দেবী অতীব রুষ্টভাবে নয়ন উন্মীলিত করিতে গিয়া নির্ব্বোধের মত তাকাইলেন।

"জানো মা বাবার জন্য যখন আমার গা পুড়ে যাচ্ছে আমি ঘুমাতে পর্য্যন্ত"

"থাম থাম ওনিলা ভগবানের দোহাই..." লাবণ্য দেবী বলিয়া উঠিতে চাহিলেন।

"এঁরাই তোমার বাবার সঙ্গে তোমার দেখা করিয়ে দেবেন...একদিন...এদের তুমি বিশ্বাস কর...ওরা বলেছিলেন, এই শোনার পর আমি খুব কেমন-যেন হয়ে গেলাম, আমার চোখে জল এলো..." অনিলা তাহার চক্ষুর্দ্বয় বন্ধ করিল...।

লাবণ্য দেবী বুঝিলেন, এই সকল সত্যে যে মহিমা, যে বিশ্বাস, যে বিভূতি, যে সমতা, যে মাধুর্য্য, যে পবিত্রতার যে চলিয়াছে-চলিয়াছে-আর-চলিয়াছের সৃষ্টি হইল, অর্থাৎ অনিলার মুখখানি ঘিরিয়া সৃষ্টি হইয়াছিল, যে মুখমণ্ডল ইদানীং তাঁহারই উরুদেশ উপরিস্থিত আছে, যাহার গ্রীবার ডৌলত্ব নিশ্চিত, তাহা ব্যতিরেকে, একটি রেখায় পরিণত, উহা কাঁধের শেষে নামিয়া যায় থামিয়া গেলেও তবু কেন যেন ক্রমাগত পুরাতন দিনের সহিত মিলিত তদ্দর্শনে, তাঁহার বলিতে ইচ্ছা হয়, "আমি কখনও, আমাকে ছাড়াইয়া যাই নাই, যাই নাই..."

এখন দরজায় টোকা শ্রুত হইয়াছিল। অনিলা উঠিল, লাবণ্য দেবী আসিতে আজ্ঞা করিলেন।

"না না আমি দেখছি, আজ আর কেউ নয় আজ আমরা দুজন শুধু..."

লাবণ্য দেবী মেয়ের অনুনয়ে, বিবর্ণ হইয়া বলিয়াছিলেন "ব্রেক ফাষ্ট ডিয়া অনেক দেরী...হয়েছে"

তাক-ঠেলা ঠেলিতে ঠেলিতে বেয়ারা আসিল, এবং ধীরে খাবারগুলি রাখে, জিজ্ঞাসা করিল..."আর কিছু, আলাক...হুজুর"

"ফ্রাইয়েড ফিস...ওনিল ফ্রাইয়েড ফিস...ডিয়ার?"

"ধন্যবাদ না...এতে যথেষ্ট...তুমি বল না..."

"বেশ"

অনিলা, মেজ-রুমালটি লইয়া মার দিকে তাকাইল, দেখিল, লাবণ্য দেবী এখনও কেমন বিষণ্ণ...বলিল "তুমি সব সময় এমন দুঃখিত কেন" এ প্রশ্ন ফিরিয়া আসিবে হয়ত অনিলা ভাবিয়াছিল।

লাবণ্য দেবী বিরক্ত গ্লাডিওলির এদিকে সেদিকে জেরেনিয়মের পাশে কন্যার মুখখানি দেখিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন "না কিছু নয়, আমি তোমাকে ভালবাসি বলে...তোমাকে কি ভালিবাসি তা তুমি জানো না...তুমি জানো না"

"জানি না...তুমি আমার সঙ্গে আছ...সঙ্গে আছ" বলিতে বলিতে অনিলা ভূততাড়িত যেন, উঠিয়া দাঁড়াইয়া ছুরির দ্বারা নির্দ্দেশ করত "মা মা ঐ যে বাবা বাবা" ঘোষণা করিল, কণ্ঠস্বর বাঁকাচোরা, মুখমণ্ডল আরক্তিম।

লাবণ্য দেবী স্তম্ভিত, পিছন ফিরিয়া শুধু মাত্র আলোকিত দেওয়াল প্রত্যক্ষ করিলেন পরে, কন্যার প্রতি চাহিতে আর সাহস করিলেন না। অনিলা কেমন একরূপ শ্লথ, তাহার দেহ কেমন অসম্বদ্ধ, হাতখানি সজোরে টেবিলে পড়িল, সে বসিয়াছে।

ইতিমধ্যে লাবণ্য দেবীর উপলব্ধি হয় যে যদিও অনিলার দিকে চাহিতে পারেন নাই, তথাপি তিনি রুক্ষ তীব্র হ্রেস্বা ধ্বনিতে বলিয়া উঠিয়াছিলেন 'অনিলা' এবং ইহার পর তাহার কন্যা সহজ হয়! এখন, তিনি মনে মনে ভয়ঙ্কর একদা ক্ষিপ্ত অন্যবার নিপীড়িত, তাঁহার টেবিলের উপরে প্রচণ্ড আঘাত করিতে ইচ্ছা হয়, ক্রমে ক্রমে বলিতে লাগিলেন, "তুমি আমায় ভয় দেখাচ্ছ কেন, তুমি কি ভাব আমি আমি তাকে তার মৃত্যুর জন্য দায়ী—তাকে খুন করেছি, খুন করেছি..."

"মা কি বলছো" বলিয়া সে লাবণ্য দেবীর মুখখানি যাহা এখন, কুৎসিত, ছোটলোক সুলভ, ইংরেজের ন্যায় ছ্যাঁচড়া, কেননা নীচু হইতে চায়নাপাত্রের রূপার, তরলের আলোক বিচ্ছুরণ এবং ফুলের ছায়া দ্বারা বিকৃত—উহা অবলোকনে বিহ্বল। এবং আপনার চেয়ার পরিত্যাগ করত তাহার মার কাছে আসে।

"তুমি জানো জি কে তোমার বাবা কি ভাবে মারা যায়—লাঞ্চের পর তার বুক ব্যথা করে...তারপর

অফিসে যায়নি—তারপর দিন ভোর রাত্রে...সিভিল সার্জ্জেন...বড় বড় ডাক্তার এসেছিল...তুমি জানো, আমি তাকে খুন করিনি...”

“ও মা তোমাকে কি ভাবে আমি শকড্ করেছি, কিন্তু কি করবো, তুমি জানো বন্ধুকে আমি আতঙ্কিত করেছি—যেহেতু আমি পিতাকে দেখতে পাই, মা ডিয়ার মা, ও কথা থাক”

“না না...তোমার কথায় মনে হয় যেন আমি তাকে...তুমি জানো আমি তাকে কি ভালবাসতাম”

“তুমি কি পাগল” বলিয়া অনিলার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হইল; মাকে, হঠাৎ কোথা হইতে জোর পাইয়া বলিল, “তুমি বড় বেশী দূরে যাচ্ছ...মা—এটা উচিত নয়” বলিতে বলিতে সে আপনার চেয়ারে বসিল।

লাবণ্য দেবী জ্ঞান ফিরিয়া পাইলেন, আশ্চর্য্য হইয়া চারিদিকে চাহিলেন, অসহায় ভাবে বলিলেন “তোমায় বড় দুঃখ দিলাম ওনিল ডিয়ার—না?” কেননা অনিলার গলার আওয়াজে ঘোর রুদ্রতা আছে—এ সত্য তাঁহার বোধ হয়।

এই মুহূর্ত্তের মধ্যে অনিলা হয়ত প্রার্থনা করিয়াছে, হয়ত ভগবানকে শুধু মাত্র স্মরণ করিয়াছে, চাহিয়াছিল এখান দিয়ে পক্ষীরা গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করুক। অনিলা পিতার মৃত্যুর পর হইতে অসম্ভব ভাবিতে শিখে, অবশ্য এ ভাবনা একান্ত ব্যক্তিগত—অর্থাৎ পিতা এবং তাঁহার অকাল মৃত্যু; ফলে, আপনার সাধ্যমত এইটুকু বুঝে, যে, মার মনে পিতার মৃত্যুর অনেক অসম্ভব কল্পনা। অনিলা অনুচ্চ স্বরে বলিল, “বেচারী, ভগবান আমাদের শাস্তি দেবেন নিশ্চয়...দেখ আমার কোন উপায় নেই আমি তাই দেখলাম, দেখলাম তোমার পাশে বাবা দাঁড়িয়ে...এখন, তুমি জান ট্রেনেও, আমি তাকে দেখেছি...”

লাবণ্য দেবী কন্যার দিকে বিমর্ষভাবে চাহিলেন, যাহাতে চোরা আক্ষেপ ছিল “আমি কেন দেখি না” অনিলা এ চাহনির অর্থ করিতে পারিয়া নিজের মনেই বলিল, “হয়ত, তুমি ভীত হবে; আমি, তাছাড়া তাঁর মেয়ে, আমাকে দেখা তো দিতেই হবে—আশ্চর্য্য না? তিনি আমাকে কি গভীর ভালবাসেন, না মা...?”

এ কক্ষ লাবণ্য দেবীর নিকট বিশ্রী হইয়া দেখা দিল, তিনি এখানে আর এক মুহূর্ত্ত অতিবাহিত করিতে চাহিলেন না, বলিলেন, “ওনিল চল একটা দোকানে যাই...”

রাস্তায় আসিয়া লাবণ্য দেবী বড় সুখে নিশ্বাস লইলেন; ইহা অতীব পরিপাটি, উজ্জ্বল, চমৎকার রাস্তা, প্রয়েম দুএকটা তাঁহাদের পাশ দিয়া যায়, অনিলা বলিয়া উঠে “ও মা কি মিষ্টি-জুলজুলে” “আঃ কেমন যেন দুষ্টু...” অনিলা একটি দেখিয়া অদ্ভুত একটি “ও! ও!” সুদীর্ঘ প্রীতিপদ স্বরে করে। ইহার পর সে বলিয়াছিল “জানো মা, সুজা হলে বলতো কি মিষ্টি আমার খেয়ে ফেলতে ইচ্ছে করে...”

“ডিয়ার না না” বলিতে পারিয়া লাবণ্য দেবী খুবই খুসী হইলেন, এ কারণ যে আওয়াজ স্বাভাবিক, রক্তেও কোন জড়তা নাই, এখানে কোন আবৃত্তি নাই যাহা এই বিদ্যমান পূর্ণতা এবং ইদানীং কন্যার সহিত, বিষয়ে, সহজ হওয়ার প্রতিবন্ধক হয়, কেননা আবৃত্তি সকল যদিচ ক্ষুদ্র পদবিশিষ্ট তাহা বিচ্ছিন্ন, মানসিকতা। কহিলেন “আঃ তোমার বন্ধুদের খবর কি” বলিতেই অনিলার দেহ হইতে, ‘সদ্য-কাটা-খড়ের’ (পারফিউম) গন্ধ আসিল। এবং প্রশ্ন যোগ করিয়াছিলেন “শামিম বি-নি-তা (বিনীতা)...এরা...বিনীতা”

“ও না, বিনীতা...ও আমার বন্ধু কখনও নয়, বিশ্রী অসভ্য...নোংরা...সে ত আমাদের স্কুলে আর নেই”

“তাই...কেন”

“আমার লজ্জা করে” বলিতেই তাহার স্কুল-ছাত্রী-রঙ ঝিলিক দিয়া উঠিল, সে যেন ভাল মন্দ বিচারের সীমায়, সে যেন আর এক পাশের বিকট পৃথিবীর চরিত্র দেখিতেছে। পুনরায় কহিল, “ও না প্লিজ, আমাকে জিজ্ঞাসা কর না, ভগবানের দোহাই...। না”

“কিন্তু তুমি বলেছিলে, নয় কি যে—সে খুব আচ্ছা মানে ভাল মেয়ে?”

“আমি বুঝতে পারিনি...” বলিয়া সে বুকে মাথায় হাত ঠেকাইল।

লাবণ্য দেবীর এ-সমালোচনা কোনওক্রমেই ভাল লাগে নাই, এবং তাহা ছাড়া এই বুকে-মাথায় হাত দেওয়ায়, আর তাহাকে পাশ্চাত্ত্য বলিয়া (!) মনে হইল না, ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিলেন “কি যে

নেটিভএর মত কর” ছোট শাসনে সম্মুখে সমগ্র যা কিছু স্পষ্ট হয়, আরও ব্যক্ত করিলেন “আমায় লজ্জা কি” এ উক্তি আপনকার কর্ণে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি অনিলার নিকট হইতে সরিয়া যাইতে গিয়া নিকট আসিলেন।

“মা মা আমার লজ্জা করে”

“অনিলা তবু লজ্জা আবার কি” যেমত বা নিজেকেই উৎসাহ দিতে, সাহসী করিতে চেষ্টা করিলেন।

“বিশ্রী গল্প নোংরা ব্যাপার!”

“নোংরা আবার কি, ও কিড, নেটিভএর মত”

“তবে কেন ওকে বিনীতাকে তাড়ান হল...ও জানো জীবনে কোথাও পড়তে পারবে না...ক্যয়ন্‌ডক্‌ট”

লাবণ্য দেবী মরিয়া হইয়া কহিলেন “তোমাদের স্কুলের...ছেড়ে দাও...তোমাকে আমি এবার ইংল্যাণ্ডে...।”

অনিলা মাথা দুলাইয়া ক্ষুব্ধভাবে মার দিকে চাহিল, মার অধরে লিপ্‌ষ্টিক ঠিক ভাবে দেওয়া নাই, রেখাগুলি কটু “মা না এমন নোংরা মেয়ে আমার খারাপ লাগে,...ওর কথা বললেও পাপ হয় জানো...”

লাবণ্য নিজেকে শক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

“ভগবান আমায় ক্ষমা করুন, সে নিকৃষ্ট” বলিতে বলিতে বিনীতার নোংরা দুঃসাহসিকতার তাহার নিদ্রাহীন অশ্লীলতার কথা মনে পড়ে। বিনীতা বাথরুমে প্রথম কুৎসিত চিত্র আঁকে; যে মেয়েটি প্রথম সে লেখা দেখে, সে নিজেই ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়াও, “দরজা খোল...দরজা খোল” বলিয়া পরিত্রাহী চীৎকার করিয়াছিল, মেয়েটি বেচারী দরজায় বিশেষ আঘাত করে; এই ভয়প্রদ আওয়াজ আজও, অদ্যাও, অনিলার কানে ভাসিয়া আসে! মেয়েটি সেই এই আঁকা দর্শনে ভীতা, এলোমেলো, কাঁদে; সে যেমত কোন খিলহীন, দরজা নাই, গুহায় পরিত্যক্তা, পাশেই খর চর্ব্বিগন্ধ এই চিত্র, আর সমীপস্থ বনভূমির শ্যেন দুর্নিমিত্ত পাশবিক হুঙ্কার, এবং এখন রাত্রিকাল—দেওয়ালের জৈবিক সংসারে এই দুষমন প্রতিচ্ছবি মেয়েটির গায়ে, মাকড়সার এমত্ত চলাফেরা করে। রাত কামিজে যে উহার সহিত গিয়াছিল, সে ইহাদের সকলকে সত্বর উঠায়, দরজা মেয়েটি অনেকের কণ্ঠস্বরে খুলিয়া, ইহারা সকলেই এমনভাবে প্রবেশ করে, যেন একটি 'কদর্য্য বালে'। দেওয়ালের প্রতি প্রথম মেয়েটির অঙ্গুলি নির্দ্দেশ সত্ত্বেও কেহই অবলোকন করিতে পারে নাই কেননা ভিতর দরজার শার্শিতে দেওয়াল তাহার জঘন্যতা লইয়া উদ্ধৃত, ফ্রেম লাভ করিয়া সে ছবি আরও; উঃ কুটিল ন্যক্কারজনক, অসভ্য, যাচ্ছেতাই, নর্দ্দমা আদাড়ে, কুৎসিত, দুর্দ্ধর্ষ, পঙ্কিল, অসহিষ্ণু, কদর্য্য, বিকলাঙ্গ—(হায় শিল্প উপাসনার সুষমা নির্ভীকতা এখানে নাই—কেননা সেখানে জন্ম হইতে অব্যাহতি কামনা করে)। ফ্রেমে, শার্শিতে এ-চিত্র দর্শনে, অল্পবয়সী, ব্রীড়াময়ী, মাধুর্য্যশালিনী কন্যাগণ, স্তম্ভিত ঈষৎ পাছু হটে, সকলে একটি হাত এমতভাবে স্থাপনা করিয়াছে তাহাতে মনে হয় তাহাদের গাত্রে বস্ত্র নাই তাহারা লজ্জা কুণ্ঠিত। এবং বিনীতার ট্র্যাঙ্ক হইতে অনেক কিছু বাহির হয়, এবং বিনীতা কয়েকদিন আলাদা ভাবে সিকরুমে থাকে তাহার পর আর তাহাকে দেখা যায় নাই। অনিলা সমস্ত ব্যাপারটি ছোট করিয়া ভদ্রসম্মত করত বলিয়া বলে, “জানো বিনীতার আত্মগ্লানি...উপস্থিত হয়নি মা...নোংরা...”

অনিলা তাহাকে অসম্ভব ঘৃণা করে, ভগবান দয়াপরবশ হইয়া অনিলাকে নিশ্চয়ই আশ্চর্য্য ঐশ্বর্য্য ভালবাসা দিয়াছেন, কিন্তু ইহাও ধ্রুব সত্য যে তাহার মধ্যে তীব্র ঘৃণা ছিল, এ ক্ষেত্রে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন, সে নিঃসঙ্কোচে বলিতে পটু এবং বলিল, “আই হেট আর তাকে ঘৃণা করি” এ উক্তির পরক্ষণে লাবণ্য দেবীর দিকে সগর্ব্বে চাহিল,—অর্থ শুধু ঘৃণা করাই তাহাকে পবিত্র করে নাই—তাহা ব্যতীত ঐশ্বরিক গুণে সে হয় পবিত্র।

লাবণ্য দেবী কোন দিকে চক্ষুর্দ্বয়কে রাখিবেন তাহা,—কেননা ঘৃণা বাক্যটিতে তাঁহার অবলোকন করিবার ক্ষমতা নষ্ট যে ক্ষমতা দ্বারা তিনি এতাবৎ বহু কিছুকে, কখন স্থাবর বা কখনও জঙ্গমাত্মক আব্রহ্ম ত্রিভুবন, এমন যে স্বীয় দূর বিসর্পী অতীতকে যেখানে তিনি একা এবং মধুময়, যে অতীত কভু তাঁতের আওয়াজে, নিশ্চিত তীক্ষ্ণ বনভূব আগত বাঁশরীর শব্দে বিশাল বাস্তবতাকে দর্শন শুধু নয়, স্পর্শ করিয়াছে তাহা ভাবিয়া পাইলেন না।

ফলে, তাঁহার নিকটে, দোকানের সাজসজ্জা, তথা মানসপটে আসিল না, উহা পাংশুবর্ণ; তাঁহার চোখে চলমান ফিটনের অশ্বের দন্ত, স্ফীতনাসা, হ্রেষাধ্বনি অবধি আরও বেশী বিকৃত হয়; কিন্তু গড়ান-বেলা কি পর্য্যন্ত সুন্দর, কিন্তু মোটর গাড়ীর-চলা, হর্ণ-দেওয়া বড় সুন্দর কিন্তু আপনার হীরক অঙ্গুরীয় সত্যই সুন্দর! এই সৌন্দর্য্য লইয়া তিনি, লাবণ্য দেবী, ক্রমাগতই সূক্ষ্মতাবোধকে পরিবর্দ্ধিত এবং নিদ্রাকে আনন্দময় করিতে পারেন। তবুও এবম্বিধ কথায় অর্থাৎ কন্যার উক্তিতে, ঈষৎ সহায় সম্বলহীন অনুভব হয়, যদিও, হায় অসহায়তা তাঁহার কবরীবন্ধন রীতিমাত্র।

এবং তখনই তাঁহার নিকট অজস্র কুলিদের প্ল্যাটফর্ম্মের হাতের ছাপ ব্যক্ত হইয়াছে, মুদ্রার পিছনে কোথাও জোর আছে, রাজসিক আজ্ঞা আছে; আর যে, তৎক্ষণাৎ, অদম্য বল তাঁহার দেহকে পুরুষালি করে, কিন্তু নিমিষেই তিনি শান্ত, এ কারণে যে দূরাগত ব্রেকের শব্দ শুনিয়াছেন, তাই তিনি ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া মৃদু হাসিয়া কন্যাকে পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। ইহার পর বলিলেন "ঘৃণা বলতে নেই..."

অনিলার কোন কথা বলার অবকাশ ছিল না, শুদ্ধতা বোধকে বিনীতার—ঘটনা ক্লেদযুক্ত করিয়াছে; যে, এই কয়েক মাস পিতাকে হারানর উগ্র বেদনা, অন্ধকারকে আপন, এবং খিলাননিচয়কে বিখ্যাত করিয়াছে; এ ক্ষেত্রে বিশেষ লজ্জার যে বিনীতা তাহার প্রাণ ছিল; তাই, সে, পরিতাপে-আবেগ-উত্তেজনায় অধীর, ঝটিতি মাকে দেখিয়া লইয়া বলিল, "তুমি জানো না...তুমি জানো না...তুমি জানো না..."

"ওনিল ডিয়ার তুমি কোন ফুল ভালবাস?"

"উঃ" বলিয়া কহিল... "সে কদর্য্য বিচ্।"

লাবণ্য দেবী এই বাক্যে চলচ্ছক্তি রহিত; ট্যাক্সী ডাকিতে ইচ্ছা হয়, আঃ গাড়ীর ক্রমাগত পলায়ন। ইহা পলকের জন্যই পরক্ষণেই কহিলেন..."অনিলা তুমি কি কখনও তারা গুণবার চেষ্টা করেছ...অনিল তুমি ত অনেকবার হরিণকে পালাতে দেখেছ.." আরও পরে যাইতে ধীরে ধীরে বলিলেন "নদীতে, সমুদ্রে স্নান করেছ..." এখন দিব্য কণ্ঠের স্বর ধ্বনিত হয় "তুমি ত তীব্র মধ্যমের আওয়াজকে হলঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে শুনতে চেয়েছ..."

"মা তুমি কি বলছ আমি বুঝতে পারছি না।"

"তোমার বয়স হয়েছে তুমি সুন্দরী, তোমার বোঝা উচিত..."

অনিলা, লাবণ্য দেবীর এই পদবিন্যাস, ইহাতেও স্বরস্থান বোধে মন্ত্রচালিত, অব্যবহিত পরে সে আপন বক্ষের, জামার ভিতরে, লকেটকে—একবার, যে উহা কোথায় অনুভব করতই মুঠা করিয়া ধরে; অর্থাৎ যে উহা আছে কিনা, যে উহাকে সে অনেকক্ষণ ভুলিয়াছে, যে উহাই তাহার অস্তিত্ব, যে উহাতেই তাহার জ্ঞান। "কি বলছ মা", বলিয়া আপন কথা স্মরণেই দোষী বুঝিতে, মুখখানি গ্লানিতে অপ্রসন্ন, স্বীকার করিল, "অত্যন্ত, ভয়ঙ্কর, লজ্জিত মা, আমি তোমাকে দুঃখিত করেছি।"

"ঠিক আছে, ডিয়ার।"

অনিলা মাকে হৃষ্টচিত্তে বলিল "ও! মা মা কি চমৎকার তুমি কথা বল, অনুরোধ, আবার বল" অনিলা, নিশ্চয়ই, লাবণ্য দেবীর মনোভাবের সঙ্কেত সকল, উহার রঙ-বিভূতি নির্দ্ধারিত করিতে পারে নাই; শুধু বয়সীনামে, তাহার আপনারই মনে হয় সে বুঝিয়াছে; তাহার অপূর্ব্ব নাসিকা কুঞ্চিত হইল, বুঝিয়াছিল, বাক্যগুলি অতীব প্রাচীনতা, বৈচিত্র্যময় যন্ত্রত্বের যাহা নির্ম্মাণ ক্রিয়া-বীজ। ততক্ষণ অনিলা, তবু মুখ নীচু করিয়া রাখে; একারণে যে তাহার মার প্রতি সহজ ভাবে চাহিতে সজীবতা আসে নাই, ধারণা হয় যে, লাবণ্য দেবী কি আকাশ-ছোঁয়া এবং তাঁহার দেবীত্ব-পূর্ণতায় প্রচণ্ড সূর্য্য, অথবা তরঙ্গ প্রত্যর্পিত আলোক বিচ্ছুরণ এবং উজ্জ্বলতার সম্মুখীন হওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব।

লাবণ্য দেবী বলিলেন "নির্দ্দয় হওয়ো না, কখনো না, ক্ষমা আনো ক্ষমা..."

অনিলা ইতিপূর্ব্বে তাহার মার নিভৃতে, বিজনতায় সময়হীনতায়; আপনার অচেতনে, চলিয়া গিয়াছিল, দেখিল, উহা বিনিষ্কম্প স্তব্ধতায় নিশ্চল, এখানে সৎসাহসে অনির্ব্বচনীয়া সুন্দরী অনিলা পিতাকে উদাত্তকণ্ঠে ডাকিয়াছে, জলদগম্ভীর প্রতিধ্বনি শূন্যতায় সংগঠিত হয় নাই, কোন বৃদ্ধ কবিকণ্ঠ অনিলাকে সুখী করিবার নিমিত্তই শূন্যতার মহতী কর্ম্ম সম্পাদনা করিয়াছে; এবং সে, আপনার নাম ধরিয়া ডাকিয়াছে, আর ইহাও প্রতিষ্ঠিত হয় সে দেখে, কোন ক্রমে, মাকে তাহারই মত সুন্দর;

দেখিয়াছিল, আশ্চর্য্য একটি রেখা, যাহা বৃত্তের মানগুণ্য অবধারণে সাহায্য, ও জগজনকে আদর্শ মোহিত করে; ঐ ডৌলত্ব মার বিপরীত তবু একত্ব আছে, পাখীর চঞ্চুতে যাহার কৌশল, সাগরের লবণ রস উহার স্মৃতি, চন্দ্রের পরিণতি অঙ্ক, স্বর্গের কল্পনা বালকত্ব, ক্রমান্বয়ে মৃত্যুতেই তাহার সৌখীনতা, আত্মার কলেবর—ইহার ফলে অনিলা মার কাছে সরিয়া আসিয়াছে।

"কখন ঘৃণা ক'র না..."

"আমি বাবাকে যে বড় ভালবাসি..."

"বিনীতার জন্য দুঃখিত হও...তাকে ভালবাস..."

অনিলার মনে, এখনও, তাঁহার কণ্ঠস্বর পরিক্রমণ করিতেছিল, মা তাহাকে অশ্রুতপূর্ব্ব রম্য জগতের সন্ধান দিয়াছেন, সেখানে, এই ব্যক্তিগত জগতে, প্রকৃতি তাহাকে নিজেকে মিলাইয়া লইতে, খুসী হইতে, অনুনয় করে, সব কিছু সাজান আছে, তবু তাহার প্রতীক্ষা। সে সত্বর বলিল, "দুঃখিত...মা" পূর্ব্বোক্ত দৃশ্য তাহাকে আকর্ষণ করে।

"দেখ পৃথিবীকে ক্রমশঃ ছোট করত, তুমি বড় ছোট করে আনছ...শোক দুঃখ মৃত্যুকে নিয়ে ত বাস করতে পারব না..." বুদ্ধিমতী লাবণ্য দেবী এ কথায়, আপন কন্যাকে বয়সী করিতে চাহিলেন, নিশ্চিত জানিতেন তাঁহার যুক্তি কন্যার ক্ষেত্রে কোন সূত্রে অর্থ বহন করিবে না; তবু গম্ভীর কণ্ঠে বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

অনিলা মার কথাগুলি নিঃশব্দে উচ্চারণ করিল; নিজেকে ব্যতিব্যস্ত করিতে চাহিল, তাহার বালিকা-উচিত ধীশক্তি ক্ষুব্ধ বিব্রত হইতেছিল, সে ভ্রূ কুঞ্চিত করে, বলিল "মানে" এবং ইহার পর ডাকিল "ট্যাক্সী।"

ট্যাক্সী ডাকে লাবণ্য দেবী যারপরনাই খুসী। গাড়ীতে উঠিয়া, সঠিকভাবে গুছাইয়া বসিতে, মেয়েকে সযত্নে ভালভাবে বসিতে জায়গা দিয়া, দরজা বন্ধ হইয়াছে কিনা দেখিয়া লইয়া, একটি সুস্থির স্বস্তির শ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। বলিলেন, "ভাগ্যে ট্যাক্সী ডেকেছিলে..."

"বড় জল পিপাসা পেয়েছিল..."

"ফ্লোরীট্রিকাতে কিম্বা হিলানোতে চল যাই...চমৎকার তারপর তোমার জন্যে আর্ম্মি নেভীতে যাব," বলিয়া তাহার চুলে হাত দিয়া বলিলেন, "এবার চুল ছাঁটা...না থাক আজ এবার সামনেটা কার্ল..."

"কার্ল আমার..."

"কার্ল হলে বেশ হবে..."

"স্কুলে শুনলে সর্ব্বনাশ"

"ততদিন থাকবে না আমার দেখতে ইচ্ছে করে"

"এ বয়সে করা ঠিক"

"একটু-আধটু করলে কি হয় না...তোমাকে কেমন লাগে দেখব, তোমার নিজেকেই আর চিনতে পারবে না, দেখবে, মনে হবে..." বলিয়া একটার পর একটা চেহারা ভাবিতে উন্মুখ, যে চেহারাতে অনিলা মিশিয়া যাইবে, নিজের প্রতি শ্রদ্ধা সম্পন্ন হইবে, সগর্ব্বে আপনার আশপাশ জগতকে দেখিবে, যেহেতু বেচারী একটি অভাবনীয় ঊষর অন্তরীক্ষ ইতিমধ্যেই সৃষ্টি করিয়াছে, যাহা লাবণ্য দেবীর বিরুদ্ধে রহিয়াছে।

পিছনের বিরাট কাঁচের মধ্যে দিয়া, ব্যস্ত পার্ক স্ট্রীট দেখা যায়। অনিলা রাস্তার দিকে চাহিয়া বলিল, "তুমি ত বলেছিলে কার্ল করার কথা আমি হাসছিলুম...তুমি শুনলে হাসবে..."

"কেন...কি...জন্যে"

"আমার কি ইচ্ছে জান...না তোমাকে বড় দুঃখিত করবে..."

"তাহলে বল না..."

মার এই অবহেলায় অনিলা বিশেষ মর্ম্মাহত হয়; সে ভাবিয়াছিল, লাবণ্য দেবী তাহার কল্পনা শুনিয়া প্রথমে উপায়হীন, অথচ উদ্বেগের দৃষ্টিতে তাহাকে কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করত স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিবেন, তাঁহার ক্রমশঃ দীর্ঘশ্বাসে, কর্ণফ্লওয়ারগুলি নমনীয় হইবে, এবং বলিবেন, "আমারও কিছুই ভাল লাগে না...সারা জীবন শুধু চুপ করে বসে থাকি...কিম্বা লেশ বুনি" ইহার উত্তরে অনিলার কথা ছিল যে "প্রার্থনা করি" ইহা মনে পড়িতেই অনিলার মার রাস্তায় বলা যুক্তি স্মরণে আসিল। "পৃথিবীকে ছোট করা, শোক..." অনিলা, এখন অনুভব করে যে সে অনেকক্ষণ হইতে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, এবং সে মাকে বলিল, "আচ্ছা তখন যে তুমি বলছিলে, শোক মৃত্যু এসব নিয়ে..."

"আমি কিছুই বলছিলাম না" বলিয়া লাবণ্য দেবী ইহার পরে যোগ করিলেন..."ডিয়া"

অনিলা উত্তরটি শ্রবণে বড় ছোট হয়; ধীরে কহিল "তুমি রাগ করছ" ইহার সহিত কিছু না ভাবিয়া বলিয়া ফেলিল "আমার আর কে আছে বল..." কিন্তু আশ্চর্য্য বলার পরক্ষণেই বুঝে যে বক্তব্য সময় সঙ্গত তথা যথোপযুক্ত হয় নাই এবং সে আপনার বক্ষের ল'কেট আকর্ষণ করে।

লাবণ্য দেবী, তাঁহার শ্লেষ যে বিফল হয় নাই, তাহার জন্য তিলেক আত্মপ্রসাদ লাভ সত্ত্বেও, তিনি কিঞ্চিৎ অন্যমনা হইয়া মুখমণ্ডল অর্দ্ধউন্মুক্ত করত বিব্রত, একারণ যে তিনি মুহূর্ত্তের জন্য আপন কন্যাকে আপন বলিয়া ভাবেন না; বিশ্রী স্থূলতা তাঁহাকে অবশ করে, অথচ নিজ হঠকারিতাকে অন্যায় বলিবার মস্ত চাতুর্য্য থাকিলেও, মন ছিল না। তিনি অনিলার দিকে তাকাইলেন, অনিলা অপ্রতিভ, লাল। এবং শুনিলেন অনিলা বলিতেছে "তোমাকে আঘাত করলাম না মা" এবং ধীরে আপনকার চোখ দুখানি তুলিতেই দেখিলেন, অনিলার মুষ্টি বক্ষে স্থাপিত। যে মুষ্টির মধ্যে কাপড়ের অন্তরালে "গঙ্গাকিশোরের ছবি"।

চিন্‌ৎজের চমৎকার ডাগর, খাসা ফুলগুলির সামনে অনিলা বসিয়াছে, তাহার ছাইরঙ কোটের উপরে মুখখানিতে পশ্চিমের আলো আসিয়া, পড়িয়া বিচ্ছুরিত; দুপুরে ঘুমে আয়ত নয়ন দুটি আরও বেশী ফোলা; লাবণ্য দেবী ও মিসেস মিটার কি একটি জিনিষ পছন্দ করিতে নীচে গিয়াছেন—এখনই আসিবেন; হোয়াইট ওয়েজের এই চা-ঘর বড় নির্জ্জন, দুয়েকজন বিদেশী ভদ্রমহিলা চা পানে ব্যস্ত।

এমন সময় মিসেস মিটার এবং লাবণ্য দেবী আসিলেন; অনিলার রূপ দেখিয়া, তাহার গৈরিক পিঙ্গল চুলগুলির উপর রোজ, পিছনে চিন্‌ৎজের ফুল উদ্বেল নীল বর্ণ, সম্মুখে প্যাট্যার্ণ—চা সরঞ্জাম—মনে হইল একটি সম্পূর্ণ ছবি। মিসেস মিটার সত্যই আনন্দিত হইয়াছিলেন। লাবণ্য দেবী উহা দর্শনে, এতক্ষণকার জিনিষ কেনার অছিলায় অন্যত্রে গিয়া পরামর্শ ইত্যাদি সব কিছুই মন হইতে উধাও, যে এই অনিলাকে তিনি আঘাত দিতে চাহিলেন না। তাই মিসেস মিটারকে বলিয়াছিলেন, "আমি বড় ভয় পাচ্ছি..."

তখনও মিসেস মিটার অপলক নয়নে অনিলার প্রতি চাহিয়াছিলেন, লাবণ্য দেবীর অনুরোধ শ্রবণে তাহার মুখমণ্ডল আন্দোলিত হইয়া সায় দিল; এ সময় লাবণ্য দেবীর নিকট গমন করত, তাহার কাছে মুখখানি নামাইয়া কহিলেন "সরি" কেননা অনিলা একটি অর্দ্ধভুক্ত স্যান্‌ডউইচ হাতে লইয়া পাঠে মগ্ন ছিল। গলার আওয়াজে অনিলা মার প্রতি চাহিল, লাবণ্য দেবী বলিলেন, "আমরা একটু ওখানে বসছি—বোধ হয় তোমার আপত্তি হবে না" ইহাতে অনিলা মাথা দুলাইয়া "ও না।"

মিসেস মিটার বলিলেন, "তাহলে ত আর বলতে পারবেন না," আর লাবণ্য দেবীর মন্তব্য শুনিতে শুনিতে পুনরায় অনিলার প্রতি চাহিলেন, যে দোকানে গিয়া কি বিশ্রী কাণ্ড যে অনিলা করিতে পারে তাহা তাঁহার জানা ছিল না, দামী কিছু কিনিবে না বিলাসিতা তাহার শেষ হইয়াছে, সে যখন পিতাকে হারাইয়াছে; সে সন্ন্যাসিনী হইবেই; সে কোন আশ্রমে যাইবেই; পিতাকে সে যখন হারাইয়াছে তাহার কিছুতে প্রয়োজন নাই "শুধু এইটুকু যে মা আমি যেন তোমাকে দুঃখিত না করি..." একথা লাঞ্চের সময় হয়।

যখন সে ঘুমায় তখন লাবণ্য দেবী তাহার বাক্সে একটি হস্ত লিখিত বই 'প্রেম' লেখা দেখিয়া অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়াছিলেন, কিন্তু বইটি খুলিয়া প্রথম পাতায় অপটু হাতের লতাপাতার মধ্যে লিখিত

'ভগবানই প্রেম' এইটুকু ছোট পাতা যে এত বিরাট বিভূতি লইয়া দেখা দিতে পারে তাহা তাঁহার নিশ্চয়ই জানা ছিল না, ফলে মিসেস মিটারকে যে বিশ্বাসে লইয়া উপায় স্থিরীকৃত করিতে চাহিয়াছিলেন তাহার ফল যে যে ভাল হইবে না ইহাই তাঁহার মনে হইয়াছিল, অনিলাকে হঠাৎ বয়সী করার চেষ্টা এখন তাঁহার অনুশোচনা, তাঁহার বিশ্বাস হয় নিশ্চয় তিনি ভাবিয়াছিলেন, যদি অনিলা একবার বুঝিতে পারে সে মার মত রমণী, তাহা হইলে, তাহার পক্ষে এ জীবন সুখকর হইবে।

মিসেস মিটার এখন বলিলেন "আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে, আমাদের এক বন্ধু হর্সওনার জানো মিঃ ডেভিড, জু ভদ্রলোক দারুণ হিপনোটিজম জানে সে ওকে একমিনিটে ভাল করে দিতে পারে।"

ভাল করে দিতে পারে বাক্যটি, লাবণ্য দেবী এখনও শিষ্ট, নীতিভ্রানকে আক্রমণ করিল, তিনি কি বলিবেন তাহা ভাবিয়া পান নাই; কেননা মিসেস মিটার অতীব একনিষ্ঠ ভাবে আবার বলিলেন, "এ ত মানসিক রোগ, আমার মনে হয়..."

লাবণ্য দেবী হাসিয়া কহিলেন "না শুনেছি ওতে শরীর নাকি খারাপ হয়ে যায়...থাক..."

মিসেস মিটার বলিলেন "তা বটে আমি শুনেছি কিন্তু এইভাবে থাকলে, অনিলার ত মনোমানিয়া হয়ে যাবে যে।"

এমত সময় লেডী মধুমণি আসিয়া চা-ঘরে প্রবেশ করিলেন, লেডী মধুমণি এ বয়সে, এখন প্রায় ষাটের উপর, অদ্ভুতভাবে সজ্জিত, লাবণ্য দেবীকে দেখিয়া কহিলেন "আঃ লাবণ্য...কতদিন পরে দেখছি...সাড ব্যাপার...কলকাতায় আসনি অনেকদিন না?"

লাবণ্য দেবী সব কথার উত্তর দেওয়ার পরে কহিলেন "এখন মেয়েকে নিয়ে বড় ভাবনায়..."

মিসেস মিটার যোগ দিলেন "বেচারীর এমন মাথা খারাপ হয়ে গেছে...মনে হয়, আমি ত বলছি মনটা অন্য দিকে ডাইভারসন প্রয়োজন, বলে সন্ন্যাসী হবে।"

লেডী মধুমণি হেসে বললেন "কি দুঃখের, কাল আমার ওখানে এস, মেয়েকে নিয়ে, ডিনারে তোমার মেয়েকে দেখব।"

লাবণ্য দেবী বলিলেন "ওই ত ওনিলা?"

লেডী মধুমণি এস্থান হইতে কহিলেন "ওই সেই সেণ্ট?"

অনিলা মুখ তুলিয়া অত্যন্ত কঠোর ভাবে কিছুক্ষণ চাহিয়া কহিল "দেখুন, সেণ্ট হওয়া আপনার কাছে খুব মজার..."

লাবণ্য দেবী অনিলার চোখ দেখিয়া প্রমাদ গণিলেন, অপরাধীর ন্যায় বলিলেন "ওনিল ডিয়ার..."

লেডী মধুমণি কিন্তু, অনিলার বাক্যে কোন ভ্রূক্ষেপ করিলেন না, তাঁহার স্বভাব সুলভ আমোদ-প্রিয়তা উচ্ছলিত হইয়া উঠিল, হিন্দিতে বলিলেন, "তুম গ্রান্‌ই দি ডি মা হো গিয়া..."

মিসেস মিটার অত্যন্ত চতুর কহিলেন "এখনি আবার ওনিল রেগে যাবে, নিশ্চয়, অনিলা ঠাট্টা উনি করছেন বুঝলে?"

লেডী মধুমণি, এখন, অনিলার পাশের চেয়ারে গিয়া বসিয়া তাহাকে ভালভাবে প্যাঁস্‌নে পরিয়া দেখিয়া বলিলেন "আঃ অনিন্দনীয় সুন্দরী" সঙ্গে সঙ্গে অনিলা মন্তব্য করিল "আমার বাবাকে আপনি দেখেছেন নিশ্চয়—তিনি আরও সুন্দর" লেডী মধুমণি বলিলেন "একে আমি অনেকদিন, দেখিনি...সাধারণ করে নাও নাহলে অনেক কষ্ট" এবং কাহার কুকুর ফুল ইত্যাদি গল্পের পর ডিভোর্সের খুঁটিনাটি আরম্ভ করিতেই অনিলা কোন কিছু না বলিয়া জানালার ধারে বইখানি হাতে করিয়া উঠিয়া গেল।

লেডী মধুমণি ঈষৎ ক্ষুব্ধ হইলেও কিছু বলিতে সাহস করিলেন না। বেশ বুঝিয়াছিলেন তিনি অসাবধানতা বশত, অনেক কথাই বলিয়াছেন, "ছেলেদের মেয়েদের এক্ষেত্রে চাব্‌কে সোজা করা উচিত—"

যদিও লেডী মধুমণিকে লাবণ্য দেবী কোনক্রমেই সহ্য করিতে পারিতেছিলেন না, তাঁহার প্রতি অভদ্রতা করিতেও বাধিতেছিল। লাবণ্য দেবী একদা, দণ্ডায়মানা কন্যাকে দেখিলেন, এবং অন্তরে শঙ্কিত হইতেছিলেন, মনে হইল অনিলা অনেক দূরে চলিয়া যাইতেছে; তিনি অল্প সময়ের জন্য মাপ

চাহিয়া, কন্যার কাছে আসিয়া বলিলেন, "এখনই যাব, তোমার কষ্ট হচ্ছে ডিয়া..."

অনিলা মাকে ধমকাইয়া কহিল, "কি যত বাজে লোক, মানে, ওই হ্যাগ বুড়ী..."

লাবণ্য দেবী এই চাপা বিস্ফোরণের জন্য প্রস্তুত ছিলেন, সত্বর বলিলেন "আর এক সেকেণ্ড..."

অনিলা তীব্র স্বরে উত্তর করিল "না না, ওর সঙ্গে বসবে না...সাধু ওঁর খেলার বস্তু, অশিক্ষিত উইচ্।"

লাবণ্য দেবী কন্যার অসহিষ্ণুতাকে কোন ক্রমেই সাধারণ করিতে অথবা সত্যই দৃঢ়রূপে মন্দ বলিতে পারিলেন না, এদিকে চাহিয়া দেখেন লেডী মধুমণি উঠিয়া বলিলেন "কাল এসো, মেয়েকে এনো, গুড্ নাইট্..."

লেডী মধুমণি চলিয়া যাইতে সকলেই সুস্থ বোধ করে, মিসেস মিটার বলিলেন "আমার মনে হয়, কোন প্রয়োজন নেই, আপনি দিন কয়েক যেতে দিন, এখন শুধু ডাইভারট করা—মনটাকে অন্য দিকে...কাল ভোরে আসুন না, স্পোর্ট দেখা যাবে, ঘোড়ায় ওতো শুনেছি..."

লাবণ্য দেবী উত্তর করিলেন 'ওকে ডাকি—'। অনিলা সকাল হইতে এখন যেন আরও গম্ভীর হইয়া গিয়াছে, মিসেস মিটারের প্রস্তাব শুনিয়া বলিল, "মা তো খুব ঘোড়ায় চড়তে ভালবাসে...কিন্তু সাজ..." লাবণ্য দেবী "এখনি কিনবো।"

অন্ধকার এখন নাই, পাখীর কলরব শোনা যায়, পিছনে কোর্সে, ঘোড়ার ছুট দেখিবার জন্য ছোট ছোট দল, হাতে ষ্টপ ওয়াচ লইয়া ভীড় করিয়াছে...মিসেস মিটার ও তাঁহার স্বামী এখানে উপস্থিত, এমত সময়, লাবণ্য দেবী এবং অনিলা আসিয়াও পৌঁছাইলেন।

মিঃ মিটার চোখে দূরবীণ ঘুরাইয়া কহিলেন "মর্ণিন মিসেস চ্যাটার্জ্জি..."

মিসেস মিটার এ ব্যাপার দেখিয়া নিজেকে খুব সংযত ভাবে বলিলেন "কাকে কি বলছো...এটা অপরাধ তুমি ওনিলকে..." মিঃ মিটার দূররীণ সরাইয়া নিজের লাঠি চেয়ার পুঁতিয়া বসিয়া কহিলেন "খুব দুঃখিত, শুধু ঘোড়ার দিকে মন, বে-আউরা" অনিলাকে দেখিয়া বলিলেন, "এই সেই মেণ্টাল গার্ল, হ্যাঁ, সব লক্ষণ আছে" ইতিমধ্যে বেয়ারা আসিয়াছে, তাঁহাকে মিঃ মিটার আজ্ঞা করিলেন "মেম সাবকো গাড়ীতে নিয়ে যাও ঘোড়া তৈয়ার হ্যায়—নানা, এখনি রোদ উঠে যাবে...আমরা আসছি...কফি?...কফি দো।"

বেয়ারা ফ্লাস্ক খুলিয়া কফি দিল...

মিঃ মিটার কহিলেন "এখুনি আসছি..."

অনেকদিন পর ঘোড়ায় আরূঢ় হইয়া অনিলা তাহার গ্রেন চেক্ প্লেট-সাবার্ট উপরে সুন্দর সাদা জামা, তাহাকে অপূর্ব্ব লাগিতেছিল যেমন আনন্দিত তেমনি ভীত, ঘোড়া হইতে চারিদিকে চাহিল সুন্দর কলিকাতা, ধন্য এ শহর। লাবণ্য দেবীর ঘোড়া দুলকী পায়ে ঘুরিতেছে, অনিলা বুঝিল তাহার ঘোড়াও আর দাঁড়াইতে চাহিতেছে না; পাশাপাশি দুজনে, ঘোড়া চলিতেছে, দু-এক পাক-এর পরই ঘোড়াকে দুজনে তুমুল বেগে ছুটাইতে আরম্ভ করিলেন।

লাবণ্য দেবী অসম্ভব দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছেন, কেননা ইহাই সেই স্পিড, যেখানে কোন ভয় নাই, আপনার মুখখানি বাঁকাইয়া কহিলেন, "অনিলা আমি বিয়ে করেছি।"

অনিলা ইহার উত্তরে কহিল "ঠিক আছে।"

লাবণ্য দেবী এ-হেন উত্তর আশা করেন নাই, হতচকিত হইয়া পুনরায় কহিলেন, "অনিলা আমি বিয়ে করেছি"।

অনিলা, "কি" বলিয়া হঠাৎ ঘোড়া থামাইল, ঘোড়া তখনও ঈষৎ ঘুরিতেছে।

লাবণ্য দেবী কাতর নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া অবনত মস্তকে কহিলেন "ওনিল আমি বিয়ে করেছি।"

অনিলার মার পিছনে সমগ্র কলিকাতার শহর, ওপাশে—কাহারা অদ্ভুত জারসী পরিয়া কি যেন খেলা করে, পাখী সন্ধানী দূরবীণ হাতে ঘুরে সবকিছু দেখিল, মার মুখখানি কালো, অনিলা অট্টহাস্য করিয়া উঠিল, অনেক দূরের কেল্লার তোপ-মিনার-সহ তাঁহার ছবি লাল সূর্য্যালোকে বীভৎস হইয়া উঠিল, এবং সজোরে সে ঘোড়াকে চাবুক মারে, ঘোড়া এখানে রাস্তা পার হইয়া দুরন্ত বেগে ছুটিল,

অনিলার চোখে জল ছিল না "বাবা...বাবা" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল...বেচারী এসময় তাহার হাতে লকেট কিছুক্ষণের জন্য ছিল, হঠাৎ রেকাব হইতে পা ছাড়িয়া অনিলা মাটিতে পড়িল, মুখময় হাতে জামায় ভিজা ঘাস, মুখ ঘষিয়া গিয়াছে চৌরঙ্গীর এপাশে, জলসত্র ছিল, অনিলা সেখানে গিয়া চোখেমুখে জল দিতে, কিছু পাতা মুখে লাগিল, এখানে সে বসিয়া পড়িল, নিজে একদা প্রশ্নও করিল, কেন সে কাঁদছে? এতদিন পরে কেমন যেন অসহায়; ইচ্ছা হইল, আপনার বক্ষে জুতাসমেত পদাঘাত করে, মাথায়, মনে, কি যেন সঙ্কল্প মর্দ্দিত হয়।

অনিলার ক্রন্দন দর্শনে এখানে যে বালক বালিকারা খেলা করিতেছিল, তাহারা তাহাদের, নান্নিকে প্রশ্ন করিল "ওকে কে মেরেছ...কোন্ মারা হায়ই?" বলিয়া সকলেই তাহাকে দেখিতে এবং যুগপৎ অঙ্গুলি চুষিতে ব্যস্ত।

শিশু কণ্ঠের নানান অনুমান, সকালের পাতা ঝরাতে চঞ্চল, এবং অট্টালিকা-ব্যাঘাত প্রাপ্ত আলোকে শিথিল করিয়াছে; পিছনে ট্রামের শব্দ ঘণ্টি গাড়ী শব্দ সকল কিছুকেই প্রশ্ন অন্তর্গত করে!

কেননা এখানে যে কাঁদিতেছে, তাঁহার বেদনা নির্দ্ধারণ করা দুরূহ, তাহার রূপ ঐশ্বর্য্য নিখাদ দেহ,—শ্রীসম্পন্ন কান্তি, লক্ষ্মী সুস্থিরা শোভা, এ সকল সত্ত্বেও তাহাকে একাকিনী করিল, যে হেতু সে কাহাকেও প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছে, যে ভালবাসা তাহার ধর্ম, তাহাকে কামনাশূন্য করিয়াছে। কত প্রার্থনা সে জানিয়াছে তাহার বাবা এবং তিনি যিনি সকলের মধ্যে আছেন। এক এবং অভিন্ন, ভগবান তাহাকে ভালবাসেন কেননা তাঁহার পিতারূপে আসিয়াছিলেন; তিনি নিশ্চয়ই দেখিতে চান তাঁহার অবর্ত্তমানে তাহাকে সে ভালবাসে কি না?

অনিলা আপনার স্নেহময় পিতার দুঃখ মুখখানি স্মরণ করিল, মনে হইল সমগ্র জগত তাহার অবমাননা করিবে জানিয়া পূর্ব্বাহ্ণেই তিনি চলিয়া গিয়াছেন, বেচারীর প্রতিটি রোমকূপ হাহা বলিয়া উঠিল, প্রিয়দর্শিনী চারুদশনা অনিলা ক্রন্দন করিতে লাগিল, কেননা তাহার পিতাকে অতিমাত্রায় লাঞ্ছিত করা হইয়াছে এবং তাঁহার পৌরুষ আঘাত প্রাপ্ত, অনবরত রোমহর্ষে, সে, কেবলই আপনার বিষণ্ণতা, বিমর্ষ, দুঃখ, অবসাদ, ক্ষোভকেই জানিল; ক্লৈব্য তাহাকে আচ্ছন্ন করিল। সে লকেট লইয়া উম্মাদ এবম্প্রকার, আপনার কপোলে, কপালে, কভু এখানে, সেখানে, চোখে সাতিশয় আবেগে চাপিয়া অশ্রু সিক্ত করে; সে ছোট ঘরে জন্মায় নাই ফলে, তাহার পাশবিক বৃত্তি নাই; একমাত্র আপনাকেই সে নিগৃহীত, বিধ্বংস করিতে পারে; সে, অন্তেবাসী অনিলা মধুর স্বভাবা, ভক্তিমতী, যাহার শ্রদ্ধা আছে, যে পিতৃঅন্ত প্রাণা, সে হায়, অদ্য ঝটিতি নিজেকে বিনষ্ট করাই স্থির করে। সে একদা এখানে বসিয়া দেখিয়াছিল অবনত মস্তকে তাহার মা, দণ্ডায়মানা, আর দেখিতে ইচ্ছা করে নাই।

ইতিমধ্যে লাবণ্য দেবী যিনি ভয়কে দেখিতে চান...কোন রূপে এখানে আসিয়াছিলেন; তাঁহার চোখে জল ছিল, মনে হয়; দেহ যেন তাঁহার দাঁড়াইতে অক্ষম, অনিলা তাঁহাকে দেখিয়া আরবার হাহা করিয়া, চাষীদের মত, বাঙালীদের মত, নেটিভের মত, কাঁদিয়া উঠিল; একই সঙ্গে কত কি তাহার কণ্ঠে আসিয়াছিল শুধু সে বলিয়াছিল "তুমি জঘন্য স্ত্রীলোক, তুমি বের হও আমার সামনে থেকে...ঘৃণা করি ঘৃণা করি...ও" বলিয়াই, সম্ভবত আপনাকে আর সে সহ্য করিতে পারিতেছিল না, সে দৌড়াইল, ট্রামের ঘণ্টা পাগলের মত বাজিল, মোটর গাড়ীর ব্রেকের আওয়াজ হইল, ঘোড়ার গাড়ী লাগাম টানে, এখনও ভিজা রাস্তায় সে পিছলাইয়া পড়িল; সে সেখানেই চাপড় মারিয়া কাঁদে; কেন তাহার ভাই নাই—আর্ত্তনাদে শোনাইল ও ওরসটিস!

লাবণ্য দেবী আসিলেন, চৌরঙ্গীর উপর এক লজ্জাকর দুঃখজনক দৃশ্য সৃষ্টি হইল; লাবণ্য দেবী তাহাকে উঠাইবার চেষ্টা করিতেছেন, আর অনিলা ক্রমান্বয় বলে, "আমি যাবো না..."

লাবণ্য দেবীর অনুনয় বিনয়, কিছুতেই যখন অনিলা মানিতেছে না, তখন তিনি আপনার সম্মান রক্ষার্থে জোর করিতে বাধ্য হইলেন এবং সমবেতকে বলিতেছিলেন, "ও পাগল"; মিঃ মিটার এবং মিসেস মিটার যেহেতু দূরবীণে তাঁহারা এ দৃশ্য দেখিয়াছিলেন, সত্বর আসিলেন।

অনিলা মহা আপশোষে মহা জ্বালায় মানসিক নির্য্যাতনে বলিয়া উঠিল "তুমি আমার বাবাকে মেরেছো" এ উক্তি সকালের রাস্তায় দাবদাহ সৃষ্টি করিল।

লাবণ্য দেবী আর সহ্য করিতে না পারিয়া প্রচণ্ড বিক্রমে অনিলাকে চপেটাঘাত করত নিজেই

কাঁদিয়া ফেলিলেন; মিঃ মিটার অনিলাকে ধরিতেই অনিলা তাঁহাকে কামড় দেয়...মিঃ মিটার হাসিয়া তাহাকে কোনরূপে আপনার গাড়ীতে বসাইলেন, অনিলা শিশুর মত হাত পা ছুঁড়িতে লাগিল এবং বাবা এ শব্দটি ক্রমাগতই উচ্চারিত হয়।

গাড়ী হোটেলে আসিল। লাবণ্য দেবী মিসেস মিটারকে থাকিতে অনুরোধ করিলেন; কেননা উন্মাদ অনিলাকে তাঁহার পক্ষে সামলান একরূপ অসম্ভব।

অনিলা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, চাইনিজ বড় ভাজ আছাড় মারিয়া ভাঙ্গিল, লাবণ্য দেবী প্রায় তাহার পায়ের কাছে বসিয়া বলিতেছেন, "ওনিলা ডিয়ার ক্ষমা কর আমায়।"

অনিলা রুদ্র মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে; মিসেস মিত্র স্ত্রীলোক, তিনি সত্বর দরজা খুলিয়া হোটেল কর্ত্রীকে ডাকিতে গেলেন।

অনিলা মাকে একা পাইয়া ক্ষেপিয়া উঠিল, "জঘন্য স্ত্রীলোক তুমি মিসেস চ্যাটার্জ্জি না, আমার বাবাকে অপমান করেছ, তুমি আমার বাবাকে মেরেছো, ডামনেবল হেবার,"...বলিয়া যাহা হাতের কাছে পাইল তাহাই ছুঁড়িতে লাগিল, পারফিউমের শিশি হইতে সকল কিছু—এইভাবে রুদ্রতার মাঝখানে নিজে বেচারী পড়িয়া যায়, তাহার হাত কাটিয়া গেল, এবং অচৈতন্য হয়—বাবা বাবা এ শব্দ বাহির হইল। কাঁচের টুকরার মধ্যে তাহার দেহ বীভৎস ভাবে পরিক্রমণ করে।

অনিলার যখন চৈতন্য হইল, যখন শুধুমাত্র স্থান নির্ণয় করিতে পারে, তখন, একজন স্নেহময়ী নার্সকে দেখিয়া একটি সুগভীর নিঃশ্বাস লইয়া কি যেন আবৃত্তি, যাহার মধ্যে, নীল, পিতা-স্রোত, এবং আমার নিশ্চেতন দ্বারা একটি মনীষা সৃজিত হইবে, সে করিয়াছিল; আপনকার জর্জ্জরিত বেদনা আপনার স্কুলের ঝাউ বীথিকায় রাখিয়া আসিতে সঙ্কল্প করে, এবং উঠিয়া বসিতে ইচ্ছুক, সর্ব্বপ্রথম সে এক গ্লাস জল চাহিল; আর যে, বুঝিল, সে ক্ষুধার্ত্ত; সংস্কার বশত কোন কথা একবার জিজ্ঞাসা করিতেই থমকাইল; ধীরে ধীরে দৃঢ় কণ্ঠে বলিল "খিদে পেয়েছে।"

কিছু পরে পাশ ফিরিতে গিয়া দেখিল, লাবণ্য দেবী—জ্বরে সম্ভবত, কাতর; নার্স থার্মমিটার দেখিতেছে, তাহার সহিত দৃষ্টি বিনিময় হইতেই, নার্স বলিল "কেমন আছ, এখন, ভাল, জল দিচ্ছি তোমার মার ভয়ঙ্কর জ্বর..."

অনিলা দুঃখ প্রকাশ করিতে গিয়া চুপ, তাহার ভিতরে কে যেন বলিয়া উঠে, "ও তাই...কখন উনি...মরবেন?" অবশ্য 'মরবেন' নহে মরুক কথাটা উচ্চারিত হয়।

নার্স আবার বলিল "আর মাথা খারাপ কর না, তোমার মা বড় ভাল, অনেকক্ষণ জ্বরেও তোমার কাছে ছিল,"

"নিশ্চয়ই আমাকে ছোঁয় নি, নোংরা..."

নার্স অনিলার কথায় অবাক হইয়া কহিল "দেখ আর চেঁচামেচি কর না, তুমি হোটেলের অনেক ক্ষতি করেছ, অন্যান্য বাসিন্দারা নালিশ করেছে—পুলিশ নীচে আছে..."

নার্সের সকল কথা শোনার পরমুহূর্ত্তেই অনিলার ঘ্রাণে কক্ষস্থিত সুমধুর গন্ধ আসিল, অনেক কিছু ভাঙ্গা দর্শনে সে পুনর্ব্বার মরিয়া হইয়া উঠিল, বলিল "না না,...আমি কিছু খাব না...আমি এ জায়গা ছেড়ে চলে যাব;"

নার্স বলিল "দেখ তুমি অদ্ভুত ভাল মেয়ে, সামান্য ব্যাপার নিয়ে ছেলেখেলা করছ;"

"ও নার্স"

নার্স আরও যোগ করিল যে পুলিশ এখানে আছে তুমি কোথাও যেতে পারবে না।

অনিলা দৃঢ় করিয়া বলিল "আমি করবো।"

সেদিন রাত্রের গাড়ীতে জ্বরে জ্ঞানহীন লাবণ্য দেবী, অনিলা এবং নার্স শাহানপুর চলিয়া গেলেন। অনিলা পুলিশ ইত্যাদি দেখিয়া কোন কথা বলে নাই; সারা ট্রেনে কোন শব্দ করে নাই, ঘুমায় নাই।

শাহানপুরে আসিয়া তাহাদের বাড়ী দেখিয়া সে অদ্ভুত বিকল হইয়া যায়; এখানে থমকাইয়া দাঁড়াইল; বাগানে ফুলের গাছে সে হাত বুলাইয়াছে, সিঁড়িতে সে হাত দিয়াছে, বাবার টেবিলে, বিছানায়, এক ঘর

হইতে এক ঘরে, বাবার জুতা লইয়া চুম্বন করিয়াছে, আর একা শূন্যকক্ষে অনবরত বলিয়াছে, "তোমাকে অবমাননা...বল, বল আমি কি করিতে পারি...বাবা তোমাকে ভালবেসে প্রাণ সমর্পণ করে আমার এত কষ্ট...তুমি কতবার দেখা দিয়েছ কেন বলনি একথা..." কিছুই নাই, লাবণ্য দেবীর ঘরে অনিলা যায় না, দেখাও করে না। অবশ্য শুধু যখন উন্মাদনা দেখা দেয় তখন তর্জ্জনী তুলিয়া অভিশাপ দেয়, বলিয়াছে, "উঠ আমার বাবার বিছানা থেকে"। তাহার পুড়ে যাওয়া মুখমণ্ডল ভয়ঙ্কর, তিনি নার্সের সাহায্যে অন্য কক্ষে চলিয়া যান। এ কক্ষের পাশে অনিলা দাঁড়াইয়া যখন ভগবানকে আহ্বান করে, অভিশাপ দেয়, শুনিয়াছিলেন, একদা ঘরে কেউ নাই, লাবণ্য দেবী জল চাহিতেছিলেন, অনিলার মন হঠাৎ দ্রবীভূত হওয়ায় জল দিতে অগ্রসর হয়।

লাবণ্য দেবী উন্মাদের মত চীৎকার করিয়া উঠিলেন, বলিলেন "বিষ বিষ"

অনিলা বিস্মিত ও রুষ্ট হইয়া কহিল "জঘন্য স্ত্রীলোক তাই যদি মনে হয়—আমাকে ছেড়ে দাও না কেন..."

লাবণ্য দেবী কোন রকমে বলিলেন "আমি তোমাকে ভালবাসি"

"ভালবাস? তুমি যে আমার বাবাকে অপমান করেছো—তার মধ্যে ভালবাসা আছে? ছিল?"

লাবণ্য দেবী বিরক্ত রাগান্বিত হইয়া কহিলেন "যাও আমার ঘর থেকে"

অনিলা সদম্ভে কহিল "মা এখনও আমি রোজ ভগবানকে ডাকি, বাবার মৃত্যু আমায় অনেক কিছু শিখিয়েছে...তুমি নিজের সম্মানের জন্যে আমাকে এখানে ধরে রেখেছ—যাতে আমি তিলে তিলে মরি...বাবাকে অবমাননা করা তোমার সার্থক হবে; তুমি আমাকে নীচ করে দিয়েছ, বড় নীচ করেছ।"

লাবণ্য দেবীর এ সকল কুৎসিত কথা শ্রবণে বড় যন্ত্রণা উপস্থিত, একদার দাম্ভিকতা ঔচিত্যবোধ আর নাই—এখন শুধু নির্য্যাতন। অনিলা এখানে বসিয়া উদাত্তস্বরে ভগবানকে ডাকে—অপরাধীর শাস্তি দাও।

অনিলা চলিয়া গিয়াছে, লাবণ্য দেবী রুকমিকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, "অনিলাবাবার কাছে তুমি সব সময় থেক," রুকমি তাহার পর হইতে সকল সময়েই অনিলার সহিত, অনিলার দুঃখ বুঝিতে সে প্রথম অগ্রসর হইল।

ক্রমে ওনিলা ক্লান্ত, ভগবানকে এভাবে ডাকার জন্য তাহার সত্যই লজ্জা হয়, হায় সে তাহার বাবাকে-পিতাকে শুধু ডাকিয়াছে অন্যকে শাস্তির জন্য, পিতাকে সে না জানিয়া বারম্বার ছোট করিয়াছে, সে তাঁহাকে দুঃখ দিয়াছে, নরক আছে যাহারা পাপ করে, অন্যায় করিয়াছে তাহারা নরকে যাইবেঃ "আমি তাঁহাকে ভালবাসিবার চেষ্টা করি নাই শুধু রক্তের উষ্ণতাকে আপন চোখে অনুভব করিয়াছি...।" এবং অন্যমনে সে দরওয়ানের স্তব গান শুনিয়াছে। নিজেকে ছ্যাঁকা দিয়াছে, চুল ছাঁটিয়া ফেলিয়াছে, এখন বেচারী যেন অশরীরী, কি বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন!

এই অভিশপ্ত গৃহ হইতে যাহাতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, তাহার জন্য যাহা যাহা করা উচিত, এখানে সেখানে টেলিফোন, ভাইসরয়কে চিঠি, গভর্ণরকে চিঠি সবই, পিয়নকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে "আমার চিঠি আছে?" কিন্তু ফল হয় নাই, সে এখান হইতে পালাইতে চাহে; আশ্চর্য! শুনিল সে নাবালিকা, এবং সে আইনকে উপহাস করিয়াছে, বলিয়াছে "বাঃ আমি পুত্রসন্তান সম্ভবা হইতে পারি কিন্তু..."

তাহার প্রতি মুহূর্ত্ত যখন দূষিত, এবং ইহার জন্য কাঁদিয়া, পরিশ্রান্ত হইয়া ভাবিয়াছে এখনও কয়েক বছর এই অশুচি, হিম কদর্য্য স্থানে তাহাকে অতিবাহিত করিতে হইবে, পিয়ানোয় এলোমেলো অঙ্গুলি আঘাতে আপনাকে বিমনা এবং অশ্বত্থ পত্রের দিকে চাহিয়াছে, সহসা নব পত্র উদগম হইতেছে, এ-রঙ তাহার বড় ভাল লাগে, তাহারই আপনার চোখে যখন আলো পড়ে ইহা তাহাই, ইহা তাহাই; এ ভাল লাগা দিয়া অদ্যকার ইদানীং নৈরাশ্যকে বাধা দিতে চাহিল, চাহিল "রঙ আর বাবা বলার যে ধ্বনি এ দুই কোথাও না কোথাও মিলিয়া যাক।" এবং তাহার বক্ষ দীর্ঘশ্বাসে উদ্বেলিত হয়।

মাঝে মাঝে প্রশ্ন করে "হায় আমি কি দুর্ব্বল...আমার যদি একটা বন্দুক থাকত বন্দুক থাকত হায় আমি যদি ছেলে হতাম"

যখন সে আপন মনোভাবনায় স্তব্ধ তখন শুনিল, দুজন কাহারা কথা কয়—"এ জমাদারের সিঁড়ি খুলে যাবে—দেখ দরজা কিভাবে বন্ধ হয়ে তবে, চোর নয় আমি আজ অনেক দিন, দেখছি...ছাদ থেকে সিঁড়ি দিয়ে নামছে..."

ইহাতে অন্যজন উত্তর করিল "নায়া সাব্।"

মন্তব্য শ্রবণে প্রথম জন কহিল "পাগলা...অনিলা বাবাক ডর, কভি ইধার আয়গা...হাম দেখা হামারা সাহাব" বলিবার সঙ্গেই কুর্ণিশ করিল।

অনিলা তখনই ভীত, পরক্ষণেই উচ্ছ্বসিত হইয়া তাহাদের ডাকে; এবং সমস্ত কিছু শুনিয়া—সে অভিমানে কাঁদিতে লাগিল, এরা তাহার পিতাকে দেখে, এবং পুনঃ পুনঃ বাবাকে স্মরণ করে।

মসৃণ, ধূম্র, চাঁদের আলো ছাদে, অনিলা এখানে, একবার ভাবিল এই ত সময়, পরক্ষণেই আমার বাবা বহুপথ অতিক্রমে আসছেন, তাই দেরী হইতেছে, পিতাকে দেখিতে আসার দুঃসাহসিকতায় সে রোমাঞ্চিত; ওষ্ঠ শুষ্ক, তবু তাহার বিশ্রীভাবে-কাটা চুলগুলি যেমত দাঁড়াইয়া উঠিতে চাহে, তাহার মনে আর প্রতিহিংসার বীজ নাই...ভগবান শাস্তি বিধান করিয়াছেন, সে নিজের কাটা চুলের জন্য কাঁদিয়াছে: তাহার অপরিচ্ছন্ন দেহবাস দেখিয়া পীড়িত, "বাবার কাছে এ রূপ লইয়া যাইবে, কি করিয়া"

তাহার উত্তর ছিল, অনিলার আর ধৈর্য্য নাই, সে ক্রমশঃ বিকৃত, সে ছাদে সদর্পে এধার ওধারে যায়, মাঝে মাঝে বালিকা-কণ্ঠে ডাকিয়া উঠে "বাবা বাবা তুমি এসো।"

সহসা কিসের যেন মস্ মস্ শব্দ। কিসের আওয়াজ! অনিলা শিহরণে রেখার ন্যায়, রক্তে সর্পিল গতি, অঙ্গের শিরা-উপশিরা স্থূল, নাসার বেসর স্ফীত, ক্রমে সে সুন্দরী, পিছন ফিরিয়া দেখে, কেউ, ঝটিতে বিদ্যুৎ প্রবাহে তাহার দেহকে কম্পিত, মর্ম্ম নির্ব্বাপিত; চক্ষু মেলিয়া চাহিল, দেখিল, 'গঙ্গাকিশোর।'

"বাবা বাবা" বলিয়া কুমারী, নাবালিকা, পিতা যাহার ধর্ম্ম, পবিত্র, নিষ্পাপ অনিলা প্রায় এক লম্ফে মানুষটির কাছে আসিয়া জড়াইয়া, কখন কখন ক্রন্দন, কখন দংশন, কখন আপনার নখর আঘাতে সকল কিছু প্রকাশে আপনার শ্বাসরুদ্ধ হয়, কর্ত্তিত লতার ন্যায় অবশেষে নতজানু হইয়া বসিয়া, শব্দ উচ্চারিত না করিয়া অনেক কথাই বলিয়াছে; এবং তাহার পদদ্বয়ে হেলান দিয়া, মনের কথা ব্যক্ত করিয়াছে।

মানুষটি বলিল "তৃষ্ণার্ত্ত"

অনিলা তাহার পিতার এই প্রথম কথা শ্রবণে, উন্মত্ত, পলকেই সে স্থান ত্যাগ করিয়া জল আনিতে সিঁড়িতে; এখানেই সে কাঁদিয়া উঠে কেননা তাহার সন্দেহ হয়, "বাবা কি চলিয়া গেলেন...?" শঙ্কিত চিত্তে, উপরে, ছাদে পুনর্ব্বার আসিল, সেখানেই সেই ভাবেই তাহার বাবা এখনও, সে গিয়া অনুনয় করিল, "বাবা নীচে চল...নীচে চল—তোমার জন্যে সব প্রস্তুত।"

সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে অনিলা মন্ত্র চালিতের মত বলিতেছিল "যিনি এত দিন স্বর্গে ছিলেন তিনি আজ এসেছেন, তিনি আমার...বাবা...যিনি রুকমি আলো জ্বালাও আমার বাবা এসেছে..."

লাবণ্য দেবী আপনার দুস্থ মুখখানি তখন আয়নায় দেখিতেছিলেন, তাঁহার হীরক অঙ্গুরীয় মণ্ডিত হস্তে একটি মুক্তার মালা, এখন তিনি অন্য হাতেও তাহা ধরিয়া যখন পরিতে যাইবেন, ঘোষণা শুনিয়াছিলেন—এযাবৎ অনিলা তাঁহাকে বহুভাবে ভীত করিতে চেষ্টা করিয়াছে—আজ অনেকদিন পর আবার!

সত্বর উঠিয়া আসিলেন এবং তিনি আলো জ্বালাইয়াছিলেন।

সিঁড়ির উপর হইতে বালিকা অনিলা কহিল "তুমি, আজ তোমাকে জঘন্য বলিব না, আজ আমি সুখী—আমার বাবা এসেছেন, তুমি তোমার..."

লাবণ্য দেবী স্তম্ভিত সত্যই তিনি একটি হাত কোটের হাতা সমেত আপাতত অনিলার বক্ষে

দেখিয়াছিলেন।

অনিলা বলিল "বাবা ধীরে এসো, ভয় নেই, আমি আছি..."

পরক্ষণেই লাবণ্য দেবী এই আধো বারান্দার আলোয় কাহাকেও দেখিলেন, সিঁড়ির আলো জ্বালিতেই তিনি যেন বজ্রাহত, অবলোকন করিলেন রঞ্জিতের হাত ধরিয়া অনিলা নামাইতেছে, অনিলা বলিল "মা আমার বাবাকে দেখ", লাবণ্য দেবীর মনে হইল ক্রমে যেন তিনি সংজ্ঞা হারাইতেছেন; রঞ্জি কেমন ভূতচালিত! তিনি খুসী হইতে গিয়া ভীত হইলেন। এযাবৎ তাহার অপেক্ষায়, রঞ্জির, তিনি ছিলেন, এভাবে তাহাকে দেখিবেন তাহা কল্পনাতীত।

* * *

লাবণ্য দেবী আপনকার দিনগুলি, যাহা সুনির্দ্দিষ্ট এই জন্য যে স্থূলতাই সকল বহমানতার শীল পরিচ্ছন্ন চিহ্ন, এবং তাঁহার গতি, তাহা ব্যাহত হয়, কি অদ্ভুত কালিমা! বেচারী কি এক অস্বাচ্ছন্দ্যবোধে উদাস, আপনার হাতখানি, কি যেন অবলম্বন করিতে সমুৎসুক, হায় তাঁহার অনুভবকে তিনি সনাক্ত করিতে অপারক্ (গ); কেননা উহা অন্য নামে আছে, তাঁহার কবরীবন্ধনের বড় খুসীর কেয়ারি; হরিণের নিরীহ নয়নের উপমাই, হায় আমি! মেষপালকের প্রত্যাগমনকে আমি দূর প্রান্তরে মন্থর করিয়া রাখিয়া, কতবার ঘুমাইতে চাহিয়াছি; স্তন্যদানে কি জ্যামিতিক শোভা!...তিনি সারারাত্র ব্যাপী জাগিয়া, দেখিয়াছেন, অনিলা তাহার প্রিয়তম কন্যাকে, বিকারগ্রস্ত, রঞ্জিকে—গঙ্গাকিশোর অর্থাৎ তাহাদের পুরাতন কক্ষে বসাইয়া তাহার পিতৃহীন দিনগুলির তিক্ত বেদনা, তবু সুন্দর, এ-কারণ যে, স্বচ্ছতাকে-পেলব, শিশুত্ব—ইহা পূর্ণ সহজ, নিষ্কলুষ—আপনার দেহে অন্তরে আনিতে সক্ষম; সে বাবাকে চাহিয়াছে। রঞ্জিত তাহার বেদনা, শ্রবণে রহস্যময় কণ্ঠস্বরে উত্তর দিল, এবং আর তিনি দেখিলেন, অনিলা আপন রূপকে বিকৃত করার জন্য, ডিম্বাকৃতি উৎকৃষ্ট কারুকার্য্যকৃত আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তীব্র বিরক্তিতে কাঁদিয়া উঠিল; কি ভাবে, কেমনে, কোন নির্য্যাতনে মর্ম্মযাতনায় আপনাকে খর্ব্ব কুৎসিত করিয়াছে, "তবু যে বাবা তুমি আমায় চিনছো...যেহেতু তুমি মানুষের অন্তর দেখ", অনিলাকে আর দেখা গেল না, এই সুযোগে, তিনি অগ্রসর হইতে মনস্থ করেন এবং যেইমাত্র দরজায়, ঝটিতি রাত কামিজে বোতাম দিতে, তাহার ধৈর্য্য ছিল না, উৎক্ষিপ্ত হইয়া এঘরে আসিল, লাবণ্য আতঙ্কে নিশ্চল, সে এতই উত্তেজনায় অস্থির যে তাহার কামিজের বোতাম দেওয়া হইল না, কহিল, "ঐ যে সেই, নোংরা, প্রতিশোধ—তোমার পিস্তল কই...গুলি কর এখনই এখনই—প্রতিশোধ চাই..." অনিলা এতই পাগলিনী যে তাহার রাত-কামিজ বশ মানিল না; উন্মুক্ত, সে নির্লজ্জ—তাহার দেহ দেখা যায়; যাহাকে, যে দেহকে, লাবণ্য দেবী রমণী করিয়া গড়িতে চাহিয়াছিলেন, আপন তন্মাত্রায় বুঝিলেন; অনিলা কখন যে রমণী হইয়াছে তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই; লাবণ্যদেবী কন্যার ভয়াবহ চণ্ডমূর্ত্তি দর্শনে, নিঃশ্বাস রহিত; দেখিলেন, অনিলা পাশের ওরমল্যু করা কেবিনেটে এতদিন যাহা তাহার দৃষ্টিতে পড়ে নাই, এখন লক্ষ্য করে কেবিনেটের কাঁচ ভাঙ্গিল, একটি মূল্যবান জেডের হাতল দেওয়া ছুরিকা বাহির করিবার পরক্ষণেই দেখে, তাহার আপনার হস্ত বহিয়া রক্ত; ভ্রূক্ষেপ নাই, নিমেষেই মুখ দিয়া লেহন ব্যস্ত, রঞ্জিকে অনুনয় করে "নাও নাও প্রতিশোধ—প্রতিশোধ চাই—ওকে খতম কর" তর্জ্জনী তুলিয়া তাঁহাকে লাবণ্য দেবীকে নির্দ্দেশ করে, তাহার হাত হইতে, এখন ফোঁটা ফোঁটা রক্ত মাটিতে পড়িতেছিল।

রঞ্জিত অনিলার দিকে এমন চাহিয়াছিল, বলিতে চাহে "ক্ষমা...ক্ষমা"—অনিলা সংযত হইল, মস্তক আন্দোলন করত চারুদশনা—অনিলা বলিল "ক্ষমা"। লাবণ্য দেবী, এসময়ে কখন যে সেফ্ খুলিয়া পিস্তল বাহির করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার স্মরণ ছিল না; সেফটি খুলিতে, তাহার চেতনা আসিল, চোওয়াল ব্যাঘ্র হইল। কি ভয়ঙ্কর রাত! ইহার পর সকাল হয়।

লাবণ্য দেবী কোনক্রমে চাকর বাকরকে অর্থদানে আপন সম্মানকে স্বাভাবিক রাখিয়াছিলেন, মনে মনে কি যেন অনবরত তিনি বলিয়া চলিয়াছেন। পিস্তল হাতে এলো চুলে পদশ্চারণ করিয়াছেন।

লাবণ্য দেবী যে এভাবে শাস্তি লাভ করিবেন তাহা জানা ছিল না, রঞ্জির অদ্ভুত আচরণ তাঁহাকে

আতঙ্কিত করিয়াছে, অনিলা তাহার আবৃত্তির কণ্ঠে অনেক শ্লেষ করিয়াছে, 'আমার বাবাকে স্পর্শ করিও না—কেননা তিনি স্বর্গ হইতে আসিয়াছেন।'

লাবণ্য দেবী ভাবিতে চেষ্টা করিলেন, "অনিলা পাগল কিন্তু রঞ্জি"; দূর হইতে কতবার ডাকিয়াছেন "রঞ্জি রঞ্জিত" কতবার বলিয়াছেন, "ও উপত্যকার মানস পুত্র!"

কোনই উত্তর আসে নাই।

সে অসুস্থ বলিয়া কাগজ পত্তর বাড়ীতে আসিয়াছে, বিহারীবাবু প্রথম বুঝিয়া বলেন "মেম সাহেব, এ গঙ্গাকিশোর আত্মা।"

লাবণ্য দেবীর মুখখানি শ্বেত হইয়া গেল। রঞ্জি নহে সম্পূর্ণ গঙ্গাকিশোর, কণ্ঠস্বর, হাস্য সব কিছুতেই, যে কিছুক্ষণ পূর্ব্বে কন্যার সহিত বাগানে দেখিয়াছেন অনিলা যাহাকে তাহার নৃত্য দেখায়;—পিতা কন্যা অশ্বারূঢ় হইয়া বাহির হয়, প্রত্যহই পিতার সেবা করে, জুতা পালিশ হইতে প্রতিটি...কাজ!

লাবণ্য দেবী উপায়হীন বিভ্রান্ত, বিহারীবাবু কহিলেন "ইহার উপায় আছে," বলিয়া লাবণ্য দেবীকে আস্তে আস্তে বলিলেন "বড় জোর পঁয়তাল্লিশ মিনিট—আত্মাকে তাড়ান যাবে—রাজী হন না হলে চ্যাটার্জ্জি সাহেব নিশ্চয় মারা যাবে"

লাবণ্য দেবী বলিলেন, "মা না ও সব...অনিলা কি যে করলে"

ইহাতে বিহারীবাবু উত্তর দিলেন "অনিলার সাধ্য কি"

লাবণ্য দেবী বলিলেন "অনিলাকে আমি"

অবশেষে লাবণ্য দেবী রাজী হইতে বাধ্য হইলেন। যদিও জানেন, ইহা কুসংস্কার, কারণ এখানকার ডাক্তাররা বলিল এর চিকিৎসা নাই তবু কলকাতায় হয়ত সম্ভব। রঞ্জিকে কলিকাতায় লইয়া যাওয়া মুস্কিল।

অনিলা যখন তাহার ঘুম হইতে উঠিল, তখন অপরাহ্ণ বেলা, দেখিল, তাহার বাবা নাই, চারিদিকে চাহিল, চক্ষু স্ফীত হইয়া উঠে, কুমারী আর্ত্তনাদ করিয়া দিগ্বিদিক কম্পিত করিল, এ ঘরে সে ঘরে দৌড়াইল, নিজের চুল মুঠা করিতে পারে না বলিয়া আক্রোশে বিদীর্ণ।

সে কি অচৈতন্য...হইয়াছিল বাবা নাই, এ কয়েকদিন অনেকেই তাহাকে অনেক বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছে...তাহারাই কি এ ব্যাপার করিয়াছে? আর্ত্তনাদ পুনরায় তাহার কণ্ঠে ফিরিয়া আসিল, মেঘনিনাদে কহিল "এ প্রতিশোধ আমি নেব-ই" যে অস্ত্র বাহিরে সাজান সেগুলি তাহার পক্ষে উত্তোলন করা অসম্ভব—একদা ভাবিল যদি ট্রেনে চলিয়া গিয়া থাকে; কিন্তু মার জুতার মধ্যে একমাত্র নাগরা ছাড়া আর সব আছে হাতঘড়ি রহিয়াছে, সে দৌড়াইয়া নীচে গেল; গ্যারাজ হইতে যন্ত্র আনিয়া ওয়ার্ডরোব—আলমারির দরজায় চাড় দিতেই খুলিয়া গেল, টানার মধ্যে দেখিল, সেফের চাবি, খুলিতেই, দেখিল অজস্র জড়োয়ার বাকস, পাশেই পিস্তল! দম্ভে কহিল আমি প্রতিশোধ...

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, সারা শহর পায়ে হাঁটিয়া বিহারীবাবুর চাকরের নিকট খবর পাইল, যে তাহারা শিকার বাড়িতে, এক মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা না করিয়া টোঙ্গা করিয়া বাড়ী আসিল, টোঙ্গা অতদূর পথ যাইতে রাজী হইল না। ঘোড়া লইয়া দ্রুত সেখানে পৌঁছায়।

তাহার বাবাকে লণ্ঠনের আলোয় দেখা যায়, তিনি দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহার দুঃখময় মুখখানি প্রতীয়মান। একটি লোক ঘুরিয়া ঘুরিয়া কি যেন প্রক্রিয়া করিতেছে, তাহার পিতা বলিয়া উঠিলেন "না যাব না...আমি অনিলাকে বড় ভালবাসি...আমি স্ত্রীকে, লাবণ্যকে বড় ভালবাসি।"

"যেতেই হবে" বলিয়া ভৌতিক লোকটি আঘাত করিল।

"আমি অনিলাকে বড় ভালবাসি"

অনিলা স্তম্ভিত। সে 'বাবা' বলিয়া ডাকিতে চেষ্টা করিল মাত্র।

"আচ্ছা যাচ্ছি" বলিয়া গঙ্গাকিশোর আর্ত্তনাদ করিল।

"কি করে গেছিস বুঝব? ডাল না শিল? জুতা মুখে ত করতে পারবি"

"পারব পারব।"

অন্য কাহারও পায়ে জুতা ছিল না সত্বর লাবণ্য দেবীর দিকে সকলে তাকাইয়া বলিল, "ওই ত... তাড়াতাড়ি"

অনিলা দেখিল, গঙ্গাকিশোর তাহার মা লাবণ্য দেবীর নাগরা মুখে করিয়া লইয়া যাইতেছে। সে [illegible] বাবা বলিয়া উঠিয়া সজোরে ঘোড়াকে পদাঘাত করিল। ঘোড়ার উপরেই অনিলা গুলি ছুঁড়িল।

তেরখাইয়ের সোঁতায় আসিয়া ঘোড়া থামিতেই অনিলার দেহটি মাটিতে লুটাইয়া পড়ে।

এখন অনিলা আর তাহার প্রতিবিম্বের মধ্যে মরুভূমি আসিয়া দেখা দিয়াছিল।



শ্যাম-নৌকা

'তুমি দীনবন্ধু' এ কথা বলিবার কারণে ছেলেমানুষ, সাধারণতঃ, যে এ পর্য্যন্ত এখনও, কশ্চিৎ সহজ মনোচোরা সজীব খেলামাত্র, কতটুকুই বা রৌদ্র উহা চাহে, সুদীর্ঘতম অন্ধকারেও যাহা, যাহার কোনই ব্যতিক্রম নাই, অন্তরতম দিব্য ক্রমাগতই খুসীর, লীলার জন্যত্ব; কালাচাঁদের ওষ্ঠদ্বয় যদিও এ সময় বড় শীত, মাঘমাস, অবশ্য কদাচ সে জন্য নহে, কম্পিত হয়; প্রতি পদক্ষেপেই সে বারম্বারই উক্তপদ উচ্চারণ করিয়াছে; তাই তাহার কণ্ঠস্বর আহ্লাদ-ভগ্ন, তাই তাহা জনহীন, উহা বালুকালপ্তের উপর রকমারি পতঙ্গের অথৈ নিষাদ জন্মরহস্যের পশ্চাদ্বর্ত্তী নিদ্রাউত্থিতের চরণধ্বনি যেমত, আর যে, 'তুমি দীনবন্ধু' বলিবার মত, সত্যই, এ-প্রান্তর গম্ভীর, শ্যাম, শান্তরসাস্পদ।

ইদানীং যাহার দূরত্ব এখানে নিকট, সেখানে নিপট, ঐখানে এলেবেলে; এই হেতু যে সর্ব্বত্রই, এখন ঐরাবৎ পদচ্যুত মেঘমালা সদৃশ কুয়াশায় হাবা সোহাগহীন; কুয়াশা কোথাও ছন্নছাড়া, কোথাও অতি বৃদ্ধ রুগ্ন কাহিল জন্তুর মতই বড় মন্থরে গমনোদ্যত; তবু, এখানে, অমোঘ শূন্যতা আছে, নিঃসঙ্গতা যাহার মধুযাদু, ইহা শান্তরসাস্পদ এবং এই স্থানে, 'তুমিই দীনবন্ধু' এ-বাক্যে, যাহা আর ধন্যবাদ নহে, কালাচাঁদ, বাদল দিনের খেলামাত্র যে, সন্ন্যাসী যেমন, আপনকার প্রারব্ধগত মৃত্যুকে অঞ্জলি ভরিয়া উৎসর্গ করিয়াছে এবং এ-প্রান্তরে, যেখানে, জলঘাস আকীর্ণ নীলিমা আভাস বারিরাশি, যাহা এখন সে পার হয়; এখন, উর্দ্ধ পানে না চাহিয়াই—কেন না এখানে অম্বর, উর্দ্ধতম অবস্থার সক্রিয় সৌন্দর্য্য, সূক্ষ্মতা, 'তুমি দীনবন্ধু' বলিয়াছে।

কালাচাঁদ আপনার হস্তধৃত, মুষ্টিবদ্ধ আঁঠার লতাটি অনুভব করিয়াছিল, একান্তে যাহার একটি গতিশীল গিরি গোবর্দ্ধন, মহিষটির গলে উহার প্রান্ত বাঁধা; কুয়াশা জল, মহিষ যেন লবণ—সম্পূর্ণরূপে মিশ্রিত তথাপি তাহার শিঙদুটি যাহা বেতালের প্রশ্নের মত, গল্পের মত বাঁকা এবং সম্মুখের অবকাশে কুয়াশা তাহার দৃঢ় নিঃশ্বাসে বিরক্ত, পক্ষ্মশ্রুত আর যে মাঝে সাঝে আলেয়া-চোখ দুইখানি প্রতীয়মান; ইতঃমধ্যে একদা যে চক্ষুদর্শনে কালাচাঁদের সহসা মনে হয় এক ঔষধ—মহিষের চোখের মণি, গুলঞ্চের রস, বংশলোচন, বেলগুটি খয়ের নূতন হাঁড়িতে ঘুঁটের আগুনে এবং ইহা ধন্বন্তরী, অবশ্য মহিষটির চোখের জন্য তাহার তৎক্ষণাৎ কষ্টও হয়, সহসা-র এহেন মানসিকতা শুধু যে এখনই, এমন নহে, দিনের পর দিন, এমনতর সিদ্ধাইএর নিয়ত প্রেরণা পায়—পরক্ষণেই সে অসহায় কারণ কখনই ফলবতী হয় না—কেননা তাহার পিতার কারণেই এবং এই মহিষ যাহার জন্য, ঔষধের নিমিত্ত নহে, অপহরণ করা। মহিষটির কণ্ঠলগ্ন লতার একান্ত অনেকক্ষণ যাবৎ একইভাবে মুঠো করার হেতু আর পদদ্বয়ের তুঁতেতেল, কারণ এ জলে জোঁক আছে, ভেদ করিয়া জটিল কাটারি-ঠাণ্ডা অনুভবের যে দুঃসহ তীব্র পোড়া যন্ত্রণা—, বিঘে দশেক আগের, রহমতপুরের মাঠের খেজুর কাঁটার মত খড়গুঁড়ি ইহার তুলনায় কিছু নয়—তাহাকে পীড়িত করে নাই, অন্যপক্ষে তাহাকে, কালাচাঁদকে, নভজলের স্বচ্ছতা দান করে, ফলে এ যন্ত্রণা তাহার ডাকের মধ্যে আসে নাই; কেন না সে হয় গম্ভীর এবং এখন জলরাশির পানে অবলোকন করত সে বলিয়াছে, ইতঃপূর্ব্বে উর্দ্ধে চাহিয়া, যখন সে মাঠে, একটি হাত আপনার বক্ষে স্থাপন করত ডাকিয়াছে, 'তুমি দীনবন্ধু!' কাহারও নিমিত্ত সে হয়ত ডাকে নাই!

প্রথম এ হেন ঘোর কান্তারে সে একাকী যখন, দিক সম্পর্কে সঠিক আস্থাবান নহে, কিয়ৎপরিমাণে অসহায় মন, যেমন ফতেপুরের হাটের মহাদেব চাবিওয়ালা বাদাম গাছের তলে বসিয়া যে গান গায় আর তালা মেরামৎ করে, তাহারই ডান হাতের কাটা বুড়ো আঙুলের মতন, যাহার হাবভাব বুঝা অক্ষে আসে না, হইলেও কালাচাঁদ তাহা অর্থাৎ আপনার মনকে খাতে আনিতে তথা আপনাকে উৎক্ষিপ্ত করিবার মানসে গীত গাহিতে চেষ্টা করে, যদিচ এ কথা সত্য যে, সে, তাহার এই মহিষ লইয়া যাত্রার পূর্ব্বক্ষণে দুকড়ির অভয় সে পায়, তবু হয়ত, সে বালকমাত্র যেহেতু, তাই তাহার মনে আর মরদ ছিল না; বহুবারই দুকড়ির শালুক-লাল নয়ন দুটি তাহার সম্মুখে ভাসিয়াছে আর তাহারই চোখ, যাহার চোখে

ভানুমতীর খেলা, মা-রসকের, ইহাদের দুইজনকে—সূর্য্য যখন গা ধরিয়া মানুষের আর কিছুক্ষণ থাকিতে চায়, তখনই তাহাদের দুইজনকে শেষ দেখিয়া চলিয়া আসে, উহারা দুইজনে নগরদ্বারির রাস্তার উপর দণ্ডায়মান থাকিয়া ক্রমান্বয় হস্ত সঞ্চালনে তাহাকে দ্রুত যাইতে ইঙ্গিত এবং নির্ভাবনা দিয়াছে।

এ সময়ের আরও আগে, অপরাহ্ণ বেলা নগরদ্বারি ছাড়াইয়া পর্ব্বতপুর তাহারই কোলে নাবাল জমির আবাদ, দক্ষিণে খেলাতগড় ইতিমধ্যে যে ভাঙা রাস্তা, ইহার মাঝ বরাবর, কালভার্ট আর প্রায় দুই রশি পশ্চিমে এক বেল ও অশ্বত্থের জোড়, যুগ্মবৃক্ষ, এখানে বনবিবির থান জোড় গাছের গুঁড়ির নিম্নে সিন্দূরলেপা, আশপাশের মরা এবং ছোট জাগা ডালে চুল টিল দিয়া বাঁধা, হাওয়ায় বৃশ্চিকের মতই, নীচের মাটি নিকোন সেখানে কয়েকটি পোড়া মাটির ঘোড়া যাহা শ্যাওলা ধরা এবং দুয়েকটী ভাঙা ঘট আর বিশুষ্ক ফুলমালা, অপরাহ্ণ বেলার আলোয় সকল কিছুর ছায়ার ইতর বিশেষ বড় ঘোর, আরও যে, শুকনা পাতা যখন খর খর শব্দ করত এ স্থানের উপর দিয়া চলিয়া যায় তখনই বিশেষত, আর ডালে বাঁধা চুলগুলি মনে হয় এখন শনিবারের অমাবস্যার বিষময়ী রাত্র।

মহিষ অপহরণ কার্য্য যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় সেই মানসে তাহারা দুইজনে, সে এবং মা-রসকে, এ কারণ যে দুকড়ি তখনও অনুপস্থিত, প্রথমে আসে; বনবিবির পূজা দিতে হইবে, বনবিবি আতুরের মনস্কামনা পূর্ণ করেন, তাঁহার পুণ্য নামে মাছ ঘোগ ছাড়িয়া জালে পড়ে, এমন কি ধানে পোকা লাগে না; মা-রসকে অতীব নিষ্ঠার সহিত পূজার যোগাড় করে, মেয়েলী সুলভ কেয়ারীতে কয়েকটি কচুপাতা ধুইয়া, একটির উপর মুড়কী পয়সা খানেকের, একধারে পাঁচটি বাতাসা, আমপাতায় তেল সিন্দূর, তাহারই পাশে একটি পয়সা চারেকের গাঁজা-ঠাসা কল্কে, যেমন যেমন দুকড়ি বলিয়াছে, একান্তে একটি মুগুরী ঘট জলপূর্ণ; সমস্ত কিছু গোছাইয়া একটি মস্ত কচুপাতা চাপা দিল। সে, কালাচাঁদ, নিকটের একটি গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়া আনমনে এ সকল কিছুই দেখিতেছিল। শুধু ভাবিয়াছিল, মা-রসকের কি প্রয়োজন ছিল, কাজটা ত' তাহার নহে, এইটুকু ভাবিতেই বুকে তুষারের তীব্রতা দেখা দিল, তাহার দৃষ্টি এখন বহুদূরে, যেখানে ভেড়ির উপর সুলুইস, গইপথ, এমত সময়ে তাহার কানে আসিল—'ওগো বাবু এত উতলা হলে কি গো চলে, তুমি না পুরুষ মানুষ।'

কালাচাঁদ ধীরে উস্ক চুলওয়ালা মাথাটি নামাইল, দেখিল কাছেই মা-রসকে মাটিতে একটি হাতের ভর রাখিয়া 'এতল-বেতল' খেলে: এ খেলা নয়, কোন খেলাই তাহার ভাল লাগে না, তবু কালাচাঁদ মা-রসকের সুন্দর সুডোল মুখখানির, যে মুখে সরলতার মাধুর্য্য, প্রতি অবলোকন করিয়া কিছুই বলিতে পারিল না। মা-রসকে অর্থাৎ রসিক মণ্ডলের চেহারাটি ভারী সুন্দর, এই কারণেই সে চণ্ডী অপেরার মালিকের, চণ্ডী শাস্ত্রীর, বড় প্রাণের, উহাদের মধ্যে এক অপূর্ব্ব সম্বন্ধ বর্ত্তমান, ফলে দলের সকলেই রসকে-কে 'মা' জ্ঞান করে, তাই আড়ালে সে মা-রসকে। সত্যই, রসিকের মধ্যে এক বিস্ময়কর মোহিনীমায়া আছে, বিশেষত তাহার সুদীর্ঘ পক্ষ্মযুক্ত চোখে ভানুমতীর খেলা, নাকটি ছোট, মাথায় সযত্নে পাতা কাটা, সর্ব্বাঙ্গে বালিকাভাব আচ্ছন্ন, অদ্ভুতভাবে সে নিঃশ্বাস ফেলিতে জানে; গায়ে একটি লাল গামছা, ঠোঁটে একটি সেনসেনের (এক প্রকার মুখশুদ্ধি) কালো দানা, এত সত্ত্বেও কালাচাঁদের মনে হয় এইমাত্র রসিক কান্না থামাইয়া চোখ মুছিয়াছে; এইহেতু, সে তাহার এতল-বেতল খেলার জন্য কিছু নাই; বিশেষ করিয়া রসকে, তাহারই কারণে—চণ্ডী শাস্ত্রী জানিতে পারিলে মনোক্ষোভের বিষয় হইবে—নিজেকে স্থির, সকল কিছু জানিয়া শুনিয়াও, রাখিতে সক্ষম হয় নাই, অদ্য সকালে তিনটি টাকা তাহার বাবাকে সে ফল খাইতে দিয়াছে; বিশেষ করিয়া, আর একদিনের কথা, তখন কালাচাঁদও চণ্ডী অপেরায় নিযুক্ত; শরৎকাল, গিরিশঙ্করপুরে পালা গাহিয়া সন্ধ্যার ট্রেন ধরিয়াছে, রসকে-কে সে 'ভাসানে'র গান গাহিতে বলে, গানটি বিলাসখানি টোড়ীতে বাঁধা; যদিও এ রাগ এ সময়ের নহে, তথাপি কালাচাঁদের বালক মনকে এ গীত এক রহস্যময় সময়ের মধ্যে লইয়াছে, যে সময় পদ্মপত্রে জলের ন্যায় ক্ষণিক নয়; ট্রেনের একটানা অদ্ভুত শব্দ এ গীতকে অন্তরতম করে, ব্যাহত করে নাই এবং এই প্রথম তাহার বাবার জন্য এক অশ্রুতপূর্ব্ব খেদ, বড় যন্ত্রণা, উপস্থিত হইল; আর যে রেলের মারাত্মক মর্ম্মান্তিক সিটি, বাঁশী, শ্রবণে ঝটিতি তাহার মনে হইল তাহার বাবা যেন এক সুখ স্বপ্নের আজব রেলগাড়ীর...এই অবধি কল্পনার পরক্ষণেই সে একীভূত : যেহেতু বিস্ফারিত নয়নে, যে নয়ন

আকর্ণবিস্তৃত, দক্ষিণা রায়ের মূর্ত্তিতে যেমন এবং এ সময় তাহার ভ্রূযুগ অস্থায়ী, দেখিল, এক ঝাঁক ফড়িঙ : একদা তদ্দর্শনে মনে হয় যে—তখন, প্রায়ই সব সময় ন্যাংটো থাকিত, কাপড় কোথায়—যে আর সকল কিছুর মতনই, তাহার ধারণায়, উহাদের বাপ মা আছে; সমগ্র শরীর উলঙ্গ দুই হাত মস্তকের পিছনে স্থাপন করত চুপ, এ হেন ভাবনায় তাহার যেমন ভাব লাগিয়াছে, এখন, সে যেমন পরকলা, সপ্তবর্ণ ক্রমাগত বিচ্ছুরিত আর পশ্চাতে অসংখ্য ধান্যক্ষেত্র—তারপর আকাশ নামিয়াছে সম্ভবত, কাহাদের ঘাটে হয়ত পা ধোয়; হয়ত, উহাদের, ফড়িঙদের, রেলগাড়ী কি আছে? হয়ত উহাদের আছে; এবং কেন যে সংস্কার হয় বাবা এক আজব রেলগাড়ীর সিটি, আর এ পর্য্যন্ত গণনায় সে, তাহার অভ্যন্তর যুগপৎ ঢাউস তখনই রোগা, তটস্থ; শিরা উপশিরা যতেক, বুকে আসিয়া রূপান্তরিত, পঞ্চশীর্ষ সর্প দংশন করে, আছড়ায়, ফলে কালাচাঁদ আপনকার ঝটিতি চমকান দীর্ঘশ্বাসকে—বয়সী, পোড়খাওয়া, মরিয়া, মাঝির তুল্য সহজেই—চোয়ালে, সব দাঁত এখন উঠে নাই, ঘর্ষণ করে, নির্ব্বাক করিতে সমর্থ হইল অথবা এখন চলতি ট্রেনের কলাপাতা ছেঁড়া হাওয়ায় তাহার শ্বাস রুদ্ধ, হাওয়াই রুদ্ধ করে, এ কারণ যে, ইহা ভাল নয় ইহা ভাল নয় ইহা ভাল নয়। তাহারই বিপরীত দিকে রসিক, জানলায় একটি হাত রাখিয়া তাহার উপর স্বীয় সুন্দর গোলাপসুন্দরীসম পাতাকাটা মুখমণ্ডল, কোন তারকা যেমন পুণ্যক্ষয়ে ধরাধামে আগত— ন্যস্ত করত গীত বলে, ভাসানের গান, আর অন্য হাত উরুর উপর গীতের মান রক্ষা নিমিত্ত তাহার অঙ্গুলি সকল তৎপর আর সে, কালাচাঁদ, জানালায় হাতে হাত রাখিয়া, সেখানে সুঠাম আম্রবীজ-চিবুক স্থাপিত, এ গান শোনে; সম্মুখে, খাল বিল ক্ষেত মাচা গ্রাম সাঁকো সকল কিছুর মধ্যেই এখান হইতে 'এনেথ' দূরত্বে, তাহার পিতাকে দেখিয়া সে চকিতে ফতুর, জলের তলে মৎস্য যেমত ওতোপ্রোত তেমনই, একবার সে, বোধহয়, নামিবার পাগলামি করে। বার বার যাঁহাকে মনে হইয়াছিল বাঁশীর, সিটির, শব্দ বৈ অন্য নহেন; কেন যে এ কথা, অর্থ সিটি, তাহা সে জিজ্ঞাসা করে নাই এই হেতু যে এ কল্পনা তাহার মধুময় বলি ভাল লাগিয়াছে, যদিও তাহার মন সিটির শব্দে বিদ্যুদ্দাম জড়িত আরক্তিম সান্ধ্য পয়োধর। তথাপি, অন্যপক্ষে, রসিকের চোখের ভানুমতীর খেলা তাহার ভাল লাগে।

ইহা ব্যতীত আর এক হেতু রসিকের খেলা দর্শনে কিছু বলে নাই, যে রসিকের বাল্যকাল নাই, আঁচল, যাহা প্রাচীনতম বটপত্র, তাহার নিরবচ্ছিন্ন মায়া হইতে সে ঠকিয়াছে এবং এই সূত্রে যিনি সতত জর্জ্জরিত তাঁহাকেই পুনরায় মানুষে, কেশরী, আহত করিবার মানসে ঔদ্ধত্য লাভ করিয়াছে; যে রসকের মা তাহাকে ফেলিয়া আনপুরুষ করে, এখন সে যে কোথায় ভগবান জানেন। মাঝে মাঝে খবর পৌঁছায় কালীঘাটে মায়ের মন্দিরে পিছনে ঘাসপটির পাশে বসিয়া সে ফুঁকো ডাব ভাঙ্গিল, খাইতেছে; কেহ বলে, 'না গো না, মাগীকে দেখেছি।' খুব ভোর, রাস্তায় সবে জল দেওয়া হয়, একটি মোটর হইতে মাঝেরআট পুলের উপর তাহাকে নামাইয়াছিল, তাহার অঞ্চল—যাহা বটপত্র হয়ত—মাটিতে লুটায়, চুল আলুথালু, চোখে নেশার ঘোর, গতর বেসামাল, আঙুলের ফাঁকে সিগারেট, মৃদু মৃদু হাত তালি দিয়া গাহিতেছে, 'তাই বুঝি পাপিয়া কেঁদে মরে সখী, তাই বুজি পাপই কেঁদে মরে সখী', মুখে ছিল হাসি—রাত যেন এখন গভীর তাই কেদারায় গান—সে পুল বহিয়া নামে, যেহেতু ট্রাম লাইনে, ভোরের ট্রামে—আলো-লাল—নিয়ত ঘণ্টি দেয়—এ খবর সত্ত্বেও রসিকের চোখে ভানুমতীর খেলা অস্থির। অবশেষে আর এক বিশেষ সত্য আছে যাহা কালাচাঁদকে রুখিয়াছে, তাহা হয় এই যে, গোলাপগঞ্জের আলম ফকির যেমন, যে কোন বৃক্ষতলে মহা সমতায়, বিশ্রাম নিমিত্ত, তাহার ছেঁড়া চট পাতে, অবিকল তেমনতর সমতায় রসিকই প্রথমজন যে পরিচ্ছন্ন কণ্ঠে বলে, 'ওগো ভগবান আছে' এ বাক্যনিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রতীয়মান শূন্যতার মধ্যস্থিত মালিন্য কি অদ্ভুতভাবে কাটিয়া যায়!

ফলে, এখন রসিকের এতল-বেতল খেলা দর্শনে যেহেতু তাহার রক্তস্থিত অসহিষ্ণুতা নিশ্চিত ছিল, তথাপিও যাহা প্রচ্ছন্ন, শুধু মাঝে মধ্যে নাসিকা কুঞ্চিত হয়, কালাচাঁদ কোন কথা বলে নাই। যদিও, অবশ্য ইতিমধ্যে একদা রসকের কোমরে ঘুনসী বাঁধা চাবির দিকে তাহার নজর পড়ে, রসিকের একটি ছোট তোরঙ্গ আছে, যাহার সম্মুখে রসিক অদ্ভুত ভাবে বসে, খোলে, তাহার নিজের পছন্দসই অনেক কিছু : কাঁচ ঢাকনা বাক্সতে কাঁচ পোকা, পুঁথী, ডালার ভিতরে একটি শ্রীশ্রীকালীর ছবি, তাহারই পার্শ্বে একটি নাদুস শিশুর ছাপা ছবি, বাঁ পাশে একটা বিয়ের পদ্য। অনেক কিছু আছে—ছুঁচ সুতো, অনেক

কাঁচের চুড়ি-ভাঙা শিকল করিবার মানসে সংগৃহীত, বাক্সর মধ্যে তাহাকে সুস্পষ্ট দেখা যায়। নিজের ভার কত সহজেই, অবলীলাক্রমেই, সে গ্রহণ করিয়াছে; ফলে সকল সময়ই সে, রসকে, তপ্ত কাঞ্চন বর্ণ, বস্তুত সে দৃঢ় যদিও সে বালিকাপ্রতিম, চোখের নিমেষে ভানুমতী, এখনও কপোলে অঙ্গুলি স্পর্শ করত অবাক হয়—অনায়াসে বলিতে পারে স্মিত হাস্য করত, 'ঋতুদান কর'—তথাপি সে দৃঢ়, তাহার আপৎকাল নাই—এই দৃঢ়তার অভিজ্ঞতার জন্য কালাচাঁদ নিশ্চিত অন্যমনা অর্থাৎ দৃষ্টিতে আত্মস্থভাব, তাহার মনে পড়ে হয়ত রসিক, যে এখন এতল-বেতল খেলে, রসকে যাহার মাইএর, স্তনের, বোঁটা আছে—এক মতে যে, যাহারই মাইএর বোঁটা আছে সে-ই রমণী—তবু সে বড় মানী রাশভারী। একবার চণ্ডী শাস্ত্রী, যিনি সুরম্য কণ্ঠে 'হে মাধব' বলিয়া উঠেন, রসকে-কে কি যেন বলিয়াছিলেন, রসকে তখনই তাহার তোরঙ্গ মাথায় তুলিয়া নিজ গামছার বিড়ের উপর রাখিয়া ধান ক্ষেত ধরিল। পৃথিবী উহার অতীব চেনা চেত্তন জায়গা, যেখানে বীজ রোপণ করিবে সেখানেই ছায়া দেখা দিবে। ফলে কালাচাঁদ নিমেষশূন্য, তখনও চুপ।

কালাচাঁদ নিমেষ লাভ করিল, দেখে, রসকে একটি শুষ্ক ঘাস মুখে স্থাপন অর্থাৎ দন্তে ধারণ করিয়া সুন্দর চোখে তাহারই প্রতি নিবিড়ভাবে চাহিয়া আছে, কালাচাঁদ অসহিষ্ণু যদ্যপি তবু এ হেন বৈচিত্র্যে অবাক, তাহার প্রশ্নের পূর্ব্বেই কর-জোড় কণ্ঠে রসকে কহিল, 'এর মানে কি বলত গা?'

কালাচাঁদ বলিতে যাইতেছিল, 'তোদের গরুর ধড়ে শকুন বসেছে', কিন্তু কিছুই সে বলে নাই, কারণ যে, তাহার বেলা গণনার মধ্যে ফাঁক কই, সে ধীরে বসিয়া পড়িল, মাঠের পানে তাকাইয়া কহিল, 'কে জানে?'

রসকে কুটোটি দাঁতে দাঁতে চাপিয়াই বলিল, 'এর মানে বৈষ্ণবীয় দীনতা—স্বরূপ যখন নীলাচলে প্রভুর কাছে এলেন, তাঁর ঠোঁটে-মহাপ্রভু' বলিয়া কুটোটি অপসরণ করত স্মিত হাস্যে ধীরে বলিল, 'এখন তুই যদি আমার দীনভাব, কাতরতা দেখে তোর পাষাণ গলায় যদি' বলিয়া ওষ্ঠের সেনসেনে লাল জিহ্বা বুলাইয়া অল্প স্বরে গান ধরিল—'চিকণ কালা গলায় মালা বাজন নূপুর পায়—বলি চিকণ কালা!' এই গীতে কালাচাঁদের কেমন ধারণা হইল, সে আরও ছেলেমানুষ শিশু, তাহার হাত ধরিয়া দণ্ডায়মান করত রসকে গাহিতেছে, তাহার পদদ্বয় টলিতেছে—আর যে এই সুললিত পদবন্ধনের গীতের আপ্লুত পরম আনন্দময় উষ্ণ অভিমান এবং কভু ঝটিতি চতুর চাহনিসঞ্চার দৃষ্টে কালাচাঁদ খুব সম্ভব মোহিত, এ কারণে যে তাহারই নিমেষের আয়ত্তের মাঝে রসকের সুন্দর দুইখানি হাত—যাহার তালু নিত্য যাত্রা করার ফলে, যেহেতু তালুতে আলতা দেয়—বিশেষ রক্তিম, এত লাল যেন শ্রীশ্রীমা লক্ষ্মীর হস্তদ্বয়—গীতের সহিত অপূর্ব ভঙ্গিমা-শালীনতায় ঘুরে—তাহাতে বরাভয় দিয়াছে; রসকে এই অল্প বয়সেই স্ত্রী-ভূমিকায় অভিনয় দক্ষ তথাপি এখন, এক্ষেত্রে, নিঃসন্দেহে, অভিনয় করে নাই; শুধু কালাচাঁদ, যে এখন আসীন, তাহাকে উহার পাষাণ ভাবিতে ভাল লাগে, তাই এ গীত!

রসকের প্রতি, যাহার মুখে এখন চাঁপা-রোদ, চাহিবার পূর্ব্বে কালাচাঁদের উহার রক্তিম হাত দুইখানিকে যার পর নাই সঙ্কেতময় বলি মনে হয়, ফলে ধারণা করে যে যদি তাহা, হস্তদুইখানি, তাহার কপোল স্পর্শ করে, তবে নিশ্চিত, নির্ঘাত, পরক্ষণেই যে যে গাছ, যে গুল্ম লতাদি দেখিবে, তাহা সমূহ আপনার পিতার ব্যাধির, শিবের অসাধ্য যাহা, অব্যর্থ ঔষধ, এবং এই জন্যই নিয়ত এখানে থাকিয়াও সে অন্যত্রে, নিমেষশূন্য, দূরে তাকাইয়াছে—অবশ্য দুকড়ির প্রতীক্ষায় এক আধবার বটে—কেমন যেমন ঘোরে রসকের ভাবকে তাহার ন্যাকা চিঁড়ের ফলার বলি বোধ হয় নাই, কারণ রসিক পরম গম্ভীর। তবু কালাচাঁদের মন অহরহ পরিদৃশ্যমান বাস্তবতায়; তক্ষকের আওয়াজ এইমাত্র সে পায়, যে শব্দে তাহার বাবার জুতার নালের শব্দ সে শোনে, যে জুতা সে একদা পায় দিয়াছিল, তাহার পায়ের পরেও জুতার অনেকটা অন্ধকার, সম্মুখের গাছপাতার ফাঁকে অন্ধকার জবুস্থবু—এ অন্ধকারে সেই অন্ধকার, সে নিরীক্ষণ করিয়াছে ইত্যাকারে ক্রমে কালাচাঁদ একমন : প্রকৃতির মানসিকতা, লাল নীল জগত, যেখানে তাহা অদ্যও সুন্দরী কুজ্ঝটিকা, ইহা, তাহার জ্ঞান আছে যেহেতু ক্রূর জাগ্রত চেতনায় দৈবাৎ স্বপ্নসিদ্ধির জন্য সে ক্ষ্যাপা। বহুবার সে হোঁচট খাইয়াছে, এই সূত্রে মকনার ভেড়ীর কথা মনে পড়ে—প্রতিভা তাহার নাই, শুধু হঠাৎএর উপর, কাছে সে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। এইটুকু বিশ্বাস, তাহার মন বলে, যে মন তাহার আবাস, মনের সহিত সে কথা কয়, মন বলে, বলে, যে এক অভ্রান্ত

ঔষধ মিলিবেই এবং তাহার বাবা পূর্ব্বেকার মতই সুস্থ হইবে, বৃক্ষাদির ছায়া পুনরায় তাহার দেহে আরাম আনিবেই; এ কারণ যে, অর্থাৎ এ হেন মনোভাব, যেহেতু, সে আপনার পিতাকে দেখিয়াছে: তাহাদের চালার উত্তরে যে ভেরেণ্ডা গাছ তাহারই পার্শ্বে ছোট চালা বড় যত্নে তাহার বাবা নির্ম্মাণ করে, সেও সাহায্য করিয়াছিল; তাহার মা দাওয়ায় বসিয়া এ দৃশ্য সত্যই আনন্দে দেখিয়াছে—এই নবনির্ম্মিত চালায় তাহার, কালাচাঁদের, ভাই জন্মিবে। উহার অপরিসর দাওয়া হইতে হাত চারেক তফাতে, সম্মুখে খুঁটি পুঁতিয়া বেশ আড়াল—এখানে প্রসূতির কাপড় মেলাও হয়—সেদিন ঘোর যামিনী, জন্মাষ্টমী, সঘন বারিপাত, কাস্তে-কাটা-হাওয়া, ক্রমাগত ব্যাঙ ডাকিতেছে; অজস্র রাত্র ভেদ করিয়া তড়িৎ রেখা দেখা যায়, চালার মধ্যে তাহার মা, পাশে কান্দিয়া ডোমের মাসী; মার ধনুষ্টঙ্কার হইয়াছে; জলে স্থলে আকাশমার্গে যত প্রকার জন্তু আছে, তাহাদের আর্ত্ত মর্ম্মান্তিক স্বর, এমন কি তৈলহীন চাকার আওয়াজ পর্য্যন্ত; হায় স্ত্রীলোক শুধু মাত্র মর্ম্মন্তুদ আর্ত্তনাদই সংগ্রহ করে—ঐ ছোট আড়ার মধ্যে হইতে আসিতেছে, সে দাওয়ায়, অন্ধকারে, দাওয়ায় ব্যাঙ লাফাইয়া উঠে, চকিতে অদৃশ্য: এমত সময় মনে হইলে, কে যেন বিকট অন্ধকারে, বিকৃত অন্ধকার, কালাচাঁদ বাঁকিয়া গিয়া চীৎকার করিতে চাহিল — চোর চোর! হয়ত বলিয়াছিল, যুগপৎ দেখিল তাহার বাবা দুর্দ্দান্ত বৃষ্টিতে বড় ছোট হইয়া গিয়াছে, পরণের বস্ত্রখণ্ড শতছিন্ন, লম্বা ভাবে—বহরে—ছেঁড়া গিঁট দেওয়া—ফলে কোমর হইতে উরু সবটাই প্রতীয়মান, এক মনে কি যেন শুনিতে শুনিতে মাথাটি ঘুরাইয়া অনড়; চালার সম্মুখের আড়ালে, প্রসূতির কাপড় প্রসারিত; সেখানে, কেন না এখন ঝাঁপটি পড়িয়া গিয়াছিল, তাই বিষকর্ম্মা ছায়া দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠে, প্রসূতির গাত্রবস্ত্র নাই কিছু নাই—কৌপীন মাত্র থাকে—অসংখ্য বৃষ্টির রেখার মধ্যে প্রসারিত সিক্ত কাপড়ের উপর, বিরক্ত স্ফীত ক্রোধ উন্মত্ত মার্জ্জারের ন্যায় ধনুকের মত বক্র হইয়া উঠে ঐ ছায়া; তাহার পিতা এ ছায়া দর্শনে অভিভূত, তন্মাত্রাহীন, তথাপি তাহার চোয়ালে গাম্ভীর্য্য অটল; নিমেষ পরেই তাহার মস্তক ধীরে আন্দোলিত হয় 'জানি জানি' সূচক যাহা, তিনি অল্পকার পরেই বলিয়াছিল...'ডাক্তার বদ্দি পেলুম না রে!' এই শেষোক্ত 'রে' বাক্যটির উপর হাত বুলান যায়—কালাচাঁদ বহুবার এই 'রে' কথাটি স্মরণে 'আহা' বলিয়া উঠিয়াছে।

এখন কালাচাঁদ আপনার মনকে আঁখি ঠারিয়া মুখমণ্ডল আনত করে, চাঁপা রোদে রসিকের ডিম্বাকৃতি মুখের খানিকটা রক্তিম, লাউএর জালির মত মুখের সূক্ষ্ম রোঁয়া দেখা যায়, কালাচাঁদ উহার মাথার চামেলীর তৈলর সুবাস পাইয়া আপনার আয়ত আকর্ণবিস্তৃত চোখ দুইটি তুলিতেই দেখিল রসিক তাহার দিকে চাহিয়া আছে, তাহার চোখের শিরা উপশিরা আশ্চর্য্য লাল—যেন দেবীর চক্ষু পটুয়া কর্ত্তৃক অঙ্কিত—ক্রমাগত রাত্র জাগরণের জন্যেই সুনিশ্চিত এবং রগের দুই পাশে আশ্চর্য্য মলমের প্রলেপ চক্ চক্ করিতেছে; মলমের কর্পূর মিশ্রিত অদ্ভুত গন্ধে কালাচাঁদ উধাও : আশ্চর্য্য মলম রেলেই বিক্রয় হয় তাই তাহার মন কেমন বিল্লি আঁচড় দিয়া উঠিল, রসিককে ভাল করিয়া দেখিতে চেষ্টা করে, রসিক যাহার চক্ষুর্দ্বয় আফিমের মত কালো, লাল লাল শিরা-যুক্ত কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে দেখে রসিক যেন ছোট এক ইস্টিশান অথবা ঘণ্টার পাটিতে গাল বুলাইতেছে, ছোট ইস্টিশানে দাঁড়াইয়া অন্য পাশে লাল লাল কলস বসান ফিলটারের তাক, তাহার নিকটে ওজন কলে একটি সাগর কুড়ো পাখী বসিয়াছে। রসিক একটি ইস্টিশান! তদ্দর্শনে সে বিমূঢ়, আর লোক চরাচর, ভ্রমর ও হংসধ্বনি বিরহিত সুবৃহৎ পদ্মবনের ন্যায় সমাহিত, স্তব্ধ। আর রসিক, যাহার নাম আপনার হাতে উল্কী করিয়াছে যাহাকে সে পাইয়াও হারাইয়াছে—তাহাকে এত নিকটে পাইয়া সত্যই উন্মত্ত, অন্যপক্ষে রসিক আপনার নাসার বেসর, যাহা কম্পমান, তাহা স্বাভাবিক করিতে বিবেক খুঁজিয়া পাইল, এলাচ-দানার মত সাদা দন্ত পঙক্তি অল্প দেখা যায়, কারণ সে বলিয়াছিল—'দেবীর থান' আপশোষ চাপিয়া ধীরভাবে বলিল, 'জমা রইল কিন্তু'।

কালাচাঁদ ঝাপসা চোখে চাহিয়া একটি ছোট নিঃশ্বাস ত্যাগ করত দীনস্বরে অনুরোধ করিল, "রসকে, তুই ওই গানটা গা না লক্ষ্মীটি 'আমার ভাঙা কপাল যে মা' ভাসানের..." আনত এ কথা কেমনে সে যে বলে তাহা তাহার মনে হয়।

রসিক তাহার আপনকার ওষ্ঠের সেনসেনে জিহ্বা বুলাইয়া কহিল, "দ্যুৎ ক্ষ্যাপা" বড় বিরক্ত হইয়া তবু শান্ত কণ্ঠে আপন অন্তরকে প্রকাশ করিয়াছিল।

ইহাতে কালাচাঁদ বিচারহীন অপ্রস্তুত, কেননা নিজের উক্তির হেতু নিশ্চয় যদি কপোল-স্পর্শ-করে এই আশা অগ্রাহ্য হয়, ঈষৎ বিমর্ষ এবং তাহার দৃষ্টিতে গভীর শূন্যতা, এ শূন্যতার মধ্য দিয়া কেবলমাত্র বৎসহারা গাভীর স্বর ভ্রমণ করিতে পারে, তদ্দৃষ্টে রসিক বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া কহিল, 'কি যে তোর পোড়া দুখ-চেটে গান শোনা বাই' এবং একটু সাহস লাভ করত পরক্ষণেই ভ্যাঙাইয়া বিকৃত উচ্চারণ করিল, 'আমার ভাঙা কপাল যে মা... অমন গানের মুখে নুড়ো জ্বেলে দি...বাপের অসুখ ঠাকুরের কৃপায়...ঐ কথা ক না, আমার বুকের দিকে ঠায় অমন হাবার মতন হাঁ করে কি দেখছিস বল ত?' উত্তর না পাইয়া পুনরায় বলিল 'মন করেছি...বুকে হরিনাম উল্কি করে লিখে রাখব তোর পুণ্যি হবে...'

কালাচাঁদ জাগিয়া উঠিতে চাহিল, কি যে উত্তর করিবে তাহা তাহার তখনই মনে আসে নাই; অল্পদিন যাত্রার দলে থাকিয়া সেও অনেক কথা শিখিয়াছে; উহা আশ্চর্যজনক উহা মর্ম্মগ্রাহী, ফলে মনে হয়, সে, তাহারা, ভাব-বেসাতি জানে; এখন এ-সূত্রে তবু একটি মজার কথা ঝটিতি চমক দিয়াছিল যে, 'যেমন তোর শুনেছি পিছনে মা লেখা আছে,' এরূপ কথার জন্য, যেহেতু তাহা মজার, ওষ্ঠে স্মিত হাস্য পর্য্যন্ত ঝিলিক দেয় নাই, চমক মাত্র দিয়াছে, মুখে বলিল, 'বুকেই তো তোর সব গঙ্গা যমুনা...'

রসিক আপন নয়নে আড় চাহনির, সে কথা শুনিতে বাউরী, তাই, ছিনিমিনি খেলা দিয়া কহিল, 'কেন বুকটা কি আমার...'

'বুক যদি সব নয় তবে তোর বুক ছুঁয়ে দিব্বি করতে বলিস কেন?'

'দায় পড়েছে, তুই কি আমার শ্বশুর ঘর' বলিয়া রসিক এমন ভাণ করিল, যে তাহাকে নিকটস্থ পত্রপল্লবরাজি দেখিয়া আহ্লাদিত।

'বাঃ কতবার...সেই যখন জুয়া খেলি...তখন মনে পড়ে...'

রসিক তাহার মুখ হইতে এ গল্প শুনিতে চাহিয়াছিল—যদিও তাহার এখনই-ঘটার মত মনে আছে, নিজের পাটের মত মুখস্থ। এই হেতু যে তাহার হ্যাংলা আস্পর্দ্ধার সে সকল ঘটনা স্মরণে আছে কিম্বা নয়, উহার স্বীকৃতি পাইবে। রসিক একদৃষ্টে, বিগত দিনের প্রতি তাকাইয়া, কহিল, 'তুই তখন খুব ছেলেমানুষ ছিলিস, হরিখুড়োর পেট্রোমাক্স জ্বালা দেখবার জন্য হেদিয়ে মত্তিস।'

এ কথা শ্রবণে কালাচাঁদের, বালক মাত্রেই এরূপ করে, দৃষ্টি যে কোথায় স্থির থাকিবে তাহার জন্য ব্যস্ত, এবং একটি খুসী তাহার বক্ষস্থল ভেদ করিতে গিয়া আহত ছিল; অসহিষ্ণুতা সেখানে এখন ক্ষিপ্ত হইয়াছিল, ফলে পদদ্বয় চঞ্চল, নিমেষে সকল কিছুই আলুনি বোধ হয়। কেমন যেন সংস্কার হইল, বিশ্বাস জন্মে; বাবা নহে, পিতা বলিয়া চীৎকার করিলে ইহার আশু শান্তি হইবে। ঠিক এমত সময় সে 'বউ-কথা-কও' ধ্বনি শোনে, অতএব উর্দ্ধে, পত্রাদির দিকে চাহে, পলকেই রসিকের দিকে চাহিতেই দেখিল, রসিকের চোখ টিপিয়া দুকড়ি পুনরায় 'বউ-কথা-কও' ডাকিল।

দুকড়ির লম্বাটে মুখে শিল কাটা দাগ, চোখ দুটি কথা, মাথায় একরাশ বাদামী চুল, গলায় রুমাল বাঁধা, সহাস্যে কহিল, 'প্রাণেশ্বরী কে বল ত?'

রসিক তাহার হাত দুটি সহজে খুলিয়া, আপনার মস্তকে ঈষৎ যত্ন দিয়া, কপট রাগে বলিল, 'খবরদার আমায় ছুঁবি না।'

'কেন কেষ্টবিলাসের দেহ নাকি—ছুঁলে আরাম নাট খাবে...'

'কেষ্টবিলাসের দেহই তো' বলিয়া কালাচাঁদের প্রতি চটুল নয়নে চাহিয়া বলিল, 'না বলবে না, সাত ঘাট ঘুচ্ছিস, মড়ার খৈ পয়সা কুড়োস—তোর জাত জন্ম কিছু আছে?'

'না সই তোমায় প্রাণ মন সঁপে সে বালাই গেছে...'

'মরণ দশা কোথায় ছিলি, ওর বাপ ওদিকে...কোথায় ছিলি এৎখন'

'বকরী হুঁদোতে গিয়েছিলুম রে শালা' বলিয়া হাসিয়াই এহেন কুত্তামজান উত্তরকে সম্যক ব্যক্ত করা মানসে, আপনকার মিহি আলতা-জিহ্বাকে সহজ কৌশলে ভাঁজ করত হিজড়ে-উচিত জঘন্য কায়দায় অতীব কদর্য্যভাবে স্বীয় ওষ্ঠদ্বয়, যাহার দুই কোণ চড়াই পাখীর ন্যায় সাদা, যেহেতু ঘা আছে, তাহা সবেগে ঠেলিয়া, সর্প ফণী যথা, ভিতর বাহির করে; সিক্ত জিহ্বা এক অধৈর্য্য কার্ত্তিক মাসের ভূমিকা; এবং এ সময় অল্পবয়সী গৃহস্থ-কন্যার মত চোখ-মারে, তাহার পয়রাগুড় রঙ চোখে, যাহার কতিপয় পক্ষ্ম-কেশ খৈ।

কালাচাঁদ, বিশেষত, উত্তরের গল্পটি স্মরণে, যাহা দুকড়ি প্রমুখাৎ প্রচারিত, যে ঘোষ পাড়ায় যখন শীতল ঠাকুজ্জীকে মেলা-ধরাতে লইয়া যায় তখন ইটাগড়ের বস্তিতে এক বিহারী স্ত্রীলোককে একটি বকরী লইয়া ঐভাবে হাঁকিয়া ফিরিতে দেখে, স্ত্রীলোকটির ফজ্জলীগতর, সখেদে মুহুর্মুহু আড়মোড়া দেয়, চোখে কাজল, একটি হাত মাথায় তাই সুন্দর বগল দেখা যায়, অন্যহাতে কাঁঠালপাতার ঝাড় এবং বকরীর দড়ি। এবং এখন, সম্মুখে ঐ অসংযত মুখমণ্ডল, তদ্দৃষ্ট তাহার অল্প দেহ বাঁকা, চোখ অন্যত্র লইবার সময়—এ কারণ যে দুকড়ির উপস্থিতির মুহূর্ত্ত হইতেই সে নিজেকে এক অবিশ্বাস্য, নিশ্চিত, মনতোড় চর্ব্বির গন্ধ পাইতেছিল—তাই বিরক্তস্বরে প্রকাশ করিল, 'কি হচ্ছে তো কি লাজ লজ্জা...' এবং শঙ্কিতচিত্তে এক নিমেষ রসিকের প্রতি দেখে।

রসিকের ব্রণবিরহিত ঢলঢলে মুখখানি পলকেই নীল, কোন অপরিচিতের ঘর্ম্মাক্ত জামায় হাত লাগিলে তাহার যেমন মুখবিকার দেখা দেয় তেমনই বিকৃত এবং ক্রমে তীক্ষ্ণ তাহার তীব্র উক্তি শোনা গেল, 'থাকবে কি করে, পনতান্ন পার বাবাদাসীর নেংটি-নাঙ এখন ওর থেকে দুকুড়ি বয়সে বড় শীতল ঠাকুজ্জীর হাফভাতার, রোজ খোলা চাপালে মন ত মন...পূব্ব জন্মের পাপ...'

কালাচাঁদের চোখে সেই কদর্য্য স্ত্রীলোকটি ভাসিয়া উঠিল যাহাকে দেখিয়া সরযূগায়েন, সে চণ্ডী অপেরার রগুড়ে ভূমিকাগুলি করে, বলিয়াছিল, 'দোক্‌ড়ে মেয়েমানুষ কচ্চিস এই বয়েসে, তার উপর শীতল ঠাকুজ্জী, বামুনের কোঁড়ে রাঁঢ়ী বাঁটচোষা সাপকানা হয়ে যাবি টাইসিস হবে...কি বলবো...কলিউঠা ছোলা খাস...' স্ত্রীলোকটির ভয়ঙ্কর হাওয়া...এই স্ত্রীলোকটি ভিন্ন উপায় ছিল না, এই বয়সেই তাহাকে বয়সী হইতে হইয়াছে; স্ত্রীলোকের রহস্য তাহার নখদর্পণে; মেয়েছেলে কি চায় সে জানে, এই তাহার জানা হইয়াছে।

ফলে রসিকের গঞ্জনা তাহাকে, দুকড়িকে, প্রেরণা দিল, জঘন্যতায় সে ধনী, কুলি, ইংরাজ, স্ত্রীলোক, যে-কোন গাড়ী চালকের মত দুৰ্দ্ধর্ষ, এবং দারুণ আমোদে রসিকের চিবুক ধরিয়া কহিল, 'বল বল নারকোল মুচি' এবং পরক্ষণেই, হাত ঘুরাইয়া, যে হাতে লোহার বালা, সম্ভবত পিষ্টন রিঙ, আর যে ন্যাংটো পরী উল্কি—ছড়া কাটিল, 'নারকোল মুচি, ফুলকো জুঁচি,—লৈতন গাছের ফল; আঁচল পেতে জুনতে দিব—কি দিবি তা বল? : হাতে তাগা, মাথায় জাগা, পায়ে দিব মল—আর তালে তালে...: টাক ঝুমুর ঝুমুর।' শুধু এই কুৎসিত ছড়াই নহে, ঝটিতি রসকের কোথাও স্পর্শ করত আহ্লাদে বলিল, 'মাইরী তোর ধো ধরে চুমু খাই...আগ কচ্ছিস'

রসিক, যে আকাশের তারাকে দেব-দেবী ভাবে, সে ইত্যাকার ইংরাজ-পছন্দ রভসগন্ধময় অসভ্যতা, যেহেতু সে সযত্নে পাতা কাটে আর যেহেতু ইহা দেবীর থান, অসম্ভব ক্রুদ্ধ হয়, কোন ক্রমেই তাহার ভাল লাগে নাই ফলে সে অগ্রপশ্চাত কোন কিছুই না বিবেচনা করিয়া, যে রসকে ঢাকনা দিয়া আচার খায় এবং বগলে হাত দিয়া ভাত খাইতে বসে, সে, প্রচণ্ড জোরে পর পর কয়েকটি চড় দুকড়ির গালে বসাইয়া দিল, চড়ের শব্দে বৃক্ষস্থিত পাখীরা ত্রস্ত, বিভ্রান্ত, উধাও। কালাচাঁদ থ, নিক্তির কাঁটার প্রতি যেমত মানুষে একনিষ্ঠ, সে তদ্রূপ, ঘুমভাঙা চোখে দুকড়ির দিকে চাহিল, উহার শিল কাটা গাল কালচে রক্তিম, যে দুকড়িকে দর্শনমাত্র অদ্ভুত এক চর্ব্বির গন্ধ, সে এতাবৎ, অনুভবে ঝিম—কেন যে চর্ব্বির গন্ধ এ কথা নিশ্চয় তাহার স্মরণে ছিল না। বাদামতলা 'যদুমণি চ্যালেঞ্জ শিল্ডের ফোর্থ রাউন্ড খেলার দিন সে হাট হইতে এক আদলার চর্ব্বি খরিদ করে; মাংসওয়ালা জসিম মিয়া বলিয়াছিল, 'সে কি তুই বামুনের ছেলে...' এবং সে কচুপাতাস্থ সাদা চর্ব্বি শুঁকিয়াছিল, ইহার পর সযত্নে বলটিতে চর্ব্বি মাখায়, তাহার পর সবুজ মাঠ, হুইসিলের শব্দ, হাই ইস্কুলের খোনা-মাস্টার, কোমরে গামছা, সাইকেলের পাম্পটি, নিজস্ব, পাছে চুরি যায় সেজন্য তাহার মধ্যে ঢুকান, এবং বাঁ হাতে ল্যাম্প; সারা মাঠ ছুটিয়া রেফারইগিরি করে, মরণপণ খেলা আরম্ভ হয়। সেদিনকার চর্ব্বির গন্ধ আজও, এখনও; ঝটিতি-উড়া পাখীর উদরস্থিত হাল্কা পালক খসি ধীরে ক্রমে নামে, কালাচাঁদ ঈষৎ কম্পমান, দেখিল দুকড়ি কোন যন্ত্রের ক্র্যাঙ্কের, অকেজো অবস্থা, যেমন যাহার উপর দিয়া সন্ধ্যা-রাত্র-দিন-ঘনঘটা আসা যাওয়া করে, আরও গৈরিক হয়; দুকড়ি নির্জ্জীব, তবু সে, কালাচাঁদ, আপনার মুষ্টিবদ্ধ করত প্রস্তুত, যদি কিছু হয়! এবং অতি সহজভাবে এ কথা বুঝিয়া লইয়াছিল যে, দুকড়ির ক্ষমতা নাই, শীতল ঠাকুজ্জী একাদশী অমাবস্যা-পূর্ণিমার দিন দুধের চাঁচিটুকু দিয়া বলে, 'খেয়ে লে গায়ে গত্তি লাগবে'; গায়ে গত্তি লাগে নাই,

সাপের খোলসের মত সে মৃদু-শুষ্ক; এখন অনেকদিন পরে আপনার বয়সের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়াছে—যাহাকে দেখিয়া তাহার ধারণা হয়, হইত, যে সে হয় একটি অচিন গাছ, কেন না এই দুকড়ি একদা উহাকে কাঠঠোকরা গল্পটি বলে : "কাঠঠোকরার বিবাহ, টোপর মাথায় পাল্কী প্রস্তুত, এমন সময় কাঠঠোকরার বাপ বললে, 'হ্যাঁরে সব তো যোগাড় হয়েছে কাঠ তো নেই'; বাপের কথায় সে কাঠ আনতে বার হল; বরের সাজ, মাথায় টোপর—কাঠ যোগাড়ের জন্য ফেরে" এ গল্পের পর কালাচাঁদ কাঠঠোকরাকে বড় আপনার করি দেখে।

এইটুকু পুরাতন অপরাহ্নের কথায় সে জলের শৈত্য, হয়ত, ভুলিয়াছিল, এখন কয়েকটি ব্যাঙের দড়বড়ি লম্ফ দেখিয়া, সে স্থির, একদা মহিষটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিল, কেমন একটি ভয় তাহার বুকে অঙ্গুলি সঞ্চালন করে, প্রথম আপনাকে একাকী স্পর্শ করত বুঝে সে ভয়, আর এক ওয়াসার-বিনা পাম্পের মত প্রথমে ক্রমাগত মুখ খারাপ গান করিতে চেষ্টা করে, 'ময়রাঠাকুরজি তোমার বুকের মাঝে কি' এ গানটি অতীব কুৎসিত ভঙ্গীতে গাহিতে পারে, পারে নাই; ফলে আরও নোংরা গান 'ডবগা এঁড়েটাকে আসে দিও না আমার নাগাল পাবে না'; কিন্তু আশ্চর্য্য এসকল পদবন্ধন তাহার কানের কাছে অন্যেরা গাহিয়াছিল, অন্যপক্ষে সে দ্বারকা পালার গান গাহে, 'মন লো মন বাঁশরীর শবদে তোর মরণ' এগীত গাহিয়া দু'পাঁচ থানায় সে, যখন দলে ছিল, নাম কেনে, এ সুর তাহার কণ্ঠে আসে নাই—কারণ নির্ম্মম অন্ধকার, মনে হয় তাহার, একমাত্র শৈব্যাই এ অন্ধকারকে ভয় পায় নাই; কালাচাঁদের বড় আশা ছিল, বড় হইয়া শৈব্যার ভূমিকায় অভিনয় করিবে।

তমসাচ্ছন্ন রাত্র, উন্মাদিনী শৈব্যার দুঃখ, তাহাকে, অল্পবয়সী কালাচাঁদকে ঝটিতি সাহস দেয়, মন অসম্ভব নিশ্চিত, সে কেমন যেমন বিকল, প্রাচীন একটি বীজ, এখন আপনার ধমনীতে চলা-ফেরা করে, এবং সে, যে স্বীয় মনের সহিত কথা কহিতে পটু, সে শুনিল, ঈষৎ বিস্ময়কর বোধ হয়, নিজেই বলিতেছে, 'তুমি দীন বন্ধু'। ইদানীং কণ্ঠস্বর ট্রেনে মলমবিক্রেতার মত কেঠো নাটকীয়, পুনরায় সতেজ করত উচ্চারণ করে, আর যে সেইক্ষণে সমস্ত আকাশ বাতাস তন্মাত্রা প্রতিধ্বনি করি উঠে—ক্রমাগত আবৃত্তিতে মেঘমন্দ্রে, যেন স্বর গম্ভীর নিষ্কাম এবং শব্দাবলীতে আপনকার মুখ মারুত যাহা বাষ্পময়, ইহা যথার্থ, উহাতে একশোবার তদীয় হৃদয়স্থিত আনন্দ রোমাঞ্চ প্রকাশ করিয়াছে, এমত যে তাহার খাসা চিকণ মুখখানি, যাহাতে মুনিদের মতিভ্রম হয়, যে কোন পুরুষ ভ্রষ্ট হইতে আগ্রহশীল, সেই মুখমণ্ডল সে আনন্দে ডাগর তাহার দক্ষিণা রায় প্রতিমা, আয়ত নয়নযুগলও প্রভাবান্বিত; বিশেষতঃ সে পুর্ণাঙ্গ উদ্বেল মুখর আনন্দিত সম্যক্ বুঝায়, যেহেতু তাহার কুন্দপুষ্পশুভ্র দন্ত পঙক্তির একস্থানে—সেখানে শুধু এচিঙের কৃষ্ণবর্ণ হাসিলে তাহাকে বড় আদরের মনে হয়, খেলা মনে হয়—মধ্যে উপরিভাগে সম্মুখের দিকে একটি পার্শ্ববর্ত্তী দন্ত নাই; সে দন্ত এ বয়সেও কালাচাঁদ সেদিন সাত সকালে একটি ডুমুর পাতায় বহন করত ইঁদুরের গর্ত্তে দিতে গিয়া—পিতার বিযাক্ত কাশির শব্দ শোনে, ক্রমান্বয় কাশি; ইহাতে তাহার ভ্রূদ্বয় কুঞ্চিত, একারণ যে সম্মুখের মাঠ ঘাটের মধ্যে পরিষ্কার দেখে তাহার বাবার কণ্ঠলগ্ন মাদুলি কিভাবে দুলিতেছে এবং তাহাতে রক্তের ছিটা। ফলে আশ্চর্য্য! দন্তটি ডুমুরপত্রসহ পড়িয়া যায়, সে দেখিল দন্তটি ইঁদুরের গর্ত্তে চলিয়া গেল; সে নির্ব্বোধের মত চারিদিকে অসহায়ভাবে নিরীক্ষণ করে, শুধু মনে পড়ে দুকড়ির কথা, সে নিশ্চয় ইহার অর্থ বলিতে পারিবে যে দুকড়িকে তাহার অচিন গাছ বলি বিশ্বাস, যে গাছ সমাধিস্থ অবস্থায় সর্ব্বশেষ বাস্তবতার বিদ্যমানতার হেতু স্বরূপ মৃত্তিকাময় উদ্ভূত; পাখীরা এ গাছ জানে, আর কালাচাঁদ তদীয় বাপের কারণেই উহা ইদানীং দর্শনে সমর্থ; এহেন অচিন গাছের গল্পে আমরা এক উদ্যান মানস চক্ষে দেখি যাহা প্রাচীন, যাহা নিরালা, যাহা বড় হিম, যেখানে এক দেহী অন্যকে প্রশ্ন করে, 'আমার নামে কি তোমার বুক আজও আঁচড়ায়?' কালাচাঁদ দুকড়িকে স্মরণ করিয়াছিল, একারণে যে দুকড়ি অনেক কিছু জানে; সাত সকালের ইত্যাকার দুর্দ্দৈব, একটি নির্ব্বোধ ভ্রূকুঞ্চন তাহার রক্তে চলাফেরার পঞ্চম, ইহার কিছুক্ষণ পরে ইঁদুরের গর্ত্ত হইতে, সুবিশাল অনন্ত মাঠ হইতে আপনকার মস্তক ধীরে সরাইয়া লইয়া লতা-ব্যাহত তাহাদেরই কুঁড়ের দিকে চায়, কাশির ধমকে সারা কুঁড়েটি থরহরি, পাতা হইতে এমন যে শিশির বিচ্যুত; কি ভাবে, সে ঝটিতি পিতার কাছে, সরা ধরিবার নিমিত্ত ফিরিয়া যাইবে, সে বিবেচনায় কালো; অজানিত নহে, সম্যক অপরাধ ভাবনায় সে অর্থাৎ পিতা যাহার এরূপ আর্ত্ত, আর সে নূতন দাঁত যাহাতে হয়, তাহার জন্য অস্বাভাবিক; এ চাওয়া আমোদ

মাত্র; এ ভাবনায় সে ওষ্ঠ দংশন করে, আপনার গণ্ডে একটি চপেটাঘাত করিতে যাইয়া থমকিয়া নিজের পদদ্বয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করে; সিক্ত ঘাসের শীতে পা অবশ, শুষ্ক ঘাসের শীর্ষ পায়ে যে তাহা আছে তদ্দৃষ্টে সে যারপরনাই বিব্রত; ঔষধ-সন্ধানী চোখ মুহ্যমান, ঘর যে এরূপ ভীতিপ্রদ হইতে পারে তাহা ইতঃপূর্ব্বে তাহার জানা ছিল না, যে ঘরে সে পাশ ঘেঁষিয়া বনচারী সকালের মুখ চাহিয়া ঘুমায়, এতদিন পরে মনে হইল সে বালকমাত্র, কি সে করিতে পারে, উপায় যে নাই তাহা ভাবিতে সাহস পাইল, ভাল লাগিল, অথচ এই কালাচাঁদ পৃথিবীকে আপন আন্তরিকতা সহকারে ধৈর্য্যে বিশ্লেষণ করিয়াছে, এমন ধন্বন্তরী সত্য লাভ করিবে যাহার দ্বারা বাবা অচিরেই দণ্ডায়মান হইবে এবং তাঁহার হর্ষ অশ্রু তাহার, কালাচাঁদের, মাথায় পড়িবে।

দুকড়ি নিশ্চিন্ত, এই দৈবাৎ ঘটনার অর্থ বলিতে পারিবেই নিশ্চয়; কালাচাঁদ দ্বিপ্রহরে যখন মথুরানগর স্টেশনের ওভারব্রিজ বাহিয়া উঠিতেছে তখন ২টা ৫৭র ট্রেণ সিটি দিয়ে ধূম নির্গত করত ছাড়িয়া দিল, ধোঁয়ায় ওভারব্রিজ পরিপূর্ণ, পাছে হারাইয়া যায় সেইজন্য থমকিয়া দাঁড়াইল, সিটির শব্দ তাহার গা ফুটা করিয়াছে, তীব্র ব্যাকুলতায় সে ভগবানের নাম করিতে গিয়া নামতা পড়িতে লাগিল, কেননা সিটির এক বিশেষ বর্ণ আছে; ধোঁয়া উধাও হইতেছে, ইহার মধ্য দিয়া দেখে টেলিগ্রাফের তারে একটি নীলকণ্ঠ, যাহা শূন্যতা বিদীর্ণ করিয়া উড়িয়া গেল এবং নীচে ছোট্ট জনমণ্ডলীর মধ্যে তাহার মুখখানি, বাঁশী বাজাইয়া একটি ছোট বানর কপালের, যাহা মাটি স্থিত, চারিপাশে চক্রাকারে ঘুরিয়া হঠাৎ দাঁড়াইয়া যাদু দেখাইতে আরম্ভ করিল, 'এক পয়সাকে অনেক করে হাত সাফাই', আর এক মুখে ক্রমাগত বলিতে লাগিল, 'এক পয়সা দশ করতে পারি কিন্তু খাতি (খেতে) পাই না'; উহার বিষাদ কণ্ঠস্বর, স্পষ্ট শোনা যায়; দুকড়ির ফ্যাকাশে মুখমণ্ডল কালাচাঁদকে মনমরা করে, বেচারী দুকড়ির জন্য তাহার বড় কষ্ট হইল, উহার কেহ নাই, শীতল ঠাকুজ্জী থাকিয়াও নাই; রাত্রে তাহার ঘরে মিনষেরা আসে, ফলে হাটখোলাতে ঘুমায়; এই শীতে যেদিন হাট বসে সেদিন একটু আরাম কারণ তেলেভাজার নেভা উনুনটির আশপাশ তাহার উক্তিতে 'ডগডবগা ছুঁড়ীর উরুতের মত, জুঁচির তলা যেমন মুখে গরম'। কালাচাঁদের মনে হইল তবু ঠাকুজ্জী ভাল বলিতে হইবে; একথা সকলেই জানে ইতিপূর্ব্বের সেই পন্তান্ন বয়সী মাগীর অত্যাচারে দুকড়ি যখন পালায় এবং সে মাগী [illegible] দুকড়ির নামে থানা-পুলিশ করে চোর বদনামে, চুরির দায় অবশ্য দুকড়ির ছিল, দিনকয়েক হাজতে বাস করার পর শীতল ঠাকুজ্জী প্রায় কুড়ি টাকা খরচ করিয়া তাহাকে ছাড়ায়; ক্রমে দেখা গেল রক্তচোষা তবু মন্দের ভাল। দুকড়ির খেলা দেখান শেষ, কেহ একটি আদলাও দেয় নাই, আদলা ত দূরের কথা বিড়ি ধরাবার জন্যও দেশলাই পর্য্যন্তও দিবে না; দুকড়ি চুপ করিয়া বসিয়া পড়িল; যাদু দেখাইয়া সে পয়সা করিবে, কেন না সে কাশী যাইবে, সেই গল্প সে কালাচাঁদ এবং রসিককে করিয়াছে। তখন পৌষ সংক্রান্তির সাগর সঙ্গমের অনেক সাধু ফিরিতেছে; তাহাদের দিকে চাহিয়া কালাচাঁদদের বলিল, 'ম্যাজিক দেখিয়া যখন ট্রেণ ভাড়া হবে তখন কাশীতে যাব। সেখানে একটা কূয়ো আছে সেই কুয়োতে যে যা ব'লে ঝাঁপিয়ে পড়ে মরে যায়, আসছে জন্মে তাই হয়। আকবর শা তার পূব্ব জম্মে ওতে ঝাঁপ দেয়...গরীব ছিল, আমি দেব...কি বলে দেবো বলত, রাজা? উহু শালা মুটে মজুরের চুলকে ওঠে রাজা মরলে...বোঝ'...বলিয়াই সম্মুখের রাস্তায় সন্ন্যাসীর স্রোত দেখাইয়া কহিল, 'এই বলে ঝাঁপ দেবো যেন সন্ন্যাসী হই' কথার শেষে সে রহস্যময়ভাবে হাসে, আর দুই বন্ধু রসিক ও কালাচাঁদ অগণন সন্ন্যাসী দেখিতে লাগিল। এখন এই ওভারব্রিজের উপর হইতে, সে, কালাচাঁদ, দেখিল দুকড়ি যেখানে ম্যাজিক দেখাইতেছিল সেই স্থানে বসিয়া...আধপোড়া বিড়ি ধরায়; কিন্তু কালাচাঁদকে রেলের বাঁশীর শব্দ এমত বাণ মারিয়াছে যে তাহার এক পা নড়িবার ক্ষমতা ছিল, না, আপন বেদনা যেহেতু সিটির শব্দ তাহার নিকট আর এক অর্থ লইয়া এখানেই যে অচল, সিগনাল যখন স্বাভাবিক তখন সে ডাকিল। দুকড়ি এখানে আসে, এক নিঃশ্বাসে কালাচাঁদ তাহাকে সকল কথা বলিল। সমস্ত বুদ্ধি তাহার, দুকড়ির।

দুকড়ির চোখ দুটি মৃতমৎস্যের চোখের মত, চড় খাইয়া সে জবুস্থবু, প্যান্টালুনে বোতাম না থাকিলেও সে কোনক্রমেই অসভ্য নয়; রসিক তাহার দিকে এমন ভাবে চাহিয়া বসিয়াছে যে কোথায় উহার বেদনা-ত বটেই কোথায় উহার গা চুলকায় তাহাও সে জানে, ধীরে ধীরে মনোভাব প্রকাশ করল, 'মনে পড়ে, আমার দিকে চেয়ে দেখ...চণ্ডীবাবুর রাখাল ভোজন মনে পড়ে...তুই আমার পাশে বসে কি

বলেছিলি তুই আমাকে চাস না-চাস জানবি আমি তোর;...আমি বলেছিলুম দুই প্রকৃতি সম্ভাষী...তোর কত মেয়েছেলে...তুই বলেছিলি ওটা তোর প্রারব্ধ...”

দুকড়ি গভীরভাবে তাহার প্রতি চাহিল। রসিক ক্রমাগত বলিতে লাগিল, ‘আর কথা দিয়েছি কখনও খারাপ কথা...’ দুকড়ি উত্তর করিয়াছিল, ‘সে তোর বুক ছোঁয়ার লোভ’ রসিক সুন্দর ভ্রূদ্বয় কুঞ্চিত করত প্রশ্ন করিল, ‘মানে কেন বুকে কি আছে...’। দুকড়ি এবার হাসিয়া কহিল, ‘ধুকধুকি’ রসিক কহিল, ‘নে উঠ দেরী’

দুকড়ি উত্তর করিল, ‘সব হাঁসিল হয়েছে...এখন কালা’

‘মানে...’

‘মহিষ পেয়েছি, ওই যে খেজুর গাছ ওই যে কুসুম গাছ সেখানে আমি বেঁধে রেখেছি—এখন ঝটপট সেরে নি’।

কালাচাঁদ দুকড়ির ব্যবহারে বিস্মিত হইয়াছিল, কিন্তু সহসা দুকড়ির হাতে শাঁখের আংটি দেখিয়া মনে হইল এরই কারণে, পাছে দুকড়ির ব্যায়রাম হয় তাই রসকে উহাকে প্রথমে এক বোতল ‘সালসা’ নিজের নামে আনাইয়া দিয়াছিল; শাঁখের আংটিতে নাকি ‘দুষ্টি’ রোগ হয় না, তাহাও সেই দিয়াছে। দুকড়ি গাঁজা তৈয়ারী করিয়া অদ্ভুতভাবে দম মারিল, সাঁপিটা পকেটে রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই সমস্ত পাতার ছায়া তাহার গায়ে, তাহাকে রহস্যময় বলি ধারণা হইল, সে পূজা করিতে সুরু করে, সে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। ইহার পর তাহারা তিনজন, এই রাস্তায় তখন প্রায় সন্ধ্যা, একমাত্র আগার সহিত দেখা। কালাচাঁদ আগাকে দেখিয়া আড়ালে লুকাইয়া পড়িল, কারণ এই আধ-পাগলা কাবুলিটা দেখিয়া তাহার অপয়া বলি মনে হয়, কারণ আগার মুখে একটি কথা সর্ব্বক্ষণ শোনা যায়, “ভাগ্‌তা হায়’—বাস-চলা রাস্তার পাশে তাহার বাড়ী; শব যদি যায়—সে রুটি ছাড়িয়া উঠিয়া আসিয়া বলিবেই ‘কোন-ভাগতা হায়’; তাহাকে বলা হয়; আগা মড়ার দিকে চাহিয়া, যেন পাহাড়ের প্রতি অবলোকন করে, বলে, ‘ভাগতা হায় ইসকো বাপকা বাপ-কো হাম সাদি দিয়া থা—সাদি দিয়া থা—বিশ-পচাশ বাল-বাচ্চা পয়দা কিয়া—ভাগতা হায়—; ভাগতা হায়’; কালাচাঁদ আগার জুতার মস মস ধ্বনি শুনিয়াছে।

দুকড়ি এই যাত্রার মধ্যে একদা বলিয়াছিল, অন্যান্য পরামর্শদানকালে, ‘গরুর গাড়ী হলে ভাল হত, এখন পৌষ মাস পার—কেউ কি গাড়ী ছাড়ে, মাগ দেবে ত গাড়ী দেবে না...তোর বাবাকে আমি গেলে ভাল হত...কিন্তু চৌকিদার আটকাতে হবে...রসকে তুই তার করকরে দাড়িতে হাত বুলোবি তাহলেই সে কাৎ...তুই নির্ভাবনায় যা, কুয়াশা...এখন রাত কিছু পরে চোখের গাঁয়ে দেবে...’

‘আবার। তুই কি এ ছাড়া কথা।...’

এখন কালাচাঁদ অন্য দুইজনের মুখোমুখি, ইতিমধ্যে ছোট দরিদ্র সন্ধ্যা, কোন অঙ্কের গণনার বন্ধন নাই, সে সন্ধ্যাটিকে শুধুমাত্র সময় এমত সংস্কারে দেখিতে চাহিয়াছিল, কেননা উহার, রসকের, ভানুমতী চোখ আর দুকড়ির প্রতি চাহিবার মত, যাহা সহজাত ধর্ম্ম বর্ণ গৌরবান্বিত সে সৌন্দর্য্যবোধ অন্য কোন, ভাবনা নয় শূন্যতাদ্বারা বিলুপ্ত। দুকড়ি মৃদু হাসিয়া বলিল, ‘কি ভাবছিস, বুঝি ধরা পড়ি...?’ দুকড়ির এহেন প্রশ্নে কালাচাঁদ সমস্ত দিক নিরীক্ষণ করে, সে সত্যই ‘ধরা পড়ার’ কথা ভাবিতেছিল কিনা তাহা, এখন, আপন মনকে শুধায় নাই। সম্মুখে উহারা দুইজন, রসকে দুকড়ি গলা জড়াইয়া দাঁড়াইয়া, পিছনে মাদার (মান্দার) গাছ, লাল ফুল, রক্তিমতাকে স্থিরীকৃত করা নিমিত্ত এখন আলো ছিল, সবুজতা নিশ্চিহ্ন! দুকড়ি সহসা আপন পাশুটে ছোট মৃতদেহতুল্য শরীরকে দীর্ঘায়ত করিয়া ঘোষণা করিল, ‘আমাকে জড়াবি, আমার নাম বলবি’ তাহার হাতে দড়িটা দিয়া...‘আমার নাম আমি করেছি’ এবং এ সময় সে নিজ শরীরকে রসকের বন্ধন হইতে মুক্ত করে। রসিক উহার প্রতি বড় চোখে তাকাইয়া শিশুর মত প্রশ্ন করিল, ‘তোর কিছু হবে না’ আর যে তাহার বারম্বার স্মরণ আসিল যে দুকড়ির দেহ অতীব বজ্র, যে কোন মেয়েকে, স্ত্রীলোককে, মরজগতে সুখী করিবার শক্তি আছে!

রসকের প্রশ্নে আপন দেহকে দুকড়ি চামরের মত দুলাইয়া বলিল, ‘হবে না মহিষ চুরি গরু চুই...লোকে মেরে আমার ফলনা ফাটিয়ে দেবে’ বলিয়া মেহরুগ্ন স্ত্রীলোক, অল্প বয়সী, যেমন ভীত পুনরায় আপনার মনগড়া আইন জ্ঞান,—যেহেতু ইহা চব্বিশ পরগণা, প্রকাশ করিল, ‘তারপর থানা পুলিশ কোট হাকিম শালা এক বিয়োন মাগীর মত কুর্শিতে বসে হাই তুলতে তুলতে বলবে—তিনশো

পাঁচ ধারা, সাতাশ ধারা, চারশো আটারো ধারা ফৌজদুরী...দোয়াতের...ইয়েতে কলমের...ডুবিয়ে এক বছর ঠুকে দেবে; আমি জেল-ফেল তোয়াক্কা করি না।' দুকড়ির এইরূপ বিশদ বিবৃতিতে কৃতজ্ঞতার কোন, নূতন করিয়া শ্রদ্ধার আয়োজন উহাদের মনে আসে নাই। অন্যপক্ষে, দুকড়ির নিকট যাহা স্থাবর, যাহা জঙ্গম আর যাহা নরনারীর অঙ্গ ছাড়া অন্য কিছু নহে, ইত্যাকার ধনী, কেরাণী, মুটে মজুর স্ত্রীলোক, যে কোন গাড়ী চালকের ন্যায় দৃষ্টিভঙ্গী রসকের নভজল স্বচ্ছ মনকে ব্যাহত করে নাই, একারণ যে তাহাতে রস ছিল না। একারণ যে উহারা প্রত্যেকেই সম্বন্ধের আর একান্তে আপন অস্তিত্বে অনুভবের বর লাভ করিয়াছিল। পক্ষী শাবকের গাত্রে যেমত সন্তর্পণে, হাতে নোনা আছে জানিয়া, হাত বুলায়, তেমনি যত্নে, এই প্রথম, কারণের, উপর, আদর করার ছলে হাত বুলাইবার অব্যর্থ সুযোগ লাভ করে। যে তাহারা সকলেই বীজ, তাহারা পুত্র! নিয়তির বশে তাহারা সেয়ানা ডাগর, এতাবৎ উহা ভ্রম বৈ অন্য নহে।

কালাচাঁদকে নিরীক্ষণ শেষে ঝটিতি দুকড়ি উহার বক্ষে আঙুল দিয়া কি এক অক্ষর বা যন্ত্র আঁকিয়া বলিল, 'লে যেখানে ইচ্ছে যা, ড্যাঙ্গায় বাঘ জলে কুমীর সব, কেঁচো, যেখানে ইচ্ছে যা...'

কালাচাঁদ দুরাগত, প্রায় বিলীয়মান আগা সাহেবের অতি নজর লইয়া কহিল, 'যাই তাহলে...'

রসকে সজল চোখে উত্তর দিল, 'যাই কি রে, আসি বল' এবং এ সময় লাবণ্যময় সোহাগে তাহার গাল টিপিয়া ছিল। পুনরায় যোগ করিল, 'ভয় কি, ঠাকুর আছেন, বাপ তোর ভাল হয়ে যাবে দেখিস, পাঁঠা দেব কালীকে...'

দুকড়ি এই এক রহস্যময় সম্বন্ধের বিপুল জোয়ারে তচনচ, নিজেকে পুত্র জানিতে পারিয়া সে উদ্বেল, একদা ঊর্দ্ধে আকাশের দিকে, যেখানে আধো নীলারুণ ছায়া, তারা আছে—চাহিয়া নিমেষেই কালাচাঁদকে জড়াইয়া সজোরে চুম্বন করিল এবং আলিঙ্গন অবস্থায় সে রসিককে অবলোকন করে, এই হেতু যে তাহার মনে হইয়াছিল রসিক বলিল, 'ছুঁড়ী বুড়ী উঠতে বসতে পাস তবু...' এ উক্তি দুকড়ির সম্পূর্ণ মনের কথা। রসিক, কেবলমাত্র মৃদুমন্দ হাসিতে ছিল, 'তাহার ওষ্ঠের সেনসেন এখনও প্রতীয়মান। দুকড়ি কালাচাঁদকে ছাড়িয়া, ধীর, মাথা দুলাইয়া কহিল, 'ওদের খেলে কাম হয় এখানে তা হয় না, তোর ধুকধুকির শব্দ শোনা যায়' তাহার এ কথার অর্থ সরল, আরও সরলতম হইল যখন তাহার চোখে জল দেখা গেল। তাহার পর রসিক দুকড়ি 'দুগ্গো দুগ্গো' বলে।

কালাচাঁদ দ্রুতপদে আপনার ছায়ার উপর পদক্ষেপ করত চলিতে থাকে,...যখন অনেক দূর, নিঃশ্বাস চঞ্চল, তখন পিছন পানে তাকাইল, দুকড়ি ও রসিক দুজনেই পথের শেষ পর্য্যন্ত, হয়ত, দেখে, তাহাদের পশ্চাতে মাদার গাছ; সে নিজ কানে শুনিতে যেমত পাইয়াছে উহারা অনবরত দুর্গা নাম জপ করিতেছে; 'জয় জয় মা তারা' এ শুদ্ধ নাম উচ্চারণে পুনর্ব্বার পৃথিবীকে সিদ্ধপীঠরূপে অভিষেক করিতে আকণ্ঠ! তৎপরে বালক কালাচাঁদ, আঁধারে, শ্লথ গতিতে পদসঞ্চালনায় পথ অতিক্রম করে, হয়ত একই ভাবে হস্তদ্বয় ঝুলাইয়া চলার জন্য অস্বস্তি কিয়ৎ পরিমাণে অনুভব হয়, ফলে সে আপনকার হাত দুইখানি, খাড়া-হওয়া জন্তু অগ্রস্থিত পদযুগ যেমন অদ্ভুতভাবে রাখে, তদ্রূপ রাখিয়াছিল এবং এইভাবে কয়েক পদ অগ্রসর হয়, ফলে কখন যে আঠরা লতা হাত হইতে খসিয়া পড়ে তাহা জানিবার অবকাশ হয় নাই, যখন, এখন, হয়ত উহার ঠিক দিবার নিমিত্ত দৃষ্টি সম্পাৎ করার মুহূর্ত্তে দেখিল, বুঝিল যে তাহারই হস্তদ্বয়ের উপর কে যেন শায়িত, পলকেই মনে হইল সে নিজে শৈব্যা, হাওয়ায় যাহার চুলগুলি উড়ে, শায়িত পুত্র রোহিতাশ্ব নহে তাহার পিতা, সে...যাহাকে বহন করে এবং ইহার পরক্ষণেই সে শৈব্যার মত ডাকিয়াছিল, 'দীনবন্ধু!' এ কথায় তাহার বিশ্বাস ছিল যে তাঁহাকে ডাকিলে তিনি সাড়া দেন। কিন্তু ক্রমে এ ডাকা আর রূপ ধারণ করে।

এই অপূর্ব্ব যাত্রা যে কখন শেষ হইয়াছে, যে যাত্রার মধ্যে তাহারা তিনজন ক্রমে এক হইয়াছে, ক্রমে কালাচাঁদের মধ্যে বল লাভ করে, উহা তাহার খেয়ালে ছিল না।; এখন সে আপনার কুটিরদ্বারে, দৌড়াইয়া সে দরজার নিকটে আসিল, দেখে, তাহার বাবা শীতে কুঞ্চিত হইয়া ঘুমাইতেছে, সে সত্বর তৎপর বোকার মত হামাগুড়ি দিয়া, কেন যে কে জানে, খানিক গিয়া ধীরে আপনার কান বাপের বুকের নিকট লইল; অসম্ভব বিস্ময়কর তন্মাত্রা-প্রসূত স্পন্দন-শব্দ, কালাচাঁদ এ শব্দ শোনে এবং অন্য পাশে প্রজ্জ্বলিত ল্যাম্পটি দর্শনে আশ্চর্য্য হয়; কে জ্বালাইল? নিশ্চয় টগরের মা; মনে আসিতেই সে লাফ দিয়া

উঠিল, টগরের মা হাটুরে চোর, তাহার টাকা যে টাকা রসিক অদ্য সকালে দেয়! সে টাকা কই? মহা অধীরতায় বাবাকে উঠাইল।

কালাচাঁদের বাবা কোন মতে চোখ চাহিল, সে রুগ্ন ক্লিষ্ট বাপকে বলিল, 'টাকাগুনো'। উহার প্রতি অদ্ভুতভাবে চাহিয়া আপনার ওষ্ঠ দংশন করত, কেমন যেমন এক আর্ত্ত অভিমানে বাপ টাকা তিনটি ফেলিয়া দিল! কালাচাঁদ ইহার জন্য প্রস্তুত নিশ্চয়ই ছিল না, সে টাকা কয়েকটির প্রতি পর পর লক্ষ্য করত কি যেন, অর্থাৎ বাপের মনোভাব বুঝিতে প্রয়াস পাইল, বলিল, 'তুমি কি গো? টগর মা চোর...সে এসেছিল...আলো মানে জ্বলছে দেখে মনে সন্দ হল তাই' কালাচাঁদের কথা তাহার বাপ এক দৃষ্টে শুনিয়া কহিল, 'সেই কখন গেছিস আমার খিদে পেয়েছে...।'

'ও তাই বল, দাঁড়াও ভাত ত হিম...দাঁড়াও; কিন্তু খেয়ে রওনা হতে হবে, খুব চুপচাপ, পার না হওয়া পর্য্যন্ত কাশবে টাশবে না বুঝলে।'

মহিষটিকে দাওয়ার নিকট লইয়া আসিয়া সযত্নে কালাচাঁদ তাহার উপর ছেঁড়া মাদুর চট গুছাইয়া চাপাইয়া ধীরে বাপকে দাওয়া হইতে উহার পৃষ্ঠে আরূঢ় হইতে সাহায্য করে; ল্যাম্প নিভিল, দরজায় তালা পড়িল; কালাচাঁদ দাওয়া হইতে দেখে মহিষের পৃষ্ঠে তাহার বাবা বসিতে পারে নাই কেমন একভাবে শুইয়া আছে, যে কোন নিষ্ঠুর লোক এ দৃশ্য দেখিলে কাতর হইবেই; বড় বেচারী দৃশ্য; কালাচাঁদ এ ছবি দেখিতে দেখিতে একমাত্র কথা স্মরণ করে, মা'র ধনুষ্টঙ্কারের বীভৎস ছায়া যেক্ষণে, সেই ঘোর বর্ষণকুটিল রাত্রে, সম্মুখের টানান কাপড়ের উপর পড়ে, তখন তাহার পিতা যেন আকাশে হেলান দিয়া, অসহায় নহে, পুরুষের মত সে ঘটনা দেখে; ইহার জন্য বালকের এক দুঃসহ গর্ব্ব উপস্থিত; সে বাপের দিকে চাহিল; পুনরায় আর দিনের কথা তাহার মানসপটে ভাসিয়া উঠিল।

তাহার বাবা যে এখন মরণাপন্ন, মহিষপৃষ্ঠে কাহিল, অনেকদিন আগে সূর্য্যগ্রহণের দিন কোথা হইতে একটি কাঁচ যোগাড় করিয়া আনিয়া, দিনে ল্যাম্প জ্বালাইয়া কাঁচটি শিষে কালো করত তাহাকে 'গ্রহণ' দেখিবার নিমিত্ত দেয়। এই বৈজ্ঞানিক কর্ম্মের জন্য আজও মনে পড়ে সে তাহার বাপের দিকে কিভাবে চাহিয়াছিল, যে পিতা পূর্ণকুম্ভের অন্তঃস্থিত লৌকিকতা, দয়াশীল ঠেঁটি অবধি নাই, সে, ন্যাংটো সিঁড়ি ও তুলসীমঞ্চের ইতঃমধ্যে ন্যাড়া স্থানটি, কাঁচ হস্তে পদচারণা করে, দেহ সঞ্চালনে অভিনেতার দক্ষতার ইঙ্গিতের কিছু, এবং অর্থপূর্ণ সাহসে, চকিতে দিনমণির প্রতি তির্য্যক কটাক্ষে দেখিল, সূর্য্য কি প্রচণ্ড! নিমেষেই হস্তধৃত কাঁচে শূন্যতম উর্দ্ধতম আকাশের বিহগ লীলায়িত রূপ নেহারি ঝটিতি সে বোকা, চমক লাগা, ওষ্ঠ এখন কাঁপে, অর্থ এই যে, বিরাট ব্রহ্মাণ্ড কোথাও বাধাপ্রাপ্ত না হইয়া, মধ্যপথে না পাইয়া কেমনে, এই অপ্রাকৃতিক আয়না যাহা তাহার কোটী যোজন দূরত্ব বহনে বালখিল্য তাই আপন রূপকে, যেহেতু জ্যামিতি আচারী বিকলাঙ্গ না করিয়া, বিনীত এবং এখানে প্রতিফলিত; তখন কাঁচটি হইতে মুখ তুলিয়া, যাহা অহংতা নগ্ন, বাপের প্রতি—যে এহেন বৈজ্ঞানিক তথ্যটি তাহাকে অবিচারিত চিত্তে দিয়া এখন একনিষ্ঠ, কাঠ চেলা করে, গ্রহণের পূর্ব্বে হেঁসেল তোলার প্রয়োজন,—দৃষ্টিপাত করা মাত্রই সে, বাপ, মৃদু হাসিয়াছিল। কালাচাঁদ তদুত্তরে হাসিতে গিয়া থ, এ কারণে যে উহার মনে হয় অতিদূর নভমণ্ডল হইতে স্মিত হাস্যরেখা আসে, যে নভমণ্ডল কাঁচে, ফলে সে সূক্ষ্ম হইতে উৎসুক, সে-জগতে ভ্রমণ করিতে অভিলাষী; এখন সেই বাপ, সে নিজে আর্ত্ত, ছিটকে-পড়া ব্যাঙের মত, দেহটি মহিষের পৃষ্ঠে মেলান, মহিষের পিঠে অনেক খড়, উপরে এক জীর্ণ চট, সেখানে অবশ-শরীর, গায় শতচ্ছিন্ন কাপড়ের খুঁট; আর চারিদিকে আধখাওয়া অন্ধকার, বীভৎস; পুনরায় যাত্রা আরম্ভ হইল, এ পথের কোথায়ও পদ্মবন নাই, ছায়া নাই, শুধু কর্ম্মহীন প্রান্তর আর প্রান্তর! আপন গৃহ এবং দশদিককে সে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে।

বাপের শতচ্ছিন্ন খুঁট তাহাকে বিদ্রুপ করে, হাসপাতালের লোকেরা কি ভাবিবে, নিজবস্ত্র যে ঠেঁটি মাত্র ইহা স্মরণ না করিয়া তাহা খুলিতেই থমকাইল, কণ্ঠস্বর সরল করি নিজেকে এক চতুর নিঃশ্বাসে উদ্বুদ্ধ করে, যাহাতে পলকেই দশাসই পুরুষে পরিবর্ত্তিত; কহিল 'দীনবন্ধু' কিন্তু আপন কণ্ঠস্বর শ্রবণে মনে হইল, উহা রসিকের; পুনর্বার ডাকিল, শুনিল উহা দুকড়ির, তাহার নহে; তাহাদের একজন যাহার তোরঙ্গ আছে, অন্য যে বিপথগামী ট্রেনে ফুল-টিকিট লাগিলেও যাহারা সত্যই—যাহারা ভিড়ে হারাইয়া উচ্চস্বরে কাঁদিতে প্রস্তুত—বালকমাত্র, সম্বন্ধের আদরণীয় তীরে বিস্ময় আহত! অবশ্য ইহাদের

বর্ত্তমানতো কালাচাঁদের বড় সুখকর মনে হয়! মহিষ মন্থরগতিতে চলিয়াছে, তাহার মনে ভয় হয় নাই, এখন মাঘ মাস, দুকড়ির কথায়—যখন তাহারা আগা সাহেবকে দেখিয়া লুকায়—'মাগ মাস, মাগেরা ভাতারের খেজুর কলসীর মত ঝুলছে, টপ টপ করে রস...' তথাপি বাবাকে তাহাদের মহিষচুরির গল্প এবং অত পথ অতিক্রান্ত করার নৈসর্গিক অভিজ্ঞতা, 'দীনবন্ধু' সম্বোধনের অধৈর্য্যের আহ্লাদ, তাহার বর্ণনা করিতে ইচ্ছা হয়; এমত সময় কুকুর শাবকের মত কুঁ কুঁ শব্দে তৎক্ষণাৎ চারিদিকে ইতস্তত অবলোকন করত বুঝিল মহিষের পৃষ্ঠ হইতে আসিতেছে, সে সত্বর বাবার মুখের নিকট আপন কর্ণ লইয়া যাইতেই স্তম্ভিত বিকৃত স্বরে সে শুনিল 'হারামী-বান...ছেলে...দেখতে পাচ্ছ না গায়ে কাপড় নেই...'

বয়সী পুরুষের মত চোয়ালে সে-গঞ্জনা সহিয়া, ধীরে বাপের পিঠে কাপড়টি ঢাকা দিয়া চলিতে লাগিল, এ সময় তাহার একটি দীর্ঘশ্বাস পড়ে। বাপ সেখানেই চুপ করে নাই, আরও অনেক তীব্র কথা বলিতেছিল, 'জানি না আমাকে মারতে নিয়ে যাচ্ছ, ঠাকুর আমাকে নাও, নাও...এই মহিষের পিঠে' ঠিক এমত সময় এক শেয়ালের অস্বাভাবিক ডাক শ্রুত হয়। কালাচাঁদ ঝটিতি কহিল, 'বাবা চুপ কর, ক্ষ্যাপা শেয়াল' বলিয়া চারিদিকে ভীত চোখে দেখিবার চেষ্টা করে। সে বুঝিয়াছিল এ শেয়াল খেজুরতলার টিটেরস-চাটা শৃগাল, ফলে মাতাল, উন্মত্ত; কালাচাঁদ প্রমাদ গণিল! সে এই কয়েক মুহূর্ত্তে কত কি ভয়ঙ্কর ভাবিল, মানসচক্ষে দেখিল শৃগাল উন্মত্ত হইয়া প্রায় তাহার পিতার হাত, যাহা প্রলম্বিত, দংশন করিতে উদ্যত, সে যারপরনাই হুঙ্কার দিল, জন্তুকে খেদাইল, খেদাইতে খেদাইতে বহুদূরে, শৃগালের স্বরও অনেক দূর হইতে আসে, সে একটি নিঃশ্বাস লইয়া মহিষের নিকট আসিতে গিয়া ভীত, বিন্দুমাত্র। চারিদিকে ঘোর কুয়াশা, কোথাও তাহারই পদবিক্ষেপে ঝিল্লিরব ছাড়া, ক্বচিৎ প্যাঁচার জ্বালাময়ী ডাক ছাড়া কিছু নাই, কুয়াশা নিবিড়—কোথাও ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, দৌড়াইয়া তাহা ধরিতে গিয়া কাঁটায় জর্জ্জরিত, সে প্রাণপণে এ প্রান্তরে ডাকিল, 'বাবা, বাবা'—এমত সময় এক কাশির শব্দ!

শৃগালের ডাক এখন অনেকদূরে; শুধুমাত্র মহিষের পদশব্দ, সম্মুখে সমগ্র দূরত্ব নৈকট্যের সহিত মিশ্রিত হইয়া মহাবিকারে ঝিম, কালাচাঁদ তাহার বেদনার উন্মত্ত স্বরের রেশের আধিক্যে বড়ই আত্মপ্রসাদ লাভ করে; পৃথিবীর, মরজগতের অন্তরালে 'কালের' ভাবনা—যাহা রোমশ যাহা দৃষ্টিক্ষম—তাহা উহার হাতে অধৈর্য্য হইয়া উঠে, এবং এই হস্তদ্বারা পিতার গাত্র বুলাইতে গিয়া বিদ্যুৎ আহত, কেন না পিতা সে হস্ত স্পর্শ মাত্রই, ঝাঁঝস্বরে বলে—'উঁ, মরে গেলাম কি ঠাণ্ডা', বালক অপবিত্র নিমেষেই, অপ্রতিভ তখনই; মর্ম্মাহত হইয়া ভাবিল, 'বাবা বড় দুঃক্খী' এবং এই সঙ্গে একদা ইচ্ছা হইয়াছিল, এই উপায়টি কেমনে সম্ভব হয়, সে গল্প বলে; কিন্তু সাহস পায় নাই, অপহরণ কথাটি ছিল, মিথ্যা করিয়া বলা যাইত যে মহিষটি চাহিয়া আনিয়াছে কিন্তু ইহাতে কোন মরদানা নাই, বলে নাই কারণ অপহরণ মহাপাপ, হয়ত সে-কথা শুনিয়া বাবা এই মাঠেই মরণাপন্ন শরীর লইয়া তৎক্ষণাৎ লাফাইয়া একবার নিশ্চয় তাহার ভাঙা দেহ কম্পমান করি চীৎকার করিবে, নিমেষেই অদৃশ্য হইয়া যাইবে এ কারণে যে, চৌর্য্যের পাপে কুষ্ঠ হয়, গলিত কুষ্ঠ! কিন্তু দুকড়ি বলিয়াছিল, অপরাহ্ণ সূর্য্য সন্ধান করত, 'ইস নো ভেরীওয়েল, নো ব্লাডি পাপ' এই উক্তিতেই এ বুদ্ধি হয় যে পাপ বলিয়া কিছু নাই, রসিক বলে, 'ভগবান আছেন' অর্থাৎ ভগবান আছেন বলিয়া পাপ করিবার ক্ষমতা মানুষের নাই, অবশেষে সে জোর দিয়াছিল, 'তুই তো তোর বাপের কারণেই করছিস, আর সত্যিই তো এটা চুরি নয়...' দুকড়িও যোগ দিয়া বলে, 'ম্যাজিসট্রেট, হাকিম, মাগের দাস হতে পারে, বোকা নয়' এবং কালাচাঁদের নিজের মনে হয়,—'পেট্রোমাকস তো আছে'

অজস্র কথার স্রোত তাহার ভিতর আনাগোনা করে, এইভাবে, কিভাবে, যে, সে দুস্তর প্রান্তর পার হইয়া, যাহা শীত আর অন্ধকার মোহিত, বিদ্ড়ার খালের সম্মুখে আসিয়া অসম্ভব নিশ্চিন্ত অনুভব করে, জলে আকাশ মার্গের জ্যোতি তাই সাদা, ওপাশে কেওড়া আর বেত গাছ; অনেক বেলেহাঁস, সে, অকারণে মনে হয়, পিছনের দিকে তাকাইল; মহিষের পৃষ্ঠে তাহার বাপ তেমনি শায়িত আর যতদূর চোখ যায়, যদিও কুয়াশা আবৃত, মাঠ; সে জয়যুক্ত হইয়াছে, এ উপলব্ধির পরক্ষণেই—রকমারি গালাগাল এক সঙ্গে উচ্চারণ করিতে গিয়া অদ্ভুত আহাররত পশুর শব্দ করিতে গিয়া রোমাঞ্চিত হইয়া বিদ্ড়ার খালের পাড় ভাঙিয়া তৎপর দৌড়াইল; যেখানে সেখানে দৃষ্টিপাত করে, এখন নৌকার

আবছায়া ছবিটি দর্শনে রুদ্ধশ্বাসে আসিয়া, বেগ সামলাইতে অপারগ, ফলে, লগী ধরিয়া একটু ঘুরিয়া ঝটিতি নৌকার মলম ধরিয়া ফেলিল, নৌকাকে, সেই অবস্থায় মলমে বারম্বার মাথা ঠুকিয়া প্রণামান্তে, চক্ষুর্দ্বয়—যাহা বিশাল, তুলিতেই নৌকার গর্ভস্থিত জলে, যাহা এখন স্থির, আপন প্রতিবিম্ব দেখে, এবং অতীব ধীরে আপন প্রতিবিম্বের দিকে সুস্পষ্ট করিয়া দেখিবার নিমিত্ত তাহার অভিমান ছিল। এ মোহ ক্ষণেক, মুখমণ্ডল তুলিয়া সে পুনরায় গভীরভাবে উচ্চারণ করে, 'তুমি দীনবন্ধু' আর যে এক পল অপেক্ষা না করিয়া নৌকার দড়ি খুলিতে যত্নবান, বুঝিল, অতিমাত্রায় হিমে তাহার অঙ্গুলি অবশ, সাড় নাই, ফলে বন্ধনটি তাহাকে নিছক ব্যতিব্যস্ত করে, সে বোকার মত খানিক জল তুলিয়া গ্রন্থি ভিজাইল, বুদ্ধি ভ্রংশ হইয়াছে, দিকভ্রমবিকার এখন বৃদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়াছে—এত শীতেও তাহার গাত্র ঘর্ম্মাক্ত, ক্রমে সে গ্রন্থি খুলিতে সমর্থ হইল, গুণ টানিয়া, ধীরে নৌকাটি লইয়া যে স্থানে একটি বাবলা গাছের তলে বিশ্রামরত মহিষের পিঠে বাপ এখনও তেমনিভাবে শায়িত, সেখানে আসিল। ভাবিল, 'মহিষের বাবা না জানি কত ভাবছে!"

মুহ্যমান বাপকে কালাচাঁদের কেমন যেন মায়া হইল, সে নিশ্চয় অনেক কথা মনে সাজাইয়াছিল, যে সকল বাক্যের মধ্যে আপনকার বাহাদুরিই সঠিক বিষয়, কিন্তু কোন কথাই সে বলিল না, বাপকে ধীরে উঠাইয়া অতি সন্তর্পণে, শিশুস্থানে, নৌকায় উঠাইয়া বাপের পা ধুইয়া, পরণের ঠেঁটি খুলিয়া সযত্নে মুছাইয়া, সত্বর মহিষ পৃষ্ঠ হইতে খড় চট আনিতে দৌড়াইল; এক আঁটি খড় মহিষকে দিয়া তাহাকে নমস্কার অন্তে নৌকায় ফিরিল। নৌকায়, বেশ প্রশস্ত, খড়ের বিছানায় বাপ সত্যই আরামে আপনাকে জড়াইয়া আছে; এ দৃশ্য দেখিয়া তাহার, কালাচাঁদের, শরীর পর্য্যন্ত স্ফীত, পাঁচ পীর স্মরণ করত, দুর্গা নাম করিয়া নৌকা ছাড়িল, খানিক লগী দিয়া আসিয়া বৈঠা ধরে। অনেকক্ষণ এইভাবে বহিবার পর, খাল যেখানে শেষ হইতে আর কয়েক রশি বাকি, সেখানে হইতে দেখিল, বিরাট গঙ্গা। শুধু বলিল, 'বাবা, মা গঙ্গা...'

আপাদমস্তক চটে ঢাকা পড়ে নাই, বাপের পা দুইখানি বাহির হইয়া আছে, যে পদদ্বয় শীতে কম্পিত, বাপ কহিল, 'তুই আয় একটু শো,' কালাচাঁদ দূর অভিমুখে চাহিয়াছিল, কেন না এসময় এক স্বপ্নরাজ্য তথা জাহাজ গঙ্গাবক্ষ দিয়া যাইতেছিল, তথাপি এ উক্তি তাহার মর্ম্মস্পর্শ করে। সে ভাব করিল যেমন সে শোনে নাই, শুধুমাত্র নৌকার দিকে চাহিয়া ভাবে, 'এর বাপ মা বড় ভাববে, ভাববে ছোঁড়া যে কোথায় গেল!' আর একবার বাপের কণ্ঠস্বর শুনিবার মানসে সে একমনা হয়, শব্দ না করিয়া দাঁড় বহে; সম্মুখের পাটাতনের উপর খড়ের বিছানায় তাহার বাপ নিঝুম; সে শুধু বলিয়াছে 'বেচারী'...ক্রমে নৌকা গঙ্গায় আসিয়া পড়িল, কালাচাঁদ নামিয়া তীরের নিকটে লগী পুঁতিয়া নৌকা বাঁধিয়া, গঙ্গার জল আপন মাথায় দিয়া, বাপের বস্ত্রের উপর ছিটাইতে গিয়া থমকাইল, শায়িত জনকে মনে হইল এভাবে গঙ্গোদক সিঞ্চন করা বিধেয় নহে—যাহা তাহার কল্পনামাত্র—এমত সময় বাপ বলিল, 'ওরে আমায় একটু গঙ্গাজল দে'। কালাচাঁদ অতি ভক্তিভরে অঞ্জলিবদ্ধ করত গঙ্গাজল পিতার নিকট আনিল, বাপ তাহার চট হইতে মুখমণ্ডল বাহিরে আনিয়া কিছুটা হস্তদ্বয়ের উপর ভর দিয়া মস্তক তুলিয়া রাত্রের পতিতোদ্ধারিণী, দেবী সুরেশ্বরী ভগবতী গঙ্গা দর্শন করিল, রহস্যময় কণ্ঠস্বরে, নিরবধি কাল যে আবেগকে বিনাশ করিতে সক্ষম হয় নাই, আরবার আবৃত্তি করিল, 'মা মা মাগো'।

এহেন মাতৃসম্বোধনে কালাচাঁদের সর্ব্বশরীর অসহায় শিশু হইয়া গেল; তাহার বাপ কোনমতে কিঞ্চিৎ গঙ্গোদক ব্যবহার করিয়া শুইতে শুইতে বলিল, 'কালা তুই একটু শো না রে...আমার কাছে...' কালাচাঁদ আহ্বান বচন আপনকার রোমকূপ দ্বারা শ্রবণ করে; স্বীয় মনক্ষোভ, যাহা এই যাত্রার সুরু হইতে সঞ্চিত হইয়াছে তাহা এড়াইবার নিমিত্ত, অন্যমনস্ক হইবার মানসে সে দাঁত দিয়া নখ কাটে, তাহার পৌরুষ অনেক যাবৎ আহত, এখন চোখ ফাটিয়া জল আসিতে চাহিল, চোয়াল ঘর্ষণ করত তাহা সামলাইতে বাধ্য হয় কেন না তাহার বাপ পুনরায় উহাকে স্মরণ করে। অতএব কালবিলম্ব না করিয়া সে বাপের পাশে প্রায় ঈষৎ হামাগুড়ি দিয়া আসে। এরূপ ভাবে আসিতে তাহার বড় ভাল লাগিয়াছিল, খুব আনন্দ হয়। একদা শুধু বলিল, 'ইকি আমায় চট দিচ্ছ কেন ঠাণ্ডা আমার লাগে না...' বলার সঙ্গে সঙ্গে আপনার ঘাড়ের কাছে শীতল স্পর্শ পাইয়া সে কিরূপ বাঁকিয়া গেল, মৃদ্যু হাস্য শুনিল, অবশেষে তাহার বাপের কথা ভাসিয়া আসিল, 'তবে যে বড় বললি ঠাণ্ডা লাগে না?' ইহার পরক্ষণে ক্রমাগত

মনের কথা, 'জানিস তুই খুব যখন ছোট ছিলিস আমি আর তোর মার মধ্যে ঠিক যেন ড্যাঙ্গার মাছ...তুই মার জন্মে মাছ ছিলি আঁকপাক করে খেলা করতিস...কত খেলা করতিস...'

প্রথম বাপের রসিকতায় এবং ইত্যাকার বহু পুরাতন স্মৃতি উল্লেখ করিতে শুনিয়া ছেলেমানুষ কালাচাঁদ ভারী খুসী হইল, তাহার দন্তপঙক্তি, একটি নাই, এখানকার, এখনকার সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিল; সে চোখ মেলিয়া উদ্‌গ্রীব; শুনিল, 'তোর কি এসব করার কথা প্রারব্ধ...বিধির লিখন...কিন্তু এটা জানিস উপরে যিনি আছেন, যিনি সকলের, সকলে যাঁর বড় আদরের—সেই ভগবান জগৎপিতা তোকে বড় ভালবাসবেন' এই উক্তির পর বাবার নিঃশ্বাসের শব্দ শ্রুত হয়; এই সূত্রে, প্রসঙ্গে, কালাচাঁদ তাহার পিতার কোল ঘেঁষিয়া আসিল। যে সকল মুহূর্তে, এমনও যে তুলসীপাতার ছায়ায় বসিবার ছোট তাহার শরীর, সত্যই সে ছোট, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সে-সকল গল্প শুনিতে, সে প্রতি পলে যখন পুত্র, উল্লাসী; কেন না এ সম্বন্ধের সূত্র সমস্ত বাস্তবতায় আরোপ করিয়াছে, যে লবণাক্ত সৌন্দর্য্য তাহারই মত কোন না কোন পুত্র আকাশ নভমণ্ডলে ছুঁড়িয়া দিয়াছে, যাহাতে নির্বিঘ্নে যায়, সে কারণে, এবম্প্রকার অনন্ত শূন্যতার আয়োজন! কালাচাঁদ কি বলিবে তাহা স্থির করিতে পারে নাই, মাঝে, মনে হয়, আহা যদি রসকে দুকড়ি...এইটুকু ভাবিয়া সে অন্ধকার, ঝিম্, নির্ভাবনা, বস্তুত রসকের উপস্থিতির জন্য তাহার আনন্দ ছিল, কিন্তু দুকড়ির! যে ত্রিভুবনের সমস্ত কিছুকে সে পেট করে! তথাপি মনে হইল এক্ষেত্রে সে নিশ্চিত শান্ত হইবে; সহসা তাহার বাবা বলিল, 'কালা ঘুমুলি'?

'না বাবা, কেন?'

'একটা গান বল...'

কালাচাঁদ গাহিল, 'মা আমাকে দয়া করে শিশুর মত করে রেখ' কালাচাঁদের সুললিত কণ্ঠস্বর পার্থিব জাগ্রত অবস্থাকে, যাহা ধূলিকণার অঙ্গে, সুখী করে। কালাচাঁদ সুচারুরূপে গাহিবার নিমিত্ত বসিয়াছিল, গীত শেষ; কুয়াশাচ্ছন্ন ছাড়া নভস্থলে আপন জনের মুখমণ্ডল দেখিতে পাইল, তাহার মন দেহ সূচাগ্র, আর যে চরাচরসমূহ নিজ বক্ষস্থল, তাহার অত্যুক্ত ইচ্ছা হইল, এখনই এখানে, যেখানে হউক, কোথাও একটি বীজ রোপণ করে, পলকেই তাহা বিশাল মহীরুহে দেখা দিক; ইচ্ছা হয়, সম্মুখে যে বর্ত্তমান, ঐ দেদীপ্যমান তারকা খসাইয়া আনিয়া দেয়; ক্রমে অধৈর্য্য উতরোল, কেবলমাত্র ভয় ছিল, অকথ্য ভাষা না স্ফুট হয়; আগামী কল্যর কর্ম্মধারা ঝটিতি নির্দ্ধারণ করি পরক্ষণেই কথা কহিতে চাহিল, কিন্তু বেচারী কি প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবে, বিস্ময় তাহার নাই, বিস্ময় লইয়া সে অনেক কসরত করিতে প্রাণান্ত করিয়াছে, শুধু এক্ষেত্রে অনুরোধ করিল, 'রামের বনগমন পালা...বাবা বল, সীতার কথা।'

তদুত্তরে বাপ আস্তে আস্তে কহিল, 'সীতা বলতে নেই—মা জানকী বল' বলিয়া নিজে প্রণাম করিল, কালাচাঁদও তদ্দর্শনে অতীব শ্রদ্ধায় আপন মস্তকে করযোড় স্পর্শ করে। ইহার পর সুন্দর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'আজ পুষ্যানক্ষত্র সমন্বিত বৃহস্পতিবার...' আর বেশী বলিতে হইল না তাহার বাপের কাশি আরম্ভ হয়, ছেলেমানুষ কালাচাঁদ বড় মূর্খ হইয়া গেল, এক হাতে পৈতা ও মাদুলী কণ্ঠ হইতে অসংলগ্ন করে যাহা উহার বাপের কণ্ঠে জড়াইয়া ছিল, এবং অন্য হাতে সযত্নে বক্ষ বুলাইতে থাকে। দূরাগত জাহাজের বাঁশীর শব্দে সে নিজের সমগ্র দেহ দিয়া তাহাকে, বাবাকে, আড়াল করিবার মারাত্মক বালকবুদ্ধি প্রকাশ করিল।

সকালের গঙ্গা দর্শনে কালাচাঁদ আত্মহারা, কি এক অপূর্ব্ব রূপ, একবার মনে হইল বাবাকে জাগায়, কিন্তু বাপ রাত্রব্যাপী শীতকাতর ফলে এখন রোদে অজস্র ঘুমে নিখোঁজ। যোগী-আরাধ্য গঙ্গাকে বড় আপনার করিয়া দেখিতে লাগিল, এসময়, দেশলাই-এর বাক্সে যে রবিবর্ম্মার ছবি দেখিয়াছে ভাবিতেই সেও তাই, রূপান্তরিত। কিয়ৎক্ষণ এইভাবে থাকার পর কোন শৌর্য্যাভিমানে তাহার ছোট শরীর উদ্বেলিত হয়, আপন কর্ণে সে বিবিধ, পাঞ্চজন্য দেবদত্ত ঘোরকর্ম্মাভীম পৌণ্ড্র, আদি শঙ্খধ্বনি শুনে, মহা আহব তাহাকে আহ্বান করে, কালাচাঁদ বলিয়া উঠিল, 'এবে জোর নৌকো বিলাস হবে; দেখি কোন আঁটকুড়ির বেটা কোন শালা ঠেকায়' বলিয়া গঙ্গার প্রতি বীরদম্ভে চাহিল, অবশ্য গঙ্গার প্রতি নহে, অন্য কেহ অলক্ষ্যে ছিল যাহাকে দেখিতে পাইয়াছে! কালাচাঁদ আর কালক্ষেপ না করিয়া বাপকে জাগাইয়া কহিল, 'তুমি হিমভাত চাট্টি খাও।' বাপ দেখিল তাহার সম্মুখে কলাপাতায় হিমভাত, বাসি বেগুন পোড়া। ইহার পরক্ষণেই কালাচাঁদ বলিল, 'আমি নৌকা দেখি, পারে ত যেতে হবে...''

সে, বেলা যখন বেশ খুব শীর্ণ, ফিরিয়া আসিল; কোন নৌকা নাই, যদি বা আছে কবে কখন ছাড়িবে ঠিক নাই, বেশ বোঝা যায় মহাভাবনায় নির্ব্বোধ, বিরাট নয়নযুগলের এক কোণ দিয়া গৈরিক গঙ্গাকে অবলোকন করিল, বাপ কহিল, 'তাহলে'

কালাচাঁদ সদর্পে উত্তর দিল, 'তাহলে আবার কি? চুপ কর দিকিনি...হাসপাতাল যেতেই হবে...'

তাহার বাপের প্রথম হইতে হাসপাতাল যাওয়াতে একটু আপত্তি ছিল, এখন এরূপ অবস্থা বিবেচনা করিয়া কহিল, 'হাসপাতাল আমি যাব না'

কালাচাঁদ কহিল 'থাম থাম...চুপ করে থাক...মরবে নাকি...' আর বাক্যব্যয় না করিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল, দাঁড় বাহিতে বাহিতে বলিল, 'ছেলেমানুষী করো না, মরলে তো আমিও মরবো...রোগ নিয়ে ছেলেখেলা নয়...ভগবান আছেন, এখন তো আর চোত বৈশেখ মাস নয়'

যখন গঞ্জের ঘাটে পৌঁছাইল তখন বেশ বেলা, নৌকাটি ছোট খালের ভিতর রাখিয়া তীর হইতে নিসিন্দের ডাল ভাঙ্গিয়া মলমে গুঁজিল যাহাতে বাপের মুখে রোদ না পড়ে, এইটুকু ব্যবস্থা করিয়া উপরে উঠিল, দূরে দুই চারিটি টিনের চালা সম্মুখে দাঁড়িপাল্লার তেকাঠা, ইতিমধ্যে একটি ভাঙ্গা মেলার চিহ্ন; অবিক্রিত ধামা, কেহ লাঙলের ফলা ইত্যাদি গুছাইতে ব্যস্ত, আর হাসপাতাল! দূরে জরাজীর্ণ,—এখান হইতে দুই চারটি এনামেলের চটনাউঠা বাসন, ফিলটারটি নজরে পড়ে।

হাসপাতাল দর্শনে তাহার কেমন মুখখানি হইল, এ হাসপাতাল রসকের খবর, ডাক্তার তাহাকে ভালবাসে, এবং ডাক্তারের হাতযশ আছে। ভাঙা মেলার দিকে কালাচাঁদ চাহিল, একান্ত হইতে হাঁক আসিতেছে, 'এইসো এইসো একে পাঁচ, টাকায় পাঁচ টাকা।' যেখানে দাঁড়াইয়াছিল সেই স্থান হইতে হাসপাতাল কতটুকু পথ তবু তাহার মনে হইল, অনন্ত এ পথ! হাসপাতাল দর্শনে, যদিও সে নিজেই তাহার বাপকে এখানে আনিতে আকাঙ্ক্ষা করে, এখন বিমূঢ় বিষাদগ্রস্ত; তাহার তন্নতন্ন অনুসন্ধান ব্যর্থ, বৃক্ষলতাদিকে কষ্টই দিয়াছে, মস্তকে হস্ত স্থাপন করত অসহায়ভাবে সে চলচ্ছক্তিরহিত। একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া হাসপাতালের দিকে আগাইয়া গেল, কি বীভৎস নোংরা হলঘর, পাশে একটি কক্ষ অদ্ভুত সজ্জিত, সে ডোমকে প্রথমেই প্রশ্ন করিল, 'এ ঘর এত করে...' হয়ত কালাচাঁদের বাপের জন্য এ ঘরটি বড় পছন্দ হয়। কিন্তু ডোমের উত্তর শুনিয়া ভয়ে ঘরের দিকে চাহিয়া সেলাম করিল, 'ঘর ফিরিঙ্গি ঘর ইংলিসম্যান' কালাচাঁদ ত্রস্ত, ইংলিসম্যানদের নূতন জুতার উদ্দেশ্য লাথি মারা। সে কাতর নয়নে ডোমের দিকে চাহিল, জিজ্ঞাসা করিল, 'ডাক্তারবাবু কোথায়?' ডোম উত্তর করিল, 'মফঃস্বলে গেছে।' কালাচাঁদ বারান্দায় বসিয়া পড়িয়া ঘরের দিকে চাহিতেই দেখিল একজন রুগী ইসারায় ডোমকে ডাকিতেছে, ডোমের উত্তর, 'বিকালে শুনবো গো' শোনা গেল। কালাচাঁদ এই বিকট আবহাওয়ার মধ্যে থামে হেলান দিয়া ঘুমাইয়া পড়িল; রুগীর চীৎকারে তাহার ঘুম ভাঙে এবং মনস্থ করিল, না বাপকে যদি মরতে হয়, আমার কোলে মাথা দিয়ে মরুক, বলিয়া যেক্ষণে সে উঠিয়াছে সেই সময় ভেড়ী পথে দেখিল, প্রায় গাধার শরীর আকারে একটি ঘোড়ায় ডাক্তার, যাহার পদদ্বয় প্রায় মাটিতে স্পর্শ করিয়াছে।

ডাক্তারবাবুকে কালাচাঁদ বিনীত নমস্কার করিতে ডাক্তারবাবু তাহার প্রতি চাহিয়া বিস্ময়ে অভিভূত, বহুকাল এত সুঠাম চেহারা তিনি দেখেন নাই। কালাচাঁদ কহিল, 'আমায় রসকে, চণ্ডী শাস্ত্রীর দলের রসকে...'

'তোর বাবা কোথায়?' সসম্ভ্রমে ডাক্তার বালককে প্রশ্ন করিলেন; কালাচাঁদের কথা, অর্থাৎ তাহার বাপ এত পথ পদব্রজে আসিতে পারিবে না পাল্কী বা ডুলি না হইলে, আর সে নিজে মাথায় এত নীচু যে কাহাকে ভর দিয়া এত পথ পাড় ভাঙ্গিয়া আসিবে—শুনিয়া কিঞ্চিৎ অন্যমনস্ক। ডাক্তারবাবুকে দেখিয়া দু একজন রুগী পরিত্রাহি ডাকিতে আরম্ভ করে, ডাক্তারবাবু তাহাদের দিকে চাহিয়া কহিল, 'দাঁড়াও না বান...রা, তুমি দাঁড়াও আমি এখুনি আবার মফঃস্বলে যাবো, বাড়ী থেকে এক মিনিটে-র মধ্যে আসছি, ওষুধ পত্তর নিতে এসেছি' বলিয়া কয়েক মিনিটের মধ্যে ডাক্তার আসিয়া তাহাকে কহিলেন, 'চ'। খালের পাড়ে আসিয়া কালাচাঁদ দড়ি টানিয়া নৌকা নিকটে আনিল, ডাক্তার জুতা খুলিয়া অল্প কাদার উপর দিয়া তাহার বাপকে অতীব যত্ন করিয়া দেখিল, পূর্ব্বেই সমস্ত লক্ষণ ঘাটে আসিবার পথে শুনিয়া কি এক কথা তাহার মনে হয়; চোখ তুলিয়া কহিল, 'এই নৌকোয় গাঙ্ পার হলে কি করে, তুমি বটে বড় কঠিন লোক...না না আমায় টাকা না...শোন' বলিয়া কালাচাঁদকে পাড়ের উপরে লইয়া কহিল,

মৃত্যু অবধারিত' বলিয়া তাহার প্রতি সস্নেহে চাহিয়া সহসা প্রচণ্ড কণ্ঠে কহিল, উপদেশ দিল, 'দেখ' যেহেতু কালাচাঁদ ডাক্তারের কথা শুনিয়া আর এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিতে পারে নাই, উহা বিদ্যুৎ আহত করে; একদমে সে ঝটিতি নীচে প্রায় নৌকার কাছে, কখন যে দুই কানে অঙ্গুলি প্রদান করিয়াছে তাহা জানা নাই,মুখে অপরাহ্ণের ছবি, ডাক্তার ষ্টিথোস্‌কোপের নলচেটি হাতে উহা দ্বারা বক্তব্য লিখিতে, স্পষ্ট করত বলে, 'এখনই চলে যাও।' বেচারী কালাচাঁদ কি করিবে ভাবিয়া পাইল না পুনরায় পাড়ের দিকে উঠিয়া খানিক অশ্বপৃষ্ঠ-আরূঢ় ডাক্তারবাবুর পশ্চাত গমন করি থমকাইয়া একা এ মাঠে দাঁড়াইয়া নিরাকার, তাহার কপোল দেশ বহিয়া অশ্রু কয়েক ফোঁটা নামিল, এই সংবাদ শুনিবার জন্য কি এত অত্রাহি হইয়াছে, মৃত্যু অবধারিত, শালপাতার ঠোঙ্গা ফেলার আওয়াজ হইতে যাহার স্বরব্যঞ্জন-বর্ণ প্রসূত! 'ডাক্তার কি করতে তাহলে আছে, বাবাকে বাঁচাতে নয় তো,' ক্রোধে আক্রোশে কালাচাঁদ দাঁতে দাঁত ঘর্ষণ করিল, অস্ফুটস্বরে বলিল, 'অলরাইট' তাহার মধ্যে দানবেরা খেলিতে আরম্ভ কি যে করে তাহা লেখা নাই, গাছের ডাল ভাঙ্গিতে কাঁটা ফুটিল ভ্রূক্ষেপ নাই মহাদম্ভ ভরে মেদিনী কাঁপাইয়া চলিল...তাহাকে বাধা দিবার কেহ নাই, সে বাবা এখনি কলিকাতায় যাইবে; দৌড়াইয়া আপনাদের নৌকার কাছে আসিতেই বাপ বলিল, 'বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে...বড় ক্ষিদে।'

'জানো ডাক্তার টাকা নেয়নি, আমি অনেক খাবার কিনবো, কলকাতায় যাব...ডাক্তার বলে তুমি ছেলেমানুষ নৌকা বইতে পারবে না আমি মনে মনে পাগলা খায়া হায়—হ্যাঁ এখনই যাবো...আগে দাঁড়াও কড়া চাপাই...'

কালাচাঁদের গায়ে হাতে পায় বীরত্ব পৌরুষ লাবণ্য হইয়া দেখা দিয়াছিল; সে পাড়ে উঠিয়া যেখানে ডাক্তার তাহাকে সেখানেই, ক্ষণকাল, কোন মারাত্মক বিষধর পতঙ্গের গুঞ্জন করিতে আরক্তিম, আশ্চর্য্য! ইতঃমধ্যে, অথচ, ইতস্তত জিহ্বাদ্বারা তালব্য শব্দ, উপায়হীন-সূচক, নিজেকে একমনা করিতে নিঃসৃত হয়; এবং এইকালে ডাক্তার যাহা যাহা বলে, আনুপূর্ব্বিকক্রমে মনে আসে, 'তুমি রসকের মিতে, হাসপাতালে অনেক জায়গা...বাপকে এখানে এনেছ এটাই পণ্ডশ্রম,...বড় জোর কটা দিন বেভুয়ে নিজের ভিটেতে—তুমি দুধের আর কেউ থাকলে নিশ্চয় তাকে বলতুম কষ্ট হয়—" এই পর্য্যন্ত শ্রবণে, কালাচাঁদ তখন, মায়া মমতার লেশ নাই সুন্দর ওষ্ঠদ্বয় পৃথক করিয়া কহিল, 'যা হয়...কপালে...ডাক্তারবাবু আপনি ভর্ত্তি...।' ডাক্তার মাঠ, ও অদূরে গঙ্গা হইতে সম্বিৎ লইয়া তাহাকে বাধা দিল, 'পাগল, এখনই নিয়ে যাও,,...বুঝুম না, বারোজাত ডোমে ছোঁবে মড়া...ভাল হবে...।' এখন, কালাচাঁদ নিজের অনুরোধ স্মরণে চাপা চীৎকার করিল, 'আমি শালাও কথা বলিনি' এবং পরক্ষণেই ব্যঙ্গ বিদ্রূপ শোনা যায়, 'মৃত্যু অবধারিত...দেখি কোন শালা আছে—তার বাপও এখনও জন্মায়নি,' এই উক্তিতেই আগা সাহেবের মুখখানি ভাসিয়া উঠিল নিমেষেই, তাহার বাক্যাবলীর, কালাচাঁদের, প্রতিধ্বনি হইয়া আগা সাহেবের গলা আসিল, 'ভাগ্‌তা হায় ভাগ্‌তা হ্যায়;' ইহা অনুভবে, কালাচাঁদ রোমহর্ষে দুমড়াইয়া বিকলপ্রায়, সে মরিয়া, দুর্নিমিত্ত বিষ পতঙ্গের গুঞ্জনে ক্ষিপ্ত, এবং এই বিকারে ইতস্তত নিরীক্ষণ করিলঃ জরাজীর্ণ হাসপাতাল ঐখানে, আর তাহার ফিরিঙ্গী ঘর! তদ্দর্শনে সে আরাধ্য মহাজন-সাক্ষাৎ তথা পন্থা পাইল, পলকেই সেও ইংরাজ—যাহারা দুর্দ্দান্ত, অমানুষ, নীচ, জানোয়ার, শিশু ভিখারীকে বুটের ঠোক্কর, অন্তঃসত্ত্বা রমণীকে, প্রভুর নামে, লাথি মারিতে যাহারা স্বর্গসুখ পায়—কালাচাঁদও সেই ইংরাজ-সমান, উহার পুণ্যদা চক্ষুর্দ্বয় অচিরাৎ পিঙ্গল কভু মেঘবর্ণ, তাহার মতিভ্রম দেখা দিল, নিজেকে না বুঝিতে দিয়াই আপনার ঠেঁটি খুলিয়া ফেলিল। টাকা তিনটি নিশ্চয় মাটিতে, সে উলঙ্গ এবং ক্রমাগত ভারী পদচারণার হেতু শুষ্ক মৃত্তিকায় পদচিহ্ন গভীর; তাহার তীব্র পিত্তোদ্রেক হইয়াছে, একদা নিজ দেহ স্থির, ক্রমে অগ্রপশ্চাৎ আন্দোলিত; যেস্থানে, ডাক্তার অবশ্যম্ভাবী ঘোষণা করে, সেই স্থানে আক্রোশে লাথি, তিন তিনবার মারিল, আর যে ইহার পর বৃদ্ধঅঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমার শীর্ষ স্পর্শে যে বৃত্ত রচনা করে, তাহারই মধ্যপথ দিয়া তিন তিনবার থুতকুড়ি কাটিল, আশ্চর্য্য তিনবারই, সে সফলকাম হয়; এই মদগর্ব্বে জলদগম্ভীর স্বরে ডাকিল 'কালাচাঁদ'। এবম্প্রকার সিংহনাদে দেহে কালবৈশাখী আর যে তির্য্যকদৃষ্টিতে মেরুদণ্ডের শেষ ক্লৈব্য ভস্মীভূত, দন্ত ঘর্ষণে—যদিচ এখনও সে সম্যক অলকাপুরীর সৌন্দর্য্য, বড় মধুময়—বায়ু স্তম্ভিত, লতাগুল্মবৃক্ষপত্রাদি নিথর, গাঙ্‌-শালিক ও আর আর পক্ষীদের কণ্ঠে চ্যামটে মাঠ প্রবেশ করিয়াছে; সে দেখিল খেলার মাঠ, অনবরত সে ফাউল

করে, অনবরত হুইসিল দিয়া খোনা মাস্টার বলে 'ফাউল, আর যদি কর' বুক ফুলাইয়া কালাচাঁদ, এখন, এখানেই, নানাবিধ ফাউল করার ভঙ্গিতে কহিল 'বেশ করবো'—পরক্ষণেই দেখিল রসিকের তেড়ী-পাতাকাটা, যাহা দক্ষিণাপবন সঞ্চালিত পদ্মবন-ব্যথিত দীঘির তরঙ্গ-বিভঙ্গ, বড় নিষ্ঠাসহকারে রসিক উহা আরোপ করিয়াছে, তাহা ধ্বংস করিতে অত্যুগ্র উৎসুক; পরে ভাবিল তাহারই গর্ভে সে ছিল, যে ক্রূর দর্শনা, চণ্ডোদরী নাম্নী নিশাচরী, যে বলে আমার গর্ভাবস্থা, এই অবস্থায় আমি যে পর্য্যন্ত দর্শন করিয়াছি...মৃগনয়না সীতাকে সেই পর্য্যন্ত আমার ইচ্ছা হইতেছে আমি ইহার যকৃৎ প্লীহা-ভুজদ্বয়ের স্থূল পার্শ্বভাগ, নাড়ীবন্ধন সহিত হৃদপিণ্ড ভক্ষণ করি...(ইহার পরও নির্ঘাত অশোকবন পুষ্পিত হয়); মুখখানি এরূপ ব্যাদান করত রুখিয়া দাঁড়াইল যে, লোক দিক সমূহ ত্রস্ত, কহিল, 'মৃত্যু মৃত্যুর গায়ে আমি হিজজে হুহুমান...শাল্‌লা' আর ইহার সহিত মনস্বী ধার্ম্মিক কালাচাঁদ ইতর হস্তভঙ্গীমা করে এবং ইদানীং এই আসুরিক দুর্দ্দৈব ক্ষমতা লইয়া তাহার শিরা-উপশিরা তাহাকে পশ্চাতে ফেলিয়া ছুটে; দেখিল, আয়না ধরিয়া সে নিজে, আয়নার সম্মুখে বসিয়া, রসকে পরম নিখুঁতত্ব দিয়া আপনার মুখমণ্ডল সাজাইতে ব্যস্ত, দুটি গ্যাসের আলো দুই পার্শ্বে, রসকে এক রহস্যময় গোপনতা লইয়া গোপনতাকে আপন মুখে ধীর গাম্ভীর্য্য সহকারে খেলাইতেছে; এই গোপনতা এক নিরবচ্ছিন্ন শান্তিপ্রসূত, যোগলব্ধ, যেখানে জ্যামিতি কভু দূরত্বে, কখনও চন্দ্রালোকে, ক্বচিৎ শিশু হস্তের বর্ণাঢ্য রক্তিমতায়; এখন বিদ্যমান তখন অদৃশ্য, আর চারিদিকে, গঙ্গা বিদীর্ণ, নিঃসঙ্গ উপত্যকার নির্ভাবনা; এখন এই লাজুক গোপনতাকে তচনচ করিবার বাসনায় সে আস্ফালন করিল, সে আছাড় মারিয়া, দেখিল সত্যই, সে-গোপনতা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে, চারিদিকে অসংখ্য টুকরো, টুকরো, টুকরো। এবং ব্রজনাদে হুঙ্কার দিল, দেখি, 'মৃত্যু কি করে, ছেলের হাতে মোয়া' কখন হইতে যে তাহার চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া জল পড়িতেছিল তাহা সে জানিত না; অগোচরে হাতের কব্জি দিয়া খানিক অশ্রুমোচন করিয়া, যোগীগণ-দুর্লভ প্রবাহিণী গঙ্গাকে দর্শনে, ক্ষণেকেই মৃদু, ক্ষণেকেই দুর্দ্ধর্ষ অশ্রুতপূর্ব্ব শক্তি সঞ্চারিত এবং যুগপৎ, আশ্চর্য্য! নিজেকেই প্রশ্ন করে, 'আমি কি রহস্য করি, পালা গাহিতেছি, এসব সত্যসত্যই আমি সত্যই সত্য?' তীক্ষ্ণ অবিশ্বাসের অল্পকাল পরেই, ক্রন্দন-ব্যাহত স্বরে বলিল, 'মা মাগো, আমায় সাধন দাও, জন্ম-জন্মান্তর আমি সাধন করবো, আমি বাঁচাবোই বাঁচাবোই' আর যে, দ্রুতগতিতে টাকাগুলি তুলিয়া মাথায় ঠেকাইয়া, অশ্রুসিক্ত চোখে ঠেঁটি পরে; সে বিড়বিড় করি অনর্গল কুৎসিত গাল পাড়িতে অস্থির, ইতিমধ্যে কেহ তাহাকে ফুৎকারে উড়াইয়া দিয়াছে, তাহার ভালবাসা যাহা কাব্য-অনুগ্রাহী, ইহাতে হাত পড়িয়াছে, যে ভালবাসা রসিকের যাহা দু-কড়ির, দুকড়ি যে হৃদয় ভালবাসে, রসিক এই অবিরাম-বসুধাকে চতুর চটুল, তাহার, ভ্রূভঙ্গে নষ্ট করিতে সক্ষম, বলিয়াছিল, 'ওগো কালাবাবু আমি মধুর ভাবের ভাবি, কাঞ্চন ফেলে কাঁচে গেরো দিইনি, পীরিত আমার ধোবা ঘরকে যায় না...'

রাখাল ভোজনের দিন সন্ধ্যায়, 'পীড়িত আমার ধোবা ঘরে যায় না' এই সুললিত কথানিচয় রসকে বলে, ঠিক ইহার পূর্ব্ব দিনে রাত্র তখন গভীর, রসকে ঘুমন্ত অবস্থায়, স্বপ্নচালিত, দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত যাহার তালু লাল, অগ্রসর হয়, উহার ঠোঁট দুইটি মাঝে মাঝে পৃথক হইতেছিল: নিকটে যাহারা জুয়া, তাস, খেলিতে ব্যস্ত, সহসা এহেন দৃশ্যে থ, রসিক, দরজা দিয়া বারান্দায়, এটি স্কুল বাড়ী এবং একই ভাবে আনাগোনা করে, আর ইহার সহিত 'কালা কালা' নামটি উক্ত হয়, দরজার অবকাশ দিয়া রসিক স্বপ্নচালিত, পার হইবার সময় তাহার তালুতে লণ্ঠনের আলো অনৈসর্গিক হইয়া দেখা দেয়; এ ঘটনা কালাচাঁদকে চমৎকৃত ব্যাকুল করে। এখন, এই সকল ভালবাসা তাহাকে যুক্তিপূর্ণ করিয়াছে, ভালবাসাকে সে লাট খাইতে দিবে না; সে রুখিবেই; জলদগম্ভীর স্বর তাহার জিহ্বা আলোড়ন করে, এখান হইতে দেখিল, নীচে, নৌকা—নিসিন্দার ডাল সাজান,—পাশ দিয়া দু'একটি নৌকা পার হইয়া যায়, নিজ দৃষ্টির সম্মুখ হইতে দুই হাতে ডাল সরাইয়া আপন মনে কহিল, 'ভগবান ত মরে যায়নি...আমি আটাশে ছেলে নই' এবং উচ্চ কণ্ঠে কহিল, 'এ হাসপাতাল জাহান্নাম, বুঝলে, দাঁড়াও আমি এলাম বলে, কিছু কিনে আনি—এখনই যাব' বলিয়াই টাকা তিনটি কিছুক্ষণ হাতে নাড়াইয়া নিক্ষেপ করিল, রাজার মুখ প্রত্যেকটির দেখিয়া সে আনন্দে বিকারগ্রস্ত; দেখিল মেলায় কিছু নাই, শুধু রথটি—ইহা রথের মেলা—অচল, একটি পানের দোকান, শীতের হাওয়ায় অজস্র পরিত্যক্ত পাতা উড়িতেছে; মদগর্ব্বে

দোকানে আসিয়া হাঁকিল, 'সিগারেট হাওয়া গাড়ী'—ভয়ঙ্কর কিছু করার এই প্রকাশ! সিগারেট ধরাইয়া যাহাতক সে নির্দ্দম করিয়া টানিয়েছে, অমনি ধমক দিয়া কাশি, এবং এক পাক ঘুরিয়া গেল, ঝটিতি সে নৌকা অভিমুখে দৌড়াইয়াই থামিল; এ তাহার বাপের কাশিত নহে, তথাপি এই কাশি, শকুনের মত চক্র দেয়, কালাচাঁদ ক্রোধ-উন্মত্ত; এ সময় একটি বৃদ্ধ কণ্ঠস্বর বলে, 'খোঁকা আস্তে টান' খোকা কথাটি শ্রবণে বিশেষ রুষ্ট হইয়া কাশিবার মধ্যেই অল্প কণ্ঠে মন্তব্য করিল, 'খোকার তলপেটে দাড়ি'! কাশির ধমক সম্মুখের প্রতীয়মানতায় রক্ত ছিটাইতেছিল। তদ্দৃষ্টে কালাচাঁদ পাঁশুটে, এবং এমতকালে কড়ওয়ালার গলার আওয়াজ, জুয়াড়ীদের হুঙ্কার কানে আসিল; চিঁড়ে মুড়ির খোঁজ উবিয়া গিয়াছে, রাস্তায় বৃক্ষের আনত ডাল দেখিয়া তাহার মনে হইল আমার মাথায় লাগিতে পারে, যদিও অসম্ভব, মাথা নামাইয়া কড়ওয়ালার কাছে আসিতেই দেখে কড়ওয়ালা ও তাহার সঙ্গী উঠিয়া যাইতেছে। কালাচাঁদ কহিল, 'আমি খেলবো' তখনই ছক পাতা হইল; কড়ওয়ালা কহিল, 'যাহারা খেলিবে না তাহারা ভীড় করিও না' বলিয়া হৃতসম্পদ জুয়াড়ীদের হটাইয়া দিল, ঠেঁটির গিরোতে কালাচাঁদের খুচরা পয়সা ছিল, কালাচাঁদ, প্রথমেই দু'আনা লাগাইয়া কড় কৌটা হাতে লইয়া 'জয় মা, ছয় পাঁচ'—জিত; এই জিত তাহাকে অব্যর্থ বিশ্বাসে আনিল, সে ট্যাঁক হইতে এক টাকা ধরিল; পুনরায় জিত; যা থাকে কপালে বলিয়া, যখন জিতের টাকা হাতে পাইল, তখন মুখ দিয়া বাহির হইল 'এবার কলকাতা'; কিন্তু মনে হইল, ছটাকা বারো আনায়, 'জয় মা' বলিয়া সমস্ত টাকা যা ছিল ধরিল। জিতলে চল্লিশের উপর, 'চার তিন' বলিয়া কড় চালিল; আনন্দে লাফ দিয়া উঠিল, 'চার তিন চার তিন' বলিতে বলিতে হঠাৎ কি হইয়া গেল, একটানে তাঁহার ঠেঁটি খুলিয়া লইয়া ছক তুলিয়া খালের উপর বাঁশের সাঁকো দিয়া দৌড়াইল প্রথমে কড়ওয়ালা এবং তাহার সঙ্গী; কালাচাঁদের মুখে যখন শব্দ আসিল তখন তাহারা সাঁকো পার হইয়া, খাল পার হইতে আর একটি খাল যেখানে বাহির হইয়াছে সেখানের একটি শালতিতে উঠিয়া পড়িল, কালাচাঁদ দ্রুত পিছু লইল, তাহার চীৎকারে সকলে ছুটিয়া আসিল, কিন্তু হায় কালাচাঁদের, দ্রুততাবশতঃ বাঁশের সাঁকোতে পা পিছলাইয়া গেল, দুইধারের রেলিঙ ধরিয়া সে ঝুলিতে লাগিল; ইহা ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক, ইহা যাহারা তাহাকে সাহায্যের জন্য ছুটিয়া আসে তাহাদের বাধা সৃষ্টি করে, এবং অনেক দূরে বুনো সীম গাছের পিছনে শালতি অদৃশ্য; কালাচাঁদকে লোকে কোন রকমে তুলিল, অন্যধারে তাহার ঠেঁটি কড়ওয়ালারা ফেলিয়া দেয়, সে উহা পুনঃসংগ্রহ করে; একজন সান্ত্বনা দিয়া কহিল, 'কেঁদে কোন ফল হবে না, তুমি দুঃখের ছেলে, মাই-ছাড়া সন্তান, তুমি গেছ ওদের সঙ্গে...' সত্যই, কালাচাঁদের চোখে জল ছিল না, নাসা স্ফীত, ক্ষোভে মুখমণ্ডল কম্পমান; অন্তরে এক বাক্যের অহরহ পুনরাবৃত্তি শোনা যায়—'এখন', এবং মাঝে মাঝে একটি শ্লেটের মত সমতল বক্ষ ভাসিয়া উঠিয়া তাহার চক্ষুকে ঝাপসা করে, এই বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিয়া সাত দিব্যি কাটে, জুয়া আর খেলিবে না; তখন সেও যাত্রা দলে, জলখাবারের পয়সা দিয়া বাপের জন্যই—ঔষধ-পথ্যের সুরাহার নিমিত্ত—আনায় একশো তেঁতুল বিচির পড়তা, উহাই বাজী ধরিয়া খেলা হইত, একদিন চণ্ডী শাস্ত্রীর ঘর হইতে রসিক উঠিয়া আসিল, তাহাকে জুয়া হইতে টানিয়া অন্ধকার উঠানে যায়, বলে, 'বুক ছুঁয়ে দিব্যি কর, মনে রাখিস এখানে ভালবাসা আছে মানে ঠাকুর আছেন', ইদানীং সেই শ্লেটের মত সমতল বুকখানি, হৃদয় যেখানে, গম্ভীরভাবে পরিক্রমণরত! কালাচাঁদ, এখন, স্তিমিত সন্ধ্যার ম্লানকে ভীরু চোখে দেখিল।

খালের সুউচ্চ পাড় হইতে, নিম্নে, শ্যাম নৌকায় নির্ব্বিকার, চট আচ্ছাদনে যাহাকে দেখে, সে তাহার বাপ, ইহজীবনের কারণ, এবং সে নিজে সম্বন্ধ; চকিত হওয়ার শব্দ মধ্যে কালাচাঁদ আপন দীর্ঘশ্বাস শুনিয়াছে, ঘন ঘন রোমহর্ষে দেহ দুমড়াইয়া অস্থির, হুঙ্কার অথবা হিম তিক্ত হ্রেষাধ্বনি, করিতে মরিয়া; একারণ যে পঞ্চভৌতিক নির্জীব বিনিষ্কম্প স্তব্ধতা, বালককে বিকলাঙ্গ মূঢ় করে; অন্ধকার ইত্যাকার নিরেট যে স্পর্শ-সাপেক্ষ, অন্ধকার অনুভবে তাহার ইন্দ্রিয়ে বজ্রাঘাত হইয়াছে; এই স্থান হইতে গঙ্গার বিশাল শূন্যতাকে নিরীক্ষণ করিয়াই সে শীতকাতর, গঙ্গাবক্ষে সন্ধ্যা এখন কথঞ্চিত ধূসর মেদুর, ক্রমাগতই কৃষ্ণময়ী কচুরীপানা ভাসমান; গঙ্গার স্তোত্র তাহার জানা নাই; অবশ্য সম্পূর্ণ একটি পদ মাত্র ধীরে ধীরে আবৃত্তি করিয়া, নীচে পাড় বহিয়া নামে, লগী খুলিয়া কাছি আকর্ষণে গুণ টানিল, এবং আবার তাহার বাপ সাড়া পাইয়াছে কিম্বা নয় ইহা ঠিক দিতে নজর করিতেছিল, নৌকায় স্তূপীকৃত আঁধার। গঙ্গার মুখে নৌকা আসিতেই অল্প চক্র খাইল, কালাচাঁদের আপন ঠেঁটি যথাযথভাবে, খুলিয়া বাঁধিবার

কালে চোখে পড়িল, মুখ হইতে চট সরাইয়া তাহার বাপ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিল, এ দৃষ্টির নিকট অন্ধকার রৌদ্র, এবং উগ্রভাবে কাশিল; পিতা এক ঘোর দুঃস্বপ্ন, এবং সে অসহায়; এখন সে কোনক্রমে, লগী ঠেলিতে ঠেলিতে বলিল; 'ভাঙা মেলা, দোকানীরা নেই...কিছুটি' থমকাইয়া জোরে বলিল, 'নেই'; জলে শুধু লগীর শব্দ ব্যতীত এখানে নিথর, অনেক দূর হইতে ভাঙা ভাঙা কথা এবং মাঝি মাল্লার গানের কলি, সুরের আভাস, শৈত্য বহন করি আনে, গ্রাম রেখা কালো, আর যে আলো দেখা যায়। কালাচাঁদ বৈঠা ধরিল। বৈঠার আওয়াজে যে সে দুর্বল একথা বিশদ হইবার মধ্যেই, এক বিকট শব্দ তাহাকে আকর্ষণ করে, বদখত উল্লাস মথিত আওয়াজ, 'ফেরা নাও-ফেরা, বড় নৌকায় বাঁধ'—পিতার কথায় এতাবৎ নীরবতার মধ্যে বিশেষ সমঝ ছিল তাহা পুত্রের নিকট পরিষ্কার, পিতা যে ডাক্তারের কথা-পরামর্শ—'বলে, আর বাহাদুরি নয় টাকা দিয়ে, বড় নৌকায় নৌকা বাঁধ'—আর আর কথা, নিশ্চিত, সব শুনিয়াছে; কালাচাঁদ একদা গঙ্গার প্রতি চাহিল, অপরাধ, শরীরের মধ্যে বন্যবরাহ হইয়া উঠিল; আবার রূঢ় কণ্ঠস্বর, 'ফেরা নৌকা...টাকা কই দে টাকা...' কালাচাঁদ উত্তর করিল, 'খিদে বুঝি আমারও পাইনি' বলিয়া যত সম্ভব দ্রুত বৈঠা মারিতে লাগিল। পুনরায় শোনে, 'তুই কি মনে করেছিস এ্যাঁ হারামী আমায় মেরে ফেলতে চাস, দে আমায় এপাড়ে নামিয়ে, টাকা, টাকা দিয়ে কি করেছিস বল'—বিরক্ত আত্মম্ভরী কালাচাঁদ সদর্পে কহিল, 'ওটাকা তো রসকে আমায় দিয়েছে...তোমার কিসে' বলিয়া দুর্দ্দান্ত ক্ষমতায় বাহিতে লাগিল। রুগ্ন মরণাপন্ন পিতা, চট ফেলিয়া উঠিয়া কাশি চাপিয়া বলিল, 'দে শালা, হারামী টাকা না হলে তোকে লাথিয়ে' ইহাতে অপমানিত কালাচাঁদ, যে অপরাধ জর্জ্জরিত, ইতরের কণ্ঠে বলে 'ইঃ টাকা তোমার বাবাকেলে ধন কি না' সঙ্গে সঙ্গে তাহার বাপ কহিল, 'তবে রে শালা খানকির ছেলে, বেজম্মা'। কালাচাঁদ দাঁড়াইয়া উঠিয়া রাগে কম্পিত দেহে উত্তর দিল, 'ওঃ যত ওঁর জন্যে করা হয় বড় বাড় বেড়েছে না, ফের যদি মুখ আঁশটে করবে, তো, আমি দাঁড় ফেলে দেবো'—মর্ম্মবেদনায় উন্মত্ত পিতা নিজেকে সামলাইতে পারিল না, পুনরায় একই গাল পারিল, যাঁহাতক বলা, হিতাহিত/কাণ্ডজ্ঞান-রহিত বালক বৈঠা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া কহিল, 'মর'—পিতাও ক্রোধে অধীর, তৎক্ষণাৎ তাহাকে লাথি মারিতে গিয়া পা স্খলিত; নৌকার পাঠাতনে আছাড় খাইয়া পড়িল। নৌকা ত্রাহি ত্রাহি দোলায়মান, আর যে আকাশে বিদ্যুৎরেখা একত্ব বিকিরণ করে ও স্বদেশগত জাহাজের ভোঁ মন ছিঁড়িয়া বাজিয়া উঠে। কালাচাঁদ প্রস্তরীভূত, নৌকার অস্বাভাবিক কম্পন এখন, ক্রমে, আর নাই; কালাচাঁদ সমস্ত দিক মৃদু চোখে নিরীক্ষণরত, জাহাজের ভোঁ তাহার দেহে স্পন্দিত, উপলব্ধি করে সর্ব্বত্রেই পিতার আলেখ্য; গঙ্গার বক্ষে ঘূর্ণায়মান জলরাশি—এখানে সেখানে; মধ্যে এই শ্যাম-নৌকা, সম্মুখে পিতা একখানি হাত নৌকা ছাড়িয়া আছে, আর তিমিরাচ্ছন্ন, তমসাবৃত অন্ধকার! ক্রৌঞ্চ মিথুন অন্ধকার! জুতার অন্তঃস্থিত ব্যবধানের অন্ধকার।

গঙ্গাবক্ষে এহেন দুর্দ্দৈব সংঘটনে, বসুধার গৃহ ছাড়িয়া উর্ব্বরতা সাগর অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে; অংশ হইতে পূর্ণ, আব্রহ্ম ত্রিভুবন, সকলকিছু, শব্দহীন: সে একটি নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল, বক্ষে কপাট বন্ধন হস্ত, জ্যোতি প্রধান ত্বরিতেই, বন্ধন মুক্ত করত, মুখ অভিব্যক্তিময় মনে লয়, সে পার্শ্ববর্ত্তী দন্তাঘাতে অশরীরী শৃঙ্খল কাটিতেছে; ক্রমে, হস্ত সঞ্চালন করে, সে সন্তরণ দক্ষ; মুহূর্ত্তেই, দক্ষিণ পায়ের, আপন অঙ্গুলি দ্বারা, ভূমিলিখন আরম্ভ হয়, ক্ষণেকেই হস্তঅঙ্গুলি দ্বারা দ্রুত কি লিখিতে থাকে, আর কয়েক পল অন্তরে সে ব্যঞ্জনাক্ষর-বিরহিত শব্দ করিতে সমর্থ, অনন্তর বানান উচ্চারণ শোনা যায়, 'ঠাকুর'; সম্যক জ্ঞানদীপ্ত মনে উচ্চৈঃস্বরে, মস্তক আন্দোলন করত, তবু অভুক্ত আওয়াজ, 'ঠাকুর ঠাকুর ঠাকুর' বলিয়া উঠে, এই ডাকে ঘোর প্রতিধ্বনি হয়, এবং বুঝা যায়, শূন্যতা কোথাও নিপট, যাহার গাত্রে শব্দ আহত হইয়া লক্ষগুণ, সেখানে মৃত্তিকা আছে; কালাচাঁদ, ইহার পরক্ষণেই, এই আপশোষ করে, যে সর্ব্বত্রে পিতাপুত্র দেখিয়াছে অণুপরমাণুর পিতা আছে তাহার এ-কি বিড়ম্বনা! তাহার এই দশা, সে সর্ব্বনাশকে ডাকিয়াছে; পৃথিবীতে আর পাখী নাই, তারকার সান্নিধ্য কি ভয়ঙ্কর! সে শশব্যস্ত, বাপের কাছে গেল, দেখে, মুখ বহিয়া রক্তধারা, উদর গভীর, পাঁজরার মধ্যে মধ্যে কালো রেখা; বাপের মুখ সযত্নে মুছাইয়া দিয়া, তাহাকে জড়াইয়া স্বরিত আওয়াজে কহিল, 'বাবা আমাদের কি হবে?' বারম্বারই এ প্রশ্ন শোনা যায়; ক্রমে নিজেকে বিশ্বাস হইল পিণ্ডবৎ, অন্যদিকে রাত্রময়ী গঙ্গা, তাহার দেহ কোন এক অবলম্বন হইতে খসিয়া পড়িতেছে; পূর্ব্বাহ্নে দেখিয়াছিল বাপের একটি চোখ খোলা, এখন দেখিল উহা

পৈশাচিক বীভৎস, তথাপি সে পিতার বক্ষে, সৎসাহসে, কান পাতিল; হাতখানি তুলিয়া কানে দিল, আপন বক্ষে হস্ত স্থাপনা করিল; কাঠে, নৌকার, কান পাতিল, প্রতি বিন্দুতে, জলে স্পন্দন বিদ্যমান, শুধু এক স্থানে নাই; পিতা অনন্তের অংশ, নিঝুম; কটুবাক্যে কালাচাঁদের মুখ বিকৃত হইল, অশ্রু নাই; মুখ তুলিয়া বাপের ভৌতিক মুখপানে চাহিল; আচম্বিতে দাঁড়াইয়া তারস্বরে বলিল, 'বাবা বাবা কথা বল, কথা বল', পরে কহিল 'মৃত্যু অবধারিত মৃত্যু...মৃত্যু', আপন বয়স ভুলিয়াছে সে ভাঙ্গিয়া পড়িল, ক্রন্দন নাই, দেহ চমকায়; ওষ্ঠ দংশন ব্যতীত আর উপায় নাই; দম্ভ ভরে ঘোষণা করিল, 'নৌকা আমি ফেরাব আমি আমি আমি' হাত দিয়া জলরাশি, উন্মত্ত উন্মাদ, কাটাইতে কাটাইতে, দুর্জ্জয়, দুর্দ্ধর্ষ, ক্রমাগত পিতার প্রতি দৃষ্টিপাত করে; এ সময় স্মিতহাস্য ক্রমে মত্ত হস্তীর হুঙ্কার হাস্যে দিক সমূহ ভয়ার্ত্ত; ভয়ঙ্কর ভাবে, যদিচ অভুক্ত, হাসিতে হাসিতে, জল হইতে হাত তুলিয়া পিতার দেহের চারিদিকে পরিক্রমণ করে। এখন, বাপের পৈশাচিক মুখমণ্ডল, একটি চক্ষু যাহার খোলা, হাওয়া দাড়ি অল্প কম্পিত, দেখিয়া সে অত্যুগ্র ক্ষিপ্ত হয়, যে কোন কিছু বিবেচনা না করিয়া ঝটিতি চোখের প্রতি চাহিয়া রুষ্ট কণ্ঠে কহিল, 'আমাকে ভয় দেখিও না, ভয়, বন্ধ করো চোখ' বলছি এ কথার সঙ্গে, বাপের চোখে সে ঘুষি বসাইয়া দিল, মৃতের মুখ উন্মুক্ত, খানিক রক্ত বাহির হয়, এবং যুগপৎ, বেচারীবালক, কাঁদিয়া উঠিল; কাঁদিতে কাঁদিতে সে অবশ, একদা সে ঘুমাইয়া পড়িল। কত ক্ষণিক, সে যে ঘুমাইতেছে তাহা সে বুঝে নাই, সহসা কিসে হস্তস্পর্শে জাগিয়া উঠিল, দেখিল নৌকার বাহিরে কচুরীপানায় তাহার হাত, চারিদিকে ঘূর্ণায়মান জলরাশি, সভয়ে বাপের দিকে তাকাইল, মনে হইল গাত্র যদি লেহন করে, হয়ত পুনরায়...এবং সে জিহ্বা প্রসারিত করি প্রস্তুত; সম্ভবত, মৃত পিতার গাত্রে জিহ্বা স্পর্শ করিল কিন্তু কচুরীপানার যাত্রা তাহাকে অন্যমনস্ক করে, এখন ভাটা, অর্থাৎ আর উপায় নাই। কখন যে সে জানু পাতিয়া বসিয়াছে সে জানে না; অবিরত গতির মধ্যে যাহা কালের বিচিত্র দেহ, ছোট নৌকায় সে করজোড় করে, ডাকিল, 'দীনবন্ধু! এ আমার পাপ!' হঠাৎ মনে হয় 'আমি পালা গাহিতেছি' ফলে আপনকার প্রতিবিম্ব দেখা মানসে চিত্তচঞ্চল, এবং তবে দর্শনে হয়ত বলিয়া উঠে, 'আঃ আমার প্রতিবিম্ব—পীরিত নিয়ে আমি নয়-ছয় করেছি ঠাকুর ঠাকুর এখন আমার কেমন ভাল লাগছে ঠাকুর আমি হেসেছি আমি ক্লান্ত হয়েছি ক্রন্দনে আমি ক্লান্ত...আমায় দুঃখ দাও নাথ, দুঃখ যা সুন্দর কেননা দুঃখই একমাত্র সৌন্দর্য্য! সব সুখ আমি গঙ্গায় আছি' পরক্ষণে উঠিয়া বালক কৃষ্ণনাম করিল, ধীরভাবে কিঞ্চিৎ গঙ্গোদক তুলিয়া তারকব্রহ্ম নাম করিতে লাগিল!...এই সে বলিতে চাহিল, 'পৃথিবীতে আবার যদি আসি; আমি আসবোই...ভালবাসা দিও—দেখ আমার ভালবাসা ধোবা ঘরে যাবে না'...এবং মনস্থ করিল পিতাকে আলিঙ্গন অবস্থায় মরিবে। ওষ্ঠ কাঁপিল 'যে ভালবাসা...'

সহসা জাহাজের বাঁশীর শব্দ, ক্রমে চক্ষু মেলিয়া চাহিল; সূর্য্য দিক্‌নির্ণয় করে, ভাঙা ছেঁড়া কুয়াশা, জলে নীলারুণ লাবণ্য এতেক নয়ন অভিরাম জলোচ্ছ্বাস বর্ণিকাভঙ্গ ইতঃপূর্ব্বে কখনও দেখে নাই, কিন্তু কে যেন তাহার ভিতরে থাকিয়া পালাইতে চাহে; সে দৌড়াইতে গিয়া স্থির বর্ণচ্ছটা দেখিতে দেখিতে তাহার শিরঘূর্ণন আরম্ভ হইল, পিতার দিকে একবার চাহিল, উত্তাল তরঙ্গবর্ণে নীলারুণ যাহা, সেখানে ঝাঁপাইয়া পড়িল। বালক দুই এক হস্তক্ষেপ করিয়া ঘুরিয়া নৌকা অভিমুখে ঝটিতি অগ্রসর হয়, এ কারণ যে তাহার মনে হয় 'আমার পিতাকে ফেলিয়া আমি পলাইতেছি' এহেন আপৎকালে সে নিজেকে ধিক্কার দিতে সমর্থ হইল, সত্বর সে নৌকার গাত্র ধরিল, জাহাজের ঢেউ-এ নৌকা প্রায় খাড়া এক চক্ষু মুক্ত পিতাকে দেখিল। তথাপি জলোচ্ছ্বাসে চোখ সে চাহিতে পারিল না, হাত নৌকা হইতে পৃথক হইল। প্রাণপণ করিল, যতবার কাছি ধরিতে যায় নৌকা মায়া ধরিয়া সরিয়া যাইতে লাগিল।

বর্ণোচ্ছ্বাসের মধ্যে কালাচাঁদ ডাকিল 'বাবা বাবা' পরে ডাকিল 'হে মাধব প্রাণ মাধব মন গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম বল!' যে বাদল দিনের বড় সোহাগের খেলা মাত্র, এ তুমুল বর্ণোচ্ছ্বাসে নিশ্চিত নিশ্চিহ্ন; পিতার নৌকা ক্রমাগত সাগর অভিমুখে যায়।


সন্ন্যাসিনীর পমেটম

লেখক শ্রীকমলকুমার মজুমদারের 'সুহাসিনীর পমেটম' একটি বহুবিতর্কিত রচনা। ওঁর এই লেখাটির প্রথম মুদ্রণ হয় কৃত্তিবাস পত্রিকায়। প্রয়াত কমলকুমার মজুমদারের লিখিত 'সুহাসিনীর পমেটম' এখন পুস্তক আকারে প্রকাশিত হল। লেখাটির ভাষা গাম্ভীর্য এবং বাস্তবতা সবকিছু মিলিয়েই এর বৈচিত্র্য। তাই পাঠকমহল আবার একবার ভিন্নভাবের সমালোচক হতে পারবেন।

এখানে প্রকাশ থাক...লেখকের অন্তরঙ্গ ভক্তদের মধ্যে শুভ (মুখোপাধ্যায়) তাঁর পরম স্নেহাস্পদ, তাই তাঁর মনানুসরণ করেই শুভকে বইটি উৎসর্গ করা হল।

দয়াময়ী মজুমদার

সুহা অর্থাৎ সুহাসিনী, উদ্ভিন্না যুবতী, শকুন্তলার চেয়েও সুন্দরী...
লখাই, ব্রাহ্মণের ঔরসে কামিন্‌-রমণীর বালক পুত্র...
অক্ষয়, সুহাসিনীর বাবা, পোস্টমাস্টার, 'সৌন্দর্য...ও বাবা, রাত না পোহাতেই কুইনিন্‌...
মোহন একাদশী, পিওন, 'উড়াও বিজয় পতাকা, জ[illegible]শু বলে', জ্যোৎস্নায় সে পরী দেখে...
লক্ষ্মণ চাটুজ্যে, দুই পুত্রের কাঁধে ভর দিয়ে, মাতাল, 'চলুক্‌ চলুক্‌ ঘুরে ফিরে, বা বেটি চুম্‌কীখটি...ঘুরে ফিররর্‌রে'...
লখাইর মা, তখনও ভগবানের ওপর লখাইয়ের রাগ যায়নি, কারণ যে ভগবান
তার মাকে অমন কুৎসিত করে গড়েছেন, বাঁকা মুখের একটি গাল চম্‌কায়...

সে আপনকার অতীব শ্রীযুক্ত মুখমণ্ডলের খাসা সীম বীজ নাসার বেসর সেখানে ঝুটাপান্না—মনোলোভা পান্নার ইহকালের অচীন সুদীর্ঘতা বহু সন্তরণে অতিক্রম করত আসিয়া স্থির মূর্ত্ত, উহাতেই সোমনা অঙ্গুলি প্রদান করে এবং এই অঙ্গুলিতেও নির্ঘাত, অবশ্যই, তাহার, সুহার—সুহাসিনীর দগ্ধ তীক্ষ্ণ রাত্র যাহা মেঘগর্জনের উন্মাদ দাপট ও যুগপৎ ভেককুল আর ঝিঁঝির পরম্পরা ডাক মিশ্রিত ত্রাহি করা দুর্যোগ ফলে, এ কারণে, এহেন ঘোরঘটা যামিনীর মাড়ি পীড়নজনিত যখন এমনও যে উহার, বালিকার, ডাগর কালীয়া চতুর দেহ সুতপ্ত—এখন, যদ্যপি সে অল্পবয়সী তত্রাচ তাহার শরীর বৈভব সুকুমার লাল, পুরুষ অভিমানী—আরও যে, এই অবয়ব যাহার কক্ষস্থ লণ্ঠনের হেতু দশাসই রুদ্র মখমল পট্টছায়া, মশারী তবু, দর্শনে প্রকৃতই বিশেষ মীনগন্ধবৈধ বাসনায় উচ্ছ্বসিত হওয়া স্বভাবত যে সম্ভব, যে তথাপিও কোনক্রমেই বুঝে না—উপরন্তু, অথচ এই হয় যে, পার্শ্ববর্ত্তী ভাঁড়ার ঘরের, যাবতীয় কিছুর মধ্য হইতে ছোটলোক, নিম্নশ্রেণীর, মাথার কিটকিটে সুলভ বাসের সহিত শিকে-তোলা হাঁড়িতে জাওলা মাছের কচিৎ চাঞ্চল্য প্রসূত ঘর্মাক্ত তৃপ্তিদায়িনী রতিসুখ আপ্লুত শব্দ উত্থিত হয়, তৎব্যতিরেকেও; তাই নিজেকে—সে—ভাবে দংশিত যন্ত্রণায় মৃদুহাস্যে জড়াইয়া শুইবার প্রোষিতভর্ত্তিকা ঘুমাইবার ঔৎসুক্যে জিহ্বাও পালট করে নাই, উহা সরসিত নহে, কেননা সে হয় ম্লান, সে বড় অসহায়; সে এই অমানিশীথিনীতে সর্বক্ষণব্যাপী তিক্ত নিম্ব গন্ধ পাইয়াছে, তাহার পেলব গাত্রময় মারিগুটিকার বেদনা তাহাকেই আপন নৈকট্য হইতে অপসারিত করে—পুনরায় নিম্বশাখা পত্রযুক্ত ব্যজনে সে কাতর আর্ত্ত বেচারী; ইহা সত্য যে, বেচারীর রাত্র খাক্ হইয়াছিল অসম্ভব রুক্ষ, প্রমত্ত, হিম—ঐ রাত্রের বিকার বিষে তাহার অঙ্গুলিশীর্ষ পাংশুবর্ণ, মুখে সূতিকা রোগের মালিন্য, এখন এই অঙ্গুলি দ্বারা সে পান্না বসান নাকছাবি ঘুরাইতে দারুণ সবিশেষ অন্যমনস্কা; হইলেও ইতঃমধ্যে তত্রাচ একদা পলকেই আরবার দেখে, দেখিল সে আপনকার সাতিশয় দিব্য অভিরাম মনোযাদু বাবু লাবণ্যযুক্ত ছবিলা সৌন্দর্য্য লইয়া—কোথাও বালি খসা, কভু পলেস্তরায় ফাটলের গভীর কৃষ্ণময়ী রেখার প্রচার আবার চকিতেই অন্তর্দ্ধান, আরও যে কখনও কখনও পেরেকে ঠোকা ঢল গর্ত্ত ছিদ্রপূর্ণ কালচে ড্যাম্প ধরা দেওয়ালের সম্মুখেই দণ্ডায়মানা পশ্চিমের গৈরিক সোনা আলো, উত্তরায়ণ জন্য, তির্য্যক ভাবে পেঁপেপাতা ভেদে কিয়ৎ অংশে সবুজতার কম্পন হিলমিল তাহার মুখমণ্ডলে আর ঠিক পাশেই প্রসিদ্ধ শিল্পীর, রবিবর্মাকৃত বিখ্যাত 'শকুন্তলা' এই চিত্র অত্যন্ত নিপুণ শ্রীসম্পন্ন এবং সুহার সামনেই কিছু দূরে, দরজার নিকটে লখাই, তখন যাহার ছোট দেহখানি বাঁকিয়া চুরিয়া মোচড়াইয়া আধা-চরকি একশা, উল্লাস আলোড়নে সম্পূর্ণরূপে বেসামাল হয়ত সে আপন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হাত দুইটি হাঁটুর কাছেই উরুদ্বয়ের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করত ঘর্ষণ করে—দেহ আশপাশে দোলায়মান তাহা ছাড়াও যে, সে এমত সময় বারম্বার আপন দাঁত দ্বারা অশরীরী কিছুকে ছিঁড়িয়া খণ্ডকৃত করিতে প্রগল্ভ এবং ইহার সহিত হঠাৎ আচম্বিতে, সুহাকে দেখিয়া দুলিতেছে যখন, তদবস্থাতেই কর্ণপটাহবিদারণকারী পেচকতুল্য নিনাদে এক ভয়াল রাত্র সৃজন করিল আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নিমেষেই নিজেই অল্প নিমিত্তের জন্য থ, একা, অদ্ভুত খালি, সেই তীব্র কাঁটা ক্ষুরধ্বনি সৌন্দর্য্যশালিনীকে এমত রোমাঞ্চিত করে যে সে সময় সম্বন্ধ খোয়াইয়া সঙ্গীহীন, অনন্তর উল্লাসকারীর বয়সসুলভ নাকটানার শব্দ হয়, সুহা ফিরিয়া আসে, এখন স্থির; লখাই যে তখন সম্বিৎচেতন যে অতি ছেলেমানুষ, বলিয়াছিল "মাইরি মায়ের দিব্যি তুমি ভার্‌রী সুন্দর" পরক্ষণেই নিজ বুদ্ধিতে শকুন্তলার ছবির নিকট সে উপস্থিত, কে-বেশী-সুন্দর তুলনার জন্য সুহা সেখানেই, বালক ছবিখানির উচ্চতাহেতু আপনার মুখখানি তুলিয়া খুব একহারা নিবিষ্টতায় উহা পর্য্যবেক্ষণের শেষে সুহাকে ক্ষণিক অবলোকনে নিরাকার সহসা একলাফে সুহার বাবার তক্তাপোষে উঠে, এইখান হইতে ক্ষিপ্র নিরীক্ষণে অতঃপর কহিল, "ঠিক সত্যি সত্যি সত্যি" এই সময় এমন হইল যে, একটি টিকটিকি ডাকিয়া উহার সত্যকে মান্য করে, তাই লখাই অপার খুসী বলিল, "দেক্‌লে দেক্‌লে, এখন একটা গান

বল বল” অন্তত ইত্যাকার অনুরোধ নিশ্চয়ই আপাতত উদ্ভট, আপাতভাবে অর্থহীন, কিন্তু আদতে উহা গুরুত্বপূর্ণ সুবিচারিত, নিঃসন্দেহে একান্তই সময় উপযোগী ফলে এ কারণ সৌন্দর্য্যবতী বালিকার ওষ্ঠে সূক্ষ্ম কম্পন, নাসা স্ফীত, ত্রমে ধীরে আস্তে আস্তে তাহারই উন্নত সৌখীন গ্রীবা শিল্পিসমাজ আরাধিত রসিকজন সমাদৃত যথার্থ সুলিখিত বিচিত্র বক্ররেখা, যাহা অদৃশ্য, ধরিয়া উঠিয়া জাগ্রত, লখাইএর বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি, লখাইএর প্রশংসা তাহাকে এমত এক গাম্ভীর্য্য মধ্যে আনীত করে যে সেখানে যেখানে সে সুহা চিরকাল—যেখানে আসন্ন সন্ধ্যার বর্ণনাভেদ করত সে যাইতে সক্ষম, যেখানে তাহার সুচারু কবরীর চম্পকদাম চির আয়ুষ্মতী তবু, এহেন মনোবৃত্তির অন্তরে সুহা যখন আবিষ্ট তখনও আপন কণ্ঠে নিজ পিতার গলার আওয়াজে, লখাইএর তক্তাপোষে ওঠার অপছন্দে, এই কথা যে “এই শুয়ার বামুনের ঔরসে, নাব” বাজিয়াছিল, এই নোংরা বাক্যস্ফূর্তি তাহার নিজের কোনক্রমেই নয়, অবশ্য ইহাও সত্য এরূপ উক্তি সঠিক অসাধু হয়ত না বোধ হইলেও, এই ধরণের বচনের বিবেচনার দূরে অন্য কোথাও তাহার বাস, সে নিজে লখাইকে, যদিও সে, লখাই, কখনও ইতঃপূর্বে এরূপ সাহস করে নাই এবং যদিচ ইহা গর্হিত এই তক্তাপোষে উঠা তথাপি কিছু বলিতে পারে নাই; প্রথমত উহা তাহার বাবার, দ্বিতীয় তক্তাপোষের একধারে নানারূপ ঔষধের শিশি-বেহালার পাচন ইত্যাদির পাশেই শ্রীমদ্ভাগবত আছেন, জপমালা আছেন এই কারণে লখাইএর এতখানি সাহস ঠিক নয়, তাই ঐ ধমক, এবং ঐ নামে সুহার বাবা অক্ষয় মাস্টারকে সাদরে ডাকিতেও শোনা যায় কেননা লখাইএর জন্মদোষ আছে যে সে ব্রাহ্মণের ঔরসজাত আর ইহা সবিশেষে আত্মপ্রসাদ লাভ নিমিত্তই উহার মা নিজেই যখন সর্ব্বপ্রথম দূর মেদিনীপুর হইতে এখানে চব্বিশ পরগণায় ধান কাটিতে কামিন্‌ রূপে আসে তখন আর আর কামিনদের আপন পুত্র লখাইকে স্বীয় মুখদ্বারা নির্দেশ করত বলে “উটি আমার বামভনের ঔঅসে” সকলেই এমত সাদা জবানীতে হাসিতে গিয়া প্রথমে কিয়ৎ পরিমাণে হতবাক পরক্ষণে কাস্তে ফেলিয়া হাস্যে ভাঙ্গিয়া পড়ে, তাহাদের মলিন বস্ত্রের রেখা কতরূপ, অদ্যও তাহাদের হাস্যধ্বনিতে দ্বিপ্রহরের হাওয়া আছে—ইহাতে লখাইএর মা খুবই অবাক—মুখ কোন তিক্ত স্বাদে নিঙড়ান উপরন্তু ঠোঁট দুটি বিভক্ত অবাক হওয়ত হাস্যময়ীদের প্রতি নিরীক্ষণে যেন, উহারা জল, স্থল বা কেবল মাত্র দূরত্ব তাহা বুঝে নাই, অতঃপর তাহার চকিত নাক টানার শব্দ শোনা যায়, এবং ঘাড় বাঁকাইয়া অদূরে ধান্যস্তূপের সামনে ছেঁড়া নেতাকাঁথায়—যাহার কিছু কিছু হাওয়ায় উদ্‌ভ্রান্ত, শায়িত শিশু লখাই যে এখনও তামাটে লাল—দেখে; লখাইএর উদ্ধৃত বাহু আর তারও পিছনে একপাশে হিমের আকাশ, অন্যত্রে কামিনরা একে অন্যের গা টেপাটেপি করে, একের উদ্বেলতায় অন্যের ছল-বিরক্তি খেলিয়া উঠে “ওলো থাম আ মলো যা” লখাইয়ের মা যাহার হস্তধৃত কাস্তে হইতে কিছু চেকনাই উজ্জ্বলতা আপনকার চোখে ফিরে, বুঝিতে পারে নাই যে, কেন উহারা “বামহ্নণের ঔনসে” বলি হাসিতেছিল, সে নিজেও অল্পই হাসিয়াছিল অথবা হাসিতে চেষ্টা পায়, সে ভাত-ধরার গন্ধ টের পায় নাই, হয়ত সে নির্বোধ, হয়ত সে সরল, ত্বরিতে আপনার অজানিতেই ধৃষ্ট পদক্ষেপে দাম্ভিকভাবে শায়িত পুত্রের নিকট গিয়া তাহাকে তুলিয়া, স্বীয় বক্ষ অনাবৃত হইল, মাই দিতে থাকে—এমত সময়ে সম্মুখবর্তিনীদের দিকে সে চোখের পাতা উপর্য্যুপরি ফেলিতে দেখিতে তাকাইয়াছিল, গর্বে তাহার দেহ স্ফীত কেননা মনে মনে বারম্বার হয়ত বলে “ইটি ব্রামভণের ঔরসে ত বটেই—আমার গুরুর কৃপায়” অতএব, ইহা সিদ্ধান্ত সত্য হয় যে, সে পৃথিবীর মৃত্তিকায় ডাগর বৈ অন্য নহে এবং তখন শীতকালীন বিবিধ পক্ষীদল তাহার সম্মুখে থমকাইয়া সত্বরই ঐ আবৃত্তির দুর্দ্ধর্ষ পদনিচয় লইয়া উড়িয়া যায়; অধুনা এই ঘরে তক্তাপোষের ভয়ঙ্কর বাস্তবতায় অর্থাৎ লখাই—অবশ্য লখাই এ বাড়ীর সর্বত্রেই অতি সহজ সাধারণ এমন হয় যে অক্ষয় মাস্টার সর্বপ্রথম অনুমোদন করত বলে “যা যা বলে বালক নারায়ণ...তাছাড়া কলকাতায় কত বাবু ঝিয়ের হাতে জল খাচ্ছে...পৈতে গলায় লোক পেলে বামুন রাখছে...সে হয়ত আগেতে রাঁড়ের বামুন ছিল...লোক, ঝাঁটা মার...ব্রাহ্মণ যা করবে তাই মানতে হবে...নে নে তিনবার শিব শিব বললে অজামিল উদ্ধার হয় শিব শিব বলে তুলুক...বেল পাতা কচি দেখে বুঝলি...যেই তুলুক গঙ্গাজল দিয়ে আমায় নিতে ত হবেই” ফলে পিতার যুক্তিতে খুসী মনে, সুহা লখাইকে লইয়া নিকটেই ছোট মাঠটিতে যায়, যখন সে লখাইকে দুর্বা চিনাইতে বলে “দুৎ ও গুনো মুথো, দুব্বো দুব্বো” এমত সময় দুর্লভ ময়রার কাকী, তেলকলেখা, হাতে কুড়োজালি, ইহারা নাকি রেলেতি ময়রা—যে নাপিত মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের সময়

আনীত হয়, নাপিত শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রণাম করিয়া ক্ষৌর কার্য্য মানসে প্রস্তুত, সমবেত জনমণ্ডলী গঙ্গাতীরে বেদনায় ঝিম্, একমাত্র প্রভুই মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছিলেন, নাপিত ক্ষুর তুলিবে কি সে অবশ্য বিবর্ণ...তথাপি কর্ত্তিত কুন্তল হাওয়ায় উড়িল, ভক্তজন শ্রদ্ধায় তৎসমুদয় আহরণ করত গঙ্গা মৃত্তিকায় প্রোথিত করলেন—এখানেই কেশ সমাধি—নাপিত আপনার অস্ত্র সকল গঙ্গায় নিঃক্ষেপ করিল...প্রভুর শরণাগত...ইহার এই সূত্রে শুনায়, আপন ব্যবসা পরিত্যাগ করত আত্মীয়জন রেলেতি ময়রা হয়...দুর্লভের কাকীকে সুহা দেখিতে পায় নাই কেননা সে তখন, বলিতেছিল "ভাল দেখে সুন্দর সুন্দর দেখে দুব্বো তোল দুব্বো আস্তে তুলতে হয় দুৎ...সবুজ দেখে...ঠিক কৃষ্ণের গায়ের...নবদুর্ব্বাদলশ্যাম...সুন্দর দেখে দেখে..." এই বাক্যধারা শ্রবণে লখাই বিস্ময়ে মাঠের দিকে তাকাইল, ঘাসের মধ্যেও এত সুন্দর আছে এ সত্য ভাবিতে সে কেমন ভীত. পরক্ষণেই হাসিল; ঘাসে শুইতে আরাম আছে—কিন্তু তাহা সুন্দর, আদর-চাহনিতে বিস্তৃত ঘাসের প্রতি যখন চাহিতে প্রয়াস পায়, তখনই শুনিল "গোবিন্দ গোবিন্দ" পরে সে দৃষ্টিপাত করে, দেখে, দুর্লভের কাকী, ভাবে ঢলিয়া পড়িতেছে, বলে—"আহা কি অমৃত! সাধে বলে জাত! জন্মজন্মান্তরের সুকৃতি চাই তবেই বামুন ঘরে জন্ম! নবদুর্ব্বাদলশ্যাম-আমার কৃষ্ণের গা, ছোঁড়া তোল তোল...তা হ্যাঁ বামুনের মেয়ে তুমি নোংরা বুঝি! তা আর কাউকে পেলে না ওকে দিয়ে...শেষটায়"...সুহা ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়াছিল, কহিল "ওতে কি দোষ...' দুর্লভের কাকী বলিল "দোষ আর কি মা আচারে বিচারে...তোমাদের ঘরে দামোদর (শালগ্রাম) আছেন" বলিয়া মাথায় হাত স্পর্শ করে; সুহা রূঢ় ভাবে উত্তর করিল "আমার বাবাকে বলগে...বামুনকে আর আচারবিচার শিখতে হবে..." পরে লখাইকে কহিল "নে নে তুই তোল্ না—বোস্টম দেখে যে তোর ভাব লাগল" দুর্লভের কাকী বিড় বিড় করিয়া কহিল "ও বাবা! ঘাট হয়েছে" তাহাকে আর দেখা গেল না, লখাই পুনরায় ঘাসের সৌন্দর্য্য দেখিল—এই বাস্তবতায় সুহা নিজ গাম্ভীর্য্য হইতে বিচ্যুত নহে, অনৈসর্গিক বিমোহন তাহার চারিপাশে বিন্দু হইতে বিশাল অবকাশে স্থায়ী, তাই সেই মুহূর্তে আপনার সহিত কোন যোগসূত্র ছিল না, তথাপি মনে পড়ে সে কথা বলিয়া থাকিবে এবং তাহা ছাড়া এ সময় দরজা দিয়া দেখা যায় তাহারই পাতিহাঁসগুলির ভারাক্রান্ত দেহে প্রত্যাগমন—ইহারা ক্ষুধার্ত্ত একারণে চঞ্চু উন্মুক্ত কণ্ঠের ডাক শ্রুত হয়; মুখগহ্বর-বিবরের অন্ধকার গোচরীভূত প্রত্যক্ষ সাপেক্ষ; তদ্দৃষ্টে অর্থাৎ এজমালী আবরণ অন্ধকার যাহা ত্রিভুবনে পরিব্যাপ্ত, সুহা সাক্ষাৎ করে—যাহার গর্ভ হইতে ময়ূরপঙ্খী স্বয়ংজাত হওয়ত কখনও নীলহ্রদে এবার স্বচ্ছ করতোয়া কভু লবণাক্ত গৈরিক পাপহারিণী গঙ্গায় কখনও বা সপ্ত সমুদ্রে ভ্রাম্যমাণ, অবশ্য আরও যে তদ্দৃষ্টে আপনার উদ্ধত বক্ষের আঁচল সুবিন্যস্ত করিতে যত্নশীল, উপরন্তু ইহাও সত্য যে লখাইএর অনুরোধে অতএব—সুহা আপনকার ডালিম ওষ্ঠ সঞ্চালনে, অসম্ভব ধীরতায় গীত নির্ব্বাচনে একাগ্র সর্ব্বপ্রথমে সুন্দর গীত 'চাঁদ ও চকোরে অধরে অধরে' ঝটিতিই অন্য 'কেমনে হৃদয় ধরি না হেরে মাধব মাধুরী" এই গান অতীব সুখদায়িনী, গীত গায়কি ছন্দে 'না-হেরে'-এর স্থানে 'নান্ না হেরে' হইবে. ইহা মিশ্র নট-বেহাগ; সম্মুখে, তক্তপোষে, হয় এই জায়গায় অবাধে উঠিবার স্বাধীনতায় অথবা যথার্থই এতেক সৌন্দর্য্য নৈকট্যে লখাই অনেকটা নৃত্যরত, চক্ষুর্দ্বয় অর্দ্ধউন্মীলিত, এখন সুহাসিনীর গীত শুনিতেই তাহার অঙ্গ শরীর কেমন করিয়া উঠে আর তখনই কোন কিছুকে কামড়াইতে অত্যুগ্র আবেগ আসিল এ কারণ হঠাৎ সে লাফ দিয়া মেজেতে নামিয়াই ইঁদুর-ছুটে গিয়ে সুহাকে জড়াইয়া ধরে—একদা তাহার হস্তধারণ করত ইহারই উল্টা পিঠে আপন মুখ স্থাপনের পরক্ষণেই কুম্ভপূরণের বালখিল্য শব্দ করে, অনন্তর এতাদৃশ শব্দ কোমরের কাছেও সে করিয়াছিল; বালক-স্বভাব-অভিব্যঞ্জনায় সুহাসিনী যারপরনাই প্রীত, স্ফীত, মথিত, জীর্ণ, খুসী আহ্লাদিত আনন্দিত পুলকবিহ্বল সম্মোহিত স্ফুরদবালকদম্ব-বিশেষ করিয়া এই হেতু যে ঠিক গীত গাহিবার পূর্ব্বে যেক্ষণে সে নিপট সমাগত সন্ধ্যার বর্ণনা ভেদ গাম্ভীর্য্যের অন্তরীক্ষে চিরকালীন তখন সে কথা বলে—এ কথায় সে জানিতে চাহে যে সে কি পর্য্যন্ত সুন্দর—আশ্চর্য্য তাহার এইরূপ প্রশ্নে ক্রমে ইহাই প্রতীত যে সে অনেক রূপবতী শকুন্তলাকে সৌন্দর্য্যে পরাজিত করিবার কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত অর্থাৎ জানা-মানুষদের তুলনায় সে কত সুন্দর!—তথা এই পৃথিবীতে, যেখানে পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করে, ভূমিষ্ঠ হয়, সেখানে প্রিয়জনের চিঠির জন্য লোকে পত্রমর্ম্মরে চমকিত, অশ্রু সম্বরণ করত নিঃশ্বাস লয়—এখানে সে কত কত সুন্দর কেননা তাহার সৌন্দর্য্য লাভের মধ্যে সেদিন,

নিজ অসামান্য সৌন্দর্য্য লইয়া সে যখন ছেঁড়া-সেলাই নিমিত্ত ছুঁচে সুতা পরাইবার জন্য একাগ্র—কোলে পিতার ছিন্ন পুনঃ পুনঃ সেলাইরেখা যুক্ত সার্ট-এই সময় জং-একাদশী, যোহন একাদশী, দরজার সামনে বারান্দায় একটি পা রাখিয়া চুপ, সুহা কিছুক্ষণ ধরিয়া উহার গান শুনিলেও অন্যমনস্ক হয় নাই, তথাপি 'কোন বিদেশিনী মন চুরি'...এই গীতে, ইত্যাকার অনেক গান একটি ধ্যেয় নিশ্চিত আশার বিশেষ রূপ, তাই ইদানীং হয়ত অনেকেরই, অক্ষয় মাস্টারও অবশ্যই, চিন্তার কারণ, অক্ষয় মাস্টারকে সত্যই ভাবিত করে, বলিয়াছে "ব্যাটা মরছে পেনসেনের বয়স হতে যায়...পাগল না হয়...কেউ গুণ ফুণ...ছি ছি আগে ব্যাটা যীশুসঙ্গীত গাইতিস এখন পীরিত..." ইহাতে সুহা অন্যমনে উত্তর দিয়াছে "এ তবু ঢের ভাল" তুমি চুপ করে ঘুমোও না...যীশু সঙ্গীত গাইলে ত কেরে কেরে করে উঠবে খনে' এখনি ত মুখ খারাপ সুরু হবে"—অক্ষয় মাস্টার ঈষৎ জ্বরের কাতর গোঙানি শুনাইয়া জবাব দিল "করবে না ত কি শালা কানের তালা ফাটিয়ে দিত না" কতদিন, প্রায়ই, যখন, যোহন একাদশীর উদাত্ত কণ্ঠস্বর শোনা গিয়াছে তখন কালাজ্বরগ্রস্ত অক্ষয় মাস্টার আপন মশারী হইতে সর্ব্ব প্রথমে কন্যা সুহাকে কটু উক্তি করিয়াছে এ কারণে যে কবে যেন সুহা বলিয়াছিল "জং একাদশীর গলা ঠিক যাত্রাওয়ালাদের মতন" অবশ্য এই বক্তব্য নিশ্চয়ই বিশ্বাস কোন ক্রমেই সে করে না, কবে যে এ-হেন মন্তব্য করে ইহা তাহার মনেও পড়ে না, যদি বা বলে, তবে উহা শুধুমাত্র বাপকে জব্দ করিবার জন্যই, ফলে এখন কর্কশ স্বরে "হতচ্ছাড়ি পোড়ারমুখী" কোথাও কেবল কাগজ-জোড়া মশারী—কেননা সেলাই-যুত আর নাই অথবা হাতে সময় নাই—ভেদে পোড়া কেরাসিন গন্ধ মিশ্রিত হইয়া সারাদিনের পরিশ্রমান্তের ঘুমটুকু বিনষ্ট বটে করে এবং পরক্ষণেই যোহন একাদশীর উদ্দেশ্যে "এই শালা থামবি কিনা" তীব্র সুউচ্চ বিরক্তি শোনা যায়, যাহাতে ভাব বেসামাল গীতের "আলোক নিরঞ্জন করি আগমন" পর্দ্দা অসম্ভব নিপট যারপরনাই গাঢ় হয়, কিন্তু অনুপ্রাণিত এই গীত থামিবার নহে, পুনঃ "এই শালা এই শাললা" সুর স্রোত ছাপাইয়া অনেক উদ্ধত স্বরে কিয়দংশে গীতকে বিকৃত করে, কিন্তু গীত থামে না, ইতিমধ্যে অক্ষয় মাস্টার মশারী হইতে বাহির হইয়া খড়মে পা দিতেই বিশেষ ক্ষমতাবান, ঝটিতি জানালার গরাদ ধরিল বাহিরে খানিক আঁধার, শুক্লপক্ষে ঈষৎ আলো থাকে, ঝোপঝাড় ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা—যে রাস্তাকে সুহার একদা যথার্থ রাস্তা বলি মনে হওয়াতে অজানিত ভাবনা সঙ্কেতে সে যন্ত্রণা-বিহ্বল, দেখিয়াছিল,—তখন সে কচুগাছ কাটে, সহসা গাড়ীর-পা-দানির উপর ক্রমাগত পদাঘাতের ও মুখ নিঃসৃত সাবধানজনক শব্দে সুহা কর্ত্তিত কচু গাছ হস্তে, উন্মুখ, এমত সময়, অদূরে ঘোড়া কাহাদের বন্ধন ছিঁড়িয়া যাহার মুখখানি পার্ব্বত্য রজনীকে অনবরত প্রহার পরতন্ত্র-কেশরে ফেনাইত তরঙ্গ রেখা, এই ঘোটকের বামে মুরদমিয়া—ছোট রেলের ইঞ্জিন ড্রাইভার, তাহার দক্ষিণ হস্ত কেশরধৃত, বাম স্কন্ধে গামছা, ইতিমধ্যে অল্প ছুটন্ত পাট্টা শরীর খানিক বাঁকা, অন্যধারে আর একজন ইহার হস্ত অশ্বের মুখ সংলগ্ন চোখের ঠুলির সরঞ্জাম ধরা সেও ছুটে, ইহারা সকলেই ঘোড়াকে বাগ মানাইতে, ভাঙাইতে একমন, যখন এই দারুণ পদ্ধতি আড়াল হইল, যে মাঠের হাওয়া পদাঘাত মিলাইয়াছে সেই হাওয়ায় তাহার, সুহার কেশদাম এখন এলোমেলো, কচুর আঠায় তাহার আঙুল জ্বলিতেছে, সে তবু অবিচলিত, ধীরে ছুরি হইতে আঙুলি অসংলগ্ন করত মুখমণ্ডল-উদব্যস্তকারী চুলগুলিকে সরায়, ঘাড় বাঁকাইয়া রাস্তা পর্য্যবেক্ষণ, প্রত্যক্ষ, অবলোকন করিল, রাস্তার লাল—এ কারণ যে খোয়া আছে বালিকাকে অতীব আকর্ষণ করে, মনে হয় কোথাও ইহা রাস্তা নয়, কিছুতেই উহা রাস্তা নয় কখনই তাহা রাস্তা নয়—তথাপি ইহার সরলতার প্রতি কণার প্রতীক্ষায় মূর্ত্ত, এখন ঘোড়া-যুক্ত গাড়ীখানি যাওয়া হেতু দুএকটি খোয়া-শীর্ষ ভাঙ্গিয়া চূর্ণীকৃত লাল, সে, সুহা, ইহা দর্শনে প্রলুব্ধ, সে চাকার ক্বচিৎ দাগের পার্শ্বে সেই চূর্ণকে আপন জিহ্বায় অনুভব মানসে উহার স্বাদ গ্রহণ অভিলাষিণী, এবং বিশ্বাস হয় ইহা রাস্তা—জানালার ধারে, এই রাস্তার অন্য পার্শ্বে যোহন একাদশীর চালা খুব কাছেই—ফোড়ন দিলে ঝাঁঝ আসে—সেখানে তখন ভগবৎ গীত উদ্দাম, অক্ষয় মাস্টার জানালার গরাদ ধরিয়া সেই দিকপানে তাকাইয়া তারস্বরে চীৎকার করে "কথা কানে যাচ্ছে না এই হারামজাদা শালা এই গাড়ওল" যাহাতে যোহন একাদশীর ধৈর্য্য নিবিড় এবং ইতঃমধ্যের জানালা হইতে ঐ চালার অন্ধকার সুপ্রাচীন হয়, তাহাতে অক্ষয় মাস্টার অধিক পরিমাণে রুষ্ট, ক্রুদ্ধ অপমানিত ফলে "শালা খেশ্চান শালা একটু ঘুমুতে দেবে না...দাঁড়াও শালা তোর নামে পি এম জীকে রিপোট করেঙ্গা" প্রতিধ্বনি করিয়া উঠিল, তাই সুহার তন্দ্রা সমস্ত নিশ্চিহ্ন আর যে বেচারী তৎক্ষণাৎ আপন

গৃহ অভ্যন্তরে পালাইতে অভিমানিনী কেননা এইভাবে বিতণ্ডা সুরু হওয়ত কোথায় যে পৌঁছায় সেই অভিজ্ঞতা তাহার আছে, অতএব সে কোনমতে বাধা দিতে বলিত "আঃ বাবা" এবং এই সূত্রে যোহন একাদশীর বৌএর উপর ঘৃণা মিশ্রিত রাগ বালিকার মনে দেখা দেয়; এখন অক্ষয় মাস্টারের উক্তিতে যোহন একাদশী আপন গীত মধ্যেই জবাব করে "পি এম জী আমার স্যাঁট করবে করগে যা রিপোর্ট" ইত্যাকার ঔদ্ধত্য শ্রবণ মাত্রই অক্ষয় মাস্টারের জ্বর সাড়া দিয়ে উঠে, এমনপ্রকার কথা শোনা অর্থই মহাপাতক হওয়া এইজন্য আপন অজানিতেই নিজ কর্ণে অঙ্গুলি ধরিয়া খানিক "ও হো হো" বচনে বিলাপের শেষে তীক্ষ্ণ স্বরে কহিল "ওরে শালা পি এম জীকে গাল, শালা খেশ্চান শোর গরুখেগো জাত—তো ব্যাটা পাখনা উঠেছে গলা দিয়ে রক্ত উঠবে শালা" তাহার এই ধরনের তিরস্কার নিষ্ফল, যেহেতু যোহন একাদশীর উদ্দামতর গীত জোনাকীযূথকে তাড়িত করত আসে, তাই অক্ষয় মাস্টার নিত্যকার মত বলিল "ইদিকে যীশুর নাম, উদিকে মুখ খারাপ কচ্ছিস বাঙ্‌সোৎ...পিয়ন হয়ে পোস্টমাস্টারকে তুই তোকারী, শালা জুতিয়ে"...ইহাতে সুহা শঙ্কিত তটস্থ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিটকাইয়া ঝিম, অন্যপক্ষ প্রচণ্ড উত্তর দিল "খবদার্ শালা মুখ খারাপ আমি বার কচ্ছি—কালই শালা আমি ডালহাউস যায়েঙ্গা তোমার পোঙায় কি করে হুদোর দিতে হয় তা আমি ভালভাবেই জান্‌তা হ্যায়..." অক্ষয় মাস্টার এ কথায় 'ডবল ডবল' বলিয়া উন্মাদ; অন্য পার্শ্বে যোহন একাদশী যুগপৎ রসাইয়া তরুপ করিল "বটে আমি যদি বড়সাহেবকে না বলি ত আমার নামে বেজী পুষো...দেখি কেমন তোমার চাগ্‌রী থাকে...বলব সারাদিন ঘুমোয়...তার মেয়ে পোস্টকাট টিকিট বেচে জোড়া পোস্টকাট ১ পয়সা বেশী নেয়—পোস্ট অফিস ঘরে শিস্ দেয় পরের চিঠি খোলে বেশ করব গাইব...আবার আমাকে বলে কিনা বড় নস্‌রিয়া আদমী দেখছি" ইহাতে অক্ষয় মাস্টার ঈষৎ বিলাপের পর রাগে দাঁত ঘর্ষণে কণ্ঠস্বর অল্প করত কহিল "হল ত...এখন...কতবার তোকে আমি বলেছি ওকে নস্‌রিয়া বলিসনি এখন", সুহা ধ্রুব জানে ইহার সূত্রে কোন কথা নিশ্চিত আসিবে তাই খানিক স্বাভাবিক আত্মরক্ষার হেতু, আর আংশিকভাবে ঘুম ভাঙ্গার বিরক্তিতে জবাব দিল "আহা ও মুখপোড়া আমাকে খামখা বলে কেন তুমি বড় জেলাবী আছ—বেশ করি বলি" কিন্তু বাপ এই যুক্তি গণ্যই করে না, নিত্য নিয়মিত অক্ষয় মাস্টার ভ্রূদ্বয় কপালে তুলিয়া যেমন যোহন একাদশীর কথা এইপ্রথম শুনিয়াছে অতএব কিঞ্চিৎ ইতস্ততা দেখা দেয়—সঙ্গে সঙ্গেই বলিয়া উঠে "এখন কালই যদি ডালহাউসী যায়...তাহলে" সুহাও উত্তর দেয় "এ যাচ্ছে রোজই যাচ্ছে আর ধ্যানপানায় কাজ নেই, এ্যানড়া যাচ্ছে" বাপ তখনই বলিল "যদি যায়। তখন ত আমার হালুয়া বেরবে...বয়সে কত বড় ওর পোঁদে না লাগলে...তোর জন্যে দেখছি চাগরীটা...কতবার বলেছি পরের চিঠি খুলিসনি...চুরি করিসনি" ইত্যাকার উত্থাপন কেন তাহা সুহা জানে—এখন যাহা ইন্ধন, ভালরূপে বুঝিলেও তাহার ইঙ্গিত তাহাকে করিতেই হয়, তিক্ত বিদ্রূপছলে ছাগলের আওয়াজে 'ব্যাঃ হা হা ব্যাঃ হা হা' তে ঘর তির্য্যক হইয়া উঠে—ছাগধ্বনি শ্রবণে জ্বরজীর্ণ অক্ষয় মাস্টার উৎক্ষিপ্ত,—ধৈর্য্য নাই, "ও হো হো হতচ্ছাড়ি হারামজাদি বাপকে ব্যাঃ, তুই কালই শ্বশুর বাড়ী চলে যা" আর যে সুহা এই ইংবতায় এতটুকু দমে না, বিচলিত নহে, উঠিয়া বসিয়া কোমরে কাপড় জড়াইতে সময়ে কহিল "বেশ এখনি যাব তুমি ওদের টাকা ফেলে দাও" এই রুক্ষ মনোভাবে অক্ষয় মাস্টার কি করিবে ভাবিয়া পায় না, খড়মের চঞ্চল শব্দে স্থান উদব্যস্ত; সুহার আপন মেরুদণ্ড দৃঢ়—ইতিমধ্যে চোরা দীর্ঘশ্বাস তাহাকে কাঁপাইয়া তুলে, বেচারীর একদা মনে হয় যোহন একাদশীর সহিত তাহার পিতার এহেন নিত্যকার বচসার আদত উদ্দেশ্য সে, এ কারণ যে অনেকটা একই ধারায়, বিশেষত শেষটুকু, কথা পরম্পরা আসে তাহাকেই বিদ্ধ করিবার নিমিত্তই এই বাকবিতণ্ডা; তাহার উপর রাগে অক্ষয় মাস্টার অন্তত রাত্রে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য, উত্তর করিল "টাকা দেবে না হাতী দেবে, জোচ্চোর কোনদিন যদি এ পথ মাড়ায় (অর্থাৎ সুহার বর) জুতিয়ে" সুহা বলিল "তাদের আসতে বয়ে গেছে..." পিতা কন্যা যখন এরূপ শত্রুভাবাপন্ন মুখর, এবং যোহন একাদশী ভক্তিতে সপ্তমে, তখন সাধারণত লক্ষ্মণ চাটুজ্জ্যের উদাত্ত চীৎকার সহকারে মুখ-খারাপ সৃষ্টিকে নিন্দনীয় করে, ক্রমে রাস্তার প্রতি মুহূর্ত্তই যাহার পরিপ্রেক্ষিত—মাতাল লক্ষ্মণ চাটুজ্জ্যেকে দেখা যায়, তৎসহ তাহার দুই পুত্র—ইহাদের কাঁধে, সে, ভর দিয়া আছে তথা তাহারাই লক্ষ্মণ চাটুজ্জ্যের এক একটি হাত সসম্ভ্রমে, মায়ায়, ভালবাসায়, যত্ন করিয়া ধরিয়াছে, একজন বালক ঈষৎ ছোট সেইহেতু লক্ষ্মণ চাটুজ্জ্যে কিছুটা বাঁকা, চন্দ্রালোকে এ দৃশ্যের ছায়া প্রতীয়মান হয়, আঁধারেও ইহা বুঝা যায়, উহারা

আসিতেছে...এবং এ ব্যাপার আশ্চর্য্য যে ঠিক এইখানে আসিয়া লক্ষ্মণ চাটুজ্জ্যে পুত্রদের বাগ মানিবে না, গীত তখনও যেহেতু তাই ঘোর উৎসাহে বলে "চলুক চলুক ঘুরে ফিরে বা বেটি চুমকী ঘটি...ঘুরেফিররের" এ সময় লক্ষ্মণ চাটুজ্জ্যে আপন মস্তকের চারিদিকে অনামিকা উদ্ধত করত হাত ঘুরাইবার চেষ্টা করে, কিন্তু যাহা সম্ভব নহে তাই আঙুলটি বন্ধনের মধ্যে সঞ্চালিত, ঘুরে, অনন্তর পুত্রদের ক্রমাগত 'বাবা বাবা' বলিয়া কাকুতি মিনতিতে কিঞ্চিৎ সম্বিৎ লাভে কহিল "ঈশ্বর জগতকে এমন প্রেম করিলেন যে বউঝি বার-ভাতারী হল, তোমার শালা বউ বছর না ঘুরতেই হওয়া...শালা খেশ্চান...বেগুন পোড়া খাবার জন্যে বে কর...যীশু তোমার দয়ালু দাড়ি গজায়...শীতকালে খাই শাকালু..." যখন এ রসগান অনেক দূরে তখন যোহন একাদশীর অসংযত কথা-শোনা যায় অবশেষে সিদ্ধান্ত ইহা যে "শালা বর্ণাশ্রমই হিন্দু বানসো তোদের নাভিশ্বাস উঠেছে"...এবং সৌজন্য অনুরোধ না মানিয়া অজস্র শ্রীলতাহীন বাক্য এখন গীতির কলি "উড়াও বিজয় পতাকা জয় যীশু বলে" গাহিতেই থামাইয়া বলে, আর যে দূরাগত মাতালের তখন সুন্দর ছড়া সুরে আসিতে থাকে 'আয়রে আয় ছেলের দল মাছ ধরতে যাই মাছের কাঁটা পায় ফুটল দোলায় চেপে যাই' এই পদের হাতছানি এখন সুহাকে বিমোহিত করে, শুধু ধীরে ধীরে আপনার অন্তরীক্ষে এই সূত্রে শুনিবারে পায়—কপালে আঘাতের শব্দের সহিত মরণাপন্ন স্বর "এই কি সেই রাস্তা সত্যই সে ঘোড়া কি সত্য"—ইদানীং "উড়াও বিজয় পতাকা জয় যীশু বলে" গান যোহন গায় না, যে গীত গাহিয়া কতদিন, ব্যাগ ঘাড়ে সে ধানক্ষেত মধ্য দিয়া ছুটিয়াছে...তাহার কাঁধের বর্শা ফলকের (যাহা সে নিজ খরচায় বানাইয়াছে) নীচে কয়েকটি ঘুমুর যখন লুপ্ত তখনও গীত ভাঙাভাঙা আসে; এখন সে ছুটিতে যাইয়া স্থির হয়, আপন দাড়িতে হাত বুলায়, অফিস ঘরে যখন দেখা যায়, তাহার ইঁদুরের মত ক্ষুদ্র চোখদুটি ছলছলে, অনেকক্ষণ বাদে এক একটি নিঃশ্বাস ফেলে, সীল করিবার কালে হাতের গালা ক্রমাগত গলিয়া পড়িতেছে অথচ কোন ভ্রূক্ষেপ নাই,—ইহাতে অক্ষয় মাস্টার একদিন কপাল কুঞ্চিত করত বলিল কি গো খেশ্চান তোর দেখছি ভাব লেগেছে, কি ব্যাপার...বউ পালাতে ত মানে সে ধ্যাস্টা মাগীর বেইমানি....মাগ উদাসী হতে ত এত ভাব দেখিনি..." যোহন একাদশী অদ্ভুতভাবে সুহার দিকে চাহিল, সুহা এই ইঙ্গিত বুঝিবামাত্রই ভাত নামাইবার অছিলায় বাহিরে যায়, যোহন একাদশী কহিল "মাস্টারমশাই বড় ফেরে পড়েছি আজ মঙ্গলবার ত এর আগের মঙ্গলবারের দিন রেতে আমি তখন গান গাইনি, মনে হল দাওয়ায় কে যেন চলাফেরা করছে, চাঁদের আলো ফুটফুট করেছিল...একটু চুড়ীর আওয়াজ, আমার বুকটা কেমন করে উঠল, আমি বুকের লোমগুলো মুঠো করে ধরি—তখনও চলাফেরা শুনছি...হঠাৎ দেখি দরজাটা হাওয়ায় খুলে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে আমার মনটা ছ্যাঁৎ করে উঠল, চোখ ঝলসে যায়—আমি থ অবাক এত সুন্দর যে কি বলব, সে যে কি সুন্দর তা বলা যায় না, জানো মাস্টারমশাই সে নিজেই আমার ঘরে সেঁধলে, যেন তার নিজের ঘর এমনভাবে চারিদিকে চাইলে, আমার টুলটার উপর বসলে, গরম আমি তাই যেই পাখা দু'বার করেছি অমনি কি এক ফুলের গন্ধে সমস্ত ঘর-ময় চাঁদের আলো, ফুলের গন্ধে আমি যেন পাথর যেন যেন ঘুমাচ্ছি তারপর আমার কি হল হাতের পাখাটাকেই শুঁকছি শুঁকছি সে যে কি সুন্দর আমার মন বলে এমন কখনও সে দেখেনি...এমন সময় জানো, আমার পাখীটার দিকে সে চেয়ে বললে 'ওটা আমায় দাও'...পাখীটা আমার বড় প্রাণের তবু আমি যেই ভেবেছি দেব, মন সামলাতে আমার মন খুসীতে বুক ভরে গেল, আমি গান গেয়ে উঠলুম...'উড়াও বিজয় পতাকা জয় যীশু বলে' এ গান শুনে তার বয়স আঠারোর ওদিকে যাবে না, হাসি নেই থমকে গেল...একেবারে কাঠ...তারপর আঁচলটা মাটি থেকে তুললে....তখনও রূপ থেকে সেই আলো!...আমি কি করব স্থির করতে পারলুম না...তখন মুখ দিয়ে "উড়াও উড়াও এই কথা বেরচ্ছে...সেও তত দূরে যাচ্ছে....আমার বুদ্ধি খেলে গেল বললুম "চলে যাচ্ছ যে" সে বললে, "আবার দেখা হবে"...শুধোলুম "কোথায়" সে বললে "যেখানে সেখানে" বললুম "পাখী" উত্তর দিল "নেব খন"...তারপর সৌন্দর্য্য সেই আলো...অদৃশ্য" যোহন একাদশীর কণ্ঠস্বরে উত্তাল তরঙ্গের আঘাত শ্রুত হইল, আড়ালে সুহা—দরজার ফাঁকে চোখ রাখিয়া এই উপকথায় ঘুমাচ্ছন্ন, তথাপি স্পষ্টই দেখে যোহন একাদশী জানালা দিয়া অনেক দূরের দিকে চাহিয়া—হায় বেচারীর জন্য অনেক দূরত্বই একমাত্র বাস্তবতা কিন্তু তাহাও মেঘময়—আপন দাড়িতে, বার্দ্ধক্যের উপর, হাত বুলাইতেছে এবার বলিল "অসম্ভব সুন্দর দারুণ সুন্দর

সে সুন্দর কেউ কখনও দেখেনি” অক্ষয় মাস্টার শূন্যদৃষ্টিতে বিক্রির-জানলা দিয়া তাকাইতেই কহিল “পরীর ব্যাপার নিশ্চয়...ছায়া পড়ছিল?” যোহন একাদশী মুখখানি তুলিয়া জিজ্ঞাসা করে “ছায়া...কেন” অক্ষয় মাস্টার ভাব ঘোরে বলিল “ছায়াই ত চেনবার...মানে...ছায়া যদি পড়ে মানে হল এখানকার...যখন নেই বুঝতে হবে...আদত পরী” এই মন্তব্য যোহন একাদশীর যুক্তিসম্মত মনোমত হয় নাই,—মনে হয়, সে ভাবিল অক্ষয় মাস্টার তাহার সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত, কহিল “পাখীদেরও অনেক সময় ছায়া পড়ে না...যখন তারা উড়ে উড়ে অনেক দূর...” ইহাতে অক্ষয় মাস্টারের কপাল কুঞ্চিত ও আরবার বুদ্ধির পরিচয় দিতে আগ্রহান্বিত “তবে আমি ভাবছি...পাখীটা চাইবার মানে কী...পাখী...পাখী মানে ত আত্মা...একথা শুনে আমার বড় ভয় হচ্ছে শীত করছে...পাখী চাইবে?” যোহন একাদশী উহার বিচার শ্রবণে, প্রথমত বড়ই একা অনুভব করে প্রকাণ্ড কোটের-বক্ষ কোটের বোতামে হাত দিয়া ধীরে চোখ তুলিয়া আশ্চর্য্য স্বরে বলিয়াছিল “যেহেতু পাখীরা অনেক দূর উড়তে পারে...পাখীরা অনেক দূর উড়তে পারে...” এই বাইবেলীস্বরে অক্ষয় মাস্টার বিরক্ত হওয়ত কহে “সে কথা সবাই জানে...আমি ভাবছি...অন্যকথা” যোহন একাদশী ভ্রূ তুলিয়া উত্তর করিল “আত্মা ত...অন্ধ! তোমাদের হিঁদুদের বড় পিটপিটনি...মানে খুঁজছ...তাছাড়া আমার ঘরে বাইবেল আছে...যত বাজে কথা...পাখীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি...তাকে আমি ছোলা দি...সে ছোলা খায়...দ্যোৎ” একথা অক্ষয় মাস্টারের সুচিন্তিত মনে হয় নাই অনুচ্চস্বরে প্রতিবাদ করিল, “তবে....পাখীটা খামখা...পাখীটাত কথা বলে না...যে” যোহন একাদশী গম্ভীর ভাবে বলিল “বাঃ! কত সুন্দর দেখ্‌তে না...কত সুন্দর!....সুন্দররা সুন্দর চায়....” অক্ষয় মাস্টার তাচ্ছিল্যভরে উত্তর দিল, “তাই যদি, তবে যীশুর গান শুনে...” এতক্ষণ বাদে যোহন একাদশী নির্ব্বাক, সে হারিল; অক্ষয় মাস্টার মনে খুসী, সহানুভূতিসূচককণ্ঠে কহিল “ওরা পীরিত...প্রেমের গান পছন্দ করে...দু'একটা শিখে রাখ...” এবং আর কোন কুৎসিত ইঙ্গিত তাহার স্মরণে আসিবার পূর্ব্বেই যোহন একাদশী প্রকাশ করিল “আবার এ'ও আমার মনে হচ্ছে যে গান শুনে...ঈশ্বর আমায় পরীক্ষা করতে...সে রূপ দেখার পর আমার আর মাথার ঠিক নেই...দেখনা আমি পাখী নিয়ে ঘুরি...” ইহাতে অক্ষয় মাস্টার উত্তর দিল “দোৎ আর লোক পেলে না তাঁকে ডবল প্রমোশন দেবে...তাই যদি হয় তবে এত হেদিয়ে মচচিস কেন...ঠাকুর কখনও সুন্দর দিয়ে তাঁর ভক্তকে ঠকায়...” এই চিন্তায় যোহন একাদশী নির্ব্বোধ তাহার কণ্ঠস্বরের সরলতায় সুহাকে দুঃখপীড়িত করিয়াছিল একদা সে অশ্রুতপূর্ব্ব অভিজ্ঞানে রোমাঞ্চিত যাহাতে যে চম্পকের বিষ মধ্যরাতের ঝড় অদ্যও বহন করে এবং এই সত্যের স্পন্দন ছিল...যাহাতে যে নিয়তিকৃতনিয়ম রহিত সূক্ষ্মতম কোন নিঃশ্বাসের চরিত্রের খেলার কলমের অভ্যুত্থান—বর্ত্তমানতা এবং সদম্ভে, নিশ্চয়, মুষ্টিঘাতের শব্দে দিক সকল কিন্নর; চাতক স্ফটিক জল নিনাদে মর্ত্তকে আর দুঃখ দেয় না; পাঁজড়া প্রমুখাৎ বৈধ হাসি-কান্নার জন্য যোহন একাদশীর আর স্বপ্ন নাই...এখন, এইভাবে অর্থাৎ সুহার দিব্যভাব দর্শনে গতিরহিত যোহন একাদশী আপনকার অজানিতেই, নিজ মনে, “আঃ!” বলিয়া উঠিয়াছে—আর যে...আরও যথাযথ রূপে দেখার কারণে, স্বীয় মুখখানি অগ্রপশ্চাত করে, পরক্ষণেই এমত করিল যেন কিছুই সে দেখে নাই, বারান্দায় উঠিয়া, দরজার চৌকাটে পা দিয়া দেহ বক্র করত, একটি হাতে স্পর্শ বাঁচানর অভিপ্রায় প্রসারিত রাখিয়া অগ্রসর হয়, এবং এ সময় সে আড়ে সুহাকে দেখিয়াছিল, পরে আপন ঘরের চাবিটি লইয়া চলিয়া গেল; সুহার কোলে স্তূপীকৃত দারিদ্র্য—ইহা হইতে চোখ তুলিয়া সে অন্ধকারের প্রতি চাহিল, রাত্রে আয়না দেখিতে নাই, অধুনা তাহার ঐ অন্ধকারের প্রতি চাহিয়া কেন কি জানি—গ্রাম্যবালকদের মত বলিতে সাধ হয় “ওগো ডাকপিয়ন করি নিবেদন মালিক ভিন্ন চিঠি দিও না কখন” কিন্তু ঠিক এইক্ষণে তাহার বাবা, বারান্দা পর্য্যন্ত আসিয়া স্থির, জ্বরগ্রস্ত মুখখানি কিছু উন্মুক্ত, এলোমেলো ছাড়া ছাড়া দাঁতগুলি প্রতীয়মান, অক্ষয় মাস্টার অবশ্য এক নিমেষেই সাধারণত্ব ফিরিয়া পাইতেই তিক্ত পদ সঞ্চালনে ঘরে প্রবেশ করিয়া তীব্র স্বরে বলে “কি ধ্যান পানা হচ্ছে...পোড়ারমুখী উঠে জল ফল দে...চা কর না” একথায় সুহা রাগান্বিত হয় নাই, শুধু চরিত্রক্ষার জন্য একই গলায় কহিল “আমার পিণ্ডি উচ্ছুগ্যু করছি” ইহা শুনিয়া বাপ খানিক চঞ্চলপদে ঘোরাফেরা করত উত্তর করিল—“তোর কপালে অনেক দুঃখু আছে...এ্যা মাথায় ঘোমটা থাকে না কেন রে তোর” সুহা হতবাক ধীর “কোন মেয়ে বাপের বাড়িতে ঘোমটা দেয় শুনি” ঠিক ঘটনার পরদিন, অফিস ঘরে যাইতে গিয়া সুহা থামিয়াছে কেননা তাহার বাবা এবং যোহন একাদশী

তাহার সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে কথা কহিতেছিল, তাহারা দুজনেই চিন্তিত তাহার বাবা বলিতেছিল "আমরা গরীব আমাদের এত ভাবন সৌন্দর্য্যের কি ছাই এর দরকার...সৌন্দর্য্য...ও বাবা রাত না পোয়াতেই কুইনিন..." অবশ্য শেষের এ রসিকতা কোন আর্ত্তস্বরে কুইনিন চাওয়ার (কিনিতে চাওয়ার) উত্তরে, নিশ্চয়ই যে কিনিতে আসিয়াছিল সে অল্পবয়সী বালিকা হইবে, অক্ষয় মাস্টার কহিল "গতর না...লাগতেই 'গুল্ম হইল বুঝি পেটে'...দাঁড়া, সৌন্দর্য্য একটা, বুঝলে যোহন, অভিশাপ"...এই আলোচনা সুহাকে কোন ক্রমেই কাহিল করে নাই, ইহাতে যে সত্য—তাহা তাহাকে একটি মহৎ বিশ্বাস দেয় যে সে নিশ্চিত অতীব সুন্দর হয় এবং যেখানে কোনই খেদ নাই—তথাপি এখন সে লখাইকে আপনার অদ্ভুত গম্ভীর মনোভাবের মধ্যেই সে কত সুন্দর জানিতে প্রশ্ন করে;—এই সূত্রে, তবু বলা যায়—এখানকার চারিটেবল ডিস্‌পেনসারীর ডাক্তার কাঙালীচরণবাবুর তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী, বৌএর উল্লেখ সমীচীন হয় নাই—এবং সে নিজে ইহা বুঝে,—কিন্তু সে বড় ক্ষুধার্ত্ত সম্ভবত—কেননা কাঙালীডাক্তারের বৌ উষা অত্যন্ত কুৎসিত নীচ মেয়েছেলে, বয়সে মাত্র সতেরো, কিন্তু এই বয়সেই এখানকার বহু স্ত্রী লোকের কদর্য্যতাকে হার মানাইয়াছে; উষা ভাতের পাতে বাঁ হাতে গেলাস ধরিয়া, আলগোছে নহে, জল খায়, এমনই নানাভাবে চিরাচরিত নিয়মকে—যথা ঘোমটা তাহার মাথায় থাকে না, লঙ্ঘন করে, জানালায় অসংযত বস্ত্রে দাঁড়ায় এবং ইত্যাকারে বুড়ো কাঙালীচরণ ডাক্তারকে নিত্য নূতন ফন্দিতে ছোট করিতে সিদ্ধ আরও আশ্চর্য্য যে এই সব দাম্পত্য নোংরা গল্প ছোটজাত বড়জাতের মেয়েদের বেহায়ার মত বলে, যে, সে উষা নিজেই আপনার যৌবনভরা দেহকে বিবস্ত্র করত শুইয়া থাকে আর ডাক্তার বিরাট পালঙ্কের চারিদিকে তাহাকেই কেন্দ্র করিয়া হামাগুড়ি দেয়, উষা জঘন্যতম নিশ্চয়, অবশ্য এ জাতীয় বর্ণনা সোজা সুহাকে করে নাই, ঘাটের অন্ধকারে দাঁড়াইয়া অন্যদের শুনাইতেছিল, যখন সুহা পুকুরে, বেচারী সুহা এ-হেন ইতরতা শ্রবণে আপন কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারে নাই, ইহার কারণে, সে নিজেকে অজস্র গঞ্জনা দিয়াছে, যে, কি মরণ-দশা ধরিয়াছিল যে সে ডুব দেয় নাই!—এ ঘটনার পর দিন উষাকে—তাহার তুলনায় অনেক অল্পবয়সী সুহা বলিয়াছিল "ছি ছি তুই যে এত নীচ তা আমি আগে থেকেই আঁচ করতে পেরেছিলুম, বুঝলি? তাই তোর সঙ্গে সই পাতাতে রাজি হইনি...তোর গলায় দড়ি জোটে না, লজ্জা করে না—নিজের ইহকালের পরকালের যে সব তাকে নিয়ে ছোট লোকদের কাছে...ছি ছি...যার তার সামনে তামাসা...তোর মামা না ডাক্তারবাবুর পা ধরে বিয়ে করতে রাজি করায়...খবদ্দার তুই আমাদের বাড়ীতে পা দিবি না বলে দিচ্ছি...আর দাঁড়াও না এসব কথা আমি লখাইএর মাকে দিয়ে ডাক্তারবাবুর কানে তুলছি—এত বাড় ভাল নয় শেষে গ্যাসতলায় দাঁড়াতে হবে" গ্যাসতলা বলিতে আদতে কি বুঝায় সুহা নিশ্চিত তাহা জানে না—দুঃখ দুঃখে যেখানে যাহাতে হেলান দিয়া দাঁড়ায়, খেমটা হাস্য উচ্ছ্বাস সিগারেট বিড়ির ধোঁয়ার সহিত কুণ্ডলী পাকাইয়া উঠে, অন্ধকার হইতে আঁধারে স্থিত চোখে কান্‌কি মারার প্রতিধ্বনি পতঙ্গেরা গ্যাস-আলোক ঘিরিয়া করে—একি ঘোর অগ্নি উপাসনা!—এই ছবি সম্যক জানিলে সুহা কখনই ঐ অভিশাপ করিত না, কেননা সে কোথাও অসভ্য নয়; এখন সুহার ভর্ৎসনায় ক্রোধে উষা ভীতা; সুহা অপমানিত হইয়াছে বুঝিয়া তাহার, উষার, গৌর মুখমণ্ডল লজ্জায় সম্ভবত আরক্তিম, ওষ্ঠ অযথা সংযমহীন উত্তর অভিলাষে শুধুই কেবলমাত্র কম্পিত, সে কাঁদিয়া ফেলিল, সুহার লক্ষ্মীপদদ্বয় ধরিতে গেল, চুনের ঘরে দাঁড়াইয়া সুহার গা ছুঁইয়া দিব্বি করিয়াছিল যে অবশ্যই, এমত কথা আর কদাপি সে মুখে আনিবে না, যদি ভুলক্রমে কদাচ, তখনই সে, সুহা, যেন তাহার মরা মুখ দেখে; অন্যপক্ষে সুহা উষার শ্রীসম্পন্ন সুন্দর মুখমণ্ডলের প্রতি তখনও রাগত নেত্রেই চাহিয়াছিল; তবু, এখন এই সৌন্দর্য্য প্রসঙ্গে উষার নাম সমগ্র কল্পনাকে কলুষিত করে, সত্যই সুহার নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত অসমান, হয়ত যাহার তুলনায় সে আরও সুন্দর কিনা জানিতে, যাহার নাম উল্লেখ করিতে, সাহসী হয় নাই অর্থাৎ আপন ঔদ্ধত্য প্রকাশজনিত আবেগে অথবা নিছক পদ্ধতি ক্রমে সুহা উষার ঘৃণ্য নাম বলে, ফলে তাহার প্রশ্নে বালক, যে তখনও ভাবদীপ্ত নৃত্যরত, লখাই, উত্তর দিল "দোঃদুদু কিসে আর কিসে চাঁদে আর বাঁদরের পোঁদে..." ইত্যাকার ইস্, কদর্য্য বেলেল্লা পরোক্ষ রায় যাহা অসভ্য যাহা জঘন্য উহা শালীনতা বিরোধী অবশ্য এজাতীয় নানাবিধ অশ্লীলতার মধ্যেই—এখানকার লতাগুল্মাদিও পর্য্যন্ত অসভ্য—সুহার বিদ্যমানতা; কিন্তু যে সে সত্যই এই পৃথিবী যাহার প্রতি কণাই সৃষ্টিক্ষম প্রতিক্রিয়া তাহা যে কুকুর শিয়ালের এমত সিদ্ধান্ত মানিতে অবিশ্বাসী, তথাপি বালকের

ঐ উক্তি সুহার চকিতে-লব্ধ-সুখগাম্ভীর্য্যের অভ্যন্তরে, যে অভ্যন্তর বীজাণুরহিত, আপন নিত্যতা হেতু, বর্ত্তমানতার কারণে, নিশ্চয়ই বিস্ময়কর যে হয়ত বালিকার কোনই, একদা অশ্ব-দেখার, ভাবুকতাকে ও ব্যাঘাত হানিতে পারে নাই; লখাইএর উত্তর শ্রবণে ইহা পরিলক্ষিত হয় যে সুহার মুখখানি ঈষৎ উন্মুক্ত তাই দন্তঃপাতির রম্যবাহার তৎসহ মুখলালাজাত সূক্ষ্ম রেখা যথার্থ এবং লালা-সূত্রটি অবিচ্ছিন্নভাবে উপর সারি হইতে নিম্ন সারির দন্ত স্পর্শিত আছে এবং ইহা ক্ষণিকনিমিত্তই দর্শন যোগ্য আর উহাতে পৃথিবী যে অবশ্যই অতীব সহজ—এখানে যে মানুষ বৃত্ত আঁকিতে আশ্চর্য্য হইয়াছে, যেখানে অর্ণব-নীল আরোপ করিতে ক্ষণে অপরিসীমতার সংজ্ঞা নির্ণয়ে অচিরাৎ সক্ষম,—এবং উহা যে রসাস্পদ মহিমময়ী তাহা নির্দ্ধারিত; উপস্থিত সুহা উষার কথা উত্থাপনের হট্টকারিতা ক্লেদ হইতে অব্যাহতি লাভ আশায় অর্থাৎ এইভাবে স্বীয় মনকে প্রস্তুত করত পুনঃ প্রশ্নের জন্য বদ্ধপরিকর, তাহার দৃষ্টি দিকে দিকে সঞ্চালিত সুমহান ভ্রূযুগের একটি ক্ষিপ্ত শেষে বক্র ঝটিতিই থৈ পাইল, আর তখনই শ্লেষ্মাযুক্ত তাহারই স্বর শোনা গেল, "কামিনী দিদির থেকেও" এ নাম উচ্চারণের কালেই সুহার আপন সুঠাম দেহ মৃদু স্পন্দিত, নিশ্চয়ই উদ্বেগ ছিল, এখানে প্রতিবিম্ব নাই একারণ যে সর্ব্বাণী পাঠকের কন্যা কামিনী যাঁহার রূপলাবণী তথা সৌন্দর্য্যে—সৌন্দর্য্য যাহা আর এক বিকৃত অবস্থা এমত নয়—প্রেরণায় আবার কোন নবতম কলম জাত হওয়া সম্ভব, উহা এক দৈব ঐশ্বর্য্য!—এবং লখাই সুহার প্রশ্নে আপনকার অন্তর্দ্দশার মধ্যেও, নৃত্যরত ভঙ্গিমা কৌশলে ব্যাপৃত ক্ষণেই স্বীয় মানসপটে অসামান্য সুন্দরী কামিনীদিদিকে বিশেষত বিভিন্ন কর্ম্মরতা দেখিয়াছিল, সত্যই সে সুখী! এখন, বিশেযত যখনই তাহারা দুইজনে সে আর সুহা, স্বভাববশতঃ ছেনতাইব্যপদেশে পশ্চিম পাড়ায় গিয়াছে হাতে আঁকশীলগী—আছেই, তখন প্রায়ই, অনেকবারই, এরূপ ঘটে যে একে অন্যের বহু ব্যবধানে অদৃশ্য, প্রত্যাবর্ত্তনের সময়ে নিত্যই সর্ব্বাণী পাঠকের বাড়ীর পিছন সীমায় অবস্থিত আদভাঙা কোথাও ফোকরওয়ালা কালমেঘ ও ফার্ণলাঞ্ছিত কাদা-গাঁথা প্রাচীরের যেখানে একটি যজ্ঞিডুম্বুরগাছ—সেখানেই সাক্ষাৎকার তাহাদের হয়; এই বাড়ীকে তাহারা নমস্কার করে, ইহার পরই মাঠ, অনন্ত নির্ভাবনা প্রাচীর পার হইবার কালে, খানিক মাথা নীচু নির্ঘাৎ, কৌতূহলবশতঃ তাহারা ফোকর দিয়া নিরীক্ষণে অনন্য নজর দ্বারা কভু দেখিয়াছে ছোট শিব মন্দির মার্জ্জনায় তিনি ব্যস্ত, আপনাকে একনিষ্ঠ করিতে ওষ্ঠ দুইটি চাপা, অদ্ভুতভাবে ভিতর দিকে টানা—শুধু একটি রেখায় পরিণত, গালে চমৎকার টোল প্রতীয়মান—এখান হইতে একটু কালো তবুও তিনি পরমাসুন্দরী; কখনও লক্ষ্য করে মহৎ শিবলিঙ্গকে ময়ূর পাখা দিয়া হাওয়া করিতেছেন, ইহাতে লখাই তাচ্ছিল্যসহকারে বলে "যে না শিব তাকে আবার" এই উক্তি শুনিয়া সুহা গম্ভীর ইহাতে বালক ত্রস্ত, তীর্য্যকভাবে উহাকে লক্ষ্য করিয়া জানিতে চাহিয়াছে "ভগমানের গরম লাগে" তখনই বালিকা উত্তর দিয়াছে নিশ্চয়, "কান মল শিগগির বাঁদর" একদা সুহা এমন হয় যে তাঁহার চোখের সম্মুখেই পড়িয়াছিল কেননা সে তাঁহার সৌন্দর্য্যদর্শনে এ-পর্য্যন্ত তন্ময় যে লুকাইবার কথা মনেও নাই কামিনীদিদি তখন গরুর জাব দিতে ছিলেন, সহসা নবনীত মুখখানি তুলিয়াই তিনি নিথর গম্ভীর, আর সে, লখাই, কোনক্রমে তাঁহার দৃষ্টি এড়াইয়া, যেহেতু প্রাচীর, ইহারই দেওয়ালের সহিত এক এবং শুনিয়াছিল, তিনি বলিতেছেন "ছি ছি সুহা...আমি বলিহারী যাই...বলি তোর বয়স বইছে না...একে তোর বদনাম এসব করিস বলে...এখনও পরের আগান-বাগান কচ্ছিস্...এমনধারা গেছো মেয়ে হয়ে থাকলে চলবে...ভালর জন্যেই বলছি...আন ক'রে নিসনি আমার কথা...একে তোর শ্বশুরবাড়ী অমন...এমন করলে আর কোনদিন তোকে তারা...নেবে? ছিঃ" ইহা ছাড়া আবার ক্বচিৎ দেখিয়াছে, যে তিনি ভক্তিভরে পুঁথি পাঠ করেন—অনেক বর্ষীয়সী, অনেক অল্প বয়সী, সকলেই অতি সাবধানে পা ঢাকিয়া সযত্নে শোনে; দেখিয়াছে, কাহাকেও সান্ত্বনা দিতেছেন অথচ নিজে অষ্টাদশী-মাত্র তাঁহার মুখমণ্ডলে দ্বিপ্রহরের পাতা ছেঁড়া আলো; দেখিয়াছে কাঁকে কলস লইয়া সিক্ত বস্ত্রে তিনি গমনশীলা, চাঁদ-চন্দন গায়ে অনেক জলবিন্দু যাহা তখনও বিশুষ্ক নহে ফলে আবছায়া রামধনুর খেলা এবং তাহার সুঠাম ডুইংকৃত পদদ্বয়ের নিটোল সিক্ত আর্দ্র গুল দুইটি একের পর এক ওতপ্রোত, তিনি ক্রমে উঠান, এবং মরাই পার, অদৃশ্য; তখন তাহাদের সম্মুখে মরাইএর শান্ত সিন্দূর লেপা লক্ষ্মীশ্রী ইহা তাঁহারাই সৌন্দর্য্যের একদিন; আর একবার, লখাই যখন প্রত্যাবর্ত্তনের সঙ্কেতসূচক অভ্যাসবশত, রীতি অনুযায়ী, চমৎকার পাপিয়া ডাকিতে ডাকিতে অগ্রসর, কিছু পরেই অন্য কোন স্থান হইতে সুহার কোকিলকণ্ঠ অনুকরণে প্রতি উত্তর দ্বিপ্রহরের পত্রমর্ম্মর,

জলস্তর, নীড়, কড়া-মাজার আওয়াজ ভেদ করত আসিল আর যে অনতিবিলম্বে এতাদৃশ বিভিন্ন পক্ষিরব নিকট হইল; একজন—বাঁশবনের খিলানদার সুদীর্ঘ রহস্যময় পথে মধ্যাহ্ন আলোর জাফরী কোথাও বা জ্যামিতিক আসন অতিক্রম করে আর অন্যজন, লখাই, এত মাঠ জমি থাকিতেও সহসা জল-জমা যেখানে তাহার মধ্য দিয়া আসে, প্রায়ই আসে, এখানে সে দেখে, দেখিল তাহার ছায়া নাই, অবশ্য জল আলোড়িত একারণে, তাহার আমোদ হয়! যে সেছায়াকে উড়াইয়া দিতে সক্ষম, আপন ক্ষমতায় বিশ্বাস দৃঢ়, লখাই এখান হইতে সুহাকে লক্ষ্য করত সোহাগপূর্ণ পুনরায় পাপিয়া ডাকিল, উহাদের দূরত্বের ইতঃমধ্যে খানিক ঝামাধরা ইঁটের ফলে রঙের তারতম্যে বর্ত্তমান প্রাচীর যাহারই নিকট আসিয়া লখাই ফোকরে মুখ রাখে এবং সত্বর ইসারা আর স্বরহীন বাক্য উচ্চারণে সুহাকে দ্রুত আগমন করিতে অনুরোধ করিল, সুহা আধা-দৌড়ে এখানে আসিয়া অন্য একটি ফোকরে মুখ দিয়া যাহা দেখিবার তাহা অবলোকনে স্তব্ধ, কেননা সে-ছবি অলৌকিক রসঘন যাহাতে চমৎকারিত্ব বিদ্যুৎ তথাপি সর্ব্বাংশে দুঃখময়—দেখিয়াছিল ঢাকা বারান্দার উনুনের উপর বোগনর সম্মুখে কাঁচা কাঠের ঊর্দ্ধগতি ধূম্রজাল আবেষ্টনেই তাঁহার ছোট ছোট চুলসমেত উত্তমাঙ্গ, নিশ্চয়ই অধুনা যাঁহার পদ্মপলাশ নয়নযুগ আরক্তিম, ফোকর দিয়া সমগ্র বাস্তবতা—ছবি বড় দুঃখের, এবং দুইজনে ঐ দুইটি আলাদা স্থান হইতে দৃষ্টি সরাইয়া একে অন্যের প্রতি তাকাইল, লখাই আহত মনেই প্রশ্ন করিয়াছিল "কামিনীদিদির চুল কি নাপিতে ছাঁটে" অথচ আদতে এই পদবন্ধনে, আশ্চর্য্য যে কেন-অমন-করে চুল ছাঁটে ও তৎসহ প্রতিবাদসূচক আওয়াজের মিশ্র স্বরভঙ্গ বিদ্যমান, সুহা ঝটিতি "সুস্" শব্দে কথা কহিতে নিষেধ করত তিক্ত উত্তরও দিল "মরণ দশা" বলিয়াই নিজ গলা উচ্চ হইয়াছে বোধে জিব কাটিয়া লখাইকে সাবধান নিমিত্ত আপন ওষ্ঠে অঙ্গুলি প্রদান করিল, বালক সুহার উত্তরে ঈষৎ থতমত পরক্ষণেই বুঝে যে সে নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়াছে ও যুগপৎ এই প্রাচীরের গাঁথনির মৃত্তিকা একটু খুঁটিয়া লইয়া কপালে স্পর্শের পর ভক্তিভরে গ্রহণ করিল একারণ যে এই বাটীর ত্রিসীমানাও, মন্দির ব্যতিরেকেও, জনসাধারণের বড় আশার স্থল, পুণ্য পবিত্র স্থান, কেননা সর্ব্বাণী পাঠকের পিতা ঁগৌরীশঙ্কর সাধক মহাপুরুষ ছিলেন তাঁহার নামে ত্রিতাপ হরণ হয়, যাঁহার জপমালার দিব্য অতীব হেমস্পর্শ, ফুল প্রমুখাৎ বহু মানুষের কাছে আছে; ভগবান মানুষের বড় কাছে আছে, বড় আপনার—একথা তিনিও বলিয়াছিলেন; এখন, অন্যপক্ষে সুহাও মৃত্তিকাকণা লইয়াছে, উহাদের মুখ মৃত্তিকা স্বাদে কেমন যেমন, যেন আর্ত্ত, এবং যখন তাহারা মাঠে—সুহা সবিস্তারে বলিতে থাকিল "বিধবারা...আমার অতি বড় শত্রুরও এমন দশা যেন না হয়...কেন তুই জানিস না...ওরা নিজেদের চুল নিজেরাই ছাঁটে...অবশ্য কখনও সখনও হয়ত..." এই ব্যাখ্যার পূর্ব্বাহ্ণ হইতে লখাই আপনার বোকামি ঢাকিবার তথা সামাল দিবার জন্য দারুণ ব্যাকুল ইহা ব্যতীত যে কামিনীদিদির ভাঙ্গা কপালের নিমিত্ত সমব্যথী হইবার মানসে বলিল "জানো আমি মন করেছি মাকে বলব অমনধারা কপচে চুল ছাঁটতে" ইহাতে সুহার মৃত্তিকা স্বাদযুক্ত মুখখানি বাঁকিয়া উঠে, সে হাসিতে গিয়া ঈষৎ ক্ষিপ্ত জবাব দিল "যা-যা...তোর মায়ের যা ছিরি তা উবরি কপচে কম্মে চুল ছাঁটলে আর দেখতে হবে না..." তাহার পরই কি জানি কেন অতি রূঢ় স্বরে—হয়ত কিছু-পূর্ব্বের-দর্শন এসব কথায় মলিন হইতেছিল বোধে কেননা উহা বিশেষ দুঃখের হইলেও যারপরনাই সুন্দর—কহিল "মাছখাগী বিধবাদের আবার..." এবং পরক্ষণেই নরম করিয়া বলিল "ওসব ভদ্রলোকদের উঁচুজাতে..." সত্যই, সুহার নবলব্ধ স্মৃতিকে লখাইএর ইচ্ছা নিপীড়িত করিয়াছে, অন্যদিকে বালক এরূপ কঠিন সমালোচনার জন্য কখনই প্রস্তুত ছিল না, উহাতে তাহার দেহ সর্পিল কিয়দংশে ঘূর্ণায়মান, আক্রোশ উদ্বেল অথচ চকিত হয়ত তাহার মনে হইল একটা কাঁটা ফুটিলে ভাল হয়, অথচ লগী-আঁকশী হস্তচ্যুত হওয়ার সঙ্গেই উহা ধরিবার বুদ্ধিও দেখা গেল সে হারায় নাই, ইদানীং সে আপনার কনুইয়ের কাছে মৃদু চুলকায় এবং এইভাবেই চক্ষুর্দ্বয় তুলিতেই রোদে সে দুইটি বিদীর্ণ, তাই ইহাতে মাথা হেলাইয়াছে আর যে তখনই শুনিল তাহার নিজেরই কণ্ঠমধ্যে কতিপয় বাক্য যথা "আমরা বড় গরীব! পুকুরে শালা ঝাঁঝি! ইসটুপিট! গাড়ী তিন ঘণ্টা লেট!" কিন্তু এ সকল কথার একটিও উচ্চারিত হয় নাই, আদতে সে বলিয়াছিল "ভগবানের উবরি আমার বড় রাগ" সম্ভবত ইহা সে শুধুমাত্র কথার গতি অন্যমুখী করণের জন্য বলে, না তাহা নহে, সে তাহার সঞ্চিত ক্রোধ প্রকাশ নিমিত্ত ব্যক্ত করে এতাবৎ ভগবানকে সে অন্ধকার ভাবিয়াছে, সুহা তাহার উক্তিতে অতিশয় বিস্মিত "ও মা গো" বলিতেই আপন বদনে তর্জ্জনী

স্পর্শিত হইল বিচলিত কণ্ঠে প্রকাশ করে, "তুই কি পাগল না কি...হ্যাঁ তুই কি বলছিস রে...এমন কথা মুখে আনে" এসময় সে, সুহা, আপন কপালে ও বক্ষে হাত ছোঁয়াইয়াছিল, সত্যই সে আতঙ্কগ্রস্ত পুনরায় তাহার স্বর শোনা গেল "তোর মাথায় কি ভূত চেপেছে না কি...কি আগলা পাগলা কথা" লখাই তখনও দমে নাই অধিক তীক্ষ্ণভাবে ঘোষণা করিল "ভয়ঙ্কর রাগ" সুহা হঠাৎ অনেক অনেক দূরে ধানখেত পারে বড় রাস্তার একটি চলতি-বাস নির্দ্দেশ করত কহিল "হ্যাদে দেখ দেখ, বাস...বাজী, ওটার নাম আমি বলছি অলকাপুরী...তুই" ইহার উত্তরে সে শুনিল লখাই আপন মনোভাব প্রকাশে অধীর "ভগবান আমার মাকে অমনধারা করলে কেন" পরক্ষণেই ধীরে "গৌরী সাধকের সঙ্গে ভগবানের...কত ভাব" এবার তীব্রভাবে বলিল "কামিনীদিদির ভাতারকে ভগবান খেলে কেন...কামিনীদিদি রাঁঢ়ী বেওয়া হল কেন? ভগবান যতি ভালই হবে..." এই পদস্ফূরণ এতেক তাড়াতাড়ি হয়, এক নিঃশ্বাসেই হইয়াছিল, যে সুহা বাধা দিতেই পারে নাই, তাহা ছাড়া সুহা খানিক দূরে অগ্রসর হয় এবং সে বুঝিল তাহার আলোচনার মোড় ফিরাইবার বৃথা চেষ্টা হইয়াছে, সে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া লখাইএর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল, সে রুষ্ট কেননা লখাই আপন বক্তব্যের মধ্যে কতগুলি অশ্রাব্য ভাষা প্রয়োগ করিয়াছে তাই ভর্ৎসনা সহকারে কহিল "ফের ছোঁড়া থাবড়ে তোর গাল আমি আঁটিসার করে দেব...তোকে না কতবার...ওসব কথা মুখে আনবি না..." এ শাসনে লখাই খুসী, তৃপ্ত, কেননা বুঝে, কোন উপায় সেও সুহাকে বিঁধিয়াছে আর যে উত্তর দিয়াছে "বেশ আমার ঘাট হয়েছে, কামিনীদিদি বিধবা হল কেন...ভগবান ওর বরকে খেলে কেন?" ইহার পর গম্ভীর চোখে সুহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল; সুহা চারিদিক সভয়ে চাহিয়া লইয়া নিম্নকণ্ঠে বলিল "তোকে না বলেছি...ভগবান নয়...ইংরেজরা মেরেছে" অর্থাৎ সুহা ইহাতে যে কথা ব্যক্ত করে তাহা এই যে কামিনীদিদির বর হরিহরকে—যেহেতু সে আপন দেশকে ভালবাসিত, সন্ত্রাসবাদী ছিল, ইংরেজরা—যাহাদের নিকট হইতে ফেরঙ্গ রোগ ভারতবর্ষ লাভ করে—এতই উৎপীড়ন করে, অমানুষিকভাবে বন্দুকের কুঁদো দিয়া উহাকে মারে যে সে, হরিহর, মারা যায়; লখাই ইংরাজের নাম শ্রবণে খানিক ভীত হইলেও পূর্ব্বকার আক্রোশবশত সদম্ভে কহিল "শালা ইংরেজের গুষ্টির আমি তুষ্টি করব" এবং ইহার সহিত উদাত্তস্বরে "বন্দেমাতরং" শোনা গেল, লোকচরাচর প্রধূমিত হইল, শব্দে রোমাঞ্চিত হওয়ত লখাই একথা সকর্ণে শুনিতেই ভয়ে বিশীর্ণ কেননা সে শুনিয়াছে ইংরাজরা ছোট শিশু তুলিয়া পর্য্যন্ত আছাড় মারে আর গান গায় (সম্ভবত গড সেভ দি কিং) একারণে সে নির্জ্জীব, আপন মনেই বলিল, "আমি ত বাহমভনের ঔরসে..." আর তৎক্ষণাৎ আপন বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ অধরে স্থাপন করে এইভাবে কিছুক্ষণ চলিবার পর সে চোখের পাতা পুনঃ পুনঃ ফেলিতে অবস্থায় নিজের ইংরাজ সম্পর্কে উক্তিকে হয়ত মুছিয়া ফেলিবার মানসেই, জিজ্ঞাসা করে "ভগবান নিলে কেন" প্রথমে সুহা উত্তর না দিয়াই মাঠ ভাঙ্গিতে লাগিল, নিছক সাবধান সতর্ক করা নিবন্ধনে কিয়ৎক্ষণ পরে কহিল, "ও আল দিয়ে যাব না ওখানে মা মনসা আছেন" অনন্তর শোনা যায় মেঠো হাওয়া ভাঙা ভাঙা তাহারই বাক্যনিচয় "কপাল! পূর্ব্বজন্মের কম্ম ফল...পাপ নিশ্চয় হয়েছে না হলে..." তবুও এই সিদ্ধান্ত যে সেদিন তখন এই মাঠে লখাইএর মন মানিল না, পাপ! তাহারা ত নিত্য চুরি করে, সুহাকে যে শ্বশুরবাড়ী নেয় না এসব যুক্তি মনে ধোঁয়া তখনও তাহার ভগবানের উপর রাগ যায় নাই কেননা যে ভগবান তাহার মাকে কুৎসিত করিয়া গড়িয়াছেন! শুধু যে তাহার মা 'কেলে কুৎসিত' এমন নহে, এতই কুরূপা যে লোকে দেখিলে হাসে এইজন্য যে তাহার, লখাইএর মার বাঁকা মুখের একটি গাল চমকায় ফলে সর্ব্বজনের হাসির উদ্রেক করে, তাই লখাই গাল-চমকীর ছেলে, এবং এখন কেননা ভগবান কামিনীদিদির মত অসামান্য রূপবতী সুন্দরীকে প্রতারণা করিয়াছেন!—কামিনীদিদির নানান ছবি সুহার তুলনামূলক প্রশ্নের নিমিত্তই লখাইএর চোখে উদ্ভাসিত, এখনও তাহার চক্ষুর্দ্বয় নিমীলিত; তাহাকে যেমত কেহ ভর করি আছে অথচ নৃত্যভঙ্গিমাও পরিলক্ষিত হয় আর যে এই অবস্থায় লখাই ঘোষণা করিয়াছিল "আলবৎ...একশোবার তুমি...খুব...খুব সুন্দর সুন্দর..." এই উক্তি কোনক্রমেই লখাইএর হইতে পারে না, উপরে যে আকাশ নীলারুণজাম কিছুক্ষণ পরেই যেখানে অগণন তারকারাজি প্রতীয়মান হইবে, এখন যাহার নিম্ন অবকাশ বাদুড় ও পক্ষিদল দুর্দ্দান্ত গতিতে অতিক্রমশীল, ঐ বাক্যনিচয় সেইখান হইতে বিবিধ সত্যের একটি এইরূপে আগত, ইহাতে পৃথিবীর বাষ্প পর্য্যন্ত লাগে নাই অতীব শুদ্ধ এবং সুহা সুউষ্ণ একটি মহৎ রেশমী নিঃশ্বাসে আপনকার দেহকে স্বীয় কারণেই লাস্যময়ী প্রীতিপদ তথাহি শুভ্র শয্যায় রূপান্তরিত

করিল, মনে হয়, একদা ইতিমধ্যে সে কামিনীদিদিকে দেখে, সেখানে কোন ভীড় নাই তিনি আপনার প্রতিবিম্বের রাশ টানিয়া দণ্ডায়মানা, যাঁহার তপোভঙ্গকারী অধিক সৌন্দর্য্য এবং যোগিনী সংযম এই পোস্টঅফিস পীরচৌকিতে একমাত্র জাগ্রত সুখস্বপ্ন—যাঁহার অচিরাৎ বৈধব্যজনিত দুরদৃষ্ট সুহাকে বড় ভীরু করিয়াছে, শতবার নিঙড়াইয়াছে, গোপনে ঠাকুরকে এ সম্বন্ধে অনেক বলিতে তাহার ঠোঁট কাঁপিয়াছে, নির্ব্বোধের মতই বারম্বার এই সাধ পোষণ করে যে, যদি ভগবান, যদি এমন করেন—একবার করেন, পূর্ব্বকার দিন ফিরিয়া আসে, আর সে জবাপাড় শান্তিপুরী শাড়ী, যাহা সে নিজে কুঁচাইয়া রাখিবে, শাড়ীটি তাঁহাকে পরাইয়া এবং একটি কেয়া খয়েরযুক্ত পান খাইতে দিয়া তাঁহাকে, কামিনীদিদিকে দেখিবে, নয়নভরিয়া দেখিবে, সুহা আপন জীবনের সৌন্দর্য্যবোধ সাধ মিটাইবে, আপন কণ্ঠে আঁচল সংলগ্ন করত প্রাণ ভরিয়া প্রণাম করিবে এই বড় সাধ; এখন আপনকার—সুহার নিজের সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে লখাই প্রমুখাৎ আকাশের সত্য—যেখান হইতে বেদ আগত ব্রাহ্মণ্য আসিয়াছে আর আসিয়াছে যে "সে সুন্দরী" অবশ্য এই বিচার তাহাকে নিমেষেই অসংযত গর্ব্বিত করে নাই,—তাহার বুক একদা দুরুদুরু করিয়া উঠে, ঈষৎ ভাবিত, এখনও সে দেওয়ালের স্থির, লখাইএর উত্তরে সুহা আপন স্বভাবসুলভ 'ব্যাঃ' ছাগধ্বনি ঘোর অবিশ্বাসে মনে মনেই নিশ্চিত করিয়াছিল, মনে জানে, অবশ্যই বলিতেছিল, "যাঃ তোর সঙ্গে মস্করা করছিলুম দেখি কামিনীদিদির কথায় তুই কি বলিস..." কিন্তু আদতে লখাইএর ঘোষণায় সুহা যথার্থ খুসী কেননা অতঃপর তাহার কণ্ঠে ধ্বনিত হইল একটি অন্যতম প্রশ্ন—"আমার আঞ্জণি সত্ত্বেও" এইসূত্রে হঠাৎ-পাওয়া স্বীয় চিরকালীন বিভূতি হইতে—মায়ালোক হইতে যাহার বারিরাশি কখনও লবণাক্ত নহে, যেস্থানের ঈষৎ বৈচিত্র্য মরলোকের ভক্তির মধ্যে প্রচারিত, কণামাত্র ফুলে ফুলে—সেই অস্তিত্ব হইতে সুহা আপনার রম্য সৌখীন আয়ত নয়নদ্বয় তুলিয়াছে, তুলিয়াছিল, সে উত্তর শ্রবণেচ্ছু; আঞ্জণির উল্লেখে নৃত্যভঙ্গিমার অন্তর্নিহিত অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও প্রশ্নটি বুঝিবার সঙ্গেই ঝটিতি লখাই গোমেষাদি তাড়নায় "হিঃ রে রে" আওয়াজ করি উঠিল, পরক্ষণেই "আমিত বটে আছি" এই দুর্দ্ধর্ষ আত্মম্ভরিতা ও দম্ভসহ পদাঘাত শোনা যায়, তক্তাপোষ জীর্ণ হইল, অতএব ইহা জাহির হইয়া থাকে যে, সে—লখাই অবলাজনের আশা সহায় সম্বল, এবং তখন তখনই ঐ কথা বলিতেই, লখাই কিছুটা থতমত কেননা তাহার অনিচ্ছার কথাই মনে, অধুনা অনুচ্চারিত থাকিয়াও, ক্রিয়াশীল, আর যে এ সময় তাহার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ অধরোপরি স্থাপনার পরেও, অথচ, কহিয়াছিল যে "ভালক্ করে ঘষে দিব"—ইহা সত্য যে এই উক্তি নিজ কানে পৌঁছাইতেই সে শুধু গুঞ্জন সর্ব্বস্ব ও অনতিবিলম্বে অজানিতেই নিজ অঙ্গুলি চুষিতে নিরীহ; লখাইএর কথিত বাক্যনিচয়ের মধ্যে "বুলাইবার" জায়গায় "ঘষিয়া" প্রয়োগে, এই কক্ষের বহু আরাধনার চতুষ্কোণ বিকৃত, এখানকার অবকাশ অনার্য্য নিঃশ্বাসে ভারী; হয়ত, অথচ আশ্চর্য্য এই হয় যে, ইত্যাকার উত্তর—উত্তর অন্তর্গত ইঙ্গিত—সুহার দ্বারা খুবই শান্তভাবে সহজভাবে গৃহীত হইল; অথচ আশ্চর্য্য এই যে উত্তরটি সুহাকে তাহার আপনার হেমগাম্ভীর্য্য হইতে একেবারে খেদায় নাই তথাকার স্থিতিসত্ত্ব হইতে বঞ্চিত করে নাই; অথচ আশ্চর্য্য অন্যপক্ষে লখাই এখনও পূর্ব্বেকার মতই, তবু ঐ উক্তির পর কেমন যেমন নিশ্চয়ই তাহার গতকালের আগের দিনের কথা স্মরণ হয়, তখন এইরূপ ঘটে যে—নিত্যকার মত ভোর না হইতেই লখাই যখন আসিল না, তখন সুহাসিনী আর বিলম্ব করিতে পারে নাই, আজ তাহার আপনার আঞ্জণির জন্যই লখাইকে বড় প্রয়োজন ছিল সে উহাদের বাড়ী গিয়া উপস্থিত, এবং লখাইএর মাকে দেখিয়া সত্যই নিশ্চিন্ত—কেন না তাহার মন এ যাবৎ বলিতেছিল, হয়ত বা লখাই মায়ের সঙ্গে হাটে গিয়াছে—ইতিমধ্যে লখাইএর মা চেটাই দাওয়ায় পাতিয়াছিল, সুহা কহিল "ভাগ্যে, আমি বলি বুঝি তোমরা মায় পোয় শাক্ বেচতে গেছ...আঞ্জুণিতে বেজায়...সে ছোঁড়া কোথায়" বালকের ঘুম ভাঙ্গিয়া ছিল, সুহার স্বরে সে তড়িৎ আহত, ঘর হইতে বাহিরে কোনক্রমেই আসিতে চাহে নাই অথচ তথাপি কিন্তু এখান হইতে, ঘর হইতে, সঙ্গোপনে সুহাকে দেখিবার আগ্রহে সে মতিচ্ছন্ন, ত্বরিতে উঠিয়া একেবারে দেওয়ালে অদ্ভুত এক বিভঙ্গে লাগিয়া থাকিল—এমনভাবে যে যেমত সে দৌড়ায়, এতাদৃশ ভাবে কিয়ৎকাল অনুপবিষ্ট; দাওয়ায় আসীন সুহা যে নিজ পদদ্বয় খানিক মুড়িয়া কিঞ্চিৎ পিছনে সরাইয়া বসিয়া আছে অথচ আলতার বিন্যাস ওতপ্রোত এবং যাহার সমগ্র শরীরী ঈদৃশী আসনে বাম হাতের উপর ন্যস্ত, ইহার বোম্বাই বেঁকি রেশমী চুড়ি সকল কব্জির তথা সমস্ত বাহুর ডৌলত্বকে সহজ বোধ্য

করে, আর অন্য হাতখানি আধ-ময়লা বাসী কাপড়ের ভাঁজের প্রতিধ্বনিহীন এলোমেলো পাকা আরবী রেখানিচয় যেখানে ফুঁসিত চমকেই উদ্ধত বক্ষের শাসনে ছত্রাকারসম্ভব সেখানেই—ক্রমে রেখাগুলি একীভূত, উর্দ্ধগতি কাঁধ পার; সুহার মুখমণ্ডল পূর্ণ মাধুর্য্যে দিব্য নিপট বিস্ময় কেননা ললাটে কাঁচপোকা টিপের উপর অর্দ্ধমণ্ডলাকার চূর্ণবিচূর্ণ কুন্তল লেখা, কবরী সুখ-শিথানে শিথিল, এখনও সুহা আশ্চর্য্য! অপ্সর—অধুনা লখাই তাহাকে সুহাকে রহস্যনিগূঢ়তম দর্শনে, দরজার লম্বা ফাঁক দিয়া দেখিয়া নীলারুণ, একারণে যে বিগত দুইটি বৈকালে উহাতে সহসা বালকের যদিও এ বয়সে অনেক রাস্তা চিনিতে বাধ্য হইয়াছে—এক অভাবনীয় মানসিকতা নির্ম্মাণ তথা মন রচিত, উৎপন্ন—তাহাতে সে খানিক চলা-রাস্তা পুনরায় ফিরিয়া পুনরায় অতিক্রম করে, এইভাবে অগ্রসর হইয়াছে তাহাতে মনে হয় যে সে কভু খেলনা ভাঙে নাই, তাহাতে মনে হয় উহার যেন কেহ মরিয়া গিয়াছে, হয়ত তাহার এযাবৎ মতিত্ব, গিরলানদিও মতিত্ব, উপর্য্যুপরি তাহাতে লখাইএর বিশ্বাস জন্মে যে এমন মন্ত্র সে জানে যাহার দ্বারা পত্রের উপর চলিতে ও অনেক কিছুই করিতে সিদ্ধ তাহাতে যে সে আপন নিঃশ্বাস বায়ুর প্রতি নজর করিতে পারে; এবং এখন, কখন যে সে আপনার অগোচরে ক্রমে দরজার পাটা ধারণে বাঁকিয়া নিরীহ চক্ষু দুইটি অবলোকন মানসে সোজাই পরিষ্কার সুহার দৃষ্টির সম্মুখে আনিয়াছে, নিশ্চয়ই ইহা লখাইএর বুদ্ধি বহির্ভূত, তাহা জানা ছিল না, ফলে যখনই সুহা উহাকে দেখে তৎক্ষণাৎ সে অদৃশ্য; লখাইএর রকম বুঝিয়া মৃদু হাস্যে সুহা মন্তব্য করিল 'আ মলো যা আমি বলে যাতনায় কাত্‌রাচ্চি যার চোটে সাত সকালে ছুটে এলুম উনি মস্করা কচ্ছেন...ওটা কি হচ্চে...ইদিকে আয় জলদি..." এই কথাতেও লখাই যেমন তেমনই, কেবলমাত্র তাহাদের আলুনি ঘরের সর্ব্বত্রে চাহিল, আপন নগ্নতাহেতু সে বড় অসহায় পলকের জন্য তাহার মা'র প্রতি রাগ হয় যেহেতু বারবার সুহা বলিয়াছে তিন আনা চোদ্দ পয়সা গজে, গিরে বারো, দেশী ডোরিয়া কোরা মার্কিন আর একশো ষাট আলেকজেন্ডার সুতা কিনিয়া দিতে, তাহা দ্বারা সুহা ইজের করিয়া দিবে কিন্তু মা উত্তর করিয়াছে "কোথা পাব" কখনও বলিয়াছ "এ্যা উঃ তে রেঙ্গুন সেঃ ত তিনেক মিলবে...আমরা কেঙালী এঁটো খাগী আমাদের অততে"—এখন, লখাইএর চোখে নিত্যকার ছেঁড়া গামছার টেনিটাই পড়িল না, সেটাই বা কোথায়! অথচ লখাইএর ঈদৃশী মনোভাবনায় ছোট বিরক্তির মধ্যেও তাহারই অন্তঃস্থিত কেহ সুহার অদৃষ্টপূর্ব্ব অসামান্য সৌন্দর্য্য স্মরণে 'আহা আঃ' বলিয়া উঠে, তাই সে নীলারুণ, সে নিজে দেখে তথা উপলব্ধি করে যে দিক দিক হইতে, যেদিক রেলগাড়ী যায় সেদিক হইতে আর যে, বাসের গন্তব্য দিক হইতে, ধানক্ষেত যেখানে শেষ, মানুষ মরিয়া গেলে যেখানে যায়—তারা হয় পুকুরের নীচে যেখানে যক্ষের আবাস, সমস্ত দিক সকল হইতে বহমান ধারায় নদীকল্লোল করত সৌন্দর্য্য আসিয়া সুহার মুখমণ্ডলে জমিয়া যাগপ্রদীপ; হয়ত বহুজনম ব্যাপী ইহাতে সে ধ্যানস্থ, উপস্থিত আবার সে দেখিয়াছিল ও তাহার নিজের মধ্যে হলুদ শোভা; পুনর্ব্বার, এ সময় সুহার তিক্ত হুকুম অনুরোধ শ্রুত হয় "এই ছোঁড়া, আয়নারে আমি মরি যে রে" বক্তব্য কোকিলের কুহু হইয়া লখাইকে মণ্ডিত করিল আর যে সে অভ্যাসবশত পাপিয়া ডাকে সাড়া দিতে গিয়াও সে, আপনাকে সংবরণ করে, আপনার নগ্নতাহেতু বাস্তবিক সে সরমে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়, অবশ্য আশ্চর্য্য এভাব সম্পূর্ণ সদ্য নূতন—কেননা নবতম চেতনায় সে শুভ্র, ইহা তাহাকে অবনত মস্তকে সৌন্দর্য্যকে প্রণাম করিতে শিখায় যেহেতু, আদতে উহার বড়ই হায়া যে আঞ্জুণি সূত্রে সে সুহার নিকটস্থ হইবে, হঠাৎ লখাই দরজার ফাঁক দিয়া আপনার মাকে দেখিল, শতচ্ছিন্ন কাপড়ে দেহ আচ্ছাদিত তবু অনেকাংশে অনাবৃত, তাই ইচ্ছা হয় তখনই গিয়া স্তন্যপান করিতে আরম্ভ করে, যাহাতে লখাই এখনও অভ্যস্ত—এই সাধারণ ইচ্ছার মধ্যেই বালকের দৃষ্টির সমক্ষে ইহা সঠিক উদ্ভাসিত যে সে এক জাম বাটি দুধ দুই শক্ত হাতে তুলিয়া আকণ্ঠে পানরত ফলে নিমেষেই বাটিখানি প্রায় কপালে ঠেকে—বাটি যখন নিঃশেষ তখন তাহার মা কহিল, "হ্যাদে দেখ দুদে যে গোঁফ হয়ে গেল নে চেটে ফেল্ চেটে ফেল" একথায় লখাই উত্তর করিল "গোঁফ থাক গোঁফ থাক, পাকা গোঁফ আমি থুথড়ে বুড়ো"—হয়ত এ-দৃশ্য দেখা এ কারণ যে নিজ বয়সের জন্য লখাইএর বড় লজ্জা—একদা আপনার মুখখানি এমত করে যে তাহাতে সে বলিতে চাহে যে আঞ্জুণির কি আর কোন টোট্‌কা নাই, তাহার কেন যেন মনে হয় সে নিজেই যেন ঔষধ এবং পরক্ষণেই যে—লখাই গোঁফ হইয়াছে দেখে; আপাতত সে উলঙ্গ অবস্থাতেই ঘর ছাড়িয়া দরজার চৌকাঠ হইতে ত্বরিতে নামিয়াই জবুস্থবু,

অজস্র আলোর সম্মুখে স্তব্ধ, আপন অভ্যন্তর ধূসর, উহার হাঁটু দুইখানি অল্প ভাঙ্গা আর ছোট হস্তদ্বয় দ্বারা আপনার নগ্নতা ঢাকিতে তৎপর, ব্যস্ত, একমনা (হায় মানুষের লজ্জা কতটুকু), সুহাকে আপনার মাকে প্রত্যুষের লতাগুল্ম বৃক্ষাদি কোন কিছুই নিশ্চয় বালকের চোখে পড়ে নাই, শুধুমাত্র আলোই সে অবলোকন করে, অথচ এমত সময়ে উহার কণ্ঠনিঃসৃত কিয়ৎ পরিমাণে লজ্জার অনিচ্ছার আবদারের অনুনাসিক ধ্বনি 'হিঁ' আওয়াজে সমবেত দুইজনের হাস্য উদ্রেক হইল, সুহা কপট রাগে তথাপি কহিল "উকিরে আমার কাজ কম্মনেই ধ্যানাপানা দেখ...হঠাৎ এত লজ্জার কি হল?" বলিয়া সে আর কালক্ষেপ না করিয়া সত্বর আপন জানুর উপর ভর করত-একটু পথ অতিক্রমেই—বালককে নাগালের মধ্যে পাইতেই তাহার একটি হাত ধরে, ইহাতে তৎক্ষণাৎই বালক বাঁকিয়া অন্য দিকে ফিরিল, অবশ্য এভাবে খানিকক্ষণ থাকিয়া শেষে সে সহজ; সত্যই আর যখন লখাই জটিল দুর্বোধ্য নহে তখনই সুহাসিনী তাহাকে তির্য্যক দৃষ্টিপাতে পর্য্যবেক্ষণ ব্যতীত অন্য কোন পন্থা মনস্থ করিতে পারে নাই, এই হেতু ইহা পরিদৃশ্যমান যে, লখাইএর অঙ্গ মেটেসিঁদুর লাল, উহা যেন কোন গ্রাম্য দেবতা, শুধুই লাল, দুর্দ্ধর্ষ এমন উহা প্রাকৃত জনকে বড়ই অসহায় দুর্ব্বল প্রতিপন্ন করে-ক্রমে ধীরে সুহা সহজভাবে লখাইএর মুখখানি নির্ণয়ে সমর্থ, সেখানে ওষ্ঠের দুইপার্শ্বে লালার বিশুষ্ক রেখা, আপাতত সে, লখাই, স্বীয় লজ্জার আর যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তাহা দিয়া হাসে; এই ঘোর বাস্তবতার সঙ্গীণ আপৎকালের রূপ লইয়া সুহার মনে অশান্তি আনিল, উর্দ্ধে অধে চারিদিকে বাষ্পাচ্ছন্ন, কাহারাও দ্বারা সে এককালেই উৎক্ষিপ্ত এবং আকর্ষিত, সে দুঃস্থ হাভাতে, অসংখ্য করাঘাত নিজ বক্ষে শব্দায়মান, সে যেন ক্রমান্বয় এক ভয়ঙ্কর টানে পিছু হটিতেছে, তথাপি বালিকা আরবার দেখিতে প্রস্তুত, এতক্ষণ পর সে ঈষৎ সচেতন, যে লখাই তাহার সাক্ষাৎ ঔষধ নয় সত্যই সমগ্র দেহ নহে, উহা ভ্রম, শুধুমাত্র অঙ্গটি, যাহার জন্য লখাইএর এতেক লজ্জা—তাহাই সিঁদুর লিপ্ত, এখনও সুহা পূর্ণভাবে উন্মীলিত চক্ষে এদৃশ্যের প্রতি চাহিতে সাহসী হয় নাই—তাই আধবোজা চোখে সে আড়ষ্ট, এবং পর্য্যবেক্ষণ সেই বড় পুরাতন কোথায় উধাও স্তব্ধ—স্থির উপাসনার মূর্ত্ত সুমহান বিগ্রহ যদ্যাপি বিশেষ রক্তিম, ইহারই সম্মুখে বালিকা যে বহু শিব গড়িয়াছে যাহার রহস্যময় অন্তরীক্ষ হইতে রঙ সকল শুভযাত্রা করিয়া ইহলোকের বাঁশরীর শব্দের দায়িত্ব, যে অন্তরীক্ষের শূন্যতায় হ্লাদিনী-উজ্জীবিত-সাধ্য অক্ষর জ্যোতিপ্রভা, বীজকণা সমূহ পরিক্রমণ শীল, স্বেদ বিন্দু বিথার অর্থাৎ যাহা মোঘহীন নিষ্কলুষ পাপহীন পথ—বেগবতী নদীর তরঙ্গস্তর ভাঙ্গিয়া সেই স্থান হইতে কোন মমতাময় 'এসো এসো' কণ্ঠস্বর আসিতে থাকে, ইহাই সেই অক্ষয় বিগ্রহ যাঁহার নিকট শরণাগত ভক্তজন, দুগ্ধ তণ্ডুল বিল্বপত্র দানে অর্চ্চনা করত সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতে শুধু কামনা করে, যেন এই ত্রিতাপ বিকলাঙ্গ পৃথিবীতে পুনর্বার না আসিতে হয়, পুনর্জন্ম না হয়—ইহা এক আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য বোধ!—স্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া উহার প্রতি আকৃষ্ট সুহা বিস্মিত কহিল "খামখা এত সিঁদুর দিতে গেলি, কেনরে...দ্যুৎ কই কিছুটিত হয়নি" লখাই তখন সহজভাবে উত্তর করিল "মাইরি কাল রেতে..." কথা শেষ না হইতেই তাহার মা যোগ দিল "সে কিরে ওমা কই আমি ত কিছুটিক জানিনি আমায় বলবি ত" ইহাকে বালক বিরক্তি সহকারে জবাব করিল "আহা তোকে আবার কি বলবে" এবং এই সময়ে আপনার মায়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেই অপার্থিব এক কর্কশ যাতনায় সে কালো, সত্যই বড় ক্ষুব্ধ—বড় দুঃখ পায় যথার্থই সুন্দরীর—সুন্দরী বালিকার সান্নিধ্যে নিজ মাকে অতীব ভিখারী, কাঙালী, দেখে—যাহাকে দেখিবা মাত্র সমৃদ্ধিসম্পন্নদের কুকুর পর্য্যন্ত তাড়া করে এতদ্দৃষ্টে লখাই বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল—এত্যাবৎ গিরলানদিও মতিত্ব ভ্রান্তিমাত্র উহা বিড়ম্বিত অবশ্য কিছুক্ষণ নিমিত্তই; যদিচ সে ঐ তির্য্যক জবাব দিয়াছে তত্রাচ ইহাও সঠিক যে উহার আশঙ্কা হয়, এ কারণ যে এত বড় বুদ্ধিদীপ্ত মিথ্যাটি যদি প্রকাশ পায়!—এবং তখনই তাহার মন মোটর বাসের যান্ত্রিক শব্দের পূর্ণ ক্রমে সন্ধ্যা বিধৌত হইল, এইহেতু যে অবলীলা ক্রমে দারুণ আপশোষ, হয়ত, নিশ্চিত উদয় হয় যে 'হায় সবাই যতি মেয়েছেলে হতুম' আদতে লখাই—কেন যেন তাহাকে পাইয়া বসিয়াছিল, যোগীর ছেলে নয় তাহাকেই আঞ্জুণির ঔষধ হইতে হইবে তাই—নিজেই গত রাতে মেটে সিঁদুর লাগাইয়াছে কেননা একমাত্র এই উপায়ে সে অব্যাহতি পাইতে পারে বিশ্বাস হইয়াছিল হয়ত সিঁদুর মাখিয়া থাকিলে তাহাকে আর যোগীর ছেলেকে আনিতে যাইতে হইবে না—অতএব উচ্চ আড়া হইতে বহুদিন পূর্ব্বে রাখা সিঁদুরটি বাহির করিয়া গোপনে ব্যবহার করিয়াছে, এ কার্য্যে তাই স্বতঃই প্রমাণ যে সুহা প্রমুখাৎ ঐ নূতনতম মানসিকতার

অধিষ্ঠান বালকের মধ্যে সম্ভব হইয়াছে, এ যাবৎ বিশ্রী কি তাহা জানিত, এখন ইদানীং সৌন্দর্য্য বলিতে কি বুঝায় এ সত্য ধীরে বিকশিত প্রস্ফুটন হইতেছে—প্রতিমায় মাটি লাগে, তাহার মনস্থ মতিত্বকে হয়ত সে ত্যাগ করিতে উদ্যত সে এক অচিন্তনীয় মনোরমত্ব বুদ্ধির অধিকারী ফলে এত্যাবৎ যে ক্রিয়া-টোট্‌কা নিতান্ত সাধারণ নিঃসন্দেহে এখানকার জীবনযাত্রার প্রয়োজন, ছিছি করার কখনই নহে, সেই ব্যাপারই বালক লখাইএর নিকট আশ্চর্য্য হঠাৎ দুশ্চিন্তা ক্রমে অসঙ্গত, খারাপ বলি ধারণা জন্মায়, ইতিপূর্ব্বে সে খায়, সে ঘুমায়, খেলে, সাঁতার কাটে, পালায়, দরজা খোলে, বহন সক্ষম, রাগান্বিত হয়, মিথ্যা বলে, চুরি করে, দূরের বস্তুও দেখিতে পারে, শিকার করে, গম্ভীর নিঃশ্বাস লইয়া আমতা আমতা করে, বিড়ি খায়, মুখ খারাপ করে, এখনই পর দুঃখে আহা বলিতে পারে, নিজে কাঁদে, ইদানীং ভাগ্যশঃ সে সৌন্দর্য্য দর্শন করে, যে সুমহান তেজস্কর পুরাণ-কল্পিত সৌন্দর্য্য সুহাসিনীর উত্তমাঙ্গ আশ্রয়ে ভাস্বর, ভাস্বর হয়; এবং এতাদৃশ উত্তমাঙ্গের সমক্ষে, যে কোন নামেই সাধারণ কাজটি করিতে তাহার যারপরনাই আপত্তি রহে—এই সূত্রে আপন অঙ্গের অনেক কাঁচা কুৎসিত নাম কি হিন্দি কি বাঙলা বালকের স্মরণে আসিতে সে বিমূঢ় জিহ্বা কাটিল এইজন্য যে মনে হয়, সুহাদিদি সম্ভবত জানিতে পারিয়াছে—যথার্থ এসব নাম আজ উহাকে উহার মনকে অধিক ছোট করে বলি বোধহয়, বিশেষত গত রাত্রে লখাইকে শতচ্ছিন্ন করিয়াছে, বার বার মনে আসিয়াছে কিভাবে অব্যাহতি পাওয়া যায়, হাতে চন্দন কাঠটি লইয়া বরেশ্বার আঘ্রাণে, কায়মনোবাক্যে সৌরভ চালিত, অপূর্ব্ব মোহনবত্বের কিনারে সে অতর্কিতে পৌঁছিয়াছে, এমত কামনা ইদানীং আসে, ঐ স্থল হইতে আর যেন ফিরিতে কদাচ না হয়, ঈদৃশী অভিলাষ তাহার এনেথ মনে ধ্রুব! আরও ইহাও জাগে, যে সেই বিরাট ধ্বংসের মধ্যে তথা বাড়ীটির মধ্যে লুকাইবে যাহার নিঃসঙ্গতা অন্যের নিকট ত্রাসের কেননা অর্থাৎ আঞ্জুণি নিরাময় কার্য্য অত্যধিক পৈশাচিক এ-অন্ধকার মৎস্য-পিত্ত নীল তাহার মনে গাঢ় গূঢ় হইয়াছে, প্রায়ই উহার ওষ্ঠদ্বয় কম্পিত এই জিজ্ঞাসায় যে "পঞ্চানন্দ ঠাকুর সুহাদিদিকে এ অসুখ দিলে...আমি ছাড়া...আরও ত..." এখানেই সে থামিয়াছে, এইভাবে কাজে লাগার অনিচ্ছা তাহাকে উন্মত্ত অধীর করিতেছিল সর্ব্বক্ষণ "খারাপ" কথাটি এই সূত্রে বালককে যথেষ্ট জ্বালাতন করিয়াছে এবং ইহাতে যে দোষ হয় তাহা সে বুঝে যেহেতু—বিশ্লেষণ নিপুণতা এক এক সময় তাহার মধ্যে বেশ ভালভাবেই দেখা দেয়, কেন না সে যোগ করিতে দক্ষ, বিয়োগে দড়, স্বভাবত মিথ্যা কথনে দক্ষ একারণে যে সে চোর! এখন সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে উহার অহেতুক ভক্তি শ্রদ্ধা উদ্ভূত উদ্বুদ্ধ, সুদীর্ঘ মাঠপ্রান্তর অবশেষ দিকচক্রবাল বালকের দৃষ্টিতে পাথর; অধুনা সে সুহার প্রতি তাকাইতে পারে, কিন্তু অথচ অন্যপক্ষে সুহা ভারী চোখে পর্য্যবেক্ষণের পর মন্তব্য করিল, "দুঃ ঘোড়ার ডিম হয়েচ্ এ তো ভীমরতি...কামড়েছে না কচু..." অতঃপর সুহা লখাইএর মাকে প্রশ্ন করে "হ্যা গা মেটে সিঁদুরে কি দোষ হয়..." লখাইএর মা খুব বিশেষজ্ঞের রীতিতে উত্তর দিল "বালাই...ওতে পারাটারা থাকে না...পারাতেই ভয়...মুচে নিক না" একথা শুনিয়া সুহা বলিল "তাহলে যা যা মুচে আয় না হয় তুমি একটু যাও না...বড় যাতনা..." ইহাতে লখাইএর মা কহিল "আমার কাপড় ছাড়া হয়নি" সুহার নিকট অবশ্য ইদানীং কেবল যাতনা ব্যতীত আঞ্জণি—কিছুদিন পূর্ব্বের ধারণায় যাহা অতি সাধারণ রোগ—বিকৃতি উহা খুঁত, চোখের পাতার তথা দীঘল নয়নদ্বয় যে চতুর নয়নযুগ ক্রমান্বয় দিনে দিনে চাকচিক্যে অভিনয় হইতেছে তাহার উপরেই—সেখানেই, করমচা রেশমী ছোঁয়া—কিন্তু এইটুকুই সত্যসত্যই বালিকার মুখখানিকে অপরিসীম, ভাবব্যঞ্জক বড়ই মধুর করিয়াছে—কিন্তু সুহার উহা ভাল লাগে না পরন্তু তাহার ইহাতে অথৈ ক্ষোভ, অপছন্দে সে ক্ষুণ্ণ; এ কারণ যে, রেশমী ছোঁয়াটুকুতে তাহার দীপ্ত ভাবনা, গভীর সৌন্দর্য্যধ্যান কালো, বিশেষত যখন সে নিত্যসুন্দরী লাবণ্যময়ী শ্রীসম্পন্না ললিত; ইতিমধ্যে লখাই পরিচ্ছন্ন, অনন্য উপায়ে লখাই একবার বলিতে চেষ্টা করে যে, সে যোগীর ছেলেকে আনিতে পারিবেনা, যেহেতু তাহার খারাপ লাগে, সুহা তাহাদের বাড়ী যাক কিন্তু সে বলিতে পারে নাই, এবং শিশুটিকে আনে—ধীরে ধীরে আসিল, সে সর্ব্বৈব প্রস্তুত তথাপি বেচারী লজ্জায় নিশ্চিহ্ন, তদ্দৃষ্টে সুহা, বোধহয় মৃদুহাস্য সহকারে, বলে "মরি মরি আবার নজ্জা..." এবং সুহা নিজ জানু ভাঙ্গিয়া পদদ্বয় উপরে স্বীয় বয়সোচিত গুরুনিতম্ব স্থাপনা করি বসে, যাহাতে লখাই যথাসম্ভব নিকট হইতে পারে, অন্যপক্ষে লখাইও উহার যুক্তজঙ্ঘার দুই পাশে—যেখানে অনেক বস্ত্রের বিস্তার হেতু রেখা ঘোর—পদদ্বয় রাখিয়া দণ্ডায়মান, এই সময় বালক যে কখন

আপনকার ছোট তর্জ্জনীশীর্ষ দাঁত দিয়া মৃদু চাপ দিতে সুরু করে ইহা লিখিত নাই ও যুগপৎ দেখে, সুহার মুখের প্রতিবিন্দুতে রূপ মাধুর্য্য! এবম্বিধ দর্শনে বালকের আঁখি ঝুরে সে এ সৌন্দর্য্যের ইতি করিতে বিকল; একদা, ঝটিতি এই অদৃষ্টপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন, যাহার সুহার বলিতে গেলে নিত্যসহচর সে, লখাই, এই পরিবর্ত্তনের জন্য কখনই এতটুকু প্রস্তুত ছিল না, রোদে-ঝড়ে-জলে ঠোঁট-চাপা সন্তর্পণে যখন সুহার প্রতিবিম্ব ধারণে, জল স্তর ত্রস্ত এবং পলায়নে, বালিকাকে সে বহুভাবেই দেখিয়াছে কিম্বা আসলে উহাকে দেখেই নাই, যাহার জীবৎকাল এতাবৎ খাদ্য-অন্বেষী পাখীর-শালিকের—ধূর্ত্ত পদক্ষেপের গতি ভিন্ন অন্য নহে সহসা ঈদৃশী পরিবর্ত্তনে, যখন প্রথম দেখে, সুহাদের ঘরেই সে, লখাই, ছেঁড়া কাগজ, সে গীত ভুলিয়াছিল তাহার হস্তযুগও এই রূপলাবণ্য দর্শনে, পদদ্বয়, সে যেন অসংখ্য মার্ব্বেলের উপর দিয়া ব্রঞ্জের অণুকণার বিশেষত্বের মধ্য দিয়া সে চলিতেছে, তাহার খুরের আওয়াজে ত্রিভুবন সজাগ, এবং হামাগুড়ি দিতে থাকা অবস্থায় মুখ বাঁকাইয়া দেখিল, সুহাসিনী, এবম্বিধ দর্শন ঔৎসুক্যপরতন্ত্র কালে লখাই অনুপবিষ্ট ভাবে ব্যাপইষ্টির সূক্ষ্ম মন্থরতার ইঙ্গিত করিতে পারিত খানিক আরবার হামাগুড়ি দিতেই বালকের চক্ষু বিস্ফারিত নিশ্চিত সম্মুখে বন অন্ধকার সেইহেতু সে ত্বরিতে ফিরিয়া আসে কেননা ঐখানে যদি যায় উহার শান্ত খুর নখ হইবে, অথবা ভয়ঙ্কর শৃঙ্গী হইয়া দেখা দিবে, এমত আসন ত্যাগ করাতে এখন সে গড়াইয়া শায়িত কড়িকাঠ প্রত্যক্ষ হইতেই কাহার এক বজ্রমুষ্টি উহার ছোট বুকে ঘোরাফেরা করিল, প্রথমেই মনে হয় তাহাদের বালিশ নাই তখনই আপনার হাতের উপর মস্তক তুলিয়া তখন একটি মৃত্তিকা ধূসর মায়িক প্রশ্নে সে নীল অবশেষে শুধু নাক টানিয়া শ্লেষ্মাযুক্ত স্বরে কহিল "আমি মরে গেলে তুমি কাঁদবে" কণ্ঠ আড়ষ্ট হইয়াছিল; এ হেন সৌন্দর্য্য হইতে উষ্ণ অশ্রুপাত যে অশ্রুবিষয়ে বন্দরে স্টেশনে দাঁড়াইয়া মানুষ দেওয়াল আকর্ষণ করিতে চাহিয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে ঠাকুরকে বারেক প্রশ্ন করিয়াছে, ঠাকুর সস্নেহে উত্তর দিয়াছেন "অশ্রু তোমার সৌন্দর্য্যবোধনিমিত্ত" লখাই অশ্রু চাহিয়াছিল, সে মার্ব্বেল অথবা ব্রঞ্জ, তবু; সুহাকে এতেক সুন্দরী দর্শনে বিমোহিত, দেখিল সে ডুবসাঁতার কাটিতেছে উপরে নীচে জল আর জল যেথা প্রগাঢ় শ্যাওলা সবুজ, সহসা জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এত সুন্দর কি করে হলে গো" ইহার উত্তরে সুহা বলিয়াছিল "সে একটা ম্যাজিক...ম্যাজিক আছে আঃ!" এই ম্যাজিক বাক্যটি কি পর্য্যন্ত রহস্যময়, কত সহজে সুহা উচ্চারণ করে; লখাইএর বিশ্বাসের জন্য ইহাই যথেষ্ট, এ কারণ যে, সুহা যে অনেক ম্যাজিক জানে, তাহা সে অবহিত—কত রকমারি ম্যাজিক, খাম খোলা, আঙ্গুলে সুতার খেলার কৌশলে, জলে ছুঁচ ভাসান, কাগজের দোয়াত-নৌকা করার পটুত্বে—প্রত্যেকটিই ম্যাজিক!—অবশ্য যখনই ঐ সব বিষয়ে সে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া জানিতে চাহিলে তাহার জবাবে, ম্যাজিক! শুনিয়াছে কিন্তু ইদানীং এই ম্যাজিক অদৃষ্টপূর্ব্ব!—ইহার সুদূর অবশেষে স্বচ্ছতা রঙ্গিল সেখানে শান্তিদায়ক শয্যার একটি নাম ক্রমাগতই নীল অম্বুরাশি তরঙ্গে আনীত, উদীয়মান আবার ঝটিতি উধাও!—এবং ইহার বাতাস লখাইএর মুখে লাগিয়াছে, সে তন্ময় নিস্পন্দ নিতান্ত প্রয়োজন একদা পা কোনমতে আঘাত করত সাড় ফিরাইয়াছে, ঈদৃশী ম্যাজিক জানিতে চাহিয়াছে; যাহাতে সুহা আপনকার সৌন্দর্য্য হইতে প্রথমে বলিয়াছে "তুই বেটাছেলে, এ ম্যাজিক জেনে তোর কি হবে" ও পরে আশ্বাস দিয়াছে লখাই যদি কাহাকেও একথা না বলে তাহা হইলে নিশ্চয়ই ম্যাজিক শিখাইবে, তাই লখাই কোন কথাই তাহার মাকে অবধি বলে নাই; আপাতত, সে সুহার মুখপানে চাহিয়া ছিল, দেখিল সুহা আজব পদ্ধতিতে আলস্য ভাঙে আর এই সঙ্গে হাস্যকর বৃহৎ এক হাই তুলিয়াছিল, ফলে উহার কানের উচ্ছেফুল মাকড়ী এদিক সেদিক, কিন্তু এ-কার্য্যে বালকের ঈষৎ বিঘ্ন উৎপাদন করে নাই, সুহা তেমনই সুন্দর, কিশোরীকে দেখিতে লক্ষ্য করিতে লখাইও একটি হাই সংবরণে বিকৃত—এই হাইতে মায়াময় ধাতুগত শব্দ আপনার কানে বাজিয়া উঠিয়া ক্রমে লুপ্ত, অধুনা এক অন্ধকার গহ্বর সেস্থানে দেখা দেয়, এ গহ্বর পূর্ণ করিয়া যদি ধানকলের বাঁশীর আওয়াজ আসিত তবে সত্যই প্রীতিপ্রদ হয়—বালক বহুদূরে একা একা চলিয়া গিয়াছিল অথচ সুহার দিব্য উত্তমাঙ্গ উহার নয়ন হইতে অদৃশ্য হয় নাই; সৌন্দর্য্যের সম্মুখে এরূপভাবে থাকা আর তাহার সহিতে ছিল না, অন্যমনস্ক হইবার মানসে সে আপনার হাতের প্রতি লক্ষ্য করে এখনও সেখানে মেটে-সিঁদুরের লাল, যাহা অব্যর্থ অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু নিষ্ফল হইত—হইলই; এ সময় শিশুকে আপন এক হস্ত দ্বারা যুত করিতে অন্য হস্ত দ্বারা উহারই অঙ্গ ক্রমে সুদীর্ঘ নয়নের সমক্ষে লইয়া গেল, ক্রমে শিশু অঙ্গ হঠাৎ আঁখিপল্লব স্পর্শনপ্রত্যক্ষে বালকের

সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত, বাঁকিয়া যায়, অদ্ভুত লজ্জায় হয়ত, মন ছিছি করি উঠে, এ ব্যাপারকে যথার্থই সুনিশ্চিত তিক্ত ঘৃণাই বুঝে, মনে মনে নির্ঘাত আবাল্য শোনা কথাটি উক্ত হয় যে—গঙ্গা যিনি পরম ঈশ্বরী, যিনি পাপহারিণী তাঁহাতে এক মুঠা সরিষা লইয়া 'মা গো' বলিয়া ডুব দিলে যদি এ-পাপ যায়, আর যে বাহ্যত অন্য মনোবৃত্তিতে লখাইএর পদাঘাত, আপশোষে, করার ইচ্ছা উপস্থিত; কিন্তু অন্যপক্ষে সে আঙুল চুষে এই হেতু যে সুহা তখন নিজেই আপন কার্য্য সম্পাদন করিতেছিল এবং শ্লেষ্মা উহা এমন যে সে ন্যাকা ও বলিতে ইচ্ছুক "বামভবনের ঔরসে", সুহা অতি শান্তচিত্তে স্বাভাবিক ভাবে অঞ্জুণি উপশমার্থে ক্রিয়া সমাধানের পর কহিল "যা ওকে দিয়ে আয়" লখাই যোগীর ছেলেকে সেখানে রাখিয়া ত্বরিতে ঘরে ঢুকিয়া অল্পক্ষণ শ্লথ গতিতে পদচারণার পর দেওয়ালের মুখোমুখি দাঁড়াইল; ক্রমে ধীরে, সন্তর্পণে, আপন মস্তক চক্রাকারে ঘুরাইয়া সকল বস্তুর প্রতি অসহায়ভাবে নিরীক্ষণরত, এবং একটি হাতের নখের দ্বারা সে দেওয়ালের মাটি খুঁড়ে—সে বড় দুঃখী তাহাকে কেহ যেন আর ছুঁইবে না—কেহ নয়, এ বড় দীর্ঘশ্বাস-দায়ী কলঙ্ক! কিন্তু এখন ইত্যাকার উক্তি 'ঘষে...' যাহাতে কক্ষপ্রাণ চতুষ্কোণ ধ্বংস তাহা শ্রবণে সুহা সুখী তথাপি নিজ প্রশ্নের খুব সরল উত্তরের আশায়, তক্তাপোষের উপর লখাইএর প্রতি দেখে—দেখে লখাইএর দেহে নৃত্যের ভঙ্গিমা থাকা সত্ত্বেও, আপন কান ধরিল, ছোট চাঁটি নিজ গালে মারিল এ কারণ যে গর্হিত ভাষা ব্যবহারে সে অপরাধ করিয়াছে বুঝিয়াছিল, অনন্তর তাহার শুদ্ধ কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'মাইরী মাইরী মাইরী অঞ্জুণির দিকে চোখ টানে না, নেই বললেই হয়...কি কি সুন্দর...' এবং আর কোন প্রশ্নের আগেই নিজেই কহিল "বাবুদের বাগানে পরী" বলিয়াই সে আত্মস্থ, এই হেতু যে পরীকে অনুসন্ধান করা তাহার বিরাট দায়িত্ব হইয়া এখনও হয়ত আছে, অধুনা কোন মতে শেষ করিল "আমি দেখেছি, মাঃবেলের পরী তেমন কিছু নয়...তুমি ঢেল সুন্দর..." এসকল কথায় সুহা এত খুসী যে, লখাইএর অনুরোধ মাত্রই গীত গাহিতে উৎসাহী, ফলে আনন্দে লখাই বালিকার গাত্রে নানাবিধ শব্দ নিজ মুখ স্থাপন করিতে ক্ষণেই বলিয়া উঠে "দাঁড়াও সুহাদিদি, একবাট্টি মাকে ডাকি" আর যে অনুমতির অপেক্ষা না রাখিয়া, তখনই ক্ষিপ্রগতি সে দরজা দিয়া বাহির হওয়ত বারন্দাপার, উঠানে লাফাইয়া পড়িতেই হাঁসগুলি ছিন্ন ভিন্ন, সে খানিক, ইতস্তত মধ্যে, পরক্ষণেই নিজ পশ্চাদ্দেশ বাজাইতে ব্যস্ত, ঝিঙে ফুল কাঁকুড় করিয়া মুখে ব্যাণ্ড বাজাইয়া গাহে 'বো ব্যান ব্যান শো শ্যান ভোঁপ ভোঁ' এইভাবে কিছু পথ অতিক্রম হয়, হঠাৎ সে থমকাইল, কেন না সে ছোটপুকুরের পাড় বাহিয়া বেগ সামলাইতে না পারার হেতু প্রায় জলের কিনারে, অজস্র পানা এবং ইহারই মধ্যে একটি শালুক ফুল উত্তিন্ন অন্যত্রে ঘাটে বিরক্তিকর ছচ্ছড় তাহার মা শাক ধোয়, চপলমতি বালক এই পরিবেশ দর্শনে জলবিন্দু পুকুরের মধ্যে পালা দেওয়া তাই ভৌতিক ডালগুলি প্রকীর্ণ এখানে সেখানে আঁধার আঁস-গন্ধ জল, সমগ্র বিদ্যমানতায় লখাই বিমর্ষ, কণ্ঠে স্বরবর্ণ শুকায়, ও যুগপৎ কোন নির্জ্জনতার সম্মুখীন—সেখানে কেহ নাই কিছু নাই বাতাস নাই, তাহার বড় আদরের নবতম মানসিকতা পর্য্যন্ত ডুবিয়াছে যাহার দুয়েকটি বুদ্বুদ অতএব জাত, দৃশ্যমান, এই ক্লীব নির্জ্জনতার একান্তে তাহার মার উত্তোলিত শাকধৃত হস্ত হইতে জল ঝরার বিশ্রী শব্দ, ছচ্ছড় অনবরতই—ইহা এক বড় বোকা শব্দ, এ আওয়াজ লখাইকে বড়ই একা করে, অসহ্য একা, তথাপি সে চক্ষু তুলিল, দেখে, বুঝিল; সঙ্গীন অভিমানে পুকুরের অন্য পাড়ে অগণিত কলাগাছের মধ্য দিয়া অস্তমিত সূর্য্য ক্রমে আকাশের প্রতি—এ সময় টিয়ার দুঃসহ বেগ, চিলের একে একে চক্রাকার অধোগতি আর অন্য পাখীদের অস্তিত্বে তাহার ব্যাঘাত হয় নাই—দৃষ্টিপাত করিতেই সে ক্ষুব্ধ আর্ত্ত রুগ্ন বিষণ্ণ অসহায় অনাথ, উর্দ্ধ হইতে আরও উর্দ্ধে চাহিতে চেষ্টা করে, কেবল দূরত্বই হয়ত সে খুঁজিয়াছিল, এখন মুখ নামাইতেই স্কন্ধে ঈষৎ বেদনা অনুভব হয়, আর তৎক্ষণাৎই ভগবানের বিষয়ে তাহার পুরাতন অসহিষ্ণুতায়, এমনকি রাগে, নিঃশ্বাস উত্তপ্ত হইয়াছে—বহুদিন পর এই মনোবৃত্তি আবার সজাগ, হয়ত সত্যই বালক ইহার নিমিত্ত প্রস্তুতই ছিল না, উহার ছোট দেহ এপাশ ওপাশ দুলিল, পুনর্ব্বার পুষ্করিণীর উপর ইতস্তত বিচরণশীল ফড়িঙের আসা যাওয়ার দিকে দিকে পালার আঁধার নিরীক্ষণের পরে ধীরে সে আপনার মাকে দেখে, দেখিল, আধো-আলোর মধ্যে মধ্যে কালো, আশ্চর্য্য তাহার মাকে ঐ কালোয় আর সাধারণত যেমন দেখায় তেমন দেখায় না, নিঃশ্বাসবায়ু তাহার বুকে তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল, এই আবিষ্কারে সে যারপরনাই খুসী, হায় এমত-এক অন্ধকার যদি তাহার মাকে সব সময় ঘিরিয়া থাকিত!—এরূপ মনোভাব হয়ত উদয়

হয়, কেন না সহসা আপনার অজানিতেই তাহার কণ্ঠে "আঃ অন্ধকার!" ধ্বনিত হইয়া উঠে, আনন্দে পা নাচাইয়াই, পদদ্বারা ভূমিতে আঘাত করিল—এবং ইহা নিশ্চয় যে সে অন্ধকারকে ভালবাসিল, চকিতে একটি খোলামকুচি কুড়াইয়া জলস্তরে ছুঁড়িয়া দেয়, আর বিভিন্ন চক্রের প্রতি—তখনও দেখা যায়,—তাকাইয়া কহিল "মা চ চ শিগ্‌গীরি চ সুহাদিদিকে দেখবি চ" লখাইএর মার তখন শাক ধোয়া শেষ, খানিক জলে নামিয়া এখন সে কুলকুচি করে, ইহার শব্দ শ্রুত হয়, মুখের জল পিচকারি দিয়া ফেলিতে ক্ষণে পুত্রের দিকে চাহিল, শেষে কহিল, "পাগল নাকি কোথা যাব কাজকম্ম নেই..." ইহাতে লখাইএর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল, সে তিক্ত উত্তর দেয় "রেখে দে তোর কাজ—কাজ হবেখনে" পরে ধীরে "কি যে সুন্দর না কি বলব রাণীর মত চ না" এই রাণীর মত উপমা, নিশ্চয় কোন যাত্রায় দেখা রাণীর মত সম্পূর্ণ সংজ্ঞা লাভের আশেই লখাই সুহাকে গান বলিতে অনুরোধ করে, লখাইএর মা পুত্রের কথা শুনিয়া মুখে জল থাকা কারণেই সুদীর্ঘ 'উ' আওয়াজে সাড়া দেয়, এবার জল ফেলিয়া বলিল "তাই নাকি বলিস কি" তাহার উক্তি মিশ্রিত বিস্ময় লখাইকে হৃষ্ট করে, বিশেষত তাহার মার শ্রীহীনতা মুদ্রা দোষ যখনই সে বিস্ময়াপন্ন হয় তখনই বড়ই হাস্যকর কদাকার,—এ দোষ লখাইকে ইদানীং কিয়ৎ পরিমাণে নিছক অন্যমনস্ক থাকিয়া থাকিয়া করে, যাহা একপ্রকার সে ভুলিয়াছিল—এখন আশ্চর্য্য লখাইএর মার গাল-চমকান নজরে পড়ে নাই, কেননা অন্ধকার, ফলে সে অন্ধকারকে সুখমনে খুসী চোখে দেখে, উহার মা ইতিমধ্যে কহিল, "সন্দে দিতে হবে না, বাড়ী সেরে..." লখাই এ সময়ে, ঘাটের কাছে আসিয়া মার বিড়ির বাক্‌স হইতে একটি বিড়ি লইয়া ধরতাইএর দিকটা মুখে পুরিয়া সজোরে ফুঁ দিল, পরক্ষণে ধরাইয়া ধোঁয়া ছাড়িতে কহিল, "গুলি মার্ সন্দে ফন্দে চ চ" এই কথার সঙ্গে সঙ্গে বালক দশাসই, সে অক্লেশে অনায়াসে যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই পরাজিত করিতে যোয়ান, এখন ঝটিতি যোহন একাদশীর কথা প্রথমে, দূর কোন মন্দিরের ত্রিশূল তাহার সমক্ষে উদয় হয়, কিন্তু এ সব বালককে বিড়বিড় করিতেই অনুপ্রাণিত করে, এবং পুনঃ সে গল্প বলার রীতিতে বলিল "চল্ না...চ...না" আর নিজ হাতের বিড়িটা তাহার মাকে দিবার কারণে হাতখানি প্রসারিত করে, এ সম্প্রসারণের গায়ে আশ্চর্য্য বাসালত্ উৎকীর্ণ মহিমা ছিল, ইহাতে তাহার মা কহিল "না খাস্‌ত নিভিয়ে রাখ্—আমার সন্দে দিতে হবে যে"; খানিকক্ষণ কোন কথা নাই, এখন নিস্তব্ধতা তাহার কাছে কাটা-নখ, কেবল ছেঁড়া কাপড় নিঙড়ানর হেতু সম্ভবত কর্কশপ্রধান শব্দ,—যাহা নিমেষেই থামিল, তাহার মা পুরুষোচিত হিম্মতের আওয়াজ করত শাকের বোঝা মাথায় ঝুলিয়াছে; ক্রমে মাতা-পুত্রে পোস্ট অফিসের নিকট; দরজা খোলা—ঘরে আলো আছে, অথচ ধুনা দেওয়ার জন্য স্তিমিত ধোঁয়াপূর্ণ ঘর, লখাই কানে বিড়িটি গুঁজিয়া ডাকিল, "কই গো দিদি কোতায় গো", সুহা দেখা দিল, তাহার হাতে সন্ধ্যাদীপ, চক্ষুর্দ্বয় তুলিয়া বলিল "সাত কাজে সন্দে দিতে দেরী—বাবা দেখলে হাঁ হাঁ করবে...দাঁড়াও" এখন সুহার ওষ্ঠে মৃদু হাস্য ছিল, এ হাস্যে বৈষ্ণব কাব্যসুধর! লখাইএর মা সুহা দর্শনে ভাবুক স্তম্ভিত উহার মাথার উপর চাকনে শাকের জল শীর্ণধারে গড়াইয়া পড়ে ফলে বাম গালের চমকান ঝটিতেই চঞ্চলগতি, সত্যই সে বিহ্বল, অলৌকিক-আহত বিস্ময়াবিষ্ট, সুহা এখনও দরজার চৌকাটে—পশ্চাতে ধোঁয়ার এলোমেলো রেখায় সব কিছু দৈবীমায়া, এবং সে দেখিল, লখাইএর মার হস্তদ্বয় একটি সুঅঙ্কিত নমস্কারে এক, আর যে উহার মস্তকের বোঝার স্থিতি রক্ষা করনে মাথা ধীরে ধীরে দোলে, ভিজা কাপড় হেতু সর্ব্বাঙ্গ জড়ীভূত, আটকান; সুহা উহাকে একপ্রকার চাবুক প্রত্যক্ষে অভিভূত—স্নায়ু ছিল না, ফলে সে আড়ষ্ট নহে, অন্যপক্ষে লখাইয়ের মা কচিৎ নিঃশ্বাসে বর্ত্তমানতায় আসিল, অধুনা সে আপন জঙ্ঘায় জুড়িয়া যাওয়া বস্ত্র খণ্ড এক হাতে আলগা করে, অন্যহস্ত বোঝাধৃত, বোঝাবহনে আজীবন ক্লান্তি দূর হইয়া গেল, আজন্মের কাঙাল স্বর উহার কণ্ঠ হইতে নিসৃত হয় "মাগো রাজলক্ষ্মী দঃশন হল সত্যি সত্যি" আজ লক্ষ্মী-রাজলক্ষ্মী শ্রবণে সুহাসিনী চকিতেই বিদ্যুল্লতা, দেহ নাই, এবার রোমহর্ষে হস্তস্থিত প্রদীপ স্বীয় প্রতীকত্ব ভাঙ্গিয়া কম্পিত; আর লখাই যে সে কি সে করে, মায়ের স্বীকৃতি বিশ্বাস তাহার স্কন্ধকে পেশীযুক্ত করে, সে লাফাইতে জানে, মাটিতে গড়াগড়ি দিতে পাকা, কান্দিতে জোয়ান, হেলে সাপের ন্যাজ ধরিয়া ঘুরাইয়া নিক্ষেপে চতুর, সুহা আপনকার উন্নত গ্রীবা বাঁকাইয়া বালকের প্রতি অবলোকন করে, দেখিল লখাই আপন করতলে মস্তক ন্যস্ত—দেহ সর্পিল ভঙ্গিমায় সঞ্চালন রত, সুহা মৃদুহাস্যে স্বীয় মাথার-কাপড় সঠিক করিতে যাইবে, তখনই পুনর্বার লখাইএর মা উচ্চারণ করিয়াছে "মাইরী

গুরুজী...ঠিক ঠিক" বলিয়া অভিভূত, এমন কি স্পন্দন নাই, জলময় তবু অনুভবহীন, কিয়ৎক্ষণ স্থবির; এখনকার নিরীহ স্তব্ধতার অন্তর্বর্ত্তী কেবলমাত্র প্রদীপ শিখাই নিয়মপরতন্ত্র, এইটুকুই তাদের পক্ষে বন্ধন, শ্রেয়, নিপট—সেই প্রতি পর্য্যবেক্ষণে লখাইএর মা ঈষৎ শৈত্য বোধে কহিল "এখন আসি" সুহার লখাইএর মার স্বাভাবিক গাল-চমকান মনেও পড়ে নাই, তাহার আয়ত নয়নদ্বয়ে শিখা প্রতিফলিত; আশ্চর্য্য এক সময় লখাই নিজ উচ্ছ্বাস হইতে কোন প্রকার কিছুই বলে নাই, মায়ের হাত ধরিবার কারণে আপনার হাত দ্বারা নাগাল সন্ধান করে—গৃহ প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য প্রস্তুত, ঘুরিয়া দাঁড়াইতেই ধন্ধা, আঁধার যেহেতু, লাগিবার মুহূর্ত্তেই উহার সাতিশয় ঔৎসুক্য অধীর যে, সুহাকে সে কোন স্থান হইতে লুকাইয়া দেখিবে, ইহাতে হয়ত, সে ফ্রেম চাহিয়াছে—এখন যাহা দর্শনে ধন্ধা লাগে তাহা বৈমাত্রের অন্ধকার !—বেশ কিছু পূর্ব্বাহ্ণে যখন সে তখনও তক্তাপোষে উঠে নাই সৌন্দর্য্য সান্নিধ্যে বিশেষ অপরিমিত উল্লাসে মুখে চীৎকারে যখন কাষ্ঠবৎ ঠিক সেই ক্ষণেই এরূপ অন্ধকার দেখে, নজরশক্তি ভেদ অপারগ—চারিঠাঁই ঘন ঘটা কালো রূঢ় বাত্যা ঝটিকায় সৃষ্টি অসহায়, তালগাছের শীর্ষ হাহাকার করিতেছে, ডালগুলি এখানে সেখানে নিঃক্ষিপ্ত, কোনটি জলে পড়ে, ভয়প্রদ শব্দ হয়—প্রকম্পিত আর সে মুখ ব্যাদান করত অথবা অন্য কেহ উহা সকলের আত্মম্ভরি প্রতিধ্বনি করিতে উন্মাদ; সমুখের গৃহ প্রত্যাবর্ত্তনের পথের অন্ধকার দৃষ্টে সে শুষ্ক হয় নাই, অবিলম্বে তদীয় মার দিকে চাহিল—ছোট নির্ভরতায় বুঝে উহাতে ভয় নাই হয়ত মাভৈ বলিতেও ইচ্ছা হয়—দেখিল জলকণা যাহাতে খানিক ব্যবধান হইতে আগত দীপালোক আকৃষ্ট, ঝরিয়া পড়িতেছে, একদা চোখ ফিরাইয়া তুলসী তলার প্রতি অবলোকন করে, দেখিল সুহা অবগুণ্ঠিত গললগ্নীকৃতবাস ভক্তিভরে প্রণামে বিচিত্র, ইহাতে লখাই আপন স্বরকে সরসিত করত চক্ষু ফিরাইয়া অন্ধকার আধিক্যে নিমিত্ত মাত্র, যুগপৎ তাহার মনস্থ হয়, যে সে হাট হইতে পিস্তল কিনিবে, বড় হইয়া দোনলা কিনিবে এবং এখনই এই অন্ধকারকে মারিবে—আশ্চর্য্য অথচ কিছুক্ষণ পূর্ব্বে সে অন্ধকারকে আপন বাহুতে মাথা রাখিয়া মনে হয় শুইতে দিতে চাহিয়াছিল, সম্ভবত সে অন্ধকার অন্য হয়—এবং এখনই তাহার মাকে প্রশ্ন করে "হ্যাঁ গো তুলসী গাছে কি ঠাকুর থাকে..." তাহার উচ্চারণ রীতি অসম্ভব ভাবুক, এবং তাহার মা কি উত্তর দেয় তাহা উহার মরমে পৌঁছায় নাই এ কারণে যে মনে পূর্ব্বে দেখা একটি আকাশ শিথিল গুঞ্জণ হইয়া খেলে, যাহার দিকে নয়ন মেলিলে নিজেকে দূর মনে হয়—কেননা সুহা উহার দিকে তাকাইয়া, আকাশের দিকে—নিলিছ-ড্যাঙ্গার মাঠে বিশাল বট তলায় চিৎ হইয়া শুইয়া, সে একটি গল্প বলে যে ছোট একটি বালক ভগবানকে চিঠি করে—যে তাহারা বড় কাঙাল বড় দুঃখী—গল্পটি ঠাকুর রামকৃষ্ণ বড় ভালবাসিতেন—সুহার গলার স্বর বর্ণময়; বিদ্বেষী লখাইকে নিগূঢ়তম করে—শ্রবণের পরেই আরাৎ জলস্তর দৃষ্টিপাতে করিতে তাহার সাধ হয়, যে সে জিহ্বার দ্বারা জলপান করিবে, তাহাতে যে নিরবচ্ছিন্ন আকাশের প্রতিবিম্ব—ফলে সকল সময়ই চোখ রাখিতে পারিবে—এ কল্পনায় যে শুভ্রতা, কিছুকাল চুপ থাকিয়া কহিল "সুহা দিদি" এই পর্য্যন্ত বাক্য স্ফুট হইল, আর পারে নাই কিন্তু মন ছিল বলে "সুহা দিদি তুমি ত অনেকেরই চিঠি কর আমাদের হয়ে...মানে মা..." সরল মনোগাঁথা পদবন্ধন প্রকাশে জড়তার হেতু নিশ্চয়ই লখাইয়ের দীপ্ত চক্ষু সজল, সে বুঝে, এ দুঃখ বলিলে, সুদীর্ঘ প্রান্তর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র হইবে, সুহাদিদি হাসিবে তত্রাচ মনস্থ পুনরায় করে যে সে জিহ্বাদ্বারা জল খাইবে; এখন শুধু বলিল "সুহাদিদি একটা গান বল" সুহা চারিদিক নিরীক্ষণ শেষে ধরে, ধরিল "মজলো আমার মন ভ্রমরা শ্যামাপদ নীল কমলে" এবং একদা গীতমধ্যে কহিল "তুই আমার সঙ্গে গা না" লখাই এ গীত গাহিয়াছিল; এখন কৃষ্ণময়ী অন্ধকারের প্রতি চাহিয়া আপন প্রশ্নের উত্তর ঘোর অবিশ্বাসে তাচ্ছিল্য করে "ঘোড়ার ডিম থাকে" পরক্ষণেই যোগ দিল "কি সুন্দর না মা—দেখলে তাক লেগে যায়" ইহার সঙ্গেই তাহার মা বলিল "মা গো মা তোকে নিয়ে আমি যাই কোথা ভর সন্ধে (সন্ধ্যা অপগত) ঠাকুরদের নাম বলে তুলসী তুলসী নারায়ণ...বলে...তুমি তুলসী বৃন্দাবন...তোমার শিরে কি যেন...আমার যেন হয় স্বগ্‌গেতে বাস...বলে তুলসীই স্যকখাৎ কিষনো...তুই কি, বলতে আছে...তুই কি আজন্মে কালাপাহাড় ছিলি নাকি, দ্যাৎ" তাহার মায়ের উত্তরের প্রথম দিক তাহাকে খুসী করে ক্রমে সে ম্রিয়মাণ, কোনমতে নিজেকে সামলাইয়া কহিল "বল মা অবাক সুন্দর না...ওসমানের থেকেও সুন্দর" ওসমান কথাটি বলিবামাত্রই মুহূর্ত্তেই স্বর ঈষৎ নামিয়া যায়, ওসমানের মত (দুর্গাদাসবাবু) সাজ জোড়া তাড়া দিয়া করিয়া এমন কি ছাপার কালি

দ্বারা গোঁফ ইত্যাদি আঁকিয়া সুহা—বালকের মানসপটে আরবার দণ্ডায়মানা, পুরুষবেশী সুহা অদ্যও তার স্মৃতিতে উজ্জ্বল, যদ্যপি হাস্যমিশ্রিত হওয়ত অবশেষে ভাবময়, কিন্তু ইদানীংকার সমগ্রতা ভারি সুন্দরের নির্দিষ্ট উপমা, ফলে লখাই যে কোন পদকে সঙ্গীত আয়ত করিতে পারে, সে অধুনা একটা লাইনের সহিত অন্য লাইন মিলাইতে ইচ্ছা করে, পারে নাই; অতএব অজানিত নিরন্তর ছন্দ মিল তাহার ছোট দেহখানি ঘিরিয়া আন্দোলিত; ক্রমে দৃঢ় লাল বর্ণিকাভঙ্গ চোখের সামনে উদয় হয়, অবশ্যই ইহা পোস্ট বাকসোর লাল, যাহাতে আর এক বালক চিঠি ফেলিয়াছিল—লাল সাক্ষাতের সঙ্গেই লখাই উদ্দীপন ব্যাকুল—এই লালের সহিত, এইটুকু সঙ্কল্প করিতে পারে যে ভাব করিবে হয়ত; এবং সত্যিই সে এ ভাবনায় আর নহে—অবিলম্বে সে চোখ বুজিল, তাহার স্বপ্ন দেখা দেয়—যে সে অন্ধ, মার হাত ধরিয়া এখানে সেখানে, এখন সুহাদিদির দরজায়, ভিক্ষা চাহিবে, সুন্দর সুহাদিদির নিকট "দয়া হবে" বলিয়া দাঁড়াইবে অন্ধতা উহার ভাল লাগে, কেন না অন্ধরা দেখিতে পায় না—কিন্তু অন্ধরা কাঁদে, তাহাদের চোখে জল পড়ে—এই রহস্য তাহাকে বড় সঙ্গীন করে অথচ রম্য বাস্তবতা! এমন সময়তে লখাইএর মা সহসা বলিয়া উঠিল "কি টাল খাচ্ছিস...চ...চ পা চালা..." আর আবার নিঃশ্বাস লইয়া যোগ করিল "কি করে...এত উপসী (রূপসী) হল রে" লখাই মা-কথিত বক্তব্যের আগে পরে পরম্পরা নির্দ্ধারণে অসমর্থ...তাই পূর্ব্বোক্ত তুলসীর ছড়ার উত্তরে সুহার ন্যায়, এখন ছাগধ্বনি ব্যাঃ করিতে নিশ্চিত, কেননা তখন যখন ওসমানের স্মরণে সে লখাই দিব্য অভিব্যঞ্জনায় ক্রমে সমাহিত হয়—তখনই ঐ ধরণের মেটে-ছড়ার সুর উহার আদৌ পছন্দ নহে, সম্ভবত তাহা বালকের একাগ্রতাকে ছত্রাকার করিতে চাহে তবু সে ওসমানের উল্লেখ করিয়াছে, পলকেই রূপসী বাক্য ভাস্বর, সে শান্ত, অন্ধকারের দিকে চাহিতেই উচ্চারণ করিল "আমি আগে বড় হই"—লখাইএর মা পুনঃ কহিল "কি করে হল অ?" লখাই দ্বিধাহীন উত্তর দিল "সে একটা ম্যাজিক আছে..." ইহা স্বকর্ণে পৌঁছিবার আগেই সে যারপরনাই ভীত, চারিদিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করে, নিজ মুখ ছোট দুইখানি হস্তদ্বারা চাপিল, চক্ষু সেইহেতু স্ফীত; এ কারণ যে, সুহা উহাকে ম্যাজিক ব্যাপার বলিতে কেবল এই শর্তে রাজি হয় যে, যদি লখাই, কোন কথা এমনও যে ম্যাজিক পর্য্যন্ত উচ্চারণ না করে, তাহা হইলে বলিবে, সুহা বলিয়াছিল, অথচ এই দ্বিতীয়বার, অবশ্য প্রথমে চাপে পড়িয়া ম্যাজিক কথাটি বলিতে বাধ্য হয়—সে হয় যোহন একাদশী, যাহাকে সে অপ্রত্যাশিত আলপথে দেখিতে পায়; লখাই কিয়দংশে বিদ্রাবিত, পলায়নের উপায় রহিত, ইদানীং সে উহার সান্নিধ্যে শঙ্কিত এইজন্য যে, যোহন একাদশী কখন যে তাহাকে অতর্কিতে আক্রমণ করিবে ইহা কিছু লিখিত নাই, ফলে লখাই বৃদ্ধকে খুসী করিবার উদ্দেশ্যে বলিল "আঃ পাখীটা কি সুন্দর...ঈশ্বর করুন তুমি পাখীটা তাকে দিতে পার" যদ্যপী সে যেদিন হইতে চন্দনাকে লইয়া যোহন একাদশী ঘোরে ফিরে, যেখানে সেখানে থমকিয়া নিশ্চল, জলা জংলা লপ্তের প্রতি চমৎকারী শূন্যদৃষ্টিতে নিরখি সমাধিস্থ তাহার গাত্র বেপথুমান কভু, তখন হইতে লখাইএর আশা হয় অব্যাহতি পাইবে—বিশেষত, বহুদূরে একান্তে সুউচ্চ বাস-চলা সড়ক সেখানেই রেললাইন, অন্যত্রে সর্ব্বথা অতিকায় ধানখেত আর ধানখেত ইতঃমধ্যে শীষটান জমির উপর, এইখানে—নয়ন অভিরাম লোভনীয় দৃশ্য হওয়ত লখাই, এ ছবি যথান্যায় সৌখীন, কিন্তু কোথাও চিত্রগত রহস্যবিভূতি নাই, শুধু বর্ষাস্নাত পক্ষীশাবকের চোখের ভীরুতা মিশ্রিত; এ দৃশ্য বড় নেক একটি উলঙ্গ বালক শুধুই—অন্য কিছু নয়, ঘনশ্যামবর্ণ সত্যই, ঈষৎ আর্দ্র ভূমিতে ঘুমায়, উহার হস্তপদ সকল কিম্ভূত ছড়াইয়া মেলিয়া আছে, আর যে একখানি হাত খানিক উত্তোলিত কারণ সেই হাতের কব্জিতে রশি বাঁধা, রশি বেশ কিছু অবকাশ পার, অবশেষে সটকায় বাঁশের সহিত যুক্ত, সটকার অন্য প্রান্ত নমনীয় রশি জলে শালুকের মধ্যে অদৃশ্যমান, এখন সমুদয় কৌশল, যন্ত্র, সবুজতা, শালুকের খুনখারাবী রঙ, ক্বচিৎ আঁটিনের চৌক উল্লেখ, অনেকদূরে একটি জল ছ্যাঁচার কাঠামো, নাতিসূক্ষ্ম জলপথের সঙ্কেত, দুয়েক জন লাঙল করে, আলরেখা, সব কিছু মিলিয়া বালককে—লখাইকে ঘিরিয়া এক মনোমুগ্ধকর প্রাচীনতা, ব্যাকুলতা, ইহার অন্তঃসার সূক্ষ্মতা তত্রাচ পাখীর ডাকে মায়া ছিন্ন করত উধাও হয় নাই, বালক ঘুমে কাঁচ স্বচ্ছ; এসময়ে যোহন একাদশী এখানেই উপস্থিত, ঘুমন্ত লখাইএর সমীপে উবু হইয়া বসিল, জাগাইল, লখাইএর চক্ষু উন্মীলিত হইতে ব্যগ্র, সে কল্পনাই করিতে পারে নাই হঠাৎ এইভাবে উহার মুখোমুখী হইবে, সুহা—ছাড়া এস্বপ্ন ইদানীং দেখিতেও ভাবে না, সংস্কারবশত রশিহাতের প্রতি তির্য্যক দৃষ্টিপাতে ও পলকেই যোহন একাদশীর দাড়ি লক্ষ্য

করিল, যোহন একাদশী তাহার গালে ঠোনা মারিতেই, সে আঃ শব্দ করিবার পূর্ব্বেই শুনিল "পাগলা এখানে ঘুমচ্ছিস..." লখাই এ-হেন আশাতীত আশ্চর্য্য মিষ্ট বাক্যে বিকল, অথচ উহার একথা কোনক্রমেই ভাল লাগার নহে—অভিজ্ঞতা তাহার আছে, ইতিমধ্যে বেচারী আপনকার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঙ্কোচ হেতু দমবন্ধ করে, দেখিল যোহন একাদশী বসিয়াছে, কোন দিকে যে, সে চাহিয়া আছে ইহা লখাই বুঝে না এবং এখন তাহার ক্রন্দনজন্য প্রস্তুতি তিরোহিত, শুনিল "বুঝলি সে যে কি...সে না আশ্চর্য্য সুন্দর...আমি ত অনেক দেখেছি, সর্ব্বাণী পাঠকের মেয়ে তার ঝি হতে পারে...এত সুন্দর...দেখবি চারিদিক উজল করে আছে...আলো দিয়ে তৈরী...আলো শুধু আলো..." লখাই বর্ণনার কোন কিছু আন্দাজ করণে অপটু, আর তখনই তাহার রশি-হাত ঝটিতে উর্দ্ধে, ত্বরিতে মাথা ঘুরাইয়া দেখিল সটকায় একটি শোল মাছ ঝটপট করে, উল্লাসে তাহার ধমনী সকল স্ফীত মাত্র, কিন্তু বাক্য স্ফূর্ত্তি হয় নাই, শুধু অজস্র সবুজের মধ্যে মাছের বক্রতার দিকে সে সভয়ে তাকাইয়াছে, অন্য পক্ষে যোহন একাদশী অন্যমনস্কভাবে ঐ দৃশ্যের প্রতি মন সংযোগ করিল, আস্তে আস্তে বলিল "মাছটা বড়...তুই পারবি সামলাতে...না আমি" লখাই ইহাতে অধো-সাহস লাভে, হঠাৎ ত্বরিত ঝটকায় উঠিয়া বলিয়াছে "হেঃ ওৎ থেকে" এবং আপন হস্ত রশি খুলিতে ক্ষণেই সহজ নিঃশ্বাসে শেষ করে "পারব"—তৎসত্ত্বেও যোহন একাদশী পাখীটি স্বীয় স্কন্ধে স্থাপনের সময় কহিল "নাঃ তুই ছেলেমানুষ..." অতএব উঠিয়া খানিক অগ্রসর হওয়ত সটকা-বিদ্ধ মাছটি মুক্ত করার সময় মন্তব্য করে "তুই ত অনেক আগানে বাগানে...এদিক সেদিক..." এসময় কাঁধে পাখীর বড়ই অস্বস্তি আড় চোখে দেখিয়া শাসাইল "আঃ কি হচ্ছে"...তার পরে অতি মধুর স্বরে আশ্বাস দেয় "...তার তরে মন উতলা ত...এই বলছি...ওকে...তুই (পাখীটি) যেদিকে বললি...সেই দিকে ত গেলুম...লখাই দেখবি দারুণ সুন্দরী...দারুণ...দিক আলো করে আছে..." লখাই উহার মাছ খোলার রকম লক্ষ্যে বিশেষ চিন্তিত উদ্বিগ্ন, মাছটা জলে না পড়ে, ফলে উহার বক্তব্যের ব্যাপারে যোগ ছিল না, তথাপি কাহাকেও দেখিতে, হয়ত, বর্ণনানুযায়ী, বারেক মাথা সঞ্চালিত করে; আর একথা তাহার মনে আসে, যে যোহন একাদশী মাছটি আত্মসাৎ করিবে ও এবিষয় সুহাকে ভরসা করিয়া কিছু বলিতে পারিবে না। যোহন একাদশী মাছটি দুই হাতে, কব্জায়, ধরিয়া মাটিতে ছুঁড়িয়া দিয়া ভ্রূ কপালে তুলিয়া ব্যক্ত করে "মাছটা সেরটাক পাঁচ পো হবে" অনন্তর ঘাসে হাত মুছিতে সময় করুণ কণ্ঠে কহিল "দেখ না আমি কত রোগা হয়ে গেছি...কত রোগা...রেতে আমি ঘুমাতে পারি না...মনে হয় ঐ এল...উঠে বসি...চোখে দেখা যায় না এত সুন্দর।" লখাই অবাক সে কিছুই বুঝিতে ছিল না, যোহন একাদশী তাহার দিকে বিরাট মাথাটা ঘুরাইয়া জিজ্ঞাসা করে "তুই কিছু জানিস না..." লখাই জানু পাতিয়া বসিয়াছে, উত্তর দিল "না...ত" তাহার মাথাটি না'র দ্বারা এখনও চালিত, যোহন একাদশী ছোট একটি "ও" বলিয়া পকেট হইতে বিড়ি বাহির করিয়া একটি লখাইকে দিল, "খা নে..." শোনা গেল, নিজে একটি ধরাইয়া উদভ্রান্ত চোখে চাহিয়া কহিল "সে এসেছিল...একদিন...মাস্টার আহাম্মক বলে কিনা পীরের দরগায় সিন্নি দিতে...হিঁদুরা একের নম্বর অন্ধ...সুন্দর যে কি বলব—" লখাই বিড়ির ধোঁয়ায় একটু কাশিয়া উহাতে বয়সীর মত জবাব দিল "পাগল" সত্যই বালক বৃদ্ধের জন্য কোথায় একটা বেদনা অনুভব করিতেছে বুঝায়, এখন স্বীকার না করিলেও সে জানিত পরী উহাকে দেখা দিয়াছে, বালকের সায়ে যোহন একাদশী উৎসাহিত, গলার শিরা ফুলাইয়া কহিল "আমি শালা, হাল ছাড়ছি না...দেখা আমি পাবই...তোর কি মনে হয়" লখাই তখনই প্রতিধ্বনি করে "ইয়া...একবার না একশোবার" ক্রমে সে যারপরনাই খুসী হইতেছিল, বলিল "পাবেই" একথায় যোহনের নাকে মুখে জল আসিয়াছে, কোটের কলারে মাথাটা দুয়েকবার ঘসিয়া সহসা এক হাত দ্বারা বক্ষস্থিত রোম আকর্ষণে একীভূত, ছোট চোখে সারা চরাচর দেখিল, সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস লইয়া তারস্বর হুঙ্কার দিল "দূর শালারা বৃথা লাঙল কচ্ছিস...শালারা উপুড় হয়ে মরবি, শালারা বৃথা লাঙল—কি বল" লখাই ঝটিতি এক বিকট চীৎকারের জন্য ভীত, সে ইহা আশা করে নাই, দূর হইতে লাঙলেমজুত লোকটি হাত আন্দোলিত করিল, তবু সভয়ে "নিশ্চয়ই..." অথচ যোহন একাদশীর উপর তাহার গুপ্ত আক্রোশ তাহার ঘৃণা যাহা এতাবৎ মনে আসে নাই তাহা আসিতে চাহিল... সে কথা স্মরণ করিতে তাহার কষ্ট হয়; তখনই যোহন একাদশী চাপা কণ্ঠে গোপন সংবাদ দিল "তাছাড়া আর একটা মস্ত ব্যাপার আছে বুঝলি...তোর কথা ফলবে...জানিস সে এটাকে চেয়েছিল..." বলিয়া

পাখীটিকে মুখের নিকট আদরে ধরে পরক্ষণেই নিজের দাড়ির অগ্র তুলির ন্যায় দুই আঙ্গুলে করত চন্দনার সবুজ অঙ্গে বুলাইতে বলিল "আমি যখ...এ তার, তাকে আসতেই হবে...কি বল আচ্ছা আমি সত্যি রোগা হয়ে গেছি না..." লখাই আড়ষ্ট হইয়াছিল, তবু সহানুভূতিসূচক গলায় কহিল "কই না ত অন্তত..." যোহন একাদশী উহার কথা শেষ করিল "...পাখী নিতে...হিঁদুদের সাধে বলে ভূতপূজক...বলে পাখীটা মানে আত্মা...তোর কি মনে হয়..." লখাই আশ্চর্য্য, উত্তর দিল "তা কি করে হবে..." যোহন একাদশী বলিল "আমি ও তাই বলি...আমি যোহন একাদশী রোজ রবিবার গীর্জ্জে সাফ করি ঘরে বাইবেল...আমার কাছে...হে...ওরা সুন্দর জিনিষ চায়...আমিও নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও সুন্দর..." বলিয়াই অহেতুক লজ্জা পাইয়া, মাটির দিকে লক্ষ্য করে ধীরে উচ্চারণ করিল "একশোবার" লখাইএর কণ্ঠস্বর বিরাট খেতে প্রতিধ্বনিত হয়, যোহন একাদশী পুনরায় জানিতে চাহিল "তোর তাহলে বিশ্বাস হয় যে...আমি তার..." বালককে বৃদ্ধের স্বর প্রভাবান্বিত করিল, সেও বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে ধীরে উত্তর করিল "পাবে পাবেই" যোহন একাদশী তৎক্ষণাৎ "হাই ই" বলিয়া বজ্রধ্বনি তুলিয়া আপন হাতদুটি আকাশে ছুঁড়িয়া দিল, পাখী স্থানচ্যুত হওয়াতে উহার গণ্ডীর মধ্যে চঞ্চল, বুঝায় বৃদ্ধ উল্লাসে ঘর্ম্মাক্ত, অতএব পাখীটিকে পুনঃ যথাস্থানে রাখিতেই তাহার চক্ষুর্দ্বয় বুজিয়া আসে, সুচিন্তিতভাবে দাড়িতে হাত বুলাইতে ক্ষণে কহিল "কিন্তু তোর কি মনে হয়...হ্যাঁ যীশুর গান মানে ঈশ্বর মানে ভগবানের গান শুনে...চলে যাবে কেন...মানে তোর" প্রশ্নটিতে লখাই প্রথমে আপন নগ্নতার জন্য বড় সরম, শুধু লজ্জা, তখনই আপন হাত দিয়া অঙ্গ আবরণে ব্যস্ত, অসহায় ভাবে দিক সকলের প্রতি দৃষ্টি সঞ্চালন করে; হয়ত এই প্রশ্নে সে এমত এক স্থানে যাইতে চাহে যেখানে স্বর্গ নাই পাতাল নাই...এতাবৎ বাদল করা আকাশের তলায় জল গুঞ্জণের মধ্যে—যোহন একাদশীর মন কথাবার্ত্তা তাহাকে নীল করিয়া আঁকে—এখন সে-রঙ লখাই আশ্চর্য্য হওয়ত পর্য্যবেক্ষণ করে যে দেওয়ালের মত রূপ গ্রহণ করিয়াছে—হাস্যময়ী সবুজতা মাঝে মধ্যে ঘোড়া জলস্তরের উপর দিয়া বিচিত্রভাবে তুরগবেগে ধাবমান, সে হাততালি দিতে চাহে ও যুগপৎ গম্ভীর—লখাই গোলকধাম খেলা পর্য্যন্ত ভালবাসে না তাহার হাতের চালে তিন তিনবার ফুঁ দিয়াছে তথাপি কড়িগুলি প্রভাবিত হয় নাই, বরং বালকের উদ্দীপনাকে বিধ্বংস করিয়াছে, হঠাৎ কড়িগুলিতে আদিম সংযুক্তি মিশ্রণ সঙ্কেত হইয়াছে—প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় এখন দেবতা; যখন তখনই নরকে গমন, বেশ্যালয়ে গমন, আবার কখনও যদি উদ্ধার পাইয়াছে, কয়েকঘর উপরে, আশ্চর্য্য, তখন পুনরায় পতন নরকে; লখাই ক্ষোভে অস্থির, সুহা হাততালি দিয়া উঠিয়াছে, বলিয়াছে "দেখ উষাও কোথায় উঠে গেল—তোর মনে পাপ আছে...ঠাকুর তাই দেখাচ্ছেন... দেখাচ্ছেন...খালি খালি পতন..." আর সে ভাগ্যবতী, পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি অনিবার্য্য আছে—তাই কয়েক চিতনেই বৈকুণ্ঠ বাস গমন, সেখানে দেবাদিদেব হাস্যমুখে আসীন...লখাইএর বৈকুণ্ঠচিত্রে যারপরনাই বিরক্তি, সুহা এবং উষার শ্রদ্ধাসম্পন্ন নমস্কার তাহার ক্রোধকে দমন করিতে অসমর্থ; বহুবারই সে সঙ্কল্প করে, সে এখেলা আর কদাচ খেলিবে না—এবং কখনও পূর্ণ অভিমানে ইহাও বলিয়াছে "ঠাকুর একবারও ত আমাকে বৈকুণ্ঠে ওঠাতে পারতে" একথা মনে উঠিতেই তৎক্ষণাৎ নিজেকে ধমক দিয়াছে; এখন পরী যে অতিমাত্রায় সুন্দর, সে, পরী, গান শুনে নাই সংবাদে হয়ত তাহার ভয়ঙ্কর হাস্য সমস্ত ত্রিভুবনকে পরিদ্রাবিত করি উঠে, আপন অনুচ্চারিত শব্দহীন হাস্য শ্রবণে সে দুই পা পিছাইয়া যোহন একাদশীর বাক্যতত্ত্ব সম্যক পরিজ্ঞাত, সুষ্ঠু পদবিন্যাস হওয়ার আগেই উত্তর দিল "ভাল লাগেনি বোধ হয়" ইহাতে যোহন একাদশী গভীরভাবে উহার প্রতি দেখে, এতক্ষণ পরে ইহা তাহার প্রত্যক্ষ হয় যে, পরিব্যাপ্ত অলসতা সাক্ষাৎ ধানক্ষেত—চতুষ্কোণগুলি আটন, যেখানে মাছ অস্থির, আর সম্মুখে যে মনোভাব ওতপ্রোত উহা সাক্ষাৎ উলঙ্গ বালক বৈ অন্য নহে—লজ্জার সম্ভ্রম ঔচিত্য সরলতা সেখানে অনাগত; তবু ঐ সত্যকে বৃদ্ধ এড়াইয়াছে, উহার সুস্পষ্ট উত্তর তাকে কম্পিত করে, তবু কহিল "তাই...তোর মনে হয়?" লখাইএর হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ খানিক উর্দ্ধে মুখের প্রায় নিকটে আসিয়া ফিরিয়া যায়, নবতম উৎসাহে মরিয়া কাহার উপর আপন এতাবৎ সঞ্চিত আক্রোশ হিংসা চরিতার্থে খরতর তাম্রবর্ণ নিঃসঙ্কোচে প্রকাশ করিল "ওসব গান ওরা ভাল বাসে না" এবং পদটি বলিতে তাহার নিজের অব্যর্থ ধারণা যে সে "ভগবান টগবান ছোঃ গুলি মার...যত ম্যাদাটে গান কার ভাল লাগে..." এই কথাগুলিই বলিতেছে, পলকেই শুনিল "আমি ত ওদের ভগবানকে

বলেছি” স্পন্দিত হইতেছিল, অথচ আশ্চর্য্য সে আপন কোমরে হস্তস্থাপন করত অটল; যোহন একাদশীকে—দিক হইয়াছে অম্বর যাহার এমন বালক তাহার বিদ্যমানতা সজাগ করে, তাই সে একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ নিমিত্ত দূরের দিকে তাকাইল, সামনের অবকাশে অবসান বাক্যের সৃজনের পশ্চাতে যে অভিজ্ঞান যে উপলব্ধি তাহা প্রচ্ছন্ন, উহাকে অধীর করিল এখন আপনার দৃষ্টি বহুবর্ষ পরিক্রমণের শেষে হস্তস্থিত পাখীতেই—অনন্য নিপটতায় অহরহ অনবরত জীবন—ইহা সুন্দর, অনুরণিত হয়—স্থললাভ করে ও তীক্ষ্ণ হিম অনুতাপ তখনই আবছায়া আচ্ছন্ন; একই বিষয় লইয়া মাখনের, মাখন নাপিতের সম্মুখে তাহার তর্ক হয়, সে আলোচনা করে, এখন বড় আপশোষ হয় যে হরিয়া পাশিকে সে পরাজিত করিতে পারে নাই—এখন মনে হয় ইহার সহিত তাহার কথা বলিতে যাওয়াই ভুল, কি প্রয়োজন ছিল তাহার হরিয়া পাশিকে নির্বোধের মত আক্রমণ করা!—যোহন একাদশী পাকুড় গাছ তলে উহাদের দেখে, মাখন হরিয়া পাশির খেউরী করে, ক্ষুব্ধ সে হইয়াইছিল, সে বলিল “এবার হরিয়া! সেদিন বড় বেইজ্জত করেছিলে, এখন? বাবুদের যদি বলি তাহলে? ছাল চামড়া থাকবে...শুধু মাখন আছে বলে...” মাখন হরিয়া পাশির গালের চামড়া আপনকার আঙুল দিয়া রগের দিকে টানিয়া ধরিয়াছে, খুব অদ্ভুত অ্যাকিউট কোণে স্থিতিবান, সে থামিয়া আছে, আর হরিয়া পাশি হেলনে মুখ ফিরাইতে নিশ্চেষ্ট, শুধু চোখের কোণে তাহার আঁখি তারা, কহিল...“বটে...” মনে মনে, ইহাও হইতে পারে যে, সে ভীত, মাখনের কবলে উহার মুখমণ্ডল নাই, মুখ ঘুরাইয়া কহিল “ভ্যালা আপদ! দেখ দিকি অন্যায়টা কি বললুম...তুমি আস কেন পরামর্শ নিতে...” মাখন দৃষ্টি সঙ্কোচে প্রশ্ন করিল যে কি ব্যাপার, হরিয়া উত্তর দিল না, পুনরায় যোগ দিল “অন্যায় আমার হল কোথায়...” যোহন একাদশী বলিল “তখন আমার ঘাড়ে মেল ছিল...না হলে, বুঝলে মাখন ওভাবে, কতবড় কথা, বলে কি না সৌন্দর্য্যের আমি কি বুঝি...” হরিয়াকে বাধা দিয়া মাখনও ওকালতি করিল “ওর কথা ছাড় সারাদিন তাড়ি খায়...কথার আঁট নেই” হরিয়া বলিল “গায়ে পড়ে ঝগড়া করতে এসেছ, যদি বলি তোকে কথা মানে লাগবে...সেদিনত হন হন করে...নাচতে নাচতে চলে গেলে...এখন বলব কেন বলেছিলাম সৌন্দর্য্য কি তা তুমি জান না...আমি যে গাছে চড়ি সেখানে পাখী নীড় (!) বাঁধে না...সাধারণ সোহাগ ভগবান যা দিয়েছে আমি যেই...অমনি দূরে...আমার মন কেমন করে...আমি অনেকভাবে বঞ্চিত্...ভেবেছি...জেনেছি কখন না কখনও কমলে কামিনী দর্শন হবে...” যোহন একাদশী নিশ্চয় উহার একটা কথাও শোনে নাই, সে নিজের ক্ষোভে বিকল কহিল “হে হে তুমি গাছে চড় বলে ভাব আমাদের অনেক উপরে...” হরিয়া ইহাতে মাখনকে সাক্ষী মানিল “বলে—তাড়ি টক লেগেছে, জিবে আমার আড় গো, আর দাঁত পড়েছে আর জনমে—কথায় নেই বাগ গো...কার কথায় বাগ নেই? বলব? তুমি সৌন্দর্য্য ব্যাখানে কি বলেছিলে...যে তার আঠারো বছর...রাগ হল ত...” একথা উচ্চারণের সঙ্গে সহিত, এখানে লতাগুল্ম বৃক্ষাদি জড়িত নিভৃত প্রসার আঁধার হয়, যোহন একাদশী বৃথা আক্রোশে মুখ খুলিয়াই অচল; মাখন অনেকক্ষণ পরে আপন ক্ষুর হাতের তালুতে সঙ্কেতময়ী শব্দে শাণিত করে, হরিয়া জোর পাইয়া যোগ দিল “সৌন্দর্য্য বড় সহজ ধম্ম হে...আঠারো! আঠারোটাই যেন এক বিয়োন বকনা...জল খেগো শকুনির মত লাফ দিয়ে পড়লে...আমরা জাতশকুনি যতই উঁচুতে উঠি ভাগাড়ের দিকে নজর...হো...” কথা শেষ নিশ্চয় হয় নাই, অপ্রত্যাশিত ইহা ঘটে যে যোহন একাদশী হরিয়াকে আক্রমণ করে, ও যুগপৎ মাখন ক্ষুরধৃত হস্তখানি চাবুকে যতদূর সম্ভব একান্ত লয়, হরিয়া পাশির নেশা অল্প কাজেই বুদ্ধিভ্রংশ হয় না, ঝটিতি আপনাকে বাঁচাইবার কারণেই অদ্ভুত প্রকারে স্বীয় দেহ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া হাত দুইটি মাটিতে আর হাত পাদ্বারা নানাবিধ অসমকোণ সৃজিত অবশেষে একটি চোখ, যোহন একাদশীর ভীমকর্ম্মা ঘুষি লক্ষ্যভ্রষ্ট গাছের গায়ে বসিল, নিরীহ কদমগাছ সংজ্ঞাশূন্য, বেচারীর ধমক জোর এবম্প্রকার যে বৃক্ষগাত্রে তখনই আঁটিয়া যায়, হরিয়া ইহাতে মৃত্তিকায় সটান, মাখন তেমনভাবে থাকিয়া আঃ! বলিল, কেহই খুসী হয় নাই যোহন একাদশীর মুখ হইতে ঈদৃশী যন্ত্রণা অনুভবেও কোনই বেদনাসূচক শব্দ নির্গত হইল না, শুধু দন্তরাজি দ্বারা নিম্ন অধর দংশন প্রতীয়মান, চোয়াল ঘর্ষণ বুঝা যায়—তাহার দৃষ্টিতে বৃক্ষস্থিত ঘুষিতে আবদ্ধ, উহারা দুইজনেই সেইদিকে চাহিয়া আছে, তবু তাহার যন্ত্রণা কুঞ্চিত ক্রন্দন, অভিমান, নিস্ফল হিংসা অধুনা মনে সতরঞ্চ, মিশ্রিত একক না, ক্রমে সে আর লঘুচেতসা নহে, দম্ভ নাই অতি সরল ব্যঞ্জনায় ব্যক্ত করে “সৌন্দর আমি বুঝি আমি জানি” তত্রাচ মনে হয় উহার স্বর রূঢ়; চিত্রার্পিত যোহন একাদশীর

প্রতি, এখনও পূর্ব্ববৎ, মাখন বিনীত চোখে দেখিয়া ক্ষুর বন্ধ করিতে থাকিয়া ব্যথিত খাদে কহিল "থাক ওসব কথা, একটু জল দেব—" এবং সম্মতির অপেক্ষা না করিয়া উঠিয়া, গাছের গায়েই মুষ্টির উপরে ধীরে ধীরে ঢালিতে লাগিল, নিশ্চয়ই ইহাতে কিছুটা ভাল লাগে, যোহন একাদশী তির্য্যক চাহনিতে সটান হরিয়াকে পর্য্যবেক্ষণে ইহা বলিল যে "হরিয়া বাঘের পেটে আমার ঘুম জন্মায় না...জেনে রেখ..." হরিয়া আশ্চর্য্য যে ক্রুদ্ধ নয়, প্রতিপক্ষের দূরাদৃষ্টে হয়ত সে খানিক আহত, তাহা সত্ত্বেও অল্প তাচ্ছিল্যভরে সম্ভবত উত্তর দিল, "জানলাম,...চোখ দিয়ে দেখা বড় ভাগ্যের কথা...কান দিয়ে ত জগত দেখছ...যে কথা বললে...সে গ্যাদা থাকা ভাল...তাছাড়া তুমি গীজ্জে যাও..." যোহন একাদশী শায়িত তথা ভূমি লুণ্ঠিত হরিয়ার প্রতি কহিল "আমি বলছি ওটা মানে বয়স বলা আমার ঠিক হয়নি আমি অন্যায় করেছি—" পরক্ষণেই হাতখানিতে ফুঁ দিবার নিমিত্ত আপন মুখের নিকট লইয়া যাইতেই স্থির, হয়ত এই যন্ত্রণা বড়ই শ্রদ্ধার যথার্থ আদরণীয় বলি বোধ হয় তবু সংস্কারবশে উহা নিকটে আনীত করিয়া ফুঁ দিতে থাকে; হরিয়া বলিল "সখা, তিন ছেড়ে উঠা চাট্টিখানি কথা! তাই ভজা বাবুর্চিকে বললুম—কেশরী [কিশোরী] ভজনিয়া হওয়ার আচার বড় কঠিন...ন্যাংটো ছুকড়ী দেখলুম আর গৌরীপটে নমস্কার করলুম...ব্যস পুরুষ হওয়া সহজ! ভিকিরী আরে ভিকিরী...এখন ভাসা ইস্টিশানের কাছে গাবতলায় বেগুনী ফুলরীর দোকান দিয়েছে...সে শালা পাশবিক অত্যাচারের ফেরে...ধ্যানজ্ঞান...ভাবে মরদের কাজ...থানা পুলিশ ভাবে...কোর্ট কাঠগড়ায় উঠবে...দূরে মাগী ঝি ঝি কান্না কাঁদবে আঁচল দিয়ে নাকি নাক মুছবে...আর সে মহাগ্যাদায় স্বীকার যাবে...হুজুর মা বাপ আমি করেছি...আমি দোষী...! পুরুষের কম্ম!...মাগী ঘোমটা তুলে ওকে চোখ মেলে দেখবে...এর পর মরেও সুখ...!" যোহন একাদশীকে বলিল "তোমার নেশা চড়েছে...দেখছি...কি কথায়..." হরিয়া অল্প হাসিয়া উত্তর দিল "কপাল! কথার আঁট থাকলে আমি ত গণেশ উকিল...কি" ইহার পর উর্দ্ধে দৃষ্টি মেলিয়া "পদ্মের চুল পাকতে আমি দেখেছি—যা পাকায় তা তোমার আমার ঘুনসীতে থাকে না...তাই আমি দুঃখিনী ভজনীয়া...[কিশোরী ও দুঃখিনী দুইটি মত, বৈষ্ণবদের বিষ্ণু পরমপদ ব্যতীত সুফীবাদের পড়ন্ত রোদ মিশ্রিত হইয়া দেশজ ভাবধারা]—নিজের সঙ্গে সুখ ভাব হলে তবে ত দেখবে—ভেব না আমার বীজ নেই আমি ঢ্যাঁটার...আমার একুনে সাতটি একটা আবার আসছে" শেষোক্ত অর্থাৎ ভেবনা—ইত্যাদি পদ সে উহাদের প্রতি অবলোকন করত ব্যক্ত করেও অনতিবিলম্বে যোগ দেয় "এখনও আমার হয়নি...অভাবকে আমি দুঃখ বলি...তবে মন বলেও কিছু নয়...মানুষ বাঁচতে চায় বলেই না বলছ...ওতে দোষ নেই...জেনে রেখ সৌন্দরের স্মৃতি নাই কাজেই বিস্মৃতি নাই...মনতে অনেক কাঁটা দিতে হবে...নিকোতে হবে...তবে ত..." পর পর দশ ব্রাহ্মণজনম শরীর হলে—তবে কিছু হবে..." যোহন একাদশী ইতিমধ্যে ফুঁ দিতে সময়ে যতবারই মাখনকে প্রশ্ন করিতে যায়, ব্যঞ্জনাক্ষর বিরহিত শব্দও করে ততবারই হরিয়ার বাক্যস্রোতই বাধা দিয়াছে, ফলে হরিয়ার কথায় ইহা সিদ্ধ হয়, যে সে মনোযোগ দেয় নাই; মাখন এখন পুনরায় আপন তালুতে ক্ষুর শাণিত করে আর যে নিজে হইতেই বলিয়াছিল নিশ্চয়ই পুরাতন প্রশ্নের উত্তরে, "আমার মন বলে তুমি পাখীটাকে দুদিন সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে না বার হয়ে দেখ—" যোহন একাদশী অবাক হইয়া জানিতে চাহিল "তাতে" মাখন উহাকে ধীরে বুঝাইল "তাতে"? তাতে মনে হবে যে তুমি আর খোঁজ না...অভিমান করেছ...বলে মানের বশ কৃষ্ণ—" যোহন একাদশীর ঈদৃশী যুক্তিতে আহ্লাদিত, ক্ষণেকেই অন্যমনা হয়ত ভাবে সে ক্লান্ত তাই এই উচ্ছ্বাস, এবার মুখখানি তুলিয়া সায় দিল "ইয়া...ঠিক...ঠিক, হরিয়াকে জিজ্ঞেস করলে, দশ হাত পাদরী গিরি করবে...আচ্ছা...ওটা ত কিছু বললে না...জ্ঞানের মানে—" তোমার কি মনে হয়—কেউ মানে অন্য কিছু মায়া ধরে—আসতে পারে মানে—" মাখন হাতের তালুর দিকে নজর রাখিয়া কহিল "হতে পারে—" হরিয়া এতক্ষণে হাতের উপর মাথা ন্যস্ত করিয়াছে, চোখ বন্ধ, উহাদের আলোচনা শ্রবণে ধীরে চাহিল, মন্তব্য শোনা গেল "হতে পারে—বাঃ লোকটা ভুল বুঝাচ্ছে—একে পাদরী ধম্ম-মানি কেশ্চান—! বলি সৌন্দর্য্যের আবার মায়া ধরা যায়—কখনও হয়—" মাখন উত্তর করিল 'কেন হবে না—রাজপুত্তুররা জিজ্ঞাসা করে না তুমি দেবী না মানবী—?' ওরা মায়া "সীতা ধরেনি—" হরিয়া ঝটিতি উঠিয়া আসীন, তর্জ্জনী সঙ্কেতে কহিল "কেটে দাও কেটে দাও পুঁথি থেকে বাজে কথা—রাবণ কি বলেছিল যদি রামরূপ ধরে যাই তখন কি আর তুচ্ছ নারীতে আমার মন থাকবে—তেমনি ও শালারা ধরবে মায়া সীতা ভেবে

দেখনা কেন—বললুম আর মানলুম—তখন ওপক্ষ এত হেদিয়ে ছিল যে—মায়া সীতা ধরার সঙ্গে সে বোকাচোয়ার দেহত্যাগ হত—" বলিয়াই দুই হাত কপালে ঠেকাইল, মাখন নমস্কারটি দেখা সত্ত্বেও ভীত কণ্ঠে শাসন করিল "সাধে কি বলে ছোট জাত—আস্‌পদ্দা ত কম নয় পুঁথি কাটও!—গো হত্যার পাপ হয়—ছ্যা—আদতে কি জান তুমি নিশ্চয় ভাল করে গাওনি—তাই" যোহন একাদশী প্রতিবাদে ভ্রূ তুলিয়া জবাব দিলে "হে কি বল, এ পর্য্যন্ত সাক্ষী—এর গা ছুয়ে বলতে পারি" এবং পাখীর গা স্পর্শ করত হলপ করে "আমি গলা ছেড়ে গেয়েছি" মাখন মৃদু হাস্যে সস্নেহে বলিল "না—প্রাণ দিয়ে—" তখনই যোহন একাদশী উত্তর দিল "কি গেরো—এ সাক্ষী আমি প্রাণ দিয়ে—" ইহা শেষ না হইতেই হরিয়া বিদ্রূপ সহকারে কটু স্বরে কহিল "সে যেমন তুমি প্রাণ দিয়ে বেঁচে আছ—? তোমার কাছে এসব সংস্কার—জীবনটা সংস্কার—" যোহন একাদশী তিক্তকণ্ঠে উহাকে বিদ্ধ করিতে আগ্রহশীল যে "হরিয়া আমি মাতলামীর তেঁতুল—তোমার পাদরীগিরী যারা তাড়ি খেতে আসে তাদের কাছে করিস্ [!]—অক্ষয় মাস্টার রুগী বলে বোকা ত নয়—সে বামুন টিপসই দিয়ে মাইনে নেয় না—সে তবে কেন বলবে—সে ত আমার মোসাহেব নয়—" হরিয়া উত্তর দিল "হরিয়া পাশি বলছে, তিনি ঠিকানা বলেছে—আগে যাতে মন বসে, কিসে জান তারপর মোড় ঘুরিয়ে দে—তখন সুন্দর ত সুন্দর—সবাই শুনবে—যোহন একাদশীর রেল লাইনকে ভালবাসতে পারিস—কাঁদে না খায় না রক্ত নাই—আহা মরচে ধরে বলে নয়—সুন্দর বল দিকিনি—যা বাঁয়ে কাট—বাঁয়ে কাট—" মনে হইল, ইহারা দুজনের প্রতি একভাবে চাহিয়াছিল যেহেতু, উহারা কিছুই শুনে নাই, তবু তাহার, হরিয়ার কথা থামিতে, মাখন একটি ছোট নিঃশ্বাস লইয়া বলে তুমি পাখী নিয়ে দুদিন না বেরিয়ে দেখ—"আর জাত বামুনের কথা মান—ওর কথা ছাড়—বলে না, 'জ্ঞান শুঁড়িতে চৌয়ায়ভাটি—' যোহন একাদশী উত্তর দিল "তবু হরিয়া জেনে রাখ—তারপর থেকে বয়সের কথা আমি আর পাড়িনি—শুধু বলেছি যে চমৎকার একজনা—" অবশ্য এ সময় যোহন একাদশীর দুর্ব্বিষহ গরম অনুভূত হয়, কোটের এক পাল্লা হাত দিয়া টানিয়া খোলা, হরিয়ার বচনে স্পষ্টত—চোখ ছোট করত অবলোকনেও, সত্ত্বেও—রূপ ছিল না; আর যদি বহমানতা, হয়ত ইহাই ঠিক, ইহাই সর্ব্বৈব মূর্ত্ত ভাস্বরতাকে প্রচ্ছন্ন রাখে, উপর্য্যুপরি বহমানতা বিগত গ্রীষ্মকে হানা দিয়া ইদানীং আনিয়াছে; সে ত কোন প্রশ্ন করে নাই, সুন্দর দর্শন তাহার জিজ্ঞাসা নহে, প্রত্যক্ষ সত্যই ধ্রুব! পাখী যাহার...হরিয়া তাহার সত্যকে জিজ্ঞাসা মনোবৃত্তিকে ঐহিক আখ্যা দিয়াছে কুটিলতম ভ্রূকুটি চক্রান্তে তাহাকে মহা অবহেলায় ভ্রংশ করে, গভীর বিশ্বাস রাহু গ্রস্থ—এইটুকু বাসনা ছিল যে সে দৈবযোগে যাহা দেখে তাহা অচিন্ত্যনীয় সকলকেই বলিবে, অনেক কষ্ট লোকে পায় তবু ঈষৎ মহৎ শান্তিলাভ করিবে—হরিয়া ইহার আগের দিন বলে "তোমার পাদরী বাবাদের বল না—" সে কোন ইহাতে উত্তর দেয় নাই কেন না সে জানে মণ্ডলীর সভাপতি বলিবে, "জোব বা লুক লিখিত সুসমাচার পড়" বলিয়া পুনরায় কপালচ্যুত নিকেলের চশমাটা ধীরে কপালে তুলিবে, বেচারী যোহন একাদশী ভাগ্যদোষে অথবা ইহাই লিখিত যে, সেই বাস্তবতা ঝটিতি উধাও হইবে—সে শুধু জানিতে পারিবে তখনও পৃথিবীতে রহস্য আছে—রসাস্পদ কিছু আছে; নিশ্চয় উহার ঈদৃশী দুর্নিমিত্তে, আপৎকাল সঙ্ঘটনে দেবতারাও বিষণ্ণ, মেঘে পুষ্পোদগমতা অচিরাৎ দগ্ধ! কিন্তু বিদ্যুল্লতা তাহার জাগ্রত অস্তিত্ব ঐ বিদ্যুৎ দীনের চরিত্র! সে অন্যমনস্কতা বশত মাটিতে চাপড় মারিল, নিজেকে একারণ যে খাড়া করিতে বদ্ধপরিকর এবং সঙ্গেই পাখীটা চেন সুতলীর সীমা অনুযায়ী উড়ে, পাখীটিকে ধরিতে যখন মনোযোগী তখন শোনা গেল, "শালা হরিয়া জ্ঞান শুঁড়ী—ভাবের কথা গাছে চড়ে জেনেছে—শালা—" অধুনা পাখীকে পুনঃস্থাপিত করার কালেই লখাইকে বলিল "জানিস মাখন নাপ্‌তে ভাল বুদ্ধি দিয়েছে—বলেছে পাখী নিয়ে বেরিওনা—মান করতে মান করলে সে বুঝবে—তোর" লখাই এতক্ষণে বিশৃঙ্খলভাবে বহু অনেক কথাই স্মরণ করে কিন্তু কোন বিষয়ই তাহার মনে যথার্থভাবে দেখা দেয় নাই শুধু বেশ কিছুদিন পর যোহন একাদশীর সম্মুখেই উহার নাম ধরিয়া ডাকিতে ইচ্ছা হয় কহিল "যোহন একাদশী কি বলছ আমি ঠিক—" পদটি শেষ হইতে না দিয়াই বৃদ্ধ ক্ষোভ প্রকাশ করে "তোকে না কক্‌রে একটা বিড়ি খাওয়ালুম—যোহন একাদশীর কথা বুঝবে কেন?" লখাই একটু ভরসা পাইল, পরিচ্ছন্ন ভাবে নিখাদ গলায় বলিল "মাইরী যোহন একাদশী—ব্যাপার ত বলনি—" যোহন একাদশী উহার প্রতি কিয়ৎক্ষণ শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া মাখনের পরামর্শ ব্যক্ত করিল, লখাই কোনকিছু না

ভাবিয়া অভিমত দেয় "দেখই না মান করে—যোহন একাদশী—" যোহন একাদশী বালকের প্রতি অসহায় ভাবে নিরখিয়া শূন্যতার দৃষ্টি ছাড়াইয়াছে, ক্রমে সুগভীর একটি নিঃশ্বাস লইবার পরে দাড়িতে হাত বুলাইতে থাকিয়া বলিল, "আমার বুকটি কেমন হু হু করে তোর—" লখাই আশ্চর্য্য যে ইহাতেও উত্তর দিতে পিছু হটে নাই, কহিয়াছে "একশো বার করে—" একটু থামিয়া যোগ করিল "আমার মন বলছে নিশ্চয়ই দেখা পাবেই—পাবেই—পাবেই—" যোহন একাদশী যারপরনাই আহ্লাদিত কোন কথাই খুঁজিয়া না পাইয়া বলিল "পাখীটা অবলা ওর কত কষ্ট বল—এর খবর করবি তোর ভাল হবে—ওর কত কষ্ট—হ্যা হ্যাঁ যে কথা হচ্ছিল—মাখনও বললে—পীরিতের গানই চলুক—" লখাই এর যতটুকু মনের প্রসার তাহাতে সে খেলা খেলিতে জানে, সম্ভবত সায় দিয়া বলিয়া "তাই চলুক যোহন একাদশী—" আবার উহার নাম ধরিয়া ডাকিতে সে খুসী, এসময় সে অতি পুরাতন স্বরবিভঙ্গ লাভ করে—মানসিক বাচিক কায়িক একতা ইহাকে সূক্ষ্মতা দিয়াছে, ইহা মসৃণ সহজ কণ্ঠে শেষ করিল "গান চলুক, মান করে দেখ" ঈদৃশী বক্তব্যের ক্ষণিক ছন্দ তাহার দেহকে দুলাইয়াছিল মাত্র, কোথা দিয়া যে ছন্দ অবচেতনার সহিত মিলনকে লঙ্ঘন করত নির্ব্বাপিত তাহা সে মননে কৃষ্ণতম, সে চারিঠাঁই চাহিয়া অধুনা আঙুল মুখে রাখিতে চায়! যোহন একাদশী আচম্বিতে, পরিদৃশ্যমান বর্ত্তমানতাকে কোন কিছু ভাবিতে না দিয়া "ই য়া আ" বিরাট আওয়াজে, ইহা হুঙ্কার না আলস্য উচ্ছেদের না ক্ষিপ্ত চরমতম উল্লাসের আহ্লাদের অভিব্যক্তি! দিক সকল মথিত, বিভ্রান্ত বিকল, লখাইএর হাতখানি মুখ হইতে চমকে খসিল, জিজ্ঞাসা করিতে বিদ্রাবিত হওয়ত কৃশ রুগ্ন, চক্ষু আয়ত, অধরদ্বয় সূচ্যগ্র এখন হাইয়া আছে, দুর্ভাবনায় ব্যথিত আশঙ্কায় প্রথম অক্ষরশূন্য শব্দে ক্রমে বিজাতীয় ধরণে বাক্যস্ফূর্ত্তি হয়, "যোহন একা...যোহন একাদশী তোমার কি হয়েছে কিক্ হয়ে..." বালকের বিশ্বাস জন্মে, নির্ঘাত উহাকে কেহ বাণ মারিয়াছে ফলে কচিৎ শৈবলীর পটে আঁকা চোখ দুখানি এই অর্থে তাহার মনে ভাসিয়া উঠে—সেই অব্যর্থ বাণের ভয়প্রদ ক্রূর ক্রিয়ায়, এখনও মনে হয়, উহার ই[illegible]কার মর্ম্মন্তুদ চীৎকার—লখাই পলকেই একদা পশ্চাতে যেখানে সবুজ, তৎপরেই মাছটি যাহার চঞ্চলতা লক্ষ্য করে, তখনই ইহাও তড়িৎগতিতে খেলিয়া উঠে, সবুজতা আদি যাহা কিছু—যোহন একাদশীকে কি আড়াল করনে ক্ষমতাহীন, এ সকল চলচ্ছবি ব্যতিরেকেও বর্ণহারা শীর্ণ বদনে ক্রমে ক্রমে ঐ প্রশ্ন তাহার দ্বারা সম্ভব হয়, একারণে যে কিছুকাল ধরিয়া কথিত যন্ত্রণাদায়ক শব্দ স্পন্দন শোনা যায়; পরক্ষণেই ইহা দর্শনে সে নির্জীব যে তাহা ঝটিতিই ভূমিতে সটান চিৎ যোহন একাদশীর চক্রাকার পরিক্রমণ, বেচারী পাখীটিও ত্রস্ত স্ফুলিঙ্গ বৃত্তিতে উড়ে, লখাই জানিত না যে উক্ত বিপর্য্যয় ধমকে সে অধরে তর্জ্জনী স্থাপনে বিচলিত, জানুদ্বয় তাহার অল্পভাঙ্গা—ইদানীং তর্জ্জনী অতিষ্ঠ; আর্ত্ত আর যে, ইতঃমধ্যে দুঃখময় পাখীটি উচকিত ঘূর্ণায়মান, ইহার ত্রাসযুক্ত পীড়াদায়িকা উৎকণ্ঠা নিবন্ধন শব্দবিকার আর অন্য পক্ষে বৃদ্ধের 'ও আই' ক্রমান্বয় স্বরব্যঞ্জনভেদ সাযুজ্যে অধুনা লখাই আপনার কেশরাশি আকর্ষণ করে, হঠাৎ আশ্রয় আশে পাখীটি তাহারই মস্তকে ক্ষণেক বসিতেই স্থিতিবান হইতেই চেন সুতলীতে টান পড়ে, নিমেষেই লখাইএর হাত সরিল দেহ রোমাঞ্চে আলুলায়িত; এতক্ষণ, বাণবৃদ্ধ হওয়ার বিশ্বাস দৃঢ়ীকৃত, সে প্রাণান্ত অসহায়ভাবে অনবরত "যোহন একাদশী যোহন একাদশী" নামে গগন বিদীর্ণ করিতে উন্মাদ; দূরে যে এখনও লাঙলে মজুত, তরঙ্গায়িত ধান্য শীর্ষের একান্তে, যে লোক সে হয়ত একবার এখানকার সংস্থাপনের প্রতি ঔৎসুক্য পরতন্ত্র হইল; যোহন একাদশী পরিক্রমণ থামাইল, চক্ষু এদিক সেদিক হয়, কিম্বা ইহা লজ্জা, ধীরে হাত দিয়া পাখীটিকে অলস ভাবে ধরিতে চেষ্টাশীল; লখাই যোহন একাদশীকে এতক্ষণ বাদে চিনিতে পারে, মুখে বালকের একটি কাঁদ কাঁদ হাসি—ঘোর কাটিতেছে, দেখে উহার কোট ধূলায় ঘাসছিন্নে একশা, পরণের কাপড় তদ্রূপ, এ-হেন দুর্দ্দশায় তাহার যারপরনাই কষ্ট হয়, অবশ্যই সত্যই অনুধাবন করে একারণে যে বৃদ্ধ অতিশয় পীড়িত জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছিল গো"...যোহন একাদশী উঠিয়া বসিয়া পাখীটিকে ধরে আর ছেলেমানুষের মত আব্দারে রাগে খুঁ খুঁ করার পর ত্বরিতে কহিল "দুঃ শালা চেঁচামেচি করে শালা আমার ভাব নষ্ট করে দিলি!...করে দিলি ত" অতঃপর কিঞ্চিৎ রূঢ়কণ্ঠে প্রকাশ করিল "হারামজাদা ভাব বুঝিস্ না—শালা—এর নাম ভাব"—পরক্ষণে ক্রন্দনের সুরে অকুণ্ঠিতে, ব্যক্ত করে "বোঝ শালা আমার কি দশা—সাধে বলছি—আমার দশা!" ইহার পর লখাইকে সম্পূর্ণ দেখে—যে এখন নির্বোধ যে এখন দুই হস্ত-জোড় বামস্কন্ধে

উপস্থাপিত করত আপন বদনমণ্ডল উহার উপরে ন্যস্ত রাখিয়াছে, পুনরায় ভগ্ন স্বরে বলিল "আমার মরণ! তোকে দোষ দেব কি—তুমি ছেলেমানুষ—" লখাই কোনরূপে উহার কথা বুঝিতে—ব্যাপার ধারণায় যখন অস্থির, ঈষৎ অন্যমনা তখন দেখে বৃদ্ধ আপন গণ্ডে চাপড় মারে ও বলে "মরণ দশা আমার" এ সময় লখাই ভ্রূদ্বয় তুলিয়াছে, হয়ত এই বিচারে যে সে বড়ই বৃদ্ধের তরে উদ্বিগ্ন হওয়ত নির্ব্বুদ্ধিতার প্রমাণ দিয়াছে, ঐ অবস্থা যে কোন অসুস্থতা না ইহা সে বুঝে, খামখা সে আতঙ্কিত হইয়াছিল, যাহা হউক—সেই কারণে সে উহার নাম ধরিয়া ডাকিবার আশাতীত, নির্ভয়ে, সুযোগ লাভ করিয়াছে; বৃদ্ধ আপনাকে আঘাত করিলেও এমত অর্থ পরিষ্কার যে সে খুসী, সে পূর্ণ; যে সে ঐভাবে সোনা হইতে পারে, ইহা স্মরণে বর্ণাঢ্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এককালেই বক্ষে স্থান চাহিল, তৎ কারণেই বোধ হয়. সে তখন তখনই সোজা হইয়া উঠিয়া দণ্ডায়মান হইতে মন করে, অনুভবে ইহা আসিল যে তাহার মেরুদণ্ড আছে, কিন্তু আশ্চর্য্য পাখীটি হাতের মধ্যে লইয়া আপন কপোলের কাছে আনিতে, আতিশয্যে তাহার কাঁধ অনেক উর্দ্ধে ছুটিয়া যায়, এখন পাখীটি তাহার অধরে, সে আদর খায়, ঝটিতি এই মানসিকতায় বলিল, "এই তুইত আমার সঙ্গে সঙ্গে গলা ছাড়লি না—শালা—!" লখাই অতীব বিস্মিত, ঈষৎ দমকা হাস্য দমনের হিক্ শব্দ শোনা যায়, উত্তর করে "ইঃ বাঃ" এবং যুগপৎ তাহার কণ্ঠস্বর, "ওঃ!" ধ্বনিতে অধীর যদিচ, নিরীহ কেননা সে—সমীপে আসীন যোহন একাদশীর দাড়ির কালোর উপরেই সবুজ পাখীর গোরচনা রক্তিম মাকাল চঞ্চুর এপাশে অল্প উন্মুক্ত ওষ্ঠ উপর্য্যুপরি সঙ্কেতযুক্ত তির্য্যক দৃষ্টির কৃষ্ণতম তুহিন তাহার আঁখি তারা; বালক সঙ্কটে পড়িল, কিছু বলিতে মনস্থ করে, অহেতুক জিহ্বা দ্বারা অধর আর্দ্র হয়, এ কারণ যে সে বাক্যস্ফূট না করিয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠা চুষিতে আবিষ্ট, স্বাভাবিক রঙ্গপ্রিয়তা নিশ্চিহ্ন; অধুনা যোহন একাদশী ঐরূপে স্থির, উহার প্রশ্বাসে পাখীর পালক বিব্রত দেখা যায় একপাশের গাল তাচ্ছিল্য অথবা বিরক্তিতে কিঞ্চিৎ উঠা, তদবস্থায় কহিল "কেন রে শালা—হেঁকে উঠিসনি—কর এখন—কর—দে হাঁক—না হলে শালা তোর মাছ আমি কেড়ে (!) নেব—কই—" লখাই তখনই গদা চৌকিদারের হাঁক অনুকরণ করিয়াই বৃদ্ধের প্রতি অবলোকনে বুঝে যে উহার মনঃপূত হয় নাই, ফলে পুনঃ কপোলে হাত রাখিয়া ভয়ঙ্কর দন্তৌষ্ঠী বিসর্পিল হাঁক দিল, এ সময় সে অনেক বারই উহাকে লক্ষ্য করে, পূর্ব্বের অভিজ্ঞতায় যোহন একাদশী সম্বন্ধে জড়তা নিবন্ধনে ঘৃণা বিকৃত ভয়ে এবং এখন মৎস্য অপহরণ আশঙ্কায় বেচারী আপ্রাণ-অধ্যবসায় দেখায়, তথাপি পাখী আদরকারীর কোনই কিছু প্রীতিপদ হয় নাই বরং সে রুষ্ট, উপরন্তু কহিল "শালা গেরস্ত হুঁশিয়ার কচ্ছিস—এই রকম" লখাই গলা সরল করিয়া উহার মনহরণ নিমিত্ত মরিয়া হুঙ্কার দিল, যোহন একাদশীর চোখ বন্ধ, সে ঐ স্বর নিবিষ্ট মনে শোনে, পুনরায় দেখিল সে নিজেই চক্র দিতেছে—এবং তাহারই অনর্গল স্বরব্যঞ্জনাভেদ ও পাখীর মর্ম্মান্তিক চীৎকার সাযুজ্যে, যে মেঘ অন্তর্হিত হয়, সুদূর কোন দেশের ভজনালয়ের সুদীর্ঘ ষ্টেইনড্ গ্লাসের বিচিত্র ভাবুকতায় অচিরাৎ আলোক সম্পাত প্রচারিত দেখা যায়, অভ্যন্তরে ব্রণ-বিরহিত শূন্যতায় কভু ওক আসনে ক্বচিৎ ভূমিতে ঐ অলৌকিক পৌরুষ, সৌভাগ্য প্রতিফলিত; জলদগম্ভীর অবরোহী বিহার বাদনের আওয়াজ পর্দার স্বরগ্রাম, এখানে বিচরণশীল এক অভাবনীয় অপ্রত্যাশিত এ্যালকেমীর চূড়ান্ত প্রবণতা—হায় আমি! আমি যেন বর্ণ দেখিতে পাই—যাহারা বলিতে চাহে, 'পায়ে পড়ি আমাদের দ্বারা আর বাক্য নির্ম্মাণ করিও না, আর নহে, আমরা এখানে খেলিতে ভালবাসি, এখানে কেননা অন্ধকার নাই।' আমি আপনার ওষ্ঠ দংশন করিয়াছি, পদনখর দ্বারা, মৃত্তিকা খনন করিয়াছি, সে বিচিত্র পৌরুষের প্রতি ব্রীড়া অবসন্ন নেত্রে অবলোকন করি, আঙরাখা স্পর্শের চুম্বনের স্বাদ উহার তিল-ফুলটিতে—যাহা দর্শনে মা লক্ষ্মী একদা বিস্ময়ে শিশু—নিশ্চয়ই ভগবান জানিতেন মানুষ অভ্যাসকে সত্য বলিবে, তাই তিনিই পিতা দয়া পরবশ, তিনি জানিতেন জ্যামিতি বিশেষত্বর অন্যত্রে নিরাংশ এ্যাবষ্ট্রাকটকে মানুষ মনস্বিতা বলিবে তাই তিনি মঙ্গলময় দীনবন্ধু ইদানীং এ বিভূতি-রহস্যশূন্যতা—তোমার টাই এ তাহারই ছোট একটি খোঁজ, দুর পাল্লার ভ্রমণে, আজও মনে পড়ে, মানভূমের লাল রাস্তা দুধারে শাল গেঁও বন, স্পোর্টস্ গাড়ীটা হুঙ্কার দিয়া যায়, টাইপিন ভুলিয়াছিলে, কিম্বা ইচ্ছা করিয়াই, টাইটা তোমার কাঁধে—দুর্দ্দান্ত বেগের মধ্যেও, কি অবিনশ্বর, সোহাগ! মিলি চকলেটের রাঙতা খুলিতে সময় এ দৃশ্য দেখিয়াছে, হিরণ বলিল, বড় জ্যাজ jazz! এবং সে এ-কথা বলিতে উচ্চস্বর সংযোগ করে, উহার মন্তব্য আমি শুনিয়া গভীরভাবে অন্যমনস্ক—'বড়'

কথাটা সে এমতভাবে, উচ্চারণ করে যেন সে 'দারুণ' কথাটা উহার দ্বারা প্রকাশে উৎসুক, মনে হয় আজীবন ক্লান্তিটিকে উড়াইয়া দিতে মরিয়া—মিলি হাসিয়াছে তাহার সুচারু দাঁতে চকলেট লাগা; উপস্থিত, যোহন একাদশী মুখ বিকৃত করে, লখাইএর উল্লাস তাহার পছন্দ নয়, শিয়র আন্দোলনে ইহা বলিতে চাহে যে ঠিক ঠিক হইতেছে না, অনন্তর গভীর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করত শূন্যদৃষ্টিতে তাকাইয়াছিল, ধানখেতের প্রতি চোখ রাখিয়া কহিল, "আলুনি আলুনি লাগছে থাম..." অনিচ্ছা সত্ত্বেও বচনভঙ্গি একটু রূঢ়, লখাই থামিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া উহাকে দেখিবার সুযোগ চাহিল, তর্জ্জনী দাঁতে কাটিতে থাকিয়া চুপ যোহন একাদশী ক্ষীণকণ্ঠে কিছু বলিতেছে, যাহার এক-আদটা শব্দ শ্রুত হয়, একদা শুনিল "শালা," কানে আসিতেই লখাই চমকাইয়া উঠিল, আদৌ তাহার উদ্দেশ্যে কোন শব্দই প্রয়োগ যোহন একাদশী করে নাই, এবার উচ্চারিত হইল "শালা হরিয়ার খালি জাহির কত ভাবের কথা জানি...উঁচুতে থাকে...পৃথিবীটা সোহাগের আরসি নয় একথা সবাই জানে, শালা...সাত চূড়ী এক কর—যত লম্বা লম্বা বাত—তবে ও কথাটা ঠিক যে সুন্দর মায়ায় হয় না—" লখাই কোনই ইতি করিতে না পারিয়া ভীরুভাবে কহিল "এখন কি মাটিতে চককর দেব—তোমার মতন—" যোহন একাদশী বালকের প্রতি উত্তর করিল "পারবি কেন আমার মতন—যেমন খানিকটা চেঁচালি—মনে হল কাকে যেন ডাকছিস—চোর-ছ্যাঁচড়ের কি এ কম্ম!" সত্যই লখাইএর ডাকে আহ্বান ছিল, হয়ত সে এই সূত্রে, অবচেতনায়, সে সৌন্দর্য্যকে আহ্বান করিয়াছে; অধুনা বৃদ্ধের অসন্তোষ বেচারীকে অবশ করে, পুনরায় শুনে, "না দেখলে ওটা হয় না, আমি বলি, তুই না লেগে পড়—তুইও খোঁজ—আমি সবাইকে বলেছি—মাটিয়ারীতে যে ইরাণীরা এসেছে ওদেরকে বললুম—ওদের মোড়ল বললে দেখা মিললেই বলব—ওরা ত মাঠে মাঠেই থাকে—ঠিকানা সঙ্গে সঙ্গে ফিরছে তাজ্জব!—দেখবি আশ্চর্য্য সুন্দর— খুঁজবি ত বল—খুঁজবি?" লখাই ঘাড় নাড়াইয়া সম্মতি জানাইবার পরেও কহিল, "একশো বার" যোহন একাদশী সহসা উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং একবার লখাইএর দিকে অসহায়ভাবে চাহিয়া ঝটিতি জলপূর্ণ আলপথে নামিয়া গেল, মন্থর পদ সঞ্চালনে জলে সঙ্কেতপূর্ণ শব্দ তরঙ্গায়িত—এখন সে আরবার ফিরিয়া দণ্ডায়মান, কোনক্রমে চোখ তুলিয়া লখাইকে যে তৎকালে একটি স্বস্তির শ্বাস ফেলিতে উদ্যত, নিরীক্ষণ করত বলিল "খুঁজিস কিন্তু আর যেই না দেখা পাবি—তৎক্ষণাৎ টেলিগ্রাম—আমাকে বলবি" ইহার পর আঙুল দিয়া শূন্যতায় অনেক কিছু লিখিল, থামিয়া, এবার কহিল "হু কিন্তু কাউককেও কিছুটি স্পিকটি উহু—স্পিকটি নউট—সোজা আমাকে—আমি তোকে কাঠি বরফ খাওয়াব—" প্রতিশ্রুতির শেষে আবার চলিতে শুরু করে, লখাই মাথায় হাত বিনীত হওনে রাখিয়াছিল, এখনও তেমতি আছে, তাহার নজরে যোহন একাদশী আর দূরে বাদলার মেঘ বৃদ্ধর হাতের পাখীটি চমকিয়া উঠে, সম্ভবত বিদ্যুৎ দর্শনে; এবার গান শোনা গেল, 'আয়রে বসন্ত ও তোর কিরণমাখা পাখা তুলে' উত্তম করিয়া যোহন একাদশী গাহে, অধুনা তাহার হাত অভিব্যঞ্জনায় খেলিয়া উঠিতেছে, এ দিকে উৎপীড়িত উপদ্রুত পাখী, নিম্নে ধানখেতের লহরী—আকাশে বিজুরী রেখার এই সম্বন্ধের পরিস্থিতি মধ্যে অবরোহণ অর্থকে উৎসাহিত করিতেছিল, উহার হাত দুইখানি; বেশ যখন দূরে তখন লখাই অনেকভাবে যোহন একাদশীর হাত সঞ্চালন নকল খানিক নৃত্যের ভঙ্গীমায় করে, পরক্ষণেই মাছটি লইয়া আপন অঙ্গে যোজনা করিয়া অতি বিকৃত অশ্লীল ইচ্ছার মথিত, নিশ্চয়ই অবশ্যই এমন এক আনন্দ হয় এমন উচ্ছ্বাসে এমন ডাগর হর্ষে সে উত্তপ্ত যে সে বুনো, উপস্থিত সে মাটিতে হস্তদ্বয়ের উপর হঠাৎ ভাঙ্গিয়া পড়িল, ভয়ঙ্কর পশুর ন্যায় হালুম হুঙ্কারে মাছটির নিকট অগ্রসর হয়, প্রায় দন্তাঘাত করিতে প্রস্তুত, মৎস্য গন্ধে নাকটি কেমন বিচলিত উঠে বাঁকে, ঝটিতি সে একহাতে ভর রক্ষণে বিপরীত দিকে ঘুরিয়া সমগ্র চরাচরকে নয়ন ভরিয়া দেখিতে থাকে, প্রথম বৃষ্টি নামার—খেত হইতে খেতান্তরে লাঙলের পার্শ্ব—সে হো হোই আহ্বানধ্বনি, প্রীতিসূচক চীৎকার সে শুনিতে পাইল? জানান দিতে যে তাহার গাত্রে ফসলপ্রসবী বৃষ্টির সর্ব্বপ্রথম বারি বিন্দু পতিত হইয়াছে সে গলার শিরা স্ফীত করিয়া তুফান তুলিয়াছে, এবং 'আনি মানি জান না'য়ে খানিক ঘুরন্ত, হঠাৎ বেগ সম্বরণ করত স্কুলের ছেলের মত 'বন্দেমাতরম্' বলিয়া উঠে, তাহার স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার হইয়াছে এবং বোধ হয় সে নিজেই স্বাধীনতা ফিরাইয়া আনিয়াছে যোহন একাদশীকে সে নাম ধরিয়া নির্ভয়ে ডাকিয়াছে, এখন লখাই দশাসই এই অধিকার তাহার হাতেই যেমত আছে; বোধমাত্রেই সে মুখে দেহে সহাস্যে মাখিতে লাগিল, এইবার স্নান, একদা মনে হইল, 'আঃ এখন

যদি চন্দন কাঠটা থাকিত!' এইটি সে দারুণ ক্ষিপ্রতায় বুদ্ধিতে চুরি করিয়াছে; দুর্লভ ময়রার কাকী যখন আপনকার নাম ঘর...পূজার ঘরের সামনে দাওয়ায় বসিয়া চন্দন ঘষিতে একমনা, তৎকালে কশ্চিৎ গরু উহাদেরই ছোট খেতে—বেগুন আর ফলন্ত ঝিঙে প্রচুর—ঢুকিয়া পড়ে, দুর্লভ ময়রার কাকী তৎক্ষণাৎ কাজ রাখিতে বাধ্য হইয়া গরু খেদাইতে অগ্রসর, ফলে ঐখানে কেহ নাই, শুধু অঙ্কিত সামগ্রী—অজস্র ফুলরাজি, ঘরে সিংহাসনে গোপাল, লখাই সহসা উপস্থিত, ঝটিতি আরাৎ বিধৌত পুষ্পরাশির সময়া চন্দন পীঁড়ির উপরে কাঠটি লইয়া অদৃশ্য একারণে তাহার হস্তে ঘষা চন্দন লাগে, নিমেষেই সে আর এক! হস্ত নাসিকার নিকটে প্রসারিত—আঃ অপূর্ব দিব্য গন্ধ! অনন্তর ছোট কুঞ্জে সে, পত্রচ্ছিন্ন অসংখ্য কিরণ রাশির তির্য্যক চমৎকারিত্বের মধ্যে লখাই বিকাশোন্মুখ, এতাবৎ নানাবিধ ভীতির হেতু হইতে পলকেই এখন নিশ্চিন্ত, অব্যর্থ বিশ্বাসে নিঃশঙ্ক চিত্তে সে নিজেকে দেখিতে পাইল, সেই গন্ধ বহু বহু উচ্চে উন্নীত করে—বিশেষ হর্ষে সে জাগ্রত, নিশ্চয়ই ইহার অর্থ যে, মনে হয়, সে উচ্চবর্ণের সন্তান; এই ব্যাপারের পর, "যে নিয়েছে সে গলায় রক্ত উঠে মরবে...বংশ নিপাত হবে..মাগী হয় গর্ভস্রাব হবে...গোপালের চন্দন কাঠটা গো...ধুনস্কোটি তিৎথ থেকে আনা...হায় হায়...নরকেও স্থান হবে না" ইত্যাদি পাগলিনী আলুথালু হওয়ত গ্রাম পথের এখানে সেখানে দুর্লভ ময়রার কাকীর অভিশাপ—বালককে বিচলিত করে নাই, সে ঘাটে বসিয়া জল আলোড়ন, পদদ্বারা, করিয়াছে, কখনও আপন কপোল শোষণ করত দাঁতে খানিক চাপিয়া প্রকৃতির এটা সেটায় নির্ভয়ে দৃষ্টি খেলাইয়াছে, এমন কি সুহার বুক স্পর্শে বলিয়াছে "মা কালীর দিব্যি..." সুহা শুধু কহিয়াছে "ঠাকুরের জিনিষ...পাপ হবে..." এতাদৃশ ফল সে বহু শুনিয়াছে, অধুনা শৈলাবী—বিরাট পিঙ্গল যাহার চক্ষুর্দ্বয়, শনি মঙ্গল বারে, চতুর্দ্দশী অমাবস্যার ঘোর রাত্রে যে উলঙ্গ হইয়া লতাগুল্ম শিকড় সংগ্রহ করে, অপরাজিতর শিকড়, হলুদের গেঁড় আরও অনেক, লখাই তাহার মায়ের ফিস্ ফিস্ গলায় পরিষ্কার বর্ণনা করা "কার সর্বনাশ হল, রাত তখন মাটির গায়...দেখি শেওড়া বনের ওপাশে বাবা কি দিয়ে তৈরি কে জানে...একেত লশাসই...পুরুষ্টু চেহারা...মুনিইসি ঘায়েল হয়...ওই চেহারা এক ঢাল চুল উড়ছে, উদোম ন্যাংটো, কি একটা শিকড় তুলে ঝপ্ করে আমার সামনে পেরায় কোদাল-কোপান চাহনির পর এক হাট চোখ মেলে বললে...কাউকে বলিসনি লখাইএর মা...এখন ভাবলে বুক আমার হিম...এক ঢাল চুল ন্যাংটো শৈবালী বড় বড় চোখ তিন পা এগোয়, পাঁচ পা পিছুয়ে গিয়ে, তিন পা বাঁয়ে গেল..." মায়ের মুখ ফিস্ ফিস্ স্বরে এ দৃশ্য! যুগীর মাকে বলে পক মনে শুনিয়াছে সেও; অনেকেই তাহাকে এইভাবে দেখিয়াছে, শুধু অক্ষয়মাস্টার তাচ্ছিল্যভরে মন্তব্য করে "যা যা তন্ত্র চাট্টিখানি...ইকি কপাল কুণ্ডলা...মাগী এক নম্বর ধ্যাষ্টা...থাকে ইঞ্জিন ডাইভারের সঙ্গে মোছরমান মরদ—আবার স্বামীর কল্যাণে সিঁদুর পরে...সে শালী করবে তন্ত্র...দেখগে যা গর্মীবাগী মেহর ওষুধ তুলছে..."—সেই শৈবালীকে লাগান হইয়াছে, সে সকলকে চাল পোড়া খাওয়াইবে—চন্দন কাটের হদিসে, শুনিয়াও লখাইএর কিঞ্চিন্মাত্র বৈলক্ষণ্য নাই, ঠাকুরের জিনিস স্মরণেও সে স্নায়ু বিকারের রোগী নহে, এক আধবার সদ্য সকালের বিধৌত ফুলের ছবি মনে উদয় হয়, তখনই একটির পর একটি ফুলের নাম বলিয়াছে, সাদা ফুল বোষ্টমদের লাল ফুল শাক্তদের, ইহাও সে জানে; অনেকেই তাহার কারণে হয়ত বা চুরির হদিশে গোষ্ঠর মাঠে পর্য্যন্ত গিয়াছে—সে ভ্রূক্ষেপ করে নাই; উপস্থিত চন্দন কাঠের জন্য উহার মন কেমন করিল, এই সুদূর প্রসারী ফাঁকা মাঠে সেটির কারণে যারপরনাই ব্যাকুল, থাকিলে অতিশয় জৌলুষ হইত, বড় সুখের হয়, ইদানীংকার যোহন একাদশী-সাক্ষাৎকার ফলে মনোভাবে চন্দন সৌরভে হরষিত হওয়ার বাসনা ন্যায়সঙ্গত—স্বাভাবিক কেননা অখণ্ড নিরবচ্ছিন্ন স্বাধীনতা উহা, ইহাই তাহাকে এমত লঘু এতই সূক্ষ্মতম করে যে সে অনায়াসে আপন দৃষ্টির উপর দিয়া—পথ দিয়া বিহারে পারদর্শী, একারণ যে, চন্দন নিহিত, বিজনতা, নিঃসঙ্গতা তাহাকে আশ্চর্য্য রমণীয় সৌহার্দ্দ্যে বাঁধিয়াছে, কখনও দেখিয়াছে তথাকার জ্যোতির্ম্ময়ীদিশা তাহারই পথ চাহিয়া অপেক্ষমাণ, কোথাও কিন্তু নাই এবং সে নিজে সম্ভবত, উহার গম্ভীরতার বিনিষ্কম্প স্তব্ধতা বৈ অন্য কিছুই অনুভব করে না, ঐ কল্পনাতীত রসাস্পদ পরিবেশ শুধু বড় আপনার ইহা বিশ্বাস জন্মে; তাই সে মাঝে মধ্যে বলে "যাই একবার চন্দনের কাছে যাই..."—উপস্থিত, সে বাস্তবিকই আপনকার দুই করদ্বারা এমন এক মুদ্রা নির্ম্মাণ করে যাহাতে মনে ধ্রুব, যে চন্দন কাঠ যথান্যায় বর্ত্তমান, আর যে সে অচিরাৎ তন্ময়, ঝিম—মহাআবেগে সোজাবাঁশীধরা মুদ্রাবদ্ধ হাতের

উপর হইতে সৌরভ আঘ্রাণে লখাই শরৎকালীন লঘু মেঘ, ঘুমায়, শিয়র কিয়দংশে স্কন্ধের দিকে আড়, বিলম্বিতে নয়নযুগ ঈষৎ উন্মীলিত এবং পরিদৃশ্যমান বিদ্যমানতা স্পর্শন-প্রত্যক্ষে লখাই আলোক বর্ষ; বেশ দূরে, এখনও যোহন একাদশী, কখনও সখন, হাওয়ায় উহার ক্ষীণ গীত উচ্চকিত, এদিকে লখাই যে আজীবন বেচারী, অধুনা, ছোট বহুল অযতনের শরীর দিব্যগন্ধের উলুধ্বনি স্পন্দিত, নিরাংশে অলৌকিকতায় চিন্ময়, শুধু তাহার বারম্বার মনে হয় যে সে বড় দামী, খুব দামী; এখন সহসা নজর ফিরাইতে মৎস্যটি নিরীক্ষণে গাত্র কাঁপিয়া মহা আনন্দ জ্ঞাপন করিল, "ঢেঁকি খেলা"...মনে উদয়ের তৎক্ষণাৎ আপনার পিঠ বাঁকিয়া উঠে, ইস কি মার! সুহা তাহাকে বিচুটি দ্বারা মারে, ঘাটে সুহার পিঠে সাবান মাখাইবার কালে সে তাহার, অভিজ্ঞতা ধরা গলায় বলে যে, 'তুলসী আর আমি উচ্ছে তুলছিলুম, ওর নজরে পড়ল টগর তার বরের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলে, তুলসী আমায় বললে চ চ ঢেঁকি খেলা দেখবি,"...সুহা সাবান মাখার আরাম ও আর্দ্রতা হইতে আপনাকে প্রস্তুত করিতে পারে নাই, যখন সে বস্ত্র সঠিক করিতে মনস্থ করে, শোনে "আমি আসায় বললে এখান দিয়ে উঁকি মার..." সুহার গাম্ভীর্য্য লখাই পৃষ্ঠদেশে অনুভব করে, কেমন যেন গরম, তবু কথা সংযমে সে অপারক, হয়ত ভয়ে বলিয়া ফেলিল "জানো তুলসী আমায় বলে আয় আমরা..." এ সময় সে দেখিল অনেক রামধনু বুদ্বুদের উপর—সুহাসিনীর এলো খোপা ধরা চুলের হাত সরিয়া যাইতেই—কালো চুল পড়িল, সুহাসিনীর বুকের হাতও সরিয়া যায়, বিস্রস্ত বসনে নিকট হইতে বিচুটি তুলিয়া মারিতে আরম্ভ করে, সে রণরঙ্গিনী অঙ্গে বস্ত্র নাই, চুল জল সত্ত্বেও এলোমেলো, মুখমণ্ডল অপমানে লাল—"বদমাইস...হারামজাদা...যত...পাজী...হাভাতে আসুক সে...যত পাকা পাকা কথা..." ইহার পর সে আরও অনেক কথাই বলে যাহা নিশ্চয়ই লখাইএর মনে থাকা "যে তার মাকে (তুলসীর) বলব তার না বিয়ে হয়েছে...ফের যদি...ওদের সঙ্গে...দুটো উচ্ছে দেবে ব্যাস্ বসে গেলুম!" অতএব ঐরূপ খেলা মননে, যদি কখনও, তখনই তাহার পিঠ বাঁকিয়াছে, যুগপৎ সে আপনার দৃষ্টি ফিরায়—ফিরাইয়া সেখানে যেখানে যোহন একাদশীর ভাব হয়, সে স্থান নিজেই আঙুল সঙ্কেতে দেখায়, ঘাসরাজি মনে লয় পৃষ্ট নহে, আশ্চর্য্য, অপার্থিব শ্রী ধারণে এখনও মনোরম, তদ্দৃষ্টে বালকের নয়নযুগ সত্যই বিমোহিত অথবা আপনাকে সম্মোহিত করে বলিল, আঃ ঘাস কি সুন্দর! হায় তাহার হাত কি কান্দিতে জানে, এবম্প্রকারে সে নিমেষেই দেউল নির্ম্মাণের সাক্ষাৎ পরিকল্পনার খেই, প্রথম কাঠামো বিগ্রহ, এবং কখন যে সে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হওয়ত, অতীব সন্তর্পণে জানু পাতিয়া উপবিষ্ট তাহা সে জানে না, তাহার কণ্ঠে স্বরভঙ্গ "এ পদ ব্যক্ত করিতে হয় যে "আঃ ঘাস...ঘাস...কি সুন্দর!" অধুনা তদীয় হাতখানি ঘাস সকলের উপরে ফিরে, কবেকার পুরাতন কথা হয়ত বা মনে আসিয়াছিল অথচ যথার্থই বিস্ময়জনক ইহা যে কিছু আগে সে যেকালে হঠাৎ লব্ধ স্বাধীনতায় আহ্লাদে 'আনি-মানি' ঘুরন্ত, আদত এই কারণেই সে এতই উদ্বেলিত, যে নির্ঘাত সুন্দর নিশ্চয়ই কোন বাতাস যাহা যোহন একাদশীকে ভর করিয়াছে তখন সে অশরীরীকে এইরূপ অনুরোধ করে "তুমি আরও সুন্দর হয়ে বেটার ঘাড়ে চেপে বস, কক্খনও নেব না...আমি তোমাকে ইলিস মাছ খাওয়াব...রোজা আস্‌লেও নাব্‌বে না, ও শালা..." সে সঠিক বুঝে যে উহার জন্যই যে সে এতদিন পর, লখাই পরিত্রাণ লাভ করিয়াছে এই মুক্তি সৌভাগ্য! ইদানীং পূর্ব্বকথিতবৎ অবস্থায় থাকিয়াই আরবার কোন বাক্যস্ফুট না করিয়াই মনোজ্ঞভাবে "আঃ ঘাস কি সুন্দর! বলিতে চাহে, পদনিচয়ে ওষ্ঠ কম্পমান এবং এ-হেন অনুধাবনের সহিত দেহখানি অচিরাৎ হিম উদ্বিগ্নতায় অধৈর্য্য, দুলিতে দেখা যায়, এমতই যে মনে হয় সুবিচারিত কোন মসৃণ চিক্কণ ভাবনার গ্রাহ্য মধুরূপ বৈচিত্রে চালিত, সুদৃশ্য আভাস ধারণায় দেহে এই তরঙ্গ সঞ্চার, কেননা আপন বিস্ময়ে পূর্ব্বোক্ত পদের যুক্তি সঙ্গত, ছন্দ অনুপাতে কথা সে খুঁজিয়া পায় নাই, মন চলন্ত গাড়ীর আয়না, হায় যদি সে মিল দিতে পারে! কেবল অহরহ সুন্দর সুন্দর সুন্দরই উচ্চারণ মনেতে হয়, এবং একদা ঝটিতি সে সোজা উঠিয়া, কেন যে "আস্তিকস্য মুনিম মাতা ভগ্নী বাসুকী—" শ্লোক আবৃত্তি প্রয়াস করিল, যদ্যপি এখন রাত নহে, যদিও সে শুইতে যাইতেছে না—যখন সে অসহায়; ইতিমধ্যেই বুঝিল যে সে আবার ভুল করিয়াছে, শ্লোকটি শিখাইবার সময় সুহাসিনী পৈ পৈ করত বলিয়া দিয়াছে "ভুল হলে মন্তরে ফল হয় না।" সেইহেতু লখাই পুনর্ব্বার সংশোধন করে, অথচ সর্পের কোন চিহ্নই এখানে নাই, যে সর্প বিষধর, অথচ ইহাও সত্য যে সে ভয়ে শীতল শিহরিত, অথচ সে স্পষ্ট দেখিতেছিল অন্য কিছু,—তাহা

এই হয় যে, জগতের বিশালতা ক্রমবর্দ্ধনশীল আয়তন হইতে আরও আরও; প্রসার গল্পের সীমা ছাড়িয়া লক্ষ লক্ষ যোজন দূরে—পরিপ্রেক্ষিত নাই আকাশ মিশিতে পারে না, ছুটিয়া শেষ করার নহে, ক্রমান্বয়ে অপরিচিত বিদেশী—ইহাই তাহার ভীতি, ইহাই লখাইকে ঐ আদি অন্তহীনতা স্বীয় অবশ্যম্ভাবিত্ব লইয়া গ্রাস নিষ্পেষিত চূর্ণীকৃত সঙ্গীন অনাথা করে—বেচারীর অন্য শ্লোক জানা নাই যাহা আবৃত্তিতে সশ্রদ্ধ স্তুতি করিতে পারে, ফলে মনসার ধ্যান; কে যেন আবার যোহন একাদশীর মত এক হাতে দাঁড়ি উল্টা করত মুখের কাছে ধরে, ফুঁ দিয়া চুলগুলিকে বিরক্ত করিল, বজ্র আজ্ঞায় কি যেন বলে, সে সকল কথার অর্থ বুঝিতে যাহাতে না হয়, তৎপূর্ব্বেই সে যোহন একাদশীর বর্ণিত সৌন্দর্য্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুভবে, প্রাণপণে সুন্দরীকে ডাকিতে উদ্যত! কোথায় সে তাহাকে খুঁজিবে, চির চেনা আগান বাগানও প্রহেলিকা—একদা দেখিল রাত্র ঘোর কৃষ্ণময়ী ঝঞ্ঝা উৎপীড়িত, তালবৃক্ষের শীর্ষ উৎক্ষিপ্ত, সে দাঁড়াইতে অসমর্থ দিকে তাল খসিয়া নিঃক্ষিপ্ত হয়, সে বদ্ধ পরিকর, দেখা পাইতেই হইবে, মাঝে মাঝে মেঘ গম্ভীর আওয়াজে, ধূলিকণাও অবসন্ন, তাল পতনের বিকট শব্দে এখন সে কাঁপিয়া উঠিল, বালক তবু আপনাকে দুঃসাহসী করিবার নিমিত্ত মুখ ব্যাদনে প্রলয়ঙ্কর শব্দ করিল, তখনই দুর্দ্ধর্য, তাহার সমকক্ষ নাই—তখনই সৌন্দর্য্য বর্ণনা ধ্যানে আনিল, খুঁজিতেছে যখন, চকিতে প্রত্যক্ষ করিল, শৈবালী উলঙ্গ দশাসই শরীর চুল উড়ে, একদা লখাইএর ইচ্ছা হয়, উহাকে সে কড়ি চালিতে বলে, তাহার ন্যায্য পয়সা সে দিবে, তখনও শৈবালী সম্মুখে, হাওয়ার দাপটে চুল ছত্রাকার, পীন উন্নত পাথরকাটা স্তন যাহার কম্পিত, অট্টহাস্য করি উঠে, যাহাতে নাল ঠোকার শব্দ হইল, সম্ভবত উলঙ্গ রমণী তাহার মনোবাঞ্ছা বুঝিয়াছে, লখাই ঈষৎ মাত্র দমে নাই, তাচ্ছিল্যভরে বলিয়াছে "তুই শালী সানকী খোওয়া গেল, হদিশ দিতে পারিস, তুই শালীত ছুকড়ি মেয়ের চোকের ভাষা আনতে পারিস...বউকে...হুড়কো—" এবং চোখ তুলিয়া তাহাকে দেখে, বিরাট চক্ষুর্দ্বয় অনেকের অন্ধকার যাওয়া আসা করিতেছে, এই ভয়ঙ্কর দুর্যোগের মধ্যে দেখিল শৈবালী তেমনি হাস্যসহকারে উহাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইতেছে; সঙ্গে সঙ্গে লখাই প্রতিজ্ঞা করিল, মরণপণ তবু আমি তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিব যোহন একাদশীকে খবর দিব, নিজে বাঁচিবার জন্যই, জঘণ্য ভাবনা হইতে নিষ্কৃতি আশে, ঐ কুৎসিত ভবিতব্যকে যদি সমূলে উৎপাটনে সত্যই সে মরিয়া—তাহার জন্য তাহাকে সৌন্দর্য্য বর্ণনা চোখে রাখিতেই হইবে, অন্য গতি নাই, খুঁজিতেই হইবে যদি স্বাধীনতাকে অটুট রাখিতে চাহে, ইত্যাকার অর্থ উহার ছোট পদবন্ধন সঙ্কল্পে ছিল যাহা "খুঁজিতেই হইবে" এবং যোহন একাদশী কথিত সূত্র মুখস্থ প্রয়াসী হয়—"আলো দিয়ে তৈরী" আর যে পরক্ষণেই বলিয়াছিল "আমি বামুনের ঔরসে—আমি কি তা চিনতে পারব—" তৎসঙ্গে সহিত আপনার আঙুল চুষিতে আরম্ভ করে, নয়নের সমক্ষে জগৎ তেমনি খেলায়—অস্থির, ঝটিতি এক নীলকণ্ঠ ঐ খেলার মধ্য দিয়া যায়, তাহার চক্ষু এ-দৃশ্য এড়ায় নাই, সে হাততালি দিতে মুখগহ্বর হইতে আঙুলি নামায়, দেখিল, একটি কাঠবিড়ালী! যুগপৎ সে দৃপ্ত তেজে বলীয়ান, শ্রীরামচন্দ্রের হস্ত চিহ্ন তাহাকে যারপরনাই হরষিত করে, সত্যই কাঠবিড়ালীরা কত-সুকৃতির ফলে রামের স্পর্শ পাইয়াছে, লখাই বলিল "নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই একশো বার হাজার বার সেই সুন্দর যে আলো আলো তার দেখা পাবই—" সকল সময়, স্পর্শন-প্রত্যক্ষ সাধ্য কল্পনা-ও অনুসন্ধান সঙ্কল্প মনে উৎকীর্ণ থাকে; আশ্চর্য্য ইহার পরও কিন্তু লখাই রেহাই পায় নাই, যেই মাত্র সুহা লখাই হইতে আড়ালে, ঝটিতিই যোহন একাদশীও তৎপর, কোন দ্বিধা নাই, এমন হয়, কখনও বা পলায়নরত লখাইকে ধরিতে বেসামাল, পিছলাইয়াছে—ইহাতে, খবরে, সুহা হাততালি দিতে সময় মধ্যেই অন্যমনা, অনেকবারই উহার মুখমণ্ডল আরক্তিম তখনই যখন বৃদ্ধ সফলকাম, অভদ্র সদাচার বিরোধী কটুবাক্যে স্ফুলিঙ্গে তাহাকে জর্জ্জরিত পরতন্ত্র প্রগলভ; সহসা বালিকা এখন দেখিল—যাহার পরিত্রাহি কান্নায় বিব্রত হওয়ত, অত্যধিক ক্ষিপ্ত প্রশ্ন করার পূর্ব্বাহ্ণেই, সে নিজেই উপস্থিত পশ্চাতে যোহন একাদশী, গীতগুঞ্জনে ভ্রূকুঞ্চিত, নির্ব্বিকার চিত্তে দরজায়, তদ্দৃষ্টে সুহার রক্ত উদ্ধত, এক নিঃশ্বাসে বেচারীর মর্ম্মভেদী ক্রন্দনের হেতু বুঝে, তিক্ত স্বরে কহিল "ফের ওর গায়ে হাত তুলেছ—বে আক্কেলে ভূত" ইহাতে বৃদ্ধের কোনই অসম্মান নাই, শুধু অনুনাসিক খুঁ খুঁ আওয়াজ করে; সুহার গলা অন্যগ্রামে, "মহা নসরিয়া আদমী ত তুমি—খামখা ছেলেমানুষটাকে কিসের জন্যে মার" অধুনা যোহন একাদশী আপনকার মোচে কুটিল পাক দেয়, দিতে উত্তর করিল "খবরদার নসরিয়া বলবে না বলে

দিচ্ছি—যোহন একাদশী কাউখে জবাব দেয় না" ইহাতে সুহার অঞ্চল খসিয়াছে, তাহার সুদৃশ্য বাহু মাধুর্য্য নখিলা এবং বাত্যা দৃপ্ত বচনে কহিল "বেশ করব বলব...তোমার ঘাড় দেবে..." যোহন একাদশী স্থির, এতাদৃশ উগ্রতায় সে, অভ্রান্তে, ছোট, তবু সে উহাকে আড়দৃষ্টিতে পর্য্যবেক্ষণ শেষে তুচ্ছ জ্ঞানে উচ্চারণ করিয়াছে "যা যা...এঁ হাতী দেবে...মেলা চেল্লাসনি জেলাবী মেয়েছেলে কোথাকার—" এই কথায় তৎক্ষণাৎ বালিকার মেরুদণ্ড সোজা, রুষিয়া হিংস্র, ওষ্ঠদ্বয় কম্পিত, এবার প্রয়োগ করে "তবে রে...হাড় হাবাতে ডাক্‌রা—" ঐ ভীতিপ্রদ গঞ্জনা কোনদিক হইতে যে আসিতেছে যথার্থই, সম্ভবত, তৎকালেই যোহন একাদশী নির্দ্ধারণে বুদ্ধিহীন, অতএব উহার শিয়র আশে পাশে হেলিয়াছে, ঈষৎ স্বাভাবিকতায় তত্রাচ সদম্ভেই "আর একজনের কান্না কানে যাচ্ছে না, বুজি...সে ছুঁড়িটাকে দরকার থাকে ত—" যুগপৎ সুহা বলিল "জিজ্ঞেস করতে আমার বয়ে গেছে...ইচ্ছে হয়—" এবং সে এই সময় অল্প মাথা নামাইয়া কেননা রকের চালা অনেক ঢালু, জানালার বাহিরে তাকাইল—নিকটে কল্কে ফুল গাছের ছায়ায়, আলোর হিজিবিজির মধ্যে এক ছেপ্‌টি পরিহিত মেয়ে, হাতে পোস্টকার্ড, কান্দিতেছে—ক্ষণেকেই চোখ ফিরাইয়া এখানে ক্রন্দনরত লখাইকে স্বীয় তর্জ্জনী দ্বারা উল্লেখে জানিতে, সুহা, চাহিল, "তা একে তুমি মারবে কেন শুনি...ছ্যাঁচড়া ছোটলোক—" যোহন একাদশী নিজ মুখটিকে অযথা বিকৃত করত উত্তর দিল "না কাঁদাবে না...ছুঁড়ির পয়সা পড়ল আর হাওয়া" ও তৎসহ মহা বিদ্রূপে ইহাও উক্ত হয় "মচৎকার" এহেন পরিহাসে বালিকার নয়নযুগ উষ্ণ আদবোজা তীক্ষ্ণ হইয়াছে নিমেষেই আপনকার শরীরে বিশ্রী অঙ্গভঙ্গি উহার হয়, সে আক্রমণ করিল "ও তার কি জানে" বৃদ্ধর সত্বর পশুকণ্ঠে প্রতিধ্বনি শোনা যায় "ওখানে ও ছিল...ছিল যখন তখন নিশ্চয়ই—" ঈদৃশী যুক্তিতে তখনই উত্যক্তকারী ছাগধ্বনী তুলিয়া সুহা উচ্ছলিত, এবং দংশন করে বা "বাঃ যেমন মর্কটের মতন চেহারা...তেমনি বাঁদুরে বুদ্ধি—" এই অসভ্য ইঙ্গিতে যোহন একাদশী অতীব উত্তেজিত, কর্কশ তুমুল স্বরে প্রতিবাদ সূত্রে বাধা দিল "মুখ সামলে কথা বল" সুহাসিনী বলিল "বেশ করব বলব বাঁদুরে বুদ্ধি" যোহন একাদশী ইহাতে, দৃষ্টি সঞ্চালিত করিয়া এখানে সেইখানে, কিছু খোঁজে, আর যে পলকেই অত্যুগ্র তারস্বরে অনতিবিলম্বে কহিল, "তাহলে আমিও বলব...জেলাবী" উহার কথা শেষ হওয়ার পূর্ব্বে সুহা নিজ কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করত আশ্চর্য্য অসম্ভব চীৎকারে "একশো বাঃ বলব...যেমন বাঁদুরে বুদ্ধি—" বৃদ্ধ ভীমকর্ম্মা চোখে তাহাকে দেখিয়া সেইক্ষণেই আপন দুই করদ্বারা কর্ণ চাপিয়া, দিক সকল মথিত হয় এমত হুঙ্কার দিয়াছিল "জেলাবী জেলাবী কোথাকার" বালিকা ও বৃদ্ধের উন্মত্ত নিনাদ পরম্পরায় কখনও বা যুগপৎ, যারপরনাই ঘোর দুর্যোগ ঘনাইল, এইরূপে বেশ কিছুক্ষণ, উত্তরোত্তর ক্রমে স্বরভঙ্গ শোনা যায়, কেহই উহাদের মধ্যে দমিবার পাত্র নহে; লখাই কান্না থামাইয়া, আঙুল চুষিতে ক্ষণেই তাহার চক্ষুর্দ্বয় স্ফীত, ইহা দর্শনে বিবর্ণ, এতাদৃশ কাণ্ড নিশ্চয়ই নূতন নহে, তথাপি সে মূঢ়মতি, এইহেতু যে ইহা একাধারে এককালেই হাস্যোদ্দীপক, কৌতুকপ্রদ ও আতঙ্কদায়ী ত্রাসের; ইদানীং পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষ হইতে ক্রমবর্দ্ধমান উদাত্ত মন্ত্রোচ্চারণ আসিতেছিল, বোধহয়, সে বিষয়ে হঠাৎ সুহা সচেতন, তাহার গণ্ডদ্বয় ও রগ দুইটি এখন লাল, কণ্ঠের শিরা উপশিরা অতিমাত্রায় নীল, স্ফীত, কুঞ্চিত, অল্প স্বরে বলিল, "ও নিয়েছে বললেই হল—" যোহন একাদশীর কানেও মন্ত্রোচ্চারণ পৌঁছায়, সম্বিৎ ফিরিয়া ইহাতে নিশ্চয় পায় নাই বরং সে খানিক আত্মপ্রত্যয় লাভ করে, অধুনা সুহার উত্তরে বলিল "জেলাবী কোথাকার—" কেননা তাহার ধারণা হয়, বালিকা পূর্ব্বের ন্যায় এখনও চীৎকার করিতে প্রস্তুত, আর যে সে যে হারিতে চাহে না; উপস্থিত লখাই মহা প্রমাদ গণনায় দরজার প্রতি চাহিল, এ কারণে যে সে ভাবে, পুনরায় ঐ ভয়ঙ্কর দৃশ্যের সঙ্ঘটন হইবে; আপাতত মন্ত্রধ্বনি কিয়ৎ পরিমাণে খাদে, যোহন একাদশী হঠাৎ অসংযত, কহিল, "না মারবে না...পয়সার ত আর পাখা নেই...তাহলে তুমিই কম দিয়েছ" সুহা তখনই তাহার, বৃদ্ধের, অভিসন্ধি বুঝে, যথা সম্ভব সুস্থ মস্তিষ্কে উত্তর দিল "আমি কম দিয়েছি...তোমার মুখে...আর তুই বা খুঁজতে যাস্ কেন বাইরে পড়েছে আমাদের কি—" বৃদ্ধ মন্ত্রোচ্চারণের তারতম্যে কিঞ্চিৎ জোর লাভ করত, সদর্পে ব্যক্ত করিল, "তাহলে হ্যাঁ হ্যাঁ তুমিই কম দিয়েছ" এবং খানিক উচ্চ সপ্তকে "অচল চালাচ্ছ...চুরি...সব কচ্ছ—অনেকে এখানে মাড়ায় না যত চোর" বেচারী সুহাসিনীর আর ধৈর্য্য রহিল না, ঝটিতি দরজার প্রতি লক্ষ্যের পরই তাহার মুখখানি বুনো জানোয়ার সুসাজান দন্তরাজি বিষধর, উহাকে মারাত্মক প্রতীয়মান হয়, টেবিলস্থ একটি নুড়ি তুলিয়া

সজোরে নিক্ষেপ করিল, যোহন একাদশী তক্ষণাৎ ভাগ্যশঃ শিয়র সরাইয়া লইল, সুহা শান্ত হয় নাই কহিল "ওরে আমার সাধু—তোমার মুখে আমি নুড়ো জ্বেলে দেব...ছোট জাত...খেশ্চান...যদি না দি...ত আমার নাম সুহাসিনী নয় লজ্জা করে না বুড়ো মিনষে—তোমার ইয়ে পালিয়েছে বলে ওর...অস্তিসার ছোঁড়ার উবরি যত ঝাল ঝাড়ছ...ব্যামো বেড়েই চলেছে...সাধে কি—" ইত্যাকার পীড়াদায়ক বাক্যবাণে যোহন একাদশীর উত্তমাঙ্গ নিপট একটি বৃত্ত অনুসরণে পরিক্রমণশীল, আপাতত ধপাস করিয়া টুলের উপর বসিয়া যেন কুকুর ফলে খ্যাক্ খ্যাক্ শব্দে এ ঘর বিদ্রাবিত, এতাদৃশ পৈশাচিক গর্জ্জনের শেষে অনতিবিলম্বেই শ্রুত হইল "বেশ করবে" অবশ্য সম্যক পদটি স্ফুট হয় নাই, শুধু মেঘনাদ প্রথমে, তাহার পর বুঝা গেল; অন্যপক্ষে সুহা, চোখ ছোট কেননা উহার আস্ফালন বুঝে, আপন কোমরে নিমেষেই বস্ত্রপ্রান্ত জড়াইয়া লইয়া, ছিন্ন বস্ত্র জন্য তাহার গা অনেক স্থানে এলো অনাবৃত, উপস্থিত কেশভার রক্ষিতে এক হাতে চুলের শীর্ষ সটান সোজা তুলিয়া পাক দিতে ব্যস্ত, বামখানি চুলের গোড়ায়; ত্রস্ত লখাই ক্রমাগত আঙুল চুষিতেই অন্ধকার, হঠাৎ ইহারা দুইজনে শুনিল বৃদ্ধ বলিতেছে "বেশ করবে...আমার মাগ বেশ করবে হুড়কি হবে...আমার বউ একশোবারই পালাবে তা ত বাপের কি—" এমত হইতে পারে যে, মনেতে সুহা এবম্প্রকার দুয়ো নির্বুদ্ধিতার আশায় প্রতীক্ষামানা থাকে, তাই বৃদ্ধের কথায় তাহার কর্ম্মপ্রবণ বাহুদ্বয় তড়িৎ আহত, সে উল্লাসে নয়ছয়, সমগ্র আবহাওয়া সঙ্গীন হয় যেহেতু সে বারম্বার তুমুল ছাগধ্বনি করি উঠে অতঃপর দুই আঙুলে নিম্ন অধর টানিয়া চাপিয়া, যোহন একাদশীকে, শিস দ্বারা বিভ্রান্ত, দগ্ধ, মতিভ্রংশ, চূর্ণীকৃত, বিধ্বস্ত, পর্য্যুদস্ত করিল; উপস্থিত লখাই এমন হয় যে নাক টানে এবং মৃদু হাসিতে সাহসী; বৃদ্ধ ঈদৃশী বিদ্রূপাত্মক দুষ্টতায় অত্যধিক মর্ম্মজ্বালায় ক্ষুব্ধ হওত মহা আক্রোশে টেবিলে ঘুষি মারিল এবং তৎক্ষণাৎ এই দুর্নিমিত্তে স্বীয় কব্জিতে দংশনে, কঁকাইয়া ডুকরাইয়া অস্থির, শিশুসুলভ কান্নায় ভাঙ্গিয়া শতধা; অন্যকক্ষ আগত পূজা আহ্নিক সারার শেষের, যারপরনাই তির্য্যক স্বরের বিষমতা-চাপা কোনক্রমে অতীব শুদ্ধকণ্ঠে 'ওঁ ওঁ ওঁ—তারা তারা তারা ব্রহ্মময়ী মাগো' এই নাম ধ্বনিত, এখানেও, হইল, সঙ্গে সহিত কপালে হাত স্পর্শ সুহা করামাত্রই নিকটে অসমান খড়মের শব্দ শোনা যায়, তবু স্বভাব সংস্কারবশতই সে লখাই প্রতি মৃদু চোখে চাহিতেই—ইহা ইশারা, বালকও কোনভাবে মুখের মধ্যে হাত ঠেকাইল; অত্যুগ্র বিরক্তিত অক্ষয় মাস্টারের সবেগে প্রবেশ তাহাকে প্রায় কন্যার পায়ে আনিয়াছে, ও তারস্বরে সে কহিল "এটা অপিস ঘর নাকি শুনি...কি হচ্ছে এখানে—" বলিতেই কালে দুইএক পদ পশ্চাদে সরিয়া যোগ দেয় "ভেবেছ কি...সমানে চেঁচাচ্ছে...তোমরা আমার ইহকাল পরকাল খেলে...পূজো আহ্নিকটুকু তোদের জ্বালায় করতে পারব না...সুহাই রাক্কুসি ফের যদি বুড়োমানুষটাকে সাতসকালে কাঁদাস ত আমি তো চুলের মুঠি ধরে...ছিঃ ছিঃ অপিস ঘরেতে চোখের জল কি অমঙ্গল! কারুর চাগরী থাকবে...ওর সঙ্গে লাগতে...তো বাপের বইসী—" সুহা এখনও রোষ ক্ষিপ্ত, দৃঢ় বিদ্যুৎ কটাক্ষপাতে হয় টেবিল উপরি ওজন-পাল্লায় অঙ্গুলি দ্বারা চাপিতে প্রয়াসী থাকাকালীন পিতার দিকে চাহিল অথবা কাগজ-চাপা নুড়ি লইয়া নাড়াচাড়ার মনোযোগ অবসরে, শিয়র ঘুরাইয়া তুলিয়াছে, দেখিল, আলোর তারতম্য বৈসাদৃশ্য বটে, আরও যে মনস্থ বিষয়ে জানালার অন্যপার্শ্বে, অর্থাৎ উহার সমক্ষে ভাসমান আর্দ্র গাছপাতায় জলকণা কিছুই তাহাকে বাধা দেয় নাই, ঠোঁট উল্টাইয়া ডাগর চোপা করে "ইঃ...যাও যাও...কেঁদে জিত হয়েছে সোহাগ...মেয়ে মানষের অধম...ফু...তিন কাল গে এককালে ঠেকেছে...বেহায়া...সাত বাসটে চোখের জল ফেললুম ব্যাস—" অক্ষয় মাস্টারের খড়মের কয়েকটি ছোট, ইহাতে এলোমেলো আওয়াজ হয়, বুঝায়, কন্যার দুর্দ্ধর্ষ নির্মমতা প্রতিরোধে সত্যই সে রুগ্ন, অনন্য উপায়ে অতএব চড়া সুরে ধরিল "এই শালা যত নাষ্টের গোড়া...মেরেছে কি না মেরেছে...চিল্লিয়ে বাড়ী মাথায় করলে—" প্রসঙ্গক্রমে অক্ষয় মাস্টারের অনুমান ঠিকই এবং বলিল "ঠিক শালা চোরের জাত...শালা বামনার ঔরসে...এদিকে আয়...হারামজাদা—" এতাদৃশ ব্যাখ্যায় আদেশে, লখাই ভীরু চোখে আঙুল চুষিতে ক্রমে, সমবেত দৃষ্টি এড়াইয়াই যেমন, কোনরূপে সুহার নিকটে আসে, উপস্থিত তখনই ঝটিতিই সুহা কেশভারকে এলো খোঁপা বাঁধিতে থাকিয়া সুউচ্চগ্রামে ধমকাইল "খবরদার বলছি...খবরদার! মুখ খাঁশটে করবে না...মরদ কত...ঐ ইষ্টুপিডকে বকতে পাচ্ছ না...এক রত্তি ছেলেমানুষটার উবরি যত কেল্দানি—" অক্ষয় মাস্টার প্রশ্নমান চাহনিতে সকলের প্রতি দেখিয়া, এখন তাহার স্বর কিছু ভদ্র সম্বন্ধ

বোধযুক্ত, শান্তভাবে কহিল "ও অমন একটু আদটু খুনসুড়ী তাতে—" ইহাতে বালিকা অধিকতর কঠিন, শ্যেণ দৃষ্টিতে বাপের প্রতি লক্ষ্য করে, উত্তর দিল "খুনসুড়ী মরি মরি...খেশ্চানই গাড়য়ানী বিলিতী খুনসুড়ী ত সবার সয় না...এ খুনসুড়ী!—খুনসুড়ী ছিল আগে...তোমায় কত বার ত বলেছি ওর ইয়ে পালাবার পর যত গায়ের জ্বালা ঝাল ঝাড়ছে ওর উপর...পালাবার পর থেকেই—" তখন যোহন একাদশী কাঁদিতেছিল, স্থূল কোটের হাতাদ্বারা স্বীয় চক্ষুর্দ্বয় অল্প আস্তে মুছে, ডুকরাইয়া বলিতে লাগিল "এক ফোঁটা মেয়ে আমাকে যা নয় তাই বললে...আমি...আমি...ওকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি" বৃদ্ধের শোচনীয় মর্ম্মান্তিক অবস্থা অক্ষয় মাস্টারকে আর্দ্র করে, ফলে সে উচ্চৈঃস্বরে কোন কথা যোগ দিতে বড় করি হাঁহিয়া ত্বরিতে সুবিচারিত নিম্ন কণ্ঠে ইহা জানিতে চাহে "কিন্তু ও ছোঁড়ার দোষ নিশ্চয়ই...এই পয়সা নিয়েছিস...শুধু মধু" এবং অবশেষে লখাইএর দিকে তাকাইতেই ভ্রূকুঞ্চিত; এখন সুহাসিনী আপনকার চুলে খোঁপা সযত্নে নির্ম্মাণে মনোযোগী, এখন কণ্ঠের বলীরেখা নিচয় লুপ্ত আর যে ঈদৃশী ভঙ্গিতে সুগভীরভাবে বালকের প্রতি নিরীক্ষণে একাগ্র, ইতিমধ্যে অক্ষয় মাস্টারও দেখিল, লখাই অতি সন্তর্পণে আপন মস্তক আন্দোলনে উহার প্রশ্নে 'না' উত্তর দেয়; অক্ষয় মাস্টার তত্রাচ মন্তব্য করিল "কবে থেকে অতশতকে লিখে রেখেছে তবে হঠাৎ আমি বলি...ওকে ও ত আর শত্তুর নয়...মাৎতে যাবেই বা কেন" এই জিজ্ঞাসা কক্ষে শব্দ তরঙ্গ হওয়ত কিছু গোল পাতা, কোথাও খড় ছাওয়ার খসা দুয়েকটি খড়কে তৎসহ উলঙ্গ লখাইকে স্পন্দিত করে তবু সে জানালার বাহিরে সকল কিছুতে আকৃষ্ট হইতে উন্মুখ, হয়ত তাহার হাতখানি উহা অবলম্বন প্রেরণায় বিস্তারিত হইতে স্ফূর্ত্ত, তাই ইহা নিশ্চিত যে, সে নূতন করি বাস্তবতাকে স্পর্শ করিবারে ইচ্ছুক; এখন সে ধূসর তাহার সেইহেতু এখনও আসে স্মরণ নাই, যে বহুদিন হয় সে চৌক, ভাঙা, ছেঁড়া নিঃশ্বাস লইতেছে; ইদানীং ঐখানে বাস্তবতায়, অসংখ্য প্রবাহমানতায় স্নান করিবে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও—বালক আপনাকে এক সমিতিতে রাখিতে নিছক মতিচ্ছন্ন যদ্যপী—অদ্যাও ইহা সম্ভব হয় নাই; পিতা কন্যার নিকট যাহা প্রহেলিকা, দুর্ভেদ্য সেই গূঢ়তম উত্তর তাহাকে বেড় করিয়াছিল, সেই গূঢ়তমতা সাক্ষাৎ অপরোক্ষ উপলব্ধির লোকচরাচরকে বড় কালো বড় আঁধার করিয়া থাকে, কেননা এ পর্য্যন্ত যোহন একাদশীর গলার স্বর বালককে নিঙড়ায়; প্রথম, তখন উভয়ত বর্ত্তমানতার কুহকের মধ্যে সে বসিয়া আছে, তাহার চুলগুলি উড়িয়া ছত্রাকার নীচে দুস্তর ক্ষেত প্রান্তর অবশেষে ধূমায়িত, আর ইহা হানা বিধ্বস্ত একদার গর্ব্বিত অভিজাত অট্টালিকা সে তিনতলে, নীচে বিরাট উঠানে ইঁটভাঙায় পাহাড় মধ্যে সরুপথ পিছনের দুমহল পার হইয়া অর্থাৎ এক দরজা দিয়া সদর দেউড়িতে অদৃশ্য, এ স্থানে প্রহর সকল অস্বাভাবিক, জল নিমেষেই শুকায়, অবশ্য সর্ব্বাগ্রে এখানে উঠিতে সে ভৈর দফাদারের জন্যই বাধ্য হইয়াছিল, এই বাড়ীর পাশের মাঠে লখাই গোবর কুড়াইবার কালে অচিরাৎ সাইকেলের ঘণ্টির শব্দ শোনে, সহজ কৌতূহল বশত সে ভ্রূদ্বয় কুঞ্চিত করে, দেখিল, বেশ দূরে এক সাইকেল, হ্যাণ্ডেলে রঙীন চরকী; আর সে পলকেই ঠাওরাইল, ভৈর দফাদার, এ কারণ যে এ থানায় অমন সুসজ্জিত বাহারে সাইকেলে অন্য কাহারও নাই—হ্যাণ্ডেলে তিনটি রঙীন চরকী, পিছনের রিমে টুকরা টুকরা বনমালায় বেলোয়ারী শোভা, এবং তৎক্ষণাৎ তাহার কণ্ঠে ভীতিপ্রদ বিষমতায় 'অগ' ধ্বনি শোনা গেল নয়নদ্বয় বিস্ফারিত সমস্ত দিক নিজ শিয়র ঘুরাইয়া দেখিতেই ঘূর্ণন আরম্ভ হয়, এমত অবস্থায়ও সে গোবর পূর্ণ ঝুড়ি তুলিতে পারে, ভৈর দফাদারের হাত হইতে রক্ষার কোনই উপায় নাই সে কোথায় দৌড়াইবে? সম্মুখে, এক মাত্রা রাস্তা মাঠের মধ্য দিয়া ধ্বংসাবশেষ ভেদ করত চলিয়া গিয়াছে, ফলে সে আর এক মুহূর্ত্ত দেরী করে নাই, অথচ তখন, মনে হয় বাড়ীখানি ধূলিসাৎ ক্রমাগতই, এক মহল পার ইত্যাকার ভাবনায়; উপস্থিত গোবরের ঝুড়ি বড়ই ভারাক্রান্ত বোধ হইল, এখন আবার ঘণ্টির শব্দ বেশ স্পষ্ট, কোনমতে মাঝমহল অতিক্রমে, ঝুড়ি দুই হাতে শির উর্দ্ধে। সোজা বাহু প্রসারিত, রাখিয়া দ্রুত নিঃশ্বাস লয়; এ সময় কোথাও ইঁট খসিয়া পড়ার কুশ্রী আওয়াজ উহাকে চমকাইয়াছে তত্রাচ সে দোমনা নহে, অবিলম্বে ঝুড়িটি সরু রাস্তায় বসাইয়া চারি ঠাঁই সত্বর পর্য্যবেক্ষণে বিমূঢ় সন্দিহান, ইতঃপূর্বে এহেন রূপে ইহা ইঁট আর ইঁট, ছাদভাঙা, অগণন জানালায় এক একটি আকাশ বিদেশী ও যুগপৎ নৈর্ব্যক্তিক; অনর্গল টিয়ার কর্কশধ্বনিতে বালকের গাত্র জর্জ্জর, ক্রমাগত এখানে সেখানে জানালার মধ্য দিয়া যায় আসে, আশ্চর্য স্তূপীকৃত বিধ্বস্ত নির্জ্জনতার ক্বচিৎ কোথাও পঙ্কের কাজ, হঠাৎ আরাব্যস্কের খানিকে আলো, জোঁকগতি খিলানক্রম, দুর্গা দালানের ফ্লুটেড স্তম্ভ শীর্ষ—ইহা

করণীয়—অশ্রুতপূর্ব্ব রেখায়িত, রীতিধারা, মানুষের আশা উদ্দীপনা; কাঠবিড়ালীর ত্বরিত গতিবিধি, কোথাও দোতলা হইতে অশ্বত্থ, কভু ফার্ন, ইঁটের মধ্যে আমড়া আকন্দ—এতাদৃশ পরিবেশ, সমস্ত কিছুতে সে অব্যর্থ বেশী উলঙ্গ, এতাবৎ লোকপ্রচলিত ভীতির মধ্যেই দুর্লঙ্ঘ গোপনতা নির্দ্ধারণে সে সাহসী. নয়নদ্বয়ে তাই বিদ্যুৎ খেলা, দ্বিধা তিলেক নাই, যদিচ ইঁট রাশির কোথাও এক শঙ্খচূড়ের বাস ইহা সে শুনিয়াছে একটি ছোট নমস্কার অন্তে ঝটিতিই স্তূপ কোনক্রমে বহিয়া অনন্যসাধারণ ক্ষিপ্রতায় সোজা দ্বিতলে, অতঃপর খুবই সন্তর্পণে চোখচালায়, দালান ছাড়াইয়া বিরাট কোঠা সকল শেষে সিঁড়ি ধরিয়া এখানে, ইহা ত্রিতল; শ্বাস কষ্ট জনিত উহার অবসন্নতা নাই, বুকে এখনও ঝড়, এ সময় বুঝে যে সাইকেল মাঝমহল পার, এ কারণ যে ছোট কাশির শব্দ হয় এখনও যে সে চারিদিক পর্য্যবেক্ষণ অস্থির—উপরে ছাদ প্রায় স্থানের নিশ্চিহ্ন শুধু ভাঙা ভাঙা দেওয়াল, আর যে জানালার অজস্র কাঠামো—এখন মনে খুঁড়িতেছিল অন্যত্রে যদি সে যাইতে পারে এইহেতু যে উহার আপনকার দেহের সম্মুখভাগে সে ও নিজ পশ্চাদভাগ কাঠবেড়ালী নির্ম্মিত তথাপি কিন্তু পরক্ষণেই সে কৌতূহলপরতন্ত্রে, ভয়ে আবছায়া সত্ত্বেও লুকাইয়া নীচের দিকে তাকাইতে মরিয়া, বিশেষ ঔৎসুক্যে সে ফাটলে মুখ স্থাপন করে পলকেই তাহার মনে হইল চোখ দুটি খসিয়া নীচে ক্ষণেকেই গভীরে, কি সুদীর্ঘ গভীরতা! এবং উপস্থিত অনুভব হয় যে সে হঠাৎ উল্‌টা হইয়া গিয়াছে ফলত ঐ ক্রূর অতলতা তাহাকে ভয়ঙ্কর আকর্ষণে টানিতেছে, তাহার পদদ্বয় স্পন্দিত; সংখ্যাহীন অন্ধকার বিসর্পিল ভ্রমণে যেখানে নামিতেছে দিক সমূহও বিমোহিত তাই নিম্নাভিমুখী অধোগতি প্রাপ্ত—সেখানেই ভৈর দফাদার, সাইকেল হইতে অধুনা মাটিতেই, লখাই-পরিত্যক্ত ঝুড়ির সামনে, ঝুড়িনিরীক্ষণ মানসে আনত মস্তক, সম্ভব যে সে ভাবে, ইহাতে একনিষ্ঠ, উহার দুইখানি তেজাল হাতের ইতঃমধ্যে বেলোয়ারি রঙীন চক্রগুলি, খানিক রিমের চেকনাই এর উল্লেখের উপর সংসক্তভাবে জুড়িয়া আছে, এবং এক্ষণেও তাহার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ বেতালে, অন্যমনস্ক নিশ্চয়, ঘণ্টি বাজায়; অনেক ঊর্দ্ধে অবস্থিত লখাইএর হৃদ্‌পিণ্ড ঘণ্টির সঙ্কেতময় অনুরণনে তুষার, এ কি গাঢ়তম স্থান চেনা চেতনার পরিধি অন্তর্হিত ধূলিসাৎ অবশ্য—তবু বালকের রিমের চেকনাই বক্রতা আধঘুরন্ত রঙবাহার ভারী চমৎকার দেখিতে ইহাও মনে হয়—তাহার কপালে স্বেদ, তখনও স্বীয় আঙুল মুখে স্থাপন নিমিত্ত কাছে আনিতেই ধূলা প্রত্যক্ষে, উহাতে, আপনকার নিতম্বে ঘর্ষণে মুছিতেই তখনই খুর-ধার-করার আওয়াজ শুনিল, বুঝে নাই ইহা তাহারই নখের আওয়াজ, তাই তড়িৎ গতিতে পিছনে ফিরিতেই অপ্রত্যাশিত ধমকে ভৈর দফাদারের 'কে রে?'—দুঃসহ চৌকিদারি হুঙ্কারে সমস্ত ভগ্ন বিধ্বস্ততা ত্রাহি—চৌহদ্দী যন্ত্রণায় মৃত, উহা কি সত্যই শব্দ! না উহা অতি প্রাচীন ইঁটের শ্যাওলাই—অনায়াসে যাহা আপন হিম দ্বারা সকল কিছুকে রক্তশূন্য, উৎখাত, করি পারে; বালক সমূলে নিঃসন্দেহে উৎপাটিত, পুনর্বার ইদানীং 'কেরে কে ওখানে' পরম্পরা জলদ গাম্ভীর্য্যে সে থরহরি, কোন কিছু নির্ণয় পূর্ব্বেই উহার শিয়র কেমন একভাবে ঘুরিতেই দেওয়ালে আঘাত পাইল, অন্য কিছু পরিজ্ঞানের নিমেষ তাহার নাই এবং সে কেবলই দেওয়ালে পিঠ চাপিয়া মিশিয়া যাইতে চাহে, দেওয়ালের ঠাণ্ডা অনুভবে এখন বালক কর্তব্যপরায়ণ তাই আপন মুখ দুই হাতে ঢাকা—ইহাতে এই অর্থ হয়, যে নিজেকেও সে অবিশ্বাস করে, যদি ভ্রম বশে উত্তর করে! এবম্বিধভাব কাজেই অন্যসূত্রে নহে আরও যে তদবস্থায় উহার কানে বারম্বার ঘণ্টির শব্দ আসে, শ্যাওলামিশ্রিত যাহা তৎসহ এখানকার বাতাসের হা হা; এবার অধিকন্তু 'কে—কেরে' পর পর উচ্চারণের অবশেষে, ভৈর দফাদার অসহিষ্ণু বুঝায়, কহিয়াছিল "যে আছিস এই ছোঁড়া...ছুঁ...মরবি...মরবি...ঝুড়ি আমি চিনে রাখলুম"—ও যুগপৎ বজ্রকণ্ঠে হাঁক দিল "পাকাড়" ইহাতে লখাইএর একটি চক্ষু, কেননা এতাবৎ দুইটিই বন্ধ ছিল, উন্মীলিত স্ফীত; ধীরে অন্য চক্ষু এখনও ধ্বনিস্তর, পাকাড় বাক্যের, শ্রুত হয়, তৎসহ কুটিল পুরাতন হরিৎ প্রত্যাবর্ত্তন দেখা গেল, ডানার আঘাত শব্দ আসিল, এ কথা ঠিক যে সে ঈষৎ আমোদ, ভীত তথাপি, পাইয়াছে; নির্ঘাত খুসী অথচ দেওয়াল ত্যাগ করে নাই, উপস্থিত বিপরীত দিকে নজর পড়িতেই, জানালা মধ্যভেদে অনেক অনেক নিম্নে আঁকাবাঁকা পথ ও মন্থরগতি সাইকেল অনন্ত রেখা সৃজন করিতে থাকিয়া চলিয়াছে, ঈদৃশী স্বাভাবিকতা নির্নিমেষে তাহার প্রত্যক্ষ হয়, ভারী ভাল লাগিতেছিল, কিয়ৎকাল বিলম্বে সাইকেল মাঠ পার এবার সুউচ্চ রাস্তায় এবং ক্রমে অদৃশ্য; তখনই সে এক সুখদায়ক গভীর নিঃশ্বাস লইয়াছে, এখনই সে চারিদিক অবলোকন করিবার সৌখিনতায় অথৈ, ঝটিতিই জানালার কাঠামোতে

ঝাঁপ দিয়ে পড়ে, এবং কোন রূপে বসানে দুই হাতের ভরে নিজেকে উন্নীত করত, পরিদৃশ্যমানতা দেখিতে কালে হঠাৎ তাহার মনে হয় যে সে জানালার বাইরে, নিশ্চয় সে নিম্নের দিকে চাহিয়াছিল, বহু নীচে পতিত হইতেছে, গাত্র তাহার এই কারণে রোমাঞ্চিত, ইতিমধ্যে অনেক দূরে দূরে এক আদ জনকে ইচ্ছে হয় ডাকে, কিন্তু ক্ষণেকেই স্থির; কি যেমন তাহার কায়মনকে আকর্ষণ করে, তবু আর এইভাবে থাকিতে পারে নাই, আশ্চর্য্য সে নামিয়া, ঘুরিয়াই নাচের ভঙ্গী দেহে খেলাইতে অধীর, হয়ত জানালার বাহিরের সর্ব্বত্রের দৃশ্যমানতাকে সাড়া দিতে অথবা চমকপ্রদ নানা রকমারি রেখায় উহার অনুলিপি লইতে সে উদ্যোগী, এখন বালকের দেহে, দিনমান হইলেও, নক্ষত্র গ্রহরাজী প্রতিফলিত, অথচ ইহা সত্য যে সে ত্বরিতে আপন নৃত্যকে কুশ্রীতে পরিণত করে, অশ্লীলতার উহা অনেক কাছে, এবং যে পথে ভৈর দফাদার গিয়াছে সেই দিকে প্রথমেই একটি কলা পরে ডবল কলা মুদ্রা দেখাইতে প্রমত্ত, পায়ের কাজে, দেহে, হাতে গাজন-নাচের ধরণ, ইত্যাবসরে সুরে বলিতেছিল "তুমি আমার ঘণ্টা করবে ভৈর দফাদার...আমি শালা চুরি করে সব বাড়ী ফাঁকা করে দেব...আমাকে ধরবে তুমি" খানিক নৃত্যের পর অতর্কিতে নিস্পন্দ, শিয়র চালনায় চারিপাশে নজর লইল, জানালার দরজার অনবরত ফাঁক—তন্মধ্য দিয়া আগত আলোর চৌকস্না, কোথাও বা নহে, স্বীয় কুঞ্চিত ভ্রূতে যে প্রশ্ন ছিল, তৎক্ষণাৎ তাহার উত্তর হয়, যে এ বাড়ীতে ভূত নাই, কেহ কখনও দেখে নাই, এ বাড়ী লোকেরা ধনী ছিল, দানী ছিল তাই সকলেই স্বর্গে; এবং নির্ভয়ে দুয়েকটি ইঁট জানালার নিকট রাখিয়া উচ্চ করে যাহাতে দাঁড়ান স্বস্তিতে হয়; উপস্থিত সে জানালায়, উর্দ্ধ হইতে এতাদৃশ্য শোভা, ইতিপূর্ব্বে বৃক্ষাদি হইতে কখনও যে সুযোগ ঘটে নাই, দর্শনে বালক সম্মোহিত; কোথাও শুধু ঘাস বিস্তৃতি অবলোকনে সে মহিমান্বিত তাহার ওষ্ঠে "আঃ কি সুন্দর" কভু জলের স্রোত, বৃক্ষ শীর্ষ, গোছাগাদি, গ্রাম চিহ্ন, দেখিয়া "আঃ কি সুন্দর" অতঃপর নিপট দূরত্বে তন্ময় হওয়ত "শুধু দূর আর দূর কে এত দূর তৈরী...এত দূর পেলে কোথায়...কি সুন্দর...কি সুন্দর!" উচ্চারিত হইয়াছিল; ক্রমে মনে মনে ইহাও আনন্দে বলে, "আঃ যা কিছু সমস্ত সবাইকে আমি পাখার বাতাস করব, পা ধুয়ে দেব, শীতে গা ঘেঁষে থাকব, তোমরা সবাই নিশ্চিন্তে ঘুমাবে," এবং চির পরিচিত সকলকে অচেনা সবাইকে সে হাতছানি দিয়ে মহা আহ্লাদে খানিক আহ্বান করিয়া ভাবুক—অনেক দূরে তাহাদের ঘর, মা এখনও হাটে, ঐ চটকলের চিমনীর নিকটে যে হাট সেখানে—শাক বেচে "ও বাবু বাবু মশায়...দ্যাও দ্যাও একগণ্ডা আধলা দাও...গরীবকে—" নিশ্চয় বলিতেছে আর যাহার গাল চমকান হেতু, মনে লয়, যে সে শাক বেচুনী কোথাও নহে, যে সে নিঃসন্দেহে ভিখারী। অন্যত্রে, কিছু দূরে পোস্ট অফিস, সুহাদিদি, উঠানে যাহার একটি ছিন্ন কাপড় শুকায়—এখন নিশ্চয় স্নান সারা, গামছা ছাড়িয়া, এইটিও শতছিন্ন কাপড় যাহাতে সঠিকভাবে লজ্জা নিবারণ অসম্ভব—বার বারই ঘুরাইয়া ফিরাইয়া পরে, এতটুকু বিরক্তি নাই, কপালকে দোষ দেয় না কেবল "দুঃৎ" বলিয়া হাসে; অনভিপ্রেত ভাবে এ সকল মননে লখাই ক্ষুৎপিপাসা কাতর; তাহার শিয়র এমন যে, ঢলিয়া পড়িতে চাহিল, আশ্চর্য্য যে সে আপন অধর, বয়সীর ন্যায় দংশন করে, সে বড়ই রোগা; নীচের সমস্ত, হয়ত ইহাও ধারণা হয়, যে তাহারই পশ্চাদধাবনের জন্যই তৈরী, কেননা সে অভ্যন্তরে, স্বীয়, অতিমাত্রায় কৃষ্ণময়, কেমন এক অভিমান তাহাকে ছাইয়া আছে, কোন উপায়ে সে গভীর নিঃশ্বাস উপস্থিত লইতে সক্ষম হয়; এ সত্যও সম্ভবত মনে আসে, যে কি পর্যন্ত সে নিম্নের অঢেল প্রসারতাকে ঘৃণার চোখে দেখে, কেননা তাহার একটি হাতের ছোট মুষ্টি দ্বারা জানালার বসানে ঘুষি মারিয়াছিল; বোধ হয়, সে এমত কামনা করিতে উদ্যত যে আসছে জনমে এই বাড়িতে যেন সে জন্মায়, আর তাই অট্টালিকার চারিদিকে দেখিতেই অজস্র ভাঙ্গার এখানে সেখানে চাহিতেই, ঝটিতি পিছনে ফিরিয়াই থ, তাহার নয়নদ্বয় রেখাবৎ এই জন্য অন্যদিকের দেওয়ালের পঙ্কে, অদৃষ্টপূর্ব বিস্ময়কর লীলা নিরীক্ষণ হইল, অঙ্কিত ফুলহার বর্ণাঢ্য! এযাবৎ বিদ্যমান, ঝড় জল সব সহিয়া তবুও আছে; যেহেতু ইহা শিল্পেরই সহনশীলতা—কিছু অংশে ম্লান তত্রাচ বর্ণিকাভঙ্গ পাঠান, লখাই ইদানীং পূর্ণ দৃষ্টিতে ঐ যৌক্তিকতা পর্য্যবেক্ষণে স্থির কেমন যেমন অচিরাৎ যে সে উলঙ্গ এই সত্য প্রমাণিত হয়, তাহার কণ্ঠ শুষ্ক কপোল পাংশু, যে তাহার তৎকালে এ হেন তিলেক দেহে অসংখ্য জনমানুষের নগ্নতা—ইহাও যে—আগান বাগান, রাস্তাঘাট, রেলবাস, জলাশয়ের, সাঁকোর, আটচালার সমস্ত কিছুর উলঙ্গ ন্যাংটো চেহারাই তাহারই দেহে বাস্তব, আর সে অনেক নগ্নতাই বহন করিতেছে, এমত অনুধাবন হয়ই, ফলত সে অত্যাধিক ক্লান্ত, সন্ধ্যা অপগত হইলেই ঘুম তাহার

উরুদেশকে পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন করে, মুখখানি হাস্যকর নির্বুদ্ধিতায় ঈষৎ খোলা—তাই বালকের নগ্নতায় সম্পর্কসম্ তৎসহ দূরত্ব বিপর্য্যস্ত; দেহ ব্যতীত, তাহার নিশ্চয়ই বিশ্বাস হয় যে, আরও নানা স্থানেই সে উলঙ্গ সেইহেতু তাহাকে ঐ সত্য অনুসন্ধান কারণে সর্ব্বত্রেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সঞ্চালন ব্যস্ত দেখা যায়, যেন সে দেহ ছাড়া অন্যত্রেও আছে; ইহা অর্থপূর্ণ যে দেওয়ালের লিখিত সৌন্দর্য্য তাহার নগ্ন দেহে সস্নেহে হাত বুলাইতেছে; উহার আহত আঘাত প্রাপ্ত; এ কারণেই ব্যথা, গায়ে মমতায় হাত বুলাইতেছে; আর সে মহা অভিমান অতিমাত্রায়, রোষউপহত মনে 'বেশ করব' উচ্চারণ করে; কিছু সময় আগে, সে, লখাই, নিম্নের অঢেল প্রসারতা দর্শনে তথা ঘাসের প্রগাঢ় আভাস লক্ষ্য হওয়ায় প্রশংসায় শ্লেষ্মাযুক্ত ও অনুনাসিক স্বরে পৃথিবীকে ব্যজনাদি সেবাদ্বারা শীতে গা ঘেঁষিয়া থাকিবে ইত্যাদি বলে—এ সকল কিছুই সর্ব্বৈব অলীক; কেননা এখন স্পষ্টত সে বলিয়াছে, "আমি চুরি করে ফাঁক করে দেব...এখানে এসে ঢুকবে...দেখি কোন শালা—" তবুও, ইহার পরেও, ফুলহারকে অবলোহক মানসে আগ্রহান্বিত হইয়াছে; এইখান হইতেই, সে দেখিয়াছিল, নীচে, অসংখ্য ভাঙার মধ্যপথ, অনেক হরিণ-খুরো গরু, কখনও হম্বারব করে, লখাই উপরে হর্ষিত—কেননা, সে এতক্ষণ এই দৃশ্যের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, এবং অনুমানে ধারণা হয় যে নিশ্চয়ই আলা—আল্লারাখা আসিতেছে; মাঝ মহল বহিয়া যেক্ষণে সে প্রতীয়মাণ, তখনই লখাই "আলা এই আলা আলা শোন শোন" ডাকে, আলা মুখখানি তুলিয়াছিল; লখাই আলার দুর্ভাগ্যময় ম্লান মুখমণ্ডল, এতাদৃশ ভাঙার ইতিমধ্যে আরও যেন মনমরা দুঃস্থ—কোথা হইতে দেখিলে, কি প্রকার ভঙ্গিমায় পর্য্যবেক্ষণ করিলে, যে সে স্বস্তি পাইবে তাহা স্থিরীকৃত কারণ চঞ্চল, প্রথমে এদিকে যায়, অন্যত্র যাইতে থমকাইয়া চীৎকার দিয়া উঠে, "একটু দাঁড়া" এহেন রহস্যময় আধো অন্ধকারসন্নিভ ছায়ার বিশেষত্বে অন্তর্ব্বর্ত্তী আলার দুঃখময় মুখখানি দেখাই যেন উহার একমাত্র উদ্দেশ্য—নীচে হইতে হয়ত কোন উত্তর আসিয়াছিল এই আলা যে তাহাকে বলে, "ছায়ার উপরে বসেই আমার দিন যাবে" লখাই এ কথার তাৎপর্য্য যথারীতি নির্ণয় করিতে পারে নাই, একটি ভাঙা শম্বুক খোল, কুড়াইয়া সম্মুখের খালের শালুক ফুলে ছুঁড়িয়া মারিয়াছিল, অবশ্য যুগপৎ আলাকে তির্য্যক দৃষ্টিতে নিরীক্ষণে সুদীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করে, অথচ সেইকালে কেন যেন আলার বাহুর তাবিজটির অস্তিত্ব লখাইকে ভাবুকতা দেয়, যদিও সে জানে আর আলাও তাহাকে বলিয়াছে যে উহার মা-ই ঐ তাবিজটি পরাইয়া দিয়াছে যাহাতে ব্যাধি বিপদ না আসিতে পারে, এ কথা শুনিয়া সে সত্যই বড়ই সুখী হয়—ইহাতে মনে বিশ্বাস জন্মায় যে পরিদৃশ্যমান যাহা কিছু, মাঠ রাস্তা রেল লাইন বাস শালুকফুল, সমগ্রতা সকলই সত্যযুগের; লখাই সুহাকে আলার কথার মানে জিজ্ঞাসায়, বালিকা তাহার দিকে নিবিড়ভাবে চাহিয়াছিল, যাহাতে লখাইএর মন বুঝে যে সুহার চোখদুটি সন্ধ্যার দীঘির জল—বড় কালো, এখন সুহা চোখ দুইটি কোন ধ্যানে বন্ধ করিল অর্থাৎ এ পর্য্যন্ত জানা সমুদয় গল্পের মনোরমত্ব ধর্ম্মকে, আপন উপলব্ধিতে যাহা ছিল, তাহা অনুভব হয়, বিলম্বে সজল দৃষ্টি মেলিয়া কহিল "আহা—বেচারী জানে জীবন বড় কষ্টের—" লখাইএর কাছে আলার কথা অন্যলোক ইহতে ঝটিতি নিজের পায়ের তলে আসিল, সর্ব্বত্রে মাঠ প্রখর তাপে পুড়িতেছে এবং আলা এই মাঠে গরুর তদারক করে; তাই সে, লখাই উহাকে প্রশ্ন করে যে 'কষ্ট হয় না' এবং সে ঐ অদ্ভুত উত্তর দেয়; এখন সুহাকে নূতন প্রশ্নের জবাব, লখাই কৃত, দিতে হইল, "তুই যে বলছিস সোজা বললে না কেন, তার মানে আছে, যারা অনেক জানে তারা অনেক বুঝে—ষোল আনা বুঝাতে চায়—নিশ্চয়ই সে অনেক বুঝে—অনেক তার দুঃখ—" ইহাতে লখাই তখনই অন্যমনা, এইজন্য যে আলার বাবার মৃত্যুর পর তাহার মাকে কাদের মিঞা নিকা করিয়াছে, এবং লোকটির প্রথম পক্ষের স্ত্রী ইহাদের—আলা ও তাহার মাকে বড় হেনস্তা করে, আলা এই বয়সে একদিনও খেলা করে নাই; আকাশের দিকে চাহিয়া হাঁটে, এই প্রকারে মুখখানি আবছায়া সবিশেষ ম্লান, সুতীক্ষ্ণ নাক, ডাগর চোখ সত্ত্বেও ভাবায় যে সে জড়; মনে হয় তাবিজটির পরিমাণ ভালবাসা লইয়া কোন পিপাসা তাহার মেটে নাই, তৃষ্ণার্ত্তও সে নহে; উপস্থিত লখাই নীচের দিকে তাকাইল, শ্যাওলার উল্লেখের মধ্যে আলার চোখ দুটি তাহার রসাস্পদ বলি ধারণা হয়, আর যে সত্বর কহিল, "দাঁড়া" কিন্তু পরক্ষণেই কোন সঠিক কিছু মনস্থ করার পূর্ব্বাহ্ণেই সে আপন বহুদিনের জিজ্ঞাসা, যেহেতু বিশেষ করিয়া আজ এখন অনেকক্ষণ ধরিয়া এখানে, সেই প্রশ্নটি লইয়া আলার অপেক্ষায় ছিল যে তাহাকে দেখামাত্রই নামিয়া জানিবে, কেননা গতকাল যোহন একাদশীর সহিত অফিস করে অক্ষয়

মাস্টারের সহিত তর্ক হয়, সে নিজেও ভাবিয়া পায় না হঠাৎ এ কথা লইয়া এ কথা উত্থাপনের অন্তত কোন প্রয়োজন ছিল, অক্ষয় মাস্টার জ্বরের কম্পনের মধ্যে উত্তর দিল "বলা ভাল নয় কি মন্দ নয়, সে কথা আজ তোমার মাথায় চাড়া দিয়ে উঠল কেন—কোন স্বপ্নাদেশ-টেশ পেলে নাকি—" যোহন একাদশী দাড়িতে হাত বুলাইয়া নিজেকে ব্যক্ত করিল "কিন্তু বামুনের ঔরসে কথাটা—কথাটা অত্যন্ত জঘন্য—এটা মানতে হবে—তাই বলছি কথাটা ত..." বলিতে সময়ে সে গভীর দৃষ্টিতে দরজার দিকে তাকায়, সেখানে লখাই তাহার হাতে কল্কে, নিশ্চয়, কি করা উচিত নির্দ্ধারণে সে বিকল, এই কারণে ক্রমাগতই ফুঁ দিতে থাকে, ইহা সে বুঝে তাহাকে লইয়া বিতর্ক এবং ইহাও সে বুঝে এখানে তাহার উপস্থিতি সমীচীন নহে, আপাতত যোহন একাদশী খুব মায়া পরবশ, সহানুভূতির কণ্ঠে বলিল "বামুনের ঔরসে বলে ওকে কষ্ট দেওয়া হয়...ওর আত্মা যাতনা পায়..." লখাই আর দাঁড়াইল না, ঐ পদ বন্ধনের উপর দিয়া অধিক সতর্কতার সহিত, মনে হয় সে তারের খেলায় পারদর্শী, অক্ষয় মাস্টারের নিকট গেল, ইতিমধ্যে সে দৃঢ় নজরে যোহন একাদশীর প্রতি তাকাইয়া পরিষ্কার ইঙ্গিত দিতে চাহে যে সে ইত্যাকার বাক্যালাপ সমর্থন করে না; এবং ধীরে কল্কেটি হুকার উপর স্থাপনের পরেই ত্বরিতে স্থান ত্যাগ কালে শুনিল, অক্ষয় মাস্টার বলিতেছে "ছিলিমটা টেনেছিস ত...তুমি বাপু ওসব নিয়ে মাথা ঘামিও না...ও আমি বলবই..." লখাই এতক্ষণে, রকে আসিয়া স্থির হওয়ত, নিজের কাছে স্বীকার করে যে বৃদ্ধের কথা আদতে ভাল লাগে, তাহার উহার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা অবশ্যই জন্মায়; এখনও অফিস ঘরে সেই বচসা ক্রমে কর্কশ যাহা, লখাইএর চোখ যেন ভিজে প্রথমত সহৃদয় কৃতজ্ঞতায় কেননা এ পর্য্যন্ত জ্ঞানত তাহার নিমিত্তে এ ব্যাপারে প্রতিবাদ কেহ করে নাই, সুহাদিদিও নহে, অথচ সে—পদের অর্থ যে কি তাহা সে, লখাই জানে না, সকলেই বলে সকলেই হাসিতে হাসিতে বলে; বালক নিজেও অনেকবারই হাসিয়াছে, পীড়া নির্য্যাতন তাহাকেও হাসাইয়াছে! মনে সম্ভবত উদয় ইহাই হয়, যে কোথাও বিশ্রী অথবা কুৎসিত, ফলে কাহাকেও সে কোন দিন ভালবাসে নাই মানুষকে সে ভাবনার চোখে ত্রাসে দেখিয়াছে, দ্বিতীয়ত বুঝে এ যাবৎ সে বড় ক্ষোভ অভিমান বহিতেছিল, উপস্থিত তাহার পদদ্বয় অস্থির যাতনায় কাতরতায় কম্পিত, এবার সে তো ভূমিতে আছড়ায়, এমত সময় সুহার, লখাইকে দেখিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত হয়, প্রশ্ন শোনা যায় "উঃ কি হল...কি হল..." ইহাতে লখাই জড়ীভূত, তথাপি ঈষৎ মূর্খ হাস্যে কহিল "দেখ না জং একাদশী কি যে তক্‌কো কচ্ছে...থামতে বল না..." এহেন কাপুরুষতার জন্য সে নিজেকে অভিসম্পাত করে নাই, বরং স্বস্তি লাভ করিয়াছে; সুহা অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে উহাকে পাঠ করত অফিস ঘরের দরজায়, পা ঠেকাইতেই চমকিত হইয়া ফিরিয়া আসিল, কেননা ঘরের মধ্যে দুইজনের কণ্ঠ উচ্চ, একই সঙ্গে দুজনেই বাদানুবাদে দশাসই, তৎসত্ত্বেও যোহন একাদশীর উক্তিতেই "বামুনের ঔরসে মানে ত খানকীর ছেলে বে-জন্মা" শ্রবণে সুহা বিদ্যুৎ আহত; আপনকার ওষ্ঠ দংশনে পিছন দিকে করুণা মিশ্রিত অথচ ভয়ের চাহনিতে দেখে, লখাই রক ছাড়িয়া উঠানে অনেকটা দূরে মস্তকে হস্ত দুইটি রাখিয়া চুপ, তদ্দৃষ্টে সুহার সত্যই বড় যন্ত্রণা হয়, তাহার অনুমান শক্তি নিমেষে উধাও অথবা সে কোন কিছু ভাবিতে চাহে নাই; অবশ্য ইহাও ঠিক যে, ঐ 'খানকীর ছেলে' বাক্যে লখাইএর নিশ্চয়ই কোন বিষমতা আসিত না, এ কারণে যে, যে কোন লোককে উক্ত কথায় গাল দিতে সে অভ্যস্ত; ঝটিতি সুহা অফিস ঘরের মধ্যে, তারস্বরে কহিল "তোমরা থামবে কি না, দেখ যোহন একাদশী তোমার পাদরীগিরি কত্তে হয়ত গীর্জ্জেতে যাও না মুখপোড়া...বাবারও বলিহারি যাই—" যোহন একাদশী ইহাতে অনেক উচ্চগ্রামে উত্তর দিল "তা বলে হক কথা বলব না বাঃ! বামুনের ঔরসে বলা পাপ—" সুহা তখনই প্রতিধ্বনি করিল "তোমার বিদ্যে জাহির করতে হবে না—আনমুখো—তুমি ছোটজাত আস্পদ্ধা কত—" যোহন একাদশীর বুঝা গেল তর্ক করিবার আর ইচ্ছা ছিল না, মনে মনে সে যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছিল শুধু বলিল "লাও বাবা—সৎ কথাও বলতে পারবে না মানুষে, হা কপাল!" লখাই অফিস ঘরের স্তব্ধতায় এখন চমকিয়া উঠিল, স্বীয় কর্ত্তব্য স্থির তখনও করিতে পারে নাই, কেবল আরবার আগ্রহ হইয়াছে কাহাকেও বামুনের ঔরসের অর্থ জিজ্ঞাসা করে; অথচ তৎসহ ভয়ও আছে, যদি উহার অর্থ খুব খারাপ হয়! তত্রাচ এখন উচ্চৈঃস্বরে জানিতে চাহিল "হ্যারে—বামুনের ঔরসে মানে কিরে—" আল্লারাখা সম্ভবত ভাবরূপে অনুধাবন করিতে পারে নাই, সে কহিল "কি" এবার লখাই বোধহয় আপন লজ্জা ঢাকিতে সকৌতুকে বলিল "বামুনের ঔরসে—মানে কি" এই

পর বন্ধনের প্রতিধ্বনির মধ্যে খড়মের আওয়াজ শ্রুত হইল, আলা সশ্রদ্ধায়, যতদূর সম্ভব, খড়ম পরিহিত ব্যক্তি দর্শনে আগে ভাগে রাস্তার এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইয়া নমস্কার করিল, লখাই তখনও এ কথার হৃদয়ঙ্গমে সমর্থ হয় নাই; ফলে পুনরায় সে যেইমাত্র কহিয়াছে "বামুনের—" তৎক্ষণাৎই প্রতীয়মান, নীচে লাল চেলীপরণে সর্ব্বাণী পাঠক 'কেরে' হাঁক দিয়া সুন্দর বিন্যস্ত চুলরাশি যুক্ত উত্তমাঙ্গ তুলিয়া উপরের দিকে চাহিয়া বলিলেন "ছোট মুখে এসব কি কথা—খবরদার যেন না শুনি—" তৎপরে আলাকে কহিলেন "এসব কথায় থাকিসনি ভগবান কষ্ট পান—ওকে বলবি—ভাল আছিস ত—" লখাই যদ্যপি আপনার মুখ সরাইয়া আনিয়াছিল তবুও থ, তবু ইতিমধ্যে, সংস্কার বশে, সম্ভবত, সর্ব্বাণী পাঠকের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়াছে, জিহ্বা এখনও লজ্জায় অপ্রস্তুতে প্রলম্বিত; সে যেন নিজের কাছে নিজের মুখ দেখাইতে অপারক, আশ্চর্য্য ছিছিতে নিজ অন্তরীক্ষ শব্দায়মান; সর্ব্বাণী পাঠক এতই মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন যে এই ভাঙা বাড়ীতে উঠার জন্য তিরস্কার পর্য্যন্ত না করিয়া চলিয়া গেলেন, খড়মের আওয়াজ আর নাই, অনেকক্ষণের পরে লখাই সাহস সঞ্চয় করিয়া পুনর্ব্বার নিম্নের দিকে তাকাইল, কেহ কোথাও নাই স্থানে শুধু বিধ্বস্ত শূন্যতা, তাহার এই নীরব শূন্যতা দেখিতে ভাল লাগিতেছিল হয়ত; এমত সময়ে ছাড়া ছাড়া গীতের পদ গুঞ্জনধ্বনি, সেও ভ্রূ কুঞ্চিত করিল, দেখিল মধ্য মহল পার হইয়া যোহন একাদশী; যোহন একাদশী অধুনা তাহার দারুণ শ্রদ্ধার পাত্র, একমাত্র এই নরজগতের সর্ব্বপ্রথম হিরো তথা নায়ক, এ যাবৎ যাহার পরিত্রাহি গীত, রাত্রকালে লখাইকে কণ্টকিত করিয়াছে, যাহার জামার গন্ধ তাহাকে উৎক্ষিপ্ত করিয়াছে, যাহার দাড়িতে কতবার হাত দিয়াছে, যাহার স্ত্রী পলায়নে আর সকলের মতই আহত হইয়াছে—সেই যোহন একাদশী; ঈদৃশী বিধ্বস্ততার তিন তলায় থাকিয়াও লখাইএর মস্তক সম্ভ্রমে ভূমিষ্ঠ হইতে চাহে, এক্ষণে অথচ অচিরাৎ লাল চেলীর ঊর্দ্ধে দিব্য মুখ মণ্ডল উদ্ভাসিত, যাহার দৃষ্টির বাহিরে যাইতে সে লুকায়, এবং বিশেষ লাজের মধ্যেও এই সিদ্ধান্ত মনে আসে যে তাহার জিজ্ঞাসার অনুরণন ধরিয়া সর্ব্বাণী পাঠকের শব্দ নিচয় দ্বারা এই অর্থই অভ্রান্ত যে উহা চূনকালি, যে সে অতীব হীন নেড়িকুত্তা, তথাহি ঘৃণ্য, এ হেন মনোভাব কতটুকু! সে ক্রোধে পদাঘাতের কোন বৃত্তি পায় নাই, নিশ্চয়ই তাহার মনে হয় এই অট্টালিকা ত আছে, এখানে সে চন্দন কাঠটি লইয়া আঘ্রাণ করিবে—ঘর, দালান, আধা ভাঙ্গা সিঁড়িগুলি, প্রতি মহল অগনিত জানালায় দাঁড়াইবে ইহা ধ্রুব, তাই সে নীচের দিকে দেখে, এবং তাহার মহাজন যোহন একাদশীর সাক্ষাৎ পায়, আনন্দে বালক এখান হইতে ডাকিয়াছিল, পূর্ব্বাহ্নের পরাজয়ে তাহার গলার স্বর বড় অসহায়, তবু শোনা গেল, "যোহন একাদশী...জং একাদশী"...এই আওয়াজকে বড় আপনার মোহময় করিবার নিমিত্ত এক দাঁড় কাক ডাকিয়া উঠিল, পুনরায় সে ডাকিল "জং...জং—একাদশী—" যোহন...একাদশীর চলা ঝটিতি বন্ধ, ধীর পদগুঞ্জনে সে বিসর্পিল রেখায় শিয়র ঘুরাইয়া তদীয় দৃষ্টি ভাঙা পার হওয়ত, জীর্ণ গলিত জানালার কাঠামোয় লখাইএর মুখখানি দেখে, বালক তখন যেন একটু বেশী ঝুঁকিয়াছে তথা বিপদ আধিক্য নিকটে আহ্বান করিয়াছে সম্ভবত এই আশে যে, বড় সাধ, তাহার আপৎকালে দৃষ্টি বৃদ্ধ শঙ্কিত হয়—যে তাহার দুঃখে দুখী, যোহন একাদশী—ইহারই লিখিত প্রকাশ চাহে; অধুনা দুইজনের চোখাচোখির সঙ্গেই সে, লখাই রমণীসুলভ লজ্জায় নিশ্চিহ্ন—আবার কোন মতে উহার দিকে পূর্ব্বোক্ত ভাবনায় তাকাইল, যোহন একাদশীর মুখখানি সহসা নীচ হইতে সোজা উঠিয়া আসিল, একেবারেই তাহার সমক্ষে, বৃদ্ধ দুই হাতে আপনার প্রগাঢ় দাড়িকে উল্টা করত ধরিয়াছে, ইহাতে চক্ষু অবধি ঢাকা, এবার মুখ মারুতের ধমকে দাড়ি বিভক্ত হয় আবার কোন ফাঁকই নাই, বিভক্ত থাকা কালীন ওতপ্রোত মুখে শেষ হাসি ছিল, এখন সে কহিল, "এই তুই আমাকে বাবা বলবি কেমন...বাবা বলবি"...লখাই দাড়ির খেলা পর্য্যন্ত কিছু অবাক, কিছু মজা পাইয়াছে, খানিক ভীত, চকিতে ঈদৃশীর রহস্যময় মুখমারুত চালিত কম্পমান দাড়ির বিভাগের পশ্চাৎ হইতে, ঐ উক্তি প্রথমে সে যথান্যায় অনুধাবনে অশক্ত, ভ্রূ কুঞ্চিত আবার নিমেষেই সাধারণ, ওষ্ঠদ্বয় দূরে—সে অল্প, বাক্য নিচয়ের আঘাতেই, সরিয়া আসে; উপস্থিত কোন বিশ্বাস আনিয়া পুনরায়, মুখ অবনত নহে, নয়ন কোণ হইতে বাঁকা চাহনিতে যোহন একাদশীকে অবলোকন পর্য্যবেক্ষণ জন্য দৃষ্টিপাত করে; এখনই, তেমনভাবেই বিভক্ত দাড়ি অন্তর হইতে ধ্বনি শোনা গেল "আমাকে বাবা বলে ডাকবি কেমন"...এক অশ্রুত পূর্ব্ব যক্ষের দৌলতের সন্ধান উৎঘোষিত হইল, ভয়ঙ্কর ভাণ্ডার কেন্দ্র ভেদে শিবের কলম মহাতেজে উদ্ধত ইহা দৃপ্ত ইহা

অব্যর্থ; ইহার পিছনে বৃদ্ধের ভৌতিক বুনো পোষ-না-মানা হাস্য সমস্ত স্থানকে ঘর্ম্মাক্ত বিদ্রাবিত করে, ইদানীং উহার কোটের হাতা সহ হস্ত দুইটি ছিটকাইয়া মাথা ছাড়াইয়া সোজা উপরে সঞ্চলিত, ইহাতে আহ্বান, উল্লাস, মদগর্ব্ব, প্রগল্‌ভতা, উহা নিশ্চেতন অবশ্যই অপ্রতিভ লক্ষণ যুক্ত, তখনই বলে "বুঝলি" এবং আশ্চর্য্য যে লখাই স্বীয় দেহে জলপ্রপাতের শব্দে অনেক কিছু বিকজ্বা হওয়ার সঙ্কেত লাভ সত্ত্বেও, হাসিয়াছে, হাসে, আর যে হাসির মধ্যেই একদা বিস্বাদে নিঙড়ান, এজন্য সে স্পষ্টতই সে যোহন একাদশীর দাড়ি লইয়া কসরৎ দর্শন কৌতুকে সে হাততালি দিতে উৎসাহী তাহা সে ভুলিয়াছে, উপস্থিত সে নিজ করের প্রতি চাহিল, সে বিস্ময়ে নির্নিমেষে উহা লক্ষ্য করিতে সাড়হীন-নিরাকার, বক্ষ কম্পিত নিঃশ্বাসের পরেই, সে হাত দ্বারা কি যেন ধরিতে বিশ্বাসী, সম্মুখে শূন্যতা আর যে ঊর্দ্ধে অধে সর্ব্বত্রে কুষ্ঠগ্রস্ত চূর্ণীকৃত সংগ্রহ, সে ভ্রূ দ্বয়কে যুগ্ম করে, নিশ্চয়ই বুঝে এই করদ্বয় কিছু পায় নাই, কোন কিছুকে আকর্ষণ নিমিত্ত নির্ম্মিত না; তবু সে, এই কপাল, যে আঙুল গ্রীষ্ম বর্ষায় শীতে চুষিবেক; এখন নিজে তালুতে জিহ্বাদ্বারা দারুগত আওয়াজে সে খানিক তদীয় সম্বিৎ ফিরাইয়া আনে; এই কথা ধ্রুব, উক্ত ভাব ব্যতিরেকেও, বৃদ্ধের অভিধা প্রাঞ্জল বোধগম্য হয় নাই, উহার ব্যঞ্জনায় রগড়ের ছড়া ছিল, যাহা সমস্ত ব্যাপারের শঠতা প্রবঞ্চনামূলক আবরণ ফলেই; তবু স্বীয় অভ্যন্তরে ধূমায়িত স্থূলতা ক্রমান্বয়ে স্ফীত হয়, সে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ অমান্য করতঃ অচীরেই সুদীর্ঘ, কি বড়! এবং সদম্ভে, আমি দুর্দ্দান্ত বেগে জল আলোড়ন করিতে পারি—ঈদৃশী অহঙ্কারে ওষ্ঠদ্বয়ে ঝড়, তৎসত্ত্বেও লখাইএর ডাগর চক্ষু দুইটি অবশ্যই বলিয়াছিল, তাবিজের কী সত্য আছে! তখন দেওয়ালের ফুলহার প্রথিতযশা মহিমা অবলোকনে বলিয়াছিল, তোমরা কি যথেষ্ট, তোমরা কি খুব, তোমরা কি অনেক, তোমরা কি সত্য সত্য সত্য!—আর ইত্যাবসরে, উহার ছোট শরীর বীজগণিতাত্মিক গতিবিভঙ্গে স্পন্দনশীল—এবং স্বীকার পায়, যে তোমাদের কাছে আমার উলঙ্গতায় কোন লাজ নাই—তোমরা কি সত্য তোমরা কি পর্য্যন্ত সুন্দর! ইহার পরক্ষণেই বাহিরের দিকে তাকায়—নির্ঘাত নির্দ্দেশ আঙ্গুলীদ্বারা করে যাহা কিছু পরিদৃশ্যমান তাহাদের—ঐ যে অজস্র উলঙ্গতা আমার দেহে আশ্রয় হেতু নিমিত্ত আসে, কিন্তু এতদোক্ত মনোবৃত্তি স্ফুট হয় নাই, লখাই কাঙাল চোখে শুধু চাহিতে জানে, আঙুলে চুষিতে জানে, এবং বিলম্বে তাহার চক্ষু বিস্ফারিত, রোমহর্ষে সে উৎখাত, কেননা মাকড়সা তাহার সমক্ষে, ইহাকে সে চেনে, মাকড়সা অধুনা অন্ধকার খাইতেছিল; ইহাতে শীত গ্রীষ্ম ঝিম লখাইএর ত্বকে অনুভূত হইল, রোমাঞ্চ সে চোয়াল ঘর্ষণে বলিয়া উঠিল "বন্দেমাতরং!" আরও কর্কশ নিনাদে চীৎকার করিল "বেশ করব আমি বামুনের ঔরসে তো বাবার কি একশো বারই আমি বামুনের ঔরসে তো বাবার কি" এ কথা লখাই সুহাকে বলে নাই, একথা লখাই তাহার মাকে বলে নাই, কখনও দূর হইতে শুধু যোহন একাদশীকে দেখিয়াছে, মনন মা করা সত্ত্বেও বৃদ্ধকে বুঝিবার চেষ্টা সম্ভবত করে; সুহা তাহাকে এইভাবে লক্ষ্য করিয়া জানিতে চাহিল "অমন করে ঠায় কি দেখছিস রে যোহন একাদশীকে" ইহাতে লখাই চমকাইয়া ইতস্তত চালিত নিজ দেহের মান সম্বরণে শশব্যস্ত, শুধু দেখিল—সুহার দুই হস্ত যন্ত্রের ন্যায়, সটান লাল গামছা ধৃত ও উঠায় নামায় কার্য্যশীল, এই হেতু যে সে ভিজা চুল ঝাড়িতেছে আর যে এইভাবেই সুহা প্রশ্ন করে; লখাই থতমত তবুও উত্তর দেয় "দেখছি আচ্ছা সুহাদিদি জং একাদশী মানে মানে বহুত রোগা হয়ে গেছে না গো" এইটুকু ব্যক্ত হওয়াতে, তাহার আপনার দ্বারা, সে খুব খুসী; বিশেষত যে 'বহুত' শব্দটি ব্যবহার করার নিমিত্ত এইজন্য যে উক্ত শব্দটি তাহার মনোভাবকে আড়াল রাখে, অতএব কিঞ্চিৎ জোর পাইয়া পাওয়াতে সুহার চুল ঝাড়িবার যথাযথ তালের, আওয়াজের, সহিত তাহার শিয়র উঠে আর নামে, আশ্চর্য্য যে উপরন্তু যোগ করিয়াছিল যে "বেচারীর বউটা...বউ হারিয়ে গেল" যদিচ সুহা এবম্বিধ ভদ্রোচিত বাক্যে নিশ্চয় প্রীত, তথাপি এ কর্ম্মেরত থাকিয়াও উহাকে দেখিল, উপস্থিত লখাই সুহা গ্রীবা ফিরাতেই গামছার ছায়াকে লঙ্ঘন ইচ্ছায় লাফ দিয়াছে ইত্যাকারে বার কয়েক, কিন্তু প্রকাশ থাক এতক্ষণ যাবৎ একটি হৃদয় আলোড়িত দীর্ঘশ্বাস, তাহাকেই, নিঙড়াইতে অধিক যন্ত্রণাদায়ক অনুভাবিত হয়, ঝটিতি উহা ত্যাগের চিন্তায় সে মনে মনে অস্থির ফলে কোন উপায়ে এ স্থান ছাড়িয়া অন্যত্রে—এখানে, ইহা জলাশয়, অনেক কলসী বিস্তার অনেক পানা ক্রমন্বয় শ্বেত শালুক; সন্তর্পণে জলে নামিল, উত্তমাঙ্গ আনত আপাতত, এই ভঙ্গিতে—খুব কষ্টে আপনার দীর্ঘশ্বাস যাহা বিধ্বস্ত অট্টালিকা লব্ধ যাহা অতঃপর উহার জনমানবহীন অন্তরীক্ষ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয়, তাহা ত্যাগ করিল তাই পানা সকল কাঁপিতেছে

এতাদৃশ্য স্পন্দন দৃষ্টে সে বিস্মিত ও তৎকালে উহার ওষ্ঠে ব্যঞ্জনাক্ষর বিরহিত শব্দ উত্থিত, শোনা যায়; মনে হয় লখাই কিছু কামনা করে—ইহাই তাহা যে, আমার শতেক দীর্ঘনিঃশ্বাস মাছেরাই জানুক...আমার শতজনমের দীর্ঘশ্বাস মাছ হউক মাছ হউক! এমনও ধ্রুব যে, সে দীর্ঘশ্বাসের হেতু জানেই না, কিম্বা সে চতুর যোহন একাদশীকে যদিও নিরীক্ষণ করে, তাহা সত্ত্বেও তাহার কথা স্মরণে আনিতে চাহে নাই, অথচ সুহার পিতৃ সম্বোধন, রাস্তার কাহারও 'বাবা' শব্দে ডাক উহাকে আশে পাছে বিশেষত পিছনে দেখিতে ক্ষিপ্রতা দিয়াছে মাত্র; এবং আরও যে, কুহক আশ্রয় নীচে অন্ধকার যে স্থলে নামে ঘুঘুর ডাক যাহার নিঃসঙ্গতাকে বর্দ্ধিত করে, দাঁড়কাকের যেখানে আর্তনাদ শ্রুত হয়, শত বজ্রাঘাতে বিধ্বস্ত সংগ্রহ অর্থাৎ শ্যাওলাময় ইঁট আর ইঁট—এবম্প্রকার স্থিতি, ফুলহার হইতে পরিদৃশ্যমান সজীবতার আভাস হইতে বহু যোজন দূরে, ইহার মধ্য হইতে দাড়ির পিছনের কটু রেশমীতা নিসৃত 'বাবা' বাক্যটি কখনই চেতনায় আনিতে চাহে নাই, দেখা যায় অনেকবারই স্বীয় শরীরে মৃগী রোগাক্রান্ত কম্পন সৃষ্টি করে তাই হয়তঃ তখনই ফুলহারের প্রতি আপনার উচ্ছ্বাস পর্য্যালোচনায় হাসিয়াছে ও তৎক্ষণাৎই ঈদৃশী যুক্তি দর্শাইয়াছে যে, যাহা সুন্দর তাহার সহিত কথায় ওজনের দরকার নাই, যাহা সুন্দর তাহার সহিত "আমার যা খুসী যা মনে আসে..." এমন কি নানাবিধ আওয়াজ করিব, আর যে একটি পাকা কথা স্মরণে আসে, যে, সুন্দর মন দেখে; "আমি ফুলহারের দিকে সব সময় চেয়ে থাকব" এই সঙ্কল্প সে, লটকার জলা যেখানে খালের মত সঙ্কীর্ণ তাহার বাঁশের সাঁকোর উপর দাঁড়াইয়া, নীচে জলঘাস কণ্টকিত জলরাশি, অগণিত লহরীমালা; ইহা মনোহর, তাহা দেখিতে এতই ভাল লাগে যে সে, করিয়া খুসী; এমত সময়, সাঁকোর এক প্রান্তে তাকাইল, একটি লোক আসে, অতএব তাহাকে পাশ দিতে অন্যদিকে চাহিতেই লখাই আতঙ্কিত, কেননা সাঁকোর কাটারি-টানের ধরতাইয়ে বাঁশের রেখা চৈনিক ভাবনায়, আপনকার প্রতিধ্বনির আয়ত্ত লাভে ছুটিয়াছে সেখানে দুই পার্শ্বের রেলিঙে হাত রাখিয়া যোহন একাদশী, লখাই বাঁশের মস মস ধ্বনি তবু শোনে, তাই সে বাঁশের রেলিঙে ভর দিয়া হেলিয়া দাঁড়ায়, যাহাতে লোকটি সহজে যাইতে পারে, লোকটি তাহাকে সাবধানে অতিক্রমের পরক্ষণেই যোহন একাদশীকে দেখিয়া কহিল "কি গো পথ আগলে অমনতর বাগঘের মত কাটে যে..." যোহন একাদশী তাহাকে পথ ছাড়িতেই উত্তর দিল "দেখছি বটে...ছোঁড়া পড়ে বুঝি...জলে অসংখ্য জোঁক..." লোকটি একথা শুনিতে সময়েই উহাকে পার হওয়ত রাস্তায় নামিয়া কহিল, "হ্যাঁ ছোঁড়া...গালচমকির ছেলে ত মহা চিঁচকে..." যোহন একাদশী এতক্ষণ মনে হয় লখাইকে দেখিতেছিল, অধুনা নিমেষেই একটি গভীর নিঃশ্বাস লইয়া, অল্পশিয়র ঘুরাইয়া মৃদু ভর্ৎসনাসূচক কণ্ঠে বক্তাকে লজ্জা দিতে চাহিল "ছি ছি এমন কথা বলার নয়...গালচমকি এ সব কি কথা...ওতে ওর আত্মা কষ্ট পায় ছি..." লোকটি চলা থামাইয়া স্থির সে ম্রিয়মাণ, থতমত, এবার বাহু চুলকাইতে থাকে, এখন রাস্তা ধরিল; যোহন একাদশী পুনরায় রেলিঙের বাজু ধরিয়া চিত্রার্পিত, অবিলম্বে সে গলা সাফের অন্তে, মনে হইল গীত গাহিবে, কিন্তু তাহা নহে, বলিল "দেখলি, কেমন বললুম...আমি সবাইকে বারুণ করে দেব...আর যে শালা ডাকবে...বলিয়াই বাঁশের উপর প্রচণ্ড জোরে ঘুষি মারে, সমস্ত সাঁকো আন্দোলিত হইল; লখাই তখন প্রাণপণে রেলিঙের বাজু আঁকড়াইয়াই ত্রস্ত, এবার শুনিল "তারই একদিন কি আমারই..." ইহার পর স্নেহমাখা স্বরে "ওরে পড়ে যাবি যে জলে ভারী জোঁক..." অবশেষে কোনক্রমে তির্য্যক দৃষ্টিতে নজর সম্ভব তাহার দ্বারা হয় যে যোহন একাদশীর মাথা আনত, টাক আর দাড়ির কিয়দংশ ওতপ্রোত—ইদানীং সে, লখাই, চকিতে চারিদিকে প্রত্যক্ষ আশে তৎপর, আর যে তৎকালে বুঝে, যে যোহন একাদশী অতীব মন্থরে নিজ মুখমণ্ডল উন্নীত করে, উপস্থিত তাহার ভ্রূ দ্বয়ের টান দেখা গেল, অনন্তর হিতৈষী অযুত বাৎসল্যে, অল্প আড়ষ্ট গলায় কহিল "হ্যাঁ রে আমি যা বলতে বলেছিলুম মনে আছে ত তোকে যে মানে বাবা বলতে..." লখাই এ যাবৎ আশা করিতেছিল যে এখনই দাড়িতে মুখ আবরিত হইবে, এবং কুশ্রী প্রস্তাব ধ্বনিয়া উঠিবে, কিন্তু হঠাৎ এমত সহজ প্রকৃতিস্থভাবে যে সে, যোহন একাদশী, পুনঃ সেই ভয়ঙ্কর কথা উত্থাপন করিবে ইহা সে নিজে, লখাই, প্রত্যাশা করে নাই, সে নিষ্পলক নেত্রে বৃদ্ধের দিকে চাহিয়াছিল; দেহ অভ্যন্তর স্থির হইলেও উহা আর এক বিকারের প্রস্তুতি, কেননা ইতঃপূর্বে যাহা কিয়দংশে রগড় জাতীয় এইহেতু যে দাড়ির কেয়ারি আর হাস্যে সমাপ্তি ঘটে, কিন্তু উপস্থিত যোহন একাদশীর স্বাভাবিকতা যারপর নাই হিম, কূট দজ্জাল, যে সে অসমসাহসিক কিছু করিতে মধুর হাস্য সহকারে পারে, তাহার

পক্ষে সকল ইতর অমানুষিকতা সাধারণ; এখনকার রৌদ্র পর্য্যন্ত তাহার অভিসন্ধির দ্বারা অপবিত্র ফলে ঈষৎ মলিন, প্রখর রৌদ্র তবু লখাইএর অনুমানে বিবর্ণ, উহার ত্বকে মৃগী রোগ খেলিয়া উঠে, যোহন একাদশী আবার কহিল "বাবা বলবি বুঝলি" অতঃপর আর দাঁড়ায় নাই এরূপ সরল নিখাদ অম্লান বদনে আপনকার সাধকে অভিব্যক্তি করার নিমিত্তই তাহার বুক দশাসই হইয়াছে, আত্মতৃপ্তিতে উদ্বেল, এবং এ স্থান পরিত্যাগ করত, সাঁকোর পারে গেল না, রাস্তার দিকে অগ্রসর হওয়ার পূর্ব্বেই বালকের দিকে মোহময় মায়াযুক্ত চোখে অবলোকনে চুপ, ক্রমে মৃদু হাসিয়া গীত গাহিতে গাহিতে চলিতে লাগিল; লখাই প্রস্তরীভূত, এতই যে একটি মাছরাঙা তাহার নিঃশ্বাসের সীমার মধ্যেই বসিয়াছে, খানিক বিলম্বে ছোট অল্প পাখীর আওয়াজের ভিতরেও সে অবাক স্তব্ধতার সম্মুখীন, অদ্ভুত রহস্যময়! কুড়াল আঘাতেও যাহা চুপ, এবং তখনই সে মনস্থ করে, যে উহা দ্বারা সে অনেক অযুত ফড়িং নির্ম্মাণ করিবে, যাহারা সুখে আনন্দে শূন্যতায় ভ্রমণ করিবেক; পরক্ষণেই সে সাঁকোর উপর দিয়া আশাতীত দ্রুতই আর যে মাটিতে নামিতেই ঝঞ্ঝা বেগে দৌড়ায়, দিক জ্ঞান নাই, কখন যে একদা সে রেলগাড়ী—ইহা তাহার চৈতন্যে আসিতেই, সে থামে, তখনও বুদ্ধির সহিত সম্বন্ধ অথচ কোথায়, কেননা এ পর্য্যন্ত উহার মুখ নিঃসৃত "কু ঝিক্ ঝিক্" শ্রুত হয় আর হস্তদ্বয় যান্ত্রিক ভঙ্গিতে—কতটুকুতে রেলের আভাস! আসা যাওয়া করে; হঠাৎ স্থির হওয়ত অসম্ভব রোষ পরায়ণ, নিজ অধিকার সত্ত্ব হাঁসিল নিমিত্ত মরিয়া—আকাশ বিদীর্ণকারী উচ্চ কণ্ঠে কহিল "বেশ করবে...আমার মাকে গালচমকি বলবে, তো বাবার কি...শালাচ্ সাউকিড়ই ক আর...খানকির ছেয়ে...শালা..." ইহার শেষে, আশ্চর্য্য! তাহার দেহে এমত প্রবল ভাবে দমড়াইতে দেখা যায় যে মনে হয় কেহ তাহাকে অব্যর্থ বজ্র জোরে ধরিয়াছে, আর বালক প্রাণপণে আপনাকে মুক্ত করিতে ঘর্ম্মলিপ্ত, সে রোরুদ্যমান; আর যে ইতিমধ্যেও দুর্দ্ধর্ষ আবেগে বলিয়া উঠে "বেশ করবে গালচমকি বলবে...আমি...তো বাবার কি যতি বামুনের..." এখানেই ছেদ পড়িল, কেননা আলা তাহাকে জ্ঞাত করে, যে "বামুনের ঔরসে মানে বামুনের ছেলে বামুন থেকে মানে যার জন্ম" তাহারা দুজনে গৃহাভিমুখী গরু সকলের পিছনে পিছনে যাইতেছিল, উপস্থিত প্রচণ্ড বৃষ্টি, আলার মাথায় কাটা চটের থলে; লখাই উহা শ্রবণমাত্রই সমস্ত দিকসমূহ দর্শনে ছত্রাকার এই জন্য যে এই প্রথম সর্ব্বথাই তাহার আনন্দকে সে পরিক্রমণ ব্যাপৃত বুঝিল, প্রত্যেক আনন্দ উহার কারণে অপেক্ষমাণ, ঝটিতি সে বৃষ্টিজনিত সম্ভবত, হিম—এবম্বিধ জিজ্ঞাসা আসিল, "বামুনের ছেলে মানে ত সকলেই তাদের প্রণাম করে? তবে হাসে কেন?...এ কি তাহলে...? এরও কি গাল চমকায়" অচিরাৎ সে কেমন পাংশুবর্ণ ধারণ করিল শুধু সায় দেয় "ও" এবং চট আবরিত আলা তাহার দিকে অদ্ভুতভাবে লক্ষ্যে আনমনা সঙ্কেতময় অনুধাবনে সে কোনমতে জোর আনিয়া কহিল "কি দেখছিস রে" এ সময়ে তাহার দুই হাত, বক্ষ চাপিয়া, দুই স্কন্ধ ধরিয়াছিল ও শরীরে অসংখ্য প্রবাহধারা; আলা আপনার চির-ক্লান্ত শিয়র মৃদু আন্দোলনে, হয়ত না সূচক কিম্বা বেদনায়, উহাকে পাঠের শেষ গম্ভীরভাবে বলিল "দেখছি বৃষ্টিতে ভিজলে তোকে কেমন দেখায়" নিশ্চয়ই লখাই আলাকে সন্দেহের চোখে দেখে, যে রহস্য সে নিজে জানে না তাহা আলার কাছে কত সোজা, অতএব সে অনন্য উপায়ে নিজ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠার দিকে তাকাইল, ভীত হইল, এ জন্য যে 'বামুনের ঔরসে' বাক্যটির গাল নির্ঘাত চমকায়, যে চমকান সে ছাড়া আর আর যাহারা সকলেই দেখিতে পায়, হঠাৎ আপনার একটি হাত স্কন্ধ হইতে সরাইয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশে চীৎকার করি উঠে "হ্যাদে দেখ গেল...পিঙলেটা...গেল রে" সঙ্গে সঙ্গে বিপথগামী পিঙ্গল গাইএর পশ্চাদধাবনে আলা অনেকদূরে, গরুগুলি মন্থর গতিতে চলে আলা এখন পিঙ্গলা গাইটিকে রাস্তায় তুলিতে ব্যস্ত আর সে পুনরায় দুই স্কন্ধে হাত স্থাপন করত অনড়, শুধু পদদ্বয় দ্বারা কর্দ্দমাক্ত রাস্তায় মাটি চাপে; উপস্থিত সে যোহন একাদশীর উদ্দেশ্যে গাল দিতে থমকাইলেও, ইহা ধ্রুব যে সে কোন সূত্রেই 'বামুনের ঔরসে' যথার্থ অর্থ কি, এবং আপন মুখে অঙ্গুলি রাখা ছাড়া আর কোন কিছু ভাবিতে পারিল না, শুধু একদা মনে উদ্ভট ভাবনা জাগিল, যে তাহার মার গালে চমকান আর নাই আর যে তখনই গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল, সে এক কূট রন্ধ্র গত; ইহার ঠিক দুদিন পরে, পুনরায় রাস্তা যেখানে অতর্কিতে বাঁকিয়া আড়ালে এ কারণ যে দুই পাশেই ঘন বাবলা গাছের মাথাতে আলোকলতা, সহসা এইখানেই যোহন একাদশী, তাহাকে দেখিয়াই আহ্লাদে আটখানা, বলিল "কেমন বলেছিলুম না সবাইকে

করুণ করব...সবাই বললে বটেইত ওর আত্মা কষ্ট পায়" বলিয়া নির্ব্বোধের হাসিতে উচ্ছল; লখাই উহার দিকে স্থির নিস্পলক দৃষ্টিতে চাহিয়া অতীব সন্তর্পণে পিছু হাঁটিতে থাকাকালীন আপন অন্তরে শুনিল কেহ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলিতেছে "আমার আত্মা কষ্ট পাবে ত পাবে" যোহন একাদশীর বালকের বিবর্ণ মুখ দেখিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত হয় পরক্ষণে নিজে কপালে করস্পর্শে ব্যক্ত করে "হা কপাল! তুই অমন করে সরে সরে যাচ্ছিস কেন, তোকে না আমি কত ভালবাসব...তুই আমাকে বাবা বলে ডাকবি—তোকে আমি কত আদর করব—প্রেথম প্রেথম...আড়ালে তা পয়ে সব্বার সামনে" লখাইএর কানে এ সকল কথা অসম্ভব এক বিকট আওয়াজ বাজিতে ছিল পুনরায় শুনিল "তোর মা খুব সুন্দর রাঁধে, কচুশাগ্ চিংড়ী মাছ অমৃত খেয়েছি একদিন বুঝলি" লখাই এই প্রশংসায় মতিচ্ছন্নই, এ ব্যাপার তাহার, আশ্চর্য্য মনে উদয় হয় নাই যেহেতু তাহাকে বৃদ্ধের প্রস্তাব, ভুলাইয়া দিয়াছিল, এমত জাঁক দেয় যে, নিশ্চয়ই, বালকের উহাকে বলিবার অনিবার্য্য ব্যতীত—আর কিছুই মনে হয় নাই, তাই দীর্ঘশ্বাস ক্বচিৎ বালখিল্য আস্ফালন! এখন যোহন একাদশীর বক্তব্যে তাহার আপনার গালে সজোরে চপেটাঘাত করিতে ইচ্ছা হওয়ার সঙ্গেই সত্যই যেন চপেটাঘাত সে করিয়াছে অনুভবের মুহূর্ত্তেই তাহার মুখ ঝটিতি ঘুরিয়া যায়, অন্তঃস্থল কম্পিত ক্ষোভে, কি কুক্ষণে সে গোপনে, এমন যে সুহা দিদিকে লুকাইয়া, কলাপাতায় করিয়া পোড়াচিংড়ী দিয়া কচু শাক রান্না অশেষ শ্রদ্ধায় লইয়া গিয়া তাহাকে নিবেদনান্তে বলে "সুহাদিদি তোমাকে কত কি দেয়—আমরা কাঙাল ত কি পারি—তুমি এটুকু খেও মা বলেছে—তোমার পরবার নেই—রোজই বলে আমি বলি এসব কি সে খাবে!" ইত্যাকার তাহারই মনগড়া বরং উহার মা ঈদৃশী খেয়াল অনুধাবনে ঈষৎ অবাক, এখন ইহাতে যোহন একাদশীর খুবই খুবই বিস্মিত হওয়ার কথা এ কারণ যে অনেকদিন হয় সে একা কিন্তু তাহা ঘুণাক্ষরেও নহে, উপরন্তু সে তাহারই প্রীতিবর্দ্ধন নিমিত্ত এইটুকু ভেট দর্শনে অপ্রাকৃতিক আহ্লাদিত; লখাইএর ঐটুকু দেওয়ার মধ্যে অপরিমিত আবেগ ছিল, কেননা এই প্রথম তাহার যথার্থ বন্ধুলাভ ঘটে যে ব্যক্তি তাহার সপক্ষে, কিছু বলে, যে বাধা সে নিজে দিতে অক্ষম, সে ব্যক্তি তাহাই দিতে বদ্ধপরিকর, যোহন একাদশী 'বামুনে ঔরসে' পদে বাধা দেয় ফলে তাহার নিকট কৃতজ্ঞ হওয়াই সাধারণত বাঞ্ছনীয় কিন্তু উপস্থিত সে কার্যের তথা হটুকারিতার হেতু লখাই নিজেকে অভিসম্পাত করিবার মত অবকাশ নির্দ্দিষ্ট পায়, তবু সে পলক ফেলে নাই তেমনই দণ্ডায়মান; যোহন একাদশী তাহাকে ছাড়াইয়া যাইবার কালে অপ্রত্যাশিতভাবেই তাহার মস্তকে সস্নেহে হাত বুলাইয়া খানিক পা দূরে, ইতিমধ্যেই বালকের গা কেমন যেন বাঁকিয়া উঠে, ইহা ঘৃণায় অবধারিত, এবার যোহন একাদশী তাহাকে শঙ্কিত করে উঁহার দাড়ি মুখমণ্ডল আচ্ছাদিত চোখ দুটি ছোট দেখায় বৃদ্ধ তাহার দিকে ফিরিয়া ছিল, ফুঁ দিয়া দাড়ি বিভক্তের সঙ্গেই ঘোর স্বর শোনা গেল "তুই বাবা বলবি" আর তখনই দাড়ি হইতে হাত সরাইয়া মধুর বচনে শেষ হয় "বলবি কেমন" লখাইকে সমস্ত বাক্য নিচয় একাধারে ত্রাসে জলবৎ ও উৎক্ষিপ্ত করে, এই কয়েকদিনে 'বাবা' শব্দটিতে সে কি অসম্ভব সহায় সম্বলহীন কি পরিমাণে তদীয় শ্বাসরুদ্ধ কি অমানুষিক নির্ম্মমতায় বেচারীকে খেদাইয়া পৃথিবীর শেষ সীমায় লইয়া গিয়াছে, যে সে আঙুল চুষিতে পর্য্যন্ত ভুলে; 'বাবা' উক্তি শ্রবণেই আপন কর্ণে অঙ্গুলি দিয়াছে তাহার চারিদিক অমঙ্গলময় নির্জ্জনতা; ইদানীং যোহন একাদশী পুনরায় কিঞ্চিৎ পথ অগ্রসর হওয়ত থমকিয়া চুপ, অবিলম্বে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া স্মিতহাস্যসহ "তোকে জুতো জামা সব কিনে দেব—তুই ভদ্দরলোকের ছেলেদের মত হবিই—আমার সঙ্গে গিজ্জে যাবিই—" এবম্বিধ বচনের স্বাদ গ্রহণ করত বলিয়াছিল ও তৎক্ষণাৎ আপন দাড়িতে হাত বুলাইয়া ঘোষণা করে "তখন এ্যাঁ কোন শালা দেখি বামুনের ঔরসে—গালচমকির ছেলে বলে" আর সে দাঁড়ায় নাই, ঈষৎ চক্ষুলজ্জায় হইলেও হইতে পারে সে দ্রুত পদক্ষেপে চলিতে থাকে, এবং বেসুরে 'উড়াও বিজয় পতাকা' গীতটি প্রথমে গাহিতে উল্লাসিত লখাই বিদ্রাবিত নয়নে প্রত্যক্ষ করে যে যোহন একাদশীর, চলাকালীন, রোমশ হস্তদ্বারা পার্শ্বস্থিত বৃক্ষ সকলের পত্রাদি অতীব নিষ্ঠুরভাবে কর্ত্তিত হয় তদ্দৃষ্টে সে হতবুদ্ধি, ভস্মীভূত, ক্রমে ক্রমে একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল, অবশ্য এখনও সে হারামী শালা বলার অবসর পায় নাই, হঠাৎ এমত সময়ে পুনর্ব্বার চলা থামাইয়া তাহার দিকে চাহিয়া কহিল "যদি বলিসত কাঠি বরফ" পরক্ষণেই এক হাত দিয়া দাড়ি উল্টাইয়া যোগ দিল "ঝতি না বলিস তোকে আমি পুলিশে দেব—এক নম্বর সিঁধেল"—আর যে নিমেষেই পিছন ফিরে, ইতিমধ্যে আধমরা বালক ভেজা চোখে, আড়ষ্ট ভগ্ন স্বরে ডাকিল "বাবা', কিন্তু

যেমনি সে কণ্ঠস্বর মরমে প্রবেশ করে অমনি সে জ্বালায় থরহরি, রাগে ক্ষোভে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য আপন অধর দংশনে ক্রূর, অধুনা বৃদ্ধকে আর দেখা গেল না এবং সুযোগে নিজেকে পাইয়া যে সে কি করিবে কিভাবে উৎপীড়ন নির্য্যাতন করিবে ভাবিয়া পাইল না, সে নিজেকে যেন পদাঘাত করিল ফলে বাস্তবিক নিজেই ছিটকাইয়া পড়িল, অনবরত পদাঘাত অনুভবে, 'আর করব না আর করব না' বলিয়া নিনাদ করিল আর অন্য লখাই তাহাকে পদাঘাতকালে বলিতেছিল "আজ তোর একদিন কি আমার একদিন" অনন্তর পীড়িত লখাই উঠিয়া, ধূলা ছাড়ার কথাই নাই, কেমন এক গর্দ্দভনিন্দিত কণ্ঠে চীৎকারে এখন সকালের আকাশকে জীর্ণ করে, একপ্রকার কর্কশ বুনো হুঙ্কারে তাহার গলায় জ্বলন আরম্ভ হয়, তথাপি সে কাহিল নয়, রুষ্ট স্বরে বলিতে থাকে "তোর পোঁদের কাপড় তুলে দেব—বা—বাঁট খাও শোরের বাচ্চা হারামী খৃশ্চান—খৃশ্চান" আর কি যোগ দিতে পারে তাহা সঠিক নির্ণয়ে বুদ্ধি ভ্রংশ তাই কহিল "শালা খ্রেশ্চান ডিসকে পিরীচ বলিস্ আলুভাতেকে আলুভত্তা বলিস্—তোদের জাত জন্ম আছে—? দাঁড়াও শালা পোষটো বাকসয় আমি সাপ্ পুরে দেব—" এতশত কটুবাক্য ঘৃণা ক্রোধ সত্ত্বেও তাহার কেমন যেন অনিবার্য্য টান অনুভব হয়, যোহন একাদশী জাল টানিতেছে, এবার তাহার গলা হইতে অস্ফুট বেদনার ধ্বনি নিঃসৃত হইল; রুদ্ধস্বরে বলিল "আমার আত্মা কষ্ট পাবে ত পাবে— তাতে তো বাপের কি" ইহার শেষ সে চোখ তুলিয়াই হতচকিত কেননা দেখিল যোহন একাদশী আরবার প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে এখন স্থির, বৃদ্ধ কহিল "হ্যাঁ যদি দুদিনের মধ্যে আজ থেকে না বলিসত— ভৈর-ফৈর নয় সোজা দারগা—ঠেলে দেব" আর যে এই উক্তির সহিত আপন হস্ত দ্বারা কুৎসিত অশ্লীল ইঙ্গিত করিয়া চলিয়া গেল; লখাই থ, আর কোন উষ্মা প্রকাশে তাহার মন ছিল না, সে জানে, সে বহুবারই ইউনিয়ন বাড়ীর গাছ তলায় দারোগাকে দেখিয়াছে, দলে দলে লোক ভেট আনে, যোহন একাদশী সব কাজ ফেলিয়া দারগার সেবায় অযাচিতভাবে নিজেকে নিয়োজিত করে। দারগার জন্য সে মুরগী রাঁধে, আঙুলে মুরগীর গলা ধরিয়া হঠাৎ চাপ দিয়া মারে, একদা ইহা দর্শনে দারগাও পর্য্যন্ত, শোনা যায়, বলিয়াছে—ইঃ তোর দয়া মায়া বলে কিছু নেই—গলা চেপে—" যোহন একাদশী উত্তর দেয় "এতে হুজুর মাংস খেয়েত ভাল হয়" দারগা তাহা শুনিয়া মন্তব্য করে "তবু দয়ামায়া বলে—ওটা নিষ্ঠুরতা" যোহন একাদশী মৃদু হাস্যে বলে "আমি যে লড়াইয়ে ছিলুম—এই কোটত লড়াইয়ের হুজুর...ফিরোজপুর পল্টনে; কি গোলা কি বারুদ পিলে চমকে উঠে সে লড়াইএর পর আর হুজুর দয়ামায়া সব ধুয়ে মুছে গেছে—হুইসিল মারা গুলির শব্দ—আপনি বড় নরম—আমাদের পুরুষ মানুষের বড় শক্ত হতে হয় হুজুর" তৎকালে একদা রৌদ্র তৎক্ষণাৎই ছায়ায় উহার মুখখানি অতি প্রাচীনতম সত্যরূপে ভাস্বর, উপস্থিত সে চাকু দিয়া পেঁয়াজ কুটে তাই পেঁয়াজের ঝাঁঝে তাহার চোখে জলপূর্ণ, দারগা মনে হয় কিঞ্চিৎ হাসিলেন, সম্ভবত সহানুভূতিসূচক, লখাই লুকাইয়া দেখিল; দারগা কোমর হইতে খসান বেল্টটি, দেখা গেল, চেয়ারের হাতলে রাখিয়া সম্মুখের টুলে ভালভাবে পা ছড়াইয়া একটি সিগারেট বাহির করে, ইহাই চেয়ারের হাতলে ঠুকিতে কালে, সমবেত অপেক্ষমাণ জনমণ্ডলীর দিকে মহা করুণায় চাহিয়া অবশেষে যোহন একাদশীর প্রতি তির্য্যকভাবে অবলোকনে সস্নেহে কহিল, "যা হোক আমার তরে তোর ভারী কষ্ট—" এতাদৃশ বচনে যোহন একাদশী যেন সাড়ী পরিহিত বুকের কাপড়ও মনে হয় টানিল, অদ্ভুত অনুনাসিক সুরে উত্তর দিল "কিস্সু নয় হুজুর—আমার ভাগ্গি" নিশ্চয় সুসংবদ্ধ হয় এমত কিছু না পাওয়াতে যোগ করে "আপনি বড় নরম হুজুর—উঃ আপনার মত পোষাকে আমার কাপ্তেন বুটপট্টি সাফ না দেখলে ত ব্যস্ ফাঁকি অপ—" দারগা সিগারেট মুখে দিতেই, কে একজন সবেগে আসিয়া দেশলাই হাতে প্রস্তুত, মহাভক্তিভরে ধরাইয়া দিল, দারগা ধোঁয়া ছাড়িবার সময় বৃদ্ধের উপর সন্তুষ্ট হওয়ত কহিল "যোহন একাদশী তোকে কতবার বললুম একটা ডায়েরী কর, বেগর ডায়েরী আমার ক্ষ্যামতা নেই—তোর বউ যেখানে থাক্ খানকী শালীকে কড়ি চেলে আমি শালীর চুলের মুঠি ধরে তোর পায় এনে ফেলে দিতুম—সে শালাকে জুতিয়ে খাল খেঁচে" ইহা শুনিতে যোহন একাদশী জলভরা দিকে তাকাইয়াই নিবিষ্ট, সম্ভবত এই ভাবনায় যে সামনে যে প্রতিবিম্ব তাহা কি উহারই; এখন লখাই সে-দৃশ্য স্মরণে বিকল, এতেক নির্য্যাতনের পরও তাহার অহং চূর্ণীকৃত যখন—সে জেলের ভয়ে বর্ণহীন; তথাপি তাহার যোহন একাদশীর সহিত এই সাক্ষাৎকারের প্রথমটুকু দুদিন চলিয়া যাওয়ার পর তাহার মাকে বলিয়াছে; গত দুদিন সে আলার উপদেশ মত চলে যে উপদেশ—তখন সে আলাকে

ছাঁকনে দিয়া মাছ ধরায় সাহায্য করে, তখনই কোন বিশেষ নাম উত্থাপন না করিয়া ঘটনা আনুপূর্ব্বিক সবই বর্ণনা করত, পরামর্শ চাহিতে সলজ্জভাবে আলার প্রতি তাকায়, আলার মুখখানা ম্লান, নিজেকে সহজ ধারায় রক্ষার্থে জলস্তরে হাত খেলাইতে ক্ষণে কহিল "উপায় কাঁচা হলুদ চিবিয়ে, মানে বাসি মুখে তোর মায়ের কড়ে আঙুল যে কোন একটা কামড়ে দেবে সাতদিন, এই সঙ্গে এয়োস্ত্রীর চুল সাতগাছি শনি ও মঙ্গলবারে যোগাড় করে কড়িতে বিঁধিয়ে মায়ের বাঁ হাতে পরাতে হবে—সাতদিন পীরের দরগায় তিনি-তিনি যে যেমন পারে—" এখন লখাইএর মুঠোয় একটি চিংড়ি মাছ ছটফট করিতেছিল, তাই সে বস্তুটির প্রতি চোখ রাখিয়া জানিতে চাহিল "কেমন করে তা হবে—" আলা গম্ভীরভাবে কহিল "করতেই হবে যে ভাবে পারে...করি কি মরি...ধর বলবে একজনা বাণ মারবে শাসিয়েছে...তারই মঙ্গল হবে—কিন্তু কার এমন সব্বনাশ—" লখাই চিন্তিত তত্রাচ তাহারই মধ্যে বলিল "নাম বলতে দিব্বি আছে—আচ্ছা—তুই এসব" ইহার অর্থ আলার নিকট সরল, বিরস নয়নযুগ অন্যত্রে লইয়া কহে "সব শেষ হয়ে গেছে তার অনেক দিন বাদে এ তুকটা জানতে পারি" এবার দৃষ্টি ফিরাইতেই লখাইকে শূন্য মনে একীভূত অথচ শীতকাতর দর্শনে বিস্ময় প্রকাশ করিল "তুই দেখি বড় কাঁপছিস—জ্বর—" লখাই কিন্তু এতক্ষণ আলার তাবিজের দিকে চাহিয়াছিল ইদানীং চমকাইয়া উত্তর দিল "আজকাল আমার একটুতেই শীত করে—" এবং মুষ্টি ধৃত চিংড়ি মাছটি টুকরীতে রাখে, কি জন্য এতাদৃশ্য শৈত্য সে নিশ্চয় মনে করিতে চাহে না শুধু মাঝে-মধ্যে মনে মনে বলে "মারের চোটে আমার হাড় ভেঙে দেওয়া উচিত—"; সকাল বেলায়, ভোর থাকিতে, উঠিয়াই একটু হলুদ চিবাইয়া মার আঙুল ধরিয়া কামড় দিতেই, তাহার মা 'উহুঃহু' শব্দে আর্ত্তনাদ করত যন্ত্রণায় এক থাপড় মারিতে উদ্যত, কিন্তু লখাই নাগালের বাইরে, তাহার মা কহিল "বজ্জাত ছোঁড়া সক্কাল বেলা আমার হাতটা কামড়ে দিলি—মরমুখো—" লখাই কোন মতে তাহাকে পাশ কাটাইয়া দরজায় বলিল "কেন জানিস একজনা আমাকে বলে বাণ মারবে—তাই তোর আঙুল হলুদ চিবিয়ে কামড়াচ্ছি—এই দেখ হলুদ" আর তখনই জিহ্বা প্রলম্বিত করিয়া দেখায়, ইহাতে তাহার মায়ের যন্ত্রণা উধাও, শঙ্কিত হইয়া জানিতে চাহিল "সে কি রে—কি সব্বনাশ কোন ডাকরা—চ চ শৈবালীর কাছে যাই—" লখাই তাহার মাকে কহিল "কাউকে বল না বললে কেটে যাবে—এমন লোক ধর সব্বাণীবাবুর চেলা...তা ওষুধ..." তাহার মায়ের তবু ভাবনা, কিন্তু পুত্রের উপরোধে তাহারই গা, লখাইএর, স্পর্শে দিব্বি করিতে হইল, কোন কিছুই দ্বিতীয় কান করিবে না; এখন লখাইএর চাঞ্চল্য সকলের চোখেই অস্বাভাবিক বোধহয়, তবু তাহাদের মধ্যে সুহা তাহাকে জিজ্ঞাসা করে, "কিরে তুই দেখছি খালি খৈ ফুট কেটে বেড়াচ্ছিস" সে, লখাই, ইহাতে শুধু মলিন হাসি হাসিতেছে; উপস্থিত ভাত খাইতে বসিয়া তাহার কণ্ঠ শেষে আরম্ভ হয় কোনক্রমে আড়ষ্টতা সত্ত্বেও "জানিস শালা হারামজাদা আঁটকুড়ির বেটা খেশ্চান এক লম্বর খচ্চড় বলে কি" এ পর্য্যন্ত উক্তির পর হঠাৎ স্তব্ধ, মায়ের দিকে অবলোকনে বিমনা, উপরন্তু সে বুঝে যে তাহার মতিত্ব লইয়া, অন্তরে, কে যেন নাড়াচাড়ায় বিহ্বল মায়ের গাল চমকানর দ্রুত চাঞ্চল্যে সে যারপরনাই খুসী এতাবৎ যে কারণে ভগবানের প্রতি তাহার দুঃসহ অভিমান; ভয়ঙ্কর ক্রোধ!—ইতিপূর্ব্বে এ সম্বন্ধে তাহার কি যেন বা মনে আসে—এবার বক্তব্য শেষ করার জন্য ভ্রূভঙ্গের পরই পুনরায় চুপ, শীত অনুভূত হয়, অন্যপক্ষে তাহার কহিল "বলবি ত না! শালগাঁম হয়ে গেলি যে খা না সে পোড়ার মুখো কি বলে" ঈদৃশী অভিব্যক্তিতে সে জীবিত, এক দলা ভাত মুখে তুলিয়া অদ্ভুত হাস্যকরভাবে বলে "বাবা বলবি" এ কথা বলিতে তাহার প্রাণ কাঁদিতেছিল, তবু উচ্চারিত হয় ইহাতে তাহার মা নিজে এক দলা ভাত, অনন্য উপায়ে নাচাইতে মূঢ় ইহা গর্হিত লোকাচার বিরুদ্ধে এ কারণে যে ভাত নাচাইলে লক্ষ্মী ছাড়িয়া যান, অতএব লখাই কর্কশ স্বরে তাঁহাকে, মাকে, সচেতনার্থে "কি কচ্ছিস ঠিক দুকুর বেলা ভাত নাচাচ্ছিস হাতে—" বলিয়াছে, অথবা এতাবৎ যে শীতে ত্বক কণ্টকিত তাহা মোচন নিমিত্তই সে রুষ্ট, উত্তপ্ত ক্রমে, এবং অবিলম্বেই স্বীয় কঠোরতা হৃদয়ঙ্গমে ঝটিতিই দ্রবীভূত, অজানিত দুঃখ তাহার অন্তরঙ্গ এখন, শুধু দুঃখ। নির্ঘাত তদীয় মায়ের কারণে, আর যে অনন্তর আপনাকে ক্লৈব্য হইতে জাগরূক করণ মানসে, নিঃশব্দে দুর্ব্বার শক্তিতে মনে মনে বলে "আমার আত্মা কষ্ট পাবে ত পাবে—তো শালার কি" এবং যুগপৎ নিজ কর দর্শনে হতাশ যে উহা কতটুকু! উপস্থিত তাহার মা ধমকে ঈষৎ স্বাভাবিক উহার কণ্ঠ হইতে শুষ্ক "ওমা!" নিঃসৃত হইল; এই, ইত্যাকার সাড়া—এ-হেন ব্যবহার যদি ঔদাস্য, বলা যায়—লখাইকে বুনো

করতে হতবুদ্ধি করে, নিশ্চয় সে ভাতের দিকে লক্ষ্যে সে প্রকৃতিস্থ, বুঝে যে আমরা কাঙাল, নিজেকে তিরস্কারের বাসনা আসে, বারম্বার ভাবিল নির্ব্বোধের মত কেন মাকে জানাইতে গেল, তাহার মায়ের 'ওমা'! উক্তিতে তাহার গা ছম্ ছম্ এখনও; সে নির্লজ্জ উলঙ্গ, আর যে, ইহা—ঈদৃশী উলঙ্গতা বৃক্ষের আড়ালে কভু গিয়া অর্থাৎ আপনাকে গোপন করিয়া মতিভ্রমে কখনও পতঙ্গ দ্বারা ঢাকিবে এমত সঙ্কল্পের মুহূর্ত্তে দেখে, হাজার উলঙ্গতা তাহার অল্প শরীরময় আশ্রয় নিবন্ধন ক্ষিপ্ত, সে সত্যই বড় অসহায়! সে কি জল স্থল সমুদয় পত্রগুল্ম ঔষধী হিংস্র নিরীহ সকলকে বলিব—তোমরা বাড়ী যাও! লখাইএর দেহের অনুকণা এমন যে বিষাদময়, অনুতপ্ত; উপস্থিত, তাহার মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহ সঞ্চারিত, সেও অজ্ঞাত কোন দূরদৃষ্টে রোমাঞ্চে ত্রাহি; আদতে উহার কারণ নিশ্চয়ই স্মরণ করিতে পারিত, যে, সে আজ সকালেও, গতকাল ত বটেই, আশ্চর্য্য হওয়ত দেখিয়াছে আপনা হইতে, দু' এক বার প্রহার সত্ত্বেও, কয়েকবার রাগে চীৎকারে সে বলিয়াছে "ভুল! চালাকি করবার জায়গা পাও না, জুতিয়ে লাট করে দেব" তথাপি দেখিয়াছে পদদ্বয় আপনা হইতেই গীর্জ্জার দিকে যায়, গীর্জ্জা অভিমুখে যাইতেছে; অধুনা ভাত হাতে লখাই সৃষ্টিছাড়া অচেতন বিদ্যুৎ স্পৃষ্টে সমস্ত প্রত্যঙ্গাদি, শুধু বুঝে সে কত কণামাত্র, যোহন একাদশী হঠাৎ এতকাল বাদে কি ভীম দানব, আর তাহার মা গালচমকি কতখানি মেয়ে মানুষ—দাপটহীন, এ সময় সে নিজ আঙুল অন্যমনে লেহন করে, কেননা ইহা প্রহেলিকা যে, তদীয় মনে এয়োস্ত্রীর সাতগাছি চুল সংগ্রহ বাসনা উচ্চকিত; এবং শূন্যদৃষ্টিতে ধীরে লখাই কহিল "হ্যাঁ গো কি বার বলত আজ" তাহার মা এতাবৎ বাঁ আঙুলের দাগে কিসের হিসাবে নিবিষ্ট, পুত্রের প্রশ্নে ঘাড় বাঁকাইয়া দর্শন শেষে উত্তর দিল "তাহলে পাবে মোট সাড়ে দশ পয়সা ও আজ মঙ্গলবার" আবার হিসাবে সে ঢুকিল; অদ্যাই, চুল সংগ্রহে কাহার নিকট যাইবে? সুহাকে মরমে মৃত লখাই কোন কিছুই বলে নাই, তবু, এখন, সে সুহার নিকট; যোহন একাদশীর সহিত বিগত সাক্ষাৎকারের শেষটুকু সে সুহার মুখের প্রতি চাহিয়া বৃত্তান্ত কহিল, ইহাতে সুহা উনুনে খানিক নুন—কেননা সে বৈকালিক অর্থাৎ রাত্রের রন্ধনের জন্য প্রস্তুত—দিতেই ঝটিতিই শিখা উদ্ধত, সুহার মুখে, উহার তীব্রতা খেলিয়া উঠে, আর যে যুগপৎ প্রতিধ্বনি শোনা যায় "পুলিশে দেবে? আসুক সে ডাক্‌রা, তার দাড়িতে আমি [illegible]পড়ে ডোল ভেঙে দেব ওঃ পুলিশে দেবে কি এমন কুবেরের সম্পত্তি চুরি করেছে মহা নস[illegible]!" বালিকা এতাদৃশ অসংযত হয়, যে অন্য জ্ঞাতব্য প্রসঙ্গতঃ, না করিয়া বলিল "মদ্দানি [illegible] তোমার পরবারকে যারা—বলগে যা না তান নামে—আসুক সে—" সুহার এরূপ মরদ পাঠান দম্ভ লখাইএর হৃদয়ে অপরিসীম বিশ্বাস আনে, এতক্ষণ বাদে সে চতুর্দিকে খুব সাধারণ চোখে চাহিতেই বল পাইল, সঙ্গে সহিত তখনই আপনকার মায়ের ভাব স্মরণে আসে, কিন্তু তৎসহ ইহাও মনে পড়ে কাহাকেও চিঠি দিতে চাহিয়াছে—সঠিক কাহাকে তাহা ধোঁয়া; এবং সুহার উক্তির জন্য তাহার এরূপ ইচ্ছা হয়, যে সে সুহার হাত ধরিবে, স্থিরও করে; সুহাকে বহুবার ইতিপূর্ব্বে নিজ বিপদে নির্ভীক দেখিয়াছে কত ছেলে মেয়ে তাহার, লখাইএর কারণে, বিছুটির চাবুক খাইয়াছে; এখানেই একমাত্র নির্ভরতা, যেখানে তাহার অভিমান অহং লইয়া খেলিতে কেহই সাহসী হইবে না; তথাপি সে কিছুতেই সাতগাছি এয়োস্ত্রীর চুল চাহিতে পারে নাই; যখন সে তাহার মায়ের নিকট "কি বার" সূত্রে শুধায় তখন—তাহার খানিক আগে হইতেও ঢাকের বাদ্দি, সানাইএর বেপর্দ্দা-টাঁয়ের সহিত, শুনিতেছিল; এই বাজনার কারণ 'বার' জানিতে পারিয়া নির্দ্ধারণে সমর্থ ইহা যে, বট-বিল্ব জোড় গাছের তলে—ইহা পঞ্চানন তলা, এইদিকে দুয়েকটি খড় বাহির হওয়া মধ্যে সামনে হালের পঞ্চানন মূর্ত্তি নীচে কতক দক্ষিণা রায়—একটি মাটিতেই পড়িয়া আর যে, এই সমারোহের পিছনেই অর্থাৎ বৃক্ষের কাণ্ডের আর এক দিকে লাল পোস্টবক্স, এই স্থানেই, মূর্ত্তির সামনে, একটু তফাতে শৈবালী ভর হয়; ইহাও লখাইএর জানা আছে, যে তাহার ভর দেখিতে অনেক লোক আসে, অনেকে অতীব গোপনীয় কামনা জোড় হস্তে নিবেদন করে, শৈবালীর কুৎসা ব্যতিরেকেও কুলটা দুর্নাম থাকিলেও নীচু জাতের সকলেই, দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত লোকের স্বজনের কেহ কেহ তাহার যে সিদ্ধাই আছে—একশো আট এয়োর লাল পেড়ে শাড়ীর আঁচলকাটা তাহার কাছে আছে এবং সে ঐগুলি নিজেই উপবাসী থাকিয়া সংগ্রহ করে—সে সম্পর্কে নিঃসন্দেহ, কেননা ইহা জ্ঞাত যে, আর্ত্তেরা জিজ্ঞাসুরা আর যাহারা পীড়িত তাহারা সর্ব্ববিধ উপকার পাইয়াছে, উহারা সার্থক; এখনও

[illegible] ধমকে ঢাক বাজিয়ে উঠে নাই, এখনও গতি ঢিমা, ক্বচিৎ সানাই, অতএব বুঝায় যে শৈবালী [illegible] ভর হয় নাই এতাবৎ; নিশ্চয়ই এ পর্য্যন্ত সে শুধু বাবাঃ শব্দটি স্বীয় দীর্ঘশ্বাস দ্বারা বেশ কিছুক্ষণ পর পর বলে; শৈবালী এলোচুলে বসিয়া, দুই জানুতে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠা—করস্পর্শ যুক্ত-মুষ্টি বদ্ধ হাত—খানিক অনাবৃত জঙ্ঘা প্রতীয়মান যেখানেই, এখানে ন্যস্ত; চোখ দুইটি বিরাট, ইহাতে অনেকের অন্ধকার; অধুনা চক্ষু নিমীলিত, তেলা গায় মাঝে মধ্যে কিয়ৎক্ষণ স্থায়ী রোমহর্ষ আর যে ইহাতে রমণীর শিথিল অঞ্চল নিমেষেই স্খলিত তৎকালে উহার নিরাভরণ তুমুল বক্ষদ্বয় অপ্রকৃতিস্থ লক্ষ্য হয়, এবম্বিধ ভরের প্রতি বাদকের পলমাত্র ঔৎসুক্য নাই তত্রাচ এখন সুহার সহিত বাক্যালাপ মধ্যেই অচিরাৎ বাজনার তারতম্যে হঠাৎ, তাহারও দেহে, বাদ্যের দ্রুত লয় প্রতিধ্বনিত হয়, উহার কল্পনায় পঞ্চানন তলার ছবি—শৈবালীর উদর ঊর্দ্ধে, গাত্র, শিয়র, ক্রমবর্দ্ধন আবেগে চক্রাকার, ঘুরিতেছে; রমণীর কেশদাম অসংখ্য রুক্ষ বিদ্যুৎ, কিছু কাঁধে খানিক উপস্থিত আঁচল খসা নিটোল বুকে যাহা ইদানীং তাম্রাভ রক্তিম; রমণীর মুখ হইতে কখনও বা জোরে পরক্ষণেই অস্ফুট "বাবাঃ! মাত!" শব্দ নির্গতবান, দর্শনার্থীরা মুহুর্মুহু পঞ্চানন উদ্দেশ্যে ঘোরনাদে জয়ধ্বনি করি উঠে; ঢাকিরা উন্মত্ত পদবিক্ষেপে, সানাইওয়ালা কটি-খেমটাভঙ্গে অর্থাৎ ভয়াবহ নৃত্যের কেয়ারিতে শৈবালীকে পরিক্রমণ ফলে, এতেক নিকট হইতে ঢাকের বিদীর্ণকারী আওয়াজে, সে হতচৈতন্য মাতাল উহাতে এক অনৈসর্গিক বীজগণিতাত্মক সূক্ষ্ম অনুভব, সে জনমানুষের অন্ধকারে নিশ্চিতকে মন্থর করে, এখনও রমণী গভীরে, সে যখন ইত্যাকার সঞ্চালনে দেহ অল্প পশ্চাতে হেলায়-চিৎয়ায় সেক্ষণে বক্ষদেশস্থ গাঢ়-লাল ওতপ্রোত, ঝটিতি উহার—সকণ্ঠ নিশ্চিত সকল লইয়া—উঠিয়া দাঁড়াইবার চরম মুহূর্ত্তটির জন্য প্রত্যেকেই উদ্বেগে আকুল, উন্মুখ! লখাইএর মন বাদ্যের ধ্বনিতে স্পন্দিত, উহার পদদ্বয় ছুটিয়া ঐদিকে যাইতে ক্ষিপ্ত; যদ্যপি সে অবহিত যে কোন উচ্চবর্ণের কেহ, সুহা অবশ্যই, এমনও যে পয়সা-হওয়া সমৃদ্ধিসম্পন্ন নীচু জাত পর্যন্ত ঐ ক্রিয়া, ভর দেখিতে যায় না, ইতিপূর্ব্বে যখনই তাহারা, সুহাও সেও পঞ্চানন তলার পাশ দিয়া গিয়াছে, মঙ্গলবারের ভীড় দেখিয়াছে তখনই সুহার অবজ্ঞা ঘৃণা মিশ্রিত তাচ্ছিল্য উক্তি শুনিয়াছে যে "এ দেখলে লইতে হয়, ম্যাগো দুনিয়ার যত হাড়ি ডোম মুচি মুর্দ্দাফরাস হেলে জেলে মালা অজাত কুজাতের ভীড়...তাই ভদ্দর লোকরা নেহাৎ দায়ে না পড়লে এ পথ মাড়ায় না—" কখনও বা সুহা বলে "বাবা ঠিকই বলেছে শৈবালী পকেটমুখীতন্ত্রে সিদ্ধ;" লখাইএর পক্ষে কোন কিছু মন্তব্য করা সম্ভব নয়, সে কেবল অবাক হইয়া উহার প্রতি অবলোকন করে হয়ত এমত মূঢ়তায় সুহা নির্ঘাত প্রশ্নের সন্ধান পাইয়া থেকে উত্তর দিয়াছে "অমন এক-আধটা লেগে যায় বাবা বলেছে, ঠাকুর বলেছেন, এ সব ঠিক না—" লখাই কৌতূহল বশে, শৈবালীর ভর আলোড়ন, যাইতে থাকাকালীন সুহাকে এড়াইয়া দেখিয়াছে; কখনও বা সুযোগ লাভে বেশ দূর হইতে, সমগ্র ক্রিয়া কলাপও তাহার দ্বারা পরিলক্ষিত হয়; সুহার বিরক্তি মৃদুভাবে তাহার মনে আসে, কিন্তু এই কয়দিনে সুহা ও তাহার মধ্যে চার মাঠ ব্যবধান, সুহা বহু বহু দূরে পিঁড়িতে বসিয়া রাঁধে; উপস্থিত লখাইএর বাদ্যের তালে পদবিক্ষেপ দেখা গেল, সে অন্তরে আপনাকে হঠাৎ কেন যেন শ্লেষযুক্ত বাক্যে বিদ্ধ করিল "এঃ পরের এঁটো খেগো কাঙাল মা বলে আমরা আবার ভদ্দর লোক কিসে পোঁদে ত্যানা জোটে না ওঃ" এবং তাহার ভ্রূ যুগ কপালে; পরমুহূর্ত্তেই সুহাকে না বলিয়া অদৃশ্য; ইদানীং সে খরতর ঘোর ঢক্কানাদের মুষ্টিগত, অপরাহ্ণ সমাগত অথচ তৎকালীন আলো নাই কেননা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, বটতলায় মলিন ধূসরতা প্রতিজনের পায়েই দেহেই বাদ্যের চোরাগতি; শৈবালীকে কেন্দ্র করিয়া অমানুষিক বিক্রমে ঢাকিরা নৃত্য-সহকারে ঘোরে, চরম মুহূর্ত্ত উপস্থিত, কেননা শৈবালী কভু অকথিত যন্ত্রণায় আপন কেশরাশি আকর্ষণ, কখনও তদীয় সুরসুন্দরী-স্তন যে স্তন তারকারাজি প্রকৃতজনের অগোচরে পান করে সেই পীনউন্নত স্তনদ্বয় অতি পৈশাচিক নিষ্ঠুরতায় মর্দ্দন করে, উরুদেশের বস্ত্র অনেকখানি স্খলিত দুই পা'ই অদ্ভুত সংস্থান মানিয়া অল্প বিস্তৃত, কিন্তু সোজা না, ভাঙা অর্থাৎ জানুর কাছে কোণ নির্ম্মিত; এহেন অবস্থা ভেদ করিয়া শৈবালী অতর্কিতে বিদ্যুৎ ক্ষিপ্রতায় চাড়া দিয়া উঠিয়াছে, ইহাতে ঢাক সানাই আর সমবেত কণ্ঠের ডাকাত-উত্তেজনায় স্থান ঘর্ম্মাক্ত, অপার্থিব হুঙ্কারে বোধ শক্তি মানুষের উধাও; এখন, শৈবালীর দুই করে বরাভয় মুদ্রার আদলে ফলে পুটের খানিক কাছেই করদ্বয়—সংখ্যাহীন নিশ্চিত সকল, ইহা সব অপরিমেয় গহনতা হইতে আনীত, সাগরের নীল, গাঢ় সবুজ শ্যাওলা, লবণাক্ত মৎস্যগন্ধ এখনও জড়ান;

একটি ভীত কুকুর ঈদৃশী বিশৃঙ্খলার মধ্যে অচিরাৎ অনুপ্রবিষ্ট, সানাইওয়ালা ক্ষণমাত্র বিভ্রান্ত না হওয়ত. চক্ষু তাহার স্ফীত, প্রচণ্ড পদাঘাত করে, এতেতেও, জীবটির ব্যতিব্যস্তকারী মর্ম্মান্তিক চীৎকার শোনা যায় আর সে উৎপীড়িত হওয়ার তৎক্ষণাৎ ধ্যান মগ্না শৈবালীকে ঠেলিয়া পলাতক—ইহাতে শৈবালী স্পন্দিত নিমেষেই সেখানে, অধুনা যেখানে লোকে পাটের আড়তের সামনে পাশাখেলায় লুপ্ত, তাহারই পাশে যে কাত-করা গো-গাড়ী এখানে একজনা গামছা কোনমতে মুড়ি দিয়া ঘুমে বিকল; লখাই চারিদিকে সন্দেহের চোখে পরিদর্শনের শেষে এবার সেই ঘোর বৈচিত্র্যের প্রতি তাকায়, আপনা হইতে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠা অধরের নিকট আসিয়া পাথর, অবিলম্বেই লক্ষ্য সাপেক্ষ যে, উহার দুই হাত স্কন্ধে তাই বুক চাপা; সম্ভবত, বাদ্যাদি আছে যদিও, তত্রাচ, বৃক্ষতলের চেহারা উহাকে বড়ই গরীব করে, একদা সুহার পর্য্যবেক্ষণ সিদ্ধান্ত খেলিয়া উঠিল যে "যত ছোটলোক অজাত...পা গুলো দেখলেই বোঝা যায় হাড়পেঁকো—" এবং ইহাও, তৎসহ, চমকায় যে, কোন ভদ্রলোক গাছতলার বিগ্রহকে স্বীকার করে না. আর যে আমার পা উহাদের মত না কখনও, সুহাদিদির কথায়, হইবেও না; ইত্যাকার মনোভাবে তাহার স্নায়ু শুধু একদা তীক্ষ্ণ সূঁচ, কিন্তু সে স্থান ত্যাগ করিল না. কখনও শৈবালীকে এবম্প্রকার দেখিয়াছে কিনা স্মরণে নাই—এতাদৃশ পরিবেশ; মেঘলা বেলা, বৃক্ষনিম্নে কুহক ছায়া, বাজনদারদের ভৌতিক উন্মাদনার কেন্দ্রে শৈবালী, উহার দশাসই দেহ শনৈঃ শনৈঃ অগ্র পশ্চাতে চালিত, উহার অর্দ্ধনিমীলিত বিশাল নয়নের বীভৎসা শ্বেতাংশ, কপালে উজ্জ্বল সিন্দূর, সিঁথিতে প্রশস্ত সিন্দূর রেখা, চুলে মুখ ঢাকে ক্ষণেকে সরিয়া যায় বস্ত্র শিথিল এলোমোলো, উহার সমস্ত কিছুতেই রহস্য—এ কারণ ইদানীংকার পঞ্চাননতলার সমগ্রতাকে অশরীরী উৎকট তন্মাত্রা বিবর্ণ করিয়াছে, শুদ্ধ স্বর নামধেয় কিছুই যেন ত্রিভুবনে নাই, প্রতি কণায় তৎপরিবর্ত্তে ভ্রূকুটি; লখাই দেখিল পর পর আতঙ্কিত চক্ষুসমুদয় ও নিজে অনুভবে জানে যে আপনকার কণ্ঠে একটি 'অগ' ধ্বনি আটকাইয়া আছে—ঐ ধ্বনি শৈবালী মাটি ছাড়িয়া ঝটিতি উঠিবার সঙ্গেই হয়; যখন লখাই, স্থবির পঞ্চানন প্রতিমূর্ত্তির কিয়দংশ, মুখের খানিকও একটি বৃহৎ চক্ষু এবং সম্মুখে সদ্যউত্থিত মন্থরে সঞ্চালিত উহাকে অকস্মাৎ দেখে, তখনই 'অগ' শব্দ কণ্ঠে ঘটিয়া উঠে, এযাবৎ ইহাতে জিহ্বা আড়ষ্ট, অধর খানিক বিস্রস্ত; এ হেন তাণ্ডবতা ভেদ করত অদূরে যে রোগী ধর্ণা দিয়া আছে যাহার বস্ত্র অসংযত তাই চর্মরোগদুষ্ট কয়লা নিতম্ব প্রকাশিত; তাহারই যন্ত্রণার আওয়াজ শোনা যায়, এখন, লখাই, আপনকার জড়ত্বে পূর্ণ দৃষ্টিতে অনৈসর্গিক রমণীকে প্রত্যক্ষ করিল—আকাশ এখন তাহার ঘোড়া, মানুষের উষ্ণ নিঃশ্বাসে সে চুল শুকায়, তাহাকে লখাই যেন পান করিতেছিল, দেখিতেই সম্মোহিত একদা অস্ফুট স্বরে বলিয়াছে যে আমি লখাই জল আলোড়ন আরার করিতে পারিব ও যুগপৎ শোনা যায় "আমার আত্মা কষ্ট পাবে ত পাবে" ক্রমে সে শৈবালীতে এক অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত অলৌকিক এয়ো-স্ত্রীর সন্ধান পায় এবং বুঝে, বিশ্বাস হয়, যেহেতু গুহ্যতম অজস্র নিশ্চিত উহার সর্ব্বগঠনে, যে এই তুফান রমণীর এয়ো-স্ত্রীর সাত গাছি চুল অব্যর্থ রক্ষা কবচ, আশ্চর্য্য সে বয়সীর ন্যায়. বাম হাতের তালুতে একটি ছোট পৃথিবী দিয়া একটি প্রচণ্ড ঘুষি মারিল আর যে তখনই বাদ্যের শেষ তেহাই পড়ে; অনন্তর হাড়সার স্তব্ধতার সূচনা হইতে, কিছু স্বরভঙ্গ গলার কথা, পীড়িত ব্যক্তির কাতরতার ঊর্দ্ধে, পরী বেদেনীর কণ্ঠের কোমল ধৈবত উৎসারিত হইল "মা মনসারে" এখন সে হাতে ত্বরিতেই পুত্তলীকা পরে, দুই হাতে দুইখানি আহ্লাদী গরবিনী প্রতিচ্ছবি, কখনও যাহারা সখী, হঠাৎ পরিবর্ত্তনে উহারাই সতীন; এবার রসচটুল সুরে গাহে "ভাল খেঁদি লাচবি নাকি রসের নাগরিয়া ভাল খেঁদি লাচবি নাকি রসের বিনোদিয়া..." এবম্বিধ কাহারবায় অন্য প্রকারের ভাব আনয়নে সাধ্য হয় নাই, প্রত্যেকেই শৈবালীর নিকটে যাইবার ব্যগ্রতা লইয়া পরী বেদেনীর খেল্‌কলাপ অবলোকনে থ, চলচ্ছক্তি রহিত, কেননা পরী বেদেনী দুই ছত্র নিয়ম বশে, গাহিয়াই পুত্তলীকা খুলিতে সময় নিজেই কহিল, "ওগো তোমাদের গরজ বুঝি নাকি...আমি নূতন সাপটা যেটা ধরলুম বিল থেকে...সেটা দেখাব এখানে পঞ্চাননও আছেন...মনসার অংশ এখন..." এখন সে ঝাঁপিতে ঠোকা চাপড় দিল, ইত্যাকার আঘাতে ফুঁসিয়া উঠার রুষ্ট আওয়াজ ঝাঁপি হইতে আসে; জন সমাবেশ কেমন যেন উদ্বিগ্ন তটস্থ, ইদানীং ঝাঁপি খুলিতেই ঘোর তৈলাক্ত কুটিল কৃষ্ণ কজ্জ্বল বৃত্ত পরম্পরা দেখা গেল, সর্প অতর্কিতে দম্ভভরে জাগ্রত. ফণা করিয়া দুরাধর্ষ ভয়াল; তথাপি, উপস্থিত একটি বৃদ্ধা, অজস্র রেখাযুক্ত মুখমণ্ডল, তুলিয়া প্রশ্ন করিল, "সে কি নষ্ট দুষ্ট", শৈবালী তেমনি চালিত ঘুম কণ্ঠে ধ্বনিত হইল "কে?" ইহাতে লখাই একাগ্র.

ঢাকের নিবেদনে, অপ্রকৃতিস্থ শৈবালীর আর্ত্তনাদ শোনা যায় "আঃ ইঃ প্রদর বড় জ্বালা...পুকুর পুকুর ভাসবে সে... শুতে চায় না...ধান উঠে যাবে...খোয়াবে সাপের ছোবল—মরদানা পেট হবে—" লখাই, এই বোধ হয় প্রথম, 'পেট-হবে' শুনিয়া হাসিতে পারে নাই, কেননা প্রদর কি—ভাবিতে উহার ভ্রূ কুঞ্চিত. অন্যত্রে সাপের বর্ত্তমানতা আর পরী বেদেনীর গীত আবৃত্তি তাহাকে চেনার মধ্যেই রাখে, এখনও হয়ত; কিন্তু বাক্যটিকে মুখস্থের পূর্ব্বাহ্নে কতক শব্দ দেহ অভ্যন্তরে অনুরণিত যে, "ধ্যাষ্টা মাগী, তুমি শুওরের সঙ্গে নষ্ট—এসেছ মারণ...উচাটন নিতে—" ঈদৃশী বক্তব্যে শৈবালী ঈষৎ অধিক কম্পিত. উক্ত ভর্ৎসনা শুনিবামাত্রই প্রশ্নকারিণী ছিন্ন অঞ্চলখানি মুখেতে, টানিয়া, অন্তর্হিত: আবার উত্থিত হইল, "সন্দব (সৈন্ধব) লুনে কপাল পোড়া মাগী ঠিক থাকবে, এখন উঠতি-গোঁফ দেখে...উরুৎ কাঁড়ি—থাকবে না ঘরে থাকবে না...মাগীর গায় বাতাস লেগেছে", আবার শোনা গেল "কাশী হবে না হওয়া—" লখাই নির্ণিমেষে শৈবালীর উত্তমাঙ্গের প্রতি চাহিয়া আছে, উহার চোখের ভীতিপ্রদ শ্বেতাংশ পরিদৃশ্যমান, এবং তখন পুনরায় ঢাকের আওয়াজ শোনে, ঢেঁড়া-দেওয়া যেমন বা, আর সেই সঙ্গে তার যা সদ্‌ধি দাও...সাত কান, এখানকার কথা করেছ কি তিন দিনে গলা দিয়ে রক্ত উঠে মরবে...মরবে...মরবে—" ঘোষণা ঢাকিই করিয়াই নিশ্চিন্ত মনে বিড়িতে ফুঁকো টানে নিবিষ্ট; এদিকে পরী বেদেনীর আপন মনে সাপ-খেলান, প্রায়ই দীঘল ঘোমটা রমণীগণের, ছিন্ন বস্ত্র হেতু যাহাদের, তাই হয় কেশ রাশি, হয় একটি কান, হয় অধর, হয় নাসিকার মুণ্ডারী গহ্বর, নয় একটি চোখ, ওতপ্রোত ও ভিক্ষাশায় সমস্ত স্থান পচিতেছে, প্রতি কথার জবাব, যথারীতি অর্থ লখাইএর করা নিশ্চিত অসম্ভব, তবে মাগী, নষ্ট, থাকবে না, পেট হবে, ভেসে যাবে—" এতাদৃশ শব্দগুলি সুহাদিদি শুনিলেই ক্ষিপ্ত হয়, তাহা বালকের স্মরণে ছিল, তবু অধুনা তাহার মনে হয় যোহন একাদশীর বউএর শালীনতাহীন ভঙ্গে, বেহারীর পাছা ডেও পিঁপড়ের মত ছিল, জলকে যাওয়ার কথা, আর যে সুহার শিক্ষায় তদ্দৃষ্টে তাহারও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়াছে, এখন মননে সে চমকায়; কোন কিছু ধ্রুব সিদ্ধান্তে, সত্যই সে উপনীত হয় নাই অর্থাৎ প্রবাদের সাক্ষাৎ ঘটে নাই, একান্তে সর্প—জগতের অন্তিম রেখা, অন্যধারে শৈবালীর স্পন্দিত স্নেহের চোখের শ্বেতাংশ, উজর সিন্দূর বিন্দু—উড়ন্ত কেশরাশি, পিছন হইতে ধূমপানের বকাটে কুণ্ডলী, ইতিমধ্যে সে, যাহার বালক শরীরে রতিমতি পৃথিবীর লালসার বিশ্বাসঘাতকতার ক্লেদযুক্ত প্রতিধ্বনি, এবার সে শুনিল—অবগুণ্ঠিত মুখমণ্ডলের একটি উৎকীর্ণ কান যাহার প্রকাশমান, উহার প্রশ্নে—"মেয়েমানুষ অধরা জীব...জেন মেয়েছেলে গরু, ঘাস সব এক ঠাঁই...একো দেখলেই জিব ঝুলবে...চূর্ণীভূষী সব ঠাঁই...একো একো...দেখলেই বাড়ীর বার...খচ্চড়ামি ছাড়—" পরক্ষণেই ইহার সহিত ঢাকে কাঠি পড়িল, লখাই বুঝে এক অজানিত মেঘ গর্জ্জনে তাহার শিরা সমুদয় স্ফীত, তথাপি বিস্ময়! ইহাও বুঝে, প্রতিবারই বিস্ময়ের অবশেষে, বুদ্ধি সম্ভবত, কি যেন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে; তথাপি অনাচারী বিভ্রান্তিতে সে কুক্ষিগত, কিন্তু তৎকালে এমত ধারণা হয় যে সে অনেক অনেক লম্বা, এবং এতৎসত্ত্বেও আপন বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠা চুষিতে থাকে; এতাবৎ ফুল আর ফল, চৌর্য্যবৃত্তিই তাহার ভাবনা, কিন্তু বিশ্রী এবম্প্রকার কথাবার্ত্তায় সে বাঁকিয়া ওঠে; ইহা যেন আর রকমের ঘাট, নির্ব্বিবাদে যেখানে সকল অসভ্য আলাপ হওয়াই রীতি, উহার মনে হয় কেন কি জানি গাত্রময় পাঁচড়া, এবং সে পিছু ফিরিয়া দেখে, দেখে দুজন মাঝবয়সী লোক অল্প দূরে মাঠ কড়াই খাইতেছে, মাঠ কড়াই (চীনে বাদাম) ভাঙার শব্দও তাহার নিকট অদ্ভুত সঙ্কেতপূর্ণ; ইতিমধ্যেও সে ঈষৎ নিজ চক্ষুর্দ্বয় আয়ত করে, নির্ঘাত এই হেতু যে, ঢাকিরা যে ক্ষেত্রে ঐখান হইতে বেশ দূরে, এ কারণ যে মেয়েছেলেরা যাহাতে সহজ হয়, ইহাদের উপস্থিতি হঠাৎ কথাবার্ত্তা শোনার লপ্তের মধ্যে কেন, নিশ্চয়ই লখাই উহাদের সন্দেহের দৃষ্টিতে বুঝিতে চেষ্টা পায়, এমন হইতে পারে, যদিও গমনোদ্যত, তবু তদীয় আগ্রহ ঔৎসুক্য তাহার নিজ গোপনতা উহাদের দ্বারা বিনষ্ট মনে হয়, এখন সে তীক্ষ্ণ নজরে তাহাদের প্রতি তাকাইল, উহারা কেহ পরিচিত নহে দেখে, অনন্তর চারিদিকে পর্য্যবেক্ষণ করিতেই সে স্থির—শৈবালীর পাশেই খানিক লাল জ্বলিয়া উঠিল, ইহা, অদূরে বৃক্ষ সংলগ্ন পোস্ট বাক্সের দরুণ লাল উহা, নিমেষেই বালক পরাস্ত, উহার কাঁধেই কাহারা বৃক্ষ রোপণে ইদানীং শশব্যস্ত; অথচ সম্মুখে অপার্থিব এয়োস্ত্রী, যে বহুতর নিশ্চিত সকল. অন্ধকার মন্থনে, অনাগত সূর্য্য উদ্ভাসিত দিন সকল, আনিয়াছে, তাহাকে ছাড়িয়া যাইবার জোর নিশ্চিহ্ন; অথবা সে মরিয়া দুর্নিমিত্তকে সে ভয় পায় না, একদা মনে জাগে, 'মেয়েছেলে গরু' ক্রমে এই সূত্রে

তাহাকে জগতের স্বভাব অবশ্যই বিমর্ষ করে, অচিরাৎ সে শোনে "ছুকড়ী মেয়ের চোখের ভাষা কৈ" শৈবালী ঈষৎ স্মিত হাস্যে ইহাতে যোগ দেয় "পুরুষ মানুষ বিট খচ্চড়া, কোর্ট রাঢ় খোর; তবে জামাই রাঢ় কপালে নয়, ছুকড়ী মেয়ে চোখের ভাব না হলে বশ বাঁধন হবে কি করে" অবশেষে আর এক জিজ্ঞাসায় নির্ঘোষ হয় "সানকি খাট ছেড়ে গলা জলে তিন পা উত্তরে" ইত্যাকার দুইটি জবাব লখাইকে স্বস্তি দেয়—বিশেষত প্রথমটির 'ছুকড়ী মেয়ের চোখের ভাষা' পদটির ছন্দ, অন্য নহে, তাহাকে আন্দোলিত করে—এবং তাই হয়ত স্মরণ হয় যে সে কেন এখানে আসিয়াছে, ঝটিতি সে দেখিল শৈবালীর খুব সে কাছে, হাওয়ায় যাহার বসন উড়ে আর ইহাতে তাহার শৈবালীর পাহাড়ী উরু বিকশিত, উর্দ্ধে চোখের শ্বেতাংশ, বালক ধীরে প্রশ্ন করিল "আমার কি সব্বনাশ...মানে খারাপ মানে মানে—" শৈবালী হেলিয়া যায় এবার তাহার মীমাংসা শোনা গেল না, বরং প্রতিধ্বনি হয় "মানে, মাটির না মেঘের না মনের—" লখাই এতাদৃশ বাক্যের কোন খেই পায় নাই, ফলে ঝোঁকে কহিল "আমায় শাসায় একটা লোক—" এরূপ প্রশ্ন করিতে পারার কারণে তাহার অবশ্যই আত্মবিশ্বাস জন্মে, তত্রাচ পরক্ষণেই, কথার অন্তে, অন্যত্রে চাহিতেই সে এক দৃশ্য হিম, হৃদপিণ্ড কাঁপিয়া উঠিল, সে মাটির দিকে তাকায় শৈবালীর পায়ের সামনে অনেক পয়সা, ঝিঙে বেগুন ইত্যাদি এবং সেখান হইতে, দৃঢ় হওয়ত তেজে মুখখানি তুলিয়া ইতঃপূর্ব্বের ভয়াল দৃশ্য অর্থাৎ যোহন একাদশীকে নির্ভীক ভাবে পূর্ণ দৃষ্টিতে দেখিতে কঠিন স্বরে পুনঃ জিজ্ঞাসা করে, "একটা লোক আমায় শাসায়" ইহার মধ্যে লখাই ধ্রুব আপনার আপৎকালকে দুরপনেয় চিত্তে আহ্বানে দশাসই; শৈবালীর ব্যবস্থা "আমি মাদুলী দেব" উহার কানে পৌঁছায় নাই, সাতগাছি চুল চাওয়ার সঙ্কল্প জলের দাগ, সে মাটিতে পা চাপিয়া দম্ভে তখনও দাঁড়াইয়া; যোহন একাদশী চিঠির বাক্স এ পর্য্যন্ত না খুলিয়া উহার তালাটি এক হাতে নাড়িতেছিল, আপন কর্ত্তব্য ভুলিয়াছে; সে যে এইভাবে কি অবলোকনে বিভোর তাহা বিষয়ে নিশ্চয়ই চেতনা নাই, উহার সমক্ষে ডাগর শৈবালীর আলুলায়িত কেশ উড়ার মধ্যে আজানু স্পর্শের ব্যতিক্রমে, উলঙ্গ স্কন্ধধৃত হস্ত, বালক, দুঃসাহসে বজ্র; যোহন একাদশী একদা আপনার দাড়িমুখ উপরে তুলিতে প্রয়াস পায়, নিমেষেই গাহিতে থাকে 'উড়াও বিজয় পতাকা', আর যে তালা খুলিয়া চিঠি সংগ্রহে মনোনিবেশ করে; লখাই এখন কেন যেন এদিকে অন্যদিকে দৃষ্টিপাতে চঞ্চল, সে সাপটি যে কোথায় প্রত্যক্ষ মানসে চাহিল; পুনরায় শৈবালীর নোংরা উক্তির টুকরা তাহার মধ্যে কূট সন্দেহের, পরোক্ষভাবেই, ধোঁয়া আনে, অথচ এ সময় শৈবালীর বিবিধ ঔষধ দানের কণ্ঠই শোনা যায়; সন্দেহ বিকারে লখাই মেঘলা আলোয় শষ্প বিস্তৃতি দর্শনে আশ্চর্য্য ছোট একটি নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল, অবিলম্বেই সে এই স্থান হইতে দৌড়ায়; যোহন একাদশীর, তাহা নিরীক্ষণে, চোওয়াল নড়িয়া উঠে; চিঠি সংগ্রহের পর সে ধীর পদক্ষেপে অনেকখানি পথ অতিক্রম অন্তে দেখিল, বিরাট পুকুরের পার্শ্বস্থিত রাস্তার তাল গাছে হেলান দিয়া কেহ আড় হইয়া আছে, ফলে তাহার ভ্রূযুগল নাচিয়া কুঞ্চিত, ঝটিতিই গণিল উহা লখাই, এবং ঈদৃশী জাত সুযোগে যোহন একাদশী দুষ্ট খুসীতে অতিষ্ঠ, কিন্তু কেমন যেমন তাহার ধন্ধা লাগিল, এ কারণ যে লখাই কিঞ্চিন্মাত্র বিচলিত নহে, সে নির্ভাবনায় তখনও, যদিও সে বৃদ্ধকে দেখে; আর যে বালক সঠিক দাঁড়াইবার উদ্দেশ্যে শিয়রের ভরে ধনুকের মত বক্র হওয়ত পলকেই সটান সোজা, হইতেই যোহন একাদশী ত্বরিতে দৌড়ে অগ্রসর খানিক, ও এখনও নির্ব্বোধ, কেননা লখাই পলায়ন উদ্যত নহে, বরং সে বয়সীর ন্যায় স্বীয় কোমরে হস্ত রাখিয়া দর্পে ঘোষণা করিল "আমার আত্মা কষ্ট পাবেত পাবে" যোহন একাদশী রাগে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য, হুঙ্কার দিয়া উঠিল "শয়তান মাগীটার ঠেঙে আমার মারণ উচাটন নিতে যাওয়া—হারামী শালা চোর—শালা বামুনের ঔরসে...শালা গাল চমকির ছেলে—" এ সকল কটু পৌরুষ বাক্য বলিতে ক্ষণে ভয়ঙ্কর ভাবে লখাইএর অভিমুখে যায়, অথচ ইত্যাকার সময়ও নিজের সম্পর্কে আশ্চর্য্য সচেতন যে ঘাড় ফিরাইয়া নানা স্থানে লক্ষ্য করে, কেননা সাপে ব্যাঙ ধরার মর্ম্মান্তিক আর্ত্তনাদ আসিতেছিল, বালকের সামনে দাঁড়াইয়াই "হ্যা" শব্দে সমগ্র চরাচরকে তটস্থ ইচ্ছায় সে অধীর, উহার প্রতিধ্বনিতে হাজার ব্যাঙের ডাক সহ মর্ম্মান্তিক চীৎকার শ্রুত হইল; বালক নির্ব্বিকার ইহার অধরে বিদ্রূপের হাস্য এখন হঠাৎ ইলসেগুঁড়ি বৃষ্টি হয়, সে ভিজে; যোহন একাদশী আক্রোশে ক্ষিপ্ত প্রচণ্ড এক এক চড় মারিতেই লখাই ছিটকাইয়া পড়ে, আর যোহন একাদশী গর্জ্জনে পশু, বালক উঠিয়া স্থির চোখে জল নাই দেখিয়া বৃদ্ধ অপ্রকৃতিস্থ, ক্রমাগত মারিতে থাকিয়া বলিতেছিল "বল

[illegible]—আমার আত্মা কষ্ট পাবেত পাবে, কেমন বাপের বেটা শালা" এক ঝটিতি ব্যাগটি ছাড়িয়া লখাই তুলিয়া মাটিতে আছাড় মারিতে গিয়া পাশের জলভরা পুকুরে নিক্ষেপ করিয়া, বলিল "শালা শয়তান হারামী একবার আমার নাম ধরে ডেকে দেখ...গর্ভচ্ছরাব" লখাই আচমকা কিয়ৎ পরিমাণে জল খাইয়া এখন ভাসমান, এতাবৎ সে—চড় দেখামাত্রই যে আকাশ বিদীর্ণ করে—নীরবে, এতটুকু ধৈর্য্যচ্যুতি নাই, যোহন একাদশীর পৈশাচিক উৎপীড়ন সহিয়াছে, ইদানীং তদীয় চোখ ছাপাইয়া জল আসিল, ক্ষোভে বক্ষদেশ কম্পিত, বিবর্ণ ওষ্ঠ অপমানে বিকল, বহু কষ্টে অভিসম্পাতের কথা যোগাইল "সব তোলা যাবে..." তখনই যোহন একাদশী হাঁফাইতে থাকিয়া ক্ষিপ্ত আওয়াজে জানিতে চাহে "কি বল্লি" যেহেতু তাহার বিশ্বাস হয় যে লখাই নির্ঘাত গাল দেয়, অথচ, ইহা সত্য যে এখনও অসংযত খারাপ কথা বলার কোন মনোবৃত্তির চিহ্ন তাহাতে নাই; আপন অসহায়তা, যে সে দুর্ব্বল, প্রতিরোধ ক্ষমতাহীন বোধে এখনও সে প্রকৃতিস্থ, ভদ্র এখনও, সে নিস্তেজ; বৃদ্ধ আরও কহিল "শালা আমার পেছনে শৈবালীকে [illegible]...মারণ উচাটন... আমার স্যাট করবে শৈবালী... আমি বলে হর রোববার গীর্জ্জে যাই..." ইহার পর, ক্রন্দনরত লখাই একটি শালুকদণ্ড ধারণে বারেক জলস্তরে থাকিয়া পলকেই উহা ছাড়িয়া শুধুমাত্র পদদ্বয় ধাবাইয়া ভাসিয়া সিক্ত অঙ্গুলি মটকাইতে অভিশাপ দিল "এর বিচার হবে...এর বিচার হবে...এর বিচার হবেই" ইতঃমধ্যে তিনবার অঙ্গুলি মটকানর শব্দ স্ফুটমান, অবিলম্বেই যোহন একাদশী নিদারুণ তাচ্ছিল্যে "হাঃ হাঃ" শুষ্কধ্বনিতে আত্মম্ভরি হাস্যের লহরা খেলাইয়া উত্তর করিল "হো গা ত হোগা বিচার ত হাম চাহেতা হায়..." এবম্বিধ উক্তিতে লখাই মূঢ়মতি না, তদ্রূপ হলফ, নিঃসঙ্কোচ ঘোষণা উহার বিদিত, এতদ্ব্যতীত জানে সুহাদিদি অনেকবারই খেদ করিয়াছে যে "বাবাই ত ওর সব্বনাশ করলে...ছিল মানুষের মত...কি মতি হল...কি এক মনগড়া ভুজুং দিলে...ব্যাস—বিচার-টিচার—" একারণ, অবশ্য, অক্ষয় মাস্টারকে বস্তুত দোষ দেওয়া যায় না, তখন তাহার গা জ্বরে পুড়িয়া যাইতেছিল, এমত সময় "মাস্টার মাস্টারবাবু—মাস্টারমশাই—" অক্ষয় মাস্টার কোন মতে, কপালের জলপটিতে হাত দিয়া, খানিক উঠিয়া স্থির, জবাব দিল "কে য়া" পরক্ষণেই কড়ানাড়া শব্দ অদ্ভুত সঙ্কেত ক্রমে শব্দ! যোহন একাদশী দরজার সম্মুখে অবশ, এযাবৎ বিমর্ষ মুখমণ্ডল, কড়ার শব্দে দরজার অদৃষ্টপূর্ব্ব বিস্ময়কর চেহারায়, অনুভবে—ইহার সহিত বিদ্যুতের এক গভীর মধুর সম্পর্ক বর্ত্তমানতায়, অধুনা ম্লান; দরজায়-আঘাত—করিবার ছবি কোথায় সে দেখিয়াছে, ভাবনায় উচকিত, হয়ত ঈদৃশী আওয়াজে ছেলেবেলীয় মমত্ব প্রবণতার ইঙ্গিত ছিল, তবু একদা সে কড়া ছুঁইতে দরজা স্পর্শ করিতেই হাত খানিক চমকেই ফিরিয়া আসে আর যে সে আতঙ্কিত, আড়ষ্ট জিহ্বায় সাড়া দিয়াছে "আঁজ্ঞি আমি গো—যোহন একাদশী" কক্ষ মধ্যে অক্ষয় মাস্টার নিদ্রিতা সুহার দিকে একবার তাকায়, কিন্তু পরিশ্রান্ত কন্যাকে তাহার বিরক্ত করিতে ইচ্ছা হয় না, কপালের পটিতে হাত রাখিয়া কম্বলটিতে গা যথাসম্ভব ঢাকিয়া নামিল, দরজা অল্প খুলিতেই দেখে যে যোহন একাদশীর ঊর্দ্ধাঙ্গ সামনের দিকে আনত ও তদবস্থায় উহার শিয়র ঘুরিয়া পশ্চাৎ অভিমুখে এবং মাঝে মধ্যে, হয়ত আত্মরক্ষা জন্য ঝটিতি দেহ অধিক বক্র অতঃপর উন্নীত হয়, তদ্দৃষ্টে হতবাক অক্ষয় মাস্টার উহার প্রতি জ্বর কম্পনেও নিষ্পলকে চাহিয়া বিবশ, কক্ষস্থিত আলোর ছটা বৃদ্ধের মুখের কোথাও, গায়ের কোথাও পড়াতে সে কূট ধাঁধা আচম্বিতে ভয়ঙ্কর; অধুনা যোহন একাদশী অক্ষয় মাস্টারের দিকে কাতর নয়নে তাকাইয়া ও তৎকালেই নিজ অঙ্গুলির দ্বারা পিছনে নির্দ্দেশে, ফিস্‌ফিস্ গলায় কহিল "ঐ যে ঐ...শুনতে পাচ্ছ—পাচ্ছ" এই ব্যক্ত করিয়া সে মূক, অতীব উৎকণ্ঠায় কান খাড়া, কি যেমন শুনিতে পায়! ঈষৎ মুখভঙ্গিও তাহাতে সুস্পষ্ট, এবং ধীরে, হয়, মহাশান্তিতে ক্ষণেক চক্ষুর্দ্বয় তাহার মুদ্রিত হইল সম্ভবত, প্রগাঢ় ঘুমে অচেতন সুহাসিনীর অবিরাম নিঃশ্বাস উহার গোচরীভূত, এমত সূত্রে নিশ্চিত এই জিজ্ঞাসা আসে, আধুনিক কালে মানুষে কি সত্যিই ঘুমায়—যদি একান্তই, তাহা হইলে কোন বিশ্বাসে! এখন হঠাৎ বৃদ্ধ পুনঃ চমকাইয়া বলিল "ঐ যে মাস্টারবাবু কত লোক কত কইছে—পাচ্ছ শুনতে—" অবশেষে আহত চোখদুটি তুলিয়া দৃষ্টিপাত করে, মনে হয় সে অলৌকিক অভিজ্ঞতায় উপদ্রুত, কাহিল, মনে হয় লবণাক্ত জলরাশি সন্তরণে সে বাঁকা, মনে হয়—উহার পশ্চাতে ভয়াবহ ধূধূ যাহা কোনদিন হাঁসিল হইবে না, জনপদও হইবে না—উহার পশ্চাতে বিষাদময়ী তরঙ্গায়িত নীল প্রহেলিকা যাহা কোনদিন মানুষের দায়িত্ব লইবে না, আরবার সঙ্কেতে নিম্নকণ্ঠে জানাইল "সবাই আমার পিছনে পিছনে এসেছে, এরা কি আমার পিছু ছাড়বে না—

'তুমি ভূত বিশ্বাস কর—ঐ দেখ—" অক্ষয় মাস্টার জলপটিটা অতি সন্তর্পণে লইয়া, কঠিন অন্ধকার দর্শনে চুপ, যদিও বুঝে, যোহন একাদশীর মুখ নিঃসৃত গন্ধে যে সে মদ খাইয়াছে, কিছু রূঢ় বলিতে তাহার মায়া হয় এ কারণে যে বিগত তরশুদিন রাত দুইটা হইতে আপন স্ত্রীর অপেক্ষায় সেদিন সারাটাই—রাত, পরশুদিন রাত, গতকালও একইভাবে কাটিয়াছে—বউটি ফিরিয়া আসে নাই নিশ্চয়ই উধাও হইয়াছে; যোহন একাদশী ক্রোধে যে ঢালাই করা কড়াটি চারআনা দিয়া তরশু দিন কিনিয়া আনে, কেননা তাহার বউ বলিয়াছিল, "এক কড়া কিনে দাও তোমায় মনের মত করে চচ্চড়ি রেঁধে খাওয়াই"—শুধু সেই কড়াটিকে অপয়া বোধে ভাঙ্গিয়াছে; তাই অক্ষয় মাস্টারের কিছু বলিতে মন সরিতেছিল না, বেচারীর দুর্দ্দশা অবলোকনে জ্বর কম্পিত স্বরে সস্নেহে অনুনয় করে "ও কিছু নয় পাখী টাখী ডাকছে—যোহন একাদশী তুমি বরং বাড়ী গিয়ে ঘুমোও—" এতাদৃশ উক্তিতে যোহন একাদশী সোজা হইয়া ঝটিতি লাফে অল্প দূরে থাকিয়া হাত নাড়াইয়া কহিল "না না উ কথাটি বল না—ওদের জন্যেই ঘর ছেড়ে এলাম—" চারিদিক থেকে লাইনকে লাইন কথা—রকমারি গলায়—এখানেও ধাওয়া করেছে—" সত্যই তাহার ঘরেই এ ব্যাপারের সুরু, সে যখনই দরজা খুলিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়াছে অমনি কিশোর কণ্ঠের আওয়াজ "ভূষণের পা ধরিয়া তাহার কাছ হইতে এই জায়গাটুকু পাইয়াছি—বাবা আমাদের বড় কষ্ট, মা বাবুদের বাড়ী রান্নার কাজ এত কষ্টেও লয় নাই, তুমি একবার এসো" এ সকল কথা শ্রবণে যোহন একাদশী আশ্চর্য্যান্বিত, এ যেমন চিঠিটির কিয়দংশ! আর সে শব্দ নিচয় মিলাইতেই আবার "চিঠি লিখিবার মতও আমার সঙ্গতি নাই, আর কিছুদিন ফণীকে থাকিতে দেন...আপনাদের ঋণ কখনই শোধ হইবার নহে...তাহার পরীক্ষার মুখ চাহিয়া এ কথা বলা...আমরা আপনাদের দাস হইয়া..." এহেন বেদনাযুক্ত স্বর যোহন একাদশীকে শুষ্ক করে এমত সময়ে আরও করুণ আওয়াজ চালের উপর হইতে আসিল "সে তোমার ভাই...ধনীর ঘরে পড়ে মা সত্যি কি তুমি ভুলেছ...তাহার মৃত্যু অবধারিত" পরক্ষণেই "শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়—শ্রীচরণেষু দাদা...মা আর কদিন তীর্থ যদি না যান—" আবার অন্যত্র হইতে শোনা গেল, "ঈজধান অনেক হাজা..." পরক্ষণেই ঘরময় লোবাঙ্গের গন্ধে ভরিয়া গেল "আল্লাহ মঙ্গলময়, বাজান বাজান আমার আর দিন, আমার নাই—তোমাকে দেখিতে সাধ হয়...বড় সাধ—" যোহন একাদশীর নেশার ঘোর, যাহার জন্য মুখে জল পর্য্যন্ত দেয় নাই, তাহা বুঝি কাটিয়া যায়, অনেক কষ্টে দেহ সঞ্চালনে ঐ সকল বাক্যনিচয় ঘাড় হইতে যেন ফেলিয়া দিবার চেষ্টা করে, অধুনা সে একটি ঢোক অপসারণের পর, বলিয়া উঠে "তোমাদের আমি কি করেছি...তোমরা কি পেয়েছ আমাকে...তোমাদের গলা এত কাঁদ কাঁদ কেন" ইহার উত্তরে ধ্বনিত হইল "আতর দাসী চ্যালেঞ্জ শিল্ড...এবার নিতেই হইবে শীঘ্র আইস—" অতঃপর "আমাদের বংশ সবাই জানে...আমার কন্যা সুন্দরী...পণ নিশ্চয়ই দিব" এতাদৃশ অহঙ্কারকে পুনরায় কাতর প্রার্থনা বাধা দেয় "ভগবান আপনার পূর্ণকে শীঘ্রই সুস্থ সবল করিয়া দিন, এই আশা" সঙ্গে সঙ্গে "বড়মামাবাবু আমার বড় জামাইএর একটা কাজ..." পূর্ব্বোক্ত মেয়েলী গলাকে ছাপাইয়া আবৃত্তি হইল "জয় পরাজয় আছে ভাঙ্গিয়া পড়িলে চলিবে না, ভগবান আছেন, দেশই ধ্যান জ্ঞান...বল বীর চির উন্নত মম শির" কিছুক্ষণ পরেই স্ফুটমান হয় "রাজরোষ যে কি তাহা আমাদের পরিবারের মত কেহ বুঝে নাই তোমার দাদা আজ দ্বীপান্তরে, তুমি বৃথা সময় নষ্ট করিও না বি. সি-এস দাও" ইহার পর "তুমি অষ্টম গর্ভের সন্তান, অনেক আশা সত্বর এম. এর জন্য প্রস্তুত হও—" আবার "বাবার বড় ইচ্ছা ছিল আমাদের মধ্যে কেউ তাঁহার আত্মার সদগতি নিমিত্ত "গয়া ধামে পিণ্ডদান" ইহার অন্তে মহা নিখোঁজ হইতে সূত্রপাত হইল "আমি বড় অভাগিনী, তুমি যে তুমি—স্ত্রীলোকের ইহকাল পরকাল একমাত্র গতি থাকিয়াও নাই—বড় লাঞ্ছনা বড় অত্যাচার, ইচ্ছা হয় সরযূর মত কেরাসিন দিই" যোহন একাদশী এহেন ক্ষোভজনিত বচন কানে পৌঁছাইতেই কহিল "না না—আমার দিব্বি না—" এবং বলা শেষ করার তখনই বৃদ্ধের কণ্ঠশোষ আরম্ভ হইল; কেননা অল্পবয়সী মেয়ের অভিমান ঘরময় ঘনাইল, "বেশ তোমার যা ইচ্ছা হয় তাহাই করিও, বাধা দিতেও চাহিনা, ভগবানকে নিশ্চয় আমি ডাকি...সম্পর্ক এক জনমের নহে মনে রাখিও...তুমি বিবাহ করিয়া সুখী হও...সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি—" এবম্বিধ মনোভাবে অন্যজনা সাহস পাইয়া কহিল "মনে রেখ শিব পূজা আমার বৃথা হইবে না... আজ নয় কাল কিম্বা পরজন্মে" তখনই একটি যুবক বলিল "জানি তোমরা শহরে মানুষ গ্রামাঞ্চলে ভাল লাগে না, তোমাদের বাড়ী

করিয়া লেখাপড়া করা আমি চাই না, গ্রীষ্মের ছুটিতে—" ইহাতে কে যেন ছোট আয়না হইতে মুখ তুলিয়া কহিল "ও এবার আমাকে কলিকাতায় যখন যাই তখন হোসটেল হইতে এসে সীতা দেখিতে নিয়ে যায়, ঘোড়া গাড়ীর মধ্যে জানলা বন্ধ—ও আমাকে বার বারই চিকি চিস দিয়াছিল... কানা কেষ্টর গান কি বলব? বাড়ী পৌঁছুতে বড়দি বলিল কি রে রোদে পুড়ে এলি গাল লাল! E. T. ৮০" অতঃপর সন্তান অনেক পুণ্যে হয়, তাহার অংশ আমি লইব না...হাসপাতাল স্কুলে এই সবে দিও না মন্দির করিয়ে দিও...অনেক শান্তি—" "তোমার পুত্র এইভাবে ছাড়িয়া যাইবে তাহা ভাবিতে পারি নাই, তাঁহার ইচ্ছা...ডাক্তাররা পাষণ্ড—" "বেশ কথা, আমি হাইকোর্ট প্রিভি কাউন্সল পর্য্যন্ত—" 'ম্যাটরিকের রেজাল্ট' যোহন একাদশীকে সমস্ত কথাবার্ত্তা ক্রমশঃ সঙ্গীন করিয়া তুলে, সে যে কি করিবে স্থির করিতে পারিল না, একদা সঙ্কল্পে অধীর যে এখনই সে ধলতার পুলে যাইবে যেখানে সে প্রত্যেকটি চিঠি পড়িয়াছে, মহা আক্রোশে ছিঁড়িতে গিয়া ধলতার খালের প্রতি তাকাইয়াছে, অপরাহ্ণ অপগত—ধলতার জল সোনা, সেখানে তাহার, ছোট ছায়াতে, অন্তরীক্ষের নিজ ধূসরতা, ইতিপূর্ব্বে হরিয়ার আড্ডার কথা তাহার মনে আসিল; যেখানে সে ছোট জলচৌকিতে বসিয়া মদ খাইয়াছে—হরিয়া আদতে পাশি কিন্তু মদও তৈয়ারী করে—হরিয়া তাহার সম্মানার্থে কাঁচের গেলাসে মদ দিয়াছে, খানিক পেঁয়াজ লঙ্কা কুচি দিয়া ছোলা ভাজা গুঁড়াইয়া ছাতু করিয়া মাখিয়া চাট দেয়, যোহন একাদশীর এখন যে কোন মূল্যে আনন্দ প্রয়োজন, ফলে এতাদৃশ অভ্যর্থনা আপ্যায়নে খুসী হওয়ত কহিল "হরি আর জনমে তুই আমার বউ ছিলি...কি যত্ন! আমি না একের নম্বরের...খামখা কড়াটাকে ভাঙতে গেলাম কেন—" হরিয়া একটু মদ চলিতে থাকিয়া সায় দিল "অমন হয়...বউ বলে—" যোহন একাদশী আর কিছু স্বীকার করিতে উদ্বেল "না না রাগে পাখীটাকে ছোলা জল দিইনি...কি পাষণ্ড ভাব...তা-কি দোষ...ভাবলুম ম' শালা চেঁচিয়ে মরবে রে...তার প' দিন অবিশ্যি...আর একটু দে...মাগী—" হরিয়া হাসিয়া কহিল "আমার কথা ত মানলে না" অর্থাৎ ঘনশ্যাম খ্যামটাল যখন এ সম্বন্ধ আনে, তখন যোহন একাদশী বলিয়াছিল "আর লোক পেলে না" ঘনশ্যাম তাহার দিকে তাকাইয়া মৃদু হাসিয়া কহিল, "আমি খ্যামটাওয়ালা বলে ভাবছ বুঝি—খারাপ মেয়ে ছাড়া বৈ কিছুর সঙ্গে পয়চানী নেই...হরিয়া জিজ্ঞেস কর...মেয়ের মা কি মামার বাড়ী কোথায়, তবে...বলব না যে একেবারে গঙ্গা জল—" হরিয়া বলিল "ধম্মৎতে বলব, বয়সী বিধবা ভাই বৌরা মুখ করত তাই...বার হল...মেয়েটো শীতল হালদারের—" ঘনশ্যাম খ্যামটাল যোগ দিল "শীতল কলেরায় মল...তা পর দেখেছি এতটুকু বেচাল নেই...বিড়ি বেঁধে খেত...কত লোক রাজরানী করব বলেছে উঁহু...বলেছে...পরকাল ত আছে...মেয়েটো দেখ না...তুমি খিশ্চান বলেই বলছি সবাই জানে ইটি বাপের মেয়ে...তবু অন্যরা...কবে দেখবে বল—" যোহন একাদশী বলিল "গীর্জ্জে যায় বাইবেল পড়ে" ঘনশ্যাম উত্তর দিল "নিশ্চয় তার মায়ের কথা শোনে না...ওখানে খবর নিও—" যোহন একাদশীর মুখে নির্ব্বোধ হাসি খেলিয়া উঠে, কহিল "বটে রগড় হবে...আমাকে নিয়ে" ইহাতে ঘনশ্যাম ভাণ অভিমানে বলিল "থাক আর কথার দরকার নেই" যোহন একাদশী ইহাতে অসম্ভব গম্ভীর আত্মস্থ পরে অতর্কিতে ঘোষণা করিল "তাহলে ঠিক হায়, আমি রাজি..." ঘনশ্যাম অবাক, ধীরে কহিল "মেয়ে" যোহন একাদশী নিজ ভাব হইতে দাম্ভিক স্বরে বলে "নো..." ঘনশ্যাম তথাপি জানিতে চাহিল "তাহলে কথা ঠিক ত" যোহন একাদশী হুঙ্কার দিয়াছিল "মরদা কা বাত হাঃথি কা দাঁত" ঘনশ্যাম খ্যামটাল করমর্দ্দন করিয়া চলিয়া যায়; হরিয়া তখন বলিল "সত্যিই তুমি...তুমি বিয়ে করবে..." যোহন একাদশী বীরত্বব্যঞ্জক হাস্যে উচ্চারণ করিল "নিশ্চয়" হরিয়া থতমত খাইয়া কহিল "ভেব না ভাংচি দিচ্ছি তবে বুড়ো বয়সে বিয়ে করা, না ত সদর দরজায় তড়পা রাখা...এঁড়েতে আসবে মুখ দেবে, টানবে, নিয়ে বেরিয়ে যাবে..." যোহন একাদশী বেপরোয়াভাবে তাচ্ছিল্যে প্রকাশ করিয়াছিল "অমন এঁড়ে আমি বহু দেখেছি" এবং বিবাহ সত্যই হইল; ক্রমে বউ সম্পর্কে অনেক বেচালের কথা, তাহার কানে আসে, বিশেষত সে নাকি খ্যামটা নাচ জানে এবং 'বুড়ো আমার মরুক মরুক; চাগরীতে বাজ পড়ুক—এ যৈবন কালে কাজে এলো না' এই গীতটি অতিশয় ভাবাবেগে গাহিবার সহিত—শালীনতাহীন খ্যামটা নাচে গানের অর্থ অভিব্যক্ত করে, ইহা একটি হিন্দু বিবাহের বাসর ঘরে সে দেখায়, উহার হাতে দো রুমাল ছিল আশ্চর্য্য! যোহন একাদশী এমতভাব করে যেন সে কিছুই জানে না; উপস্থিত হরিয়া কহিল "বলেছিলুম তখন বুড়ো বয়সে বিয়ে করা নাত সদর দরজায় তড়পা রাখা, যাক ভালই হল এসেছ একলা যাবে একলা...ছাতুগুলো একটু

সেঁকে দেবে...? রাগ করবে না বল...তোমারও ভীমরতি বলিহারি...তুমি নাকি নরকের তসবীর কিনেছিলে" যোহন একাদশী চোখ ছোট করত জানিতে চাহিল "কোন শালা বললে? ও রহমৎ কিম্বা আস্ফকার..." হরিয়া বলিল "সবটা বলেনি...তবে" যোহন একাদশী কদমগাছে হেলান দিয়া তির্য্যক দৃষ্টিতে বারবার হরিয়াকে বুঝিয়া লইতে আগ্রহান্বিত, নিশ্চয়ই সে ঈষৎ গ্লানিতে বিশেষতঃ আড়ষ্টতায় স্বস্তি শূন্য; তথাপি, সে, নজর পরম্পরায় মনে হয় সে কথা ভুলিতে চাহে, এবং সে নিকটের বেচারী কুকুরটির দিকে অপ্রত্যাশিতই, লাথি মারিতে পা চালায়, এবং তৎসহ মাঝ-রাতের বীভৎস হাস্যে কহিল "খামখা এত রাগ মনে চিবচ্ছে কেন বলত" এইভাবে সে হরিয়া উক্ত ভাবনার পর্য্যায়ক্রম হইতে ভাঙ্গিয়া অন্য খেই ধরিতে সমুৎসুক; ভুলিতে চাহে, কখনও সে ফুলদোলের মেলাতে গিয়াছে, যেখানে বৈশাখের হাওয়ায় অসংখ্য ছবি, হারমোনিয়াম সুন্দরী, টুপিপরিহিতা ইরাণী স্ত্রীলোক, তুর্কী যুবতী, বস্ত্রহরণ, গোষ্ঠলীলা, কালীয় দমন, কালীঘাটের কালী, তারকেশ্বরের শিব, ষটচক্র অঙ্কিত যোগী, আবার তামাকু সুন্দরী এবং নরকের শাস্তিবিধান চিত্র—সবই তখনই উহার মন আকর্ষণ করে, সে একবার আপনার অবস্থিতি গণনার হেতু চারিদিকে তাকাইয়া, প্রথমে একটি দৃশ্যের চিত্র দেখিতে চাহিল, দৃশ্যটি পরীক্ষার শেষ, বলিল "দাওত ঐখানা দেখি তোমরা যীশুর ছবি আনতে পার না...দেখি ওটা" নরকের ছবিখানি হাতে আসিল, সবুজ, আম-হলদে আর জবার লাল, কালো এক মেলের রেখায় দারুণ নাটকীয় ঘোরকর্ম্মা বর্ণনা, পাপের পরিণতি, তপ্ত কটাহ, লেলিহান অগ্নিশিখা, গাত্র হইতে চর্ম্ম উৎপাটন, মাংসল রমণীগণের মোহিনী-আপ্তমভীতি, তৃষ্ণার্ত্তকে জলদান না করিলে কি ফল হয়, বিপথগামিনী কুলটা বিশ্বাসঘাতিনীর কামুকতার শাস্তি নরকে কি বিভীষিকাময় ত্বক পরিদহ্যকারী স্থান দর্শনমাত্রেই সরলমতি জীবের মুখ পরিশুষ্ক, শরীরে বেপথু ও রোমহর্ষ জাত হয়, বমনেচ্ছু দেহ মোচড়ায়—কেননা বিশ্বাসঘাতিনীগণ এখানে আতঙ্কিত, যেহেতু উপপতিরূপে কর্কশ: এবড়ো খেবড়ো বর্শাফলক কাঁটাওয়ালা খর্জ্জুর কাণ্ড ভূতচালিত, আসে—একদা মরজগতের কামান্ধদের দুদু লালসা পরিতুষ্ট করিতে আগত, সামান্য ত্রুটির! জন্য একি সেমেটিক হিংস্রতা—যোহন একাদশী ইহা দৃষ্টে যেন স্ত্রীলোক, নিশ্চিত ব্যথিত; ফলে উঃ বলিয়া উঠে, ক্রমে অন্তঃশীর বৃদ্ধের মুখে অল্প রাব্যেলেভাবের হাস্য পরিদৃশ্যমান, সে এক হস্তে ছবিটি ধরিয়া মোচে তা দিল, এমত সময় পনেরো-আনি-বোবা আসফাক, যে অস্পষ্ট বাক্য উচ্চারণ করি পারে, ও বেশীর ভাগই ইশারায় বুঝায়, সে কোন মতে প্রকাশ করে "ন অঅক...বা বা বা ইতে...কেনো" রসে অস্থির মুখ ব্যতিব্যস্ত, যোহন একাদশীর ভ্রূ কুঞ্চিত—সে মোচে হাত দিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইতেই দেখে রহমৎ, যে বৃদ্ধের মতিগতি অনুধাবনে সত্বর বলে "ও বলছে...নরকের তসবীর তুমি বাড়ীতে" যোহন একাদশী নির্ব্বোধ গাম্ভীর্য্যে কহিল "উপরে শালা হিঁদুদের বৈতরণী...না হলে কিনতুম" এবং দাঁতে দাঁত ঘর্ষণে, কেন্না বোবার রসউচ্ছ্বসিত মুখ উহাকে অতিষ্ঠ করে, যোগ দিল "প্রেত্যেকের ঘরে এ তসবীর রাখা উচিত...তাতে পৃথিবী ভাল থাকবে..." ইহাতে পনেরো-আনি আসফাক হি হি শব্দে হাসিয়া উঠে, যদিও রহমৎ "এই এই কি হচ্ছে!" বলে তথাপি, উহা থামে নাই, আসফাক বিড়িতে জলদি টান দিয়া, চোখ ঘুরাইয়া ফোকড় কানকী মারিয়া মন্তব্য করিল "কি রঙ দুদু...বগনার ন্যাজ চেপে পৃথিবীকে সুস্থ সৎ রাখতে চাও...হা কপাল..." যোহন একাদশী ছবিটা দোকানীকে ছুঁড়িয়া প্রত্যর্পণের পরক্ষণেই ঘুরিয়া চোয়াল বাঁকাইতে ক্ষণে জানিতে চাহিল "কি বললে শালা—" রহমৎ তখনই তীব্র উৎকণ্ঠায় বলিল "ও কিছু লয় পিওন খুড়ো—তুমি যেমন ও বোবা লাচার"—যোহন একাদশী উত্তর দিল "আমি বুঝিনি..." যেহেতু সে আসফাকের বাচনভঙ্গিতে অভ্যস্ত এতদ্ব্যতীত আসফাক রসিকতার সময় বিড়ি হাতে, ভাবার্থটির অশ্লীল অভিব্যক্তি সহকারে, নোংরা মুদ্রায়—প্রাঞ্জল করিয়া দর্শায়, অনন্তর যোহন একাদশী কহিল "বোবা লাচার...বকন্নার ন্যাজ টিপে...চেপে...পৃথিবীকে সুস্থ সৎ..." ইহার পরক্ষণেই ভাবার্থের ভঙ্গি নিজে দেখাইয়া ক্ষিপ্র হাসিতে নয়ছয়, তিন জনেই রগড়ে হাস্যে দারুণ খুন, হর্ষাশ্রুর সূচনা হইল; অতর্কিতে যোহন একাদশী পনেরো-আনি বোবা আসফাককে প্রচণ্ড চড় মারিল, এখনই থামে নাই, মুখে-ধর্ম্ম তুলিয়া অজস্র কুৎসিত কথা আর সেই সঙ্গে প্রহার করিতে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য; ভাগ্যশঃ রহমৎ আসফাককে বুক দিয়া রক্ষায় অগ্রসর হয়; এখন যোহন একাদশী কোটের হাতায় মুখ মুছে, আসফাকের কথার গূঢ় অর্থে সে পৌঁছাইয়াছিল, সে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ ঠাওরে সুনিশ্চিত; ইতস্তত দুই-চারিজনার চোখে যে তাহার প্রতি নিবদ্ধ

ধীরে ইহা লক্ষ্যে আসে; অধুনা, এ কারণেই তসবীরওয়ালার দিকে ফিরিতেই আচম্বিতে আপন চেতনায় প্রতিষ্ঠিত, যেহেতু সমক্ষের ছবিটি তাহাকে আকর্ষণ করে—পাহাড়ী ঝরণা নিকটে একজনা সৌম্য জটাজূটধারী সন্ন্যাসী ধ্যানস্থলোচনে আসীন কাছেই অল্পবয়সী কিশোরী যাঁহার, তদ্দৃষ্টে যোহন একাদশীর জিজ্ঞাসা করে 'তে-চোখ মুসকোটা নির্ঘাত শিব কিন্তু ছুঁড়িটা কে?" হয়ত সে না জানার ভাণ করিল, এবং জানিতে চাহিল; তসবীরওয়ালা কহিল 'হর পার্ব্বতী' ইহাতে যোহন একাদশী কেবল মাত্র 'ও' বলে কেননা এই সূত্রে পূর্ব্বাহ্নের বিদ্রূপ তাহার শিরায় উপশিরায় পুনঃ জাগিয়া উঠে; উপস্থিত তসবীরওয়ালা একটু সুযোগ পাইয়া বলিল "কি বাবু নরকের ছবিটা পছন্দ হল না, ওটা আদত চীৎপুরের ছাপা..." যোহন একাদশী উত্তর করে "দোৎ...দেখছিলুম হিঁদুশালারা কি ভাবে অম্বল চাপা দেয়, শালারা জাত মন্দা..." ক্রমে তাহার কণ্ঠ হইতে বাক্যনিচয়ের রেশ ধরিয়া তিনটি ফাঁকা হাস্যের শুষ্ক প্রতিধ্বনির শব্দ উৎসারিত হইল, আশ্চর্য্য অথচ যে, তৎকালে সে ছবির নীলিমার মধ্যে আপনার, বড় আপনার, বিশ্বাসকে ঐ মুসকো আর ছুঁড়িকে কেন্দ্র করিয়া বাঁচিতে দিতে চাহিয়াছিল—যে বিশ্বাস সর্পভীতিকে তুচ্ছ, মারিগুটিকাকে অবজ্ঞা করে; ইদানীং হরিয়া কহিল "যাক...গে আর...একটু..." একারণ যে সে নিজে নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয়, নরকের তসবীর কথা তুলিয়া—দেওয়াতে, দিশা পায় নাই; যোহন একাদশীর চোখ প্রায় বন্ধ এখন ঈষৎ উন্মুক্ত করত তাহার দুঃখময় মুখ—অবশ্য ইহা যদি বলা যায়, কেননা, এবম্প্রকার দাড়ি তাহার দুঃখের জাত মারিয়াছে—ধীরে ফিরায়, সেই অভিমুখে যেখানে একটি কুলে গাছে হেলান দিয়া অনেকক্ষণ যাবৎ অদ্ভুত আপন পদদ্বয়ে খাড়া কাঠামো নির্ম্মাণ করিয়া এইভাবেই, আড় বাঁশি বাজাইতে তথা রেয়াজে নিবিষ্ট; বেপর্দ্দা সুতীব্র আওয়াজ অন্যের ভ্রূকুঞ্চিত করে তদ্রূপ আচমকা দৈবাৎ শুদ্ধ স্বরও অন্যকে স্বস্তি দেয়; যোহন একাদশী বলিয়াছিল "তখন থেকে কোন শালা পি পি কচ্ছে...জ্বালালে..." হরিয়া তৎক্ষণাৎ বুনোকে ধমক দিতে লাগিল "শালা পয়সা চারেকের মদ...খাবে..." এমত সময় যোহন একাদশী ঘোষণা করিল 'মৌজাক্ শালা...আমার খামখা রাগ হচ্ছে কেন...আয় শালা হরিয়া তোতে আমাতে ফিরিঙ্গী মদ্দ মাগীরা যেমন নাচে... নাচি..." এবং সে, হরিয়ার অপেক্ষা করে নাই, উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাজ্জব পদ-বিক্ষেপে হস্ত সঞ্চালনে ভূমি সতর্কভাবে পরিক্রমণ করে, এবং সে গীত গায় এবং কলির পর কলি বদল হয়, সে নির্ঘাত কদর্য্য গান কিছু খুঁজে অথচ অনবরত তাহাকে কোন এক গীত বাধা দেয়, সে নৃত্যগীতের মধ্যে হঠাৎ থমকাইয়া এক আদটা কথা বলে, যথা "আশ্চর্য্য না!..." আরবার "হঠাৎ আমার কপালে...বুঝে পাইনা—" ইহাতে হরিয়া সহানুভূতিমিশ্রিত গলায় কহিয়াছে "নিয়তি নিয়তি...ছেড়ে দাও তুমি নাচ তুমি গাও—" সঙ্গে সহিত যোহন একাদশী তাহার দশখানা অর্গানের গলা ছাড়িয়াছিল, সপ্তকে বিবিধ ভাবে খেলিয়া উঠে, সে নাচেও, কথা নাই শুধু বিস্তৃতি, এ হেন নাচের মধ্যেই অতর্কিত বেচারী কুকুরটিকে যে, তাহার নিমিত্ত যে সকল ছাতুর গুলির অবশিষ্ট ছিল, তাহা খায়, প্রচণ্ড জোরে লাথি মারিল—ও প্রাণখোলা হাসিতে বলিল "খামখা বড় রাগ হচ্ছে—অনেক নাচা কোঁদা হল...মন! চল যাই হরিয়া আর একটু দে" হরিয়া সতর্ক করনে কহে "তোমার না পেটে কিছু নেই...একদিন...ঐ—" যোহন একাদশী আত্মস্থ জবাব দিল "খালি পেটে মদ—যে মোচড় দেয় নারী সহবাসের বাবা দে" ও মদ পাইয়া এক চুমুকে শেষ করিয়া যখন গমনোদ্যত তখন শোনে হরিয়া বলিল, "চিঠি...চিঠি গুনো ব্যাগে পোরো" চিঠির তাড়া লইয়া বৃদ্ধ সবেগে প্রস্থান করিল, অনেকদূর হইতে একদা শুধু হরিয়াকে জানান দিল "পয়সা পয়সা...কাল...কাল—" ইহার সহিত আরও "খামখা কড়াটা আমি ভাঙতে...চমৎকার সুন্দর কড়াটা" এবং অসম্ভব পল্টনি চালে অতঃপর মাঠ ভাঙে; এখানে, সে, যোহন একাদশী, আপন ধূসর ছায়া দর্শনে নিজ নিঃশ্বাস হাত দিয়া অনুভবের পর উচ্চারণ করিল 'আমি কত খাট হয়ে গেছি...কতটুকু..." আর যে পরক্ষণেই নিজ গম্ভীর কণ্ঠের "আমি কি শুধু অন্ধকার" উক্তি স্বীয় মানসিকতাকে কাঁপাইয়া তুলে, নিজ জীবন যে জীবন শুধু উরুৎ দেখাইয়াই নিভিয়াছে তথা ইদানীং সম্বন্ধ বিষয়ক বহুতর অবাক প্রশ্ন ইহাতে নড়িয়া উঠিল; কেবল আড়ষ্ট জিহ্বায় ব্যক্ত করে "বড় বদনাম হল" ও ক্ষোভ, সেও বুঝে যে, নিজের কোট ফাড়িয়া প্রকাশমান, ফলে হাতের চিঠিগুলি আপনাকে কর্ম্মব্যস্তকরন পরতন্ত্র সঠিক গুছাইতে থাকে; হঠাৎ শূন্যদৃষ্টিতে বলিল "পালে পার্ব্বনের মদ..." এবং পোস্টকার্ড দ্বারা কপালের ঘাম নিকাইতেই সচেতন, আপশোষ করিল "হায় হায় যাঃ শালা ভুষোর কালি...গেল জেবড়ে...দেখি" আর

যে পোস্টকার্ডটি অবলোকন জন্য চোখের নিকটে আনে; অজস্র, অন্যের বুকফাটা বাক্যের মধ্য দিয়া, উপর দিয়া তাহার স্বেদবিন্দু—এ মরজগতের গূঢ়তম বাস্তবতার সূচনা করিল, যোহন একাদশী এত গভীরভাবে নিজের স্বেদবিন্দু, ইদানীং ধারায় পরিণত, কখনও পর্য্যবেক্ষণ করে নাই—মনে হয়, উদ্বৃত্ত অশ্রুবারি কি স্বেদবিন্দু! চোখের কাছে আনা চিঠিটার অনেক বাক্যই তাহাকে কেমন যেমন হিংস্র করিয়াছিল, সে দাঁতে দাঁত দিয়া শ্লেষে তীব্র "কষ্ট পাবে না...একা যোহন একাদশী পাবে কি যোহন একাদশী তুমি না এঁটো বিয়ে করবে না...কেমন হল...এখন..." অবিলম্বেই মুখভঙ্গীতে বিকৃত স্বরে উহার চিঠির পদ অনুকরণ শোনা যায় "ব্যাবা আং মাং দেল ভ্যারী কষ্ট..." এবার অভিশাপও যে "মর মর জ্বলে পুড়ে মর" এবং তখনই কি যেন অচিরাৎ চিন্তায়, বৃদ্ধের, ঘটিয়া গেল; আর যে পর পর চিঠি খুলিয়া পড়ে, তির্য্যক বিদ্রূপও যুগপৎ নির্গত হইতে থাকে—আকৃতি, সম্প্রীতি, প্রার্থনা, ত্যাগ স্বীকার, আবেগ, উন্মাদনা স্বদেশ হিতৈষীতা, ক্ষমা, সন্তান সম্ভাবনা, চিকিৎসা, তীর্থযাত্রী, কাশীবাস, হিংসা, দ্বেষ, আত্মীয়তা, দারিদ্র্য, বন্ধন, প্রিয়জন হারান, শোক, পরাজয়, ক্রীড়া, বাৎসল্য, অন্নসংস্থান, দাসভাব, বন্ধুতা, সখীত্ব, রাজরোষ, ঋণ, ভীতি, জয়, পালাগানের নিমন্ত্রণ, ব্যতিক্রম, দম্ভ, সাধ-সংবাদ, বাণিজ্য, চাষ, গুরুকৃপা, মোহ, আরও উপরন্তু নানাবিধ পত্র প্রতিপাঠে একদা বলিয়া উঠিল, "ভগবান ভগবান ভগবান! এঁ!" এ সময় ঝটিতি মনে ফুলদোল মেলার তসবীরওয়ালার পসরারের একটি নগণ্য ছবি, ইহা কখন যে তাহার নজরে পড়ে—মন আকর্ষণ করে তাহা যথার্থই স্মরণে নাই, ইহাতে ছবিতে অতলান্তিক স্থৈর্য্যই সুধা অথচ রেখা সকলের কোথাও দৃপ্ত নাটকীয়তা নাই, অবিমিশ্র সরলতাই শুধু ভাস্বর, বড় মায়িক বড় সহজ তবু মানুষে যেখানে অপরিসীম বিস্ময়! জন্ম হইতে নিরন্তর মৃত্যু পর্য্যন্ত মানুষের দশ-দশার এক সুসংবদ্ধ চিত্র, ইতঃমধ্যে নির্দ্ধারিত সুখ দশা সকল, অতীব প্রাকৃতিক, মানুষ নিশ্চয়ই হাওয়া স্পন্দিত হয়, মানুষ নিশ্চিত বারি বর্ষণে দীর্ঘায়ত; আশ্চর্য্য যে নলিনী দলগত সংসারের রেশ এখানে ছিল না, মর দেহের অলৌকিক রহস্যময় অনন্ত—প্রবাহ, ইহা লাবণ্য ইহাতে হৃদয় ইহাতে সৌন্দর্য্য ফলত নিরবচ্ছিন্ন শান্তি; ইত্যাকার দর্শনে ক্রমে ভাবনায় যে সে গৃহকাতর, অন্যমনা; অবশ্য পলকেই সে ঈদৃশী আলস্য হইতে, একদা যে মানুষটির বিউগলের শব্দে ঘুম ভাঙ্গিয়াছে, ইদানীং উত্থিত আর যে এবম্প্রকার মীমাংসা তাহার কানে পৌঁছে—জগতের সম্পর্কনিচয় কি নিদারুণ ভূতুড়ে! কি উদ্দাম কুহক! এবং নিজে এ উক্তি পর্য্যালোচনায় ব্যথিত হইবার পূর্ব্বাহ্লেই—এমত হইতে পারে যে চিত্রের অন্তরের মাধুর্য্যে শুভআশীর্ব্বাদ সন্ধানে ও স্পর্শন প্রত্যক্ষে নিশ্চয়, সর্ব্বৈব মতিচ্ছন্ন, মুহূর্ত্তেই ব্যাঘ্রবিক্রমে প্রতিশোধকামীর দুর্ম্মদ আক্রোশে, গর্জ্জন করিতে থাকিয়া দুষমন; এখন দেখা গেল যে সে কভু হস্ত দ্বারা কখনও বা দাঁতে চাপিয়া একটির পর একটি চিঠি ছিঁড়িতে অবিশ্বাস্যরূপে দুর্দ্ধর্ষ অভুক্ত মাংসাশী, তাহার চোয়াল নড়ার প্রমত্ততা নিরীক্ষণে ঊর্দ্ধচারী মেঘ সমুদয় একীভূত মেদুর অলকস্তর, আশ্চর্য্য তৎকালীন রোষ হুঙ্কার সত্ত্বেও ভাঙা, দুষ্ট ঈষৎ, স্বরব্যঞ্জন উচ্চারণ উহার ওষ্ঠ হইতে নিঃসৃতবান, যে 'ছিলে আজন্ম আইবুড়ো বাঙসৎ...সাধ হল...' তাহার বাচনভঙ্গি অতিমাত্রায় বিকৃত রুচিসম্মত, তৎসহ শতচ্ছিন্ন বেচারী চিঠিগুলিতে পকেট পরিপূর্ণ, ক্রমে অঞ্জলিও তাহার ভরিয়া উঠে, হিংসায় তদ্দৃষ্টে বৃদ্ধের চোখ দিয়া লালা ঝরে—সে কি কোন জন্মে য়ুরোপীয় ছিল?—উপস্থিত যোহন একাদশী হস্তস্থিত টুকরা কাগজ রাশিতে নিকৃষ্টতম জঘন্য নিষ্ঠুরতায় ফুৎকার দেয়, মৃত কাগজ তাই উড্ডীয়মান, কি ঘোর নৃশংসতা! সে হাসে, সে খেলা করে, সম্ভবত উহার গাত্র হইতে মেঘসন্নিভ ধূম নির্গত হয়, সমস্ত কিছু সম্বন্ধকে নিগৃহীত করিতে পারিয়া সে খুসী, এবং যে তখন তদবস্থায় লঘুচেতসা বৃদ্ধ আপন মত্ততায় ভাবে "তুমি যখন কেঁদেছিলে...সবাই হেসেছিল" এহেন মর্ম্মান্তিক ট্রাজিক ছত্রটি গাহিতে অর্থাৎ গীতে পরিণত করিবার মানসে গলদঘর্ম্ম, অমানুষিক বিষাক্ত উল্লাসে সে ফিরিঙ্গী; কেননা ছিন্ন টুকরাগুলি ক্রমাগত উড়ে, হাওয়া দক্ষিণে ফলে অতিমাত্রায় স্পন্দিত যেন এতকাল বেহালার অন্তরীক্ষেই এইগুলি ছিল, ধীরে জলে পড়ে; সে আবার ফুৎকার দেয়, আর এই হয় যে, অতঃপর এতাদৃশ প্রমত্ত চেতনায় পকেট হইতে আরও টুকরাগুলি বাহির করিবার নিমিত্ত, অঞ্জলির সব টুকরা ফেলি দিল, পরক্ষণেই, সত্বর মুষ্টি ভরিয়া ছিন্ন পত্রগুলি নিজ পকেট হইতে বাহির করে, ছুঁড়িয়া দেয়, এইরূপে অনেকবারই ও যুগপৎ হাহারবে হাসে অথবা গীত গাহে, এখন ইহা ঘটিল যে—বাতাস সত্ত্বেও কয়েকটি বিপরীত গতিতে চালিত হওয়ত তদীয় কোটে মুখে ঠেকিতেই সে আঁৎকাইয়া শঙ্কিত বেসামাল, ও তৎক্ষণাৎই

ইহার যথাযথ-তালে-হওয়া শব্দ উহাকে নিমেষের জন্য আকৃষ্ট করে, তথাপি অন্যমনস্ক না হইয়া অবিশেষ ঘৃণায়, বিদ্রূপাত্মক স্বরে "শাল্‌লাঃ" বলিয়া আরও ক্রূর, পতঙ্গ ধরিবার কৌশলে টুকরাগুলি কুড়াইয়া আনিয়া, যেগুলি পুলের উপর একটু আধটু মনোভাবনা—সে সমস্তও তাহার দৃষ্টি এড়াইয়া যায় নাই—মহা আক্রোশে কুণ্ডলী পাকাইয়া তিনবার থুৎকড়ি দিয়া পুনরায় নিঃক্ষেপ করিল, এবং কিয়ৎক্ষণ শক্ত শক্ত টুকরা যাহা পড়ন্ত তাহাদের মনোরম লীলায়িত ছন্দবন্ধ উঠা নামা তাহাদের পরিণামের দিকে চাহিয়াছিল; অবিলম্বে তদীয় বৃশ্চিক হাস্যধ্বনি শ্রুত হয়, প্রতিহিংসা লোলুপতায় যে সে যথান্যায় করিবেক, শত্রুসকল নিধনের রক্তদাগ আপন কোটে মুছে, মুছিবার কালে, আপনকার মুখমণ্ডলে অভাবনীয় গাম্ভীর্য্য আনিয়া "হায় তুমি যখন প্রথম এসেছিলে...সবাই হেসেছিল..." পূর্ব্বাহ্ণের গীতের, কটি তাহা গীত, তারতম্যে সুর লাগাইতেই সে উদব্যস্ত, তৎসহ পদবিক্ষেপ অসমান হওয়ার জন্য, পুনঃ বেতাল তালে সেই-শব্দ শোনা গেল, ঈদৃশী বাদ্যে যোহন একাদশী চমৎকৃত বিহ্বল—ধলতার কাঠের পুলের প্রতিটি পাটা আলগা, তাই এহেন বিস্ময়কর সৃষ্টিছাড়া কেঠো, যদ্যপী মেজাজ আছে, শব্দ—এবম্বিধ দারুময়ী সুসংবদ্ধ ধ্বনি বাজনা তাহাকে, যে হয় বৃদ্ধ, যে যোহন একাদশী, তাহাকেই এক অলৌকিক ধূসর গাজনে আমন্ত্রণ জানাইল, সে এই গাজন নৃত্যে প্রথমে সংযত ভাবে ধীরে আপনাকে প্রস্তুত করিল, গীতটি তখনও আছে, "তুমি যখন প্রথম কেঁদেছিলে গো...সবাই হেসেছিল"—ইহার সহিত দারুজাত বাদ্য, এখন মিত্রাক্ষর—দুইদিকে দিগন্তব্যাপী গ্রীষ্মতাপদগ্ধ মাঠে, প্রান্তর, মাঠে দূরব্যাপী পায়ে-চলা-পথ অনেক উদ্ধত; মধ্যে টৈটম্বুর ধলতার খাল—কিনারে জলঘাস চকিত, অপরাহ্ণ নিঃশেষ হইয়াছে, পুলে নৃত্য অভিমানী যোহন একাদশী—যে হাত কিছু পূর্ব্বে ভীমকর্ম্মা, উপস্থিত মেঘদূতকে ইঙ্গিত করে অপার্থিব নয়নসুখ ভঙ্গিমা বিলাসী তাহা; হয়ত সে আপন রক্তপিপাসাকে মন্দীভূত করণে চেষ্টা পায়; হঠাৎ সে উত্তেজনায় বিহ্বল, হঠাৎ ঘোর, মাতঙ্গ, মদগর্ব্ব পদবিক্ষেপ তাহার পরিবর্ত্তিত হইল, হঠাৎ সে যে পৃথিবীর এ তত্ত্ব ভুলিয়াছিল অচিরাৎ "চিঠি পড়া পরের...পরের চিঠি পড়া শালা পাপ" গানে বলে, এবং চিঠি পাঠকালীন যে সকল কণ্ঠোত্থিত খিস্তি, নিশ্চয়ই, সে করিয়াছিল তাহাও পুনরায় শোনা যায়, ইত্যাকারে ক্রমে ইহাও যে "এসো এসো আমার সঙ্গে লাচবে এসো..." সে সম্ভবত কোন কিছু ভুলিতে উৎসুক কিন্তু পরক্ষণেই ইহাও যে "সাঁঝি শালী পাইলেছে...তার মজা...তা মজা...আমি দেখিয়েছি" আরবার "এসো এসো আমার সঙ্গে লাচবি যদি...আয় আয়" এতাদৃশ ভাষায় এ মরজগতের জীবিত সকলকে সনির্বন্ধ আহ্বান জানায়, সে নিশ্চয়ই আর এক, কিম্বা কাঠের বাদ্যধ্বনিতে সে উদ্বেল, যে ক্রমে নৃত্য আবেগে, এক তন্দ্রায়, ঘোরে, অজানিতেই যাত্রার সখীগণের ন্যায় কোমর আন্দোলন, এবং সেই সঙ্গে কোমরে ও কপালে হাত স্থাপন করত ঘুরে এ সময় যখন নিতম্ব আস্ফালন—কষ্ট সত্ত্বেও বুঝায়—সুরু করে; সে নিজে কেন যে, কোথায় নামিতে চাহে, ঈদৃশী ছোট জাত প্রিয় মধ্য রত উপযোগী নৃত্যে তন্ময় বৃদ্ধ গাহিতেছিল, "বুড়ো আমার মরুক মরুক—চাগরীতে বাজ পড়ুক—এ যৌবনকালে কাজে এলো না" আর যে গীতকে সুস্পষ্ট অর্থব্যঞ্জক করিবার নিমিত্তে গীতকে মনোরমণার্থে সে আশ্চর্য ইহা যে ছেনাল দীর্ঘশ্বাস পর্য্যন্ত ফেলিয়াছে, খুন খারাবী কানকিও মারিতেও ব্যস্ত, এখন এমন গানের সঙ্গে পদতলের হাড়ের আওয়াজ তথা দারুভূত ধ্বনি, বড় জবর লাগসই ব্যালাদার লহর তুলে; সে গাহিতে উল্লসিত, ক্ষণেকের জন্য মনে আসে নাই যে গীতটি বিষগর্ভ মারাত্মক, সে চক্রাকারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া গাহে, আর যে মাঝে সাঝে নিজেই "ওয়ে হোয় ওয়ে হোয়" ভঙ্গীর উচ্চারণ করিতে একশা—আমোদ মুখর, কাঠপুল বাজে, গীত পুনঃবার, হঠাৎ ইতিমধ্যে আহ্লাদে অতীব "দুটি খেতে দিও—শুধু দুটি খেতে" বচন উৎসারিত হয়—গীতনৃত্যে সম্মোহিত বিভোর কোন প্রকৃতজনের উন্মাদনা, কিন্তু উহা তাহারই কণ্ঠ হইতে নির্গত, ফলে অবিলম্বেই বৃদ্ধ "বুড়ো আমার মরুক মরুক—" টুকুন গাহিয়াই নির্ব্বাপিত ক্ষান্ত, ক্ষীণ তত্রাচ আচমকা তদীয় কণ্ঠের হুঙ্কার শোনা গেল "কোন শাল্‌লা—" জানিতে চাহিল নিঃশঙ্ক মনেই যে কে পূর্ব্বোক্ত কথাটি বলে, আবেগে আপন বদনমণ্ডল যারপরনাই স্ফীত, সে নিজেকে আর সামলাইতে অক্ষম, কোন দুর্দ্দশা তাহাকে গ্রাস করিয়াছে,—অথচ গীতের আরম্ভ হইতেই ইহা প্রকাশ থাক, তাহার নিজ অজ্ঞাতসারেই চোখে জল বর্ত্তমান, এমনকি অশ্রুধারা কপোলে আসিতে গণ্ডস্থল সঙ্কুচিত হয়—এমতকালে তদীয় কর্ণে মণ্ডলীর সভাপতির কথা আসে "ছ্যা ছ্যা যত জল চলে না, ছোট জাত—দাদ্ চুলকুনীর আড়ৎ তাদের বিয়েতে বউকে যেতে দাও

কেন...জান আলাদা করে খেতে দিয়েছে...আর জান নেচেছে রুমাল নিয়ে...খ্যামটা নাচ...শোন একটা ছোঁড়া তার গা গতরে খেপলা জালের খেলা শুঁকে বলেছে...দুটি খেতে দিও পায় পড়ে থাকব...” ইত্যাকার মন্তব্যের স্মরণেই যোহন একাদশী ক্বচিৎ মর্ম্মান্তিক শব্দ করি উঠে, যুগপৎ সে আপন গালে চপেটাঘাত করিতে থাকে; কেননা যে সে সেই গীতই গাহিতেছিল তাই ক্ষোভ তাই রুষ্ট; ইদানীং পুল নিদারুণ কম্পিত, হঠাৎ কি মতি হইল সে দৌড়ায় এবং দৌড়াইয়া পুল প্রান্তে নিকটস্থ বাবলা গাছ হইতে ডাল ভাঙ্গিল, সেখানেই ডাল দ্বারা কি যেন চেষ্টা করে, গড়ানে পথ ফলে যথার্থ বেসামাল হওয়ত আবার পুলে, বাবলা ডাল দ্বারা নিজ দেহকে আহত করিতে উগ্র, এখন পদসঞ্চালন এমত ভাবে হয় যাহাতে ইহা পরিদৃশ্যমান যে সে ভয়ঙ্কর গাজন নৃত্যে আমন্ত্রিত, কাঠ বাজিতেছে তদীয় এতাদৃশ কূটপ্রবৃত্তির মানসিকতায়, খ্যামটা হট্টকারিতার গ্লানি ভারাক্রান্ত ঘর্ম্মাক্ত কলেবর বৃদ্ধ আপন কোট খুলিয়া ফেলিয়াছে, নৃত্য থামে নাই, বাবলা ডাল দ্বারা স্বীয় পৃষ্ঠদেশে এখানে সেখানে, শত্রু হনন প্রতিহিংসায় সাংঘাতিক পরাক্রমে প্রহার করণে জ্ঞান রহিত ইহাতে যন্ত্রণায় তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বাঁকিয়াছে, এবং যে দাঁতে দাঁত দিয়া থাকাতেও, সহ্য সীমা কিয়ৎ পরিমাণে হারাইয়াছে এ কারণেই উঃ বলিতে মুখ সূচ্যগ্র করে, তথাপি নিবৃত্তি নাই আপনাকে সমুচিত নির্য্যাতনে বদ্ধপরিকর ধর্ম্মানুপ্রেরিত, কাঠপুল উতরোল, পাটা সাংঘাতে এক অশ্রুতপূর্ব্ব লহরা ক্ষীয়মাণ অপরাহ্নে ঈদৃশী আত্মনিগ্রহ সর্ব্বৈব অনৈসর্গিক—কেন যেমন ইহা চমৎকার মঙ্গলজনক! ইদানীং যোহন একাদশী অল্প স্তিমিত, হাঁপাইতে থাকিয়া নিজ পৃষ্ঠদেশে হাত দিবামাত্রই অধর দংশন করিল, হয়ত বেদনায় সে স্থান জর্জ্জরিত, হাতটি চকিতেই টানিয়া নয়ন সমক্ষে ক্রমে প্রসারিত করে, তালুতে রক্ত চিহ্ন, তদ্দৃষ্টে ওষ্ঠ কম্পিত সত্ত্বেও সে খুসী, পুনর্ব্বার পীড়ন সুরু নিমিত্ত ক্লান্ত হস্ত ধীরে উঠে, আপন জীবনকে সে নিষ্পেষিত করার হেতু সে ক্ষিপ্ত, একারণ যে এখানে তদীয় নিজ ইচ্ছা মনস্থ ক্ষমতা বিষকন্যা নিয়তির বেশে আসিয়াছে, সে প্রতারিত হইয়াছে, হারিয়াছে—কিন্তু তাহার দেহ টলায়মান, তবু এই নিয়তিকেই কপালকেই বিনষ্ট আশে আরবার প্রস্তুত, কিন্তু আর তেমন জোর নাই, অথবা যে সে মাতাল, পা অসমান সঞ্চালিত পুলে কাষ্ঠ সংঘাতে অস্থির শব্দ উত্থিত, নিজ অজানিতেই রহস্যময় নৃত্যের আমন্ত্রণ স্বীকার করিল, হাতে বাবলা ডাল, পৃষ্ঠদেশে তাহার বিন্দু বিন্দু রক্ত এবং সে নাচে, যে সে এবার মড়ক আসে নাই সে আসিয়াছে, যে সে জলপ্লাবন আসে নাই সে আসিয়াছে, যে সে কালবৈশাখী আসে নাই সে আসিয়াছে, যে সে অন্ধকার আসে নাই সে আসিয়াছে—যে সে অলৌকিক ভ্রূণ, যে নিঃশ্বাস লয় সে আলোকে ঠাওর করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল; অধুনা যোহন একাদশীর নৃত্য সৌকর্য্যে অভাবনীয় প্রহেলিকা সঞ্জাত, কদাচ হুঙ্কার ধ্বনি, কোথাও একটি মড়া পুড়ে তাহারই ইঙ্গিত, সমগ্র ভাবের মধ্যে রন্ধ্রগত অন্ধকারে পথ চিনিবার অদম্য ইচ্ছা ব্যক্ত—এখানে মরাল গতি নাই, প্রজাপতির উচ্চকিত ভাবহীন, দক্ষিণ বায়ুতে পাপড়ি ঝরার আমেজ কোথায়, অথচ চন্দ্রালোক উদ্ভাসিত ফিরোজ-সবুজ মোজাইক কৃত ঋজু কৃশ স্থাপত্যের মিনারের ছায়ার উপরে—ধলতার কাঠ-পুলের হইলেও আদতে সেখানেই হয়, এ কারণে যে ক্রমাগত সঙ্কেতময় আলগা কাঠের খড় খড় ভীতিপ্রদ আওয়াজ তাহাই প্রমাণ করে, এবং ইদানীং কাহাদের আহ্বানে সে বিনীত সশ্রদ্ধ গম্ভীর সম্ভবত যাহারা মৃত যাহারা ইহা যে মরজগত তাহা নির্দ্ধারণ করিয়াছে কবুল করিয়াছে তাহাদেরই ডাকে, মৃতরা বৃদ্ধের সহিত নৃত্যে যোগ দিয়া আনন্দে আত্মহারা হইবে...যেহেতু কাষ্ঠউদ্ভূত হাড়ের শব্দ মুখর ইহা এক অশরীরী নৃত্য ইহাই মাগবারিশ তথা মাকাঃ ব্র...তথা দাঁশ মাকাঃ ব্র অদ্ভুত রেখার সঙ্কলন সংমিশ্রণ যাহাতে প্রচণ্ড বালু ডিউন ত্রস্ত—যুলেদ নাইলের নর্ত্তকীরা—নগ্ন দেহী উদ্ভিন্ন যৌবনা ইহারা, তদ্দৃষ্টে ভীত নয়নে শিহরিত মনে, হয়ত উলুধ্বনি দিবে, যোহন একাদশী এ দাঁশ মাকাঃ ব্র করে, সে বোধহীন তদীয় দেহ উদ্ধত বাঁকা ঈষৎ লম্বাটে নিশ্চিত তাহাকে কেহ আঁকিয়াছে—কোন ভজনালয়ে সে প্রাচীর চিত্র যেখানে কণ্ঠস্বর আহত হওয়ত মানুষের প্রার্থনাকে গভীর করিয়া তুলে,—মৃতের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক—কঙ্কালের হস্ত সখাভাবে ধরিয়া নাচে, শীতহিম ক্লেশ নিবারণার্থে সে নাচে, কখনও বা মনে হয় এ্যাসিডে ক্ষীয়মাণ তাম্রপাতে উহার ইহকালীন অস্তিত্ব, দাঁশ মাকাঃ ব্র সম্পন্নে মগ্ন যোহন একাদশী এক হাতে বাবলা ডাল, কাঠ পুলের বাদ্য উহাকে নিরন্তর উদ্বুদ্ধ করে—সে বিভীষিকার হাত ধরিয়া নাচে, কোন দিন ইহাতে তাহার ক্লান্তি ছিল না নিশ্চয়, য়নুইয়ে, য়নুই, সচরাচর আটপৌরে ভাবে টায়ার্ড বাক্যদ্বারা যে অভিধার সম্পাদন তুমি কর, জানিও সে কথাটি য়নুই অর্থাৎ ডিসইলেইউশন, শব্দের মধ্যে

বহু বিফ-স্টেকের গন্ধ, এমডেনের খলতা বিমূঢ়, হ্যাঙলি পেজেসের নিষ্ঠুরতায় স্তম্ভিত লোকেদের মানসিকতার কথা উহ্য—তাই ব্যবহারে নিরস্ত হইলাম—আমার মনোমত না, আমি শঙ্কিত যদি কথাটি আমাকে প্রভাবান্বিত করে—যদি করে, তাহা হইলে, চার-বাগান শালটির প্রতি আমি আর শ্রদ্ধাভরে চাহিতে পারিব না, যেখানে অপূর্ব্ব শীকার খেলার অন্তে লোভনীয় বিশ্রাম দৃশ্য হয়ত কাদম্বরী পাঠের আর আগ্রহ নাই, সন্দেহ ভিখারীর প্রতি দেখা অসম্ভব হইবে, ভাবনা হয় তোমার চমৎকার [illegible]-জাপানী বাগানে, টিউলিপ ফুটাইবার চাবুক পরিশ্রম আমার কাছে নিরর্থক হইবে, জের সূত্রে তুমি হল্যাণ্ডের কোন নার্সারী হইতে গেঁড় আনিয়াছ, আমাকে ঠিকানাটি পাঠাইও—কেননা আমাদের বাগানের ইউক্যালিপটসের যখন চাঁদের আলো পড়ে যখন অন্ধকার পড়ে তখন যদিও উহার মসৃণ কম্প-ক্ষীণ-হরিৎ ধূসর গা আমার বড় ভাল লাগে, কিন্তু মাটি ইঁটলাল যেহেতু লেটেরাইট মৃত্তিকা কদাচ অয়স্কান্ত, হায় ইউক্যালিপটসের কোনই গোপনতা নাই, একারণে রহস্যলেখা গোপনতা আমি অনুরূপ করিতে অভিলাষী যে গোপনতা লইয়া মানুষ কাশী যায়, যে গোপনতায় মানুষ সন্ন্যাসী হয়, যে গোপনতা লইয়া আমি তুমি নয়ছয় করি, যে গোপনতা লইয়া মরোক্কো যাও, ক্যলম বেচার হইতে সাহারা ভ্রমণ কর, টুরিষ্ট সাহিত্য তোমাকে মন্থিত করিয়াছিল, টুরিষ্ট সাহিত্যেই অহরহ তুমি—তোমার অস্তিত্ব, কেননা সেখানে ইহা উল্লিখিত যেখানেই একটি খর্জ্জুর বৃক্ষ, অল্পই জল সেখানেই নৃত্যপরা নর্ত্তকীরা অনুকরণে নাচ—এরূপ সমগ্র সাহারায় শুধু নাচ, আর অতিদূরে উষ্ট্রবাহিনী—এখন টিউলিপের গোপনতা আমি দিতে চাই—বলা বাহুল্য আমি সঞ্জীব চাটুজ্জ্যে নই—বলা বাহুল্য এই অনুরূপ অনুষঙ্গী করিয়া নহে, সম্পূর্ণ ভাবে অন্তরঙ্গ অঙ্গীভূত হিসাবে—হয়ত তুমি বলিবে ইহা বড়ই রোমান্টিক, আমার মতে ট্র্যাম্প ঔৎসুক্য পরতন্ত্র—যনুই কথাটি উচ্চারণে যে স্বরভঙ্গ হয়, তাহা মধ্য প্রাচ্যের লোকগীতির উদারায় যখন—আরমিক ভাষায় কি লোকগীতি আছে—ফলে আদতেই বাক্যটি আমাকে সুখী করে না, উহা অদ্ভুত বুয়রজ্যয়া কথা, অবশ্য বুয়রজ্যয়া বলিতে যথার্থ সেই অভিধাই বুঝি, কেননা বাক্যটির মধ্যে কোন ক্লাসিসিজম নাই কেননা পদতলের কার্পেট যাহা পোলনেজ, পোলনেজ কথার উল্লেখে হয়ত অনেকের সূক্ষ্ম বোধধ্যানে আঘাত করা হইল—হইতে যাহাদের ধারণা এই অমর সভ্যতার সুরু—হায় ধনীরা কত চতুষ্পদ! এই অভিধা যে যতটুকু উহা শিল্পী মনের ঘৃণার উদ্রেক করিয়াছিল—বুয়রজ্যয়া বলিতে...ঠিক তত্টুকুই, অন্য নহে; অবসন্নতা কতশতবার তোমাকে ও আমাকে রন্ধ্রগত করিয়াছে জোল হাওয়া প্রতি রোমকূপ মূর্চ্ছিত আমাদের, ক্ষয়িষ্ণুতা ডেকাডেন্স সর্ব্বৈবভাবে স্নায়ুকে মোচড়ায়, এখন বুঝি দূরত্বকে রেখার ওজনে ঠিক দিতে গিয়া আমরা দারুণ ভুল করিয়াছি, অবশেষে উক্ত নির্যাতন যখন অসহ্য তখনই আমরা নৃত্যমত্ত, আমরা ঝাঁপ দিয়া পড়ি, আমাদের সুবিধার নিমিত্তে ইতস্তত নিকটস্থ টেবিলগুলি খিৎমৎগাররা, শশব্যস্তে সরায় উহাদের মুখমণ্ডলে বিচিত্র আলোকছটা কেননা ঝাড়ের রোশনাই প্রতিভাত; কি চমৎকার! এখন ঈদৃশী উত্তেজনায় টেবিলস্থ ভাস ঝটিতি কাত হইয়া পড়ে মেজেতে লিলি বিচ্ছুরিত—দাঁশ মাকাঃ ব্র গভীরে আমরা যাহারা একদা বিবাহ-গীত সাধিয়াছি অধুনা একে অন্যের কঙ্কালের হাত ধারণে পরোক্ষে আবার কচিৎ একে অন্যকে আবেশমধু আলিঙ্গনে এ কারণ এই নৃত্যের ধরণ এই-রকম নাচি—ফুলের প্রতি চাহিবার অবকাশ আমাদের নাই কেননা এই সত্য বিজানিত যে ফুল আবার ফুটিবে কিন্তু মৃতের হস্তধারণপূর্ব্বক আমোদঘন নাচের স্বচ্ছলতা আর কি আসিবে! এবম্প্রকার নৃত্যের যাদু অপরিসীম, ভগবৎ কৃপায় ইহাতে অতিমাত্রায় আমরা উদ্যমপূর্ণ, বড় সুখদায়ী লাল মাছের চিক্কণ পিচ্ছিল গতিবিভঙ্গ প্রতিধ্বনিত বারহুতের লাল পাথরে কোঁদা বিরাট মূর্ত্তির হাতের নিগূঢ়তম গঠন সৌষ্ঠবে যে রেখা তাহা নিশ্চয় ঐ নৃত্যের লীলায়িত সঞ্চালনের মধ্য পর্য্যায়, তাই বড় মনোজ্ঞ—দাঁশ মাকাঃ ব্র। যোহন একাদশী এখনও নাচে, কাঠের পুলের হিম দুর্যোগময়ী কালান্তক ধ্বনি উহাকে এখনও উদ্বুদ্ধ অনুপ্রাণিত করে, ইদানীং আর একবার সে নৃত্যভঙ্গিমার মধ্যেই—এমন যেমন ইহা নৃত্য-ভঙ্গিমার অন্তর্গত—আপন হস্ত দ্বারা পৃষ্ঠদেশ বুলায়, এবং হস্তটি আনিয়া দৃষ্টিসমক্ষে প্রসারিত পুনরায় করিল, অধুনা সে-কর রক্তসিক্ত, সম্ভবত ক্ষীয়মাণ অপরাহ্ণ উহাতে প্রতিবিম্বিত; এখন তাহার মুখে কক্ষস্থিত আলোক রশ্মি স্থির, সে যোহন একাদশী যারপরনাই শঙ্কিত মনে আবার কহিল "ওরা কি আমাকে এ রকম করেই জ্বালাবে" পরক্ষণে ফুঁ দিয়া হয় হাঁফ নয় দীর্ঘশ্বাস ছাড়িতে সময়ে, অতীব ক্ষুব্ধ বুঝায়, অনুতপ্ত কণ্ঠে বলিল

"মাস্টারমশাই আমার কি হবে" অক্ষয় মাস্টার নীরব, শুধু জ্বর প্রকোপে কম্পিত, ফলে তখন আরও করুণ স্বরভঙ্গে বৃদ্ধ প্রকাশ করিল "আমার কি হবে...আমি...আমি পাখীটার পেটের জ্বালা শুনেও মজা করেছি...কত বড় পাষণ্ড...আমি অমন চমৎকার কড়াটা কি যে চমৎকার গোল...এতটুকু খুঁৎ নেই...সেটা আছড়ে ভেঙেছি—জানো—আমি—বেয়ারিঙ চিঠি দিলে পাছে রাগ করে বলে বেচারা পরের পা ধরে পোসটো কাটে একটু জায়গা পেয়ে—তাও আমি ছিঁড়েছি অনেক শেষ চিঠিও ছিঁড়ে—ঐ শোন শোন—বলছে আমি সরযূর মত পুড়ে মরব—মরব" এবং আতঙ্কে সে দুই হাতে মুখ লুকাইল, আর যে যোগ দিল "শুনতে পাচ্ছ?" আদতে ধলতার পুলের কথা মনে আসিলেও বলা ঘটিয়া উঠে নাই, উপস্থিত 'পাপ' বাক্যটি নিরন্তর মহা খেদে উচ্চারিত তদীয় কণ্ঠে হয়, তাই আশপাশের অন্ধকার ঘোরে কৃষ্ণময়ী—সে আপনকার শিয়র দ্বারা আলোক ছটা আন্দোলিত করত নিজেই গম্ভীরভাবে কহিল "বিচার বিচার হবে—" অবিলম্বেই কাতরোক্তি শোনা যায় "আমার কি দশা হবে মাস্টার—ভয়ে গলা ...শুকুচ্ছে...বিচার..." অক্ষয় মাস্টার আর দাঁড়াইতে পারিতেছিল না, এক্ষেত্রে সমগ্র ব্যাপারটাই তাহার মনে একাধারে অনেক প্রশ্ন, ভীতি ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে, এ ব্যাপারে সে ধার্ম্মিক হইলেও কোন সান্ত্বনা দিবার মত ক্ষমতা তাহার নাই, তত্রাচ কোন মতে বলিল "ওসব ভেব না...ঘরে যাও—আমি ব্রাহ্মণ বলছি...কিছুটি হবে না...আর যদি বা হয়...তোমায় ত বলেছি...বিচার যদি ত তিনি সে বিচার করবেন...তাঁর বিচার আর তিনি এক...আমাদের কম ভাগ্‌গি...তাঁর সামনেই দাঁড়াবে—দেখা পাবে...তাঁর স্মৃতি কম বড় গা...তখন চামড়া তোলা কোন ছার! হোক বিচার যাও বাইবেল পড়...ভগবানকে ডাক..." অক্ষর মাস্টার যোহন একাদশীকে ঈষৎ অন্যরূপ দর্শনে, এ পর্য্যন্ত ব্যক্ত করে; ইত্যাকার অক্ষয় মাস্টার কথিত অর্থান্তরে যোহন একাদশী ভাবুক সে আলোর দিকে চাহিয়াছিল—বহুতর পূর্ব্বালোচনা বোধহয় স্মরণে আসে, পরে সে কিছুক্ষণ একভাবে চক্ষু বুজাইয়া নিশ্চল, এখন—বড় করিয়া চাহিয়া জলদমন্দ্র হুঙ্কার দিল "বাপের ব্যাটা—ঠিক ঠিক...হোক শালার বিচার" ইহার শেষে হঠাৎ অত্যধিক গর্জ্জনে "উড়াও বিজয় পতাকা" গীত ধরিয়াছিল; লখাই উপস্থিত শালুকদণ্ডের অবলম্বন ছাড়িয়া, অতীব মর্ম্মাহত ধ্বনিত, অভিসম্পাত কার্য্যকরী তথা যুক্তিযুক্ত হয় এই অনুধাবনে, ইতর গাল দেয় "শালা আঁটকুড়ীর ব্যাটা নচ্ছার খানকীর ছেলে...আমার আত্মা" ইহার উত্তরে রাগত যোহন একাদশী মাটির ঢেলা তুলিয়া নিক্ষেপ করে, ফলে শালুক বেপথুমান পত্রাদি ছিন্ন, বালক থামে নাই, বৃদ্ধও নিরস্ত নহে, বারম্বারই সে—লখাই শালুকের আশে পাশে যায় ও অশ্রাব্য ভাষা বলিতে থাকে; যোহন একাদশী অযথাই ঢেলা ছুঁড়িয়াছে, অধুনা লখাই আত্মরক্ষার্থে একটি ডুব দেয়, পরক্ষণেই উঠে, দেখা যায় ইলসেগুঁড়ি বৃষ্টিতে—অনেক আন্দোলিত শালুকের ইতঃমধ্যে, তারস্বরে সে কহিল 'শালা খানকীর ছেলে...তোমা মজা আমি দেখাচ্ছি...শালা আমি আজই সুহাদিদিকে সব কথা..." আর অংশ শেষ করিবার আগেই দেখে বৃদ্ধের নিক্ষেপ উদ্যত হস্ত হইতে একটি ঢেলা খসিয়া পড়ে, যাহাতে মনে হয় এ যাবৎ—হয়ত তাহার প্রস্তাবের সুরু হইতে—ইহা স্মরণেই উহার ছিল না যে তাহাদের পৃথিবীতে সুহাসিনী নাম্নী কেহ আছে, ইদানীং তাহার নামেই অব্যর্থ মন্ত্রের কাজ হয়, তথাপি একবার আপনার পৌরুষ জাহির নিমিত্ত বৃদ্ধ নিজ ওষ্ঠদ্বয় বৃথাই বিভক্ত করে, অন্যপক্ষে বালকের অনর্গল কদর্য্য মুখখারাপ শোনা যায় তৎসত্ত্বেও সুহাসিনীর নামে সে নিস্তেজ, এবং সে কোন বাক্যব্যয় না করিয়া, নিজ ব্যাগটি ঘাড়ে ফেলে ও লখাইএর প্রতি কুপিতদৃষ্টিতে অবলোকনের অন্তে রাস্তা ধরিয়াছিল—যদিও সে গান গাহে তবুও লখাইএর নানাবিধ কুৎসিত কথার সহিত ইহা তাহার কানে আসে যে "আমার আত্মা কষ্ট পাবে ত পাবে তো বাপের কি..." তথাপি যোহন একাদশী গাহিতে থাকে; অদূরে লখাই অগণন শালুকের মধ্যে, এখন একটি করদ্বারা মুখের জল নিকাশ করিতে বুলায়, অতঃপর সে "আমার আত্মা কষ্ট পাবে ত পাবে..." পুনরায় কহিল। আশ্চর্য্য যে কোনদিন অদ্যাবধি সুহাকে সেই তত্ত্ব বলে নাই, সে কথা প্রকাশ করিতে কোথায় যেমন তাহার বাধে—যদিচ সে উলঙ্গ বাসহীন, এমন যে সে আঙুল চুষিতে অভ্যস্ত, স্তন্যপানে স্বাভাবিক; উপস্থিত সে সুহা ও অক্ষয় মাস্টারের কারণ অনুসন্ধিৎসু কুঞ্চিত ভ্রূযুগের প্রতি অপরাধীর মত তাকাইয়াছিল, যোহন একাদশীর চাপা ক্রন্দনের স্বর তাহাকে বিপর্য্যস্ত করে; সুহা কিয়দংশে গম্ভীর টেবিলস্থিত ওজন পাল্লায় উহার তর্জ্জনী, এবার আস্তে চাপ দিয়াই যুগপৎ তিক্তস্বরে বলিল "ব্যাস ব্যাস বুড়ো মিনসে আর ওঁয়া ওয়া করে ধ্যান পানা কৎতে হবে না পল্টনি দেখাবার আর জায়গা পেলে

ন...কত বড় শয়তান নসরিয়া তা জান বাবা...ঐ একরত্তি ছোঁড়াকে বলে কিনা পুলিশে দেবে...এক নম্বরের...আমায় ত কিছুটি...তাই ঝাল ওর উবরি...এক নম্বরের নিষ্ঠুর গলাটিপে মুরগী মারে কিনা ভাল হবে হবে—শুনলে গঙ্গাচ্চান করতে হয় মাগো কি সব্বনেশে পিশাচ...খেশ্চান—" অক্ষয় মাস্টার পিতার জল দুই আঙুলে টিপিয়া বাহির করিতে ক্ষণে নরম মিহি গলায় উত্তর দিল "ওমন খোঁটা দিসনি মা, ঠাকুর রাগ করেন—বুড়ো মানুষ..., যদি একটু..." ইত্যাকার বচনে সুহাসিনী অধিক রুষ্ট, শ্লেষে বিদ্ধ যোহন একাদশীকে করিতে উন্মুখ, ঝাপটা দিয়া উঠে "আহা বুড়ো মানুষ বুড়ো মানুষের মুখে ঝা..." এখানে থামিয়াই উচ্চকণ্ঠে বৃদ্ধকে শাসাইল "আমি বলে দিলুম ফের যদি কোনদিন দেখেছি ওর গায়ে হাত দিয়েছ ত...আমি তোমার মজা বার করে দেব...ইঃ কড়া ভেঙ্গেছি বলে পেরাণ হাপর...আর ছেলেমানুষটার গায় হাত দিতে লজ্জা করে না...হাত খসে যাবে" ইহার পরও অক্ষর মাস্টার বৃদ্ধের হইয়া—যে অধুনা কোটের হাতায় চোখের জল মুছিবার পর উরুদ্বয়ে হস্ত দ্বয় রাখিয়া, সম্ভবত আপনাকে বিমনা করণার্থে আঙুলদ্বারা কোন বিশৃঙ্খল তাল বাজায়—অনুরোধ করিল "থাক মা ঢের ত হল" সুহা তখনও ক্রোধে ক্ষিপ্ত ধমক দিয়া উঠিল যোহন একাদশীকে যে "তোমার গীজ্জে যাওয়ার মুখে আগুন, আবার বলা হয়...কিনা আমার আত্মা যুঁই ফুলের মত সাদা হয়ে যাচ্ছে..." অপ্রত্যাশিত এহেন উক্তিতে বৃদ্ধ অত্যন্ত অস্বস্তিতে নিজত্বকে অনুভবে, তির্যক দৃষ্টিতে সুহা দুয়েকবার নিরীক্ষণে প্রয়াসী হয়, তাহা অবলোকনে সুহা, নিজ বস্ত্র সংযত করত, বিরক্ত, পুনঃ যথেষ্ট কর্কশস্বরে কহিল "ড্যাব ড্যাব করে চাইলে কি হবে—আমি বামুনের মেয়ে বলে দিলুম তোমার আত্মা না অক্কা পাবার পর—বেয়ারিং চিঠির মত খালি ঘুরবে...আমি হাততালি দেব—" এবং সে অভিশাপ দিবার কালে আঙুল মটকাইতে ছিল, এবার শোনা যায় "এত সোজা" আত্মা যুঁই ফুলের মতন হয়ে যাচ্ছে আমার—ফুঃ" যোহন একাদশী কিঞ্চিৎ সাহসে আপত্তি জানাইল "ও কথা আমি বলেছি মিথ্যুক—মিথ্যেবাদীর জাসু তুমি না বলেছিলে সেই রথের মেলাতে" ঈদৃশী উল্লেখ মাত্রেই সুহা, তদীয় ললিতভীরু ভ্রূদ্বয় চমকিত,—অন্তর্নিহিত ব্রীড়া ইহা বড়ই মৃদুরেশমী উদ্বেলিত, ইহাই মানুষের অনৈসর্গিক গোলাপ পাশের কল্পমূর্ত্তির ধ্যান-ব্যাকুলিত নয়নে গভীর কালো কূট নবজলদধর আচ্ছাদিত 'নভোমণ্ডল, ইহার সম্মুখে দিব্য চতুর শ্বেত বিহঙ্গ শ্রেণী; কালোভ্রমর মেঘ, উড়ন্ত বকযূথ একান্তে অতসী পুষ্পে নিশান যাহা হিমবায়ু চঞ্চল, ঈদৃশী স্পষ্টতায় সুহা আবিষ্ট, সে, যে ক্ষণিক স্ফটিকের কুহক ভেদ করিয়াছে তাহাতে; ইহার ক্ষণিকের, সংখ্যাতত্ত্ব নাই, বিবসনা রমণীর সুগুরু জঙ্ঘা কম্পনের পৌনঃপৌনিক স্পন্দনের একটি উহা নহে, তাহা শালভঞ্জিকা নৃত্যের ভঙ্গিমার সুরুর সামান্য লহরীত্ব—মনীষা যাহাকে ছায়ারূপে দর্শন করে, অথচ চঞ্চলবায়ুই তাহার ভাব, নলিনীদলগত জলবিন্দুই প্রতিমা, আবার পঞ্চবটির নিম্নে প্রতিভাই ইহা, ফলে তৈলধারাকে অব্যর্থ নিশ্চয়াত্মকতা দিয়াছে, এবং নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখা অক্ষয় হইয়াছে—সুহা নিথর; নিরভিমান রূপের সম্মুখে, এ হেন কজ্জল মেঘ শোভা দৃষ্টে সে নিশ্চয় বলিতেছিল যে, হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখেতি, বালিকার—হস্ত করজোড় কেননা বালিকা এ সময়—এক বালকের মানসিকতা স্মরণে বিহ্বল যে বালক ঈদৃশী মেঘ ঘটায় উড়িয়া যাওয়া বকযূথ অবলোকন মাত্রই অচৈতন্য, ঐ বিরাট প্রান্তরে ভূলুণ্ঠিত, কোচড়ের মুড়ি ছত্রাকার—ভিজা বাতাসে উড়ে, ঐ অলৌকিক ছেলেমানুষটির আশেপাশে পাখীরা মুড়ি লোভে কাছে ঘুরে তাহাদের মধ্যে সৌন্দর্য্যপৃষ্ট ছোট নিশ্চেতন দেহ—যাহার চুলগুলি ত্রস্ত; যে বালকের জন্য সুহার বড় মন কেমন করে, গত ভাইফোঁটায় সে অক্ষয় মাস্টারকে জিজ্ঞাসা করে "বাবা তোমায় একটা কথা বলব, তুমি হাসবে না বল" অক্ষয় মাস্টার কহিল, "কিছু হাসির কথা বলবি বুঝি..." সুহা আর বিলম্ব না করিয়া প্রকাশ করে "ধর আমি যদি ঠাকুরকে ভাইফোঁটা দি...তুমি কি বল..." ইহাতে অক্ষয় মাস্টার বিশেষ আনন্দিত যে এ বাসনায় গভীর অনাসক্ত ভাবের অভিব্যক্তি ছিল, এবং সুহা ছবি থাকিতেও সাদা দেওয়ালে জিহ্বার সহিত দন্তরাজির যে সম্পর্ক—জিহ্বার উদ্বিগ্নতায় চিত্তশুদ্ধ তাহার, অনামিকা স্পর্শে ক্রমাগতই রোমাঞ্চিত হয়, এমন যে তরল চরু কি ভাবে তাঁহার পরম ভ্রাতার হাতে দিবে, আঘ্রাণ করিতে অনুরোধ করিবে সে চিন্তায় বিমূঢ় হয়—এবং প্রথমে সে অনুমান করে যে, তিনি তাহার কনিষ্ঠ পরক্ষণেই বুঝে ইহাতে দারুণ হঠকারিতাও বর্ত্তমান, কেননা আচার এই হয় যে কনিষ্ঠ প্রণাম করিবে; অবাক হইয়া সুহাসিনী এখনও মেঘাকৃষ্ট, তাহার শিয়র ধীরে চক্রাকারে ঘুরে—ধান ক্ষেতের উপরে একি বিচিত্র রহস্য—সে অনেক শ্রদ্ধায় যারপরনাই ভক্তিযুক্ত মনে, ঐ দৃশ্যের প্রতি

চাহিয়া কি যেন বা বলে, আবেগে উহার নাসাপুট স্পন্দিত, এক কালেই সে নিঃশ্বাস লইতে ও ফেলিতে গিয়া স্থবির, কি যেমন সুহা বলে, নিশ্চিত তাহার বক্ষদেশ লাল, কেননা নিশ্চিত ঐ মনোরমত্বর উদ্দেশ্যে সে বলে "ইহাগচ্ছ ইহম তিষ্ট..." যে মনে সে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীব্রতের সূচনায় ব্যাকুল স্বরে উচ্চারণ করে, এবং পুনরায় তাহার কণ্ঠে ধ্বনিত হয় "হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি" যে শ্লোক পাঠে তাহার কেমন যেন ভাবান্তর ঘটে—সে সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পায় আপন দৃষ্টির সমক্ষে সে বারান্দায় পরিক্রমণরত ও মহা আবেগে 'এবমুক্ত্বা ততো রাজন মহাযোগেশ্বরো হরি দর্শয়ামাস পার্থায় পরম রূপমৈশ্বরম' হইতে শেষ পর্য্যন্ত পাঠ করে ও নিজেকে সুহা দেখিতে পায়, এই উপলব্ধি সে বাবাকে বলে—আশ্চর্য্য! যে সুহা অপহরণে পটু!—অধুনা "হে সখেতি" বলিয়া নিঃসঙ্কোচে, গললগ্নীকৃত বাস উহার নমস্কার করে, তাহার চোখে সম্ভবত জল ছিল; এমত সময় যোহন একাদশী তাহার নিকটে আসিয়া ভেঁপু বাজাইয়া থামিয়া কহিল, "আমি সর্ব্বত্রে খুঁজছি...তুমি বলি হারিয়ে গেলে নাকি..." পরক্ষণেই ভেঁপুর মুখটা ঠিক করিতে ক্ষণে প্রশ্ন করিল "কাকে অত ঘটা করে নমস্কার করছিলে...ঠাকুরত এই দিকে..." সুহা অত্যন্ত উৎফুল্ল হওয়ত উত্তর দিল "যোহন একাদশী মেঘ দেখ..." যোহন একাদশী ঘন সবুজ ভেঁপুটা ওষ্ঠের নিকট লইয়া কহিল "খুব বৃষ্টি হবে.." সুহা ঈষৎ ক্ষুণ্ণ ইত্যাকার উক্তিতে, পুনরায় উড়ন্ত বক দর্শনে উহা নির্দ্দেশ করত বলিল "দেখ দেখ বক...কি সুন্দর..." যোহন একাদশীর ভেঁপুতে এবার আওয়াজ করিল, ইহাতেই এতক্ষণ পরে রথের মেলার নানাবিধ বাজনা, নিছক শব্দও উহার অঙ্গীভূত, একত্রে অদ্ভুত ধ্বনিসমন্বয়ক্রম সুহার কর্ণগোচর হয়, বৃদ্ধ ভেঁপু বাজাইতে ক্ষণে ভ্রূ ঊর্দ্ধে টানিয়া আশ্চর্য্যভাবে চক্ষু তির্য্যক ছাঁদে তুলিয়া উড্ডীয়মান বিহঙ্গ সারি নিরীক্ষণের পর, ভেঁপু নামাইয়া মন্তব্য করিল "ওরা কোথাও যাচ্ছে..." সুহা ইহা শ্রবণে প্রথমে ম্রিয়মাণ, ক্ষণেক শিয়র নত হয়—পরক্ষণেই সে শক্তিমত্তার পরিচয় দিল "আমি মেঘকেই মেঘের উপর দিয়ে ওদের...কেননা ঠাকুর...ওদেরই নমস্কার করছিলুম..." যোহন একাদশী একথায় অসত্য ভাবে হাসে, আর অবশ্য আকাশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করত কহিল "ও তে কি আছে...দো...হিঁদুরা একনম্বর অন্ধ..." সুহা ইহাতে বিরক্ত হইলেও, আপনাকে সংযত রাখিয়া বলিল "বাবা বলেছে আত্মা যখনই যূঁই ফুলের মত সাদা হয়ে যায়...তখনই সে অনেক কিছু দেখতে পায়" ঈদৃশী উক্তিতে যোহন একাদশী হাসিয়া খুন, সে বারম্বার সাপুড়ের ন্যায় ভঙ্গিতে অতঃপর ভেঁপুখানিক বাজাইয়া চলিয়া গেল; সুহা একটি নিঃশ্বাস ফেলিবামাত্র রথের দিকে নজর করে, সে কিয়ৎ পরিমাণে যোহন একাদশীর অবজ্ঞার মর্ম্মাহত, তবু, এইখানে লখাইকে রথযাত্রা পর্য্যবেক্ষণে তন্ময় দেখিয়া সত্বর, আসে—এইটি পাঁচতলা রথ, নবরত্ন, সমন্বিত, সর্ব্বোপরি কোঠায় লাল চেলী পরিচিত মহৎ কল্পনা, নীচ হইতে ভক্তজনে ফুল মালা পয়সা ছুঁড়িয়া দেয়, রথের উপরিস্থিত ব্রাহ্মণরা অদ্ভুত দক্ষতায় সেগুলি ধরে, তাহাদের মধ্যে কেহ জগন্নাথের পদে ফুল স্পর্শ করত পুনরায় নিম্নে নিক্ষেপ করে, সুহা যখন ঐ ব্যস্ততায় চলচ্ছক্তি রহিত তখন লখাই তাহাকে কহিল "দেখ সুহাদিদি ঐ দেখ নাগর দোলার ওপাশে যোহন একাদশী না পাঁপড় ভাজা খাচ্ছে..." সুহা জবাব দিল "মরুক গে" তবু সে দেখিতে চাহিল, চোখ পড়িল নাগর দোলার উঠতির দিকে, অন্যপার্শ্বে, দোলনার উঠার ফাঁকে ফাঁকে বৃদ্ধ প্রতীয়মান, হয়ত এতাবৎ সে নাগর দোলার যাত্রীদের আনন্দ যথোচিত উৎসাহের সহিত অবলোকন করিতেছিল কিন্তু এখন তাহার একপাশ-চেহারা ওতপ্রোত, সে যেন কিয়ৎ পরিমাণে ভাবুক—সে আকাশের দিকে, নিশ্চিত অপলক দৃষ্টি মনে হয় চাহিয়া আছে; সুহাকে নিকটস্থ উত্তেজনা পুনঃ আকর্ষণ করিল—রথের সম্মুখে উত্তাল নাম গানে বালিকা মনরসসিক্ত, খোল বাদকদের নৃত্যসহ হাতের বিদ্যুৎ চঞ্চলতা, করতাল, ঝাঁজ হারমোনিয়ম অনেক খঞ্জনীর সোনা, শঙ্খের শ্বেত, তূরীর বক্রতা, রথের গায়ে নানা চিত্র, অগণন নামাবলীর পাটকেল, রথোপরি দারুনির্ম্মিত সেপাইর স্পন্দন, ও রথ সংযুক্ত রঙীন কাঠের ঘোড়া, ঊর্দ্ধে লালচেলীর মহিমা, আর তাহার আশেপাশে কর্ম্মব্যাপৃত কয়েকজন, ইদানীংকার মেঘের সম্মুখ মানুষ কি সুন্দর দেখিতে!—এবং অনবরত হরিধ্বনির উচ্ছ্বাস—সকল কিছুতে সুহার গাত্র অপার্থিব উদ্দীপনায় শিহরিত; সে আশ্চর্য্য সমাধির অন্তরে;...তথাপি কোন মতে কপালের কেশরাজি সরাইয়া কোমরে আঁচল বাঁধিতে ক্ষণে কহিল "ওরে লখাই চ চ রথটানি...চ দড়ি ছুঁবি চ...ওইখানটা ফাঁকা চ" লখাই এহেন প্রস্তাবে মন্থিত; সে ভেঁপু বাজাইয়া নৃত্যভঙ্গিমায় আধ-ছুটন্ত অগ্রসর হয়; যেখানে সর্পিল রশি মাটিতে লুণ্ঠিত, দুজন দাসো উদ্বৃত্ত রশি সরায়—ইহার কিছু

অগ্রে তাহারা দড়ি ধরে; সুহা উহা ধারণ করত ভক্তিপূর্ণমনে আপন মস্তক উহাতেই ঠেকাইয়া চলিতে থাকে, পুলকে বালিকার চোখে হর্ষ অশ্রু, কহিল, "ছোঁড়া দড়ি ধরেছিস ত..." লখাই দড়ি ধরিয়া সুললিত নাম গানের সহিত কখন ভেঁপু বাজায়, কভু ভেঁপু সরাইয়া কণ্ঠ মিলায়, নাচে, জয়ধ্বনি দেয়—এখন সে গলার শিরা ফুলাইয়া যে-নাম গান মুখর তাহা প্রশ্নের উত্তরে থামাইয়া হুঙ্কার দিল "ধরেছিস্...কেন" সুহা কহিল, "ঠাকুরের কাছে পাথ্থনা কর...কিছু চা..." অধুনা তাহার উত্তমাঙ্গ রশিধৃত হস্তের ইতিমধ্যে রশিতেই ন্যস্ত, লখাই সুহার উপদেশ শ্রবণের সঙ্গে উহারই মত আপনকার উস্কো চুল যুক্ত মস্তক রশির উপর রাখিয়াছিল, উত্তর করে "কি বলছো" পরক্ষণেই ভেঁপু বাজায়, সুহা ধমক দিয়া বলিল "ঠাকুরের কাছে না...কিছু বল...চাইতে হয়..." এবং তাহার চোখে কীর্ত্তনের দল, ঘোটকের অঙ্কিত চক্ষু, বন্দুকধারীর হাতের কিয়দংশ, পরে কর্ম্মরত ব্রাহ্মণ, উড়ন্ত ফুলমালা পয়সা, লালচেলী তদোর্দ্ধে অতসী নিশান; লখাই কহিল "তুমি কি চাইলে..." সুহা উত্তর দিল "আমি বাবা যা বলে দিয়েছে তাই..." ইহাতে লখাই হঠাৎ ভেঁপু বাজাইয়া থতমত পলকেই প্রশ্নমান দৃষ্টিতে তাহার নয়ন আয়ত, সুহা বলিল "বাবা বলেছে...মোক্ষ চাইবি...আর যেন জম্মাতে না হয়...বাবা বলেছে—" সুহা নিয়ম অনুযায়ী ইহাই নিশ্চয় প্রার্থনা করিয়াছে; লখাই কিয়ৎক্ষণ নিমিত্ত উহার প্রতি চাহিয়া চোখ বুজিল, এবার কপাল রশিতে ঠেকে—, সুহার কানে এখন মেলার সমবেত ধ্বনিক্রম—সেলাই বাঁশীর সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণ স্বর, উল্কী করার শব্দের গুঞ্জন, অগণন মাটির বেহালাকে ব্যাহত করিয়া শঙ্খধ্বনি,—আমের মাছির অনুরণন, আবার ভেঁপু, পাঁজড়াসার আফিমচি—বাদুড় চোষাগাল যাহার—বেহালা বাদক, দিশী কায়দায় বেহালায় ধরিয়া দ্রুত লয় হইতে এই মাত্র অপসরণ করে—তাহার মাথায় টোল খাওয়া টুপি; সমস্ত স্বর মিশ্রিত অবস্থায় কালো মেঘের সহিত মিলিয়া বালিকার মধ্যে দারুণ খেলা খেলিতেছিল, এবং অপ্রত্যাশিত হারমোনিয়মের শব্দ লহরী তাহাকে আশ্বাস দেয়, ফলে ইতঃপূর্ব্বের ঝাঁঝের আওয়াজ উহাকে ধমক অথবা হতাশ করিতে পারে না; সঙ্গীতের মধ্যে কণ্ঠস্বর বিবিধ[illegible]ক অশ্রুতপূর্ব্ব, মনোজ্ঞ গাম্ভীর্য্য আনীত করে আর যে যেহেতু রথ গতিশীল, সেও এতাদৃশ ধ্বনি উজ্জ্বলতায়, মনোযোগ রাখিয়া ধীরে রশি টানে, উপস্থিত সুহার কীর্ত্তনের দলের অজস্র উত্তোলিত অনমিত হাতের ফাঁকে, এ কারণে যে সে কিছু অংশে বাঁকা দৃষ্টিপাত করে—অবলোকন হয় যে সেই দৃশ্যে তাই নিমেষেই সে পূর্ণ ঝটিতি সোজা হওয়ত দণ্ডায়মান কহে "ওরে লখাই আবার বক উড়ছে নমস্কার কর নমস্কার কর" সুহা এমতভাবে বলে যেন লখাইএর অভিজ্ঞতা আছে; কিন্তু, লখাই মাথা তুলিয়া স্বাভাবিক যদিও, কিছুই না বুঝিয়া ভেঁপু বাজাইতে গিয়া রুখিয়া ব্যাঘ্র বিক্রমে সাড়া দিল "কি" ইহাতে সুহা হয়ত ভাষায় উত্তর দিতে অপারক তাই স্বীয় তর্জ্জনী সঙ্কেতে ব্যোমচারী সুকুমার সংস্থান দর্শাইল, অন্য পক্ষে লখাই নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য না দেখিয়া, আশ্চর্য্য এই, ঐ তর্জ্জনীর প্রতি বিস্ময়ঘোরে অপলক নেত্রে চাহিয়া থ, সুহার তর্জ্জনী মনে হয় হলুদ-হওয়া শ্বেত মর্ম্মর নির্ম্মিত—মনে হয় পদ্ম ও তরঙ্গকে সর্ব্বপ্রথম প্রতীকত্বের ঘর চিনাইয়াছে, সম্ভবত লখাইএর ভাবনায় আরও কিছু এবং তাহার দেহ অভ্যন্তর ফলসা, সে বিমূঢ়; এ সময় পিছন হইতে রব উঠে "দাঁড়ালে কেন টান টান" তাহা শ্রবণে মাত্রই সুহা কিঞ্চিৎ বিচলিত, ঝটিতি রথ টানে, তাহার দেহ বেশ হেলিয়া গিয়াছে, তথাপি ইতিমধ্যে বলে, "নমস্কার কর কর" লখাই এতাদৃশ তাড়ায়, উপরন্তু রথটানার ব্যস্ততায় পলকেই কপালে একটিবার ভেঁপু সমেত হস্তদ্বয় ঠেকাইল, সুহার ইত্যাকার আব্দার নির্দ্দেশ মানা তাহার সংস্কার; এখন, দারুণ বিভ্রান্তিকারী হট্টগোল সত্ত্বেও, সে সুহার মসৃণ কণ্ঠস্বর শোনে "কি সুন্দর না" আর যে ফলে অল্পনিমিত্ত সে বিপর্য্যস্ত, অনন্য উপায়ে ভেঁপুর বিসর্পিল দুর্বোধ্যতার দিকে চাবুক অন্তহীনতার প্রতি দৃষ্টিপাতে বিশেষ অস্বস্তি তৎকর্ত্তৃক মনন হয়, ও পরক্ষণেই সে মেলার উদ্দামতায় চোখ বুলাইয়া এবার আকাশের দিকে মুখমণ্ডল উন্নত করে, এ কারণে যে সুহার নয়ন ঐ অভিমুখে ছিল, বালক দূরস্থিত লক্ষ্য হইতে কিছু বুঝিতে উৎসুক—অধুনা, দেখা যায় যে, ছোট একটি নিঃশ্বাস লইয়া, আবাল্য স্বভাববশতই নিজ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ওষ্ঠে স্থাপনে উদ্যত, তাই সে রশি ছাড়িয়া স্থির, কিন্তু অবিলম্বে পাশ হইতে ধাক্কায় সে সজাগ, ও রশি পুনরায় ধরার সঙ্গেই দেখিল, সুহার চুল খোলা, হিম বায়ু চকিত, দুইদিকে দুই হাত রশি-ধরা, ঈষৎ এক পার্শ্বে তাহার দেহ হেলান, বালিকা গতিশীল, অথচ তাহার মহান সুললিত নয়ন আকাশে স্থির, আর যে সে বলে "কি সুন্দর না" লখাই এরূপ চমৎকার অধর স্পন্দন কখনও দেখে নাই, যদিচ কিছু বিড়ম্বিত, শিয়র তাহার তবু আন্দোলিত

হয়, সে নিশ্চিত কিছু বুঝিয়া থাকিবে উপস্থিত তাহারা রথটানিতে ঠিক টিয়া-পাখীর সার্কাসের সামনে, লখাই তদ্দৃষ্টে বলিয়া উঠে "উই যে গো সার্কেস টিয়া পাখীর—টিয়া পাখী কামান ছুঁড়বে—চল না" এতাদৃশ প্রস্তাবে সুহা রশি ছাড়িয়া কহিল "চ অ আগে ফুল নি—" তাই রথের নিকট অগ্রসর হইয়া একটি আনি কোমরে গোঁজা আঁচল হইতে লইয়া রথে ঊর্দ্ধে ছুঁড়িল, ফুলমালা নিমেষেই হাওয়া ভরে নিম্নাভিমুখী সুহা উহা তৎপরতার সহিত ধরিয়া নিজ মস্তকে ভক্তিভরে তাহা স্পর্শ করে, মালাটি আঁচলের খুঁটে বাঁধিতে সময় লখাইকে সস্নেহে আশ্বাস দিল "তোকে মানে তোদেরও—এর থেকে একটু দেব—" লখাই তখনই অত্যন্ত আধুনিক কণ্ঠে জবাব করিল "দোৎ ও দিয়ে কি হবে—আমি ভাবছি যোহন একাদশী—" সুহা তাহার দিকে আয়ত নয়নে চাহিয়া উহাকে বুঝিবার চেষ্টার সহিত বলিল "সে কিরে পেসাদী ফুল অমন বলতে আছে—" পরে তিক্ত স্বরে শেষ করিল "মরুক যোহন একাদশী—মহা ছ্যাঁচড়া খিশ্চান ওর সঙ্গে আসাই ভুল হয়েছে—ঊষা এল না বলেই ত—" স্বীয় পদবন্ধ লখাই যে অনুধাবনে অপটু তাহা অনুমানে এখন নিজ বক্তব্য পরিচ্ছন্নরূপে প্রকাশ করে "মেঘের উপর দিয়ে...না...আমি...বকগুলো উড়ছে বলে...নমস্কার করছি...বলে কিনা হিঁদুরা অন্ধ..." লখাই এতক্ষণ পরে জানে যে সে বেশ কিছুকাল যাবৎ সরলভাবে নিঃশ্বাস লয় নাই, অধুনা স্বাভাবিক, মুহূর্তব্যাপী ছোট হাসি তদীয় মুখে দেখা দেয়, সুহাকে অতি সহজভাবে নির্ণয়ের অন্তে পুনরায় সে আকাশের দিকে নয়ন ভরিয়া লক্ষ্য করে, যে আকাশ সত্যই হৃদয়ে অবিচল এ পর্য্যন্ত, মনস্বিতা তাহার ইহাতে সুখী নহে কেননা যাহা তাদৃশ মহিমান্বিত চিত্ররূপে ওতপ্রোত হইয়াও অর্থহীন, উহা শুধু অন্ধকার, উহা নিছক উদ্বেগ, উহা কেবল মাত্র নাম, ইদানীং যদিও মেঘ ব্যতীত সেখানে কিছু নাই তবু লখাই পূর্ণ, নিশ্চয়ই, তদীয় ভাসা-স্মৃতিকে আরোপ সে এখন করে, অতএব মেঘ ত ছিলই এবার সর্ব্ব সঙ্গীতই মুখর কেননা বক আসে, ইহারা মানুষের ভ্রূকুঞ্চিত রেখা ধরি গমনশীল, তাহারা অথৈ নির্জ্জনতা—তখন এ শোভা দর্শনে সে তৃপ্ত এবং অবলীলাক্রমে যেহেতু বীজগণিতাত্মিক ত্রিভঙ্গ ছোট দেহে ধূমায়িত হইয়া উঠে, আর যে ভেঁপুটির বিসর্পিল কাঠামো আচম্বিতে উহার মধ্যে গ্রাহ্য হয়, তাই ঝটিতি তাহা অধরে স্থাপনে বাজাইতে থাকে; এখন সে শূন্যতার প্রতি নয়ন রাখিয়া বিসর্পিলতা বাজাইতেছিল—এমত যে বালকের আঙুল চুষিবার প্রয়োজন স্মরণে আসে নাই; সুহা নিজ ভাবনা জ্ঞাপনের পরেই কিন্তু অন্যত্রে দৃষ্টি সঞ্চালন করে, উত্তরের আশায় ছিল না, দু-এক পা অগ্রসরও হয়, হঠাৎ সে একস্থানে থামিয়া পড়ে, কিয়ৎ পরিমাণ দূরে পাঁপড় ভাজার চুল্লীর ভয়ঙ্কর আগুনের শিখার উপরে শূন্যতা চমকিত-কাঁচের ন্যায় তাহার মধ্য দিয়া বিপরীত দিকের সব কিছু আশ্চর্য্যজনক; ঐখানে মেলার পসার নাই, পর পর শুধু বৃদ্ধদের অস্তিত্ব প্রতীয়মান, একজন বৃদ্ধ লাঠিতে ভর দিয়া দণ্ডায়মান, ইহার অধর ক্রমাগতই সম্মুখে পশ্চাতে যাওয়া আসা করে, তাহার পায়ের নিকট অনেক মেলানী, তাহারই কিছু দূরে দুজন বৃদ্ধ কথা কয়, ইহাদের একজন স্কন্ধস্থিত গামছা দিয়া চোখ মুছে, অবশ্য এখন স্কাউট একজন—মেলায় কাজ করিতে ইহারা আসিয়াছে—চমকিত কাঁচের মধ্যভেদে ওতপ্রোত সংস্থানকে গর্ব্বিত পদবিক্ষেপে বিচলিত করত চলিয়া যায়, পুনরায় দেখা গেল ধীর পদে একজন বৃদ্ধ আসে—সে আপনার কেশহীন মাথায় হাত বুলায়, অন্য আর এক বৃদ্ধ বুঝা যায় হাঁপানি রোগাক্রান্ত, আপন লাঠিতে ভর দিয়া হাঁপায়, এবং অবশেষে দূরে যোহন একাদশী, ভেঁপুটি তাহার পকেটে রক্ষিত সত্ত্বেও বেশ চোখে পড়ে, বাম হাত কোমরে ও ডানহাতের তর্জ্জনী নিশ্চিত অধরে, দৃষ্টি অবশ্যই আকাশের দিকে, সে সমস্ত কিছুর সহিত চমকিত-কাঁচের ন্যায় শূন্যতার মায়ায় অতি বড় বিস্ময়কর প্রহেলিকা এবং সর্ব্বৈব কম্পিত তদীয় বর্ত্তমানতা, তাহার জন্য জলধর বিমণ্ডিত নভঃস্থলে নিশ্চয় কিছু ছিল তাহাই অবলোকনে নিবিষ্ট—পিছনে দুরতিক্রম্য ধান ক্ষেত; সুহা নির্নিমেষে এই বাস্তবতা নিরীক্ষণে স্থির; এতগুলি বৃদ্ধের মধ্যে তাহার বিদ্যমানতা বালিকাকে অচিরাৎ ফুলের আঘ্রাণ লইতে, স্রোতস্বিনী দেখিতে, পলাতক কাঠবিড়াল লক্ষ্য করিতে, উষ্ণ কিছু স্পর্শের মধ্যে আনিতে আহ্বান করে, সে হতবাক কোন কিছুতেই সায় দেয় নাই কেবলমাত্র একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়াছে—হয়ত যেহেতু যোহন একাদশীর বউ উধাও হইয়াছে, কখন যে লখাই তাহার, সুহার নিকটে আসে—ইহা সে জানিতে পারে নাই; লখাই সহসা বলিয়া উঠে "ঐ যে গো যোহন একাদশী" সুহা ঈষৎ থতমত এ কারণ যে এ-ঘোষণার জন্য সে প্রস্তুত ছিল না, উত্তর দিল "দেখেছি দেখ দেখ আগুনের হলকার উপর কেমন কাঁচ কাঁচ কি সুন্দর এর মধ্যে দিয়ে দেখ—" লখাই

যদিও সে মায়ার মধ্য দিয়াই এতাবৎ দেখিতেছিল, এখন পৃথকভাবে সদ্য মায়া নির্ণয়ে বিস্ময়ে কহিল "আরিঃ বাস কি অদ্ভুত না সুহাদিদি চমৎকার কি সুন্দর সত্যিই কি ক'রে" ও পরক্ষণেই ঝটিতি, অবাক হে. সে আপনকার একটি হাত দ্বারা এমত মায়াকে মনে হয় কব্জা করিতে একান্ত অভিলাষী তাই হাতটি সম্প্রসারিত, কিন্তু ঐ মায়াকে নির্দ্দেশ করে নাই, বরাভয় মুদ্রায় উহার প্রতিবিম্ব লইতে প্রয়াস পায় নাই, তর্জ্জনী সঙ্কেতে উহার নিয়লিথিক দূরত্বকে—ইতিমধ্যে গঙ্গার স্তোত্র—ইঙ্গিতে উদ্যত হয় নাই, শুধু উহার উচ্চতা নির্দ্ধারণেই ইচ্ছুক, আর যে তখন কহিল "কি সুন্দর না।" যাহারা আর একদিকে পাঁপড় কিনিতে পড়িমরি, তাহারা হইতেও পারে, উহাদের নজর করে, এবার বিমোহিত লখাই পুনরায় বলে "দেখ দেখ এর মধ্যে দিয়ে কি ফাসকেলাস সুন্দর লাগছে ওকে" অর্থাৎ উপস্থিত আফিমচি বেহালা বাজিয়ে অন্য ধারে ছিল, সে বেহালা বাঁধে, বালক আবার যোগ দিল "দেখ দেখ সাঁইকে কেমন সুন্দর লাগছে" তখনই মায়ার অন্যপার্শ্বে সাঁইকে দেখা যায় যাহার একটি চোখ নাই—যদিও দাড়ি আছে তবু কণ্ঠের গো-হাড় ও তুলসীর মালা পরিদৃশ্যমান, ঘাড় অবধি লম্বা চুল, পরণে আলখাল্লা, অবশ্য আদতে সাঁই নয়; লখাই ভারী আহ্লাদিত, ঈদৃশী মায়া নিশ্চয় স্বপ্ন নহে—ইহা এমনও যে, ধমনীতে বৃত্তি, অজানিতেই মতিত্ব ও হৃদয়ে উহার অধিষ্ঠান—অধুনা সে কেন যেমন আঙুল মুখে দিতে ঔৎসুক্য পরতন্ত্র, কয়েক মুহূর্ত্তের পর বৃদ্ধসকলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠা বাহিরে আনে এবং ধীরে কহিল "মা যদি আসত..." ও অতিমাত্রায় তৎপরতায় শেষ করে "বেশ ভাল হত না..." এই বক্তব্য তাহাকে নিজেকেই খানিক অস্বস্তি দেয়, সম্ভবত সে অপ্রস্তুত, সম্ভবত সে হয় কুণ্ঠিত—ফলে বাঁকাচোরা স্বরে ইত্যাকার মনোভাব নিষ্পত্তি সে করিল "সুহা দিদি পাঁপড় ভাজা কিনবে না..." আর তখনই ভাজা তৈলময় পাঁপড়ের দিকে চাহিয়া থাকার মধ্যেই তাদৃশ কুহকের রহস্যের প্রতি তাহার দৃষ্টি যায়; উপস্থিত, উহারা তখন টিয়া পাখীর সার্কাসের তাঁবুর কাছে, ভিতরে খেলা চলিতেছে, হাতের পাঁপড় শেষ প্রায়, তাহারা খেলার কামান দাগার অপেক্ষায় কেননা উহাতেই সমাপ্তি; কিছুক্ষণের মধ্যেই যখন লখাই হাতের তেল মাটি মুছিতে ব্যস্ত, সুহা কোথায় মুছিবে ভাবে, এসময় কামান দাগার আওয়াজ হয়, এসময় দারুণ মেঘ গর্জ্জন শ্রুত হয়, এসময়ে স্কাউটদের মুখে হুইসিল, ইহারা ছুটে, ইহারা হুইসিল বাজায়—এবং রব উঠে "ওলাউটো—ওলা ওউটো—কলেরা কলেরা—" স্কাউটরা ষ্ট্রেচার লইয়া সত্বর কোথায় উধাও, একদিকে সার্কাস ভাঙ্গিয়াছে—না-ভাঙ্গা খেলা সকল হইতে, উহাদের দর্শক সকল, ছেলেপিলে কোলে কাঁকে তুলিয়া পলায়নে ব্যস্ত, সুহা চারিদিকে বিমূঢ় চাহনিতে দেখে—একদিকে রথ ও ত্রস্ত মানুষেরা কিছুটা কীর্ত্তনের দল, পাশে টেন্ট এবং উড়ন্ত ইউনিয়ন জ্যাক—আর একদিকে ধাবমান অনেকে, ইতিমধ্যে অনাবশ্যক হুইসিল ও মেঘগর্জ্জনের মধ্যে সুহা দূরাগত হম্বারব শুনিল—অতীব মোহপাশে বন্ধনকারী গাভীর ক্রমাগত স্বর! তাহাতে সে সম্বিৎ ফিরিয়া পায় এবং তৎক্ষণাৎ ভীত কণ্ঠে শঙ্কায়, এলো খোপায় কেশরাশি পরিণত করিতে থাকিয়া, কহিল "চ লখাই চ চ আর দেরী নয় পালাই" আর তখনই দুইজনে দৌড়াইতে আরম্ভ করে, অবিলম্বে দুঃসহ বৃষ্টি নামিল, আকাশ আরও কালো ক্বচিৎ বিদ্যুৎ ঘটা, সর্ব্বত্রই মেলা-ত্যাগী অনেক ভয়ার্ত্ত, সুহা দারুণ বেগে ছুটিয়াছে সহসা একদা স্মরণে আসে যে লখাই নাই, এ কারণে সে পিছু ফিরিয়াই থামে, পরণের বসন বেশ সিক্ত তাই পায়ের সহিত সংসক্ত বস্ত্র আলগা করিতে সময় দেখে লখাই ছুটিতেছে ও সেই অবস্থায় বালক বলিল, "আচ্ছা আমরা ত পাঁপড় বেশী খাইনি—" সুহার এ কথায় জবাব দিবার মত মন নাই, সে ক্ষুরধার বৃষ্টিতে মেলাটির দিকে অবাক হইয়া চাহিয়াছিল, স্কাউটদের নিশান ধ্বজাদণ্ডে প্রায় জড়ীভূত, রথের নিশানগুলি তথৈবচ অবশ্য যেগুলি টিনের সেগুলি নহে, তবু রথ চলে, দারুণ কীর্ত্তন হয় তথাপিও, সে আপনার মুখমণ্ডল আঁচলের খুঁট খুলিয়া মুছিতেই প্রস্তরবৎ, সে যে কি ভাবিতেছে তাহা সে জ্ঞাত নহে, হঠাৎ আপনার আঙুলে চোখ পড়িল, সেখানে তেলের রেশ ছিল, দ্রুত নিঃশ্বাস পড়ার হেতুতে সে নিশ্চয় নিজ মনস্থির করণে সমর্থ হয় নাই; ইদানীং লখাই নিকটে আসিয়া—পলায়নে যারপরনাই খুসী হওয়াই তাহার স্বভাব, ক্রমাগতই নিবিড় অন্ধকারে নিঃসঙ্কোচে যে যাইতে পটু—আনন্দে নাচিয়া উঠিয়া, ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত উহার, জানিতে চাহিল "অমন ঠায় দাঁড়িয়ে আছ, চল—তোমার—" সুহা বালকের কথায় চেতনা ফিরিয়া পাইয়াছে, আর যে নিজ সাড়ীতে আঙুলের তেল মুছিতে সময় বলিয়া উঠিল "হ্যারা সে মুক্‌পোড়া কোতা—যোহন একাদশী" ও এ বিস্ময় প্রকাশের সঙ্গেই সে আপন গণ্ডে তর্জ্জনী স্পর্শ করে, অগণন বৃষ্টি ধারা তদীয়

গণ্ডদেশ বহিয়া যায়, আঁখি পক্ষ্ম মুহুর্মুহু স্পন্দিত, এবং গণ্ডদেশে তর্জ্জনী শীর্ষ ছোঁয়া এরূপ সুহাসিনী অর্থাৎ এহেন ভাবুক মুখমণ্ডল এক অবিস্মরণীয় আলেখ্য—লোকোত্তর প্রতিভা বিমণ্ডিত শ্রীযুক্ত তাঁতের প্রশস্তি শোনার পর অধুনা যুগ্ম বাঁশরীর প্রার্থনায় স্থির! সুহার উদ্বেগ, আর্দ্রতা সত্ত্বেও অধরের যে বিবর্ণ, ইহা লখাই প্রত্যক্ষে সক্ষম, সে বৃষ্টির নোনাজল খানিক শুষিয়া মেলার দিকে অবলোকনে, খুব তুচ্ছ প্রশ্নজ্ঞানে, নিঃসন্দেহে কহিল "মাকড়া বাড়ী গেছে—ইস্ মেলাটা...তোমার কত কি..." এবং ঝটিতি কথা থামায় কেননা তাহার চোখে পড়ে সুহা এক হাতে, পদ সঞ্চালনের সুবিধার নিমিত্ত, গোড়ালির কাছের কাপড় সঙ্কুচিত করে, আর যে তাহাকে—লখাইকে, ভাবিবার অবকাশ না দিয়া, বিদ্যুৎ বেগে মেলা অভিমুখে দৌড়ায়, লখাইও অবিলম্বেই সুহাকে ধাবমানদৃষ্টে চকিতেই অনুসরণে ব্যাপৃত হয়, পশ্চাতধাবনের সময় "সুহাদিদি সুহাদিদি...কোথায় যাচ্ছ" বলে; বালিকা নিশ্চয় স্বীয় কর্ত্তব্য স্মরণে, গতিশিথিল করত তারস্বরে উত্তর দেয় "খবদ্দা এগোসনি মুখপোড়া...আবার আসছিস্ হতভাগা...মরবি—আমার দিব্বি—এগোসনি—আমি যোহন একাদশীকে খুঁজতে যাচ্ছি—তুই থাক—ওখানে মড়ক লেগেছে—" লখাই থামিয়াছিল, সে খুঁ খুঁ শব্দে মাটিতে পা আছড়াইয়া কহিল "তুমি যাচ্ছ যে...সে নিশ্চয় বাড়ী গেছে—" ইহাতে বিরক্তিত সুহার আজ্ঞা শ্রুত হয় "এক পা এগোবি না, হতচ্ছাড়া—তুই ছেলেমানুষ কলেরা মড়ক—দাঁড়া ওখানে" সে আধ-ছুটন্ত, লখাই জানাইয়াছে যে "আমি ত কাঁঠাল খাইনি" তদুত্তরে সুহা ছুটিতে থাকিয়া বলিল "না...না" তাহার সিক্ত বস্ত্রপ্রান্ত পদ সঞ্চালনে, সঙ্কোচ সত্ত্বেও, ব্যাঘাত সৃষ্টি করে; এখন সে মেলায়, কতিপয়, টোকা, কিছু ছাতা প্রত্যক্ষ হইল, ভীড় নাই—শুধু দোকানিরা পসরা সামলাইতে উৎকণ্ঠিত, মেলার যন্ত্রত্ব বিনষ্ট হইয়াছে, কে একজনা শতচ্ছিন্ন মলিন বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদিত করত উবু হইয়া বসা, কম্পিত হস্তে বিড়ি খায়, প্রায় প্রত্যেকেই নানাবিধ ভঙ্গিতে অনন্য উপায়ে থ, ভাটি সকল নিভিয়াছে এখনও কোথাও কোন ক্ষেত্রে ধূম নির্গতবান , শুধু স্কাউটরা তদারকে ব্যস্ত, সুহা আপনার চুল রাশি নিঙড়াইতে সময়ে এবম্বিত নির্জীবলক্ষণ, উপদ্রুত দুঃসময়ের পরে সমগ্রতা, শঙ্কিত মুখ সে লক্ষ্য করে, তদীয় ওষ্ঠ বিভক্ত কেননা সে তিলেক বিলম্ব না করিয়া, স্বীয় ব্যাকুলতা, উদ্বেগ জানাইবে, অথচ ইহাও, তাহার গণ্ডদেশের পেশী সঙ্কোচনে প্রমাণিত হয়—অবশ্য সে-সঙ্কোচন কষ্টে, যে পশুসুলভ চীৎকার জন্য সে প্রস্তুত, উহার স্নায়ু তীক্ষ্ণ ক্ষিপ্ত, জিহ্বা সংযম মানিতে চাহে না, এমনও সময় চোখে পড়ে—নিম্নজাতি সম্ভূত এক লোক খুব সৌখীন ধরণে সজ্জিত অর্থাৎ গায়ে উড়ুনী—সে ওটো-দিল-বাহার ক্যানভাস করে, একটি লোকের শিরা বহুল লোল চর্ম্ম হাতের পিঠে, সে উপস্থিত কিঞ্চিৎ সুগন্ধে ঘষিয়া দিল, বৃদ্ধ হাতখানি নাসার বিবরের নিকট অদ্ভুতভাবে ধরিয়া, আঘ্রাণে তন্ময়, হাতের নিম্নে মৃদু স্মিতহাস্য রেখা, উপরে পাকা ভ্রূর তলে ছানি পড়া চোখ দুটি—আশ্চর্য্য মোহান্ধ; সুহার এ সকল আকর্ষণ ঈষৎ মাত্র, অথচ অনুসন্ধানের মধ্যেই নজর হয়; সে যতদুর সম্ভব তন্ন তন্ন করিয়া খোঁজে, ইদানীং তাহার গ্রাম্য গলায় যোহন একাদশীর নাম উচ্চারিত হইতেছিল, মেলার পশ্চিমে যে ক্ষেত, তাহাতে মহিষের কঙ্কাল—ইহা বারিধারা বিধৌত ক্রমান্বয়, তদ্দৃষ্টে বালিকা কম্পমান ত্রাসিত; সে উহার প্রতি চোখ রাখিয়া ঊর্দ্ধে পরিত্রাহি কণ্ঠে ডাকিল, বৃষ্টি আহত কীর্ত্তনের ধ্বনি ভেদ করিয়া ক্ষীণ প্রতিধ্বনি ফিরিয়া আসে, আর যে অজস্র আন্দোলিত সবুজ রেখার পশ্চাতে কিম্বা কেন্দ্রেই মহিষ কঙ্কাল পরিদৃশ্যমান, ঈদৃশী অশরীরী সংস্থান অবলোকনে, বিচলিত হইলেও সে আরবার কেশরাশি নিঙড়ায়; পরক্ষণেই চুপসান অঙ্গুলি শীর্ষ যুক্ত হস্তদ্বয় আপন বক্ষের নিকটে, অধরে বেপথু—সে ইষ্ট দেবতা স্মরণে ধ্যানস্থ—সে জগন্নাথকে শুধু বারম্বার 'ঠাকুর ঠাকুর' বাক্যে সম্বোধন করিতেছিল, এ সময়ে শুনিল "চল সুহাদিদি আমরা বাড়ী যাই—সে নেই—আমি তাঁবুর মধ্যেও—" এ কথা লখাই বলে, আরও যোগ দেয় "তাঁবুর চট ঘেরার তুলে দেখেছি, ভিজে লাভ নাই, আহা—দোকানীরা বুক চাপড়াচ্ছে—" সুহার দেহমন ভারাক্রান্ত কেননা সে একটি কথা ভাবিতে চাহিতেছিল না, সহসা তাহার মনে চমকিত হয় যে স্কাউটদের জিজ্ঞাসা করিলেই ত হইত, এবং তদ্দণ্ডেই বলে "লখাই চ একটা স্কাউটকে শুধোই—" স্কাউটের সাক্ষাৎ অবিলম্বে লাভে, সুহা প্রশ্ন করে, স্কাউটের ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া ঘাড় বাঁকিয়াই স্থির, এই সূত্রে, সুহাকৃত যোহন একাদশীর বর্ণনাকে—যাহাতে সুহা বৃথাই প্রায়শ পায় যেহেতু সকলেই যোহন একাদশীকে চেনে—সহজবোধ্য করণার্থে লখাইএর হস্ত খেলাইয়া অভিব্যক্তি দেখা যায়, আচম্বিতে স্কাউট কর্ত্তব্যজ্ঞানে হুইসিল বাজাইল, আরও কয়েকজন

উপস্থিত, তাহাদের ইংরাজিতে কথাবার্ত্তার পর মীমাংসা শোনা গেল, সুহা উহা শ্রবণের পূর্ব্বাহ্নে অধর দংশন করে; অধুনা তাহারা মেলা পরিত্যাগের পর, বেশ কিছু দূরে আসিয়া পড়িয়াছে, তখনও সুহার মুখখানি হইতে ভাবনা অপগত হয় নাই, এমত সময়ে লখাই "আঃ" শব্দে নিজ বিস্ময় প্রকাশ করত, পলকেই নাচিয়া ঘোষণা করে "হাই যে গো...হাইজঝে,...মিনষে আসতেছে" এবং হস্তস্থিত ভেঁপুটি দিয়া দেখায়; সুহা যে এতাবৎ উদ্বেগে খারাপ, যে অত্যন্ত মুহ্যমান, একথায় মহা আতঙ্কে—কেন জানা নাই—এখানে সেখানে চাহিয়াছে, নিশ্চিত দিকভ্রম হইল, অবশ্য এ-ঘোর ক্ষণমাত্র, ক্রমে লখাই কর্ত্তৃক নির্দ্দেশিত স্থানে দৃষ্টিপাত করে; বেশ দূরে যোহন একাদশীর আবছায়া অস্তিত্ব আর যে তদীয় পশ্চাতে অসংখ্য দিকসকল, এখন সে আপনকার ধূসর ছায়া—ইহা, ক্ষেতের ঘোলা জলে যেখানে ইতস্তত সবে-রোপিত ধান্য গোছ সেখানেই প্রসারিত, এ স্মৃতি সেইজন্য ওতপ্রোত যে কোন শুদ্ধ পবিত্র স্নেহপরায়ণ মেষপালক সে যেমন বা, ছায়াটি মেষ, আপন ছায়ার পিছনে শ্লথ গতি পদসঞ্চালনে আসে; চারিঠাঁই ফ্যাকাশে চরিত্রশূন্য ফর্সা এবং অবিশ্রান্ত বৃষ্টির মধ্যে অনেক ধান ক্ষেতের একটিতে ঈদৃশী বৈচিত্র্য, ঐ শোভনতা অর্থাৎ যোহন একাদশী—আরও দূরে বোর্ডিং স্কুলের গীর্জ্জা, সকল কিছুর পর্য্যায়ক্রমের অবশেষে, অতীব মনোযাদু চমৎকার সুলিখিত; এইস্থান হইতেও সুহার কাছে ইহা সুস্পষ্ট যে, যোহন একাদশী কোন বিশেষ চিত্ত বৈকল্যে অবসন্ন কিম্বা হিম্‌ ভাবুকতায় অন্যমনস্কা;আশ্চর্য্য যে এই পারিপার্শ্বের এলাকায় একটি কুকুর, ইহা কোন মতে জল ঠেলিয়া বৃদ্ধকে অনুসরণে নিবিষ্ট; এখন, বৃদ্ধ অতর্কিত নিজ গতি রোধ করিয়া চুপ, কোট প্রান্ত খানিক জলে, সে তাই একদিকের প্রান্ত তুলে, প্রান্ত হইতে জল ঝরা দর্শনের পর এবার উহা হঠাৎ ছাড়িতেই জলে যে শব্দ হয় তাহাতেই কুকুরটি ভীত আর্ত্তনাদে কিছু ব্যবধানে সরিয়াছিল, তবু যোহন একাদশীর কোনরূপ বিচ্যুতি নাই, পুনরায় একীভূত; অনন্তর প্রতীয়মান যে সে সর্ব্বত্রে অবলোকনে, উৎসুক ফলে তাহার দেহ কিয়ৎ পরিমাণে আবর্ত্তিত, আর যে হস্তদ্বয় উর্দ্ধে খেলিয়া উঠে; লখাই বলিয়াছিল, "ধর্ম্মপুত্তুর আইছে—গো" আর তখনই ভেঁপু বাজাইবার বৃথা চেষ্টার পর, উপস্থিত জলখোঁড়িতে থাকিয়া মন্তব্য করিল "তোমাঃ কি ভাবনা—" সুহা ইহাতে কিছু লজ্জিত, কহিল "হদ্দমা রোগের নাম কি—তুই যেন আগে ভাগেই বলতে যাসনি—মাকড়া হাঁটিছে দেখ্—ওদিকে কেউ গেসল বলত—" ইহারা যখন অপেক্ষায় ব্যতিব্যস্ত তখন যোহন একাদশী বেশ কাছে, অপ্রত্যাশিতভাবে সে থমকিয়া দণ্ডায়মান, উহাদের প্রতি অনিমেষে চাহিয়া স্থির, অবিলম্বে কহিল "তোমাদের কি সে গল্প আমি বলেছি—যে গল্প—" লখাই তখনই উত্তর দিল "এ্যাঁ সে ডেভিটের (ডেভিড) গপ্পত" যোহন একাদশী বাৎসল্য রসে সিঞ্চিত তবু অসহায় হাসিতে প্রকাশ করিল "না প্রভু যখন...বললেন—" সুহা সমস্ত ধৈর্য্য হারাইয়া ধমক দিয়া উঠিল "কোথায় মাঠাতে গেসলে শুনি—আমরা দুজনে ভেবে মরি—" যোহন একাদশী ক্রমে অগ্রসর হয়, তাহার ভাব দর্শনে সুহার ভয়ঙ্কর ইচ্ছা হয় উহাকে কর্ত্তব্যপরায়ণ করিতে কিন্তু তৎপূর্ব্বে বৃদ্ধ চলিতে থাকিয়া বলিল "গিয়েছিলুম গীজ্জে ঘরে" ইহাতে যদিও বালিকা কহিল "তুমি কি গো—আর সময় পেলে না—আমাদের ফেলে" তথাপি তদীয় মন ব্যথিত, হয় ঘনঘটার নিমিত্ত, হয়ত বৃদ্ধের জন্য কিন্তু ইহা সত্য সে দুঃখে ভারাক্রান্ত; যোহন একাদশী সলজ্জভাবে হাসিয়া সংযত স্বরে ব্যক্ত করিল "আজ একটা মস্ত কাজ করেছি জান...ঐ যে ঐখানে সাঁকো...সাঁকো থেকে আমার পাপ্‌টা ফেলে দিয়েছি—" সুহার তৎক্ষণাৎ গণ্ডদেশে তর্জ্জনী স্পর্শ হয় সে বাণবিদ্ধ চোখে বলিল "সে কি তুমি...বেচারীকে...ফেলে দিলে এই বাদলার দিনে...আহা—" এসময় বালিকার চোখ সাঁকোর প্রতি নিবদ্ধ; যোহন একাদশী সুহার সরল পদবন্ধনে খানিক বিড়ম্বিত, সে সুহাকে বুঝিতে চাহিয়া, এ কারণ যে বাচন ভঙ্গিতে এতটুকু শ্লেষ ছিল না, কহিল "আরে পাপকে..." এবং স্মিত হাস্যে রাস্তার উপরে আর্দ্রবস্ত্রে সহজ করুণাঘন মুখমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ করিল, সুহা বলিতেছে "তা হোক এই বিচ্ছিরি বাদলার দিনে...বেচারী...ওটা মানুষের ত...বাবা..." এবার যোহন একাদশী রাস্তায় উঠিয়া একটি শ্বাস ফেলিয়া—অপরাধীর কণ্ঠে জানিতে চাহিল "যদি না ফেলি...তবে আমার আত্মা যূঁই ফুলের মত হবে কি করে?...এখন আমার আত্মা, মাইরী, যূঁই ফুলের মত সাদা হচ্ছে..." ইহাতে সে গর্ব্ব অনুভব করিল; সুহাকে, পুনর্ব্বার যোহন একাদশী আসন হইতে ঝটিতি উঠিয়া কয়েক পা দরজার দিকে যাইয়া এখন থামিয়া কহিল "মিথ্যুক তুমি না বলেছিলে...যে আত্মা, আর যদি বলেই থাকি বেশ করেছি...আমার আত্মা যূঁই ফুলের বাবার বাবা সাদা

হচ্ছেইত...আমার আত্মার বুটপট্টি বোতাম সাফ...” তাহার এহেন দম্ভে সকলেই হতবাক, শুধু লখাই তাহার স্বভাব অনুযায়ী আঙুল চুষিতেছিল; এই যোহন একাদশী ইদানীং লখাইকে সৌন্দর্য্যের ভার দিয়াছে তথা সুন্দরকে খুঁজিতে বলে, একবারও মনে আসে নাই যে সে বালক মাত্র, সে এখনও বুড়ো আঙুল চোষে; অন্যপক্ষে লখাই সুন্দরকে পরম দায়িত্ব জ্ঞানে নিয়ত তাহারই সন্ধানে মরিয়া,—কেননা ইহার উপর তাহার স্বাধীনতা! এমন যে ইহার উপর হস্তপদদ্বয় সহজে চালনা করা নির্ভর করে; সে তাই বাবুদের বাগানের সুউচ্চ প্রাচীর লঙ্ঘনে সেখানে লিচু গাছের কুঞ্জের মধ্যে, মার্ব্বেলের পরী দেখিতে জীবন পণ করিয়াছিল, সে-এক রহস্যময় অভিজ্ঞতা, কোথা যেন ইহা তাহাকে আহত করে যাহাতে সে মূঢ়, সম্ভবত তদীয় মতিত্ব নির্দ্দিষ্ট ঠিকানায় থাকিতেও বিজ্ঞাপিত হয় যে উহা ভঙ্গুর, সে নিশ্চিত বারম্বার নিজ অন্তরকে এই উক্তিতে বিশ্বাসী করিতে চাহিয়াছে যে “ইহা সুন্দর ইহা সুন্দর ইহা সত্যই সুন্দর”, সে এবম্প্রকার নয়নে, ঐ যৌক্তিকতার প্রতি চাহিয়াছিল, তাহাতে ইহা স্বতই ভাবুক জনের মনে হইবে যে এহেন চাহিয়া-থাকার পিছনে একটি মৃদু প্রশ্নের ইঙ্গিত ছিল, যে তুমি কি তৃষ্ণার্ত্ত হও, তুমি কি স্বাতী নক্ষত্রে জল কখনও গ্রহণ করিয়াছ, সীমাকে দাস রূপে পরিগণিত কর তুমি কি, মানুষের মনস্তাপকে মহাসাগরের নীলিমা বিশেষে অভিষিক্ত করিয়াছ, তুমি কি রজনীতে ঘুমা-ও” এইভাবে সে চাহিয়াছিল; যদি তখনই, নিরীহ দৃষ্টির মধ্যেও, শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণার রূপটি মানসপটে উদয় হইতেই, যদিও সে হয় উলঙ্গ, তদীয় মুখমণ্ডল বর্ণহীন; এবং নিজেকে ছোট সমালোচনার দ্বারা অবহিত করে যে যোহন একাদশীর বর্ণনা ছিল মূলত অন্য, অর্থাৎ শুধু আলো, আলো দিয়ে গড়া; আর সে স্বাধীনতাকামী বালক, সুহাকে প্রশ্ন করে, সুহা খৈ ঝাড়িতেছিল, ফলে কুলার অদ্ভুত শব্দ হয়; সে, লখাই ভুঁয়ে শায়িত তাই অজস্র খৈয়ের উঠাপড়া—শূন্য ভ্রমণের মধ্য দিয়া সুহার প্রতি তাকাইয়াছিল, বালিকা কহিল, “দিব্য চোখ না হলে না—বাবা বলেছে—ওসব দেখা যায় না—” এই ব্যাখ্যা উহাকে সুখী করে নাই ফলত সে বিরক্ত, কেননা সুহার প্রায় কথায় ঈদৃশী ব্রাহ্মণ্য সংজ্ঞা থাকে, যাহাতে উহার মন নাই; তবু বলিয়াছে, “ধর তুকতাক মন্তর যারা জানে—মানে শৈবালী—” সুহা ঝাড়িতে মুখ ঝামটায় উত্তর দিল “রাখ রাখ—ছোট জেতে বুদ্ধি—বলে মুনি ঋষি যাঁর কিনারা করতে পারে না, সে দেখবে ও—শৈবালীর তুকে—ঠাকুর দেখা দেবেন—ব্রহ্মময়ীর রূপ মাধবের রূপ...শিবের রূপ চোখ ঝলসে যাবে না—তাই—” ইহাতে লখাই অতিষ্ঠ হওয়ত কহিল “আমি ঠাকুর দেবতার কথা ত—” সুহা ধমক দিল “ঠাকুর দেবতা ছাড়া আর কেউ সুন্দর হয়?—চুপ কর—দিব্য চোখ ছাড়া—” লখাই পরাজয় স্বীকার করে নাই, বলিল “কিন্তু যোহন একাদশী যে সুন্দর—” সুহা ধানগুলি উঠানে ফেলিয়া দিয়া উত্তর দিল “কে জানে—” লখাই নিরাশ হয় নাই, সে সৌন্দর্য্যের কথা মনে রাখে, বদ্ধপরিকর যে সাক্ষাৎলাভ করিবে, যোহন একাদশীকে সংবাদ দিবে; সে আশাই করে নাই যে যোহন একাদশীর সহিত এমন ভাবে দেখা হইবে, সে সর্ব্বত্রে ধান ক্ষেতের দিকে চাহিয়া উপস্থিত অস্বস্তি অনুভব করিল; যোহন একাদশী কহিল “হ্যাঁ লখাই—তুই বুঝি আমাদের কথা সুহাকে বলেছিস—” লখাই ঈষৎ ভীত, বলিল “আমি কেন বলতে যাব—তাছাড়া আমি ত তামাক—” যোহন একাদশী চিন্তিত মনে ধীরে ব্যক্ত করিল “তবে যে সুহা এত তম্বি করছিল—আমি মাইরী কিছুটি বলিনি—” লখাই সবই জানিত, যে আজ সকাল বেলা যোহন একাদশী—অক্ষয় মাস্টারের যখন গা টিপিয়া দিতে সূত্রে,—তাহার একটি হাত বৃদ্ধের স্কন্ধে আর যে সে মহা কসরতে টিপিতে থাকিয়া বলে, “কিন্তু চোখ বুজিয়া থাকলে চলবে না—” অবশ্য বস্তুত চোখ বুজাইয়া অক্ষয় মাস্টার আরাম উপভোগে তন্ময়, পুনরায় যোহন একাদশীর পরামর্শ শ্রুত হয় “নজর দিতে হবে—এত সুন্দর হল কি করে—কিছু মাখছে—কি মাখছে—কোথা পেলে—কে দিলে—বাবু একটু গা তোল—” এসব কথা যথাসম্ভব নিম্নস্বরে প্রকাশ করে, অবশেষে যোগ দিল যে “মাস্টার মশাই জেনো—মেয়েমানুষ পেঁয়াজ কাঠে বসে থাকলে কল বেরবে—লোহার উপর রাখ পেঁয়াজের কল বেরবে—শেষে কপাল চাপড়াতে হবে—” এই কথা সকল লখাই শুনিয়া সুহাকে ভাঙা ভাঙা বলিয়াছিল; উপস্থিত যোহন একাদশী আবার কহিল “মাইরী ধম্মৎতে বলছি, রাগ করে কি করব?” পরক্ষণেই গলা যথাসম্ভব মধুর করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “এত সুন্দর হল কি করে তুই” লখাই উত্তর দিল “ম্যাজিক ম্যাজিক”—যোহন একাদশী ইহাতে নিজেকে রুখিয়া রাখিতে পারিল না বলিল “আ মলো যা—ম্যাজিক না ছাই—পমেটম ছাড়া কি হতে পারে—” এতাদৃশ মীমাংসায় লখাই পিছু যায়, সে সত্যই হতবাক আশ্চর্য্যান্বিত,

যে যোহন একাদশী এ গোপন তত্ত্ব কেমনে জানে, সে নিজে ব্যতীত ইহা আর কেহই বিদিত নহে, এবং ইহা অনেক সাধ্যসাধনায় লাভ করিয়াছে, সুহাসিনী তাহাকে গোপনে ছোট সোনালী ঢাকাওয়ালা কৌটাটি দেখাইয়াছিল, সম্মুখের আয়নাটি যখন খুসী হয়, লখাই জীবনে, এতাবৎ কিছুর প্রতি, এখন যেমন চাহিয়াছিল এমনভাবে নিরীক্ষণ করে নাই—ইহা দারুণ ম্যাজিক, যে সে দারুণ ম্যাজিকের সমক্ষে—কৌটা খোলা হয়; অপূর্ব্ব গন্ধ তাহাকে আচ্ছন্ন করিল; মনে হয় চন্দনেও ঈদৃশী সুবাস নাই; ইহার শুভ্রতা জিহ্বায় পরম স্বাদ আনিল, বিন্দুতে বিন্দুতে রামধনু দর্শনে সে স্তম্ভিত, বিহ্বল, লখাই অর্দ্ধ উন্মুক্ত মুখে এই সামগ্রী হইতে চোখ তুলিয়া সুহার প্রতি চাহিয়াছে, সুহাসিনীকে মৃদু হাস্যময়ী বুঝিয়া সেও ঈষৎ প্রয়াস পায়, পুনরায় ঐ অনৈসর্গিক শুভ ইচ্ছার স্তূপের দিকে তাকাইল—দেখে, চারিদিকে রামধনু বিন্দু বিন্দু আর যে সে আর যোহন একাদশী আর সুহাদিদি ঐ কৌটার শুভ্রতার মধ্যে, যে তাহারা প্রত্যেকেই কিসের খোঁজে ঘোরে, তাহারা একটি বৃত্ত ধরিয়া ভ্রমণে, পরিক্রমণে এক মহৎ মণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছে—লক্ষ লক্ষ ঘুম স্বপ্ন উহাদের পদতলে নিখোঁজ, অদূরে একটি ব্যাঘ্র হাঁপায় আর যে লখাই তির্য্যক দৃষ্টিতে দেখে যে, ভগবান কাতর কণ্ঠে তাহাদের বেড়ার ধারে দাঁড়াইয়া ভিক্ষা চায়; সে স্বর বড় করুণ বড় মর্ম্মস্পর্শী। ইহা দর্শনে সে প্রীত, সে খুসী সে আহ্লাদিত! উহারা অশ্রুতপূর্ব্ব রহস্যময় ম্যাজিকের মধ্যে বাস্তবতার মধ্যে উহারা সকলেই সৌন্দর্য্য খুঁজিতেছে; অধুনা লখাই কহিল "তা জানি না সুহাদিদি বলেছে যে ম্যাজিক তাই" এবং তাহার নির্ঘাত সন্দেহ হয় যে যোহন একাদশী সেই রহস্যময় কৌটা সন্ধান পাইয়াছে; অন্যপক্ষে যোহন একাদশী উহার দিকে গভীর ভাবে দৃষ্টিপাত করত কহিল "ম্যাজিক না আরও কিছু...কিন্তু...পেলে কোথায়—কে তাকে—" এই প্রশ্নে যথার্থই লখাই উদব্যস্ত, কোথা হইতে পাইল তাহা ভাবিয়া কিছু ঠিক করিতে পারে না, আশ্চর্য্য যে সে নিজেও জানে ইহাই তাহাকে অবাক করে, যে সে কখনও ত সুহার সঙ্গ ইতিপূর্ব্বে ছাড়ে নাই; যেহেতু আজ কয়েকদিন হয় যে সে চুরি করিবে না এ সঙ্কল্প করে, কেননা সে বড়ই মনস্তাপ পায়, সেদিন সকালে যখন বড় রাস্তার উপর খণ্ডকৃত লাসের খবর ছড়াইয়া পড়ে তখন অনেকেই দেখিতে ছুটিয়াছিল, সুহা তাহাকে বলিল "তুই ডোঙাটা বাদাম গাছের কাছে নিয়ে যা আমি এখুনি আসছি—" দুজনে ডোঙা করিয়া রাস্তার নীচে খালে যখন আসিয়াছে সুহা নামিয়া ঢাল বাহিয়া খানিক উপরে, দেখিল এক সার ছেলে মাথায় টুপি হাতে কাঠের পাটা, একটির চোখে চশমা, উহারা লখাইকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছে "ঐ যে সেই শালা বামুনের ঔরসে ধ শালাকে—নেমেছে ডোঙায়" অন্য একজন কহিল "মোক্তবের দেরী হবে—" আর বাদানুবাদের পূর্ব্বেই প্রায় সকলেই সমস্বরে উত্তেজিত হওয়ত "ধ শালাকে বামুনের ঔরসে—শালা...চেরাগ চোর—" নিশ্চয়ই লখাই কবরখানার প্রদীপ চুরি করে, তাই এই উত্তেজনা, সুহা তখনও সেই অবস্থায়, এমত সময়ে দেখিল ছেলেরা ঢাল বহিয়া নামিতেছে, কোনক্রমে দৃষ্টি ফিরাইয়া প্রত্যক্ষ করে যে লখাই ড্যাঙা ধরিয়া ছুটে হঠাৎ সে, খালে লাফ দিয়া সাঁতরাইয়া অন্য পারে, ছেলেরা আর অনুসরণ করিতে পারে নাই, খালের পাড়ে দাঁড়াইয়া নানারূপ অশ্লীল হস্ত ভঙ্গিমার সহিত "বামুনের ঔরসে শালা—" ইত্যাদি চীৎকারে উদ্দাম, সুহা অবলোকন করে বেচারী লখাই ধান ক্ষেতের আল ধরিয়া ক্রমাগত ছুটিতেছে, তাহার গতির তারতম্য নাই, হয়তো সে এবম্বিধ কুৎসিত ডাকের বাহিরে যাইতে মরিয়া সুহা একটি দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে একদা ডোঙাটির প্রতি লক্ষ্য করিল; উপরে রাস্তায় আসিয়াই তদীয় সুন্দর মুখমণ্ডল বিকৃত, অদূরে গৌর বর্ণা স্ত্রীলোকের ধড়, একদিকে একটি চমৎকার উরু সমেত পা, লাইনের পূর্ব্বে ঢালের দিকে নিশ্চিত আর একটি, কেননা পাটি জাগিয়া আছে উহার আলতায় রঙ চিত্তবিভ্রমকারী—হাত দুটি দূরে দূরে—কচুগাছের পাশেই মাথা, আশ্চর্য্য যে চক্ষুর্দ্বয় অর্দ্ধ উন্মীলিত; নাকে হীরা নাকছাবি—মহিলা যে অসামান্য সুন্দরী ইহা ধ্রুব; এই পৈশাচিক সংস্থানের প্রায় ঠিক পিছনে, একটি গরুর নাল ঠোকা হয় ফলে গরুটি নিজ বাঁধন হইতে মুক্তি লাভের আশে পরিত্রাহি দেহ সঞ্চালন করে তাহার সমস্ত দাঁতগুলি বিকট ভয়ঙ্কর হইয়া দেখা দেয়, যে লোকটি তাহার শিং ধরিয়া আছে সে ঘর্ম্মাক্ত, এখন পশুটির ঐ ভয়প্রদ মুখ ব্যাদন উঠিবার চেষ্টা সম্মুখের দৃশ্যকে অধিক মাত্রায় নৃশংস করিয়া বীভৎস করিয়া ঊর্দ্ধে তুলে, খণ্ডিত ধড় যাহা এখনও লোভনীয়—অটুট স্তনদ্বয় ঈষৎ বিধ্বস্ত যদিও যেহেতু শায়িত, দেহ নিম্ন ভাগে; সম্ভবত রাস্তা হইতেই কুড়ান একটি ছিন্ন অকথিত মলিন বস্ত্র খণ্ড, হয়ত উহার লজ্জা নিবারণার্থে মেলান, পাছে ইহা উড়িয়া যায়। সেজন্য মাটির উপরে প্রান্তভাগে ঢেলা চাপা,

মাঝে মাঝে বস্ত্র খণ্ড বাতাসে উচকিত ঢেলো সরিয়া যায়, অল্প বয়সীরা 'হাঁ হাঁ' করিয়া উঠে, বৃক্ষের নীচে আসীন পুলিশটি শ্লথ গতি আসিয়া আপন লাঠির দ্বারা ঢেলো যথাস্থানে ঠেলিয়া দেয়, ভীড় হইতে অজস্র মন্তব্য শ্রুত হয়, কিন্তু ইহা, নিশ্চিত যে সকলেরই কণ্ঠে 'আহা' স্বরে খেদোক্তি, সকলেই একবাক্যে 'অসামান্য সুন্দরী' স্বীকার করে আর যে সকালের রোদে ভীত মনের নমস্কার এখন তখন প্রায় কপালেই দেখা যায়; এ পাশে মেয়েদের ভীড়ে, অন্যত্র পুরুষের জমায়েতে, এখন হঠাৎ ধ্বনিত হইল "মোটার মোটার" সকলেই রাস্তা ছাড়িতে ব্যস্ত, ছেলেরা চীৎকারে বলিয়া উঠে "ফুত্তির গাড়ী ফুত্তির গাড়ী খবরদার—" কেননা গাড়ীর গান শোনা যায়, গাড়ীতে অর্দ্ধ নগ্ন ইংরাজ স্ত্রীলোক ঘুমায়, দু একটি মাতাল, কেননা ইহারা এখনও মদ খায়, মাথায় প্রত্যেকেরই বেতের (?) টুপি, চালকটিও তারস্বরে গান গায়—ইংরাজরা যে কতবড় নির্লজ্জ তাহার প্রমাণ যখন তাহারা গান গায়—স্ফূর্ত্তির গাড়ী নিকটে আসিতেই দুইটি ভিন্নসমাবেশ উপস্থিত একদিকে, বিরাট স্তূপীকৃত খড়বোঝাই গাড়ীর কাছে; এসময় কাহাকে দেখিয়া সুহা মাথার বেঠিক ঘোমটা যথাযথ করে, তাহার জিহ্বা সংস্কার বশে দংশিত হয়, সে কোনক্রমে, যাহাকে দর্শনে এতেক সচেতনতা, তাহার দিকেই অগ্রসর হইল; স্ফূর্ত্তির গাড়ী চলিয়া যাইবা মাত্র, লোকেরা পুনরায় যথাস্থানে ফিরিয়া যায়, সুহা দ্রুতগতিতে নিজ নির্দ্ধারিত লক্ষ্যের পিছনে আসিয়া ডাকিল "শোন" এই উক্তির সঙ্গে একজন, যাহার বয়ঃক্রম আঠারোর বেশী নহে, ঘুরিয়া দাঁড়াইল সে বিস্মিত কহিল, "এ কি তুমি কোত্থেকে—" সুহা তাহাকে খড়ের গাড়ীর আড়ালে আসিতে বলে, সে আসিতেই সুহা ঝটিতি তাহার পদধূলি লইয়া কহিল "তুমি ফের এ সব উঞ্ছ কাজ করে যাচ্ছ যা আমি ভালবাসি না সেই...চাল কলা বাঁধা—" ইহাতে সে হয় সুহার বর আপনকার হাতের নৈবেদ্যর গাঁটরী দেখিয়া জবাব করিল "কি করি, মামার এক গা জ্বর বললে বড় যজমান—" সুহা বলিল "ও তুমি পড়া ছেড়ে এখানে এলে কেন...আমি এসব ভালবাসি না—" সুহার তাহার বরের উপর জোর ছিল, কেননা তাহার বর তাহারই কপালে বাঁচিয়া আছে, এই হেতু যে সকলেই জ্যোতিষীই এক বাক্যে মীমাংসা করে, বিধান দেয়, পরকপালে যদি করা হয় তাহা হইলে ভয় নাই; সুহার শাশুড়ী যিনি বিধবা তাহাকে বিশেষ স্নেহ করেন—নিজ বড় ভাই যিনি অভিভাবক যিনি বিবাহের পণের টাকা অক্ষয় মাস্টারের না দিতে পারায় সুহাদের উপর বিরূপ—ইহার কারণে সহজভাবে আপন মনোভাব প্রকাশে অক্ষম; সুহার বর এখন বলিল "দেখছ কি ভয়ঙ্কর কাণ্ড—" সুহা ইহাতে জবাব দিল "সেই দেখতেই ত এসেছি...কিন্তু আমার ইয়ে কি হল—" সুহার বর কহিল, মুখখানা কি অপূর্ব্ব না...চমৎকার—" সুহাও খণ্ডিত দেহের দিকে চাহিয়াই অনুযোগ করিল "কিন্তু তুমি না আমার গা ছুঁয়ে বলে গেলে..." সুহার বর কৃত্রিম দুঃখের ভানে বলে "এর পরও সাধ হয়...এইত" ইহাতে বালিকা রাগিয়া উত্তর দিল "সাত সকালে পিছনে লেগ না...ও মরেছে ওর পাপে—" সুহার বর ধীরে মন্তব্য করিল, "ভাবছি পমেটম স্নো মেখে...সুন্দর দেখিয়ে লাভ...সুন্দরের ত এই দশা—" ইহাতে সুহা অতীব রুষ্ট এতাবৎ নিম্নকণ্ঠস্বর তেজী হইয়া উঠে কহিল "খবরদার নষ্টদুষ্ট মেয়েছেলের সঙ্গে—" সুহার বর তখনই শঙ্কিত হইয়া বলিল "আস্তে আস্তে...আমি কি বললুম—" এবং আপন বক্তব্য যাহাতে সুবোধ্য হয় এ কারণে ধীরে প্রকাশ করিল "সুন্দর হয়ে...বেচারী কি জানত...নিশ্চয় খুব বড় ঘরের...এই পরিণতি হবে—" সুহা শ্লেষাত্মক স্বরে কহিল "তোমার বুক যে ভেঙে যাচ্ছে...যাক আমি আর কোন কথা শুনব না তুমি না আমার গাঁ ছুঁয়ে—" সুহার বর বলিল "কথা দিচ্ছি আমি আজ মামার ওষুধ আনতে কলকাতা যাব কাল নয় পরশু আমি নাপতিনীকে দিয়ে পাঠাব" সুহা বিদায় কালে আপন স্বামীর পদধূলি গ্রহণ করে; যেহেতু লখাই এই সুহা ও তদীয় বরের শুভ সাক্ষাৎকারের সময় ছিল না, সেজন্য কিছুই অবহিত নয়, বেচারী তখন আল ধরিয়া অনেকদূরে আসিয়া ছোট ড্যাঙা জমিতে আছড়াইয়া পড়িয়া রোরুদ্যমান, এমত অপমান সে কখনও কল্পনাও করে নাই, তাহার সত্যই কেহ নাই, ভগবানকে ডাকিতে তাহার নূতন করিয়া বিরক্তি জন্মায়; নিজেকে, এই অল্প বয়সেই, ইহা ধ্রুব যে বড় একা বলিয়া বোধ হয়, প্রকৃত তাহার মরিতে ইচ্ছা হইল, হয়ত পৃথিবীর সমস্ত পথ তাহার নিকট রুদ্ধ যে সে বামুনের ঔরসে! সে চোর! এই কারণে; এখানে, সে যখন ঈষৎ শান্ত তখন ইহা প্রতিজ্ঞা করে যে আর চুরি করিব না; সুহাও সে কথা জানে; যোহন একাদশী কহিল "তাহলে তুই বলতে চাস তুই জানিস না—" লখাই দৃপ্ত কণ্ঠে কহিল "মাইরী মা কালীর দিব্যি"; সুহাসিনী আপন নাকছাবিতে হাত দিয়া চিন্তিত তাহার সর্ব্বনাশ কে করিল, তাহার পমেটম কে চুরি

করিল? লখাই কখনই নহে, কেন না সে আতরদাসী চ্যালেঞ্জ শীল্ডের ফাইনাল খেলা দেখিতে গিয়াছিল, তাহার পরই যতদূর মনে পড়ে, উহা অপহৃত হয়, ফলে শীল্ড বিজেতারা যখন আমতলার পাঁচজনা ব্যণ্ড পার্টি, তৎসহ জালু হিজড়ের নাচ যুক্ত ছোট শোভাযাত্রায় তাহাদের বাড়ীর পাশ দিয়া যায় তখন সে জানালায় দাঁড়ায় নাই—আতরদাসী চ্যালেঞ্জ শীল্ডখানি দেখার ইচ্ছাও তাহার ছিল না, শীল্ড নিজেই একটি ঐশ্বর্য্য জমিদার বাবুর রাঁঢ় আতরদাসী—তাহার আলেখ্যও শীল্ডে আছে যাহা জয়পুরের সুদক্ষ কারিগররা সোনার উপর কলাই এনামেল করিয়াছে—তাহাকে চিরস্মরণীয়া করণার্থে এই শীল্ড, সোনার লতা পাতা ও পাথর বসান, সম্ভবত ঝুটো, তাহাও দেখার আগ্রহ ছিল না; সুহাসিনী কাঁদিয়াছে, লখাই নিজে তাহার বুক ছুঁইয়া শপথ করে এবং ঊষাও যোহন একাদশীর কথা বলে; এবং সে নিজে, সুহা, কোন কিছুই ভাবিতে পারে নাই অথচ তাহার বড়ই, তথাপি, পিতার কথা স্মরণ হয়—কেননা অক্ষয় মাস্টার এ কয়েকদিন তাহার সহিত অদ্ভুত ব্যবহার করিতেছিল; লখাইকে যে সন্দেহ হয় নাই তাহা নহে, কিন্তু ঠিক সন্দেহ করিবার হেতু নাই, কেননা সে গোষ্টর মাঠে যাইতে রাজি হইয়াছে, বিশেষত সন্ধ্যার পর—যেখানে দিনেই লোকে যাইতে চাহে না, কেননা ঐখানে মদন কবিরাজের বৌ আছে যাহাকে এখনও নাচিয়া নাচিয়া মাই দিয়া ফিরিতে দেখা যায় অনেকেই এ-দৃশ্য অবলোকনে হতচৈতন্য হয়, মদন কবিরাজের মৃতবৎসা, পর পর অনেকগুলি সন্তান এখানে প্রোথিত; জীবিত অবস্থায় ঘুমের মধ্যে সে শোনে তাহার পুত্রসন্তান সকল মাই খাইতে কাঁদে—সে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া আসিত; আপন দুগ্ধ এখানে সিঞ্চন করিত, এ ঘটনা ক্রমে প্রচারিত হয়, একদিন দেখা যায় যে বৌটি এখানে মৃতাবস্থায় ভূলুণ্ঠিত; সে খুন হইয়াছে—কেননা কোন দুষ্ট লোক দ্বারা সে নষ্ট, কেননা সে গর্ভবতী তাহাকে এখনও সিদ্ধ বৃক্ষ নিম্নে দেখা যায়; সিদ্ধ বৃক্ষ এক অলৌকিক বিচারক—সত্যমিথ্যার কষ্টি পাথর, সত্য যদি হয় তবে বক্তার উপর পত্র খসিয়া পড়ে, মিথ্যা যদি, পূর্ব্বে অসংখ্য শিশু ছুটিয়া আসিত—ইদানীং অশরীরী মৎস্যগন্ধা রঙ্গিণী মদন কবিরাজের বৌ আসে, নিজ উদ্ধত স্তন এমতভাবে ধৃত যাহাতে পানকার্য্য সহজে হয়—লখাই শুধু এখানেই যাইতে চাহে নাই, শৈবালীকে দিয়া চালপোড়া খাওয়ানর কথা পাড়িয়াছে; বেচারী সুহা অবসাদগ্রস্ত বারান্দার খুঁটি ধরিয়া দণ্ডায়মানা যখন, এমত সময়ে লখাই মনোরম একটি ছাগ শিশু লইয়া উপস্থিত, কিন্তু বালিকার মন বড় ক্লান্ত—নিজের সহিত আয়নার সহিত আবার নিজের সহিত যে অভাবনীয় সম্পর্ক নির্ম্মিত হয় ইহাই তদীয় স্মরণে; যে, হয়ত নিজেকে কিম্বা নিছকই এ-হেন সম্পর্ককে সে আশ্লেষে চুম্বন করিয়াছে—আয়নায় তাহার রসপূর্ণ অধরের ছাপ অঙ্কিত হইয়াছে—এখন এ ভাবনায় সে ক্লান্ত, ফলে লখাই যে বলে, যে সে তার প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিয়াছে এবং ছাগ শিশুটি ইরানীদের পত্তন হইতে আত্মসাৎ করে যেহেতু যদি পমেটম পাওয়া যায়, তাহা হইলে কালী বাড়ীতে ইহা বলি দিবে, ইহা শ্রবণে সে শুধু অসহায়ভাবে হাসিয়াছে, তাহার বদ্ধ ধারণা হয় বাবা না হয় যোহন একাদশী যেহেতু বৃদ্ধ এঘরে চাবি রাখে, কোন কাজেই সুহার ইচ্ছা নাই, সে দেখা যায় মলিন বিছানায় মুখ লুকাইয়া আছে; লখাইও বেচারী অধোমুখে চলিয়া গিয়াছে; অবশ্য সে ইদানীং, প্রতিজ্ঞার পর, প্রায়ই মায়ের সহিত দ্বিপ্রহরে শাক কিনিতে যাইত, তাই সুহা বড় একা, আজ, মেজেতে আয়নাটি স্থাপন করত, সে তক্তাপোষ হইতে উপুড় হইয়া শুইয়া, কখনও কদাচিৎ সেই সম্পর্কটির উপলব্ধি আসে নিশ্চল; মাঝে মাঝে নবাগত ছাগ শিশুটির আব্দারে ডাক শোনে আর কপালে করাঘাত করে; এখন লখাইএর উদ্বেলতায় ডোঙা যারপরনাই দোলায়মান, গালচমকি ইহাতে কহে "আ-মরণ ডুবিয়ে মারবি নাকি" তাহার একটি হাত ডোঙার বাহিরে কখন ধান গাছ স্পর্শ করে, কভু জলে, সেও আনন্দের উদ্বেগে কাতর, নিজ হস্ত পদ ত্বকে স্বাদেন্দ্রিয় উত্তেজিত, উহার গাল কি যেন প্রশ্নে অদ্ভুত চমকায়, বলিল "চাকনটা আনলে হত—না হলে" লখাই উত্তর দিল "থাম্ ত বলবি ওদের ঘরে চাকন আছে—কেউ যদি" এবং আপন মতিত্ব সহকারে মায়ের প্রতি অবলোকন করে, আর যে ইতিমধ্যে একদা ডোঙা হইতে একটি পা বাহিরে লইয়া ঝটিতি জল আলোড়নে উদ্যত, এখন অপ্রত্যাশিতভাবে হুঙ্কার দিল, বহু রন্ধ্রগত বেদনা এ কারণে ওতপ্রোত উহাতে; কখনও ধান্য শীর্ষ ছিন্ন করত মায়ের দিকে ছুঁড়িয়াছে, সমস্ত কিছুর মধ্যে অনুপস্থিত কাহাকেও বিদ্রূপ, তাচ্ছিল্যে, অবজ্ঞা, করার মনোভাব পরিচ্ছন্ন, সে জন ধ্রুব যে সুহাসিনী নয়, যাহার কথা মনে আসার সঙ্গে সে শুধু বয়সীর ন্যায় চোয়াল ঘর্ষণ করে—সে জন নিশ্চিত সেই ভিখারী যাহাকে সে অনৈসর্গিক শুভ ইচ্ছার শুভ্রতার রামধনুর একান্তে দেখে, যে

সমস্তটাই ভয়ঙ্কর অন্ধকার, যে তাহাদের জন্মান্তর প্রতারণায় সিদ্ধ হস্ত, যাহার উল্লেখে ক্রোধে অধীর হইয়াছে, আঙুল চুষিয়াছে, কখনও অধোবদনে বলিয়াছ 'আমি বামুনের ঔরসে'—সুহাকে তাহার নির্বোধ বলি ধারণা হয়ে এ কারণে যে সে বলে "তিনিই সুন্দর তারপর আর কিছু নেই—" এখন সে দুর্ম্মদ সেই ভগবানকে সম্মুখসমরে আহ্বান করে, বলিয়া উঠে "দে দেত মা কৌটটা শালা ভগবানকে দেখাই" গালচমকি ইহাতে শঙ্কিত হওয়ত নিজ কান নাক মলিয়া নমস্কারান্তে গণ্ডদেশে তর্জ্জনী রাখিয়া কহিল "তোকে ভূতে পেয়েছে, গলা দিয়ে অক্ত উঠে মরবি—" ইত্যবসরে লখাই উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করত হাসে, নিশ্চয়ই ইহা সে জানে, যে তিনি আকাশেই, তবে ইহা সে—তবু তাহার দুঃখময় মুখখানি দেখা যায়—একথা জানে না! হঠাৎ লখাই ধান ক্ষেতের মধ্যে দিয়া চাহিয়া ঘোষণা করে "এসে গেছি—শামুকড্যাঙা—" ড্যাঙাটির চারিদিকে জল, দু একটি কচুগাছ, এদিকে সেদিকে কেঁচোখোঁড়া মাটি মধ্যে সবুজ ঘাস, এখানে নামিয়াই সংস্কার বশত মাটিতে হাত ছোঁয়াইয়া কপালে ঠেকাইয়া গালচমকির দিকে চাহিয়াই দ্রুত পদে তাহার নিকট গিয়ে স্তন পান করিতে আরম্ভ করে, ইহাতে গালচমকি কহিয়াছে "উঃ কি—স্বভাব—" এবং তদীয় সন্তানের মস্তকে হাত বুলাইতে থাকিয়া লোক চরাচর দেখিয়াছে, কেহ কোথাও নাই উপরে মেঘ, লখাই হঠাৎ তাহার বক্ষে হাত দিয়া কহিল "একি তোর বুক অমন কচছে কেন" গালচমকি ভীত কণ্ঠে উত্তর দিল "আমার কেমন ভয় কচ্ছে—বড় ভয় কচ্ছে—" অতঃপর রাস্তার প্রতি ও অন্যত্র সুহাদের বাড়ীর দিকে ত্রস্ত নয়নে চাহিয়াছে; লখাই স্তনে মুখ তুলিয়া মায়ের মুখ নিরীক্ষণে বলিল "তুই সুন্দর হবি—দারুণ সুন্দর—" এ বাক্যে গালচমকি সম্মোহিত হইলেও এখনও রোমহর্ষ থামে নাই, আতঙ্কগ্রস্থ সে, কহিল "চ লখাই—ফিরে যাই—" ইহাতে লখাই বিদ্যুৎ আহত; উহার নিকট হইতে দূরে ঝটিতি সরিয়া রোষকষায়িত লোচনে বলিল "তাহলে কি বৃথাই চুরি করা—তুই দে কৌট আমি জলে ফেলে দেব—" পরে স্বর সুসংযত হয়, শেষ করে "তোর গাল চমকান উবে যাবে—তুই সুন্দর দেখতে হবি—" এবং সে আকাশের দিকে তাকাইয়াছে, চোখে একথা নিশ্চিত 'যে শালা তোকে এমন করেছে—দেখুক সে শালা" এ সময় উহার মতিত্ব অস্থির হইয়াছে, বীজগণিতাত্মিক ভঙ্গিমায় দেহ চঞ্চল—দৌড়াইয়া আসিয়া ছোট পুঁটলী খুলিয়া বিড়ির কৌটা বাহির করে, একটা বিড়ি ধরাইয়া আজ্ঞা করিল, 'নে সাজা' গালচমকি ধীর কণ্ঠে কহিল "দে আমায় একটা বিড়ি"; যে লাল পাটের শাড়ীটি লখাই চুরি করিয়াছিল, এখন তাহা গালচমকির হাতে, এ শাড়ী চুরি করিয়া আনিয়া সে বলে, "আমরা যখন দূর দেশে চলে যাব—যেখানে আমাদের কেউ চেনে না—এটা পরে তুই দুগ্‌গা ঠাকুর দেখতে যাবি" লখাই অদ্ভুতভাবে বিড়ি খায়, এখন গালচমকির চুল বাঁধা সমাপ্ত, তাহার সাবান দিয়া মুখ ধোয়া শেষ, শাড়ী পরা হইয়াছে, এখন লখাই গালচমকিকে পমেটম মাখিতে সাহায্য করে, উৎসাহ দেয়, ইতিমধ্যে নিজ হস্ত আঘ্রাণে সে তন্ময় তেলল হস্ত সংস্কারবশত পশ্চাতে মুছিতেই ছোঁয়াইতেই গম্ভীর অসম্ভব হিমের সাক্ষাৎ অনুভব হয়; ঝটিতি গালচমকির প্রতি চাহিয়া কহিল "ফাস কেলাস—উরি বাবা—কি দারুণ দেখতে হয়েছে—দেখ দেখ আয়না—দেখ দেখ জলে—দে একটা বিড়ি" আর যে সত্বর বিড়ি ধরাইয়া, কি কর্ত্তব্য স্থির করিতে অসমর্থে প্রহেলিকাময় নৃত্যে চঞ্চল অনন্তর সে ভূমিতে পড়িয়া গড়াগড়ি দিয়ে, উপুড় অবস্থায় স্থির, বলিল "তুই যা সুন্দর...যা সুন্দর...তুই যা সুন্দর—" বালকের বীজগণিতাত্মিক ভঙ্গিমা অধুনা ক্ষীয়মাণ, কেননা সে বহু কিছু ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে না, আপন উষ্ণতম গোপন মানসিকতার দ্বারা স্পর্শন প্রত্যক্ষ করে, কেননা তদীয় ওষ্ঠে ইহাই শুধু উচ্চারিত হয় যে আমার দারুণ আরাম লাগিতেছে, আমার বড় ভাল লাগিতেছে এবং সর্ব্বত্রেই যে বিদ্যমান রাজকীয় রসাস্পদ অস্তিত্ব সকল, তাহাদের প্রতি প্রশংসার দৃষ্টিতে অনন্তর তাকায়; আর ইহা সত্য যে, নিশ্চয়ই তাহার বলিতে সাধ হয় যে সমস্ত কিছুই কি পর্য্যন্ত সুন্দর! এ কারণে, তাহার দ্বারা এইটুকু মাত্র এহেন আবেগে সম্ভব হয়, সে বলে "দেখ দেখ কেঁচোয় খোঁড়া মাটি—দেখ গরল সাবানের ফেনা যেন—ধান কলটা দেখ" এখন, ইহার পরই, অনুনয় করিল "তুই আমার সামনে ঘোর না—মাইরী তোর গাল চমকানটা নেই—দারুণ লাগছে—" পুত্রের প্রশস্তি জ্ঞাপনের মধ্যে নিজ রূপ সম্পর্কে হঠাৎ ঈদৃশী ইঙ্গিত, গালচমকিকে কিঞ্চিৎমাত্র আহত করে নাই, তদীয় অধরে স্মিত হাস্য রেখা খেলিয়া উঠে, ভয় জড়ত্বের উচ্ছেদ হইয়াছে, সে অচিরেই গরবিনী; ইদানীং লখাইএর অনুরোধে পট্টবস্ত্রে সজ্জিতা গালচমকি মহা সুখে ভ্রমণ করে; লখাই ক্রমে বিশ্বাসে অন্ধ যে তাহার মা যথার্থ সুন্দর, এমন সময়ে ঘোর রবে আকাশ বিদীর্ণ হয়

"তুমি তুমি তুমি—যেও না যেও না—আমি আসছি—আসছি" এই ঘোষণায় তৎক্ষণাৎ লখাই ক্ষণেকের নিমিত্ত ঘাসে মুখ লুকায়, এখন সে চোখ তুলিয়াছে, চকিতে অপরাহ্নের আলো—মেঘ সরিয়া যাওয়াতে সুতীক্ষ্ণ—তাহার চিত্তবৃত্তিকে কেন যেন আকর্ষণ করে, গভীর স্বরভঙ্গ স্মরণে আসিবার পূর্ব্বেই সে বিপরীত আসনে সোজা-শায়িত, সম্মুখে বিরাট আকাশ, শুধু সম্ভবত তদীয় এনেথ স্বাধীনতার যন্ত্রত্বের জন্যত্বরূপে উহা, অপরাহ্ণ আলোক, সঙ্কেত করে, কিন্তু তদ্গত হওনের সময় নাই ফলে তাহার নিম্নকণ্ঠে "বসে পড় বসে পড়—যোহন একাদশী" ধ্বনিয়া উঠে ইহার পূর্ব্বেই গালচমকি অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল, "ডোঙাটা ধর—চ পালাই" আর যে সে ধান্য গুচ্ছের আড়াল লাভ নিমিত্ত বসিবার সময় রাস্তার প্রতি দৃষ্টিপাতে বুঝে, যোহন একাদশী দৌড়ায়; পরক্ষণেই সম্মুখভাগে চাহিতেই দেখে, অপরাহ্ণ আলোর সুস্পষ্টতায় চারিদিকে ধান গাছের মধ্যে সালতিতে কেহ ঘুমায়; উপস্থিত—নিশ্চয়ই একান্তের ধানগাছের স্বল্পতা নিবন্ধন—উহার মুখে রোদ লাগায় সে ঈষৎ অস্থির চকিতেই সে চোখ মেলিয়া থ, কেননা সে পট্টবস্ত্রে রমণী মহিমা প্রত্যক্ষ অবাক; ঐখানকার লক্ষণে চৈনিক চিত্র ভাবাপন্নতা ব্যাপিয়া আছে আর যে তাদৃশ ছবি, অবশ্য, মুদ্রিত চৈনিক চিত্রের সঙ্কলনে আমরা দেখিয়াছি—আর যে গালচমকি এই প্রতীয়মানতা দর্শনে আশ্চর্য্যে হতচেতন—ব্যক্তিটির মুখমণ্ডল যথার্থ মোঙ্গলীয়, ক্রমান্বয় বিগলিত—গোঁফ ও দাড়িতে অবিকল তাহাই, রমণী মন্ত্রমুগ্ধ এ কারণে যে উহার চোখদুটি অদ্ভুত! অধুনা ব্যক্তিটি ঝটিতি দণ্ডায়মান হওয়ত লগী তুলে গালচমকি যুগপৎ উঠিয়া অনড়, তদীয়, নাসা স্ফীত, গণ্ডদেশ মুহুর্মুহু চমকিত, এখন সে পিছু হাঁটিতেছে এবং যে সালতির জলস্তর আঘাতে এক কুহকময় ভৌতিক শব্দ উত্থিত হয় তাহা শুনিতেছিল—এ শব্দ লখাইও শোনে, অতএব সে ত্বরিতেই উঠিয়া ইহা বুঝে যে, তাহার মা পিছু হাঁটে ও আচম্বিতে অধিকন্তু লক্ষ্য করে যে একজন ভীমদর্শন ব্যক্তি পরণে হাঁটু-অবধি ঠেঁটি, এবার তাহাকে উরুপার্শ্বে তালু ঘর্ষণ করিতে দেখা যায়, আবার সমগ্র শক্তিতে সালতি বহিয়া ড্যাঙা অভিমুখে আসে; লখাই ইহাতে বুদ্ধি হারায় নাই, এই হেতু যে ব্যক্তিটির মন্দ অভিসন্ধি সে কোন ভাবে নির্ণয় করে, আর সময়ক্ষেপ যাহাতে না হয় তজ্জন্য পলায়নপটু লখাই প্রোথিত লগীটি তুলিবার মানসে আপ্রাণ—ঘর্ম্মাক্ত ও অনবরত বলিতে থাকে "শিগ্‌গির পালা এদিকে আয় এদিকে মা" নিশ্চয় আপন মতিত্ব বালককে অতিমাত্রায় আঁচড়ায়, কিন্তু ইহাতে গালচমকি কর্ণপাত করে না, এখনও পিছু হাঁটে; এবম্প্রকার ব্যবহারে লখাই বাহ্যজ্ঞানশূন্য, দেখিল তথাপি যে তদীয় মাতা অবশেষে জলের কিনারে, উহার স্খলিত; পূর্ব্বাহ্নের স্ত্রীসুলভ—পমেটম কৌটা ধারণে—কৌতূহল, সলজ্জভীতি নিশ্চিহ্ন; সে আপন অঞ্চল প্রান্ত পাকাইতেছে, এবং চক্ষুর্দ্বয় উজ্জ্বল; সম্ভবত ওষ্ঠে কুলটা ন্যাকা হাসি ছিল; লখাই সাহায্যের জন্য চীৎকার করিবার বোধ পর্য্যন্ত হারাইয়াছে, তবে সে রাগে অন্ধ হইয়া কটূক্তিতে আপনার মাতাকে সচেতন করিতে চাহিল "এই শালী রাতে খাঙকী পালা...এল যে" এমত সময় কূট ব্যক্তিটি আজব হুঙ্কারে স্থলে লাফাইয়াছে,গালচমকি ঝটিতে নিজ অঞ্চল খণ্ড এতাবৎ ইহা পাকাইতেছিল, কুণ্ডলীকৃত, স্বীয় মুখে প্রদান করে, আর যে লখাই অন্য উপায়ে কেঁচো খোঁড়া মাটি তুলিয়া ব্যক্তির উদ্দেশ্যে ছুঁড়িয়াছে; দশাসই নিমেষেই উহাকে অদ্ভুত ধমক দিয়াই গালচমকির প্রতি চাহিয়া হাসে, ইহা বালকের দৃষ্টি এড়ায় নাই যদিও সে তদ্দণ্ডেই ডোঙায় উঠিয়া পড়ে; নিশ্চিত তদীয় নয়নে জল ছিল, কেননা তীব্র হাস্যধ্বনি শুনে; উপস্থিত সে ঘুমন্ত সুহাকে জাগাইয়া কহিল "আমার মা মাগী তোমার পমেটম চুরি করেছে—তাকে তুমি জেলে দেবে, জেলে দেবে—চল দেখবে ত," সুহা ক্ষণমাত্র বিলম্ব করে না; দুজনে ডোঙা বহিতে মরিয়া দেখা যায়, ইত্যবসরে একদা গীত ধ্বনি, গীত সঠিকার্থে নহে, তাহাদের আকৃষ্ট করিল, পশ্চাতে চাহিয়া উহারা দেখে যোহন একাদশী ডোঙাতে একাধারে লগী চালনায় ও পাখী সামলাইতে বিভ্রান্ত, এখন যোহন একাদশী উহাদের দর্শনে, কেমন যেমন হাস্যকর-বেচারী, কোনক্রমে কহিয়াছে "ও পথে যেও না, ও পথে যেও না—সে, সে—" পরক্ষণেই শ্রুত হয় "আমার মান করা ফলেছে—" সে ডোঙার ত্বরিত গতি নিমিত্ত হন্যে; সুহারা বেগে ডোঙা চালনা করে, ইদানীং ধানলপ্তের আড়াল সরিতেই সুহার হস্ত হইতে লগী খসিয়া পড়িল দেখিয়াছিল, উদম উলঙ্গ গালচমকি শীষটানের দিকে শিয়র রাখিয়া শায়িত পাপীয়সী নিশ্চয় মৃদু হাস্য করে কিম্বা তদীয় গণ্ডদেশ চমকায়, চক্ষুদুটি নিমীলিত তর্জ্জনী তাহার শ্বেত দন্ত পঙক্তিতে ছোঁয়া, নিকটেই সবুজ শষ্পে পমেটমের কৌটা; এখনই একটি লোক যে উদম ল্যাংটো

মহা তেজে দাঁড়াইয়া উঠে, তাহার পদদ্বয় অসংযত; ধর্ম্মপ্রাণা ব্রাহ্মণকন্যা সুহাসিনী তদ্দৃষ্টে অপমানিত আপন করজোড় মুখমণ্ডল স্থাপন করিল; লখাই অর্দ্ধ উন্মুক্ত মুখে ঐ দৃশ্য অবলোকনে প্রস্তরীভূত, তাহার দৃষ্টির সমক্ষে লোকটি ক্রমবর্দ্ধমান বিশাল দেহ ধারণ করে, উহার জানুতে মরা ঘাস টুকরা ও অল্প ক্ষতচিহ্ন, তদীয় মুষ্টিদ্বয়দেহ পার্শ্বে, দূরে অবস্থিত, অধুনা মুষ্টি আলগা হয় কিছু ভাঁটুই আর ঘাস ঝরিয়া পড়ে, সে যেমত বা সম্পূর্ণ মাতাল আশ্চর্য্য যে অপ্রত্যাশিতভাবে এ ঘোর বাস্তবতার পিছনে সহসা রামধনু আকাশ ব্যাপ্ত করিল, অচিরাৎ কিসের আবেগে লখাই মথিত! এবং তখনই যোহন একাদশীর ডোঙা বিদ্যুৎবেগে আসিয়া উহাদের ডোঙায় প্রচণ্ড আঘাত প্রাপ্ত হয়, লখাইয়ের সমক্ষে দৃশ্য টলায়মান—কেননা ডোঙা অস্থির, ভারসাম্য হারাইল ফলে দুজনেই জলে, অন্যপক্ষে যোহন একাদশী ঐ দৃশ্যে এমত বিমূঢ় যে নিজ হস্ত হইতে লগীচ্যুত হয় এবং চেন সুতলী মুষ্টিবদ্ধ যাহা ছিল—তখনই নিমেষেই মুক্ত, ফলে পাখী উড়িয়াছে; সে নিজেও জলে পড়িল; এখন তিনজন সাঁতার কাটে; ভীত চকিত পাখীটি চক্র দিয়া ছোট একটি মনুষ্যনির্ম্মিত বন্ধন লইয়া আকাশ পথে; লখাই ঐ পরিদৃশ্যমানতা স্মরণে হয়ত—আপন বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠা অধরে স্থাপনে উদ্যোগী, হয়ত বলে যে আমি বামুনের ঔরসে এবং যেহেতু সে স্বাধীনতা বিশ্বাসী তাই বলিয়াছে যে ইহা কি সুন্দর, ইহা কি সুন্দর ইহা কি সুন্দর!



পিঞ্জরে বসিয়া শুক

জয় মাধব, তারা ব্রহ্মময়ী, মাগো—জয় রামকৃষ্ণ

তখনই যে সময়ে সুঘরাই হারাইয়া যায় এই দিব্যমাল্য সাজান, ভাস্বর, হীরক-শোভাতে বিনিদ্র শহরে—ইহা শিবপুরী, ভক্ত ও মুক্তি প্রদায়িনী যাহা, সৌন্দর্য্য যাহা, যে শহর, তখনই সে আপনকার সীমা বুঝিয়া তীব্র আতান্তরে পড়িয়াছিল; যে তাহার শেষ অঙ্গুলিশীর্ষতেই ও অন্য প্রত্যঙ্গাদিতে যে ইহার পর হইতেই এবং বনস্থলী চমকপ্রদ হইয়া রহে, যে ইহার পর হইতেই দীপের জ্যোতির্ম্ময়ী ঘটনার প্রবাহ! যে ইহার পর হইতেই আমি, হায়! আমি নারসিসস্-রে পথিক করিয়াছি।

ঐ সীমা ভাবিয়া, ও আমার মনিব! ও আমার মনিব! বলিয়া সে বড়ই উভরায় কান্দিয়া থাকে ইহা সত্য, অথচ আদতে তাহাতে প্রচ্ছন্ন ছিল কূট বিদ্বেষজনিত ক্রোধ, সে যেমন সেই সাধক—যে যিনি নির্ভীক তোয়াক্কাহীন দামাল, আকর্ণবিস্তৃত নেত্র যাঁহার হিঙ্গুল, চেহারা যাঁহার বৈরাগ্যসুন্দর দশাসই, গাত্র যাঁহার মসৃণ ও উজর তাম্রবর্ণের, যাঁহার পরনে কৌপীন, হস্তে যাঁহার সুমহৎ চিমটা; এখন যিনি এই লোকপ্রসিদ্ধ মন্দিরের দরজার চৌকাঠেতে অদম্য দুঃসাহসে ভীষণ রাগে ঐ চিমটা দ্বারা বারম্বার আঘাত করিতে উন্মাদ; ইহাতে ক্রমান্বয়ে তদীয় স্কন্ধ বলীবর্দ্দের প্রায় স্ফীত হইতেছিল, ঘর্ম্মে তাঁহার কপালের হোমতিলক ঘুণাক্ষরে পরিণত হইল, ইঁহার রুদ্রাক্ষমালা আন্দোলিত, আর যে তিনি মুহুর্মুহুঃ বীরবিক্রমে ত্রিভুবনের ত্রাসসঞ্চারী হুঙ্কার পাড়িতেছিলেন।

ঐ বিপুল হুঙ্কারমধ্যে ঐ অভিনব সাধক জলদগাম্ভীর্য্যে মা ভৈঃ উচ্চারণ করিয়াছিলেন, আবার কখনও বা ভগবান শিবকে বিকট আঁশটে বচনে গালি ও টিট্‌কিরি দিতে থাকিয়া ইহাও বলিতেছিলেন, শালা...অদ্য আমারে দর্শন দিতে হইবে, আমি কভু ফিরিয়া আসিতে চাহি না, দে শালা অখণ্ডতা!

যে এবং ঐ সাধক এরূপ অহঙ্কারও প্রকাশ করেন, যে, আমি তোমার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছি...আর তুমি আমাকে ফাঁকি দিলে!

ঈদৃশ নানান অর্থপূর্ণ শব্দের সহিত চিমটা-প্রহারের সঘন আওয়াজ হইতে থাকিল, আশ্চর্য্য যে ইহাতে কুক্কুর ও পাখীরা রব তুলে নাই, নিকটে থাকিয়া সুঘরাই কিছু আড়ষ্ট, কিছু কৌতূহলী!

সে দেখিল, অনেক পূজার্থী ও ধার্ম্মিকরা ঐ বীরের সমীপস্থ হইয়া বিস্ফারিত লোচনে, তাঁহার ঐ ভয়ঙ্কর উদ্ধত ক্রিয়াকলাপ দেখিতে থাকিয়া ভক্তিবিহ্বল হৃদয়ে, কেহ বা অশ্রু ভারাক্রান্ত ইতিমধ্যেই, অহরহ, অহরহ 'জয় বৈদ্যনাথ শিবশম্ভু' ধ্বনি দিতেছিলেন; তাই ইদানীংকার সমস্ত ভাবে আমাদিগের জীবন এক সুউচ্চ মহিমার অবস্থায়ে স্থায়ী হইয়াছিল।

সাধক ঘোর দম্ভে পুনরায় ঘোষণা করিলেন,...আমি মন্দিরে যাইব না...তুমি স্বরূপে আসিয়া দেখা দাও...। এবং যে ইহার পরক্ষণেই তদীয় বিপুল দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িল, তিনি চেতনশূন্য হইলেন; তখনই, সমবেত প্রত্যেকে তাহার অবলোকনে মহা গৌরবান্বিত বোধ করিলেন; ইঁহারা সশ্রদ্ধচিত্তে, মন্থরে, শিব ধ্বনি তুলিতে থাকিয়া ও তৎসঙ্গে ঐ সাড়হীন দেহের উদ্দেশে পুষ্পমাল্য আদি বর্ষণ করিতে গৌরবান্বিত বোধ করিলেন; ইঁহারা সশ্রদ্ধচিত্তে, মন্থরে, শিব ধ্বনি তুলিতে থাকিয়া ও তৎসঙ্গে ঐ সাড়হীন দেহের উদ্দেশে পুষ্পমাল্য আদি বর্ষণ করিতে সময়ে, ইহা বলিলেন,...হে নীলকণ্ঠ, হে ভগবান উমাপতি, তুমি অন্তর্যামী, আমাদের পুরুষানুক্রমে এবং পূর্ব্বজন্ম ও ইহকালের জন্য আমাদের যে অমরতা বরাদ্দ আছে...তাহা অচিরেই ঐ সাধকেরে দেওয়া হউক, কেন না তুমি তাহার (ঐ সাধকের) অবিনাশী প্রেম।

সাধকের অন্তর্দ্দশা প্রাপ্ত দেহটির শুশ্রূষাকরণে অতীব শুদ্ধাচারী ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেহ সাহস পর্য্যন্ত করেন না, এই জন্য যে ঐ পাঞ্চভৌতিক দেহ অধুনা কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীর পরমাশ্চর্য্য চন্দ্রকলা! এখন কেহ

সাধকের কর্ণে অমৃত শিব নাম, কেহ ব্যজন, কেহ উহার মেরুদণ্ডে ঘৃত কর্পূর মালিশ করিতেছিলেন, অনেকক্ষণ পর সাধক খানিক সহজ অবস্থায় আসিলেন ও তন্দ্রাবিজড়িত স্বরে কহিলেন, জল...জল খাইব!

এইভাবে ইহজগতের সহিত সম্পর্ক গঠিত হইল।

সুঘরাই এহেন প্রহেলিকার কিছু, সরলতার এতটুকুন, বীরত্বের লেশমাত্র না বুঝিয়া শুধু সাধকের দুর্দ্ধর্ষতা গ্রহণ করিয়াছিল। আর যে তেমন তেমন রোষে সেও জ্বলিতেছিল—সম্ভবত, কেন না তাহারই ছায়া বাঁচাইতে ব্রাহ্মণ্য শ্রীসম্পন্ন পাণ্ডাঠাকুর মহাশয় ঈষৎ দিক্‌ভ্রান্ত হওয়ত স্বীয় উড়নীতে সামাল দিয়াছিলেন; বিশেষই নিশ্চিত, কেন না সে বেচারী মন্দিরের দুয়ারের এই পার্শ্ববর্ত্তী স্থান ত্যাগে বাধ্য হয় তখনই, যখন ঐ সাধক অন্তর্হিত হইয়াছেন, যখন এরূপ সুদুর্লভ পবিত্রতার অর্থাৎ মন্দিরের নৈকট্যে আসাতে যে এক অনির্ব্বচনীয় আহ্লাদে তাহাতে গোঁয়ার হইয়া উঠিয়াছে!

এবং তাই তৎক্ষণাৎ সুঘরাই, তদীয় স্নেহশীলা মনিব পত্নী আদিষ্ট, সেই মনোলোভা সার্থক কামনা জানাইতে পারে না। যে পরম ভক্তিমতী রমণী যে সূত্রে বলিয়াছিলেন,...এখন বাবা বোদ্দিনাথের ইচ্ছে যদি হয়, এমন যদি করেন, তুই তাঁর সামনে একেবারে...উঃ তাহালে! হ্যাঁরে তেমনতারা ভাগ্য কি আর ছোঁড়া তুই করেছিস!...সে নয় নাই হ'ল...তবু তুই দাঁতে দাঁত দিয়ে...জান্ যায় সেও ভি আচ্ছা, তুই তাঁকে ডাকবি, দেখবি তোর পাপ তিনি মুছে দেবেন!

এই পর্য্যন্ততে সুঘরাইএর রৌদ্রনিবাস আয়ত চক্ষুর্দ্বয় সর্ব্ব সময়ে বড় হয়, যাহা প্রত্যক্ষে মনিবপত্নী আবার কহিলেন, হ্যাঁরে,...তিনি বড় দুখীর ঠাকুর...মা ঠাক্‌রুণ (সারদাদেবী) বলেছেন, যে ছোট ছেলের ডাক তিনি ফেলতে পারেন না, তুই নিব্‌ভয়ে ডাকবি, বলবি ঠাকুর আমি বড় অধম বড় দীন, তুমি ছাড়া আমার গতি কৈ...তক্‌খুনি, দেখবি বাবা বোদ্দিনাথ তোর পুব্‌বো জন্মের সব পাপ ধুয়ে মুছে দেবেন...আবাঃ ছোঁড়া গালে হাত দেয়...কতবার বলেছি না ঐ সব কথা কক্‌হনও গালে হাত দিয়ে শুনতে নেই...এসব ঠাকুরদের কথা।

ইহাতে সুঘরাই আপনকার গাল হইতে হাত নামাইতেই যারপরনাই অসহায় নির্জীব হইল; এমনই যে, ইদানীং সকল নির্ভরতা তাহার ঝটিতেই খোয়া গিয়াছে, যে সে সব গরু খেদাইতেও অপারগ; এবং তাই উপস্থিত এ দেহ কোথাও হেলান চাহিতেছিল—যাহা নির্ঘাত কৃতাঞ্জলিপুটে শুনিবার, পত্রউদ্গম ও কুম্ভকারের চাকের নির্গুণ গূঢ় পদ্যতে, যাহা গ্রামাঞ্চলে অনাবৃষ্টির ছড়া বোধে ব্যবহৃত হয়, নবমবর্ষীয়া বালিকারা নগ্ন দেহে, শূন্য ঘট মস্তকে ধারণে ঈষৎ নৃত্যভঙ্গিমায় উহা গাহিতে থাকিয়া প্রথমে ক্ষেত প্রদক্ষিণ করে।

এখন সুঘরাই যখন এহেন হেলান দিতে ইচ্ছুক, ঠিক সেই সময়তেই শুনিতে পাইল যে নিজ অভ্যন্তরে পাঠান দাপটে কিলকিলা রব ঘনাইয়াছে; তদীয় পেশীসকল তাহার স্বকীয় পূর্ব্বজন্মটিকে বিনানুনে এক গ্রাসে খাইতে হাঁ হাঁ করিতেছিল, যাহাতে সে বিপদ গণিল; ইহাতে শঙ্কায় সে কিয়ৎ পিছু হটিল, সুতরাং সে নিরীহ, যে নির্ব্বিবাদে সুতীক্ষ্ণ শীত সহিয়াছে নিজ বক্ষঃদেশে হস্ত রাখিয়া, যে নিজ হাতে কপালের ঘাম ও চোখের জল মুছিয়াছে, যে কোন লাট্‌ঠার দড়ি (কুয়া দড়ি) স্পর্শ করে না,—সে অন্য নহে। ফলে অতএব মোটেই আভাসিত তাহার মধ্যে হইল না, যে কোন একদিন কয়েকটি পালক উড়িয়া—হায়! কখনও বা মুক্তার বৈভব আতিশয্যকে প্রনষ্ট করিয়াছিল, এইহেতু যে সে আপনার ভালবাসা লইয়া ক্বচিৎ খেলা করে—তাহারে বিকট করিয়াছিল! এবং সে ন্যাংটো হইয়াও ছাড় পায় নাই।

যে স্থলে পালক উড়িয়াছে, পালক পড়িয়াছে, ধ্রুব যে ভগবান রামচন্দ্র যাবৎ না সেখানেতে পদার্পণ করেন, ততদিন সেখানে কিছুতেই দীপ জ্বালিবে না, যে ঐখানে পদক্ষেপমাত্রই সকলেই পথ ভুলিবে; এ কারণে যে, ঐ স্থলে সুঘরাইএর তর্জ্জনী কাটিয়া বেশ খানিক রক্তপাত ঘটে, এবং যে সে দেখিল ঐ রক্ত তাহার পাখীটিকে মহা সোহাগভরে পান করিতে; এখন আজব যে, ঐ দৃশ্যে সে দারুণ খুসী হওয়ার মুহূর্ত্তেই দুর্দ্দান্ত ক্রোধে ভৌতিক, তৎপ্রবর্ত্তিত সে তৎক্ষণাৎই পদাঘাত করিল মৃদুল পক্ষীটিকে; কিছু পালক খসিল, ইহা উড়িতে থাকিয়া তাহার সম্মুখের—রিখিয়ার পশ্চিমে অবস্থিত সুরম্য ডিগরিয়া পাহাড়কে ঢাকিয়াছিল।

দেবস্থান যাত্রার মধ্যে এবং মন্দিরে আসিবার রাস্তাকে পূজার্থী ও ব্রাহ্মণ স্পর্শ বাঁচাইবার ইতঃমধ্যে মনিবপত্নী-বর্ণিত প্রার্থনা, ইহা শ্রুতি বা দেশাচারে নহে, তিলেক সে বিস্মৃত হয় নাই, বরং উহাই তাহার সম্বল ছিল; তবে ইহা ঠিক, যে, ঐ সময়েতেই, নিষ্ঠাবান মনিব মহাশয় তাহার বিষয়ে যে অভিমত ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহাতেই সে, তাহার এক ছত্রে সে, কেমন দোমনা হইতেছিল; তিনি প্রকাশিয়াছিলেন,...যে সে নিষ্পাপ (মনিবপত্নীর উক্তিতে) সাতজন্মের পাপ!

এবং তবু ঐকথা যাহা উচ্চারণের সঙ্গেই বাস্তবতা কাদামাখা পদে মার্ব্বেল অভিমুখে ছুটিতে আছিল, এইজন্য যে ঐ উক্তিতে মনিবপত্নী, যিনি এ যাবৎ মৌনী, এ যাবৎ নিছাড় মালাজপকারিণী, তথাপি তিনি সন্ধিকে বাৎসল্যভরে সুঘরাইএর প্রতি চাহিয়া স্মিতহাস্য করেন।

কিন্তু যখন সে বেদময়ী অজস্র ধ্বনির মধ্যে, যখন আহ্লাদ তাহাতে থিতাইয়াছে, তখনই সুঘরাইএর আপনকার এতাবৎ মনস্থ কামনার পদবন্ধ মনিব-ব্যক্ত পদগুলিতে ঠেক্ খাইতেছিল; এখন সে যেহেতু প্রার্থনা জানে না ফলে ক্রমাগতই সে অন্ধকার দিয়া ডাকিতেছিল।

অবশেষে পুনরায় মনিবের বিনীত কণ্ঠস্বর শুনিল, একটি শব্দ দেখিতে পাইল, ইহাতে সত্যই সে যেমন চানোয়ার বালিতে খোঁড়া গর্ত্তের নিথর জলের চাকচিক্য সাক্ষাৎ করিয়াছিল, আশ্চর্য্য যে ঐ নিঃসঙ্গতায় থাকিবার সময়েই সুঘরাই বুঝিল তদীয় নিষ্পলক চাহনির সামনে—এই হাট দিনমানে মন্দিরের রাস্তায় এক অযুত দ্যুতিময়ী শোভাযাত্রা আসিতেছে।

সে প্রত্যক্ষ করিল এ শোভাযাত্রাতে সমস্ত পথ চারুবর্ণ ধারণ করিয়াছে, সে প্রত্যক্ষ করিল এক বহুমূল্যবান উৎকৃষ্ট কিংখাবের ছাঁদনা, যাহার চারিটি রৌপদণ্ড চারিজন বালক ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক ধৃত, ইহাদের মস্তক মুণ্ডন করা, পরণে ইহাদের গৈরিক—আর ঐ ছাঁদনার নীচেতে কোন সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা, হস্তে যাঁহার ধান্যমঞ্জরী, ইনি গৌরী, ইনি সেই যিনি নৌকার অভিমানকে মান্য করিয়াছেন, ইনি সেই যিনি মরকতের গোপনতা!

ঐ শোভাযাত্রা দর্শনে পথিপার্শ্বের সকলেই 'অহো ভাবতীতনু! জয় জয় অপূর্ব্ব মিথুন! অহো মহেশ্বরী' বলিয়া গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছিল; ঐ সুমধুর আওয়াজে দিকে দিকে পবিত্র অগ্নি স্থাপিত হইতেছিল। এই জোয়ারের ইতিমধ্যেই অদৃষ্টপূর্ব্ব মনোরমত্ব দেখার প্রাণভরিয়া দেখার সৌভাগ্য হইতে বেচারী মন্দ-কপাল সুঘরাই বঞ্চিত হয়।

সে সর্ব্বেব বিচ্ছিন্ন হইল।

সে অনেক অনেক কান্দিল। সে অনেক অনেকবার ও আমার মনিব আমার মনিব, বলিয়া উথলিয়াছে। কিন্তু কান্দিলেও অন্তরে সে ঐ সাধকপ্রায় আস্ফালনে তৈয়ার; আপনার অঙ্গুলিশীর্ষ বারম্বার নজরে এক বিষমত্ব জানিয়া সে খ্যাপাটে, এতদিন তাহার যে সীমা গ্রাম্য ছিল, সম্প্রতি তাহা ভৌতিক হইয়াছে; এই শহর তাহাকে, নিজেকেই, তাহার স্বীয় গায়ের উপর ঢালিয়া দিয়াছে; এই শহরের উপর সে খড়্গহস্ত, সে ব্রাহ্মণশ্রেণীর ন্যায় মোহিলিকে অভিশাপ দিয়াছে কারণ মোহিলি বলিয়াছে, ইহা মহিমান্বিত শহর, বহু জ্ঞানী এখানে, এখানে শিব বাস করেন, পঞ্চায়েত বিল্বপত্র হস্তে বিচার করে, এখানে বিস্কুটের কারখানা নাই।

ইহা মহিমান্বিত শহর! সুঘরাই বলিয়াছে, পাখীরাই তাহা জানুক; সে বলিয়াছে, মোহিলি ও যাহাদের ধারণা এ শহরে কুকুর হওয়াও পুণ্যের, তাহাদেরকে সে পদাঘাত করে এবং নিমেষেই এরূপ মনোভাবে সে ভীত; উচ্চবংশের বালকদের ন্যায় বলিতে এখনও পারে নাই যে, না বাবা বলিব না ভগবান শুনিতে পাইবেন।

সুঘরাই এই শহরকে খলযন্ত্রী সমঝে আপনার চোয়াল ঘর্ষণ করিতেছিল, এখানের কোথাও সে নিজেরে সম্প্রসারিত করিতে পারে না। অবিরত ঢাক বাদকের নৃত্যপদক্ষেপ তাহার পদচিহ্ন মর্দ্দিত দেখিয়া, শান্ত তীর্থযাত্রীদের তাহার পদচিহ্নের উপর দিয়া যাইতে প্রত্যক্ষে সে মারাত্মক হইয়াছে! ইহা বড় বিষম দায়, কোন বিচারেরই সুযোগ নাই!

কখনও বালকস্বভাব বশত সুঘরাই রাস্তার এক পাশ বাছিয়াছে, এই নির্ব্বাচনে একদা সে অহো বলিয়া ফুকারিয়াছে, সে খুসী, সে ইহাতে উচ্চবর্ণের স্পর্শ বাঁচাইয়াছে; ক্রমে তদীয় পদদ্বয় ধূলাতে বিশেষই গৈরিক যে তাহাও ঠিক কিন্তু সুরাহা হয় নাই! তাহার মনিবরা রাস্তার মধ্য দিয়ে যায় বা কখনও

পথ ছাড়িতে পাশে, তবে! সে নিয়ত মনিবদের অন্বেষণও করিয়াছে, ইহারই ভিতরে যে সে অনেকবিধ কাঠামো, সুদারুণ পারিপার্শ্বিকতার সহিত আপনাকে সংযোজিত করিয়াছিল—সুতরাং এনতার অনভ্যস্ত সংস্থানের মধ্যে সে, সঙ্গে সে, এক হয়—এইরূপ বিশ্বাসে যে মনিবরা তাঁহাদের সত্ত্বগুণ বশত আকর্ষিত হইতে পারেন ঐ ঐ সংগঠনে।

এবং সুঘরাই ঐ ঐ পরিবেশ সকলের মধ্যে আপনাকে উপস্থাপিত করিয়া আবার অন্বেষণে থাকিয়া খুবই তাজ্জব যে কখনও কখনও সে নিজেকে মনিবের চোখে নির্দ্ধারণ করিতে মজবুত ছিল; ইহাতে পর্য্যবেক্ষণ তাহার কি আশ্চর্য্য অমানুষী, বোধ কি অভাবনীয়! যে যেন বা সে কখনও জংলী নয়; ইদানীং এহেন ভিন্নতায় সে, মানে মনিবকে, দেখিল।

সে কল্পনায় দেখিল বিশৃঙ্খলতা, মসৃণতা, অনেক আবছায়া অনেক রক্তচন্দন ও তীর্থযাত্রীর দল ভেদ করত তিনি সুস্পষ্ট হইলেন; এবার তিনি মুখের পার্শ্বে হস্ত স্থাপনে ভীড়ের এখানে হঠাৎ, অন্যত্রে বারেক সুঘরাই বলিয়া ডাকিলেন, যে ইহাতে মাতৃস্তন অরুণাভ, যে ইহাতে জনতা এই নিবিড় এই তরল হইল; এখন এবং সুঘরাইএর প্রমাণের-কোন-বালককে পশ্চাত হইতে দর্শনে—বালকের বস্ত্র ও গেঞ্জী দর্শনে যেহেতু ঐ সুঘরাই বিশ্বাসে অত্রাহি দৌড়াইলেন এবং চীৎকার করিলেন—এই হারামজাদা সুঘরাই!

হায় সে এক স্কুলগামী বালক!

নিরাশ হওয়ত বিষণ্ণ হৃদয়ে তিনি পূতসলিলা শিবগঙ্গার সুদৃশ চাতালে আসিলেন; এখানে কেহ কেহ যাহারা ঘুমায় তাহাদিগকে স্বীয় দেহ বাঁকাইয়া এমত নিবিষ্টতায় তিনি সমীক্ষণ করিলেন যে, যেমত বা ঘুমন্ত সকলের স্বপ্নের সুষুপ্তির অন্তরীক্ষে সুঘরাইএর খেই লুক্কায়িত আছে; যে মধুস্বরে তিনি সুঘরাই বলিয়া ডাকিলেন; ইহা নির্ঘাত অপ্রকৃতিস্থতার হইলেও আর যে, এই দেবস্থানের ধ্বনিত গভীর জয় জয় শিবশম্ভু বচনে ও স্নানের নির্ম্মল শব্দে ঐ প্রিয় নাম ধূলিসাৎ, তীর্থকামীদের অগ্রবর্ত্তী মঙ্গল ঢাক বাদ্যে তাহা নয় ছয়!

সেখানে খুঁজিতে থাকিয়া মেঘমন্দ্রে অগণন কণ্ঠের মন্ত্রের প্রতি কখনও, সুললিত স্তবস্তোত্র আবৃত্তিসহ শিবগঙ্গাতে শুভ অবগাহনরতদের প্রতি কখনও তিনি সনাতন প্রবীণ ভঙ্গীতে চাহিয়া রহেন কারণ যে বিবিধ ওষ্ঠের স্ফুটমান শব্দরাজিতে ও অবগাহনের মনোজ্ঞ রণনে ধ্রুবই যে তন্মাত্রা সমস্ত নির্ব্বিকার, কোথাও অন্ধকার নাই; মাত্র যে শিখা ঊর্দ্ধগামিনী এই তত্ত্বে সবই জরিয়া আছে—তাহারাও কি সুঘরাইকে ডাকে!

আবার তিনি শ্বাস লইলেন, তিনি সহজ হইলেন, তিনি ঠিক করিলেন, এই ভাবিয়া যে সুঘরাই নিশ্চয়ই ক্লান্ত বোধ করিলেও মুষড়ায় নাই এবং আরও নিশ্চয়ই আমার খোঁজার সুবিধার্থে এখানেও সে ছিল; তাই যাহারা শিবগঙ্গায় অর্দ্ধজলমগ্ন, করজোড়ে যাহাদের পৃথিবীর পার্থক্য, তাহাদেরই কাহারও পাঠ থামিলে এই সংবাদ লইবেন যে, যে বালক এতক্ষণ শুদ্ধাতিশুদ্ধ অবগাহন দেখিতেছিল এবং তাহাতে সে অপরোক্ষেই, যেন সে, ঐবালক, একাই সুদীর্ঘ সময়, যাহা বীজ বপন করিতে ব্যয়িত হইয়াছে এবং ঐভাবে অনেক দুরতিক্রম্য পথ বহি এখানেতে আসিয়া চমৎকৃত!

এবং আপনাদের স্নানের আওয়াজে সেই বালক একদা রিখিয়ার সন্ধ্যায় নীত হইল; ছোট ছোট পরিবার বেড়াইতেছে—ইহারা চেঞ্জার; ইহাদের সকলের মুখমণ্ডল, দৃষ্টি, আকাশ ও মাটির ইতিমধ্যে রক্ষিত—ইহাদের পিছনে পাহাড়, শাল ও মহুয়ার পুনরাবৃত্তিতে ন্যাংটো দিকসকল; ইহারা সমস্ত কিছুকেই গ্রাণ্ড বলিয়া প্রশংসা করে, তাহারা পেট্রোমাক্স হাতে সুঘরাইকে দেখিয়া বলিয়াছে—ছেলেটি গ্র্যাণ্ড গ্র্যাণ্ড! বেশ কালচার আছে!

এবং আপনাদের স্তবস্তোত্রের অনুরণনেও শিবগঙ্গার শীতলতায় উহার, সেই বালকের, দেহ মন পরিবর্ত্তিত আর যে তাহাতে এই শুভ বুদ্ধি মনে হয় জন্মে যে শিবই প্রাকৃতজনের অদ্বিতীয় জ্ঞান এবং ইহাতে সে স্মিতহাস্য করিতে চেষ্টিত হইয়াছিল...আপনারা শাশ্বত ধর্ম্মের, মন জানে, সূক্ষ্মগতি অভিজ্ঞ আপনারা, বলুন, তাহার ঐ ভাব যেন সত্য হয় এবং এখন ধর্ম্মপ্রাণ আপনারা এই লৌকিক খবর কি বলিবেন যে সে কোথায় গেল?

কিন্তু তিনি জিজ্ঞাসিতদের উত্তর আন্দাজে, অনুৎসাহে যে সকল কুসুম শিবগঙ্গার পাপহারিণী জলস্তরে হতাদরে ভাসে অধুনা সেই সেইতে নেত্রপাত করিলেন, এখন তদীয় ক্ষুণ্ণ মানসে ফুলগুলি,

ফুলগুলি, ফুলগুলি!

অনেক সন্ন্যাসীর মধ্যে এক তেজঃপুঞ্জ কলেবর ভস্মাবৃত সন্ন্যাসীর নিকট তিনি যাইয়া প্রণতি পুরঃসর কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদিলেন,—ভগবন, যে বালক অশ্রুভারাক্রান্ত নয়নে, স্বীয় মস্তকোপরি হস্ত রাখিয়া আপনাকে অবলোকনমাত্রেই থ হয়, সুতরাং আপনাদের মতন সন্ন্যাসীর সম্পর্কে মোহিলির উল্লেখ তাহার খেয়াল নাই; আবার ক্ষণেক পরেই সেই বালক এক আতঙ্ক দেখিল, সে দেখিল সমক্ষে থাকিয়াও নাই-এর মধ্যে আপনি—আপনার ধুনির অমোঘ তর্জ্জনী আছে, সে দেখিল আপনার ধুনিতে সূর্য্যের যাত্রাপথ পুড়িয়া খাক্ হইয়াছে।

সে নাসিকা কুঞ্চিত করে—আমরা জানি যে ঐ ধুনিতে পানপাত্রের কিনারের আঙুরলতা কেয়ারী করার সভ্যতা দাহ্যমান, মানুষ নিজেকে ভালবাসার নামে নিজেকে সজ্ঞানে যে তামাসা ব্যঙ্গ করিয়াছে—কত না ব্যঙ্গ উক্তি রচনা করিয়াছে—তাহারই পোড়া গন্ধ আপনার অনির্ব্বাণ ধুনি হইতে নির্গত, ধূম্রজাল অনেক ঊর্দ্ধে উঠে, ইহাতে উজ্জ্বল হংসযূথ বহুদূর হইতে নিশানা পাইতেছে অথচ চন্দ্রসূর্য্য নক্ষত্রাদি বহুকাল হয় আপনার দিক্‌মণ্ডলে নাই—এই জটিল ঘটনা আবর্ত্ত কথা যেন সেই বালকও জানিয়াছে, কেন না সে নিশ্চিন্ত ছিল। অথবা এইজন্য সে স্থবির যে আপনার দর্শনে অবশ্যই সুদুর্লভ স্পন্দনরহিত যাতনা তাহাতে যেমন প্রভাবিত হইয়াছে!

অভ্রান্ত ইহা যে আপনার দিব্যদেহই পূর্ব্বদৃষ্ট সেই শোভাযাত্রার গূঢ়তম মন্ত্রগুপ্তি এবং যে আপনি অলৌকিক নগ্ন, আপনি অজর দুঃখবোধ, অলৌকিকী দুখের দুখী আপনি...হে মহাত্মন, হে ভেদজ্ঞানহীন, এখন যদিস্যাৎ অভেদজ্ঞান বিচারে সেই বালকটিরে নজর করিয়া থাকেন, আপনি লোকহিতকামী সর্ব্বজ্ঞ বলুন সেই অল্পবয়সী, যে বালকত্বে অপরিসীম, সে কোথায়?

ঐ মহাপুরুষের ধুনি গন্ধে সুঘরাই নাসিকা আবার কুঞ্চিত করিতেই সে শুনিতে পাইল তালপাতা পথের কাঁকরে ঘর্ষণে ভারী বিশ্রী আওয়াজ উঠে...পরক্ষণেই প্রতীয়মান যে ঐ তালপাতার উপরে একটি মৃত কুকুর বাঁধিয়া রাখা; এক অদ্ভুতদর্শন লোক, অনেকাংশে তাহার ভগ্নীপতির মতন দেখিতে, এক দীর্ঘ তালপাতার ডাঁটা ধরিয়া টানিতে থাকিয়া মন্থরে আসিতেছে, লোকটি চমৎকার কণ্ঠে গান গাহে এবং কোঁচড় হইতে মাঝে মাঝে যেন কি খাইতেছিল। পথচারিগণ মৃতের পচা দুর্গন্ধে নাকে কাপড় দিয়াছে, থুথু ফেলিতে ফেলিতে চলে।

ঐ বিষমত্বে অন্যপক্ষে সুঘরাই যেন জমিয়া উঠিল, ইহা তাহার নিকট অন্ন, ইহা জল! সে মুষ্টিবদ্ধ করিল, তাহার ক্রন্দনের কোনই কারণ নাই, সে নিবিষ্টচিত্তে ইহা লক্ষ্য করিল যে অনতিদূরে এক গাড্ডায়ে সেই মৃত কুকুরটিকে ফেলা হইল। তখনই সে যেমন বা নিজের সূত্র পাইল, তখনই দ্রুত পদসঞ্চালনে সে সেখানে—যেখানে আর কিছুকাল পরেই শকুন আসিবে; ধর্ম্মত সে আপনার অহঙ্কার ফিরিয়া পাইল, তাহার অজ্ঞানতা! পুনরায় লাভ করিল, পচাগলা পূতিগন্ধময় যাহা কিছু তাহার সহিত তাহার কি অবিচ্ছেদ্য যোগ! সে সুখী, সে হারাইবার নহে।

যেখানে, চাতালেই, কোন অতীব নিষ্ঠাবান আচারী ব্রাহ্মণ, সূর্য্যকে যিনি একাগ্র মনেতে জল-অর্ঘ্য দেন, ইহারই নিকট, ঐ কর্ম্মানুষ্ঠানশেষে ঐ সুঘরাই কল্পিত রীতিতে মনিব মহাশয় অবতারণা করিলেন—এক ছেলেমানুষ চপলমতি আপনকার অধরের প্রহেলিকাময়ী কম্পন হেরিয়া ও যুগপৎ সূর্য্য তথা নভোস্থল প্রতি নেত্রপাতে কিছু এক সমাধান উদ্দেশ্যে এতই অচেতন থাকে, যে তাই অসাবধানবশতই, আপনারে ধাক্কা দিয়ে ফেলে; তৎকালে আপনি, হে মহানুভব, তাহার দিকে ঈষৎ তাকাইয়া ঝটিতিই আবার কর্ম্মানুষ্ঠানে ব্যগ্র হন; অন্যপক্ষে সেই বালক কৃশ হওয়ত, রুগ্নবদনে, কিছু এক বোধ তাহার এই বিচ্ছিন্নতায় নিতান্ত দরকার কেন না আপন অন্তঃস্থিত অন্ধকারকে সে ভয় পাইতেছিল এবং তাই অন্য বোধ অভাবে কিছু সময় নিজ দুষমনী বোধে নিশ্চল ছিল—কেন না যে সে হয় জাতিতে ডোম।

তবু সে এইটুকুন তাহার সপক্ষে বলিতে নিশ্চয়ই একশা, যে তাহার দিকের খবর নাই, এমনও যে, এখন দিনমান কিম্বা নহে ইহা, অথবা কোনটি তাহার বাম হাত তাহা, সারা কিছুই উহার জ্ঞানকাণ্ডবহির্ভূত অধুনা; যেহেতু সে আমাদিগকে আকুল হইয়া খুঁজিতে আছে; বেচারী

দৈবদুর্ব্বিপাকবশত আমাদের কাছ-ছাড়া, আমাদের সান্নিধ্য হইতে বিচ্ছিন্ন। সুঘরাই তাহার নাম, বেচারী হারাইয়াছে—হায় যে ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী নগরীতে মানুষ আপনারে ফিরিয়া পায় সেইক্ষেত্রে সে হারাইয়াছে, এখন যদি...।

এই অবধি ভাবিতেই সুঘরাইএর চোখে মোহিলির বহু পুরাতন শতচ্ছিন্ন জুতার ন্যায় মুখখানি প্রতিভাত হয়; এখন মোহিলি হয় একজন গো শকট চালক। যেটিতে সে এবং মনিবদ্বয় আরোহী ছিল, মুখ্যত ইদানীন্তন বিপর্য্যয় ও দুর্গতি মোহিলির নিমিত্তই।

যে যাহা এই যে, গরুর গাড়ী রিখিয়া হইতে বেশ আসিয়া উত্তরিল বিলাসীর চৌরাহাতে—যে স্থলে পুবে দুমকার রাস্তা, পশ্চিমে জসিডি বরাবর; যেখানে তাহারা সকলেই—যখন, হর হর মহাদেব, জয় বাবা বৈদ্যনাথ ধ্বনি দিতে যাইবে, তৎসহ গললগ্নীকৃতবাস মনিবপত্নী সন্নিহিত বেলবৃক্ষের পত্রোদ্গম শোভা দর্শনে 'আহা' বলিবেন, যথার্থ লম্ফকারী ধ্বনি সেইখানেতেই; অতর্কিতে কূর্ম্মপৃষ্ঠ জমির শীর্ষভাগে, দেখা গেল কে একজনা ভূমি ছাড়িয়া অনেকটা লাফ বারম্বার দিয়া উঠে; লম্ফকারী সেইজন আপন বক্ষঃদেশে ঘন ঘন চাপড় মারিতে একটি হস্ত দ্বারা আঘাতিছে, এবং সে বেদনায় চীৎকার পাড়ে, কান্না যেমন, কিন্তু চোখে জল নাই; আর 'ওহো সুঁই' কম্পিত কণ্ঠে বলিয়া উঠে।

এতাদৃশ সংঘটনে ভোরের মনোলোভা সমীরণ স্তোভ ছিল; এতাদৃশ নাটকীয়তায় শহরগামিনী সারিবদ্ধ সাঁওতাল রমণীকুলের গতি ব্যাহত হইল, ঐ লোকটির কিম্ভূত ব্যবহারে দারুণ আকৃষ্ট যে উহারা, উহাদিগের সুমহান মুখমণ্ডলে অবিশ্বাস্য ত্রাসজনিত কাতরতা আছে, উহারা আতঙ্কে তাই, যে তদানীন্তন কালেও তাহাদের কবরীস্থ ফুলসকলে আপন আপন অঙ্গুলির মঞ্জুল সোহাগ দিতে থাকে।

যন্ত্রণায়ে উৎক্ষিপ্ত লোকটির ছায়া আরবী হরফকার কাটিতেছিল, তজ্জন্য প্রায়শ ভগ্নস্বরে তদীয় সুতীব্র নিনাদ—উও হো সুঁই!

কথাটি আরও বিভীষিকা হয়। সুঁই শব্দ শ্রবণেই মোহিলি অব্যর্থই যে উৎপাটিত, গরুর দড়ি ছাড়িয়া কর্ণে অঙ্গুলি প্রদানিল; সর্ব্বনাশী আতঙ্কে উহার শিয়রে-বাঁধা গামছা খসিয়াছে, তথৈবচ অভিব্যক্তিতেই সে কহিল,—গে মাইরে হা মো কপহাড়! এবম্প্রকারে মহা আর্ত্তনাদ করিল; এখন উহার খুদে চক্ষুর্দ্বয় হাঁহিয়া হ্যাঁদা হইয়াছে, বুঝাইল, সে আর আসিবে না।

সুঁই সুঁই রব চারিদিকে; ইহাতে সকালের আকাশে খরা, পথগুলি হইতে পরিপ্রেক্ষিত মুছিয়া গিয়া কোথাও নীলিমার ভাবান্তরে করবী ক্বচিৎ; সুঁই-এর ভয় মড়ক-অধিক, এ কারণ যে, তাহারা যে যারপরনাই কাঙাল; সুঁই এক ভয়ঙ্কর রক্তচোষা, যে যাহার ব্যথায় দিন কয়েক নির্ঘাত অপটু তাহারা হইবেক। ইহারা শহরের কর্ম্ম অন্বেষী; বেচারীরা প্রত্যেকেই 'হা হতোস্মি!' বিলাপে, ঐ শহরের প্রতি বড় গূঢ়তম বুক ভাঙা নয়নে চাহিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবে এখনই।

জনৈক ঐ উজ্জ্বল শহরের প্রতি তাকাইয়া, যে যেমন লোকপ্রসিদ্ধ বিরাট সনাতন দেউল তাহাতে সম্যক বিস্মিত—সুতরাং, সে আপন হৃদয়াবেগ জ্ঞাপন করিল, পাপ! আমাদিগেরই পাপ, বাবা বৈদ্যনাথ দেবাদিদেব, কিন্তু কে সেই জন যে এরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করিল যাহাতে বহু কোল নিঙড়াইবে, বহু ছন্নছাড়া হইবে; হায় কে এরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করিল—সে কত বড় পামর! যে, সে যদি শহরবাসী হয় তাহাকে ধিক্, সে যদি বাহিরের মফঃস্বলের তাহাকে শত ধিক্; তুমি বাবা বৈদ্যনাথ থাকিতে এত পাপ! জানি শত কুঠার আঘাতেও সুমহৎ বৃক্ষ যেমন ছেদনকারীকে ছায়া দিতে নিস্তেজ নহে, তদ্রূপ তুমি...কিন্তু আর ক্ষমা নহে তুমি জাগ্রত, তুমি ইহাদের তোমার ত্রিশূল দ্বারা খণ্ডিত কর, সেই বিশ্বাসঘাতকের সমুচিত শাস্তি বিধান কর। আমরা শালা জাতে অধম ছোটলোক, আমরা আলেখ কীড়া, অনেক জন্মাই অনেক মরি, আমরা রোগের ঘর...কিন্তু অদ্য, সূর্য্য সাক্ষী, আমরা কোন রোগ বহন করি আনি নাই! আমরা দীন, আমরা অভুক্ত, শহরের যাহা অসৎ তাহা দূরে লই, আমরাই অসৎ...এ সময় ধান পাকিবে, বহু অচেনা পাখী আসিতেছে, কুয়ার জল যেক্ষণে স্বচ্ছ, এ সময় সুঁই! ভীতি আমাদের সম্বল, আমরা ভীত, আমরা কাঁদিয়া থাকি।

সুঘরাই উক্তিসকল যেমত দেখিল; আর মোহিলি এখন, মনিবদের পীড়াপীড়িতে, উপরন্তু ইত্যাকার আশ্বাসে যে—ইহা সুনিশ্চিত শ্মশানের অপর পার্শ্বে দুধ-কাড়া ভণ্ড সাধুর ডেরা, যে প্রতি গোয়ালার

নিকট হইতে আদায় করে, আস্তানার কাছেই সুঁই-এর ডেরা পড়িয়াছে, ফলে এক রশি মতন রাস্তা মোহিলি অগ্রসর হয়; পথ নিঝুম, গাড়ী রুখিয়া মোহিলি নামিল; শনৈঃ অত্যধিক সন্তর্পণে, পদক্ষেপে, শ্মশানাভিমুখে সে চলিতে থাকে; এবার সে অনেক নিসিন্দাও আতা গাছের আবডালে, তদ্দৃষ্টে সুঘরাই মেরুদণ্ড টান করিল।

অনন্তর কিছু সময় বাদে নিদারুণ বিকারগ্রস্ত মর্ম্মন্তুদ নখিলা রোল শ্রুত হইল, যে যাহা ক্রমে পশ্চিমের নাবাল ক্ষেতে সরিয়া অল্প রেশ সম্প্রতি, কেহ সেখানেতে ছুটিয়া আছে, সে আপাতত থামিল, দেখা গেল সে হয় মোহিলি, যে এবং গরুর গাড়ীর দিকে মুখ করত জানাইল সে—শহরে যাইবে না, সুঁইওয়ালারা শ্মশানের এই দিকে, তাই ডরে আমি রাস্তা ত্যজিয়া ক্ষেতে, যে আমি মাটির যাতনা বটে, বড় কাঙাল বটে, আমি পলাইব, পলাইব হে!

মোহিলি না-বাগমানিতে মাথা দুলাইল, পরে মনিবদের যথোচিত ভদ্র সুসঙ্গত অভয়বাক্যে মোহিলি সতর্ক চলনে ক্ষেত হইতে এখানে সন্নিহিত হইল, তাজ্জব যে, আপন চুটা ধরাইতে মনিব মহাশয়ের কাছে দেশলাই মাগিল; পরক্ষণেই ভূতচালিতের রকমে সে বাচাল, আরম্ভিল—হে রে শাল্‌লোঁ হরিজনরা, যে বেটা দুষমনরা চিনি যে কি তাহা জানে না, যে শয়তানরা হাঁটুর নিম্নে কাপড় পরিতে ভয় পায়, যে হাজতীরা (হাজতে থাকে) বাপকে শালা, আপন পুত্রকে খচ্চড়, দিবানিশি সম্বোধন করে, যাহারা মহিষের মাংস খায়, যারা ভাগাড়চারী শকুনের সহিত দাঙ্গা করে, মরা পশু খায়, হা মরি তাহারা লইবে মন্দিরের দখল! ঐ শাল্‌লো হরিজনদের জন্যই এই সুঁই।

হে বাবা বৈদ্যনাথ তুমি যদি সত্য, তাহা হইলে সুঁই-এর পরও তাহাদের কলেরা হউক, যে চিঠি তাহারা করিয়াছে তাহারও কলেরা হউক, সবংশে তাহারা নিধন হউক; এখন শালা চরকাবাজরা সুঁইবাচক। যাহাদের পাপে মেঘ অবধি বাঁজা হয়—ডোম চামার মেথর হাড়ি পাশি, যত শালা মাতাল ভুমনীখোর বদমায়েস, আংলিস খচ্চড়, গরুচোর ধানচোর, ও হো হো আমি জাত ভাঁড়াইলেও আমার সুরত দেখিয়া চিনিবে যে, ওহো সুঁই গে মাই, আমার আগে আমার ছায়া পর্য্যন্ত যাইতে—যাহার নামেই ডরে, দেখুন হে আমার ছায়া বটে কীদৃশী ভয় পাইয়াছে, দেখুন উহা আমার পিছে মুখ লুকায়। অহো বাবা বৈদ্যনাথ দেখ, আমার তরাস এখন আছে, তুমি ধন্য।

তথাপি যে মনিবরা অজস্র সাধ্যসাধনা করিলেন, হায় কোনই ফলোদয় ঘটিল না; সুঘরাইএর দেহে সিঞ্চিড়া উপস্থিত, বধির কেরেট সাপ যেমন তাহার আশেপাশে, স্বীয় গ্রামেব লোকের এরূপ ভীতি দর্শনে সে নিজেই দুর্ব্বোধ্য হইয়াছিল; ইদানীং সে চামার মোহিলির মুখমণ্ডল পাঠে সম্যক উহারে বুঝিয়া লইতে ব্যগ্র থাকে; এই সেই চামার মোহিলি যাহার বাড়ীতে বিলাতী আমড়া গাছ আছে, যে হয় খুবই ঢ্যাঙ্গা, যে খুবই রোগা, যে হয় হাড়সার, সব তেমন তেমন আছে বটেই, তবে যে কি যেন উহাতে ছিল না।

যে তাহা ইহা, যথা যে—সেই যে চামার মোহিলি, যাহার বশে কত প্রেতাত্মা, যাহাকে কতবারই না দুর্ব্বোধ্য ছড়া কাটিতে সঙ্গেই কুশ-পেয়ের ন্যায় পা করিয়া ইব্রাহিম মিঞার ভুটে ঘোড়ার মূত্র ঝিনুকে সংগ্রহ করিতে দেখিয়াছে; যাহাকে দেখিয়াছে ঐ মূত্রপূর্ণ ঝিনুক হাতে তদ্রূপ ছড়া উচ্চারণে, যে সদ্যজাতক-কে ইলড়া ভূতে পাইয়াছে অথবা যাহাতে না পায়, তাই উহা খাওয়াইতে গিয়াছে—ইহা তাহাদেরই মারণ ঐ জাতীয় ভূতের! যাহারা নবজাতককে বিকলাঙ্গ করে, দুমড়াইতে থাকে।

ঐ ঝিনুকসহ তাদৃশ কায়দায় মোহিলির মন্থর গমন, কি পর্য্যন্ত ভাব গম্ভীর, যে সে এতটুকু ভ্রূক্ষেপ কিছুতেই করে না, উহার পিছনে তখন গাছে পাতায়ে ভীষণ ভূতুড়ে দৌরাত্ম্যর শব্দ ও কাণ্ড ঘটিতেছে; কি আশ্চর্য্য রহস্য সে! আর এই সুঁই ব্যাপারে নিজেই শঙ্কিত, বেপথু শরীর উহার! ইহাই কি সেই মোহিলি যে যাহার ঘুনসীতে সকলের শুভাশুভ বাঁধা নিশ্চিন্দি, যে যাহার চর্ম্মে জনাজাতের ঘুম লাগিয়া থাকে। রাত্র যাহার দাসানুদাস।

মোহিলির বহমানতা লুপ্ত হইতেই, এতক্ষণকার, সেই রিখিয়া হইতে যাত্রা প্রীতিময়, যাহা উদ্দীপনায় নিশ্চিহ্ন বিশেষত এই কারণে যে একদা মোহিলি জানাইয়াছিল, যে এক একজন সন্ন্যাসী মহাপুরুষ আছেন যাঁহারা তত্ত্বদর্শী, যে রহস্য তুমি শুনিয়াছ তাহার সবিশেষ তাৎপর্য্য জিজ্ঞাসুকে তাঁহারা বলিতে

পারেন, বৈদ্যনাথে যখন যাইব তখন আমরা, তুমি আর আমি, তেমন তেমন মহাপুরুষ দেখিলে তাঁহার নিকট নিবেদন করিব, ইহাতে আমরা জন্মান্তরে উঁচু ঘরে জন্মাইব। আমরা নিশ্চয়ই জন্মাইব...।

ইহাতে কি যেন ভাবিয়া সুঘরাই কহিল,—যদি উহা শুনিয়া অচৈতন্য হয়!

মোহিলি উত্তর করিল—জানি তাঁহারা অজ্ঞান হইবার নহে।

যদিও মোহিলি এই কথার মধ্যে মধ্যে কাশিতেছিল তবুও সে আবছায়া সুঘরাইএর চোখে এবং ঐরূপ প্রস্তাবে তাহার, সুঘরাইএর দেহ নিয়মরহিত: এবং সুঘরাই অন্যত্রে, তখন সে প্রত্যক্ষ করিল, অদূরস্থিত সৌখীন টেবিল ল্যাম্পের আলো আশ্চর্য্য অহেতুক হঠাৎ বর্দ্ধিত হইল। ইহাতে তাহার কণ্ঠস্বর ব্যাহত নয় যাহা একটানা ভিখারীবৎ ছিল; দ্বারদেশে থাকিয়া সে ঐ রহস্য-কথা বলিতেছিল আর যে তাহার পশ্চাতে দরজায় উৎকৃষ্ট চিন্‌ৎসের ফুলকারী পর্দ্দা উড়িতে থাকে এবং বাহিরের সাঁওতাল পরগণার বিচিত্র অন্ধকার অনুভব হয়।

চিপ এণ্ড ডেল রীতিবিশিষ্ট ছোট লেখার টেবিলের সামনে মনিবপত্নী, যিনি এখন পুত্র ও কন্যাকে চিঠি লেখেন, হালকা ফলসা রঙের চিঠির কাগজের পাশেই তাঁহার বাঁ হাতখানি আড় করিয়া রাখা যেন কোন প্রসিদ্ধ আর্টিস্টের কাজের খানিক, কিন্তু অঙ্গুরীয়র চুনীর উজ্জ্বলতায় ঐ ভাবনা আর থাকে না, মনে হয় ইতিহাস একদা ভয় পাইয়াছিল; ডান হাতের কলমটির প্রান্ত তাঁহার সুমহৎ অধরে ছোঁয়ান; সামনে চমৎকার গিল্টকরা ফ্রেমে, নাবিক পোষাক পরিহিত কিশোর বালকের ছবি ও ইহারই পাশেই, একই ফ্রেমে, বালিকা কন্যা মেষপালিকার বেশে—এই কল্পনাকে তাহার জীবনপণ নৈতিকতায় বাঁচাইবে—আর তাহারা ঝরণা দেখিতে ছুটিয়াছে!

যেহেতু ইহাদের ঐ পুত্র কন্যাকে সুঘরাইএর পক্ষীবৃত্তান্ত জানাইবার জন্য মনিবপত্নী উন্মুখ ছিলেন। সুঘরাই বর্ণিতে আছে, স্বরে তাহার জড়তা নাই, কিন্তু ছোট দেহখানি তাহার অস্বচ্ছন্দ, সে কহিল—মোহিলি অদ্ভুত গলায় বলিল, এখন তোমার পাখীতে যে রহস্য গোড়া বাঁধিতেছে সাবধান!—এবং তাহার জবানীর মধ্যেই টেবিলস্থ আলো কেমন করিয়া উঠিল।

মনিবপত্নী এই কথা শোনামাত্র চেয়ার ছাড়িয়া দণ্ডায়মানা, তাঁহার দেহ কোন প্রহেলিকা প্রভাবিত মৃদু টলিতেছিল, ফুলদানীর গোলাপগুলি, যেগুলি [illegible] অনেকদিনই ভাবানুষঙ্গর সূত্র, তাহাদেরকে তিনি তদীয় সুষমামণ্ডিত বাম হস্তে আঁকড়াইতে চাহিলেন এবং শুধুমাত্র বলিয়া উঠিলেন, শুনছ শুনছ শিগ্‌গীর!

ইহাতে তখনই পাশের কক্ষে একটি কাঁচের গেলাসের আঘাতের আওয়াজ হইল; পরক্ষণেই মনিব মহাশয় আসিলেন, আজ্ঞা করিলেন সুঘরাইকে, তুই যা। ইহা বলিয়া তদীয় সহধর্ম্মিণীকে ধরিতেই যিনি অচৈতন্য হইলেন, সাবধানে চেয়ারে তাঁহারে বসাইয়াই তিনি স্মেলিং সল্টের শিশিটি আয়না দেরাজ হইতে তুলিয়াছিলেন; এবং অতঃপর ও-ডি-কোলনের এটমাইজারটি লইয়া কহিলেন, না না উঠিও না, মাথায় কাপড় দিবার কোন দরকার নাই...আবার সযত্নে তাহাকে বসাইয়া দিয়াছিলেন; পর্দ্দায় ছায়া পড়িয়াছিল।

এবার এটমাইজারের শব্দ সহিত মাধব নাম উচ্চারণ করিতেছিলেন, কিছু বাদে মনিব মহাশয়ের ধীর আক্ষেপ শ্রুত হইল,...আমি ঐ ঘর হইতে সবই শুনিতেছিলাম, বুঝিয়া পাই না মধু ও রিলিকে এ খবর দিবার কি...অবশ্য সামান্য পাখীর পিছনে এ কথা থাকিবে তা তুমি বা কি করিয়া জানিবে....মাধব তারা ব্রহ্মময়ী!

তন্দ্রাচ্ছন্ন মনিবপত্নী কহিলেন—আমি ভেবেছিলুম ছোঁড়া জঙ্গলের গল্পই বলে থামবে'খন!—অতঃপর বলিয়াছিলেন, আ মোহিনী মায়া!

ক্রমে যে, পাখীর ব্যাপার সুঘরাইএর শুধুমাত্র অন্যমনা হওয়ার কারণ হইয়াছিল, সে এক কালো-র দিকে চাহিত, এক অচৈতন্যতার দিকে চাহিত; বৈদ্যনাথধামে আসিবার সুযোগে মন্দির দেখা ও বিবিধ অনুষ্ঠান প্রতি আগ্রহ ছাড়াও ইহা—এই মনোভার তাহাতে প্রচ্ছন্ন ছিল।

তাহা এই যে বহু পুরাতন সাধনলব্ধ আধ্যাত্মিকতাকে জড় তত্ত্বের উপর—যদিও যাহা এখনও বিস্ময়ের এবং আপাতত তাহা ভীতির—তাহার উপরই আরোপ করিতে পারিবে; যেমন শিল্প ধর্ম্ম সরলতা প্রকৃতিতে আরোপিত হয়।

ভক্তিপ্লুত ভগবদারাধনায়ে তীর্থযাত্রার মধ্যে অনতিদূরস্থ ঐ বৈরাগ্যজননী অমৃতবর্ষী শহরবিষয়ক যে ধারণা তাহাতে, সুঘরাইতে, উথলিত ছিল, উহাই অধুনা অসহ্য স্ফোটকে পরিণত হইল; এখন যে মনিবেরা নাই, আসমুদ্রহিমাচলখ্যাত মন্দিরের শীর্ষ দেখার মানসিকতা অবলম্বনহীন অব্যক্ত গোঙানি হইয়াছে; যে এবং সম্মুখের গোটা শহরই রিখিয়ার যে-সিজিনের বাড়ীর তুল্য ফাঁকা, যেখানে তাহার কণ্ঠস্বরের হরেক প্রতিধ্বনি হয়, এখানেও তেমনই হইতেও পারে।

অন্যদিকে মোহিলি ধাবনৌৎসুক্যে দড়বড়ি গরুগুলি ঘুরাইতেছিল এখন, তৎকালে সুঘরাই উহারে, মহাজন একরূপ, তাহার নাড়ী অন্বর্থ, নির্ঝঞ্ঝাট আশ্রয় যথা, আত্মিক পারিবারিক কেহ ঈদৃশী সমঝে আছে; অথচ যুগপৎ সে নিজে এমত কোন প্রদেশে, যেখানে মৃত্তিকার জঠর নাই, বুদ্বুদের অন্তঃস্থল দিয়া কোন অস্থান ভেদ করিতে অকেজো, সে বড়ই একা, ল্যাংট, তাহার ভয়ও তাহাকে ত্যাগ করিয়াছে।

এবং মনিব বলিতেছিলেন—আজব বুনো, জংলী!

মোহিলি যাইতেছে; সুতরাং উপায়রহিত সুঘরাই এই বিচ্ছেদকালীন মুহূর্ত্তে, চামার মোহিলির অবয়ব যেন খানিক রহস্য কুহক চরিত্র তীক্ষ্ণ গভীর দৃষ্টি-দ্বারা সাহস টানিয়া লইতে বদ্ধপরিকর হইল, কিন্তু হা হন্ত মোহিলির যাবতীয় গোপনতা যে ধর্ষিত হইয়াছিল। অথচ মোহিলিকে এখন কি খাসা দেখিতে, ভয় তাহাকে সুন্দর করিয়াছে—আর সে তাহা প্রত্যক্ষে অবাক!

মনিব মহাশয় কহিলেন—তীর্থে আসিয়াছি তাই কিছু বলিতে চাহি না, নিশ্চয়ই বৈদ্যনাথের ইহা অভিপ্রেত! ও আপন পত্নীকে বলিলেন, তখনই বলিয়াছিলাম সহিসের জ্বর ছাড়ুক তখন না হয় বৈদ্যনাথে আসিব।

ইদানীং সুঘরাই, কাষ্ঠচ্যুত কূর্ম্মবৎ অবস্থায়ে যে সে, ইহা অনুমান তাহার হয়; তবু সে ভাবে ইতঃমধ্যে অবশ্য, যে মোহিলি, আপনার চমকপ্রদ ভীতি যাহার কণামাত্র খোয়া যায়, তাহা লইয়া ক্রমাগত আপনার রহস্যের অভিমুখে সেই গানখানি গাহিতে থাকিয়া হাল্‌লা[illegible]র, মাঝে মধ্যে গরু জোড়া হাঁকানোর শব্দও হয়:

পিয়া যব যাওরে রিখিয়াকে হাটিয়া
কুছ কিন্‌ইহ নুন তামাকুল
কুছ কিন্‌ইহ ধন্‌ইয়া—বল্
হা পিয়া হা পিয়া হামরা খাতির মুখ মুছানির গামছা কিনি লিয়া
পিয়া পিয়া যব যাওবে...।

আঃ কি খাসা গীত, কাঁড়ার (মহিষের) গললগ্ন ঘন্টির ধ্বনি, এ-গে-ননুয়ারে ডাক, শেষরাতের মোরগের ভাঙা স্বর, ছায়ার পরিবর্ত্তন, শীতের কুয়ার জলের উষ্ণতা, সর্পের গতি সবই ঐ পদবন্ধের ভাবেতে আছে; এমনও কি ঐ গীত-জাত উদ্দীপনার মধ্যে—নোসটালজিতে; সান্ধ্যভ্রমণের চেঞ্জাররা, কমেডির ভুল উদ্ঘাটনে—জানার হেতুতে যাহারা নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে এবং যাহাদের কর্ত্তব্য আপনি স্থিরীকৃত, সুখে ভ্রমণ করে; স্থানীয় খুন খারাবী হওয়াতে তাহারা বীর।

ইহারাই, চেঞ্জার তাহারা, যাহারা আধো চন্দ্রালোকে নিঃসঙ্কোচে এক ইউক্যালিপটস গাছের নিম্নে সমবেত হইয়া দাঁড়াইয়া পাতার আওয়াজ শুনিয়াছে, সকলেই চুপ ছিল, একাগ্র থাকে; কেহ নিষ্ঠ হইতে কারণে চশমা মুছিয়াছিল; অল্পবয়সী ও শিশুতে চপলতা নাই; পাতার আওয়াজ হয়!—ধিক্ তাহাদেরকে যাহারা ইউক্যালিপটসের উপকারিতা বিনাইয়া থাকে! তাহারা অধর্ম্ম করে—এইরূপে চেঞ্জারদের অনেক সময় গিয়াছে।

একদা কেহ ঘড়ির রেডিয়ামের স্পষ্টতা লক্ষ্য করত কহিলেন,—কবি বলিয়াছিলেন, প্রকৃতিতে ফিরিয়া যাও। ইহা হাস্য উদ্রেক করে নাই কারণ ইহা ব্যক্ত করিতে কুহক স্বরভঙ্গ ঘটিয়াছিল—যাহা মিনতি ও কাতরতা মিশ্রিত, ইহাতে সকলেই বহু উর্দ্ধে ইউক্যালিপটসের হাল্কা পাতাগুলির দিকে—এইগুলি গাছটির স্বদেশ, ঐদিকে চাহিয়া অনুভব করিলেন যে তাঁহারা সকলেই ক্লান্ত; ইহা কলিকাতার ক্লান্তি; অথচ ইহা ঠিক যে তাঁহারা এখন বৈদিক আত্মসমালোচনার বাহিরে, অতএব এই তত্ত্ব নিশ্চয়ই বিচারিত হয় না, যে অনাসক্তের বীজ লইয়া তাহারা কেবল দৌড়াইয়াছে। (দৌড়াইয়াছে শব্দটি কত কত মাটির, অথচ এ ক্ষেত্রে? আঃ মানুষের নশ্বরতা!)

ইহারাই কি-সেই যাহারা শূন্য-কে ছিল বলিয়াছে!...

পুনরায় শ্রুত হইল প্রকৃতিতে ফিরিয়া যাও! ইহাতে, এই বাক্যগঠনে চোরা রাজসিকতা আছে, দর্প রহিয়াছে, যে প্রকৃতির বাড়ী যেন আদিবক্তার নখদর্পণে! এবং এখন তাহারাও ঐ সকলেরা, আত্মম্ভরিতায় পৌঁছাইয়াছে, তাহাদের প্রশ্বাসে পত্ররাজি শুষ্ক হয়।

তাহারা চরিত্রকে ছাড়াইতে পারে নাই, মানুষ কি আলেখ নেশা! ঐ গীতে এই সকল কিছু—যেই কেন উহা ঐ গীত হউক, যে চাঁদ অস্থির হইবেক; ঐ গীতের দিকেই সে বেচারী সুঘরাই আছে, তাহার পোষ মানা ভয় আছে, তাহার ঘর যে এবং, এখন এই ভাবনা প্রভাবিত হইয়া সে সুঘরাই অধিক হতাশায়ে সজল নেত্রে উত্তরের আকাশের ঠিক লইল, যে কেমনে সে যে বাড়ী ফিরিবে; এখানকার এই শহরের সমস্ত বস্তুই, ও যাহা যাহা কল্পনাসাপেক্ষ, শ্বাসরুদ্ধকারী বিরাট অহরহ, ভিখারী কুষ্ঠরোগীর ক্ষতে ক্ষিপ্ত কুকুরের মাড়ি দেখা যায়, প্রতি কিছুই করাল উত্তঙ্গ প্রাচীর; রিখিয়া চার ঘুমের পথ, হাটবারে ছাড়া চিঠি বিলি-না-হওয়ার দূরত্ব বর্ত্তাইয়াছে; সুঘরাই মাটির উপর চলিতে চাহিতেছিল, যে মাটিতে জেংগীল পাখী বসে, ডাকে; পায়ের তলায়ে সে চাহিয়াছিল মাটি, শহরে যাহা মাথার উপর; এ শহরে মাথা ঠুকিয়া কান্দিবার সুযোগ নাই; হাস্য অনুমোদিত অথচ।

হঠাৎ এই বৈলক্ষণ্যের সময়েতে তাহার কানে গেল, কোন শুদ্ধাচারী বলিতেছে, যত শালার ছোট জাতের মরণ, ছুঁইও না ছুঁইও না! তৎক্ষণাৎই সরিয়া দাঁড়াইবার মতন জন্মগত সৎ স্বাভাবিকতা তাহাতে কাজ করে নাই; যে যাহা, যদি সে বৃক্ষশীর্ষে থাকাকালীন অমন তাড়না শুনে, তবে ঝটিতিই সে মান্য করিতে উদ্যত হইতই; কিন্তু এখানে তাজ্জব এই, অচিরাৎ বেশ তিলেক পরেই, উক্ত তাড়না নিমিত্ত, দেখা গেল যে সে কান নাক মলিতেছে আর ছুটে। সে জানিতে চাহে না ঐ তাড়না কাহার উদ্দেশে, অবশেষে এবং যে সে বেসামাল, এবং সে পতিত। তদবস্থ সে পশ্চাতের পানে ত্রাসযুক্তলোচনে ও তৎক্ষণাৎ খুসীতে বারবারই নজর লইয়া থাকে।

আসলে, অপ্রাকৃতিক ভয় যে কি কারণে, খুসী যে কি জন্য, তদ্বিষয়ে ভ্রূ কুঞ্চন এমনও যে ঘটে নাই, যেহেতু অদ্ভুত ঘোরে, রন্ধ্রগত সে ছিল, তাই যে সে খালি প্রতি পদক্ষেপেই বলিতেছিল—শালো হারামজাদা চামার মোহিলি মানুষের জুতা হইতেও জাতিতে নীচু, তোমার জন্যই অদ্য আমার এই দুর্দ্দৈব! ক্রমে এইরূপে সে নিজেরেও হতভাগ্য নরকের কীট কহে, নিজেকে অভিসম্পাতে নিপীড়নে অবিরাম হেয় করিয়াছে। সে এইভাবে কোথাও দাঁড়াইতে চাহিতেছিল কেন না অনবরত সুঘরাই এর মনে হয় সে যেন বা মিলাইয়া যাইতেছে।

নিশ্চয়ই মোহিলির খবর বিভীষিকা হইয়া তাহারে আঁচড়াইতেছিল। যাহা যে শেষরাতে যখন বৃক্ষাদিও ঘুমায় তখন শিব নন্দীভৃঙ্গীসহ শিবগঙ্গায় স্নানে আসেন, যদিস্যাৎ কেহ তাহা দেখে সে কামারের চুল্লীর স্ফুলিঙ্গের মত নস্যাৎ হয়। ইহা মোহিলি দারুণ অঙ্গভঙ্গীকরত ব্যাখ্যা করে, ফলে সুঘরাই দেখে সমস্ত প্রকৃতি পর্য্যন্ত ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, শুধু সে জাগিয়া আছে।

উপস্থিত-মোহিলিসূত্রে তাহার সমক্ষে অনেক কিছু আভাসিত হইল, যাহা যথা—মোহিলি গাড়ীর মুখ ফিরাইতে তখন হন্তদন্ত, আর যে সুঘরাই দণ্ডায়মান মনিবের জুতা জোড়া বুকে ধারণ করিয়া আছে—কেন না দেবদর্শন যাত্রায়, তীর্থে, উহা নিষিদ্ধ—এখন অপ্রত্যাশিত রোমাঞ্চিত বিধায় অসাবধানে একটি জুতা মাটিতে, অবশ্য সে তখনই তাহা কুড়াইয়াছে, কিন্তু এই কর্ত্তব্যবোধের মধ্যেও সে বিচাল্যমান ঈষৎ হইয়াছে; যে মোহিলির প্রত্যাখ্যানের নির্দ্দিষ্ট মুহূর্ত্ত হইতে আপনারে মারাত্মক নিঃসঙ্গ বলি তাহার বোধ হয়; যদ্যপি সে হয় ডোম, তৎসত্বেও মোহিলি অনন্য থৈ আছিল।

এমত ঠিক যে সে নিঃসঙ্কোচে অনায়াসে মোহিলির হাত ধরিতে পারিত কোন কিছু ঔৎসুক্যে, কোন কৌতুকাবহতে, বিশেষত কিছুর নাম মাত্র আতঙ্কে, যাহা সে আর পারিবে না; সুঘরাই ইহা লইয়া পর্য্যালোচনা হয়ত নির্ঘাত করিয়া থাকে, যে এই শহরে কাহারই বা সে হাত ধরিবেক, মনিব মহাশয়ের শত আতঙ্কেও না, যদিও মনিব মহাশয় ও তদীয় পত্নী অপ্রার্থিত হৃদয়বান সমস্তরূপে, সর্ব্বদা যত্নও করেন, তাহারে গেঞ্জী কাপড় সবই দিয়াছেন, তাহার নিমিত্ত সুঁইওয়ালাদের নগদ চার আনা পয়সা পান খাইতে দিয়াছেন।

আশ্চর্য্য কতটুকু সময়ের মধ্যে যে সে নিখোঁজ হয়, এ কারণ যে সে জাতি ঘৃণ্য; যে অপিচ মনিব

মহাশয় তাহারে যারপরনাই আড়াল করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন, কিন্তু পাণ্ডা ঠাকুর মহাশয় জিজ্ঞাসিলেন—সে নেনুয়া কি জাত ছিকোরে তোরা।

ইত্যাকার সুমিষ্ট ভাষণ, অতীব শীল যাহা, তাহাতে সুঘরাই তুষ্ট; পাণ্ডাঠাকুর মহাশয়ের যথারীতি সম্বোধনে ইহা পরিষ্কার যে, তাহাকে বুনো, তাহাকে ডোম জাতীয় মনে হয় না, যেহেতু তাহার মাথায় অনেক তৈল, যে জন্মাবধি সে চিনি খায়, সে ডালিম কি জানে, বেশ সোহাগের চেহারা বটে তাহার।

তবে, এই ধরনের প্রথমকার আবেগ কাটিতেই সুঘরাই বানচাল, যেহেতু যে এবং বহুবারই সে অগ্নি পোহাইয়াছে, সুমহৎ শিখা তাই এখন তাহার সমক্ষে, তাই তদীয় স্বল্পায়তনের দেহ শতছিদ্র, স্বেদোদগমে গেঞ্জী পরিপ্লুত,—এই স্বীকারে সে বাধ্য—যে সে হয় ডোম এই অপরাধ স্বীকারেই; কিন্তু, সম্ভবত ঐ সঙ্গে যেমন ইহাও যে, যাহার জন্য সে বেচারী দায়িক না, এবং যে সে বা তাহারা ও মহুয়া গাছ একই; কিন্তু তদ্ব্যতিরেকেও, তথাপি উহার সুঠাম অনার্য মুখশ্রী আরক্তিম কষায়িত ইত্যাকার মনোভাব তাহার পক্ষে অবিশ্বাসের।

এমনও যে কোন এক সত্য—অসাধনেই তাহার মস্তকে ঘোর করে, যে নানারূপ অদ্ভুতদর্শন যন্ত্রের, টিনকাটা চ্যরনার, বিটার ইত্যাদির পাশেই অনেক নানান আকারের চমকপ্রদ লেবেল আঁটা টিন, কোনটিতে কোনটিতে মাছের ছবি, হৃষ্টপুষ্ট শাদা শুয়ারের, কোথাও গরুর! কতবার না এইসব টিন সে মহা উৎসাহে সাজাইয়াছে, মনিবপত্নীর আজ্ঞায় কাটিয়াছে।—এই ব্যাপারে এইজন্যই যে হয়ত বৈষম্য তাহাকে এতদূর ভয়ঙ্কর করে।

পাণ্ডাঠাকুর ব্রাহ্মণ স্বভাবসিদ্ধ অনুদ্বিগ্ন শান্ত, যেমত যে, আর্ত্ত সহিত আলাপনের স্বরক্রমে কহিলেন—তাহা হইল, তবে, কিন্তু।

ইহাতেই যে মনিব মহাশয় কিয়ৎ আশ্বস্থ থাকেন, কেন না দিবালোককে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতে তিনি চাহেন নাই; তিনি ধর্ম্মশীল, একদা আপন জায়ার প্রতি যিনি অযুত শ্রীসম্পন্না ভক্তিমতী অধুনা মালাজপকারিণী যিনি পূজারিণী, তৎপ্রতি অবলোকনিয়তে উত্তম শুভবুদ্ধিচালিত উত্তর দিলেন—হে ঠাকুর মহাশয়, মৎকৃত ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন, ইহা দোষ বটে, যে এই হতভাগ্যের ছায়া পর্য্যন্ত স্পর্শনে অশাস্ত্রীয়, যে উহার জল চলে না, তথাপি, যদিও ঈদৃশ জনের আমূল পরিচয় আপনাদের নখদর্পণে, আমি বলি, আমি গৌড়ীয়—সর্ব্বোৎকৃষ্ট শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, বাঙলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্ভ্রান্ত প্রাচীন বংশ আমাদের, সেবাব্রত থাকা সত্বে বহুজনকে অন্নদান করিয়া থাকি, (আমি প্রভূত বিত্তশালী ঠাকুরের কৃপায় হইয়াও) ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী জপ করি, মানুন, আমি ত বটেই, ও মদীয় ভার্য্যা ইনি উচ্চ অভিজাত বংশসম্ভূতা, ইনি সত্বগুণবিশিষ্টা বহু বহু জন্মের তপস্যা দেবারাধনাজনিত সুকৃতি নিবন্ধন ইহজন্মে মা জননীর রাঙাচরণ আশ্রয় লাভ করেন, ইনি মা জননীর শ্রীশ্রীমায়ের (শ্রীশ্রীসারদা দেবী) মন্ত্রশিষ্যা, ইনিও ঐ অধম দীনতম বেচারীকে অভাবনীয় স্নেহ করেন খুব স্বাভাবিকভাবেই; তাহা ছাড়া ভগবান রামকৃষ্ণ আমাদিগের সন্দেহ অজ্ঞানতা বিদূরিত করিয়াছেন যে, যথা—সদ্ব্রাহ্মণ, যার কোন কামনা নেই, সে হাড়ীর বাড়ীর সিধে নিতে পারে। আবার বলিয়াছেন যে, কৃষ্ণকিশোর অত বড় আচারী ব্রাহ্মণ কোন হীন জাতিকে তিনবার শিব শিব বলাইয়া হৃষ্টচিত্তে উহার হাতে জলপান করেন। তাই আমাদিগের সবই জল-চল, অবশ্য বিদেশ বলিয়া নহে, যাহা হউক সুঘরাই আমাদের সহিত চলুক, বালক কখনও শহরে আসে নাই, গাড়ীও নাই, শেষে কোথায় কি ঘটিবে, অনেক জন্মের পুণ্য অর্জ্জনে অদ্য সে এখানে দেবস্থানে, আর যে মদীয় পত্নীর কল্যাণে ধর্ম্ম ধারণা উহাতে আছে জানি, উহাকে এখন বিফলমনোরথ হইতে দিবেন না; ঠাকুর মহাশয় দেখুন দেখুন উহারে দেখিতে নবীন কদলী কাণ্ডের ন্যায়, তেমনই মনোলোভা তেমনই নিষ্পাপ, সে কাহাকেও তিলমাত্র স্পর্শ করিবে না, এখন আজ্ঞা করুন।

এবং যে তদ্বিধ প্রসঙ্গ পাণ্ডাঠাকুর মহাশয় শুনিতে তদীয় ললাটস্থ হোমজাত রম্য শৈবতিলক দেদীপ্যমান হইল, হর হর মহাদেব বলিয়া আদেশ দিলেন—ভগবান শঙ্কর গৌরবমণ্ডিত হউন, বাবা বৈদ্যনাথের নামে ইহা হউক, বেশ, বাবার দুয়ার অবধি যাইতে পারে! ইহাতে মনিব মহাশয় উৎফুল্ল হওয়ত বাবা বৈদ্যনাথের জয়ধ্বনি করিলেন।

এতাদৃশ অনুমোদনে এবং জয়ধ্বনিতে সুঘরাই, আহ্লাদে তাহার মনে পড়িল, যে সে পদ্ম দেখিয়াছে, অথচ বন্য, সে গাত্রের গেঞ্জী খুলিয়া তখনই পরিতে চাহিল, পঞ্চতীর্থবারিতে সে শুদ্ধ, তাহার তৈলসিক্ত

মস্তকে পূত নির্ম্মাল্য আছে; ক্রমে তাহারা সকলেই এক অভূতপূর্ব্ব মর্ম্মস্থলের নিকট, আর্ট যেখানে প্রকৃতিকে প্রভাবিত করিয়াছে। যে সে এখন প্রাকৃতজনের চরম মনীষাদায়িকা শিবমন্দিরের দুয়ার সমীপস্থ আছে, যে সে ঐ পুনর্জন্মক্ষয়কারী শিবপুরীর প্রাচীরে, এই প্রথম বিবেক তাহাতে, আর যে সে বিবেকনিয়ন্ত্রিত, অনেক অনেকবার মাথা ঠুকিতেছিল; নানা মানুষের শ্লোকরাজি নানান প্রার্থনা, যথা ভগবান ইহার সুমতি দাও, ভগবান শঙ্কর অন্তিমে তোমার দর্শন পাই, তোমার শরণার্থী হে বৈদ্যনাথ।

তদীয় কানে আসে অথচ সে অন্ধকার দিয়া ডাকিতে চাহিল এবং যখন আপনকার বক্ষঃদেশে এ মন্দির ছবি মুদ্রিত হউক এরূপ কামনায়ে যে সে আপন গেঞ্জী খুলিতে যাইবে, হরি হরি যে তৎক্ষণাৎই তাহার কাল হইল, দুর্ভাগ্য উপস্থিত!

ঐ সময়েতে, অশ্রুতপূর্ব্ব গোল ধিকিয়া দাবদাহ, ক্রমে, বিকট জিগীর গর্জ্জিল; যে সে, সুঘরাই, গেঞ্জী তুলিয়া অস্পন্দ, তাহার মনে উপজায় যে কাছেই নিশ্চয় কোথাও লক্কড় আক্রমণ করিয়াছে; নিমেষেই এহেন অপ্রশস্ত সঙ্কীর্ণ গলিতে এক দারুণ সঙ্কটজনক অবস্থা ঘটিয়া উঠিল, অগণন নিরীহ তসর গরদ মটকা কেটে রেশম পট্টবস্ত্রশোভিতা রমণীগণ চকিত হইলেন, বাঁশুলী নয়ন কালীঘাট হইল, ইঁহারা সকলে সঙ্ক্ষুব্ধ; নথ দুলিল, কর্ণভূষণ ব্যতিব্যস্ত, কঙ্কন বাজিল, গললগ্নীকৃতবাস শিথিলীকৃত, চোখে চোখে বিভ্রান্ত বিদ্যুৎ, পূজাউপচারসকল হস্তচ্যুৎ হওনে অধোদেশে মাটিতে, পাত্রভ্রষ্ট কর্পূর ভূমিতে জ্বলিতেছে, ধূপ যেখানে সেখানে, ফল গড়াইতেছে, দুগ্ধ পড়িয়াছে, ফুল ও মালা সমুদায় নয়ছয়, কচি বিল্বদল ছত্রাকার, কতক কুৎসিতদর্শন পা ঐ সকল সৌন্দর্য্য মর্দ্দন করিতে থাকিয়া আইসে; ইহারা হরিজন! ইহাদের প্রত্যক্ষে শুদ্ধাচারী পুরুষগণ যাঁহারা কেহ মহামহিম্নঃস্তব, অন্য কেহ নির্ব্বাণঘটক, কেহ কৌপীনপঞ্চক, কেহ শিবস্তোত্র আবৃত্তি রুদ্ধ করিয়াছেন, কেন না অহিতকারীরা ভীমনাদে চীৎকার পাড়িতে লাগিল।

সুঘরাই যেমত হতচেতন, সে বিস্ফারিত নয়নে হেরিল, কীদৃশী ভয়ঙ্কর মদমত্ততা! এক সঙ্গে এতেক নোংরা আকৃতি সুঘরাই কদাচ দেখে নাই, প্রতিজনের মুখমণ্ডল বিশেষত কণ্ঠলগ্না মাল্যে অধিক জঘন্যদর্শন হইয়াছে, ইহারা যাহারা শাস্তির ভয় পায় অথচ কভু জিহ্বা দংশন করে না, ইহারা তাহারা ভক্তি যাহাদের বক্ষ হইতে তের নদী পার; ইহাদের বেচারীদের পরনে ঠেঁটি, কণ্ঠে জবা কুসুমাদি মাল্য, ইহারা বহু যুগ অভুক্ত, ইহাদের কাহারও কাপড় নাই, উহাদিগের গাত্রগন্ধ উৎকট যেন মহুয়ার খৈল পোড়া গন্ধ, উহারা অস্নাত, উহারা যাহারা সন্ধ্যায় স্থির হয় না, তাহারা মন্দিরে প্রবেশ করিতে উদ্যত, বহু শতকের ভীতিতে এখন তাহারা বিষধরজ্ঞানরহিত।

ইহারা বেচারীরা স্বার্থোদ্ধত পন্থা চালিত ধর্ম্মার্থে শহীদ হইবেক, ইহারা সকলেই মদ্যপ এবং যে নানাবিধ নেশা বিজড়িত, এখন ইহাদের নেশা আড়ান কণ্ঠে ইহারা যাহাদের ছন্দানুবর্ত্তী সেই দুষ্টমতি নেতৃবর্গের নাম ঝটিকা দিতেছিল, যেমন যাহা কুৎসিত অশ্লীল পদ, নামগুলির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ যে কি তাহা পাণিনি জানেন! এই ধুরন্ধরেরা নেতৃবর্গ আদতে নীচযোনি ফিরিঙ্গীপ্রসাদ, ইংরাজ শালাদের দাস, এই সকলের নামে আকাশে বাতাসে তড়কা লাগিতেছিল ঐ বেচারীদের প্রমত্ত রোলে, ইহারা নিম্নজাতিরা ঐ ধূর্ত্তদের প্ররোচনায় ভয়াল, তথাপি সত্য বটে ইহাদের কাহারও কাহারও চোখে অশ্রুধারা ছিল।

যে এবং ক্রমেই ইহাদিগের অপ্রতিরোধ্য চাপে বিপ্রকর্ষণে সকল কিছুই বিধ্বস্ত এমত, সকাল কুজ্ঝটিকা হইল; বহু আর্ত্ত বহু বৃদ্ধ হা হা রব করিল, যে শিবের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ করিতে যে সুলক্ষণা উমারূপিণী ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা কন্যারে শঙ্খ মঙ্গলাচারে লাজবর্ষণে ঘন ঘন উলুধ্বনি ও গীত ও নৃত্যবাদ্য সহকারে আনয়ন করা হইতেছিল তাহাও রাবণিক পাশবিক কদর্য্যতায়ে লণ্ডভণ্ড, হায় অলৌকিক বিবাহ! হা লজ্জা! উহারা অলৌকিক কন্যার মস্তকোপরি কিংখাবের চন্দ্রাতপ অপহরণ করিল, আপনাদের মধ্যে কাড়াকাড়িতে যাহা শতচ্ছিন্ন হইল, কন্যা কিছুক্ষণ ন যযৌ ন তস্থৌ, ঝটিতি উন্মত্তের ন্যায় দ্রুত দৌড়াইয়া অর্গলবদ্ধ মন্দিরস্থ সদর দ্বারে আঘাত করেন।

যে সকল শিশুদেরকে ত্রিনয়নের চরণ বিধৌত বারি সিঞ্চনের বিধায়ে আনা হইতেছিল তাহাদের অবস্থা সঙ্গীন, কুক্কুর তারস্বরে ডাকিয়া উঠে, ইদানীং এক ভীমকর্ম্মা নৈরাজ্যের মথন হইল; যে, সব মহামূল্যবান মণিময় খচিত স্বর্ণভুজঙ্গ কোথাও বা স্বর্ণ রৌপ্য থালি পতিত, কখনও বা খোদাই করা

অত্যুৎকৃষ্ট মর্ম্মথালি চূর্ণীকৃত হইয়া রাস্তায়ে, বিভিন্ন দেশের স্মৃতি তুচ্ছ হইয়াছে; এবং হীরক সমন্বিত ও বিবিধ রত্ন মণ্ডিত ত্রিশূল, আরও যে অপরূপ-দর্শন নীলা পান্না অলঙ্কৃত বৃষ, এতদ্ব্যতীত যাহা যথা আশ্চর্য্য রাজসিক স্বর্ণসূত্রে গ্রথিত রুদ্রাক্ষ ও স্ফটিক জপমালা যে এবং সর্ব্বোপরি অলোকসামান্য মহাদ্যুতিময় চন্দ্রকলা যাহা মনন মাত্রই বহুপুণ্যে সর্ব্বগুণযুক্ত জাতি শ্রেষ্ঠ হিন্দু জন্ম সার্থক হয়—যে কোন-র নির্ব্বিকল্প সমাধি হইতে পারে, এখন যতেক সম্ভার অর্ঘ্য ভূলুণ্ঠিত।

এখন সেই সেই লোকেরা কেহ কেহ ক্রন্দিত কেহ সভয়ে অগ্রসর হয়, আর কেহ কেহ ঐ অমূল্য নিদর্শনগুলি আত্মসাৎকরণে কিল্‌কিলা রব করিল, এহেন বিবৃত্তপাকে অসংখ্য পায়ের ফাঁকে কশ্চিৎ কিম্ভূতদর্শন মুখোসধারীও লুণ্ঠনে ব্যগ্র, নেতৃবর্গের বিদেশী ঘড়ি শোভিত হাতও কর্ম্মতৎপর, আর যাহাদের বাহুতে সুঁইবিদ্ধ -ব্যথা তাহারা জিগীর আস্ফালন জেংগীল পাখীর ন্যায় আর্ত্তনাদ করে।

এখন ঐ তাণ্ডব সঙ্ঘটনে বেচারী সুঘরাই মহা বৈচিত্ত্যে, যে সে কোনদিকে যাইবেক ভাবনায়ে বিশৃঙ্খলতা; নির্ঘাত ইহা, ঐ দেবস্থানের পবিত্র সৌরভ ত্যাগ করি যাইতে সে অভিলাষী না, কিন্তু বেচারী মন্দভাগ্য। কাছের এই পৈশাচিকতায়ে সে অসুখী, সে বিভীষিত অথচ অবলীলাক্রমে সুঘরাই বুঝিল যে সে উহাদের একজন, সেও নিশ্চয়ই উহাদের একজন! অতএব আপনারে বাঁচাইতে সুঘরাই নিয়তই সরিতে পদক্ষেপ করে, অথচ তন্মুহূর্ত্তেই সে যেন ভূতগ্রস্ত উহাদের মতই জিগীরও দেয়, এই সে কিল্‌কিলা রব করিল, এই সে আর্ত্তনাদে বিকট; নিজেই নিজের বাদ সাধিল, ঘোষিতে চাহিল যে আমি উহাদের একজন। খানিক বাদে দেখা গেল ক্রমাগত পাণ্ডাঠাকুর মহাশয়রা নিজ নিজ ভৃত্যগণসহ দ্রুত পদসঞ্চালনে এখানেতে আইসেন; সম্প্রতি যমের অরুচি বৈপ্লবিক নেতৃবর্গরা পিট্টান দিল, কেন না অভিনব ধর্ম্মার্থীদের উপর বেধড়ক দুরমুশ আরম্ভ হইয়াছে।

যে অবশ্য সে এই বৈগুণ্য, ঐরূপে নিজেকে কবুল করার বৃত্তি, একদা যে কাটাইয়া উঠিয়াছে ইহা সম্যক তাহার উপলব্ধি তখনই হইল, যখন সে বেশ ব্যবধানে, এবার পলায়নের কথা; এবং অজস্র জটিল গলি সে ঘুরিয়াছে, এক একটিকে সে উপর্য্যুপরি বেড় দিয়া থাকে, এ কি বিড়ম্বন। তাহার স্বভাবগত সরলতায় সে পতঙ্গের প্রায়; এই সঙ্কীর্ণ পথে কেহ কোথাও নাই; শুধু দেওয়াল পরম্পরা। পূর্ব্বাহ্ণের হিরণ্যকশিপুর দুঃস্বপ্ন তাহার হাসি কান্না শোষণ যেমন করিয়াছে; কেবল দুর্জ্ঞেয় অশ্লীল ভীতি তাহাতে অথচ, উপস্থিত এই ধন্ধ হইতে নিষ্কৃতি লাভ মানসে সে ছুটিয়াছিল।

হঠাৎ এক সময় সাহসভরে সুউচ্চ বাড়ীগুলির শীর্ষে নেত্রপাত করিল, সে সূর্য্যালোক দেখিলেক, নিম্নে গলিময় যে ধূসর কুয়াশাচ্ছন্ন যেমন তাহারও প্রত্যক্ষ হইল, বুঝে ইহা পাণ্ডা পাড়াই; আর খানিক অতিক্রমে যে সে স্তব পাঠের আওয়াজ পাইল, ইহাতে এবং সে যেন বহু দূরের শাল গাছের পিছনে; যে সে পায়রার কলরব বুঝিল, যাহাতে যেন কাহারও নাম; যে সে সদ্যঃস্নাতা স্তোত্রে কোন বিস্ফুরিতাধারা রমণীকে কলস কাঁকে আসিতে দেখিল, যুগপৎ অন্তরে বিঘোষিত হইল, আঃ জল! জল! এই বশম্বদ আপনাকে চিনিল যে এবং তদীয় সটান-বুনটে-থাকা প্রত্যঙ্গসকল শ্লথ হয়; আর তাহাতে সুপ্রতিষ্ঠিত ইহা ধ্রুবই যে সে আর অধম নয়—যেহেতু সে বাঁচিয়াছে।

কিন্তু তত্রাচ সে অতিষ্ঠ এ কারণ যে, কুহকময় বাড়ীর ঘোর, গলির তির্য্যক গতি, হাই উঁচুতে গবাক্ষে লাখবন কাঞ্চন-জিনি যুবতীর আনন ক্বচিৎ দৃশ্যমান এবং বিশেষত পথিপার্শ্বের বীভৎস নর্দ্দমা ও পাইখানার নাড়ী-মোচড় গন্ধ—যেখানে ইতঃমধ্যেই তাহার বিগত সংজ্ঞা-বিঘাতক-অভিজ্ঞতা পচিয়া বিকট—ইহা সমুদয় মিশ্রিত হইয়া তাহার কায়িক অশান্তি ঘটায়; ও ইহাতে তাহার দৃষ্টি ঝাপ্‌সা, যদিও সে নবীভূত এক ঘটনা নিজেই, অধিকন্তু যে সে পথের ঠিকও পাইয়াছে যদিও। সহসা এক সময়ে যে সে আপনকার করতল নিরীক্ষণ করিল যাহা শূন্যই, যেমন কিছু ছিল, যেন কিছু খোয়া গিয়াছে এই বিবেচনায়, অনুভবে, পশ্চাতে অসহায়ভাবে তাকাইয়াছে; আর সে স্থানীয় ভৌতিক গন্ধকে অব্যাহতি লাভে মরিয়া যে কিন্তু সফলকাম নহে।

কোন রকমে সুঘরাই শিবগঙ্গার কাছে আসিল; প্রথমেই ইহা সহজ হয় যে সে এতাবৎ শ্বাস যাতনায় অত্রাহি ছিল, যে যেমন তাহার অন্তর বাহির কুশ্রী গন্ধের ঘর, তাহার সমগ্র দেহ সীসক পরিপূর্ণ; উপরন্তু সে হঠাৎ মৃগী রোগাক্রান্ত রাত্র, যাহা বিস্মৃত সম্প্রতি, ভেদ করত এখানে সে সহজ; সে পূতঃসলিল ঐ মহিমান্বিত জলাশয়ের পানে অনিমেষনয়নে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেক—আঃ কত কত পাহাড় পাহাড়

জল, আঃ কত কত আমি। যে এবং ইদানীন্তন 'আমি' শব্দকে সে ডরিল না যাহা চমৎকার অনুরণন তাই।

এখানে ওতঃপ্রোত হইল কোন একজন ব্যক্তি এই পবিত্র জলে, অধোভাগ নিমজ্জিত যাহার, কৃতাঞ্জলিপুটে উর্দ্ধলোকের দিকে নিষ্পলকদৃষ্টিতে ছিল, ইহা স্পষ্টই সে উদকক্রিয়ায় ব্যাপৃতা ঘাটেতে যাহার স্বজনরা, প্রায়ই স্ত্রীলোক শোকসঙ্গীত গাহে।

এই ব্যাপারের নিকটে একজন সন্ন্যাসী সশিষ্য অবগাহন করিতে নামিয়াই ঐ অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষে এবম্প্রকার উদ্বেলিত যে হা রাম হা রাম নিনাদে অর্দ্ধবাহ্যদশা প্রাপ্ত হইলেন, শিষ্যরা তাঁহাকে ধারণ করিয়াছে, এই সন্ন্যাসী তদ্ভাবাপন্ন আবৃত্তি করিতে থাকিলেন, হা রাম!...

বিশেষতঃ চতুর্দ্দিকেই বিকশিত কানন, তাহাতে মন্দাকিনী মনোহারিণী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। সীতা সমভিব্যহারী পরম যশঃশালী রাজকুমারগণ সকলেই অতি কষ্টে তথায় গমন করিলেন অনন্তর তাঁহারা কর্দ্দমশূন্য সুপ্রশস্ত ঘট্টে অবতরণ করিয়া 'এতদভবতু' বলিয়া পিতৃদেবের উদ্দেশে জলদানে প্রবৃত্ত হইলেন, রাম তৎকালে জলপূরিত অঞ্জলি গ্রহণ পূর্ব্বক, দক্ষিণাভিমুখে দণ্ডায়মান হইয়া রোদন করিতে করিতে কহিলেন—হে রাজশার্দ্দুল পিতা! আপনি পিতৃলোকে গমন করিয়াছেন; অতএব এক্ষণে আপনার উদ্দেশে মদ্দত্ত সুনির্ম্মল জল অক্ষয় হইয়া পিতৃলোকে উপস্থিত হউক!...

এখনই শিষ্যরা 'ওঁ রাম' ধ্বনি দিল।

অবশ্যই ইহারা রামায়েৎ। সুঘরাই এই রামকথার অনেকখানি ভাষাগত বাধা সত্ত্বেও অনুধাবন করে; সে এহেন প্রহেলিকার সূক্ষ্মতায় এতই বিক্ষিপ্ত যে ঊর্দ্ধে দেখিতে উহার ভরসা নাই, সামনের জলরাশি আর সে নহে; অদ্ভুত শেষ রাত্রি ঘনাইয়াছে, আবার ভয় উপজিল, সে অথবা বাষ্প হইয়া যাইতেছিল।

সে ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া এই বাগে আসিল, যেখান হইতে এখন পুনর্ব্বার অতিক্রান্ত মহল্লা নজরেই তদীয় মন পাংশু হয়; যে মন্দির আগত অনৈসর্গিক সুবাস তাহারে, অভ্রান্ত যে রমণীয় ভাবপ্রসারতা দিয়াছে, যে গভীর কুয়া হইতে উত্তোলিত জলে-রৌদ্র-দেবতার-অবাক তাহাতে আছে, তৎপ্রভাবে, এখানকার আলো সে অনুভব করিয়াছিল আর যে সে অশ্বত্থের বীজের তুল্য অসংখ্য হাটবার পার হইয়া কোথাও উদ্গত হইয়াছে।

যদ্যপি যে তদীয় শ্রদ্ধাস্পদ মাননীয় মনিবরা যেখানেই মন্দিরেই অপিচ গলির জটের মধ্যে, প্রবেশ করিতে জী চাহে নাই, তবু মনে হয় তাহার ইতস্তত হাল্লাঝুরির কালীবাড়ীর গেটে যেন সে আছে, সেখান হইতে সোজা এই শিবমন্দিরের এক চোরা পথ আছে, ইহাতে তাহার আশ্চর্য্য কম্পন দেখা দিল যে তাহার মধ্যে মনিবদের কম্পনও সঞ্চারিত, বুঝিল যাঁহারা একদা হাল্লাঝুরির কালী মন্দিরের গেটে থমকাইয়াছিলেন, কেন না বাগানের অপ্রশস্ত তিনটি পথের মুখে ফলকে লেখা ইড়া, পিঙ্গলা সুষুম্না এবং অবশেষে শ্রীশ্রীতারা ব্রহ্মময়ী বিগ্রহ—তদ্দৃষ্টে যদিও তখন ভোরবেলা তবু দম্পতিদ্বয় মর্ম্মরিত—অবশ্য সুঘরাইএর আন্দাজ তাঁহারা একে অন্যের হস্ত ধারণ করেন।

উপস্থিত গলি সকল তাহারে অসম্ভব বিশুষ্ক করে, যে তাহাতে ঈদৃশ উদ্বেগ যে ঐখানকার অশরীরী হিমবাহ গন্ধতে নিঃশব্দে ঘটির মত ডুবাইতে পারে; অথচ না-যাইতে-পারার ক্ষোভে সে অধৈর্য্য; এবং সে ক্রন্দন নিমিত্ত স্বরবিকারের আয়াস পাইল—অবশ্য ধর্ম্মত ইহার কারণ এই হয় যে তাহাকে যাইতেই হইবে, এখনও সে পদচালনারহিত তবুও, এখানকার জনসঙ্ঘের ব্যস্ততার কেন্দ্রে সরল নিঃশ্বাস লওয়ার অস্বাচ্ছন্দ্য নাই যাহা তাহার ভাল লাগে, মানে পরোক্ষে মন্দিরের নিকটের হট্টকারিতা, যাহা স্মরণে আপাতত নাই, অথচ তাহাতে ক্রিয়াশীল অজ্ঞাতেই।

তৎসত্ত্বেও কোনরকমে সুঘরাই খানিক পথ অগ্রসর হইতেই কেমন এক উদ্দীপন তাহার অন্তরে পুনরায় সংগঠিত হইল; সে যেমন কোন শোভাযাত্রা দেখনের নিবন্ধন প্রমত্ত, নিম-হরিৎ ধান্যমঞ্জরী থরথরিত রতনচূড় শোভিত হস্তে নববধূ যেন স্মিত হাস্যে আসে; জনতা উথলিত-হর্ষোৎফুল্ল আঃ মিথুন আঃ মহেশ্বরী আঃ গিরিনন্দিনী! ত্বমেব সা ত্বং সাবিত্রী ত্বং দেবী জননী পরা, বচনে বিস্ফুরিত, কেহ বলিল, রে চক্ষু ইহার পর তোর জ্যোতিঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হউক। এখন সুঘরাই ধাইয়াছে ঐ কাঁঠাল পত্রে তেল ও মেটে সিন্দূর অভিজ্ঞার লোভে; একদাও ভাবে নাই সেই গলির গন্ধের বিষয়ে; যেন শোভাযাত্রা এখনও, এই সংস্কার হয়, যে আছে, সে আবার দেখিতে পাইবে আর সে নির্ভীক চলিতেছে।

অচিরাৎ পাণ্ডাঠাকুর মহাশয়ের সহিত ভাগ্যশ সাক্ষাৎকার ঘটিল, যে এবং তিনি স্নেহপ্রযুক্ত কণ্ঠে

আজ্ঞা করিলেন, দৌড়াও দৌড়াও তোমার বাবু ও মাতাঠাকরুন তোমার সন্ধানে গিয়াছেন, কেন তুমি ভয়ে স্থান ত্যাগ করিলে, শিব থাকিতে ভয়, নির্ব্বোধ বড় তুমি হে ছিঃ ছিঃ।

তদনুবর্ত্তী সুঘরাই অসহ্য উৎকণ্ঠায় দৌড়াইল, যেন তাহার স্বকৃত জিগীর তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছে। নিরন্তর বিশ্রী গন্ধে সে ক্রমান্বয় কালো। সে, সুঘরাই গলিভেদে যেক্ষণে খোলামেলায় তখনই তাহার মানসিক যন্ত্রণা সমুদ্ভূত হয়; কোন দিকে সে যে চাহিবে তাহার তাহাতে মতি ছিল না। মঙ্গল বাদ্যকারী ঢাকীদের নৃত্য, বিভিন্ন দেশীয় তীর্থযাত্রী প্রবাহ, যে পাছে-হারাইয়া যায় তাই একের সহিত অন্যের রমণীগণের আঁচল বাঁধা, এ সকলি তাহার চোখে; একদা সে অত্যন্ত অসহায় বোধে নিষ্পেষিত, দেখিল সামনের শিবগঙ্গার জলের কোন কিনারা নাই, শুধু জল আর জল, সূর্য্যকে ইস্তক খাইয়া সারিয়াছে!

তাই তৎকালেই বেচারী অসাধনেই কান্দিয়া উঠে; তীর্থযাত্রীরা তাহার পানে এলেবেলে দৃষ্টিপাতে শিব জয়ধ্বনি করত জলদে পা ফেলিয়াছে, সুঘরাই কর্ত্তব্য নির্ণয়ে অপারগ, সে মনিবদের কোথায় খুঁজিবে, অনেক বাঙালী তীর্থকামী বা পথচারীকে সে এহেন ঘোরে, উদ্ব্যস্ত করিল; ক্রমে তাহার অত্যুগ্র দশা যাতনা, যাতনা প্রস্তর হইল; এ সময়ে ইতিমধ্যে পাঁচটি জন্তু যেন তাহার গাত্র হইতে উদ্ভূত হইয়া দিকে দিকে দৌড়াইল; এখন সাইকেলের ঘণ্টি শুনিতে থাকিয়া যে সে ঘুমাইতে এলাইয়াছে; বুঝে যে তাঁহাদের তন্নতন্ন সন্ধানের ফলে নিজেই অবশেষে সে হারাইয়াছে; ক্রমাগতই সে হারাইয়া যাইতেছে।

তৎপ্রযুক্ত তাহার নিকট ঝটিতিই চমকেই সমস্ত কিছুই যেন ভিন্‌জাতীয় আলুনি, যে এই বিষমত্বে একবার, এবং সে সুমহান ত্রিকূটপর্ব্বত দেখিলেক, ডিগ্‌রিয়ার দিকে তাকাইল; এখন উভয়ের বর্ণান্তর পরিলক্ষিত হইয়াছে, সে প্রত্যক্ষও করিল: চেঞ্জাররা সার বাঁধিয়া ডিগ্‌রিয়া-র মুখোমুখি দাঁড়াইয়া প্রশস্তি জানাইল, কহিল, গ্র্যাণ্ড! কি সুন্দর! এই ঘোষণার নিমিত্ত কত অন্ধকার তাহারা পরিত্যাগ করিয়াছে—এমনও যে অতীতকে নবকলেবর দিয়াছে—নিশ্চয়ই এতাবৎ কলিকাতার ঘিঞ্জি হইতে ছাড়া পাইয়াছে, তাহারা আপন কূটস্থ প্রতিবিম্ব দেখিল।

তাহাদের—এই উক্তিকে এই পদবন্ধ যেন হারমোনাইজ করে—যে অলিগলিতে বড়রাস্তায় আমরা প্রেমকে অস্বীকার করিয়াছি! পর্ব্বত দুইটিই যেন সম্পূর্ণ অচেনা, এবং সে ভ্রূযুগ কুঞ্চিত করিল, বুক তাহার মোচড়ায়—হায় মোহিলির গ্লানিতেই ইহা ঘটিয়াছে—হায় অধম মোহিলিই ঐ বেচারীদের ঐ পাহাড় দুইটির সর্ব্বনাশ সংসাধন করিয়াছে।

যে উপলক্ষে ঐ পাহাড় দুটির বিদ্যমানতা সেই এস্ত্রটিই মূর্খ স্বার্থান্ধ চামার পুত্রদ্বারা ধূলিসাৎ হইয়াছে, হা দুঃখ! চরাচর তিমিরাচ্ছন্ন যেন এখন গোশাবক ও গাভী সকলের কোন দিক নাই, চারণ ভুমি হইতে কেমনে ফিরিবে, কোন এক গাভীর ললাটে সিন্দূর তিলকও দেখা যায় না, খুরখাত অদৃশ্য, দিক তিমিরাচ্ছন্ন। সুঘরাইএর অন্তরে উপস্থিত এই ছবি প্রতিভাসিত। এখনও ঐ প্রাকৃতিক শোভাদ্বয় নিছক অপরিজ্ঞাত, তথাপি সে উহাদের স্মরণ মননে আছিল যেন যে নিজেরে হারাইয়া না ফেলে।

ইহা খুবই সাধারণ এবং নির্ঘাত যে তদীয় মনিব মহাশয় তাহারে খুঁজিতে, তিনি তাহারই আশপাশ দিয়া কতবারই না চলিয়া গিয়াছেন; ইহা সে ভাবিল যে স্নেহ-প্রাণা পরম পূজনীয়া মনিবপত্নী ঠাকরুন সাংঘাতিক উতলা, অধীর, বিবর্ণ; পতিরে অনুনয় করত কৃতাঞ্জলি হইয়া নিবেদিলেন,—বাবা বিশ্বনাথ, এ কি অঘটন! কি জ্বালা, কি পোড়ার, এমনতারা হবে জানলে ছোঁড়াকে...ওরে পুব্ব জম্মে কি হেন পাপ করেছিলিস্ যে নিঘিন্নে জাতের পেটে এলি, ওরে অন্য হ'তে পাল্‌লিনি, মাহাতো কিম্বা কাহার কত শত জাত ত ছিল; হায়রে কোথা রাম রাজা হবে, না, হায়রে! ছোঁড়া এখনও হয়ত উপসী, দাঁতে কিছুটি কাটেনি গা, চন্নামেত্তর খাবে, বাবার পেসাদ পাবে ব'লে, আমারই মরণ দশা, তোমার কথা তখন হেলা না হলে করি, গোখুরি হয়েছে, এমন জানলে। আমার মাথা খাও, পায় পড়ি, জানি একে ছোঁড়া মূর্ত্তিমান পাপ, তলাস করিতে তোমারও ভোগান্তির সীমা নেই, তবু দেখ, ইদিকে বেলা যায়।

তদ্বিধ খেদোক্তি মিনতি সুঘরাই সুস্পষ্ট অভিধানে শুনিতে যেমন পাইল। আর যে সেবকবৎসল মনিব মহাশয় সর্ব্বক্লেশনাশিনী উদ্বিগ্ন পত্নীর ঈদৃশ উৎকণ্ঠা সমঝে ও রমণীর হিসটেরিয়া রোগনিমিত্তও বটে এখন দ্বিরুক্তি করেন না! অথচ স্বভাবতঃ তদীয় সত্তা আর একে পরিণত, সমস্ত অস্তিত্ব এখন আর্কিটেকটনিক ব্যঞ্জনা যাহা মন্দিরের ফুলচন্দন কর্পূরগন্ধ গম্ভীর অন্ধকার মিশ্রিত এবং কণ্ঠ এখন

কাব্যবীজে স্ফীত হইয়াছিল এবং এহেন অবস্থা লইয়া নীচজন্মাকে তথা সেই পাপের পুনরপি অনুসন্ধান শুরু হইল।

সুঘারইএর মানসে সেই ঘোর শ্যাম গোচারণভূমি থাকে, এখন সেই ত্রস্ত গাভী একভাবে হম্বারবে আকাশকে অভয় দিতে আছে, যে তাহারা বিভ্রান্ত উত্তেজনায় পরমাদে একে অন্যরে সংঘর্ষে. বেচারীদের গললগ্ন ঘণ্টি ক্ষিপ্তক্রমে বাজিতে অনবরত থাকিয়া উত্তপ্ত; ধ্বনিভেদ তাই, বহুদূর স্থিত সাঁওতাল পল্লীতেও শ্রুত, এরূপ অবাক ধ্বনিব্যঞ্জনায় উত্তেজিত হইয়া সাঁওতালরা মাদল বাজাইতেছে,—হায় বেচারীদের গরু নাই! দাবদাহর সঙ্কেতেই খবরেই একে অন্যের হাত ধরে! ইদানীং অথৈ রিখিয়ার পথে পথে নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার, চৌকিদার পথ লাঠি ঠুকিয়া হাতড়ার অন্ধ যেমন বা।

নিশ্চয়ই মনিব মহাশয় ঐ ছ্যাকড়া গাড়ীর সামনে যাইলেন, সেইটি স্থিতবান আছে, সেইটি কৌতূহলোদ্দীপক, যাহার আশেপাশে সার্কাসের খেলার তাকলাগান ছবি প্রলম্বিত, যে গাড়ীর ভিতর হইতে হ্যাণ্ডবিল বিলি হইতেছে, যাহার ছাদে কেট্‌লড্রাম, ক্লেরিওনেট, করনিট বাজিতেছে; গাড়ী মধ্যে দেখা যায়, তিনি যিনি বাঘের খেলা দেখান, যাঁহার বুকে বাঘ-নখ আঁটা রূপার ঘড়ির চেইন, ইঁহার মরদ গোঁফে দারুণ কেয়ারি; উনি ঘুমন্ত; মনিব মহাশয় উঁহার পানে চাহিলেন।

বাদ্য ঢক্কানিনাদ তীর্থযাত্রীরা মুহুর্মুহু জয় শম্ভু যোগেশ্বর, এইরূপ আপন ইষ্টর নাম তুলিতেছে. ইতিমধ্যে দ্বাদশ লিঙ্গের নাম গমক দিয়া উঠে, তন্মধ্যেও আপন অহঙ্কার ফেলিয়া তিনি, বাঘের খেলোয়াড়, ঘুমে কাদা; অথচ বক্ষের মৃত খবরে—কি জানি বাঘ-নখ বা কি, কি জানি ঘড়িই বা কি—অদ্ভুত কামুক ভুজবন্ধাই; নিশ্চয়ই সুঘরাই অনেক বালকের তর্জ্জনী নির্দ্দেশ নিয়ন্ত্রিত ইঁহারে অবলোকন করিতেছিল, অবশ্য সে চোখের জল মুছে নাই, সত্যই ইনি ভীতিপ্রদ ইনি আনন্দও!

ইত্যাকার পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক মনিব মহাশয় হ্যাণ্ডবিল বিলিকারী, যিনি তারের খেলা দেখান—তাঁহারে সম্ভ্রান্তস্বরে জিজ্ঞাসিলেন, মহাশয়, আপনি সুবিখ্যাত ব্যক্তি, আপনার মধ্যে সরল রেখার বৈচিত্র্য, বহু বালকের হাতে আপনি হ্যাণ্ডবিল দিতেছিলেন, যে বালক আপনাদের কসরতের ছবি দেখিয়া থমকাইয়াছিল, পরক্ষণেই বড় পশ্চাতে চাহে আবার বাঘেরা খেলোয়াড়কে দেখে, রোমাঞ্চিত হওয়ত শিহরায় যে যেন এখনই খেলোয়াড় জাগিয়া হালুম করিয়া উঠিতে পারে, হঠাৎ সে স্থান ত্যাগ করিল, আপনার আহ্বান সত্ত্বেও সে কাছে আসে নাই।

অবশ্য পুনরায় ফিরিয়া আইসে, যখন কোচম্যানের পার্শ্বে বসিয়া ক্লাউন নানান রঙ্গতামাসা দেখায়. বাহবা রুমালের খরগোস ও বাখানি ইন্দুর লইয়া খেলা এখানকার দুএকটি সবস্ত্র বালক, সুঘরাই না, ও কতিপয় পথচারী বুঝিত না; অবশ্য ক্লাউন যখন কপট শ্লেষ্মা ঝাড়িয়া এই অল্পবয়সী ভিড়ে নিক্ষেপ করে, যখন কপট তাড়নায় পাদানিতে পা দ্বারা আঘাতিয়াছে, চাবুক আস্ফালনে মজা করিয়া থাকে, সর্ব্বোপরি কপট মূত্রত্যাগজনিত অঙ্গভঙ্গীতে ও তৎশব্দের অনুকরণ, যখন অন্যান্য বালকরা হাসে, যখন পালায়, সেই বালক সরিয়াছে পালাইয়াছে কিন্তু হাসে নাই।

যে এবং চিত্রিত কসরৎ সকল দূর হইতেই, ক্ষণেক আপন অঙ্গুলি যেন ঐগুলির উপর, সে বুলাইয়া বুঝিয়া লইতে চাহিয়াছে—সে চাতুর্য্য চাহিয়াছে, বিচক্ষণতা চাহিয়াছে; কিন্তু কসরৎ বুঝিতে তদীয় গেঞ্জী আঁট বোধ হয়; ও যে, হঠাৎ বাঘেরা খেলোয়াড়কে অদ্ভুত বুনো আলস্য ত্যাগ করিতে প্রত্যক্ষে যাহার গাত্রে পুলকমিশ্র তরাসে সিঞ্চিড়া উদ্গম হইল, তখনই সে যেন ধর্ম্মভীরু, একারণ যে তাহার মনে দংশিল যে আমি ডোমপুত্র সুঘরাই আমি ত ইহাকে, ইহা সব—সার্কাসের লোকদের খুঁজিতেছি না, আমি যে মনিব মহাশয়দের...এবং তাহাকে কি আপনি যেহেতু সে আপনার হস্তচ্যুত দেশলাই তুলিয়া দেয়, আপনি এখন...।

সুঘরাইএর দেহ হইতে যাহারা যে জন্তুরা একযোগে বাহির হইয়া নিমেষেই অদৃশ্য হয়, ইদানীং সেই পাঁচটিকে দেখিল, সে সাক্ষাৎ চিনিল; ইহাদের জিহ্বা লোল, ইহারা হাঁফায়, বেচারী কুক্কুরগুলি; যখন তাহার গাত্র হইতে সবে মাত্র জাত তখন মনোহর শ্বেতকায়া ছিল, এখন অত্যধিক হয়রানিতে উপস্থিত যারপরনাই মলিন ধূসর; ইহারা কুণ্ঠায় জড়সড়, তাহারই দূরে দূরে অবনত মস্তকে ঘুরে, ইতিমধ্যে অসহায়ভাবে তাকায় এবং কোন কৈফিয়তে ল্যাজ তাহাদের আন্দোলিত ছিল; সুঘরাই উহাদের প্রতি খিন্ন অলস চোখে তাকাইল; সে নিজে আজ্ঞাবাহক, অথচ আশ্চর্য্য এই ক্ষেত্রে তাহার চাহনি মাত্রই—

তখনই, উহারা কুকুর সকল উহারা মাটি আঘ্রাণ করত ছুটিল. ধূলা উড়িতেছে। এখন আবার পূর্ব্বকথিত অন্ধকার; তীর্থযাত্রিদের ম্রিয়মাণ শ্রান্তস্বর শোনা গেল—তাহাদের টুকরো কথা আসিল—ভবভীতি, পাপ, কর্ম্মক্ষয় হইতেছে! এখনও পূর্ব্বকথিত অন্ধকার, দিকসকল অন্তঃসত্ত্বা বিড়ালের ন্যায় মন্থর।

মনিব মহাশয়ের চিত্তে প্রসন্নতা নাই, বহুকালের পুঞ্জিত শুদ্ধতা বিশেষত শিব অর্চ্চনার সুকৃতি লইয়া এক জংলীকে খুঁজিতে ক্যাহিল। অনন্তর তিনি কয়েকজন মিস্ত্রীর সকাশে যাইলেন। ইহারা রাস্তার ধারেই এক মোটর গাড়ী সারাইতে ছিল, যে এবং ক্ষণে ক্ষণে তাহারা সারান ব্যাপার লইয়া যুক্তিতর্ক করে, যাহা অনর্গল ইতর মুখ খারাপ মিশ্রিত; সুতরাং কিছু তীর্থযাত্রী তাহাদের কাছের একটি গাছ তলায় বসিতে যাইতে থামিয়া বেশ দূরে চলিয়া গেল। মিস্ত্রীগণ কুলি কামারীরা যে নিদারুণ খলমতি ছোটলোক প্রকৃতির স্বভাবতই ইহা তিনি জ্ঞাত। ইহাও সম্যক বিদিত যে, ইহারা মর্য্যাদার কিছু বা কোন কাহাকেও, দেখিলে চোয়াল ঘর্ষণ করে, তাই তিনি ইতিমধ্যে একবার দ্বিধায় পড়িলেন, এ কারণ যে উহারা এক তীর্থ আগতদের মধ্যে কশ্চিৎ উড়িষ্যাবাসী প্রিয়দর্শনা ডাগর যুবতী রমণীকে লক্ষ্য কেমন যেন করিতেছিল—এই সূত্রে, বিদ্যুতে, হিজড়ারা আভাসিত হয়, এখন পুনর্ব্বার হাতুড়ি ও অন্যবিধ শব্দ হইল।

মনিব মহাশয় প্রস্তুত, বিনীত, ইহা নিবেদিলেন,—ভায়া, এক দেশওয়ালী ছেলে, তাহার চোখে জল ছিল, অবশ্য আদতে সে অনুমান করে যে আমরা হয়ত গাড়ীভাড়া উদ্দেশ্যে তোমাদের কাছে আসিতেও পারি খোঁজ খবর করিবারে, তাই, এখানে আইসে; এঞ্জিনের কিয়দংশ নিরীক্ষণে মহাভয়ে সে বিচলিত, তত্রাচ উহার এঞ্জিনের কটু চেহারা তাহারে যথাক্রমে আকর্ষণও করে, ও যে তোমাদের কর্ম্মকুশলতায় সে বিস্ময়াবিষ্ট, ও তদীয় জিহ্বা অনেক কিছু প্রশ্ন জন্য সরস হইতে আছিল বটে, যে বিরাট টায়ার উত্তোলনে সাহায্য করিতে চাহে এবং যাহারে তোমরা অশ্লীল বচনে খেদাইলে—ঠিক যখনই সে কলকব্জার বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্মতায় বিমোহিত, যখন উহা তাহার চমৎকার স্মৃতি হইতেছিল! এখন বলিতে পার সে কোথায় গেল।

এবং যে স্থলে অনেক মনোহারী পসরা-মেলার দোকান; সুঘরাই একদা চামেলীর মাতোয়ারা সৌরভে সচকিত, যে সে তির্য্যক নয়নে রকমওয়ারি শিশি সকল নজর করিল, ঐগুলি চাকচিক্য সমন্বিত, এতেক মধুর মনোজ্ঞ গড়নের যে যেন উহারা হেঁয়ালী গীত জানে! এহেন আতরের দোকান সাক্ষাতে সুঘরাই যেন রিখিয়াতেই, কোন ক্ষোভ নাই। অতএব মনিব মহাশয় বিচার করিলেন এমন যে. এখানে কিছু সময় হয়ত বা অতিবাহিত সুঘরাই দ্বারা হইয়াছে।

যে সে কতবারই না, মদীয় পত্নীর উৎকৃষ্ট আবলুস কাঠ নির্ম্মিত আয়না দেরাজের উপরে, জেডের সুলক্ষণা অতুলনীয় রূপের এক চৈনিক দেবীমূর্ত্তি ও ইহারই আশেপাশে, মাইরি কি অভিরাম বোগদাদের গোলাপ পাশ, ব্যহেমীয় শিশি বাহার ও ইদানীংকার ফরাসী এসেন্সের আধার, একই কেয়ারিতে—আনারকলি-বাগিচা ছাঁদে সাজান, সুঘরাই যাহা দেখিতে মোহাচ্ছন্ন আজ্ঞাবহ দাস হইলেও সাড়হীন; যদিও হায় সে পদ্ম পাতায় খায়, সে প্রায়-জংলী, তারাময়ী অন্ধকার এখনও তাহার নিকট সুন্দর হয় নাই, পরীর গল্প সে শুনে নাই! শুধু স্মরিয়াছে ঐখানে সৌখীনতার মধ্যে কোথাও যেন ভোর হয়, আবার পাখীরা ফিরিয়া আইসে দারুণ পড়িমরি দৌড়ান যায়—তখনও সে লুপ্ত হইয়া যায় না!

তৎপ্রবর্ত্তিত, রাস্তার উপর এই বেলোয়ারী সম্ভারে গতিরহিত সুঘরাই সুনিশ্চিত হাতের কব্জিদ্বারা বিগলিত অশ্রুধারা মুছিয়াছে এখানে, জয় শিব শম্ভু ধ্বনি কানে আসে না। এখন এতদ্ভাবাপন্ন তিনি মনিব মহাশয় চুনটকৃত দোপাল্লী টুপী-পরা বিলাসী আতরওয়ালাকে প্রশ্ন করিতে যাইয়া অচিরাৎ মহা দ্বিধায়, কিসের তত্ত্ব করিবেন তাহা জ্ঞাত নহেন মুখ্যত; যেন তিনি আতরের খবর লইতে আসিয়াছেন, কেয়া গুলাব শামামা এবম্বিধ নাম তাহার স্মরণে আছে এবং যেমন ইহাদের মধ্যে একটি নাই তথা খোয়া গিয়াছে; এখন তাহা সত্যই আতর না অন্য; না, অন্য কিছু নয় তাহা আতরই, তাহাই সুঘরাই অর্থাৎ।

অনেক শিশি দেখিতে তাঁহার স্থিরতা আসিল, কহিলেন,—যে বালক রক্তিম নয়নে মহাশয়ের পসরা বিদগ্ধভাবে পর্য্যবেক্ষণ করে, ফলে তাহার এই অপ্রত্যাশিত ভৌতিক সংগ্রাম হইতে নর্দ্দমা হইতে খানিক অব্যাহতি লাভ হইয়াছে ক্রমে বমি উদ্রেককারী গন্ধ তাহা হইতে সরিয়াছে যে এবং, সে যে অকথিত সান্ত্বনা পায়, যে, সে হারাইয়া যাইবার নহে; এবং সে এই বিশ্বাসেই, যে যদি ভগবান শিবের

জয়ধ্বনির-নিকটে থাকিতে পারে তাহা হইলে কোনরূপেই সে হারাইতে পারে না—তাই সে ছুটিল. কিন্তু কোন ঢাকীর পশ্চাতে তাহা কি জানেন, সে কি ঐ সিন্ধু প্রদেশ আগত যাত্রীদের...পশ্চাতে!

অতঃপর মনিব মহাশয় আপনার পদক্ষেপ সংযত করিলেন, কেন না আশ্চর্য্য কথায় তিনি কেমন যেন, যে যাহা এই, তীর্থযাত্রিদের একজন বলিতেছিল,—যে তিনি আর ট্রেন হইতে নামেন নাই, বাবা বৈদ্যনাথকে গাড়ীতে বসিয়া প্রণাম করিয়া বলিলেন,—বাবা তুমি জান আমার মৃত্যু আসন্ন কল্য সন্ধ্যার আমার '—' ঘটিকায় কাল হইবে, আমি কাঁশীধামে যাই, আমি গঙ্গাতীরে শেষ নাম জপ করিব, আমি মুক্তি চাই, তুমি দেবাদিদেব তুমি লইয়া চল...তারক ব্রহ্ম নাম তুমি দিও!

সুঘরাই অদ্ভুত চোখ করি এহেন কথা শুনিতে জিহ্বাদ্বারা অধর সিক্ত করে; সে আন্দাজে কিছু অনুধাবনে, ইহা ভাবে, যে উহা ঐ বক্তব্য এক দারুণ ষড়যন্ত্রের খবর, অন্যপক্ষে এরূপ স্বস্তিও তাহাতে জন্মায় যে ইহা ভাল, যে বৈদ্যনাথে নামিলে অব্যর্থই হারাইয়া যাইত; ঢাকীরা তাহাকে, সেই বৃদ্ধকে. পয়সার জন্য ত্যক্ত করিত, বুঝিতেই চাহিত না যে তীর্থে কাঞ্চন স্পর্শ করিবে না বলিয়া সেই বৃদ্ধের যথাসর্ব্বস্ব তাহার সঙ্গীদের নিকট; ভাল যে কাশী গিয়াছে আর হারাইবার সম্ভাবনা নাই।

যুগপৎ ব্রত বিগ্রহ গরুটি, যাহার ললাটে চমৎকার সিন্দূর, বিশেষত সেইটির জন্য সুঘরাই ক্ষুণ্ণমন এখন দেখিল, সকল উদ্বিগ্ন কণ্টকিত গাভীর চক্ষুর্দ্বয় জাজ্বল্যমান, ইহারা ব্যথিত স্বরে হম্বারব করে, যাহা সস্নেহ লেহনের শব্দের ব্যঞ্জনা অনুসারী, যে স্বর পদ্ম হইতে, দেবীর চরণ ন্যায় শুদ্ধ; ইহা চতুর্বিধ আকাশ, পরিক্রমণ, ভেদ করত, মহাব্যোমে পৌঁছায়, সেখানে সুস্পষ্ট অভিধানে ঐ ব্রত বিগ্রহ গাভী এই অভয় দেয়, যে, হে জ্যোতির্ম্ময় তুমি বিকিরণ কর, অন্ধকার বিনষ্ট কর, শুন, মানুষে আর কোন অজ্ঞান নাই, বৈচিত্র্য নাই, যে তাহারা ফুলে,কুঁড়ি উদগত হইতে দেখিয়াছে, প্রস্ফুটনে তাহারা উথলিত, বেশ কাল অন্তে উহার ঝরা প্রত্যক্ষে তাহার বাস্তব হইয়াছে এবং সুদীর্ঘতা ও বিপুল এই দুইকে আপেক্ষিক জানে! অগ্নিকে শপথার্হ মান্য করিয়াছে, মদীয় হম্বারবকে প্রস্তরে পর্য্যন্ত আরোপিত করিয়াছে। সুঘরাই গাভীসকলের কারণে চিন্তিত বিমর্ষ কেন না চৌকিদারেরা ক্রমাগত রিখিয়ার পথের অন্ধকারে হাঁক পাড়িতেছে, সকল গ্রামবাসিরাও দিক্‌ভ্রান্ত যে সে অনুমান করিল।

অতঃপর সে ভাবিয়াছে মনিব মহাশয় নির্ঘাৎ এখন সেই বদ্ধ উন্মাদের সম্মুখীন, যাহারে তিনি সমাহিতচিত্তে সংস্কারবশত পরিগণন করিলেন, যথা ইহা নির্দ্দিষ্ট যে আত্মদর্শীরা উন্মাদবৎ রহেন. তাঁহারা জড়বৎ পিশাচবৎ বালকবৎ হয়েন, এবং যেহেতু কয়েকজন বৈষ্ণব সন্ন্যাসী মালা জপিতে থাকিয়া সেই ব্যক্তিতে আকৃষ্ট রহে—এ কারণে তিনিও বিবেচনা করিলেন, ইঁহাকে দেখি বদ্ধ উন্মাদ. নিশ্চিত মহাপুরুষ, অবশ্যই পরহিতব্রতীও হয়ত; আর যদি ইনি তাহা না হইয়া থাকেন, যদি ইনি সাধারণ পাগল হন, সেই ক্ষেত্রে ইহা বিদিত যে, পাগলরা সত্যের সন্ধান, ব্যবহারিক সত্যেরও সন্ধান দিয়া থাকে; এখন যে কোন পক্ষে, আমি ইঁহাকে শুধাইতে ব্যাকুল, বিশেষত এই নিমিত্ত যে,বেশ ভালরূপেই জানি সুঘরাইএর পাগল খ্যাপাদের প্রতি প্রগাঢ় দরদ উৎসুক্য আছে, কতদিন সে তাহাদের ভাত দিবার জন্য পদ্মপাতা আনিয়াছে, নিজ অন্নদানে উৎসাহিত হইয়াছে, আবার ইহাও ধ্রুব যে, অন্যধারে যাহাদের মতিচ্ছন্নতা তাহারে প্রমোদিত করিয়া থাকে এবং যাহাদের জ্বালাতন করণে কি অবধি হৃষ্টতা তাহার, যে পরক্ষণেই উন্মাদদের প্রতি আক্রমণে পলায়ন তুল্য আহ্লাদন তাহার আর কৈ!

এতদ্প্রবর্ত্তিত, সমীপবর্ত্তী মলিন চ্যাগড়া গাত্রে উন্মাদকে করজোড়ে এবং জানাইলেন, আপনি অনন্যসাধারণ, হে নরোত্তম আপনি ধন্য, আপনার নিঃসঙ্গতা ভাগবত কথিত, আপনি গোপনতা বহন করেন—গোপনতার গোপনতা! আপনকার বিচ্ছিন্নতা নজরে যে বালক নিজ অবস্থা সত্ত্বেও থ; যে. নির্ঘাত বুঝে সেও ক্রমশ গোপন হইয়া যাইতেছে, ক্ষণেক পাংশু হইয়াছে; কোনমতে সে সোজা ছিল, যদিও যে আপনার মুখে হাস্য ছিল তথাপি সে আপনাকে বেচারী বলিয়াছে, যে যেমন আপনিও হারাইয়া গিয়াছেন, হায় আপনি থানা পোস্ট অফিস ভুলিয়াছেন, মাঠে ঘাটে ষড়ঋতু খেলা আপনি ভুলিয়াছেন; বালক ইহা অবিদিত যে, মহা ব্যোম আপনকার বৈভব; এবং যে রোরুদ্যমান সেই রিখিয়ার ছেলেটি, আপনার দৃশ্যত-আধিভৌতিক দুঃখে বড়ই বিকল, যে আপনার কেহ নাই, এখন আপনার দিক বিচারও নাই; এরূপে সে নির্ভয়েই আপনাকে দেখিতে থাকে, হঠাৎ সে আতঙ্কিত হইল, সে ত্রিকূট পাহাড়ের দিকে চাহিল এবং স্থান ত্যাগ করে...তাহার বিষয়ে কিছু বলিবেন। আর যে সেই বদ্ধ উন্মাদের

তর্জ্জনী সঙ্কেত আশায়ে ক্ষণকাল বিলম্ব করিলেন। সম্মুখের পাগলামী অন্তর্হিত হইল।

বেশ খানিক দূরের পথিপার্শ্বস্থিত উত্তম তিলক-সেবা মণ্ডিত গোখুর শিখাযুক্ত জনৈক গণৎকার দর্শনে মনিব মহাশয়ের ঔৎসুক্য উপজিল, তিনি নিকটে যাইলেন এ কারণ যে এই গণৎকার কিয়ৎ অভিনব পন্থীর, ইহার সমক্ষে বিচিত্র সাজ সরঞ্জাম, অক্ষ, চিত্র ইত্যাদি, নভোমণ্ডলে গ্রহনক্ষত্র পরিস্ফুট চিত্র, শনির পরমদ্ভুত সন্ত্রাসপ্রদ কুটিল শুধুমাত্র মুণ্ড অঙ্কিত, ও যন্ত্র সকলের ছক। যখন সুঘরাই এখানে সে ঐ গণৎকার ইনি এক বর্ষীয়সীর করকোষ্ঠি স্বাধ্যায়ে নিমগ্ন, চমকে তিনি খড়ি পাতিলেন, স্মিতহাস্যে ঊর্দ্ধে হস্তসঙ্কেতে মৌনভঙ্গ যেক্ষণে করিবেন, তৎকালেই—ইতিপূর্ব্ব হইতে যে অস্পষ্ট গোলমালের শব্দ হেথা হইতে শোনা যাইতে আছিল, তাহার বেশ দূরে এক জনসমাবেশ দেখা গেল, সামনের কয়েকজন ঈষৎ ধীরগতি, পশ্চাতে বিক্ষুব্ধ অনেকেই।

কাহাদের পুলিশ ধরিয়া আনিতে আছে; বাম পার্শ্বে এক রোগা লোক, তদীয় হস্তধৃত সাঁড়াশী কব্জায়ে একটি মুচি (সোনাগলানর আধার), ইহার গর্ভ হইতে একটি স্বর্ণ সর্পের মস্তক উত্তোলিত ত্রিশূলের শীর্ষ, এগুলি মুচিতে খানিক গলিত পিণ্ডে আটকান; দক্ষিণে একজনা সুবেশী পিছনে একজন গামলা-উনুন, কেহ হাফর ইত্যাদি বহিতেছে, কিছু অন্তরে মত্তমাতঙ্গপ্রায় জনতা যাহাদের দন্ত বিকট প্রকটিত, বলিতেছিল,—শালাদের আমাদের হস্তে অর্পণ কর।

কেহ কেহ প্রস্তরহস্তে রোষামর্ষ চক্ষু ঘুরাইয়া কহিতেছিল,—আমরা ঐ শনৈশ্চর নরাধমদিগের রক্তে কপালে ফোঁটা কাটিয়া পুণ্য অর্জ্জন করি, কি ভয়ঙ্কর ইহারা!

কেহ বলিতেছিল,—ইহারা কাহারা ইহারা গাছকে গাছ জলকে জল বলে কি, ইহাদের ঘুম কি পাতাল প্রবেশ করিয়াছে!

কেহ বলিল,—আমাদের হাত কাজে অতীব শক্ত কড়া পড়িয়াছে, হৃদয় বুক আমাদের বাবার কৃপায়ে এখনও ছাগল ছানা!

কেহ, এবম্বিধ হট্টগোলে আকৃষ্ট হওয়ত, এরূপ ব্যাপারে সাক্ষাতে বিভীষিত,—পাপ! পাপ! বলিতে থাকিয়া কান নাক মলিয়া একটি করজোড় মস্তকে ঠেকাইয়া, সত্বর শিবগঙ্গায় স্নান উদ্দেশ্যে, পাপমোচন উদ্দেশ্যে গেল।

অসমাপ্ত স্নানার্থীরাও পুনরায় স্নানে যায়, সেই দৃশ্যে রমণীমণ্ডল চক্ষু আনত করে দ্বিচারিণী হইবার ত্রাসে! এই বিবিধ উদ্বেগের মধ্যে হঠাৎ একটি প্রস্তরখণ্ড আসিয়া লাগিল সুবেশী লোকটির ললাটে; রক্ত কিঞ্চিৎ পুলিশের জামায় ও স্বর্ণকারের মুচিস্থ রূপগুলিতে! রমণীরা চোখ ফিরাইল; এ সময় শহরের এক ডাক্তারবাবুর পাল্কী-গাড়ী এই ঘটনার সন্নিকট হয়, তিনি গাড়ী হইতে নামিয়া—উৎক্ষিপ্ত জনতা যাহারা বাবা বৈদ্যনাথের জয়ধ্বনি দেয়, আর মার মার বলে—তাহাদের ভেদ করত যাইলেন, আশ্চর্য্য মুচিস্থ অবস্থা দর্শনে তিনি সত্বর সেই দিকে হস্তের গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগ খুলিতে ক্বচিৎ থমকাইয়া এবার সুবেশধারী লোকটির সাহায্যের নিমিত্ত প্রস্তুত।

সুঘরাই এ সকল কিছু দেখিতে থাকিয়া উৎচকিত, তাহার কণ্ঠের শিরাউপশিরা কোন এক চীৎকার নিমিত্ত স্ফীত, এখানে সেখানে দৃষ্টি সঞ্চালন করিল, মনিব মহাশয় হয়ত কাছেই কোথাও—এই অসম্ভাবিত ব্যাপারে মর্ম্মাহত তিনি অবশ্যই—এই জনপ্রবাহ বেশ দূরে যায় যখন সুঘরাই ইহা বিবেচনা করে।

গণৎকার তখন কহিতেছিলেন,—সুখ দুঃখ চক্রবৎ...দুঃখ যাইবেই, আবার দুঃখ তোমার গর্ব্ব হইবে, তুমি অপেক্ষা কর, তোমার স্বামীর এত দুশ্চিন্তার কোন কারণ দেখি না, পুত্রের পুনরায় বিবাহ অহেতুক, তোমাদের সলিতা আসিতেছে, তোমাদের কখনই অন্ধকারে ভ্রমণ করিতে হইবে না, পুত্রবধূ বীজ ধরিয়াছে...তোমাদের ধর্ম্মকর্ম্ম যথেষ্ট দানধ্যান আছে...!

সুঘরাই নভোস্থলের প্রতি মন রাখিতে বাধ্য হয় কেননা গণৎকার ছোট একটি ছড়ি দ্বারা ঊর্দ্ধের ঐ লোক দর্শাইয়া গ্রহর গতিবিধি উল্লেখ করিতেছিলেন, অতএব সে ইহাতে সেই ছবির নীল রঙকে স্পন্দিত অনুভব করিয়া রোমাঞ্চিত।

সুঘরাই, কল্পনা করিল—এখন মনিব মহাশয় এই গণৎকারকে শুধাইলেন,—মহাশয়, আপনি যখন

এক মহিলার সংশয় দূর করা নিবন্ধন, ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান বলিতেছিলেন, ঠিক যখন পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত সেই স্বর্ণকার ও সেই ধর্ম্ম-বৈপ্লবিক নেতাকে লইয়া যাওয়া হইতেছিল, তখনই আমি দূর হইতে দেখিলাম একটি বালক এখানে আপনার ক্রিয়াকলাপ দেখিতে উদগ্রীব, ক্ষণেকেই মহা হট্টগোল শ্রুত হয়, পথের সকলেই সেইদিকে মুখ ফিরায়, আমিও চাহিলাম, আমার আর ডাকা হইল না, পরক্ষণেই আমি আপনার সান্নিধ্যে ভীড় কাটাইয়া আসি, দেখি বালক নাই, একবার মনে হইল আমি কি ভুল দেখিলাম, না, তাহা নহে; তখনই ঐ ভীড়ের মধ্যে অনুসন্ধানক্রমে যাইলাম উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলাম! সেই দুইজন ব্যক্তির কদর্য্য কাণ্ডে আমি সম্বিৎশূন্য, অনতিবিলম্বে ঐ সুন্দরগুলির পাষণ্ড পরিণতিতে আমি হতস্নায়ু, মুচিস্থ ভক্তি-নিদর্শনগুলি আমারে আঁচড়াইতেছিল, কেন না সেখানে প্রাণিপাত যোগভ্রষ্ট হইয়াছে, চেতনা রেখা-ছাড়া হওয়ত পিণ্ড, সঙ্গে সঙ্গে মদীয় খোঁজার প্রেরণা যুক্তি, আরোহীগ্রস্থ দারুভূত, কেন না ঐ দৃশ্য সর্ব্বৈব সংজ্ঞা-বিঘাতক!

আমি যেমন যে অন্যকিছু, আমার সুকৃতি সকল বিনষ্ট, অতঃপর স্খলিত পদে চলিতেছিলাম, অবলীলাক্রমে আপনকার নভঃমণ্ডলের চিত্র আমার চোখে পড়িল, আমার দিক-নিশ্চয় হইল; আমি সন্ধানে প্রবৃত্ত হই। ইতিমধ্যে বালক আসিল, আপনার বিবাহ শব্দ তাহাকে কিম্ভূত করে, তখনই আবার যেন সে সেই চীৎকার করিতে চাহে, কিন্তু আপনার সলিতা কথা তাহাকে বড় আতান্তরে ফেলে, সে নিজে সলিতা গড়ন জানে, অথচ ইহার মানে কি, অথচ বর্ষীয়সী মহিলা ইহাতে যারপরনাই খুসী; সে সুঘরাই আবার নীল ছবিখানির দিকে তাকায়...তাহার গতিবিধি কি আপনি...!

শিবগঙ্গার পশ্চিমে যেখানে আক্ছার নাপিতগণের চোখ কভু ছোট কভু বড়, কেহ বা চুল ছাঁটে, কেহ খেউরী হয়, কেহ চক্ষু বুজাইয়া উর্দ্ধবাহু বগল কামায়, কেহ মস্তক মুণ্ডন করায়; মনিব মহাশয় স্বাভাবিক ধারণায় এই সুদীর্ঘপথব্যাপী কর্ম্মতৎপরতা ঈষৎ কৌতূহলে নজর করিলেন, এখন নিকটস্থ এক ক্রন্দনের শব্দ বহুত কাঁচির আওয়াজ ভেদ করত আসে, দেখিলেন একটি বালক যাহার দন্তে কুটা যাহা পাছে পতিত হয় তাই তাহা এখন দন্তে চাপিয়া কাঁদে, নাপিত সান্ত্বনাবাক্য বলিতেছিল,—ছিঃছি কান্দিও না, তিনি শিবের কাছে গিয়াছেন, তাহা ব্যতীত এরূপভাবে কান্দিলে অঘটন হইবে!

সুঘরাই অবাক চোখে পিতৃহারা বালককে দেখিল। বালকও সুঘরাইকে দেখে!

এই নাপিতের কাজের শেষে মনিব মহাশয় প্রশ্ন করিলেন, হে নাপিত একটি বালক যে অনেকক্ষণ যাবৎ গুরুদশা প্রাপ্ত (পিতৃবিয়োগ) এখনই যে ছেলেটি চুল ফেলিতেছিল তাহার ক্রন্দনে স্বীয় নয়নের অশ্রু মোচন করত অভিনিবিষ্টচিত্তে তাহাকে দেখিতেছিল।

ও যে সেই সময়তে, ক্ষৌরকর্ম্মের মারাত্মক করাল শব্দ শুনিতে থাকিয়া চালনা কৌশলও অনুধাবন করিতেছিল, যে এবং এই সকল সূত্রে আশ্চর্য্য এতাদৃশও ভাবে যে, হায় আমি কি পর্য্যন্ত বঞ্চিত! আমার কোনই খেই নাই, এমন কোন আমার উর্দ্ধতন কেহ নাই, যাহার নিমিত্ত আমার মস্তক মুণ্ডনের সুযোগ আসিবে! হায় আমি ঝড়ের মুখে এঁটো-পাতারও অধম! হে নাপিত, ইহা লোকপ্রসিদ্ধ যে, তোমরা দারুণ চতুর, এখন তোমার হাতের ক্ষুর চালনা রাখিয়া, একটু ভাবিয়া দেখ ত, কেন না বালককে তুমি খদ্দের ভাবিয়া থাক, এখন মনে কি হয় সে কি রিখিয়ার রাস্তার দিকে গিয়াছে।

হায় যদি মনিব মহাশয়, সুঘরাই যখন এখানে, তখন এক বিলাইতী বাজনা একটি ব্যাগ-পাইপসহ ঢাকের শব্দ শুনিতেন, নিশ্চয়ই তিনি মুগ্ধ হইয়া দ্রুত সেই দিকে লক্ষ্য করিতেন, কিন্তু আদতে বাজনার হেতু দর্শনে—সুঘরাই অবিকল এখন যেন দেখিল—তিনি মুহ্যমান, একধারে আশা ও দুঃখ তাহারে কালো করিল, এ কারণ যে উহা এক শবযাত্রা, চারপাইটি অদ্ভুত সাজান বাঁখারি নির্ম্মিত ছোট ছোট খিলান করা, উপরে চেলি-ঢাকা (পাটের কাপড়) যাহার আবির রঙ সকলকেই মোহিত করে।

মনিব মহাশয় বুঝিলেন সম্ভবত ইহা ডোম জাতির মৃতদেহ, ইহাদের সহিত কি সুঘরাইএর সাক্ষাৎ হইয়াছে; হয়ত ইহাদের মধ্যে সুঘরাইএর কোন জ্ঞাতি সম্পর্কের লোক থাকিতে পারে, তথাপি তাহাদের তিনি প্রশ্ন করেন না, নিশ্চয়ই তিনি সুঘরাইএর বিকার বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে যদি ইহা বাঁশ বাঁধা শব হইত তাহা হইলে সুঘরাই নিশ্চয় অনুসরণ করিত, ভাগাড়ে যাইত, সেখানে সে দাঁড়াইয়া থাকিত, স্বজাতি তাহাকে দেখিয়া ছোট এক হাড় ছুঁড়িয়া মারিত—হিঃ রে! সেও আহ্লাদে অধীর হওয়ত একটি

হাড় ছুঁড়িয়া জানাইত যে, সেও খুসী। দুজনেই আনন্দিত খুসী আত্মীয় দর্শনে। তখনই শিশির দেখা যাইবে। বাজনা শ্মশান অভিমুখে চলিল, মনিব মহাশয়ের মস্তক উন্নীত হইল, তিনি অদূর শ্মশান হইতে উত্থিত কুণ্ডলীকৃত ধূমরাশির গাম্ভীর্য্যের পানে তাকাইলেন, নিশ্চয় কোন জিজ্ঞাসা তাঁহার ছিল না।

মনিব মহাশয় সত্যই নিরাশ হইয়াছেন, সামান্য এক ভৃত্যের জন্য এত তল্লাস কেহ করে না, কিন্তু যেহেতু ইনি পরম ধার্ম্মিক তাই এতেক ব্যগ্রতা; যখন তিনি অবনত মস্তক চলিতেছিলেন, তখন সহসা শিব-জয়ধ্বনি উঁচাইয়া অস্বাভাবিক স্বরে গীতের বিস্তার হইল, এই গান নিশ্চয় সর্দ্দার পাণ্ডাঠাকুর লিখিত যাহা—

'আজু জাগরণে রাতিয়া বিতল সখী যে ভৈল ভোর গে, হায় রাম'—

এই মাঙ্গলিক সুললিত পদবন্ধ শ্রবণে তাকাইলেন—যে এবং কিয়ৎ রশি দূরে দৃশ্যমান হইল, ঘোর লাল পাটের সাড়ী পরিহিত, কালো তেলাল চুলে পাতাকাটা ও পাতায় চুমকী, নাকে ফাঁদি নথ ও নানাবিধ পিতলের অলঙ্কারে ভূষিত পাঁচটি হিজড়া একজন স্ত্রীলোককে, যাহার মাথায় বটপল্লবসহ ঘট, তাহাকে, মণ্ডলাকারে খেমটা নৃত্যে পরিক্রমণ করত, ঐ গীত সহকারে ক্রম অগ্রসর হয়; এই দলের পিছনে এক সুরম্য ডুলি ও যাহার অনুগমনে কুসুম-রঙ-ছোপান বস্ত্র শোভিত আর রৌপ্য অলঙ্কার সজ্জিত দাসীরা যাহাদের হস্তে পূজা উপচার রহিয়াছে। সুঘরাইও ঐ সকল কিছু এইভাবেই দেখে! তার পর শোভাযাত্রা এক কারণে থামিয়াছে বসিয়াছে, হিজড়ার দল চুটা ধরায়। ঐ এখন আবার চলিতে সুরু করিল।

মনিব মহাশয় সবিস্ময়ে এহেন চমৎকার দলকে পর্য্যবেক্ষণ করিলেন যে তাঁহার ইদানীন্তন বৃত্তি বশবর্ত্তী তাহাদের কাছে খবর করিতে ইচ্ছা হইল; তিনি নির্ঘাত যে সুযোগ অপেক্ষায় তাহাদের অনুসরণে খানিক পথ যাইলেন, শিবগঙ্গার নিকট যখন পুনরায় সেই দল রুখিল, তৎকালে তিনি তাহাদের, ঐ হিজড়াদের কাছে—যেহেতু শোভাযাত্রার অন্য সকলেই মৌনী—সুঘরাইএর সংবাদ জানিতে গিয়া অস্বস্তিতে ইতস্তত অন্যত্র মনস্ক হইলেন। অনেকটা দূরে খোলার চালের বাড়ী, খোলার পলা-রঙা চালা ও তদুপরি পরমদ্ভুত দর্শন পোড়ামাটির হাতী ও পায়রা তদীয় দৃষ্টি ব্যাহত করে, সহসা এইগুলিতে তাহার বুকে আশ্চর্য্য পথে ভরসা আনিল। যে তাঁহার সঙ্কোচ আর নাই, তিনি মধুর বচনে হিজড়াদের কাছে ইহা উল্লেখে বলিলেন,—তোমরা কি আমার কথার উত্তর দিবে, যে বালক আপন গাত্র হইতে গেঞ্জীটি উন্মোচিয়া সেই গেঞ্জী দ্বারা আপন চক্ষু মুছিতে কালে তোমাদের প্রত্যক্ষ করে, এবং ভাবিয়াছিল, অনেক সময় যাবৎ তোমাদের দেখিলে মঙ্গল হয়, এবং সে আমাদের সাক্ষাৎ পাইবে এরূপ বিশ্বাসেই সে স্বাভাবিক! মনিব আরও বলিলেন, যে তোমাদের কুহকময় অঙ্গুলি আছে যেটি তোমরা আপন সুপুরু ওষ্ঠদ্বয়ে স্থাপনে আমাদের নিমিত্ত কর, মানুষের নিছক ধারাবাহিকতা পরোক্ষে স্মরণ করাও, যে তোমরা চম্পক অঙ্গুরীয় বৈপরীত্য; অঙ্গুরীয় আলো, তোমরা চমকপ্রদ স্তব্ধতা!...এখন সেই বালক, তোমাদের বিশ্রামের কারণ বুঝিয়া আপন পাপস্খালনের জন্যও—মানুষের গলাতে ও স্বরে কি নোনা আছে—বলিল, যে সে মন্দির সমীপস্থ অঘটন দেখিয়াছে, যে সে চন্দ্রকলা ভূমিতে—বাঁকাচাঁদ এককলা জ্ঞানের প্রতীক যেমন শিবের মাথায় থাকে—পতিত হইতে দেখিয়া বৃক্ষে উঠিতে চাহিয়াছে, ঐ কীর্ত্তির চন্দ্রকলার মনোরমত্ব তাহাকে মুগ্ধ করে, সত্যই যাহা মননে যে কোন হিন্দুজনম সার্থক তখনই!

যে এবং, যে সে অবলোকন করে, এক অপূর্ব্ব কন্যাকে পদব্রজে আসে, যাহারা ধর্ম্মতাত্ত্বিক সাধক সন্ন্যাসী যাহারা নিজ নিজ স্তব 'মহামহিম্ন' ও 'নির্ব্বান ষটক' পাঠ করিতেছিল তাহারা কন্যাদর্শনে উহা থামাইয়া—'অহো ভগবতী তনু ভগবতী তনু' উচ্চারণে আকাশ বিদীর্ণ করিল, যাহারা এখানে সেখানে পদ্মাসনে বসিয়া নিমীলিত নয়নে ধ্যানস্থ ছিলেন তাহাদের গাত্রে ঐ শুদ্ধ শব্দে মুহুর্মুহুঃ রোমাঞ্চিত হইতে থাকে, এমত সময় নেতৃবর্গসহ হরিজনরা আসিল, প্রলয় কাল আসিল, কন্যা ন যযৌ ন তস্থৌ হইলেন কিয়ৎক্ষণ, অতঃপর শুভমিলনের কারণে ধাবিত হইলেন, এ সব ব্যাপার অনেকক্ষণকার, এখন নিশ্চয় শাস্ত্রমতে বিবাহ কার্য্য চলিতেছে! আর সেই দুর্বৃত্তরা অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহারা দন্তঘর্ষণ করিতেছে, তোমরা আর কালবিলম্ব করিও না, অদ্য অনেক দুগ্ধ ঘৃত পূজা উপচারাদি নষ্ট হইয়াছে, হোমকাষ্ঠের অভাব, সত্বর যাও, ভোগের আর বেশী দেরী নাই, জয় বাবা বৈদ্যনাথ!—সেই বালকটির কথা, যে আপন হঠকারিতায়ে অধোবদন, অনুতপ্ত যে সে-ও হরিজনদের সহিত চীৎকার করে, সেই

বালকের কথা তোমরা বলিতে পার...!

হায় আমার চক্ষুর মধ্য দিয়া নিয়ত বাদুড় প্রবেশ করিতেছে, হায় আমার নাম সুঘরাই, যাহা ক্রমাগত শিব জয়ধ্বনির মধ্যে ডুবিতেছে, হায় এ পৃথিবীতে পচাগলিত দুর্গন্ধ কিছু নাই, ঐ ধ্বনি সকল কিছু গ্রাস করিতেছে, যে আওয়াজ ভেদ করত আমিও বহুসময় শালা বলিয়াছি, যেহেতু আমি ডোম, কিন্তু তাহারা আরও পাপ করে যাহারা উচ্চৈঃস্বরে বৈষয়িক কথা ঐ ধ্বনি সময় কহে, আমি শুনিয়াছি: আমিও ত আমার নাম ধরিয়া অনেক অনেক বার ডাকিয়াছি! হায়! মনিব মহাশয় যদি ঐ ব্যাঙটি দেখেন তাহা হইলে কি ভাবিবেন, নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমা করিবেন, যে আমি মহা আক্ষেপে আপশোষে ক্রোধে উহারে আহত করিয়াছি!

এখন তিনি অসংখ্য ভিখারীদের সামনে, যে সুন্দর রৌদ্র উহাদের এড়াইতে পারে নাই, যে শুধুমাত্র একের ছায়ায় অন্য ভারী কালো, একদম উম্ভীজ, বিবিধ ভাষায় আশীর্ব্বাদ কল্যাণ বচনে ইহারা বিকট, অবিলম্বেই আবার ম্লান, তিনি এই নিকৃষ্ট অবহেলিতদের নম্র বচনে প্রশ্ন করিলেন,—বাবা বৈদ্যনাথ তোমাদের মঙ্গল করুণ, বিশেষ যে, তোমাদের জিজ্ঞাসা করি যে চীৎকাঠ নিবাসী বজ্রাহত ভিখারী যাহার নাম জাঙকী সেই অষ্টবক্র বিকলাঙ্গকে চেন কি না...তাহারে কি স্মরণ আছে? বোবা ভিখারীটি যে বালসরাইএর, তাহার কথা নিষ্প্রয়োজন! অবশ্যই অগণিত তীর্থযাত্রী তোমাদের আশ্চর্য্য নেত্রে নিরীক্ষণে করজোড় করে, বুঝে তোমরা জাঙকীর মতই পূর্ব্বজন্মকৃত পাপ বহিতেছে; যে এবং সুঘরাই সিদ্ধান্ত করে, যেহেতু পাপ সে করে নাই তাই তাহার দেহ নিখুঁত, যদি ভবিষ্যতে কখনও সে কোন পাপ সঙ্ঘটন করে, তন্নিবন্ধন সঙ্কল্প করে, সে আপনকার হাত পদদ্বয়কে সংযত করিবে, কেন না হাতে নোনা আছে—উহারাই নচ্ছার! এমন যদি, কভু অজ্ঞানে সে পাপ করে তাই আগামী পৌষ সংক্রান্তিতে ভাগলপুরের গঙ্গায় স্নান করিয়া তাহা স্খালন করিবে।

যদিও তাহারা ডোম, নানান বিচার আচার তাহাদের নাই, তথাপি যে এবং আরও, এই মানসিক করে যে যখন সে আধ সের চাউল প্রত্যহ খাইবে তখন তোমাদের নিমিত্ত প্রতি হাটবারে এক পালি চাউল (!) আনিবে, গামছাও দান করিবে, তাহারা ডোম, যদিও তাহাদের ভিক্ষা গৃহীত হয় না, তবু মুহূর্ত্তের জন্য সে উচ্চবর্ণের হইবে, সেই দেশওয়ালী বালক সহসা অদ্ভুত সঙ্কুচিত হয়, এ কারণ যে অচিরাৎ কাহারও সম্ভ্রান্ত কণ্ঠের ভর্ৎসনা তাহার কানে আসে; শনৈঃ ঐ তিরস্কারবাক্য সে অনুধাবনেই ত্বরিতেই নিদারুণ চমৎকৃত, যে ক্ষণেক ইহা সংস্কার জন্মে যে, যে সে যেমন বা হারাইয়া যায় নাই।

সে দেখিয়াছিল যে, অনতিদূরে জনৈকা উচ্চবংশসম্ভূতা গৃহিণী বোধ হয় তদীয় নাতনী, যে ফ্রকপরা, তাহারেই তিক্ত সমালোচনায় বলিতেছিলেন,—ছি ছি লজ্জা রাখিবার জায়গা পাই না, ইহারা (ভিখারী) না সাক্ষাৎ নারায়ণ! ইহাদের ঘৃণা ছি ছি তোমার ঐ বাপটিস মিসনে এই বুঝি শিক্ষা, ছি ছি, নরকেও স্থান হবে না, ভিখারী বলিয়া...ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া অবজ্ঞা করিয়া দেওয়ার মত পাপ আর নাই; শতজন্ম তপস্যার ফলে মানুষ ভিক্ষা দেওয়ার সুযোগ পাইয়া থাকে, উহারা কানা খোঁড়া কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত কি ইচ্ছা করিয়া হইয়াছে! বলে কুকুর বিড়ালরে অবধি ছুঁড়িয়া কিছু দিতে নাই। ছি ছি! উহাদের নমস্কার কর...!

ইত্যাকার কথার সহিত গৃহিণীর উৎকৃষ্ট স্বর্ণালঙ্কারগুলির মৃদু অনুরণনও মিশ্রিত হইতে থাকে, যে উপস্থিত সুঘরাই সদ্যস্নাত সুন্দর দেখিতে কন্যার জন্য তটস্থ হয়—এবম্বিধ উক্তিতে তাহার ডোম জন্মে আশ্চর্য্য এক অপরাধ জানিয়েছিল; আর তোমরা হে ভিখারীগণ, গৃহিণীর রূঢ়তায়ে বালিকার জড়তা বুঝিয়া, তোমরা গৃহিণীপ্রতি বালিকার নিমিত্ত সমবেদনায়, ক্ষমাপরবশ, অতীব করুণায়ে আশ্বাস দিয়াছিলে, থাক্ থাক্ উহাতে দোষ বিচ্যুতি ঘটে নাই, সে বালিকা, আমরা তিন সত্য করিতেছি উহার অপরাধ আমরা লই নাই, যে বালিকারে আমরা আশীর্ব্বাদ করি, সে শিবলোকে যাইবে, শিবকে পতিরূপে পাইবে, উহার জীবন আমরণ দেবসেবায় ধন্য হইবে, অজস্র দান ধ্যান করিবে, উহার সন্তানরা ত্রিলোক-বিখ্যাত ধার্ম্মিক হইবে, অমর হইবে মাগো!

তোমাদের এতাদৃশ স্নেহবচনে সেই বালক সুঘরাই যেন এই মাত্র স্নান করিতে চাহিল, কেননা সে চীৎকারে শিবকে পতিরূপে পাইবে, বাক্যকে তছনছ ইতিপূর্ব্বেই করিয়াছে, সে কম্পিত, সে তোমাদের নমস্কার করে, তাহারে কোন দিকে যাইতে দেখিয়াছ।

অনবরত পুণ্যকামী আর ঢাকের শব্দে মনিব মহাশয় স্বতঃই বিভ্রান্ত, নূতন করিয়া যে এখন তাঁহার

কোথাও গিয়া শুধাইতে ভয়ঙ্কর রাগ হইল; বিশেষত মোহিলির ব্যবহারে বৃথা ভয়ের জন্য—যে সেই কলেরা ইনজেকশন ক্যাম্প রোহিণীর ঐ দিকে না অন্যত্রে উঠিয়া গিয়াছে—গরুর গাড়ীটি থাকিলে কোন গোলই ঘটিত না, সুঘরাই অনায়াসে তাহাতে ঘুমাইতে পারিত; ওষ্ঠদংশন করত তিনি চারিদিকে চাহিলেন, নাঃ একবার শেষ চেষ্টা করি, যদি সে রিখিয়ায় ফিরিয়া গিয়া থাকে; কিন্তু ইহাতে তাঁহার অবশ্যই মনে পড়িবেই যে সুঘরাই কোন উপায়েই একা একা রিখিয়ায় ফিরিতে পারিবে না, অবশ্য যদি কোন সহায় সম্বল পাইয়া থাকে, ভিখারীদের কথা উঠে না, যদি অন্য কাহাকেও পাইয়া থাকে তাহা হইলে সে আর এক কথা।

এমনও যে বিসরিয়ার বাপ, যে প্রত্যহ শহরে পায়ে ঘুঙুর এবং বিরাট ঢাক ঘাড়ে আসিয়া থাকে, ঢাক বাজানই তাহার ব্যবসা, ক্রমাগত তীর্থযাত্রীদের সমক্ষে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ঢাক বাজাইয়া শুভ অভিনন্দন জানায়, এবং এইভাবে শিবগঙ্গা পর্য্যন্ত যায়; তীর্থযাত্রীদের কি আদরের স্মৃতি সে, ভারতের দিকে দিকে চন্দন গন্ধের পাশেই সে; তাহার মত অনেকে। সে ফার্ষ্ট ট্রেন ধরিবার জন্য রাত থাকিতে আসে, অদ্য তাহারও সাক্ষাৎ নাই।

তবু তিনি অবশেষে এই রিখিয়া তত্ত্ব করিবার স্থির করিলেন; তিনি দুমকার চৌরাহা গিয়া পর্য্যবেক্ষণে জানিলেন, সকাল বেলাতেই বহু কাঠের ভারী, বহু দুধওয়ালা বিষণ্ণ চিত্তে ফিরিয়া গিয়াছে ও যে দু-চারজন সুদূর ভাগলপুর হইতে বা গঙ্গার নিকটবর্ত্তী এলাকা হইতে গঙ্গাজল, বাবা বৈদ্যনাথকে তদ্বারা পূজা করিবার মানসে আনয়ন করে, তাহারাও শহরে প্রবেশ করে নাই, ক্ষুণ্ণ মনে বালসরাইএর দোকানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে; যে আজ ঐ পথে একেবারে লোক চলাচল নাই, সর্ব্বৈব নিশুতি; এখন এরূপ পথ সুঘরাইএর পক্ষে অতিক্রমিয়া যাওয়া আষাঢ়ে, কিছুতেই ঘটিবার নহে, সেরূপ সাহসও সে পাইবে না—কেন না লকড়!

কোন এক সাংঘাতিক সুচতুর লকড়ের উপদ্রবে রিখিয়ার আশপাশ অনেক মৌজা সর্ব্বদা আতঙ্কিত হইয়া আছে, যে সেখানে ঘুম নাই, ক্রমাগত নিদারুণ ফেউএর ডাকে সকলেই শঙ্কিত, কুকুররা গ্রাম হইতে বাহির হয় না, কোথাও পাতালতা স্তূপীকৃত করিয়া আগুন দেওয়া হয়; সকলেই একযোগে ভয় পাইয়াছে—একে অন্যকে কাছে টানিয়াছে—ঢাকীরা ঢাক ও অন্যান্যেরা, ছোট-রা, ক্যানেস্তরা টিনের কৌটা ইত্যাদি ঘুম চোখে বাজাইয়াছে, এই সঙ্গে সকলেই থরহরি! রাত্রিগামী গরুর গাড়ীর চাকার শিকে একটি কাঠের সহিত লাগিয়া যাহাতে শব্দ হয়, তজ্জন্য তাহাতে আড়ভাবে চালকরা কাঠ বাঁধিয়াছে, ইহাতে চলা-কালে উৎকট আওয়াজ হয়, ফলে কোন জন্তুই গাড়ীর সমীপে আসে না। ঐ লকড় হেতু এমন কি চেঞ্জার বাবুরা কেহ কেহ বন্দুক হস্তে সান্ধ্য ভ্রমণ করেন।

কয়েকদিন হইল এই লকড় এতেক দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছে যে দিনমানেও তাহাকে দেখা যায়, মাঠে গরু পর্য্যন্ত চরান ভাবনার হইয়াছে, তাই অড়হর ক্ষেত যদি পশ্চিমে হাওয়ায় নড়িল, যুগপৎ সকলেই লাফাইয়া উঠিয়াছে, ও হো হো হৈ লক্কড় হে—হাঁক পড়িয়াছে!

বিদ্রাবিত অসহায় গ্রামবাসীরা গাছের গায়ে নূতন করিয়া সিন্দূর দিয়াছে; বিশেষত এ কারণে যে বালসরাইএর রাস্তার কাছেই কয়েক ঘর ডুমনীর বাস, যে ঠিক সেইখানেতে দিন তিনেক পূর্ব্বে এই লকড় দ্বারা এক নৃশংস ব্যাপার সঙ্ঘটিত হয়।

ঐ সকল ডুমনীদের ঘরের সামনে রোজই রাত্রে একটি বোবা ভিখারী ঘোরাফেরা করিত, যে ডুমনী মাগীদের সঙ্গে তাহার ভাব ছিল; ডুমনীরা তাহাকে মহুয়া বা গাঁজার কল্কী দিত; বোবা সারারাত এখানেই তাহাদের ঘরের কাছে ঘোরাফেরা করে।

কোন ডুমনীর ঘরে খদ্দের (বাবু!) আগমনে যখন ঝাঁপ বন্ধ হইত, সেই ক্ষেত্রে ঐ বোবা ঝাঁপের ফাঁসা ফুটো দিয়া আভ্যন্তরীণ ক্রিয়াকলাপ দেখিতে ভালবাসিত; বোবা সে বটে কিন্তু লালা ত ছিল! যেদিন তাহার কাল হয়, সেদিন কোন কোন ডুমনী তাহারে রাত বারোটার ট্রেন যখন যায় তখন দেখিয়াছে, একজন ডুমনী তাহাকে একটু মহুয়াও দেয়, যেহেতু সে কাছেই ছিল মানে ঐ ডুমনীর ঘরের ঝাঁপে আড়ি পাতিয়াছিল; যে ইহার পর, যখন সে হয়ত পুনরপি ঐ ভাবে ঝাঁপের ফাঁক দিয়া দেখিতে একমনা তখনই নির্ঘাত লকড় কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়!

বেচারী বোবা!

লকড়টি, ইহা জীবিতরা ধারণা করে যে, গরুর গাড়ী বা অন্য কিছুর নিমিত্ত বোবার খানিক-খাওয়া দেহ রাখিয়া চম্পট দিয়াছে, এবং উহার মর্ম্মন্তুদ চীৎকার পশু পাখীর সহিত এক! যে সেই কুৎসিত বিভীষিকা সারাদিন রাস্তায় রহে—দূর দূর গ্রামে এই হিম দুঃসংবাদ পৌঁছিয়াছে; যাহারা অনেক পথ ভাঙ্গিয়া আসে এহেন বীভৎস দুর্দ্দৈব প্রত্যক্ষ জন্য, তাহাদের অন্তর আত্মা পাঁশুটে হইয়াছিল; সুঘরাই উহাদের সঙ্গে খানিক পথ যায়—এই ঔৎসুক্যের হেতু মনিব পত্নীর নিকট বকুনিও খাইয়াছে!

উহাদের দর্শকদের মধ্যেই কেহই সেই মর্ম্মন্তুদ দেহ অবলোকনে 'বেচারী' পর্য্যন্ত বলিতে পারে নাই; যে অন্যপক্ষে কোন নীতিজ্ঞান আব্রাহ্মণ কেহই তাদৃশ দুর্দ্দশা হইতে মন্থনে শক্ত হয় নাই। সকলে কাতর নয়নে শকুনির পরিক্রমণ দেখিতেছিল।

শুধু মাত্র ভীতি! ভীতি তাহাদের—গ্রামবাসীদের অমোঘ অহংতা; আর যে বিশেষত তাহারা যাহারা পূর্ব্বজন্মজনিত পাপ বিধায় অতীব নিম্নশ্রেণীর এই জন্মে, ইহা ধ্রুব যে ভীতি তাহাদের পুণ্যও; সুঘরাই ঐ ঘটনাস্থলের খানিক পথ হইতে ফিরিয়া সর্ব্বপ্রথম খড় কুড়াইয়াছে, যে একটি সুদীর্ঘ দড়ি তাহার চাই, খড় দ্বারা একটি কদাকার, রশি বানায় ও যে পাখীর খাঁচাটিকে মটকায়—খিলানের লোহাতে তুলিতে চাহিয়াছিল।

যে, লকড় হইতে ভীতি, ভীতি চড়াই উৎরাই-এর নিঃসঙ্গতা পার হইয়াই পাখী! যে চকিতে ইহাতে সুঘরাইএর নেত্র অভাবনীয় বিস্ফারিত যে যাহাতে একাধারে উদ্বেগ ও অপ্রত্যাশিত পাখী না থাকার দরুণ আপশোষ বিদ্যমান; যে সে এতাবৎকার অনভ্যস্ত মানসিকতা হইতে অধুনা সে মুক্ত, অত্রাহি ভাবান্তর এখন ধূলিসাৎ হইয়াছে, তাহার ডোমত্ব ঘুচিয়াছে।

ইহা যথার্থ যে সে নাড়ীর যোগসূত্র পাখী শব্দে প্রাপ্ত হইয়াছে; যে সে আতা গাছকে আতা গাছ বলিয়া চিনিয়াছে, যে সে রিখিয়ার কোন সিন্দূর-লাঞ্ছিত সেহুয়া গাছকে এখান হইতে নমস্কার করিল; আশ্চর্য্য যে এক কুকুর তাহারে দেখিয়া অজস্র চীৎকার পাড়িয়াছে কেন না সে সুঘরাই নাচিয়া উঠে—যাহাতে ইহা সিদ্ধ হয় যে সে অব্যর্থ, সে আছে।

এবং এখন, সে মনিবের প্রিয় দাস, সে সম্প্রতি শুনিল, এই হারামজাদা!—আঃ হা পাপ কাহাকে বলে! এবং যে তাবৎ বিশ্বাস যে সে আছে, এই বিশ্বাস তখনই সম্যক, যখন তাহার পাখী আছে, তখনই স্থাবর জঙ্গম সবই সংখ্যায়ে, যে যাহা মননে তদীয় অব্যবস্থিত প্রকৃতি ইদানীং সাধারণ।

আর যে ঐ লকড় কারণে ভয় হইতে শহরের এতক্ষণকার যে একাকিত্বের ভয়ে সে দিকভ্রান্ত থাকে, তাহাতে আর সেই বৈলক্ষণ্যের তেমন চেহারা নাই; এখনই সুঘরাই আপনকার দেহ হইতে হাতের পানে চাহিল, ইহা নিমেষেই ওতপ্রোত যেমন যে সেই হস্তে একটি খাঁচা আছে এবং আদতে নিজের গেঞ্জীটি তাই ডান হাতে লয়, যাহা যেন খাঁচা আর যে তৎবুদ্ধিতে নাচাইলে, যে সে এমন কি খাঁচার ভার অনুভবিয়াছিল; আশ্চর্য্য সে কি পাগল! এত সময়, হায় সে এক রকম নিজ নাম হইতে, এবং যে মাথায় সে এমন অর্থাৎ উচ্চতায় এতখানি যে এরূপ তাহারে দেখিতে হইতে, শুধুমাত্র স্থানবাচক হইয়া সর্ব্বত্রে ব্যাকুলভাবে দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়াছে! আঃ তাহাতে বৃত্তি আসিল, সৎসাহস আসিল যে সে চিবাইতে জানে।

এই প্রকার আক্ষেপে সুঘরাই স্বীয় বক্ষে চাপড় মারিলেক, যে হায় যদি পাখীটি থাকিত! ইহাতে তাহার ডোমত্ব নিশ্চিহ্ন হইল; আর একদিকে সে দশাসই ডোম যদি অপি, তবুও সে এখন অনায়াসে ফুল চয়ন করিয়া কানে পরিতে পারে, কোন বাধা নাই এবং সে সেই—যে ছেলেটির সহিত একটি পাখী আছে, যাহাতে সে বাস্তব, যাহাতে সে এই জড় পূর্ব্ব পশ্চিমাদি দিকের অপেক্ষা নহে।

এ পর্য্যন্ত যত কিছুকে—মানে যাহাতে তাহাকে সহজে খুঁজিয়া পাওয়া যায়—সে আপন শরীরের অঙ্গীভূত করিতে আপ্রাণ ছিল, তৎসমুদয়ের ঠিক লইল এবং তাহাতে বুঝে, দেহ তদীয় সীমা আর নহে—দেহে সে আটকাইয়া নাই, ইদানীং সমস্ত কিছু মিশিয়া মিলিয়া এক অত্যদ্ভুত রূপ ধারণ করিয়াছে, যাহা দেখার তথা অনুভবের সঙ্গেই সে বলিয়া উঠিল। যে, ছেলেটির সহিত একটি পাখী আছে।

এই দৈব সমাধান অহো কীদৃশী বিস্ময়াবহ! যে সুঘরাই নিজেকে নিজেই জবর ডাগর রূপে প্রস্তুত করিতে থাকে এই বাক্যাবলী: যে ছেলেটির একটি পাখী আছে, তুমুলভাবে উচ্চারণ উদ্দেশ্যে সুমহান স্বর তাহার কণ্ঠে গঠিত হইল, ঝটিতি ধ্বনিত উহা হইল, যাহাতে ধর্ম্মত ইহাই, ন্যায়ত ইহাই, ভাবে প্রতিষ্ঠিত যে, ঐ পাখীটি কোন একদিনের, সত্যযুগের, যেক্ষণে দেবতা মানুষ অভেদ! ও সুঘরাই যাহার সূত্র ইহাতে, ঝটিতি সুঘরাই-এ চাকচিক্য ছটা ধরিল, যে সে সুদারুণ নির্ভয়ে সে পুনরায় কহিল, যে, ছেলেটির একটি পাখী আছে। আর যে ইহাতে সে এই বসুন্ধরাকে অভয় দান করিল! যে তুমি ভীত কেন—আমি আছি!

ইহা এখানকার অবিশ্রান্ত স্তব স্তোত্র মন্ত্র পাঠে, গম্ভীর জয় বাবা বৈদ্যনাথজী জয়ধ্বনি মহিমাতে, অধুনা, যাহা সুদূর কুম্ভকোণম আগত তীর্থযাত্রী কর্ত্তৃকও শব্দিত, এহেন পরম শুদ্ধ উদাত্ত স্বরবিভঙ্গে, এবমুক্তবচন যাহা সে বলে, যে ছেলেটির একটি পাখী আছে, চিরতরে আটকাইয়া গেল, সংমিশ্রিত নহে, কদাচ ডুবে নাই!

এবং সে কান পাতিয়া শুনিতে যাহা উদ্‌গ্রীব, ঐ সকল তপোলভ্য উচ্চারণে তাহার আপনকার নির্ম্মিত সঙ্গীতময় পদবন্ধ বিঘোষিত শুনিল, যাহার অনুরণন দেহে হওয়া মাত্রই, তাজ্জব যে, ইহা যেমন সংস্কার, যে সে মোটেই উৎচকিত ছিল না, এ যাবৎ কিঞ্চিন্মাত্র সে হা হা রবে কাঁদে নাই।

এখন গেঞ্জী যাহা খাঁচাতে পরিণত—যাহা সে বহুক্ষণ পূর্ব্বে গাত্র হইতে খুলিয়াছে, এমন ভাবনায় যে উহা পরিয়া থাকিতে তাহার নিশ্চয়ই চেহারার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, কেন না ইহা খুব ফর্সা, আর তজ্জন্য মনিব মহাশয় তাহাকে, কিছুই অবিশ্বাস্য নহে, চিনিয়া লইতে পারিতে অসমর্থ নির্ঘাত, আর সে তদীয় দুর্লভ ঘৃণা হইতে বঞ্চিত!

সেই গেঞ্জী উপস্থিত বড় খুসী মনে পরিয়াছে! সে পূর্ণ! গেঞ্জীর আর্দ্র স্থান নিজ ত্বক্ সংস্পর্শ হইতেই সে হাসিল; অধিকন্তু খাদ্যসামগ্রীর যাবতীয়, ও দোকানের বোতলগুলি দূরে থাকিয়া দর্শনেও সে সাবধান, প্যাঁড়ার গন্ধে সে অধীর, চমৎকৃত।

আবার মনিব মহাশয়ের স্বর শুনিল—এই হারামজাদা...

মনিব পত্নী বলিলেন—কি পাপ!

এ শহরে ধূলা উড়ে, পলাশ পত্র যত্রতত্র হইয়া আছে; এ শহর মুহুর্মুহুঃ উৎকৃষ্ট ঘণ্টাধ্বনি নিনাদিত, পুষ্পমাল্য দীপ দেদীপ্য, ধূপ কর্পূর চুয়া চন্দন গন্ধে এই স্থানে আক্‌ছার, তীর্থযাত্রীদের কণ্ঠস্বর সুললিত; তাঁহার সেই একের সর্ব্বব্যাপিত্ব এই তীর্থ দ্বারা অস্বীকৃত হয় নাই! এ শহরে ব্রাহ্মণগণের গাত্রবর্ণে জৌলুস চিক্কন দিব্য।

এই শহরে, নিকটে কোথাও যেমন বা নিঃশঙ্কচিত্ত মৃগশিশু সকল পরিভ্রমণ করে, যে শিবগঙ্গায় অনেক চক্রবাক সকল, আর উন্মুখী পদ্ম কম্পন, আর যে সেই শহরে সে এতকাল পিতৃহন্তা পাপীর তুল্য অশরীরী ছিল! সম্প্রতি বালক এই শহর তীর্থকামীর চোখে দেখিল, যে সে সজীবতা, যে ঈদৃশী পুণ্যভাক নগরে তাহার হারাইয়া-যাওয়ার কারণ যাহা আদত তাহা নির্ণীত হইল, যাহা আমি ও আমার সম্বন্ধ, তাহা বোধগম্য হইল—মানুষ এই নোংরা লইয়া দেশ-দেশান্তর করে!

যদিস্যাৎ তাঁহারা, মনিবরা উক্ত ধরণের সংজ্ঞা, যে তাহার একটি পাখী আছে, নির্দ্ধারণ করিতে পারিতেন, অর্থাৎ কিনা তাহার ব্যাপারে সংজ্ঞা রচনার সুযোগ ঘটিত, তাহা হইলে কাহারও প্রশ্ন এতশত করিবার কথাই আসিত না, তাঁহারা মন্দির হইতে বাহিরে আসিয়া, সুঘরাইকে না দেখিয়া, এদিক সেদিক চাহিয়া, পাণ্ডাঠাকুরের পরামর্শ শুনিয়া, নিশ্চয় ডাহিনে অতঃপর বামে এঁদো দুর্গন্ধযুক্ত সঙ্কীর্ণ গলি, ও যে কতিপয় জীর্ণ ফাটা দেওয়াল অতিক্রম করত যে রকে ছাগল ঝিমায়, তাহার পাশ দিয়া বড় রাস্তায় চর্ব্বিত চর্ব্বণকারী ষাঁড়কে—ইঁহারা নমস্কার করিয়াই দেখিতেন অসংখ্য কবুতর উড্ডীয়ান হইল এবং আলোছায়ার পর পুনরায় আলো ঘটিল, আর তথায় সুঘরাই, ওষ্ঠে তাহার স্মিত হাস্যরেখা ও সে তাহার পাখী লইয়া স্থিতবান, এই সেই সুঘরাই যে কখনই মন্দিরে হাঙ্গামাকারী হরিজনদের সহিত জিগীর দেয় নাই, ইহা এক ছত্র ডাগর দৃশ্য, আর পিছনে শিবগঙ্গা!

সুঘরাই এখানে বৈদ্যনাথে, পাখী আনিতে বায়না ধরিয়াছিল, মনিব মহাশয়কে এই কথা—সুঘরাইএর ইচ্ছা—তদীয় পত্নী নিবেদনও করিয়া থাকেন, কিন্তু তদুত্তরে তিনি, মনিব মহাশয় বলেন,—দূর,—তুমি

কি উন্মাদ হইলে, একে উহা দেবস্থান মানে আমরা দেব দর্শনে যাইতেছি সেখানে কোন হুজ্জুত লইয়া যাওয়া যায়...!

তা'তে কি হয়েছে, ছোট ছেলে বলছে, আহা বেচারী পাখীটাকে এক মুহূর্ত্তও ছেড়ে থাকতে পারে না...আর জম্মে নিশ্চুই কেউ ছিল ও ছোঁড়ার...এক মুহূর্ত্ত কাছ-ছাড়া করতে পারে না...ছোঁড়া দেখ না বাহ্যে যাবে তাও পাখী...ওগো অমত ক'র না, ওর ভারী সাধ পাখীটাকে বোদ্দিনাথ দশ্শন করিয়ে আনে...।

না না তুমি বড়ই উহারে আহ্লাদ দাও—কোথাকার এক ডোম ছোঁড়া, তাহার জন্য...উহাকে রাখিয়া দেখিতেছি মহা বিপদে পড়িয়াছি...।

মনিব মহাশয় ও মনিব পত্নী এখানে আসিয়া এক গ্রাম্য বালকদের ভোজন দেন, ইহাতে কেয়ারি করা বাগানের কিছু নষ্ট হইয়াছিল—কিন্তু ব্রাহ্মণ হইতে সকলেই আসিয়াছিল, মনিব মহাশয়ের খাদ্যাখাদ্য বিচার নাই জানিয়াও খুব হৈ হট্টগোল হয়, তবু আসিয়াছিল! উচ্চবর্ণের বালকরা একটি বালকের সংস্পর্শ এড়াইয়াছে—যেহেতু সে ডোম, উহারা হাড়িয়াল ডোম।

এই বালকের চেহারায় নিদারুণ দুঃস্থতার ছাপ ছিল, অভাবিত নির্জ্জনতা তদীয় অঙ্গে আছে, এখানকার জংলী বৈচিত্র্যও ছিল এবং তাহার হাতে একটি পাখী ছিল—ফলে সেই বালককে উপস্থিত উচ্চবর্ণের ঘৃণা অন্যদিকে তাহার ইঁহাদের প্রতি মায়া এক অপূর্ব্ব দুঃখ বোধ দিয়াছে, আঃ তাহার দাঁড়াইবার ভঙ্গীও চমকপ্রদ, যাহাতে পশ্চাতের অজস্র মৌসুমী ফুলের চরিত্রকে সে আটকাইয়াছিল। অন্ন নহে, বহুদিনের ঘুমের পুষ্টি তাহার চোখে ছিল। সে একান্তে নিজেই বসিয়াছিল—মনিব পত্নী জিজ্ঞাসিলেন, তুমি এখানে কেন।

সে দাঁড়াইয়া উত্তর দেয়,—আমি ডোম।

মনিব পত্নী তৎক্ষণাৎ আঃ মাধব আঃ ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন।

মনিব মহাশয় কহিলেন—এই ব্যাপারের পঙক্তি ভোজনের তুমি আমি কিছুই করিতে পারিব না! তাহাকে একান্তে খাইতে দেওয়া হয়—মনিবপত্নী পরিবেশন করেন, সে যখন খাইতেছিল তখন তাহার পাখীটিও তাহার পাতেই খাইতে আছে, এই সময় গ্রাম্য বালকদের কলরোল, রন্ধনের গন্ধ, পাখী কুকুরের চেঁচামেচি ছাড়াইয়া উঠে—ইহাতে শাস্ত্রের উদাহরণ দেখিয়া মনিব পত্নী তদীয় পতিকে উহা প্রত্যক্ষ করিতে ডাকিলেন! ঠাকুর আঃ তুমি দেখাইলে! তাহাদের সাধন নির্দ্দেশে প্রত্যেকের পাতা ফেলিয়া দিলেন—মনিব পত্নী ঐ ডোম বালকের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করেন।

মনিব মহাশয় কহেন—না, না, ইহা হইবার নহে, পাখী লইয়া কোথায় যাইবে। ঐ ভীড়ে তুমি ক্ষেপিয়াছ দেখি...।

না, কেন ভীড় তা'তে কি, পাখীটা নিক্ না বাপু, ওর দিদি ত মরে ভূত হয়ে গেছে, সেখানে যে ওটা কার কাছে রেখে যাবে দেখ্-ভালের জন্যে, ফিত্তে কত বেলাই না হবে কে জানে—আর ঐ পাষণ্ড ভগনীপতি লোকটাও ভাল নয়, শুধু বাড়ীতে থাকতেই যা ঐ লোকটা ছোঁড়াকে দেয়, সে'ও পাখীটাকে দেখতে পারে না...আর তা' যে মাগী এখন যারে ওর ভগনীপতি রেখেছে, সে'ও পাখীটাকে দেখলে পরে কাঁইমাই করে, তা' সঙ্গে সঙ্গে মিনষে মুখ পোড়াও ধুয়ো ধরবে খনে... সিদিন নাকি বলেছে বাবুরা চলে যাক্, তুই ফিরে ত আসবি, পাখীটা আর একটু বড় হোক...তখন একদিন খুব মহুয়া তাড়ি মিশিয়ে খাব, খুব বমি করব, বৌকে, মানে মাগীকে, খুব মারব আর পাখীটাকে কেটে, কাঁচা কাঠে ঝল্‌সে খাব...অথচ ও ছোঁড়া রোজ দুপুরে ভাত নিজে কম খেয়ে ওদের জন্যে নিয়ে যায়...হ্যাঁগা পোষা তিতির আবার খায় নাকি...এখন বেচারা...বেচারী ভয়ে কাঁটা...।

সত্যই দুঃখের কথা বটে, তবে ইহা ত অনায়াসেই হইতে পারে...যে সে এখানেতে পাখীটা রাখিয়া যাইতে পারে! এখানেই ত থাকে ও হারামজাদা! ওর পাখী থাকিবে!

ও বাবা এখানে! ঐ মালী বেটা তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, শনিচারোয়া (চাকর), বামুন ঠাকুর সর্ব্বাই ওকে হিংসে করে, বলেছে তুই চলে গেলে পাখীটাকে জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে আসব'খন...সহিস

পর্য্যন্ত, আর আর সবাই বলেছে...!

ইহা কি একটা কথা হইল, ঐ সব কথা মস্করা মাত্র, তাহারা আমাদের ভৃত্য, কখনও সাহস করিবে না...বৃথা চিন্তা করিও না...।

কি যে বল, সে কথা কি আমি বুঝি না, তবে যদি বল কেন, তাহলে বলি...তা' উত্তুর এই, যে, দেবস্থানে গিয়ে ও ছোঁড়া শান্তি পাবে না, হরি কথা শুনতে এসে পুঁই আড়ায় (মাচায়) মন; তাতে পাপ হয়, ও'র ত হবেই আমাদেরও...রিলি মধুর ও...।

দেখ, তুমি দেখি বড়ই মায়াপ্রবণ, তুমি যাহাতে দুঃখ না পাও তাই সুঘরাই ডোম জানা সত্ত্বেও অর্থাৎ ইহা জানিয়াও যে, যদি ঐ হারামজাদা পাপকে কেহ যদি আঘাত দেয়, ছোট করে, তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা দুজনেই মরমে মরিব...ইহা বুঝিয়াও রাজী হই, কোন আপত্তি করি নাই, কিন্তু পাখী কোথায় রহিবে...আচ্ছা পাখীটি গাড়ীতে যদি...।

খেপেছ, গাড়ীতে সে ছোঁড়া রাজি হইবে না...সে শিবগঙ্গার জল ছিটুবে, মন্দির দেখাবে...কত সাধ ওর!

সত্যই তুমি দেখিতেছি, স্নেহে অন্ধ হইলে, আমারে ভুল বুঝিও না, উহাকে মন্দির কি কথা, সে রাস্তায় প্রবেশ করিতে দেয় কি না দেখ, এতদ্ব্যতীত ঐ ঢাউস পর্ব্বতপ্রমাণ পিঞ্জর লইয়া, সেই জনারণ্যে, ভীড়ের চাপে কি খেলার কথা, কোথায় ঘুরিবে...।

অবশ্য যে সে পাখীটিকে লওয়ার জন্য আর পীড়াপীড়ি করে নাই। এখন বুঝিল যে সে ভালই করিয়াছে এবং ইহা ভাবিতেই অচিরাৎ অলৌকিক বিবাহ, মিলন, যাত্রা দেখিল, মুহুর্মুহুঃ আমলকী আদি পুষ্পবৃষ্টিও হয়, জয় ভগবতী তনু জয় জয়, এবং তখনই আচম্বিতে পাহাড় ধ্বসিয়া পড়িল, যে বন্যফল হরিতকী আমলকাদি ছিন্ন হইয়া উৎক্ষিপ্ত হইল, খাঁচাটি হস্তচ্যুত হইল, বিদ্যুতেই পা'য়ের চাপে ভাঙ্গিয়া নয়ছয় নিশ্চিত, পাখীটি থরহরি, বিশেষত মুখোসটির ভৌতিক রীতিবিধি দেখিয়া, এখন মুখোস পরিহিত ভিক্ষুক ও হরিজন ও নেতৃবর্গের পায়ের চাপে সে পাখীটি সরিতেই, পালাইবার পথ পাইত না, আর যে অন্যপক্ষে সুঘরাইও সরিয়া আসিতে বাধ্য হইত, এবং সে ক্ষেত্রে মনিব মহাশয় কি বলিয়া খুঁজিতেন; সুঘরাই কোন কথাই গঠনে সফলকাম হয় না।

ক্রমে ইহাও বিচারিত হয়, যে যদি সে অন্য উপায়ে মোহিলির গাড়ীতে রাখিত যখন সে মোহিলি রিখিয়া প্রত্যাবর্ত্তনে প্রস্তুত তখন পাখীটিকে রাখিয়া আসিত, তাহা হইলে নির্ঘাত বৈকালে রিখিয়ায় পৌঁছিয়া শুনিত, মোহিলি লম্বা লম্বা ঠ্যাং ফেলিয়া চলাফেরা করত, এক অঘটন বর্ণনা করিয়া, পরে শান্ত কণ্ঠে উপসংহারে বলিত, সিটা ভুলাই গেল্ রে। ইহাতে বনস্পতি অসুখী হইতেন, এবং বরং বারবার ইহাই তদ্দ্বারা অনুমিত হইল যে পাখীটি হাতে থাকিলে মহারাষ্ট্রীয় তীর্থযাত্রিণীদের অঞ্চলে অঞ্চল যেরূপ বাঁধা, সেইরূপ এই বন্ধনের ছবিত্বটি, তত্ত্বটি যাহা তাহাদের, তাহার ও মনিবদের মধ্যে অলক্ষ্যে জাগিয়া থাকিত, এমন যে আঁধি উঠিলেও সূর্য্য ডুবিলেও তাহা কভু ভ্রান্ত হইবার নহে!

এই সময় কোন পাণ্ডাঠাকুরকে, বগলে যাহার খেরোর খাতা, যে যাহাকে এক যাত্রীর পশ্চাদ্ভাবনে মহা উত্ত্যক্ত করিতে দেখিল, এবং অন্যত্রে ইহা, যে আর একজন পাণ্ডাঠাকুর স্বীয় বাম উরুদেশ উপরে ঐরূপ এক খেরোর খাতা খুলিয়া ছড়া-পড়া সুরে এক যাত্রীবর্গের বহুপূর্ব্বতন পুরুষের নাম সাকিম শাখাপ্রশাখার নাম ইত্যাদি পাঠ করিতেছে, শ্রোতৃবর্গ সকলে একে অন্যের মুখ অবলোকনে অদ্ভুত গৌরবান্বিত, তাহারা সকলেই প্রীত, যে তাহারা বহুদিন এই পৃথিবীতে বসবাস করিতেছে, তাহাদের বংশধারায় সময়ের অবাক ঐশ্বর্য্য, সৌরমণ্ডলের প্রতিটি নক্ষত্র তাহাদের চিনিতে পারে, তাহারা কুসুমের জন্ম দেখিয়াছে, নদী যখন প্রথম ধাবমানা হইল সে কথাও মনে পড়ে, তাহাদের পরিচয় অতীব মহান, অত্যন্ত সুন্দর।

শ্রোতা সমুদয়ের মুখ নিরীক্ষণে সুঘরাই সনিষ্ঠ হইতেই এক চমৎকার ক্ষুরের আওয়াজ শুনিতে পাইল এবং যে, হায় তাহাদের পাণ্ডা হয় না এমত খেদ তাহাতে আসিয়াছে, এবং তৎক্ষণাৎই ইহাও যে দুঃখের কিছু নাই এরূপ তাহাতে দৃঢ়তা দেখা দিল; এ কারণ যে তাহার পাখী আছে যাহাই তাহার নিজস্ব, তাহাই বংশধারা, সে'ও শ্রোতাদের মতই, যাহারা মধ্যে মধ্যে মহা শূন্যতায় আপনাদের ধারা

দেখে, তেমনই সেও যেন পাখীটিরে লক্ষ্য করিল যে এবং তখনই দেখিল পথপার্শ্বে কোন মাতা সন্তানকে স্তন্যদান করিতেছে।

সুঘরাই এখন বুঝিল সে ক্লান্ত; একদিকে রিখিয়ার রাস্তা অন্যদিকে এই ধর্ম্ম উদ্দাম শহর তাহারে যেমন চাপিয়া ধরিয়াছে, দক্ষিণ দিক ধরিয়া মীনাবাজারের দিকে বা ইস্টিশানের দিকে যাওনের ভরসা কখনই পায় নাই, যেহেতু তবু এদিকে গাছপালা, তবু এদিকে ঝিঁঝিঁর শব্দ, ইহারা তাহার বড় জানাশুনা, বেশী করিয়া হারাইবার সম্ভাবনা এখানে নাই, আর কারণ যে এই পথেই মনিবদের রিখিয়ায় ফিরিতে হইবে; যে অনবরত মাথা ঘুরাইয়া দৃষ্টি ফিরাইতে তদীয় ঘাড়ে ব্যথা, এতক্ষণ এই পথে ডাক্তারবাবুর গাড়ী ব্যতীত অন্য ভাড়াটে গাড়ীও যায় নাই; এদিকে ক্রমে বেলা পড়িয়া আসিতেছে, ইদানীন্তন পাখী ব্যাপারে সমাধান সত্য, তবু অন্তঃস্থল ঝিম, হাতে ঘাম হইয়াছিল।

সে ধীরে চলিতে থাকিল, যে সে তির্য্যকভাবে একদল দুর্বৃত্ত পদবাচ্য যুবকদের দেখিল, ইহারা মলিন বস্ত্র পরিহিত, ইহাদের রাশিকৃত চুলে তেল নাই, এখন ইহাদের হাতে হাতে তাস, যে ইহারা জুয়া খেলিতেছে। নিশ্চয়ই মনিব মহাশয় এখানে আসেন, ইহাদের প্রতি তিনি যারপরনাই ঘৃণাভরে তাকাইলেন, যে ছিঃ এহেন শ্রীসম্পন্ন শহরে যেখানে শিব নিজে বর্ত্তমান, যেখানে সেদিন গতবছর (১৯৩৪) ভূমিকম্পে যাহার ক্ষতিসাধন করিতে পারে নাই, এই স্থানের সব কিছু শিব, তোমরা কেন সেই পুণ্যকে পরিহাস কর!—এই মনোভাব এই জন্য যে ইহারা কেহ তাস ফেলিতে সময়ে শিব জয়ধ্বনি দিয়াছিল।

তত্রাচ তিনি কিন্তু যেহেতু আপন দায়ে বাধ্য; তাই উহাদের অতিশয় নম্রভাবে, ইস কি লজ্জা! জিজ্ঞাসিলেন,—ভাই যে ছেলেটি তোমাদের তাস খেলা দেখিতে আগ্রহশীল হয়, এ কারণ যে সে মনস্থ করে যে, তাহার ভাগ্য যাহা ইতঃপূর্ব্বে গণৎকারকে সে প্রশ্ন করিতে পারে নাই, এখন তাহার অভীষ্ট কল্পিত দান দর্শনে, যাহা নিশ্চয়ই তোমাদের কেহ ফেলিবে, তাহাতে স্থিরীকৃত হইবে।

সে জানে না এইভাবে সময়ক্ষেপ হয়, সম্ভাব্যের খেলার মধ্যে নিয়ত ঋতুপরিবর্ত্তনের আঙ্গিক—চরিত্র রূপ আরোপ করা বৃথা, যখন সে বুঝিবে তখন সে তেজেই ক্রোধপরায়ণ হইবেই, যেমন স্বীয় যুক্তি খণ্ডিত হইলে, যেমন আশা ভগ্ন হইলে, যেমন মানুষ বিকারপ্রাপ্ত হয়! তোমরা তাহাকে বলিলে, তোমাকে কি দারোগাবাবু পাঠাইয়াছে।

সে, সুঘরাই, উত্তর দিয়াছে, তাহা নহে, ঐ যে তোমাদের পিছনে যে ঢাকী ঢাক আঁকড়াইয়া ঘুমাইতেছে, তাহার ঘুম ভাঙ্গিলে, মনে হয় কিছুক্ষণের মধ্যেই ভাঙ্গিবে, কেন না উহার পায়ের ঘুঙুর ইতস্তত নড়িতে আছে, ঘুম ভাঙ্গিলে জিজ্ঞাসিব যে, বিসরিয়ার বাপ যে ডোম এবং ঢাকী, নিবাস রিখিয়ায়, যে নিত্য এখানে আসে তাহারে দেখিয়াছে কি না। ইতিপূর্ব্বে কর্ম্মব্যস্ত ঢাকীরা কেহ বলিয়াছে জানি না।

তোমরা কহিলে, উহার, সেই ঢাকীর এখন জাগিবার সম্ভাবনা নাই, আমরা জানি, সে অহিফেন সহযোগে মদ্যপান করিয়াছে। ইহার পর তোমাদের একজন ঘুমন্তর নাসিকার নিকট উৎকট চরসের ধোঁয়া ছাড়িলে তাহার পর বালকের উদ্দেশে কূট মুখ খারাপ করিলে—বালক যেন তোমাদের স্বরে আপন চীৎকারের আওয়াজ পাইল, সে তাই মাথা ঘুরাইয়া আত্মরক্ষা করে যেমন, বলিতে পার সে কোনদিকে গেল।

আঃ বেচারী মনিব মহাশয়!

তেমনই ম্যাজিকওয়ালাকেও একটি বালককে দর্শাইয়া নিবেদন তিনি করিয়াছেন,—এইরূপ একটি বালক ক্রমাগত বলদ চোখে অনেকক্ষণ ধরিয়া তোমার নৈপুণ্যে একদম নিঃসাড় জড়; এমনও যে, যে সে হারাইয়াছে তাহা সে ভুলিয়াছে; অবশ্য যখন মাঝে মধ্যে সম্বিৎ আসে, সে তোমায় সিদ্ধ মহাপুরুষ জ্ঞান করিতেছিল, অগোচরে সে'ও অলৌকিকতাকামী; যে এবং তুমি তাহারে তোমার কোন বিশেষ ছল—হাতসাফাই, প্রদর্শন জন্য দর্শক সাধারণের মধ্যে তাহারে মনোনীত করত আহ্বান করিতেই, বালক ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠে। তুমি অভয়দানে কহিলে,—আরে ডরো মৎ, ডর কেয়া। ডর এই যে, প্রথমত তাহা গ্রাম্যভীরুতা, এবং যে চিরতরে নূতন করিয়া সে হারাইতে চাহে নাই, সে কান্দিতেছে কেন না এখানকার সমবেতকণ্ঠে, তদীয় কান্নায়, হাস্যরোলের মধ্যে শুনে যে,—যাও এখনই ভেড়া হইয়া যাইবে। বালকরা পুনর্ব্বার যোগ দিয়াছে,—যাও না উহাতে ঐ মাথায়, স্থাপিত কঙ্কালটিতে মিলাইয়া

যাইবে। এই বলিয়া সকলেই ভূমি উপরে রক্ষিত চমকপ্রদ করোটি কঙ্কালের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়াছে। আর যে সে বোমকান চোখে, সেই করোটি কঙ্কালের পানে লক্ষ্য করে, প্রত্যক্ষ করে যে তাহার ঘরপথ সকল, সে নহে, বোকার মত উহাতে ক্রমান্বয়ে ঢুকিয়া যাইতে আছে। যে এবং ব্যাকুলভাবে কান্দিতে ব্যক্ত করিল যে,—সে বড় হতভাগ্য, সে দুঃখী, সে মনিব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে।

কিন্তু ইহার পূর্ব্বাহ্ণে মানে এই খেলা দেখার আগে—যে সে বনপ্রদেশে একদা হঠাৎ আতা ফল দর্শনে যেমন চিনিয়া লইতে অপারগ হয় এখন তেমনই তাহার ভাবান্তর, যে সে হারাইয়াছে কি না ইহাও বিস্মৃত; কিন্তু এখন সে হারাইয়াছে; তাহার কথা শুনিয়া সমবেত ভীড় হাসিয়া উঠে; যে সে খুসী, সে খুসী।

হে ম্যাজিকওয়ালা,—তুমি তাহারে অব্যাহতি দিলেও সে কোনক্রমে তোমারই পাশ বরাবর আসিয়া দণ্ডায়মান থাকে, এখানে সে ঐ পূর্ব্বদৃষ্ট সন্ন্যাসীর মতই নিশ্চিন্ত, ইহার আসল কারণ এই যে, আমি তাহার মনিব, তাহার খোঁজে আছি, এখানে যদি আসি, স্বভাবত আমি ঐ নরকপাল হেরিয়া কি খেলা চলে তাই ধারণার নিমিত্তই, তোমা পানে তাকাইব ইহাই মানুষের প্রকৃতি মানুষের চরিত্র, হৃত বস্তু সম্পর্কে নূতন করিয়া অবহিত হইব আর যে তাহাকে দেখিতে পাইব। সে অনেক সময় যাবৎ ঐ ভাবে ছিল, যেহেতুও সেখানে সম্ভবত হাড়ের খানিক ছিল। কখন সে চিন্তার রহস্য ছাড়াইয়া—বদ্ধজীব ডোম।

ইহা এক গূঢ় কারণেই যে সে এই পরিবেশ ত্যাগ করিতে চাহে নাই। তোমার বাঁশীতে তাহার মন ছিল না, সে শুধু এই স্থলকে কব্জা করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, কেননা কিছুক্ষণ আগে তাহাতে কোন প্রকারের, ইহার সর্ব্বথা উৎকট, কীদৃশী কুটিল, অভিনব অমানুষিক বিভীষিকার সঞ্চার হইয়াছিল।

এবং ইহা তৎকালেই ঘটিল, যে মুহূর্ত্তে সে আমাদের প্রমত্ত হইয়া অন্বেষণের মধ্যে অবলীলাক্রমে, ঐ সুসাজান পানের দোকানের সৌখীন উৎকৃষ্ট আয়নাতে এক মায়াবী প্রতিফলন সাক্ষাতে নিশ্চল, যে সে ব্যামোহাবিষ্ট, যে সে পূর্ণ সম্মোহিত হইয়া থাকে; অবশ্য খানিক বাদেই এবার তাহার হৃৎপিণ্ড কাঁপিল, এবার তাহার তালু শুষ্ক হইল এবং যে সে পদমেকে পশ্চাতে হটিল।

যে, আয়নাতে যে সে-ই, নিজেই, যে যাহাকে সুঘরাই নামে ডাকিলে সাড়া দেয়, যে জাতিতে হয় ডোম, গোত্র যাহাদের নাই, অতীব স্বাভাবিকভাবে প্রাকৃতিকভাবে সে হয় ডোম, যাহার দৈবাৎস্পর্শে পূজার্থিণী গরদ পরিহিতা করুণাময়ী সর্ব্বদা স্নেহশীলা মনিব পত্নীশিহরিত, জয়দেব পাঠ স্তব্ধ, হস্ত হইতে পুষ্প সাজিচ্যুৎ হয়, পুনরপি তিনি স্নান করেন—এই তিলেক পরিচয়ে অবধি লিখিত নাই সে বিজাতীয় ঘৃণা হইতেও বঞ্চিত হইয়াছে—আর উচ্চবর্ণের ঘৃণা যাহা তাহার জীবনই যে, যাহার পিতা নাই, মাতা নাই, ভ্রাতা ভগ্নী নাই, পত্নী নাই—যে যাহার মহান-হৃদয় মনিবরা আছেন; যে যাহাদের সমভিব্যাহারে এখানে আসিয়াছে; যে সে অধুনা হারাইয়া গিয়াছে; কিন্তু কিছুই বিশদ হইল না।

যে সে-আয়নাতে নেহারিল মাত্র যে এক ভূমিকর্ষণকৃত জমি, পূর্ব্ব ফসলের গোড়া পর্য্যন্ত যেখানে নাই, এইবার খর অকর্ষিত জমি মতন রঙের কাহাকে কোন অবয়বকে দেখিল, আশ্চর্য্য যে সে জল চাহিতেছে,—ইহাতে সুঘরাই ঢোক গিলিল,—জল!

জল ত দান করা হইয়াছে—জল পিতৃলোকে গিয়াছে! কিন্তু সে এতই তৃষ্ণার্ত্ত—তৃষ্ণার্ত্ত না ভীত—আয়নায় প্রতিভাত মূর্ত্তি দেখা গেল ঢোক গিলিল, ইহাই তাহার পূর্ব্বপুরুষ; যে উহা কাহার প্রতিবিম্ব, ঈদৃশ প্রশ্নে সে বিস্ফারিতনেত্রে প্রৌঢ়শীলা সদৃশ; এমনও সুতরাং ফলে মানে, অর্থাৎ, যে উহা আমিই ত, এহেন বাক্য নিশ্চয়াত্মক করিতে, বাস্তবিক করিতে, যে, স্বভাবত লোকে নিজ বক্ষে হস্ত স্থাপনে, অথবা এক্ষেত্রে অঙ্গুলি দ্বারা যেমন নির্দিষ্ট নিজেকে করে তেমনই এখন তাহার, সুঘরাই এর, সেই বৃত্তির অভাব থাকে; আরও যে, 'উহা' এই শব্দ ব্যবহার করিতে আপনকার অজ্ঞাতেই সে মূঢ়মতি—আর যে ইহা অবিশ্বাস্য নহে। সম্মুখে তাহার শনৈঃ সংজ্ঞাবিধ্বংসী নিঃশব্দ!

চেঞ্জাররা যে কোন তুচ্ছ কিছু নিরখিয়া কহিল—ভাবা যায় না কি গ্র্যাণ্ড! ইহারা তাহারা যাহারা স্বপ্নের ভার বহে! যাহারা স্থাবরকে সংবেদনশীলতা দিয়াছে।

ইতঃমধ্যে সুঘরাই আপনার পিছনে তাকাইল, সেখানে কেহ নাই, সেখানে ধূলা উড়ে, সেখানে পাতা বিদ্যমান; তখনই সে সভয়ে নেত্রপাত করিল, অদূরে বিভিন্ন তিলকধারী লোকেরা একের পর এক সাধক যায় ও আসে, ইহাদের দর্শনেই বুঝা যায় যে কে কোন সম্প্রদায়ভুক্ত, সে অবাক নয়নে তিলকমণ্ডিত

ললাট লক্ষ্য করিল, এমনভাবে করে যাহাতে বুঝায়—যে তাহার আক্ষেপ হইল, যে সে তিলক পাঠে অপরিজ্ঞাত, ইহা ঠিক যে বিবিধকণ্ঠের জয়ধ্বনি তাহাকে এখন চালিত করিল এবং আবার সে আয়নায়, ইদানীং সে নিজ হাতের উল্কীকৃত নীলাভ ডাং-উদ্ধত কিদিম কাঠকোম-টি ভারী অঝাপসা দেখিল; এখনও উল্কী বিধায়ে তদীয় হাত কিঞ্চিৎ ফুলো, কেননা ঐ বিছা উল্কী দুই হাটবার আগে, হাটেতেই করান হয়; ইহা তাহা স্মরণেই আঁকান যে, ঠিক সেদিনই সকালবেলা তাহার তিতির, তাহার ভগ্নীপতির গায়ের প্রায় এক আঙুল নিকটে উপস্থিত এক কাঁকড়া-বিছাকে পড়িমরি করিয়া দৌড়াইয়া আসিয়া ঠোঁটে ধরিয়া লইয়া ঠুকিয়া তৎক্ষণাৎ খাইল।

আর যে ইহা দর্শনে গর্ব্বিত সুঘরাই উল্কীকরণের সঙ্কল্প করে: যে একটি তিতির ও তাহার ঠোঁটে একটি বিছা! কিন্তু দুইটির খরচা ছ' পয়সা, আপাতত অগত্যা শুধু বিছাতেই সন্তুষ্ট থাকে; তিতির সে আঁকাইবেই, আঃ! তাহার চঞ্চুপুট দ্বারা বিছা আক্রমণ, আঃ তাহার পক্ষদ্বয় কি মনোহর প্রসারিত হয়, আঃ! যেমন তাহা অনাদিকাল যাবৎ অমনই অফুরন্ত পক্ষ মেলিয়া আছে!

এখন আয়নাতে সে ওতপ্রোত, এবং বিছা উল্কী সত্ত্বেও এখনও কিম্ভূত সন্দেহ তাহাতে বর্ত্তমান; যে সে কিছুতেই কোন উপায় ঠাওরেও সে চিনিতে পারে না ঐ প্রতিবিম্বকে; কেবলই আরবার আপনকার নিরীহতা, ইন্‌নোস্যান্সএ ভ্রূ সটান করে। আবার অন্যপক্ষে নিজেকে নিশ্চয়ই 'উহাই' শব্দে অভিহিত করিতে, সনাক্ত করিতে, সে নিজে ভীতিপ্রদ প্রহেলিকা।

কি হেঁয়ালীপূর্ণ আবছায়া! অঙ্গভঙ্গী মুখবিকৃতির প্রয়াস সবই বিদ্রূপাত্মক অন্ধকারে পরিণত; ক্রমে ইহা তাহার মনে পড়ে মানে অস্বস্তি হয়, যাহা এই যে, তাহার কেহই, এমনও যে তাহাদের জাতের মোড়ল, এমনও যে অনেক—তাহাদের অপেক্ষা উচ্চবর্ণের, যাহা এই জল-চল জাতের লোক যেমন আপন বয়ঃক্রম জানে না, ঠিক তেমনই, তেমন সেও যেমন নিজ বয়স জানে না, তেমনই নিশ্চয়ই সে'ও আপনার চেহারাবিষয় কিছুই জ্ঞাত নহে, যে চেহারা কুয়োর ঘাট-জলে প্রতিবিম্ব, আর অন্যসূত্র হইতে তাহার শোনা—দেখা নহে!

সুঘরাই এর মনে হইল, সে যেমত ভাসিয়া আছে, তাহার দেহ নাই, মৃত্তিকা নাই, এবং হঠাৎ সে আপনার বিছা-আঁকা হাত আঘ্রাণিল; যুগপৎ দেখিল ঐখানে, আয়নাতে যে উহা, যে সে সে-ই, যে হারাইয়াছে, ইতিমধ্যে একদা যে মনে হয় আমার চেহারা নাই, তবে আমি হারাইব কেমন—এবম্বিধ ধারণা সর্ব্বৈব বলদ!

আমি উহা, আমিই উহা এবং ইত্যাকার বলিতে ও ভূমিতে পা-বাজাইয়া কবুল করিতে, সবিশেষ আত্মপ্রত্যয়-নিবন্ধন সে মরিয়া হইল; আমি ও উহা যে অলৌকিক বিবাহযাত্রা আমি দেখিয়াছি, সেই চৈতন্য সত্তা তাহার জড়তা ভাঙ্গিল; ইতিমধ্যের ঘোর ব্যবধানকে সে পান করিল, সে ইহাতে বেসামাল হইল; সহসা শ্রুত হইল যে সে, সাদরে 'আতিতি-তি' শব্দে উহাকে তথা আপনাকে ডাকে; আবার আচম্বিতে ঘোষিয়া উঠিল,—আমি সেই যাহার এক পাখী আছে। ইহার সঙ্গেই জয় বাবা বৈদ্যনাথ ধ্বনি তুলিতে চাহিলেও বেচারা পারে না। যে এবং ধীরে কহিল,—উহা সেই আমি যাহার এক পাখী আছে। অথচ স্বরে কেন যেন মনে হয় পাখীটি বেহাত হইল।

তৎকালে পানের দোকান হইতে, হে ম্যাজিকওয়ালা তোমার ডম্বরু ও বাঁশী শ্রবণে সেই উচ্চবর্ণের ভাবনার দ্বন্দ্বের ছেদ পড়িল। ম্যাজিকওয়ালাই তাহার উত্তর। সঠিকভাবে বলিতে গেলে বলা যায় যে সে যেন বাঁচিল; ভাগ্যশঃ সে বালক, তাই তোমার ম্যাজিক দর্শন জন্য ঔৎসুক্য-পরতন্ত্র দৌড়াইয়া আসিতে এক নিমেষ ত্রিকূট পাহাড় তাহার চোখে পড়িল; তোমার এখানে সে অব্যাহতি লাভের পর একদিকে বড় স্বস্তি বড় স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে, তেমনই তোমার নৈপুণ্য দেখিতে তাহার মনে হয়, হায় মনিব মহাশয় ও তদীয় পত্নীর কত জিনিষ খোয়া যাইতে সে নিজে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া বাহির করে, আর অদ্য সে নিজেই হারাইয়া গেল!

এবং লকড়কে সে যথেচ্ছা গালাগাল দিল; তাই সে ক্রমে পুনরায় বিমর্ষ এবং তজ্জন্যই তুমি যখন খেলা দেখানোর পর মহাচাতুরিতে নর-কপালটি স্বীয় মুখের সন্নিকটে উন্নীত করত, তোমার বিড়ির ধোঁয়া, যাহা নীল, ঐ নর কপালের ছিদ্র দিয়া বালখিল্যতাবশত পাচার করাও, ফলে, কপালের করাল দন্ত বহিয়া ধূম অনর্গল বহির্গত হয়, ইহা প্রত্যক্ষেও সে অন্যান্য সবস্ত্র ও উলঙ্গ বালক বালিকাদের মত

হাসে নাই, সে কোন দিকে গেল জান। সে ম্যাজিকের কৌশল হইতে, জট হইতে, ক্রমশঃ খুলিয়া সহজ হইয়াছিল।

ইহা ধ্রুব বটে যে, আপনারে সনাক্তকরণে অকৃতকার্য্য হওয়াতে এবং যে আমার একটি পাখী আছে—এখন, উপস্থিত যাহা নাই ইহা ভাবিতে সে অধিকন্তু মুষড়াইয়া পড়িল, যেমত সে দ্বিগুণ হারাইয়া গিয়াছে; তাহাতে বিজাতীয় আক্রোশের ধমক উদ্গত হইতে চাহিল, সে দুর্বৃত্ত যেমন, কাহার উপর যে রুষ্ট সে ইহা বুঝিতে চাহে নাই; এমনও যে এখানে সেখানের মোটা নিম ডাল দিয়া পাথরে সিদ্ধি পেশাই করা দর্শনে প্রলুব্ধ হওয়ত, প্রসাদের নিমিত্ত কিয়ৎ দূরে দাঁড়াইতে সম্প্রতি কোন সুমধুর পাঠের আওয়াজে সে আকৃষ্ট হইল; এবার পাঠ বন্ধ হইয়া গীত হয়, যথা—

তুলসী উহাঁ যাইয়ে যাঁহা আদর ন করে কোই।
মান ঘটে মন মরে রাম কো শরণ হোই ॥

আসমুদ্রহিমাচলে যে যেখানে রোমাঞ্চিত হইল, তাহার এই শুদ্ধ গীতের শব্দতরঙ্গই কারণ; এখানে অনেকের পুলকাশ্রুতে নয়নযুগ সজল, অনবরত রামনামে স্থান সুন্দর হইয়া উঠে; ইহাতে সুঘরাই বুঝে যে সম্মুখে রামায়ণ গান হইতেছে, কিন্তু তদীয় মানসিকতা অত্রাহি সত্ত্বে সে স্থান পরিত্যাগ করে নাই, প্রথমত সে মর্ম্মে মর্ম্মে জানে, যে তাহার সন্ধানের মধ্যে দেবালয়, সন্ন্যাসী, অবধূত, গীতা বা রামায়ণ পাঠ আমাকে চুম্বকের মতনই টানিবে, যেহেতু আমি ও মদীয় পত্নী অতীব ধর্ম্মপরায়ণ, যদিও জানি সে নীচকুলোদ্ভব এবং এই ব্রণবিরহিত পবিত্র রামকথা যাহা মোক্ষ ও প্রীতিদায়িকা, তন্নিমিত্ত অবশ্য তাহার কোনই মতি নাই,—উহার বয়ঃক্রম ইহার কোন হেতুই নহে,—তবু তাই সে কিছুকাল বাধ্য হইয়া যাপন করিবে; এখন উক্ত গীতে সে আলোড়িত বিশেষত কথকের বিন্যাসই তাহার অনুপ্রেরণা হইয়াছে।

কথক ঠাকুর বলিয়াছিলেন, রে পাগল মন, ওরে তুলসী তুই ছায়া ত্যাগ করে রৌদ্রে যা; তুমি ভুজালিঙ্গন ছাড়িও, এমন স্থানে যাইও যেখানে অহঙ্কার অহরহ দলিত হয়, যেখানে তোমায় উচ্ছিষ্ট দেয়, লোকে দূরদূর করে, আগুনটুকু চাহিলে হাঁ হাঁ শব্দে তাড়না করে, কাহারও প্রজ্জ্বলিত দীপ হইতে দীপ জ্বালিতে যাইলে সে ভাবে আমি সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি—সেখানে মন যাও, যেখানে মরমে তুমি ম'র, তোমার কেহ নাই, পরিজন নাই, তুমি একা সম্পূর্ণ তুমি যখন আপন বোঝা তখনই যখন ঠিক ঠিক দুঃখ পাইবে; তখনই রাম স্মরণ হইবে, অবশ্য এই অনুভবের মধ্যেও আমি আছে; তবে, এই আমি'র দোষ নাই, সেই আমি'তে রাম নাম স্মরণ হইবে। তেমন দুঃখের মধ্যে তেমন দুর্ভাগ্যের মধ্যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হওয়ত হে মানুষ তুমি যাইও। রামের কথা স্মরণ হইবে। হায় রাম বলিতে পারিবে।

যথা ভূমি সব বীজময় নখত নিবাস আকাশ।
তথা রাম নাম সব ধরমময় জানত হি তুলসী দাস ॥

সুঘরাই এই গীতে ডোমসুলভ চোখে, বালক-উচিত ভ্রূভঙ্গীতে গায়কদের মুখপানে চাহিয়া থাকে, ইহা অলোকসামান্য কাব্য, কাব্যত্ব ইহা তাহার নির্ব্বুদ্ধিতা বশত সরলতায়ে নহে, তবু সে অন্যমনে দেখে। সরলতা যাহা ভক্তির বীজ, অবশ্য কোন শিশুরই সরলতা নাই, তাহার অপরিণত স্বভাব আছে, সরলতা সন্ন্যাসধর্ম্মের, সরলতা সন্ন্যাসীর, অবতারাদির ভাবই সরলতা—ঐ সুর উঠা পড়া দার্ভঙ্কুর রোমন্থনকারী মৃগশিশুর ন্যায় ক্রমে এখন দেখিতে লাগিল।

অবশ্য সে ডোমপুত্র, গীত শুনিতে ডিগরিয়ার পাহাড়, যেখানে সূর্য্য ডুবে তদবধি শঙ্খচিল যেখানে বিন্দুবৎ, পদ্মের কোরক যে পর্য্যন্ত গিয়া কুৎসিত, তদবধি 'ভূমিতে' পরিবর্ত্তিত হইতে পারিল না, হায়! আমি ভূমি, বলিতে বিবেক তাহার হয় নাই; অন্যপক্ষে অবশ্য, আকাশ কথাতে, তদীয় শরীরমধ্যে বিপরীত পাকে, কি এক কিছু যেমন বা ঘুরিতে থাকে, কিন্তু ঐ প্রক্রিয়া অভাবনীয় ধীরে; সে অবশ্যই মশাল তৈয়ারী করে যদ্দ্বারা আকাশকে দেখিবে, যে সে তখনই নিজেরে ঐরূপ কর্ম্মে ব্যাপৃত অবস্থা বুঝিয়া ধড়েতে আর ছিল না, তাহার ওষ্ঠ শুষ্ক হইয়াছে, কেননা মধ্যে কোথাও, এই ব্যোমের, মেঘাশ্রয় নাই,—ক্রমান্বয় সন্ন্যাসীর দৃষ্টিতে নিশ্চিহ্ন হইয়াছে যাহা।

হায় সে ঐ পদবন্ধের 'যথা'র নিয়ন্ত্রিত, আনীত বাস্তবতায় আতান্তরে তাহাকে নিক্ষেপ করিল, সে

গণৎকারের গলা যেন পাইল, যে এবং ইহাতে আরও মূঢ় সে হয়; তবু কোনওক্রমে কথকঠাকুরের দিকে দৃষ্টিপাত করিল।

ইনি বলিতেছিলেন, রাম নামে আঁখি ঝুরে...! এই সূত্রে, যদিও ঐ উপদেশ-ইঙ্গিত চমৎকার।

তবু বলি একদা, আমার পরমারাধ্য মাধব আমায় বলিয়াছেন, 'ভগবানের নামে, আমার নামে শিশু গাত্রগন্ধ যে না পায়, সে আমারে পায় না' আঃ শিশু গাত্রগন্ধই রাম!

কথকঠাকুর এমনভাবে, রাম উচ্চারণ করেন যেন চিরঞ্জীব হনুমানের চোখে জল আসিল।

ঐরূপ রাম উচ্চারণে যে সুঘারইএর অদ্ভুত রোমহর্ষাদি লক্ষণসমূহ উপস্থিত হইলেও, ওষ্ঠ এখন আর্দ্র হইলেও, কোথাও যেমত বা আড়ষ্টতা জড়তা সঙ্কোচ জাড্য কুণ্ঠা অপ্রতিভতা, মেদাটে বৈলক্ষণ্য আছিল, এবার হঠাৎ সে ক্ষোভে অনুতাপে ক্ষিপ্ত, কেননা নেতৃবর্গশিক্ষিত কীদৃশী কদর্য্য, কি পর্য্যন্ত প্রমত্ত হিংসাপ্রযুক্ত, জগতের-নীচতম-বৃত্তি সেই রাজনৈতিক রোলে তাহারই সুঘরাই স্বজাতিবৃন্দ বেচারী হরিজনরা, এহেন সুন্দর রাম নাম মধ্যে মধ্যে করে, তাহাদের সেই চীৎকারের সহিত তাহাদের উৎকট গাত্রগন্ধ স্থানকে অপবিত্র করে।

এবং সে হঠাৎ 'আমি ডোম' 'আমি ডোম' ইত্যাকার অনার্য্য চীৎকারে—এখান হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়, এইকথা মনে পড়িতে 'আমি ডোম' 'আমি ডোম' বলিতে ইহাই ধর্ম্মত অর্থাৎ ব্যক্ত হয় যে মনুগণের পূর্ব্বে বহুকাল হইতে আমি হারাইয়াছি!—তাহার পশ্চাতে সঙ্গে সঙ্গে রাম নাম নিশ্চিত গিয়াছিল। এবং মনিব মহাশয় যে ব্যক্তির নিকট সংবাদ লইতে এতেক বর্ণনা করেন, তাহাকে সুঘরাই বিষয়ে আরও প্রশ্ন করিলেন—এবং তৎসহ তাহার অন্তরে প্রার্থনা শ্রুত হইল, যে, হায় ঠাকুর তুমি অন্তর্য্যামী তুমি তাহার শুভাশুভ সবই জান, তবু..।

অনন্তর তিনি, মনিব মহাশয়, যারপরনাই অবসন্নচিত্তে, পরিশ্রান্ত হওয়ত শিবগঙ্গার ধারে আসিলেন. এখানে তাঁহার গায়ে আর্দ্র মসৃণ বাতাস কিয়দংশে তাঁহার শ্রান্তির অপনোদন করিল, দেখিলেন উদ্বেলিত জলস্তর, অদূরে জনৈকা লোলচর্ম্মাঙ্গিণী অশীতিপর বৃদ্ধা, দেহ যাহার ন্যুব্জ, এখন জলে রহিয়া মুখ প্রক্ষালনে নিয়োজিতা, যে এবং তজ্জন্য তদীয় বিশুষ্ক কদাকার প্রলম্বিত নির্ব্বাপিত স্তনদ্বয় জল-ছোঁয়া. সুতরাং জলস্তরে ভাসমান ফুল ও পাপড়ি যাবতীয় উহাতে আসিয়া লাগিয়া ঠেকিয়া সরিয়া আঘাতিয়া বিলি কাটে, অতএব এতাদৃশ সমাপতন, যদ্যপি এলেবেলে, বড়ই কৌতুকপ্রদ, স্রেফ ফাজিল।

ইহা প্রত্যক্ষেও যে তিনি কোনই মজা আহরণ করেন না, এ কারণ যে সদাই তাঁহার মনে ইহা আঁচড়াইতে আছিল, 'পুষ্পদন্তের' শ্লোক আমার কণ্ঠস্থ করা বৃথা, কোথায় শিবই মদীয় অদ্বিতীয় স্মরণ মননের বিষয়ভূত হইবেন, না, কোথায় আমি ডোমপুত্র সুঘরাইএর সন্ধান করিয়া ফিরিতেছি। এই কি আমার নিয়তি।

মনিব মহাশয় ইদানীন্তন বৈচিত্র্যপরতন্ত্র সর্ব্বত্র শ্যেনদৃষ্টিতে বিশ্লেষিত করিতে এক মহা আনন্দময় অগ্নিতুল্য দেদীপ্যমান যোগীকে দেখিলেন, দর্শনমাত্রই বিশ্বাস ইনি মহাপুরুষ, ইনি যে পরমহংস তাহাও নিশ্চয়, কেননা ঠাকুর রামকৃষ্ণ ইহাদের লক্ষণের কথা বলিয়াছেন; সেই মহাপুরুষের নিকট বেশ কিছু সবস্ত্র ও প্রায়ই উলঙ্গ বালক বালিকা; যাহাদের তিনি নিশ্চয়ই তদীয় সুদীর্ঘ ধীরনেত্র মেলিয়া একদৃষ্টে দর্শনে আপনাতে বালকস্বভাবে আরোপ করিতেছিলেন, এবং মধ্যে মধ্যে মেওয়া মিছরি বিলাইতেছিলেন; তিনি নবাগত দেখিলেই,—ওঁ তৎ সৎ, এস এস আমার সমক্ষে দাঁড়াও, তোমারে আমি নয়ন ভরিয়া দেখি, খেলা কর, কথা বল, আমি শুনি, ওঁ তৎ সৎ।

মনিব মহাশয় সাষ্টাঙ্গে প্রণামের পর নিবেদন করিলেন,—ভগবান, আপনি করুণাময় ক্ষমাশীল, আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন, যেহেতু আপনি বালকবালিকারে সাধন আদর্শ বলিয়া মান্য করেন, জ্ঞান করেন ও তদ্দ্বারা অদ্ভুত সরলতা নির্ম্মাণ ও তদ্দ্বারা, ঐ সরলতার দ্বারা, অদ্ভুত রজ্জু নির্ম্মাণ করেন, তাই নির্ভয়ে আপনারে জিজ্ঞাসা করি, এক বালক—এই পর্য্যন্ত বলিতেই সেই মহাপুরুষ, মৃদু হাস্যে, ইহাতে সৃষ্টিতত্ত্ব যেন নড়িয়া উঠিল, কাব্যবৃত্তি বিকচ হইল এবং কহিলেন যে,—সে কাছে আসে নাই, প্রত্যেক বালকবালিকা তাহারে অভয় দেয় তবু,—আহা আমি তাহা দেখিয়াছি এক বালক যখন আর এক'কে অভয় দেয়—সে এক বলিহারি ছবি!...

তিনি সহাস্য বদনে আরও বলিলেন সম্ভবত এত ছোটদের মধ্যে যাহারা মাথায় ছোট সেই সকলের উলঙ্গদের মধ্যে কি যাইব, ভাবিয়া সে চলিয়া গিয়াছে, আমার নিকট সে'ও ইহাদের মতই, তবু সে আমার আহ্বান বুঝে নাই...এখন এই মিছরি লও, মেওয়া লও, বেচারীর মুখ শুকনা। লও, তাহার মঙ্গল ইচ্ছাময় করিবেন।

মনিব মহাশয় সশ্রদ্ধায় করজোড়ে মেওয়া মিছরি গ্রহণ করত মহাপুরুষের পদার্চ্চনার পর ধীরে কহিলেন,—প্রভো, আপনি সেই যিনি পত্র উদ্গম রহস্য দেখিয়াছেন, আপনার হাস্যে অচিন্ত্যনীয় শ্লোকপ্রবাহ, আপনার চাহনিতে শত বাত্যাতেও দীপশিক্ষা অস্পন্দ হয়, আপনি জ্ঞাত যে সেই অভাগা কেন আপনার সন্নিহিত হয় নাই; সে ঐ সময় এক দাঁড়কাকের রব শুনে যখন আপনি তাহারে আহ্বান করিলেন, সে দেখিল যে এখানেই আপনার নিকটেই বাঘেরা খেলোয়াড়ের ঘুম ভাঙ্গিল, অর্থাৎ আপনার নিকটেই উহার ঘুম থাকে, যে সে দেখিল এক উন্মাদ তূলা পিঁজিতেছে, এবং পরক্ষণেই আবার মহানন্দে অচেনা আকাশ লইয়া খেলা করিতেছে, আমার বুদ্ধি ব'লে, ইহা আপনি তাহারে দর্শাইলেন। সে অথচ ভীত হইল। সে কাষ্ঠচ্যুত কূর্ম্মবৎ এক অভিনব জীব, তাহারে রক্ষা করুন, হায় সে অবশ্যম্ভাবিতার দিকে ছুটিল!

তিনি, মনিব মহাশয়, অতঃপর চলিতে থাকিয়া আপন প্রসারিত করপুটে ঐ মিছরি ও মেওয়া দর্শনে অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না, ইহাতে অত্যাশ্চর্য্য ভালবাসা ছিল। এ কারণ যে পশ্চিমের পত্রভেদী সূর্য্যরশ্মিতে স্ফটিকতুল্য মিছরিখণ্ডে অজস্র রামধনুর আশ্রয় হইয়াছে, কিসমিসগুলিতে রঙ ধরিয়াছে, ইহারা বহু পুরাতন হইয়াছে।

এবং যে ইহা হইতে চক্ষু তুলিতেই তিনি থ, হস্ত হইতে তখনই প্রসাদী সকল মাটিতে পতিত হইল, যে সেইদিকে তাকাইবার সময় পর্য্যন্ত পাইলেন না, অথচ যে তিনি প্রসাদ পতিত হওয়ার অপরাধে আপন জিহ্বা দংশন করত আপন কর্ণদ্বয় মলিতে থাকিলেন, কেন না এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখিলেন: এক মৃত ব্যাঙ, যাহারে লইয়া দু একটি কাক ছিন্ন করিতেছে, তিনি ইহা যে তীর্থক্ষেত্র তাহা ভুলিলেন, কোন শিব জয়ধ্বনি আর শুনিতে পাইলেন না।

যে এহেন দৃশ্য তদীয় গৃহদ্বারকে পর্য্যন্ত স্থাপিত করিল,—সাঁওতাল গৃহদ্বারে কত লতাপাতা, বাঙ্গলার গৃহদ্বারে এস মা আনন্দময়ী—এহেন দৃশ্য তদীয় মমত্ববোধকে পরিহাস করিল। এবং যে তিনি নির্ঘাত, তিনি নির্ঘাৎ হঠাৎ, যেন মনে মনে কলের গানের কাছে যাইলেন, আপন আসবাবপত্র জামাজুতা দেখিলেন, স্ত্রীর ফটোগ্রাফের নিকট দাঁড়াইয়া খানিক, তৎপর যেন পাইপ ধরাইয়া একটি টান দিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন, যে ঈদৃশী নির্দ্দয় দুষ্কর্ম্ম অভ্রান্ত যে সুঘরাই কর্ত্তৃক সংসাধিত হইয়াছে।

তখনই তিনি ম্রিয়মাণ ইহাতে; অবিলম্বেই বুঝিলেন যে সে যেন দারুণ শিক্ষিতের মত রূপান্তরিত, যে তাহার নিজের মস্তকের করোটি সম্পূর্ণরূপে বদল হইয়া গিয়াছে; যে সে নিজের উপর ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়াছে, একের পর এক সংস্থান সে ক্রমাগত আশাতে, কখনও কৌতূহল প্রবর্ত্তিত হইয়া ভাঙিয়াছে ও যে ইত্যাকারেই ক্রমবর্দ্ধমান রাগে, বিশেষত নিজেরে অপাঙক্তেয় ক্বচিৎ জানিয়া, কভু নিরুপায় বুঝিয়া, সে মারাত্মক আধুনিক হইয়াছিল: অধুনা সে যে ডোম ইহাও বিস্মৃত; যে এবং সে মানসিক বৈগুণ্যে পথের কুকুরকে ঢেলা দ্বারা আক্রমণ করিয়াছে, যে অনেক নিরীহ কাঠবেড়ালীকে ক্রূর সর্পের হিস্ শব্দে খেদাইয়াছে।

যেমনভাবে সে তদ্রূপ বিষাক্ত আওয়াজে তাহার আপনকার প্রাণপ্রিয় জীবিত স্বরূপ তিতিরটিকে একদা ভয় প্রদর্শন ক্রমে খুসী হয়, মনিব মহাশয় বুঝিলেন, সেই প্রবৃত্তির নাশ হয় নাই, অথচ কিন্তু ঐ ব্যাপারের জন্য সে, সুঘরাই, তখন অপ্রতিভ হয়, তখন অধোবদন হয়; যাহা এইরূপ ঘটে: শনিচারোয়া সেদিন না আসাতে সুঘরাই ভিতরের বারান্দা ঝাঁট দিতেছিল, তদীয় পাখীটি নিকটেই এবং উহার গাত্রে সকালের রোদ খেলিতেছে, যাহা সহসা সুঘরাই অবলোকনে আবিষ্কার করিল; যাহাতে সে অতিশয় তন্ময়; এতদ্ভাবাপন্ন রহিতে ক্রমে, তাহার সারা দেহ এক যাদু আবেগে তছনছ হইল, রোমকূপে ঘোর শব্দ উঁচাইয়া হৈ দিয়া উঠিল।

যে আর, সে এরূপ বাক্যে আপনাকে, সে উচ্ছ্বাসকে, প্রকাশিল,—ওরে আমার সোনার পক্ষী দেখ, দেখ, এখন আমার সর্ব্বশরীর তোমার প্রীতিবর্দ্ধন নিমিত্ত, তৃপ্তিসাধন হেতু, সম্পূর্ণ পতঙ্গরূপ ধারণ

করিয়াছে, হে রে পক্ষী তুমি আমারে সত্বর খাও, হে রে তুমি আমারে বিনা লবণেই খাও, আমি সার্থক হই! ইহা বলিবার পর মহা আদরে গদগদভাবে সোহাগাত্মক ভাব জানাইল ও তৎসহ সে নিজ হস্ত প্রসারিত করিল, যাহাতে তাহার প্রিয়তম পাখীটি চঞ্চুদ্বারা উহার হাতে মৃদু টোকা দেয়।

সে ভারী খুসী, যে এবং ইহাতে অঢেল উৎফুল্ল হওয়ত আপন দেহ, উপস্থিত তদীয় দেহ যাহা চতুষ্পদ ভঙ্গীতে ছিল, তাহাতে যেন গোপন কোন দুর্লভ কিছু ভোজ্য বস্তু পাকিয়া আছে, তাহাই দেহ হইতে, অদ্ভুত ভাবে আন্দোলনে সুঘরাই উৎক্ষিপ্ত করিয়া তিতিরটিকে দিতে চাহিয়াছে, কি-যে-নিবেদন-করে তাহা ব্যক্ত করিতে অনেকই বাস্তবতা, অনেক ত্বাচপ্রত্যক্ষ প্রতীয়মানতা সে স্মরিয়াছে।

ও যে অবিচারিত চিত্তে অসাধনেই ডোমবুদ্ধিতে বলিয়াছিল,—ওরে পক্ষী, এখন আমি নিজেই ঐ যে দুইটি পাহাড় স্পর্দ্ধাভরে একে অন্যের প্রতি চাহিয়া আছে সেই দুইটিই আমি, এখন আমি ত্রিকূট, এখন আমি ডিগরিয়া পাহাড়, এবার ইতোমধ্যে যে দিক সকল, যে রহস্য ব্যাপ্ত, তাহা কব্জা করিয়াছি, তুমি সত্বর তাহা গ্রহণ কর গ্রহণ কর, খাও আমি সুখী সার্থক ও ধন্য হই।

পরক্ষণেই বলিল, আয় আমরা কামড়াকামড়ি করি, কুকুররা যেরূপ করে! আমার ভগনীপতি ও তাহার স্ত্রীলোক যেরূপ করে।

এবম্প্রকার বচন সুঘরাইএর নিজেরই, হৃদয়ঙ্গম হইতেই সে হরযে কণ্টকিত, সে অতিকায় সুবিশাল, এখানেই এই দেহে সূর্য্য উঠে ডুবে ইহা প্রমাণিত হইতেই সে অধীর আছে; ভাগ্যে পক্ষী দূরে যায়, ভাগ্যে ঝাঁটা নিকটেই আছে, আর যেটি ধরিতেই সে প্রকৃতিস্থ হইল! তাই সাব্যস্ত হইল যে, সে ভীত ও যে এহেন ভীতি সম্পর্ক সুঘরাই একদমই অপরিজ্ঞাত ছিল; নিশ্চয়ই ইহা সর্প বিছা ব্যাঘ্র অন্ধকার ঝঞ্ঝা বজ্রপাত প্রেত পেয়াদা ব্রাহ্মণ বা উচ্চবর্ণ হইতে,বা ঠকিবার ভীতি হইতে ইহা, মোটর গাড়ী হইতে ইহা হয় অধিক কূট, বাঁকা!

এখন, সম্মুখে কোন কিছু কম্পনে অনুভবের পূর্ব্বেই যে ঝাঁটার জলদি শব্দ কিন্তু তাহারে আকৃষ্ট করে, এখন দেশীয় ঘৃত মিশ্রিত মুরগীর মাংস পাকের গন্ধ তাহাকে প্রলুব্ধ করে নাই; যে অন্যবিধ গন্ধ হইতে ঘৃতগন্ধ যে স্বাদু তা বুঝে ইদানীং! ঝাঁটার আওয়াজে সে আর এক হইল; ফলে ত্বরিতে উহা অনুসরণ প্রাবল্যে অচিরাৎ কালান্তক গোখরা সর্পের হিস্ সুঘরাইএর জিহ্বায় ঘটিল, আর সে তখনই পরমাশ্চর্য্য ভালবাসাতে ঐ বিভীষিতকারী করাল হিস্ শব্দে তিতির পাখীটিকে, আতঙ্কগ্রস্ত করিতে বাহাদুর! মহা আহ্লাদ তাহাতে, সে আপন কৌশল দেখাইবার নিমিত্ত চারিদিকে দেখিল, পরক্ষণেই হিস্ শব্দ খেলিয়া উঠিল, ইহাতে সকালের হাওয়া বজ্রাহত, মানুষের রক্ত নিস্তেজ প্রাপ্ত হইল।

অদূরে খাবার ঘরে মনিব পত্নী ষ্টোভেতে খানিক বাসি মুরগীর-মাংসর তলা-পুড়াইয়া পাক করা সকাল-বেলাকার জলখাবারের জন্য প্রস্তুত তদারক করিতেছিলেন, এবং নিজে ময়দা মাখিতে ছিলেন ঐ শব্দে তাঁহার কান খাড়া হইল; সেই মারাত্মক ধ্বনি স্টোভ অথবা তৎজাতীয় অন্য কোন আওয়াজের সহিত মিশিয়া যাইবার না, উহাতে নিয়তির পায়ের খস খস ধ্বনি আছে! শ্মশানভূমি যেন ফুঁসিতেছে!

অন্য ঘরে যে শব্দে, মনিব মহাশয় রাত্র-আঙরাখা পরণে পাইপ মুখে কলের গানে কমলা ঝরিয়ার গান শুনিবার মধ্যে পরিষ্কার অভিধানে বুঝিয়া থাকেন; ফলে দুজনেই, মনিব পত্নী ময়দার তাল সমেত হাতে ত্রস্ত হওয়ত দরজার গোড়ায়, ও যে মনিব মহাশয় শঙ্কিত পদে বারান্দায় আসিলেন—এখন ইনি হিস্ শব্দের কারণ নির্দ্ধারণে অতি স্বাভাবিকভাবে পাইপ-ধৃত দাঁতেই কোনমতে হেই দিয়া উঠিলেন।

যাহাতে মনিব পত্নী অধিক উম্মামতি হন, তাহারে সুঘরাইকে, সাতিশয় তাড়নাপূর্ব্বক এই কথা বলেন, বলি পোড়ার মুখো নচ্ছার শয়তান বলি হচ্ছেটা কি, আবার দাঁত বার করে হাঁসছিস, লাজলজ্জার বালাই নেই, এই সাতসকালে বেচারা পাখীটার 'পোঁদে' লাগা, কি কাণ্ড! আমি ত ভয়ে কাঁটা, আর কাজ পেলি না, ঐ এক রত্তি পাখী, ছেলেমানুষ অবলা জীব, তাকে ভয় দেখাতে তোঃ বাধল না, তোঃ মতন শয়তান ত কখন দেখিনি, সাপ হয়ে হিস্ হিস্ হচ্ছে ছ্যা ছ্যা...দেখবি'খনে আঃ-জন্মে সাপ হয়ে জম্মাতে হবে...তোঃ ভালবাসার মুখে ঝাড়ু, তোদেঃ ছোট জাতের কি মায়া মমতা বলতে কিছুঃটি নেই র‍্যা, সাত সকালে ইকি কাণ্ড! ও ঘরে না ঁমা রয়েছেন, বুঝলি অনেক পুণ্যে মানুষ জন্ম, অনেক পাপে ছোটজেতের ঘরে জন্ম হয়, ডোম চাঁড়াল হয়, ওঁর আদরেই তুই এত বাড় বেড়েছিস্!

এবং ইহার সহিত আপন স্বামীর উদ্দেশে কহিলেন, তুমি ওরে কিছুটি বলনা বলেই ত এত আস্পদ্দা, ইস ভাবলে গা হিম হয়, কতবড় পাজি, তুই শয়তান না মানুষ, নিশ্চয়ই ডাকাত হবে...আবার ওকে তুমি বন্দুক সাফ করতে দেবে বলেছিলে (!) তুমি কিছু বল না বলেই ত...কি নরক যন্ত্রণা!

মনিব মহাশয় গান শুনিতে থাকিয়া উত্তর করিলেন,—বলিলাম ত, এই সব রুক্ষ ঝামেলায় আমাদের কোন প্রয়োজন নাই, আমরা বেড়াইতে আসিয়াছি, আমরা খামখা পাদরীগিরির জন্য বরাত লইয়া আসি নাই, অতশত হুজ্জুতে কোন কাজ নাই, আজ হিস্ করিতেছে, সেদিন পাখীটিরে পদাঘাত করিল, উহাকে এই মুহূর্ত্তে এক কাপড়ে পাখীশুদ্ধ বিদায় কর, পাপ! তাড়াইয়া দাও হারামজাদাকে।

স্নেহশীলা মনিব মহাশয়া ইহাতে বিব্রতচিত্ত মর্ম্মাহত হইয়া কর্ণে অঙ্গুলি প্রদানে প্রায় উদ্যত হইতে চাহিলেন, একদা তাহার খাঁচার প্রতি নজর গেল, যাহা তিনি সাজাইতে সাহায্য করিয়াছেন, ইনি শিহরিত আছেন!

'নারায়ণ নারায়ণ' এবং 'তারা ব্রহ্মময়ী মাগো' বলিয়া 'আনন্দময়ী মাগো' বলিয়া, আনন্দময়ী 'শ্রীশ্রীমায়ের চরণ স্মরণে স্বামীর জন্য ক্ষমা চাহিয়া অত্রাহি হইয়া কহিলেন,—ছি ছি তোমার কি জ্ঞানগম্য হবে না কোনদিন, মাঠাকরুন কি ভাববেন! বকতে বললুম বলে ঐ সব অলুক্খুনে কথা, তোমায় বলতে যাওয়াই আমারই ঝক্মারি হয়েছে...সাত সকাল। এতবড় কথাটা কি করে তুমি মুখে তুললে; ছোঁড়া নয় ভুলই করেছে...।

যে এবং ঠিক এমত সময়ে তাঁহার কথার মধ্যে তিতিরটি মনিব পত্নীর পায়ের নিকট আসিয়া নখে ঠোকা মারিল, ইনি যন্ত্রচালিতের ন্যায় হস্তধৃত ময়দাপিণ্ড হইতে, কিঞ্চিত মাখা ময়দা লইয়া তাহারে দিয়া সুঘরাই উদ্দেশে ইহা বলিয়াছিলেন,—আঃ মরণ দশা! তুই অমনতারা হাঁ করে মূর্ত্তিমান পাপের মত দাঁইড়ে রইলি যে, নে নে ঝট্‌পট্ ঝাঁট্ দিয়ে, এরে, পাখীরে খাবার দিগে, দ্যাকদিকিন্ কি খিদেটোই পেয়েছে...।

এবং পাখীটিকে আপন শিশুর ন্যায় সম্বোধনে কহিলেন, 'আহা খিদে পেয়েছে তোমাল বেচারী!'—এই সোহাগ বাক্যে পাখীটি আশ্চর্য্য যে, অদ্ভুতভাবে সে, মুখখানি তুলিয়াছিল।

বটেই উহাতে, ঐ হিস্ ধ্বনিতে, ভক্তিমতী মমতাময়ী সেই রমণী যারপরনাই ভীতা হইয়া থাকেন; যে কিন্তু অন্যপক্ষে, সুঘরাই এই তীব্র বকুনিতে ভারী জবুস্থবু!

কিন্তু যে এ পর্য্যন্তও তাহার সুঘরাইএর মুখে নীচজাতিসুলভ বাঁদুরে হাসি বিদ্যমান রহে, তত্রাচ এক সুদারুণ আত্মশ্লাঘা তদীয় সুন্দর নিটোল ললাটে প্রতিভাত, যাহা যেমন যে, এই পক্ষী হয় আমার, উহার যে পালক সকল অদ্যাবধি হাওয়াতে উড়িয়া গিয়াছে তাহাও, তাহাও; উহার হাঁটা চলা ঠোকরান ডাক্, উহার দুর্গতি, উহার কম্পন, উহার চাঁদ সর্ব্বেব কিছুই আমার, উহাতে অভ্রান্তই মদীয় প্রভুতা থাকে!

ও তৎপ্রভাবিত সুঘরাই আপনার প্রাণ অপেক্ষা বুকের পাখীকে মহা আহ্লাদে হেদাইয়া তির্য্যকে লক্ষ্য করিল; করিতেই, তন্মুহূর্ত্তেই ঐ ভ্রম অদৃশ্য হইল; তৎপরিবর্ত্তে পৃথগ্বিধ এক গম্ভীর চমক তাহার ভ্রূযুগে বর্ত্তাইয়াছে, তাহাতে ক্ষণেকজন্যই সে কুহকান্বিত হইলেক, ও ঝটিতি পুনরপি সর্প হিস্ দিতে সে অধীর হইয়া থাকে; এই কারণেই যে, তৎকৃত ভুজঙ্গশব্দের ফলে অদৃষ্টপূর্ব্ব এক দুর্দ্ধর্ষ ঘটনা ঐ পক্ষীতে, নিরীহতা মধ্যে, উদ্ঘাটিত তদ্দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছিল; আর যাহা সাক্ষাতেই তাহাতে ভাব লাগিয়াছিল, যে সে, সুঘরাই, অবিনাশী গোপনতা সেইক্ষণে নেহারিয়াছে, ইহাতে সে নির্ঘাত আর ডোমপুত্র নহে!

যে ঐ শব্দে যুগপৎ পাখীটিতে কীদৃশী মনোরমত্ব উজাগর! কি এত অব্যর্থ অভয়, কি গৌরব, কি এক পেশী, ঝামরাইয়া তখনই উঠিল, ইহা যাহা অপরিসীম দিব্য, ইহা যাহা খাসা, কি ঘটা! সেই মুহূর্ত্তে ঐ কাল সদৃশ ঘোর হিস্ আওয়াজে তিতিরটি চমকে উৎকর্ণ সচকিত হইল, কি যেমন তাহাতে! মাল্য মৃত্তিকা কুসুমাদি পতঙ্গ জুড়িয়া এক তুমুল কিছু প্রকট হইল, করতাল ঝাঁজিয়া উঠিল; সুঘরাই যেমন বনমধ্যে। আঃ পক্ষীর গ্রীবা কৌস্তভ মণিময়, অখণ্ড তেজে দীপ্তদৃপ্ত সটান!

অয়ি শীর্ষস্থতা!

এরূপ দেখা, এই দেখার জন্য আত্মপ্রত্যয়, সুঘরাইকে ঐ দিবস বহুক্ষণ যাবৎ শ্রীযুক্ত, প্রজ্জ্বলিত রাখিয়াছিল; অনেকবারই সে সগর্ব্বে পাখীটিরে কিয়ৎদূর হইতে অবলোকন করিয়াছে আর তখনই সেই শীষটান, ঐ লতেব গ্রীবার,—কোন প্রহেলিকার কম্পনে, তির্য্যক গতি ঝটিতি নিরেট সোজা উহাতে—

যাহা তাহাকে নির্ভীক করে, সেও অজ্ঞাতে উহা রপ্ত করিতে অধ্যবসায়ী হইল।

যে এবং এই প্রথম, ডোম জীবনে যে এতাবৎ ভীত, সে জিজ্ঞাসু হয়, তন্নিষ্ঠ যখন সে ভ্রূ কুঞ্চিত করে, তৎক্ষণেই যে সে এক অনৈসর্গিক বিকট, ইহা প্রেততাড়িত-র অধিক, ভয়ে সে চেতনা বিনা; ইহার মধ্যে কি যেন মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছিল; আবার গর্ব্বে সে ডোম! অবশ্য সেই দিন পুনর্ব্বার ঐ কাণ্ডের জন্যই বড়ই অবাঙ্মুখ তাহারে হইতে হইয়াছিল, যখন সে হিরণার টিলায়।

আমরা জানি সকালে বিকালে সাঁওতাল পরগণা, তথা জঙ্গল মহলের প্রায় স্থান, বিশেষত রিখিয়া, অভাবনীয় রূপ ধারণ করে—ইহার যে কোনও স্থানে দাঁড়াইলেই, এই বিশ্বাস হইবেই, যে মানুষের বড় কাছে দূরত্ব সকল; তাই সকালে এখানে রেখাব খেলিয়া উঠে, কেননা অমরতার দেখা দিবে, সন্ধ্যায় শুদ্ধ ষড়জ জাগর হয় কেননা অমরতা এখনই আসিবে; শুকতারা আশ্চর্য্য হরিণ যেমন বা।

ইহার আকাশে চির ব্রাহ্মণ্য, মৃত্তিকা বিস্তার হয় উৎসবময়ী ফোয়ারা! এমনই বৈচিত্র্যের মধ্যে সকালে চেঞ্জাররাই ভ্রমণে বাহির হয়, বস্তু সমুদয় কিছু অবাক মুহূর্ত্ত হইয়া উঠিতে থাকে, ভ্রমণকারীরা তাহার সেই মুহূর্ত্তের সহিত করমর্দ্দন করে।

সুঘরাইও মনিব মহাশয়েদের সহিত রিখিয়ার হাট পার হওয়ত উত্তরে হিরণার টিলায়, এখানে হাওয়া বড় বেশী, এখানে মনিবরা আঃ বলিয়া উঠিলেন।

মনিব মহাশয় তাঁহার পাইপে মিকসচার ভরিতে থাকিয়া কহিলেন,—দেখ, ফাঁকা কথাটি এই স্থান সম্পর্কে যথার্থ নহে, ইহা আরও কিছু, কোন স্রোত এখানে নাই ফুল নাই—এখানে আমরা আবার নূতন—স্লেট আমাদের পরিষ্কার। এ স্থান এমনি যে, যে এই হিরণার টিলা এমনি যে ইহার জন্য সহজেই আমি তোমার শয্যা ত্যাগ করিতে পারি।

মনিব পত্নী ঐ বাক্যের প্রতি কোনমতে চাহিলেন,—উঃ কঠিন উহা আমোদের!—এই জন্য কোনমতে যে, ইদানীং তিনি কশ্চিৎ নীল পালকের হাওয়াতে ভর করত নামিয়া আসা দেখিতে আছিলেন, তাই চক্ষুযুগতে, যাহা পান ও গুবাককে লজ্জাতে পরিণত করিয়াছে, মৎস্যকুমারীর গল্পের সংযম যাহাতে থাকে এবং উনি উৎসাহিত ছিলেন, যে, আঃ কে জানিত ঐ পালকে মদীয় নির্ভরতা থাকিবে!

আর যে সেই আশ্বাসে ভ্রূদ্বয় সটান, এখন কহিলেন,—আহা বেচারী পালকটা! দেখ দেখ পালকটা, কি সুন্দোর! ইহা প্রকাশিতে তাঁহার দেহলতা এরূপ কম্পিত তিনি যেমন বলিয়াছেন—এমন একটি নীল আসন হয়...যাহাতে বসিয়া শ্রীশ্রীমা জননীকে ডাকি (স্বর্ণমৃগ দর্শনে সীতা স্বভাবত এইরূপ বলিয়াছিলেন); অথবা এখন সন্ধ্যা হইবে, শঙ্খ বাজিবে তাই।

স্বামীর কথা তাঁহার কানে ছিল, উত্তর করিলেন,—ব্রাকেটে উচ্চৈঃস্বরে (!) হাস্যধ্বনি! এবং বুঝলুম ম'শাইয়ের আমার উবরি মমতা অঢেল! এখন এই নীল পালকটার জন্যেই আমার মনে হচ্ছে...এ জায়গাটা বড় আত্মীয় সমান!

এমত সময় একদল সাঁওতাল সারিবদ্ধভাবে ঐ টিলা অতিক্রম করিতে ক্রমে উঠিল, তাহারা নির্জ্জন প্রবাহ, তাহারা অদ্ভুত পায়ে চলিতেছে, তাহারা তাঁহাদের ইতিমধ্যে দিয়া যায়, ইহাতে তাহাদের মধ্যে এক আজব আড়াল সৃজিত হইল, সম্ভবত এই ক্ষণিক বিচ্ছেদ হওয়ার জন্য ভবিষ্যতে কখনও তাঁহারা উৎকণ্ঠিত হইবেন।

এখন সাঁওতাল দল তাঁহাদের দুজনকে দুজনের কাছে স্পষ্ট করিতেই, দুজনেই চমৎকারভাবে হাসিয়াছিলেন, চেনা-মানুষকে দেখার হাসি যাহা! এবং ইহার অবিলম্বেই, খানিক ইহাতে সলজ্জ মনিব পত্নী স্বভাবতই সুঘরাইএর কারণে এখানে সেখানে দৃষ্টিপাত করিলেন; দেখিলেন সাঁওতাল দলের লাইন এবার বাঁকিয়াছিল; এবং শনৈঃ সানোয়ার পথে নামিতেই খাঁচা-হাতে সুঘরাই প্রতিবিম্বিত হইল, ইহা এক দৃশ্য বটে!

মনিব পত্নী তাহারে দেখিয়া বিস্ময়ে কহিলেন, ও মা তুই ওখানে, আমরা ভেবে মরি!...দেখ দেখ ছোঁড়া যেন সদ্য জঙ্গল! সুঘরাই তখনও সেইভাবে আছে, তাহাতে মনিব পত্নীর সাধ হইয়াছিল,

চেঞ্জারদের মত বলিয়া উঠিবেন, কি গ্র্যাণ্ড দেখাচ্ছে না! কিন্তু ইহাতে, ত্বরিতে আগাইয়া-র (গ্রাম)...বাবুর বাড়ী আগত মোক্ষদা ঘোষালের গিন্নীর কণ্ঠস্বর জিহ্বায় থমকাইল, যাহা মনিব পত্নী শুনিয়াছিলেন।

নিজ বাড়ীর উঠান হইতে মোক্ষদাবাবু, ইনি সদাশিব তুল্য, ইহার বক্ষঃদেশে নস্যর দাগ, হাতে একটি নস্য-মলিন ন্যাকড়া, ডাকিলেন,—চাঁপার মা শুনিতেছ! বলি ও গো শীঘ্রই আইস একবার।

চাঁপার মা অর্থাৎ ঘোষাল গিন্নী মনিব পত্নীর সহিত গল্প থামাইয়া,—যাই ভাই একটু ঝাঁকি দর্শন দিয়া আসি, বলিলেন।

এসময় পুনরায় মোক্ষদাবাবুর কণ্ঠ পুনরপি ধ্বনিত হইল,—উহারেও লইয়া আইস...।

ইহারা দুইজনে উঠানে যাইতেই, মোক্ষদাবাবু ধ্যানঘন আবেশে অঙ্গুলি নির্দ্দেশে ব্যক্ত করিলেন,—দেখ দেখ কি গ্র্যাণ্ড! এবং তাঁহারা দেখিলেন মাকড়সার জালে জল-বিন্দু!

ইহা দেখিতে ঘোষাল গিন্নীর আশ্চর্য্য যে ঘোমটা স্খলিতই ছিল, তাঁহার কণ্ঠলগ্ন দশ ভরির পাটি-হার কিছু অস্থায়ী, এই পাটি-হার এখনও পাটি-হার আছে! ঘোষাল গিন্নি বলিয়াছিলেন, লোকে আমায় কত বলিয়া থাকে, ভাঙ্গিয়া অন্য কিছু গড়াও না কেন, কত নূতন প্যাটার্ন হইয়াছে,—আমি বলি প্যাটার্নের মুখে, সখের মুখে, ছাই! এক প্যাটার্ন করিলেই তখন প্যাটার্ন প্যাটার্ন বাই হইবে...স্যাকরা পোড়ারমুখোদিগের গর্ভ ভরাইতে ত জন্মাই নাই...এখনও দুইটি মেয়ে পার করিতে বাকি!

এখন ঘোষাল গিন্নীর স্বর সবিশেষ আপ্লুত, যেমন বা ফোক্‌লা, তদীয় মাড়ির আড়া দেখা যায়, জালস্থিত জল-বিন্দু প্রত্যক্ষে কহিলেন,—মাইরী কি গ্র্যাণ্ড না ভাই!

উপস্থিত এই টিলায় মনিব পত্নী সমক্ষে সুঘরাই বিষয়ে, ঐ রূপ 'গ্র্যাণ্ড' উক্তিটি বাধা দিল, নিশ্চয়ই ভাবিয়াছিলেন, সুঘরাইএর বিষয়ে মহা বিশ্রী শুনাইবে। ইত্যাকারে তিনি আপন স্বরগ্রামই তুলিয়াছিলেন।

কেননা স্বামী বলিয়াছিলেন, গ্র্যাণ্ড গ্র্যাণ্ড ড্যানচিবাবুরা(ড্যানচিবাবু: আগে চেঞ্জাররা ঐ সব দেশের খাদ্য সামগ্রীর দাম শুনিয়া হাটে মাঠে বলিতেন (damn cheap) এমতভাবেই বলে, বেচারীরা বলে যাহাতে মনে হয়, সৌন্দর্য্য কুৎসিতের প্যারডি মাত্র, অদ্ভুত না?

অথচ তিনি এখনও সেই পালক-নির্ভরশীল বৃত্তিতে থাকিয়া ছেলে মানুষটিতে মনঃসংযোগ করিয়াছিলেন; এখন সুঘরাই বিশদ, যে বহুদূরস্থিত অভিমানী ত্রিকূট নিঃসঙ্কোচে উহার কাছেতে আসিয়াছে, যে বহুদূর হইতে বন সমারোহ—তাহাও, যে ধান ক্ষেতের ঝরণার শুধু মৃদু-শব্দ-গান—ইহাও, যে এবং খাঁচা হস্তে বালকের পশ্চাতে অনেক অনেক লাল পথ সকল ছুটাছুটি করিতে আছে!

আরও যে, দেখা যায়, যে এই সময়েতে সুঘরাই আপন জিহ্বা দ্বারা ছোট করিয়া আপন ঠোঁট লেহন করে। স্রোত উহার বাল্যকাল, ষড়ঋতু উহার ভবিতব্য হয়! যে এবং ঈদৃশ জ্ঞানে এমনও যে মনিব পত্নী নীল পালকটি ভুলিয়াছিলেন কেননা বিশ্বাস এখন হইয়াছিল যে সে বালক নিঃশঙ্কচিত্তে প্রদীপ জ্বালাইতে ও নিভাইতে পারে।

নিরহঙ্কার মনিব মহাশয় পাইপে মৃদু টান দিতে থাকিয়া, সহধর্ম্মিণীর উচ্ছ্বাসহেতু সপ্রশংস প্রবণতায়ে আপনকার প্রিয় ভৃত্যের প্রতি নজরেতেই, এইটুকু তাঁহাতে ঝটিতি খেলিয়াছিল, অভিনবতম ব্রতকথার উদ্দীপনা দেখিয়াছিলেন, যাহার উপচার ঐ পর্ব্বতশীর্ষের বৃক্ষপত্র, কেননা সেখানেই প্রথম বৃষ্টি হয়, কেননা সেখানেই প্রথম দিন দেখা দেয়। এই ভাঙা পদটুকু বড় আপনার, যে ইহা বড় বৈদিক! আর সম্মুখে সুঘরাই, যে আর তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় ছোট হইল এবং যে তিনি খুসী সহকারে দমকা উচ্ছল হইলেন,...হা! লাল্ লা! সন আফ এ বিচ, হারামজাদাকে সত্যি চমৎকার স্পেইলনডি দেখাইতেছে...মিসিং লিঙ্ক! মিসিং...

মিমি-সিং লিংক!...ও হ্যাঁ হ্যাঁ কৈ?—বলিয়া মনিব পত্নী ঐ সূত্রে সুঘরাইকে নূতন করিয়া বুঝিতে উদ্যোগী, তাঁহাতে অপ্রার্থিত বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চারিত হইল: উহার পশ্চাতে কোথাও গেরি, কোথাও হরিৎ, কোথাও বা কমলা রঙ, কোথাও বা চলমান-রঙ অর্থাৎ যাহারা চেঞ্জার তাহারা ভ্রমণ করে; যাহা তাহাদেরই বস্ত্র ছটা!

এবং ঐ সকল রঙ প্রভাবে বিচরণের কালো মহিষগুলিও রঙীন; যে আর যাহাদের ইতঃমধ্যে তীক্ষ্ণ

তছনছে হাওয়া—ইহাতে এহেন ছবিতে, তাঁহার বাম আঁখি স্পন্দিত হইল, ক্রমে ইতঃপূর্ব্বকার উপলব্ধি হইতে তিনি কোথায় যেন বাঃ বনরাজি যেন সুঘরাইএর গা শুঁকিতেছে।

তিনি মনিব পত্নী কিয়ৎ অপ্রতিভ যে স্বামীর সংজ্ঞা বোধগম্য হয় নাই, ও বিনীতভাবে প্রকাশিলেন,—সে কি গো আমি ত ছোঁড়াতে শুধু অন্ধকার দেখছি! এই অন্ধকার কথাতে তিনি নিজেই যেন সত্যযুগে, ক্লাসিক পর্য্যায়ে চলিয়া গিয়াছেন।

আ! যথার্থ ধরিয়াছ, উহাই ত মিসিং লিংক!

ইহাতে এখন সত্যই মনিব পত্নী বহুদূর নিঃশব্দতায়ে অন্তর্হিত হইয়া থাকেন, যে তথাপি স্বামীর উচ্চারণের রকমে, যে স্পষ্টতই স্বভাবতই অনুধাবন করিলেন, যে তাহাতে—মনিব মহাশয়ের চোখে, মিসিং লিংক প্রাপ্তির কোনও আত্মম্ভরি উদ্বেলতা আহ্লাদ আদৌ ছিল না, বরং তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় যেমন বা কোন দিব্য বিগ্রহে আকৃষ্ট হইয়া আছে।

ও এ কারণেই তাঁহার পানে মনিব পত্নী এমত নিরীক্ষণরত, যে যাহাতে, যেন ইনি উহারে বুঝিয়া লইতে চাহিয়া কিছু দিন ইহাই যেন বলিয়া চলিয়াছেন যে যথা: সেদিন এই হিরণার টিলায়—এখানে উড়িতে থাকা কতক কাগজ-টুকরা প্রত্যক্ষে তুমি থমকাইলে, চমকিলে, তুমি স্তোভযুক্ত হও, তুমি আতঙ্কিত। ক্রমে তোমার নিরীহ ওষ্ঠ সংপুট স্ফীত হইল, এতই যে তুমি যেমন দারুণ হুঙ্কারে প্রতিবাদে দিকচরাচরে দৃষ্টিসঞ্চালন করিয়াছিলে, দূর হইতে জেঙ্গীল পক্ষী তোমার রোষযুক্ত ভাব অনুমানে আমাদের মাথার উপরকার আকাশ অতিক্রম করে নাই, একমাত্র টিলার যে দেবতা—টিলার অন্তর আত্মা যিনি, তোমার ঐ বৈগুণ্যে নির্ঘাত হর্ষযুক্ত হইয়াছিলেন।

ততঃ অচিরাৎ তুমি বিপুলতর দাপটে নির্ঘোযিলে,...এখানেও কাগজ! তোমার বাচনভঙ্গিতে চমক আয়রনি, শ্লেষ ছিল; অথচ তুমি শান্ত, অথচ তুমি নাটকীয় ভাবে দাঁড়াইলে, শিশিরবাবু যেমন ফুটলাইটের সমক্ষে, ফলে তোমাকেই তুমি, তোমার ঐ বা[illegible]ভাবকে তুমি নির্ব্বাক করিলে, তোমার সবকিছুতে কেমন এক দুর্ব্বার খামখেয়ালী-ফের; কিয়দংশে মজার মনে হইলেও, আমি উদ্বিগ্ন, আমি ধন্ধে আছিলাম, যে তোমার মনুষ্যজাত দর্পিত জিহ্বায় ঈদৃশ হাহস্ত বলিয়া উঠিল, যে, এই মহাস্থানের কুমারীত্ব বিনষ্ট হইয়াছে ঐ সকল কাগজের টুকরায় যে ইহার, এই টিলার পুণ্য যা কিছু, ইহার গৌরীত্ব অহঙ্কার ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে।

যে আমারে উদ্দেশ করত ইহাই ইঙ্গিত করিলে এবং, যে, হায় তুমি না একদা কামনা করিয়াছিলে—যে এরূপ মহিমার কূর্ম্মপৃষ্ঠ জমি কি শান্তরসাস্পদ! কি স্তব্ধতা!—এখানে এক সুবিশাল নয়নসুখ নবরত্ন মন্দির উৎসর্গ করিব—অবশ্য যদি এমন সুকৃতি থাকে, অবশ্য যদি আদিষ্ট হই কখনও কখনও, এখানে শ্রীশ্রীমায়ের মন্দির স্থাপন করিব! কিন্তু এখন এই টিলা ইহা এখন অশাস্ত্রীয় হইয়াছে, এই টিলারে কেহ আর নালিশ জানাইবে না, সাক্ষী মানিবে না...অত্যাশ্চর্য্য যে কেবলমাত্র কাগজটুকরো দর্শনেই তুমি এবম্ভূত মতিচ্ছন্নই!

তোমার সেই অপ্রাকৃতিক বিলাপ বচনে আমি অথৈ-তে, আমাতে যারপরনাই এক পরমাশ্চর্য্য ভীতি সঞ্চারিত হয়! যে আর তোমার ঐ দুঃখদশা আমারে বিষণ্ণ মুহ্যমান করিলেক। জানি তুমি ধার্ম্মিক, তুমি অতীব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, তুমি অভিমানী, কত কত তুচ্ছ কিছু তোমারে হিম করে,...সেই যে সেই মনে পড়ে...সুন্দর মহিমাময় গম্ভীর গভীর খদির বৃক্ষ পূর্ণ আইবুড়া কুজ্ঝটিকাময়ী জঙ্গলে, যেখানে পেচকের আওয়াজে শিকড়গুলি ভয়ঙ্কর, যেখানেতে লতাগুল্মে প্রায়ই হরিণের শিং আটকাইয়া যায়, এহেন সংস্থানে তথায়ে অনেক লজ্জাবতী ও বিবিধ ভূমি গুল্মের কাছেতে, সমক্ষে, এক টুকরা দৈনিক টাইমস কাগজ, সিভার্সের মারমালেড-জার ও সাদা-পিগ্ মুদ্রিত টিন ও IXL এপরিকট জ্যামের টিন দর্শনে তুমি কি পরিমাণ গ্রাম্য, তুমি নিশ্চিহ্ন, তুমি মর্ম্মপীড়িত ম্রিয়মাণ হইয়াছিলে, তুমি তদানীন্তন কালে এক মৌমাছি দেখিলে যাহা ঐ বিকট (!) সংস্থানে পরিক্রমণরত, তাহারে তুমি নির্ব্বোধ বলিলে, তুমি বীভৎস দুষমনী উহাতে দেখিয়াছিলে—তুমি ধার্ম্মিক যেহেতু—অথচ মজার কথা এই হয় যে, তোমার তাঁবুতে ঐরূপ আধারের দোকান সাজান! হায় সেই দিন তুমি ও তোমার প্রিয় বন্ধুদ্বয় (জোসেফ কিরণ চৌধুরী ও ভবানী সি. বাসু) হরিণের পশ্চাদ্ধাবন হইতে পর্য্যন্ত বিরত হইলে—সূক্ষ্ম তত্ত্বে তখন তুমি বাণবিদ্ধ, যে তুমি ভক্তিযুক্তমনে চরণামৃত পান কর সেই তুমি...তোমাকে যখন যখন মনে পড়ে আমি

কাদৃশী অচিন বালিকা!

ঐ সকল কাগজের টুকরা সকল তখনও এই টিলায় উড়িতে আছে!

আঃ ক্ষণজীবী পতঙ্গ সকল! তুমি সুঘরাইকে এক টুকরা কুড়াইতে নির্দ্দেশ দিলে, টুকরা আনীত হইল,—তাজ্জব, তুমি আজন্ম সংস্কার ভুলিলে, তুমি কি নেটিভ!—আনীত টুকরা পাঠে তুমি অতিমাত্রায়ে বিক্ষুব্ধ, কি এক বেদনা তোমাতে স্ফুটমান হইতে চাহিল, তোমাতে বাক্য বৈখরী হইল, অথচ কিন্তু ঝাপটা হাওয়াতে উহা গোঙানির ন্যায় বুঝায়।

তোমার আদেশে তোমার প্রিয় ভৃত্য টুকরা সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইল, এই স্থান বৃহৎ হইল, যে অন্যপক্ষে আমি স্ত্রীলোক মাত্র—সতত পৃথিবীরে দোষারোপ করিতে ইতস্তত থাকি, অবশ্য আমি মদীয় গণ্ডদেশে তর্জ্জনী স্পর্শ করিয়াও করি না, যে এবং তোমার পাইপ সত্ত্বেও আমি বিব্রত নহি, তোমারে আর আমি নেটিভ বলি নাই, আমি শুধু তোমার পাইপের হস্তীদন্তশ্বেত বিন্দু (কোন এক দামী পাইপে এইরূপ থাকে) নিম্পলকে দেখি; যে সেই ডোম বালক ইতঃমধ্যে মহাউৎসাহে ছুটিয়া ছুটিয়া কাগজ সকল কুড়াইতে আছে, এ দৃশ্য ভয়ঙ্কর, ঐ দৃশ্য বিশ্রী! যে তাহার আদরের তিতির পাখীটি এখন খাঁচা ছাড়া উহাও মহা আমোদে তাহারে অনুসরণ করে ক্বচিৎ কখনও বা উড়িয়া কখনও পদব্রজে।

এ দৃশ্য দারুণ খেলা।

যে তুমি দুচারখানি টুকরা পাঠে ইহাই পড়িলে, ল্যাভ লেটাঃ! আশ্চর্য্য ঐ কথার কোন প্রতিধ্বনি ছিল না। মেঘ সকল নিঃশঙ্কচিত্ত ছিল!

এবার তুমি যখন অস্পষ্টভাবে উচ্চারিলে 'ল্যাভ লেটাঃ' কিছু প্রতিধ্বনি শ্রুত হয়, যেই না তুমি নিরীহ শিশুকণ্ঠে ঘোষিলে 'ল্যাভ লেটাঃ! এইবার দিকে দিকে সেই শব্দ প্রতিধ্বনিত হইল। শিশুস্বর নিবন্ধন উহাতে শ্লেষ ছিল নাই। আশ্চর্য্য মেঘ অপসারিত হইল, আমরা দুইজনে দূরে দূরে অজানিতেই অসহায়ভাবে নয়ন ফিরাইলাম, আমরা (?) বহুদূরাগত গন্ধ-সূত্রই পাইলাম, যে এবং দুর্জ্জয় অপরিমেয় অতুলনীয় ঘ্রাণশক্তি ক্রমে বহু যুগের অতীতের স্বর শুনিলাম! এক প্রমত্ত জোয়ান কাব্যবীজ। দুস্তর গোপনতা ভাঙ্গিয়া যাহা আসিতে আছে।

অতঃপর তুমি টিলার দিকে পুনর্ব্বার অবলোকন কর, তুমি সম্বলহীন! তবু আদৃত ভাবে এখানে সেখানের পারিপার্শ্বিকতার কত গাছ, কত লতা, ধূলা উড়া হৃদয়ঙ্গম করিলে...যে ও তুমি কেমন যেমন ব্যর্থতায়, ইহাতে যে আমি মা জননীকে স্মরণ করিতেছিলাম। তুমি মথ-এর (পতঙ্গ) তুল্য নির্ব্বিকার, দারুভূত আছিলে!

তৎকালে আর সেই বালক কখনও কখনও তাৎপর্যপূর্ণ জিগীর দিতে থমকায়, কখনও আপনারে ধিক্কার দিতে আছে, কখনও বা হঠাৎ উৎফুল্ল, এই যে আর এক খণ্ড! আর এক খণ্ড! পুনরপি আর এক খোঁজে তোমার ঘ্রাণশক্তি, যাহা মানুষে কথঞ্চিৎ, তাহাই ক্রমবর্দ্ধমান হইতেছে।

আবার পরিলক্ষিত হয়, বালকের ছোট হাতখানি—সে নিজ ঢালু নিম্নে থাকার কারণে মানে তাহার শরীর দেখা যায় না!—এখন ওতপ্রোত এই বিরাট নশ্বরতার মধ্যে ফাঁকার মধ্যে উচ্চাইয়া উজাইয়া উঠে। তিলেক বাদেই সে ছুটিয়া আসে, যেমন তদীয় পক্ষী যেমন পোকা ঠোঁটে দৌড়ায়—খুব সাদা সাঁওতাল গীতের লাইনের ব্যঞ্জনা যেমত বা।

আর যে তুমি ঐ সকল সংগৃহীত টুকরা সুদক্ষ প্রতিভাধর মণিকারের ন্যায়, পরীর গল্প রচয়িতার প্রায়, বিচক্ষণতায়ে কাজল-টানার যতনে, সাজাইতে বসিলে প্রত্যেক খণ্ডে নুড়ি চাপা দিলে, এবার তুমি অধিকতর চাতুর্য্যে নির্ম্মাণ করিতে লাগিলে ইত্যাকারে যে,—চিঠি সুবাসিত!

সম্ভবত খোঁপায় ছিল...উঁহু তৈল চিহ্ন নাই! ব্লাউজের অন্তরে, বুকের ঘামে অক্ষর তাই নির্ঘাত আর্দ্র-হওয়ত ছাৎরা...মানে কিছুক্ষণ আগেই অর্থাৎ সদ্য ছেঁড়া...এই চিঠি প্রথম না, কিছু উত্তরের পর...পুরুষের হস্তাক্ষর। পুরুষেরই...!

ও! প্লেটোনিক...

ফ্যা...ব্রাউন ও নিশ্চয় ফ্যানী হইতেই হইবে...কলেজের কোন ছোকরা...বেশ কথা ভালবাসিতে চাহিতেছে আর মেয়েটি বোধ হয় লিখিয়াছিল...বিবাহিতা? হয়ত না! শেলীয়ান হাইটের তোড়...চমৎকার পেগানাইজ!

আঃ শেলীয়ান হাইটেও ইহা নূতন peganisation.

যে এবং এই পর্য্যন্ত বলিয়া তুমি আমার প্রতি নেত্রপাত করিলে।

আমি অসহিষ্ণু হইলেও তোমার ব্যবকলনে (deduction) খুসী, অবশ্য হোমস-স্মরণে (শার্লকহোমস) সমগ্র ব্যাপার শুদ্ধ করিয়া নহে—বরঞ্চ তোমার এতাদৃশ বৈচিত্র্য আমার এমনিতেই বেশ লাগিতেছিল—নিশ্চয়ই আমিও কোন ঘোরে ছিলাম!

এখন তুমি স্নায়ু-বিধ্বস্ত কেন না চিঠির মধ্যে ফাঁকা—খানিক স্থান টুকরাবিহীন—সেখানে টিলার জমি গর্জ্জন করিতেছিল, পোকা, ঘাস, ফুল উদ্ধৃত, এই ফাঁক নিরখিয়া তুমি জড়, থ, তুমি আধ্যাত্মিক!

যে ঝটিতি ব্যক্ত করিলে, আঃ নিষ্ঠুরতা! পত্রলেখক এক বীভৎস নিষ্ঠুরতা প্রত্যাশী—হন্যে! নিষ্ঠুরতা তাহার স্বর্গ! ইহার পর তুমি প্রচণ্ড প্রসারিত, রিখিয়ার সভ্যতার দিকে ব্যগ্রতায় তাকাইলে 'আঃ রিখিয়া' বলিয়া এবং যে তুমি মহাশক্তিতে শ্বাস গ্রহণ করিলে যাহাতে বহু দূরস্থিত বৃক্ষলগ্ন পরগাছা চমকিত হইল।

শনৈঃ যে আরও যোগ দিয়াছিলে...মনে কর পেগানাইজেশনের তোড়ে দুজনেই দুই জনকে, একে অন্যরে, কীদৃশী ভয় পাইতে চাহে! সমস্ত অস্তিত্ব কণ্টকিত!

আর আমারে জিজ্ঞাসিলে, না না আমার সায় প্রত্যাশায়ে কহিলে...কেন মানুষ এতেক নিষ্ঠুরতা চাহে...নিষ্ঠুরতাই কি প্রেমের মৃত্তিকা...একের নিষ্ঠুরতা ক্ষয় করিবার চায়...অনৈসর্গিক মরালিটি...ফুলের ঘায়ে যে মূর্চ্ছিত এখন সে দলিত হইতে প্রস্তুত!

এবং ঐ সময় সুঘরাইএর পক্ষীটি তোমার চিঠি সাজানর নিকটে পাছে উহা ভাঙে তাই তুমি তাহারে হেই বলিয়া তাড়া দিয়া আরবার মন্তব্য করিলে যে,...অবশ্য ইহাতে আমি মনস্তত্ত্বর যুক্তি বলি নাই।

তোমার উক্ত বাক্যালাপ আমার নিকট ঝাপসা অবশ্যই তাই বলিয়া আমি হেঁয়ালী নামে উহা সকল দূরে ঠেলি নাই—যেহেতু তখন আমি সন্ধ্যাকালীন শঙ্খের আওয়াজে অন্যমনস্কা, অবশ্য তোমার ঐ শেষোক্তিটিতে আমার বারম্বার মনে হইতেছিল যে তুমি, একা হইতেছিল যে তুমি, এখনই ললাটাঘাত বিষণ্ণতায় বলিবে, আঃ মনুষ্যজাতি! অবশ্যই নিরাশায়ে যে উহা, ঐ কথা, অবশ্য বাবার (মনিব পত্নীর শ্বশুর) গলার স্বর ঐ ব্যঞ্জনায় নাই, তবু বাবার মতই বলিয়া উঠিবে আঃ মনুষ্য জাতি!

আঃ বাবার হাতে কি অমোঘ পরমায়ু! তাঁহার হাত ট্যালকের গুঁড়ায় কি অদ্ভুত অশরীরী—কি সাদা! হাতে ম্যাগনিফাইং গ্লাস, হাতে খোলামকুচি! হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়ে বাবা একবার বলিয়াছিলেন, অসট্রাকন! এক টুকরো খোলামকুচিতে কি বিদ্বেষ, কি অট্টহাস্য, সঞ্চিত ক্ষোভ।...আবার একটুকরাতে কি হদিশ, এমন একরেখা মোটিফ, এমন এক নিরবচ্ছিন্নতা...মিসিং লিঙ্ক! আর মনুষ্য জাতি!—

ইহা বলিতে থাকিয়া বাবার চক্ষুর্দ্বয় আশায় বিস্ফারিত, আর তুমি আর এক, সেদিন তদ্রূপ উপলব্ধিতে আমি যথার্থই অশান্তিতে ছিলাম, আবার ইহাও যে, সন্দেহ হইতেছিল যে তুমি রহস্যপ্রিয়, যে কোন মুহূর্ত্তেই চমক দিয়া হা-হা হাসিতে আমাকে অপ্রতিভ, আমার রমণী স্বভাবকে অপদস্থ করিতে পার!

এখন, আজ উপস্থিত আপনার স্বামীকে সম্যক বুঝিবার চেষ্টা হইতে বিরত হওয়ত ইনি কপট বিরক্তি প্রকাশে তর্ক করিলেন,...আহা বললেই হ'ল কোথায় ঐ চোর চোর দেখতে ডোম ছোঁড়ার মধ্যে তোমায় সেই যে বলছিল—এবং ইহার সহিত প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর ধারায় বলিলেন,—একশোর মধ্যে জিরো...যাও!

কিন্তু পরক্ষণেই মনিব পত্নী আত্মস্থ হইলেন কেন না তাহাতে আভাসিত ইহা যে, সেই দিনকার সেই চিঠির টুকরার পাশে বসিয়া তাহার প্রেমাস্পদ স্বামী নিজ ভাবুকতার সূচনা করিয়াছিলেন, যথা...ধর...অবশ্য বলা যায় কোন এক অলিখিত অপেরার মহতী দৃশ্য...হয়ত তোমার মনে হইবে বড় খুকু কল্পনা...তবু...একদল স্টেজের অন্তে আসিল, অঙ্গুলিনির্দ্দেশে খণ্ডিত পত্র সকল দেখাইল, তাহারা ক্রন্দিত নয়নে কুড়াইতে লাগিল, এই রূপ কুড়াইতে, হাত বহুবার চম্‌কিয়াছে এক এক খণ্ড চমকপ্রদ মনোভাব প্রকাশিয়াছে, কখন বা মসৃণ হাতকে ভ্রমবশত, যে উহা পত্র-খণ্ড, কতবারই না একে অন্যের হাত কেহ ধরিয়া থাকে।

খণ্ডিত পত্র সকল উড়িতেছে, দ্রুত পদক্ষেপে তাহারা আছে এখন তাহাদের বসন চেহারায় যেমন

পাথর নির্ম্মিত, এইভাবে ক্রমে তাহাদের বসন পাংশু মলিন বর্ণ ধারণ করিল, তাহারা প্রেক্ষাগৃহের একুসটিক্‌সকে নূতন বর্ণাঢ্য সংজ্ঞা তথাপি দিল। তাহারা সংগৃহীত খণ্ডিত পত্রগুলির চারি দিকে চক্রবৎ ঘুরিল, এবার তাহারা সজল নয়নে একদা সুমহৎ বৃক্ষের সন্নিধানে গেল, ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া লতা ছিন্ন করিল এবং লতা দিয়া পরম রমণীয় এক সাজি নির্ম্মাণ করিল—কি আজব! কি কুহক! বিজোড় না হইলে চুপড়ি আধার অসম্ভব! চুপড়ি টুকরী ধামা—সবই বিজোড় বন্ধন!

তাহারা বেদনায় ঝঙ্কারিল, আমরা কোথাও বিজোড়, আমরা কোথাও বিজোড়! সাজিতে খণ্ডিত পত্রসকল রাখা হইল, এখন তাহারা শোভাযাত্রা করিয়া চলিল; অন্ধকার হইল, তাহাদের হাতে মশাল, তাহারা চলিতেছে দিকাভিমানী দেবতা সকল মুগ্ধ প্রীত হইলেন; তুমুল বরষণ হইল, তাহাদের মশাল নিভিল না, তাহারা ধীরে প্লাস্‌টিক (মনুষ্য) অঙ্গের সীমা অতিক্রম করিল, সম্মুখে বনরাজি, ক্রন্দনই তাহাদের নির্ভীকতা, সম্মুখে বনরাজি।

সেই বনস্থলী অলৌকিক, শিশুর হাততালিই এখানে পুষ্প, অপেক্ষমানার—নয়নই ফল। এবং তাহারা সেই বনে আনীত খণ্ডিত পত্রসকল ছড়াইয়া দিল, বারম্বার কহিল, এই পত্র যদি সত্যযুগের হয় তাহা হইলে শূন্য-স্থান ইহার পূর্ণ হউক! বনস্পতি নিশ্চয় শুনিলেন! নিথর বনভূমি! শুধু শ্রুত হইতেছিল সেই বনের পূর্ব্বাঞ্চলে কোন গৃহাভিমুখী কাঠুরিয়ার দল কোন গীতের এক ছত্রই—এখনও অন্তরার বিবর্ত্তন হয় নাই—বার বার গাহিতেছে! সকলেই খণ্ডিত পত্র বাহকরা ভক্তিযুক্ত মনে দণ্ডায়মানা, আরক্তিম চোখে প্রতীক্ষায়।

এমত কালে সম্মুখের ঝোপ জ্বলিয়া উঠিল।

...অনেকটা তেমনিভাবে...মনে পড়ে যেমন দাবদাহর সূত্রপাত আমরা সেই হাজারীবাগ অঞ্চলে জায়নোফর বনে যেমন দেখি, উঃ কি দারুণ নয় সেই গাইডটা, নির্জ্জন বনের মধ্যে অদ্ভুতভাবে মুখে হাত দিয়া দারুণ প্রলুব্ধকারী ডাক দিতে থাকিয়া হঠাৎ তর্জ্জনী সঙ্কেতে এক ঝোপ দর্শাইয়া ফিস্‌ফিস্ স্বরে জানাইল, খসখস ফট্! শব্দ! শিকার!

আমিও শিকার ভাবিয়া বন্দুক তুলিলাম, পরক্ষণেই সেখানে ধিক ধিক অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইল, আশ্চর্য্য। ধূমহীন একেবারে...ক্রমাগতই শিখা, গাইড সেইভাবে তখনও তাহার চক্ষুর্দ্বয়ে ধন্ধ! আমি জলের বোতলের প্রতি নির্ব্বোধের ন্যায় তাকাইলাম, ইস্!...তারপর সেইদিন তোপচাঁচির বাঙলায় আমরা মনমরা, আমরা অবসন্ন...ভাগ্যে সেখানে আশ্চর্য্য যে খাদ্যের পাত্র সার্ভিস সবই রূপার নির্ম্মিত। তুমি সন্দেহে হল-মার্ক দেখিলে, কহিলে নিশ্চয় মেপিন এণ্ড ওইয়েব...বেশ পুরাতন ও লেইট ভিক্টোরিয়ান রৌপ্য।

—আঃ আমরা সেই ওবজে দ'আর (object d'art) পাত্রে ভোজন করিলাম, এসপারাগ্যাস সুপ ভুলিবার নহে, আমরা অনেক অনেক বাড়ী বাসনপত্রের গল্প করিতেছিলাম, তাহার পর, তাহার পর...হ্যাঁ ওইসটার না কি একটা খাইবার সময়...আমি মস্ত হাঁ করি, না না বিশ্রীভাবে চিবাইতে দাঁত দেখা যাইতেছিল, তুমি অবাক হইয়া আমারে সাবধান কর, কাঁটা ছুরির অজস্র শব্দ করিয়া থাকি, তুমি অবাক হইয়া আমায় সাবধান কর। কেননা, উহা ত ঘটিবার নহে।...ওবজে দ'আর-এ আমরা কি সেই দাবদাহ সূত্রপাত ভুলিয়াছিলাম?...কিন্তু দেখ ভুলি নাই...।

ঠিক তেমনই ঐ বনের ঝোপ জ্বলিয়া উঠিল। যাহারা খণ্ডিত পত্র লইয়া আসিয়াছে তাহারা তৎপ্রবর্ত্তিত নতজানু হইল।

প্রজ্জ্বলিত ঝোপ হইতে এক কিশোর সুন্দর বনদেবতা দেখিতে সুঘরাইএর মত এক অভিনব চমৎকার ফড়িং দর্শাইয়া কহিলেন,—ইহা কি সেই?

তাহারা সভয়ে উত্তর দিল, প্রভু উহা তাম্রবর্ণের যে! তুমি ভাল জান!

তখন বনদেবতা অদৃশ্য হইলেন, কিয়ৎ পরেই তিনি হীরকপ্রভ এক শম্বুক দেখাইলেন, কহিলেন,—ইহাই কি সেই?

তাহারা সভয়ে উত্তর দিল,—প্রভু উহা রৌপ্যবর্ণের যে! তুমি ভাল জান!

তখন বনদেবতা অদৃশ্য হইলেন, কিয়ৎ পরেই তিনি এক নবারুণ সদৃশ ক্বচিৎ পান্নার ঘটা গঠিত এক বিচিত্র ক্রৌঞ্চ দেখাইলেন, কহিলেন,—ইহাই কি সেই?

নতজানু সকলে আর্দ্র চোখে উত্তর দিল,—প্রভু তুমি ভাল জান।

বনদেবতাকে দেখিতে ঐ ছোঁড়ার মত!

সেইদিন তখন ঐ মনস্তাপ জাতীয় পরমাশ্চর্য্য উপাখ্যান শ্রবণে মনিব পত্নী হাসিয়াছিলেন, অথচ তামাশায়, কেননা যে এতাদৃশ লিরিসিজম্‌কে শোভনীয়তা, ঔচিত্য, মানে বাস্তবতা দানে বহুকাল আগের তোপচাঁচির ঘটনা উল্লিখিত হইয়াছে, প্রাচীন এক ক্ষোভ বিস্মৃতির কথা যাহা!

তিনি ইহাও সঠিক বুঝিলেন যে ঐ চিঠির ফাঁক স্বামীকে উৎচকিত করিয়াছে, তাই যুগপৎ তিনি, পত্নী, সমালোচনায় বলিয়াছিলেন যে,—ধর তোমার চিঠি মিলানো ঐ ফাঁক অনেকটা এমনই মানে অক্ষমতার ছাড় বা শিল্পীর ছাড় যেখানে তাহারা ভাবিতে পারে না।

মনিব মহাশয় তদ্বিষয়ে উত্তর দিলেন,—আঃ সে শুভ্রতা! সে শুভ্রতা!

আজ এখন সেইদিনকার সেই বালকবৎ ভীরু স্বামীকে স্মরণে অধুনা তীব্র কটাক্ষপাতে প্রতিবাদ করিলেন, মিসিং লিঙ্ক না ছাই পাঁশ...কোথায় ছোঁড়া তেমনটি চেয়ে দেখত...?

সাক্ষাৎ চোর-চোর বুঝিয়া তুমি সদ্য-জঙ্গল দেখিলে কি রূপে তাহা হইলে...।

তখন কেন জানি না জঙ্গুলে ব'লে মনে হ'ল...। মনিব পত্নী ইহার পর ছেলেমানুষের মত আব্দার করিলেন,—ওগো এইভাবে পোড়ারমুখো ছোঁড়ার তুমি একটা ফটো তু'ল...ওরে বাবা পালকটা কুড়ো কুড়ো...কিন্তু তোমার কি করে মনে হল?

তোমার মনে পড়ে, সেইবার ঘুটঘুটিয়ার জঙ্গলে পিকনিকে যখন যাই তখন তুমি হুপ্‌পী (কাঠ ঠোক্‌রার মত দেখিতে এক রূপ সাদা কাল মিশ্রিত পাখী), দেখিতে চাও আমরা সুঘরাইকে কাজের সাহায্যে রাখিয়া বহুদূর চানোয়ার তীর ধরিয়া পূর্ব্বদিকে যাই! বেশ সময় বাদে, আমরা যখন ফিরিয়া আসি, তখন তুমি ভৃত্যকে না দেখিয়া উতলা হইয়া যাহারা রান্না তদারক করিতেছিলেন (অনেক চেঞ্জার এই পিকনিকে মিলিত হইয়াছিলেন) তাহাদের তুমি প্রশ্ন কর।

তাঁহারা কেহই, তাহার সংবাদ দিতে পারিলেন না, তুমি বড়ই শঙ্কিত যুগপৎ অপ্রসন্ন যে তোমার অনুপস্থিতিতে কেহ যদি বেচারীকে ডোম বলিয়া ছোট করিয়া থাকে, খেদাইয়া থাকে, রান্নার কাছ হইতে তুমি আমাদের অন্য ভৃত্যদের ও অন্য চেঞ্জার বর্গের বালকদের তাহার খোঁজ করিতে বলিলে।

তখন, তাহার নামে বন চমকাইতে লাগিল। অজস্র প্রজাপতি পার হইয়া অনেক গভীরে সেই ডাক প্রচারিত, এমত সময় মূর্ত্তিমানের উদয় হইল, হাতে খাঁচা দেখিয়া তুমি তাহারে চিনিলে! স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া জিজ্ঞাসিলে, মুখপোড়া জানোয়ার কোথায় ছিলি...এই ভয়ঙ্কর বন, তোর কি কোন ভয় ডর নেই র‍্যা...।

আজও আমার মনে আছে, জানোয়ার মৃদুহাস্যে উত্তর করিল, মাঁ গো, কোন ভয় করিবেন না, আমার জন্য এখানে—এই দীপ্তিময়ী বনে আপনকার কোনই শঙ্কার কারণ নাই...এবং অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করত কহিল, মাগো জানিবেন, মহতী বনস্থলী আমার গা শুঁকিয়াছে...।

যে এবং ইহা প্রকাশিয়া সুঘরাই সমস্ত লতা গুল্ম পত্রবিকাশের, পক্ষী রবে ছন্দিত যাহা, ঐশ্বর্য্যময়ী যাহা, তাহারই পানে সগর্ব্বে নির্ভীকতায়ে মস্তক সঞ্চালনে দেখে—কি এক অহংতা এখন তাহাতে যে এবং সে কেমন এক শব্দ করিল আর যে সমস্ত বন ব্যাপিয়া নিথর প্রতিধ্বনি ঘটিল।

যে ইহা শ্রবণে তুমি নিশ্চল, এমনও যে ঐ বাক্যে স্বভাববশত স্বীয় কপালে ভক্তিভাবে হাত স্পর্শ করিতে ভুলিয়াছিলে! তখন আমরা দুজনেই হারামজাদার প্রভায় আচ্ছন্ন! অবশ্য অন্যান্যরা সারিবদ্ধভাবে যাহারা তাহাকে আধা ঘিরিয়া ছিল, তাহারা হাস্য করে, কিন্তু হঠাৎ তখনই বৃক্ষ পত্র খসিতে তাহারাও ঈষৎ থ!

শুধু জগুর পিসিমা, তিনি খানিক দোক্তা মুখে ফেলিতে, তাঁহার বাহুতে আড়াই প্যাঁচ সাপ মুখো, সাপটির চোখ চুনীদার, তাগা পরিলক্ষিত হইল, ইনি সাহসে মনিব পত্নীকে সম্বোধনে কহিলেন, ওগো বৌমা, বলি শোন, আমার পঞ্চা যখন পেটে তখন একবার ননদ বাড়ী যাই—তখন তাহাদের ঘাটে একজন একজনকে বলিতেছে শুনিয়াছি, যে সেই বলে না—

গরুর কুটুম চাট্‌লে চুট্‌লে
কুকুরের কুটুম শুঁকলে শাঁক্‌লে
মানুষের কুটুম্ এলে গেলে।

...তা তোমার সুঘরাইএর গাত্র শুঁকিবে না?...

ইনি সেই জগুর পিসিমা যিনি, '...' নিবাসে-তে আগত চেঞ্জার ঘোষবাবুর পুত্রের, যে ছেলেটি বিশেষত ধরাগলায় নবযৌবনা যাহারা তাহাদের সমক্ষে, সৌন্দর্য্যের স্তুতি করার বহর স্মরণে, বিরক্তিতে বলে যাচ্ছিলেন,—ওমা সেদিন ভোর থাকিতে আমরা, আমি, মিনি, রাধা, নিভা, ইতি, চায়নারে লইয়া সিরিয়ার পাহাড়ে বেড়াইতে গিয়াছি, দেখি, ঘোষেদের সুপুত্র ছোঁড়াকে, আমারে দেখিয়াও, ঘোর কলি কি বলবি মাইরি, কোন ভ্রূক্ষেপ নাই, খালি ব্যাখান...ইহা উহা সব কিছু সুন্দর, আবার বলিল, সঞ্জীববাবু না কে লিখিয়াছেন...ঝাড়ু মারি! সোমত্ত মেয়ে সব সঙ্গে লাজলজ্জা নেই, আমি বলি ছোঁড়া তোমাকে ছাড়া পৃথিবীটা...মরণ! লোকে আমায় আনকাল্চার বলে বলুক, এত সুন্দরের কি দরকার!...ও ছোঁড়ার মনে পাপ আছে!

একদা আবার এই পিসিমাই তাঁহার ভাই-বৌ রাধা'র মাকে সঙ্গে লইয়া '...' বাবুর বাড়ী পান্থপাদপ গাছ দেখিতে গিয়াছিলেন! সেখানে বেচারী রাধার মাও সুমহৎ বৃক্ষ সমক্ষে কম্পিত, রোমাঞ্চিত, তাহাতে ভাবান্তর, তাহাতে ঐ রমণীতে রাত্র সমাগত! তদীয় মুখমণ্ডলে আরক্তিম নাসাপুট অতীব জবা হইল, ননদিনীকে কোনক্রমে কহিলেন,...দিদি এই পান্থপাদপ অবলোকনে আমার দেহমনে এক আলোড়ন সঞ্চারিত হইতেছে, এক অভিনব পুলক ঝাপটা দিয়া উঠিতেছে, এমন একটি সুকৃতির সন্তান আমাতে আসে, সত্যই জন্ম সার্থক হয়! ইহাতে ঐ সরল বাক্যের সহিত রাধা'র মা-র ঘন শ্বাসের শব্দ প্রাচীরে প্রাচীরে লাগিয়াছে।

ইহাতে জগুর পিসিমা ভূতচালিতপ্রায় হাঁ হাঁ করিয়া উঠিয়া ভর্ৎসনায়ে বলিলেন,—ছ্যা ছ্যা মরণ দশা, গাছ দেখিয়া তোমার ভাব লাগিল যে, এই সেদিন না বিয়াইলি, আবার? তাহার শেষেরটির নাম রাখিলে চায়না...আগেরটি ইতি, তারপরও চায়-না, আবার?—আর যে ইনি গল্পচ্ছলে পান্থপাদপ সম্বন্ধে এই মত নিম্ন স্বরে ব্যক্ত করেন যে, সত্যই বাপু...গাছটা যেন মরদপানা এবং ইহা প্রকাশে তিনি বস্ত্র সংযত করার পরে ঘোমটায় ঠিক দিয়াছিলেন।

...জগুর পিসিমার ছড়া কাটাতে, যুক্তিতে, আমরা দুইজনে সুঘরাই হইতে সেই বিরাট বনস্থলীর প্রতি দৃষ্টি সঞ্চার করিলাম, এ বন দৃঢ়—পশু যেখানে পদে পদে পথের বাধা সৃষ্টি করে। ক্রমান্বয় আরোহী কল্পনা! দেখিলাম কুহক, আমরা বুঝিতে প্রয়াসী হইলাম, দেখিলাম হস্তী-দন্ত নির্ম্মিত রমণী, যিনি কহিলেন,—শত পুত্র গর্ভে ধরিলেও আমি কুমারী। এমনও যে কুড়লের আওয়াজ আমাদের চীনে বুলবুলির ডাক বলিয়া ভ্রম হইল, এ বনভুবঃ কুমারী যে! দূর হইতে ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া বন্দুকের আওয়াজ আসিল, আমাদের দ্বারা বিবেচিত হইল, কোন পশুর (মিলন ইচ্ছা স্বর) মেইটিং কল!

আঃ! বন্দুকের আওয়াজও মেটিং কল!

এ কারণ যে এ বনভূমি রোসনাই! আমরা দুজনেই বড় মন কেমন অনুভবে, আবার কীদৃশী ঈর্ষায় আমি, কি ভয়ঙ্কর রোষে আমি, আবার ঠিক তখন পিকনিক পার্টিতে পোরটেব্‌ল্ গ্রামোফনে একটি কমিক রেকর্ডের ফাটাতে পিন ঠেকিয়া ক্রমাগত একই শব্দের অদ্ভুতভাবে পুনরাবৃত্তি ঘটিতে আছে, যাহা আমারে অধিকতর উন্মত্ত করে! কোন ক্রমে আমি সুঘরাইএর প্রতি লক্ষ্য করিলাম, সেই দ্বিপ্রহরে এখন যেন সন্ধ্যাপ্রসবী শিঙ্গা বাজিতেছে! আমার আবার অক্ষর পরিচিতি ঘটিল! বুঝিলাম আমারও মনিব মাধব! আছেন, তাই আমি আর এক বুনো!

এই পর্য্যন্ত বিস্তারিয়া মনিব মহাশয় সদম্ভে প্রতিষ্ঠা করিলেন, ঐ বালক সেই মিসিং লিঙ্ক!

ল্যভ লেটারএর...!

ইনি এবং উচ্চারণের পরক্ষণেই মনিব পত্নী বিদ্যুতে জিহ্বা দংশনের পরই কহিলেন, ও মা, ঐ কারা আসছে দেখ...।

এই ডাগর মনোহর হিরণার টিলার উত্তরে আরও দেশদেশান্তর সকল আছে, এখন উত্তরে প্রতীয়মান ঐ ভাগে যোজনব্যাপী আলুলায়িত প্রলম্বিত রম্য উত্তম শ্রীমণ্ডিত উৎরাই, কোথাও একলা আতা গাছ, কখনও বা পাথরপৃষ্ঠ, মহুয়া স্থির সস্ত্রীক, তারপর সমতল; তারপরও চিঠি যাইয়া থাকে; ঐদিকে মানুষের

নিঃশ্বাসে আকাশ খুব নীলিমা; চোখে জল; ঐ রাস্তা যারপরনাই লক্ষ্মী, যায় ও আসে, ঈদৃশ পথটি বেচারী ঘুমকে কভু সমালোচনা করে না।

মনিব মহাশয় ঐ পথে শরৎকালকে আসিতে দর্শনে বলিয়াছিলেন, শরৎ আসিয়াছে এস কাঁদি— তাঁহার চক্ষু সজল হইয়াছিল।

বঙ্কিমবাবুর লাইন আষাঢ় আসিয়াছে এস নামি!

এখন পত্নীর ইঙ্গিতে, মনিব মহাশয় তাঁহার মানসিক শান্তি হইতে—তিনি যেহেতু বিচারই শান্তি বিশ্বাসী যেহেতু, তিনি কিছু সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন, তিনি আপন বালকভৃত্যকে আর এক সৌখীনতায় আপন সৌখীনতাতে (!) অন্তরিত করিতে পারিয়াছেন—উৎরাই পর্য্যবেক্ষণ করিলেন;

পরিদৃশ্যমান হইল এই যে, চৈত্রের ঘূর্ণায়মান বাত্যায়-জব্দ কিছু পাতার ন্যায় একটি দল, ইহা প্রভাময়ী; যে উহারা জনে জনে তুমুলগোঁয়ার বাতাসে গাত্রবস্ত্রাদি কেহ ফ্রক কেহ শাড়ী সামলাইতে যে, ইহা জলবৎই যে সকলেই অপূর্ব্ব উৎসুক যে ঐ আলোড়িত দল গীত গাহিতে আছে, যাহারই এক আধ মাত্র ঘুরন্ত বাতাসে এত দূরেও ছিটকাই আসে।

এহেন দৃশ্য মারচস্! অভিরাম রঙ্গিলা! উহারা যেন প্রকৃতিকে ডাকিতে গিয়াছিল, না না, তাহা কেন, উহারা প্রকৃতিকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিতে গিয়াছিল, যে ইহা নজরে মনিব মহাশয় পূর্ণ, ধীরে ধীরে বলিলেন,...বেশ দেখিতে লাগিতেছে না বল! আজব হেরোইক! উহারা যেন ব্রাহ্মণী হংসের রুট ধরিয়া আসিতেছে না? স্প্লেইনডিড!...স্প্লেনডর!...

কে ওরা বুঝতে পাচ্ছ? মাগো আমার কথা ওরা বোধ হয় শুনতে পেয়েছে গো...লাজে মরি!

যে ইহা শুনিয়া মনিব মহাশয় তদীয় বৈষ্ণবীয় মনস্কতা হইতে, স্বীয় সহধর্ম্মিণীরে আশ্বাস স্বগতভাবেই দিয়াছিলেন, তুমি কি পাগল! ওরা কে...।

বুঝতে পাচ্ছ না, 'ছোট-বাইরেরা' গো, যদি ওরা কিছু শুনে থাকে, ওরা বড় বাবা যেমন বলেন বড় জবরদস্ত মৌলবী!

হইবে না-ই বা কেন! হেডমিসট্রেস বলিয়া কথা...!

সম্প্রতি তাহারা, ঐ দল, দূরে থমকাইল, এখন কেমন একরূপ তাহারা দোমনা করিতেছিল অগ্রসর বিষয়ে, স্পষ্টতই যে এখন তাহারা রাস্তা ছাড়িয়া পার্শ্ববর্ত্তী জমিতে ইতস্তত রহিয়াছে! যাহা নেহারিয়া মনিব পত্নী ভ্রূদ্বয় কুঞ্চিত করেন, ব্রীড়ায় অবনত মুখে জানাইলেন,—না গো, ছ্যা ছ্যা ওরা নিশ্চুই আমার 'লাভ লেটার' বলাটা শুনতে পেয়েছে! বড় তরাসে ওরা যদি এতটুকুন আঁশ গন্ধ রইল ত অমনি হাঁ হাঁ করবে'খুনি...।

তুমি খেপিয়াছ...আমার ধারণা বলে উঁহারা আমাদের এড়াইতে চাহিতেছেন, সেদিনকার ব্যাপারের, মানে সাঁওতাল নৃত্যের দিন মনে নাই!

রকমারি লণ্ঠন ও পেট্রোমাক্সের বিকিরণ গাছলতাপাতা নানা ছাঁদে, বহুস্তরে, ভেদিয়াছে—কভু বা আজব রামধনু! ছটাসকল কতক নাবি জিনিয়াতে ও জলদি ডেলিয়াতে, কখনও আন্দোলিত চামেলীতে (আঃ আমাদের রিখিয়ার বাড়ীর জানালার নীচে কি অফুরন্ত চামেলী! কি তারিখহীন!), আবার অন্যদিকে সাঁওতাল রমণী যাহারা ইতস্তত আছে, তাহাদিগের দেহে ঐ আলো, যে এবং এই সকলের সেই ছায়াই যাহা ক্ষণিক নিমিত্তই চকিতেই জাগাইতে পরিশ্রম করিয়া করিয়া যায় মুরারীবাবুকে—ইনি তিনি যিনি রৌদ্র-প্রত্যক্ষ-বোধ লইয়া নিম-নিদ্রিত!

ইনি টুলেতে বসিয়া, যে টুল একটি ইজিচেয়ারের পিছনে আছে, ইহার শিয়রে পশ্চাৎ হইতে তিনি মাথা রাখিয়াছেন; তাই এইভাবে তাঁহার ঘাড়ের রেখাটি সম্মোহ হইয়াছে। নিশ্চয়ই তিনি এখানকার পাহাড়ী হাওয়ার মধ্যকার পারিপার্শ্বিকতাকে উক্ত আকার অতুলনীয় অভিব্যক্তিতে স্বপ্নে আনিতেছিলেন; যে তদীয় মুখমণ্ডল এরূপ যে স্বতঃই মনে হইবে যে মুহূর্ত্তেই তিনি চোখ মেলিয়া ঘোষণা করিবেন, কি গ্রাণ্ড!

এবার ঐ মুরারীবাবুর আঁখিপক্ষ্ম কম্পিত ছিল, তিনি সজাগ; কেননা তিনি সজাগ, কেন না তিনি

অলৌকিকতা শুনিতেছিলেন। কেহ, পরিতোষবাবুই, তাহা বর্ণিতেছিলেন যে: আমার স্ত্রী, শুধু আমার স্ত্রী বলি কেন, উহাদের গোষ্ঠী মানে ফ্যামিলির সবাই খালাস করিতে খুবই অর্থাৎ পারদর্শী, কি এক পুণ্য আছে! যদি ক্বচিৎ বাই চান্স একটি নষ্ট হয় ত কান্দিয়া আকুল হন, দু-তিন দিন অন্ন গ্রহণ পর্য্যন্ত করেন না, খালি কান্না! হা ভগবান, আমি জন্ম-রহস্য দেখিতে বিহ্বল কেন হইলাম!

সে ক্রন্দন শুনিতে পাষাণ দ্রবীভূত হয়! কেদার দাস বলিয়াছিলেন এরূপ পাকা হাত ক্বচিৎ...একবার এক ছোকরা ডাক্তার এক পোয়াতি দর্শনে সেই গৃহস্থদের বলে,—যে মশাই কত বলিব—তোমরা গাছ চাহ না ফল চাহ...। আমার স্ত্রী বলেন তাহা শুনিয়া তাহার হাত অবশ। সেই বাড়ীর লোকেরা বলিল গাছ!

ঠিক এই সময়েতে নৃত্য উৎসবে বাড়ীর সিঁড়ির কাছে একটি ছোট ভীড় দ্বারা মধু মধুর হাস্য খেলিয়া উঠিল। যে বালিকা সেদিন চানোয়ার রোগা তীরে বালির বসত নির্ম্মাণ করিয়াছিল, আর যে, যে বালকের ভাগ্য, অপরূপ-কান্তির নুড়ি সকল প্রাপ্ত ব্যাপারে, অতি অতি অতি শুভ সুপ্রসন্ন, আর এই বালকই বড় তীক্ষ্ণ তীব্র ভাবে চানোয়ার স্রোত দেখে, এবং এই দেখাটি ভবিষ্যতে যে কোন বহমানতা এমন কি নর্দ্দমার দ্রুত গতিপ্রবাহে আরোপিত হইবে, সে হাততালি দিয়া উঠিবেক, আঃ ঐ চানোয়া! ক্রমে ঐ ছবি তাহারই মধ্যে মরিয়া শুধু কম্পন হইবে কী?

আঃ কত বাস্তবতাই আমার রক্তে!

এখন ঐ বালিকা আর ঐ বালকের ছায়া সেই হাস্য-খর ভীড়কে শ্যামীকৃত করিয়াছিল; এবং মুরারীবাবু তদীয় (আমাদের মনগড়াই নহে) সব কিছু ঘোষণা করার মনোবৃত্তি হইতে অর্দ্ধনিমীলিত চোখে হাস্যের প্রতি লক্ষ্যে আয়াস করিলেন।

এখন তাহার ঠাওর হইল, যে সিঁড়িতে, স্যর পি-র পরমা সুন্দরী নাতনি চতুর্দ্দশী অলোকা! পিছনে জড়োয়া ক্যাপিটাল দেওয়া ফ্লুটেড থাম—আর উপরে খিলানের রেখা; সামনে অলোকা; পাশেই তদীয় চমৎকার 'সরাইল' কুকুর (এরূপ নোবল কুকুর জাত খুব কমই) ও টর্চ্চ হস্তে অলোকার পরিচারিকাবৃন্দ!

সে বেচারী অলোকা সদাই বিভীষিত, সর্প তাহার ভয়, উজর হাসনুহানা যাহার আতঙ্ক, স্ফূর্ত্তমান কামিনী গাছ দেখিলে যে নীল হইয়া যায়! ঐশ্বর্য্যময়ী অলোকার মধ্যে তখনই চোরা-স্বেদ দেখা দেয়! তাহার অনামিকা যে নয় ক্যারেট হীরক খণ্ড ক্রমাগত ঐ সকল কিছুকে মহাস্পর্দ্ধা শাসন করিতেছে, যে অলোকা চরাচরের দিকে চাহিয়া বলিতেছে, তোমরা আমাকে হে সৌরভিত বৃক্ষসকল, আর শঙ্কিত ভীত করিও না—তথাপি যে সেই অলোকাই ঐখানে থাকিয়া ঐ হাস্যে যোগ দিয়াছিল!

ঐ উদ্দীপনা এক শিশুকেন্দ্রিক।

অদূরে বিলি, যে এতাবৎ এক পেয়ারা গাছের একটি নমনীয় ডাল টানিতে থাকিয়া—ফলে তাহার দেহে আলোর হিলমিল আছে। নিজ জীবনযৌবনের উপাখ্যান কহিতে আছিল,—যে বহুতেই নিলর্জ্জ হইয়াছে তাহার নিমিত্ত, এবং সে স্কুলে...যখন তখন টপসী (টমকাকার কুটির) ওরফে প্রমদা, যাহারে কাফ্রীর মত দেখিতে, যে তাহাদের ক্লাসে সর্ব্বপ্রথম সাড়ী পরিতে বাধ্য হয়, যে তাহারে সে অনিমেষনয়নে দেখিত, প্রমদা রূপসী।

কিন্তু কি ভয়ঙ্কর তাহার ঠোঁট, গা কণ্টকিত হয়। এই বিবরণে শ্রোতারা ব্রীড়ায়ে চারিদিকের ঠিক লইয়াছে যে কেহ শুনিল কি! আরও আরও বিলি জ্ঞাপন করে, যে সে ইন্‌সট্রুম্যান্ট বক্সের ডিভাইডারের কাঁটা দিয়া (তখনকার দিনে এমন লেখা খুব চলন ছিল) আপন হস্তে প্রমদার নামের আদ্যক্ষর 'পি' লিখিয়াছে, রক্ত পড়িয়াছে—ইহাতে যত কিছু ডাক বাবা-মা-ভাই ইত্যাদির স্বরভঙ্গ হইয়াছে—তবু সে মরিয়া!

ইতিমধ্যে ফ্রক পরা ও পুরুষ পোষাকে (যেহেতু তাহার মা ছেলে চাহে—হয় নাই বলিয়া তাহাকে পুরুষবেশী করে) একটি মেয়ের সান্নিধ্যে আসিতেই সে বলিয়াছে, অভাগীর স্বর্গ চমৎকার! কখনও ভগিনী নিবেদিতা, কভু পণ্ডিতানী রমাবাঈ, অতএব সে, বিলি, বহু প্রাচীন রীতির চতুর, বলিয়াছে, অজস্র শত চিঠি আমার নিকট জমিয়াছে...তাহা দিয়া আমি এলবামের মত(!) করিয়াছি...।

যে বিলি আবার আরম্ভিল যে একদা প্রমদার কুহকময়ী অগ্নি উদ্গার দেহ স্মরণে 'এ কি এ কি!' শব্দ উচ্চারিয়াছিল এবং যে তাহাতে ঘুম ছিল না! যে ইহা ভাবনা হইত তাহার নিজের দেহ যদি লীলা-র মত

হয়, সত্যি যাহার বক্ষ সমতল ছিল! আমি রাতদিন ভগবানকে ডাকিতাম!

এ হেন যে বিলি সেও ঐ হাস্য খুসী উচ্ছ্বাসে আকৃষ্ট হওয়ত—যে তখন বেচারী জানে নাই যে উহার কারণ কি, (আপন অনুগত) শিষ্যসমানদের লইয়া গ্রাভল পথে কর্কশ আওয়াজ তুলিয়া জলদিই এখানে, যেখানে মাধুর্য্য! এবং এই সময় এমন ঘটে—মনুশেফের স্ত্রী স্বীয় কন্যা অনুপমা—যে তাহার মায়ের অজস্র সঙ্কেত ইসারা দেখিয়াও দেখে নাই, যে বিলির সংস্পর্শ ত্যাগ করে না—পথ রোধ করিলেন।

অনুপমাকে কবলিত করিয়া তদীয় মাতা গোপনতা সৃষ্টি করত, উষ্মবর্ণ-প্রায় বাক্য উচ্চারণে তিরস্কার করিলেন,—রহ তোমার বাবাকে আমি বলিতেছি তুমি ওই ঢলানীর দুর্ব্বিনীতার সহিত মাখামাখি করিতেছ, উহার পদদ্বয়ের গড়ন বানরতুল্য! সে বিপথগামিনী, অনবরত মিথ্যাবাদিনী, বলে ডাইসেসন হইতে পাশ করিয়াছি, উহা মিথ্যা...কি এতেক তোমাদের কথা?

প্রথমে, এবম্প্রকার কটুবাক্যেও অনুপমার চোখ জোর হারায় নাই, যে সে বলিতে ইচ্ছুক যে বিলি খুব কালচারড, ফরওয়ার্ড! সে একা কলেজে যায়, সে আলোকপ্রাপ্তা!

অথচ এ সময় এবং তাহার কর্ণে বিলির শ্লেষ্মা-জড়িত স্বর ছিল, যথা প্রমদা বলিয়াছিল, বিবাহ না-হওয়া পর্য্যন্ত এ দেহ স্পর্শ করিতে দিবে না, বিবাহের পর যাহা খুসী যেখানে খুসী; এবং ইহা যে একদিন শিলা বৃষ্টিতে বিলির সারা অঙ্গে কিভাবে শিলা বাজিতেছিল!

এখন অনুপমার মৌনভঙ্গ হইল; তদীয় মাতাকে সে জানাইয়াছিল গত সরস্বতী পূজায় বিলির নিজেকে কি পর্য্যন্ত রমণীয় সুলক্ষণীয়া দেখিতে হইয়াছিল তাহারই কথা!

কিন্তু যে আদতে ঐ সূত্রে বিলি ঘোষণা করিয়াছিল, যে আমাকে অপূর্ব্ব দেখিতে হইয়াছিল, মাথা ঘষিয়াছিলাম, সাগর-খেলা চুল মাথায়, পরনে বাসন্তী রঙের সাড়ী, কলেজের মেয়েরা সমস্বরে 'আঃ!' আনন্দিত ফুকারিয়া উঠিল, উঃ সত্যই আমাকে যা চমৎকার দেখিতে হইয়াছিল না, রাস্তার আবালবৃদ্ধ, সবাই হাঁ হইয়াছে, এক অতি নীচু ক্লাসের একজন লোক আমাকে দেখিয়া উল্লাসে আতিশয্যে হাঁটু পর্য্যন্ত লুঙ্গি সংবৃত করত, লোকটি আপনার সমগ্র দেহ যেন ছুঁড়িয়া দিল, শ্রুত হইল...মাইরি দুইটি (ভাত) ছড়িয়ে দিও—(পায়ে) পড়িয়া থাকিব!

এবং বিলি কহিল আমি মন্তব্য করিয়াছিলাম ছিঃ অসভ্য! কি আস্পর্দ্ধা! ছোটলোক মেয়েদের সম্মান করিতে জান না!

আর যে অনুপমা যাহা স্মরণেও জন্মমূকের মত আপনকার মুখে ভাব আনিয়া স্থির থাকিয়া মাতাকে কহিল অন্য আর একটি মেয়েকে আপন সপক্ষে মানিল, কোকোও জানে জিজ্ঞাসা কর না কি গল্প হইতেছিল!

য-বাবুর ভগিনী, ইনি নিকটেই ছিলেন; ইনি বর্ষীয়সী, ইনি বিধবা, ইনি 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' মুখস্থ বলিতে পারেন, ইঁহার পায়ে কেডস এবং ইহার কারণে ইনি ঈষৎ কিন্তু-তে আছেন, ইনি কোকো নাম শুনিয়া বিস্মিত হইলেন, কোকো আবার কে? অবিলম্বেই তাঁহার দৃষ্টি ঐরূপ নামধারিণী অল্পবয়সী মেয়েটির প্রতি, এত বয়সেও তাহাকেও ভ্রূকুঞ্চিত করিতে হইল, যেহেতু ঐ মেয়েটি তাঁহারই বোনঝিরে বলিয়াছে যে তাহার নাম লাভলি।

অথচ উহার নাম দুর্গা, আশ্চর্য্য উহার, মেয়েটির মাতা প্রথম ঐ লাভলি নাম অস্বীকার করে, পরে বলিয়াছিলেন, উহার মামা রাখিয়াছিলেন।

য-বাবুর ভগিনী অবাক হইয়াছিলেন, এখন তিনি থ, নিশ্চিত ভাবিলেন রিখিয়াতে আসিয়া এক একজন এক এক রূপ ধারণ করে...অনেকের কথা মনে আসিল—যে যাহা ভাবিলে গাত্রে সিঙ্গিড়া উপস্থিত হয়; মেয়েটি বিলির সহিত অহরহ কানে কানে কথা কয়!

অথচ দুর্গার মা বলিয়াছে, যে আমার কন্যা দুর্গা সেরূপ নহে, সে এখনও জানে, চুম্বনে পুত্র গর্ভে আসে, দুর্গা 'মেস'-বাসী অসভ্যদের জুতা ঝাঁটা দেখাইয়া থাকে। য-বাবুর ভগিনীর একটি প্রবচন এই সূত্রে মনে স্বভাবতই আসিল।

পুড়বে মেয়ে উড়বে ছাই।
তবে মেয়ের গুণ গাই ॥

এবং চকিতে ইনি, খানিক বিলির প্রতি চাইলেন, তাঁহার দেহ মোচড় দিল, এই বিলিই দূর সম্পর্কে তাঁহার ভাইঝি, হাতে টাট্ (তোমার পাত্র) লইয়া যখন ফুল তুলিতেছিল এবং তখনও পাঁজি লিখিত তিল সম্পর্কে ব্যাখ্যা করিতেছিল; যে এবং ইহাও তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে বিলির মাতাই ইহার জন্য দায়ী, বেহায়া মেয়েরে কখন শাসন করে না এবং ইহাও যে, নিজে, বিলির মাতা, এত সোমত্ত মেয়ে থাকিতে রঙীন কাপড় পরেন, তাহার আর কাণ্ডজ্ঞান কি হইবে!

এই মাতা, ইহা প্রচলিত যে, বিলির পিতা বিলির কিছু বেচাল দর্শনে কিছু বলিলে তর্ক করিয়া থাকেন যে: এই যুগ নূতন! তুমি বৃদ্ধ!...বিলাতে কি হয়! লোকে বলে, লোকের মুখে ছাই, তাহারা কি খাইতে অথবা পরিতে দিবে। আমরা জীবনে কোন সাধ আহ্লাদ করিতে পারি নাই, মেয়ের সম্পর্কে তোমারে ভাবিতে হইবে না! (আশ্চর্য্য বিলির পিতা উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী)

যে এবং এই সকল কথা বিচারিয়া য-বাবুর ভগিনী উপলব্ধি করিলেন, দুই দিনের জন্য আসিয়াছি, আমার কি প্রয়োজন! তাহার সাক্ষাতে নব-যৌবনারা কেমন যেমন নগ্ন, তাহাদের গাত্রবর্ণ মেঘতুল্য ধূসর, যে এবং ইনি সংযতভাবে মুনশেফের স্ত্রীর সহিত ইহা যোগ দিলেন, না মিশিলেই পার, আমি অন্য কিছু বলি না, তবে যে ঐ ব্লাউজ পরা বগলকাটা কেন, ঘটি হাতাই ত ভদ্র...আবার হাতাবিহীন...বিলি শুনিতে পাই কাঁচা রসুন খাইয়া থাকে...গোবিন্দই জানেন!

অনুপমা এহেন তিক্ততার মধ্যে থাকিয়াও বিদ্যুতে বিলির নজর লইল, কেমন যেন ভীরু, কেমন যেন জেল্লারহিত, কিছুক্ষণ পূর্ব্বে কি কুহকিনী যে সে! উহার হস্তীদন্তের (আসলে সাধারণ হাড়ের) ঝুমকো, উহার মীন অথচ টানা নয়ন, গৌর গাত্রবর্ণ, উহার কাজল, সিন্দূর টিপ—এ সকলেতে যেন পৃথিবী নড়িতেছিল, সর্ব্বেব ফোয়ারা।

এখন বিলি উপস্থিত ঐ শিশুকেন্দ্রিক আবহাওয়ায় নিজে যেন অনেকটা বিলি-র স্বীয় উক্তির ন্যায় নির্ঘাত ক্যাড, চিবি, চিশ্রী; যাহা এই যে ঐ সরস্বতী পূজার দিন তাঁহার কোন বন্ধুর ভাই তাহার এক ফটো তুলিয়াছিল, ফটো আসিল, কিন্তু কোথায় সে বাসন্তী রঙ, কোথায় সেই অপূর্ব্ব কেশরাশি! যথার্থ বিপরীত তাহারে দেখিতে যেন রাক্ষসী...চিবি চিশ্রী ক্যাড।

এবং এই বিবরণের পরই বিলি অধোবদনে থাকে, খানিক বাদেই হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, আমার ফটো কেন যেন ভাল উঠে না, বোধ হয় তুক আছে...এবং এই স্বীকারে সে উৎসব-মাতৃক বিলি ফ্যাকাশে, হায় বিলির স্তব্ধতা আছে! কোন এক গ্রহের দ্বারা অজানিতেই তাহার পরমার্থ অপহৃত হইয়াছে!

কিন্তু ঝটিতি তিলেক মধ্যেই বিলি নিজের কথাকে উড়াইয়া দিল...ধেৎ মা বলিয়াছে উহাদের হাত খারাপ, ক্যামেরা বাজে। তথাপি তাহার এই যুক্তির পরও তাহার সেই বিষণ্ণতা গুণগ্রাহী সকলে দেখিয়াছে; দেখিয়াছিল, বিলি যখন একাকিনী!

এখন শিশুর সান্নিধ্যে বিলিরে অনুপমার যথার্থই তেমন তেমন উপলব্ধি হইল; যে সুতরাং সে বেচারী এতেক স্তম্ভিত, যে যাহাতে সে আপনার অতি ধ্যানে কৃত কেশবৈচিত্র্যে হাত দিয়াছে অসাবধানতায়, বিলি যেমন ময়লা যে বিলি ধূপের ধূম্র রেখার তুল্য ম্লান, সেই স্পর্দ্ধিত দ্বীপ তাহার কোথায়, চন্দ্রালোক যে দারুচিনি অরণ্য মর্ম্মরিত করিয়া বিচ্ছুরিত হইত তদীয় ভ্রমণের হেতুতে; যে তরঙ্গ সকল তাহার লাগিয়া অলঙ্কার নিমিত্ত, বিবিধ প্রকারের ঝিনুক আনিত, তাহা শুধুই যেমত বা কবিপ্রসিদ্ধ!

এখন অনুপমার দ্বারা ইহা পরিলক্ষিত হইল, যে বিলি ঐ চম্পক স্থান হইতে অপসৃয়মাণা হয়। যে সে শিশু আদৌ ভালবাসে না, ইহা অনুপমা জানিয়াছে এবং ঈদৃশ হলপে আশঙ্কিত হইলেও চোরা-মনে রাখিয়াছে। কিন্তু, অন্যপক্ষে শিশু যে নির্দ্দোষ মাধুর্য্য, যে ইন্নোসেন্স যে বিলিকে এইভাবে যে আঘাত করে—তাহা নির্ব্বোধ অনুপমা কভু বুঝিবে না; আঃ ইন্নোসেন্স কি মারাত্মক!

এখন বিলি সদলে চলিয়া গিয়াছিল, গ্রাভেলের কর্কশ আওয়াজ পুনরায় বিস্তারিয়াছিল, যে ক্রমে বিলি বেষ্টিত সহচরীদের মধ্যে আপন মুখখানি বিষাদ হইতে উন্নীতকরণে-সক্ষম হয়; এবার সে তীক্ষ্ণ, প্রকাশিল, যে ঐ হাস্যসূত্র গ্রাম্য দোষযুক্ত, যে উহাদের ভাষা অশালীন আনকালচারড, প্রায় ক্যাড।

আধা বৃত্তাকারে সহচরীবৃন্দ নির্ব্বিচারে তাহার ডাগর মানসিকতা দেখিয়াছে। তাহারা উহার ঢলঢলে বেলোয়ারি মুখ—যাহার কারণে এক্‌জইবিশনের স্নো-এসেন্সের দোকানদাররা অকাতরে সাম্পেল উপহার দেয়—সেই আকর্ষণ হইতে চোখ ফিরায় নাই, বিলি সাবাস! তাহার ক্যাড শব্দ উচ্চারণ সর্ব্বত্রে

খেলিয়া ফিরিতে আছে।

কখনও সভয়ে ইহাও সহচরীদের মনে পড়িবে, অমলাকেই বিলি ক্যাড বলিয়াছে, তাহারা যাহারা বাঙালী জীবনে ল্যাভম্যারেজ অবধি শুনিয়াছে, তাহারা বিলি-কে কখনও শুনে নাই!

অমলা ক্যাড। এ অমলা সেই, যে খুব সরল, যে লক্ষ্মী, যে খুব ভাল, যাহার দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ হইয়াছে, যে সগর্ব্বে রুলী পরে, তাহার বিবাহতে এক কাণ্ড হইয়াছিল, যাবতীয় মিষ্টি গুড়ের তৈয়ারী হয়, কারণ তখন বয়কটের যুগ, সবই নষ্ট হইল কেননা কেহ মুখে দেয় নাই। সে সুন্দর গান জানিত, বহু সভায় উদ্বোধন সঙ্গীত বন্দেমাতরম্ সেই গাহিত, সে কাজী সাহেবের গান আরও ভাল করিত।

এই সেই অমলা, যাহার গানের খাতাটি অতীব মনোমুগ্ধকর ছিল। এই অমলাই সেই যে গত পূজায় বিজয়ার দিন সিদ্ধি খাইয়া একটু এলোমেলো হয়, গীত গাহিতে প্রথমে 'পাতকী বলিয়া কিগো' পরক্ষণেই 'লালদীঘিতে আগুন' অবিলম্বেই 'আয় মন বেড়াতে যাবি' সঙ্গে সঙ্গেই 'শত কোটি কল কল নিনাদে' ইত্যাকারে গীতপ্রবাহের কালে বহুবারই উহার বস্ত্রাঞ্চল স্খলিত হয়, আর বহুবারই সে জিহ্বা দংশন করে! তাহাতে কোন মতিচ্ছন্নতা নাই—সে বড় ঘর-বোলা। গত ভূতচতুর্দ্দশীর দিন সে কোথা না কোথা হইতে এই রিখিয়াতে চৌদ্দশাক তুলিয়া আনিয়া সকলকে বিলাইয়াছে। সে বহু পাখী চেনে, উহাদের ডাক নকল করিতে পারে।

এই অমলাই এখন একটি চেয়ারে বসিয়া আপন পুত্রকে স্তন্যদান করিতেছিল। আঃ সমগ্র ধরণীর মঙ্গল হউক; আঃ দিক সকল সৌর সম্বন্ধীয় না হইয়া আপনি স্থিতিশীল হউক! আঃ পতঙ্গ সকল স্রোতস্বিনীতে নির্ভয়ে স্নান করুক!

অমলার স্তন্যদান-এই নিপটতার ছায়া, চলমান লণ্ঠনে, গাছে, পাতায় দেওয়ালে জানালায়, বিলি কঠিন দৃষ্টিতে ঐ প্রতীয়মানতা লক্ষ্য বিতৃষ্ণায় করিল, তদীয় হাল্কা দুল জোড়া ক্ষিপ্র আন্দোলিত হইল, ব্লাউজের গলার নিকট রাখা রুমাল লইয়া স্বেদ অপনোদন করিল। (হাতব্যাগের তখনও চলন নাই) যে সে নিম্নগ্রামে উচ্চারিল, ক্যাড! সহচরীরা ভাবতঃ ঈষৎ অপরাধী।

বিলির খাসা শ্রীযুক্ত মুখখানি, যাহা দক্ষিণ ভারতীয়দের মত সদাই নড়ে, তাহা খানিক স্থির, জানাইয়াছিল, অধুনা স্তন্যদান কুশিক্ষা প্রণোদিত, উহাতে রমণীর রম্য সুষমা খর্ব্ব হইয়া থাকে, যে অমলা বৃথাই স্বদেশী (!) করিয়াছে। আর এহেন বাক্যে সকলেই ত্রস্ত, ক্রমে অবশ্যই দৈবক্রমে দেখিল, স্তন্যদানের বিপরীতে যে রমণী—সে রমণী আর এক রহস্য!

আঃ বিলি তুমি আহেলী ডিকাডেন্স বহন করিতেছ! আঃ বিলির শুধুমাত্র বাম হাতের অনৈসর্গিক কালো চূড়ীর পৌনঃপুনিকতাই কি সবুজতা!

এখন ঐ শিশুকেন্দ্রিক দলের আশেপাশে গিরি ঝরণা নদী সৃজিত হইতেছিল, শিশুটি তখনও সমানভাবে খুসী, আর আর সকলে তাই বড় উৎফুল্ল। কাণ্ড এই যে, মনিব মহাশয় মহা-অথৈ আদরে বিজলী নাম্নী একটি মেয়ের সাত মাসের কন্যারে কোলে লইয়াছিলেন, আর সে সেই শিশু হঠাৎ প্রস্রাব করে! মনিব মহাশয় তাঁহার মহামূল্য চীনাংশুক পাঞ্জাবীর নিমিত্ত কোন খেদ না করিয়া বরঞ্চ উদাত্তে, গ্র্যাণ্ড...গ্র্যাণ্ড! বলিয়া এই সংবাদ সমবেতদের দিয়াছিলেন, তাই ঐ হাস্য-ঝটিকা!

এখন প্রধানা শিক্ষয়িত্রী, যিনি রাশভারী, ইনি তড়িৎ দাশ সি.আই.ই-র স্ত্রী, এবং এই সময়েতে ইনি পুরুষদিগের সহিত বাক্যালাপ করিতে থাকিয়া—পুরুষগণের সহিতই আলাপ তাঁহার শোভা পায়—ক্বচিৎ অন্যত্র মনস্কা ছিলেন, রকমারি আসন ইজিচেয়ার, টুল, তক্তাপোষ হইতে বহু আকৃতির পশ্চাতে এখন সাঁওতাল রমণীগণ ইতস্তত আছে।

প্রধানা শিক্ষয়িত্রী সহবতে ঐ সূচনাতে মনঃসংযোগ করিলেন; তিনি আপনকার চশমার তলা-কার কাঁচ দিয়া দেখিতে ব্যগ্র হইলেন; তৎক্ষণাৎই কোন সুলক্ষণা রমণী আলোকবিহীনতা হইতে শিশুকে কপট শাসন করিলেন,—ওরে আবার হাসা হচ্ছে, শয়তান মুতিয়াছ আবার...এবং মহিলার রম্য দন্তপাতি ভাস্বর হইয়াছিল।

যাহা শ্রবণেই প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর স্নায়ু দষ্ট হইল, অভিজাত মনিব পত্নী এবং অলোকার প্রতি অসহায়ভাবে একাধারে নেত্রপাত করিলেন, অবশেষে স্বীয় স্কন্ধের কাছে বস্ত্রাঞ্চল প্রান্ত ধৃত ব্রচ আছে, যাহা মনোহর কাজনিদর্শন—সোনার বসানে প্রত্যাগত এক পক্ষী, লার্ক সম্ভবত, তাহাতে যত্ন দিলেন।

এবং পার্থক্য ইহাদের সহিত তাঁহার নিজের ঐ সময়েই হৃদয়ঙ্গম হইল, পুরুষদিগের প্রতি চোখ ফিরাইতে পারেন না, ঐ সময় ভাগ্যশঃ অনেক আলো থাকিলেও ছায়া ঢাকিবার মত জোনাকী ব্যতিরেকেও, গোপনতা থাকে, সেই স্থলে উপস্থিত তিনি ক্ষিপ্রতায় 'মুত' শব্দটিকে নিজের কারণে সুখকর অনুবাদ (!) করিলেন 'ছোট বাইরে'।

এবং অতঃপর তিনি অবোধ শিশু বালিকার ব্যবহারে ভদ্রতাবশে মৃদু হাস্যে কহিলেন: ও, ছোট বাইরে ক'রেছ বুঝি! প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর চমকপ্রদ মনোলোভা স্বরে, সকলেই বুদ্ধির অঙ্ক হইয়া গেল, তখন সকলেই খানিক সচেতন ছিল, অবশ্য পরে বড় অসংযম উজরাইয়াছে নিজেদের মধ্যে ঐ পদসূত্রে।

দূরে সেই ভাবমুগ্ধকারী দল, আঁকিয়া বাঁকিয়া আসিতেছে, তাহারা আপনাদের স্বাভাবিক রাখিতে গীত গাহিতেছিল, 'নূপুর বেজে যায়,' ক্রমে ঐ দল কোথায় যে তাহাদের স্বপ্নত্ব বাহার ত্যাগ করিল গোপন করিল তাহা বিস্ময়ের, পট তেমনই উজর আছে, পথ তেমনই মায়াযুক্ত আছে, সম্প্রতি যেমন বা ইহারা ঘোর জড়বাদের অন্তর্গত হইল। এখন তাহারা টিলায়। মনিব মহাশয় ও তদীয় পত্নী সহজ হইলেন, উদ্যোগী হইলেন, সুঘরাই অল্প তফাৎ রহিল।

ইহারা বিভিন্ন ধরনে সাড়ী পরিহিতা, তাই কিছু সলজ্জ, তাহারা একে অন্যের পশ্চাতে আশ্রয় লইতে সমুৎসুক, প্রধানা শিক্ষয়িত্রী রুমাল দিয়া কপালে থুপি দিলেন, উপস্থিত দুই পক্ষই মৃদু মৃদু আনন্দ প্রকাশ করিতেছিলেন। কিয়দংশে এই ব্যবহার নিম-কমিকাল বৈকি! তথাপি এই বিরাট ফাঁকা মানুষের যাবতীয় উপহাসাত্মকতাকে নিশ্চিহ্ন করিল। পার্শী মারাঠি মদ্র ধরনের এবং স্কুল ও সামনে-আঁচল রীতির কাপড় পরন দর্শনে মনিব পত্নী অনেক প্রশংসা করিলেন।

তৎকালে প্রধানা শিক্ষয়িত্রী একবার বাবুটির, একবার পশ্চাতের চানোয়ার হোথায় নিরীক্ষণে কহিলেন—প্লেইজেনট! অপূর্ব্ব! বলিয়া তিনি মনিব মহাশয়ের দিকে ফিরিলেন।

তাঁহার মধুর স্বরসঙ্ঘাত ব্যাপ্ত হইল; অবশ্য ঐ উক্তির রেশে যেন 'কিন্তু' আছিল, সঙ্কোচ নাই, অন্যপক্ষে যেন নিজ উপস্থিতি সম্পর্কে উহাদের সচেতন করার মতিত্বও যেন তাহাতে; এবং আরও তিনি মনে মনে যুক্তি রচনা করিতেছিলেন; এবং যে কেন তাঁহারা লোকালয় ছাড়িয়া উত্তরে যাইয়া থাকেন!

মনিব পত্নী তাঁহার অভিমান ত্বরিতেই বিচার করিতে পারিয়া সত্যই মজা পাইতে গিয়া সাবধান হইয়াছেন, তথাপি অসতর্কতায়ে তাঁহাকে তাঁহাদের গিরিডি চলিয়া যাওয়া বিষয়ে প্রশ্ন সূত্রে—গিরিডি প্রসঙ্গে: যে চমৎকার উস্রি, কি অদ্ভুত মেঘ করে! ধন্য পরেশনাথ! কি শান্তরসাস্পদ বারগনডা ইত্যাকার বাক্য স্থির করিতে অধুনা ন্যায়ত থমকাইয়া আছেন যে তাহাতে, ঐ সকল উল্লেখে, বেজার দেখা দিতে পারে ইহা মনে করেন।

যেহেতু প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর অভিজ্ঞতা হয় যে রিখিয়া অত্যন্ত গ্রাম্য! কুসংস্কারাচ্ছন্ন! আর যে তিনি সিন্দূর পরাতে বিশ্বাসী নন, সত্যনারায়ণ শুনিতে যাইতে রাজি নন!

তিনি বলিয়াছেন এখানে প্রায়ই স্ত্রীলোকেরা অশিক্ষিত; তাঁহার লারডারের (খাদ্যসামগ্রী রন্ধনের ছোট আলমারী) উপরে কাঁচে, কালোর উপরে সোনার জলে 'ঈশ্বর মঙ্গলময়' লেখা আছে এবং সেই লেখার মধ্যে 'ঙ্গ' অক্ষর ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া মিটিয়া গিয়াছে, এবং ইহা লইয়া অর্থাৎ এখন যে কথা দাঁড়াইয়াছে এবং তাঁহার ভাষা লইয়া গ্রাম্য-রিখিয়ার সকলে তামাশা করিয়াছে! এবং তাঁহারা তাই গিরিডি যাইবেন, সেখানে নিজেদের ব্রাহ্মগোষ্ঠি আছে, একটি সমাজমন্দির আছে! প্রাণীজগৎ ও উদ্ভিদ ছাড়া প্রাচীনতা সাবেকত্ব উপরন্তু নাই।

অতএব এখানে মনিব পত্নী অল্প অস্বাচ্ছন্দ্য বোধের ক্ষণেই আপন সরলতায় আসিলেন, একারণ যে, সমক্ষেই ফুলমৃদু বালিকারা—যে তাহাদের অনেক অলৌকিকতা ছিল। তিনি খুব বন্ধুতায় কহিলেন,—একদিন আসুন না...আমাদের বাড়ীতে।

প্রধানা শিক্ষয়িত্রী এই আহ্বানে, সম্ভবত খুসী হইয়া তৎক্ষণাৎই, নিশ্চয় আমরা খুব খুসী হইব, বলিয়াই অল্প অন্যমনা—মিথ্যা তাঁহারা প্রয়োজনে বলিয়া থাকেন—কহিলেন,—সময় যদি পাই।

অন্তরে তিনি—মনিব পত্নীকে, যিনি ধর্ম্মপ্রাণা, এখন এড়াইতে চাহেন যেহেতু ইঁহার ভাষা কুশ্রী—

অথচ চালচলনে ভীষণ ইংরাজ—যেহেতু ইনি ভূতপূজক হিন্দু; জন্মান্তরবিশ্বাসী ও গঙ্গা-সমর্পিত মন, যাহাদের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী হিসাবে ঘৃণা করিতেন, অপছন্দ করিতেন! সুতরাং এই ক্ষেত্রে তিনি যে কি করিবেন তাহা মনস্থ হইবার পূর্ব্বেই ফ্রক-পরা অল্পবয়সী মেয়েটিও যে মারাঠি ধরনের সাড়ী পরিহিতা. সে বিস্ময়াবিষ্ট হইল, সুঘরাইএর পাখী দেখিয়া কহিল,—পিসিমা দেখুন দেখুন, কি বিউটিফুল পক্ষী. দেখুন পক্ষীটি বালকের হাত ঠুকরাইতেছে! ইহা আশ্চর্য্যের! উহা কি পক্ষী!

প্রধানা শিক্ষয়িত্রী ঐ অপ্রার্থিত সুযোগ লাভে স্বস্তিতে যোগ দিয়াছিলেন, সত্যই চমকপ্রদ! মহাশয় উহা কোন জাতীয় পক্ষী? এবং যুগপৎ স্বীকার করিলেন, যে এইসব বিষয়ে আমরা এত অল্পই জানি...এবং যেক্ষণে তিনি হাসিয়া উল্লেখ করিবেন যে, ঈসপ্‌স বা হিতোপদেশে ইহার কথা নাই, তখনই শুনিলেন যে, উহা তিতির!

এবং ঐ তিতির শব্দ তিনি সুষ্ঠুভাবে উচ্চারণের পরে পার্শ্ববর্ত্তিনী মারাঠি সাড়ী পরিহিতা কিশোরীকে প্রশ্ন করিলেন, তিতিরের ইংরাজী কি বল ত দেখি... সিনি? আঃ অত দুলিতেছ কেন! ওকি! ভদ্র হও...ছিঃ! এই মেয়েটি এবং ঐ মেয়েটি আমার মধ্যম ভ্রাতার কন্যা...গত পরশু আসিয়াছে...আবার দুলিতেছ...যেখানে উহারা থাকে সেখানে ভাল স্কুল নাই...দুঃখের...অমন করিও না...ইহারা কি ভাবিতেছেন ছিঃ...!

ঐ তিরস্কৃত মেয়েটি তখন মনিব মহাশয়দের চোখে অলৌকিক শোভা ধারণ করিয়াছিল, এ কারণ যে,—সম্ভবপর ইহা যে সাড়ী পরার অনভ্যাস বা অস্বাচ্ছন্দ্যের জন্যই—তাহার পদদ্বয়ের যাহা সর্ব্বলোক বন্দনার জন্য, প্রণামের জন্য গঠিত তাহা যেমন সাঁচিতে আছে ঠিক তেমন তেমনভাবেই পশ্চাতে ঈষৎ উত্তোলিত ছিল।

মনিব মহাশয় আপন সহধর্ম্মিণীরে নিজ মনোভাব জ্ঞাপন করিলেন, কি মিষ্টি না,...যেমনটি সাঁচিতে...নয়? আহা কি!

মনিব পত্নী জানাইলেন, আহা কি ভাব! কি চমৎকার, এবং এই পর্য্যন্ত বলিয়া তিনি ইতস্ততর মধ্যে, প্রায় তাঁহার ওষ্ঠে আসিয়াছিল, যে, ঐ মেয়েরে পূজা করা যায়, কিন্তু প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর রুচি তাঁহার অবিদিত ছিল না, এখন এইরূপে শেষ করিলেন, এদের দেখ, প্রত্যেককেই বড় খাসা দেখতে নয়!

প্রধানা শিক্ষয়িত্রী পুনরায়, তিতিরের ইংরাজী জিজ্ঞাসাতে, মেয়েটি উত্তর দিল,—পারর...টরিজ।

ছিঃ কি উচ্চারণ করিতে আছ, 'আর'এর যে মানে প্রথমটিতে...তারপর বলিলাম ত ঐ স্থানে ভাল স্কুল নাই...।

পার্শী সাড়ী পরিহিতা যুবতী ইচ্ছাকৃত অবশ্য কিছুটা উদ্বেলতায় ঐ কথায় বাধা দিল,—শুনিয়াছি ইহাতে খুব ভাল রোষ্ট হয়...খাইতে খুব ভালও...!

নিশ্চয় খুব ভাল খাইতে...তুমি তখন খুব অল্পবয়সী, যখন আমি পেশোয়ারে...স্কুলে...উনি কলেজে...এই তিতিরের মাংসে অপূর্ব্ব রান্না হয়, তবে সেই রন্ধনে কাশ্মীরজাত লঙ্কার প্রয়োজন হয়...আমরা একটু হলুদ দিয়া থাকি বটে, এবং শা-মরিচ...বুঝিলেন, বেশ ভালভাবে কাটিয়া...প্রথমে ভিনিগার বা নেবু রসে ভিজাইয়া অথবা মাখাইয়া...হ্যাঁ কাটার পরই...।

মনিব মহাশয় ইহাতে অবশ্যই অবাক, সুঘরাইএর প্রতি অপরাধীর ন্যায় চাহিলেন, যে এবং খুব সোজাই মৃদুস্বরে বলিয়াছিলেন,—ও বেচারীর পাখী অন্ত প্রাণ!

স্বামীর এহেন নির্ব্বুদ্ধিতায়ে মনিব পত্নী ঝটিতি অপ্রতিভ হওয়ত, যাহাতে অভ্যাগতরা না ক্ষুণ্ণ হন তন্নিবন্ধন অতীব তিক্ত শ্লেষে বলিলেন, ছাড়ুন ত ওঁর কথা, পাখী অন্ত প্রাণ না হাতী, অষ্টপ্রহর ওর পিছনে লেগে আছে, আবার কথা, ওই মুখপোড়া ছোঁড়ার ভগনীপতিই যে বলে...বলে পাখীটাকে কাটবে ব'লে শাসায়, ও ভয় পায় এখন...সত্যি যদি কাটে, রাঁধে তখন ছোঁড়াও হয়ত দেখব একটা ঠ্যাং খাচ্ছে...আজই পাখীটিকে এমন হিস্ শব্দ ক'রে জাত সাপের শব্দ ক'রে ভয় দেখাচ্ছিল, যে আমার এবং ওঁর পিলে চমকে গেসল!...বল...আমরা আঁৎকে উঠি...খুব বকলুম ব'লে অবলা জীব তারে পোষাই বা কেন...কি বলবেন বলুন...জাতে ওরা ডোম, ছোট জাতদের আবার মায়া মমতা...মন বলতে কিছুটি ওদের নেই...উনিও বললেন পূর্ব্বজন্মের পাপ হলে হাড়ি ডোম হয়, যে এবং তাঁহার স্বর ক্রমবিলীয়মান হইল।

মনিব মহাশয় বলিলেন, সত্যই বলুন! হাড়ি ডোম উহাদের মন থাকিবে, মমতা থাকিবে ইহা আশা করাই বাতুলতা...।

প্রধানা শিক্ষয়িত্রী ও তদীয় পার্শ্ববর্ত্তিনীরা সরমে কুণ্ঠিত, অধোবদন; মারাঠি সাড়ী পরিহিতা ও তাহার দিদি পর্য্যন্ত, যদিও তাহারা বঙ্গের বাহিরে প্রায় বাঙালীবর্জ্জিত স্থানে থাকে, তবু, যে সকলেই মলিন, যে সকলেই নিজেদের আড়ষ্টতা কাটাইবার মানসে সুঘরাইএর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিল।

প্রধানা শিক্ষয়িত্রী এহেন নোংরা ধারায়, মনিব পত্নীর, বলার ভঙ্গী জীবনে শুনেন নাই, একমাত্র এখানে স'স টানের রাহিত্য থাকে; অতএব তাঁহার ভিতরে এখন বিতৃষ্ণা উদ্ভূত হইয়াছে, তাজ্জব যে এমনও একদা সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে অন্তত সব সত্ত্বেও মনিব পত্নীর শুধু আরশোলা ভীতি আছে জানিয়া তাঁহাকে মার্জ্জিত বলিয়া বিবেচনা তাঁহার হইয়াছিল।

আরশোলাকে ঘৃণাতে প্রধানা শিক্ষয়িত্রী বড় সুখী হইয়াছিলেন, নিজের সহিত মিল দেখেন, যে মনিব পত্নীরও একই ঘৃণা আছে—। এখন নিশ্চয় মনে হইল তাহা মিথ্যা বালখিল্যতা, সম্প্রতি কোনমতে যেন স্বগতেই তাঁহার ওষ্ঠে বাক্য স্ফুট হইল! কি অসভ্য! তৎসহ উঁহার গোষ্ঠির সকলেই সুঘরাই প্রতি নেত্রপাতে সমস্বরে মন্তব্য করিল, ওমা কি অসভ্য ভাই!

অবশ্যই এবম্প্রকার উক্তি মেয়েরা যেন তাহাদের স্বীয় ইজ্জতের কারণেই বিশেষত করিয়াছিল। এবং, ঐ পদ প্রকাশের বৃত্তিতেও প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর কিন্তু যে পূর্ব্বলব্ধ ভ্রষ্টতা যেমন তিরোহিত হয় না, এক ঘৃণা হইতে অগণন ছুঁৎমার্গে বিশালা ব্যক্তিত্বশালিনী প্রধানা শিক্ষয়িত্রী উৎক্ষিপ্ত হইলেন।

অন্যপক্ষে যে এরূপ সঙ্গীন তিনি যে তদীয় অভিভাবকত্ব অধীনাদের প্রতি তাকাইতে তিনি অসমর্থ; ক্বচিৎ আপনার সূত্রের কথা মনে হইল যেন, ধীরে তিনি শিক্ষয়িত্রী-বিহিত রীতিতে মস্তক আন্দোলিত করত সকলকে একাগ্র করত অনেক কষ্টে আরম্ভিলেন, সিলি দ্যাটাস ব্যাড! অর্থাৎ মেয়েদের ঐরূপ মন্তব্য।

যে এইটুকুতে তাঁহার হৃতমান ফিরিল, যে এই টুকুতেই ক্লান্তি বিদূরিত হইল, যে এই টুকুতেই প্রত্যয়ের সঞ্চার হইল। ঐ ছোট ইংরাজী পদ ব্যবহারে ভব্যতা সম্পর্কে তিনিই প্রথম সচেতনতা আনিলেন, যে অবশ্যই তিনি সদসৎ তত্ত্ব পর্য্যায়ে মনিব দম্পতিরে লইতে পারিবেন।

সুতরাং সুঘরাইকে কেন্দ্র করা তাঁহার কোন অভিপ্রায় নাই—শুধু মাত্র তাহারে উপলক্ষ করিয়া সাজাইতেছিলেন যে ডোম বলিয়া ইত্যাদি! কিন্তু অসাধনেই যেন বলিলেন,—আপনি না শুনিলাম, খাদ্যাখাদ্য বিচার করেন না...অক্‌সো (oxo) খাইয়া থাকেন, এবং যাহাতে এই উক্তি আঘাতরূপে না বুঝায় তজ্জন্য তাঁহার মুখে স্নেহপ্রযুক্ত হাস্য ছিল।

অউক্‌সো! কে বলিল...!

আমিই সিদিন বল্‌ছিলুম, যে মুরগীগুনো সব মারা গেল হঠাৎ, রাতে কিছু নাই...সব্বাইকে খুঁজতে পাঠালুম; অবশেষে অউক্‌সো...ছিল...!

এ সময়ে প্রধানা শিক্ষয়িত্রী তাঁহার সঙ্গের বালিকাদের ঐ বিশেষ্যটি সম্পর্কে কৌতূহল দর্শনে তাহা নিবৃত্তির মানসে নিম্নস্বরে কহিলেন, অক্‌সো...না বভরিল কোনটি, বিফ ইন বৃফ্ (beef in brief)। আমার ত ভুলিয়া যাওয়া উচিত নহে, কোথায় দেখিয়াছি—আঃ আমার বয়স হইয়াছে, রহ মনে করি, ইনসিওর ইট্ উইথ গিলেনডারস্—সম্ভবত অক্‌সোই?...কিন্তু ইহার পরক্ষণেই উৎরাই-নামার বেসামাল তাঁহাতে, কেননা ঐ অক্‌সো সূত্রে মনিব পত্নীর ভদ্রতা-ব্যভিচারিণী কথা তাঁহাকে জ্বরগ্রস্ত করিল। যুগপৎ স্বদেশীনেতার মন্তব্য কানে আসিল, গরু খাওয়া ঠিক নয়!

এই বিষয়ে বিলাসিতা-বিরোধী স্বদেশী নেতার জবাব প্রথমে প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর আরামপ্রদ বলিয়া বোধ হয় (আদতে যেহেতু প্রথমত ঐ ব্যক্তি মনিব দম্পতিদের বুজরুক বলিয়া থাকে ও তাঁহারা অত্যন্ত ধনী বিধায় ইংরাজের খয়ের খাঁ বলে) তাই এই নেতাকে তিনি পছন্দ করেন—আবার অপছন্দ করেন খুবই, কেন না তাঁহার স্বামী বলিয়াছেন যে তাঁহাকে এ্যানারকিষ্ট দীননাথ জানাইয়াছে ঐ লোকটি নিজের ফটোর একটি ব্লক করিয়াছে, দুঃস্থ নির্ব্বোধ পত্রিকাওয়ালারা যাঁহারা ব্লক ছাপান উচ্চমানভাবে, তাঁহাদের দিয়া থাকে, ছবি ছাপায়।

এইভাবে সেই লোকটি জনপ্রিয়। লোকটি রাজনীতিবিদরা যেমন হইয়া থাকে, চরকা কাটে, অনেক

গ্রামে প্রহৃত হইয়াছে, অনেক বন্যার টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে...এ-ক্লাস প্রিস্‌জনার ত দূরের কথা কখনও বি-ক্লাসও নয়! এখন কোন এক মিউনিসিপালিটির ধাঙ্গড় নেতা, সে তাহাদের শোষণ করিতেছে, বলে পৃথিবীতে রাজা বলিয়া কিছু নাই! যুবতী দেখিলেই কামে গোঁয়ার হইয়া উঠে! এই বিলাসিতা-বিরোধী স্বদেশী নেতা মনিব পত্নীর মুখে অক্‌সো গো-মাংস শুনিয়া মহা ধিক্কারে কহিলেন, গরু খাওয়া ঠিক নয়...একে গরম দেশ, গরু মানুষের উপকারী...আমাদের দেশ...।

ইহাতে মনিব পত্নী নিদারুণ অবজ্ঞায় মুখ ঘুরাইয়া লইয়াছিলেন, এমন যে তাহার সহিত তাঁহার বাক্যালাপে মানহানি ঘটিতে আছে, বিলাসিতা-বিরোধী স্বদেশী নেতা প্রস্থান করিল। তিনি, মনিব পত্নী এখন নিলর্জ্জভাবে বলিয়াছিলেন,—গরম দেশ...উনি যেমন বলেন মেয়েছেলে সহ্য হচ্ছে না? আর গরুর মাংস ত কি কথা...! সমবেত সকলে এই সরলতায় বিশেষ আমোদিত হয়। একমাত্র প্রধানা শিক্ষয়িত্রী ব্যতিরেকে, যিনি এখনও যুবতীর ন্যায় কণ্টকিত লাল হইয়া থাকেন। তিনি বড়ই অপদস্ত হইয়াছিলেন।

এখন প্রধানা শিক্ষয়িত্রী কোনক্রমে ঐ বিষয় এড়াইতে তৎপর হইয়া কহিলেন,—কিছু মনে লইবেন না, আপনাদিগের তুল্য এত উচ্চশ্রেণীর অর্থাৎ মানে...যা বলিতে চাহি তাহা ইহা যে...ইত্যাকারে তাঁহার কণ্ঠস্বর শ্লেষাত্মক হইতেছিল, জাতিতত্ত্ব লইয়া ঝটিতি বলিলেন—আমাদের কাহাকেও ছোট ভাবিয়া অর্থাৎ ছোট করিয়া বড় ভাবা...মানে ঈশ্বর যাহাকে যেমন করিয়াছিলেন...কি উচিত...শোভা পায় না...।

মনিব মহাশয় অত্যন্ত বাধিত হইয়া উত্তর করিলেন,—আমার বাক্য আপনি মার্জ্জনা করিবেন—আমাদের এই চমৎকার ঘৃণা অবজ্ঞাটা থাকিতে দিন...।

যে প্রধানা শিক্ষয়িত্রী একদা নিঃসংশয়চিত্ত হইলেন যে মনিব মহাশয় নিজে আত্মসমালোচনা করিলেন, আবার একদা ভ্রূকুঞ্চিত তাঁহার হইল, অতএব কোন তত্ত্ব অনুমানে—মনিব মহাশয়ের উক্তি কি শ্লেষ-নির্ঘাত তাহা অবধারণে তিনি মুস্কিলে ছিলেন; সম্ভবপর হইলে এই স্থান তিনি ত্যাগ করিতেন, তবু স্বভাববশত উত্তর করা উচিত বিধায়ে ব্যক্ত করিলেন,—মানুষ কোন কদভ্যাস বা...আপনার ন্যায় ব্যক্তি এরূপ...মনোভাব।

সম্ভ্রান্ত শিক্ষিতা ভদ্রমহিলার মন্দ দশা বুঝিয়া মনিব মহাশয় বিচলিত হইয়াও বলিতে উদ্যত হইলেন যে আপনি কি মদীয় জীবনী পাঠ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি স্তব্ধ।

এখন খানিক শাসনের ভঙ্গীতে বিড়ম্বিত প্রধানা শিক্ষয়িত্রী ব্যাখ্যা করিলেন,—উহাদের ডোম বলিয়া ছাড়িয়া দিলে চলিবে না...আমাদের কর্ত্তব্য উহাদের শিক্ষা দেওয়া...ক্রীশ্চান ধর্ম্ম বলে...আমরা ত বলি মানুষকে সৎপথে চালিত করা...বালককে...সে চপলমতি, তাহারে শিক্ষা দিতে হইবে যে পক্ষী হইলেও উহাদের সুখদুঃখ বোধ তথা প্রাণ আছে...এখন হইতে যদি শিক্ষা দিতে অবহেলা করি তাহা হইলে, একটু একটু করিয়া যে পাপ আত্মায় প্রবেশ করিতেছে...!

মনিব মহাশয় তদুত্তরে, তিনি আবাল্য জানিতেন আত্মা সম্পর্কে ভগবান কি বলিয়াছেন, তিনি আলস্য ত্যজিয়া মৌখিক বিনয়ে নিবেদন করিলেন,—সুঘরাইএর ভাবান্তর কোন আলোচনার বস্তু নহে...ইহা অবশ্যই একশবার যে আপনি যাহা বলিলেন তাহা অভ্রান্ত—তবে যদি অনুমতি করেন তাহা হইলে বলি যে সুঘরাইএর উক্ত ব্যবহারে কোন আত্মসুখ নাই—সে নিষ্পাপ! উহা নিষ্পাপ! যেমত যেমন পিঠোপিঠি ভ্রাতা ভগিনীতে ঘটিয়া থাকে...আমি দেখিয়াছি ও নিজে পাখীটিরে আঘাত করিয়া বলিতেছে, আমারে তুই মার না কেন?—সহজ সম্পর্ক তাহা ব্যতীত অন্য কিছু না,...জানিবেন ইহা খুনসুড়ীই, কেহ বলিতে পারেন যে মাত্রালঙ্ঘিত খুনসুড়ী ইহা, তবু ইহা খুনসুড়ী!

এবং ইহার সহিত—যে তিনি শিক্ষিত, যে তিনি চিন্তা করিতে পারেন, ইহা যাহাতে সুস্পষ্ট হয়, তৎপ্রবর্ত্তিত উত্থাপন করিলেন যে, ইহার মধ্যে সেই ঐতিহাসিকতার আঁশ নাই, যাহা কোন ফরাসী পাদরী (দু'বোয়া!) মনে পড়ে যাহারে 'প্লেইজির ইল্লিসিট' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন ইহা তাহা নয়!...ইহা অতীব প্রাচীন মনুষ্য বা বালকস্বভাব মাত্র...দেখুন মানুষে অনেক বিশ্রী বস্তুর সুন্দর নামকরণ করে, তেমনি উচিত ছিল এই সহজ সাধারণ স্বভাবের একটি বিশেষ নাম দেওয়া...তাহা হইলে...আমরা ইহার চরিত্র বা প্রকৃতি নিরূপণে নিশ্চিত হইতাম...আমার ধারণা ইহা সম্পূর্ণ পূর্ব্ব-কথিত সম্পর্ক ইহা।

চশমাটির ফ্রেমে ঠিক দিয়া প্রধানা শিক্ষয়িত্রী অল্প হাসিলেন অর্থ এই যে কাহারও বিদ্যার

অভিমানকে চোট দেওয়া তাঁহার অভিপ্রেত নহে কহিলেন বটে আপনার যুক্তি অন্যায় মানিবে না, বলা যায় পক্ষপাত অর্থাৎ শূন্য নহে...(!) আপনি একটি অনৈমিত্তিক বৃত্তিরে রাসিওন্‌লাইজ করিতে চাহিতেছেন...আমরা দৈনন্দিন জীবনেতে...জীবনের মধ্য হইতে অনেক তত্ত্বাভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারি, তখন সিদ্ধান্ত হইবে যে, কথিত ঐ প্রকার খুনসুড়ী বা তদর্থবাচক শব্দ যে কোন...যে কি পর্য্যন্ত বিঘাতক...উদাহরণস্বরূপ ভাই-ভাইএর তাদৃশ পরস্পরের প্রতি আচরণ, কালে কলহ এবং যে কলহের পরিণামে পরিবারের সকলেরই মর্ম্মপীড়ার কারণ হয়,...এইরূপে প্রতিবেশীতে ও সমাজে বিশৃঙ্খলতা...আমরা দেখিব যে লঘুতা খেয়ালখুসী, বড়ই দুঃখজনক, বড় ব্যথার কারণ হয়...ঈশ্বর বড়ই...।

ক্ষমা করিবেন, যতদূর মনে হয় ভগবান উহার, সুঘরাইএর জন্য লজ্জা পাইবেন না...আর যে, আপনি যাহা বলিলেন তাহাতে বুঝায় উহারে আইন অনুগ করা—এবং যুগপৎ তিনি কহিলেন,—দেখুন দেখুন এবং তৎসহ দেখ দেখ সম্বোধনে আপন সহধর্ম্মিণীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন সুঘরাইএর প্রতি, তদীয় গাত্রে জামা সত্ত্বেও ইহা ওতপ্রোত যে সে প্রজ্জ্বলিত কিছু শিখা সকল, তিব্বতীয় টঙ্ক যাদৃশ—তেমনই, এখন ডিগ্‌রিয়ার একদিকে সূর্য্য, তাহারই কিরণমালা, সুঘরাইএ প্রতিফলিত! মনিব মহাশয় জ্ঞাপন করিলেন,—তাজ্জব সে মনে হয় প্রজ্জ্বলিত ও দুঃখিত, দেখুন উহার বা উহাদের ভগবান নাই।

প্রধানা শিক্ষয়িত্রী এবম্প্রকার উক্তিতে অত্রাহি হইলেও, তাঁহার অধীনারা বিমূঢ় হইলেও, সকলেই এককালে সুঘরাইকে লক্ষ্যে অভিভূত ক্রমে তাহারা সকলে চীৎকাঠের বাঁধ, ও অগণন তালবৃক্ষ ও সিজেল জাতীয় বৃক্ষ (!) মহিমা আর অনেক সম-বিসম ইদানীং ফলসা-টে উঁচু নীচু জমির পিছনে ডিগ্‌রিয়ার দক্ষিণে মারচস্‌ সূর্য্য দেখিল! তাহারা বিমোহিত। ইহাদের মধ্যে পার্শী সাড়ী পরিহিতা সম্ভ্রান্ত সৌভাগ্যবতী যুবতী কহিল,—যে ঈশ্বর আছেন তাহা উহারে...জ্ঞাত করা বিধেয়...আঃ ঈশ্বর বলিয়া সে আপনকার উত্তমাঙ্গ বড় নিশ্চিন্তে অলৌকিক নির্ভাবনায় ডিগ্রিয়ার বৈভবের চারিদিকে ঘুরাইল। সে নিকটে ছিল, সুতরাং বৈকালিক প্রসাধনে ব্যবহৃত জলসেকের আর্দ্রতার, এখনও, এত ভ্রমণেও, চাকচিক্য প্রতীয়মান, পার্শী কায়দায় সে বড় দূরে ছিল, তাই সে অদৃশ্য।

তাহার ঐ বাক্য মনিব দম্পতি, যাঁহারা ধর্ম্মবিশ্বাসে অন্ধ, ভগবান বলিতে যাঁহাদের নয়ন সজল হয়, তাঁহারা সমস্ত সৃষ্টি হইতে হস্তদ্বয় তুলিলেন, মনিব পত্নী গললগ্নিকৃতবাস হইলেন, আপন আপন জুতা ত্যাগ করিলেন ও বক্ষস্থলে করজোড় স্থাপন করিলেন। তাঁহারা অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিলেন। অতঃপর এবং ঐভাবেই মনিব মহাশয় বলিলেন, আমার ধ্রুবজ্ঞান যে বালক আপনার ধর্ম্মবিশ্বাস আপনি বহন করিতেছে।

মনিব পত্নী তদীয় সমৃদ্ধ পুষ্ট দেহ দুলাইয়া এদিক সেদিন নজরের পর শান্ত স্বরে সুঘরাইকে আজ্ঞা করিলেন,—আ মোল যা ছোঁড়া সন্ধ্যেবেলা বলেছি না স্থির হয়ে থাকতে হয়, এত ঘুগ্‌ঘুর করছিস কেন মরণ...! কাছে কাছে থাক না—ইহাতে এই শেষোক্ত পদে ইনি কিছু ব্যক্ত করিলেন,—এখানে আয়...ও লজ্জা কচ্ছে বুঝি, বুঝেছি খবদ্দার পাখীটারে কষ্ট দিস নি...শুনলি ত ওতে পাপ হয়!

এবম্ভূত অভিযোগে, সুঘরাই বটেই যে নিগৃহীতই ছিল, যদ্যপি যে সে সহজ হইতে উন্মুখ, কিন্তু সে আপনাকে প্রকৃতই শান্ত রাখিতে লায়েক না, সে অসংলগ্ন হইয়া আছে; সে মনিব পত্নীর উপর যারপরনাই ত্যক্ত বিরক্ত হইতে সাহসী হইয়াছে; নিশ্চয়ই সে ভাবিয়াছে যে এত লোকসমক্ষে তাহাকে হেয় করা (!) সঙ্গত হয় নাই ও তৎপ্রভাবে সে দূরে থাকে, এবং সপক্ষে এই কথাই তাহাতে উত্থাপিত হয় যে সে বিবেচনা করে যে, যে কেন এই শালা!—এবং এই শালা উচ্চারণেই সে সচেতন যে, তাহার কোথাও এতক্ষণ গর্ব্ব হইতেছিল—অর্থাৎ আপন পাখীর কারণে ঐ গঞ্জনা তাহার গৌরব—যে সে আত্মপ্রসাদে, যাহা এইরূপে ব্যাখ্যা করা যায় যে, তবু ত অর্থাৎ তবু ভাল ইহা যে সে তদীয় পক্ষীর হেতুতে কথা শুনিতে আছে! পুনরায় সুঘরাই আপন পক্ষীর দিকে নজর রাখিয়া ইহা যেন কহিতে লাগিল যে:

এই শালা, এখন, যে, এই বিরাট জবা রঙ টিলায় ঘুরিতে ফিরিতে আছে শালা, তোমার জান না বড় খচ্চড়, কিছু দিন পূর্ব্বে আমি যখন খাঁচার কাঠি বদলাইতে সারাইতে কাঠি চৌরস করি, একনিষ্ঠভাবে মোহিলির দেওয়া মন্তর উচ্চারণ করিতেছিলাম, যদি না করি তাহা হইলে, ভূত খাঁচার কাছে আসিবে;

ভূত খাঁচায় ঢুকিবে, উহাকে বধ করিবে...আমি যে কত উহারে ভালবাসি...আমার তিতির তখন আমার কোলেই বসিয়াছিল, মন্তরের মাঝে মাঝে আমি তাহার সহিত গল্প করিতেছিলাম, আশ্চর্য্য যে সে আমার কোল সে নোংরা করে নাই, আমার হাতে ধারালো ছুরি, বাঁশ ফাড়িয়া দুই একটি কাঠি সবে মাত্র তৈয়ারী করিয়াছি হঠাৎ এমত সময় পাখী নড়িতেই আমার এই আঙুলটি কাটিয়া যায়, যে অনেক রক্তপাত হইল, আমার পরনের বস্ত্রে কিছু পড়িল,...অনেক অনেক মেজেতে; আমি লাফাইয়া উঠিয়া পড়িলাম, আমার এত আদরের পাখী শালা কিছুই বুঝে না; পাখী দূরে দূরে অবশ্য আমার দিকে চাহিয়াছিল, শুনিয়াছি...পাণ্ডাঠাকুরের ময়না পাখী। পাণ্ডাঠাকুর মরিতে অনেক কাঁদিয়াছিল, দু-তিনদিন কিছু গ্রহণ করে নাই, শুনিয়াছি বদরীবাবুর কুকুর, তিনি মরিতে, পাগল হয়।...দেওঘর হইতে দারগা আসিয়া তাহাকে গুলি করে! বেচারী।—অনেক রক্ত দর্শনে আমাতে ঘোর উপস্থিত, আমি আঙুল চাপিয়া বসিয়া পড়ি, প্রথমে পাখীটি আমার সেই পতিত রক্তের উপর দিয়া নির্ব্বিবাদে চলিয়া যায়, মেঝেতে অনেক পায়ের রক্তাক্ত ছাপ অবলোকনে আমি ভীত হই—আঃ নাট্যকাররা কি সুদক্ষ কি চতুর, এহেন ভীতিকে চমৎকার স্বগত উক্তিতে রাখিয়া থাকে!

সুঘরাই লজ্জাতে কাঁদিবে এমন, মরমে সে মরিয়াছে!

তাদৃশ সদ্য রক্তাক্ত ছাপ সকল বিস্ফারিতনেত্রে সুঘরাই দেখিতে থাকে, সে যেমন যে ইহা যে গণনা শিখিবে, ঐ এলোমেলো মুদ্রণে তাহার জিজ্ঞাস্য ছিল অঢেল, কিন্তু সে আর স্থির থাকিতে পারে না, সবেগে বাগানে গিয়াছিল দ্রুতই, কিছু গাঁদাপাতা আহরণ করত ক্ষত স্থানে চাপিয়া, ঐ কথিত স্থানে ফিরিয়া সে বজ্রাহত, তাহার মাথা আপনা হইতে আনত হইল, যে সে যেমন উচ্চবর্ণসম্ভূত, সে ডোম নহে, কেন না ছোটজাতদের মস্তক কখনও আনত হয় না, তাহার বেচারী নেত্রপক্ষ ভারাক্রান্ত হইল, তখনও সে হতবুদ্ধি সে তটস্থ, যে তাহারই রক্ত তাহারই প্রাণাধিক প্রিয় পক্ষী খানিক মস্তক কাৎ করত অপূর্ব্ব শোভাতে চঞ্চু দ্বারা রক্ত পান করিতে একমনা আছে।

ক্রমে তদ্দর্শনে সুঘরাই শনৈশ্চর হইল, চক্ষুর্দ্বয়ে জরাভঙ্গ দেখা দিল, যে সে উঠানে মৃত্তিকায় দানবীয় ক্রোধে পদাঘাতে আপনারে জাগ্রত করিল, যে সে ঢেলো ভুলে নাই, শুধু দৌড়াইয়া গিয়া দশ মরদ জোরে লাথি মারিল; এই রক্ষা যে লাথির সবটা অর্থাৎ পায়ের পুরা চোট, পাখীর গায় লাগে নাই, তাহা হইলে, বেচারী পাখী তৎক্ষণাৎ প্রবল বেগে উৎপাটিত উৎক্ষিপ্ত হওয়ত দেওয়ালের সংঘাতে নিশ্চয়ই মরিয়া যাইত! এখন লাথির স্বল্প ঘা'য়ে পাখীর দুইচারিটি পালক খসিল আর যে পাখী ত্রাহি চীৎকারে এক কোণে যাইল, কম্পিত ছিল; ঐ আতঙ্কিত পক্ষীর ভয়ার্ত্ত আর্ত্তনাদ অনুরূপ তাহারও কণ্ঠে ধ্বনিত আপনা হইতেই অগোচরেই হইতেছিল, আপাততভাবে মনে হয় সে যেমন বা ভ্যাংচাইতেছে; এবং সুঘরাই নিজ বেগে বেসামাল হওয়ত, সশব্দে পতিত হয়।

ঐ শব্দে মনিব পত্নী দ্বিপ্রাহরিক নিদ্রা উত্থিত হইয়া ঐ স্থলে যাইয়া এবং তখন সুঘরাইকে ছুটিতে দেখিয়া ও তৎসহ রক্তাক্ত মেজে প্রত্যক্ষে হা হা রব করিয়া উঠিলেন, তাঁহার মাথা কেমন করিয়াছিল, তথাপি জিজ্ঞাসিলেন,—ওরে এত রক্ত কোত্থেকে এল সব্বনাশ, তোর পাখী কৈ রে...কিরে অমন হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস...পাখী কৈ...শব্দ হল কিসের—তোর কাপড়ে রক্ত কি সব্বনাশ!

সুঘরাই আনুপূর্ব্বিক সকল কিছুর বিবৃতি দান করিল না।

সত্বর ফার্স্ট এইড বাক্সটি লইয়া আসিয়া তাহার ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ করিলেন, সুঘরাই আইওডিনে লাফাইতে লাগিল, মনিব পত্নী তখনও বিস্মিত হইয়া আছেন, বলিলেন, বেচারী তোর দুঃখেই বুঝি অমনধারা ক্যাঁক্যাঁ করে উঠল! আমি বলি বেড়াল টেড়াল...!

সুঘরাই এখনও দারুণ রোষদগ্ধ, তাদৃশ বীভৎস কদর্য্য দৃশ্যে সে মতিচ্ছন্ন, তাহার ওষ্ঠ কাঁপিতে আছে, প্রকাশিল যে,—বেড়ালে ধরিলে খুব ভালই হইত, ঐ পক্ষী রাক্ষসী উহাকে আর সে পুষিবে না...উহা রাক্ষসী ভূত পেত্নী...আপনি শুনিলে বিকল হইবেন যে, উহা আমার রক্ত নির্দ্বন্দ্ব মনে মাড়াইল, ঐ দেখুন সারা মেজেতে উহার রক্ত লাগা পায়ের দাগ, তখনও কিছু বলি নাই, দেখিলাম সে আমার রক্ত খাইতেছে, আমি রাগিয়া যাই আমি লাথি মারি আমি পড়িয়া যাই! উহা পেত্নী মনে হয়, উহাতে পেত্নী ঢুকিয়াছে নিশ্চয়...এই বার তাহার চোখে জল আসিল। এ বিষয়ে সে মোহিলিকে খবর দিবে।

স্নেহময়ী মনিব পত্নী তাহারে ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন এইরূপে যে, তুই ছোঁড়া মহা পাগল,...দেখছি

সাক্ষাৎ পাপ তুই—যা আগে কাপড় ছাড়...ফের যদি করিস তোর কান ধরে উনি বার করে দেবেখন—পরে সান্ত্বনা দিয়াছিলেন,—দেখ দেখি কি কাঁপছে বেচারী, তুই না ওকে দারুণ ভালবাসিস...ওর কি জ্ঞান আছে...ও সব করবে, তুই তাতে মারবি কেন...তুই না বলিস আমাকে যে, মা আমাকে তি তি করে ডাকবে আমি আসব...তুই না সিরিয়া পাহাড়ে ওর নাম লিখবি!...ছোঁড়া উনি শুনলে তোকে আস্ত রাখবেন...তোর পাখী হারাতে উনি না খুঁজতে যান, কত টোটা নষ্ট হল (সেদিন অবশেষে মল্লিক লজের পশ্চাতে ভাঙা বাড়ীর কাছে যখন গুলি ছোঁড়া হইল তখন—তিতির কোথা হইতে বাহির হইয়া উড়িল—এবং একজন যুবক ও যুবতী, ইহাদের মুখ পাংশু ছিল। যুবতী শুনি, দুল হারাইয়াছিল, তাই যুবকের সহিত খুঁজিতেছিল)...ওর গায়ে পা দিলি! নমস্কার কর ছোঁড়া, ওতে না ঠাকুর আছেন? ও অমন হবে কেন...জানিস ওদের চোখেও জল আছে, নে ছোঁড়া নমস্কার কর শিগগীর।

সুঘরাই আপনার পক্ষীরে নমস্কার করিল। তিতিরটি গ্রীবা তুলিয়া সুঘরাইকে দেখিতে আছে। সুঘরাইএর দেহ সুমহৎ বেপথু খেলিয়া উঠিল, একদা শ্রাবণের ঘোর শ্যামবর্ণ মেঘের নিকট সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, সে পাখীটিকে বুকে রাখিবে, সে পিঙ্গল-রক্ত স্রোত স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে সে পাখীকে বুকে রাখিবে, যে সে গম্ভীর অশ্বত্থ বৃক্ষের নবোদ্গত পত্র স্পর্শে প্রতিজ্ঞা করে যে সে উহাকে বুকে রাখিবে!

প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর কন্যা তেমনই শান্তকণ্ঠে তাহার মাতাকে অনুজ্ঞায় জানাইল, মা গো, এই সুন্দর স্থানে তুমি এনড্রু মারভিলের সেই 'অন এ ড্রপ অফ ডিউ', আবৃত্তি কর না, কি মায়াময় স্থান ইহা হয় যে—একবার বলিলেও মনে হইল সে যেমন বা এক বক্তব্য তিনবার বলিতেছে।

প্রধানা শিক্ষয়িত্রী ঐ প্রশংসায়ে ছেলেমানুষ হইয়া থাকেন, সগর্ব্বে ঝটিতি কহিলেন,—তোমার আবৃত্তি আমি শুনিব—এবং তখন সুঘরাইকে নিকটে আসিতে দেখিয়া কিয়ৎ তাঁহার সারমর্ম্ম নীতিসূত্র করার বৃত্তি হইতে, খানিক পূর্ব্ব-তর্কসূত্রে নিজের যুক্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে, অবশ্য ইনি ঈষৎ খুসী ছিলেন যে, মনিব মহাশয় তর্ক নিয়ম অনুযায়ী করিতে পারেন নাই, মাত্র নিজের জাত্যাভিমান, যদি তাহা ব্যক্তিত্ব হয়, তবে তাহাই ব্যবহার করিয়াছেন, আরও যে তিনি প্রমাণিতে চাহেন,—মনিব পত্নীর নাকছাবিতে হাত দেওয়াতে, ইহা সেকেলে যে তাঁহার নাকছাবি নলক দাগ নাই, আরও, আর যে তাদৃশী বিতর্ক তাহার ভাল লাগিতেছিল; তৎপ্রভাবিত সংজ্ঞাভূত করিলেন,—নিশ্চয় মানিবেন—কোন প্রাণী বিশেষত...এই সব জিনিষ পোষা ভাল নয়...সেদিন যেমন উনি স্বামী বলিতে ছিলেন...মনে পড়িবে।

সেই সাঁওতাল নাচের দিবস! আর প্রধানা শিক্ষয়িত্রী যিনি বসন্তের হাওয়াকে নির্দ্বন্দ্বচিত্তে শাসন করিতে পারেন বেশ তফাৎ আছিলেন।

এই বাড়ীর যেখানে কুঞ্জ গোছের, ছিটকান আলোয় দেখা যায় সাঁওতালরা পুরুষ-রমণী মিলিত সমাবেশ, চুটার ধোঁয়া উত্থিত, মহুয়া মদ তাহারা যেন চর্ব্বণ করিয়া খাইতেছে! ঘুমন্ত মুরারীবাবু, ঐ শিশুকেন্দ্রিক গুলজার—যেখানে সেখানকার আধ-গদ্-আপ্লুত স্বর শুনিতে আছেন; কিন্তু উহা ছাপাইয়া—তাহাতে পরিতোষবাবু যিনি তাঁহার স্ত্রীর দক্ষতা বলিতে ক্রমশঃ এক্‌শা অর্থাৎ যে পুরুষ, রমণীর রহস্যময় বৈপরীত্যপরতন্ত্র বুঝিয়া মুগ্ধ বিহ্বল; ত্রাস-মিশ্র-শ্রদ্ধায় যে সদাসর্ব্বদা আছে, সেই সেই ব্যক্তির গুমরান ধরনে, তিনি বিশদে বলিতেছিলেন,—আমার স্ত্রী, নিজে ভুবনবাবুর মেজমেয়ে, যে ছেলে হওয়ার আগে খুব পাত খোলা চিবাইত, খুব চট সেলাই করিতে পারিত—তাঁহার পরম সুন্দর পুত্র হইল, এই পুত্রের আঁতুড় দরজার পাশে আমার স্ত্রী নিজ হাতে চমৎকার দোয়াত কলম তালপত্র রাখেন—এই দোয়াত কলম তালপাতা আজও মদীয় গৃহে আছে...হ্যাঁ...রাত্র যখন নিশুতি...এক চমৎকার ফুলের গন্ধে তাঁহার তন্দ্রা কাটিয়া যায়, দেখিলেন এক তেজের মধ্যে বিধাতা পুরুষ! মদীয় স্ত্রী বুদ্ধিমতী, প্রণাম অন্তে জিজ্ঞাসা করিলেন,—প্রভু, মানুষে এত কষ্ট পাইয়া থাকে কেন! বিধাতা পুরুষ কহিলেন—যে সে জন্মায় এই কারণে।

আশ্চর্য্য যে পরিতোষবাবু কদাচ বলিলে বিশ্বাস করিবেন না বা পৃথিবীতে কত কি ঘটে আমরা কি জানি ইত্যাকার বচনে কৈফিয়ৎ কভু দেন না। মদ্যপ মনিব মহাশয় আপ্লুত স্বরের মধ্য হইতে বলিয়া

উঠিলেন,—দেখ নৃত্যে জমি কি দারুণ চৌরস হইতেছে, এক অভিনব স্থাপত্যের গড়ন ও ভাঙ্গন পুনর্নির্ম্মাণ হইবে...ডাগর নৃত্য হইবে! সুঘরাই তুমি খুবই ভুল করিয়াছ, যাও পক্ষী লইয়া আইস, সেই এ-ই জাঁকাল নৃত্য দেখিবে। ভয় পাইও না...কুকুর তোমার পক্ষীরে কিছু বলিবে না...।

সরসীবাবু যিনি মামলায়, প্রিভি কাউনসিলে তিনি বা তাঁহারা জিতিলেও, তিনি বা তদীয় পিতা সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন, তাহাদের অট্টালিকার মর্ম্মর বিক্রীত হইয়া সুদূর সিংহলে গিয়াছে, বাড়ী ভাড়ার বিনামূল্যে রাবিশ দেওয়া হয় পড়িয়াছেন, এখন বাগান করেন, ইহার নিকট ছিলেন। পরিতোষবাবুই বা কেহই এক্স-রূপে (X) পরিণত হয় না, সব সময় ইঁহার নাম উল্লেখ্য; ইনি সেই বিধাতা পুরুষের দুর্ব্বল উত্তরে হাসিলেন, তখনই শিশুকেন্দ্রকে ভাঙ্গিয়া অনেক মহিলাকে দ্রুত পদে যাইতে প্রত্যক্ষ করিলেন। ইনি উদ্ভট অপ্রাকৃতিক, যে অথচ ইনি সুপুরুষ যে এবং একাহারী সংযমী! সকলকেই চিঠি লেখেন।

লোহার গেটের ছায়া গ্রাভেলে, অরকেরিয়ার গাছ হইতে মাগনোলিয়া-গ্র্যাণ্ডিফ্লোরাতে—আঃ মাগনোলিয়া কি অদ্ভুত কৌশলে তাহার পাপড়ী মেলিয়া থাকে—এ কারণ যে এই বাড়ীর গেট আগে-পাছে করিতেছিল! এ কারণ যে একটি সুকুমারমতি বালক, নবম বর্ষীয় যে মাত্র, গেটের পাল্লার সর্ব্বনিম্ন বাতায় পা রাখিয়া, পায়ের দ্বারা ঠেলিয়া দুলিতে আছে, গেটে হাঁস-কলের করুণ শব্দ উত্থিত হইতে থাকে, তৎসহ মাঝে মাঝে অন্য মৃদু সুখবর্ষী শব্দও আছে, যাহা একটি চাবির সংঘাত, যাহা বালকের গাত্রের দোছুটিতে (কাছা গলায়) লগ্ন আছে, যেহেতু কয়েক দিবস হয়, বালকের পিতৃবিয়োগ ঘটিয়াছে। এখন সে এখানে।

উৎসবের মধ্যে যাইতে তাহার বালকের মন সরে নাই, সকলে যখন সমীপে, যখন সকলে আপন আপন উচ্ছ্বাস-উদ্যমের নিমিত্ত সবিশেষ অপ্রতিভ, যখন সকলেই কথঞ্চিৎ বিমূঢ়, তখনও বালক পাল্লাতেই! গরাদের অন্যপার্শ্বে তদীয় দুঃখ-চাবকান মুখখানি বড় সুন্দর, বড় ক্লেশ অন্যদের দিতে ছিল; সকল সম অভিব্যক্তিতে ঊর্দ্ধে তাকাইয়াছেন, ঐ ইউক্যালিপটাসের চামর পাতার আরও ঊর্দ্ধে, পুনরায় দৃষ্টি আনত ইহাদের, সমস্বরে বলিলেন, বেচারী, হায় ভগবান!

একান্তে প্রধানা শিক্ষয়িত্রী আতঙ্কিত মনে তর্ক তুলিলেন,—ইহা খারাপ, এই হয় প্রকৃতই নিষ্ঠুর! ছোট ছেলে, দেখিলে প্রাণ ফাটিয়া যায়, এই নির্দ্দোষ শিশুকে এহেন বস্ত্রে...উহাকে দোষী করা...এরূপ করার ঔচিত্য দেখি না...কবে আমাদের দেশ হইতে এই সকল যাইবে। আশ্চর্য্য কোনও ভদ্রলোক নামটা করিব না (মনিব মহাশয়) বলিয়াছেন, আমাকে মধ্যাহ্ণ ভোজনে উহারা বলিতে চাহে, আমি নিশ্চয়ই যাইব...কি হৃদয়হীন!

কয়েকজনের, নারী ও পুরুষ সত্যই ঐ লৌকিকতা যে নির্দ্দয়, এমত বুদ্ধি হয় , তাহারা সত্রাসে প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর প্রতি গভীরভাবে চোখ মেলিয়াছিলেন। তৎকালে গৃহকর্ত্রী যেখানে নাচের আয়োজন, আপনার ঘোর ছাড়িয়া, মধুর স্নেহযুক্ত কণ্ঠে জানিতে চাহিলেন, ও মা তুমি হঠাৎ।

হ্যাঁ আমাদের চাকরটি বোকা কিনা, তাই মা বলিলেন তুই যা উহার সহিত, ঐ জঙ্গলী 'স্পিরিট' কিছুতেই উচ্চারণ করিতে পারে নাই—এই বল ত স্পিরিট! (নিকটে চাকরটি ছিল) দেখুন কি মজা হয়...এই বল না...।

এই সরলতায় সকলেই অত্যধিক শোকে নিমজ্জিত, যে সকলের বক্ষঃদেশ আলোড়িত হইল, আঁখি নিষ্প্রভ ও যে সজল হইল, প্রধানা শিক্ষয়িত্রী যিনি আপন উক্তি কারণে এতাবৎ কিন্তুতে, যে তাঁহার কথার সারবত্তা, বালকের চাপল্যে (!) অর্থ-সামঞ্জস্য লাভ করিল, ফলে কপালে বিকার নাই, অবশ্য তিনিও সন্তপ্ত হইলেও তাঁহার কণ্ঠে, ইহা হয় খারাপ, ইহা হয় অমানুষিকতা, আওয়াজে স্ফীত! অথচ ইহা অচিন্ত্যনীয় যে চোরা খুসী, যে ঈদৃশ এক বর্ত্তমানতা এই শোকচিহ্ন এখানকার ফাজলামি হইতে রক্ষা করিবে, ইহাতে প্রশ্ন যে কঠিন কি তিনি, তাঁহার কন্যাদ্বয় ঈষৎ বিমূঢ় হইয়া তবুও ছিল।

বালকের এক হাত উত্তোলিত ছিল, উহা গরাদ ধরিয়াছিল, সে কহিল,—নাচ হবে বুঝি...আমি নাচ বড় ভালবাসি, আমার বাবাও খুব নাচ ভালবাসিত, মাও ভালবাসে আমি ভালবাসি নাচ...নাচ...কতক্ষণ হইবে...রাত্র বারোটা অনেক রাত পর্য্যন্ত আমি জাগিয়া থাকিতে পারি...।

সকলেই নিম্নস্বরে, 'বেচারী' উচ্চারণ করিল!

আবার সকলেই ভারী পদক্ষেপে গেট হইতে ফিরিয়া আসিতেছে; যাহারা বিলিকে ঘিরিয়া তাহারা

এহেন পদধ্বনিতে সচেতন, তাহারা ঘাড় বাঁকাইয়া পশ্চাতে নেত্রপাত করে! ইহাদের মধ্যেই জনৈক ভদ্রলোকের হাতের অন্যমনস্কতায় ছড়ির এলেবেলে আওয়াজ গ্রাভেলে সংঘাতে হইতেছে, যুগপৎ আরও অন্যান্য হস্তের ছড়ি লাঠির উৎসাহহীন শব্দ ঘটিল। সহচরীবৃন্দ এই সূত্রে অবলোক নিয়াছে যে নাচের জন্য মাঠ চৌরস করা চলিতেছে, এই ব্যক্তি কাজ করে কপাল হইতে ঘাম অপনয়ন করিল, উহার পশ্চাতে জলপানরত রমণী।

নাচ হইবে। মাদলের আওয়াজ আসিতেছে, মদ চলিতেছে! অভ্যাগতরা সকলেই এখন অনবরত একটি পদ মুখস্থ করিতেছিল, 'পেট ত ভর'ল মহন ভর'ল না হে'—ইহা সাঁওতাল সর্দ্দার মাঝি মহুয়া খাইতে খাইতে বলিয়াছে; চিঁড়া গুড় তাহারা পেট ভরিয়া খাইয়াছে, কিন্তু মদের অভাব! তাই মন ভরিয়া উঠে নাই।

সাঁওতাল সর্দ্দারের কথা, ঐ সংজ্ঞা ওষ্ঠ হইতে ওষ্ঠান্তরে! বাবুরা উহা প্রতিধ্বনিত করিলেন, বাতাস ভারী হইতেছিল, যে সাঁওতাল রমণী বক্ষবস্ত্র সামালিয়া বাঁকিয়া জল, স্বচ্ছ জল পান করিতেছিল সে তির্য্যকে চাহিল। সরসীবাবু সম্ভবত মনিব মহাশয়কে উপদেশ দিলেন,—আজ্ঞে এংগসটুরা বিটরস মিশাইয়া মহুয়া আপনি ট্রাই করিয়া দেখিতে পারেন...ভাবা যায় না! এই সেই সরসীবাবু, তখনি অতীব উদ্ভট।

আমার স্ত্রী, মহাশয় বলিয়াছি ত, একপ্রকার উন্মাদ, সেইবার শিমূলতলায় এক কাণ্ড ঘটে, আমাদের বাড়ীর পাশেই নাম বলিব না এক সৎব্রাহ্মণবংশীয় ভদ্রলোক বাস করিয়াছিলেন, তাঁহার এক কন্যা মাত্র পঞ্চদশবর্ষীয়া, সে পরমাসুন্দরী রাজার ঘরে পড়িবার মতই, বিবাহের চার মাসের মধ্যে সে শাঁখা ভাঙে, এবং যে এই কন্যার দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাহার মাতাও পান ও মৎস্য যাবতীয় বিলাসাদি ত্যাগ করেন। বেচারী সত্যই হতভাগিনী! পুত্রসম্ভবা ছিল। পুত্র জন্মিল, আশ্চর্য্য এগারো মাস সাত দিনের দিন, আমার তখনই বিশ্বাস ধ্রুব হইল, এ কোন মহাপুরুষ! আমার স্ত্রী খালাস করিবার পরে কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ী আসিলেন, তাঁহার মুখে, কি দেখিলাম কি দেখিলাম, শুধু এই কথা ছিল। তখন রাত্র অনেক, আমি কুয়ো হইতে জল তুলি, তিনি স্নান করেন, এই জল ধারার মধ্য হইতে জ্ঞাপন করিলেন—মহাপুরুষ! নবজাতক এক মহাপুরুষ আমি দেখিয়াছি কপালে জোড়া হীরা জ্বলজ্বল করিতেছে, আহা আমি মধু দিয়াছিলাম, হায় তিনজন যমদূত আসিল, আমারে ধাক্কায় দূরে সরাইল! সময় পার-হওয়া (দশমাস দশ দিনের পর জন্ম) সন্তান যতই শ্রীমণ্ডিত হউক, ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক ঘরে রাখিতে ভরসা পান নাই। আমি, মহাশয় জানি, তিরিশ এগারং তিনশো তিরিশ প্লাস সাত, তিনশো সাঁইতিরিশ, এইবার আসুন তিন তিন সাত হইল, এইবার যোগ দিন। কত? তেরো! তেরো দারুণ শাস্ত্রসম্মত পয়া শুভ সংখ্যা! মহাপ্রভু নিজেই...আচ্ছা...আমার স্ত্রী ঐ যমদূতের পশ্চাতে ছুটিলেন, ঐ যমদূতরা বনেতে যখন হাঁড়ী রাখিল, যমদূতগুলি বিস্ময়াবিষ্ট হওয়ত দেখিল, হাঁড়ীর সরা আপনি খুলিয়া গেল, দেখিল যে; মণিময় এক শিশু উঠিয়া দাঁড়াইল; দেখিল যে, ঐ তাহাদের মানে যমদূতদের প্রতি মৃদু হাসিয়া অনেকানেক রকমের আলো বিকিরণ করত গভীর বনের মধ্যে।

সহচরীবৃন্দ তখন নৃত্য অঙ্গন প্রস্তুতি দেখিয়া পুনর্ব্বার বিলির দিকে; যে এবং শ্রদ্ধায় গভীর হওয়ত এতাদৃশ অভিব্যক্তিতে একে অন্যে নয়ন মেলিয়াছে, যাহাতে বলিয়াছে, আমরা লাভ ম্যারেইজ শুনিয়াছি, আমরা বিলিকে শুনি নাই।

আঃ বিলি আশ্চর্য্য, বিলি আশ্চর্য্য, বিলি আশ্চর্য্য। উহার জন্য যে যে যুবক আত্মহত্যা করিয়াছে, আঃ বিলি! আত্মহত্যার খবরে বিলি হুঙ্কার দিয়াছে, প্রেম-কাতর মার্জ্জারের ন্যায় তাহাতে স্বরভেদ পরিলক্ষিত হইয়াছে, পুলিশ ইন্‌সপেক্টার বলিয়াছে, ডেপুটি কমিশনার এইচ. কিউ. তোমাকে দেখিতে চাহেন, তুমি নিদারুণ! ইংরাজ ডেপুটি কমিশনারের সিগারের ধোঁয়ায় বিলি অস্বস্তি বোধ করে নাই, কেননা সে হয় কালচারড তাহারে দেখিয়া ঐ ধোঁয়া নিপট হয়, তিনি বলিয়াছেন...পর পর আত্মহত্যা। বিলি তুমি ব্যবিলন...অন্তত অশোকের সময় ফিরিয়া যাও! এ শতাব্দীতে তুমি অত্যধিক, বিলি বিলি বিজ্ঞান আমাদের বিস্ময় অপহরণ করিয়াছে! জীবনধারায় এমন কোন কূট-আতঙ্কও নাই। আমরা গোবেচারা। তোমার মর্য্যাদা আমরা দিতে অপারগ!

আঃ লাভ ম্যারেজ আমরা শুনিয়াছি, আমরা কখনও বিলিকে শুনি নাই! একাবলী ছন্দে ঈদৃশী বাক্য

বলিতে, সাবেক পরিবারের কুমারীগণ, তাহারা এক উপত্যকায় গিয়াছে এবং হর্ষ পুলকিত।

ওগো পুণ্য নগরী কলিকাতা। গঙ্গা বিধৌত শ্রীশ্রীকালীমাতা আশ্রিত, ভগবান রামকৃষ্ণ পদ-ছোঁওয়া তুমি, ধন্য নগরী কলিকাতা! উচ্চবর্ণের অভিজাতবর্গের কলিকাতা। বিলিকে দয়া করিও, আর যে প্রকৃতিরে অনুনয় করিও, সে যেন বিলির প্রতি দয়া রাখে।

এই সেই সরসীবাবু, যাঁহার মুখমণ্ডল ভাসা-ভাসা ভাগবৎ পাঠকারীকে বিদ্রাবিত করিবে, অবশ্য যদি নিম্ন স্থানাৎ আলো আসে। ইনি মুরারীবাবুকে দেখিলেন। তখন মুরারীবাবু তেমনভাবেই ঘুমাইতে আছেন, যদি ঘুম ইহা, যে, কোন মুহূর্ত্তেই অথচ উঠিয়া ইনি হাসিয়া কহিবেন, আমি জাপানের সূর্য্যবংশীয় রাজপ্রাসাদ অন্তর্গত খিড়কির বাগানে জাফরান পদ্ম ফুটিতে দেখিয়াছি, আহা হরিদ্রা! তোমার মননে আমার চক্ষু জলভরা হউক। অয়ি আমার মহত্ত্ব। যে এবং আশপাশে দৃষ্টি সঞ্চারে ইহা তাহার অনুমান হইবে যে নাচ এখনও আরম্ভ হয় নাই।

আর যে পর্য্যবেক্ষণ করিবেন অলোকা তেমনই ভাবে দণ্ডায়মানা। এবং যে অন্য ধারে, শালা রাজনৈতিক-কবন্ধ, শালা, যে ক্রমবর্দ্ধমান জাতীয় চরিত্র, যে রুমাল বিন্যস্ত করিতেছিল, ইহারই এই ব্যক্তির কারণে, এই ছোট ধরিত্রীতে, অনেক রমণী অনাদৃতা হইয়াছেন! ইহার লালা-মিশ্রিত বলদ হাসি হাসি কীদৃশ নীচযান! সেই দুর্বৃত্তের শব্দাবলীতে কথাতে নারী, জাতি, শোষণ শব্দ আছে, সে ভাবে অভিজাতরাই গোঁড়া অপ্রাকৃতিক এবং সে নিজে ভূত বিশ্বাস করিলেও, ভগবান নাই, ইহা জানে!

এখনও নাচ আরম্ভ হয় নাই; রাজনৈতিক-কবন্ধ ক্রমশঃ বিকলাঙ্গ হইতেছে! সাঁওতালগণের চিঁড়া খাওয়া দর্শনে তাঁহার জিহ্বায় জল আসিল, অথচ এই ব্যক্তি প্রতি প্লেট হইতে কিছু না কিছু খাইয়াছে, বলিয়াছে অপচয় অন্যায়। এবং আড়দৃষ্টিতে দেখিল, সে সাঁওতাল রমণীদের সান্নিধ্য চাহিতে ছিল।

ঐ সেই সরসীবাবু, যিনি স্যার পি'র বহু গল্প জানেন, দেওঘর স্টেশনে স্যার পি'র খাস বেয়ারা আবদুল হাতের ঘড়ি দেখিয়া কহিল, মেরী বাবা (অলোকা) টায়েম হইয়াছে, আমি কি হুজুরকে ঔষধ দিব। কেননা স্যার পি...স্নায়ু পীড়া-গ্রস্ত; ইনি বুনো ফুল—ফুটুস গাছের সমীপে বহুসময় যাপন করেন, কেহ তাঁহাকে বলিয়াছে উহার গন্ধ স্নায়ুকে স্নিগ্ধতা দেয়। যে ঐ দিবস দেওঘর স্টেশনের ফার্স্ট ক্লাশ বিশ্রামাগারটি আর এক রূপ ধারণ করিয়াছিল, খসখসের টাট্ পর্য্যন্ত টানান হয়; এখন অসময়; রেলওয়ের কর্ম্মচারীবৃন্দ হন্তদন্ত। ইতিমধ্যে মাস্টার মহাশয়, অপরাধী যেমন, আসিয়া কাহিল স্বরে জানাইলেন,—স্যর গাড়ী এখনও মধুপুরে পৌঁছায় নাই! বুঝিতে পারিতেছি না...এবং ইনি টেলিগ্রাম যন্ত্রের শব্দের জন্য এই স্থান হইতে উৎকর্ণ থাকেন। অলোকা তাহার পিকিংগীজ লইয়া না-জ্বালা টেবিল আলোর গোলাকার কাঁচে আপন প্রতিচ্ছবি লক্ষ্য করিতে আছে, এখন তাহার আতঙ্ক নাই, সর্পভীতি নাই, এখানেও তাহার আকৃতির কোন বিচ্যুতি নাই! ইহার দরুণ প্রতিচ্ছবি মজা-উদ্দীপক হইল না, সে মাস্টার মহাশয়ের কথা শুনিয়া তাঁহারই দিকে অসহায়ভাবে চাহিল, পিতামহকে দেখিতে তাহার জোর ছিল না, কেন না তিনি বেচারী যারপরনাই অধৈর্য্য; গোলাপের কলম তাঁহার বিদেশ হইতে আসিয়া কলিকাতা বন্দরে আসিয়াছে, কয়েক রাত্র তাঁহার ঘুম ছিল না; গোলাপের কলম হাওড়া ছাড়িয়াছে তাঁহার ঘুম হয় নাই; এখন এই স্টেশনে পৌঁছিবে, তিনি গোলাপের কলম লইতে আসিয়াছেন।

সরসীবাবু সেই অভিজাতকে অপেক্ষমাণ দেখিয়াছেন। ঐ স্যর পি...মহানুভব, ঐ স্যার পি...শান্ত প্রকৃতির! ইহাও সরসীবাবু বলিতে পারেন।

একদা মনে পড়ে আমাদের লেখকের বাড়ীতে আমার বাবা, অনন্যোপায় বেড়া নিমিত্ত অনেক লেডি হ্যামিলটন ও মার্শল নীলের কাটিং রোপণ করেন, কালে সেগুলি ঝামরাইয়া উঠে। সেবার রিখিয়ায় আসিয়া এই সংবাদে স্যর পি...ম্রিয়মাণ; তিনি বেড়ার অন্যধারে থাকিয়া জানাইলেন, ইহা অন্যায়!

আমার বাবা উত্তর করিলেন,—মহাশয়, মুঘোল বাগিচায় এরূপ ব্যবহার আছে!

তিনি সলজ্জভাবে বলিলেন, তাহারা যাযাবর জাতি ছিল, খুনী ছিল! আমার বাবা তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন, শুনিলেন স্যর পি'র কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হইল, ইহার কাঁটা আছে ইহাই জানিয়াছেন, আমি

ভাবি আপনি শুধু, হায়! জানিলেন গোলাপের কাঁটা আছে...ইহা লিখিত থাকিবে! স্যর পি...অতীব দীপ্তিশীল, আবার নিষ্প্রভ কেননা মানুষের দুঃখ হইতে দুঃখতর দুঃখ তাঁহাতে আছে!

এখন নাচ হইবে।

মনিব পত্নী উতলা হওয়ত স্বামীকে বলিলেন,—হতভাগা এখনও এল না (সুঘরাই) তুমি ত তাকে...তোমার মাথায় যে কি চাপে...পাখী আনতে বললে! এই অন্ধকার রাস্তা!

মনিব মহাশয় আপন পত্নীর বাক্যে কিছু আশ্চর্য্যে থাকিয়া কহিলেন,—তোমার মনে পড়ে, আনা পাভ্‌লুভা কে...ওঃ তাহার প্রবেশ মনে পড়ে? সব থেকে আমাদের বিরক্ত করিতেছিল, সেই আলোর ছটা যাহা সারা প্রেক্ষাগৃহ পার হইয়া আসিতেছিল,...(ওল্ড) এম্পায়ার ত...প্রজেকশ্যন রুম হইতে আলো আসিতেছিল তাই। কিন্তু ষ্টারে ব্যবস্থা আর এক, কর্ণার্জ্জুন নাটকে—নরেশবাবুর হাতে, মানে শকুনির হাতে, সেই অব্যর্থ পাশায়...কাহার হাড় যেন। কি আলো! আজও মনে আছে। হ্যাঁ তুমি কি পাগল হইলে; অন্ধকারেই উহারা ভাল দেখিতে পায়...সে কি চেঞ্জার! নিশ্চয় হারামজাদা খাঁচাটি সাজাইতেছে...নাচ আরম্ভ হইবার আগেই সে আসিবে।.,.আমি আনা পাভ্‌লুভার নাচ কলিকাতাতে দেখি...সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ ঐভাবে, সেই হাঁসের ন্যায়, মরিতে চাহে...।

সদ্যোজাত শিশু না কাঁদিলে সকলেরই, ধাত্রী হইতে গৃহস্থের মহা দুশ্চিন্তা উদ্বেগ হয় ত, সে-বার আমার স্ত্রী নবজাতক কাঁদে না দেখিয়া, কান্দিল না দেখিয়া, সন্নিহিত ধাত্রীকে কহিলেন, এই জাতক না কাঁদিলে বাঁচিবে কেমনে; না কান্দিলে...রহ, আমি চপেটাঘাত করি। সে কান্দিল! সে বাঁচিবে।

শ্রোতারা সকলেই সেই প্রহেলিকাময়ী ধাত্রীবিদ্যা পারদর্শিনীকে, যিনি এই নৃত্যজমায়েতে তাঁহাকে, এখন অদূরে আছেন, দেখিল।

মনিব পত্নী মহা উৎসাহে প্রকাশ করিলেন, দেখ ঠিক এমনি তারা আমরা কলকাতায় এ্যাট হোম দেব (!) কি বল? এমনি চেয়ার তক্তাপোষ টুল ইজিচেয়ার মোড়া বেঞ্চ এই রকমই পাথর থেকে চায়না, কাঁসা, জার্ম্মান সিলভার, রূপার ডিস, মাটিরও কিছু, গেলাসও...এ্যাট হোম দেব...পেলমেল...কি বল? খুব মজা হবে না!

এবং পরক্ষণেই মনিব পত্নীই কহিলেন, উদয়শঙ্কর দারুণ না! নিরাশা নামে এক নাচ, মনে পড়ে, কি লিরিসিজম, সবসময়ে আমার মনে হইয়াছে মিউজিক হ্যাণ্ড একটু বেশী হইলে বড় ভাল হইত...!

মনিব মহাশয় তদুত্তরে বিস্ময় প্রকাশে সমর্থন করিলেন,—যথার্থ, সত্যিই উদয়শঙ্কর একটি আনন্দ, পারকাশ্যনকে লীলায়িত, মানে অন্য যন্ত্রে...নৃত্যের রেখা আর বাদ্যধ্বনি রেখা কোথাও এক মানে...আরে আসুন...অবশ্য আমি যদিও গৃহস্বামী নহি...।

মনিব মহাশয় যাঁহারে অভ্যর্থনা করিলেন তিনি দাশ মহাশয়, প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর স্বামী, ইঁহার হস্তে ছড়ি, মাথায় ছাতা, গলদেশে কম্পাটার, অথচ কেহ খুব কিছু মজা পায় নাই, এমনও যে অল্পবয়সীরাও নহে, যে মেয়েটি পুরুষের পোষাকে—তাহার বয়ঃক্রম দ্বাদশ হইবে, তাহার পায়ে ডারবি জুতা, তাহার পরনে ধুতি—ইহা মালকোঁচা দেওয়া, তাহার সিল্ক-টুইলের সার্টের উপর ওপনব্রেষ্ট কোট, তাহার কানে মাকড়ী, তাহার নাসার পুটে পাতলা-রিঙ, যে এবং তাহার দুই দিকের বেণীশেষে চমৎকার গোলাপী ফিতা...! ইহার ভাই নাই তাই ঐ বেশ, এই প্রকার পুরুষবেশী কিশোরী শুধু অবাক হইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া অতীব গ্রাম্য চাহনিতে দাশ মহাশয়রে নিরীক্ষণে ছিল। যে অথচ এই পুরুষবেশী কিশোরী নাক কুঞ্চিত খ্যাঁদা করিয়া হাসিতে পারে, কপোলে টোলের উদ্ভব হয়; এক ঘটা! সে হাসে নাই, যে ইহাতে দাশ মহাশয়ের কোন হেলদোল আসে না, তিনি খোলা ছাতার কারণে অনুমতি লইলেন না, কেন না তাঁহার ইত্যাকার অভ্যাস সকলের চোখ-সওয়া।

মনিব মহাশয় পুনরায় খেই ধরিলেন,—আঃ নাচ কিভাবে যে মায়া করে!...ভাবিতে থাকিলে আমরা বিন্দুবৎ...ষ্টেজ কি সৃষ্টি, ষ্টেজ কি দারুণ সৃষ্টি!...আপনি নাচ ভাল নিশ্চয়ই বাসেন...! ঐ যে উহারা...ঐ দল দারুণ নাচে...নানাবিধ পশুপক্ষীর ডাক শুধু সঙ্গে করিয়া আনে নাই...মানে পারে নাই, যাহা মাদল, তিন ফুটো বাঁশীর টান যোগাইয়া থাকে...তবে আনা পাভলুভা উদয়শঙ্কর ছাড়াই আমাদের ইহা ভাল

লাগিবে।

দাশ মহাশয় অত্যধিক গাম্ভীর্য্য ধারণে সম্মতি জানাইয়া, এখন নৃত্যের জমি চৌরস দেখিলেন, কেহ জল ছিটাইতেছে, কেহ মাটি পেটাইতেছে দুরমুস দ্বারা, ছাদ-পেটাই দিয়া। আর যে ইহারই পশ্চাতে অনেক সাঁওতালী মেয়ে, তাহাদের হাস্যে যেমন বা আলো যেমন কম, আরও পশ্চাতে তখন হাড়িয়ার ভাত লাল গামছাতে ছাঁকিতেছে পুরুষেরা, মেঠো-ইন্দুর চকিতে চলিয়া যায়!

ইন্দুরগুলি উহাদের ডরায় না। এই অপ্রত্যাশিত সংস্থানের সহিত কখনও তাঁহার, দাশ মহাশয়ের পরিচয় নাই, বিদেশীর ন্যায় তিনি চাহিয়াছিলেন, একবার বিদ্যুতে খেলিয়া গেল, ইহারা নাচিবে! ততঃ দূরাগত শিয়ালের ডাক তিনি শুনিয়াছেন, এবং ছাতার নির্জ্জনতায় তিনি স্বতন্ত্রই এযাবৎ; এখনও তাই; এইবার স্বেচ্ছায় আপনাকে মনেতে সঙ্কেত-আজ্ঞা দিলেন,—নাচ হইবে! তম্মুহূর্ত্তেই বোঙ্গা উপাসক (সাঁওতাল দেবতা) হইতে তাঁহার নিজের অদ্ভুত পার্থক্য যে তাহাই পরিষ্কার হইতেছিল।

পরক্ষণেই অল্প বাদেতেই দাশ মহাশয় সরসীবাবুকে আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই সেই সরসীবাবু, যে যিনি উদ্ভট, যে যিনি ত্রাসদায়ী। চেঞ্জারদের সহিত, স্বভাবতই আলাপ ইঁহার হইয়া থাকে, আর যে যখন চেঞ্জাররা চলিয়া যায়, তাহাদের বিষয়ে তাঁহার দিব্য দর্শন সকল অন্যকে ইনি পোস্টকার্ডে জানাইয়া থাকেন; কোথাও লিখিয়াছেন, আপনাদের উনুনটি ভালভাবে ভাঙা উচিত ছিল, বলিয়াছিলাম বাড়ীটি ভাল নয়, এই সেই দিন দেখিলাম আপনার স্ত্রী আঁচল কে যেন কাটিতেছে; কোথাও, হঠাৎ সন্ধ্যা স্পষ্ট দেখিলাম আপনি কাহাকে যেন দরজা খুলিয়া দিলেন, সেই লোকটির, আশ্চর্য্য দেখিতে সর্ব্বাঙ্গ ব্যাণ্ডেজ; কোথাও, অনুরূপ দর্শন ১৯২৮ হয়, আবার দেখিলাম, যে তুমি আমায় বলিলে, আমায় সি-অফ করিতে যাইবেন নিশ্চয়ই!

সুতরাং ঐ সরসীবাবুকে অবলোকনেই স্বতঃই ইহা তাঁহার মনে হয় যে, উহাকে কোন পর্য্যায়ে ফেলিবেন, এ কারণ যে তাঁহাদের জীবনধারা এক সূক্ষ্ম সমালোচনা হইতে উদ্ভূত, সমালোচনা তাঁহার অবলম্বন, যে কুসংস্কার তাঁহার নাই; সুতরাং পত্রের বিষয় তাঁহার আলোচ্য নহে, শুধু স্বল্পপরিচিতকে পত্র দেওয়া তাঁহাদের শিষ্টাচার বহির্ভূত; যে উহা সহবত-বর্জ্জিত; আবার তৎক্ষণাৎ তিনি নিজেকে সংশোধন করিলেন, যে বিশেষ প্রয়োজন না হইলে উচিত নহে এমত পত্র দান করা। অথচ তিনি যে সরসীবাবুকে এই প্রথম দেখিতেছেন এমন নহে, যে তিনি তির্য্যক দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিলেন সরসীবাবু অতীব স্বাচ্ছন্দ্যে এক প্রলম্বিত হাই তুলিলেন। এই স্মরণের পর যে এবং দাশ মহাশয় স্বগত বলিলেন,—উহারাই নাচিবে।

সদ্যপ্রসূত শিশু, ইহা বালক, কাঁদে নাই, অত্যাশ্চর্য্য হুঙ্কার দিয়াছিল সে ঘোর গোলাপী বর্ণ হইতে, পুরীতে, সমুদ্রে, প্রথম উদিত দিবাকরের প্রায় লাল হইল, সহসা লণ্ঠন নির্ব্বাপিত আপনি! শিশুর দেহ হইতে ধূম বাহির হইল, সে নীল হইল, সেই শিশু শুধুমাত্র একটি মাত্র চক্ষুতে রূপান্তরিত পরক্ষণেই এক ত্রিকোণ বস্তু! আবার সে একটি হাত, কখনও বা একটি পা মাত্র, কখনও এক কলম; ধাত্রী চীৎকার করিল,—আরও লণ্ঠন, কি বিভীষিকা দেখ, প্রসূতির স্তন কি বিরাট হইতেছে, কি বিকট হইতেছে—দুগ্ধস্রোত বহিতেছে, শঙ্খ বাজাইতে নিষেধ কর। শিশু আপন বক্ষদেশ ফাড়িয়া দেখাইল, হৃদয় নাই; কহিল,—যাহা দেখিলে তাহা সত্য, মানুষ ইহাই, তাই আমি মাতৃগর্ভ হইতে তাকাই। গৃহস্থেরা আসিল,—দেখিল সেই রূপান্তরের পুনরাবৃত্তি ঘটিল, এবং কহিল,—ইহা সর্ব্বনাশা, দাও ইহারে, ইহারে আমরা মাটি চাপা দিব: সেই দিবস ঝাপান ছিল, মাঠে অনেক সন্ন্যাসী—ইহা কুড়মুনের কাছে এক মাঠে ঘটে, জিলা বর্দ্ধমান...তাহারা অন্ধকারে মৃত শিশু খুঁজিতেছিল, ঐ শিশু দর্শনে নানাবিধ রব তাহারা করিয়া উঠে, শিশুটিরে ছিনাইয়া শূল শীর্ষে বিদ্ধ করিয়া নাচিল, প্রমত্ত হওয়ত নাচিল—যে তাহারা সিদ্ধ হইবে...মেমারী আগত পুত্রহীনা বেশ্যা সনাতনী ঐ শিশুটি চাহিয়াছিল, কারণ সে তাহার অভাব পূরণ করিবে। ইহাতে দুই দল হয়, তাহারা মারপিট করে—আর সকলে অন্যেরা নাচিতেছিল।

মনিব মহাশয় ধীর কণ্ঠে উত্তর দিয়াছিলেন,—এত উতলা হইবার কারণ নাই, সে হারামজাদা হয়ত পাখীটিরে সাজাইতেছে...বেচারী বড় দুঃখিত হইত...এই নৃত্য একমাত্র সে আর সেই পক্ষীরই দেখার

উপযুক্ত, তাহাদের ভুল হইবে না—আমরা অনেক কিছু ভাবিব তবে দেখিব...এই নৃত্য যে কোনও ধ্বংসাবশেষকে দুর্লভতা দিবে...সে যদি একা দেখে বড় ক্লেশ পাইবে!...এ নাচ দারুণ, এ নৃত্য দারুণ হইবে।

মনিব পত্নী কহিলেন, মেরীকে তুমি ডেকো...কি যে এরা ছাই স্বাধীনতা স্বাধীনতা করে চেঁচায়, মরণ!

কাছেই একদল নানা বয়সী পুরুষ ঘোর তর্ক করিতেছিল, নিয়ত বাঙালী, বাঙলা দেশ, রিট্রেঞ্চমেন্ট, চরকা—একটা হোক্‌স, শব্দ উৎসারিত হইতেছিল যে সকলেই তর্ক জয় ইচ্ছুক, ইহাদের উৎসাহে জাতীয়তাবাদী দৈনিক পত্র-এর প্রচারসংখ্যা ক্রমবর্দ্ধমান, যে ইহারা দেশ-প্রেমে ক্লান্ত হওয়ত এখন হাওয়া বদলাইতে আসিয়াছে। এই দেশাত্ম-বোধের মধ্যে রাজনৈতিক-কবন্ধ ছিল না! কেন না এনারকিষ্ট দীননাথ এখানে, সে বড় বালাই। এহেন ঘোরতর বাগ্‌যুদ্ধে মুরারীবাবু চোখ খুলেন নাই, তিনি স্বাধীনতায়, যে এবং তাঁহার ভ্রূদ্বয় কুঞ্চিত নয়, নিশ্চয় বিরাট কোন সিদ্ধির জন্য আরও গভীরে তিনি আছেন। এক সময় তিনি ঘোষণা করিবেন, আমার আমিত্ব কি দুস্তর, কি বিচিত্র! আমি স্বাতি নক্ষত্রে যে জল তাহাতে গৌরবান্বিত হইলাম, তোমরা আমারে আরও খানিক মগ্ন থাকিতে দাও, আমি তোমাদিগকে অনেকবিধ আশ্চর্য্য কথা বলিব!

ডেপুটি কমিশনার এইচ. কিউ তাঁহার মোম চর্চ্চিত গোঁফ, তিনি দারুণ জবর পিগ ষ্টিকার একজন, তাহার নেত্র বীরতুল্য, তাঁহার বুটের আওয়াজ অধস্তনদের স্মরণে! তিনি সিগার-এর ধূম ত্যাগ করিতে, ধূমবৃত্ত উদ্ভূত হইল, কহিলেন,—বিলি তুমি বিস্ময়কর, তোমার উচিত ছিল...কি ক্রেজি আমি...যেহেতু বালুকার বৈভব দিয়া তুমি নির্ম্মিত, তোমাতে অন্ধকারের অ নাই। সূর্য্য উপাসনা হইতে পৌত্তলিকতা এবং বিমূর্ত্ত মানসিকতার যখন সবেমাত্র সঞ্চার, বাস্তবতা যখন প্রহেলিকা, তাহার ইতঃমধ্যে লহমার কোনখানে ডাগর দাম্ভিকতায় তুমি খেলা করিতে পার!

হায় এ শতাব্দীতে মারাত্মক যুদ্ধ ঘটিয়াছে, এ শতাব্দীতে, বলিতে কি, রমণীর কোন প্রয়োজনই নাই! তুমি নিরর্থক, তোমার বাম বক্ষস্থিত কৃষ্ণপক্ষ রাত্রের, স্বেদবিন্দুতে অপুত্রকের পুত্র হয়, তোমার দক্ষিণেরটিতে শুক্লপক্ষীয় স্বেদবিন্দুকে, নদীসমূহে বন্যা দেখা দেয়, দেশান্তর হইতে আজব পক্ষীতে তোমার উন্মাদনা আছে, হায় আমাদের কাহারও নিকট সেই মুক্তামালা নাই যে তোমারে প্রীতিভক্তিতে প্রণামী দিব, যে এ পর্য্যন্ত যাহারা তোমার শুভ নামে আত্মহত্যা করিয়াছে, সেই তাহারাই তোমারে সর্ব্বদা অদৃশ্য থাকিয়া রক্ষা করিতেছে, তাঁহারা তোমার নামে আত্মত্যাগ করিতে, বহু তরুণকে প্ররোচিত করিতেছে—তাহাদের শেষ—পত্রসকল তোমাকে, যদ্যপি আইনবিরুদ্ধ, আমি তবু দিব!...যে হয়ত উহা সকল তোমার উন্মাদনাকে খুসী করিবে...কি ক্রেজি আমি...বিলি তোমাকে আমরা দেখিলাম যে বিলি তুমি অপরিসীম টেররিফিক (বিলির উচ্চারণে) তুমি...তোমার কারণে পুলিশ রিপোর্ট বলে, তোমার কারণে ম্যাডাক্‌স স্কোয়ারে সেদিন সন্ধ্যায় রক্তাক্ত জঙ্গ হয়, তোমার জানলা হইতে তুমি দেখিয়াছ, দুইপক্ষ সকলে উদ্বুদ্ধ হইয়া খরতর লড়াই করে, কত হকিস্টিক ভাঙ্গিল, কত ইলেকট্রিক তারের চাবুক চালনার শব্দ সাঁইসাঁই হইল, পাঞ্চ ব্যবহৃতও হয়, কে একজন পার্কের ফরাশের (যে গ্যাস জ্বালে) মই লইয়া রণস্থলে আসিল!...ইহা কিছু নয়, একটি জাতিকে উচ্ছন্ন দিবার সম্ভাবনা তোমাতে...ইহা, এতাদৃশ বাক্যে খাঁটি ইংরাজ ডি. সি-র আধা নীল চক্ষুর্দ্বয় সুনীল হইল।

...দেখ দেখ ঐ সাঁওতাল কি পর্য্যন্ত আনন্দের! কি বাঘেরা!

শ্রোতৃবর্গের কণ্ঠ শুষ্ক হয়, তাহারা পুরাতন প্যাটার্নের অলঙ্কার, যথা, মটরমালা, মপচেন ইত্যাদির নিমিত্ত খানিক মৌন, তাহারাও সাঁওতাল দেখিল। এ সাঁওতালগণ বহু জনপদ-বধূর রাত্র আত্মসাতে কালো!

একটি শিশু কি অফুরন্ত তাহার চেহারা, যে কাজলকে, নিজ চক্ষুস্থিত, নৈনেত্তর করিয়াছে, তবু কি মধুর। শিশু হস্তীর প্রায় ছুটিয়া আসিয়া দাশ মহাশয়কে জানাইল,—মেতমতাই নমচ্‌কাল...মেতমতাই নমচ্‌কাল (নমস্কার)।

সহচরীবৃন্দ কহিল,—আমরা লাভ ম্যারেজ শুনিয়াছি কিন্তু বিলিকে কখনও শুনি নাই। অদ্য প্রাতে ভ্রমণরত বিলিকে আমরা দেখিয়াছি, তাহার পথের সম্মুখে কয়েক তরুণদের আগমন, বিলি শুধু মাত্র

ফুৎকারে তাহাদের বিশৃঙ্খল করত কহিয়াছিল,—যাও এক ফুৎকারে তোমাদের উড়াইয়া দিলাম।—সত্যই তাহারা ছিন্নভিন্ন মেঘের ন্যায় হইল। যে এখন সহচরীদের বিস্ময়োক্তি ও ঐ যে শিশুকথিত পদবন্ধ অবাক মিশ্রিত—দুই পক্ষের এক এক শব্দ কখনও পাশাপাশি—সুতরাং এক অদ্ভুত ভাষার কথার সৃষ্টি হয়।

এক কাশি শব্দ শ্রুত হইল, আর আর প্রসব-বৃত্তান্ত সূচিত হইয়াছিল, আর স্বরে, পুনরায় ধ্বনিত হইল,—আমার স্ত্রী জন্ম সম্পর্ক নেশার দরুণ এক এক কুহক ঘটনা জানেন, আমি জানি, তিনি আমায় অনেক গুহ্যাতিগুহ্য অভিজ্ঞতা, তত্ত্ব, বলিয়াছেন, যে তাঁহার হস্ত নাড়ী কর্ত্তনের মুহূর্ত্তে ঝনাৎ শব্দ করিয়া উঠে, তাঁহাতে দিব্য দৃষ্টি উপজাত হয়, যাহার বলে তিনি প্রত্যক্ষ করেন, ঝরণা, মৃত্তিকা, উদ্ভিদের ঈশ্বরী জাগ্রত, সৌরজগত বিচ্ছিন্ন হওয়ার অনৈসর্গিক শব্দ উহা—ঐ ঝনাৎ, তাহার শরীর এক অভূতপূর্ব্ব দশা প্রাপ্ত হয়, মনে হয় তৎক্ষণাৎই তাহার বিবাহ ও স্বামী পরিচিত হইল, ধ্রুব যে তদীয় দেহে অন্য মনোরমত্ব উপচাইল!

তিনি বলেন,—কোন আসক্তি নাই আমাতে, পরে খেদ হয়, হায় মায়া! কোথায় আমি...(হঠাৎ গলা ফিরাইয়া) ভাল আছেন স্যার, এই এমনই গল্প হইতেছে...ইঁহারা কত বড় ঘর! উঁহাকে স্যার বলিলে আমি ছোট হই না, কোন অন্যায় হয় না...হ্যাঁ বলিতে ভুলিয়াছি, ঐ শালা...এমন চেঁচাইতেছে...দেশ যে উদ্ধার হইল...তাহাতে আর ভুলিব না!

হ্যাঁ একবার আমার বড় সাধ হয় যে আমিও ঐ রূপ মদীয় স্ত্রীর মতন অনুভব লাভ করি, তাহাকে আমার মনোবাসনা বলি, একদিন তিনি ছুটিয়া আসিলেন, তাঁহার কেশভার রুক্ষ অঞ্চল মৃত্তিকায়ে, বসনে রক্তচিহ্ন, হস্তদ্বয় আঠা আঠা, তিনি যেন সন্ন্যাসিনী, চক্ষুর্দ্বয় প্রজ্জ্বলিত দিব্য,...আমি ঘড়িতে দম দিতেছিলাম—তদ্দর্শনে ঘড়ি রাখিলাম, আঃ সেই হাত আমায় স্পর্শ করিল, সেই স্পর্শ ও গন্ধে এক মহাদুর্ব্বিপাক, এক দণ্ডকারণ্য, এক মানস-সরোবর, তাতাথৈয়ে নাচিয়া উঠিল, এক হংস হত্যা হইল, এক হংস জীবিত হইল, আমি স্রোতাঘাতচকিত নুড়িবৎ, আমি পিপীলিকাবৎ, আমি মেঘবৎ, আমি ব্যাঘ্রবৎ, আমি বিদ্যুৎ, এই প্রথম আমি পুরুষ হইলাম! তাঁহার হস্তগন্ধে আমার চেনা-চেতন সমাসীন হওয়ত অট্টহাস্য করিল! বহির্জগৎ নির্ব্বাপিত হইল। ক্রমে শুনিলাম মদীয় স্ত্রী সন্ন্যাসিনীরূপে খেদোক্তি করিতেছেন, হায় আমি রমণী নই!

এই উক্তি ক্রমশ সকলের, যে যাহারা এখানে, যে যাহারা, ইতস্তত, সকলের অগোচরেই আপন আপন ত্বকে, অন্তরে, কন্দরে সর্ব্বত্রেই অনুরণিত হইল, তৎপ্রভাবে, যুগপৎ সকলেই অলোকার প্রতি, যে দিব্য প্রভাময়ী, যে অভিজাত, সৌন্দর্য্যে ময়ূর, যে বিশুদ্ধ, যাহাকে একমাত্র শিশু কিশোররা কামনা করিতে দ্বিধা করে না, শিশুরা আধোস্বরে বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশে; আর যে কিশোরদের সেই কামনা ঈদৃশ, যেন ভাই হই! অলোকা আপনারে বিকিরণ করিতে আছে, তাহার অত্যুৎকৃষ্ট লিওঁ সিল্কের কৃষ্ণ আলডিহাইড সবুজের ঘোর পার্পল ফুলকারি গ্রীবাছাড়া খানিক আবক্ষ জুনিয়ার মিস ধরনের ফ্রকে উল্লেখিত আছে।

সেই অলোকা এক আশ্চর্য্য!

এখন সে আপনার কণ্ঠের মুক্তামালায় হাত দিল—তাহার বাহু কি অপরূপ ব্রণবিরহিত—টিকার দাগ নাই! সে স্থাপত্যকে অভিনব করিয়াছে! অলোকার অধরদ্বয় এমন, যেমত সে ইহা কহিতে আছে যে আঃ অবশ্যম্ভাবিতা, আমার তোমাতে মতি নাই, অপার করুণানিধি ভগবান আমায় যে ভীতি দিয়াছেন, আমি অলৌকিক সৌভাগ্যবতী, হে নির্ঘাত অবশ্যম্ভাবিতা, তোমাতে আমার লোলুপতা নাই, হে হাসনুহানা, তোমাতে অনবদ্যতা সুচির, তুমি কলমের আঁচড়ে প্রস্ফুটিত হইলেও আমি কণ্টকিত, হে কামিনী তোমাতে মোহিনী মায়া অমোঘ, যুবতীর কবরীতে থাকিলেও আমি ভীত! ভীতিতেই আমি বৈদিক!

এবং তদীয় এবম্ভূত খেদে সেই জন্মরহস্য আমার চক্ষুর্দ্বয় সার্সিতে দেখিয়া আরক্তিম বুঝিলাম, কে যেমন আমার অভ্যান্তরে, আমার অভ্যন্তর গঙ্গাতীরে বসিয়া রামপ্রসাদ গাহিতেছে, আনন্দময়ী নিরানন্দ কর না, যে এবং গীত থামাইয়া ঐ গায়ক কহিলেন,—মন্ত্র লও মন্ত্র লও, তোমার স্ত্রী যখন এক রমণীগর্ভসম্ভূত মৃত সন্তানে চমৎকৃত হয়, ইহাতে যে, আশ্চর্য্য হয় যে, রমণীগর্ভে মৃত্যু প্রবেশ করে,

রমণী কি বিস্ময়রহস্য অহো সত্য! তৎপ্রভাবে যখন তোমার সহধর্ম্মিণী ব্যামোহাবিষ্ট, তখন ইহা কহি নাই; অহো সত্য! এখন সময় আগত, শীঘ্রই মন্ত্র লও, অতএব...আমরা গুরুর সন্ধান করিতেছি!

পুলিশ রিপোর্ট বলে যে, তুমি জানলায় থাকিয়া, তোমার অজস্র কেশরাশিতে তোমার চিরুণী যায় আসে—যেমন তুমি সেই গাড়ী দুইটির মারাত্মক দুর্ঘটনা দেখ, যে দুইটি তোমার জানলার তলা দিয়া প্রায় ৮০ হইতে ১০০ স্পিডে যাইত। যেমন মোটর বাইকের দুর্ঘটনাও দেখিয়াছ, তেমনি তুমি সেই সেই রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম দেখিতেছিলে, অথচ তুমি ইতিহাস ভারাক্রান্ত কর নাই। বিলি তুমি সেখানে যাও যেখানে তোমার সম্মুখে পশ্চাতে অগণন খোজা, তাহারা কি অভাবনীয় গর্ব্বিত, কেন না তোমার দেহরক্ষী তাহারা!...এখন যে তরুণ সম্প্রতি তোমার কারণে আত্মহত্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছে তাহাকে কি দেখিবে?

বিলি জানাইল,—আমি তচ্ছ্রবণে কহিলাম,—মন্দ কি! তরুণ আনীত হইল। যাহারে আমি কখনও, কোন বিবাহ বাড়ীতে, কোন জন্মতিথি, কোনও নিমন্ত্রণে কোনও একজিবিশানে (!) বায়োস্কোপে পথে ঘাটে বাসে ট্রামে কোথাও দেখি নাই—তবে পূর্ব্ব তরুণদ্বয় যাহারা আমার কারণে আত্মহত্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছে অতএব, তাই সে পরিচিত—যেন আমি মৃদু হাসিলাম, সেই তরুণ কিছু পরিশ্রান্ত! সে আমার প্রতি গভীরভাবে নিষ্পলক দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল, সে সন্ত্রাসে কম্পিত, আশ্চর্য্য সেই তরুণ আমাকে কখনও দেখে নাই! আমি কহিলাম,—এখন সে যাইতে পারে!

ইহাতে সহচরীবৃন্দ সকলেই আপন আপন অলঙ্কার হইতে অতীব পুরাতন হইয়াছিল, কহিল,—আমরা লাভ ম্যারেজ শুনিয়াছি—দৈব দুর্ব্বিপাক শুনিয়াছি, কিন্তু বিলিকে শুনি নাই: যে আর ঐ সহচরীবৃন্দের মধ্যে যাহারা অস্নাতা, ঋতুমতী, তাহারা ঐ বিলিকে সম্যক আঘ্রাণ করিল, যাহাতে অনুতাপ নাই, এই সেই রমণী যাহার অস্তিত্ব অনুষঙ্গ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় না। এই রমণী আমাদের আরাধ্যা! ভাগ্যেশ আমরা রিখিয়ায় তাই এই রমণীরে সহজে বুঝিলাম!—ইহার পরক্ষণেই ইহারা সকলেই নৃত্যের জন্য উন্মুখ হইয়াছিল।

দেশের অবস্থা হইতে তার্কিকরা অনেক দূরে, কখনও আদিস আবাবা কখনও স্পেনে। বিগত মহাযুদ্ধ যাহারা দেখে নাই তাহারা অচিরেই লড়াই প্রার্থনা করিতেছিল, লড়াইতে আমাদের মুক্তি! এক স্বর শ্রুত হইল; এখন বলিতেছ বটে! আমি পড়িয়াছি, লড়াই সাংঘাতিক, ঘরবার দুই যায়, গীতাতেও আছে বর্ণসঙ্কর জন্মায়, বিশৃঙ্খলা!

অন্য কণ্ঠ,—ঘরবার ত কিছুই নাই...যায় যাউক!

ভিন্ন কণ্ঠে,—পৃথিবী ত আপনার নয়...মানুষ কিভাবে ভুলিয়া যায় যে অন্যজনও মানুষ! সরসে আর একজন জানাইল—মহাশয় মানুষ নিজেরেই ভুলিয়া যায়! নিজেকে না মারিতে পারিলে অন্যরে মারা যায় না...। এই বচসার অদূরে দেশবৎসল জাতীয় চরিত্র অন্যর প্লেটের দিকে নালমাখা চোখে চাহিয়াছিল এবং সে অনেকের প্লেট হইতে ভাগ পায়—সে পাঁঠার ন্যায় হাসে!

অন্যত্রে নৃত্য আরম্ভ হইয়াছে, এ নৃত্যে চড়াই উৎরাই, অসমতল-সমতল ভূমিতে চলনের ভঙ্গিমার বাস্তবতা আছে, ধিতাং ধিতাং নাদে মাদল বাজিতেছে, একজন নাসারন্ধ্র দিয়া যুগ্মবাঁশী মাঝে মাঝে বাজাইতেছে, যাহার আওয়াজ নাই বলিলেই হয়, সাঁওতাল, নৃত্যরত রমণীদের বাহুমূলের রেখা, পেলব থরথর স্তর সমন্বিত উন্নত বক্ষগত অংশ যাহা—পাঁজড়ায়ে সম্মোহ বিস্তার করিতেছে!

দাশ মহাশয় তেমনই ছাতা খোলা! প্রধানা শিক্ষয়িত্রী ঐ নৃত্যের দুয়েক সঞ্চারী দর্শনে অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিলেন, স্বামীর ঐ স্বাতন্ত্র্য অন্যের চোখে হাস্যকররূপে প্রতীয়মান হইল! তিনি কন্যাদের প্রতি তির্য্যকে নেত্রপাত করিলেন, তিনি অলোকাকে নেহারিলেন, অলোকাতে জড়বাদী রমণীত্ব নাই!

যে নাসারন্ধ্র দ্বারা এবম্প্রকার প্রায় নিঃশব্দ প্রায় বংশী বাদনে প্রধানা শিক্ষয়িত্রী অশেষ বিকারগ্রস্ত, যে তিনি নয়ছয়, যে তিনি কোণ-ঠেসা, যেমন যে লম্পট কিছুর সমীপে তিনি, যে এবং তিনি ধূপ ভালবাসেন, ধোপদুরস্ত বস্ত্র যে তাঁহার তৃপ্তি বর্দ্ধন করে, এখন ঐ দৃশ্যে ইহা সকল সর্ব্বৈব ভিত্তিহীন; অনন্তর তিনি নিজেকে ধিক্কার দিয়াছেন। যে, উক্ত কায়দায়ে ঐ বাঁশীগুলি বাজান হইয়া থাকে, এই জ্ঞান আগেভাগে

থাকিলে, যে বংশীগুলিতে—খাসা নকাসীকৃত কাজ শ্রবণে তাহা দর্শন মানসে উদগ্রীব হইতেনই না, অবশ্য মূলত মনিব পত্নীর অসংযত মন্তব্য এড়াইতেই তদীয় শিল্প প্রবণতা ঘটিয়াছিল, অন্যথা বাঁশীর শিল্পকর্ম্মের প্রতি তাঁহার আন্তরিক টান ছিল না, হায় কি বিড়ম্বনা!

ভাগ্যশ তিনি সাঁওতালটির হাত হইতে ঐ নিদর্শন লইয়া পর্য্যবেক্ষণ করেন নাই! যদি ঘটিত তাহা হইলে অনেক ইউক্যালিপটস ওয়েল, কারবলিক সাবানেও তিনি বহুদিন অশুচি রহিতেন! যে এখন নিকট হইতে তাহা দেখিয়াছেন স্মরণেই দেহমন কাহিল, কর্দ্দমাক্ত; তিনি পান করিবার ছলে, জল চাহিয়াছিলেন, যে জল আনিল তাহার সাহায্যে হাতমুখ প্রক্ষালন খানিক আড়ালে যাইয়া করিলেন। এবং তিনি নির্ম্মল এবং আরাম হইলেন, এঃ নাক দিয়া বাঁশী বাজান!

কিন্তু তিলেক পরেই পুনরপি বাঁশীর চেহারা, উহা বাদন কতটুকু বা তথাপি সর্ব্বদাই তাহার সমক্ষে, যে, এমনও যে উহাদের উৎকীর্ণ মৎস্যলতা কুসুম কেয়ারি অবধি, যাহাতে তিনি অত্রাহি, যাহাতে উৎখাত। সুস্বন লহরী, খোদাই বৃথা হইয়াছে। তৎপ্রভাবে এতেক বিপর্য্যস্ত বটে—যে সুললিত, রিখিয়ার হাওয়ার শব্দ সহিত অপসৃয়মাণ খর্ব্ব-প্রায় ক্ষুদ্র-তরঙ্গ ব্যঞ্জনা সমান ঐ নৃত্য, মাদল বাদকের চুলের ঝাপটা—যেহেতু সে নাচে, সমস্তই কদর্য্য এরূপ সংস্কার জন্মাইল। তিনি আরবার চশমা মুছিলেন।

পার্শ্ববর্ত্তিনী যাহারা, যাহারা গ্র্যাণ্ড বলিতে ব্যস্ত, যাহারা নর্ত্তকীদের গীতের অর্থ একে অন্যকে জ্ঞাত করিতেছে, যথা 'শালফুল, আমার দেহতে পড়িতেছে আমার চালাতে পড়িতেছে, আমার ভাতে পড়িতেছে, আমি তাই গীত গাহিতে আছি।' যে দর্শকরা গীতের অর্থ কি পর্য্যন্ত মধুর মধুর বলিতেছিল, তাহাদের সকলের দিকে, উপরন্তু কন্যাদ্বয়কে, নেত্রপাতে তিনি, প্রধানা শিক্ষয়িত্রী স্বাভাবিক হইতে পারেন না, তিনি ক্রমান্বয় যেন পাপপঙ্কে যেন নরকে (!), এ নৃত্য সদ্য অঙ্কুরিত আম্রবীজ নহে যে স্বহস্তে উপড়াইয়া ফেলিয়া দিবেন।

যাহা এইরূপ—তিনি তাঁহার অফিস কামরা হইতে প্রায়শঃই লক্ষ্য করিতেন, কিণ্ডারগার্ডেনের শিশু যাহাদের তিনি দেশের ভবিষ্যৎ বলিয়া অভিহিত করিতেন, শিশু বলিয়া নহে! ইহাদের—পুরাতন মরিচা-ধরা টিনের নিকট পরিবৃত হওয়ত এক জটলা, টিফিন খাইতে থাকিয়া ইহাদের অদ্ভুত কথা কাটাকাটি চলিত!—প্রধানা শিক্ষয়িত্রী রুটিন ও নানান খাতা হইতে যাহা প্রত্যক্ষ করেন, এমনও যে ক্লাস চলিবার কালে অনেক শিশুই বাহিরে আসিয়া সেই পথে গমনাগমনের সময় ঐখানে কিছু সেকেণ্ড নিশ্চল, শুধু মাথার ফিতা স্পন্দিত, কখনও স্কার্ট নড়ে, কিন্তু কোনদিনই, ব্যাপার যে কি তাহা জানিতে অবসর ঘটিয়া উঠে না।

অথচ বাল্যখিল্যরা মালীকে হটাইয়াছে, ইহা তাঁহার চোখে পড়ে, মালীকে তাহারা মারিবে ইহা শুনিলেন, হয়ত অনেক ছোট ছোট হাত উদ্যত তাহা কল্পনা করিলেন। ইহারা বৃষ্টি মানে না, উহাদের চোখ বড় হইয়াছে, কেহ মস্তকে হস্ত স্থাপন করিয়াছে, কেহ টিফিনের কিছু সেখানে দিয়াছে। এক দিবস, সেই দিন খালি রোদ, ঐ টিনের সন্নিকটে ভারী সোরগোল, তুমুল উদ্দীপনা, আমি আগে,...আমি দেখিয়াছি...না মনু ফাষ্ট তারপর আমি...!

তর্জ্জনী নির্দ্দেশ এক্ষেত্রে মারাত্মক, কেহ যদি ভুলক্রমে তর্জ্জনী দেখাইল, তৎক্ষণাৎ নির্দ্দেশকর্ত্তার তর্জ্জনী কেহ দংশন করিয়া দিয়াছে। একে অন্যরে মুষ্টিবদ্ধ করত ঐ টিনের দিকে দর্শহিয়াছে। আঃ স্বর তাহাদের অবাক মনোহর! তাহাদের হাঁ অনেকটা, ফোকলা যাহারা তাহাদের হাঁ তাৎপর্য্যপূর্ণ।

সেই দিবসই তিনি সেই আকৃষ্ট স্থানে যাহা নেহারিলেন, তাহাতে তিনি হাসিতে গিয়া কালো, যে এবং বজ্রাহত, একটি আম্রবীজ আপনারে উন্মেষিত করিতে আছে—সূর্য্য ফাড়িয়া বর্ণসকল ফাড়িয়া কি এক দাম্ভিকতা। একি মাভৈঃ! কি এক মমত্ব!

উহার আঁশ সকল রোমশ, পসলা বারিপাত হেতু এক-আধ জলবসা নিটোল তাহাতে এ পর্য্যন্ত, কীদৃশী জঘন্য! কি লাম্পট্য! কোথাও কার এক গোপন রাত্র, শিকল-তোলার শব্দ যেখানে অহেতুক, প্রধানা শিক্ষয়িত্রী যুগপৎ অসম্মানিত বিভীষিত হইলেন, বয়সী বালিকারা ইহা কি দেখিয়াছে? দেশের ভবিষ্যৎরা অপ্রার্থিত কহিল, উহাতে বাঁশী হইবে!

ফোক্‌লা যে সে কহিল—হুঁ আমরা বাজাইব...আমি ফাষ্ট!

অতীব বুদ্ধিমতী প্রধানা শিক্ষয়িত্রী ঝটিতি চশমা খুলিলেন, বাস্তবতা ঝাপসা হইল। চোরা-অপস্মার তাহাতে উদ্‌ঘাটিত হইল। মহা রোষে তিনি আজ্ঞা করিলেন,—যাও ক্লাসে।

তাহারা সকলে স্তম্ভিত, ধীরে পিছু হটে! কোন অবোধ কহিল,—টিফিন ত!

তিনি কর্কশ স্বরে কহিলেন,—গো! তাহারা পিছু খানিক হটিল যেন নাচে, হঠাৎ ঘুরিল, ছুটিল, তাহারা হাসিতে ছত্রাকার! ঘণ্টা বাজিল।

ইস অঙ্কুরিত ফাটা আম্রবীজ কি অসভ্য!

আম্রবীজে তাঁহার প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর রন্ধন আউলাইল, উহা স্পর্শ করিবার কথায় তাঁহার জ্বর দেখা দেয়, তিনি বালি চাপা দিবেন? অবশেষে ঐ টিন সমেত উহা কোথাও, প্রাচীরের অন্যধারে, নিক্ষেপ করাই মনস্থ করিলেন। কয়েক দিবস পরে তিনি টর্চ হাতে, স্কুল যাইলেন। নিঃসঙ্গ স্কুল! দরওয়ান গেটে! মালীকে তিনি চিঠি ছাড়িতে পাঠাইলেন, হায়! তাঁহারে মিথ্যার শরণাপন্ন হইতে হইল। এখন টর্চের রশ্মিতে রামধনু বিচ্ছুরণে সেই বেলেল্লা, নোংরা, ব্যভিচার, শৃঙ্গার লালসা (!) উহাতে আম্রবীজ যেন বেপথু!

প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর ভাব যেমন বা ঈর্ষান্বিত তাহা নিরীক্ষণে কিন্তু ইহা নহে।

ঐ আদিরসাত্মক বৈভব হইতে এক নিরীহ কমনীয় হরিৎ কাণ্ড উদ্ভূত যাহার শীর্ষ যুগ্ম পিঙ্গল-বেগুনী পত্রমণ্ডিত, ইহা কুলটার ভান এমত!

মৃদু শ্রাবণ বাতাসে দুলিতে আছে...মনুষ্য জাতি হিসাবে তিনি উহা অবলোকন করিলেন, মনুষ্য হিসাবে তাহার স্মৃতি নাই! তিনি ইংরাজি বলিতে বাঙলা, বাঙলা বলিতে হিন্দি, পুনর্ব্বার ইংরাজিতে আপনাকে, দাস আপনাকে, প্ররোচিত আপনাকে হুকুম করিলেন; কিন্তু টিন চাগাইয়া তুলা অসম্ভব হইল; যে তদনন্তর তদীয় মুখমণ্ডল অশ্বখুর দষ্ট হইল। তিনি ঝাঁপাইয়া পড়িলেন, এক পৈশাচিক ধ্বংসউন্মাদনায় তিনি কম্পিত, ঐ মৌনতাকে বিনষ্ট করিলেন, তাঁহার বিদ্যার ডিগ্রী অম্লান রহিল—তাঁহার সৌখীন এক লহমার অনুতাপ, স্বীকারোক্তির, নিমিত্ত এই নৃশংস দুষমনী সংঘটিত হইল!

ভারতের জাতীয় চরিত্রটি তাঁহার প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর কন্যাদ্বয়ের প্রতি চাহিয়াছে, ইহা তাঁহার নজরে এতক্ষণ পরে আসিল, সেই ব্যক্তি যে দাবার ঘুঁটির ন্যায় সকলের অজানিতে সান্নিধ্যে আসিবার কারণে বহু আসন বদলাইয়াছে, ইহা তিনি বুঝিলেন, বুঝিলেন কন্যাদ্বয় স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে না। তিনি উঠিয়া সেখানে যেখানে সুঘরাই তাহার খাঁচাটি কিছু তুলিয়া ধরিয়াছে! আর দাশ মহাশয় নৃত্য হইতে চোখ ফিরাইয়া উহাতে মনোনিবেশ করিলেন।

এবং মনিব মহাশয় উল্লাসে আপন সহধর্ম্মিণীরে জ্ঞাত করিতেছিলেন,—তোমারে পূর্ব্বেই বলিয়াছি...দেখ...আমার কথা সত্য ত...বলি নাই হারামজাদা খাঁচা সাজাইতেছে?...দারুণ সাজাইয়াছে যেন রেড ইণ্ডিয়ান হেড! পাখীটি কি গর্ব্বিত দেখ...!

স্নেহশীলা মনিব পত্নী তদুত্তরে বলিলেন,—মরণ, ছোঁড়া তোকে কত বারই বারুণ না করেছি...রেতে গাছে হাতে দিতে নেই...তখন দেবতারা আসেন...সত্যিই ডেলিয়াগুলো আঃ ঐ সান ফ্লাওয়ারটা...মনে হচ্ছে এখানেই ফুটেছে...পাখীটা সাক্ষাৎ...সাক্ষাৎ...চমৎকার না!

দাশ মহাশয় এতক্ষণ নাচ উপভোগ করিতেছিলেন, ঘুঙুরের আওয়াজ—অবশ্য মাত্র পুরুষ নর্ত্তকদের পায়ে—গানের সঞ্চার এবং উল্লম্ফন ও দৈহিক দোলাতে তদীয় কাশির শব্দ অবধি বদলাইতে আছিল, যে তিনি তাহা সম্যক বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এই দেহ স্থাপত্য-ধ্বনি সঞ্জাত, এখন কিন্তু আর সেই—সত্যের রেশ নাই, এখন ইন্দ্রিয় সজাগ প্রায়!

একদা ছাতা বন্ধ করিতে চাহিলেন, যে তিনি নৃত্যের পশ্চাতে বৃক্ষসকল, ক্রমে দূরে রিখিয়ার নিগূঢ় আকাশ পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। যেন সদ্য বিধবার ক্রন্দনধ্বনি শুনিলেন, (যেমন তদীয় স্ত্রীর অশৌচ বস্ত্র পরিহিত বালককে দর্শনে স্বস্তি হয়) তদনন্তর পুনর্ব্বার নর্ত্তকীদের প্রতি একাগ্র কিন্তু ইউক্যালিপটসের পত্রমর্ম্মরে স্বামী-হারা বিলাপ নিশ্চিহ্ন হইল। তাঁহাকে অধৈর্য্য করিল—তিনি নাচ দেখিবেন! ভূমিতে পদাঘাতে উড়ন্ত ধূলায়, নৃত্যতে সাধারণ পদক্ষেপে হইতে, সকলকে উদ্বুদ্ধ করিতেছে। এমত কালে মনিব মহাশয়ের সংযম তাঁহারে আকৃষ্ট করিল, তিনি এক খাঁচা দেখিলেন।

অথচ ইতিমধ্যে সেই পুরুষবেশী বালিকাকে বেণী দুলাইয়া বলিতে শুনিলেন,—আমি যদি নিজেরে হত্যা করি মানে বিষ খাই তাহা হইলে জেল হইবে।

তদুত্তরে বালিকা কহিল,—কি করিয়া!

পুরুষবেশী বালিকা বলিল, তাই ত শুনিলাম...!

উত্তর হইল,—আমি যদি আমাকে মারি তাহাতে কাহার কি?

এই কলহ পার হইয়া দাশ মহাশয় খাঁচাটি বিশেষ তীক্ষ্ণ সূক্ষ্মতায় নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, কেহ টর্চ ফেলিয়াছে, পাখীটি সুস্পষ্ট যাহাতে, এখানে ফুল ছিল, সুতরাং নির্ম্মল আনন্দ প্রকাশের দিক ছিল। অতএব ছাতার কারণে আর তাঁহার খুঁৎ থাকে না, তিনি আনুনাসিক স্বরে স্বভাব-ভীত ভাবে প্রশংসা করিলেন,—সত্যই এবম্প্রকার দৃশ্য অমৃতবর্ষী...দেখুন কুসুম সকল, তখনই মনে হয় কোথাও এক স্বচ্ছতোয়া নদী আছে...কুসুমের বর্ত্তমানতা...আঃ!

এমত সময় অহঙ্কার মদমত্ত সুঘরাই, যাহার মুখের নিকটে খাঁচা থাকার দরুণ, যে দেখিতে পাইল পক্ষী ঐ তুমুল আলোতে দুই একটি পোকা খাইতে চঞ্চু পৃথক করে, গোলাপী অভ্যন্তরে ক্ষণেক, খুট শব্দ হয়, গলদেশ উঠে-নামে, যে তন্নিবন্ধন বালক সুঘরাই যথার্থ অপদস্থ, কেন না পক্ষীর তাদৃশ তৎপরতায়ে তাহার কল্পনা ম্লান হইতেছে, সে আশা করে যে তাহার পক্ষী লক্ষ্মী হইয়া থাকিবে, ভদ্র থাকিবে; যে রুক্ষদৃষ্টিতে তাহাকে শাসন করে, তোমাকে এত খেলা শিখাইলাম, কসরৎ শিখাইলাম, কত কি শিখাইলাম, সবই পণ্ডশ্রম হইল, যে এবং তাহাতে, সুঘরাইতে, কোপনতা আসিতেছিল।

সে অস্ফুট স্বরে পক্ষীটিরে সাবধান করিয়াই জনসমাবেশের দিকে বড় করুণভাবে তাকাইল। তৎকালেই ঐ খাঁচাটি বিশেষ সশব্দে নড়িয়া উঠিয়াছে, যে যাহাতে সে দৃষ্টি ফিরাইতেই নিরীক্ষণ করিল, সান ফ্লাওয়ার খসিতেছে, ইহাতে সে ঝটিতি রুষ্ট এবং অন্য কাহারও বিবেচনার সময় না দিয়া খাঁচার উপর এক চাপড় মারিল, পক্ষী ত্রাহি স্বরে ডাকিল।

মনিব পত্নী তৎক্ষণাৎ বলিলেন,—এই তুই...কি করছিস...পাগল নাকি...!

মনিব মহাশয় বলিলেন,—হারামজাদা তাই বলিয়া অত জোরে চাপড় দিতে কখনও আছে...খাঁচা ভাঙ্গিয়া যাইত, পক্ষী ভয়ে পালাইত...আর বলিবে না, সেদিন বৃথা আমার প্রায় একডজন গুলি নষ্ট হইল...ঠিক এইভাবে,...দেখ বেচারী এখনও ভয়ে অস্থির...আ হাহা, তিতি বল, বল,...নিগার কোথাকার!

দাশ মহাশয়ের কাশি স্বাভাবিক হইয়াছে এমত সংঘটনে, যাহাতে তিনি মনোজ্ঞ অনুনাসিক স্বরে, অর্গান বাদ্যযন্ত্রের কিয়ৎ রেশ আছে যাহাতে, বিস্তার ব্যাখ্যা করিলেন,—যথার্থ এতদ্দর্শনে বারম্বারই এই সত্য মনে আসে, পরম কল্যাণময় ঈশ্বর...যিনি সবার প্রভু,...মঙ্গলময় তিনি...চাহেন কেহ কাহারেও দুঃখ দিও না,...এখন এই পক্ষীর সূত্রে বলা যায়...ইহাদের আমি সৃষ্টি করিয়াছি, ইহারা আমার, ইহারাই প্রকৃতির প্রকৃতিই, আমি ইহারাই প্রকৃত!

এই পর্য্যন্ততে, যেন অতীব গূঢ় কিছু মীমাংসা ব্যক্ত করিতে, দাশ মহাশয় সমর্থ হইলেন; রহস্যসই করাই তাঁহাদের সাধনরীতি, যে এবং অধুনা তাঁহার গাম্ভীর্য্য অনুধাবনে ইহাই অনুমিত হইবে যে জীবন হইতে জীবনীর প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা আছে; কিন্তু তিনি নিজে যেমন জীবনীর চাপে কবে যেন মৃত...এখন কালো ছাতার পশ্চাদ্‌পট ক্রমে ইহাই বুঝায়—যেন কোন এক ছোট স্টেশনে তাঁহার লাশ পড়িয়া আছে।

এখন দাশ মহাশয় শুধু অনুনাসিক স্বর মাত্র। যে পার্শ্ববর্ত্তী নীরবতা, যাহা যেমন ধমক খাওয়া, যদিও সবাই তির্য্যক দৃষ্টিতে নাচ দেখে; ইহা তাঁহাকে অনুপ্রাণিত করিল, যে আবার সেই সঙ্গে তাৎপর্য্যপূর্ণ কাশির শব্দ ও অবিলম্বেই চোস্ত বাচনভঙ্গি শ্রুত হইল,—মঙ্গলময় সদাসর্ব্বদা বলিতেছেন, নদী গিরিমালা লতাগুল্মবৃক্ষ কীটপতঙ্গের ভাষায়—তাহাদের সকলের ভাষায়...তোমরা আত্মসুখপরতন্ত্র ইহাদের খাঁচায় আবদ্ধ করিওনা...প্রকৃতিকে ফিরাইয়া দাও...ইহাদের সুখদুঃখ আমি জানি...তোমরা আত্মসুখে নিমজ্জিত...ইহাদের সুখদুঃখ বেদনা তোমরা কিছুই বুঝ না...ইহাদের পুষিও না...উহাতে পাপ হয়—!

সমবেত জনমণ্ডলী, নাচ দেখার ফাঁক মধ্যেই খুব একাগ্র, দাশ মহাশয়ের তত্ত্বাদেশ শুনিলেন, যারপরনাই পরিতুষ্ট হইলেন; সকলেই একবাক্যে এবং যে সাধুবাদ জ্ঞাপনকরত বলিলেন,—মহাশয় আপনি সঠিক চিন্তা করিয়াছেন। ইহার পর তাহারা সুঘরাই, যে অপ্রতিভ যে থতমত আছে, তাহারেই

অবলোকনে ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন—সুঘরাইএর এতক্ষণ পরিবৃত উচ্চবর্ণের মধ্যেও এতটুকু আঁট বোধ হয় না, কিন্তু ইদানীং সকলের এহেন মনোভাব অনুভবে, সে খুব অস্বস্তিতে আপন প্রভুর প্রতি অসহায়ভাবে তাকাইয়াছিল।

মনিব মহাশয় যিনি এবম্ভূত দাশ মহাশয়ের বচন পরম্পরায় মৃদু হাসিতেছিলেন। তাঁহার কোন কথাই মানে লাগিবার নয়, কেন না দাশ মহাশয় শুধু বলিবার জন্যই বলিলেন, উনি কিছু আদিষ্ট পুরুষ নহেন: তাই তিনি শুধু নিবেদন করিলেন,—মহাশয় আপনি যা বলিলেন তাহা সত্য...তবে আমরা জড়...জড়বাদীর মানে...অবশ্য এক হয়, তিনি আছেন, তিনি যদি আসিয়া বলেন...তাহা হইলে অন্য কথা। আদতে ইনি, মনিব মহাশয় বলিতে চাহিয়াছিলেন, জড়বাদীর উপলব্ধ ভগবৎ প্রসঙ্গ বৃথা! কিন্তু আপনাকে, উচ্চবংশীয় সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ ইনি যেহেতু, সংযত রাখেন। এবং বরং আপন প্রিয় ভৃত্যেরে ধীরতার সহিত আজ্ঞা করিলেন,—আর পাপে প্রয়োজন নাই, ইনি যাহা কহিলেন তাহা অর্থপূর্ণ সত্যই, সুঘরাই তুই ঐ পক্ষীটিরে কল্যই জঙ্গলে ছাড়িয়া আসিবি...!

মমতাময়ী ধর্ম্মশীলা মনিব পত্নী তদুত্তরে স্বামীরে একান্তে লইয়া বাধা দিয়াছিলেন,—কি যে অলুক্ষুণে কথা বল...এই সন্ধ্যে মানে সবে সন্ধ্যে উত্রোল, কেন মৎতে ও পাখী ছাড়বে ছি ছি...তুমি কি যে বল...মনে নাই ব্রজবাসী কি বলেছিল...পাখী পোষা কি যাতা...সে কথা তুমি ওনাকে বলছ না কেন?...অথচ মনে হল তুমি ওনাকে ঠাট্টা করলে যেন...!

মনিব মহাশয় বিনীত স্বরে প্রকাশিলেন,—তুমি বৃথাই আমারে দোষারোপ কর, আমি তামাসা করি নাই, যদি করিতাম উনিও তাহা বুঝিতেন, দেখ উঁহার মুখমণ্ডল...আর জঙ্গলে ছাড়িবার কথা উহাতে সত্যই নাই...যাহারা ভগবানকে ঐরূপ জানে তাহাদের কোন কথা বলা নিরর্থক...!

মনিব পত্নীর আজও সেই ব্রজবাসীর (এই বৈষ্ণব যিনি বৃন্দাবনে থাকেন—ইহা নাম নহে) কথা মনে হয়, তাদৃশ সদানন্দময় মানুষ কমই চোখে পড়ে, ইনি মাঝে মাঝে কলিকাতায় তাহাদের বাড়ীতে আসিতেন, পূজার দালানে থামের নিম্নে বসিয়া যাঁহাকে তিলক সেবা করিতে তিনি দেখিয়াছেন, মুখে অহরহ কৃষ্ণ নাম; ইনি বলিয়াছিলেন,—ওহো তত্ত্ব নয়, খাঁচার পাখীতে মন আরোপ কর, মন আরোপের জন্যই পাখী পোষা—এই মরদেহ খাঁচা ঐ পাখী আত্মা...এ জানাই ঠিক জানা...! এই ভাব লও!

যে উপস্থিত হিরণার টিলায় প্রধানা শিক্ষয়িত্রী সাঁওতাল নৃত্যের দিনকার তত্ত্বালোচনার উল্লেখে, মনিব মহাশয় শান্ত কণ্ঠে জানাইলেন,—দাশ মহাশয়ের কথায় তত্ত্বাভিজ্ঞতা আছে, উহা সূক্ষ্ম, সামান্য মানুষে উহা কেমনে ধারণা করিবে...সাধকরা উদ্দীপনার জন্য অনেক সময় পাখী পুষিয়া থাকেন...সে কথা ধরি না, তবে আপনি জানেন, বেদনা দুঃখ বুঝে না সাধারণে...মানুষের ক্ষমতা কতটুকু, সে ডাক্তারী করিতে পারে...কোন কিছুর বেদনা স্বয়ং অন্তর্য্যামী নারায়ণ বুঝিতে পারেন বা তাহার অবতার যেমন ঠাকুর পারেন...মানুষ ছার!...তবে তিনি আমাদের ভালবাসা কথাটা জানাইয়াছেন...আমাকে একজনের বা শতজনের মৃত্যু সংঘটনের ক্ষমতা যখন দিয়াছেন তখন নিশ্চয় তিনি ভালবাসার ঐশ্বর্য্যও দিয়াছেন তবে নিশ্চয় তাঁহাকে জানাতেই সেই ভালবাসা আসে—তবু সুঘরাইকে যখন দেখি—উনি তিতি করিয়া ডাকিলে সাড়া দেয়, অবিকল তিতিরের মতোই আসে, তেমনই অদ্ভুত পদবিক্ষেপে ঘুরে...ইহা সেদিন আমার নজরে পড়িল, ভাবিয়াছিলাম যে উহা সাঁওতাল নাচ দর্শনে শিখিয়াছে, কেন না একই ভঙ্গিমা, একই ফের, অভিন্ন—কিন্তু উনি আমার সন্দেহ ঘুচাইলেন।

মনিব পত্নী সপক্ষে কহিলেন,—হ্যাঁ ছোঁড়া বরাবরই তিতিরের মত ভাবভঙ্গী করে, জানেন...আবার ছোঁড়া তিতিরটাকে নানা কিছু শেখায়, কত খেলা...ওগো সেইটে বল না, ও ছোঁড়া খাঁচার কাঠি ভগ্ন জায়গায় নিজের আঙুল বেঁধে জোড়া দিয়েছিল—আমি ত দেখে হেসে বাঁচি না...অন্য হাতে খাঁচাটা চাগিয়ে আমায় এনে দেখালে! আমার মনে হয় ও ছোঁড়া আজন্মে পাখীটার কেউ ছিল...আমি ভাবছি ওর মুরগী কাটা ছাড়িয়ে দেব...ওতেই মনে হয় বুঝলে...এখন আমার মনে হচ্ছে...তাছাড়া যখন পুষছে তখন ভাল নিশ্চয় বাসেই...।

মনিব মহাশয়,—সুঘরাই আমার ধ্রুব বিশ্বাস উহারে খুব ভালবাসে, ভয়ঙ্কর ভালবাসে...।

সুঘরাই ও তাহার খাঁচা এখন আবছায়ার কিছু, সুতরাং শুধুই ভালবাসা শব্দ আপনার বিশেষত্ব লইয়া

প্রকট হওয়ত মায়া ধরিতেছিল। রিখিয়ার এই বিরাট চৌদিকের সর্ব্বত্রে—প্রধান শিক্ষয়িত্রীর আর নেত্রপাত যো ছিল না, ভালবাসা শব্দে তদীয় অধীনরাও নিজেও যেন কুঁ কুঁ শব্দ করত ভীত! এই স্থল বুনো, লাট্টা খাম্বার শব্দ এতটুকু স্বাভাবিক করে না, কেহই সুতরাং নিজেকে জানে না। গা কেমন যেন ছম ছম করিতে আছিল। একমাত্র সুঘরাই ভাবিতে ছিল নূতন কোন অভিনব ধাবায় খাঁচাটি সাজাইবে।

সুঘরাই অবসাদে নৈরাশ্যে যারপরনাই ক্লীব আছে, তাহার কান্দিবার মত আর ক্ষমতা ছিল না, ইহা যে শহরের অংশ তাহাও জ্ঞান ত নাই, এখন তাহার ভাবনাতে একমাত্র যে বাস্তবতা ছিল তাহা হয় ঘুম, নিজের ঘুমকে, যাহার চেহারা যেমন বা সে স্পষ্টই প্রত্যক্ষ করে, সে বড় ভয় পাইতেছিল, ইতিমধ্যে দুয়েকবার তন্দ্রাচ্ছন্ন হওয়াতে আতঙ্কিত বটে হইয়াছে।

পশ্চিমের আকাশ তাহাকে পীযিতেছিল, কেন না সন্ধ্যা সমাগত—নিজেকে এখন তাহার প্রহার করিতে ইচ্ছা করে, সে টলিতে টলিতে যেদিকে আরও কোলাহলপূর্ণ, যেদিকে সে ঘুম ভুলিতে পারে, সেই অভিমুখে শ্লথ পদক্ষেপে চলিতে আছিল। কুয়ায় হইতে জল তুলিবার শব্দে, কুয়া বাঁধান পাথর, যে স্থলে অপেক্ষাকৃত বেশী আরামদায়ক ঠাণ্ডা, সেখানেই সে থ, সে যেমন জাগিতেছে বলিয়া তাহার মনে হইল।

এবং যে দ্রুত কয়েক পদ অগ্রসরেই সুঘরাই এক কুয়ার সম্মুখে; যে লোকটি জল তুলে, সে জল দান করিতেছিল—কেহ জল পান করে, জলকণা সকল সুঘরাইএর দেহের এখানে সেখানে ছুটিয়া আসিতেই আপনা হইতেই তাহার চেতনা হইল, যে সে অনেকক্ষণ এখানে, ও ঝটিতি কি এক শব্দরোলে তাহার দেহ পূর্ণ হইল, যাহা সঠিক বুঝিতে না পারিলেও, যাহার উদ্দেশে ঐ ধ্বনি উঠে—সেই ছবি তাহাতে ক্রমে আবছায়া খেলিয়াছে। ক্রমে ভাস্বর হইল!

অলৌকিক বিবাহ-যাত্রা!

আশ্চর্য্য যে এহেন সঙ্কটেও সে ঐ শব্দ অনুকরণে উহার যথার্থ স্বরূপ নির্ণয়ে উথলিতও হইয়াছে; এবং ইহাতে আপন কণ্ঠস্বরের পশ্চাতে মনিব মহাশয়কে সে অনুভব করিল। আশ্চর্য্য জল সম্বন্ধে সে যে তৃষ্ণার্ত্ত, নিশ্চিত ক্ষুধার্ত্ত, সে যে ঘুম ভয়ে ভীত তথা পরোক্ষভাবে সে যে হারাইয়াছে, তাহা ক্ষণেকের জন্য খেলিয়া উঠে নাই, জলধারার শেষ সূর্য্যছটায় সেই মহিমা উদ্ভাসিত হইতে আছিল।

যে এখন যে-ব্যক্তি জলপানরত সে ঈষৎ মুখ তুলিতেই সুঘরাই যেমন বা স্তম্ভিত, তথাপি কোনমতে সে ছায়া হইতে মানুষটিকে হদিশ করণে, ঢুঁড়িতে প্রয়াস পাইল; যখনই সেই ব্যক্তি আপন দেহ বাঁকাইয়া এক বিরাট ঢাক কাঁধে তুলিয়া অতীব স্নেহে এক গণ্ডূষ জল লইয়া ঢাকের ছাউনিতে ছিটাইল, যেমন উহা তাহারই ন্যায় তৃষ্ণার্ত্ত। সন্নিহিত সুঘরাই এক চিরপরিচিত নাম ধরিয়া ডাকিবার অপ্রত্যাশিত স্বর আনিতে মরিয়া হইল, অনতিকাল পরেই সে অদ্ভুতভাবে চীৎকার করি উঠিল, ইহাতে সেই 'অহো মহেশ্বরী!' পদের রেশ থাকে!

অহো মহেশ্বরী।

শব্দের অক্ষহীন ধ্বনিতে, ঐ চীৎকারে তদীয় তিতিরের অবাধ উল্লাসে সবটুকুই পূর্ণ ছিল; সুঘরাই যেমন এতটুকু কাহিল না, ঘুম তাহার জলে ভিজিয়া গিয়াছে, যে এবং কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই সে নিখোঁচ গলায় ডাকিতে পারিল,—আ গে বিসরিয়ার বাপ!

এবম্বিধ ক্ষমতায় এতাবৎকার সমস্ত নিষ্ফলতার ক্ষোভ খেদ চমকপ্রদ কাহিনীতে সুবিন্যস্ত হইল। সুঘরাই যারপরনাই উচ্ছ্বসিত, যে সে পুলক ফেলিতে চাহিল না; বিসরিয়ার বাপের অনেক দিনকার না-কামানো দাড়িতে চিঁড়ার কুচি, আর মুখময় জল, যে সে, বালক, তাহার স্বজাতিকে দেখিয়াছে, সে উহাকে ছুঁইতে চাহিল, আহা কতকাল যে সে মানুষ স্পর্শ করে নাই, নিশ্চয়ই বহুকাল, বহুকালই সে দল ছাড়া বিচ্ছিন্ন হওয়ত হারাইয়াছে।

সুঘরাইএর ডাকে বিসরিয়ার বাপের পদস্থিত ঘুঙুরের আওয়াজ হইল ঢাকেও মৃদু শব্দ ঘটিয়াছিল, যে এবং সে আড়নয়নে সুঘরাইকে লক্ষ্যের সঙ্গে শুধু মাত্র 'আরে আরে' জ্ঞাপনের পরই আর এক গণ্ডূষ জল গ্রহণ করিল, এবার মুখখানি তুলিয়াছে, নিবিষ্টচিত্তে সেই জল আপন বক্ষে বিশেষত সিঞ্চনে ক্রমে

এখন লেপিতেছিল। এত নিকট হইতে সুঘরাই কখনও ইতিপূর্ব্বে এই বৃদ্ধকে নিরীক্ষণ করে নাই!

বৃদ্ধ বিসরিয়ার বাপ কেমন যেমন অন্যমনস্ক আছে। ইহাতে সুঘরাই সত্যই আতান্তরে পড়িল, সে ত্বরিতে আশ-পাশ জলধারা সমস্ত কিছু দেখিল, সে কি সুঘরাই নয়! তৎক্ষণাৎ আপনার গেঞ্জী খুলিতে চাহিল, অধুনা জলে আর্দ্র বদনে করজোড়ে বৃদ্ধ বড় বিষাদে এই প্রার্থনা জানাইতেছিল,—বাবা বৈদ্যনাথ তুমি দুঃখের দুঃখী, হায় কত দুঃখ আছে আমার, কবে ঘুম দিবে, আর কত দুঃখ আছে গো!

এই সরলতায় সুঘরাই নিশ্চিহ্ন মনে হইল, এখনও কি আমার হদিশ হয় নাই...মনিবরা? এখনও আমি কি হারাইয়া আছি...এই বিসরিয়ার বাপ কি সত্য!

ইদানীং তাহারা বিলাসীর টিলায়, বিসরিয়ার বাপ আর একবার মন্দিরের দিকে ফিরিয়া ভগবান বৈদ্যনাথকে নমস্কার করিল, এরূপ মনোহর উহার কৃতাঞ্জলি যেমন চৈত্রের শালবন প্রতিবিম্বিত হইতে পারে, অতএব মুহূর্ত্তেই সুঘরাইএর আর উদ্বেগ নাই—এবং যেহেতু বিসরিয়ার বাপ এ সময়ে তাহার ঢাকে তিনবার কাঠি দেয়, এ কারণ যে ঢাকের আওয়াজ বড় সাহস!

উত্তর দিকে উৎরাই পথে অজস্র জোনাকি ভয়াল চক্ষুতে পরিণত হইবার নহে। এইবার তাহাদের রিখিয়া যাত্রা শুরু হইবে। বৈদ্যনাথের ধূলি মস্তকে লওয়া হইয়াছে।

বিসরিয়ার বাপ হাঁকিল,—হেরে মক্‌রোয়া রে!

মকরোয়া নামে ব্যক্তিটি নিশ্চয় কাছে কোথাও আছে!

সুঘরাইএর বিসরিয়া বাপের হাঁকে, চক্ষু তখন সজল হইল এবং সে এতক্ষণে ক্ষুধা অনুভব করিল, কুয়া হইতে এতটা পথ বৃদ্ধ অনবরত তাহার রোজগার গণনা করিয়াছে, এক এক হিসাব স্মরণে ঢাকে কাঠি দিয়াছে, খেয়াল রাখিতে, যথা ভোরের গাড়ী, মোটা চেহারার যাত্রীরা তাহাকে লয় নাই, কিন্তু বিধবা বুড়ী হ্যাঁ হ্যাঁ যে মন্দিরের দিকে...কাঁদিতেছিল, সে ঢোল বাজাইয়াছে, সেই বুড়ী দুপয়সা, হ্যাঁ হ্যাঁ...তারপর এক পঁয়সা...তাহার পর এক পয়সা...এই প্রকারে কতবার সে হিসাব ভুলিল, এইভাবে সে নিজেরে গালি পাড়িল, কিন্তু যে তদীয় পায়ের ঘুঙুর নিয়তই বাজিয়াছে, এক সময় আচমকা আপনার গালে বুকে চাপড় মারিয়া তারস্বরে দিক বিদীর্ণ করিল,—হাহা আমি দেড় পয়সার চিঁড়া খাইতে গেলাম কেন...রাতে ভাত খাইব কেমনে...ও হো ও হো...আমি শালা...!

তখন তাহারা বিলাসীর অভিমুখে, এখন শিবগঙ্গা প্রায় অতিক্রম করিবে, সারা পথ সুঘরাই বারম্বার পিছনে দৃষ্টিপাত করিয়াছে, যদি ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়, উপস্থিত বিসরিয়ার বাপের খেদোক্তিতে মহা ভীরুভাবে কহিল,—বিসরিয়ার বাপ, তুমি যদি আমার মনিবদের একবার পাণ্ডাপাড়ায়...আমার মনিব তোমাকে নিশ্চয় টাকা...

বিসরিয়ার বাপ সবেগে উত্তর দিল,—তুমি কি পাগল, তাহাদের ঠিক সময় ক্ষুধা পায়...তাহারা বড়লোক।

ইহাতে সুঘরাই, যদিও ডোম তবু, মুখ ঘুরাইল, অনেক যুক্তির উল্লেখে ইচ্ছা থাকিলেও সে অবতারণা করিল না, এবং যে সে নিজেরেই অদ্যকার দুর্দ্দৈবের জন্য দোষী করিয়াছিল। যে তখনই এবং এক মহিমান্বিত ধ্বনিতে সে চমকিত! কেননা এই পুণ্য নগরের বিবিধ সোরগোল, জয়ধ্বনি, ইদানীং এখানে এক বিচিত্র শব্দ রণনে রূপান্তরিত হইয়াছে। এবং যে আশ্চর্য্য যে বালকের মনপ্রাণ তাহা উচ্চারণে দেদীপ্যমান!

ইতিমধ্যে বৃদ্ধের 'এ গে মকরোয়া' ডাক ও মুহুর্মুহু ঢাকের শব্দে, এক পাল্টা সাড় আসিল, আর যে ক্রমে দেখা গেল এক বৃদ্ধ কেমন একভাবে পশ্চিমের আকাশে চোখ রাখিয়া আসিতে আছে, সে যেমন খাড়া পশ্চিমে যাইবে, তদীয় পদশব্দে কাঁকরে ঘর্ষণেতে, তাজ্জব, যে যখন ব্যক্তি বেশ কাছে তখন বিসরিয়ার বাপ জানাইল,—হেরে মকরোয়া অদ্য এই বুতরু তোমার হাত ধরিবে...আমি সারা রাস্তা নিজেকে শালা মারিব...আমি অতটা চিঁড়া খাইলাম...আমি কি...! ...এই সেই মকোরোয়া...শিব ইহারে রাতকানা করিয়াছে...শালা পাপী তুই ইহার হাত ধরিবি!

ডোমপুত্র সুঘরাই অবলোকন করে মকরোয়া বিষাদের হাসিতে তদীয় হাত প্রলম্বিত করিল। আর সে, শান্ত নেত্রপাতে ঐ রাতকানা বেচারীকে পর্য্যবেক্ষণ করিল, এতাবৎ তাহার মনে এহেন সঙ্কল্প থাকে,

যে সে বিসরিয়ার বাপের কাছ ঘেঁষিয়া থাকিবে, এই বৃদ্ধের সেই প্রথমকার মর্ম্মান্তিক প্রার্থনা তাহাতে কোন এক দুর্লভ স্মৃতি দিয়াছিল, যে প্রার্থনার পরে, ঐ বৃদ্ধ শতচ্ছিন্ন বস্ত্রপ্রান্ত দ্বারা একাধারে জল মুছিয়া ক্লান্তি অপনোদন করিয়া তাহার দিকে সরলভাবে হাসিল, তাহাতে সুঘরাইকে এক ঘোর দিয়াছিল যে, যেমন যে এই দুঃখময় বার্দ্ধক্যে হাসি থাকে কেন! এখন সুঘরাই ঐ প্রলম্বিত হাতখানিতে প্রলুব্ধ—যে এবং যেইমাত্র সে ঐ হস্ত ধরিতে স্পর্শ করে যুগপৎ মকরোয়া অন্যপক্ষে সুঘরাইএর হাত ধরিল, ইহাতে ক্ষণেকেই দিক সকল প্রকৃতিস্থ হইল, এই পৃথিবীতে কখনও ঝড় হয় নাই, কিন্তু তিলেকের মধ্যেই দীর্ঘশ্বাস অবশ্য সে, বালক ফেলিয়াছে!

হায় ডোমেদের দীর্ঘশ্বাস আছে!

কিন্তু দীর্ঘশ্বাসের কারণ জানিতে সে প্রস্তুত নহে! (বিস্ময়ের যে সে নিজেকে চালিত করে) তৎপরিবর্ত্তে, সে বেদম উল্লাসে নাচিয়া উঠিল, অবাক দায়িত্ববোধে সে উষ্ণ, তদীয় গেঞ্জী যেমত শুভ্রতর হইল; লক্কড় ভূত প্রেতকে সে বিদ্রাবিত করিতে পারে—সে হুঙ্কার দিয়া নির্ভীকতায় সামনের পথ নজর করিয়াছিল।

অপার্থিব গর্ব্বে তদীয় গ্রীবা উন্নত দৃঢ়, ইহা আপনা হইতেই ঘটিল, কচিৎ এই ভঙ্গীতে ইহাতে বুঝায় যে তিতিরস্বভাব তাহাতে অনেকদূর প্রবেশ করিয়াছে, যে তাহাতে অধুনা এই অভিব্যক্তি সম্বন্ধে ধীরে বোধ আসিল এবং সে আপনকার গ্রীবায় মহা ভাবুকতায় হাত বুলাইয়াছে।

সেদিনও ঠিক আর এক যশোগরিমার আশায়ে এমনই ঘটে, স্নেহবৎসলা মনিব পত্নী যখন, কাগজের ফুল সকল নির্ম্মাণ করিয়া তাহাকে দিয়াছিলেন—সেই ফুলরাজি মনোলোভা, ইহাতে পোকা নাই, ইহা শুকাইবে না, বর্ণ নিষ্প্রভ হইবার নহে এবং উহাতে পক্ষীটি তাহার বিরাগভাজন হইবে না। সে আহ্লাদিত যে কাহারও খাঁচা—যাহা রিখিয়ার হাটে আনীত হয়, যাহা মোহনপুরে আসে—এমত ফুলে শোভা বর্দ্ধন ঘটে নাই।

সুঘরাই সচকিত পদক্ষেপে চলিতে আছে, মকরোয়ার ধৃত হাতে বার্দ্ধক্যের কম্পন; মধ্যে মধ্যে তাহাকে অন্যত্রে লইতেছিল—এতাদৃশই আরএক কম্পন! তাহা কিছু আজব প্রকারের উমের পিছন হইতে আগত—শীতের কুয়ার জলে যে উম নাই! সুঘরাইএর কোমরের ঘুনসী ঢ্যাঁটার চাবিটির পাশেই যে বাঁধা রহিয়াছে, ফলে যাহা কখনই খোয়া যাইবার নহে, এবং যাহা মাঝে মাঝে মনে পড়ে। এ কম্পন অভিনব, প্রথম যখন বনে গিয়াছিল ইহা তখনকার।

সে সুঘরাই বনসম্পদের একটি হইয়াই ব্যাঙের ছাতি সংগ্রহে ঘুরিতেছিল, তাহার স্কন্ধ যখন বৃষের তুল্য, যখন সে ভয়ঙ্কর! তখন এই এহেন কম্পন স্পর্শ করে—সবে চোখ ফোটা এক পক্ষী শাবকেতে।

শুধু তখন হয়ত তাহার মনে হইল বহুদিন তিতিরের সেই কম্পন ছোঁয়া হয় নাই, কিম্বা মনে হইবার আগেই তাহার গাত্রে ঝুমুরের কয়েক মাত্রা দুলিয়া উঠিল—কেননা বিসরিয়ার বাপ ঢাকে কাঠি দিয়া তখন এক ঝুমুর গাহিতেছে।

মুখে হাসি, সব্বলাশী, বাঙালি কা বিটিয়া।
ক'লকৎতা তে বেচতরে তামাকুল টিকিয়া ॥

এই ঝুমুর আন্দোলনে সে অচিরাৎ শিশুহস্তী, কিন্তু তখনই সে আপন দায়িত্ব ভুলিতেই বেচারী মকরোয়া ত্রাসে মৃদু হাহা করিয়া উঠিয়া ব্যক্ত করিল কিছু।

কিন্তু পরক্ষণেই বিসরিয়ার বাপ পথিপার্শ্বস্থিত আধা ঘুমন্ত গ্রামবাসীদের সম্বোধন করিয়া বলিয়া উঠে,—শুন শুন আমার কপাড় হে, আমার এককুড়ি দুইটি ছেলে...অনেকেই মৃত, আমায় খাইতে দিবার ভয়ে অনেক শালারা মৃত, যাহারা আছে তাহারা আমায় ফেন পর্য্যন্ত দেয় না গো...।

আবার কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া ঢেঁড়া দিয়া চীৎকার করিল,—তোমরা শুন, ঘরে ফিরিবার আনন্দ আমার নাই, তোমরা শুন রেলের জনম আমার জনম এক (সময়)...আমার জনম বড় দুঃখের হে, দুঃখই আমার বয়স...শুন...। এবং ঢাকে কাঠি দিয়াছিল।

তাহার কথার উত্তরে পারিপার্শ্বিক নিথর নিঝুম হইতে উৎসারিত হয়,—শালা তুমি মর, তুমি মর তুমি মর লক্‌কড়ে তোমারে খাক!

বিসরিয়ার বাপ ইহাতে গাহিয়া উঠিল—

পাগলা মনা পাগলা মনা।
পাগলা মনা রে।
আনন্দে হরি গুণ গাও!

সম্প্রতি সুঘরাইএর দেহে অনেক কথাই আঁচড়াইতেছে, সারাদিনের নানান ফেরে সে আর একে যেন পরিবর্ত্তিত, অনুকম্পা, করুণা আদি বহুবিধ সত্ত্বগুণ তাহাতে আছে এখন, সে পারিপার্শ্বিক আঁধারে চোখ রাখিয়া উচ্চৈঃস্বরে স্বীয় মনোভাব জ্ঞাপন করিতে প্রস্তুত—বিসরিয়ার বাপ ঢাক বাজাইয়া খানিক কাহিল যেহেতু, এই উদাত্ত স্বরে বলিতে পারার জন্য সে খুসী,—বিসরিয়ার বাপ তুমি খেদ কর কেন, তুমি ইচ্ছা করিলে একটা কাঁটাহার, (কাঁঠাল) একটা পাঁঠা, এক পালি চাল খাইতে পার, তোমার ত দুঃখের কথা নহে!

বিসরিয়ার বাপ এহেন প্রশংসায় উজ্জ্বল হইয়াছে, রাতকানা মকরোয়া বেশ বুঝা গেল ঈর্ষায় হাসিয়া কহিল, কে দিবে হে...?

যে সুঘরাই একশত বিচার করিয়া বলে নাই, অথবা কি যে সে ব্যক্ত করিতে মনস্থ করে তাহা তাহার খেয়াল নাই; সে অপ্রতিভ; সে ত্বরিত নিজেই সংযত হইল অথবা সমক্ষের কোন অন্ধকার দেখাতে আকৃষ্ট; আদতে ঐ বৃদ্ধের খেদ কমাইতে সে বলিয়াছিল। এবং আরও নিশ্চয় যেহেতু এই বিসরিয়ার বাপই যে তাহাকে কুয়াতলায় সবিস্ময়ে বলে,—হারে বুতরু তোমার তিতির কোথায়? তিতির বিনা তুমি! আশ্চর্য্য! তোমাকে আমি চিনিয়া লইতে পারি না,...আমি ভাবি একটা গেঞ্জীওয়ালা কেহ...। সেই কারণেও হইতে পারে!

যে এখন মকরোয়ার কম্পনেই ঐ বাক্য স্মরণেই উপস্থিত যে তাহা হদিশ পাইল—যে বৃদ্ধের কুয়াতলার ঐ কথারই জন্য সৌজন্য কৃতজ্ঞতা জানাইতে এমনবৎ সে যেন সুযোগ সন্ধান করিতেছিল, কিন্তু সে অযথা সূত্র ধরিয়াছে!

এমত সময় বিসরিয়ার বাপ যে গর্ব্বে উখলিত আছে, বলিল,—হা রে মকরোয়া রাতকানা, যে বুতরু তোমারে অদ্য পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছে, সে খুব ভাগ্যবান...আরে বাবা!...বেজায় ধনী লোকের বাড়ী কাজ করে,...বেজায় ধনী হে...তাহারা উহারে খুব যত্ন করে, রোজ এ পোয়া চালের ভাত দেয়, কি না বল?...

এই সুঘরাই খুব চতুর হে, এ ডালিম বেদনা দেখিয়াছে...যাহা গ্রামের আর কেহ দেখে নাই...আমি, আমার কথা ছাড়...সে ডালিম বেদানা খাইতে দেখিয়াছে, আসছে জন্মে...সে বড় ঘরে জন্মাইবে...হা রে দুঃখ!...হা হা এই বুতরুর চমৎকার এক তিতির আছে...আহা ঘরকে ফিরবার টান বটে...সুখ দুঃখের সাথী সেটা...।

সুঘরাই, তাহাকে একদিন লইয়া আসিও, দুটা ভাত দিব, ঝুমুর শুনাইব...'ত্রিকূট পর্ব্বতই চড়ি ডুমা ছাঁটে বাঁশরে কুরু বনে সজনোয়া'...দারুণ তিতির, অনেক টাকায় বিকাইবে গো...বড় বড় ঘাটওয়াল জোড়া (কাপড়) দিবে হে, টাকাও দিবে...হা হা যখন তাহার (তিতিরের) বিয়ের ফুল ফুটিবে, তখন আমাকে বরাৎ দিও হে, হাটে হাটে ঢেঁড়া দিব...।

এবং তৎক্ষণাৎ বিসরিয়ার বাপ নৃত্যসহ ঢেঁড়া বাজানর ছন্দে, ঢাকে কাঠি দিল, সেই মত সে বাজাইতে থাকে তিতির বিষয়ক—একের পর অন্য পদবিন্যাসের বিরতিতে, যথা...চোখ উহার কাঁটি কাঁটি, রাগিয়া গেলে লাল, মেঘ ডাকিলে বেগুন বেগুন, আবার তারার মত বটে, নদীর মত হে, আকাশ বাতাসের ছায়া, তাঁহার মাথায় বাবুদের মতন টেরী কাটা, তাহার পাখার ঝাপটে পোকা পালায়, তাহার ডাক যেমন বা গাডের (রেল-গার্ডএর) হুইসিল,...রেল ছাড়ল হে...।

এবার তাহার ঘুঙুর বাজিল, পুনরায় ব্যাখ্যা করিল,...তাহার চাহনিতে মকরোয়ার রাত কানা ঘুচিবে, তাহার ডাকে মাদি তিতির পাছা তুলিয়া বসে,...সে বড় জোয়ান—গাছের পাতা তাহার সামনে উড়িলে সে রুখিয়া উঠে...জাত রাজ রাজপুত...বিড়াল হুলাড় ঐ তিতিরকে ডরায়, সুঘরাই তুমি যখন দেখিবে পাখীটা ছেঁড়া ন্যাকড়া, ছেঁড়া দড়িকে ঠোঁট দিয়া কব্জা করিয়া ঢেঁকি করে,...তখনই আমায় খবর দিবে...তাহার বিয়ের ফুল ফুটিয়াছে বুঝিবে...যে জোড় খাইবে।...সে যখন লড়িবে শ'য়ে শ'য়ে পয়সা

পড়িবে...কত লোক হারিয়া ধূলা চাপড়াইবে।

ইহাতে সুঘরাই আপন তিতিরের গুণকীর্ত্তনে নয়ছয় আছে, যে সে মকরোয়ার কম্পনে অত্যধিক প্ররোচিত, উদ্বুদ্ধ, যে সে ইতঃমধ্যে কখন যে মকরোয়ার হাত নিজে ধরিবার মনস্থ করে—ইহা তাহার অজ্ঞাতেই; এবং সে বুঝিল যে সে ঝটিতি আপন হস্ত মুক্ত করিয়া তখনই উহার হাত ধরিল।

মকরোয়ার হাত শিরাবহুল, ও অতীব রোমযুক্ত এবং যাহা অনুভবেই সুঘরাই চমকিত হইয়াছে, যে সে হোঁচট প্রায় খাইয়াছে—কীদৃশী অলৌকিক ঘটনা উহা স্পর্শে, কি এক বিহান! সে ধানক্ষেত ঝরণায় স্রোতে পা ডুবাইবে, শব্দ হইবে—নিশ্চয় ও যে তখনই সে সঠিক আরবার মহেশ্বরী ধ্বনি শব্দত দিয়া উঠিল। ইহাতে সে বিস্ময়ে ছেলেমানুষ। অথচ সে নিজে তাহা বিশ্বাস করিতে পারিল না যে উহা তাহার কণ্ঠস্বর, উহা যেমত অন্য আর কেহ!

অন্যপক্ষে রাতকানা মকরোয়া, উঃ বলিয়া সবিনয়ে জানাইল,—হে বুতরু, আমি তোমার উপর নির্ভর করি...বেসামাল হইলে আমিও হইব...আমাকে বুঝিয়া চল...আমাকে বুঝিয়া চল হে...।

অবাক যে এহেন কাতরোক্তিতে সে বিচলিত নহে, যে সে তখন আপন কর্ণে সেই মহাধ্বনির অনুরণনই কেবল শুনিতেছিল, সেই ধ্বনিকে পূর্ণভাবে নিখুঁত শব্দে জানিবার কারণে সে কেমন যেমন নিষ্ঠুর, যে এবং ক্ষণিকেই বুদ্ধি করিল যে সে ভীত ভাণে পুনর্ব্বার সেই আস্বাদ লইবে! সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলিয়া আছে।

তাহারা সকলেই পথ চলিতেছিল। বালসরাইয়ের অন্যধারে চড়াইয়ের পূর্ব্ব দিকে রাঙাপড়ি-র শালবন সেখান হইতে মাদলের আওয়াজ আসিতেছিল, ইতিমধ্যে আঁকাবাঁকা রাস্তার বালি সাদা দেখা যায়—সুঘরাইএর চোখ ছোট হইয়াছিল, আড়ষ্ট গলায় অনুরোধ করিল,—হে বিসরিয়ার বাপ একটু ঢাকে কাঠি দাও...কেন না লক্কড়টা যদি...এবং অথচ এখন ধীর পদক্ষেপে বাজনার অপেক্ষায় না থাকিয়া সে অগ্রসর হয়, এই উৎরাইএর কোথাও বিশেষত কালভার্টে যে আছে সে নিশ্চয়ই আপন কম্পিত সুযোগ পাইবে, সুতরাং! ঐ কথা।

তথাপি সে অতীব শান্ত কণ্ঠে প্রকাশিল,—দেখ হে মকরোয়া আমি ইচ্ছাসুখে তোমার হাত চাপি নাই, ইহা আমি জানি তুমি বৃদ্ধ, তুমি রাতকানা...আমার কথা তুমি জান না, আমি খাওয়া দেখিয়াছি কিন্তু খাই নাই সারাদিন...আমি উপবাসী...তাহাতে আমার দুঃখ নাই...আমার মনিবদের হইতে আমি বিচ্ছিন্ন হই—আমি এখন যেহেতু ছেলেমানুষ, লক্কড় ক্ষুধিত...।

রাতকানা মকরোয়া এই সুদীর্ঘ আধ ভাঙ্গা বাক্যবিন্যাসে যেমন বা ভ্রূদ্বয় কুঞ্চিত করিল, অন্তত সুঘরাই ইহা অনুমান করিয়াছিল, তন্নিবন্ধন সে যথার্থই সঙ্কুচিত, যে সে আপনার কথার আওয়াজে পীড়িত, সে আপনকার বাম হস্ত এই অন্ধকারে দেখিতে উৎসুক হইল।

ভাগ্যশ বিসরিয়ার বাপ এখন ঢাকে কাঠি দিয়া ত্রিভুবনকে জ্ঞাত করিল,—হি সে শালা লক্কড় পেটে যে শালা বোবা, সেই শালার পেটে মদ ছিল, লক্কড় শালা মদের আস্বাদ পাইয়াছে...মাতাল ছাড়া আর কিছু সে খাইবে না...হাঃ আমি কি দুঃস্থ, বহুদিন আমি মদ খাই নাই...আমি তালের কেঁড়ে চুষি!—ইহার অন্তে সে গাহিয়া উঠিল...

'ফুলল গুলাব রে ভোমরা চুষাল...'।

যদিও এহেন স্থানে ঐ প্রকারের মস্করা বিসদৃশ, তথাপি সুঘরাই যেমত স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিয়াছে এবং সে মকরোয়াকে বলিল,—তোমাকে আমার তিতির দেখাইব...তুমি দেখিলে তাহাতে তোমার শীত গ্রীষ্ম বোধ থাকিবে না...। কিন্তু ইহা জ্ঞাত করিতে সে যেমন তটস্থ হইতেছিল, কেন না সম্মুখে বাঁশঝোপ, ঝটিতি সে মকরোয়ার হাত সজোরে চাপ দিল, এখন নিশ্চয়ই কম্পন উপলব্ধির আশে নহে।

মকরোয়া ইহার নিমিত্ত প্রস্তুত ছিল, ফলে সে দাঁড়াইয়া পড়িল। অন্যপক্ষে সুঘরাই সভয়ে সেই বাঁশঝোপ অবলোকন করিতেছিল, সে শুনিয়াছে এই বাঁশঝোপ বড় দুষমন, ভূত আছে; যে ভূত দুইটি বাঁশ পাশাপাশি ভূমিতে আনত করাইয়া মানুষকে মারার কল পাতে, সুঘরাই এই সংস্কারে—অবশ্যই চোরা এই সত্য যে তাহার হাতে নোনা আছে—ত্বরিতে মোহিলি হইতে প্রাপ্ত এক অমোঘ মন্ত্র মনে মনে উচ্চারিয়া আপনারেই প্রদক্ষিণ করিয়াছিল।

তিতির পাখীটি তখন কত দিনের বাচ্চা মাত্র, সুঘরাই আপনার হাতের উপরে বসাইয়া সেই পাখীটি লইয়া যায় মোহিলির কাছে, যে তখন কোদাল দিয়া জমি কোপাইতেছিল, সে তদ্দর্শনে তদীয় বক সমান লম্বা ঠ্যাং ভাঙ্গিয়া লাফাইয়া কহিল,—ছি ছি তোমার কোন কাণ্ডজ্ঞান নাই...তিতিরটি খড়ের উপর বা কোন কাটোরাতে (পাত্রে) আনিতে হয় জান না, তোমারে বলি নাই...সবে ইহার চোখ ফুটিয়াছে...খুব অন্যায় করিয়াছ!...জান না তোমার হাতে নোনা আছে...মানুষের নিজের হাত তাহার মনের কথা শুনে না—হাত ভারী খচ্চড়, কেরেট সাপ হইতেও পাজি...হাত সদ্যোজাত শিশুর দক্ষিণ প্রত্যঙ্গে যে ভূত পায় তাহা হইতেও নচ্ছার!

সুঘরাই ইহাতে মাটির দিকে চাহিয়াছিল, যে সে হয় পাঁশুটে, অথচ মোহিলির বাড়ী পর্য্যন্ত সারাটা পথ এই হাত দ্বারা এতক্ষণ এক অভূতপূর্ব্ব অভিজ্ঞতায় সে মথিত ছিল, ঐ ছোট শাবকের কম্পন তাহার হৃদ্‌পিণ্ডকে যেমন ছন্দিত করিতে আছিল এবং এক হাত হইতে অন্য হাতে শাবক রাখিয়া, শূন্য হাত গভীর কৌতূহলে আঘ্রাণ করিয়াছে...কম্পনের কি মধুর গন্ধ! কি মধুর'!

সম্প্রতি মোহিলির ভর্ৎসনাতে সে বিচাল্যমান নির্জীব আছে।

মোহিলি কোদাল ফেলিয়া আসিয়া একটি স্থানে দাঁড়াইয়া মন্ত্র বিড় বিড় করিতে থাকিয়া বাম পদ দ্বারা যতদূর সম্ভব—উহা দূরে প্রসারিত করিয়া, ভূমিতে এক গণ্ডিচক্র নির্ম্মাণ করিল, অদ্ভুতভাবে লাফ দিয়া গণ্ডির বাহিরে আসিল ও নানান ক্রিয়ার পর পক্ষীশাবককে গণ্ডির কেন্দ্রে বসাইয়া দিল। অতঃপর চারিভিতে অদ্ভুতভাবে হাঁক মোহিলি পাড়িল, এবার আকাশের দিকে তাকাইয়া স্বীয় বক্ষে চাপড় মারিয়া কি যেন গলাধঃকরণ করিতেই তন্মুহূর্ত্তে মাটিতে সে নিজেই আছাড় খাইয়া পড়িয়া গোঙাইতে আছিল, এবং কাটা-ছাগলের-ন্যায় সে কাঁপিতেছে; আশ্চর্য্য যে এবম্বিধ ঘটনায় পাখীটি স্থান ত্যাগ করে না; অন্যপক্ষে বালক থতমত হইয়া পলায়নে উদ্যত হইয়া তেমনই রহে, সে চিত্রার্পিত।

ক্রমে মোহিলির কর্ণদ্বয় নড়িল, এবং যে সে মাটিতে মুখ রাখিয়া অস্পষ্ট বিজড়িত কণ্ঠে কি যেন বলিতে আরম্ভিল,—এখন শোনা গেল, আমি সেই ভূত, আমি সর্ব্বনাশ করিব, যে আমি...জল পান করি, ঐ বুতরু কেন তিতিরকে শুধু হাতে বহন করিয়া আনিল, দুয়ার খুলিয়া দিল, পথ করিল; তুমি কেন দেখ নাই, এখন ফল ভোগ কর, তোমরা দুয়ার খুলিয়াছ, পথ করিয়াছ, সর্ব্বনাশ করিব!

তদুত্তরে মোহিলি ঈষৎ তাহার নিজস্ব স্বাভাবিক স্বরে, কি যেন কহিল, সম্ভব মার্জ্জনা ভিক্ষায়।

...আমি মরদ মিয়ার একটি ছাগল এখন বিনষ্ট করিয়াছি; আমি এখনই তোমার ও ডোমপুত্রের সর্ব্বনাশ করিব, ও তুমি লোহা ছুঁইলে বেশ...তোমরা রক্ষা পাইলে; কিন্তু তিতিরের রক্ত পান করিবই...কেন না যে রহস্য সূর্য্যকে ত্রিকূটের পশ্চাতে উঠায় আবার ডিগরিয়ার বামে এবং ডাইনে সরাইয়া ডুবায়, সেই রহস্য যেক্ষণে সবে পক্ষীতে গোড়া লাগে তাই পক্ষীশাবক কম্পিত, সেইতে বালকের হাত লাগিয়াছে যে সে চোর ছ্যাঁচড়া হইবে, উহার হাতে তাই নোনা, (নোনা মানুষের হাত, উহার হাতও নোনা) সেই নোনা লাগিয়াছে, আমি পক্ষীশাবকের রক্ত পান করিব।

মোহিলি স্বাভাবিক স্বরে মিনতি করিল।

...আচ্ছা! যেদিন পিঙ্গল বর্ণের কিদিম কাঠকোম (কাঁকড়াবিছা) খাইবে সেইদিন গোড়ালাগা উহাতে পুরা হইয়াছে জানিও...।

মোহিলি কোদাল পদদ্বারা ছুঁইল এবং অতঃপর উঠিয়া সুঘরাইকে পক্ষীশাবক সম্পর্কে অনেক নিয়ম-মানার উপদেশ দিল, আপাতত মৃৎপাত্রে ছোট কেঁড়েতে পাখীটিকে রাখার কথা কহিল, তিন হাট তিন দিন পর খাঁচা! কঞ্চি কাটার মন্ত্র তাহাকে বলিল। এবং ইহার পর তাজ্জব যে বালকের ভগনীপতি, পাখী যে অপছন্দ করিত, সেও কিছু বলে নাই!

সে, সুঘরাই, সারাদিন এক বিশ্রীদর্শন খাঁচা লইয়া ঘুরিত! আর সূর্য্যের দিকে সভয়ে চাহিত। কেন না সে এতাবৎ শুনিয়াছে যে সূর্য্য নিজে উঠে! নিজেই নিজের জমিদার! এখন জানিল অন্য কথা, যাহা কাহারও সহিত আলোচনা করাতে দিব্বি আছে। শুধু খাঁচার বাঁশ-চৌরস সময়ে নিজ গাত্রের কম্পনে ভীত হওয়ত মোহিলিকে বলিয়াছিল।

মোহিলি উত্তর দিল,—উহা হাওয়ার জন্য বা ঠাণ্ডায় ও কিছু নয়!

সুঘরাই যখন ঐ বাঁশঝোপে যে ইহা রাস্তার পাশে আছে, তির্য্যক নিরীক্ষণ করিতে থাকিয়া, অদ্ভুতভাবে মকরোয়ার হাত সন্ধান করিতে আছে, তৎকালেই মকরোয়া অনুচ্চ কণ্ঠে বলিল,—হে বিসরিয়ার বাপ, এই বুতরু খারাপ, খচ্চড়...আমার হাতে বড় জোর আবার চাপ দিয়াছে...আমি হোঁচট খাইতাম হে।

বিসরিয়ার বাপ ঐ বক্তব্যের প্রতিধ্বনিতে মন রাখিয়া উত্তর দিল,—আহা সে বুতরুমাত্র...এখন রাত্রকাল, তাই সে ভীত...নিশ্চয় স্বেচ্ছায় নহে, আরেঃ বাব্বা! মনিব কত ধনী, সে কিরূপে খচ্চড় হইবে!

রাতকানা মকরোয়া কোন যুক্তিতে কর্ণপাত না করত প্রকাশিল,—হাঃ, শালা খচ্চড়!

যে সুঘরাই কায়িকভাবে যেমন এই ছোট তাহারা-র মধ্যে, তেমনই সে অন্তরেও নিমেষেই উহাদের সহিত এক; কটূক্তি এখনও বিশালতায় প্রতিধ্বনিত হইতেছে, কিন্তু যেহেতু, ক্রমে খচ্চড় শব্দটিও বড় হইতে ছোট হওয়ত সর্ব্বশেষে দক্ষিণের ক্ষেতের আল হইতে আসিল! তাই সে ক্ষণেক বিভেদে আছিল; এবং যে তাহাতে ইহা আভাসিত হয় যে যেন মকরোয়াতে কোন রহস্যেরই গোড়া লাগে নাই; কিন্তু তৎপ্রবর্ত্তিত অনুতাপ নহে, ছোট ছিছিও নহে, একটু অপ্রতিভ হইবার পূর্ব্বেই পুনরপি, সেই মহাধ্বনি তুলিতে যেন মরীয়া হইল।

যে ধ্বনিতে এক অলৌকিক বিবাহ-যাত্রার ছবি!

আর আর পরিচারকবর্গের কথায় স্নেহশীলা মনিব-পত্নী ইদানীং যারপরনাই চিন্তিত; সত্যই সুঘরাই ক্রমশ এক অদ্ভুত অন্ধকার হইয়া উঠিতেছিল, যেমন সে এক চরিত্র! যে সে, বৈদ্যনাথ যাওয়ার দিনের যত ব্যবধান বর্দ্ধিত হইতে আছে, ততই যেন হন্যে, খাঁচার কাগজের ফুলের গন্ধ আর অনুপ্রাণিত নহে, বাগানের ফুল তাহাতে সঠিক স্বর শব্দ জাগায় নাই, খাঁচা সাজাইবার অভিনব উদ্ভাবনশক্তির জন্য সে উন্মত্ত আছে।

অতএব তিনি যখন শুনিয়াছিলেন যে সুঘরাই রাত্রে ঘুমের মধ্যে কি এক, কোন এক ডাক, আজকাল তুলিয়া থাকে, তখন তিনি সুঘরাইকে শুধু বলিয়াছিলেন,—মুখপোড়া রাতে হাত পা বেশ ভাল করে ধুয়ে তবে শুবি! অবশেষে মোহিলিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মোহিলি তাঁহারে আশ্বাস দিল, যে সে বিহিত করিবে।

সুঘরাইএর সম্বন্ধে বিবিধ খবরের পরে যখন বিশেষত কয়েক দিন বাদে শুনিলেন, যে, ঘুমের মধ্যেই সে দাঁড়াইয়াছে, হাতে তাহার লণ্ঠন, এবং সে ধ্বনি তুলিতেছে! এবং যে তাহার মুখে মৃদু হাসি ছিল, যে সে পুনঃপুনঃ নাসিকা কুঞ্চিত করিয়াছে! এবং সে মাদুরে বসিয়া পার্শ্বস্থিত খাঁচাটিতে কি যেন করে! সে যেন কি বলিতে থাকে পাখীটিরে!

আদতে যাহা সুঘরাই তখন বলিয়াছে, তাহা এই যে, মা ঠাকরুণের নিকট যে কাগজের গুচ্ছ আছে তন্মধ্যে হরিৎ কাগজের পরেই যে কাগজ (যেহেতু সে ঐ রঙের নাম জানে না) সেই কাগজের ফুল করিতে মা ঠাকরুণকে বলিব, এবং সেই ফুল দিয়া সাজাইব, কেন না এখনই সেই ধ্বনি তুলিতেই আমি দেখিলাম বিবাহ-যাত্রার সেই সাজানতে সেই রঙ।

কল্যই আমি ঠাকুর ঘরের নর্দ্দমা পুনরায় শুঁকিব, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমার সমগ্র ঐশ্বর্য্য মনে পড়িবে, আজই নিশ্চয় হইত, হঠাৎ শনিচারোয়া আপন যদি না আসিয়া উপস্থিত হইত!

যে সুঘরাই, এখন দ্বিপ্রহর, প্রায় নিঝুম ঠাকুর ঘরের,বাহিরের দিকের, নর্দ্দমায় আঘ্রাণ করিতে ছিল; সেখানে নানাবিধ গন্ধদ্রব্যের জল নিষ্কাশিত হয়, ধূম নির্গত হয়, সেখানে ফুলের পাপড়ী ছিন্ন, কখনও কখনও মৃদু পাখীরা জল পান করে! এখানেও যে চমৎকারিত্ব আছে, যে সুঘরাই তাহা জানিত!

শুদ্ধচারিণী মনিব-পত্নী যখনই উহা পরিষ্কার করিয়াছেন তখন সুঘরাই বাহিরে থাকিয়া পয়ঃনালীর মুখ হইতে দূরে রহিয়া কাজ সঠিক হইয়াছে কিনা তদারক করিয়াছে এবং এই সময়ে পবিত্রতার কাছে থাকিতে সে যেমন শঙ্কিত হইয়াছে—এখন ঐ নর্দ্দমায় কিছু ভীতি ছিল যে সে ডোম,—তবু এখন যখন সে আঘ্রাণে ক্রমে ভরপুর এবং মুখমণ্ডল আরক্তিম, কোন একভাবে তীর্থস্থানের অপূর্ব্ব ধ্বনি ফুকারিতে

চেষ্টান্বিত, ঠিক তেমন সময় শনিচারোয়া উপস্থিত, কহিল,—হে রে ঐখানে কি করিতেছ!

সুঘরাই থতমত, চকিতে আপন খাঁচাটি যাহা এখানে ছিল তাহা অন্যপাশে স্থাপিত করিল ও ফুল আর কিছু সুতা এবং ছুরিটি এবার হাতে লইয়া কহিল,—নর্দ্দমায় ময়লা আছে কি না দেখিতেছি...!

কি দেখিতেছ? দেখিলাম, তুমি ফের সেইরূপ চীৎকার করিতেছিলে।...আমি দেখিলাম! আমি দেখিলাম!...বল এবার যে লড়াইএর মন্ত্র শিখাইতেছ নর্দ্দমাকে, লড়াইএর মন্ত্র শিখাইতেছ...!

যে সুঘরাই মাথা উন্নত করিতে চাহিলেও পারে নাই, কেননা নিকটের পিচ্ গাছ, কেন না পশ্চাতের ফলসা গাছ, ইহারা সাক্ষ্য দিতেছিল; তাহা সত্যই ঐ শনিচারোয়া উল্লেখিত যাহা, এখন তাহার যুক্তি নিরর্থক, যাহা অবলীলাক্রমে তদীয় জিহ্বায় আসিয়াছিল। সে তেমন স্বর লাগাইবে সিরিয়া-র পিছনের মাঠে যেমত ঘটিল,—সেখানে সে খাঁচা সাজানর সরঞ্জাম রাখিয়া খাঁচাটি একহাতে লইয়া দাঁড়াইয়া, কেননা উপবিষ্ট ভঙ্গিতে সে জোর নাই ভাবিয়া, আপন সমগ্র আবেগ সৎসাহস সঞ্চয় করত সেই ধ্বনি তুলিতে থাকে।

সে ছোট্ট পাহাড়টির পাশে আছে। আজ তাহার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে, সে সেই শ্রুত শব্দটি পূর্ণ উচ্চারণ করিতে পারিবে! সে নিজেকে শাসাইয়াছে পর্য্যন্ত, যে, আজ যদি না ঠিক পার ত পাঁচ চড়! যে এবং সে তারস্বরে, হাওয়ার বিপরীতে, সেই ধ্বনি অনুকরণে দিক সকল বিদীর্ণ করিয়াছে! তাহার নির্দ্ধারিত অনেকগুলি তিনবার পার হইয়াও—তিনবার উচ্চারণ করিয়াও সে সফলকাম নহে।

কাগজের ফলসমূহে হাওয়া ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে, ঝটিতি মনে হইয়াছে সন্ন্যাসী সাধকদের কণ্ঠস্বর সেখানে ফুলেতে দিব্য হইতেছে, হইয়া আছে; আর যে সে তিলমাত্র কালক্ষয় না করিয়া সেই সেই ফুলগুলি তুলিয়া কানের পাশেই ধরিয়াছে, এমত আশায় যে যদি ঐ সম্যক স্বর শুনিয়া নিজ কণ্ঠে তুলিতে পারে, তবেই তাহার সমক্ষে সেই বিবাহ-যাত্রা শোভা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উদ্ভাসিত হইবে।

আর যে সে তেমনভাবে পক্ষীর খাঁচাটি সাজাইবে!

কিন্তু যতবার সে মনঃসংযোগ করে, ততবারই বেচারী প্রতারিত, সে বিড়ম্বিত! যে এখন কাগজের পাপড়ীতে বাঁচার-জন্য হাস্যকর আওয়াজ সেখানে, টিকটিকি ধৃত পতঙ্গ যেমন বা। যে সেই ফুলগুলির উপর আক্রোশ তাহার হয় নাই—যদিও সে বালকমাত্র—ইহারা তাহার তিতির নহে, এখন সে তাহা ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আবার একাগ্র হইয়াছে, যে ক্রমাগত মুখখানি প্রতিনিয়ত এক বিশেষ উচ্চারণে খেলাইতে চাহিয়াছিল।

ইতিমধ্যে এক অদ্ভুত অপ্রত্যাশিত সঙ্কল্প তাহাতে থাকিয়া থাকিয়া উৎচকিত হইয়াছে, যে সে ব্রাহ্মণ (পাণ্ডা) বাড়ীতে চুরি করিবে, বামাল বেচিবে ও পরক্ষণেই অদ্ভুত কাল্পনিক দৃশ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে যে সে বামাল বেচিয়া মহুয়া কিনিল, ও তাহার ভগনীপতি মহুয়া খাইয়া শুয়োর ছানা কোলে লইয়া খুব নাচিতেছে!

কিন্তু ঐ সঙ্কল্প, ঐ দৃশ্য তাহাকে অবাক কিম্বা থ পর্য্যন্ত করে না এবং ইহাও সম্ভবত যে—একারণ যে, এখন সে সম্মুখে দেখিয়াছিল কয়েকটি উলঙ্গ বালক প্রায়-উলঙ্গ বালিকা নিকটে আসিল, যাহারা রাখাল ইহারা তাহার প্রতি চাহিয়া আছে, যে বালক কাঁড়ার (মহিষ) পিঠে আরূঢ়, যে কাঁড়ারের গললগ্নি ঘণ্টি বাজে, কহিল,—তোমার কি হইয়াছে, তুমি এরূপ চীৎকার কর কেন?

যে এবং এই সঙ্গে আর আর নগ্নতা সকল হইতেও ঐ একই প্রশ্ন হইল।

সুঘরাই একদা আপনকার হস্তধৃত খাঁচার দিকে চাহিল, দেখিল, ফুল আর টুণ্ডী; এবং দেখিল, আপন প্রিয় পক্ষী ঘাবড়াইয়া আছে; আর যে নিখোঁচ কণ্ঠে উত্তর দিল,—আমি ইহাকে সাহসী করিতেছি, ইহাকে নির্ভীক...ইহাকে দুর্দ্দান্ত করিতেছি...লড়াই তাহার কাছে শুক্না ডাল ভাঙার মত যাহাতে সহজ হয়!...যাহা শুনিয়াছ তাহা এক দারুণ মন্ত্র, ইহাতে তিতির দামাল হয়!

যে নগ্ন অল্পবয়সীরা ইহা শ্রবণে নিজেদের মধ্যে তর্ক করিল, নিজেদের দেহের বিবিধ স্থানে হাত দিল, কেহ চুলকাইল; সিদ্ধান্ত করিল, আরেঃ বাব্বা! এক হাট ভর্ত্তি জমিদারের বাবার বাবার বাবা, উহার মনিব, কত কত ধনী...এরূপ মন্ত্র নিশ্চয় আছে...আমরা ডিগরিয়া জানি, ত্রিকূট জানি...কত কি জানি না!...আঃ খাঁচাটি কি সুন্দর!...ঐ গোল মত ফল কেমন যেন দেখিতে, আ আমরা কিছুই জানি না; উহাকে কি বলে? কি অপরূপ সে যাহার এরূপ খাঁচা আছে...সে খুব খুব!

এবং ঐ ধ্বনির কারণ রূপে সুঘরাই সকলকেই ঐ যুক্তি দিয়াছিল। এখন সে নিঃসম্বল দৃষ্টিতে নর্দ্দমাটি দেখিতে থাকে।

শনিচারোয়া যোগ দিল,—এখন...মালীর বৌ সবই দেখিয়াছে...যে তুমি নিত্য মাঠে যাও সেই তুমি বাহির-এ পাইখানায় গিয়াছিলে...তোমার ছাড়া কাপড় সিঁড়ির পাশে আতা গাছে ছিল (এই বাড়ীর আচার অনুযায়ী) তোমার খাঁচা সিঁড়ির তলায় ছিল...তুমি উলঙ্গ অবস্থায় আসিয়া সাজান-তে ঠিক দাও...পাখীটিরে খোঁচাও...সেখানে চীৎকার ঠিক কর নাই, চাপা স্বরে কর...তুমি বিড়ি খাও না অথচ তাহাকে বলিয়াছ উহা চন্দনী বিড়ি...সে যখন জিজ্ঞাসা করে এত ধূপের মত গন্ধ কেন...ইহার অর্থ কি?

সুঘরাই এবম্প্রকার প্রশ্নে আশ্চর্য্য যে একটুকু বিচাল্যমান নহে, সত্যই যে সে একটি ধূপ জ্বালাইয়া বারম্বার সেই ধ্বনি তুলিতে আপ্রাণ করিয়াছে, মাঠে ঘাটে ঈদৃশী চেষ্টা হাওয়ার নিমিত্ত বৃথা হইয়াছে তজ্জন্যই, মল্লিক লজের পশ্চাতে একমাত্র ছাদহীন বাড়ীতে সে যায় নাই।

কারণ সেখানে স্ত্রী-লোকরা বহুসময় যায়। তাই ঐ স্থান, যেখানে সম্মুখের নোনা ধরা দেওয়ালে বিরাট মাকড়সা, ও পাশের দেওয়ালের গায়ে বিশ্রীদর্শন টিকটিকি...আর যে ইতিমধ্যে সে—প্রজ্জ্বলিত ধূপ হস্তে সে পবিত্র ধূমায়িত, সে খানিক চোখ বুজাইতে শঙ্কিত, তথাপি সে নিজেকে সোজা দৃঢ় করিয়াছে এবং সে সেই বিবাহ-যাত্রার সন্ন্যাসী সাধককৃত অভিনন্দন ধ্বনি তুলিয়াছে, ফলে তাহার শরীর কেমন যেমন বেসামাল হইল, তন্ময় হইল, যেন তাহার অন্তরীক্ষে কোথাও মনিব মহাশয়ের বিছানার মত বিছানা—সে শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল—কি ব্রণ-বিরহিত শুভ্রতা! এখন এবং সে দৃপ্তস্বরে মালীকে কহিল,—সে বিড়ি খাইতেছিল।

আবার মিথ্যা!...পাপ হইবে...অবশ্য তোমরা ডোম, গাপের কি জান বটে।

আবার আমাকে ডোম বলিতেছ...দাঁড়াও মাকে বলিব...।

...কোথায় ডোম বলিলাম? ও...ও...উহা আমার মুখ হইতে...আপনি...। এবং শনিচারোয়া অসহায়ভাবে থামিয়াই আরম্ভিল,—কতবার বলিলাম মোহিলিকে আবার ডাকিতে...এখনই সুরাহা হইত!...আমরা ভাবি তোমার কি হইল...!

সুঘরাই শনিচারোয়ার এই ডোম সম্বোধনে ঈষৎ-হৃষ্ট ছিল। কিন্তু মোহিলির উল্লেখে অল্প বিমর্ষ, অবশ্য মমতাময়ী মনিব পত্নী এখনও, পরিচারিকাবর্গের অনুরোধে কর্ণপাত করেন নাই, এমনও যে স্বল্পভাষী মরদ মিয়া সে-ও এবং অনেকে তাঁহাকে সুঘরাইকে মাঠে মহাধ্বনি তুলিতে দেখিয়া বলিয়াছিল, ইহা এরূপ কাণ্ড ভাবিবার কথা মা!

কিন্তু তিনি মৃদু হাসিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন উহা সুঘরাইএর উল্লাস মাত্র খাঁচাটি যেহেতু মনোরম দেখিতে হইয়াছে! কিন্তু ইদানীং সুঘরাই বেশ অনুভব করে যেন তাঁহার সেই-পরিচিত ভাব—যাহা প্রশান্ত প্রসন্নময়—ক্রমে অন্তর্হিত হইতেছে; বিশেষত গতকাল সে লক্ষ্য করিল, যে তিনি পাখীটির ঘা বৃদ্ধি দেখিয়া ঔষধ দিতে থাকিয়া কহিয়াছেন,—ফের যদি দেখি খুঁচিয়েছ তাহা হইলে কিন্তু ভাল হবে না...আমি কিন্তু...।

সুঘরাই এক নূতন স্বরে কহিল,—উহা ঐ পাখী নিজের ঠোঁটেই...বিশ্বাস করুন...খুঁচাইয়া মানে...ঔষধ পর্য্যন্ত খাইয়া ফেলে...তাই...।

ও সব কথা থাক্...খবরদার প্রাণী হত্যা হয় যদি তাহলে তোরই একদিন কি আমারই একদিন...আমি বুঝি না...ও অজ্ঞান...নড়বে চড়বে কোথায়...অত যদি তাহলে পায় দড়ি বেঁধে রাখ...সাজানর চোটে বেচারীর জল খাবার বাটিটা পর্য্যন্ত সরিয়েছিস, ডোম না হলে এমন নির্ম্মম বুদ্ধি হয়।...চোখ নেই, বেচারী প্রায় ঐখানটিতে বসে থাকে...।

যে এবং তিনি পাখীটারে সোহাগ জানাইতে কালেই পুনরায় বলিলেন,—তো চন্নামেত্তর খাওয়া কেন? আমারই ভীমরতি!...তুই যে মুখপোড়া বলিস ওকে একবার মারলে আমি নিজে দশবার খাই...কৈ দেখি কোথায় তোর এমন ঘা...বজ্জাত...ঠাকুর, মাগো, এত লোককে তুমি সুমতি দাও, এই ডোম হারামজাদাকে একটু দিতে পার না...পাপ হয় জানিস না...ফের যদি খোঁচাবি!...

আমি তাহারে ভালবাসি যে!

কিয়ৎ দূরেই সুঘরাই এই সতর্ক-আজ্ঞা মানিতে অবশ্যই প্রস্তুত হইলেও ইহাও সে জ্ঞাত করিতে

উদ্‌গ্রীব, কেননা হস্তে-অঙ্কিত বিছা সে দেখে, যে শুধু তাহার দ্বারা বা কোন কিছুর দ্বারাই উহার ক্ষতিসাধন সম্ভব নহে, এ কারণ যে উহাতে এক রহস্যের গোড়া লাগিয়াছে! সুতরাং তাহার মুখে এক নির্ভাবনা অস্পষ্ট হইয়া রহে, কিন্তু ইহা কতক্ষণ, অবিলম্বেই সে বুঝিয়াছিল যে তিনি, মনিবপত্নীও তাহার দিকে অদ্ভুতভাবে তাকাইয়াছিলেন। যাহাতে তাহার অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত উদ্‌ঘাটিত, আর যেমন সে ত্রস্ত ছিল।

যে ইহা সত্যই, তাহাকে তিনি অনেকবারই ঐ ধ্বনি সম্পর্কে মধুর কণ্ঠে প্রশ্ন করিয়াছেন; কিন্তু সুঘরাই কোন সময়ই মূল কারণ প্রকাশিতে সৎসাহস পায় নাই। মধ্যে মধ্যে অদ্ভুত কথা মনে আসিয়াছে, যে একদিন তুমুল বৃষ্টি হয় তখন বলিব, একদিন সাগ্‌রি পাখী বাজের দ্বারা তাড়িত হইয়া কুয়োর ভিতরকার বট গাছে বসে তবে—তখন বলিব, একদিন আমার খুব জ্বর হইবে—তখন বলিব।

মোহিলি বলিয়াছে,—যতদূর মনে হয় দেওঘরে যাওয়াটাই অঘটন হইয়াছে...ডোমের ছেলে...নিশ্চয়ই কোন ফুল বা প্রসাদী কিছু মাড়াইয়াছে...কিম্বা কিছু ছুঁইয়াছে, কোন দেবস্থান ছুঁইয়াছে বা...ভূত হইলে অনেকবিধ জ্বালাতন করিত, তবে সে হয়ত এইরূপে ধীরে ধীরে পাগল হইবে...তবে এখনই সব বুঝা যাইবে... সুঘরাই কোথায়!

সত্ত্বগুণশালিনী মনিব পত্নীর ডাকে সুঘরাই আসিল, ভৃত্যবৎসলা রমণী সুঘরাইকে আপন কক্ষে লইয়া বলিলেন,—বলবি ত বল, না হলে পাখী খোঁচানর আদত কথা মোহিলি তোকে এইসা মন্‌তোর দেবে যে...।

এই পর্য্যন্ত শুনিয়াই যে সে মোহিলিকে একবার দেখিতেই তাহার আপনার দৃষ্টি যেন কোথাও বা নিবদ্ধ হইয়াছিল—সমক্ষে আয়না ছিল, সে ওষ্ঠদ্বয় জিহ্বার দ্বারা ঈষৎ বুলাইয়া কহিল,—আমি সেই চীৎকার যে কেন করি তাহা বলিতেছি...আমি পাগল নই...আমাতে কোনও প্রেতাত্মা ভর করে না...আমি বহুজন্মের পুণ্য (!)...তাই এই বাড়ীর দাস...এখানে আমি গেঞ্জী পরিয়াছি...বালিশ পাইয়াছি...এমন কি বর্ত্তনে খাই...বহু জন্মের পুণ্যবল আমার...তাই মাঠাকরুণ আপনি আমারে বৈদ্যনাথ লইয়া যান...আমি এক উৎকৃষ্ট রত্নসামগ্রী মণ্ডিত শোভাযাত্রা দেখি! যাহা ভগবান বৈদ্যনাথের কাছে যাইতেছিল!

আঃ অলৌকিকত্ব! ধর্ম্মশীলা মনিব পত্নী নিশ্চয় ইহা বলিয়া করজোড় করিয়াছিলেন।

চৌকোণা ছত্র-এর তলে অলোকসামান্য বালিকা, হস্তে ধান্যমঞ্জরী!

আঃ ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী কাব্যবীজ! সম্পূর্ণ চিত্র মনিব পত্নীর সমক্ষে ভাস্বর হইল!

সেই নববধূ চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আবার নাসাগ্রে চাহিলেন, তাহাতে সকলেই করজোড়ে কহিল, আমরা সুখী, সুখী! মুক্তি মুক্তি! আঃ সৌন্দর্য্য!

এবং সাধক সন্ন্যাসীবর্গ নববধূর ত্রিনয়ন দর্শনে নানারূপ ধ্বনি তুলিয়াছিল, এই বলিয়া সে বিচিত্র ধ্বনি সৃষ্টি করিতে থাকে।

আঃ আধ্যাত্মিকতা! বলিতে সময় শুদ্ধা ভক্তিমতী মনিব পত্নীর দেহ পূত রোমাঞ্চে ভরিয়া উঠিল। তাঁহার আয়ত বিশাল নয়নে অশ্রু সঞ্চারিত হইল। ক্রমে যে তিনি নিষ্পলক শিখাবৎ—তিনি তাঁহাদের প্রিয় নীচকুলোদ্ভব ভৃত্যের প্রতি অতীব শ্রদ্ধায় চাহিয়া আছেন। আশ্চর্য্য সে পূজা হওয়া ফুল সকল খাইয়াছে।

যে তখন সুঘরাই কহিতেছিল, আমার খাঁচাটিরে তদ্রূপ আমি সাজাইতে অভিলাষী, আমার কেন কি জানি সমগ্র সজ্জা আমার এক কালে মনে পড়ে না...তাই আমি সেই সন্ন্যাসীবর্গের মত উদাত্ত স্বরে ধ্বনি তুলিয়া থাকি, কথাগুলি আমার যদিও মনে নাই, ধ্বনি তুলিলেই আমার কিছু কিছু প্রত্যক্ষ ঘটে, আমি খাঁচাটিরে সাজাইতে চাই...সেই ছত্র, সেই বিবিধ রত্ন সমুজ্জ্বলতা সেই সামগ্রী সমন্বিত!

মোহিলি দেখিল ঐ ত মৃত্যু! এবং সে মন্ত্রর ধ্বনি হাঁকিল, বালকও দমে নাই—দুজনে নানা ধ্বনি তুলিতে লাগিল।

পরম বিবেকী মনিব পত্নী আশ্চর্য্যান্বিত হওয়ত তখনও আত্মস্থ, একদা মনে হইল, এই বালক অপরিমিত! পরক্ষণেই খাঁচার দিকে নেত্রপাত করিলেন, বুঝিলেন যে কেন সুঘরাই খাঁচার অভ্যন্তর

ইদানীং সাজাইয়া থাকে, হায় সে যদি পক্ষীটিকে সাজাইতে পারিত—সঠিক থামের মত প্রলম্বিত ফুল রেখা...পূর্ব্বে যেখানে সাজান, খাঁচার বহির্দ্দেশই, প্রতিসম ছিল, উত্তর প্রতি-উত্তর ছিল এখন সেখানে ভেদ উপস্থিত, এক কেন্দ্র ধরিয়া নির্ম্মাণ সঙ্ঘটিত, এক বিস্ময়! এবং তৎকালেই তিনি পক্ষীটিরে নিরীক্ষণ করিলেন, যাহা শ্রান্ত যাহা অপ্রাকৃতিক যাহা বেচারী! যে এবং তিনি অমোঘ স্বরে বলিলেন,—ইহা পুরুষ! হায় তাঁহারও ভগবতীতনুর কথা মনে আসিল না!

সুঘরাই মনিব পত্নী উত্থাপিত এবম্ভূত সত্যের সমক্ষে তথাপি সমগ্র আবেগ দিয়া মহা ধ্বনি তুলিয়া সলজ্জ কণ্ঠে শুধু জানাইল, হয়ত নিশ্চয় সেই কথা এইরূপ! অবশ্য এই ধ্বনি এখন শেষের অক্ষর অর্থাৎ—'রী' সুস্পষ্ট অভিধানে শ্রুত হইল!

ধর্ম্মপ্রাণা মনিব পত্নী কহিলেন,—এতদিন কেন বলিসনি...আমি তেমন তেমন সাজিয়ে দেব, যা হোক এখন ডাক্তারকে আমি আসতে বলেছি, পাখীটা কেমন ধুঁকছে!...বুঝতে পারছি না হঠাৎ কেন এমন হল! খুব খুঁচিয়েছিস বুঝি? একে ত তাজা করতে হবে...না হলে সব বৃথা...।

সুঘরাই কহিল,—আপনি ভাবিবেন না কাল শনিবার...আমি ড়াড়ুপোকা উহাকে খাওয়াইব, আমাদের ঘরের পাশে ফণীমনসা হইতে পাতা চয়ন করিব...কেননা তদ্বারা ড়াড়ু ধরা বিধেয়...ড়াড়ু পোকা খাইলে উহার আরোগ্য হইবে...আপনি নিশ্চিন্ত হউন।

ডাক্তারবাবু পাখীর খাঁচাটি দেখিয়া অভিভূত, যে তিনি খুব সন্তর্পণেই তাহা অবলোকন করিতে থাকিয়া প্রশংসায় কহিলেন,—অভিনব! এরূপ কখনও দেখি নাই...সার্থক!

সুঘরাই আপনার নিন্দাকে কব্জা করিয়া টেবিলের একান্তে দণ্ডায়মান যে সে এমন কি খাঁচাটির দিকে নজর করিতে সক্ষম নহে! সে আপন পাখীটির গায়ে এখন হাত বুলাইতে আছে।

ডাক্তারবাবু পুনরায় প্রকাশিলেন,—নিশ্চয়...ইহাতে আপনার লক্ষ্মী-শ্রীযুক্ত হাত, নিশ্চয়ই হলপ করিয়া বলা যায় যে, আছে...আহা ইহা এই খাঁচা যেন অলকাপুরীকে হার মানাইয়াছে!

এতাদৃশ গুণকীর্ত্তনে ধীর সৎস্বভাবা মনিব পত্নী কহিয়ে বলিলেন,—আমি না, ছোঁড়াই অষ্টপ্রহর ঐ নিয়ে আছে...উনি বলেন ছোঁড়ার টেষ্ট আছে...খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে, কাল হল তার এঁড়ে কিনে...ফুলগুনো বটে আমি করে দিয়েছি...ছোঁড়ার কত সখ তাজা ফুলের মত গন্ধ হোক, তাই একটু পারফিউম দিয়েছি, তাজা ফুলে পোকা থাকে, পাখী ঠোকরায় দেখে, মানে ওনার সাজান নষ্ট হয় দেখে, উনি খোঁচান ত...তাই বললুম...ও কি মানুষ!...সেই খুঁচিয়েই ত ঘা...এখন আবার আর এক জ্বালা পাখীটা মদ্দিখানে না থাকলে.. খোঁচাবে দেখুন দিকি...। এই পর্য্যন্ত ব্যক্ত করিয়া মনিব পত্নী সুঘরাইএর প্রেরণা, বাস্তবতা, অভিজ্ঞতার কথা সবিস্তারে কহিয়া অনুরোধ জানাইলেন,—এখন দেখুন ত ঘা-টা—নিম-ঘি এটা-সেটা সবই ত দিলুম...এ সবই জানেন ওঁর জন্যেই ওঁর আহ্লাদেই হয়েছে...উনি কিছুই বলেন না...!

যে মনিব পত্নী বহুবারই তাঁহার স্বামীকে সুঘরাইএর এই স্বভাব জ্ঞাত করিয়াছিলেন; তদুত্তরে মনিব মহাশয় তখন বলিয়াছেন,—দেখ...তুমি উহাকে কোন জ্ঞান দিবার আদেশ লইয়া আস নাই...উহারে কুড়াইয়া খাওয়া পাপ অস্বাস্থ্যকর বলিয়া যেমন অনেকে ক্ষান্ত হয়...আমরা তাহা নই। আর যে উহারা এত দুঃস্থ এত নিঃসহায়...পাপ কোথায়...বেচারীর নিয়তি পর্য্যন্ত নাই। সে দেহ সচেতন মাত্র নহে...দেখ না হাঁ করিয়া মুখ দিয়া মাছি ধরে...! আমাদের ভক্তির জোর থাকিলে উহার পাপও থাকিবে না...। উহার পাপ আমরা লইব...! কেননা উহা তাহার নহে...! ঠাকুর ভিন্ন গতি নাই...। আমরা কেহ কিছু নই!

এখন ডাক্তারবাবুর সমক্ষে, স্নেহময়ী মনিব পত্নী এবং সুঘরাইকে আজ্ঞা করিলেন, মুখপোড়া ওকে...পাখীটাকে, উল্টে ধর না...আলতো করে ধর! আমি টর্চ ফেলছি...।

ডাক্তারবাবু পাখীর দিকে তাকাইয়া ভ্রূকুঞ্চিত করত মন্তব্য করিলেন,—এখন থাক, এ কি পাখী এমন ঝিমাইয়া পড়ে কেন...যেন নিস্তেজ...উল্টাও ত...বুকটা চিতাইয়া ধর...একটা এসেন্সের গন্ধ যেন!

ঘা থেকে বিশ্রী গন্ধ বেরুচ্ছিল, তাই আমি একটু পারফিউম দিলুম, অন্যায় হয়েছে...।

তাহা নহে...তবে গন্ধক মানে...।

গন্ধক...গন্ধক!...এ বাড়ীতে? অবশ্য প্রথম আসার আগে গন্ধক ধোঁয়া দেওয়া হয়...ছোঁড়া গন্ধক কোথায় পেলি...ও বুঝেছি, বন্দুকের টোটা তৈরীর কলে বারুদে...তাই বা...।

মানে মলম...হ্যাঁ নিশ্চয় কোন মলম এই দেখুন...নিশ্চয় এই মলম পাখী খাইয়াছে...!

কোথায় পেলি আমি ত দিই নি...তুই কি সেই ফেলে-দেওয়া টিউবটা থেকে...তাতে ত কিছু ছিল না...সেটা বিষ লেখা থাকলেও এত কি...নিশ্চয় তুই সেটা দিয়েছিলি...?

না...তাতে এমন কিছু হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না...তবে সাময়িক একটু কাজ করিয়াছে...তুমি ত বাপু বড় নিষ্ঠুর,...তুমি ত বড় তামসিক হে...দেখ কি করিয়াছ—শোৎ! পুঁজ, ছি ছি খাঁচাটিরে এরূপ সাজাইতে যখন তোমার মন আছে...তখন...ইহার জন্যই ত বাপু সাজান ছিছি...যতবারই আমার খাঁচার প্রতি দৃষ্টি যাইতেছে ততবারই জানেন আমার মন হইতেছে যে এতেক মনোরমত্ব বুদ্ধি উঁহাতে যে আছে তাহা আমার কল্পনাতীত...যাহাদের ছটাক জমি পর্য্যন্ত নাই—যাহাদের তাল ও কাঁঠাল আর ব্যাঙের ছাতা খাইয়া জীবনধারণ...গরুর জন্য রক্ষিত ফেন বৈ অন্য কিছু যাহারা চুরি করিতে সাহসী নহে...পাণ্ডা বাড়ীর গাছের শুকনা উড়ন্ত পাতা স্পর্শ করিতে যাহারা ত্রস্ত হয়, তাহাদেরই একজন এই বালক...তাহাতে এত সূক্ষ্মতা!...এই নিষ্ঠুরতা তোমায় পরিত্যাগ করিতে হইবে...পরিত্যাগ কর...তোমার কি মন চাহে না যে পাখীটিরে সকলে দেখিয়া সুখী হয়...! দেখ ত কি বিশ্রী গন্ধ বাহির হইতেছে...।

যে সুঘরাই, ইহা বলার কথা নহে, ঐ উৎকট ঘেমো গন্ধ কখনও কখনও শুঁকিতে থাকিয়া,—লোকচরাচরের চারিদিকে অপটু দৃষ্টিতে চোখ ফিরাইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে ঘেন্না নাই ও সে ভীত নহে; যে ঐ গন্ধ কুৎসিত ইহা তাহার দ্বারা বিচারিত হয় না, এবং ইহাও নির্ঘাত যে তাহাতে ক্বচিৎ আভাসিতও হয় নাই যে চন্দনাদি গন্ধ দ্রব্যের নিমিত্ত উন্মত্ততা তাহার অন্তরে আছে।

ঠাকুর করুন তোমাতে মায়ামমতা দেখা দিক! ডাক্তারবাবু যেন প্রার্থনা করিলেন।

ড়াড়ুপোকা ফণীমনসার পাতা দিয়া ধরিয়া তিতিরকে খাওয়াইবার বিধিমতে সে লুড়িয়া গ্রামের ঝাঁকাল ফণীমনসা হইতে পত্রসংগ্রহ করিতে যায় এবং সেখান হইতে খাঁচাটি হাতে সুঘরাই যখন তাহার ভগনীপতির ঘরের সামনে, তখন হাওয়াতে বৃক্ষের ডালসকল নুইয়া অদ্ভুত রূপ ধারণ করিল, অদূরে কাতার দিয়া লুড়িয়া গ্রামের অনেক উলঙ্গ শিশু—ইহারা পড়িমরি করিয়া সুঘরাইকে অনুসরণে এখানে আসিল, ইহারা খাঁচাটি অবলোকনে সম্মোহিত।

সুঘরাই হৃষ্টমনে চারিদিকে নেত্রপাত করিল; সে সেই চির-অভ্যস্ত ঘেমো গন্ধ পাইল, কিন্তু খাঁচাটি টলে নাই, যে নিশ্চয় ঐ গন্ধে সে নাসিকা কুঞ্চিত করিবার মুহূর্ত্ত পায় না, যে অথবা অবশ্যই এখনও কোথাও তাহার স্বভাবে সেই গন্ধ সহজ স্বাভাবিক রহিয়া থাকে। কোথাও সে কিম্ভূত হাড়ী, ঘরের কোথাও ছেঁড়া ছেঁড়া চটের থলি এতদিন তরাসে যাহা লক্ষ্য হয় না, অদ্য স্পষ্ট এ সকল তাহার দ্বারা লক্ষিত হইল; ভগনীপতি তাহাকে দেখিয়া, তাহার খাঁচা অবলোকনে এক কোদাল-হা হইয়াছে, সে খুসীতে কখনও কহিল, খুব...খুব...খুব বহুদিবস পরে আত্মীয় দেখিলে...এক পাতা চিঁড়া দধি দেখিলে, যে আমোদ সেই আমোদ হইল, তোমাকে ও তোমার খাঁচাটি ও পাখীটি দর্শনে বটে আমোদ হইল।

ঐ লোক আপন রক্ষিতা ও পোষ্য শুয়োরটিকে বারম্বার আজ্ঞা করিল,...দেখ দেখ। এইরূপে এতই সন্তোষ প্রকাশ করে যে তাহা অবর্ণনীয়, যে সে আপন উরুদেশে, আপন বাহুতে, কখনও বা বৃক্ষের কাণ্ডে চাপড় মারিল, তাহার শুয়োরটি ঘোঁৎ ঘোঁৎ করিয়া পলাইয়াছিল, ক্রমে সে এতেক গর্ব্বিত যেমন যে, তাহার বসিয়া খাইবার পুঁজি আছে। সুঘরাই ইহাতে স্ফীত অসম্ভব, এতদিন পর ভগনীপতিকে আর মন্দ প্রকৃতির বলিয়া বোধ হয় নাই।

ভগনীপতি আরও প্রকাশিল যে,—লোকমুখে শুনিয়াছি তোমার পাখী ও খাঁচার প্রশংসার...কতবার উহা দেখিতে সাধ হইয়াছে...তুমি ভয়ে আন নাই...আমি কথা দিতেছি কখনও ইহা আমি কাটিয়া খাইবার কথা মুখে আনিব না...আহা খাঁচাটি যেন বিবিধ অলঙ্কার-ভূষিতা রমণীসদৃশ,...না না উহাকে তাড়া দিও না...ঐ বিশ্রীদর্শন কুকুর দেখিয়া, এখানে নূতন লোক দেখিয়া ভড়কাইয়াছে...বাহির করিও না উড়িয়া যাইবে...উহাকে লড়াই শিখাইতেছ ত? হ্যাঁ উহা মস্ত জঙ্গী হইবে...লড়াই লড়াই...এবং সকলেই তোমার পাখী দর্শনে চক্ষু সার্থক করুক, সকলেই গ্রামগ্রামান্তরে এই সংবাদ লইয়া যাক যে রিখিয়ার অন্তঃপাতি

লুড়িয়া গ্রামের...হাড়িয়াল ডোমের শালার এক রূপবান পাখী আছে...একি তুমি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া আছ কেন...আহা উহারে শাসাইও না...ছি ছি! আঃ খাঁচাটি যে...।

ইতিমধ্যে পাখীর ব্যবহারে সুঘরাই আরও অপদস্থ, এবং যে তাহাতে এবম্প্রকার বৈচিত্র্য আসিতেছিল যে তন্মুহূর্ত্তেই পাখীটিরে আক্রমণ করে, যে সে তীব্র কুপিত, মনে মনে সে বড় আপন এই প্রিয়স্পদের উদ্দেশে মুখ খারাপ করে এবং অনেক গঞ্জনা অনেক আপশোষ তাহাতে বিস্ফারিত, যে যেমন...শালা তোমারে এত শিখাইয়া পড়িয়া আনিলাম...ডাক্তারবাবুর ঔষধই তোমার কাল হইল...বেশ ত ছিলে...সারা দ্বিপ্রহর ধরিয়া আমার সাজানকে বানচাল করিলে...আমার মাথায় তেল দেওয়া বৃথা গেঞ্জী পরা বৃথা হইল...আমি বাড়ি গিয়াই (মনিব বাড়ী) খাঁচা হইতে তোমাকে বহিষ্কৃত করিব...হুলাড়ে রাত্রযোগে তোমার টুঁটি ধরিবে...!

এখনও মায়ামমতাহীন রোষে সে যখন গর্জ্জাইতে আছে, তৎকালে ঝটিতি যে মনিব মহাশয়ের স্বর তাহার কণ্ঠে ধ্বনিত হইল, যে এবং মনিব পত্নীকে সাক্ষাৎ দেখিল, ফলে সমস্ত মানসিকতা পরিবর্ত্তিত, এখন সে কাপুরুষ! আপন সপক্ষে এইটুকু যুক্তি পাখীটিরে দিয়াছে, যে...আমি কি সাধ করিয়া রাগিতেছি...তোমার জন্যই ত সাজানরে, মূঢ়! তুমি যদি, তাহাতে বিশৃঙ্খলতা আনয়ন কর, তাহা হইলে কোন মানুষ না বিরক্ত হয়, আমি তো ডোম...তুমি জংলী, সাজান আমার প্রাণ...আমার সঙ্গ করিয়াও তুমি এখনও ভূত...আমারে দেখিয়া শিখিতে পার না...জান না, সাজানর মধ্যে আমি কি দেখি, আমিও চাই সকলেই তাহা দেখুক!...আর নড়া চড়া করিও না, যাহা ঘটিবার ঘটিয়াছে!

সত্যই খাঁচাটি সাজানতে তদীয় বিস্ময় নিভাঁজ নিখুঁত পূর্ণ মাত্রায় ঝমরিয়া উঠিয়াছে; ইহাতে তাহার ডোমজ সর্ব্বাঙ্গ বিশাল হইল। এমনও যে মহুয়া গাছটিতে টানান হাটতলার যে লাল পোস্টবক্স না-ছুঁইতে-পারার আঁট—হাটতলার ঐ পোস্টবক্স প্রত্যক্ষে যে ঝটিতি তাহারা হয় যে তাহারা সাক্ষাৎ পাপ!—ব্যতীত পৃথিবীর পরেও যে আর এক সত্য আছে যে যাহা সুঘরাইতে উদ্ভিন্ন!

সে খাঁচাটি লইয়া মন্থরগতিতে চলিতে আছে, এখন তাহাতে ইতস্ততর মাত্রা আর নাই! খানিক পথ অতিক্রম করিতেই এখন এমন হইল যে,—তাহাদের গ্রাম ও রিখিয়ার রাস্তার মধ্যে নলিনীবাবুর বাড়ীর পিছনে (অর্থাৎ আমাদের বাড়ীর) যে বিরাট প্রাচীন অশ্বত্থ গাছ আছে, সেখানে অনেক জনসমাবেশ, অনেক খাটিয়া, অনেক হুঁকা, অনেক ধোঁয়া, অনেক কাশির শব্দ, অনেক কথাবার্ত্তা; এক বৃহৎ চক্র দিয়া বহু লোক উপবিষ্ট!

ইহা ছোট না-জলচল জাতির সম্মেলন, মনুষ্যচক্রের কেন্দ্রে, মধ্যখানে, এক অগ্নি প্রজ্জ্বলিত; তন্নিকটে এক যুবতী আসীনা—সে কেঁদে, তৎসহ এবং হুঁকা খাইতে আছে—এই সেই যুবতী, একদা মধ্যরাত্রে তদীয় স্বামীকে হত্যা করে—শ্বশুরালয়েই, এবং যে, সেই রাত্রেই সেইখান হইতে একটি মস্ত কাঁঠাল লইয়া প্রায় চার ক্রোশ পথ ভাঙ্গিয়া রিখিয়ায় পিত্রালয়ে পালাইয়া আইসে। এই যুবতীকে লইয়া মারাত্মক তর্ক, অন্যান্য জাতির লোকও এখানে উপস্থিত তাহারা দূরে দাঁড়াইয়া আছে!

মুসলমান সম্প্রদায়ের অনেকেই এখানে আছে—যাহারা অনাহূত তবু তাহারাও মাঝে মধ্যে যুক্তি সরবরাহ করিতেছিল!

এবং যেইমাত্র ঐ ঐ লোকেদের, সমবেতদের, সুঘরাইকে দৃষ্টিগোচর হয় সেই ক্ষণেই এই বিজ্ঞ সম্মেলন প্রায় ছত্রাকার, যে, ঈদৃশ রোল উঠিল যে, ঐ সে বালক যাহার সুন্দর তিতির আছে, ঐ সেই বালক যাহার খাঁচাটি দেখিতে মহারাণী সমান, ঐ সেই বালক যে এখন খাঁচা লইয়া যায়! যে এবং অজস্র হাতছানি ওতপ্রোত হইল।

ইহাতে সুঘরাই গর্ব্বমিশ্র অস্বস্তিতে আপনার স্কন্ধস্থিত গামছায় ক্বচিৎ যত্ন দিল, তাহার এক পার্শ্বে রৌদ্র, পাখীর খাঁচা সমেত ছায়া তাহারই পদপ্রান্তে, ও যে তাহার পিছনে অনেক গ্রামের শিশু সকল! এবং সমগ্র সভার অনুরোধেতে সে সকলের প্রীতি সম্পাদন পরতন্ত্র খাঁচা হাতে ধীর হস্তীগমনে অগ্রসর হইল।

প্রাচীন যাহারা তাহাদের অভিপ্রায় অনুযায়ী, যাহারা ঘেরিয়া বসিয়াছে তাহাদের সকলকে—ইহারা প্রায়ই দূরাগত ভিন্নগ্রামের লোক সুঘরাই পক্ষী দেখাইতে পরিক্রমণ করে, যাহা দেখিতে কালে বিবিধ

বিস্ময়সূচক আ আ শব্দের মধ্যেই সুঘরাই শুনিতেছিল,—তুমি তোমার রুগ্ন পুরুষের উপর যথেষ্ট অত্যাচার করিয়াছ এবং অবশেষে তাহারে, প্রমাণ না থাকিলেও, সকলেই বুঝে, হত্যা করিয়াছ, এখন ঐ অগ্নির দিকে চাহিয়া বল, সেই সকালে..., এই দোষারোপ এক প্রাচীন কর্ত্তৃক সেই যুবতী উদ্দেশে ব্যক্ত, ইহাতে সুঘরাই সেই যুবতীকে তির্য্যক দৃষ্টিতে পর্য্যবেক্ষণ করে, যে তাহার মন ঘৃণায় বিষাইয়া উঠিল।

ক্রমে সে খাটিয়া আসীন প্রাচীনদিগের সমক্ষে আসিল, যাহাদের চক্ষু যেমন, কেমন কঠোর, তাহারা এখনও তন্ময় হইতে পারে, ভাবে আবিষ্ট হওয়ত এই অদৃষ্টপূর্ব্ব খাঁচা দেখিতে নিয়ত মস্তক ঘুরাইতে থাকিয়াও, খাঁচার অন্তর্বর্ত্তী পাখীর লক্ষণ সকল ইহারা উচিতরূপে ঠাওরে অসমর্থ, সুতরাং কেহ খাঁচাটিতে অঙ্গুলি দ্বারা টোকা দিতে যত্নবান, যাহাতে পাখী সজাগ হয়, যে এবং কেহ ফোড়ন কাটিল,—পাখীটি নির্ঘাত মাদি...যদি তাহা নহে তবে এতেক ভীতু কেন? কেহ বলিল,—কেমন যেন করিতেছে?

বালক সুঘরাই ইহাতে অত্যধিক অপমানিত,—ঐ পরিহাস অসহ্য, যে এবং তৎকালেই সে দেখিল, পাখী তাহার সকল সংস্থান বিধ্বস্ত করত চঞ্চল, যে পক্ষীর এহেন স্বেচ্ছাচারিতার কোন ক্ষমা সুঘরাইএর কোমলতার বাহিরে,—সে মানিতে প্রস্তুত না, যে তাহার রোগগ্রস্ত কাহিল তিতির আতঙ্কিত হইয়াই স্খলিত পদেই কিয়ৎ স্পন্দিত মাত্র, আর যে সুঘরাই স্থানকাল ভুলিয়া পাখীটিরে আক্রমণে উদ্যত, তৎক্ষণাৎ প্রাচীনমণ্ডলী হইতে তীব্র প্রতিবাদসূচক, সাবধান করা সূচক, গঞ্জনাসূচক নিন্দাবাচক রকমারি শব্দ ছুটিয়া আসিল।

অতএব সুঘরাই নিবৃত্ত বটেই, তবু যে সে মর্ম্মাহত থাকিয়া ক্রোধে ফুলিতে আছিল, প্রধানত এই কারণে যে, সে কখনও ভাবে নাই, অর্থাৎ এ যাবৎ তাহার অজ্ঞতাই ছিল যাহা, যে,—তদীয় তিতিরকে কেহ তাচ্ছিল্য করিবে; এখনই এই সূত্র হঠাৎ আভাসিত যে, গত হাটের দিন, কোন পথচারীরা—তাহারা কাঁধের বাঁক লইয়া থামে—একে অন্যকে, তাহারই তিতির বিষয়ে, অনেক সাধুবাদের পর মধুর স্বরে কহিল, ইহা দারুণ মরদ, হাঁ হাঁ অদ্যও ইহারই স্মৃতি জাগরণ নিমিত্ত মেঘ হয় বৃষ্টি আইসে; ইহা দারুণ মরদ, যদি এখন বনাঞ্চলে যায় ইহারই চলনভঙ্গিতে বনস্থলীর মাদি কুক্কুট সকল অত্যাশ্চর্য্য সংকেত ভাষায় কণ্ঠ উন্নত করিয়া আমন্ত্রণ জানাইত পশ্চাদ্দেশ স্ফীত করত উঁচাইয়া মাটিতে বসিবে, ইহা দারুণ মরদ, ইহার প্রখর সকাম চাহনিতে মনুষ্যসমাজের যুবতীজনের জঙ্ঘা ভারাক্রান্ত হয়!

এখন এই বিজাতীয় সভাতে বিমূঢ় বালক খানিক স্তব্ধভাবে অপ্রতিভ হইয়া যাপনের পরেই, যে আপনকার এক স্কন্ধ হইতে অন্যতে গামছা স্থাপনের পরেই, সদম্ভে ঘোষণা করিল, ইহা দারুণ মরদানা, ইহার কাঁটি সাক্ষাৎ যম, ইহা রমণী-তিতিরগণের আশ্রয়স্থল, ইহা নর-তিতির সকলের কালসদৃশ, ইহার সংহারমূর্ত্তি ভয়ঙ্কর...পক্ষাঘাত রোগ পর্য্যন্ত পলায়ন করে।—যে এবং ইহা ব্যাখ্যানে সে এতই আবেগে এতই উত্তেজনাতে ছিল যে আরও যোগ দিল,...ইহা বহুরূপ শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছে, ভুখারির বানর হইতেও যথেষ্ট ইহা দক্ষ...গ্রামের অনেক বালক ইহার কসরৎ দেখিয়াছে, ইহার ক্রীড়ানৈপুণ্যে মদীয় প্রভুরা চমৎকৃত হইয়া থাকেন...ইহা এক হাত হইতে অন্যটিতেও মস্তকেও ইঙ্গিতমাত্র যায়, বিশুষ্ক পেয়ারা কাঠে ইহার কাঁটি বসে...লড়াইএ ইহা মজবুত! ইহা দারুণ মরদ!—এই আস্ফালনের পরক্ষণেই সুঘরাইএর গাত্রে ঘাম দেখা দিল। পরেই সে স্থবির!

তখনই সভার চারিদিক হইতে, যাহাদের তিতির আছে—তাহাদের নিকট হইতে চ্যালেঞ্জ আসিল, তাহারা পরস্পর আপন আপন গ্রামের নাম কহিল, যথা সালোয়া, ধরমসী, রতনপুর, বড়কোয়া, শিমবারি ইত্যাদি...এবং তাহারা উঠিয়া দাঁড়াইয়া আপনকার উরুদেশ উন্মোচন করিল—চর্ম্মরোগ বিক্ষুব্ধ ক্লিষ্ট যাহা, সদর্পে তথায় চাপড় মারিল একের পর এক! আর যে ঐ একের পর এক-কে অবিলম্বেই নির্ভীক সুঘরাই আপন ছোট উরু মেলিয়া রাবণিক ঔদ্ধত্যে চাপড়ে জবাব করিল! কিন্তু অন্যেরা যাহাদের তিতির নাই তাহারা কসরৎ দেখিতে আগ্রহী; নির্ব্বোধ উপায়রহিত সুঘরাই তিতিরটিকে বাহির করিয়া আপন হস্তে বসাইতেই সে মাটিতে পড়িয়া দু'একবার পক্ষ আন্দোলনের পর বসিয়া চুপ!

যুগপৎ তুমুল হাস্যধ্বনি ও আলোড়ন উৎক্ষিপ্ত হইল; ইহা কি লড়িবে, ইহাকে ঘৃতমিশ্রিত মাংসের ছাঁট খাওয়াও, ইহা মাদি নিশ্চিত—ইত্যাকার রব উঠিল। অন্যপক্ষে সুঘরাই যদিও তিতিরটিকে পদাঘাত করিতে পাশবিক, কিন্তু যে তাহাতে সাড় ছিল না। একদা নির্য্যাতিত আহতদৃষ্টিতে তিতিরের প্রতি অবলোকন করত কহিল, বেশ বেশ, কল্যই কাহার গ্রামে যাইব বল—যাহা নিকটে তাহা বল!—তাহার

কানে দু'একটি নাম বিদ্রূপাত্মক হাস্যভেদ ভাসিয়া আসিল, অতঃপর সে কোনক্রমে মস্তক সটান রাখিয়া ঐ স্থান ত্যাগ করিয়াছে!

সুঘরাইএর গাত্র অসম্ভব উষ্ণ, সে মতিচ্ছন্ন প্রায় যে সমগ্র খাঁচার সাজ হওয়াতে এবং চলা-র জন্য নিজ বস্ত্রের শব্দ, বড় হাস্যকর, সভার উপহাস তাহারে দগ্ধ করিতে আছে, ও আপশোষ পরম্পরাতে তাহার ওষ্ঠদ্বয় কম্পিত। সে এক আধবার শুধুমাত্র গামছাখানিক এক কাঁধ হইতে অন্যত্রে লইয়াছে, কিন্তু বুঝায় যে সে তখনও এলাইয়া পড়ে নাই, যে সে হাটের পথে, টিলার দিকে, ড়াড়ু পোকা সংগ্রহে, যেহেতু যায়।

এমত সময় একদল চেঞ্জার তাহার পথ রোধ করিয়াছিল; খাঁচা দর্শনে তাহারা মহা উচ্ছ্বাসে, গ্র্যাণ্ড গ্র্যাণ্ড বলিয়া সুঘরাইএর প্রশংসাতে (এখানকার ধারা বশম্বদ কাহাকেও কালচারড রূপে সনাক্ত করে না) প্রকাশিল,—সত্যিই ছেলেটি আনকালচারড নহে!...মোটেই আনকালচারড নহে!...মোটেই আনকালচারড নহে!...একেবারে আমাদের মতন মডার্ন, না?

ইহাতে সুঘরাই যথাযথ ভদ্র-অভিব্যক্তিতে কিছু বিনয়ী হইতে কঠিন হইয়া রহে, যে সে অন্যত্রে দৃষ্টি সঞ্চার করিল, দেখিল, লাল পোস্টবক্সটি যাহা গাছের কাণ্ডে সংলগ্ন, তদ্দণ্ডে সে যেন জ্বলিয়া উঠিয়াছে! চেঞ্জাররা তাহারে অতিক্রম করিয়া এখন চলিয়া গিয়াছিল। সুঘরাই আপনকার বস্ত্রের শব্দ শুনিতে থাকে, যে সে এতই উৎক্ষিপ্ত যে মনে হইল পোস্টবক্স বিনষ্ট করে!

যদি বিচার তাহার দ্বারা সম্ভব হইত, সে মীমাংসা করিতে পারিত না এ ক্রোধ কেন, যেহেতু এতাবৎ তাহাদের জাত পোস্টবক্স ছুঁইত না, তবে দুই এক হাট পূর্ব্বে এই সংস্কারের বিরুদ্ধে ঢেঁড়া দেওয়া হইয়াছে!—এখন সেই পুরাতন প্রথা কেন নির্ম্মূল করা হইল, ইহাই তাহার রোষ—যেন একটি অধিকার বিনষ্ট হইয়াছে, যেন একটি বিদ্বেষ তাহার খোয়া গিয়াছে—এই স্বাধীনতায়ে পুঞ্জীভূত অভিমান তাহাতে চক্র দিয়া উঠিল—অথচ সাধারণত সুঘরাইএর অর্থাৎ তাহাদের জীবনে কোথাও ব্যর্থতা নাই!

এখন সে হিরণার টিলায় উপস্থিত, খাঁচাটি রাখিতে গিয়া আশ্চর্য্য যে সে যেমত ছুঁড়িয়া ফেলিতে উদ্যত, যে সে অবাক, এমন ক্ষেত্রে সহসা আপনকার হাতের উল্কীর প্রতি নজর গিয়াছিল, যে সে যেমন বা কিম্ভূত ঘোরে, আপনার অঙ্গুলির তথা হাতের স্বাদ গ্রহণ করিতে চাহিল—যে কিন্তু তখনই তাহা এড়াইতে, এই বিশাল সুপ্রসারিত এলোমেলো স্থানসমূহের দিকে সে অবলোকন করিল। এখন দেখিল তাহার ঘর্ম্মসিক্ত গেঞ্জী যেন রোদ, সে যেন ঠাণ্ডা হাওয়া খুঁজিতে আছে। যে সুঘরাই একটি অতীব জটিল শ্বাস ত্যাগ করিল।

এ শ্বাস তাহার বর্ত্তনে খাওয়া হইতে গঠিত!

সে আপনকার ট্যাঁক হইতে ফণীমনসার পাতাগুলি বাহির করিতেছে সময়েই শুনিল, কে যেমন বা 'আ তিতি' উচ্চারণ করিতেছে—যাহা তাহাদের দুজনকার, তাহার আর তিতিরের একমাত্র ভাষা, আরও যে যুগপৎ সে প্রত্যক্ষ করিল যে তাহার আপনকার অঙ্গুলি দিয়া সে জমিতে ঘর্ষণ করিতে আছে। ইহাতে সে বিস্মিত হইয়াছিল। এবার সে পক্ষীর দিকে তাকাইল, দেখিল তাহা কোনমতে দণ্ডায়মান থাকিতে চেষ্টা করিয়াই বসিয়া পড়িল, দেখিল টুণ্টীগুলি দুলিতেছে কাগজের ফুল সকল শব্দিত! তৎক্ষণাৎ সুঘরাইএর চক্ষু আরক্তিম হইল।

ইহাতে সে খাঁচার দরজা সন্তর্পণে খুলিয়া পাখীটিরে অনুপ্রবিষ্ট করাইবার প্রয়াস পাইল, এবং যে সে কপট আদরে তিতি শব্দ করিতেই নিজেই উৎকর্ণ হয়, এ যেন মনিব পত্নীর অভিজাত স্বর, এ কারণে তাহার আপনার গ্রীবা কিছু উন্নত যে সে নিজেই তিতির; কিন্তু সম্মুখে রাজসিক সজ্জার অন্তঃস্থিত পাখীটিতে সে তখনই সচেতন, বুঝিল তাহার প্রিয় পক্ষীটি খানিক গ্রীবা তুলিয়া নামাইয়া লইল।

সুঘরাই আপনাকে সংযত করিয়া কয়েকটি ড়াড়ু পোকা ফণীমনসার পাতায় রাখিয়া উহার সামনে ধরিয়াছে, এবং পুনরায় তাহাকে আহ্বান করিয়াছে, পাখীটি কোনমতে একটি পোকা খাইয়াই যেন ঢলিয়া পড়িতে চাহিল। সুঘরাই উহার রকমে ক্রমশ ক্রুদ্ধ, অমানুষিকতাতে তাহার হাতে ভারী হইয়া উঠিল, তথাপি সে আপনাকে রুখিয়াছে!

এই টিলার উপরে তিতিরটি যেন তাহার অপরিচিত, যেন তাহার কেহ নহে, কেমন ন্যাংটা, সে সত্বর

পক্ষীটিকে তুলিয়া খাঁচার মধ্যে স্থাপিত করিয়া আপনার অভিপ্রেত সংস্থানে ভিড়াইয়া তাহারে চিনিতে ভালবাসিতে ব্যগ্র,—আশ্চর্য্য যে এখন বেচারী তিতিরটি খাড়া দাঁড়াইল, আশপাশে সবুজ নীল টুণ্ডী চারিদিকে ফুলশোভা, মধ্যে মধ্যে আকাশ উল্লেখিল!

ইহা দর্শনে সুঘরাই যেন লাফাইয়া উঠিল, কিছুদূর হইতে এই বৈচিত্র্য উপভোগ উদ্দেশ্যে সে ঝটিতি দূরে টিলার উৎরাইতে খানিক নামিয়া চক্ষু ফিরাইতেই স্পষ্টই দেখিল তাহার তিতিরটি বিকটভাবে চঞ্চু পৃথক করত কেমন এক ভাব করিতেছে—ধীরে উহার দেহভার এক পায়ের উপর ন্যস্ত হইল এখন তাহার দক্ষিণের ডানা ক্রমে ক্রমে প্রসারিত হইতেই সুঘরাইএর সাজান নষ্টপ্রায়।

ক্রূরমতি সুঘরাই সবেগে ছুটিয়া আসিল। পাখী যেন তৃষ্ণায় অথবা অন্য কিছুর জন্য তেমনই চঞ্চু ব্যাদানে আছে, ইহা তাহার চোখে পড়িলেও সে গ্রাহ্য করে নাই—সে মহা উষ্মায় পাখীটি বাহির করিতেই যে রহস্য গোড়া বাঁধিয়াছিল তাহাই তাহার হাতে সাপের মত উঠিতে ক্রিয়াশীল! সে অবশ্যই বিভীষিত; পূর্ব্ব হইতে বিদ্বেষে তাহার চক্ষুতে অগ্নি ক্ষরিতেছিল—এখন সে তৎপ্রবর্ত্তিত আপনার প্রিয় পাখীটিকে যারপরনাই জোরে আছাড় মারিল।

পাখীটি গড়াইয়া উৎরাই বহিয়া খানিক তফাতে, ক্ষণেক নিশ্চলতার পরই মনসা পাতাতে ড়াড়ু পোকা লইয়া সে ধাবমান—তিতিরের নিকট পৌঁছে, তাহা ঐ পক্ষী, এক কুৎসিত, তাহা এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য হইয়া আছে!

সে উহা পক্ষীটিকে তুলিতেই উহার লম্বমান সুশ্রী গ্রীবা শিথিল নেতাইয়া ঝুলিতেছে, সুঘরাই দমিল না, পক্ষী গাত্র হইতে আগত ম্লান বিদেশী পারফিউমের গন্ধে তাহারে কোন মানসিকতা দিল না, বরং তাহার চক্ষুর্দ্বয় কেমন যেমন বিকারগ্রস্ত, হঠাৎ তাহার হাতে পক্ষীর ক্ষতের রস যাহা আঠাল তাহা লাগিতেই সে এক পা সরিয়াছে মাত্র—যেখানে সরিয়াছে তাহা তাহার পলায়নের জগত; নিশ্চয়ই এবং যুগপৎ সে সেই আঠা প্রথমে সচকিতে ও পরক্ষণেই গভীরভাবে শুঁকিয়াছে!

ঐ গন্ধ বড় পরিচিত তাহাদের, এবং হঠাৎ ইহাতে কিবার বলিয়াছে যে আমরা ডোম—যে সে জানে নাই যে, ইহা সে বলে এবং যে তদীয় হস্ত অস্থির ও সে ভূতচালিতের প্রায় পাখীর বক্ষদেশ হইতে অজস্র পালক পৌরাণিক দুর্ম্মতিতে উৎপাটিত করিতে কালে অচিরাৎ তাহার দেহের অভ্যন্তরে এক প্রলয়ঙ্কর হুঙ্কার ঘনিয়া উঠিল, অন্যপক্ষে পালক উৎপাটনে বেচারী পক্ষীটির অনেকটা ক্ষতই ওতপ্রোত হইল—এবং সুঘরাইএর ইহা ‘আমরা’ কল্পনাতে বিঘ্ন সৃষ্টি করিল!

সত্রাসে সুঘরাই ঐ পক্ষী দূরে নিক্ষেপ করত—ঝটিতি যে সে উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার করিতে থাকিল, যাহা আতঙ্ক, যাহা বেদনা, যাহা আনন্দ, যাহা আহ্বান, যাহা মিলনকামী প্রত্যাশার ডাক, এমনও যে ইহা তাহা নহে। মনোরম খাঁচাটি সে অতীব ক্ষিপ্রতায় হাতে লইতেই চীৎকার যেন আরও দুর্ম্মদ আরও খ্যাপাটে, যাহা তীর্থযাত্রায় শ্রুতধ্বনির বিকৃতি! উড়ন্ত পালকে সে আরও কুটিল হইল।

ইহা চমৎকার যে সে সুঘরাই এইরূপে মিথ্যারে স্মরণ করিতে চাহিয়াছিল—আ-আধুনিকতা! যে এবং শনৈঃ সে দৃঢ়তায়ে হিরণার টিলায় যেখানে ড়াড়ু পোকার নিবাস, দাঁড়াইয়া খাঁচাটির প্রতি লুব্ধ নয়নে চাহিয়া আপনার চীৎকারকে আপনা হইতেই ছন্দিত করিল, যেমন সে ছন্দবিধি জানিয়াছে।

যে এবং এখন কে যেমন বা গীত গাহিতে আছে!


AMARBOI.COM
প্রতিভা

মাধব যে তুমি মহাপ্রভুতে, মাগো যে তুমি বর্গভীমা, ঠাকুর জয় রামকৃষ্ণ! যে এখন আমরা এখানেতে নিজেরে বিস্তারিব; যাহা ঘটিল, তাহারে নির্ম্মাণ করি; এবং এই অভিমান ভুয়া না হউক, যে মানে, আমাদের বোধিত হওনের যেমন ধারা, যেমন প্রকৃতি, যেমন উপাদান, যেমন ভিৎ তাহা এইটিতে উল্লেখিত থাকিবেক; যে আমরা হই অতীব সরল, যেইটি হয় আমাদের সব।

এই সকল লোক তথাহি দল, যে ইহাদের দেহ যেটুকু তাহাতে লজ্জা আছে, বসন যেটুকুন আছে তাহা রেল লাইন আছে বলিয়া আছে, ইলেকট্রিক আছে বলিয়া, সম্মানে, স্ত্রীলোকদেরও; হায় স্ত্রীলোকেরা, ইহাদের বসনপ্রান্ত এমনধারা যে অপরাহ্নের ঈষৎ হাওয়াতে যদিস্যাৎ শব্দিত, যদি ক্কচিৎ বেসামাল, তবে তাহারা কহিল, মরণদশা! বাতাস কীদৃশী হয় না!

আমাদের কল্যাণে, আমাদের নাম যাহাতে খারাপ না হয় তাই বস্ত্রকে তাহারা মান্য,করিল। মনুষ্য কপালে ইহারা সেই, এখন ভাগ্যহত, ফোঁটা পরাইতে যাহাদের আঙুলের টিপেতে চন্দন এখনও আছে।

এখনও বাতাসকে, খারাপ রাস্তাকে, রোদকে ইহারা দূষিতে পারে, ইহার পর আর সব কিছুতেই বিস্ময়! তাদের গাত্র নেতা ফুকো মাঠের হাওয়াতে ফরফরিতে থাকে; অবশ্য, উপস্থিত ঐ বাতাসেও ইদানীং আর তাহাদের বেজারিবার সেই ভব্য বৃত্তিটুকু সঠিক নাই, যাহারে সহবৎ কহে—আঃ এই সুন্দর সহবৎ শব্দটি! যাহার বিশদ এই: ডান হাতটিই রতনচূড়ের গহনা, ভাব লইয়া কপালেতে উঠে—শ্রদ্ধা যেখানে নিছকই, কপোলের টোল সত্ত্বেও, অনৈসর্গিক।

তাহারা সকলে ভাসিয়া চলিতে আছে।

এই সেই সড়ক, যাহা বড় পিছল, কোথাও জল; মাটি দোঁয়াশা, আবার বেলে, আবার এঁটেল এবং লবণাক্ত, যে এইখানটি পার হইতে তাহাদিগের পায়ের ছাপ পড়িতেই ছিল না; ঐখানে তাহারা পড়িয়া যাইতে পারে তাই একজন প্রথমজনকে বাঁধন দিল, অর্থাৎ হাত ধরিল, তৃতীয় দ্বিতীয়র, এই ক্রমে চতুর্থ তৃতীয়র এবং এইভাবে যখন একটি লাইন, এবং তাহারা ঐ স্থান পার হইতে আছে; দলের বেশ কয়েকজন যেক্ষণে ঐটির মেঝেতে, তৎক্ষণাৎ ইহাদের ঐ লাইনের মধ্যের অল্পবয়সী যে, সে কহিল, আরেঃ বাস্! ঐ আমার ছাপ, ঐটি আমার, এবং ইহা মহা উল্লাসেই।

হে মীরার প্রভু, হে ঠাকুর আমাদের ভাষাজ্ঞান অতীব ঘেয়ো, এখানে ঐ 'উল্লাস' শব্দপ্রয়োগে জানি আমাদের পাপ হইল! হায় উহাদের আমরা অনেক দূর হইতে, অনেক জন্মের এদিক হইতে নেহারিলাম! ইহাতে, এই ব্যবহারের, অখণ্ড মহারাজ আমাদের দুষমন বলিতেন! আঃ বিদ্যাসাগর, তোমার সূক্ষ্মতা আমরা একদিন অন্তত স্বপ্নে দেখিব—তবে ঐ পাপ যাইবার!

বাস্‌রে মোর পায়ের ছাপ, ছাপ, কি বড় দেখ গো কত গাড়িয়া বসিয়াছে, ইহা মহা আবেগে উচ্চারিত হওন সঙ্গেই, ঐ অল্পবয়সী, যে যাহার দেহগঠন পর্য্যন্ত সিঁটাইয়া ইদানীং আঁচল ধরা খোকা হইতে কিছু বা বড়, সে অবাক এবং আরও কহিল, ওগো তোমরা দেখ সে, ঐ হইল মদীয় পায়ের ছাপ।

এই বচনের সঙ্গেই সে ত বটেই, যে তৎসহ আর যাহারা ঐ কাদাতে আছে, আরও যে মাইরি, ইহা যে, যেখানটিতে শুক্‌ন, যেখানে তখনও দুইজন, এমনও যে ইহাদ্বয়ও, এবং অর্থাৎ সকলেই লটকাইয়া পতিত হইল। ইহা রাস্তা ও যাহার খানিকটা কর্দ্দমাক্ত, এখন যেখানেতে তাহারা পড়িয়া রহিয়াছে।

যে, এই পড়িয়া যাওয়া এমন কিছু গল্পের না; তথাপি, যদি কিছু বিশেষত্বর, তবেই যখন তাহা প্রত্যঙ্গ সকলকেই, ইহা মারাত্মক ঘা দিত; যে প্রত্যেকেরই নিজেকে মনে পড়িল যে সে আছে! আদতে ইহারা জখম (!) হইল পেটেতে, বালকটি চমৎকৃত ইহা খুসী অথচ নাড়ী ছিঁড়িল।

যে জন দলের কর্ত্তা (!), সে আপন বসন ঠিক দিতে হুঁসিল না; এখন এমনধারা বেগোড়েই

প্রত্যেকেই রহিল; ইহা সেই যাহারা আসলে প্রায়, সাদাই বটে, একটিই তালপাকান লোকেরা! শুধু, কর্দ্দমাক্ত পথ, নালা গাড্ঢা তাহাদের আলাদা করিয়াছে বা, ঐ সকল পার হইবার কালে তাহারা আলাদা হয়; যাহারা পড়িয়া যাওয়াতে এখনও, কাদাতে, বিবিধ হাস্যকর ভঙ্গীতে সাঁটিয়া আছে; কতক ময়লা পড়া লাল পাথরের উৎকীর্ণ চেহারা, অবয়ব; যাহা কালপ্রভাবে ক্ষয়িত, ঐরা! ইহাদের হইতে শিশু অঙ্কিত বা লোকশিল্পের মনুষ্য অঙ্গ অবধি নিশ্চিহ্নয়াছে।

ইহা ঘটিলে যে, মনুষ্যোচিত বালককৃত গেঁয়ো নির্ব্বুদ্ধিতায়, ঐ বিস্ময়, এখন যাহা লইয়া, উহাদের বেজারিবার ক্ষমতা নাই।

ইহাদের পেট এমন পড়িয়া কালো যে যাহাতে অন্ধকার সিঁটাইয়া যায়!

ইহাদের চক্ষু এমত কোটরাগত যে কাঁচ চিড় খাইয়া থাকে!

ইহাদের হস্তপদ এমত প্যাংলা যে বেদব্রাহ্মণ কান্দিতে আছে!

ইহারা নিজেদের জন্য লজ্জিত, ইহারা চক্ষু নামায়।

হায় আমরা, যে আমি, এতকাল পুতুলের বিনিময় পাহাড় চিনিয়াছি, সেই সে থ! এস, আমরা পুতুলে ফিরিয়া যাই—সেই ভাল!

আঃ ইহারা সেই যাহারা হয় আকাশের নকল! প্যারডি নহে!

ঠাকুর তুমি ইহাদের, হাভাতে ক্ষুধার দ্বারা, মমতা পচাও নাই।

ঠাকুর তুমি ইহাদের এমন গড়িয়াছ যে ইহাদের মনে কাণা পোকা নাই।

ঠাকুর তুমি ইহাদের ভালতে হাজা মজা দাও নাই!

ইহা ভাল!

ইহাদের প্রতিটিতেই বিনি সূতার মালা গাঁথাও ভুলে যাই।

তাহারা এই মাটির প্রতিটি কণা শুঁকিতে থাকিয়া মাটিতে আছিল, আঃ মানুষ দারুণ কিছু, যেহেতু সে সকল কিছুর সত্ত্ব অনুকরণিবারে পারে! যে যখন তবু তাহারা তেমন কোন নকল নহে, বহু আদিম কর্ত্তব্যের উদাহরণ; তাহারা মানুষে যেমনটি তেমনটি আছে, যেমন তাহারা! তাহাদের মাথা এমতভাবে নড়ে, যে এবং বেশ হঠাৎ, অনেকটা যেন মনে হয়, কোন আঘাত বাঁচাইতে আছে।

সে, সেই বৃদ্ধ বীরত্বব্যঞ্জক কণ্ঠে গাহিয়াছে, 'বড় আশা করে এ পিঞ্জরে।' যখন গাহিতে থাকে তখন আলো বা অন্ধকারের তারতম্য তাহার গায় নাই! সে একভাবে দাঁড়াইয়া; শ্লেষ বা আপশোষ সত্যেই কিছুই তাহার স্বরবিভঙ্গে নাই।

কে যে পুরুষ কেই বা প্রকৃতি ইহা হয় ধন্ধের!

মেয়েছেলেদের আঁচল, একেরটি অন্যের সহিত গিঁট বাঁধা; সকলের গিঁট কর্দ্দমাক্ত হইল। ঐ মেয়েছেলেটি যাহার হাতে কিছু শুকনা পাতাসহ ডালপালা থাকে, তদ্দ্বারা সে রোদ এতাবৎ আটকাইল; যাহা উপস্থিত এখানকার গর্ত্তস্থিত জলে ভিজিল, ইহার জন্য সে নাকে কাঁদে, যাহারে ছিচ্‌কাঁদুনী কহে।

যাহা, যদি আমরা ঐ রকমটি অনুকরণ করি তবে নির্ঘাৎ ঐ শিশুটি, যে আমি বিক্‌কু (বিস্কুট) খাইব না, বলি অনেকক্ষণ যাবৎ ঘ্যান্ ঘ্যান্ করে, থ হইবেক; সে থামিল!

এই ছিচ্‌কাঁদুনে স্বভাব বা বৃত্তি, যেখানে সম্বন্ধ বড় আপন সেখানে ইহা খাটিবে; সে বড় আদরের হইলেও বিরক্তি বটে উৎপাদন করেই এবং বিরক্তির শেষ লোকে চাহিবে—ইত্যাকার মনোভাব তখনই শোভার, কুমড়া ফুল যখন হাওয়াতে দুলিতেছে। গোয়ালে গরু হম্বারব করিতেছে।

এখন মেয়েছেলেটির ঐরূপ সংস্কার ছিল।

হায় সে কান্দে! তাহাকে এবং সান্ত্বনা দিল যে মেয়েছেলেটির টিনের কাটোরাতে কিছু চাল; জোর মুঠো খানেক যাহা ঐ যে চাঁদ তারাওয়ালা বাড়ী, যেটির সামনে অনেকটা মাঠ, যাহা ঘিরিয়া পাঁচিল ও সদর দরজা, ইহার চৌকাঠে অশ্বখুর, উপরে খিলানে (!) বালির কাজ করা ঘড়ি—এখানে তাহারা ঐ চাল, সে একা নহে, অবশ্য টিন তাহার হাতে আছে, পাইল; এখানে তাহারা, বাড়ীর জানলা দরজা সমস্ত বন্ধ দেখিয়াও—অনেকটা ছায়া পিছান অবধি ছিল, ঘড়িতে একটি নির্দ্দিষ্ট সময়; অনেক ফার্ণ মেডেন

হেয়ারে তাহারা ছিঁড়িতে, হাত প্রসারিয়াছে; কুকুরটি তাহাদিগকে দেখিল, আশ্চর্য্য ধীরে সেটির ন্যাজ নড়িল। তাহারা ফিস্‌ফিস্ করিল যে, সেই ভাবে, আগে দেখা দরজাস্থ বচনে তাহার চীৎকারিবে কি! সেই যাহারা চীৎকারিতেছিল; ঠিক ভেড়ীর নীচে, এক দরজার কাছে; উহারা বেসরম কথায় ভিক্ষা মাগিতে আছিল! যাহা ভাবিতেই ইহাদের গা আছে? গায়ে, কাঁটা দিল।

ততঃ ঐ বেশ প্রশস্ত পাঁচিল ঘেরা মাঠের মধ্যেখানে অনেক দুপুরে একটি ছোট পুঁটলি আসিয়া পড়িল, মাগো কি কাণ্ড!

ইহারা ব্যতীত অন্য দল কেহ নাই, তবু সকলেই ঐ পুঁটলি যেখানে, সেখানে ইহারা সকলে ঝাঁপাইয়া পড়িল; ধুলা উড়িয়াছে। অথচ ইহারাই একবার মিথ্যাবাদী, মিথ্যাবাদী বলিতে থাকিয়া পড়ি কি মরি দৌড়াইয়াছিল। তাহা হয় এই যে সড়কের মধ্যে কালবাৎ (কালভার্ট)—তাহার ইঁটের পাশ-পাঁচিলে লোকটি বসিয়াছিল, অদ্ভুত ঝোড় জটিল চেহারা; এই দলের লোক নিকটস্থ হইতে বলিয়া উঠিল, খবরদার! এই যে দোতলা টিনের ছাদ দেখিতেছ! ঐখানেই আমরা মাঙ্গিতেছি যখন, তখন পস্তনিদার, লোকটা ডাঁটা চিবাইতে থাকিয়া দোতলার বারান্দাতে আসিল, কহিল, দাঁড়া! দাঁড়া! আমাদেরই একজনে কহিল, এই সেই লোক যে ঠোঙ্গা করিয়া চাল ছুঁড়িয়া দিল, নীচে মাঠে হাভাতেদের মারপিঠ দেখিল, ধূমপান করিতেছিল; ইহা আমি শুনিলাম এক মরণোন্মুখের নিকট! আমি পালাইব, আমি কাহারও সহিত মারপিঠ করিতে লায়েক নহি! ঝোড় জটিল ব্যক্তি যোগ দিল, তাহার কথা আমরা শুনি নাই, ভাবিলাম ভীড় পাতলা করার নিমিত্ত কহে; ক্রমে অনেক দল আসিল। চাল ঠোঙ্গাতে মাঠে পড়িল! ঘোর মারপিঠ হইল। আমার ভাগ্নেটি মারা গেল—অনেকে মরিল!

যাহার হাতে টিন ও শীর্ণ হাতে একটি আরশিদার চুড়ী (বালা), ইহা গালার তৈয়ারী, যাহাতে অনেক আকাশ। চুড়ী হলুদ, বরফি আকারে আয়না, ঐ চুড়ী আছড়ি পড়িতে ভাঙ্গিল; ইহার নিকটেই ঐ পুঁটলিটি পড়িয়াছে।

আমাদের, বিশেষত এ দাসের, ঐদৃশ চুড়ী অর্থাৎ বালা খুব ভাল লাগিত দেখিতে—হাতের ভলিউম কি তাজ্জব খেলিয়া উঠে! রিখিয়ার হাটে আমরা দেখিতাম খুব কদর আছিল। তেমন চুড়ী লয়ে আমরা ছেলেবেলায় একটা ছড়া গোছের লিখি; তাহাতে একটা লাইন ছিল মনে পড়ে, আরশি, না না আয়না, 'আয়না তাহাতে অঢের লাখ্!' তেমন চুড়ীখানি ভাঙ্গিল, এই পৃথিবীর ষড়ৈশ্বর্য্য চোট খাইল। এখনই ভাবিতে পারিব, যদিও আয়না কতটুকুই বা তবুও উহাতে, ভুঁয়ে আছাড়িয়া পতিত ঐ সকল মুখমণ্ডলের, অনেকেরই চেহারা, প্রায় জনেরই পেট দেখা যায়; একজন ঘাস দাঁতে কাটে, একটিতে শীর্ণকায় হাতে চালের পুঁটলি ধৃত—যে এবং আরও রকমারি প্রত্যঙ্গ সকল উহাতে ভাস্বরিত হইল।

অথচ নেহারিতে আছে যাহার চুড়ী ভাঙ্গিল সে, এই মাঠ নয়, সেই ঘুটিয়ারী শরিফ! এই পথে আসিতে সে প্রথম তিলের চাষ দেখিলেক, তিলফুল। (আঃ তিলফুল জিনি নাসা!) ফুটিয়াছে। সেখানে মেলা! এখানে পীর সাহেব বড় জাগ্রত! এখানে ঔষধ সংগ্রহে তাহার আগমন হয়; কেননা সে হইল মৃতবৎসা! ঐ থানের মৃত্তিকা এখনও মাদুলীতে আছে। এখান হইতে নিজের তরে ও ছোট ননদের তরেও তদ্রূপ চুড়ী খরিদ করিয়া থাকে; আঃ ফিরিবার পথে আবার তিলফুল। আঃ তিলফুল জিনি নাসা এই উপমা না জানিয়াও সে অপূর্ব্ব সরলতা পায়, ভ্রূকুঞ্চন করিল, এ কিসের চাষ? এখন সেই পুরাতন ছবি প্রতিবিম্ব অবিকল ঐটুকুন বরফি জায়গাতে!

আঃ প্রতিবিম্ব মানুষের কাল, আঃ প্রতিবিম্ব মানুষের বৈভূই!

এখন ঐ টুকরার প্রতিটি, সে ক্রন্দিত চোখে দেখিল, উহা সকলগুলি সংগ্রহিতে যাইল, তখন যাহারা ঐ চাঁদতারা লেখা বাড়ীর মাঠে আছাড়িত অবস্থাতে রহিয়াছে, যে ইহারা সকলেই তদ্দৃষ্টে বেজার হইল; সূক্ষ্ম বিচারে, ইহাই প্রমাণ হইবে যে ঐ বেজার, ঐ সংগ্রহ কার্য্য উদ্যোগ নিমিত্ত নিশ্চয় বটে নয়; ইহার কারণ যে, পুনরায় তাহাদের উঠিতে হইবেক, তাহারা আবার পথ চলিতে বাধ্য। হাঁ হাঁ করত বাধা দিতে এখন যদ্যপি কাহিল থাকে, কিছুটা আছাড়িয়া পড়ার জন্য, তবু মরা তেজে কহিল, আ হা টুকরা সকল কুড়াইলে ভাগ্য বাঘে খাইবে। এই শাসন মধ্যে অনেক বর্ণই উহ্য রহিল।

মেয়েছেলেটি ভয়ে টুকরাগুলির প্রতি হস্ত প্রসারিয়া এমত প্রকারে নেত্রপাত করিল, যাহাতে ইহা

লেখা, তোমরা এইখান হইতে উঠবে না, তাহা কভু কি হইবার? তোমরা এখানে পড়িয়া থাকিবে! সে এবং স্পষ্টতই যুগপৎ যে ওষ্ঠদংশনে ব্যগ্র আছে; হা কত কাল আমি স্তন্যদান সৌভাগ্যে বঞ্চিত হই, বড় সখ ছিল দাওয়াতে বসিয়া আমার সন্তানকে দুধ খাওয়াইব! তত্রাচ সে ঐ সকল ভাঙা টুকরার দিকে নজরিল, ও যে সে খেদিল, আমার কপালে আগুন জ্বলুক!

এখন এখানেতে ঐ রাস্তার কর্দ্দমাক্ত লপ্তে, সকলেই যেখানেতে বেয়াকুফ হয়; এই সময়েতে, ঐ মেয়েছেলেটি যাহার চূড়ী, তদীয় পিঠ ও পাঁজড়ার ইতঃমধ্যে কোন স্থানে, বেশ তীক্ষ্ণভাবে কিছু ফুটিতে আছিল; চোখ হাঁইয়াছে; প্রথমে অনুমানিল যে ঐটি অবশ্যই গুগ্‌লি বা কাঠকুটো; হঠাৎ মনে হইল আঃ চূড়ীর খুঁট! (আঁচলে চূড়ীর টুকরা বাঁধাই, খুঁট) ঐ খোঁচা তাহার নিকট উপস্থিত, উহাতে, যেহেতু এক রত্তি আয়না আছে, তাই ঢের আমেজের হইল। সে নিশ্চয় সুর করিয়া বলিয়াছে, উহাতে আমরা বড় সুখে ছিলাম।

ইহা সকল কুড়াইও না, এই খান সাহেবেএর বাড়ীর মাটি উহা লভুক!

খান সাহেব, রায় সাহেব, রায় বাহাদুর পদ সকলই ইংরাজদের সময়ে সম্মানজনক পদবী, সম্ভ্রান্ত অভিজাত ব্যক্তিরা লাভ করিতেন। হরেন ঘোষ রাগে বলিতেন, এখন এমন হইয়াছে যে রাস্তার লাল পাগড়ি, চুটকী মে রাধা কীসুনওয়ালারা এবং আমাদের পাড়ার ভিস্তি, গাড়োয়ানে আজকাল পায়। তবু ভাল, 'আজকাল'।

টুকরা কুড়াইও না, ঐ আয়না কুকুর শুঁকিয়াছে!

কুড়াইও না ঐ আয়না দেওয়া ভাঙা টুকরা। উহা এমতভাবে কেহ বলিল, যাহাতে এই ব্যঞ্জনা রহে, উহাতে আর আমরা বুড়া হইব না, উহা এমন কিছু নহে, মুখের তা নহে, উহা প্রসাদ নহে, উহা মায়ের দেওয়া না। এই কথা তাহারা ঘোষিল যাহারা ভুলক্রমে ব্যক্তিময়, যাহারা ইন্দূরে পরিবর্ত্তিত হইবার পর্য্যন্ত গল্প করে নাই।

মাটি লভুক উহা, বলিতে এই সময়তে দৈব কোন প্রতিযশে, কেহতে ডান, কেহতে বা বাম বাহুতে ভর দিয়া মাটি হইতে দেহ উঠাইয়া রহে; এই ভঙ্গী, প্রায়ই, কর্ণকে ফুটাইয়া তুলিতে ব্যবহৃত হয় যখন তাঁহার রথচক্র গ্রাসিত, পাকা অভিনেতা বা সুদক্ষ অঙ্কনবিদ ঐটি কাজে লাগাইয়া থাকে। এখন হঠাৎ ঐ খাড়া সোজা থাকা হাত অনেকেরই মচকাইল! ঝটিতি তাহারা প্রতিজনই আপনাকে সামাল দিল।

পূর্ব্বলিখিত নিষেধ 'কুড়াইও না' তথাহি শাসন, ভাষাতে তাহারা, বিশ্বাস যে, প্রকাশে নাই; তবে ঐ সকল বাচকতার, কল্পনাতে, নিপট তরঙ্গ প্রতি বেচারাগণের চোখের সমক্ষে খেলিয়াছে।

ঐ সব মানার শেষেরটির তরঙ্গতে, অনুধাবনেতেই (!), বেচারীসকলে শীতার্ত্ত হইল! আর কাহারওই আলাদা কিছু উচ্চারিবার চাঙ্গা নাই, বলিতে গেলেই পেটে ঘাই মারিল; অবশ্য ঐতে ইহারা ক্বচিৎ অন্যমনস্ক ছিল; ঐ ঐ শব্দ সত্যই মানে যে, যাহা কেহই বলে নাই, তবু তাহাদের সামনে এখন ঐ শব্দর তরঙ্গ আয়নার টুকরা দিয়া যায়; হায়, তাহারা বোধিত হইতে পারে না যে উহা সকল কোন শব্দের বহমানতা।

যে, চমকিত মেয়েছেলেটি ক্রমে আর্ত্তকণ্ঠে জিজ্ঞাসিল, কিন্তু তোমরা যে এই মাটিতে, ঐখানেতে 'আদর্শে' রহিয়া গেলে, আমি একা হইলাম বটে। বড় বড় একা! সত্যই চূড়ীভাঙ্গার মন খারাপে সে জানিতে পারিল না যে তাহা হইতে তৎক্ষণাৎ ইহা অন্তর্দ্ধান করিল যে সে এক মহান স্বভাব দেখিয়াছে: সেই এক বুড়ী যে নাতি হওয়া মাত্রই, আঁতুড় ছাড়িয়া দৌড়াইয়া যাইত, হাল ও হাল গরুর কাছে, ওগো ওগো আমার নাতি আসিয়াছে। পুকুরের কাছে, ওগো আমার অমুকের কোলে সোনার চাঁদ আসিয়াছে। ওগো ক্ষেত আমার নাতির যেন হাসি থাকে। ওগো রাস্তা আমার নাতি যেন সন্ধ্যার আগে বাড়ী ফেরে।

এখন যাহাদের চোট খাওয়া স্বরে, ঐ চূএর শব্দে, ব্যাখ্যাত হইল, বটে, তবে আমরা যাইব, তবে ইহাদের গৃহীদের কহি, আল্লা তোমাকে আবার অবস্থা দিন—এখন যে জন পুঁটুলিতে ভরিয়া কিছু চাল দিল।—তোমার জুম্মাবার সার্থক হউক, অতিথিশালা পরিপূর্ণ হউক! তোমাকে দুঃখ দেওয়ার জন্য, তোমারে অপ্রস্তুত করিবার জন্য আমাদিগের নরকবাস অনড় হউক!

ইহাতে বিলাপ; ইহাতে তাহার ঈদৃশী চোখে বাড়ীখানির প্রতি নিরখিয়াছে যে যাহাতে মনে হয়

নিশ্চিত বলিতেছে, খান সাহেবের সব ধান্য দারগাতে লইয়াছে, ঢেঁকি পর্য্যন্ত, আমরা জানি!

ধনী নাই, ফলে আমরা হাভাতে হইলাম; এ কথা ভিখারীর, তথাপি এই সত্যই ভাবিতে তাহাদিগের মন বড়ই আঁচড়াইতেছিল যে, হে খান সাহেব, এই মহালে, একমাত্র আপনার ঠাঁই আমরা যাচ্ঞা করিতে আসিতে পারি; আপনার দেহকান্তি, ধর্ম্মত্ব, আপনার সুশুভ্র দাড়ি, আপনার চোখ, আপনকার হজ বস্ত্রখণ্ড বহুদূর হইতে মানুষকে আশ্বাস দেয়; আপনিই আমাদের মানের জন্য অর্থাৎ আপনার নিকট হইতে যে কোন দান লইতে অমর্য্যাদা নাই, আমরা যাহারা ভাতে কিছু পড়িলে—ইহা সর্ব্বৈব মিথ্যা, ইহাদের খোলা মালার সংসার, এখন অভিমানে ভাবিতেছিল যে আমরা সমৃদ্ধিতে ছিলাম, ঘরে মরাই ছিল—কাঁসি সমেত কুকুররে দিতাম; আমরা তাহারাই, যাহাদের নিমিত্ত মৎস্যসকল এক নিয়মিত সময়ে ঘাটে ওতঃপ্রোত হয়।

ঐ ঘাটে, ইহা খর্জ্জুর বৃক্ষের মোটা কাণ্ডদ্বারা গঠিত, তালবৃক্ষের দ্বারা কদাচিৎ, কেননা খর্জ্জুরের গাত্রে কুমীর পিঠের মতন কাঁটা থাকে, তাহাতে পা হড়কাইবার কোন আতান্তর নাই; ছোট আন্দাজ পুকুরে কলমী শাকের এলেক; হাঁস চরিতেছে; এখন খুব কুয়াশা, নিকটের সজিনার গাছ হইতে ফুল পড়ে! ঘাটের ধাপের পাশে বাসন ডুবান, কাঠের বারকোষ ভাসিত আছিল, পাড়ের কাছেতে জলজ ঘাস! কুয়াশা সব একেস্তার করিয়াছে; এখন সকাল, সূর্য্য নাই, কেহ শীতে কুঁকড়াইয়া পুঁটলির মত হইয়াছে, ঘাটে বাসন মাজিতে আছে।

আঃ মানুষের মত কল্পনায় ইহারা বাস করিতে শিখিয়াছে।

মহাশয়, আপনার নিকট আমাদের কোন লজ্জা নাই। আমাদের কষ্ট যে আমাদিগের পাপেই, আপনার মতন মহৎ ব্যক্তিকেও কালো হইতে হইল, চকিত করিল। কপালে আমরা করাঘাত করিলাম, হা, ভগবান! আপনি শুধু একবার আমাদের দর্শন দিন; আপনি স্বহস্তে ঐ পুঁটলি দিলে আমরা ঠাকুরকে ডাকিতাম, জানুন আমরা তেমন করিব না, সেই ঘটনার মত মহান দাতা চাউল যখন দিতে আসেন, তখন অসংখ্য হাভাতে তাঁহাকে ঘিরিয়াছিল, হাভাতেরা আঁচড়াইল, কামড়াইল, প্রহারিল; দাতা রক্তাক্ত দেহে মরিলেন, চাউল ছড়াইয়া পড়িল, চাউল পাখীতে খাইল! আমরা বলি যে ঐ ঘটনা মিথ্যা মানিতে চাহি না।

এখানে, ঐ অপরাহ্নের আকাশ যাহা অদ্ভুত শারদীয় যেখানেতে, কয়েক মাইল আগের ঐ আকাশেই কি লড়াই, তখন আয়না ভাঙে নাই, আঃ, 'ওরফে' কোক্‌তো লিখিত নাটকে আছে, পড়িয়াছি, মৃত্যু নির্ঘাৎ রমণী! যাহাতে বুঝি, পাঁজড়ার গল্প তাহা নহে; কেননা সে আয়না বহিয়া, আয়নার ভিতর দিয়া আইসে; ইস্ মাগো! তাহা কি পর্য্যন্ত হয় সুন্দর, যাহা কখনই ঐ দৃশ্য হইতেই পারে না, যে, রমণী এক পাঁজড়ার গল্প! আবার মনে জোর আসে, যে রমণী জন্ম জন্মান্তর পাঁজড়ার গল্প হউক! এহেন যে ভাবিল, যে মৃত্যু আয়না দিয়া আইসে, সেই কবি সাক্ষাৎ কত পুণ্যের! আমাদের সকালের শিশিরে পা রাখিতে, নষ্ট করিতে কালে, ইহা স্মরিতে খুসী লাগে!

হায় আবেগ, হায় আহ্লাদে উদ্বেলতা বশম্বদ আমরা একি কহিলাম! লাটু মহারাজ বলিয়াছেন, শিশিরে আকাশ প্রতিবিম্বিত হয়, বর্ত্তায়! হায়, ছি ছি!

এখানে, তখনই ঐ নীল আকাশেতে এই দলের মাথায় উপরে কি বা প্রচণ্ড লড়াই! গঙ্গাচিল, শঙ্খচিল সকল থমকিয়া পালাইল, ছোট ছোট পক্ষী, যাহারা রাস্তা ধরিয়া উড়ে তাহারাও; কেননা লাট ভাসিয়াছে, গইপথ অবধি স্লুইস ডুবিয়া জল; আঃ চারিদিক কি আলোকিত! ঐ গাঙ জল, যাহাকে, তুমুল জলস্তরকে, বেচারীরা ক্রন্দিত চোখে সাবেক ভয়কাতর প্রণাম করিল; হাওয়াতে, ঐ জল, ঢেউ খেলিতে আছিল; জলে পঞ্চানন্দর প্রতিমার মুখ বিকৃত কেননা জলে নিমজ্জিত হেতু; যে মা শীতলার প্রতিমা প্রায় জলপূর্ণ! ক্ষয় হয় নাই, এখনও আছে; পাটের চুল জলে ভাসিতেছে; আদখামচা চক্ষুদ্বয়, জলে ঢেউ হেতু এই প্রদর্শিত, এই নাই। ইহাতে মানুষের বুকের জোর উখাড়িত হইল।

হায় দক্ষিণা রায়ের অদ্ভুত কল্পনার চোখ অবধি জল, এই কারণেতে, তাহার তিন চোখ, মুকুট লইয়া, জলে অস্থির প্রতিবিম্বিত।

সুধাংশু রায় এসম্বন্ধে অনেক লিখল, মনে পড়ে তাহার সহিত দেখা মদনমোহন তলায়; মদনমোহন

বিষ্ণুপুরের। কারুর কিছু হাইরেছে, মদনমোহন পাইলেছে, সেই মদনমোহন। বাঁকুড়ার রাসমঞ্চ ইঁহারই, এই মঞ্চ এক অভিনব স্থাপত্য! ঐ মঞ্চের পূর্ব্বদিকে যে টেরাকোটা আছে; সেইগুলির কাছে কিছু সূক্ষ্ম ভাবনা দেখা যায়; গলা, মানে মুখমণ্ডল ও বক্ষ ইতিমধ্যে কণ্ঠে, ঐখানে নিশ্চয় শাস্ত্রসম্মত ইহা, চোলকর্ম্মের অপরূপ বলী রেখা করা গলা থাকা নির্দ্দেশিত হয়। যেহেতু ইহা রাসমন্দির! এখানে কয়েকটি ছবি যেহেতু গীতবাদ্যরত, মুখমণ্ডল ও দেহের মধ্যে হঠাৎ গলা বাদ, সেখানে ফাঁক; ভাস্কর্য্যে ফাঁক ব্যবহার বড় অবাকের, ইহা সকল বিচিত্র নিদর্শন ফলে মিনিয়েচার নহে; ইহা ঠিক বলিতে বাঙলার নিজস্ব স্টাইল।

এই মদনমোহন গোকুল মিত্রর নিকট বন্ধক ছিলেন। আদিতে, ইনি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রর ইষ্ট দেবতা। এই মদনমোহন গোকুল মিত্রর তামাক সাজিলেন, আবার কৃষ্ণচন্দ্রর হইয়া কোর্টে সাক্ষী দিতে যান; ভক্তের জন্য তিনি সব পারেন। জয় মাধব! হে গোপীজনবল্লভ, হে মীরার গিরিধর গোপাল। হে ফৈয়জ খাঁর গীতের টিটও লাঙগারেবো! আঃ আমি আছি।

এই মদনমোহনতলায় বিরাট অন্নকূট উৎসব। আঁচলে আঁচল বাঁধা, যেমন আগে লিখিয়াছি, পাছে হারাইয়া যায় সেইজন্য। তবু মেয়েছেলে হারায়, শিশু চুরি যায়। যে কোন পার্ব্বণে দুর্বৃত্তরা সুযোগ পাইলেই, মহৎ কালীসিংহীর মন্তব্য, হামলা করিবে। কালীপ্রসন্ন সিংহ একজন প্রবর্ত্তক লেখক, ইঁহার মহাভারত ব্যতীত অনেক লেখা আছে; মধুসূদনকে ইনিই অভিনন্দন জানান, মাইকেল তৎউত্তরে বাংলা বলেন; ততঃ গৌরকে লিখিলেন, fancy I was expected to speechify in Bengali! ঐ অন্নকূটে পাছে মেয়েরা হারাইয়া যায় তাই মেয়েছেলেরা অন্যের অদ্ভুত পরিচয় দিয়া ডাকিয়া উঠিতেছিল, ওগো অমুকের মা বা মেয়ে, মাসী ইত্যাদি, অমুক গ্রামের অমুকের বাড়ীর মেয়ে; ইহাতে গগন ফাড়িয়া যায়। এমন ধারা ডাক খুব ছেলেবেলায় থিয়েটারে যখন মেয়েদের বসিবার জায়গা আলাদা ছিল তখন থিয়েটারের ঝিরা এভাবে ডাকিত, আমাদের মা জেঠাইমাদের ডাকিত, ওগো জানবাজারের মেয়েরা...। আমাদের ঐ সুধাংশু বই ছাপাইয়াছে ঈজিপ্তের তৃতীয় ডাইন্যাসটিই'র মূর্ত্তির সহিত দক্ষিণা রায়ের সবিশেষ একাত্মতা আছে।

ঐ জলরাশিতে কি ভয়ঙ্কর যুদ্ধরত শকুন দুইটির চেহারা প্রতিফলিত হইয়াছিল। যাহাতে জল আলোড়িত; দাঁতে খিল ধরিতেছিল, তাহাদের যাহারা দেখিতে বাধ্য, কখনও জলে, বা কখনও আকাশমার্গে ঐ খেওখেই, তাহারা আতঙ্কিত হয়। হায় ইহারা ঐ সময়েতে আপনাদিগকে বাঁচাইতে মন করে, যে এবং চেষ্টাও করিল, হায় বাঁচিবার জন্য প্রতিতেই স্বীয় দেহকে মা ভাবিল ও সেখানে লুকাইতে চাহিল।

ঐ আকাশেতেই যেখানে একদা ঐরূপ বীভৎসতা, আজ এখন, হাই ঐ নীলেতে, খাসা মনোরম ঝাঁক উড়োজাহাজের, ঐ সকল জঙ্গী; তখন যুদ্ধ হয়, কেমন নয়নসুখ, উঠে, নামিল, তাজ্জব ঘটা দেখা যায়! তাহারা যাহারা এই আধা কর্দ্দমাক্ত স্থানে শায়িত, তাহারা এতদিন বাদে এক নরম সূক্ষ্ম বোধ লভিল, যাহাতে, মানুষের দুর্দ্দৈবে তাহারা বেচারী বলিতে পারিবে; ইহাতে তাহারা আঁচাইয়াছে তখনই, এতদিন বাদে তাহাদের পান খাইবার অবসর, এখন নিশ্চিন্ত। তাহারা সুখ দুঃখের গল্প করিবে; সেই গল্পর আরম্ভ এই ধাঁচের, সে বার এত কাঁকুড় হইয়াছিল যে, গাঁময় কাঁকুড় পাকা ফুটির গন্ধ, কত মৌমাছি। এবং এই সময়ে এক ছড়া কোন শিশুকে শিখাইবার উদ্দেশ্যে বা তামাসায় বলা হয়:

আশালতা পালঙ্ পাতা আজকে তোমার বিয়ে।
হাওড়া থেকে বর এসেছে, টোপর মাথায় দিয়ে ॥
বর দেখে যাও বর দেখে যাও রান্না ঘরের ঝুল।
কণে দেখে যাও কণে দেখে যাও কনক চাঁপা ফুল ॥
পোড়ার মুখো বর আবার গোঁফ রেখেছে।
তাই না দেখে মেয়ে আবার রাগ করেছে ॥

এখন ঐ জঙ্গী বিমানসকল আছে, যে মেয়েছেলের পিঠেতে এই অবধি ঐ বিস্ময়কর আয়নাসহ টুকরা ফুটিতে আছিল—সে বড় মায়াতে আকাশমার্গে উড়া বটে নেহারিতে হাঁদা হইয়াছিল, অবশ্য

সকলেই তদ্রূপ; আহামরি অবস্থাতে সকলেই রহিল যখন বিমান বহর নাই, ততঃ মহা আবেশে তাহারা মুখ মারুৎ ত্যজিল।

যে এবং স্বতঃই এই শব্দ স্ফুট হইল, আঃ! ইহার পরবর্ত্তী আনন্দ জানান দিবার কথাটি, এই ক্ষেত্রে আর ভাস্বর হইতে পারিল না, খেদের বটেই; যে শব্দ ফুটিল না তাহা হয়, কি সুন্দর! কাহারও দ্বারাই উচ্চারিত হইল না; শুধু ঐ মেয়েছেলেটি, যাহার অঞ্চলের সহিত মাত্র আর একজনের শুধু বন্ধন ছিল ফলে এই জন সব শেষে, ইহার বস্ত্রের অন্য খুঁট হাওয়াতে উড়িয়া থাকে; তাহার ওষ্ঠে উহা নিঃশব্দে খেলিয়া উঠিল।

এখনই সকলে যখন প্রাকৃতিক, তখন ঐ শেষের মেয়েছেলেটির সহিত যাহার আঁচল বাঁধা সেই চূড়ী পরিহিতা কহিল, গিঁট খুল আমি মাঠে যাইব।

মরণ কি খাইয়াছিস যে।

খুল না এখন রাত ত নয়।

অঞ্চল মানে আঁচল, ইহা বস্ত্রপ্রান্ত যাহা এতদ্দেশীয় উচ্চনীচ ভেদে স্ত্রীলোকের বাম স্কন্ধ উজাইয়া আলুলাইয়িত হয়। প্রতিমার অঞ্চল, ও পশ্চিমে, এখনও উহা বক্ষঃদেশ আবরিয়া প্রলম্বিত হয় সামনের দিকে; পূর্ব্ব কালেতে বাঙলাতে তাই ছিল, বহু ছবিতেই আছে; বর্গভীমাতে একটি পোড়ামাটির কাজে নজর হয়, পূর্ব্ব দেওয়ালে, অন্যরকম। সামনে কারণেই আঁচলে এত কারুকার্য্য যাহা বিস্তার হইয়া পড়ে—এখন বঙ্গদেশীয় আটপৌরে কাপড় পরিবার অঞ্চলই চলন হইয়াছে। বুখানন হ্যামিলটনের বইএর ছবিতে আছে: নিম্নশ্রেণীতেই ঐরূপ ছিল। অঞ্চলের দুইটি খুঁট, দুই খুঁটেই অন্যের সহিত বাঁধাই নিয়ম যখন দলেতে অধিক জন থাকে। কখনও শিশুর ঘুনসীতে আঁচল খুঁট বাঁধা হয়। শিশু যাহাতে করিয়া হামা দিয়া ফেরে, মা নিশ্চিন্ত রহিবে।

যে ঐ লাইনের শেষে ছিল, যে যাহার অঞ্চল খুঁট জম্পেস গিঁট দেওনেতে, যখন কোন উপায়ে খোলা হয় ঐ গ্রন্থি, তখনও সেই কাপড় প্রান্ত, অদ্ভুত কুঁচকাইয়া রহিল, ট্যারা গোলপানা নৌকা মত আছে খানিক কাপড়, ঐ খুঁট! ইহার প্রতি ঐ হতভাগিণী চাহিয়াছে, কুঁকড়াইয়াছে। বলিয়াছিল, আমরা কিন্তু কিছুতেই সেই কাছারীবাড়ী গ্রাম দিয়া যাইব না।

কেন!

কেন? আপত্তি কিসের।

খুব অপয়া।

অপয়া মানে?

শুনিয়াছি।

চৌকিদার প্রমুখাৎ ঘটনা ছড়াইয়াছে, ঐ কাছারীবাড়ী গ্রাম কলেরাতে নিশ্চিহ্ন হইল; কর্পূর চিবাইলেও সে রোগ ছাড়িবে না; যে গ্রাম ও ভেড়ীর ইতিমধ্যে বিরাট জলকর; ভেড়ী হইতে নামিয়া সড়ক, তাহা গ্রামের পাশ দিয়া গিয়াছে; ঐ বিরাট জলস্তর ভাঙ্গিয়া, মধ্যরাতে সাবধান বাণী আইসে; পালাও! কোন মহাশয় প্রেতাত্মা পথচারীকে সাবধান করিয়া থাকে। বিশেষত চৈত্র মাস হইতে ভাদ্র মাস অবধি এই খবরে মানুষের ভীরমি লাগিয়া থাকে, কাঁঠালকে তাহারা ভীতির চক্ষে দেখে! আবার শীতকালে এহেন কিম্বদন্তির প্রেতকে লইয়া গল্প করে, মানুষ মরিয়া গেলে ঠাকুর হয়।

দেহ কষ্ট যাইলেই মানুষ ঠাকুর!

শুনিয়াছ? ফিরিতেছে লোক কোথায় দেখিলে?

সবাই উত্তর দিকেই যায়।

এখন ত নয়, বহুদিন হয়, এবং সে চিৎসাঁতার কাটিতেছে এমন একটি হাতের ভাঙন করিল।

অনেক দিন আগে অপয়া হয় কেমনে?

খুঁট খোলা গহ্বর এই মেয়েছেলেটিকে অবশ্যই বড় শঙ্কিত করিল, সভয়েই খোলা গিঁটের আদল দেখিতে আছে, তাহার চোখে জল আসিলই আর কিছু দূরে কে যেমন তাহার অপেক্ষা করিয়া আছে।

কেন্দ ভূত।

এবং আর কিছু বলিতে ইহার দৃষ্টি চারদিকে সত্বর প্রত্যক্ষিল, সে রগড় করিতে ইচ্ছিল যে, ভূতের

গায়ে এ জামা ছোট হইবে? এহেন রসিকতা খুবই ভব্যদের, যাহা ইহাদের পক্ষে মোটেই সম্ভবে না, কোথা হইতে নিশ্চয় সংগৃহীত হইল; তবে এখন শব্দ পরম্পরা যুয়ায় নাই, এ সময় পদ কম্পনরূপে আসিল, কিন্তু ব্যক্ত হয় না, বরং কহিল, ক্ষ্যাপা। সে গাঁ কবে ছাড়াইয়া আসা হয়!

অনেকক্ষণ বাদে ঐ কর্ম্মবাচ্যমূলক ভাব—আগে উচ্চবর্ণের ঘরে এই ধারা প্রচলিত আছিল, যখন লোকে বিনয়ী ছিল; এখন সদর্পে ব্যবহৃত হয়, ঐ ব্যক্তির কথাতে স্‌ শ্রুত হইল, ইহা কলিকাতার; ইহা, আজব শহর কলিকাতা (?) গ্রন্থে পড়িয়াছি, অধিক গুড় খাইলে তদ্রূপ হইত। শ্যামবাজারের শশীবাবু তামাসা আছে; পূর্ব্ববঙ্গীয়রা 'স' স্থানে 'হ' বলে, তবে উঠতি বয়সে দেখিয়াছি ঢাকার লোকেরা দারুণ স্‌ কতক স্থানে উচ্চারিতে পারিত।

ছাড়াইয়া আসা হয়, এই উত্তরেতে সকলেই লাট মহাল দেখিল; দূরে বসতি; একটি অভিজ্ঞতা তাহাদিগের বোধ মধ্যে ফুট কাটিল, ঐ গুলি গ্রাম; ঐখানেও রাতে আলো দেখি নাই। যে এবং মনে হয় হিংস্রতা চরিতার্থ করিল এই বলিয়া যে, মরিয়াছে ঐ শালাদেরও কপাল শকুনবসা! কিন্তু তাহা সত্যই নহে, অতীব দুঃখেই বলিয়াছিল। কহিল, পা চালাও, অন্য পথ ধর।

রাখ! আমরা কহিব এই পথ দিয়া তোমাদের যাওয়া হইবেক না।

ইহার জন্য ফৌজদারী হয় হউক।

ঐ কথা বেচারীরা আর কতদূর যাইবে বিষয়ে ক্ষিপ্ত হইতে গিয়া মনে হয়, খামখাই কহিল; স্বরে সে ধক নাই, কিয়দংশে ব্যঙ্গ শুনাইল। অনেকেরই আপৎ তাড়নের মাদুলী আন্দোলিত হইল, হায় একদা মরাই ছিল! ইহাদের কল্যাণ নিরাপত্তাও লোকে চাহিয়াছিল! সুদীর্ঘ জীবনের হাড়গুলি ওতঃপ্রোত হয়, ঐরূপ ক্ষিপ্ততা খামখা বটে, যাহা কহিল, তবে তাহার সূত্র আছে; কাহাদের ক্ষিপ্ত হইতে দেখে এখন চোখে পড়িল।

এহেন আজ্ঞা এবং হুমকি তাহারা অনুকরণ করিয়াছিল, মাত্র, তাহারা ভেড়ী হইতে নীচের দিকে তাকাইয়া দেখিল অনেকজন যাহারা ক্রমে বিকৃতাঙ্গ হইতেছে; তাহাদের শ্বাসে পতঙ্গের ডানা ছিন্ন হয়, ইহারাই হাস্যোদ্দীপক তেজে ঐ বচনে বাধা দিতে করিয়াছে; কেননা এই দল, তাহারা, বক্তারা যেখানে ছিল, যে রাস্তাতে, সেইটি ধরিতে পদক্ষেপে প্রস্তুত তাই তাহারা ধমক শুনিল; নীচের লোকেদের ভাবগতিক দর্শনে, প্রথমেই অল্পবয়সীর মনে প্রতিক্রিয়া আনিল, সে অন্যদের মুখের দিকে চাহিবার প্রয়োজন বোধ করিল না; ভ্যাংচাইতে ব্যস্ত হইয়া উঠিল প্রায়। বড়রা তখনই তাহারে বাধা দিয়া ঐ লোকেদের নিকট জানিতে চাহিল, কারণ কি? ঐ প্রশ্নের উত্তর না দিয়া তাহারা পুনঃ একই বাক্যে তাড়া দিল।

এখন এই পুরুষালি ভাবান্তরে যথা: ফৌজদারী হউক! শেষে থাকা মেয়েছেলেটি বিশেষ জোর পাইল, যাহাতে সে আপন মনোভাব মাত্র স্পষ্ট করিতে পারিল, হ্যাদে গো, তোমরা কেহ আমার জায়গাটা লহ, যদি ঐ পথে যাইতে হয় তবে ঐ জায়গা লহ, দেখ, শীত করে, যদি না দাও ত আমার মরা মুখ দেখিবে। সে নিশ্চয় বিশ্বাস করে নাই যে কাছারীবাড়ী গ্রাম ছাড়াইয়া আসা হইয়াছে; এখন এই মরা মুখ দেখিবে, বাক্য সেই সম্পর্ক প্রযোজ্য যেখানে একজনের প্রতি অন্যের টান হয় চুম্বক! এখানে উহা বৃথা হইল।

অথচ তাহার মুখের প্রতি নিরখিলে ইহা পরিষ্কার হইল, তাহার কপালে কাঁচ পোকার টিপ আছে, মুখে সেই ফুলা নাই। এবং সে খানিক দেহ মনে জোর আনিতে, যে কোন কিছুকেই সে কব্জা করিতে চাহিতেছিল, সে বৃক্ষ হোক, ঝড় হউক, আলকাটা জলস্রোত হউক! এখন দলীয় লোকের ঐ উক্তিতে, যাহা অনুকরণ, সে মরদ সুলভ সাহস বোধিল, ক্রমে বাস্তবিক যে গোষ্ঠি এই হুমকি দিয়াছে—তাহাদেরই আর আর তর্জ্জন আওয়াজ কানে গর্জ্জিল; সে বিশ্বাসিল, সে নিজে লাইনের মধ্যেই আছে। ভেড়ীর নীচেকার ন্যায় বেপরোয়াত্ব তাহার চোখে জীবনে কখনও পড়ে নাই।

আর কয়েকটি গ্রাম পারেতে আসিল, এখনও তাহারা তেমন অভিজ্ঞতা লাভ করে নাই; মেয়েছেলের দল সবে মাত্র দিকে দিকে মৃত দেখিয়াছে, আঁতকাইয়াছে; ইহাদের একজনের হাতের হাঁড়ীখানি ভাঙিতে, এই সব মৃতদেহ মাঝখানে, ভারী কাঁদিয়াছে; অন্যরা হাসিল; বৃদ্ধ বলিল, ইহা একরূপ ভালই হইল, কটা চালই বা ধরিত। সব ভাত টিপ চালতে হইত।

এইরূপ কথা সত্ত্বেও সে হাঁড়ীর কানাটি লইয়া খাড়া আছে! সকলে কহিল, মড়ার গন্ধে আর ট্যাঁকা যায় না, চল! কানা ফেলিতে মায়া হইতেছে।

অল্পবয়সী যোগ দিল, তবে গলায় পর!

সেদিনও কিছু মায়া অবশিষ্ট ছিল। ক্রমে তাহারা আকালের প্রচণ্ড কোপ দর্শনে চোয়াল ঘর্ষণ করিতে শিখিয়াছে, এখন আর নাকে কাপড় দিবার মতি নাই—অবশ্য আঁচলে বন্ধন এখনও প্রয়োজন হয় নাই। এখন তাহারা যেখানে, সেইখান হইতে, প্রাণান্ত সূচাগ্র চীৎকার শুনিল, ও অনুমানে সকলেই মন্তব্যিল, শকুনে ভাটা পড়িয়াছে, এখানে শঙ্খচিল! শঙ্খচিল! এখন তাহারা শঙ্খচিলের এই গল্প জানে না:

তোমারে বধিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে।

তাহারা কম্পিত হস্তে নমস্কারিল, মা গো তুমি দুর্গা, মাগো! এমনই তাহারা নমস্কার করিয়াছে গোসাপ দেখিলেই, অথচ খবর নাই পশুকুলকে কালুয়ার, কালকেতু, হাত হইতে বাঁচাইতে মা জননী গোধিকারূপ ধারণ করেন। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতুল্য কাব্য, নিরীহ পশুদের দুখে দুঃখী, আর কোথায়!

মা আমরা তোমার আগমনী গাহিয়াছি। ইহা সর্ব্বৈব মিথ্যা, তাহারা আবাদের লোক, এখানে এমন ভিখারী নাই যে গাহিবে, ঐ আনন্দ ধারা! আসলে ইহারা শুনিয়াছে যে এমন এক ধরণরীতি আছে। আছে বটে সোনারপুর, বারুইপুর, বোড়েল, এখানে রাজনারায়ণ বসুর বাড়ী; বারুইপুরে রথের মেলাতে ভারী ধুম।

এখানে আগমনী গাহিবার অনেকে আছে, 'যাও যাও গিরি আনিতে গৌরী, উমা আমার কত কেঁদেছে।' কিম্বা 'উমা তোর কপালে এই ছিল' এইসব গীতে কি অবিশ্বাস্যভাবে উমা আমাদের ঘরের মেয়ে! যাহা আমাদের মতিত্ব দিয়াছে। এই উচ্চাঙ্গের মানসিকতা উহাদের নাই।

ইহারা নিড়ানি কাস্তে লাঙল জানে, যাহা তাহারা গাঙে বড় দুঃখে ফেলিয়া দিল, ইহাদের স্ত্রীলোকদের এই মাত্র অভিমান যে বাড়িতে ঢালাই কড়া আছে, কেরোসিন কেনে, ক্বচিতের লণ্ঠন আছে; উচ্চবর্ণের কেহ আসিলে বলিয়া থাকে, অদ্য এখানে কড়াই চাপান, মানে খাওয়া দাওয়া করুন।

ইহারা শঙ্খচিলকে ঐ তুমি দুর্গা বচনে স্তবিয়াছে, ক্রমে আরও পথ ভাঙিল; এক ছাড় ভেড়ীতে, তেরচা ভেড়ী, উঠিতেই বুঝিল নীচে অনেকে।

উহা, ঐ আওয়াজ, চিলের নহে, ঐ সব লোকেদের! মনে হয়, ঐখানে ধান কাটার সময়, যে দেশান্তর হইতে এন্তার লোক সমাগম হইয়াছে, তাহারাই ঐদৃশ চীৎকারিতে আছে; সরোষে উহারা কহিল, তোমরা যাহারা ভেড়ীতে, এখানে নামিবে না, জানিও রক্তগঙ্গা বহিবে। ইহাদের স্বর কি পর্য্যন্ত কাংস্য তাহা নির্দ্ধারণ করা যায় না; এমত সঙ্গীন হাভাতে অবস্থাতেও এই আওয়াজ!

ইহারা র স্থানে অ বলে; বাল্মীকিতে আছে, রাবণ যখন মারীচকে সীতা হরণ কর্ত্তব্য বুঝাইলেন, তখন মারীচ কম্পিত কলেবরে কহিলেন, হে লঙ্কাধিপতি, সীতা রামঅন্তপ্রাণা, ইহা গর্হিত; এতদ্ব্যতীত রাম! সেই ঝিল্লিরব মুখরিত বনে বালক রামচন্দ্রকে আমি চিনিলাম, তদীয় পরাক্রম আমি জানি—তাড়কা বধ হইল। সেই হইতে র অক্ষর শুনিলে আমার আতঙ্ক হয়, আপনি নিবৃত্ত হউন।

উচ্চে ভেড়ীপথের দল, তাহাদের বাক্যবাণ শুনিতেছিল কিন্তু ইহাদের দেহে কোন ভীতির সঞ্চার করিল না, ইহারা যখনই আপনাদের মনোভাব প্রকাশিত গেল, যে তৎক্ষণাই উহারা উত্তরিল, ছাড়, ভালমানুষী করিতে হইবে না। আমাদের কুলায় কিনা সন্দেহ, সোজা চলিয়া যাও। ভেড়ী হইতে নামিবে না।

পুনরায় মারাত্মক জেহেদ আস্ফালনে ভেড়ীর নীচে হইতে, রুক্ষ স্বর আসিল, কথা কানে যাইতেছে না, নামিয়াছ কি রক্তগঙ্গা বহিবে, জিহ্বা উখাড়িয়া লইব! খাওয়ার সাধ ঘুচিয়া যাইবে! এইরূপ যখন বলিতে আছে তখন দমের জন্য তাহাদের পেটটি বিশেষ উঠা নামা করিতেছিল।

এই দলের, যাহারা ভেড়ীর উপরে, কাহিল প্রত্যেকেতেই, একজনা একটি খর্জ্জুর বৃক্ষের পাতা হস্তদ্বারা পাকড়াইয়া স্বাভাবিক ছিল; পথশ্রমে ইহাদের দেহ আকারে শীর্ণ হইয়াছে, সকলে তাদৃশ অপ্রত্যাশিত ধমকে মহা আতান্তরে, একে অন্যের মুখ চাওয়াচায়ি করিতে আছিল। ততঃ ইহারা ঘোষিল আমরা নির্ব্বংশ (!) হইব, যে যদিস্যাৎ আমরা তোমাদের বাধ সাধিব, আমাদের রাস্তায় নামিতে দাও, আমরা 'অমুক' পুরের পথ ধরিব, আমাদের সান্‌কি (এনামেলের কাঁসি জাতীয়কেই এখানে সান্‌কি

বুঝায়।) আমরা মাথায় রাখিব। মা কালীর কিরা, কখনও মাথা হইতে নামাইব না। আমরা যদি অযথা বলি, তবে তোমাদের বিষ্ঠা খাই।

এই কথা, ইহারা, ঁকাশীর গল্পতে মন রাখিয়া বলিতেছিল; যাহা কুয়াশাচ্ছন্ন সন্ধ্যার মাঠে, সাগর যাত্রী হইতে শুনিল, যে, ঁকাশীর গঙ্গার ঘাটের ধাপের পাথর মাটির কলসে ক্ষয় হয়! আঃ মানুষ জিতিল!

আমরা হলপ করি, যে কাস্তে লাঙল ইত্যাদি আমরা ভুলি নাই, গৃহাভিমুখী পথ আমাদের মনে আছে; আমরা হেলে গরুর লক্ষণ সমূহ ভালভাবেই জানি, আমাদের গ্রামের সকলের এ বিষয় হাতযশ আছে, কত ভিন্ পাড়াগ্রাম হইতে আমাদের হেলে চিনিতে ডাক পড়ে, বকনাই-হেলের তফাৎ এখনও জানি; যে হেলের ন্যাজে হাত দিলে নেতায় সে কাজের নয়, যে হাত পড়া মাত্রই চনমন করিবে সেই যুতসই; দেখ ঠিক কহিতেছি কিম্বা না; তোমাদের বিরুদ্ধাচরণ যদি তিলেক করি, তাহলে আমাদের হাঁড়ী যেন ফাটে! এতশত সৎ বোধ যাহাদিগের, তাহারা পেটে এক মুখে এক এমত নহে! আমাদের নামিতে দিতে আজ্ঞা হোক!

হেলে চিনিতে যে গ্রামই তোমাদের ডাকিয়া থাক্, নামা হইবে না! যমের অরুচি সকল।

ইত্যাকার শ্লেষে নবাগতরা বোধিল, যে, আপনাদের সাধুতা কবুল করিতে তাহারা শুধু ঠাট্টার কারণই হইল। তাহারা বেশ থতমত খাইল। পেট গুলাইয়াছিল।

এমন সময়, এই আগত দলের একটি লোক কলম দিয়া অসাবধান বশত গড়াইয়া নীচে পড়িল; সকলেই দেখিল মাত্র; তখন শুধু, নীচেকার ও উপরে যাহারা তাহাদের মাথা কিছুক্ষণ কাৎ থাকে ঐ পড়িয়া যাওয়ার দিকেতে, কেহ নড়িল পর্য্যন্ত না। আবার উপরের লোকদের কণ্ঠ শ্রুত হইল, ঐ লবণাক্ত বেনোজল রাশি সাক্ষী, আমরা যাহা বলিলাম ঐ পঞ্চানন শিব সাক্ষী আছেন, এইকথা তাহারা, উপরেস্থিত যাহারা, যে লোকটি পড়িয়া গিয়াছিল তাহার দিকে চোখ রাখিয়া বলল। ইহারা মুখের নিকট বর্ত্তন রাখিয়াছে যাহাতে নদীর হাওয়াতে হের ফের না হয়।

যাও যাও ঐরূপ কথা আমরা জানি, যে এবং এইমাত্র ফেলিয়া ইহাদের কিছু তখনই এই মাঠকোঠার, বাড়ীর, উঠান ঘেরা পাঁচিলের দরজায়, মর্ম্মান্তিক আর্ত্তনাদ করিল, মাগো একটু ফেন দাও!

ভেড়ীর এই দলের ঐ অভিনব বচনে তন্দ্রা টুটিতে লাগিল। তাহারা বজ্রাহত, পা বেসামাল হইল, ঠিক্‌রাইয়া পড়িল, যুগপৎ অবাক থাকিল, ইহারা ডানা ঝাপ্টাইল; এ শরীরেও ডানা আছে! পাছে যাজ্ঞাকারীদল কষায়িত হয়, সে কারণ ঈষৎ পা টানিল; পরক্ষণেই অসাড় রহিল; এবার স্পষ্ট শুনিল, ফেন দাও! ক্রমে খেয়াল হইল, ভাত সুসিদ্ধ হওয়ার পর যাহা নিষ্কাশিয়া, যে জলীয় পদার্থ ফেলিয়া দেওয়া বা গাভীকেই দেওয়া সাধারণতই হয়, তাহাই ঐরা মাঙ্গিতেছে। তাহারা গৃহীর মমতা একটু যাচিতে আছে।

নিম্নে ঐ দরজার সন্নিকটে উহারা কি? প্রচণ্ড গরমে উহাদের কি ঘামাচি হয়, কখনও কি উহাদের কন্যা ক্ষেতে ভাত আনিয়াছে? কখনও কি মানৎ করিয়াছে; এখন শুধু জিহ্বা, দাঁত ও পেট; ইহাদের চক্ষুর্দ্বয় নাই, ইহারা নিজেরে হাঁতড়াইলে খুঁজিয়া পাইবে না; কি বা ভৌতিক! যে এইটি নিশ্চয় তাহাদের প্রথম মনুষ্য জনম; যদি তাই নয়, তবে স্বীয় প্রকৃতির প্রতি এ কি বিদ্ঘুটে পরিহাস! যে মা বাবা চিনে এবং ক্ষেত খামার জানে; হাতে এখনও যাহাদের কচু পাতা, পাত্র! তাহারা এ কোথায়!

দেহ উহাদের মুখমণ্ডল, ঐ ঘৃণ্য ব্যবহারে যাহা লালসার পিণ্ডবৎ! ইহারা কোঁচড় মেলিতে আশ্চর্য্য যে জানে না; এখন শুধু অঞ্জলি মেলিয়াছে, এই অঞ্জলির দুই করই শক্ত পুরাতন কড়াযুক্ত, বাবলাকাঠে যেমন হইয়া থাকে; এই অঞ্জলির দুই করের অনেকটা, মেয়েছেলেদের, বাটনার হলুদ ছাপ, ক্রমে উঠিয়া যাইতেছে।

ইহারা সকলে, যাহারা ভেড়ীতে, আপন কর দেখিল এমন ভঙ্গী করিল। আলেখ যে, এখন তাহাদের হাতগুলি কোলের শিশুর কর হইয়া বর্ত্তাইল, মাগো কি আধো, কি নরম! কি রোদ, কি লজ্জা পায় এবং কহিল, ওহে তোমরা সকলে, তোমাদের হাতের কড়ার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। আমাদের কথা শুন। ইহারা, ঐদৃশী শব্দ, ঐ মাগিবার কথা শ্রবণে, মনেতে এই কামনা করে যে উহা শব্দ না হউক ঠাকুর! আমরা আর কিছু চাহি না, এইটুকু করিও, উহাতে ঝড় হউক, ঝঞ্ঝা হউক, বজ্র হউক—কিন্তু দোহাই শব্দ না হউক!

নিম্নেকার সকলে, উক্ত অনুরোধে, হাসিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু অজানিতেই তাহাদের হাত আপন চোখের কাছে প্রায় আসিল, এবং সমস্বরে কহিল, আসামী! আসামী!

স্যাঙা কড়া দেখ!

ইহাতে সকলে, নিম্নের, কিছু বিভ্রান্ত হওয়ত জানাইল, আচ্ছা নামিতে পার।

হায়, উহা এখন তরঙ্গ, তখন শব্দ, ঐ মাগিবার কথা; তত্রাচ যাহাতে উহা, ঐ শব্দ ধড় না পায়, ব্যাঙ ডাকিল, মেঘ ডাকিল! হাঃ শব্দকে ফুৎকারিতেই পারিল না। ইহাতে, নবাগত দলের একটি মেয়েছেলের, রাস্তাতে নামিয়াই, মনে ঘোর করিয়া আসিল; তাহাতে মতিভ্রম ঘটিল, সে যুগপৎ বস্ত্র খুলিতে, কখনও চুলেতে হাত দিতে চাহিল। অবশেষে হঠাৎ, হা হা করিয়া নিনাদিল, হ্যাদে দেখ দেখ, ও পোড়ারমুখী গতরখাগী, ঠায় ফেন উপছাইয়া পড়ে, বলি ভালমানুষের মেয়ে, খেয়াল নাই। এমন বৌ ত কোথাও দেখি নাই।

ইহাতেই, নবাগতদের একজন আশ্চর্য্যের যে আলস্য ভাঙ্গিতেছিল, অন্যরা ইহা প্রত্যক্ষিতে হাঁদা আছে; হঠাৎ 'দরকার' কথাটি সকলের মনে উপজিল, যে তাহার পিছনের দিকে তাকাইল, পা ধুইবে কি? দৈনিক কাজে যে চরিত্রটি তাহাতে ঘুণ কৈ! আমার ও পরের মধ্যে যে ভাব যাহা কোটালে বানচাল হয় নাই; এই দুনিয়ার সর্ব্বত্রে ঐটিই ত ছড়াইয়া আছে; কে আমাকে দাসখত লিখাইবে। ইত্যাকার প্রশ্ন হইল।

ইতিমধ্যে যে, ঐ বিকট অভিশাপ এমন যাহা, না শুনিতে উদ্দেশ্যে, কেননা এখন তাহারা নীচে, পথে, দরজাস্থ দলের পাশ দিয়া যায়, যে যাহার বর্ত্তন, কেহ বগলদাবাতে চাপিল—কেহ বা তাহা দুই হাঁটুর মধ্যে কজ্জাইতে চাহিল!—এবং এই সুবিধাতে, প্রতিটিতেই আপনকার দুই কর্ণকুহরে অঙ্গুলি প্রদান করত মস্তক ঝাঁকাইতে আছিল; এখন কাহারও এক পদ আগাইয়া তেমনই আছে মানে গতি ভঙ্গীতে ছিল।

ইহাদের মধ্যে থেকে, 'থেকে' এখানে ইচ্ছাকৃত প্রয়োগ, একজনা সম্ভবত মেয়েছেলে, না, না তাহা নয়; বেটাছেলেই ত বটে গতিভঙ্গী ত্যজিয়া, হস্ত হইতে বর্ত্তন পড়িল, ইহা ভ্রূক্ষেপে না লইয়া, জবর পদক্ষেপে যাইতে আছে জাতক্রোধে বিকারগ্রস্তা যে খেদ উক্তি করে সেই মেয়েছেলের প্রতি; যে এখন এনামেলের থালা দ্বারা আপনাকে বাতাস দিতেছে, অন্য হাতে সে নিজ মস্তকের উকুন খুঁচাইতে আছে, আর যে কল্পিত ফেন পড়ার নিমিত্ত অজস্র গঞ্জনা যে পুত্রবধূকে দিতেছিল বিড় বিড় করিয়া, এখনও ওষ্ঠে বিশেষ গ্যাদা; গ্যাদা মানে গরব বা আত্মচেতনা, ও যারপরনাই কর্ত্তৃত্ব বোধে সে উপস্থিত জরিয়া।

যে এবং এহেন বিকারগ্রস্তার মুখ, সদ্য আগত ঐ বেটাছেলেতে, কষিয়া চাপিয়া ধরিল, আর যেন অযথা কিছু বলিতে না পারে; যাহারা তখনও তেমনই ভঙ্গীতে, কানে আঙুল ছিল, দেখিতেছে, তাহাদের ঠোঁটে পট্ পট্ আওয়াজ ক্রমন্বয় হয়, সোঁদা গন্ধ উৎসারিল। সোঁদা—অনেক দিবস পরে চামটে জমিতে যখন বড় আকারের বৃষ্টির প্রথম পসলা পড়িয়া থাকে, তখন ধূলা উড়ে, মাটির গন্ধ আছে।

তাহারা কার্য্যত শুধু ওষ্ঠ স্পন্দন করে, কোনই শব্দ নাই; দেখে, ঐটিতে যে কল্পিত ভালখাগীরে, যাহার অবহেলায় ফেন পড়িল এখনও গঞ্জিতে ফুঁসিয়াছিল; আবার, ইহাও বলে যে, ফেন পড়িয়াছে ত কি হইয়াছে; বেশ হইয়াছে! আরও দেখিল, পুনঃ ঐ বেটাছেলেকে যে উহার মুখ চাপিতে। কেননা সেই দুর্দ্ধর্ষ বেটাছেলে, যদিও অনাহারে আছে, যে পুণ্যশ্লোক, সে হয় হিয়েরো, কিন্তু ইহার, লোকটির চোখে জল, নির্ঘাৎ এক ফোঁটা বটে যাহা পড়িল ঐ বিকারগ্রস্তার হাতের পিছনে, সেই মেয়েছেলে ইহাতে চমকাইয়া আপন হাত দেখিল, শিরা বহুলের মধ্যে, খাতে উহা, ঐ জলবিন্দু!

তদ্দর্শনে মেয়েছেলেটির চোয়াল কেমন করিল, ইস্ জল, চোখের জল! এখন মরদ লোকটি হাঁপাইতে থাকিয়া উহারে ছাড়িয়া দিল, ঠিক যখন এই দলের অন্যেরা, মার মার শালীকে জিগীরিতে মন পাইল। এই আক্রোশের কারণ তাহারা নিজেরাও নিশ্চিত জানে না।

ঐ মেয়েছেলেটি আপন হাতের ঐ জলবিন্দু নেহারিল, তদীয় নাসাপুটস্থ আপেল স্পন্দিতে শুরু করিল; যে এবং তাহাতে কেমন এক বৈচিত্র্য আসিল, তাহার পদদ্বয় নাচিল। আঞ্চলিক কায়দাতে সে কাঁদন গাহিল, আশ্চর্য্য সুস্পষ্টরূপে: এই ভর দুপুরে তোর চোখের জল ফেলাইলাম রে, আমার শত বৎসরের পুণ্য কাকপক্ষীতে খাইল রে, অরে খোঁকারে তোর বউরে বকিয়াছি ফেনের তরে বলিয়া তোর

চোখে জল, আমার মরণ দশা, ওরে আমার বুকে পদাঘাত কর, ফেন কি আমি খাইব, তোর চোখে জল! আমার সাতজনম নরকবাস হউক!

এই সময় শোনা গেল, ফেন দাও তেঁতুলপাতা দিয়ে খাইব, তোমারে দুষিব না মা! এহেন অমায়িক প্রতিজ্ঞা, যাহা ঐ সেই দরজার নিকট হইতে আসে, আর যে তাহা হাওয়াতে উড়িয়া যাইতেছিল।

ওরে খোঁকা, উক্তির পরেই ঐ মেয়েছেলেটির মুখে চাকুম চাকুম শব্দ হইল এখন ঐ চাকুম চাকুম আওয়াজ, কেহ পরিতৃপ্ত সহকারেতে খাইতে আছে; বিশেষত শিশুদের মধ্যে এইরূপ শব্দর তাৎপর্য্য থাকে। অথচ আসলে সে উঁ উঁ শব্দ করিল, কোন কিছু মনে আনিতে যেমন দেশীয় খুব স্বাভাবিক অভ্যাস তেমন ধারা করিতে করে, ঈদৃশ আওয়াজেতে সে স্বর লাগাইল; এবং ক্ষণেকেই এই সকল অক্ষর গঠিত হইল।

অবাক বাচনভঙ্গী খুবই উজর হইল, ওরে এখন ঐ গর্ভবতী মাধু (গাভী) কি খাইবে রে, ঐ ফেনটুকু গেল রে, এমন কি অযথা কহিলাম রে, ও হো হো আমার যেমন পাঁড় ভাতারী কপাল! (পাঁড় ভাতারী মানে, এমন নদী যাহা নিজের পাড় আপন জলধারাতে ভাঙে; সঠিক শব্দ পাড়ভাঙারী, ভাতারী হইয়াছে।) ঐ গইপথ সাক্ষী আছেন, দে আমার মিসির কৌটা, ওরে আমি নবদ্বীপ যাইব, ওরে আমি, আমি কাশীবাসী হইব! ঐ সায়র সাঙ্গারা যায় (সাগরসঙ্গম)—লজ্জা! আমার খোঁকার চোখে জল! ও হো ফেন কি আমি গিলিব বলিয়া গঞ্জনা দিলাম!

যুগপৎ এই সময়, সেই দরজাস্থ মর্ম্মান্তিক ধ্বনি আসিল; যে এবং ইহাতে এখানকার প্রত্যেকে বেসামাল হইল, বর্ত্তনগুলি মাটিতে পড়িল, তবু তাহারা কানে আঙুল ছাড়িল না, মৃগীরোগীর প্রকার মাথা ঝাঁকাইতে আছিল। সকলের গাত্রেতে ঐ চীৎকার আছড়িল। চোখের পাতা অনবরত পড়িল, যে এ কোন দেশ! ইস্ কি ভয়াবহ। ক্রমে সকলে যে যেখানে থাকে সেখানেই বসিয়া পড়িল, তাহারা হাঁটু গাড়িয়া বসিয়াছে।

তাহারা কোটালের শব্দ শুনিল, অদ্য শ্রীশ্রী কোজাগরী লক্ষ্মী পূর্ণিমা! কোজাগর শব্দর মানে বড় খাসা, মানে কে জাগে!

বেলদার এই যাত্রা দেখিও না, ঐখানে সভাতে এখন সবে রাজা দক্ষ, মুনি সকলের পদবন্দনা করিতেছেন, তুমি ছুটিয়া যাও, অদ্য বড় কোটের দিন, জল বাঁধ উজাইয়া যায়?

গান শোনা রাখ, সত্বর ছুটিয়া যাও। আমরা দেখিতে চাই তুমি বাঁধা কোথায় কমজোরি দেখিতেছ, যদিও ভেড়ীর পাশে, নদীর দিকে, তীরে অজস্র আস্ সাওড়া আদি গাছ তাহারা জোয়ার সামাল দিবে, তবে আজ কোটাল যাও।

ঐ সামনে, একজনা, যে তেমন নতজানু হওয়ত আছে, অলৌকিক যে তাহার মুখ অর্দ্ধ উন্মুক্ত; আরও কুহকের যে, উহার ডান করের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ অধরে ন্যস্ত যেমন শিশু; সে সুখী, সে আপন বয়স ভুলিয়াছে; আপন মাথা না ঘুরাইয়া তির্য্যক নেত্রপাতে, অথচ সে আপন পারিপার্শ্বিকতা দেখিল, এই পথ! দুই ধারে জল, অবশ্যই ধান্যক্ষেত্র ডুবিয়া আছে। ঐ ধার বরাবর শ্বেত কচু গাছও নাই, লোকে খাইয়াছে, কাঁটা নটে নাই, তাহাও লোকে খাইয়াছে, কাঁঠাল হয় নাই, শুধু খুব ছোট আমরুল শাক দুলে! এমন বাস্তবতাতে তদীয় বিভ্রান্ত অভিব্যক্তি যায় নাই, এখন এই দলের বৃদ্ধ সেই গীত গাহিতেছিল।

'বড় আশা করে এ পিঞ্জরে, এ পিঞ্জরে একদা'...

একই পংক্তি বারম্বার; উহার পরে যে সকল সত্য বাঁধন ছিল, যে লাইন ছিল, তাহা ঠিক এই স্থানে, এখন ঐ আওয়াজে খোয়া গেল; বেচারী কতবার যে 'তারপর' 'তারপর' শব্দ উচ্চারিয়াছে—সে এই দলের প্রায় সামনেই উপস্থিত আছে, উহাদেরই ধরণে বসিয়া, ইহার পশ্চাতে ভীষণ জলরাশি; সে উহাদের মুখ সকল দেখে, গীত গাহিতে চাহিল। যতবার উহাদের মুখের প্রতি নিরখিয়া গীতের বাণী স্মরিতে প্রয়াসিল, ততবারই অকৃতকার্য্য হয়। ততবারই ঐ কিছু দূরাগত মারাত্মক নিনাদ তাহারে গোহারানিয়াছে!

এখন আর সকলে যোড় হাত করি কহিল, ঠাকুর আমাদের কি অপরাধ! বিচিত্র শব্দবিভঙ্গ ঘটিল,

কিয়ৎ জড়ান; তাজ্জব যে এই বচনে তাহারা শিশুস্বর ব্যবহার করে, অবশ্যই এখানে,—ব্যবহার করে বলিতে ইচ্ছা সিদ্ধ হয়; এখন সেই অহঙ্কার মানে সমর্থতা তাহাদের ছিল কি, এই বিচার্য্য।

উহা ধ্রুবই, শিশুকণ্ঠস্বর ফলে, বড় মায়াময়, অবশ্যই বড় যন্ত্রণা লভিয়া যাহা; এখন ঐ দরজার নিকটের দলের বিশ্রীভাবে চিলের ন্যায় টানা আওয়াজ ‘ফেন দাও’, ইতিমধ্যেই শহর হইতে, এইটুকু চাহিদা যে কেমনে এখানে পর্য্যন্ত আসিয়া মাঙ্গিবার আওয়াজ রীতি হইল তাহা হয় আশ্চর্য্যের! এখানে ছআনায় আড়াই পালি চাল! ইহা ঐ উক্তি শহর গঞ্জের হাভাতেদের কথা!

এই সব দুর্দ্দশার ঘটনা লিখিতে আমাদের যারপরনাই খারাপ লাগিতে আছে, ইহা শক দিবার জন্য না; মনতেসকিউ আদি অনেকেই Shock কথাটার নিন্দা করেন, আমাদেরও খুব জঘন্য লাগে। অবশ্য উহাদের কষ্টতে মোটেই নহে, সেই কষ্ট লইয়া আমাদের এই লেখাতে আরও অস্বস্তি। এমনও মীমাংসা আছে যে, সাধারণের বোধশক্তি কতটুকু মাত্র; সুতরাং ঐ সকল শক্ বা কাঁটা ঝাঁপ—ইহা গাজন নামক পার্ব্বণের অনুষ্ঠান, গাজন চৈত্রমাসের সংক্রান্তিতে হয়। অধুনা ‘চড়কগাছ দেখছে’ পদেতে, ইহা প্রচলিত বচনের ফের, যে চড়কগাছ কথাটি তাহা গাজন পার্ব্বণের, পুরাতন পাঁজিতে ছবি আছে; এই পার্ব্বণের ভারী ধুম ছিল। যে আঘাত দ্বারা, মোটা জিনিষ দ্বারা তাহাকে, ঐ লোক সাধারণকে বুঝাইতে হয়, তথাপি আমাদের মতি নাই; অবশ্য এখানে আমাদের বিষয় হাভাতের কথাই যাহা প্রাকৃতিক সত্য, ইহাতে কাহারও কিছুই করিবার নাই।—‘প্রাকৃতিক সত্য’টা মাঙ্গ পার্কএর, বিদ্যাসাগর ইহার কথা আখ্যানমঞ্জরীতে লিখিয়াছেন এখানে তাহার ষ্টাইল পরমাশ্চর্য্য! ইহা মাঙ্গ পার্কএর ন্যায়ই মন্তব্য হইল, তিনি দাস প্রথাকে ভাবিতেন প্রাকৃতিক সত্য বা নিয়ম। ভারতে ত বটেই, অদ্য আছে অনন্তকাল অবধি ইহা রহিবে, দুর্ভিক্ষ সর্ব্বত্রই! প্রায় কবলিত হইলাম আমাদের তুল্য লোকও, যাহারা ইংরাজের সময় দারুণ মর্য্যাদায় ছিল!

এখন ঐ জিগীরে নবাগতরা প্রত্যেকেই ভূতচালিত হইল, চীৎকার করিয়া উঠিতে চাহিল; কেহ বা কোন বিগড়ান যন্ত্রকে অনুকরণ করে; কেহ দেহের দুই পার্শ্বে, এবং কেহ সামনে পশ্চাতে দুলে; যে তাহারা এইবার কেহ হাত ঝাঁপাইতেছে, কাহারও পদদ্বয় দৌড় অভিব্যাক্তিতে, কেহ তালপাতার সেপাই; আরও তাহারা উহা সহ ধ্বনি গঠিল; কেহ ঢাক, কেহ দুন্দুভি ঢোল বাজাইবার ছাঁদে প্রত্যঙ্গ বিক্ষেপিতে আছে, কেহ মুখে শিঙা ফুঁকে—ইহাদের মুখে এক ছোটলোকী শব্দ হইল, কেহ দুই তর্জ্জনী দ্বারা মুখ ফাড়িয়া আছে, চক্ষু স্ফীত, বালকটি ত্রাসে রাক্ষসবৎ; সকলেরই মুখমণ্ডল আন্দোলিত! যে এবং কিম্ভূত শব্দ করে; কেননা ঐ মর্ম্মান্তিক কথা উহাদের মনে গাড়িয়া বসিতেছিল; কেহ অর অর কাম উদ্রেকী পশুদের আওয়াজ ছাড়িতে অত্রাহি, কেহ বা কামুকের ভূমিকাতে, কেহ বা মৈথুনে, কি স্ত্রী কি পুরুষ ভেদ নাই। ইহা সব কি সত্য!

ঐ শব্দকে উহারা উখাড়িয়া ফেলিতে চাহিল, ঠেকাইতে আপ্রাণ করিল।

ইহাদিগের অন্তরে যে ব্যবধান তন্মধ্যে পূর্ব্বোক্ত বিকারগ্রস্তা মেয়েছেলেটি ছিল, অদ্ভুত নাচের পদক্ষেপে, তদীয় এক হস্ত জল কাটাইবার কায়দায় সর্ব্ব দিকে আপন ছন্দে খেলিত আছে, কহিতেছিল, ফেন ছাড়িয়া আমি বাপের বাড়ী যাই। যে এবং ঐদৃশ ভৌতিক সমবেত ব্যবহার সমক্ষে, ঐ বৃদ্ধের গীত হয়, ‘বড় আশা করে এ দেহ পিঞ্জরে।’

এখানে যখন তাহাদের মধ্যে এমন ধারা ভঙ্গী দেখা গেল, যে তাহাতে ইহা সিদ্ধান্ত হয়, আন্দাজ নহে, সিদ্ধান্ত, যে তাহারা ত্রস্ত হওয়তই, লিখিত রূপ সকল অভিব্যক্তিয়াছে; বস্তুত যদিও তাহারা কয়েকদিন অভুক্ত আছে, তথাপি ঐ চীৎকার তাহারা মান্য করিতে পারে নাই। সত্যই শুধু তাহা নহে; ঐ যাচ্ঞা বচনে এমনই যে, দাঁতে খিল লাগিল। এখন সেই প্রেত নিয়ন্ত্রিত মেয়েছেলেটি হঠাৎ দড়াম করিয়া এক আছাড়ে হুমড়ি খাইয়া পড়িল। সে হয় হল্লাক কম্পিত! যেক্ষণে উহাদের তুমুল হাস্যধ্বনি হইবার ঠিক ছিল, তাহারা হাসিল তুমুল বটে, তবে ধক্ নাই; যাহাতে গীত তুলোটে হইল; তাহারা হাসে, শব্দ নাই; ইহাতে যে, সমস্ত লোক চরাচর স্পন্দিত থাকে, এই জলরাশি, ঐ পথ, যে এবং ভেড়ীর উচ্চতা; আর সব নিঃসাড়!

হঠাৎ, অনতিবিলম্বে, সমস্বরে কহিল, বেলদার বেলদার, দৌড়াও দেখ বাঁধ কোথায় ছিদ্র হইল! বুঝি লবণ সমুদ্র আইসে।

হায় ঐ জলে, কি আমাদের কাস্তে ডুবিবেক হে!
হায় ঐ জলে, কি আমাদের হুঁকা ভাসিবেক হে!
হায় ঐ জলে, কি আমাদের পরচা সকল ভিজিবেক!
ইস্ কি জল, পাতি হাঁস মরিল!

যে এবার তাহারা স্বীয় পায় দাঁড়াইতে স্বাভাবিক (!) হইল, এতাবৎ তাহারা অভাবিত পৌরুষদাপটে পূর্ব্বেকার ভূতুড়ে কাণ্ড, আস্ফালন করে, ঐ চীৎকারে বাধা দিতে; বেচারীদের মতি এবার স্থির। তাহারা চোখ মুছিল, কেননা তাহারা কান্দিয়াছে।

আহা গো তাহারা বড় কান্দিল; ঐ খুব অস্থিরতার সময়েতে, এখন, মেয়েছেলেটি, সে ভূমিতে সটান বসিয়া, আপন বসন, যাহা এলো হয়, তাহাতে নিজেই যত্ন দিতে থাকিয়া গোঁঙাইল; খোঁকা আমার কান্দিয়াছে, দেখ না! বলিতে সঙ্গেই পুনরায় সেই কম্পন সে আবার কহিল, আমি কি ফেনের উপর বসিয়া আছি।

এবং এই সময়, যে মেয়েছেলেটির হাতে আরশিদার চূড়ী সে এতাবৎ কেমন এক গুম হইয়াছিল; হঠাৎ এই হট্টগোলের মধ্যে লাট খাইয়া পড়িল, ইহাতে অন্যেরা মতিভ্রংশে আছে, যে, একে অন্যের প্রতি তাকাইল, নিম্নস্বরে বিদিত হইল এই যে, এখন...তাহা হইলে...এ যে অজ্ঞান হইল!

এই মেয়েছেলেটি যে শ্বাশুড়ী ভাবে আছে, সে তাহাকে পড়িতেছে দেখিল; দেখিল উহার মাথা নুইয়া আছে কেশরাশি প্রলম্বিত, এবং ঐভাবেই বেশ দ্রুত গতিতেই দুয়েক পাক ঘুরিয়াই দেহটি ভূঁয়ে পড়িল, গোঁঙাইতে আছে। ইহা প্রত্যক্ষিয়া সে কহিল, ও কেমন অজ্ঞান হইল রে, আমার পোড়া কপাল! আমি কেন হইলাম না রে! ফেনের হিসাব করিতে আমার ইহকাল গেল, এই বলিয়া মাটিতে হাত থাবড়াইতে রহিল।

বৃদ্ধ এই ক্ষেত্রে দূরের দিকে লক্ষিয়া, ঐ বিমর্ষকারী গীত গাহিতে আছিলই যেখানে বিপক্ষরা মানে ঐ দরজার কাছে যাহারা; এইদিককার লোকে ঐ গীতটিতে তাহাদের দ্বারা যে শব্দ শুনা যায়, তাহা বুঝিতে জোর করে; এই কারণে, নবাগতরা পলকেতেই জানে যে, ঐ সোমত্ত মেয়েছেলেটির দেহ হইতে বাতাস, ভৌতিকতা সহজে ছাড়িবে না।

সামনে যাহা ঘটিতেছে, তাহা প্রপঞ্চ বা উহা ঢেঁকিশালার গল্প, উহা চাল কাঁড়াইতে মেয়েছেলেরা করিতে আছে; তাহারা এখনও ভেড়ীর উপরে, তাহারা মারমুখীদের শান্ত করিবারে, নিজেদের বিশ্বাস দৃঢ় করিতে অত্রাহি আছে, যে, আমরা আর কোন রূপ গল্পের বীজ হইতে এবং পক্ষ হইতে চাহি না! আমাদের, হাভাতে, লইয়া অনেক মিথ্যা রটনা হইয়াছে, 'দাতার মৃত্যু' তাহা আমরা বিশ্বাস করি নাই, ঐ অর্থান্তর ভুল! কালবাৎএর ব্যক্তির কথা অতীব হীন, উহা শুনিলে পাপ হয়, কাক কুকুরের স্বভাবের সহিত মানুষের মতি প্রকৃতি মিশাইয়া ফেলিয়াছে; বেচারীর দোষ নাই, হাভাতেতে অনেক উদ্ভট কিছু দেখিয়া থাকে! এখন আমরা কোন সত্যি ঘটনা তাই ঘটাইতে, আমরা ত মরিতেই আছি, একেবারে নারাজ! কিন্তু তোমরা এ কি বিভীষিকার গল্প হইলে! ছি!

সকলে কহিল, জল! জল!

মেয়েছেলেটিকে ঘিরিয়া আছে ইহারা। ইতঃমধ্যে ঐদের মধ্যে অন্য একটি মেয়েছেলে পার্শ্বস্থিত জলস্তর হইতে, টিনের পাত্রে জল ভরিয়া, আপন কাঁকে লইল, যে এবং যথার্থ ঘরণীর মত আসিতে আছে। এই মেয়েছেলেটি যাহার কাঁকে টিন, তাহার পিত্রালয় যে গ্রামে, তাহার নিকটে পাল্কীবাহক কয়েকজনের বাস—এবং পাল্কী বহিয়া যাহারা কালাতিপাত করে; তাহাদের মধ্যে প্রতিজন এই খুব মজার গল্পটি জানে; সেই বামুনবাড়ীতে চুরির!

উহাকে, ঐ কাঁকে টিন লইয়া যে আসিতেছে, ঐভাবে আসিতে দেখিতে, মৃগীকে কেহ সস্নেহে পাখা, কচুপাতা কেহ বর্ত্তন (!) দ্বারা করে, ঐভাবে আসিতে দেখিতে, মৃগীকে কেহ চাপিয়া ধরে। উহাকে আসিতে ঐ ভাবে দেখিয়া সর্ব্বোপরি শুকন মুখমণ্ডলগুলি চল্‌কিয়া উঠিল, তাহাদের মধ্যেকার ঘোর অন্তর্হিতিল।

এইভাবে ধাতুরূপতে নিয়ন্ত্রিত করা অনেক সময় বেপট শুনায়, আবার কখনও তাহা নহে, মহান মধুসূদন ইহা লইয়া মোটেই বিভ্রান্ত হন নাই, সব ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করিতেন।

তাহারা কাপড় পরিতে নিঃসন্দেহে জানে, তাহারা বিশ্বাসী যে সেই পোঁটলা যাহা তাহারা মাথায় দিয়া ঘুমাইয়াছে, তাহা আদতে ছেঁড়া ন্যাকড়াতে কিছু পাট ইত্যাদি ঠাসা—তাহাই নিশ্চয়ই তূলা পূর্ণ! এবং আপন ঘুনসিতে যে চাবি যাহা কোমরস্থ চর্ম্মরোগ, দাদ, চুলকাইবার জন্য না, বাড়ীতে তোরঙ্গ আছে।

আঃ কি বা মনোরম ঐ জল আনার ঘটা!

এইতে নির্ঘাৎ হয়, যুক্তি সঙ্গত হয়, যে গোলাপ তোড়ায় টিয়া পাখী আঁকা তোরঙ্গ (বাক্স) ঘরে আছে; ইস্ সর্ব্বনাশ, দেখ দেখ কোথায় মরিচা লাগিল এই তোরঙ্গতে, গেল বুঝি বা পাটের সাড়ীটা! বয়স ত বাপু কম নয় এই তোরঙ্গটির! আমার বাবার বাবা যখন এই লাট হাঁসিল কর্ত্তব্যে আসিল, তখনকার; কি বাঘ, কি সাপ, কি বা শঙ্খচূড়!

আঃ জল আনার দৃশ্য যে কত মহৎ, কত স্নেহ, কত না ছবি! কত গীত! এখন ঐ টিনেতে যাহা আধার যাহাতে মাধুর্য্য, বুঝাইল, ললিত বৃত্তি ধ্বংস হইল না; কেননা, ঐ মেয়েছেলেটির কাঁক রেখার পরমাদ্ভুত বক্রতা, অহো ধনুকে জ্যা রোপণ হইবে, সমবেতরে আদেখিলা করিয়াছে; এই মেয়েছেলেটি এবার পা বাজাইয়া স্থিত হইতেই এক ছলাৎ জল পড়িল।

যাহারা দর্শক তাহারা 'আহা আহা' বলিতে যে কেতা তাহা জানে না, তবে কিন্তু তাহারা হাঁপ ছাড়িল, ইহাতে ঐ একই অর্থ হয়! আর এই মেয়েছেলেটি, জলবাহিকা, আপন গতরে এক লতান স্পন্দন খেলাইয়া, তির্য্যক নেত্রপাত করত, মহা ভানে ব্যক্ত করিল, মরণ!

ইহা, সেই জন যে জল আনিতে যায়, সাধারণ জীবনতে অবশ্য একাধিকবার এই জ্বালা প্রকাশিল; পরপুরুষ নাহি যদি, তবে পাখী, বৃক্ষচ্ছায়া, রৌদ্র, পাতা, পতঙ্গ সকলের উদ্দেশেই ইহা, মানে মরণ, বলিবার চলন! জল আনিতে যাইলে উহা বলিতে হয়। কেননা নারীদেহের ঘটা আছে। এখন সে অজস্র পথ ধরিয়া, পাখীদের কহে! ছাতাররা ঐ মেয়েছেলের সামনে একবার ঝটাপট লড়াই করিল (এগুলি একপ্রকার ছোট পাখী)। যখন পাখীরা পথ ধরিতে বাধ্য কেননা জলস্তরে কূল নাই—কোথাও ক্বচিৎ বৃক্ষশীর্ষ মাথা তুলিয়া আছে।

এখানকার সকলে, ঐ মেয়েছেলেটিকে বড় লক্ষ্মী রূপে বোধিত হইল, যদ্যপি এই ব্রাহ্মণ্য কল্পনার লক্ষ্মী সম্পর্কে তাহাদের বটে মতি নাই; এখন ইহাদের হাত ব্যস্ত হইল, জল নামাইতে, সাহায্য মানসেতে।

ঐ মেয়েছেলেটির কাঁক হইতে, যে মেয়েটি জলপূর্ণ টিন লইল এবং নামাইল ইহার চোখ মুখ ফুলিয়াছে, এই হয় সেই বেচারী যে চাহিয়াছিল আঁচল বাঁধা লাইনের ইতি মধ্যে যাইতে; নিজ গাত্র বাস কাঁধে পড়ার পর দুই খুঁট দুজনের সহিত বাঁধিতে।

যে শুধু ডান খুঁট তাহার সামনের সঙ্গে বাঁধা যে অগ্রে থাকে, সেই জনের তাই বাম খুঁট অপয়া নহে। ইহার ডান খুঁট ছিল গালার চূড়ী যাহার, তাহারই বাম খুঁটে বাঁধা, তাহার মানে শেষ বর্ত্তিনীর যে কত সাধ ছিল ইতিমধ্যে যাইতে; এইটুকু! ছিছি ঠাকুর তুমি বেচারীর এইটুকু সাধ পুরাইলে না! বেচারী! বেচারী এত প্রচণ্ড আকালেও যে হাড়সার হইল না। কি কপাল!

তখন ইহারা সারিবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল—এখন সেই সর্ব্বনাশী বচন, দরজার ভীড় আগত, শুনিবার অনেক দিবস পরে; কাপড় জীর্ণ হইয়াছে শুধু, সে যাহার সাধ ছিল মধ্যে যাইবে এখন সেদিন সে উঠিতে, দাঁড়াইতে সমর্থ হয় নাই; আর সে, গালার চূড়ী যাহার, যে দন্তের দ্বারা গ্রন্থি খুলিবার চেষ্টাতে আছে, তাহার সহিত উহার কাপড়ের গিঁট; পাছে হারাইয়া যায় বলিয়াই গ্রন্থি।

আর আর যাহারা তাহারা সকলে লাইন করিয়া থাকে; এই হেতু যে, ডাক্তার, দফাদার, চৌকিদার, দারগা একজন আমীন, এইরা উহাদের প্রতি নজরেই বাক্‌রহিত নিস্পন্দ; সকলেই আপনকার সাইকেল হইতে বেসামাল নামিল; আমীনের হাতে হাণ্ডেল লাগোয়া এক পাখা, তালপাখা, সে উহা পাকড়াইতে ত্বরা করিল; বেশ দূরেতে এখনও হয় ইহারা; প্রতিটিরে মনে হইল অবাক ট্যারা, তাহারা তির্য্যকে দেখিল এই জন্য।

মাগো রাস্তার পাশে বিকট দেখাইল ঐ খানিকভদ্র সবাইকে যাহারা অপরাধীর মতন। অপরাধী শব্দ খুব বালখিল্য, কি বিশ্রী আমাদের শেখা। ইহা সকলের নাসারন্ধ্র ফুলিতেছে, কখনও মজার চেহারা লইতেছে; ইহাদের কেহ ধূমপান জন্য হাত এ পকেট সে পকেট করিল, কাহারও পায় জোর নাই।

ঐ কথিত ভদ্রগোষ্ঠী আপনাদেরকে উপযুক্তভাবেই কেঠো শক্ত করিল, এখন যদি কাশে তবে কচি পাতা খসিল, তাহারা অগ্রসরিতে আছে; ইহারা সাড়হীন; আশ্চর্য্য মস্তক অবনত; যাহার হাতে এখন আয়না দেওয়া গালার চূড়ী উহা বালা আদতে, সে নিজমুখের নিকট গ্রন্থি লইয়া থ; আঃহা কি বা লাজুক! ঐরূপে তাহারে চিনিতে পারা ভাগ্য! সে ঐ যাহার ফুলা চেহারা তাহার আঁচল হইতে নিজ গিঁট খুলিতে আছে।

আঃ কি তাহার চোখ, মধ্যপ্রাচ্যের ভূমিলক্ষ্মী! যাঁহার বরে, চামটে জমি ঝামরিয়া উঠে; সেই উর্ব্বরাবতী, উর্ব্বরদা দেবী লক্ষ্মী। ইহার নিম্নঅঙ্গ যে কোন হতাশাকে দ্রাক্ষারিষ্টে জিয়াইবে, আঃ ঐ উর্ব্বরদা দেবীর নয়নযুগলের নিকট আকাশ দাসখত দিয়াছে। চোখ মহাস্থনগড়ের শবরীর যেমন; কালিকাপুরের, ময়না থানা, লক্ষ্মী ভাণ্ডের চোখ যাদৃশী ঐগুলি; ভাঁড়, মাটির তৈয়ারী, ইঞ্চি ৪/৫ উঁচু, অনেকটা জুঁইএর খোল; জুঁই একপ্রকার বাজী, তুবড়ী প্রকার, ইহা হাতে ধরিয়া ফুটান হয়; মোরাদাবাদী ফুলদানীর সরু ডাঁটি খানিক উঠিয়া ফুলা হইয়াছে, সাপুড়ের বাঁশী আর কি, ঐরূপ ভাঁড়ের কানায় একটি ছোট দেবী মুখমণ্ডল; পৌষ লক্ষ্মী! লক্ষ্মীব্রত কথা আমাদের কি যে ভাল লাগে, তুমি মা কদম্বমালা কদম্ব কাননে বা বন অধিষ্ঠাত্রী তুমি, রাজলক্ষ্মী তুমি মাগো নরপতি পুরে বা চম্পক ঈশ্বরী! হইবে না, ইনি যে বিষ্ণু বক্ষঃবিলাসিনী!

আঃ মাগো তুমি বিষ্ণু বক্ষঃবিলাসিনী!

জয়রামবাটিতে শ্রীশ্রী মায়ের জন্মস্থান, এখানেতে সিংহবাহিনী আছেন, তাঁহার কল্পনা অমনধারা। এক সৌন্দর্য্য! ইনি অতীব ভক্তবৎসলা জাগ্রত। আমরা প্রত্যহ ইঁহারে স্মরণ করি, মা আমাদের কল্যাণময়ী, না হলে কবে শালা আমাদের কালাপানি হইয়া যাইত।

ভগবান কল্যাণময়, যে, সকল রমণীরে সুদৃশ নয়ন দিয়াছে! উর্ব্বরদা দেবী সুলভ অক্ষি যাহার, সে এখন গিঁট খুলাতে স্থগিদিয়া আছে। কেননা ঐ ভদ্র গোষ্ঠী যাহা, তাহাদের বাক্য স্ফুট হয় নাই, অবশ্য একটি ভঙ্গী নেহারিবার থাকে, যে, ইহাদের দেহ তেমন স্পন্দন, ক্বচিৎ সেই গা দোলান নাই, যাহা বাঙালীরা করিয়া থাকে দোষ কাটাইবার উদ্দেশ্যে, এখানেতে এড়ান শব্দটিও হয় অর্থহীন।

এই হাভাতেদের দেখা পাপ। ইহাদের হাওয়া গায়ে লাগাতে লোকে দশাপ্রাপ্ত হইবেই। যে অতি বড় শত্রুরও যেন এই দশা না হয়; অবশ্যই এমত প্রবচন তাহাদের মনে আসে নাই। তাহারা অবশ্যই প্রত্যেকে আপন পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির জন্য জড়সড়!

এই যাহারা রাস্তার ধারে জটিল হইয়াছে, যাহারা রোদে পুড়িয়া খাক ঝলসাইয়া, এখন নিঘিন্নে রূপ লভিয়াছে, মূর্ত্তিমান পাপ! তাহারা দৈনন্দিন স্বাভাবিক জীবনের ভোগাপ্তি হইতে শত শত যোজন দূরে, সুন্দর নক্ষত্র সকলকে উজাইয়া গিয়াছে, কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য কিছু নাই, প্রকৃতির কোন কিছু নেই। অথচ ঐ দল এখনও জীবিত, উহারা আছে!

এখানে এক প্রহেলিকা, ভোগাপ্তি! যাহা অনাদিকাল হইতে অদ্যাপি রহে, সেই সহজ সম্পর্ক, বিভিন্ন মতে দেহ ও দেহী একে অন্যেরে ছাড়ে নাই। দেহ ও আত্মার কে কাহারে জাপটিয়া আছে, কে কাহার স্থানবাচক, ঐ দুই যাহাদের আলোকবুদ্ধি নাই, অন্ধকার বুদ্ধি নাই, সদাসৎ কিছু নাই, ডাহিনা বা বাম নাই! কে কাহার কোন দিকে, এ কি সুন্দর ভয়ঙ্কর! আঃ সেই যুগপৎত্ব! কত পর্য্যন্ত না ঐ ভোগাপ্তি! তোমাদের ভোগের দুঃখ সঙ্গীত নাই! ঐ মহৎ সম্পর্ক একটিতে ঘাঁত খাইল, সেই দেহই এখন স্থানবাচক এবার পচিবে!

হায় নিশ্চয়ই পাপ! দেহের এই পরাজয় যাহাতে ঐ চলমান ভদ্র গোষ্ঠীর দৃষ্টিতে না পড়ে তন্নিমিত্ত তাহারা সকলে ঐদের প্রতিই বড় করিয়া চাহিয়াছিল, যাহাতে উহারা মুখ ফিরাইয়া লয়। এবং তাহারা এখন বিশেষ সিঞ্চিড়া প্রাপ্তিয়াছিল ঐ গীতে, 'বড় আশা করে এ পিঞ্জরে!' আর কিয়ৎ পরে কাপড়ে কাপড়ে দেওয়া গ্রন্থি থাকিতেও একজনকে হারাইবে! সে সেই যাহার দেহে আকাল সাঁদ করিয়াও করে নাই।

যেই জন হন্যে হয় মাঝখানে যাইবে, সেই মেয়েছেলেটি এখন টিন লইল; দুই ঠোঁট বেশ শক্তিতে চাপে বন্ধ করিতেই তদীয় গালে টোল ফুলা সত্ত্বেও জাগিল।

এই মেয়েছেলেটি ইদানীং বলে, যে মৌজাতে সে জন্মে, কয়েক গ্রাম মিলিয়া এক মৌজা, একটি গ্রামে একটি মৌজাও হয়, কয়েক মৌজাতে একটি ইউনিয়ন, কয়েক ইউনিয়নে এক থানা, আর কয়েক

থানাতে মহকুমা—সেইখানকার পাল্কীবাহকরা, বিবিধ তত্ত্ব জানে। অবশ্য ইহারা জড়ভরত নয়।

এরূপ ঘটনা আমরা জানি, আছে; একদা সিন্ধু ও সৌবীর রাজ্যদ্বয়ের অধিপতি রহূগণ শিবিকারোহণে যাইতেছিল, তদীয় প্রধান বাহক ইক্ষুমতী নদীতীরে পৌঁছিয়া অন্য শিবিকাবহন সক্ষম ব্যক্তি সন্ধান করিতে, সহসা দৈব প্রেরিত মহাজ্ঞানী জড়ভরতের সাক্ষাৎ পাইলেন; তাহার ধারণা জন্মিল, যেহেতু ইহার দেহ স্থূল ও দৃঢ়, এই ব্যক্তি নিশ্চয়ই বৃষভ বা গর্দ্দভ ভার বহনে সক্ষম, এই চিন্তিয়া বলপ্রয়োগে তাহাকে ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। ইহা লিখিত ভাগ্যশঃ আছে যে, মহাজ্ঞানী জড়ভরত শিবিকা বাহকের কাজ করেন।

ঐরা মজার গল্প জানে: বামুনবাড়ী চোর আসিল; বামুন নিদ্রাভিভূত, চোর আপন গামছা পাতিল, চাল চুরি করিবে; হাঁড়ী হইতে চাল বাহির করে, রাখে; চাল লওয়া যখন শেষ, তখন পুঁটলি বাঁধিতে গামছার খুঁট আর পায় না, হাঁতড়াইল; বুঝিল বামুন লইয়াছে, কহিল, ঠাকুর আমার গামছাখানা দাও, তোমার চালের থেকে উহার দাম বেশী। এই গল্প সে, গাল যাহার ফুলা, আত্মসাৎ করিয়াছে। আসলে যে বলিয়াছিল তাহারই গ্রাম মৌজা তাহার নিজেরই হইয়াছে; আসল জন হ্যাঁ করিয়া শুনে, যেহেতু সে এখন সব ভুলিয়াছে।

এই মেয়েছেলেটি এখন জলের টিনটি মহা সতর্কতার কজাতে নামাইয়াছে; অহো জল ছল্কাইতেছে!—আঃ ইহাতে ঐ ঐ লোকেরা, পূর্ব্বে ঈদৃশী যদি ঘটিত, জল ছল্কোইতে এককালেই ক্রোধান্বিত ক্ষিপ্ত হইত। সে আগে যদি এরূপ, তখনই নিশ্চয় অন্যের সামনে ঐ জলাধার ধরিত, ক্ষোভযুক্ত কণ্ঠে বলিবে, দেখ দেখ আপনার মুখখানা! আধারটির তল অবধি দেখা যায় না: জল স্বচ্ছ নহে জল ঘোলা গেরি। আঃ ইহাতে চুল বাঁধা যায় না ব্রণ আবছা ঘষা প্রতিবিম্ব, সব কিছুরই ঘষা প্রতিবিম্ব হয়!

ইত্যাকার কর্ম্মের মধ্যে সুমহৎ শান্ত প্রাত্যহিক চেহারা ছিল; যাহাতে ইহারা সকলে, বিশেষত বেটাছেলেরা, আপনার ট্যাঁকেতে কিছু খুঁজিতে আঙুল চালাইল, জনাজাতে প্রতির দিকেই ধাঁধান চোখে তাকাইয়া হাঁদা আছে। উহাদের দৃষ্টিপাতে এই মীমাংসা হইল, যে চল আমরা সকলে ঐ বৃক্ষের গুঁড়িতে হেলান দিয়া থাকি, তবেই খেয়াল হইবে আমরা কি খুঁজিতেছি! এবং আইস আমরা আমাদের হাতের দিকে অবলোকন করি, তবেই মনে পড়িবে আমরা কিবা খুঁজিতে আছি!

ইদানীংকার জীবনের চাপে তাহাদের অস্তিত্ব সকল অন্ধকারসাৎ হইল, সম্প্রতিকার এ কোন কুৎসিতের মধ্যে তাহারা, এ কোন বিজাতীয় বিধর্ম্মীয় নরক। বৃক্ষ ইহাদের প্রকৃতি জানে, হাত ইহাদের রোজনামচা জানে, কিন্তু ঐ প্রকৃতি ও রোজনামচা হইতে যে গড়ন, তাহার সাধ্য হয় কি ইত্যাকার বিপর্য্যয়ের সামাল দিবে! শত শত আদরের দেহকে তাহারা খাদ্য হইতে দেখিল, কিন্তু তাহাতে বৈচিত্র্য এতেক ঘটে নাই; নদীর জলে মানুষের ছায়া দর্শনে কুমীরের ঘাই তাহাদের কুকুর কুণ্ডলী করে নাই। এখন দেহ সিঁটাইতেছে।

তাহারা ক্রন্দিত মুখে একে অন্যের দিকে দারুণ অসহায়ে নিরখিল, তৎকালে তাহাদের হাত সকল ঘষিত অবস্থায় আছে; তাহারা কিছু মনস্থ করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়! আঃ তাহারা এহেন নরকে মরদ থাকিবেই! তাহারা যারপরনাই করিবেই! পুনরপি তাহারা নিজদের বর্ত্তন সমূহর প্রতি বড় কাঙাল চোখে চাহিয়া যদিও বর্ত্তনগুলি প্রায় কাঁশীর মতন তবু ডুবানর কায়দায় হাত খেলাইল।

এই দুনিয়া মহাল অবাকের! ইহার লাট চরাচরে এখনও মেঘ দেখ; আঃ এই মেঘে আমা সবের বাম বাহু কম্পিত হয়; আমরা উহারে গ্রাম প্রান্তে দাঁড়াইয়া আলিঙ্গন উদ্দেশ্যে দুইবাহু মেলিয়াছি, এসো এসো বলিয়া ডাকিলাম, তর্জ্জনী নির্দ্দেশে, ঐ আমাদের ক্ষেত্র সকল দেখ, বলিয়াছি; এ সময়, আমরা সর্পকে মারি নাই; বলিয়াছি সে বাঁচুক!

হায় আমরা কি ধূর ভাঙ্গাকে জ্বালানি করিয়াছি! আমরা আমাদের মৃত্যুসকল হায় খরচা করিলাম; হায় আমরা শীষটান হইতে নাবালে, পৌষমাস হইতে চৈত্র মাসের দিকে, দোফলা জমি হইতে নিছক বালিয়াড়িতে, নিশ্চয় যাইতে আছি; মন সকল আমাদের বড় দুঃখাইতেছে যে!

হাঃ এমনও জালিয়াৎ আছে, তাহারা অচেনা পরগণাতে ঢেঁড়া দিয়াছে, আমরা বীজ ধান খাইয়া

থুইলাম। ইস্ কত বড় বড় মিথ্যা! জানে না, কি প্রচণ্ড জল দুদ্দাড়ে সব কিছু ভাঙ্গিয়া আসিল! জল লবণাক্ত; অবশ্যই আমাদের মধ্যে ঘোগ হইয়াছিল, নিমকহারামি হইয়াছে, নিমক হালালি শিখাইতে এতেক গলা জল, শুধু নুন!

আঃ এখন অন্ধকারকে বড় জ্ঞাতি, বড় চেনা বোধ হইতেছে!

হায় আমাদের কেহ কচুগাছটি পর্য্যন্ত বৃথা কাটে নাই! অগ্রহায়ণ মাসে, দলা দলা গুড় মিশ্র চাল বাটা শত্রুমিত্র, জাত অজাত, পশুপাখী, কীটপতঙ্গ, জলচর, অশরীরী, অভুক্তদের, দেবদেবী, বনবিবি আদি, তৈজস, সাট সকলকে দিলাম, জন্ম জন্মান্তরে যাহাদের খাইয়াছি তাহাদের দিলাম!

আর সম্প্রতি অন্ধকার আমাদের নাভিতে মোচড় দিতে আছে!

হা, হাটে মাঠে, শুনিলাম অনেক পুণ্যতে মনুষ্য জীবন! ছিঃ এ কোন ভ্যাপসা সন্দেহ প্রকাশ করিলাম! আইস মেঘমন্দ্র করি। নিশ্চয় পুণ্য আছে; অবশ্যই আছে! আমাদের কণ্ঠস্বর নিশ্চয়ই উপরে পৌঁছাইবে, এসো ডাকি, কেহ কাহারও পাঁজড়ার প্রতি, কেহ কাহারও উবল পেটের প্রতি নিরখিও না, এসো ডাকি! তিনি মমতা পাঠাইবেন।

আঃ ইহারা যখন জন্মায় তখন সকল নক্ষত্রই কি খলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল!

এখন এই বিকট অবস্থার মধ্যে একমাত্র ঐ ফুলা মেয়েছেলেটির মধ্যে বেশ স্বস্তিদায়ক কিছু তৎপরতা আছে; যাহাতে করিয়া ইহাদের সকলের নিজ জমিদারের নাম উচ্চারিবার শুদ্ধ শ্রদ্ধার স্বর কণ্ঠের নাগালের মধ্যে আসিল; ইহারা অতীব বাহবা চোখে ঐকে দেখিতে আছিল, এমন প্রশ্ন ঐ চাহনিতে থাকে, যে, এই সেই মেয়েছেলে যে অম্লান বদনে, নিজের করিয়া লইত কেন অন্যের কথিত অভিজ্ঞতা, যে, একে গল্প করিল যেই:

আমাদের পাড়ার এক এমন হাঘর হইতে আসা বৌমানুষ ছিল, যে সে আগ্ তুলিয়া খাইত; পাড়ার লোক তামাসা করিত, আ সেই বলে না: ভাল লেগেছে থুই। ভাতার পুতের জন্যে কেন থুই। ইহা শুনিয়াই এই মেয়েছেলেটি কহিল, তাহা আমাদের মতন! আমার কপাল চুরি! তাহার ত অনেক কথা আছে বলি বিশ্বাস হয় যে তাহার চলনভঙ্গী ভারী সুন্দর! তাহার দেহ কম্পনে যে শতেক খবর উৎসারিত হইতেছে; রাস্তা আল ঘাট টেঁশকেল হইতে বিবিধ নবরস জারিত হইয়াছে ঐ কম্পন, ঐ ছন্দ! এইতে না একদা আমার মরামুখ দেখব সাধ্যি কহে! সে কেন আপনার গভীরতা দেখে না; কেন সে অন্যর যাহা তাহা হরণ করে, ইহা বড় কঠিন প্রশ্ন! তাহারা সকলে ঐকে হতবাক প্রত্যক্ষিতে আছিল! আশ্চর্য্য সে আপনার নোয়াতে যুত দিতেছিল।

এখন, সেই আয়না বসান চূড়ী পরিহিতা অচৈতন্য, আয়নাতে—যাহা আছে, তাহা উদ্ভাসিত।

এখন তাহাদের ভূঁয়েতে হাত ঘর্ষণে যে মাটি তাহা হাত চিতাইয়া প্রত্যেকেতে নেহারিল, দেখিতে থাকিয়া এক কুহক সম্মোহ উপজিয়াছে; মহা উত্তেজনাতে ঐ মৃত্তিকা গাত্রে ঘসিতে লাগিল, ও আপন অভ্যন্তর উপাড়িয়া আর্ত্তনাদ করিতে মুখব্যাদনিল; আওয়াজ যদি বা থাকে, তবে তাহা বেজায় অকিঞ্চিৎকর! ক্ষণেক পরে প্রতিতে সেই খোঁজার মানসে এদিক সেদিক চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপিছে, পশ্চাতে দেখিতে তাহারা ভুলিয়াছে, ইতঃপূর্ব্বের দরকার শব্দটি তদীয় নিপট চেহারা হারাইয়াছে, উহা আম্‌তা আম্‌তা ইতস্তত করার স্বর মাত্র!

অনাহার চাবকান মুখগুলি এবার হাঁ করিতে উদ্যোগিল, সমক্ষের ঘটিতে আছে যাহা তাহা গলাধঃকরণ করিবে এবং চোখ কান নাক জিহ্বা হইতে সবই যেখানে মিলিয়া একটি বা এক সেখানেতে লইয়া বুঝিবে! আঃ ইহাদের হাঁ দেখিলে কি যে নির্লজ্জ বোধ হয়!

উহা ঘটিতেছিল; সেই শ্বাশুড়ীর ভাবান্তরে যে, আর যাহারা জলাধার লইয়া ব্যস্ত, আর খানিক দূরে সেই কালিমাময় যাচন! এহেন পরিবেষ্টন কি লিখিত ছিল! কিন্তু কোন এক বৈপরীত্যে দাঁড়াইয়াও ইহাদের মেয়েছেলেরা এখনও তাহারা ক্রমান্বয় আশার গীত গাহিতেছিল; বিস্মৃত হইও না যে আমরা উপছাইয়া আছি, আমরা সতত তোমাদের পথ চাহিয়া রহি, আমরা সঞ্জীবনী; আমাদের বাহু তোমাদের শিথান, আমরা চাল কাঁড়াই, আমরা আঁধারে ল্যাম্পো ধরি, আমরা কেয়াফুল চালার আড়াতে রাখি, আমরা সুচে সুতা পরান ভুলি নাই! আঃ সেই বড় হতভাগ্য যাহার ঘাম মুছাইবার কেহ নাই, হাওয়া

করিবার কেহ নাই! আমাদের সিন্দূর অক্ষয় হউক!

ইহাতে এখনও এক্ষেত্রে সংযম ছিল; কেহতে ধীরতা তিলেক হারায় নাই; ঐ যাহার ঢোল পড়ে সে, যে অচেতন আছে, তাহার কেশরাশি দর্শাইয়া কহিল, আহা দেখ লো চুলের কি বা দশা এক ছিট্‌টে তৈল নাই, খৈলের অভাব কি দেশে, তৈল হয় নাই আছে, কয়েক লাঙল যোত বাড়ী, এক মুঠা খৈল কি মিলে না? এবং যখন জলেতে সে হাত ধুইল, অবিলম্বে সে হয় অবাক! সে বেজার হওয়ত প্রকাশিল, মরণ! এ কোন অশান্তি গো! হ্যাদে দেখ তোমরা, মোর হাত এতাদৃশ কেন, কেন এ মরণ দশার ছাইপাঁশ হলুদ রঙ!

হায় সকলেতে উহার কর প্রতি সভয়ে নিরখিল, ঐ রঙ! এ রঙ কি রকম যেন! দূরে থাকিয়াও ইহারা পরিষ্কার ছবি দেখিল। ইতঃমধ্যে কোন মুখে, এমত এক সংস্থান যে ঘটিয়াছে, ঝিলিক দেওয়া উচিত ছিল, যে, নিশ্চয়ই তোমার জোড় লাগার ফুল ফুটিয়াছে! বিয়ের ফুল ফুটিয়াছে, দেখ! দশ বিশ পালি চাল কাঁড়াও, কোমর বাঁধ! যে 'আজ দুগগার অধিবাস কাল দুগগার বিয়ে' এইটি আমাদের কথা উহাদের নহে। আবার কেহতে নিশ্চয়ই বা মন করে, অতীব ফিকে রূপে বোধকরে যেহেতু সাধারণ নিরন্ন আবিষ্টতা ধসিয়া আসিয়াছে, যে উহা রোগ ন্যাবা! এখন এই গোষ্ঠীর নিজ বুদ্ধিভ্রংশতা, ঐ হলুদ রঙের কারণ নির্ণয়ে প্রমাণিত হওয়াতে, যথেষ্ট তিতিবিরক্তিতে হস্ত আন্দোলিয়া সকলেই খবরদারী করিল, উ কি কর? এখনও নিজ হাত লইয়া বসিয়া মা গো, এদিকে এজলাস খতম হইতে যায়। এজলাস শব্দ, কাছারীগত উহা এখানেতে ব্যবহারে বৈষয়িক জ্ঞান তথা কর্ত্তব্যনিষ্ঠা বুঝাইল। আরও প্রকাশ থাক যে ইহারা আবাদের লোক যদিও, তথাপি এতশত জানার কথা; ২৪ পরগণার লোকের কাছারী সর্ব্বস্ব নাম আছে।

সে, মেয়েছেলেটি আপনকার হস্তের হলুদের প্রতি, যাহা আঙুলের পাশে রেশ মাত্র, দৃষ্টিপাত করত, অদ্ভুত কোন ভাবাবেগ বেটাল হইল; চোখের প্রায় কাছে ঐ হাত আছে; ছড়া, শ্বাশুড়ীভাবে যে আছে তাহার ন্যায় কাটিয়া, সে এক ছত্তর কাঁদুনে সুর তুলিল, যে, "হ্যাদে দেখসে, তোমরা দেখ, হলুদ পানা, এই হাতে হাতে হাতেরে..." কি যে শব্দ যোগান দিয়ে, হলুদ যখন, ঔষধ তাহা, যখন প্রসাধন, ইহা পরম্পরা তদীয় দৃষ্টিতে ভাস্বরিয়াছে নিশ্চয়ই, কিন্তু তাহার মনোমত হয় নাই।

কি যে প্রকাশিবে তাহা সে বারংবার চেষ্টাতেও যথার্থ করিতে পারিল না; তাহার গলায় টানা সুর আছে, সে বড় সাধের হাতের প্রতি চাহিয়াছে; তাহার জিহ্বা উলুধ্বনিতে নড়িতে চাহিল, নিশ্চয়ই, সে বড় আনন্দের গাত্রহরিদ্রা পর্ব্ব স্মরিয়াছে; আবার স্থির রহিল, নিশ্চয় সে প্রত্যক্ষিয়াছে, শেষে হলুদ হাতে জলদ্বারা ধুইতে আছে—হলুদ জল কড়ায় পড়িতে আছিল! এখনও ক্রমে সে ত্রাসিত হইল!

হায় তাহার, ঐ মেয়েছেলেটির, গাভীর মতন হামলাইতে মন করিয়া উঠিল। ইতিপূর্ব্বে যাহা এমতই ক্ষণেক, ঐ সেই দরজার সন্নিহিত দলের মারাত্মক ধ্বনি শ্রবণেই হম্বা করিতে সে ভূত চালিত হইয়াছিল, কিম্বা বা হাস্যের যাহা! তাহার সহিত প্রত্যেকেই তাহার সঙ্গীরা ঐ রব ঘটাইয়া তুলিল! ঘোর হম্বা রব নির্ম্মিত হইল।

ইহাতে দরজাস্থরা এই সকলের প্রতি নিরখিল, নিজেদের মধ্যে দৃষ্টিতে, ইত্যাকার রবের তাৎপর্য্য বুঝিল, এবং ইহা টিট্‌কিার যে তাহা অনুমানিতে নিশ্চয়ই ভ্রংশ হওয়ার সঙ্গেই চক্ষু রক্তিম করিয়াছে অথচ, ক্বচিৎ আক্রমণের গতি দেহে চলকাইল, নিমেষেই তারস্বরে সেই বীভৎস ধ্বনি তুলিল, ও হাত দ্বারা অশ্লীল ইঙ্গিত সংগঠিল।

কিছু আগে ঐ জল আনা ব্যাপারে, কি মনোরম দৃশ্য! এবং তখন যে জল আনিল সে আপন কাঁক হইতে নামাইতেছিল দর্শনে, প্রতিটির মনে অবাক যে গৃহস্থলীর অনেক দিন পর্য্যন্ত দেখা যায়; চালার আড়াতে কবে কে কি রাখিয়াছে তাহা উজ্জরিয়াছিল; দূরে উঠানে মরা উনুন, মাটির দেওয়ালে উজ্জাইয়া লাউ ফুল! তাহারা সকলেই নিজ দেহকে ঐ জল নামান ভঙ্গীতেই অভিব্যক্তিতে বাঁকাইয়াছিল; তাহারা এতক্ষণ বাদে টের পাইল যে চোখ সকল প্রত্যেকের বড় জ্বলিতেছে, আর ঐ জল কি স্বচ্ছ, ঠাণ্ডা!

কিন্তু অথচ অন্যদিকে ঐ হলুদ মাখা! হস্ত, কেহরই এখন আঁধার ঠেলিয়া, ক্ষুধা ভেদিয়া হলুদের অর্থ করিতে পারে নাই! আঃ ঐ হলুদ সূত্রে কত না আগের কথা মনে পড়িবে, আমাদের মেয়েরা গাত্র বর্ণের জন্য হলুদ মাখিত; আগেতে যখন বিবাহ নিমিত্ত মেয়ে দেখা প্রচলিত ছিল, মেয়েছেলেরা দ্বাদশী বা

তৎঊর্দ্ধের তখন সাজগোজ করিয়া বুট জুতা পায় দিয়া, ইহা উচ্চ শ্রেণীর কথা, বরপক্ষ সামনে বাহির হইত; এবং খুব সজ্জিত কন্যা নিজ বর্ষীয়সীদের আস্তায় আঙুলের টিপে একটু হলুদ ছোপ লাগাইয়া লইত—প্রমাণ যে সে রন্ধনেও নিপুণা। কত যে দৃশ্য আমাদের মধ্যে ভাস্বর হয়: জানলা ভেদিয়া রোদ আসিয়াছে—সাদা ফরাসের উপর হারমোনিয়াম, দোয়াত কলম, প্যাড, কাঁচের গেলাসে খানিক জল, প্লেটে অর্দ্ধভুক্ত, ঈষৎভুক্ত, দামী উৎকৃষ্ট খাবার, পানের রূপার রেকাব।

যদিও সকলেই, হামলাইতে ইচ্ছুক তত্রাচ ঐ মেয়েছেলেটির হলুদ! হাত যাহার, তাহার দিকে নেহারিয়া চক্ষু পলক ফেলিতে আছে; এবং দেখা যায় প্রতিটি গাত্রেই হঠাৎ এক ছুটন্ত অভিব্যক্তি; যে ত্বরিতেই চেহারা ঐ মেয়েছেলেটির হাত শুঁকিতে চাহিল! ইহা নাটকীয়তাবোধে নয়, ঐ দরজাস্থ বাক্য তাহাদের নিশ্চয়ই ধাওয়া করিয়াছিল; যে সেই বাক্যে পৃথিবীর যতেক গল্প সকল হাজিয়া গিয়াছে, দৃশ্য সকল বোকা হইয়াছে; জিহ্বা শুষ্ক, ত্বকে ধারণা নাই; শুধু নাসিকা সক্রিয় আছে! শ্বাস লইতেছে, তাই তাহারা শুকিয়া অন্য কোন গল্প বাহির করিবে।

এখন ইহা সকলের নাসাপুট, ঐ উপলক্ষ্যের বেশ তফাৎ থাকিয়াও, চমকিতেছে; নাসাগহ্বর বর্দ্ধিত হইল। এই দুঃসময় ক্রমে নাসাগহ্বর অস্বাভাবিক বড় হইয়াছে, নাসিকা ক্রমে যে মমত্ব বোধ, তাহা বড় প্রাচীন; অদ্ভুত নিরাকারকে অবলম্বন করিয়া আছে; ঐ আদি অন্তহীন মমতা উহাদিগের মধ্যে এখন খেলিতে আছিল, উহাদের রোমকূপ সকল কণ্টকিত হইয়া হাঁইয়া গেল, মুখ সকল উন্মুক্ত হইল; উপস্থিত জিজ্ঞাসিল, আহা শেষে কি ঐ ভূমিলুণ্ঠিত মেয়েছেলেটি অচিরাৎ গঙ্গা পাইবেক, আর দেরী করিও না, সত্বর জলের ছড়া দাও, ছড়া দাও, মুখে ভাল করিয়া জল সেক দাও।

যে এতেক বচনে যদিও নিজেদের স্বর, তাহারা চমৎকৃত হইল, বেশ বুঝিল নিজেরা বেশ ধীর আছে, এবং উহা আজ্ঞা মানিল; সমবেতর চাহনি শায়িতে আকৃষ্ট; মেয়েছেলেটি, যাহার হাতে ঐ আয়না দেওয়া চূড়ী, এখনও যে নিশ্চতন রহিল, তদীয় মুখমণ্ডল রক্তিম! ইহা বলিলাম অর্থাৎ রক্তিম লিখিলাম, ইহা স্ফীত, তাহার দেহ চমকাইত, যেহেতু অচেতন দশার মধ্যে আশ্চর্য্য তাহার বোধশক্তি ঘাঁত খাইতেছিল সেই হাভাতেদের মারাত্মক পদবন্ধে।

তাই ইহার পক্ষে স্বাভাবিক এমন কথা ভাবা এবং বলা, অবশ্য যাহা এখন হইতে বেশ কিছুদিন পরে ঘটিল, যে, তোমরা কি তবে আয়নাতেই রহিয়া যাইবে! উহা বড় নিষ্ঠুর স্থান উহাতে শুধু শব্দ, জনশ্রুতি, বসবাস করে! আমার সহিত আসিবে না? ইহার পর এমত স্তোভ থাকিল, যে সে কি একাই ঐ বিশাল আয়না বিয়ান সংসারে, জগতে, একা যাইবে? বিয়ান শব্দটা ঠিক না, বরং ইহা ভাবিতে তাহার শ্বাস আটক হইল।

ইহারই পক্ষে, এই মেয়েছেলেটির, ইহা সাধারণ যে, সে একটি চূড়ীর, যাহা মেলার স্মৃতি, ভাঙা টুকরা বড় মায়াতেই আপন ট্যাঁকে রাখিবে! অন্য খুঁট হইতে নিজেরটি খুলিয়া সে যখন একা, নির্জ্জনতাতে, তখন ঐ টুকরার প্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসিল, হে সত্যযুগের আয়না আমাদের ভোগান্তির শেষ কোথায়?

ইহারই পক্ষে খুব মাত্রায় সহজ যে সে পর্য্যন্ত ঐ রুগ্না, ফুলিয়া উঠিয়াছে দেহ যাহার তাহাকে, যে মরণ ভয়ে আছে, পঙক্তির আঁচল বাঁধা লাইনের ইতিমধ্যে আসিবার সুযোগ দিবে না। এবং সে বলিয়াছে, তুমি যে দলে ছিলে সেই দলে যাও, ভাল আব্দার! তুমি দুদিন পরে মরিবে কি দশদিন পরে আমারে শোনাও কেন...আমি আমার স্থান ছাড়িব না, অনেক পাপে এ গতর তেমন শুকায় নাই, তাই মনে হয় বেশ আছি। এবং সর্ব্বক্ষণ ঐ মেয়েছেলেটির আতঙ্কে আছে, কেননা ঐ শেষস্থকে তাহার ডাইনি মনে হয় যেহেতু সে তাহার হাত কামড়াইয়াছিল। সেই ঘটনা মনে আসিলে পেট জাঁতাইয়া উঠে।

উপস্থিত এখনও সেই হয় সাড়হীন। ইস্ কি বা অনর্থকারী ঐ ভিক্ষা মাঙ্গিবার কাতরোক্তি। যাহার ঝাপ্টাতে সে জাগ্রত থাকার কৌশল। অন্যদের হইতে সে নিশ্চয়ই ভিন্ন রকমের তাই তাহার পক্ষে আজব যাহা অর্থাৎ আশাতে থাকিবার নামমাত্র বৃত্তি পর্য্যন্ত হারাইয়াছে। আর সকলে তাহার ইত্যাকার অবস্থার সমক্ষে উপস্থিত জড়, শুধু মাত্র মাথাগুলি স্বল্প নড়িতে আছে, ঐ মেয়েছেলেটির চূড়ী শোভিত হাত মাটিতে যেমত যায় আসে নড়িতেছিল। সহসা বহু পুরাতন স্বভাবে মুখিয়া উঠিল, এবং প্রত্যেকেই এমন ভঙ্গী করিল যে তাহারা নিবিষ্টভাবে সুচে সুতা পরাইতে আছে। অথচ তখনও ভুঁয়ে ঐ

মেয়েছেলেটির দেহ লুটাইয়া ছিল।

এবার আপনকার জীর্ণ প্রায় কাপড়ে, সেই রুগ্না, যাহার দেহ ফুলা, সামাল দিয়াছিল, এবং সে ঐ রকম কাপড়টি সাপটিয়া কোমরে বাঁধিল, হাতের নোয়াতে আঁট দিতেই, ইহা নোয়া! মননে ম্লান চক্ষুর্দ্বয় ত্বরিতে সরাইল; আঃ এখনও এই সৎস্বভাব আছে! এবার এক আঁজলা জলেতে হাত ধুইল, এবং তৎক্ষণাৎই সে অবাক থ হইয়া রহিল; বসিয়া আছে ত বসিয়াই আছে; কেহ তাহার কানের কাছে, কতশত জোৎস্নার কথা নিশ্চয়, ভাবিতেছে; সব নিশ্চয়, ঠিক জীবনযাত্রার আছে, যদি তাই নহে, তবে সে সেবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইল কেমন করিয়া! এবার তাহার গাত্র সিঞ্চিড়াইল সে কাজে লাগিল; যে এবং খুব হুঁশ আনিবার কারণে, অচেতন যে আছে তাহার কপালে ফোঁটা কয়েক জল দিল।

এই মেয়েছেলেটির হুঁশ আনা খুব খুব দরকার; সে বড় খাসা হাসিতে পারিত, এই ঘটনা তাহার কণ্ঠ যেমন তেমনটি আর কাহারও দ্বারা বলা হয় না, যে, সবে বড়ি কটি দিয়া উঠিয়াছি অমনি কাক! এমন মসৃণ করিয়া বলে!

তখন বৃক্ষ সকলে পাতা ধরিত!

যে এহেন শীতল জল স্পর্শে এই ধড় এতাবৎ জ্ঞানহীন যাহা, যাহারে আমরা, বিশেষত এই দাস, মূর্ত্তিমতী উর্ব্বরদা আখ্যা দিবে, যাহার নিপট লক্ষণ সমুদয় ঐ দেহ; ইহা যাহা কশ্চিৎ অন্যমনস্কতা হইতে দূর বৃক্ষ অবধি প্রসারিত হওয়ত এক মোচড়েই খোদ্ প্রকৃতির ইতিমধ্যকে ছাপাইয়া ফেলিয়াছে—ইহা পরম মৃত্তিকাত্বর চাকচিক্য হইয়া আছে—কি বিপুল গর্ব্ব বা। জল স্পর্শেই তাহাটি স্পন্দিল এবং সঙ্গেই বিহ্বল জড়ভূত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নড়িল। এখানেই সেই বৃদ্ধের গীত অনন্য বাস্তবতা চেহারা লইয়াছে।

আঃ লোকাচার, লবণের ঘর হইতে উত্তর করিতে আগ্রহী হইল!

যাহার দেহ ফুলা, যাহারই নাসা গহ্বর মৃত্যুকে পথ দিবার জন্য ক্রমান্বয় হাঁইতে আছে; সে আপনার নোয়া, জল সেক দিতে, নিরখিল, হা সে বিয়ের ফুল ফুটিয়াছে কথাটি জানিত। বিয়ের জল কি মদীয় গায় পড়িয়াছে!

সাবধান কানে জল না প্রবেশ করে, এইপ্রকার উক্তিতে তখনই ভাবিতে হয়, হায় এই আকালগ্রস্ত দেহের ভিতরে বাহিরে এখনও কত স্থান বাকি আছে যাহা যন্ত্রণা পাইবে! দেহ শুকায় হাঃ যাতনা বোধ শুকায় না কেন? এবার নিশ্চেতন যে তাহার ওষ্ঠ ক্রমে বিভক্ত হইবার স্পন্দনে রহে পরিলক্ষিত হয়, কণ্ঠও ইহা সুস্পষ্ট যে উঠে ও নামিতে আছে; সকলেই বেশ কিয়ৎ আশ্বস্ত হয় এইতে; যে এবং নিজভাবে প্রতিতেই বাঁকিয়া ঐকে, ধরা শায়িত যে, বর্ত্তন আন্দোলনে, হাওয়া দিতে মধ্যেই যুগপৎ বাম হাতের আঙুল চিতাইয়া ঐ গলিত আপ্লুত মাঙ্গিবার ধ্বনিকে আটক দিতে আছিল!

যে এবং ঐ দরজার প্রতি নজর করিতেই বেচারীরা আঁৎকাইল, কেননা বেশ নেহারিল, উহাদের দ্বারা 'ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হোক' সাবেক পদটি তচনচ হওয়ত মাটিতে; তাহারা ইস্ বলিয়া উঠিল; ঐ পদ লইয়া সেদিনও তাহারা কথা কহিয়াছে; কেহ মন্তব্যিল, 'ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হোক' কথাটা বেশ!

ঠাকুর করুন আমার শত্রুকেও যেন উহা কোন সূত্রে বলিতে না হয়।

আমাদের ঐ কথা লইয়া সময় নষ্ট করিবার প্রয়োজন দেখি না।

আমরা এমনই করিতেছি—ইহা গল্প ত!

বৃথা করিতে নাই, উহাতে ভাগ্য মন্দ হয়।

উহা জাত ভিখারীর কথা আমাদের উচিত নয়।

ঐ শব্দরে বালখিল্যভাবে হাত দ্বারা তাহারা আটক দিতেছিল এখন, যদিও অনুমানিয়াই নিশ্চয় করিল যে, 'ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ' কথা চুরমার ও তাহা দর্শনে সংস্কারবশতই কিছু ভাঙ্গিলে যেমন, ইহাদের লাগিয়েছে; এই কারণ যে প্রকৃত প্রস্তাবে বরং ঐ বাক্যতে ইহারা থুতকুড়ি কাটিয়া থাকে, অন্য পক্ষে ভয় তেমনই পায়।

অবশ্যই ইহাদের মধ্যে কাহারও মনে সেদিনকার ঐধরণের বাক্যালাপের ঘোর দেখা দিয়াছিল; এবার সকলেই কহিল, সেই কথার জন্য ভগবান আমাদের ঐ ভয়ঙ্কর কথা শুনাইলেন, ঐ দরজাস্থ রোল! তাহারা একে অন্যের চোখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল, যে সেখানে চোখে জল আছে কিম্বা না;

এবং জানিতে ধিমে গলায় চাহিয়াছে, আমাদের কি হইবে! এবং আমরা কি ঐ পল্‌কা ধনে পুত্রে কথা দ্বারা ঐ কদর্য্যতা হটাইতে চাই, হা কপাল!

এই মুহূর্ত্ত হইতে, ভবিষ্যতে কখনও কি ঐ সুন্দর আশীর্ব্বাদ বচন বলিতে কোন ভিখারীকে দেখিবে? বা ইহাদের, ঐ মঙ্গল কথা, স্মরণ উজর হওয়ত স্বপ্নকে বিভ্রান্ত করিবে। স্বপ্ন ইহাদের নাই, স্বপ্ন এই মহলেই নাই; স্বপ্ন এক সভ্যতার, ইহা এখান হইতে বিশ ক্রোশ দূরে সেখানে যে সকল গ্রাম যেখানে শুধু বামুন কায়েতের বাস, সেখানে নারীপুরুষ শিশুরাও স্বপ্ন দেখে; স্বপ্নে পর্য্যন্ত যদি খারাপ ভবিতব্য প্রত্যক্ষ হয় তখনই মানসিক করিল, পূজা দেয়!—

তাহারা বরং এখনই মরিবে, ইস্ ঐ কথা! ইস্ কি ভীমকর্ম্মা বিকট!

এখন তাহারা যেখানেতে আছে, ঘুমাইয়াছিল, সেই স্থান ভেড়ী পথ; চারিদিকে ফাঁকা, কেননা জলস্তর; যে বৃক্ষগুলির কিয়দংশ জল হইতে উঁচু হইয়া আছে, নিত্য প্রকৃতির গোঙান শব্দ বিস্তারিছে; ইতিমধ্যে ভেককুলের ডাক নিস্তব্ধতার অঙ্গ হইয়া গিয়াছিল; অবশ্য কখনও বৃক্ষস্থিত শকুনের তিলেকের জন্য ডানার, সামঞ্জস্যকারী, আওয়াজ ঘটিয়া উঠিতেছিল। তাহারা ঘুমের মধ্যেতে কোন বাক্য শুনিতে আছিল; ইহা খুবই অস্পষ্টর, ইহার এখনও কোন স্বতন্ত্রতা ছিল না।

তবু এক বিশেষ সময়েতে প্রতিজন জাগিল; উপরেতে আকাশে কালো হইয়াছিল; সবাই বুঝিল তাহারা মাটিতে আছে, কি এক কথা এবং এখন অনুভবিল যে এতাবৎ শুনিতে আছে; ইহা মানুষের কণ্ঠস্বর! যে ঐ স্বর কোন দিক হইতে আসিতে ক্রমাগত আছে, ইহা ঠাওরাইতে প্রতিতেই মাথা ভূমি হইতে উন্নীত করিল, চক্ষু সকল শক্ত; অবিন্যস্ত কেশরাশি যদি বিরক্তির, যদি মুখে চোখে; তৎক্ষণাৎই জবর ফুৎকারে হটাইয়াছে, আর তখনই হাঁপাইতে থাকা অবস্থাতে, বুঝিতে চেষ্টা করে; যে কোন দিক হইতে উহা ঐ স্বর আসিতেছে। এবার কান সকলের স্থান যে দিকে ছিল, পরিবর্ত্তিত হইতে থাকিল। ফলে একে অন্যের উপরে দেহ তুলিয়াছে। এমত সময় ঐ স্বর, অক্ষর স্পষ্টতা লাভ করিল, যে, ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ হউক। আধা অনুনাসিক উদ্ভট গুণগুনানো উচ্চারণে!

এবং পদটির সহিত, প্রতিজনে, এক প্রচণ্ড ঝটকা টান রক্তে মজ্জায় জানিতে পারিল; ঐ বচনটি মহাকাতরতায় খেলিয়া উঠিতেছে, এবং শ্রোতৃবর্গ পরিষ্কার বুঝিল ঐ উল্লিখিত টান ঐ বচনটির মর্ম্ম হইতে আসিতেছিল; ঐ টানকে বাধা দিবার কোন বুদ্ধি তাহাদের নাই; রুখিবার শক্তি হৃত হইয়াছে; তাহারা কান ফিরাইতে কোন মতে চেষ্টা আপ্রাণ করিল; সদ্যপ্রসূত কুক্কুর শাবক তুল্য একে অন্যের ঘাড়ে গিয়া পড়িল; বস্ত্র! লণ্ডভণ্ড, একে অন্যরে আঁকড়াইতে ছেলেমানুষের প্রায়; স্ত্রী পুরুষ ভেদ নাই, নিষ্পিষ্ট হইতে আছে এমন বোধ নাই, সেই, ঐ টানরূপ বিভীষিকা শুভেচ্ছা স্বরে ভর করিয়া আসিতেছিল।

সেই ভিখারীর কণ্ঠস্বর না জানি কত হাজার বছর পার হইতে, ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ হউক! হামা দিয়া আসিতেছে, কত কাঠে, কত বা পাথরে লাগিয়াছে, রাজা যুধিষ্ঠির নিজে শুনিলেন! তবু এখনও অমোঘ টান আসিতেছে।

একে অন্যকে জিজ্ঞাসিল, টানিছে কে যেন, না?

কি ভৌতিক!

আমাকে ধর ধর আমি টানে বোধ হয় ভাসিয়া যাইব!

কোটালের কোটি গুণ!

এ কি দ!

সমাল সমাল।

এস জড়াজড়ি করিয়া থাকি।

এখন তুমুল বেগে বৃষ্টি নামিল, কিন্তু ঐ ভয়াল শুভেচ্ছার কোন কমতি ঘটিল না, এতটুকু নহে! তাহারা ক্রমে সকলেই শ্লথ কমজোরি হইয়াছে, আর প্রতিহত করিবার কোন উপায় দেখিল না, চোখ থাকিয়াও নাই; ক্রমে কর্দ্দমাক্ত হইল, একে অন্যকে গাল পাড়িতে লাগিল, কাদা ছুঁড়িল! আর একের দোষে ইহা, আমি নহে তুমি! তোমার দোষ! কেন কথা শুরু করিলে; কেননা কিছু আগে এখানে গল্পে সূত্রে, মেয়েলী স্বরে বর্ণিত হইতেছিল পীরের সেবা যাহারা লইতে আসে তাহারা হাটুরে ভিখারী নয়!

তাহারা গৃহস্থের মঙ্গল করে! পাঞ্জা থাকে, দেখ না!

বেশ গীত গায়, বিপদ উদ্ধার কর দয়া সত্য পীর এবং এই গান আর এক মেয়েলী স্বরে খেলিয়া উঠিল, ইহার সহিত অন্য মেয়েছেলেরা গলা মিলাইয়াছিল।

আমি কিন্তু ঐ ভিখারীগুলিকে দেখিতে পারি না, ঐ যাহারা আশ্বিন কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ পৌষ মাস অবধি আসে, একটি গীত নাই, কিছু নাই, শুধু ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ হউক বলিয়া বেড়ার ধারে দাঁড়ায়! গৃহস্থের ভাল মন্দ মানে না, অসুখ বিসুখ, নোংরা হইয়াছে মেয়েছেলের নিকট হইতে ভিক্ষা লয়। নোংরা বিচার ইহাদের মধ্যে চল নাই, ইহা উচ্চবর্ণদের, ইহারা কোন সূত্রে শুনিয়াছে।

আমি জানি তাহারা গৃহস্থের দায় অদায় মানে, অমন কথা বলিতে নাই সে কি ইচ্ছা করিয়া ভিক্ষা করিতে বাহির হইয়াছে।

আমার কিন্তু কথাটা বেশ, আমার বেশ লাগে, সিঁদুরের মতন জ্বলজ্বল করে! ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হউক!

ভাল ভিখারীও আছে!

যদি পছন্দ ঐ কথা তো বললেই পার।

তখন কেহ বক্তাকে সচেতন করিতে কহিল, ছিঃ ছিঃ এমন কথা পরিহাস ছলেও বলিবার নয়, এমন করিয়া বলে!

বলিলেই ত হইয়া যাইতেছে না, এখানে ভিখারী শব্দটি ইচ্ছাক্রমে চাপা হইল।

ইহা ত রগড়! আদতে কথাটিকেই যাচ্ছেতাই করিতেছি।

তোমরা কি ভাবিয়াছ আমরা চাই যে ভিক্ষা মাগিয়া যায়? আজ সে নয় ভাগ্যদোষে, হা অন্ন কথাটা উহ্য রহিল, এখানে ফিরিতে আছে! এই প্রকার বাক্যে বক্তার চোখের দৃষ্টি সুদূর প্রসারী হইল! এবং কপালে সকলে হাত ঠেকাইল।

বটেই ত, আবার ঠাকুর মুখ তুলিয়া চাহিবেন!

আমাদের ঐ সব কথাতে কি দরকার।

হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা দুটি জিনিষ মনে রাখিয়াছি, ফকির এবং বাড়ী ফেরার পথ।আবার আমরা ফিরিয়া যাইব। যে ইহা বলিল, সে এক চাযাকে দেখিয়াছিল হাতের কাস্তে হঠাৎ ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে কাঁন্দিতে।

একটু গঙ্গা জল থাকিলে আমি ছিটাইতাম, ইস্ কি সব এঁটো.কাঁটা লইয়া কথা হইল।

কিন্তু ঐ কথাটাতে গৃহস্থের মঙ্গল হয়! উহা ত আশীর্ব্বাদ!

এখন তুফান ছোটা বৃষ্টির মধ্যে, সকলেই প্রত্যক্ষিল ঐ আশীর্ব্বাদ বচন মনুষ্য শরীর লইয়াছে, এ শরীর আধা দারগা আধা হাটুরে ভিখারী, সেই উত্তটত্ব তাঁহাদের টানিতে আছে; ইহারা যে যেমন অবস্থাতে ছিল, বড় বেদনাতেই কাঁন্দিতে লাগিল, উচ্চৈঃস্বরে কহিল, কখনও ত হেলে মরিলে মুচিকে খবর করি নাই, কখনও গোসাপ বধ করি নাই, তবে কোন সে পাপ! এবং অদ্ভুত হাস্যকর ঠোঁটে উচ্চারিল, আমরা বাড়ী পথ ভুলিয়াছি! যে এবং আরও ঘোরে বিদ্‌ঘুটে করিয়া নিজেরাই আবৃত্তি করিল, ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ হউক!

যে বেচারীরা তরাসে জিহ্বা প্রলম্বিত করিল, কেহ ঐ বৃষ্টির মধ্যে হাত ঘুরাইয়া তুমুল কণ্ঠে আহ্বানিয়া বলিল, চল বরং আমরা তুফানের নদীর নৌকা আশ্রয় করি, এ পৃথিবী বেজাতের! হা চল বরং আমরা কোটালের খাতক হইব; সেই বরং ভাল চল আমরা সুমহৎ বৃক্ষে জাপটিয়া রহিব, সেই বরং খুব ভাল যে আমরা পুকুরে হাঁড়ী মাথায় ডুবিয়া থাকিব।

হায় বেচারীরা, তাহারা যে কাঁন্দিতে আছে তাহাও বুঝিবার খেই নাই, এখন বৃষ্টি হয়। পুনরপি, আর্ত্তনাদে বিলাপিল, আমরা ঠাকুর কোটি জনম নিঘিন্নে, কোটি জনম অনাহার আমাদের বুকে বাঁশ ডলুক! আমাদের ভিখারী হইতে যেন না হয়!

এখন শায়িতা মেয়েছেলেটির হাতে যে ঐ অভিনব চূড়ী, সেইখানি প্রায় তদীয় মুখের একপাশের সমান্তরালে আসিয়া রহিল; তৎসঙ্গেই মুখের একটি পাশ ঐ চূড়ীতে ওতঃপ্রোত হইল; কত না অল্প

খানিক ভাগে, ভাগ পরম্পরাতে, সে আছে, প্রতিটি আয়নায়, ইহাতে পরম মনোরমত্ব বুদ্ধি প্রাকৃতজনেতে আভাসাইল; আঃ আমাদের কি ছেলেমানুষ না করিত আগ্রার শিশমহল; একই, অজস্র প্রতিবিম্বিত হয়, তবু আমরা ঝঞ্ঝা হইলাম না; ভয়ের কিছু নাই! যখন আনার খাই তখন অসংখ্য তাহা, কোটি কোটি সেল, তাহাতে বিপরীত চাপ নাই! মদ বা আরকের ফোঁটা অসংখ্য বিন্দুতে প্রতিভাত কিন্তু প্লাবন হইবার নহে!

এখানে ঐ মেয়েছেলেটির মুখপাশ, সুচতুর ভগ্নাংশ সকল আর্শীতে, চমকপ্রদ মোজাইক করা মুখ আমরা দেখি, ঐ মুখের এই উৎকট বিজাতীয় বাস্তবতার এই আকালের সহিত মিল নাই, অথচ স্বপ্নের ইহা নয়; এহেন রূপ যাহার সে কি জানিত ইহা লিখিত আছে যে অমুক দিন, এই সময়, এইরূপ প্রাঙ্গণেতে, চাঁদ তারা উৎকীর্ণ বাড়ীর, ইত্যাকারে ঐ চুড়ী ভাঙ্গিবে, ও কণ্ঠ লগ্ন মাদুলী দুলিবে! হায় যাহা এইখানে ভাঙ্গিল না ঐ সর্ব্বনাশা মাঙ্গিবার কথা শুনিয়াই; ইহা বিড়ম্বনা।

বেচারীদের কেহ, যাহাদের মুখে খড়ি উঠে, অসম্ভব সাতবাসৃটে ফ্যাকাশে হইয়াছে, যাহারা অজ্ঞান হওয়া মেয়েছেলের নিকটে আছে ও শুশ্রূষা জন্য, এক হাতে সেই অমানুষী উক্তিকে থামা দিতেছিল; এখন তাহারা এই বহু পুরাতন ধনে পুত্রে ইত্যাদি আশীর্ব্বচন দ্বারা কি ঐ বিকটত্বকে হটাইতে পারিবে, আশীর্ব্বচন অনন্য উপায়ে ভাবিল, অন্তরে যাহা ঘৃণা করে। অতিবড় শত্রুও যেন না বলে!

এ বিষয়ে বলিবে, যদি উহা কাঠ তবে এই বচনে আগুন দিবে।

যদি আগুন তবে জলে নিভাইব!

যদি জলে তবে পা ধুইব।

দরজাস্থ, কুৎসিত ফুকারিয়া উঠা ফেন দাও হইতে এই পদ ধনে পুত্রে যথেষ্ট মনুষোচিত।

তখনই আঁচড়াইল ইহা কি সম্ভব! ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ হউক কথাটি ঐ বীভৎস আওয়াজকে ঠেকাইতে পারিবে, ইহা বড়বাবু, এ কথা বড় প্রাণের; মৌখিক উচ্চারণ ইহার নাই, উক্ত হইতেই মনের যোগ হয়! দেখা যাইবে তৎক্ষণাৎ আড়পারে অক্ষয় সিঁদুর পরিহিত সংসার উজরিল। যেখানে ক্ষুৎপিপাসা কাতর গভীর ডাকেতে—যাই মা যাই বলিয়া উত্তর হয়।

ধর্ম্মাবতার ইহারা আর কত মলিন হইবে, এই সহজ মোটা সরু, কম বেশী, ছোট বড়, আলো আঁধার, গরম, বাঁকা সোজা, সম্মুখ পশ্চাৎ ইত্যাদি বিবিধ জ্ঞান হইতে কোথায় ইহা সকলেরে খেদাইয়া লইবে। হায় অনেকদিন হয় পেটে হাত লাগিতে ইহারা চমকাইয়াছে। একজন বলিয়াছে, আমি শালা খোট্টা আমার খিদে নাই।

আমি তাহলে শালা ইংরেজ!

আমি শালা পাথর!

আমি শালা জল মাটি কাদা!

আমি আমি আগুন সব খাই! ইহা নারীকণ্ঠ।

ভাতার পুত সব সব!

ঠাকুর আমরা দুঃখের খাতে বাস করিব, আমরা জন্ম জন্মান্তর বিকলাঙ্গ হইব, আমাদের পরিবারের গর্ভের বদনামী শিশুকে আদর করিব, মেঘ ডাকিলে অভয় দিব, মেঘের আওয়াজ শিখাইব। পিতৃ ঋণের সুদ দিতে সর্ব্বস্ব খোয়াইব! কোটি জন্ম বায়ুভুক হইব। তবু আমাদের নজর তারা হইতে বিচ্যুত হইবে না, তাই তুমি কর যেন আমরা ভিখারী না হই! মহা নগরে জন্মাইব সেও স্বীকার, কিন্তু ভিখারী বৃত্তি লইতে দিও না!

ঠাকুর ইহা কি বিচারে লইব, যে যাহাদের এবম্প্রকার হাল, ইত্যাকার; বাক্যস্ফূর্ত্তি কি উহাদের খুব গভীর তামাসা বোধ হইতে প্রসূতিল! এখানে তাহারা সকলেই, ঐ নির্দ্ধারণ সূত্রে, জবর হাসিতে যাইয়া বেসামালিয়াছিল! কাহারও শিরঘূর্ণন উপস্থিত হইল; মেয়েছেলেরা লাট খাইয়া ভুঁয়েতে পড়িল; যন্ত্রণায় কেহ আঁ শব্দ করিল! ইহা যদি উহাদের পাপে হয়, ইহাই সত্য, তবে এই জন্মই উহাদের শেষ হউক! ইহা যদি প্রকৃতির খলতা হয় তবে সে প্রকৃতি বিজ্ঞান রাক্ষসের আস্ফালন শুনুক। ইহা যদি ইতিহাস

পোষ্টাই হয়, তবে সেই ইতিহাসের মুখে নুড়ো জ্বালিয়া দিব।

হায় ঐ ফেন দাও পদটি শ্রবণে, যাহাতে চূড়ীখানি আপনা হইতেই শত খান হওয়া উচিত ছিল! এখন মাত্র এই চূড়ীখানির সাক্ষ্য দেয় যে সে এবং সকলে, যেহেতু অলঙ্কার বুদ্ধি আছে—কোন কালেই, জন্মেই অনাহারে কাটাইবার জন্য জন্মায় নাই, হায় ঐ চূড়ী ভাঙ্গিবে এবং এই কূট বাস্তবতার সহিত মিশিবে! তখন জলে জল!

এই ছিল যে ঐ চূড়ী, সৌখীনতা ভাঙ্গিবে; যদ্দ্বারা সন্ধ্যার দীঘির যাহা কিছু তন্ময়তার, যাহার প্রকাশ, ঐ চূড়ীখানিতে, তাহা চুরমার হইবে। রক্তে উহার পরিবর্ত্তন আরম্ভিল; পদ্ম ও চারি পাড়ে তালবৃক্ষ ব্যতীত যে জন দীঘি কল্পনা করিতে পারে না, সেই ভাগ্য মরিল; ক্রমে পদ্ম সকল অদৃশ্য হইল, পাড়স্থ তালবৃক্ষ আর নাই; এখন শুধুমাত্র জলাশয়; অতএব ইহার সহিত কথা কওয়া যায় না; এক পঙক্তিতে বসা চলে না! রক্তের পরিবর্ত্তন কোন শিরাকে সঙ্কুচিত করিবে। অবশ্য যদিও এখনও চূড়ী পরিহিতা আছে। এহেন যে সে আমাদের ব্যাখ্যাতে অলৌকিক ক্লাসিসিজম—নিশ্চিত যে আপনাকে ভগ্নাংশ নেহারিতে, ঈষৎ ভয়, এ ভয় ছোট ক্ষণেকের ইতস্তত অবস্থা বৈ অন্য অপেক্ষা নাই—নিজেরে দেখিয়াছে।

এখন কৌতূহল আছে; সে দেখিতেছে কিন্তু কিছুই শুধায় নাই!

ঐ সেই আয়না যেটি টুকরাকৃত হইবে তাহা সে, এই শরীর, সেই নির্দ্ধারিত গ্রাম হইতে তখন বহু দূরে, ইহা জানিত না। এ দেহ সাধারণ ভোগান্তি হইতে তখন অনেক দূরে, সাড়হীনতা তবু তাহার, উহারই মধ্যে, আয়না কারণে মায়া রহিবে, যে এবং তখন যখন কুড়াইতে যাইবে সেই সময়তেও।

ইহা ধ্বনিত হইবেক, উহা কুড়াইও না।

সে কুড়াইতেছিল।

উহা কুড়াইও না, ভাল যে উহাতে আমরা আর গল্প হইব না; কুড়াইও না, আহা উহা যদিও মুখের তা নহে এই কথা যদিও মন ধারণী যে প্রকাশে নাই, তবে তাহারা হস্ত সঞ্চালনে ঐ সাবধান মুখের তা জানাইল; এই শব্দটির সম্বন্ধে কি যে বিস্তারিত তাহাতে মূর্খ রহি; অথবা মহা অভিমানে উহা কহিব না, আহা বড় দুঃখ চেটে স্বর উহাতে উচ্চারিত হইবে; এমনকি মণি মুক্তার পরিহিতার দ্বারা উক্তিতেও উহার কিঞ্চিৎটুকু সেই মমতা, কষ্ট, স্নেহ, নষ্ট হইবেই না, ও মা উহা যে মুখের...এ কি করিলি পর্য্যন্ত শ্রুত হইবে! দুঃখিনী মাগো! কলসের জলে তোমার চিতাভস্মরাশি বিক্ষুব্ধ হইতে আছে এই দেখি, আঃ ঈশ্বরচন্দ্র আঃ মধুসূদন আঃ বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের বাঁচাও।

সেই মেয়েছেলেটি যে ভগ্নাংশ, অথচ যে সম্পূর্ণ! এবং মীমাংসার ইহার যে যখন আদর্শের নিকটে তখন তদ্রূপই ভগ্নাংশ আয়নাগুলি যদিও ব্যবধানে স্থিত তখন, সেখানে সে অসংখ্য হইয়াও পুরা কেমনে।

আমরা দেখি, ইতিমধ্যকার বাদ জায়গা লুপ্ত হইল, অথবা এমনও তর্ক হইবার যে ঐ বাদ জায়গা প্রতিফলিত মুখেতে মিলিয়াছে, বা আয়না ও বাদ জায়গা এক হওয়ত একটি অন্য সংজ্ঞা; ঈদৃশ অনেক কিছু মতান্তর হইবে, প্রতিবিম্ব এখন এক আলেয়া রহস্য শোভা ধারণ করিল, আমাদের মুখ অর্দ্ধোন্মুক্ত আছে, আমাদের আঃ মাধব আঃ ঠাকুর, মাগো, আমরা এমন কি পুণ্য করিলাম যে তুমি আমাদের এই অলৌকিকতা দিলে। আমরা নিজের পদচিহ্নে অবাক হইলাম, উহারে ব্যাধি হইতে নিছক উজ্জ্বলতায় আনিলাম; এখন আরোপ শিখিয়াছি, টোন বুঝি এখন।

এই জনের মুখে জল সেক বেশ কাজ করিল, রক্তিমতা! বা স্ফীতি তথাদি বিকার, হ্রাস পাইতে আছে; এই লাগিয়া সকলেই আপন দেহকে সটান রাখে নাই, হাওয়া নিমিত্ত বর্ত্তন আন্দোলন থিমাইয়াছে; যে এবং এই সময়ে বিবিধ ভাবে নিষেধ বা অনুরোধ করিতে হস্ত ভঙ্গী থামিয়াছিল; অবশ্য ঐ দূরাগত মাঙ্গিবার ডাকের কোন তারতম্য ঘটে না।

এবং এই সময় দুই চার বিন্দু জল শায়িতার অধরে ঠেকিতে সে জিহ্বার দ্বারা উহা লেহন মাত্রই, হঠাৎ নিঃসাড় ভাঙ্গিল; সে বড় অসহায় যে, এমনই কাতরতা মুখে পরিলক্ষিত হইল, তখনই বিকট শব্দে কিছু উদগীরণ করিতে বেদম আলোড়নে দেহ উর্দ্ধভাগ চক্কর দিল!

ইত্যাকার লক্ষণ উপজিল যে, সহজেই বুঝায়, যে সে আপন অভ্যন্তরে যাহা কিছু আছে তাহা

উখাড়িয়া আনিবেই; গাত্র বাস বটেই এখন যেটুকু ভাষা লজ্জার হইল; আয়ত চক্ষুর্দ্বয় ঠিকরাইয়া বাহির হইবে এমত! কেহই, যাহারা এতাবৎ বাঁচিয়া আছে! ঐরূপ দশার নিমিত্ত প্রস্তুত ছিলই না; বৃদ্ধ গীত রুখিল; কেহ মন্তব্যিল, কি পাপ! এবং প্রত্যেকেতেই, ঐ উদ্গারে ধমকে বাঁকিতে আছিল, উক্ত একই ক্রিয়া চলিতেছে বুঝাইবে; এবং তৎসহ ইহাও ধোঁকা লাগিবার যে সমবেতরা এইরূপ অভিব্যক্তি করত ঐ আর্ত্তকে টিট্টিকারিছে।

যে মেয়েছেলেটি পুত্রবধূকে গঞ্জনা দিল, সে উঠিয়া দাঁড়াইল, ও ছেলেখাগী তোর আবার একি হইল রে। কিবা খাইয়াছিলিস; এতেক ন্যাকর কেন লো, এমন বারোমেসে পোয়াতি ত জন্মে দেখি না। ইহা প্রসঙ্গত শ্লেষ হইলেও, ব্যাজস্তুতি মানিতে আজ্ঞা হয়। এইটুকু বলিতে পারার মধ্যে, বক্তা নিয়ত জ্বালা হইতে ছাড় পাইল; আবার এইতে মহা আত্মতৃপ্তিতে, গরিমাতে, চারিদিকে চাহিয়া প্রকাশিল, ওরে ভাল খাগী, ওরে আমাকে একবার বল্‌লি না, যে তোর গতরে...ব্যথা উঠিয়াছে; এখন! ও আমি তখনই বুঝিয়াছি, তুই কেন খোলাম কুচিগুলি চিবস্, পাতাখোলা তুই পাইবি কোথায় (পূর্ব্বেতে পোয়াতি সকলের দাঁত যখন শুকাইত তখন পাতখোল চিবাইত, খোলাগুলি খুব পাতলা বেশ ভাল ভাবে পুড়ান)। চিবইতেছিস্ ত চিবইতেছিস্! বচনের সহিত আপন হস্ত দুইটি সোজা ঊর্দ্ধে তুলিয়া নৃত্যপর হইল, ততঃ কহিল মরণ দশা এই হাট লোকের মাঝে মাগী বিয়াইবি কি করিয়া! তোর কি কোন হায়া নাই, চল চল মা ঢেঁশকেলে চল। আমি একা খালাস করিতে পারিব রে। নাড়ী কাটার তরে পরোয়া নাই, আমার নখ আছে!

বেটাছেলেরা এতৎ বাক্যে ভারী রুক্ষ আতান্তরে নিক্ষিপ্ত হইল; এখানে একে অন্যের মুখপানে লক্ষ্যিল, কিন্তু জিজ্ঞাসা নাই; ইহাদের নজরে অল্পবয়সী বালক, যে স্তম্ভিত আছে, ওতঃপ্রোত হইতেই, বাঁকাচোরা স্বরে তাহারেই ধমকাইল; ঐ দিকে কি দেখিস্! তুই কি! এবং নিমেষেই ইহারা যথার্থ বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইল!

এ সময় সেই ধাই উক্ত প্রকারে হস্তদ্বয় সটান উর্দ্ধে তুলিয়া তালি দিতেছিল; যদিও ভূমিতে ঐ বীভৎসতা, তবু এবম্বিধ অঙ্গ ভঙ্গী যারপর নাই মনোজ্ঞ; এবার যে, কোন ছন্দে দেহে ভাঙন খেলিবে তাহার কৌতূহল সূচনা করিয়া থাকে, ফলে ঈদৃশ মুহূর্ত্ত বড় সভ্যতা; যাহারা দেখিবে তাহাদের প্রত্যঙ্গ সিঞ্চিড়ায় উপছাইবেক। এই নৃত্যপরায়ণার সঙ্গে মাধুর্য্য আসিল, আ মরি লজ্জায় যে অঞ্চল খুঁজ হে, জন্ম দেখ, জন্ম দেখ; কি বা মা ষষ্ঠীর খেলা, বিড়ালকে দুধ দাও! আট কৌড়ে বাট কৌড়ে ছেলে আছে ভাল! কুলো বাজা। জন্ম দেখ, জন্ম দেখ! দেব দুর্লভ ব্যাপার দেখ।

জন্ম!

আঃ কি অলক্ষণ, জাতক কান্দিতেছে না কেন কি সর্ব্বনাশ!

মারিয়া কান্দাও, মারিয়া কান্দাও, হে! ইত্যাকার বচনে ঘোর রব উঠিল; এতাদৃশ অনুষ্ঠানে গল্পপূর্ণ তরাস আছিল, মন সকল উচ্চকিত থাকিল।

দুঃস্থরা বিকট মারি শঙ্কার, সর্ব্বত্র দৃষ্টি সঞ্চালন করিল; সন্নিহিত জনকে দেখিল, শুঁকিল, স্পর্শিল, প্রতিতেই, একে অন্যেকে; ইহারা পদদ্বয় দ্বারা, মাটিতে, দাপাইয়া, বিচার সিদ্ধ হইতেছিল, যে ইহা কি সেই পৃথিবী! এই পদ শব্দ হইতে যোজনচারী মেঘমন্দ্র জাত হইল; ধূলিকণা উড়িল; পক্ষীদের যাত্রা বিচাল্যমান হইল; যে এবং এখন সন্ধ্যা করিল; নবজাতক কান্দে না। ঐ কি দুর্দ্দৈব!

বিজাতীয় অবিশ্বাস এখন কোন ব্যাপারে যে সঠিক, তাহা জানা নাই, খাতক সকলের কাঁধ চুপসাইয়া হাড় উঁচাইল। ইহাদের একবার ভ্রূদ্বয় উঠিলে স্বাভাবিক হইতে চাইবে না; এবং বেচারীরা মহা আতান্তরে আছে, আঃ স্যাঙাৎগণ আমাদের বুদ্ধি গাছসই, চল আমরা বৃক্ষ ছুঁই, আমাদের বুদ্ধি নির্ম্মল জলে, ছ্যাঁচা ধোওয়া জলে, চল আমরা নিকটস্থ জলে চোখ মুখ ধুই; এ কোন গাঢ় অবিশ্বাস আমাদের পথ রোধিল! আমাদের বুদ্ধি পাঞ্জার কড়াতে, আইস আমরা কড়া সকল অঙ্গুলি দ্বারা বুলাই, কুঁজে হাত দিব; আমাদের ঠোঁট উপচাইয়া হাসি আসিবে!

নবজাতক কান্দিতেছে না! উহার ক্রন্দনে কি বাজ পড়িল! পুনঃ ঘোর নিনাদ গঠিত হইল, মারিয়া কান্দাও, মারিয়া কান্দাও। আরও জোরে মার। কি খেলা করিতেছে, জোর জোর মার; মাথা নীচে

পদদ্বয় মুঠি করিয়া ধর, উর্দ্ধে ধর, মার, মার।

উক্ত নির্দ্দেশে, ঐ ধাই মেয়েছেলেটি কোনরূপে সদ্যজাতকে এক হাতে চাগাইতে গিয়া তখনই স্বীয় দুই হাতে উহা ধরিল; এবং থ আছিল যে মেয়েছেলেরা তাহাদের সকলেরে আহ্বানিয়া কহিল, কেহ লাগ, কেহ আইস! দেখ আমার ক্ষমতা নাই, হাত কাঁপে। এই জনের ঠোঁটের পাশ বহিয়া রক্ত নামিতে আছে; ইহা ঘটিল তখনই, যখন নাড়ী কাটিবার লাগিয়া শশব্যস্ততায়, তৎপরতায় একটি টিনের কৌটা হইতে উপরিস্থিত টিন, বারবার দুমড়াইয়া সংগ্রহ পরে, দাঁতে উহাটি সোজা পাত করিল; সে এরূপ ঐ খালাস কর্ম্মে মগ্ন, যে রক্ত খেয়াল নাই, কহিল, আইস!

এখানে যাহারা বিবিধ গোষ্ঠীর তাহারা সমবেতর সম্মতি আশে, একে অন্যর মুখপানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল; ইহারা, যাহাতে প্রসব কথঞ্চিৎ পুরুষচক্ষুর আড়ালে হয় তাই সার বাঁধিয়া খাড়া থাকিল; আশ্চর্য্য যে ইহারা পুরুষ হইতে অনায়াসে আপনাদিগকে সরাইয়া লইয়া মহান প্রকৃতিজনিত রহস্য হইল, অলৌকিক সমুদ্রতটে ইহারা কিলবিল করিতে রহিয়াছে; ঈর্ষায়, ঐ প্রসূতির সৌভাগ্যে, এক প্রকার মহতী লালা ওষ্ঠ হইতে নিঃসৃত হইতেছে, এবং অসংযত থাকিয়াছিল কারণে ঐ তরল পদার্থ উহাদের কাহারও হস্তধৃত গরীব পাত্রতে টুপাইয়া পড়িতেছিল। আঃ মৃত্তিকা উপরে শায়িত প্রসবিনী শত নক্ষত্রের শুভ লইয়া ব্যাপ্ত আছে, এ দেহ কি সূক্ষ্ম বা! আঃ যাহা কিছু জড় তাহা অদৃশ্য হইয়াছে, এখানে ক্ষুধাতৃষ্ণা নাই; অপূর্ব্ব স্বচ্ছতা, কোথাও ছেদ নাই!

এখন একজন স্বীয় পাত্রটি ফেলিয়া, জলদি সেই উত্তোলিত জাতকের পশ্চাতে আপনকার ঈর্ষাকারণে লালা অপসারণকৃত হাতেই মৃদু চপেটাঘাত করিল, কিন্তু ক্রন্দন নাই! দেহটি স্বল্প দুলিল এবং ইহা করিতে তদীয় হস্ত ত বটেই ক্রমে সর্ব্বাঙ্গ বেপথুমান হইল; তদ্দর্শনে আড়ালকারিণী সকল তদ্রূপ হইয়া সঘন নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে আছিল; ঐ পার্শ্বে বহমান নদী, ঐখানে ছোট একটু খানি আগুন, আর শুষ্ক পাতা সর্ব্বত্রে চালিত হইতেছে! নির্ঘাৎ ইহারা ঐ সকল হইতে শক্তি আহরণ করত, চীৎকারিল, মার সজোরে! ঐ সঙ্গে জাতকের মুষ্টি ঈষৎ খুলিল, ও এক হাওয়া ক্রন্দন চারাইয়া উঠিতেই ইহারা আঃ! বলিয়া অতীব বিপুল ধ্বনি দিল। আর যে বেটাছেলেরা অবধি ঐ অসামান্য নিনাদ শ্রবণিয়াছে; ততঃ, ঝটিতি এই বিরাট জনসঙ্ঘ ঐরূপ ক্রন্দন নকল করিবারে অদ্ভুত মুখভঙ্গিমা করিল, প্রথমেই উহারা সমাগত সন্ধ্যার দিকগুলির প্রতি অবলোকনিয়া যারপরনাই মুখব্যাদন করিল, হায় ইহাতে কাহারও চোয়ালে খিল ধরিল; তত্রাচ তাহারাও সকলেই নিজ মর্ম্মে ঐ ক্রন্দন হাঁতড়াইতেছিল! ইহারা উহার জন্য উদম ক্ষ্যাপাটে যেহেতু এই বিরাট আদি অন্তহীন খোলাস্থানে, যাহারে বেড় দিয়া থাকা দিগন্ত দেখা যায়, ইতিমধ্যে, সেই এক হাওয়া ক্রন্দন কম্পিত হওয়ত সুদারুণ প্রতিধ্বনিতে দশাসই; আমরা উহা নকল করিব! নবজাতকের তুল্য কান্দিব আমাদের বক্ষ আঁচড়াইতেছে, কণ্ঠ মোচড় দিতেছে, আঃ আমরা পারিতেছি না কেন! পুনঃ চেষ্টা করিব! একি ক্রন্দন থামিল যে! ঐ মহত্ত্ব!

আ তোমরা যাহারা উচ্চ ভেড়ী পথে, নিদারুণ জীর্ণ বসন তোমাদের নদীর হাওয়াতে উড়িতে আছে; পশ্চাতে বিশাল গাঢ় নীলে লম্বা শ্বেত মেঘ, ভূমি সমান্তরালে, এইটি তোমরা সকলের, তোমরা ন্যুব্জ, তোমরা কুব্জ, দেহেতে যেটুকু শীর্ষস্থতা আছে, তাহারে স্পর্শবাচক করিল। কেননা ঐ তোমরা, যে অলৌকিক, ম্যাজিক সম্পর্ক বহিতেছ। যদিও তুমি বা তোমরা সম্বোধনিলাম, জানি তোমাদেরতে কোনই আমিত্ব, কর্ত্তৃত্ব বোধ নাই, যেহেতু তোমাদের পঞ্চতন্মাত্র রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ পুড়িয়া খাক; হায় আমরা মন্দভাগ্য, সেই অগ্নি সেই ধূম দেখি নাই; বুঝিলাম; তোমরা ধন্য!

ভীমকর্ম্মা নিয়তি বানচাল করিল, লবণাক্ত জল সর্ব্বস্ব হরিয়াছে, হাঁড়ীকুড়ি গেল, তত্রাচ তোমরা মায়িক, এখনও তোমরা উপলক্ষ্য ঠিক কর, ছিঁচকাদনের স্বরগ্রাম ভুল নাই; মরা-মুখ এই শব্দকে মাটির গহ্বর হইতে আনিয়া থাক কেমনে বা!

আমরা আমাদের মধ্যরাত দ্বারা তোমাদের বিয়োগ করিলাম, তখনই বাতাস হুতাশিয়া উঠিল; আমাদের বিবিধ ভঙ্গিমার দ্বারা তোমাদেরকে খতাইতেছি যেই, অমনি বজ্র বিদ্যুতে দিক সকল আহত হইল; আমাদের অন্তরঙ্গ সূত্র দ্বারা বিশ্লেষিলাম যেই, অমনি অট্টহাস্য ঝটকাইল! তবে, তোমরা ঐ ভেড়ীপথচারী সকল, শুন, আমরা এই শপথ লইলাম, ক্ষিতিকে অপে, অপকে তেজে, তেজকে মারুৎ

দ্বারা ব্যোম দ্বারা উপলব্ধি করিব! ভগবান রামকৃষ্ণ আমাদের সহায়, ঐ মহা সম্পর্ক জানিতে পারিব!

এখন উহারা উচ্চকিত হইল, যে সদ্যজাতর ক্রন্দন আর নাই সেই নিমিত্ত; যতক্ষণ ঐ রহস্য ক্রন্দন খেলিয়া উঠে নাই, শুধু প্রসবিনীর, মাতার, উগ্র যন্ত্রণা দুস্তর ফাঁকাতে ঝটকাইতেছিল, ততক্ষণ তাহাদের পাঁজড়াতে কাঁটা বিন্দিতেছিল; ইহারা বেটাছেলে, ইহারা সবাই অধোবদনে; ইহারা এক অপবিত্র! বোধে কাতর থাকিয়াছিল; কেহ পায়ের বুড়ো আঙুলে মৃত্তিকা খননে ব্যাপৃত হয়।

এতৎ সময়ে মেয়েছেলেদের বিস্ময়, জাতক সম্পর্কে প্রচারিল, তাহাতেই হঠাৎ ইহাদের মুখ হইতে মুখে উচ্চারিত হইল, মার মার জোরে! অনেক চপেটাঘাতের শব্দ হইল।

এবং যুগপৎ ক্ষণস্থায়ী ওয়্যাঁ শব্দ শোনা যাইল।

হায় কিন্তু উহা মনন করিবার পূর্ব্বাহ্নেই মুছিয়া গিয়াছে: সমস্বরে হা হস্ত বলিয়া হস্তস্থিত পাত্র ভূমিতে, নিশ্চয় ক্ষোভে, নিক্ষেপিল; আর কপাল আঘাতিয়া বিলাপিল, আমরা কান্দিব কেমনে, হা! আঃ নিশ্চিত ঐ ধাই মেয়েটি, দিক সকল তুক্ করে নাই, না হইলে সদ্যজাত রোল তুলে না!

নিশ্চয়ই, ঐ আগুনের শিখাকে স্বীয় অঙ্গুলি মটকান সাক্ষী করে নাই, না হইলে ঐটি কান্দিল না কেন! আঃ ঝিনুক আমরা স্লুইস-এর শাণে কত ঘষিয়া ক্ষুরধার করিলাম; ধাই কহিল, টিন ভাল হইবে, হাভাতে নাড়ী মোটা (!) হয়, তাহা ব্যতীত, মায়ের ধকল সহিবার দম কোথায়, টিন! বুদ্ধি এখন!

মার! মার জোরে! আরও জোরে, কান্দাও কান্দাও! আমরা কান্দিব, কান্দিব! আমা সকলের প্রতি রোমকূপ ভেদিয়া ঐ স্ফটিক ক্রন্দন নিঃসৃত হইবে, আমরা ঐ কাঁদন যমকে দিব না; ব্যথিত নভোজল ভরা মেঘকে দিব না; লাঙল ফালায় বিদ্যুৎ চমকিয়া আমাদের হাতকে কাঁটা মারুক! আমরা যমের অরুচি সকল, আমরা এই মাত্র চাই যে শিশুর মত কান্দিব, নবজাতক যেমন কান্দে, তেমনি এ কাঁহা এ কাঁহা!

ইহা, ঐ শুন, আমাদের কাহার বা দন্তহীন, অবস্থাতে, তিলেক অপি বেচাল নাই, ফুকারিবারে; অধুনা মহান সন্ধিক্ষণে আমরা উপস্থিত, ইহা এক অদৃষ্টপূর্ব্ব সন্ধ্যা! আঃ দেখ দেখ আমাদের গাত্রে উহার, সন্ধ্যার, ভাব লাগিতেছে; এখন আমরা এই বিরাট জনসঙ্ঘ দুই হাতে সেই নিনাদরে আহ্বানিতেছি; আমাদের বুকে পরম উন্মত্ততা আসিল, আমরা আমাসকলের শেষ কপর্দ্দক দিয়া ধূলিশূন্য নাভিঃশ্বাস দিয়া, কান্দিব!

ঝোপঝাড়ে জোনাকি চঞ্চল হইল; সদ্যজাতকের ক্রন্দন নকলে খাতকেরা জনাজাত অদ্ভুত মুখভঙ্গী করিতে প্রয়াসিল, তবে কেহ চিবান হইতে উজাইতে পারে নাই...একে অন্যকে অনুসরণিবারে পর্য্যবেক্ষণিতে আছে; তাহারা মহাকালাশ্রয়ী কৃষ্ণ গূঢ় নীল দিক চরাচরের প্রতি নেহারিয়া প্রথমেই মুখব্যাদনিল; আঃ বিশাল অন্ত তলহীন গহ্বরের বীজ যেমন! তৎজনিত কাহারও চোয়ালেতে আটক লাগিল, ঐরা তদ্রূপেই রহিয়া থাকে; যে এবং প্রতিটিই মর্ম্মতে ঐ রহস্যে স্বর হাঁতড়াইতে আছিল; ঐ স্তব্ধ উঠা নামা ধ্বনি এই বিরাট খোলা স্থানে, যাহার সুবিশালতা বেড়িয়াছে দিগন্ত—এখনও চোখসই রহিল, এ যাবৎ কম্পিত হওয়ত প্রতিধ্বনিতেছিল। জলজ ঘাস নড়ে!

এ কাঁহা! এ কাঁহা!

এ মৎস্য উল্লম্ফিল, ভেককুল ডাকিল, বিদ্যুৎ লহরিল; এখন সুদারুণ আবেগে হাভাতেদের বক্ষঃদেশ লাল হইল এবং প্রমত্ত হওয়ত আদিম মস্তিষ্কতাতে ইহারা এককালেই মেঘযূথের গুরুগুরু শব্দ ও ভীম বজ্রের কড়কড় শব্দ করিয়া উঠিলেক, চেতনা আওয়াজ তুলিয়া ফিরিয়া আসে! উদ্ভিদ, মৃত্তিকা পৃথিবীর যাবতীয় সম্মোহ ভ্রমে রূপান্তরিত হইতে আছে, তাহারা ইহাদের মিনতি করিল, আমরা তোমাদের প্রবঞ্চিত করি নাই, তোমরাও আমাদের চুষি কাঠি!

পুনরপি, এ কাঁহা! এ কাঁহা! সন্ধ্যার পাপিয়ার স্বরস্থানে যাহা সুস্পষ্ট হইল!

এখন হস্তে অদ্ভুত কড়া সকল অন্ধকারে প্রায় বিলীন, এমত যে ঐ ধাই ঠোঁটের পাশ বহিয়া রক্ত যাহার ক্ষরিত, সে এতেক পরিকর হয় যে, রক্ত পড়িতেছে যে খেয়াল নাই; তাহার বাম হস্তে নিষ্পন্দ সদ্যজাতকে তেমনিই ধৃত ছিল। সে ইরাণীদের অশ্বের মতন চিঁহিহি করিয়া নিমেষেই ঐ রহস্যকে বিশেষ চানকাইতেছে; মেয়েছেলেরা স্তনবৃন্তে নখাঘাতিল, বেটাছেলেরা একে অন্যের কড়া থুপাইয়া

টনক হাঁতড়াইল এবং তাহা সকলের গাত্র সিঞ্চিড়াতে স্পন্দমান থাকিয়াছে; যে এসময়তে অন্নক্লীষ্ট যান্ত্রিক শব্দে চৌকিদারী হাঁক পাড়িল; এবং উপর্য্যুপরি ঐদৃশ ব্যাকুলতা নির্ম্মিত হয়!

আঃ দুঃখ কোন প্রত্যুত্তর আইসে না; শুধু নদীপ্রসূত হাওয়াতে একের পর এক নিশুতি আসিতে লাগিল, নীচে ক্ষেতে জমা জলে এখন একটি ভাম, খটাস জাতীয় জন্তু, চলিয়া যাওয়ার আওয়াজ, ছপ্ ছপ্! পুনরায় জাতকের ক্রন্দন নাদ ঘটিল; আমরা শুনিলাম, সদ্যজাতর অস্বস্তির ঐ প্রকাশ হইতে এহেন বাচকতা সে কোন অশীতিপর স্তিমিত দৃষ্টির নির্ম্মাণ! আমাদের হাত, অন্ন রমণী মৃত্তিকা ছুঁইয়াছে, সমান মর্য্যাদায়! আমরা পৌষ মাসের ঠিকানা, আমাদের ঘামে উচ্ছেফুলের গন্ধ! আমরা দেখি, প্রদীপের আলোতে যতখানি আঁধার অপসরণের প্রয়োজন ততখানি যায়; বছর ঘুরিয়া যায়, আমরা আকাশে বাতাসে মাঠে নেহারিলাম; তবে এখন সদ্যজাত কান্নায় ফুকারিয়া উঠিবারে মন করে কেন! এ কাঁহা! এ কাঁহা! হায় কোন ধার্ম্মিক সৎবুদ্ধিতে কহিয়াছিলেন, ল্যা'ওম এ নে লিবর, য়ে পারতুৎ ইল এ দাঁ লে ফের!— রুশো; এই কি নে লিবর! জন্ম স্বাধীন! জন্মায় স্বাধীনতা লইয়া তাই তদীয় বুকফাটা রোদন দিক সকলকে আঁচড়াইতেছে, তাই ক্রমান্বয় অন্ধকার খুঁড়িতে আছে, এ কাঁহা!

মেয়েছেলেটি প্রবল ধমকে উদ্গার শব্দ করিতে আছিল, নিকটেই সেই গঞ্জনারত মেয়েছেলেটি এখন, এই ছাঁদে:

পোয়াতি লো পোয়াতি
চুষির পায়েস খাও
তোলা জলে চান্ কর, বাপের বাড়ী যাও!

বলিতে ছিল, এবং ইহাও, এত রাতে ধাইগিরি করে কে।

যাহার গাল স্ফীত, টোল পড়ে, সে ভেড়ীর নিকটের দরজার প্রতি চাহিয়া, তখনই স্বীয় মুখ চাপিয়া রহিল, যে একশবার ইহার জিহ্বায় ঐ বচন উজরিতে শূলাইয়াছে; ইহাতে ভাবিতে পারা যায় যে সমক্ষের এহেন নৈনেত্তর তাহার সহিতেছিল যে, সব থিকে তাহারে ঐ গঞ্জনাদায়িনী বড় কাঁটা মারিতেছিল, যেহেতু ইহা পরিষ্কার, যে সে আপনিই পাগল হইতে অতিশয় উৎকটিতে আছে আর সে ক্রমেই ইহার চোখে জুড়িয়া রহিল।

তৎকারণে ইহার, গাল স্ফীত যাহার, দৃষ্টি কিয়ৎ থমকান কিছু শূন্য; সারিবদ্ধ গল্প এইতে আঁকশিয়াছে, কিন্তু বৃথা হয়, অবশেষে ঐ দরজাস্থ বচন বড় অসহায় মনকে করিল! ফলে এইতে ঐ অবস্থাতে চক্ষু ফাটাইয়া উদ্গার দেখিল, তখনই পেশীগুলি চাগাইল, এখন ঐ সঙ্কট জানিবারে প্রস্তুত হয়, তৎক্ষণাৎ এক ছিট্রে টিনস্থ জল অঙ্গুলিতে লওয়ত আস্বাদন জন্য আস্বাদন নিমিত্ত জিহ্বাতে ঠেকাইল! ইহা করিতে সঙ্গেই আর দেখিতে হইল না, মাথা লাট খাইল; তথাপি সে বুদ্ধি করিল, আপন বক্ষঃদেশ চিমটাইল, এবং যাহাতে হাজার জনমের মাতৃরূপ তদীয় চোখে খেলিয়া উঠিল; এই সময়েতে তাহার কানে ধিমেভাবে আসিতেছিল ঐ গঞ্জনারত মেয়েছেলেটির ছড়া কাটা পঙক্তি সকল ঃ

ও পো'র বাপ, ত্বরা পাকুড় পোঁত গে।
ও পো'র বাপ, কোমর বাঁধা, কাঁঠাল পোঁত গে।
ও পো'র বাপ জলদিকর উত্তরেতে নিম দাও গে।

পাকুড় তথা অশ্বত্থ ঐ মহৎ সনাতন বৃক্ষ উহার ধর্ম্ম হউক, কাঁঠাল উহার মল মাসের খাদ্য, নিম উহার দুয়ারে ঢাল তলোয়ার লইয়া জাগুক! তাহা সত্ত্বে বেচারীকে উক্ত মাতৃরূপ সকল আটকাইতে গোহারানিল; এবং চকিতেই সে ক্রমে বিকট হয়!

হায়, সময় যদি ঈদৃশী খুনখারাবী কালসিটে গ্রস্ত না হইত; ভগবানের মার যদি না নামিয়া আসিত! নিশ্চয়ই তবে এই মেয়েছেলেটির, সত্যই বড় তামাসার কাণ্ড দর্শনে এখানেতে হদ্দ মেলা বসিয়া যাইত! সে উদ্ভট প্রকারে এখন প্রদক্ষিণিতেছে! অথচ আদতে একের যন্ত্রণার কারণ নির্ণয়ে ইত্যাকার বিভ্রান্তিকর

অবস্থা ঐটির; অথচ এবম্বিধ উদ্দেশ্য জানিলেও মেলা আগতদের কিছু বেদমতার কমতি হইত না; কিন্তু উপস্থিত এত পাঁজড়া সার লোক! এমন ক্ষেত্রে সম্ভবই নয়!

এখন দেখা যায় ঐটির দুই হাত পশ্চাতের দিকে থাকিয়া মাটিতে আছে, এবং মাথাটি ঘাড়ে ঢলিয়া, চুল আলুলায়িত, এবং ইহার নিতম্ব দেশ ভূমি হইতে উর্দ্ধে, আর পদদ্বয় এমতভাবে হাঁটুতে ভাঙ্গা আছে যাহাতে সে খুব সহজেই আধাচক্র দিল, আবার পুরা চক্র দিয়াছে পশ্চাতস্থিত হস্তর স্থান সরাইয়া! হঠাৎ সে থমকিয়া জানাইল, বাস। কি বা লবণাক্ত ঐ জল, হ্যাদে গো আস্বাদিয়া দেখ!

সঙ্গীরা এই খবরে আকর্ষিয়াছে বটে, যে এবং নিমেষেই বোধিল যে, ঐ নৃত্যরত বৃথাই ধমকানিয়াছে, যে জন বেটাছেলে হইয়া জনম রহস্যের কারবার দেখিবে তাহার চোখ অন্ধ হইবেক! তাহার লাঙল দেওয়া, মই টানা জমিতে বাঁশগাড়ি হইবেক! সবংশে হাভাতে হইবেক!

এতাদৃশ অভিশাপের ইতঃমধ্যে, এ যাবৎ দরজাস্থ চীৎকার, ফেন দাও এবং উক্ত চূড়ী ভূষণাকৃত উদ্গার শব্দও মিশ্রিত হইয়া তাহাদের যথার্থ আতান্তরে ঠেলিয়াছে; তাহারা ক্রমে নিভিয়া যাইতে আছে; তাহারা সকলেই অন্য দেহ ফিরাইয়াছিল, তাহারা পুরুষ দেহের ঘৃণা সহ অপরাধে চেতাইয়া রহিয়াছে, এবং যেক্ষণে তাহারা নিদারুণ আক্ষেপে কপালে করাঘাত করিবেক, তন্মুহূর্ত্তে! শুনিল!

জাতক মাতার দৃষ্টির মধ্যেই বসবাস করিবে, আঃ পুষ্পবৃষ্টি পুষ্পবৃষ্টি।

এতৎ বচনে, সমবেতরা মহা যাতনাতে একে অন্যেরে কামড়াইল, তাহারা এক প্রকার ঘ্যাঁক্ ঘ্যাঁক্ তর্জ্জন করিল; তৎক্ষণাৎ উ আ স্বর উচ্চারিত হইল; অবিলম্বেই রোল উঠিল, আইস ঐ পাগলীকে আমরা আমাদের পাত্র সকল দ্বারা ঠুকিয়া ঠুকিয়া মারিব, রক্ত দেখিব, আমরা মরীয়া! ইহারা উক্ত মেয়েছেলেটিকে প্রত্যক্ষিতে, যে ঘুরিতেছে, আপনাদের হাতের তালু বস্ত্রে ঘর্ষণিতেছে ও চোখের পলক ফেলিতে আছিল; ইহা একটি ভাবনা! ইহা হইতে মহা আতান্তর উপজিল; এই কিছুক্ষণ, একজন বিড়বিড় করিল, একে জনে হত চৈতন্য ছিল, এখন সে উদ্গারিছে; এবং এই জন আরও তাজ্জব! এতেক ধন্ধেতে সকলেই কান্দিয়া উঠিবে প্রায়; এখন এমতে হয়, অকস্মাৎ ঐতেই এরূপ কিছু খেলিয়া উঠুক, আর ইত্যাকার চক্রর অর্থ সহজ হইল!

এই আশা যাইতেই, তাহারা আপনকার তালুমুষ্টি মধ্যে মেলিয়াছে, এখানে স্তূপীকৃত বাসনা পোড়া ক্ষার ভস্ম! তাহারা কি কঠিন পরীক্ষার সামনেতে আছে! ঐ ভস্ম মৃদু হাওয়াতেও হাতের সর্ব্বত্রে চারিয়া যাইল; তাহারা, এখন ঐ প্রতি তরুণীর, যে ঘুরিতেছে, তাহার দিকে নেত্রপাত করিতে আছে; আ তাহারা চাষা, তবে এ কোন সংশয়ের মধ্যে, কোনটি বাস্তবতা! আঃ কি বা অত্রাহির!

ততঃ ভস্মরাশি আর নাই; মহৎ কড়া ওতঃপ্রোত হইল, ইহা এক অভিনব সন্তান! যে তাহারা উহা লইয়া কি করিবে, তাহাদের শিরা উপশিরা চমকাইল, তাহারা কান্দে এমন; এবং এখন প্রত্যেকেই হাত ছিটকাইয়া, একে অন্যের মুখী আছে, এবং খুব পাথুরে চোখে দেখিয়া পরেই ঐকে তর্জ্জনীতে দর্শাইল; ঠোঁটগুলিতে পট পট আওয়াজ থাকিল, ক্রমে কথা শ্রুত হইতেছে!

আমরা এক দিবস তোমারে সেই কূর্ম্মপৃষ্ঠ জমিতে, ছটফট্ আলোড়িত আছ দেখি, আমরা দূরে, আমরা তরাসে একে অন্যের গায়ে সাঁদ করিতে চাহিলাম, এ কোন খারাপ অলক্ষণ! আসে পাশে জল, উপরে মেঘ! কিন্তু এখন এ কোন ক্ষতে তুমি কাতরাইতে আছ! বল বল আমাদের উদর ছিন্নভিন্ন হয়, ইদানীংকার দুজনের বিকৃতি বেগোড় আমরা বুঝি, তাহারা ভবিতব্য দর্শনে উৎক্ষিপ্ত বেচাল হইল; হায় আকাল কি আমাদের প্রতি এত পর্য্যন্ত ছোটলোক হইবে। এই অনুমানেই তাহারা ঐদৃশ। কিন্তু তুমি! তুমি কি আকালকে ঐভাবে আপন দেহ হইতে নিষ্কাশিতে আপ্রাণ কর; বল, আমাদের বুক বড় আঁচড়িতে আছে; দেখ ঐ তাল বৃক্ষ, তাল সকল ভাঁট ফুল রঙ ধরিতেছে, আমরা উহা পাকা পর্য্যন্ত ঠায় খাড়া রহিব! কেন এই দশা! বৃদ্ধের সহিত অন্যদিগের স্বর উজরিল!

আবার ইহাও আমাদের হাতে আসিতেছে; তোমাতে খামখেয়াল ঘর করিয়াছে; তুমি জেদ কর, তোমার মধ্যে তোমারত্ব কিছু নাই! সন্ধ্যা হইতেই চক্ষুর্দ্বয় বন্ধ কর, আমরা সকলে রুখিলাম, এ কি বুজরুকি! তোমাতে কিন্তু ঈষৎ হেল্ নাই; দেখ, তোমারে ছাড়ি নাই, আমরা মায়াবদ্ধ! এক দিবস ঘোর রাত্রে দেখিলাম, তুমি ঘুমে নিঃসাড় আছ, হঠাৎ কথা কহ! আমরা একে অন্যরে জাগাইলাম; আমাদের চক্ষু স্ফীত হইল; আমরা তোমার গাত্র অনুভব করিলাম, জ্বর নাই! তুমি জানিতে পার নাই; আমরা ওষ্ঠ

দেশে অঙ্গুলি রাখিলাম, ঠিক ঐ সময়েতে তুমি এক মরণাপন্ন বীভৎস স্বরক্ষেপিলে যাহাতে আমরা আতঙ্কিত হইলাম, পরিচিত বৃক্ষের, হাওয়ার, শব্দ সকল প্রতির গাত্রে সিঙ্কিড়া দিল; আমাদিগের চক্ষু উল্টাইয়া গেল, প্রত্যেকেই বিমূঢ় হইলাম; এই মধ্যরাত তোমার গোপনতা কি শুধু ত্রাস! এখন উক্ত ত্রাসই কি এবম্প্রকার চেহারা লইল, এই চক্র দেওয়া!

এখন ঐ ঘুরন্ত মেয়েছেলেটির, তারস্বরে কি এক কথা তদীয়, কণ্ঠ হইতে ঠিকরাইতে আছিল; তিলেক মধ্যেই সকলে ঐ স্বরভঙ্গ বুঝিয়া লইল এবং প্রতির কণ্ঠে উহা মোচড় দিয়া উঠিল: আমানি! আমানি!

আমানি হউক, কাঁজি হউক!

আমানি আমানি! তদ্রূপ কহিতে সময়ে একে অন্যকে সুস্পষ্টরূপে দেখিল; প্রতির ঠোঁট নিশ্চয় কতক ভাঙা নাম স্পন্দিত হইল; কবে হইতে যে আমি, তুমি, ওহে, এমন ডাকে সাড়া দেওয়ার চল্ হইয়াছিল, ভাবিলে তাহা সাতিশয় দীর্ঘশ্বাসই আনিবে; একে অন্যরে স্পর্শ করিল, অনেক দিবস পরে মৃদু হাসিল, এবং স্বীয় চক্ষুর্দ্বয় বুজাইল, এ হেন অভ্রান্ত হলপে যে, এই অবস্থাতেও প্রত্যেকেই মনস্থ করিল, যে, আমি, আমিই তোমার নিকটে যাইতে পারি, যতই এদিক সেদিক যাই! এবং এই অপ্রত্যাশিত ভাগ্যে আমানি ডাক ছাড়িয়া তুমুল রব নির্ম্মাণ করিল, কোন এক অদ্ভুত শক্তিতে তাহারা ক্ষেপিয়াছে!

আঃ এতেক রগড়দায়ী চক্র দিয়া ঐ টোল যাহার পড়ে, সে লোক হাস্য চরকিতে মন্থনিয়া ঐ ঔষধ বাহির করিল, উহা ধন্বন্তরি! এই আমানি রবে, সেই মারাত্মক দরজার ধ্বনি কম হয়! আমানি শব্দ উচ্চারিতে সমবেতের শীর্ণ লোল বেআঁট শরীর ঠাস হইল; শব্দটিতে যেমন জঙ্গী আহ্বান বাচক ধ্বনি তাহাদের সংস্কার, নৈতিক বোধ, আঁচ পাইল; এখন যদি প্রবল বৃষ্টি, ঐ শব্দটি হয় বিরাট বটবৃক্ষ, ইহা এক অমোঘ অস্তিত্ব—তাহারা মাথা গুঁজিল! ঐ দেখ নিমেষেই আকাশ, মৃত্তিকা, নেহারিবার সাধারণ প্রকৃতি বেচারীগণ পাইবে, ঐ দেখ তাহাদের দেহে বিবিধ ঋতুকালীন রূপান্তর সম্ভবিল। ঐ হ্যাদে দেখ, ঐ সকলেরা উদগারকারিণীকে বেড়িয়া হা হা ইত্যাদি বর্ণমালা ছাড়া বহু শব্দ করিল, যেমন বা উহা বিদেশীয়, এমনই শব্দ সকল উচ্চারিল, যে প্রমাণ হয়।

পরক্ষণেই ঐ মেয়েছেলেটি যে আমানি ফুকারিল তাঁহারে বেড়িয়া, এখন যাহারা স্বাভাবিক হইয়াছে অনেকটা এমন ভাবে ঘুরে যাহাতে স্পষ্ট হইল যে উহা ঐ ঘোরা তাতাথৈ কোন লোকনৃত্যের আরম্ভ, আশ্চর্য্য এখন ইত্যাকার ঘটনাতে তাহারা অসীম বাক্য প্রয়োগের দূরত্ব লভিল! কেন্দ্রভূতা মেয়েছেলেটি অগ্নি! বেড়কারীগণের উহা প্রদক্ষিণিয়া ছায়া উপত্যকা পার হইতেছে! ইত্যাকারে তাহারা প্রগল্ভ হইল।

সেই নৃশংস হিংস্র কাণ্ডর তিলেক মুহূর্ত্ত পরে ঐ সেই মেয়েছেলেটি ঘুমন্ত অথচ দেহ হইতে উত্থিত কি করাল সর্ব্বভুক চৈনিক তুলি আঁকা শিখা, ইহা বিভীষিকা কেননা কালো, লাল তখনই যখনই সাক্ষীর আপনার দূরত্ব উজর হয়, পিতা মাতা বন্ধু, রামায়ণ, অল্পবয়সী বালকের হাস্য, হায় কিছুই উহারে নস্যাতিতে পারে না কি অগ্নি! আঃ অগ্নি শিখা সমক্ষে তুমি বর্ত্তাইয়াও কি সুদূর অতীত, না না বাসওয়ালৎকে উজাইয়া যাইও না, ঐ কালো বর্ত্তুলাকার ছাড়াইয়া যাইও না! এখন ঐ অগ্নি লেলিহান, ঈদৃশ সময়েতে কখনও ভেকাদি, কখনও শৃগাল, কখনও নিশাচরদের বিবিধ ডাক সকলকে স্তব্ধ করত এক বিচিত্র কুজ্ঝটিকার গুঞ্জন বিস্তার হইল, যাহা ক্ষেতভূমির জলস্তরের উপর দিয়া আসে, শতেক ভ্রমরকৃত ঐ ধ্বনি, যাহারা ঐ মেয়েছেলেটির দিকে তখন পা ঘষা বিক্ষেপে আসিতেছিল, তাহার মহা ধন্ধে থ হয়, ঐ কুজ্ঝটিকা, ঐ প্রহেলিকা অগ্নির দিকে যে অগ্নি হিংসায় ঘুমাইয়া পড়া মেয়েছেলেটির দেহ ঘেরিয়া ঊর্দ্ধমুখী; আশ্চর্য্য কুজ্ঝটিকা এখন বিস্ফোরণে ভাঙ্গিল, ঐ অগ্নিতে দেখা গেল ঐ হইল পতঙ্গর ঝাঁক! নাকাড়ার বাজিতেছে একপ্রকার শব্দ হইতে আছে, পতঙ্গ সকল শিখাতে মহা উল্লাসে প্রবেশিতে ছিল, ইহা এক বিস্ময়ের মরণ খেলা, ঐ খাতকদের চক্ষু সুমহৎ বৃদ্ধিতে ক্রমে আবর্ত্তিয়া বৃহৎ আকার প্রাপ্তিল; তাহারা প্রত্যেকেই বড় মনস্তাপে যে, কি দুর্ম্মতি যে, এই রহস্যকে আমরা পরিহার করিতেছিলাম! নিজ বক্ষে হস্ত দ্বারা আঘাতিয়াছে যেই তখনই অতীব করুণ আর্ত্তনাদ করে, কেননা মুগ্ধক্রমে হস্তস্থ পাত্রই বক্ষে আছাড়িয়াছে, এখনও যাতনা আছে, এখনও চোখে আশ্চর্য্য! চল চল, স্যাঙাগণ, ঐ মহা হোম শিখাতে দগ্ধ পতঙ্গ গণ আমরা খাইব, দগ্ধ পতঙ্গ সঞ্চয় করিব, আগুনে পোড়া পতঙ্গ চূর্ণ কপালে টিপ পরিব, উহা চাঁদ!

মাধব! তুমি দীনের জন্য! আমাদের কথা শুন, ইহাদের রেহাই দাও! যে বেচারীগণের, ঐ পবিত্র

অগ্নিকে বেড়াকারীগণের ছায়া বহু কুমারী উপত্যকা পার হইতেছে, তাহারা ইত্যাকার মাতিয়া প্রগল্‌ভ আছে; আর যে, সেই জনের উদ্গার থামে নাই, সে কি জানিত একদা অলঙ্কার ঢল হইবে, আর যে এখন আমানি শব্দ উচ্চারণে অভুক্তরা ক্ষিপ্ত, এখন ঐ যাহারা নৃত্য করে তাহারা কহিবে, ভাল যে আমরা অন্ধ হইলাম, উহা আর সোহাগের আর্শী নহে উহা কুড়াইও না, আঃ আমরা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলাম যে আমরা থামিয়া রহিলাম, তাই যে কোন সূত্রেই এ দেহের সহিত আমাদের সম্পর্ক নাই! এবং তখন সেই নিষেধ বচন প্রকাশিত তাহারা মাথা বাঁকাইতে ছিল!

আঃ প্রসাদ ত নহে, বলিতে নিখুঁত ব্রণবিরহিত ব্রাহ্মণ্য! একবার বৃন্দাবনের রজঃ আসিল, আমরা গাড়ী করিয়া দক্ষিণেশ্বর যাই; যিনি উহা গ্রহণ করিয়াছিলেন সারারাত ভক্তিমূলক গীত করিয়াছিলেন! মীরা ত বটেই ইস্!

মাগো আমায় পায়ে ঠেলিও না!

ঐ ব্রাহ্মণ কন্যা, আমাদের আশুভট্টদের আত্মীয়া। দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে রজঃ ছড়ান হইল, আমরা গড়াগড়ি দিলাম! জিহ্বায় গ্রহণ করিলাম। আঃ এই গল্পও বড় মধুর! শ্রীশ্রীমা জননী তখন 'উদ্বোধনে' মায়ের প্রসাদের জন্য প্রত্যহই সবাই ব্যগ্র! একবার, মায়ের অসুখ হয়, পথ্য সাগু! শ্রীশ্রীমা বলিলেন, দেখ কাণ্ড ভক্তদের আর প্রসাদের তরে দেখা নাই!

ঐ উদ্গীরণ করিতে চেষ্টিতাকে তাহারা, যাহারা এই পাশে অগ্নি প্রভ মেয়েছেলেটিকে বেড়িয়া ঘুরিতে বুদ্ধিযুক্ত, আড় দৃষ্টিতে নজর রাখিয়াছে; তাহাদের কণ্ঠ স্ফীত কেননা তাহারা ক্রমাগত আমানি শব্দটি উচ্চারিতে আছে; আমানি! আমানি! কিন্তু এই শব্দের কোন বাস্তবতা তাহাদের মনে ছিল না; যে যেখানে জল আছে, জমি আছে, যে খর ধূলা উড়া জমিতে বৃষ্টি অনেক দিবস অপেক্ষার পর পড়িতেই মাটির সোঁদা গন্ধ ছুটে; আর তাহারা ঐ মাটিতে প্রায় নাসিকা লাগাইয়া আপন স্মৃতি শক্তিকে দারুণ পোক্ত করে। আর ঐ সুবাস যেন তাহাদের চক্ষু বুজাইয়া তুষ্ট স্পর্শিতেই লাভ হয়, আঃ তাহাদের মেয়েছেলেদের গাত্র হইতে ঐ গন্ধ উদ্ভূত হওয়ত চারিপাশ মথিত করিয়া থাকে। এবার পাঁজীতে লিখিয়াছে আশি আড়া জল, এই শুনিয়া মন জোর পাইলে—এমনই এক জগত হইতে ঐ আমানি শব্দ গঠিত হয় নাই, ঐ শব্দ উচ্চারণে এমনই যে অন্যমনস্কও নহে। গীতও নহে।

তাহারা ধূলাতে কিলবিল করে, ঐ গন্ধ আমাদিগের মজ্জাকে জরিত যাহাতে করিতে পারে। তাহারা গন্ধ স্নান করিল আর বারম্বার আঃ আঃ বলিয়াছে।

ইহারা নৃত্য ছন্দে আছে।

উহা সকলের, ঐ তরাসকারী নৃত্য দর্শনে কেহ থ থাকিয়া অবাক হইয়া যদি কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য কেহ জিজ্ঞাসা করে, কেনই বা তোমরা ঐ মেয়েছেলেরে কেন্দ্র করত মণ্ডলাকারে ঘুরিতেছ, উহা কি বলিতেছ, ইহাতে ফলে কি বা কোন দেবতা প্রসন্ন হইবে! এবং যে যদিস্যাৎ কেহ জানিতে চাহে, যে আমানি হুঙ্কারে কি তোমরা বুঝ, তাহা হইলে তাহারা অসহায় নির্জীব হইবে, যুগপৎ প্রশ্নকর্ত্তাকে আক্রমণে ছুটিবে; যে এবং ঐ বৃদ্ধের প্রতি নেহারিল!

নৃত্য আবার চলিতেছে, ওষ্ঠে শব্দ স্ফুটমান, দেখিল ঐ বৃদ্ধ দুই হাত লাঠির মাথায় স্থাপিয়া গীত বলে; 'বড় আশা করে এ দেহ পিঞ্জরে' উহার দেহ অলৌকিক সম্ভ্রান্ত হইয়াছে, মুখমণ্ডল, সন্ন্যাসীদের ন্যায় সদানন্দময়! যাহারা যে সন্ন্যাসীরা দুই হাত তুলিয়া মঙ্গল কামনা করে, আনন্দে মে রহ, আনন্দ মে রহ!

মহাপ্রভু বলিতেন, কৃষ্ণেমতিরস্তু, আনন্দে থাক।

জয় জয় শিব শম্ভু আনন্দ মে রহ। ঐ পৌষের ঝিম্ ধরা কুয়াশার মধ্যে অগণন সন্ন্যাসী, সাগরে হাওয়ায় কুয়াশা ভাঙ্গিয়া আসিতেছে, সন্ন্যাসীগণ চলিয়াছেন।

ও বৌ হ্যাদে দেখ, গড় কর, কোলেরটিরে লইয়া আয়, সেবা দে লো; ইহাতে গললগ্নীকৃতবাস হওয়ত অজস্র ভক্তিতে যে যেমন অবস্থাতে রহে ভূমি স্পর্শ করে! এসময়ে পৌষে, মানুষের কনুই অবধি ধূলা, ঐ জন্য!

আনন্দ মে রহ!

এখন বৃদ্ধকে তদ্রূপ দেখিতে হইলেও, আমানি বলিতে কি বুঝায় তাহা নিশ্চিত উহার সমঝ হয় নাই, অহো বোধহীনতাতে একেরে, এতেক সুন্দর মহান দেখতে হয়। বা তাহার কোন প্রশ্ন নাই! যেমন এই

খাতকদের একদা ছিল! এ বড় ধাঁধা! ঐ শব্দে যে তাহারা জনাজাত আপন অক্ষমতায় ক্ষিপ্ত আছে, একি বিড়ম্বনা! অথচ আমানি কথা প্রথম ঘোষিত হইতে ইহারা উল্লাসে মনেতে প্রতিজ্ঞা ঐ মেয়েছেলেটির বিষয়ে করে, চল না কলিকাতায় তোমার স্যাঙা করিয়া দিবই। আঃ আইহি হি আমানি এমনও ধারণা, আমানি শব্দার্থ বুঝিলেই যেন ঐ উদ্গীরণকারিণীর কষ্টের উপশম হইবে। কিন্তু কিছুই ঘটিল না।

পরক্ষণেই এবং তাহারা মহাক্ষোভে, খুঁক শব্দ করিতে রহিল, অধৈর্য্যে হওয়ত, কেহ শূন্যে ঘুষি কিল ছুঁড়িতে লাগিল! আর আমানি ধ্বনিতে দিক ছোট হইল, তাহাদের মধ্যে সাতিশয় ঘেষাঘেষি হইল। নৃত্য রুখিতে আছে, ইহাতে অসহিষ্ণু হইল, একে অন্যকে মারিতে লাগিল; নিজেদের পাঁজড়াতে পাঁজড়াতে সংঘর্ষে কিম্ভূত আওয়াজ হইল, মহানৃত্য বিনষ্ট হইল, তাহাদের খেয়াল আসিল, তাহারা হাঁপাইতেছে। হঠাৎ কেহ, ঐ অবলার, ঘুরিতে আছে যে তদীয় কেশাকর্ষণ করিল; বল বল শালী আমানি মানে কি!

সেই মেয়েছেলেটির মুখশোষ থামিল, তদীয় দৃষ্টি কেশাকর্ষিত মুষ্টিতে, চক্ষু পালট মারিল, তদীয় উর্দ্ধস্থিত মুখ হইতে বাহির হইল, আমানি!

বল শালী। বল, আমরা উতরোল হইতেছি, বল!

আমানি মানে।

এতদ্বচনে সকলে অধিক মাত্রাতে ত্রাহিত হইল, গোতাড়ন শব্দ করিল; হায়! ফেন দে গো শ্রবণেও এবম্প্রকার ঘা লভে নাই; মস্তিষ্ক খোয়া যায় নাই। ঈদৃশী নিজের কাছে ছোট বেইজ্জত তাহারা কখন হয় নাই; মহা আক্ষেপে তাহাদের স্বরভগ্ন হয়; ক্রমে তাহারা সকলে ঐ মেয়েছেলেকে পুনঃ ঘূর্ণিত হইবার অবকাশ দিল, কেশধৃতকারীর মুষ্টি শিথিল হয়; ততঃ কান বাঁকাইয়া পুনঃ দরজা আগত কুৎসিত ধ্বনি শুনিতে সমাহিত থাকিল! কোন শক্তি তাহাদের এ সময়েতে প্রচণ্ডভাবে ঠেল মারিতেছে, ঝটিতি পরক্ষণেই তাহারা ছুটিল ঐ দরজা অভিমুখে। নির্ঘাৎ তাহাদের কোন চেতনা জ্ঞাত হইয়াছে, যে যাবৎ ঐ দরজাস্থ পীড়াদায়ক দুশ্চরিত্র কথার না লয় হইবে তাবৎ আজ এই ভৌতিকতা থামিবে না; অথচ এই লোকেদের যথার্থ কোন মুহূর্ত্তে এইরূপ করিতে মন হইল, কখন বা যে কেন ছুটিল, সকলেই নিশ্চয় অবহিত নহে। বেহুঁশে ছুটিয়া লক্ষ্য উজাইয়া গেল, তাহারা ঐ আধা ভাগাড়ের বাধা পাইল, নদীর আওয়াজ শুনিল।

দরজার নিকটে পৌঁছাইয়া প্রতিতেই যাবৎ শিরা স্ফীত হইল, প্রতিকণ্ঠে বেপট বর্ণ উচ্চারিত আছে, বেশ জায়গা ছাড় দিয়া প্রতিটি দাঁড়াইল, ইহারা দৈববলে তেজীয়ান, শত সূর্য্যর উদয় হইল; ইহাদের নিরখিয়া, অপর পক্ষ কিছু পূর্ব্বে যাহারা আস্ফালিয়াছিল তাহারা অবিলম্বেই যেন খুকু হইয়া গিয়াছে; তাহারা ইহাদের প্রতি বড় করুণ চোখে দেখিতে আছে; আর যে এখন ইহারা দণ্ডায়মান কুক্কুর, হাত দুইটি নুলো, নড়িতে থাকে, ও পশ্চাতে তাহারা হটিতে আছে।

আগত দল আমানি আমানি, জপিয়া চলিয়াছে। ইতঃমধ্যে আচম্বিতে কহিল, লও। পেট ভরে দেখে লও।

এই উচ্চারণ সঙ্গেই বক্তারা থমকিয়াছিল। ঐ উচ্চারণে আরও যে নিশ্চয় জ্বালা ছিল, নিজেদেরকার অধমতা, ও দরজাস্থদের উপর আকোচ মিলিত হইয়া যাহা, যাহা এই পক্ষদের ছ্যাঁকা দিতে ছিল, ইহারা পাশাপাশি তন্নিমিত্ত নড়িতে আছে, এখানে ইদানীং অসম্ভব স্তব্ধতা; সে কারণে, যে যাহার আপন উদরস্থ কৌতুকপ্রদ ডাক, গড় গড় আওয়াজ, যাহা সর্ব্বক্ষণ আছে, শুনিতে পাইল; ভয়েতে উহা বর্দ্ধিত এখন হয়, তেঁতুলপাতা যে চিবাইতেছে সে থ, তাহারই পার্শ্ববর্ত্তী দন্ত প্রদর্শিত হইতেছিল, সে হয় অল্পবয়সী ছোঁড়া, আঃ কি সুন্দর নয়নদ্বয় তদীয়র!

আঃ ঠাকুর, আকালে ইহার চোখের আয়তন সঙ্কোচিল না!

উহারই ছোঁড়ার, পার্শ্বেরটির কাপড়ের কষি, এই ত্রস্ত হওয়াতে আলগা হইল, ও যে তৎক্ষণাৎ ট্যাঁক হইতে একটি কাগজের মোড়ক চ্যুত হইল, এবং তাহা খসিয়া ভূঁয়ে; যাহা মোড়ক, যাহা খুলিয়া ছেঁৎরাইল, অবশ্য সকলে তিলেক চোখের চাহনিতেই হায় হায় করিল! যদিও দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল এই কালেই ঐ আমানি শব্দকারিণীর দিকে। ঐ দরজার গোষ্ঠীর এক অল্পবয়সী মাথায় হাত রাখিয়া খাড়া সত্ত্বেও, যেহেতু পেট ডাকার আওয়াজে বিশেষ আকৃষ্ট এবং, সে ঐ আওয়াজের ঘর কোথায় হদিশ নিমিত্ত বড় উসখুস আছে।

আগত দল জিজ্ঞাসিল, কি বা পড়িল। ইহাতে অনুমান হয় পরহিত বুদ্ধি মরে নাই, কিন্তু এবং পরক্ষণেই যে কে সেই; ইহাদের ঠোঁট স্পন্দিত আছে, সেই প্রতিনিয়ত রূপের ফলে ঐটি মারণ মন্ত্রের রূপ ভীষণতা লাভ করিয়াছে! তাহাদের মধ্যে নির্ঘাৎ, এখন আস্ফালন, শরীর হইতে মনকেও যুক্তির ঠাস দিতেছিল! সুতরাং ঘূর্ণিত চক্ষু উপস্থিত ছোট হইতে আছে।

ঐ ভীত জনসঙ্ঘ, আগে যাহারা মারাত্মক তম্বি করিল, তাহাদের মুখে ইহা ধ্বনিত হয় যে, ফৌজদারী, আদালত, পিনাল কোডের ধারা! আঃ কত মহান মনুষ্য চরিত্র!—সকল ধারা পরম্পরা বলিল, কিন্তু এখন হাঁদাইয়া আছে। আঃ পিনাল কোড! আমরা এতেক ভিন্ন হইয়া কেমনে এক চালাতে বাস করি!

পূর্ব্বাহ্ণে যাহারা দিক সকল প্রকম্পিত করিয়াছে, তাহারা নবাগতদের, এই মুহূর্ত্তে ইঁদুর চোখে প্রত্যক্ষিতে আছিল; যাহাদের পশ্চাতে অদূরে নৃত্যপদ বিক্ষেপে একজন, অন্যটিতে উদ্গার করে, আর জন চক্কর দিতে আছে রহিয়া থাকিয়া; ইহাদের অল্পবয়সীরা এমত যে, ঐ সঙ্ঘটনে হামলাইল না, কেননা, বয়সীরা সিদ্ধান্তিয়াছে, দরজা ছাড়িব না; বিবেচনা হয় উহারা আমাদের কোন ফেরে ফেলিবে; আর যদি শাসন নিমিত্ত যাই, ইতিমধ্যে ধর যদি গৃহস্থ কিছু দেয়। ঐদিকে দেখিও না! ক্ষুধাতে অনাহারে অল্পবয়সীরা সোমত্ত লোকে এমন হইয়াছে; তাহাদেরও উৎসাহ নাই।

নবাগতরা এখনও দ্রুত শ্বাস লইতেছিল, ইহাদের গাত্র বর্ণ ধূসর, এখন দেহে অপরাহ্ণের কাঞ্চন আলো পড়িয়া ধূমল! এইরা পেয়াদারা স্বাচ্ছন্দ্যে স্থিতবান, এইদের তকমার ছিটকান রোদে দরজাস্থদের চোখ ধাঁধাইল, এবং সকলেই অতএব চোখ হাতে ঢাকিল; নিশ্চয়ই এহেন আতুররা জানিল, সমক্ষেতে যাহারা তাহাদের হাতে নির্ম্মম ন্যায়দণ্ড। তাহারা কোন কিছুকে এতটুকু বেচাল হইতে দিবেক না, কারণ উহাতে করস্থিত কড়া, স্কন্ধের বৃষভ তুল্য বাঁক বহন ক্রমে কুঁজকে টিট্রেকার দেওয়া হইল।

যে দরজাস্থদের ওষ্ঠ কাঁপিল, তাহারা এমনও মিথ্যা, ঐ শকুনের ভীড় দেখাইয়া, কার্কশ্য ফেনাইয়া ছিল, দেখ গতকল্য দুইজনরে, আমরা যমালয়ে পাঠাইয়াছি, শালা দেশ শকুনের আবাস স্থল হউক! দেখ দেখ পেট ভরে দেখিয়া লাও! ঐ পেট ভরে, বাক্য মনে করিয়া নবাগতরা হুতাশিয়া উঠিল, তাহাদিগের চোখ বলিল, কথাকে নষ্ট করা পাপ! উহা বড় গঙ্গাজলী কথা, এই লাট দুনিয়ায় মা বা স্নেহশীলা ঐ কথা ব্যবহার করিবেক ধিক্ সাঙা বাক্য নষ্ট করিও না।

এবম্প্রকার বচনে, ঐ রূঢ় বাক্যসকল বিপক্ষদের যাহা, তখন ক্ষুধার্ত্ত শ্রোতৃবর্গতে, ভেড়ীর উপরেতে যে গুলি, এক মোচড় খেলিয়াছে ঐ শকুনদের দর্শনে, যে এবার তাহাদের শরীরগুলি তোতলাইতে আছে, যে এবং একজন বেটক্কর ভেড়ী হইতে এখন পড়িতেছে! এইক্ষণে সেইদেরই আমানি জপিতেছে এখন যাহারা, ঐ ভীমকর্ম্মা রূপে পরিবর্ত্তন নেহারিয়া, এই দরজার নিকটস্থ দলটি সম্পূর্ণ নস্যাৎ হইল, যদ্যপি তাহারা বদ্ধাঞ্জলির তরিখা জানিত, যাহা কেয়া ও হরগছা গাছ—একরূপ জলজ উদ্ভিদ, ইহাতে ধূমল বর্ণের ফুল ধরে—যেখানেতে শেষ যথার্থ সেখানেই ভুলিয়াছে; তাহাদের বেচারীদের মহা আতান্তরে, শুধু সর্দ্দিটানার শব্দ শ্রুত হয়।

সেই তম্বিকারীরা আর ঐদের বর্ত্তমানতার কোন সামাল দিতে পারিতেছিল না; যে একদা নিজেদের এখন তামাসার, স্কন্ধস্থিত কুঁজ আঘ্রাণিতে প্রয়াসিল, ইহা কি অদ্ভুত কার্য্য! আঃ বেচারীগণের এই বিবিধ শোভার বাহ্যজগতের সহিত শুধু নাসিকার সম্পর্ক! ইহা শেষ ঘুঁটি! তবে নিশ্চয়ই ভাগ্যহতরা শেষ ঘুঁটি খেলিয়া চলিয়াছে! ইহাদের সারা দেহে ধুলা লাগিয়াছে!

ইহারাই, দরজায় সকলে রহিয়া ভগ্নস্বরে কহিল, ঠাকুর হায় আমরা সাপের খোলসের ন্যায় ছিন্নভিন্ন, আমাদের অর্দ্ধেক দেহে পৌষমাসের বসতি, তাহা ক্রোক হইল, ভিটা নস্যাতিল, আমরা নিজের বা পরস্ব ক্ষেতে কখনও প্রস্রাব করি নাই; আমরা পঞ্চপীরের নাম করিয়া নদী পার হই, আমাদের ছেলে আমাদের স্কন্ধের কুঁজে আরামে নিদ্রা গিয়াছে, কেননা উহা চমকপ্রদ শিখান হইয়াছে; আমরা বহুতে কখনও নারাজ হই নাই, এ কোন রুষ্ট ব্রাহ্মণ পৈতা ছিঁড়িয়া আমাদের অভিশাপ দিল, ঠাকুর আমরা দীন!

তবুও এখন ইহারা, জলস্তর তথা যতেক আপৎকাল, পশ্চাতে শকুন সবাই—এর ঐ বিপক্ষীয়রা শরণাপন্ন হইল, বেজায় কাতরতায় ঐ লোক ক্ষয়কারী সকলের দিকে, ঈদৃশী ব্যাকুলতাতে চাহিল,

যাহাতে জানিতে চাহে, বুঝায়, এই আগতদের তোমরা চিন কি না, ইহাদের চক্ষু ভাঁটার ন্যায়, ইহারা দৈব বলে বলীয়ান, ইহারা নিশ্চয় আমাদের এই এত বেলা পর্য্যন্ত অধিকৃত স্থান দখল করিবে। তোমরা ইহাদের আক্রমণ কর। ইহারা উহা কি কথা অনবরত উচ্চারিছে!

চরাচর অস্পন্দ!

রাশিখানিক দূর হইতে উদ্গার সূচক আওয়াজ আসে, ও চোখে পড়ে তৎসহ চক্রাকার পাক, গালে টোল যুক্ত মেয়েছেলেটির, হায় যাহার পরী হইবার সকল বাস্তবতা আছিল, তৎসহ আমানি শব্দ উচ্চারণে ত বটেই, এতদ্ব্যতীত এবং সেই সঙ্গে এক আধ ফাঁকে প্রতীয়মান তদীয় দেহ তথা মুখের আদল, যে অবয়বে, যাহাতে সম্প্রতি অদ্ভুত প্রকৃতিজাত গাড়োয়ানী ব্যাপ্ত আছে যথা, সে স্ফীতা! ঠিক ঐ উদ্ভট পারিপার্শ্বিকতার দিকে, এই মহীয়ানরা আপনকার তর্জ্জনী নির্দ্দেশ করিল; ও যে অতিশয় নিষ্ঠুর রুক্ষভাবে প্রকাশিল, দেখ, লাও পেট ভরে দেখ! এই বলিয়াই নিজেরা চমকাইল, নিশ্চয় ঐ গঙ্গাজলী শব্দ ব্যবহার জন্য! ইহা শ্লেষ করিতে বটে!

বিপক্ষরা ইহাতে ঢোক গিলিয়াছে, ইহাদের গলা কাঠ হইল, আপন টেঁকুর চাপিতে ঘামছোটা চেষ্টা করিল; তাহারা কেহ এই আপনকার স্কন্ধস্থিত কুঁজ শুঁকিল এই তর্জ্জনীর প্রতি নিরখিল; কাহারও কুঁজ শুঁকিতে রোমহর্ষ হয়; কাহারও কুঁজের পাশের রোম প্রশ্বাসে হেলিয়াছে; কেহতে হস্ত কুঁজে বুলাইতে থাকে; কেহ কড়াতে তদ্রূপ করিল। কি যে দেখিতে হইবে তৎবিষয়ে অবহিত যাহাতে হইতে পারে তজ্জন্য; তাহারা জড়, তাহারা পুনঃ কুঁজের প্রতি দেখে, কড়া দেখে, ইহা এক অভিনব কিছু; মন বিবেক সত্তা ঐখানেই তাহারা আছে, উহা নেহারিতে কালে এমত সম্মোহ উপজিল, যে তাহাদের জিহ্বা প্রলম্বিত হয়, তাহারা অদ্ভুত দর্শন হইল, এখন যেন লেহন করিবে বা এবং ঠায় ঐ দৃশ্য প্রত্যক্ষিতে রহিল!

তবু ইহাদের মধ্যে একজনা সেই পতিত মোড়কের কাগজের প্রতি নাল ঝরা আগ্রহে চাহিতে ছিল! বাদ বাকিরা এবার বুঝিল, যে এই নবাগত দলের প্রকৃত প্রস্তাবে রাগ মান করণের মত চেহারা আছে, যে সাধারণ ব্যক্তি নহে, ইহারা মকর সংক্রান্তির সন্ন্যাসীরা ইহাদের ক্ষেত্র বসত পবিত্র করিয়াছেন, গাহিয়াছেন, গো আনন্দময়ী আমায় নিরানন্দ করো না!

তখন নবাগতরা বোধিল যে তাহারা রোমন্থিত একটি বড় আদরে কথাকে শ্লেষ রূপ লাগাইয়াছে যে তাই তাহাদের নিদারুণ বুক চাপা অনুতাপ আছে সুস্পষ্ট হইল; ইহা ওষ্ঠ দংশনের বাক্যরূপ!

বিপক্ষীয়রা তবু কিছু বুঝে না কহে, হুজুর! মহানুভব!

তোমা সবাকার ঐ চীৎকারে, বহুরূপী, প্রাণী বিশেষ আর রঙ ফিরাইতে পারিতেছে না, তাহারা, হের, তোমাদের স্বর শুনিতেই হের লালই বা নীলই হইয়া রহিল; দেখ তক্ষক চারবার ডাকিতেছে অথচ আমরা আবাল্য জানি উহা সাতবার ডাকে, তক্ষক কি তোমাদের কারণে ডাক খোয়াইবে, যেমন সে বিষ খোয়াইয়াছিল? রাজা জন্মেজয় কাশ্যপ ও তক্ষকের সাক্ষাৎ বিশ্বাস করেন নাই, তখন ব্যাস বলিতেছেন, বনঃস্থলীর যেখানে কাশ্যপ ও তক্ষকের সাক্ষাৎ ঘটে সেখানে সুমহৎ বৃক্ষ আছিল, ঐ বৃক্ষে এক ব্রাহ্মণ চড়িয়া আছে, তক্ষক জানিতে চাহিলেন; কাশ্যপ দেখি তোমার ক্ষমতা! আমি এই বৃক্ষরে দংশন করিব, তুমি পুনর্জ্জীবিত কর। বৃক্ষস্থিত ব্রাহ্মণ শুনিলেন; তক্ষকের দংশনে বৃক্ষসহ ব্রাহ্মণ জ্বলিয়া গেল। কাশ্যপ সহাস্য বদনে বৃক্ষসমেত ব্রাহ্মণের প্রাণ দান করিলেন। ব্যাস অদ্ভুতভাবে ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

ইস্ কি চীৎকার! এখন বল মানুষ যদি এরূপ করে, নিরেখ বাঁকি ফেলে, তবে ঐ জীব সকল কি করে! তোমরা কি শৃগালের ঘরে কন্যা দান করিয়াছ! দেখ তোমাদের ঐ জিগীরে, এমন যে, ঐ যাহারা ব্যাধিগ্রস্ত হইল, ঐদের ইহকাল পরকাল ভস্মসাৎ হইল! এই সকল সনাতন শব্দ বলিতে তাহারা গর্ব্বিত হয়! এ কারণ যে, তাহারা, যদিও হাভাতে, কোন পরম চেতনা হাতে করিয়া আসিয়াছে, তাহারা সৎ।

চোরা চোখে তাহারা, দরজাস্থবৃন্দ, ঐ মেয়েছেলেদের লক্ষিল, হায় ঐ যাহারা বিকৃত, তাহাদের ইহকাল আছে, পরকাল আছে। তবু এখন ইহারা এই লোকেরা কুত্তার ন্যায় বেসামাল, এই সকলের গাত্রদাহ উপস্থিত, কেননা সমঝিল নবাগতদের আড়ান উচ্চারণ অবশ্যই বাণ মারা মন্ত্র, ঐ মন্ত্রে আমরা স্থানত্যাগে বাধ্য হইব, ইস্ কি ওষ্ঠ কম্পন! আঃ মৃতদের অভুক্তদের মারিও না! ইহারা একে অন্যের

পার্শ্বে সরিতে চাহিল, তাহারা আমানি উক্তিকারীদের ক্বচিৎ ঝাঁকি দর্শনে দেখিল।

হা হন্ত! ইহারা কি সেই যাহারা সকলে নদীর আড় পার হইতে আমাদের ডাকে, কি ভয়াবহ কাতর গোঙানি! আমরা শুকাইয়া আছি, পার কর পার কর!

এই মননে ইহারা কহিল আমাদের কোন দোষ নাই।

পুনরপি ভেড়ীপথে; মসী ন্যায় অন্ধকার নিঃশ্বাসকে ভারী করিল, ভেকের ডাক এবম্প্রকার অন্ধকারে বিকট হইয়াছে; তাহারা দাঁড়াইয়া থাকিয়াও এতাবৎ শুইয়াছিল, ঘুমাইতেছিল; ভবেত, প্রত্যেকেই এমত শায়িত আসনে রহিয়াছে, যাহাতে মাতৃগর্ভে যেমন শিশু; আদর নাই অনাদর নাই; গর্ভাবস্থার নিছাড় শান্তি লইয়া বনে পাহাড়ে গুহায় অনেক জল্পনা আছে, কিন্তু এই পারম্পর্য্য দেখিলে, সেই সাধকদের চিন্তাকে উজাইয়া ইহা বহু দূরে যে গিয়াছে, ইহাই স্থির হয়!

হায় তোমরা কাহারা প্রজ্জ্বলিত মশাল লইয়া আসিতেছ! থমকাও হে!

এখন এই গাঢ় অন্ধকার, তাহাদিগের এই ঘুম—শাশ্বত ঘুমকে, পাচারিয়া গিয়াছে, যাহার পরই সেই জাগ্রত অবস্থা!—সাঁদ করত তাহাদের তলাইয়া লইয়া গিয়াছে; ইহারা জাগিল, কোন সম্পর্ক মনে নাই; প্রত্যক্ষ সকল জড় হইল, চক্ষুকর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক নির্জীব—আর একটি ইন্দ্রিয় ক্ষুধা। তাহারা উদরে ভর করিয়া উঠে; আদতে, যে সত্তা দেহ মধ্যে উঠে চেতায়িত হয়, ঐ ঘোর অন্ধকারে তাহার খোঁজ নাই!

তাহারা যেখানে ঠিক অপর পার হইতে সেখানে গুণটানা শব্দ আসে!

একমাত্র সেই বালকরা, যে, পত্রাদির কম্পন, রাস্তার এবড়ো খেবড়োতা ইত্যাদি দর্শনে তামাসা প্রবণ হয়; যে এখন ভূমিষ্ঠ হইবার দিন হইতে বেশী দূরবর্ত্তী হয় নাই; সেই সবে এখন চোখ কচলাইতে প্রকাম্য (প্রকাম্য instinct এর বাঙলা শ্রীঅরবিন্দ ধর্ম্ম ও জাতীয়তা) লাভ করিল, সে এক একবার পর্য্যায়ক্রমে কোঁকাইয়া উঠে, এ্যাঁ শব্দ হয়, এবং এ্যাঁ শব্দের আবার তারতম্য, ইহা কি মনুষ্য শিশুর বা কোন শাবকের আমাদের রক্ত লোমশ, আঃ রোদন সে ভুলে নাই!—ভূমিষ্ঠ হওনের জন্য যাহা নির্দ্ধারিত!

আঃ আমরা নিজের রোদন দিয়া নিজেরে ভুলাইয়া থাকি! কিবা অপরূপ পশুত্ব আমাদের!

এখন ঐ রোদন, ভেক ডাকের সহিত মিশ খাইল, ঐ ব্যাপারে ঈদৃশী সঙ্ঘট্ট উদ্ভূত হয়, যাহাতে বুঝায় যে অসংখ্য শিশু এখনই জন্মিল! দলের প্রতিজনই অন্ধকার দ্বারা জরিত আছে এমন, কোথাও নিশ্চয় ক্ষীণতম আলোক ছটার স্বপ্ন পাইল, তাহারা মাটি হইতে উঠিল, তাহারা ধূলা ঝাড়ে নাই; তাহারাও বালকের অনুরূপ স্বর ঘটাইল! এখানে আবিষ্কার কথাটা লেখা যাইত অর্থাৎ তাহাতে আবিষ্কার শব্দ প্রধান করা হয়।

তোমরা কে যাও, কে যাও, অন্ধকার নদী ভাঙিয়া আড় পার হইতে আসিল।

এপাশে নদীর শব্দ, ভেকের আওয়াজ, যে এবং গুহ্যতম অন্ধকার, আর ইহারা দিক নির্ণয় হাঁতড়ান ছলে বাহু প্রসারিয়া, পদদ্বয় মাটি হইতে না তুলিয়া যার-পরনাই সন্তর্পণে চালিত করিতেছে; ইহাদিগের চোখ বুজিয়া আছে; এইভাবে তাহারা! অবশ্যই ভয়ে তাহারা চোখ খুলে নাই, আরও যে চোখ খোলা এবং বন্ধ করার প্রভেদ বুঝে নাই; এখন অতীব শামুক গতিতে এখানে, দেহতে, চলন রহিয়াছে, তাজ্জব যে কেহ কাহারেও স্পর্শ করে না। জনাজাতের শুধু কর্ণ সকল চমকিত হয়! এখন ঐভাবে নদীর দিকে সারিবদ্ধ আছে, তাহাদিগের কণ্ঠে সদ্যভূমিষ্ঠ হওনের শব্দ! কখনও, এই পার্শ্বে প্রান্তরের অজস্র জল লপ্তের দিকে, আবার ভেড়ীপথের মধ্যস্থানে, অন্ধকারের দিকে মুখ করিয়া বর্ত্তাইতে থাকিল! ঐ ঐ অবাক লক্ষণগুলি পূর্ব্ববৎ নিভাঁজ থাকিল; ধীর সমীরণে পরিধেয় খণ্ড উড়িতেছে, যে কালে ইত্যাকার ঘটে মেয়েছেলেদের গাত্র বস্ত্রে, তখনই উরু দেখা যায়! আঃ উরু! ব্রোঞ্জে মোমের শ্রী মসৃণতায় জরিত কোন কর্ত্তব্য বোধ লইয়া ইহারা কালা! ইহারাও কাটিয়া পড়িতে আছে! পুরুষেরা একই কায়দাতে সরিতে আছে!

হা হন্ত! কত কত অদ্ভুত উপাদান কাঠ পাথর, ধাতু, ইঁট ভেদ করিয়া আসিলাম এখনও তেমনি বিন্দু! আমার ডৌলত্ব আর তাহা আলো পাচার করিয়াছে।

গণৎকার, তুমি ত্রিকালের প্রবক্তা, বল এ কেমনে ঘটিতেছে, জ্যোতিষী, তুমি খড়িপাত, কোন জড়ত্ব অতিদূর আলোক বর্ষ ধরিয়া আসিয়া, ইহাদের এইভাবে মতিচ্ছন্ন করে (!)।

আঃ তোমারই কথা ভাবিতেছিলাম, তুমি...ঐ দপ্তরের খোদ কর্ত্তা, কেস (case) না সাজাইয়া বল

দেখি, কেন এমত করে। ঐ নির্দ্দেশ ইস্! কি বা রক্ত জল করে, দেখ দেখ আমার হাতের তালু কত ঠাণ্ডা! কি তুমি নীরব কেন! আঃ স্থির হও, তোমার বুটের মস্‌মস্ শব্দে তোমার রন্ধনের তলা লাগে! ধিক্ কাল চশমায় লজ্জা ঢাকিতেছে। শত ধিক্! ঠাকুর আমরা আর কতকাল আমাদের রক্ত শৈত্য বহিব।

হা ঠাকুর কবে কবে—আমরা খুন করিব!

আকাশবাণী: খুন হওয়ার পরই যখন সেই খুনিতকে ভ্রাতা বলিবে যাহাতে সে ভ্রাতা বলিয়া অভিহিত হইবে না!

হায় কি পর্য্যন্ত মায়াতে এই বৈখারী!

আঃ বিচারক। জানি, তোমার উইগ, জানি তোমার হাতুড়ি—জানিও এমন স্থান আছে, যেখানে বিচার্য্য ব্যক্তির হাতেও হাতুড়ি আছে—তুমি নৃতত্ত্ব জান, তুমি তত্ত্বজ্ঞ, পুরাতন বিধান সোলমানের বুদ্ধি, সমদর্শী কাজীদের অটলতা তোমার মনকে মোহশূন্য করিল; তোমাকে শত্রুহীন করিল!

আঃ যে এখন তুমি বহুত অভিজ্ঞ—এখন তুমি সাধারণত্ব, থাউকো করা, ছাড়িয়া অর্থাৎ সাধারণের ষড়রিপু ছাড়িয়া অপরাধীর কারণে চিকিৎসা বিজ্ঞানে আঁকশিতেছ, ডাক্তার ডাক! আঃ কবে তুমি মাকে দর্শাইবে!—বল হে, তবু উহারা এমন করিতেছে কেন!

অপরাধ খুঁজিতেছে যে জন্মের কোন সে অপরাধে তাহারা এমন!

তাহা হইলে তোমার মীমাংসা অনুযায়ী এই সূত্র গঠিব, যে জাতক জন্মের জন্য দায়ীক নহে, কিন্তু জন্মের অপরাধ তাহার! বিচারক মানিও, বিনামেঘে বজ্রাঘাত, হঠাৎ দুর্ঘটনা দেখিলে, এখনও আমি তারস্বরে আহা শব্দ আর্ত্তনাদে গগন ফাড়িয়া থাকি! কিন্তু ঐ দৃশ্যে আমার বংশ মর্য্যাদা, শিক্ষা, সহবৎ নস্যাৎ হয়, তাই জিজ্ঞাসা করি মি লার্ড!

হা মায়া! তাই এই বিকার বাচালতা! মায়া রাক্ষসী।

ইত্যাকার পদ সঞ্চালনে তাহারা নিজেদের পদচিহ্ন মুছিতেছিল, কিন্তু তাহারা সকলে জানে না যে তাহাদের ঐটি ঐ চিহ্ন হাতে থাকিয়া গিয়াছে, তাহারা উচ্চৈঃস্বরে খেদোক্তি করিলেক, এ পথ এই স্থান বড় ভয়ঙ্কর! ইহা বলিতে কালে, তেমন কার্য্য করে যাহাতে মুছিতে থাকা!

ঐ বাক্যে অন্ধকার কৃষ্ণতম হইল; সেই গীত তাহাদের একমাত্র চেতনা, ইহাই, সাব্যস্ত হইল, যে এবং ঐটিকে ফুস্‌ফুস্ দ্বারা! দারুণ জোরে কব্জা করিল, পুনরপি হাঁকিল, এ পথ!...

আঃ নিশ্চয়ই সেই জনসংঘের প্রতি ইহা, সেই যাহারা নদীর আড় পারে দাঁড়াইয়া এক বিচিত্র অন্ধকার; ভারী করুণস্বরে মিনতি করিল, তোমরা যাহারা যাও, তোমরা যাহাদের আঁধার বৈ আমাদের আর কিছু ঠাওর হয় না, তোমরা কি শুনিতে পাও! যদি...

পাই! ইহারা কণ্ঠস্বর এলাইয়া উচ্চারণ করে!

আমরা শুকাইয়া আছি, ইহা প্রতিধ্বনিত হইল, পুনঃ স্তব্ধতা বর্ত্তাইল, পুনঃ মিনতি শ্রুত হইল, পার কর!

ইহারা নিজেদের মধ্যে বিস্ময় প্রকাশিল, পার! ঐ সুদীর্ঘ সারি! রাঙচিতের বেড়ার মত যাহা ঐ আড়পারে ওতঃপ্রোত! অত লোক, রথের আড়ং নৌকা কোথায়, বাহিব কি দিয়া? তদুপরি গতর নাই! ইহা অসম্ভব!

যাহারা যাইতেছে কয়েক দিবস পর, তোমাদের দেখিলাম, বিমুখ করিও না আমাদের ছাওয়ালগুলিকে অন্তত বাঁচাও! আহা তাহারা শুকাইয়া আছে! আমরা শুকাইয়া আছি!

এই কথা এইপারের গাছেতে লাগিল, মুহূর্ত্তে বৃক্ষপত্র শুকাইয়া বায়ু চালিত হইল—ইহাদের গায়ে পড়িতে ইহারা আঁৎকাইল এদিক ওদিক খানিক ছুটিল। দল ছাড়ভয়ে বেশী দূর যায় নাই। ঐ তাহারা কাঁপিতেছে।

বেচারি যমের অরুচি সকল! আঃ আমরা নিজেরাই অন্ধকার, নিজেরাই অন্ধকারে আরও জড়াইয়া পড়িব! ঐ গীতও ক্রমে নিরর্থক হইতেছে, ঐ মেয়েছেলেরা, আঃ উহাদের গাত্র স্পর্শ করিব! এবং পরক্ষণেই হো ও ও...ও আওয়াজ দিয়া আবার চলিতে আরম্ভিল! ঐ মিনতি, আমরা শুকাইয়া আছি,

একাধারে তাহাদের মৃত চক্ষুর্দ্বয়কে শুধু বড় করে, তখনই অবাক যে তাহারা চোরা! হা এখন যেহেতু শরীর আছে সেই হেতু মন নিঙ্‌ড়াইল; পুনঃ কহিল, হা ঠাকুর পাপ করিলাম! আঃ ইহা এতৎ কারণ বশতঃ যে, ঐ গরবের পরক্ষণে তাহারা আত্মপ্রসাদ মেয়েছেলেদের স্পর্শ করিবা মাত্র বিদ্যুৎ খাইল!

এখন ধ্রুবই এক গূঢ়তম অন্ধকারে তাহারা আবর্ত্তিত হয়, তাহারা এখন কুকুরের ক্রন্দনের মতন আওয়াজ করিতেছে, মেয়েছেলেরা স্বল্প আঁচল দিয়া (!) ঘোমটার কাজ-চলে, এমনভাবে মুখাবৃত এবং তেমন অবস্থায় উলুধ্বনির প্রকারে শব্দ করে, যে ইহাতে মুখ আবরিত বস্ত্র খণ্ড ভৌতিকভাবে নড়িতেছিল; অন্ধকারে এহেন পৈশাচিক কাণ্ড সংসাধনে তাহারা নিজদিগকে ভীত করিতেছিল!

অন্য কিছু শুনিল না।

বেটাছেলেরা এই সংগঠনে ক্রমে এমত আতঙ্কিত হইল, যে তাহারা ভূতচালিত কম্পিত থাকে; অল্পবয়সী বালক, ক্রোধযুক্ত বিড়ালের ন্যায় মুখের এক পাশ দিয়া আওয়াজ করিল, কিন্তু পরক্ষণেই বিছুটি জ্বালা চীৎকারে সে ভেড়ী পথ ধরিয়া ছুটিল, ধূলা উঠে। সকলেই দ্রুতপদে এখন কাহারও উদর চল্‌কাইতে আছে, তেমন ধারা পাশবিক আর্ত্তনাদ বর্দ্ধিত আছে, কেহ দুই হাত পুস্তক আকারে চোখের সামনে ধরিয়া নির্ব্বাকে পাঠ করে, ঠোঁট কাঁপে, থামিয়া চীৎকার করে।

এই দরজাস্থ সকলে ঐ ঘটনা, যেখানে তাহাদের নীচতা, যদি, প্রমাণিত হইয়াছে,—তাজ্জব যে ইহা বিবেচনার মন তাহাদের আছে—তাহা হইতে নিজেদের ছাড়াইয়া আনিল, তবু তাহাদের সেইখানকার ধূলা এখনও তাহাদের পায়েতে আছিল বোধে, কিয়ৎ অস্বস্তি হইল! আর যে ক্বচিৎ মনে হইল, ইহারা কি সেই নদীর আড়পারের তাহারা! যাহাদের তাহারা বলিয়াছিল, ঐখানে থাক্ তবু আশায় মরিবে না, তবু ভাল যে জলদ্বারা তোমরা বেষ্টিত, তবু ভাল নিজের জনমকে দূষিতে পারিবে! তবু ভাল যে ভগবানকে বলিতে পারিবে, ইহা কোন পাপে! এবং ইহা নদীর ঢেউরা হওয়ায় ছিন্নভিন্ন হয়; কিন্তু জানিও আমরা কোন তঞ্চকতা করি নাই; আমরা বিশ্বাসঘাতক নই। ইত্যাকার চেতনায় তাহারা ঐদের প্রতি নেহারিল। অথচ শিরায় সেই ছি ছি রহিয়াছে!

পুনর্ব্বার ঐ হাভাতেরা অন্যপক্ষদের ঝাঁকি দর্শনে দেখিল।

ঝরোখা ঝরোখি দর্শন ইতিহাসে আছে, ঝাঁকি দর্শন ভিন্ন, শুনিয়াছি বৃন্দাবন আগত শব্দ! মাধবের সমক্ষে পর্দ্দা আছে, দর্শনাতুরদের দেখাইবার জন্য নিমেষের জন্য পর্দ্দা সরান হয়।—যেহেতু আবছায়া মনে পড়িল, উহারা হেলে গর্ত চিনিতে খুব পাকা এবং তাই নিজেদের মধ্যে অতীব নিম্ন স্বরে কহিয়াছে তবে বটে ইহারা আমাদের ভাগীদার নয়? ইহাদের মনে কি আছে! পেটভাতা ইহাদের জীবন! এবং জানতে চাহিল লবণ আছে, যদি থাকে দিয়া দাও! লবণ!

লবণ! আমরা লবণ যাচ্ঞা নিমিত্ত আসি নাই, তোমরা কি বিভ্রান্ত হইলে, তোমাদের বৈচিত্র্যের শেষ গঙ্গাস্নানেও হইবে না, তুমি আবার! তুমি চীৎকার কর, উহারে থামাও এখনও যে ঐ ধ্বনি, তুলিতে আছে!

তোমরা যে অনবরত কি বিড়বিড় কর, কেন কর, ওহে।

দরজাস্থদের উক্তিতে, ইহাদের ধিক্কার জন্মিল, আমরা হায় কোন শব্দ এড়াইতে এইদের ধমকিয়ে আসিলাম। আমরা হাত কামড়াইব, পূর্ব্বে কি সূর্য্য উঠে।

মরণদশা লবণ, ত্বরা কর, ইহারা বরযাত্রী ইহারা মাননীয়, ইহাদের অতীব সামান্যতম যাচ্ঞা তোমরা মিটাও; এইটুকু বলিতে বক্তারা উৎসাহিত আছে, স্বীয় কান সকলে হাত দিল শুনিতে নিজেরা যাহা বলে, তাহারাই যাহাদের স্বরে একপক্ষর ভেদবমি আদি ঘটিল; যে অন্যপক্ষ পথ দেখিতে পাইল না! এখন ইত্যাকার প্রকাশে প্রমাণিল তাহারা কাঁচা ডাল কখনও ভাঙে নাই, হস্তীশুণ্ড যেগুলি ভাঙিয়াছে, ক্ল্যাসিকে আছে, তাহাই সংগ্রহ করে; তাহারা পুরাতন; আর তাহারা এ পৃথিবীর কত না ভালমন্দ জানে! নিজেরা অভুক্ত শরীর উপছাইয়া বিশাল হইল। বলিল, দেখ না কিবা লক্ষ্মীমন্ত চেহারা ইহাদের, ইহাদের ক্ষেত্র দিয়া সন্ন্যাসী সকল পথ অতিক্রমিয়াছেন; দেখ না কেশরাশি মেঘরা; আরও কহিল একি ইহাদের আমাদের মত দেখি কেন! ইহা ভুল! ইহারা অভিশপ্ত দেখ না আরবার ইহাদের আসল রূপ খেলিয়া উঠে, জানিও—ইহারা ভাতের দলা কখনও নাচাইয়া খায় নাই যাহা করিলে লক্ষ্মী ছাড়িয়া যায়; ইহাদের

ঘরে মঞ্চ আছেন, তুলসীমঞ্চ, গিরি আছেন; গিরিগোবর্দ্ধন; ইহাদের রমণীগণ শিশু সন্তানকে আগান বাগান ভ্রমণে ভুলাইতে থাকিয়া খাওয়াইয়া থাকে, ভাতের দলাকে কাগের ডিম বকের ডিম তথাদি সুন্দর নাম দিয়া শিশুকে ভুলাই থাকে। ইহাদের স্ত্রীসমাজ, বার্দ্ধক্য বশতই পতিব্রতা হয় না, আঃ দ্বিপ্রহরে কখনও ভিক্ষা দিতে বাহিরিবে না—রামায়ণ গত সংস্কার; ঘোমটা ইহাদের দুর্ব্বাদল অর্থাৎ ঘাস সকলের যেমন প্রখর ঝড়ে, একরূপই থাকে, ক্ষতি হয় না তেমনি, ইহাদের পদদ্বয় হরিণ! এই বরযাত্রীদল, এই শেষ জন্ম ইহাদের; ধন্য ইহারা, আর ধকল ইহাদের নিমিত্ত তোলা নাই, জানি বরাদ্দ নাই তাই এতেক আনন্দময় ইহাদের চেহারা। ইস্ লজ্জা! যদিও এখন আমাদের উপস্থিতিতে, আমাদের বোকামীতে (!) ইহাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল তথাপি ইহারা তেমনই রহে, আনন্দের বরপুত্র! লবণ দাও!

একি প্রকার মতি, তোমরা বুঝিতেছি, আমাদের সহিত ক্রীড়াচ্ছল কর! ধিক! তোমাদের শাসন করিতেও আমাদের লজ্জা হয়, তোমরা কি সকলে পাগল হইলে!

তৎশ্রবণে এইরা এমতভাবে তাকাইল, যাহাতে নিশ্চয় হয় যে বলিতে চাহিল! পাগল! পাগল না হইলে এই হাল, এই জীবন, এই দেহ এ বিড়ম্বনা সহ্য কেমনে করিব, ইহার কুইনীন নাই, ম্যালেরিয়ার ঔষধ বিশেষ, পাচন নাই! পাগলামী—জীবন যাহার মহৌষধী!

ধিক এখনও চীৎকার কর! দেখ দেখ উহাদের ঐ মেয়েছেলেদের, তোমরা বলিয়াছ তখন, আমরা এই স্থান যদিস্যাৎ পরিত্যাগ না করি তবে, কোর্টঘর হইবে, মামলা বিলাত ছুটিবে, মানে Privy Council! অবশ্য (!) ইহা ফৌজদারী গঠিত কথা! কিন্তু বন্ধুগণ তোমাদের ঐ বিকট ধ্বনি উহাদের দুইজনকে, অথচ সত্যই একটিকেই, অচেতন করে, কি পর্য্যন্ত আতঙ্কিত করে! এমত দৃঢ়তায় কহিল যাহাতে এই আশা, আমরা যখন সাবালক (!) হইব, আমাদের মধ্যে কেহ যখন উহাদের দুই মুঠা দিতে পারিব তখন আমাদের মধ্যে কেহ উহাদের পাণিগ্রহণ করিবে। ঘর বাঁধিবে! এখন তাহারা বুঝি খোয়া যায়, দেখ দেখ উহাদের!

দ্বারস্থ অভাজনেরা ঐ প্রতি ইত্যাকার অনুনয় বচনে নেত্রপাতিল; এখনও তাহাদের ঠোঁটে সেই মারাত্মক সূত্র প্রায় অনুহ্যই রহিয়াছে, এখনও কাহারও হেঁচকি উঠিতে আছে, এখনও কাহারও ক্রমাগত ঢেঁকুর ঘাই মারিতে আছিল; এখনও কাহারও পেট ডাকিতে আছে, কি বিতিকিচ্ছিরি ঘেন্নার এই দল। কাহারও প্লীহা ফাঁপা উদর। তাহাতে নাভিকুণ্ডলী নাই, নাড়ী কাটার দোষেতে সেই স্থলে মাংসপিণ্ড, ইস্ কি পাপ! আশ্চর্য্য মানুষের বিকৃত কিছুতেই কবি দান্তের কথা লোকে স্মরণ করে! বেচারী দান্তে আমাদের খালি ত্রাসিত করে, তাঁহার সৌন্দর্য্য অদৃশ্য হইল।

দুঃস্বপ্নের পাপ! কি বা বীভৎস!

আঃ ধন্য আমরা, ধন্য আমাদের সুক্ষমতা! ঐ তাহারা এমত ন্যক্কারজনক রূপ লইয়া, দেখা যায় ঐ মেয়েছেলেদের দর্শনে পাঁচ কাঠা প্রমাণ দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিল!

অহো আমরা ধন্য, আঃ মনুষ্য তুমি আলেখ বীজ, কুসুম সকলের প্রাণভ্রমর! যেহেতু তোমরা আপশোষের সমব্যথিত হওয়ার শ্বাস ত্যাগ দেখ, দেখ মনুষ্যরূপে ভেদ বমি সকল নিমেষেই অদৃশ্য হইল, ইহারা যুবরাজ। অহো তোমাদের সবাকার দীর্ঘশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হউক, বৃক্ষ জল ঝড় আপৎ শান্তি যাবতীয় কিছু সুখে তোমার হৃদয়ে বাস করুক।

দেখে, ঐ সেই মেয়েছেলেটি, উদ্গার যাহার কিঞ্চিৎমাত্র প্রশমিত নহে; এই সেই যে উড়োজাহাজ প্রত্যক্ষিতে মুগ্ধ হইবে, এবং সে ঐ যন্ত্রের শব্দ পর্য্যন্ত নকল করিতে হয় পারদর্শিনী, আর যে কহ্লার ইত্যাদির নাল শালুক খাইয়া তাহার মানসিকতা বিনষ্ট হয় নাই, সে অতএব, ঐ কাদায় পড়িয়া যাইতে, যখন তদীয় আয়না সমেত চূড়ীর টুকুরা গাত্রে ফুটিবে! হায় ইতঃপূর্ব্বে বেচারী আর সকল টুকরা কুড়াইতে মানসে হস্ত প্রসারিত করিবে।

দলীয় সবাই কহিল, না না উহা কুড়াইও না! যে এবং হস্তের দ্বারা ঈদৃশী নিষেধ অভিব্যক্তিবে যাহার অর্থ এই হয় যে, টুকরা কুড়াইও না, উহাতে আমাদের নাম নাই ঠিকানা নাই আমাদের লজ্জা নাই, চেতনা নাই, যেটুকু আকাশ বাতাস উহাতে থাক, ঘাঁটাইও না, আমরা আমাদের নিজেদের পাঠ করিয়া লইয়াছি, উঠ চল! যে এবং অবশেষে নিষেধকারীরা খুব জবর আজ্ঞাতে হাত নাড়াইল, যাহাতে বলা হয়, উহা মায়ের দেওয়া নহে, মা যদি আপন মুখ চর্ব্বিত পানের খানিকাংশ দেন, তবে যেখানেই পড়ুক ধূলা

ঝাড়িবার, বাদ দিবার কথা ওঠে না; এইরূপে তাহারা আজব কম্পিত হইয়া বলিল, আমাদের জন্য নিশ্চিন্ত থাক আয়নার প্রয়োজন মিটিল, আমরা আমাদের নিজেদের খেয়াল রাখিব না।

ঐ মেয়েছেলেটি এখনই যে এমনও উদ্গার করিতে পারে, ঠিক তেমনি সে আওয়াজ মন্থিতেছে; ইহা হাস্যর; আরও বিকটের যে পার্শ্বস্থিত একজনা এই সময়েতে অযুত কর্ত্তব্যবোধে ঐ আতুরের উদ্গার ধমক যাহার আছে, তাহার উকুন বাছিতে ব্যস্ত।—আলেকজাণ্ডার উলকট হঠাৎ মনে পড়িল—সরল উদ্দেশ্য এই যে, যাহাতে বেচারী আরাম পায় যাহাতে বেচারী বিশ্বাস না হারায় যে তাহার স্বজন জ্ঞাতিরা! আছে, যাহাতে বেচারী বোধিত হয় যে সে কিছু জলে পড়িয়া নাই; বাধ্যতে বেচারী পদ তিনবার ব্যবহৃত হইল ইহাতে অলঙ্কার হয়; ডেকরেটিভ!

আর যে উহার অর্থ এই সংস্থানে, সকলে বিমূঢ়—যথার্থ করিয়া বলিতে যদি হয়, ঐ চীৎকারকারীরা অনাহারে সিঁটানো দেহগুলি—এমন বুদ্ধিতে আছে যে এখন যদিস্যাৎ রেলের সিটি শুনিবে, তবে তাহারা মানিবে, উহা শঙ্খধ্বনি এবং উহা আইসে গৃহস্থদের বাড়ী হইতে! যখন ইহারা প্রত্যেকেই ঈদৃশ আলস্যে রহে!

তখন অন্যরা কহিল, দেখ এখনও আমাদের অমান্য করিতেছ, দেখ কি বা দুর্দ্দশাগ্রস্থ ঐ জন, তোমাদের আওয়াজ এমত মারাত্মক যে, উহার অস্থি মজ্জা পর্য্যন্ত জ্বরিত হইল, প্রবেশিয়াছে উহার অভ্যন্তরে, সর্ব্বত্রে, ঐ শব্দই এখন বেচারী, তোমাদের ধ্বনিই উদ্গারিয়া ফেলিতে আছে; কেননা উহা যাহা ধ্বনি তাহার ভঙ্গী, বলিতে বিচার, সকলকে বিনষ্ট করিবে, তোমরা কি ওলাউঠাতে কলেরাতে এরূপ দেখ! দিনমানে কি শৃগাল ডাকিবে! আঃ ভয়! দেখ ঐটিকে।

এই ব্যক্তিদের সালিশিতে, ইদানীং জলবৎ তরল হইল যে ঐ ব্যতিক্রম, ঐ মেয়েছেলেটির কিছু মর্য্যাদা—সত্য আছে; এবং তাহা একশোবার, যে সত্যর হেতুতে সে ঐ প্লেন, উড়োজাহাজ বহর দর্শনে, আমরি, কহিল; সে আপন পৃষ্ঠদেশে, যাহা খোঁচাইত, হইয়াছিল, তাহাটি আয়না, যাহাতে ঐ রম্যশোভাযুক্ত জঙ্গীবিমানগুলির প্রতিচ্ছবি লাভ করে, এখনও তাহা বিষয়ে ভাবিত হয়, অর্থাৎ তদীয় দেহ বিঘ্ন হইয়াছে বিমান ও আয়নাসহ টুকরোটির!

ছোটবেলাতে রিখিয়ার হাটে, ঠিক যেখানেতে ছেঙলি পানওয়ালা, ছয়টি অঙ্গুলি ছিল, যেখানে বসিত, তাহারাই পার্শ্বে রকমারি জিনিব লইয়া যাঁহারা তাহারা গালার আয়নাদার চূড়ী বেচে, দেশওলী ও সাঁওতাল স্ত্রীলোকরা ছাতা বগলে ঐ দোকানের সমক্ষে বসিত, চূড়ী কিনিবে: আমাদের বড় সৌখীন করে ঐ ছবি! আমরা একটি ছড়া লিখিলাম,

কালা হাতে চূড়ী গুলাবী রঙ্‌,
আয়না তাহাতে অনেক লাখ্‌,
আকাশ পাহাড় বাসা পেল—।
মন ভেল মোরা এলো মেলো!

প্রথমের কালা হাত বদলে, সোনা হাতে করিলাম গিরিডিতে, কেননা তখন প্রমীলা কাকীমাকে দেখি, তদীয় বাম হাতে তেমন চূড়ী ছিল, তিনি আমার বয়সের দ্বিগুণেরও বেশী ছিলেন, তিনি আমাকে প্রায় এই ছোঁড়া সম্ভাষণ করিতেন, দোষ দেখিলেই দাঁড়া তোর মাকে বলিয়া দিতেছি এবং সেই অপরাধে আমি ভীত হইতাম। এখনও ঐ সোনাহাত বদল করার জন্য বড় লজ্জা পাই! কি অসৎ।

সোনাহাতে চূড়ী গোলাপী রঙ!

ঐ মেয়েছেলেটি যে উড়োজাহাজ দেখে আর ঐ চিন্ময় দৃশ্য! সে নিশ্চয় চাহিয়াছিল, ঠাকুর এই করুন যেন এই দেহ—ঋষিজনরা যাহাতে নিমিত্ত, দুঃসাহসীরা যাহা ধূলা বলিয়াছেন, তাহা যেন ঐ ইনোসেন্স-এর দৃশ্যের প্রতিবন্ধকতা না করুক, সোজা এখন আমি ভূমি ছাড়িয়া উঠিতে অক্ষম, আর উঠিতে যদিও বা পারি তৎপূর্ব্বেই ঐ রমণীয় বিমান বহর এই আকাশ পরিত্যাগ করিবে! ঐ ছোট আয়নাতে প্রতিফলিত হউক, সেইখানে যেখানেতে তদীয় মুখমণ্ডল উজরিয়া থাকে, অতঃপর শুধু ঐ সাদা রোমঞ্চ হইয়া বর্ত্তাইবে তরঙ্গ প্লেন বহর! ভগবান তোমার গাত্রে, নামে যে এতাবৎ ধূলা লাগিয়াছে, তাহা মদীয় এই কামনার জোরে সংস্কৃত হউক, তাহা মুছাইয়া দিব এই জীর্ণ অঞ্চলের দ্বারা; ভগবান আমার প্রশ্বাস কোন দিবস দর্পণকে ঘোলা করে; ভগবান ঐ উড্ডীন শ্বেত ভাস্বরতাই আমার সকল

প্রয়োজন সিদ্ধ করিবে! এই সকল শব্দ কম্পনে, সৌন্দর্য্যে, তদীয় দেহ অস্থির হয়; এই অভুক্ত দেহ আয়নাকে আড়াল করিবে না, ইহা আটক হইতে নারাজ হয়! যে এবং এই সুকৃতির ফলেই এই মেয়েছেলেটিই সর্ব্ব প্রথম সেই খঞ্জ বেচারীর করুণ মিনতি শুনিতে পাইয়াছিল।

আগতদলের দ্বারা ঐ অঘটন দৃশ্য প্রদর্শনে, এই দরজাস্থ, এই দরজা যে বাড়ীর তাহার দ্বিতলে এক শূন্য খাঁচা দেখা যায়, ঐটিতে একদা এক সুশিক্ষিত ময়না পক্ষী ছিল, গৃহকর্ত্রী বিশ্বাস করিতেন, উহা তাঁহার দিদিমা, যিনি বহু দিন স্বর্গগত, তিনি এই জন্মে ঐ পক্ষী। ঐ ময়নাটিরে খুব যত্ন করিতেন; তাঁহার, গৃহকর্ত্রীর, একমাত্র সন্তান রোগাক্রান্ত হয় এবং যে রাত্রিতে মারা যায়, ঠিক মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণে ঐ পক্ষী ডাক্তার ডাক্তার বলিয়া উঠে; পরে, প্রত্যহ যথার্থ সময়ে ডাক্তার ডাক্তার বলিয়া উঠিত! গৃহকর্ত্রীর ইহাতে অসহ্য হইবার বিধায় ঐ পক্ষীকে মুক্ত করা হইল; ঐ গৃহকর্ত্রীর জাতে নীচু এক ব্রাহ্মণ সন্তানের প্রতি মায়া জন্মায় এবং তাহাকে তিনি ভিক্ষাপুত্ররূপে—উচ্চজাত হইতে পোষ্যপুত্র লইলে ভিক্ষাপুত্র বলা হয়। গ্রহণ করেন। এই বাড়ীর দরজাস্থ এখনকার হাভাতেগণ সামনের ঐ চিত্তবিদারক দৃশ্য এড়াইতে মানসে ডাক্তার ডাক কি ভীষণ! যত্রতত্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, দূরে, জল কোথাও মহিষের কঙ্কাল কাকতাড়ুয়া জাগিয়া আছে।

ইহাদের মধ্যে যে মেয়েন্যাকড়া—ইহাদের হাবভাবে স্ত্রী কণ্ঠস্বর, স্ত্রীলোক সুলভ—সে আপন শীর্ণ অঙ্গুলি লইয়া ছেলেভুলান এক মজার কারচুপি করে, যে, ডান হাতের কনিষ্ঠ অঙ্গুলি বাম তর্জ্জনীতে স্পর্শ করত কহে, ইহা বলে খাব খাব।

এবার অনামিকা স্পর্শে, ইহা বলে কোথায় পাব।

এবার মধ্যম স্পর্শে, ইহা বলে ধার কর না।

এবার তর্জ্জনী, ইহা বলে শুধিবে কে তাহা!

এবার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শিয়া কহে, জানে কে তাহা লবডঙ্কা! যে এবং নিজেই হাসিতে চেষ্টা করে! ইহাতে আগতরা ঝাঁঝিয়া উঠিল, ধিক্ তোমাদের, তোমাদের কি এতটুকু দয়ামায়া নাই, আমরা কি এইখানেই থাকিব! ক্রমে সকলেই উন্মত্ত হইব! ইহা হইতে নদীতে যে ভয়ঙ্কর জীব সকল সম্প্রতি আসিয়াছে, যেহেতু পাপ ছাইয়াছে, তাহাতে বা কুমীর যে মানসে (!) ঘুরিতেছে, বা কামটে প্রাণ বিসর্জ্জন দেওয়া শ্রেয় ছিল! এ কি চীৎকার ধ্বনি! আমরা যে মানুষ তাহা যমকে কেমন করিয়া মনে করাইব! তোমাদের কি মর্য্যাদা নাই! বল! এখন এই আগতের মধ্যে যে অল্প বয়সী ছেলেটি; যে এতাবৎ স্বীয় দলের ব্যবহার তথা অভিব্যক্তির সমস্ত কিছু অনুকরণ করিতে সমর্থিল তাহাও, ঐ অনুকরণ, যারপরনাই মোটা ধাঁচের; সে যেমন হয় ভেড়ুয়া, মনে হইবে কেরিকেচার করে, যাহারে দেখিয়া ঐ ভীষণ চীৎকারকারীরা থ, বালকের ভাবে তাহারা কাঠ; স্বপক্ষীয়রা মাঝে মধ্যে উহারে শাসন ধমক 'হেই' বলিয়া উহার রাশ টানিতে চাহিল, যাহাতে ঐ অল্পবয়সী, আপন বিষয়ে বড়দের সমালোচনাতে, নিজ গাত্রে টাল খাইল, যে এবং অন্যদের প্রত্যঙ্গ সকলের ভুল বা বিকৃতি যেন বা আপন হাতে জমিয়াছে, অতএব সে হাত নিরখিতে লাগিল।

এখন, ঐ মেয়েন্যাকড়াকৃত হাতের খেলা বালকেরে মজাইয়াছে; সে ক্রীড়ক, আপনকার কোমরস্থ খানিক জায়গাতে যে চর্ম্মরোগ তাহাতে নখাঘাত করে, অবশ্য এই কার্য্য তাহারে অল্পই সুযোগ দিয়াছে—সমক্ষস্থ হাভাতেরা অনেকেই, যাহারা তীব্র গঞ্জনাহেতু পদনখে মৃত্তিকা খননিতেছে, তবু বালক অস্থির: সে ঐ তরিখা শিখিবে; অহো কি বা বিস্ময়কর চমকপ্রদ, ঐ অঙ্গুলির গল্প উদ্ভাবন শক্তির কি চেহারা! অনাহারে ক্লিষ্ট, পনেরো আনা উলঙ্গ, কিন্তু সে শিখিবে; ঐ খেলা তদীয় বুদ্ধি হইবে! সে মজা দেখাইবে, দর্শককে সমঝ দিবে, খুসী করিবে।

এখন এই মুহূর্ত্তটিই বহু যুগান্তর আনে; তবে দেবতারা যে দুন্দুভি বাজাইলেন তাহা নিরন্নদের কাতরোক্তিতে ম্লান হইল; বটে যে সে মহা প্রশংসাতে ঐ বাহাদুরটির, মেয়েন্যাকড়াকৃত, প্রতি হাইয়া আছে, যে এবং নেহাৎ শিশুস্বরে তাহারা প্রত্যেকেই অনুরোধিল; আবার কর, বলিয়াছিল, 'আবাল্ কলো'।

আঃ এই শিশু কণ্ঠ আওয়াজে স্থাবর জঙ্গম সমস্তই যুগপৎ হরিধ্বনি করিয়া উঠিল। কিন্তু দুইপক্ষ হাভাতেরাই যে যাহার পদস্থ মাটি দেখিল, যে যাহারা চারিদিক নজরাইতে মস্তক ঘুরাইয়া যখন পুনঃ

পূর্ব্বকার অবস্থাপ্রাপ্ত হইল তখনই বড় যন্ত্রণার ধ্বনি আঁ আঁ শব্দ ঐ দরজাস্থদের—আমাদের প্রতি লাইনেই মনে হয়, ইহা কি জানিতে পাঠক রাজি হইবে—হইতে আসিল!

অন্যপক্ষদের কাহারও হাতে কচুপাতা মুড়িয়া ধৃত বিছুটি, ইহা একপ্রকার বিষময়ী লতা, ইহার স্পর্শ মনুষ্যগাত্রে লাগিলে ত্বক ফুলিয়া উঠে, অসহ্য চুলকানি ও জ্বালা হয় ঐ লতাতে, যাহা শায়েস্তার নিমিত্ত ইহারা আনে। তৎপ্রতি, হঠাৎ অপ্রত্যাশিত বিপক্ষীয়দের করুণ রোদনসূচক লক্ষ্য করে এবং তৎক্ষণাৎ ফেলিয়া দিল, নিশ্চয়ই জ্ঞান হয় এই ভুল জন্মায়, যে ঐ লতা তাহারা ব্যবহার করিয়াছে, আর প্রয়োজন নাই যে এবং লাট মহলের শোভা ঈষৎ পাংশু বর্ণ ধারণ করিল, অথচ যে এখনও অবশ্যই যদিও তাহারা ত সশরীরে বর্ত্তহিয়া আছে এখানে 'তাহারা' বদলে মানুষ লেখা যাইত, তাহাতে এখনকার ভাগ্যহীনরা চোখের সামনে হইতে সরিয়া একটা সাংবাদিক রূপ লইত, সৌখীনতা নিছক যাহা; তাহারা ত দারুণভাবে জীয়িয়া আছে।

যে কেবলমাত্র উহাদের নানাবিধ এখন আতুর আওয়াজ বিষয়ে—প্রথমেই ঐ আওয়াজ বিশ্লেষণ করিতে এই আমাদের জিহ্বায় আসিল, অপুষ্টি, অপুষ্টিজনিত, ইহাতে আমাদের টিট্টিকার দিবার কিছু নাই; অন্যপক্ষে শাসন করা যায়, নিশ্চয়ই যে আমাদের চোখে যাহারা ওতঃপ্রোত আছে, যে, আমরা যাহাদের কথা লিখিতে আছি, অন্তত এই পরিস্থিতে, কেমন করিয়া নিমেষেই তাহাদের ভুলিলাম—ইহা ধিক্কারের! যে অপুষ্টি শব্দ এখানে প্রযোজ্য নহে! যাহা নোংরা গাড়োয়ানীর প্রকার ভেদ মাত্র।—উদর পুরতি না হওয়ার কারণে যাহা সম্ভবিল এখন ঐ বিকৃত আওয়াজ যাহা ইদানীং শিশুস্বরে শ্রবণে ঘটিল, তাহারা স্থানকাল হারাইল, বুকফাটা যন্ত্রণায় কথা হারাইল—ক্ষুধা পাইয়াছে ডুকরাইয়া উঠিল, তাই ঐ আঁৎকান আর্ত্তনাদে আগতদের বুদ্ধিভ্রংশ প্রায় করিল তৎক্ষণাৎ ইহারা কিয়ৎ বিস্ময়ে তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে মন করিল, তাহারা উহাদের বিকার নিশ্চয় অন্তরাত্মায় উপলব্ধিয়াছে, কিন্তু সম্যক অবশ্যই ধারণা করিতে জোর পায় নাই, লজ্জা পাইয়াছিল, তাহারা স্তোভ আছে। নিজেদের স্বার্থে এক্ষেত্রে না ধমকাইয়া থাকা দুষ্কর, যদি না দরজাস্থ ব্যক্তিরা ঐ ধ্বনি থামাইবার কথা দেয় তাহাদের লোকেরা উন্মাদ হইবে! তাহারা পথ ধরিবে কি প্রকারে।

উহারা ডুকরাই উঠিল, বড় ক্ষুধা পাইয়াছে!

কিন্তু ঐদৃশ শব্দের সমক্ষে তাহারা তিষ্ঠাইতে পারিতেছিল না, তাহারা ঐ অভিব্যক্তিকে নস্যাৎ করিতে চাহিল কিছু পাশবিক রাগত স্বরে, আমাদের কথা কি তোমাদের কানে যাইতেছে! কহিয়া খানিক স্থির আছে; যাহাতে বুঝায় যে উত্তরের আশা তাহারা করে নাই; বা ঐ অঙ্গুলির গল্প তাহাদেরকেও অদ্ভুত প্রকৃতি দিয়াছে। তাহারা প্রত্যক্ষিল বিপক্ষীয়রা তাহাদের দিকে চোখ বড় করিয়া চাহিয়াছে!

হা আমরা নির্দোষ হইতে অপরাধের দিকে যাইতেছি যে, আমাদের ভিটে মাটি চাটি হইল; আমরা আমাদের পুত্রের মাথায় হাত রাখিয়া শপথ করিতে পারি, আমরা জ্ঞানত কাহারেও কষ্ট দিই না, একা পথভ্রমে শ্রান্ত হইলেও কখনও উচ্চ আসনে বসি নাই, বসিব কল্পনা করি নাই; আঁধারে লাঠি ঠুকিয়া বা হাততালি দিয়া চলিয়াছি—পাছে সাপের গায় পা পড়ে, আমরা পরের ক্ষেতের জল কাটিয়া লওয়ার গল্প শুনিয়া সমস্বরে যাহারা কাটে তাহাদের ডাকিয়াছি—ও তোরা আয়, আমাদের দেশে, ছিঃ পরের আল কাটা! আর আমাদের বড় ক্ষুধা পাইয়াছে।

তোমরাই না পেট যাহাতে না পড়ে চাট্টি চাল চিবাইয়া বেলা উজাইয়াছ!—ইহা উচ্চারিতে তাহাদের জিহ্বা থমকাইল; ইহাও মীমাংসিল, সত্যি তাহারাও নিশ্চয় কাণ্ডজ্ঞান হারাইয়াছে, তখন ভেড়ীতে দাঁড়াইয়া হেলেগরুর কথা উল্লেখিল, এখন এইরূপ কথা! তাহারা নিজেদের ধিক্কারিতে ছিল, পুনঃ নিশ্চয় উহাদের মুখে এমন কাতরতা আছে যাহাতে তাহারা বিচাল্যমান, এবং সত্বর উদ্দেশ্যকে স্থির রাখিতে ঐ মেয়েছেলেদের প্রতি নেত্রপাত করিল; আঃ ঐ সেই ঘুরন্ত অবলা!

এখানে উল্লেখ যে এই ভাবে ক্রমান্বয় চক্র দেওয়া অসম্ভব—কিন্তু আমাদের বাস্তবতা বোধের মীমাংসায় উহা আষাঢ়ে নহে। সেই বেচারী ঘুরিতে থাকে প্রতীয়মান হয়; তবে এখন কিছু মন্দা, কেশরাশি আর লহরীতে নহে; ঐ ঔষধ বলিতে পারাতে, আমানি উক্তিতে, এখন তাহাতে অহঙ্কার উজর, এখন তাহার উল্লাস খেলিয়া উঠিবে, যে সঙ্গিনীটির আমানি ব্যবস্থায় আরাম হইবে! আহা এই

বেচারীই, তদীয় মুখমণ্ডল এমন যে সে কাহারও গল্প আত্মসাৎ করে না, কাহারও কপাল চুরি করে নাই।—লাইনের মধ্যে আসিতে চাহে; অন্যদের বিবেক জাগ্রত করনে সে কতবারই না স্মরণ করাইয়া দিতে চাহিল, আমি ও অন্ধকার যে সময় ভেদ আর প্রায় নাই, অতএব!

তখন ঐ কথায় আয়না শোভিত। ত বটেই, কোন মেয়েছেলেই আমল দেয় নাই, তাহারা শুনিয়াছে, লাট চরাচর দেখিয়াছে কেননা।

হে মেয়েছেলেটি, তুমি আমা সবাকারে দারুণ গার্হস্থ্যে লইলে হরণ করিলে, তুমি অম্লান বদনে কহিলে, তোমার বাম স্তন ঈষৎ ছোট, উহা সন্তান সম্ভাবনায় পুরুষ্ট হয়, বুনো সীম ফুল রঙ হইল, ইহা ধূমল; তুমি আশান্বিত থাকিলে, যে মেঘ বরণ পুত্র তোমার আসিতেছে; তুমি মাঠে দাঁড়াইয়া উলুধ্বনি দিলে; এবং সেই বৃদ্ধার মতন যে নাতি হওয়ার খবর দিত, প্রকৃতির সকলকে এবং দিক সকলকে ধন্য স্তন দর্শাইলে; এবং নিজের ব্রহ্মতালু হইতে সুদীর্ঘ কয়েক গাছি কেশ সংগ্রহ করত, একটি কড়ি ফুটা করিয়া, উহা পাচারিয়া আপন কোমরে বাঁধিলে! ততঃ আকাল ধোঁয়াইল!

হায় ঐ সমস্ত কথার প্রতি বর্ণটি পর্য্যন্ত বস্তুত ঐ মেয়েছেলেটির, তিলার্দ্ধ স্বত্ব ঐ কথাতে তোমার নাই, ঐ যে সে মেঘ, যাহার উরুদ্বয় অবধি হেরিলে, গুরু আওয়াজে ডাকিল!

সে, এই যেখানে ক্রমে জন মনিষষিদের ঘুনসী ঢল হইতেছে, পাঁজড়ার ছবিতে বেনোজল কলুযিল; সে, ঐ মেয়েছেলেটি এইখানে দাঁড়াইয়া ঐ মঙ্গল কথা, সবে ধরিয়াছে তালগুলির প্রতি অবলোকিতে থাকিলে ও কহিতেছিল যে, এই গল্পটি তোমরা বহিও, আমি মরিব কিন্তু ইহার গুণ অনেক, ইহার নিরেখ নাই, ইহা যৌবনকে জাত দিবে, মড়াকে অমর করিবে! এই একমাত্র বিশ্বাস লইয়া সে পথ হাঁটিতেছে, ইহাই ঐ কথাই উহার চালা স্বরূপ, ইহাই উহার সিঁদুর!

আর তুমি কোন দেশীয় যে তোমার ফুলা চেহারা, ধন্য দুর্ব্বা কি তুমি ভুলিয়াছ, টিট্টিকার জনক রূপে তোমার অঙ্গে আকাল সেঁদিয়াছে, হায় তুমি, ঐ বেচারীর একমাত্র বাস্তু গ্রাস, কপাল চুরি করিলে; শোন এহেন বেনোজলের স্বভাবকে মন রূপে রচিও না, তুমি শঙ্কিত কণ্ঠে হলপ কর, উহা তোমার গল্প, এবং তৎসহ তুমি উহারে গঞ্জনা দিলে, ছড়া কাটিলে,

শুনে শুনে কাকা কয়।
গুয়ের পোকা বেছে খায় ॥

ইহাতে সেই ভেড়ী উপর, ভয়ানক কাণ্ড সংঘটিত হইল; তুমি রাগে হিংসায় অন্ধ; তখন রাত্র, তুমি উহার, যে ঘুমন্ত আছিল, গলা টিপিতে মনস্থিয়া ফুলা হস্ত দুইটি প্রসারিলে, প্রতিহিংসায় তুমি এমত স্থান রহিত, এতেক বিকট, যে কে পুরুষ কে যে প্রকৃতি তাহা তোমার খবর নাই, আকালের ঘাস মানুষের মাই খায়! ইহা নিশ্চয় তোমার নজরে হইল না; তুমি তোমার ক্ষুধাপিপাসার বৃত্তির শক্তি দিয়া ঐ ঘুমন্তর কণ্ঠ হাত দ্বারা টিপিয়া কষিতে থাকিয়া বলিতেছে, নিজ পিতা ভর্ত্তা যাহার, নিজ পুত ভর্ত্তা যাহার, যমের অরুচি, অরে সাক্ষাৎ পাপ! তোরে আমি ধ্বংস করিব! তোর রক্ত আমি তর্পণ করিব।

সেই আকালে খাতক, ঈদৃশী কমজোরি যে আপনকার দুহাত দিয়া বাধা দানে অশক্ত বরং উহা আশ্চর্য্য নিশ্চেষ্টা আছে, কব্জা ছাড়া ধড় মাটিতে এদিক সেদিক ভ্রমিতে আছিল, যে আর তার স্বরের পরক্ষণেই গোঙানি আরম্ভিল।

আমরা ধড়ফড়িয়া উঠিলাম; সমবেতর কণ্ঠ হইতে শ্রুত হইল; কি, কি, কোথায়, ওহে, বড় আশা করে এ পিঞ্জর'এর গায়ক তুমি কোথায়? আমরাই বা কোথায়, হা হা আমাদিগের উদর ঐ ত, এই ত আমাদের হাত, এই ত আমাদের হাঁ, ঐ ত জলরাশি এবং আকাশ! ঐ শোন মেয়েছেলের বক্ষে দুধ আসে, আমরা কি ঐরূপ গোঙাইতে আছি, অথবা উহা আকালের বাতাসের, বা পাতার শব্দ! আঃ উহা কিজন্য সংগঠিত হয়, উহা কি। কে অপ্রাণ কিছু করিতে আছে। আমরা কেন্ন ধীরভাবে, এই মধ্যরাতে, উহা শুনিতে আছি! কেহ কি ছাতি ফাটাইয়া জল চাহিতেছে, আমাদের কোনই হেল্ নাই; আমাদের উহা অতএব ভাল লাগিতেছে বা। আঃ ঠাকুর এইটুকু কর, ভাত যাক, একফোঁটা জলের নিমিত্ত ছাতি ফাটাইতে পারি, মনে হয় যেমন ঐখান হইতে আসিতেছে, হায় আমরা ছাতি ফাটাইতে ভুলিয়াছি।

এহেন বিলাপ করত তাহারা আপন শরীরগুলিকে চিতাইল, তাহাদের পদশ্চারণের শব্দ শ্রুত হইল একে অন্যের পাশ দিয়া যায়, পুনঃ ঘুরিল; শ্লথ পা ঘষার আওয়াজ ইহারা খুব মন দিয়া শুনিতে আছিল, যে এবং এক সময়ে প্রতিতে স্থির, উহা কি ঘটিতে আছে! ঐ ছাতিফাটা আর্ত্তনাদ গোঙানি; ইহারা ঐ ধিমে আলো আঁধারে সামনের ঐ ভৌতিক পাঁজাটি গ্রাম্য চোখে দেখিতে রহিয়া গুম হইয়া থাকিল, তাহারা কোন বুদ্ধির মনন পর্য্যন্ত করে নাই; আশ্চর্য্য তখনও ঐখানে নৃশংস ব্যাপার সংঘটিতেছিল।

তাহারা দেখিল তাহারা বুঝিল।

এখন সেই হিংস্র মেয়েছেলেটির অদম্য ক্ষিপ্ততায় বায়ু নিথর আছে, তাহার গাত্র হইতে পাশবিক আওয়াজ উদ্‌গত হইল, ও তদীয় জিহ্বা প্রলম্বিত দেখা যাইল! ইহারা যাহারা দেখে একটু দূরেতে বিভিন্ন স্থানে বিদ্যমান থাকিয়াছিল; কেহতে ঢের আলস্যজনিত সুখব্যাদনে হাই তুলিল! ঐ যাহা হয়, বা ঘটে, উহা প্রাকৃতিক কিছু বা! যাহার সহিত ইহাদের কোন সংস্রব নাই! ইহাদের দৃষ্টি হয় মেদাটে! উহা কি যেমত নড়িতে আছে।

তাহারা সকলে এমত করিয়া মুখমণ্ডল ফিরাইয়া ঘুরাইতেছে যাহাতে অনুমান হইবার, যে ঐ রুদ্ধশ্বাসের, মর্ম্মন্তুদ স্বরে, কাতরাইতে আছে গোঙানি, তাহা নকলে আপ্রাণ করিতেছিল; ফলে ঐ কাণ্ডর দিকে কখনও প্রত্যক্ষিতেছিল, আর পুনর্ব্বার ঐদৃশ্য নকলের অভিব্যক্তি ঘটাইতেছিল; এখানে একমাত্র মন্তব্যর, এই কথা কেমন বিচারিল যে তাহারাও উক্ত প্রকার নিনাদ তুলিতে পারে; বটে ইহা প্রহেলিকার । হাভাতের পক্ষে এই প্রতিক্রিয়া (!) হয় দারুণ অবাকের! তাহারা দেহকে বিবিধ রকমেতে নিঙড়াইল, কিন্তু হায় তাহাতে ভারী রগড়াত্মক ঢেকুর উঠিল, কাহার বা হিক্কা উঠিল! তাহাদের কণ্ঠে সহসা মহা ক্ষোভ খুঁঃ খুঁঃ স্বর বর্ত্তাইল, এইবার অবশ্যই অশ্রুপাত হইবে!

হায় এ দেহতে মানুষ ও প্রকৃতি দুইই মরে!

এতক্ষণ বাদে তাহারা আপনার পায়েই দাঁড়াইল, এহেন [illegible] নির্জ্জনতা মধ্যে কেহ কাহারও নিকট হইতেছিল না, যে যেখানে সেখানেই রহিয়া আছে; এবং [illegible] অশ্রুধারা বহিতেছে; হঠাৎ দেখিল অদূরে ভুঁয়ে ফাঁড়া অতিক্রান্ত চকিতে মন্ত্রবলে দেহটি সটান থাকিয়া ঘুমায়—যে গোঙাইতেছিল, ইহার শিয়রের কাছে ঐ বিচিত্র আততায়ী অদ্ভুত ভঙ্গীতে উপুড় [illegible]য়ত শায়িত সেও গভীর নিদ্রাভিভূতা, যে কখনও তদীয় মুখে পরিতৃপ্তিজনিত শব্দ উজরিতে আছিল।

এই ঋতু পর্য্যায়ের খাতক সাধারণ, এই সেদিনও যাহাদের সাক্ষী মানিল এখন সেই সেইকে বিস্মৃত, মহান বৃক্ষ সকল, ঐ আকাশ, এই মৃত্তিকা ইহাদের কোন দেবত্ব নাই; তোমরা শোন, ইহা বলিতে ভুলিল। হায় লোকে এতেক সহায়হীন হইতে পারে! নির্ঘাৎ এই অভ্রান্ত সূত্র তাহারা টের পাইয়াছিল; আশ্চর্য্যের যে ভূমিতে স্থিত পাত্রগুলিতে ও দেহে পতিত চন্দ্রালোকের প্রতি নেত্রপাত করিতে সময়েই হাত দ্বারা, ঐ ঐখানে হাঁতড়াইতে আছিল; এই ক্ষেত্রে এমন স্বর আসে যে উহারা আদতে চতুস্পদ জীব বা! এবং এবার দুইহাত দ্বারা বক্ষদেশ চাপড়াইতেছিল; অধরে হায় হায় নাই, শুধু তৈলহীন যান্ত্রিক শব্দ; এবং ইহা সত্য যে তাহারা নিজ কানের দিকে লক্ষ্যিতে চেষ্টা করিতে আছিল! সেখানে জলের স্রোতের শব্দ!

অলৌকিক যে এখন বক্ষে চাপড় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইল; উপস্থিত অব্যর্থ যে এই বিপুল মস্তিষ্কহীন কালস্রোত তাহারা দেখিতে পাইতেছিল; তাহাদিগের তরাস নাই; এখন সিদ্ধান্ত হয় অনেক ক্ষণ যাবৎ তাহারা ধমনীতে যাহার ঠিক পাইয়াছিল, ইহার লাগিয়া ঐ সুমহৎ মর্ম্মপীড়ক আর্ত্তনাদ অনুকরণিতে সমর্থ হইল না, কি বা দুঃসহ ঐ কালস্রোত! এই আবর্ত্তে যখন তখন ঐ মায়িক চীৎকার পর্য্যন্ত নিশ্চিহ্ন হইয়াছে! কিন্তু মানিতে হইবে, কোথাও না কোথাও ইহাদের জোর আছে; এবং কালস্রোতকে স্বচক্ষে দেখিল!

এখন হাওয়া তোমার গাত্রে লাগিয়া বিশেষ আওয়াজ ঘটাইয়া তুলিতে আছিল, তুমি এক মারাত্মক আততায়ী, তুমি গভীর ঘুমের মধ্যে আপনাকে বিস্তারিয়াছ; তুমি এইভাবেই এখানে থাক, শৃগালে তোমারে শুঁকিবে, ইন্দুরসকল তোমার খবর লইয়া যাইবে। আ তোমার আশপাশে ইন্দুর সকল খেলা করে নরকপালগুলি লইয়া; আমরা এখন তোমাকে পরিত্যাগ করত যাইব। তোমার কোন্দল আমাদিগকে জাঁতে ফেলিয়াছে; আমাদের বিবেচনাতে এই বুঝিলাম এড়ান ব্যতীত আর সুরাহা নাই।

ইন্দুররা আনন্দে খেলা করুক।

অথচ ইহা সত্য তোমারে আমরা বড় আগ্রহ সহকারে দলভুক্ত করিলাম, যাহা এরূপ মননে যে, আমাদের কণ্ঠস্বর ক্রমে এলাইতেছে; গৃহস্থর দুয়োরে খাদ্য সাধিতে অনেক গলা প্রয়োজন হয়, দুইচারি জনের গলা কিছু কাজের নয়! তুমি খুসী হইলে।

এখন দুঃখের, তোমাকে ছাড়িব; আমাদের দলের সকলেই এক মত হইল; আমাদের ভোর নাই সন্ধ্যা নাই, হাঁড়ী হেঁসেল নাই, আমাদের পূর্ব্ব দক্ষিণ আদি দিক সকল নাই, আমাদের ছাড়িয়া আসা পথ সকল কেহ আলকাৎরা দিয়া নিকাইয়াছে; আমাদের চেটাল করস্থিত কড়া, হায়! ক্ষয়িত হইতেছে; আমাদের দুয়েকটি ছোট খাট খবর আছে; তাহা তুমি নির্লজ্জভাবে আত্মসাৎ কর! তোমার কোন কিছুই নাই! হায় তুমি শুধু নিশুতি!

তুমি বলিয়াছিলে, ঐ মেয়েছেলেটিকে, যখন তোমরা দুইজনে কোন প্রাকৃতিক কার্য্য সমাধার পর আসিতে আছ, যে আমার মধ্য হইতে কোন শব্দ শুনিতে পাও কি!

হ্যাঁ, পাই, ঐ কি তোমার দেহের ভিতর হইতে আইসে?

ভাল করিয়া শোন, কান পাত বুকে।

আঃ একি শব্দ!

ঐ শব্দর পর আমি নিশুতি!

উহা ত কেহ চিবাইতেছে কিছু, তাহারই মনে হয়!

ঠিক, আমার ভিতরটা ভামে চিবাইতেছে, ঐ শব্দ!

এখন ইহারে ত্যাগ করিতে সকলে বদ্ধ পরিকর! বিশেষত ইহার বিকট কাতরানি, ঘুম ঘোরে যাহা, তাহা প্রতিকেই বিবর্ণ করিল। এখন সকলে পালাইবে, সকলেই অতিশয় সন্তর্পণে উঠিল, এক্ষেত্রে মহা বিপর্য্যয় উপজিল বালকটিকে লইয়া; দুই তিনজন এই ব্যাপারে কসরৎ করিল, কেহ তাহার মুখে চাপা দিল; এবার তাহারা সকলে পা টিপিয়া চলিতে আছে; তবে হাওয়াতে তাহাদিগের পা কাঁপিতে আছে, কিয়ৎ ব্যবধানে যাইতে পদদ্বয় নিগড়িত বা, সকলেই গাত্র আঁচড়িতে থাকিল; এবং এখন তাহারা ক্রমে ঘুরিয়া দাঁড়াইল; যে দূরত্বে বস্তু আবছায়া হইয়া থাকে সেই স্থান, একটি কিছু! হাওয়াতে উহা সিঙ্কিড়ালাগা এমন; কে তুমি, মানুষের কোন সম্পর্ক লইয়া আছ; দিক চরাচর তোমার প্রহেলিকা যাজ্ঞা করিতেছে; তোমার, যে তুমি ভূলুণ্ঠিত, যে অপরিমিত নিশ্চিন্দি, কে তুমি!

দূর হইতে ইহারা, ঐ বেচারী দৃশ্যের প্রতি নেহারিতে লজ্জাতে কান্দিল, ধিক্কারে নিজেদের অতিষ্ঠ করল, হায় কি ভয়ঙ্কর দুষমনি! বিদ্যমান কম্পিত যাহা, বায়ুতে, ঐ ভূমিতে, আছাড়িয়া থাকা নিঃসহায়তা, তাহাদের খোঁচাইতে লাগিল, আঃ চণ্ডালিনী।

আঃ চণ্ডালিনী তুমি ধন্য!

আমরা হাভাতে হইয়াও ধন্য; তোমারে ত্যাজিয়া আমরা পিছন দিকে তাকাইলাম, তন্মুহূর্ত্তে আমরা যোত পাইলাম, একে অন্যকে ঠিক দিয়া লইতে, অপরিসীম হায়াতে আপন বস্ত্র আগলাইলাম, আঃ বহু কাল বাদে আমরা পিছন ফিরিয়া দেখিলাম, আমরা পিছন ফিরিয়া দেখিলাম আমরা প্রত্যাবর্ত্তন করি!

পুনরপি আমরা, যাহাদের হস্তজ কড়াতে অশ্রু মুছিতে চোখের পাশ ছড়িয়াছে, আমরা যাহারা এই দুনিয়া মহালের প্রতি ছটাক ভূমি খণ্ড ডলিয়া ফিরিতে পাঁজড়া হইলাম, এখন ধন্য! আঃ কি বা হেরিতে থাকি! কোন দুর্লভ সঞ্জীবনী খাদ্য আঘ্রাণিয়া তদীয় নাসার বেসর পুট স্ফীত হইতে আছে, কোন সুদুর্লভ সঞ্জীবনী খাদ্য গ্রহণের পরিতৃপ্তিতে, স্বাদে, তোমার জিহ্বা সরসিল, মুখে গূঢ় এক শব্দ খেলিয়া উঠিল, আঃ চাকুম চাকুম!

আঃ ঐ স্বরগ্রাম আমাদের গীতের ধুয়া ইউক। কিন্নরগণ লজ্জা পাইবে!

আঃ মারাত্মক চণ্ডালিনী! হা হন্ত! তোমারে আমরা ত্যজিয়া যাইতেছি! আঃ তোমার ও আমাদিগের ইতিমধ্যে এই স্থান এখন মধুমৎ হইবে! আমরা ফিরিব!

আমরা ফিরিব বটেই, তথাপি ইহা ধ্রুব, ঐ শব্দ বড় কালো, দেখ ঐ স্তন তৃণ সকল পান করিতেছে না, উহারা শব্দ ভয়ে পাংশু, ইহা চন্দ্রালোক জনিত না, আমি দেখি। উহা বিভীষিকার, তোমরা একে অন্যকে ধারণ করিয়া থাক, যেহেতু আমি প্রকাশিব, শোন স্যাঙাৎগণ উহা কৃমি কীটের শব্দ সে আপন

ধুকধুকি খাইতেছে, চর্ব্বণ করিতেছে, গলাধঃকরণিছে, বক্তার কণ্ঠ ক্রমে উদাত্তিল এবং অবশেষে ঘোষিল, ঐ চণ্ডালিনী আপনার আত্মাকে খাইতেছে!

এতৎ উক্তিতে শ্রোতারা সৃষ্টিছাড়া কম্পনে আছে, ইহাদের হাত সকল ঘোর বাধাদান নিবন্ধন উত্তোলিত থাকিল এবং নড়িতেছে; ইহারা ফ্যাকাশে আছে; এখন একে অন্যের ঘাড়ে বেসামালে পড়িল; অথচ হস্ত আন্দোলন রুখিল না। কহিল, ঐ স্বর গ্রাম আমাদের গীতের ধূয়া হউক!

আমরা উহারে পরিত্যাগ করিব না, তোমরা উঠ, আমরা সান্নিধ্য পসারিয়া কোথা যাইব! হা আমাদের কান কাটা গিয়াছে যেক্ষণে উহাকে এড়াইলাম এখন কোন মুখে আমরা অগ্রসর হইব, আমরা টকিয়া গিয়াছি, আমরা চ্যাগড়া প্রায়! এই সেই প্রত্যাবর্ত্তনের পথ, আমরা পশ্চাত্তাপে ক্লিষ্ট হই, ঐ দূরে তুমি, তোমাতে আমরা ফিরিব। আঃ এই সেই পথ! এ কি দিকেদিকে অনেক ধূর ভগ্ন, অনেক ঝাঁপি অনেক বিড়া, অনেক শিকা প্রতিটি থ্যাঁতলান!

ইহাতে আমরা থমকাইলাম; ধন্ধ লাগিল কোনটি আমরা, যাহা ভূঁয়ে অথবা যাহা এই, কে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে! আমরা হস্ত প্রসারিলাম, হাওয়া চিনিতে পারিলাম না; চাঁদ দেখিলাম, প্রহর জানিতে অকৃতকার্য্য হইলাম আমরা তচনচ হইলাম।

তবু ভাল ঐ ঐ বোধ আছে; এখানে আমরা এক অদৃষ্টপূর্ব্ব কাঙাল; আঃ তোমারে ত্যজিবার হীনমন্যতা আমরা কেমনে সহিব, ঐ খেদ ঐ দুঃখ আমরা কোথায় রাখিব! হা ঠাকুর, যে তুমি পৌষমাস আনয়ন কর, যে তুমি শিকড় হইতে শীষে আছ; তুমি ভিতরে থাকিতে এ দুর্ম্মতি! মানুষকে ত্যাগ! একেরে, বেচারা বলিবার কপালে তুমি ছাই দিলে!

এই বলিতে কালে প্রতিতে আপন গণ্ডদেশে বিশীর্ণ হাতে চাপড়িল! তাহারা ছুটিতে গিয়া হাঁপাইল! এবং উহা কি উহা কি! কহিতে থ হইল সকলেই, নিঃসহায় মেয়েছেলেটি এবং ঠিক তদীয় দেহর উপরে এক কুজ্ঝটিকা! যাহা ঘূর্ণায়মাণ! নিঃসহায় মেয়েছেলেটির দেহ হইতে বিবিধ বর্ণের অগ্নিশিখা ঘটিয়া উঠিল, কুজ্ঝটিকা মহা বেগে নামিতে আছে!

পলাতকদল ঐ রহস্য অগ্নির নিকটে আসিতেই দেখিল, শত শত পতঙ্গ ঐ বিচিত্র পাবক শিখায় আত্মাহুতি দিতেছে, আঃ গৌরব!

পলাতকদল সাতিশয় উল্লাসে সেই শিখায় আপনার হাত উষ্ম করত বক্ষে লইল। তাহারা মেঘ বৃক্ষ দেখিল, ঐ দগ্ধ পতঙ্গ সকল ভক্ষণ করিল, দগ্ধ পতঙ্গ সকল পূত পবিত্ররূপে সঞ্চয় করিল আঃ গৌরব!

এই মেয়েছেলেটি কি ভীষণ! এই খুন করিতে উদ্যত, এই ঘুমাইয়াছে! আমরা যদিও ইহাকে ত্যজিয়া যাইতেছিলাম, কিন্তু আমাদের পদশব্দ আমাদের বিদ্রূপ করিয়াছে; যখন আমরা সচেতন হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করি; সেই পদশব্দে গঠিত কেহ, বা কেহর সেই পদশব্দ, কেমন সেই জন এই বিকট চুপসান (প্লীহা) সর্ব্বস্ব দেহের মধ্যে আছে; সেই গোপন পদশব্দ এই আকাল চাটা হয় নাই; আমরা ফিরিয়া আসিলাম আমরা ধর্ম্ম হারাই নাই।

মেয়েছেলেরা চিন্তা করিল, প্রকাশিল বটে, কিন্তু ইহারে লইয়া বেজায় অশান্তি হইবে, আমরা অনেকে হইলে আমাদের স্বর উদাত্ত হইবে এই সিদ্ধান্তর কোন হেতু নাই, আমরা কি দরজাতে দাঁড়াইব? প্রতিনিয়ত সে গোলমাল করে!

আমরা অনেকে আত্মরক্ষার জন্য! শুনিয়াছি হাভাতে এক দেখিলে বড় দল তাহাকে শেষ করে ভীড় কমায়।

ছিছি পাগল! আক্রমণ করিবার লোক কোথায়, সে ধক্ কোথায়।

ইহা শোনাও পাপ, একজন আর এককে মারিবে।

এমত দুশ্চরিত্র এ পরগণায় নাই।

পেট বড় শত্রু পেটের জন্য পারে না হেন কাজ নাই!

পেটের বদনাম সহজ, আমাদের পেটের বাপ মা আছে। সকলের আছে!

ঠিক! এখন ঐ যে ঘুমাইতেছে, যাহার কৃমিতে দাঁত শূলাইতেছে তাহার বিষয়, সে যে খুন করিতেছিল। নিশ্চয়ই পেটের জন্য নহে!

সকলেই ভুলিয়াছিল ঐ সূত্র। তাহার ঘোর নিশুতির দিকে চাহিল এবং একবাক্যে উচ্চারিল; কেন

য়ে ঐটিকে আমরা ছাড়িতে পারিলাম না কে জানে। উহাতে আকাল সাঁদ করিয়াছে!

তবে কি জানিব ঐ মেয়েছেলেটি ভূতগ্রস্ত!

আমাদের দেহে ভূত ঢুকিবে এই চেহারায়? উহারে এখন ফেলিয়া যাওয়াতে কাপুরুষতা! আমরা জাগিয়া থাকিব, কাল সকালেই বলিব তুমি তোমার পথ ধর!

সেই ভাল, সকলেই প্রায় এখন ঢুলিতে থাকিয়া বাক্যালাপ করিতেছিল।

ততঃ, ইহাদের গাত্র আরও কালো হইল, রক্তগঙ্গা বহিবে বাক্য তাহারা বিস্মৃত; এখন এই মধ্যরাত্রে, উপরের ঐ বিরাট আকাশ নেহারিল সর্ব্বত্র প্রতিফলিত আছে; ইহাদের এতদ্দর্শনে পেট ডাকিয়া উঠিল, ঢেঁকুর তুলিল ইহারা। একি বিশালতা, আমরা এক রত্তি পোকাও নহি! এই বিশালতার মধ্যে শুধু ফাঁকার মধ্যে গ্রাম নাই গঞ্জ নাই, ফেরি ঘাট নাই—কোথায় আমরা হারাইব—ইস্! ঠাকুর আমরা ত রাবণকে ঘৃণা করিয়াছি, আমরা সীতার জন্য কাঁদিয়াছি—পঞ্চপাণ্ডবের জন্য খেদ করিয়াছি—আমরা কি শেষে হারাইয়া যাইব। আমরা মৃতের বর্ত্তনে হাত দিই নাই, ভাল বলিয়া গ্রহণ করি নাই—আমরা কি হারাইয়া যাইব! এস এস পুরুষরা আমাদের চারিদিকে বেড়া কর—এস আমরা গিঁটবাঁধি আমরা পথঘাট চিনি না—আমরা কি হারাইব?

একজন মেয়েছেলে কহিল, গিঁট দেওয়া লইয়া কি আতান্তর মা গো মা! সেই যে তুমি হেঁয়ালি কহিলে, হেঁয়ালি মনে নাই!—বৃদ্ধ ব্যক্ত করিল,

কেমন সে দেউটি
বিনা তেলে জ্বলে,
সোজা বা উপুড় কর জলে কিম্বা স্থলে।

নানা কণ্ঠে ঐ ছড়া বিভিন্নভাবে উচ্চারিত হইল! উত্তর দমকী হইয়া শান্ত হইল, ব্যক্ত হইল।

আলেয়া!

না।

জোনাকি!

হাঃ স্থলে জলে!

ও! তারা বটে, তবে

তাহা হইলে!

পেট!

আর!

এক্ষেত্রে, প্রত্যেকেই ঢুলিতে সময়ে, অবশ্য, এই ধাঁধা শুনিয়াও আহ্লাদিত হয় নাই, পেট লইয়া দর্শনতত্ত্ব! চাপা অভিমান প্রকাশ করিল না, এখন কানে নিজেদের কথা আছে, কাপুরুষতা, মারাত্মক ইত্যাদি। প্রত্যেকেই নিজের গলায় হাত, এই ঘুম কাতরতার মধ্যে দেখিল! আর যে চক্ষু অর্দ্ধোন্মুক্ত করিল, কাছেতেই ঐ বীভৎস মেয়েছেলেটি ঘুমন্ত, উহার দন্ত ঘর্ষণের উৎকট যান্ত্রিক শব্দ হয়! ইহাকে ত্যাগ করিতে হইবে, মনে পড়ে সেই রাত্রে যখন, এই যাহার সামনের কয়েকটি দাঁত নাই, সেই যে বিরাটাকায় মিন্‌সেরে দেখিল। সেই চন্দ্রালোকে ইহারা ফিস্‌ফিস্ করিল, নিশ্চয়ই বিধাতা পুরুষ!

ঐ চন্দ্রালোকে, তাহারা যেমন নিজেদের বড়ই ঘোলা বুঝিতে আছিল; নদীর ঝিল্লীর ইত্যাদির আওয়াজ তাহাদের জানিত সমস্তবিধ শব্দর বাচকতাকে নষ্ট করিয়াছে; বস্তু দর্শনে নাম, নাম শ্রবণে বস্তু মনেতে আসে না; প্রায় প্রত্যেকেই এমন অবস্থা আপন অজ্ঞাতসারেই টের পাইতেছিল! নিশাচর পক্ষী উড়িয়া যায়, অঙ্গুলি নির্দ্দেশে জনাজাত, ঐ ঐ উচ্চারিল; এখন নির্দ্দেশিত অঙ্গুলির বাহুপ্রসারিত রাখিয়া, শায়িত থাকা হইতে, ধীরে মোচড় দ্বারা দেহকে উত্থিত করিল, এক শ্বেত নিশাচর নদী পার হয়। তাহারা মাটিতে পা রাখিয়া অবকাশে ব্যোমেতে ভ্রমিতেছে! আবার সেই অর্দ্ধেক ব্যোমেতে মাথা তুলিতে হইবে!

তাহারা তেমনই আছে; চোখ নিঃসাড়; স্রোতের জল ছলাৎ ক্রমান্বয় সেই আধো আলোর হিলমিলে—বৃক্ষ পাতার ফাঁক দিয়া চন্দ্রালোক—এক উলঙ্গ প্রায় লোকটি, একটি ডাণ্ডাতে ভর করত

দাঁড়াইয়া, ইহাদিগের বেটাছেলেরা তাহা নিরখিয়া ঝটিতি মেয়েছেলে হইল; মেয়েছেলেরা কুমরে পোকা, (কুমরে পোকা আরশোলা। কথামৃত) তবু সকলে, গলাচিরিয়া বলিয়াছিল, কে ঐখানে?

বাতাসের আওয়াজ।

আতঙ্কিতরা স্বীয় গাত্র উদ্ভূত সিঞ্চিড়াতে যদ্যপি জ্বরিত আছে, তথাপি কোন মতে পুনরপি জিজ্ঞাসিল, কে ঐখানে।

ইহারা প্রত্যক্ষিল ঐ বিশাল দেহী কখনও মেয়েছেলে কখনও বেটাছেলের রূপ ধারণ করিতেছে; কখনও আলেয়ার মতন দপ করিয়া জ্বলিতেছে; কখনও বৃক্ষ, কখনও জীব, কখনও ধূলার ডাঁই, কখনও জলস্তম্ভ, মাছ পক্ষীর রূপে রহিয়া থাকিয়া পরিবর্ত্তিত হইতে আছে!

অনাহার ক্লিষ্ট অবস্থাতে, সেই দৃশ্যসকলকে তাহারা অদ্ভুত পিণ্ডতে রূপান্তরিত করিতেছিল; মানুষ যে কত বৃহৎ—অসংখ্য জনম সে একাই নিঙড়াইয়া সার করিয়াছে, সে ঐ খাড়া! এই পর্য্যন্ত ভাবিতেই প্রতিতেই আপন নখের তলে সিঁদাইল, তখন নিজেরে ছিঁড়িতে থাকে!

ইহারা গলা ভিজাইয়া প্রশ্ন করিল, কে তুমি!

বিশেষত অল্প বয়সী বালক বলিয়াছে, দেখ দেখ, ইঃ লোকটা! আকাশ মেঘ সমুদ্র পাতাল উহার দাড়ি গোঁপ! এই ঝিম আলোতে, ঐ ছোট আঙুলে নির্দ্দেশিত, শরীর কি বা ভয়াল, বালক চীৎকারিল, কে তুমি!

সকলেই যারপরনাই অস্বস্তিতে আছে, এমত ধারণা যে, সেই অদ্ভুত লোকটি তাহাদের কাহার পার্শ্বে শুইয়া আছে; আবার এমনও যে, উহাদের দেহমধ্যে সাঁদ করে, ইহারা তরাসে জিজ্ঞাসিল, কে তুমি আমাদের চালাতে দাপাইতেছ?

আমি উদরে জ্বালা হইতেও অধিক প্রচণ্ড!

ইহাদের নিদ্রা, অবশতা, অবসন্নতা উবিল, একে অন্যকে দেখিয়া লইয়া ভরসায় যে আমরা ত অনেকে তবে; ইহারা নিজ বর্ত্তন দূরে ছুঁড়িল, যে এবং অতিশয় মিনতি করিল, তুমি যাও, যে তুমি জানিলাম, তোমাকে আমাদের প্রয়োজন নাই, এই আমরা বর্ত্তনে থুতকুড়ি কাটিলাম।

সেই লোকটির জলদগম্ভীর স্বর গাঢ় নীল সর্ব্বাংশে এখনও চমকিত হইল! ঐ বাক্যের নিপট সদর্থ লইয়া ইহা এতেলে বেতল খেলিল তখনই সমস্বরে এই যাজ্ঞা উঠিল, যে পার সে আমাদের গল্প বল। ইহাতে এই মর্ম্ম ছিল, আমরা অন্যমনস্ক হইব! যে আমরা নিজেরা কোন উত্তর নহি!

এবম্বিধ ব্যাকুলতা শ্রবণে, অনেকেই বহু লোক প্রদক্ষিণ করিল, এক শব্দ যদ্দ্বারা গল্প আরম্ভ হয় তাহা উচ্চারিল, এবং এই স্থানের দশাসই স্তব্ধতাতে তাহা গ্রাসিল!

মেয়েছেলেরাও প্রকাশিল, গল্প আর ভাল লাগে না, ঘুমাই, ঘুমাইব নেহারিল, বেটাছেলেরা উঠিয়াছে, তাহাদের পদশব্দ হয়।

মেয়েছেলেরা চোখ চাহিয়া, বেটাছেলেদের ঐ চলিত অবস্থা দেখিল, ভ্রূদ্বয় কুঞ্চিত করিতে পারে না, তাহা বীজের মতন শক্ত হইয়াছে; উহারা কি আমাদের এই অনাবৃত উদোম স্থানে রাখিয়া পলায়ন করিতে উদ্যত? আমাদের ভার লইতে অসমর্থ? খাইতে দিতে অসমর্থ? তাহারা মরদ হইয়াও কেন এমন ধারা হেঁয়ালিময় প্রেতিণীর মত শব্দ করে!...হা আমরা সত্যই ত কেহ কাহারও নই। অদ্ভুত অসহায় বোধিত হইল; অথচ তাহাদিগের মেয়েছেলেদের মধ্যে ভূমি ত্যাগে উঠিবার কোন চেষ্টা নাই; এমনও যে উন্মত্ত বাতাসে বস্ত্র খণ্ড সামলিবার মনস্কতা নাই! তাহারা গ্রামহীন, গৃহছাড়া, অনাহারী তবু, বেটাছেলেদের এই দেহ বান্ধিবে! আমাদের তোমরা ছাড়িয়া যাইও না আমরা বর্ত্তনে থুতকুড়ি ফেলি! বহুদিন এই কোল খাঁ খাঁ করিতেছে, বহুদিন মুখে অরুচি নাই! তবু তোমরা থাক!

অহো, আমি প্রস্তর সকল, হীরা পান্না চূনী মণি সকল চিবাইলাম, মুক্ত পিষ্ট করিলাম, বহু ধূলা উড়াইলাম, অশ্বত্থকে প্রশ্ন করিলাম, তথাপি তুমি একই, ঠাওর করা তোমাকে শিবের অসাধ্য! অথচ যে কোন অগ্নিকাণ্ডে আমি তোমার দিকে ছুটিয়াছি।

তখন ঐ মারাত্মক মেয়েছেলেটি লাইনের মধ্যে আসিতে দরজাস্থ লোকেদের তুল্য আস্ফালন করিল। কাহাকেও সে মানিবেক না।

আয়নাদার চূড়ী যাহার হাতে সে রুষ্ট হইয়া বলিল, নিজের চুলে গিঁট দিয়া ঘুমাও!

সেই গিঁট ত ফস্ করিয়া, যম ত আর কচি ছেলে নয়, খুলিয়া ফেলিবে, আর সেইটি ত কাহারও সহিত বাঁধা হইল না; এই উত্তরের পর মেয়েছেলেটি, যাহার গালে টোল পড়ে সে, যেখানে অন্ধকার আঁট হইয়া থাকে, বিশেষত গাছে, সেখানে তাকাইল, এবং চুলেতেও কি ভয়ঙ্কর আঁধার! গ্রন্থি বাঁধিবে কাহার সহিত! অন্ধকার দিয়া গ্রন্থি!

তোর ভয় কিসের লা! আমরা ত রহিয়াছি।

একবারটি দাও তোমার ও উহার দুইজনের আঁচলের কোণে আমার এই আঁচলের দুই প্রান্ত বাঁধি—নিমেষের তরে হাঁপ ছাড়ি। আজিকার এহেন চাঁদের আলোতে ঐ গ্রন্থি দেখিব, তোমাদের পায় পড়ি, তোমাদের পায় পড়ি! তোমাদের যে হউক একজন মন কর, আমায় মধ্যে আসিতে দাও, এইভাবে ঐ মেয়েছেলেটি অনুনয় করিল যাহাতে অন্যরা কখনও বা শিশু, তবু মুখ ফিরাইয়াছে; উপদেশিয়াছে, বলিলাম ত চুলে গিঁট বাঁধ!

হ্যাঁ জলের সহিত গিঁট বাঁধিব! যে সে কুপিত হইল, সে নিজ কেশ পাশ গোট করিয়া শুঁকিল, অন্যত্র মুখ ঘুরাইল; এখন তদীয় জিহ্বাতে, ছি ছি যাহাতে নির্ঘাৎ বলা যায় ঈদৃশ কুৎসিত কথা আসিল। এবং আড় নয়নে ক্বচিৎ নিমিত্ত সেই একটি গিঁট দেখে! ঐখানে এই মহামারি আকালের মধ্যেও থৈ আছে; যে ভাদ্রমাসের বা কাঠ ফাটা রৌদ্র উজাইয়া আসিয়া তৎক্ষণাৎ জল-না-খাওয়ার বুদ্ধি ঐ উপায় নির্ভরতা; এখনকার চন্দ্রালোকে যাহা, গিঁট, অভিনব কোন প্রাণী! যাহা গৃহপালিত—এবং এমন স্বপ্নের গাত্রে সে হাত বুলাইতে, মাটিতে হাতের তালু টানিতে থাকিল! পরে মহা অসভ্যতায় কহিল, আমি না আমানি বলিলে তোমার ঘোর ছাড়িত।

নিজ শ্বাসের বিনা তারতম্যেই বলিল, মরণ, ইহার ভিতরে এই সারির মধ্যে কোথা হইতে কেমনে আসিবে, যার ভাগ্যে যাহা, তোমার আগের যেজন তাহারে যমে ছিনাইল খাইল সে উহার জায়গা পাইল, তাহার কপাল!

ঐ জন ত তাহার জায়গা ছাড়িয়া ঐ খানেতে গেল।

সে তাহার ভাগ্য, যে মরিল সেই বৃদ্ধাই উহারে দিতে বলিয়াছিল।

বৃদ্ধা কহিল, আমার তোমাদের সহিত গ্রন্থি বাঁধিবার সময় আসন্ন, অতি দূরের শৃগাল ধ্বনি আমি শুনিতেছি, শোন। তদীয় মনোনীতা, ধর্ম্ম নাতনীকে সম্বোধিয়া কহিল, আমাদের ঘরের লাগোয়া যে ডোবা আছে তাহার পশ্চিমে পাড়ে দেখিবে ঝিনুকের ডাঁই, ডোবাতে নামিবে, কোমর জলে এক কড়া পোতা আছে! তাহা তুমি লইও! একবার আমার হইয়া দক্ষিণ অভিমুখে দৃষ্টিপাত কর! তোমরা শোন, দলের সবাই, আমার শেষ ইচ্ছা শ্রবণ কর, আমার এই মেটে চালা খানি তোমরা নীচে মাতলাতে, মাতলা নদী, নিঃক্ষেপ করিও! আর যে আমার এই দখল স্বত্ব এইস্থান—আশ্চর্য্য! বেচারী কি পর্য্যন্ত বিষয়ী আছিল!—আমার ধর্ম্ম নাতনীকে দিবে!

যদি আত্মা থাকে, মহা অভিমানে জিজ্ঞাসি, তবে যেখানে, যে ব্যোমে তাহা যাইবে, আত্মার কি পথ ভুল হয় না, আত্মা কি ইহা জানিত ঠিক সেইখানেই বৃদ্ধার কি মরণ হইল; এই বিরাট ভেড়ী দক্ষিণে মাতলা—বিদ্যাধরী—উত্তরে কয়েক হাজার বিঘার লাট জল মগ্ন। সুউচ্চ ভেড়ীর উপরেতে এই ছোট সংস্থান। তাহাদের বসন কতটুকু বা তাহা উড়িতেছে, প্রচণ্ড দ্রুততায় হাওয়া বহে, মৃতের লোল চর্ম্ম দুলিতেছে—অদূরে, এখানে এক মস্ত কোলা ব্যাঙ। তাহাদের প্রতি ঠায় দেখিতে আছে; তাহারা অঙ্গুলি সঙ্কেতে কাটিল, আহা হেরে! ঐ সেই সত্যযুগ! সত্যযুগের ঐ সেই ব্যাঙ! তাহারা সশ্রদ্ধ নমস্কার করিল; এবং তখনই কেহ বলিল, হ্যাদে ঐ দেখ বুড়ী যায়! এবং প্রত্যেকেই সেই দিকে নেহারিল; এখন একটি নিঃশ্বাস যায়, আঃ নিঃশ্বাস কত সহজ হইয়াছে।

মানুষের শেষ ইচ্ছা বলিয়া কথা!

এহেন উত্তরে এই টোল যাহার গণ্ডদেশে পড়িবে, সে কি সর্ব্বদাই হাসে!—সেই মেয়েছেলেটি, পুনঃ অন্ধকারের প্রতি চাহিল, মনে জোর করিল এই যুক্তি জ্ঞাত করিতে যে, সেই মৃতা যদি শেষ ইচ্ছা বলিত, যে আমার লপসীর ভাগ উহারে দাও তবে কি তোমরা সে ইচ্ছা পালন করিতে।

লজ্জা পাইল, জবাব দিতে, ইহা সেই চূড়ী শোভিতা।

এই রূপ মনস্কতার কারণ, এখনও উদ্গারকারিণী যে সে যখন নিশ্চেতন, সে যখন তন্নিমিত্ত জল

আনে; সোমে পা ফেলিয়া কথক নাচে যেমন ঘটা—খাড়াইল এবং প্রকাশিল, আ মরণ! চৌকাটে বসিয়া আছিস কি লো! হ্যাঁ বুঝিতাম তোমার ভর্ত্তার বেভুঁই, বা কোথাও নাট খাইতেছে, সে নহে এক কথা! ঠায় বসিয়া আছিস্ জল লইব কেমনে? চৌকাটে বসিলে জান না নিতম্বদেশে ফোঁড়া হয়!—যে এখন সে অন্ধকার দ্বারা মুখ মুছিল।

কিন্তু ঐ দলের লাইনকে সে বেচারা বড় সাধের চোখে দেখিয়া থাকে!

আগত ব্যক্তিরা, হাভাতেগণকে কঠিনভাবে দেখিয়া লইয়া ঐ অল্পবয়সীকে হাঁকাইয়া ধমকাইল; উদ্দেশ্য যে; উহাদের চীৎকারে ত্রিভুবন খুনখারাবী হইতেছে, আর তুই কিনা উহাদের বলিতেছিস আবার করিতে, অথচ ইহারা জনাজাত সেই মেয়েন্যাকড়াকৃত ভেল্কী আঙুলের কারচুপি প্রত্যক্ষ করে, অথচ অল্পবয়সীর, যাহার নকলে, অঙ্গুলি সঞ্চালন চেষ্টায় তাতিল; তথাপি তাহারা বিভ্রান্তিতে। তাহাদের কানে ঐ ধ্বনি একই আছে!

এবারা, তাহারা মেয়েন্যাকড়াকৃত কারচুপি ঐ ছড়া কাটা পুনরপি, বালকের অনুরোধ নিবন্ধন, যাহা তাহাদের কাছে এখন ক্রমে উদ্ঘাটিত হয় তাহাতে আকর্ষিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাদের মনে শ্রবণে পূর্ব্বেকার ব্যতিক্রমে ছাড় নাই। যদিও, দেখিলেও, যে ঐ মেয়েন্যাকড়া আপন বক্ষঃদেশে বস্ত্র সম্বরণের অভিব্যক্তি করিলেক, অঞ্চল খুঁজিতে তদীয় বাম হস্ত উস্‌খুসিতে আছিল! কেননা ডান হস্তের ছিট্‌কান অঙ্গুলি যাহার প্রতিটিতে সেই অমোঘ গল্প আছে—উজাইয়া চোখের জল ওতঃপ্রোত হইল!

ইহাতে এখন দর্শকবৃন্দ আমানি যাহারা বলে তাহারা, আঃ হুঙ্কারিল! যে তাহারা বুঝেযে, যে উন্মাদিনী হয়, তাহার অসুস্থতার কারণ, সেই বেনো জলের ছিটা কখনই না, বস্তুত তাহা ঐ হতভাগিনীর স্বীয় অশ্রুকণা, বড় মোচড়ে যাহা নিঃসৃতিল; হেতু যে, হায় ঐ কি যাত্ত্রা করিবার জিগীর! উহা কি তাহারে বলিতে হইবে।

ঐ বেচারী মেয়েছেলেটির এই প্রতিবাদী সঙ্গীগণের, এতম্বিত হাদিশে, মহা আকোচ উপজিল, তাহারা পরিত্যক্ত বিছুটিলতা দেখিল, আপন ওষ্ঠ দংশন করিল, কেহই পরিশ্রান্ত নহে! কেহ বিকট রাবণিক দর্পে যাহা ঘোষিল, তাহার উচ্চারণ সকল ক্রমশ, তাহা অবশ্যই কোন যাত্রাগানের বীরত্বব্যঞ্জক পঙক্তি যাহা উদাত্ত যাহা অনুদাত্ত যাহা গম্ভীর স্বরিত তীব্র হইল! সন্নিহিতরা ঐ শব্দতরঙ্গে অব্যর্থ এক তড়কা প্রাপ্তিল।

ইহাতে কিন্তু মেয়েন্যাকড়ার নিজ দলভুক্ত পার্শ্বস্থিতদের মুখ সকল এমত চালে, গতিতে, নিছক এক অস্পন্দের টানে যাইতে, নড়িতে আছে, যে দেখিতে বড় সিঞ্চিড়া লাগিবে; এই ভৌতিক দর্শন, পিলে সর্ব্বস্ব যাহাদের চালিত এখনও রাখিয়া, এই বিরাট রহস্য প্রকৃতি, যাহা আমাদের ডাইনে বামে, মেঘে বিদ্যুৎ হানিয়া, নক্ষত্রে, গিরিকন্দরে, গতিতে অচলতায় যাবতীয় নশ্বরতায় হাস্যে ক্রন্দনে বচনে, চেয়ারের হাতলে, নিরাপত্তায়, শামুক খোল নকল ছাই দানে, শিশুর মলিন নখে—তোমার সূত্রপাতকে আমরা আহা বলি, আমরা তোমারে নমস্কার করি! তোমার এই শেষ পর্য্যায় দর্শনে আমাদের বুকে বাঁশ ডল! কি বিভীষিকাতেও তুমি তোমার মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছ। ইহাদের খাড়া রাখিয়া তুমি মহৎ হইয়াছ; তবুও আমরা বড় কষ্ট পাই; আমরা চীৎকার করিয়া উঠিলাম। তবু ভাল আমাদের চীৎকার ক্ষমতা দিয়াছ।

কি হইল!

আমরা যে বিনা মেঘে বিদ্যুৎ দেখিলাম! তোমরা দেখিয়াছ! তোমরা, আমি...।

চোখে হাত দিব, অন্ধকারে যাও দেখ, চিন্তা যাইবে। কোথায় আমাদের হাত!

রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ মাধব মাধব! আমরা চীৎকার করিলাম!

আমাদের ঐ চীৎকার কোন সূত্রেই প্রতিবাদ নহে; ঠাকুর এই করুন, যেন কেহ ইহারে কোনদিন না ঐটিকে খুব স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া বলিয়া আখ্যা দেয়; যদি দিবে, সেই পাপ আমাদেরকেও লাগিবে, আমরা—আমি বেনোজলে উৎসন্ন হইবে! ইস! ঐ অহঙ্কার যেহেতু আমরা কিছু নই—আখ্যা মরুক!

ঐ মুখমণ্ডল সকল, আগতদের, কম্পিত আছে, ঐ যাত্রাই টানে উঠিতেছে, দৃঢ়তা শৌর্য্য কদাচ না এখন, আঃ তাহারা ক্ল্যারিওনেটে গৎতোড়া আকর্ণিতেছে, তাহারা তামাক শেষ করিবে তাই চঞ্চলিয়াছে, যাত্রা দেখিবে; পিঁড়ি পাতিতেছে, সত্বর, আঃহা ঐত তহশীলদার বাবু আসিয়াছেন, যাত্রা আরম্ভ হইবে

সাজঘর আলা হইতে, যাহারা সাজ দেখিতেছিল ছুটিয়া আসে।

বেলদার! বেলদার, আমরা বড় আতঙ্কিত হইয়াছি! তুমি দেখ এই সুদীর্ঘ বাঁধের ভেড়ীর কি হইল, বেলদার সেই গই পথের, স্লুইসের, গাঁথনিতে যে বিরাট বট শিকড় গাড়িয়াছে, সেই বট মাথা ঝাঁকাইতে আছে, বেলদার আজ লক্ষ্মী পূর্ণিমা মহা কোটাল আসিবে, আমাদের পৌষ সংক্রান্তিতে দেখ যেন বাধা না পড়ে, আমরা বিপদ গণিতেছি, আমাদের এমন শিরা আছে যাহা ভূমিকম্প অবধি টের পায়—মাটির নাড়ী নক্ষত্র আমরা জানি।

যাত্রার আসর হইতে বেলদারকে উঠাইল; বেলদার কহিল, রসো হে রাণী কি বলে শুনিব, তবে যাইব; মায়ের আমার রেস্তো নাই বলিয়া কতদূর হেনস্তা; তোমরা দেখিয়াছ, মায়ের আমার হেনস্তাতে পাঞ্চলাইট ঝিমাইবেই, শালা দক্ষ, হর আসরেই ঐ ঘটনা দেখা গিয়াছে! মায়ের অপমান। তথাপি বেলদার আপন পিঁড়িখানি বগলে করিল, আগত ব্যক্তিদের সহিত কিছুটা আসর হইতে তফাৎ আসিল।

ইহারা প্রত্যেকেই মহা ভীরুতায় চারিদিক চাহিল, এবং আপন হাতে যে যাহার বক্ষঃদেশস্থ কিছুরে খামচাইয়া ধরিতে ব্যগ্র হইল, ও তৎক্ষণাৎই একই সঙ্গে দক্ষিণের দিকে, অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করত তোতলাইয়া প্রকাশিছে, এ কেমন দেখ, কত রাজ হাঁস(!) উত্তর অভিমুখে যায়, এই ত ভাসানের দিন, উহাদের ডানার ঝপটে হিম পড়িল, আমে বোল আসিল, কাঁথার ঘোড়া রোদে হ্রেষাধ্বনি করিল; এখন ঐ হাঁস চলিয়া যায়! অথচ বন্দুকের শব্দ নাই!

বেলদার, আপন পিঁড়িখানি ডান হাতে জাপটিয়া পা দুইখানির স্থান পরিবর্ত্তনিল, এবার ঘোষিল, মায়ের অপমান, ছেলেতে সইবে কেমন! আমি অস্থির, বল!

একপ্রকার উক্তিতে, ঐ যাহারা খুব হাঁপাইতে আছিল, তাহার কিয়ৎ সমীহ অথচ বিরক্তিতে, খেউ খেউ শব্দ করিয়া উঠিল; এখন এবং বুদ্ধি পাইল, ইহাদের খোলা মালার দ্বারা সংসার আছে; বলিল, দূঃ শালা বুদ্ধি বল, মায়ের অপমান ঐ সব কথা কি আমাদের! ঐদিকে হাঁস যায়; নিজ বুদ্ধিত আছে।

উহাদের, আগতদের, খেউ খেউ শব্দে, বেলদার সমস্ত ব্যাপারটির জোর বুঝিলেক, যে উহারা স্বাভাবিক সামান্য কথা করিতে অপারক হইল, চন্দ্রলোকে একি!

এখন সে যাত্রার আসর দিকে নেহারিল, পাম্প লাইটে অনেক পোকা আসিয়াছে, যদিও পোকাদের জন্য ছোট অগ্নিকুণ্ড (!) করা হইয়াছে; যাত্রার অভিনয়ের নড়াচড়া নেহারিল, এবার পুনঃ ঐ আগতদিগের প্রতি দৃষ্টি দিল; সগর্ব্বে উত্তর করিল , বল; এবং বেলদার স্বীয় মাথাকে, বেশ ভারীরূপে, জানিতে পারিল; যাত্রা যাহাতে অর্থাৎ বিষয়বস্তু হইতে অনেক নিজ অভ্যন্তরের খালি জায়গায় পূর্ণ হইয়াছে, অনেক ভাবিবার, কাজে লাগাইবার বিষয় সকল!

আঃ এইবার ধান ভাল হইল! এইবার একাই ভেড়ী পথে দাঁড়াইয়া অনেক কথা সে মক্স করিয়া লইবে, যে প্রতিটি বাক্যের শেষেতে সে যুক্ত করিবে, যদি বল কেন? এবং ততঃ সে বিস্তারিবে, এখন উহাদিগের বাধা সত্ত্বেও, বেশ ভারিক্কী বিরক্তিতে জবাবিল, তোমরা মায়ের অপমান মান কি না? ইহার নিকট অপমান শব্দটি হয় অতিশয় মনোরম; সে শ্রী সম্পন্ন আছে; সে কোঁচা দিয়া কাপড় পরিতে জানে।

আঃ তোমরা যে কি কর, আমারে কিছু জ্ঞান লইতে দাও, ভেড়ীর জন্মপত্র ঠিকুজী আমার নিকট! কোন দুর্ভাবনা করিও না; মা নিজে ধান দেখিয়াছেন, সেই মা অপমানিত—অপমান কথাটা আমরা শিখিব, বড় দুফলা কথা! আমি তোমাদের জন্য উহা শিকায় তুলিয়া রাখিব! ধান ভাল হইয়াছে, কাটার পর গই খুলিব। মাছ আসিবে! মানুষ কি চায়, মাছ ভাত, পরিবারের হাসি, ছেলে কোলে করিতে, মহাজনকে মান্য, থানে প্রণাম! আমি শিখিব! ছড়া বাঁধিব।

প্রত্যেকে আগতরা, তাহা হইলেও ধীর, মেজাজ হারায় নাই; তাহারা ইদানীংকার অভ্যাসবশত অনেক দূরত্বের দিকে নেত্রপাত করিয়াছিল, তবু একদা সেই মেয়েন্যাকড়াকে নিরখিল, যেখানে তাহাদিগের নিঃশ্বাস সরলতা আছে; অথচ ইহা ঠিক উড়িয়া যাওয়া ধূলাতে, যদি ঘটিল, এই সময় তাহারা ধোঁয়া প্রতিপন্ন করে না; যে ঐদৃশ দূরত্বের চেহারা তাহাদের মধ্যে ধ্বনিত হইয়া উঠিল, এখন বিবিধ রকমের পোকার ব্যস্ততা প্রত্যক্ষিয়াছিল; এবং সকলেই এখানকার ভেড়ীর নিকটস্থ দরজার কাছের অদ্ভুতত্বকে অঙ্গুলিতে গণনা করিল!

ইহা করিতে, তাহারা নিজেদের, প্রতিনিয়তর বিশেষ ব্যাধিরে, যাহা নিরানন্দময়, তাহাতে আটকা

দিতে উদগ্রীবিল; একদা হস্তদ্বয় বাদ্য বাজাইল, হস্তে কখনও কাহারও মুখ চাপিল, কখনও বা কানে অঙ্গুলি দিল, সেই হস্তই তাহাদের এখন ছুটিয়া পেটের প্রতি ধাবমান হয়। তাহারা সভয়ে চমকাইয়া হস্তদ্বয় ঊর্দ্ধে তুলিয়াছে। সকলেই দেখিল, বেলদার শিশুপুত্র লইয়া ভেড়ীর উপর, মৃদু হাস্যে বলিতেছে, ও পেট, পেট বড় মুচি! তোর নিকুচি॥ ইহা বলিতে বেলদারের অবয়ব, তাহার নিজের শিশুর, এই দলের অল্পবয়সীর, কখনও গায়ক বৃদ্ধর রূপ ধরিতেছিল। ঐ ব্যক্তিদের দৃষ্টি এখানে বঁড়শীয়া এমনই দৈববশে আছিল, যে, তাহা ছাড়াইয়া আনা অসম্ভব; কেননা এক্ষণই ইহারা এক ভয়াবহ ঘটনা দেখিবে! বেলদার তখন জলপ্রপাত দর্শনে লাফাইয়াছে। আবার ঐ লোকেরা দেখিল যে, তাহাদের গোষ্ঠীবদ্ধদের ছায়াতে চাপ রক্ত পড়িল; বেলদারের ক্রোড়স্থ শিশু ছিটকাইয়া পড়িল; বেলদার গৃহিণী যে মস্তকে স্বীয় পরণের কাপড়, হাঁড়ী হাতা লইয়া, লাটভাসা জল পার হইতেছিল, বেলদার তাহার শ্বশুরালয়ে যাইতেছে খাদ্যাভাবে। যাহার কোমরে পিতলের বিছে (এই অঙ্গগহনা, রমণীগণের নিতম্ব ঘিরিয়া পরা হয়; ভারতীয় স্থাপত্যে ইহা ব্যবহৃত হইয়াছে—খুব অবাকের যে এখনও সময়তেও কাহারও নিকট সমাদৃত) সে অদ্ভুত এক অভিব্যক্তি করিয়া উঠিল সেই জলে থাকিয়া, বেশ উচ্চে, ভেড়ীর উপরে একি ঘটিল! সে দেখিল! তদীয় গুরু অধোভাগ কিম্বদন্তীতে দুলিল, ক্রমে সেইটি কাহিনীতে, এখন ঘটনা, তাহার চোখের পাতা পড়ে।

আঃ ঐ সে নগ্নদেহ ভেড়ী পাড়ে সব ভার ফেলিয়া, ছোট গাছ ধরিয়া! উপরে আসিল; ছুটিয়া আইসে, ভিজা গায়ে রোদ ও জলের প্রতিবিম্ব দশাসই, বুনো চেহারা, এলোচুল, পেটখানি নিটোল কলসের মতন; এখন প্রতীয়মান যে তদীয় হস্তে তুলসী গাছ আছে, সে রক্তাক্ত বেলদারের দেহের নিকটে রুখিল; সে এক অদ্ভুত ভৌতিক উন্মাদনাতে রহিয়াছে; পদদ্বয় বেসামাল, যে এবং কখনও মাথা ঝাঁকিতে আছে; এবং সে তুলসী আঘ্রাণিতেছিল। শিশুটি হত চৈতন্য সাড়হীন থাকিল। যাহাদের দ্বারা ঐ কাণ্ড সংগঠিত হইল, তাহাদের দেহ এখনও বাঁকিয়া নুইয়াছিল। ঐ নগ্ন দেহধারিণীর তুলসী শুঁকিতে থাকা কার্য্য তাহাদের অস্থির করিল; পশ্চাৎ ক্রমে পা পড়িতেছিল!

ঐ খুনের দায় দারগা আসে নাই!

বেলদার বৌর নিশ্চয়ই চোখের জল, শুকাইতেও পায় নাই, কেহ তাহারে কহিয়াছে, ও বৌ কান্দিও না, ঘাটে মাঠে জল, আর জল সহ্য হয় না।

এই বাদা এক ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিল।

আমি ধর্ম্মত বলি, এইতে, নিজেরে দেখাইয়া, দেখিল, ফুট ফুটে চাঁদের আলোতে, ভেড়ী পথে, আটজন পুলিস, তাহাদের গায়ে কোর্ত্তা নাই, পায়ে জুতা নাই, উহা সকল বহিবার ক্ষমতা নিশ্চয় নাই, কেন না কঙ্কাল সার চেহারা শুধু মাথাতে পাগড়ী আছে; ইহাদের মধ্যে হেড দারগা, কোন পোযাক নাই, মাথায় টুপী, চেহারা একই রকমের, শুধুমাত্র পেটটি ঢাউস হইয়াছে; তাহারা আসিতেছিল; খালি পা অথচ চলাকালের জুতার মস্‌মস্‌ ধ্বনি হয়—নির্ঘাৎ পায়ে জুতার মস্‌মস্‌ ধ্বনি অনেক জমিয়া ছিল; এইতে তখনই ছুটিল সেরেস্তা হইতে চেয়ার আনিতে,সেই কালে শুনিল, খবরদার পালাইয়াছে কি কালোপাণি, তখন চেয়ার লইয়া ফিরিয়া আসিয়া এইতে সবিনয়ে প্রকাশিল, হুজুর ভাগ্যবিধাতা, ইহা সেইরূপ লোক নহে!

বটে, বটে, তুমি কে তোমার পরিচয়! পুলিসবর্গ তৎসঙ্গে বিবিধ গ্রামে, এ, হো, এ হেহে, ঈদৃশ তাড়া, খোদাইবারে শাসাইবারে করিতেছে।

তখনই হেড দারগা হুকুম দিলেন, হাত কড়া বাজাও, উহারা তাহাও করে।

হুজুর কাঙাল লোকের বাপ মা, এইতে উক্ত কাণ্ড দেখিতে থাকিয়া বলিল, আমারে সনাক্তির কেহ নাই; এই'র বাপ মা, বৌ, কোলের ছেলে সব দেহ রক্ষা করিয়াছে, দেখুন মহানুভব এইটির জন্য, সত্য বৈ মিথ্যা কহিব না হুজুর, কাহাকেও চোখের জল ফেলিতে হয় নাই। সকলে, এইটি লাটের যে কোম্পানী, মোড়ল, সে পর্য্যন্ত পাঁচ থানায় বলিয়াছে (!) এই উপযুক্ত পুত্র! তোমার জামিন দরকারে আমি আছি। সে মোড়ল আজ নাই, এককালে এবং অনেকেই নাই, যে সনাক্তি করে; এতেক নিবেদিয়া এইতে থামিল; হাওয়া গোঙাইতে আছে, কিয়ৎ তাহাতে কান রাখিয়া দারগা বিস্ময়িলেন, এত লোকের একজনও নাই, মানে!

আজ্ঞা প্রাচীন হইয়াছিলেন।

পুলিসবর্গ মেয়েছেলেদের ন্যায় হাসিল, উচ্চহাস্য হেড দারগার সমক্ষে নিষিদ্ধ; প্রকাশিল, হুজুর এখানে শিশুরাও প্রাচীন, শুনুন!

এতৎ মন্তব্যে এইতে বারম্বার নাসিকা কুঞ্চিত করিলেক, কণ্ঠে স্বর ফিকা হইল, এবং তখন দেখিল, উহারা সকলেই তুমুল হাস্য সহকারে, বলিতেছে, এখানে শিশুরা প্রাচীন হয়, জলে প্রাচীন করিল, জলে প্রাচীন! প্রাচীন! যে কোনকে প্রাচীন করে, অবাঙালী পুলিসের উচ্চারণে ঐ বাক্য ঢের টিট্‌কিরি শুনাইল।

ইহাতে, এইর মুখেতে বোকা হাসি আভাসিয়াছে; এখন উহারা হাস্যে কাহিল অবস্থাতে, অদ্ভুত প্রকার আওয়াজ কাটিল, বল না, মারী মড়ক আকালের খাতক হইল।

আগেই বলিয়াছে, মিথ্যা বলিবে না, এইজন লবণ কোন মাসে জল কাটে জানে, এইতে ভুল স্বীকার করে, ইহার বলা যুক্তিযুক্ত ছিল যে, যেহেতু এইর এমত কোন কুসংস্কার নাই, যে অনাহারে মরিয়া বলা পাপ! যাহা সত্য তাহা এই যে, জীবিতদের খেলা খতম হইলে, ডাক পড়ে; তাহাদের ডাক পড়িয়াছিল!

তচ্ছ্রবণে সকলে ধন্য ধন্য করিল! এবং ঘোষিল যে, পাপ, না না, খেলা ক্ষয় হইলেই ডাক পড়িবে!

দারগা এইর কথা শ্রবণে কহিলেন, তোমার বাপ মা সবাই যখন মরিয়াছে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তুমি ভাল লোক!

আজ তাই ত সকলে এই গাঁটি এইর নিকট গচ্ছিত রাখিয়া মফঃস্বলে গিয়াছে, আর আপনি বলেন কিনা পালাইবে, ছিঃ!

ভাল যে তোমার সাক্ষাৎ পাইলাম, তোমাকে যখন পাইলাম আমি সব বেটাকে জালে টানিব, ওহে হাতকড়া বাজাও, ইহা বলিতে তিনি কর্ত্তব্য উত্তেজনাতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন যে এবং বাজখাঁই পালোয়ান স্বরে চৌকিদার উচিত হাঁক পাড়িলেন, ও হো হো হো, ভাবিও না আইন রোগা হইয়াছে, এই পর্য্যন্ত ব্যক্ত করিতেই, ইনি টাল খাইলেন, তদীয় টুপী উৎখাত হইল, অবশ্য তদ্দর্শনে পুলিসরা তাঁহারে সামলিতে কালেই ঐ টুপী তাহাদিগের হাত হইতে অন্য হাতে খেলিতে থাকিল, সকলেই যখন পশ্চাৎ হইতে তাঁহারে ঠেকো দিতে পারিয়াছে, তখন একজন ঐ টুপী তাঁহার মস্তকে পরাইবার বুদ্ধি করিল; এখন হেড দারগা, তাঁহার দেহ বাঁকিয়া উহা সকলের হাতের উপর, হুকুম দিলেন, গলা ফাড়িয়া হুঙ্কার দাও ঐ কথা! হাতকড়া বাজাও!

পুলিসবর্গের দৃষ্টি হেড দারগার পেটের, ইহা হাপরিত হইতে আছে, প্রতি আকৃষ্ট থাকে; ততঃ ঐখান হইতে চোখ ঘুরাইয়া, তাহারা গ্রামের দিকে নেহারিল; উহা নিথর এক বসতি চিহ্নমাত্র; চারিদিকে জল, জোয়ার ভাটা হয়, আর চাঁদের আলো!

ইতিমধ্যে এইতে বিনীতভাবে কহিল, আইন রোগা হয় নাই, বাক্য বড় আদরের। বড় ভাল, অনেকদিন পর এমত সুন্দর এক কথা শুনিলাম, আঃ ইহা একটি দিন!

এখন পুলিসবর্গরা গুণটানা স্বর রকমে হাঁকিল, আইন কখনও রোগা হয় না, নলচালা, থালাচালা, বাঁশচালা, কুলোচালা, চালপড়া কোনটিই আইন ভুলে নাই; এইবেলা বাহির হও! পাপ বাপকে ছাড়ে না, জানি ও এবং তাহারা হাতকড়া বাজাইল!

প্রথম হইতে এইর খুব ভাব লাগিতেছিল, যে, ইহারা যদি পুলিস তবে এরূপ ভয়াবহ দেখিতে কেন, নজর পড়িতেই করুণার উদ্রেক হয়; ইহার কারণ কি! অথবা এইতে ঐদৃশ কোন ঘোর হেরিতেছে, তাহা হইলে ইহাদেরও ঘরেও কি ধেড়ে ইঁদুর সাঁদ করে, এইটুকু মনন হইতেই, চারিদিকে রাত করিয়া আসিল!

এমত সময়ে হেড দারগা প্রকাশিলেন, তাহা হইলে আমার ঐ কথা তোমার ভাল লাগিয়াছে, তুমি সত্যই বেশ বিচক্ষণ, কিন্তু কতক হাটুরে এমন আছে তাহারা ছড়া কাটিয়া বলে, তাহা ভাল কিন্তু তোমরা এতেক সিঁটাইলে কোন পুণ্যে হে! বুঝে না, আইন যাহাতে মিয়াইয়া না যায়, সেই অন্ত প্রাণ যাহারা তাহারা যত যত্নেই যত দুধেভাতেই থাক, চেহারা এলাইবে।

তাহারা, পুলিসবৃন্দ তদ্রূপ হাঁকিতে আছিল, যে এবং হাতকড়া বাজাইতে তাহারাও বেসামাল হইয়া থাকে, তাহাদিগের শরীরে উড়িতেছে, তবে কি উহা শরীর নহে, উর্দ্দি! ইহারা মানুষের ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের বিধাতা, আবার তখনই বিবেক হইল, কিন্তু তাহা যে কি, ইহা কিনারা করিতে এইতে

হাঁতড়াইতে জাত খোয়াইল; এইটি বা এতটুকু, জামিন বল নাই, কয়েকটি গাছ পাতা যে লোকের অবশিষ্ট; এইর দম আটকা উপক্রমিল! লৌহের শব্দ তখনও হইতেছিল!

এই ক্ষেত্রে, এইতে, শীত কম্পনের উহুহু করিতেই হেড দারগা ধমকাইলেন, তুমি ত দেখি বড় আজব বেয়াদপ! কি জংলী বুনো পানা করিতেছ; কাপড়ের খুঁট গায়ে দাও, আগুন কর যদি এতেক শীত!

এই শীত হিমজাত নহে, খুঁট আগুনে উহায় উচাটন নাই; তখনই মেয়েলী ধাঁচে বলিতে সাধ উপজিল, হুজুর কি টগর ফুলের সড়ক ধরিয়ে আসিলেন; এবং জ্ঞাত এইতে করিল, এই শীত হুজুর আমার ভিতর হইতে আসিল!

ইহাতে, হেড দারগা প্রসন্ন চোখে—দেখিয়াছ না, ধনী গিন্নীতে নাতিদের পেট ভরিয়া খাইতে আছে নিরিখিলে যদ্রূপ খুসীতে গ্যাদাভরে উহা নজর করে, তেমনভাবে—এইটির প্রতি অবলোকনিলেন, এবার মন্তব্যিলেন, তুমি সৎ, বেআইন কাহারে বলে জান না, তবে!

এইতে, তখনই জয় মা, মাগো বলিয়া উঠিল; যুগপৎ প্রশ্ন আসিল, আইন রোগা হয় না, ইহা জজ মানিবে এমন অর্থ সত্যিই কি! যে লোকের ভাবনায় শীত গ্রীষ্ম বরষা ছিল, বাত পিত্ত কফ ছিল, সেইজন এক দম আটকা ধন্ধে পড়িল, ইহা বড় বটে জামাই ঠকান কথা! নয়, যাহার উত্তর শব্দের খেলা; ইহার বাচকতা বড় কূটজ, বড় দোরধরা কথা হয় ইহা, হেড দারগাও তাহা সঠিক জানে না! ভগবৎদত্ত উঁহার দ্বারা উচ্চারিত হইল মাত্র। এইতে উহাদের, প্রতির, দিকেতে প্রত্যাক্ষিল, সেই পৌনঃপুনিকতা, সেই কঙ্কালসার দেহ! এইতে জানিতে চাহিল, হেড দারগা ইহার অর্থ বলুন, হেয়ালী এইজনের সহ্য হইতেছে না, প্রতিদিন এইতে একটু একটু ভাবে প্রাচীন হইতেছে, কিন্তু ঐ কষ্ট আর এক! আপনারা সত্যই কে? আপনি উহা কেন বলিলেন! ঐ কথা বড় ভাবের, নিশ্চয়ই রাজাপ্রজার সম্পর্কগত উহা নহে।

তুমি যদিও প্রতিনিয়ত প্রাচীন হইতেছ, এখানে প্রাচীন শব্দটি অতীব শ্লেষাত্মক শুনাইল, তবু তোমার কথা ও কথার অর্থ জানিবার ইচ্ছা দর্শনে আমারও জানিতে আগ্রহ, তুমি কে? তোমাকে দেখিয়া মনে হয় আমি বহু মাইল হাঁটি নাই, সেই একই চেহারা, অথচ তুমি ধুঁকিতেছ, তুমি অথচ কথার কাঙাল, সেই কারণে বিচার হয় তুমি আর কেউ, এই দেহে একি অলৌকিকতা!

এইতে মৃদু হাস্যে প্রকাশিল, মহানুভব আপনি আমার কাতরতা এড়াইলেন বটে!

বেশ শ্রবণ কর এই আমি বা আমরা দুই তিনটি হাঙ্গামার খোঁজে বাহির হইলাম, চারিদিকে শুধু হাড়সার বিকৃতি, অজস্র খাদ্যপাত্র রাস্তায় গড়াগড়ি যায়, অজস্র ঘুনসীর সুতা কোমর খসিয়া পড়িয়া আছে, শুষ্ক পাতার মতই খাতকরা বিচাল্যমান, আমরা সেই বিখ্যাত ডাকাতকে খুঁজিতেছি, যাহার ভয়ে ঝিল্লীরব স্তব্ধ হয়, আর তোমাদের বেলদার খুন, ইহার পর ধান্য লুঠ! শেষেরটি, ইহা মিথ্যা, পাছে সরকারকে কৈফিয়ৎ দিতে হয় তাই ডায়েরি করে; প্রকৃত প্রস্তাবে উহা বেচিয়াছে—সেই ডাকাতের সন্ধান পাইলাম, বৃক্ষ তলে শুইয়া আছে, কহিলাম ধরা দাও!

সে কহিল, হাতকড়া বাজাও!

আমার কনস্ট্যাবলগণ অত্যন্ত সমীহতে হাতকড়া বাজাইল, ও কহিল, এ কেমন মুমূর্ষু পাঁজড়া সার এত বড় ডাকাত। তবে কি ডাকাত নহে!

আঃ হাতকড়ার বাজনা বড় চমৎকার ঘটনা, দারগাবাবু! বাজাও!

সে কি রূপ!

এ বাজনা আপনাদের করা, আপনি জানেন না।

না আমার কাণ্ডজ্ঞানে নাই।

হাতকড়া বলে আইনকে রোগা হইতে দিও না!

আশ্চর্য্য! হাতকড়া ইহা বলে। বটে এই ত বলিবে, তবে।

আমি আইনকে রোগা হইতে দিই নাই।

তুমি ধরা দিতে পারিতে, তোমার রক্ষিতা বা স্ত্রীকে পুরস্কার দেওয়াইতে পারিতে।

তাই বটে।

এখন এই আকাল তোমাকে কিছু আঁচড় কাটিতে পারিত না!

বটে, হায় তোমার, আপনার, সহিত আগে যদি সাক্ষাৎ হইত!

আমি বুটের মসমসানি করিলাম, তামাসা! তোমার লোক!

মরিয়াছে, ঐ সব তাহাদের হাড়গোড়।

আকালের খাতক! ইস্ তুমি যদি থানায় যাইতে তবে এভাবে মরিতে না! খাইতে পাইতে। মেয়াদ অবশ্য খাটিতে পুনঃ সৎ জীবন!

ভগবান! সৎ জীবন এখানে আছে?

অন্তত খাইতে পাইতে!

বটে, আমার লোকেরা ঐ যাহাদের হাড়গোড় নিশ্চয়, রাস্তায় পড়িয়া, তাহারা হুজুর না খাইতে পাইয়া সপরিবারে মরিয়াছে—এমন আকাল! শিশুদেরও অস্থি দেখা যায়! আর আমি পেটের জন্য ধরা দিব, খাইতে পাইব। আমি আইনকে রোগা হইতে দিব না!

প্রতিবাদকারীগণ বলিয়া উঠিল, তোমরা আইনকে রোগা করিতেছ। তোমরা এই লাটে থাকিবার যোগ্য নয়; কিন্তু এত সত্ত্বেও সেই অঙ্গুলির গল্প নড়িতে আছিল, যদিও বক্তা কোন রা কাটিতেছিল না। এই মায়া যে ইহারা, অপর পক্ষীয় ব্যক্তিরা, স্বরভঙ্গ দেখিল—ঐ নিরবচ্ছিন্ন অস্পন্দ!

অপর পক্ষ, আগতরা, উষ্মা প্রকাশিল; তোমরা ঐ ন্যক্কারজনক বচন ছাড়িবে কি না, অনেক সময়ক্ষেপ হইল, আর আমরা তিনবার বলিব!

এতৎ আজ্ঞায় তাহারা নিবেদিল, মহাশয় আমরা আপনাদের উপস্থিতি মাত্রই ঐ জিগীর থামাইয়াছি।

মানে!

যদি অবশ্য করিতে আছি, তবে জানিবেন তাহাতে আমাদের প্রভুত্ব নাই, যেমন, নানাবিধ শব্দ আমাদের দেহ হইতে প্রস্তুত হইতেছে, হা কপাল, যাহা লইয়া কুটুম্ব বাড়ী, দেবস্থান যাওয়া, হল চালন নিষিদ্ধ! উহা তেমন, আমাদের প্রতি অবলোকনিয়া জ্ঞাত হউন।

ইহাতে, এই প্রমাণ ঘটিল যে নালিশ যাহারা করিতেছিল ও এখনও করিল, তাহারা বিকৃতচেহারার বক্তাদের প্রতি মোটেই এতক্ষণ তাকায় নাই; অবশ্যই ঐরূপ না তাকান ইচ্ছাকৃত; যেহেতু, উহাদের ভয়ানক বিভীষিকাদায়ী শরীর যাহা দর্শনে পুণ্যক্ষয় হইবে; কিন্তু তথাপি উহাসকল, বেচারীদের চেহারা, ইদানীং অতীব অসহায়; এমন যে মেরুদণ্ড সোজা কালসর্প বা দুর্য্যোধনও ইহাদের প্রত্যক্ষিয়া আপন কর্ম্মক্ষয় স্বাভাবিক জানিবে। এমতই আতঙ্ক!

দান্তের সৌন্দর্য্য ইউরোপ দেখিতে পায় না, শুধু যন্ত্রণাই দেখে, শালাদের ঈদৃশী রিপু তাড়িত জীবন! চঞ্চলবাবু দান্তেবিদ তাহাতে সিদ্ধান্ত অন্য! মানুষ যখন ভাগবৎ শক্তি অচিরাৎ লাভ করে তখনই তাহার সুষমা। অর্থাৎ আমরা এতাবৎ যাহা সরলভাবে বিশ্বাস করি গণিতের সংখ্যাপাতনের 'এক' যে মন কল্পনা করে, তাহার, সেই মনে, ঐ কল্পনার পূর্ব্বাহ্ণ হইতে ঐ সিদ্ধান্তই বর্ত্তমান, সেই মন বড় আপনার!

অনুরূপ তেমনটি এই লোক চরাচরের বিন্দুতে!

হায় ইহারা, এই লোকেরা বড় পাঁশুটে! তবেও স্থান সকল, ক্ষিতি অপ তেজ হাওয়া সকলই ইহাদের নিকট হার মানিতে আছে, যে হস্তদ্বয়ে ইহাদের কর্ম্মপটুতা চেহারা রহে, যে তাহাতে নভঃস্থল মান্য করে! তাহাতে যে মিনতি ভক্তি, অভিব্যক্ত হয়! এই দুস্তর নভঃস্থল জ্ঞাত যে, এই নীলাব্ধিবসান এই পৃথ্বী, ইহাদেরই নতজানুর ছাঁচে গড়ন লভিয়াছে; তাই ইহারা প্রতি বিন্দুর সত্য, ইহারা কথা কয়! ধান্যক্ষেত্রকে মাগো সম্বোধন করে! গড় করে!

ইহা ঐ হাভাতেরা, ঐদের ছায়া সমষ্টি জলে পড়িলেই শ্যাওলা হইবে! কিন্তু ক্রমে এক মহান সভ্যতার চেহারা মুখে চোখে স্বচ্ছ হইতেছে, উহাদের দশা, যতই ঘেন্নার, ততই মনে লয়, ঐ সেই সভ্যতা! এখানে মন্তব্যের এই থাকে যে ইহা কোনক্রমেই irony শ্লেষ নয়, ইদানীংকারদের মনে, পাপ এমন যে কোন শব্দ বা অনুভবকে তাহারা মজার করিয়া লহে, একের সহিত একের সম্পর্ক মানুষে মানুষে এমনই বিনষ্ট হইয়াছে, কেহ কাহাকেও ঘাঁটাইবে না, মজা করার বৃত্তি তথা যে সে জানাইতে চাহে সে বা একে কম কিছু নহে, বুঝি!

ধ্রুবই এক অভয়! অন্ধকারে সে, তাহারা, পথ হাঁটে, যে অদ্য সেই অনুষ্ঠান সেই আভাস দিব্য হইল! যে ব্যক্তির মস্তকে এক ছেঁড়া টোকা! তাহার চোখ দুইখানি কি বা আচারী সন্ন্যাসীর! অভয়! কি বা পরম

গাম্ভীর্য্যে ঐ বৃদ্ধার মৃত্যুর নিকট তাহারা বসিয়া, সুউচ্চ ভেড়ী পথে, দামড়া হাওয়াতে তাহাদের চক্ষু পূর্ণ উন্মুক্ত, বহুকাল অতীতে ইদানীংকার আকাশ, যাহা প্রগাঢ় কষায়িত নীল, রুয়ো অঙ্কিত মেঘ; এখানে তাহারা বিদেশী সংস্থান গঠন করিয়াছে, এ দেহ পিঞ্জরে বড় আশা করে, গীতের বাণী যাহা, যে গান চলিতেছে, কোথাও ফুৎকার নয়!

বৃদ্ধা কহিল, আমার পার্ব্বণ আসিয়াছে; তোমরা, ধর্ম্মনাতনী গো উলু দে লো! এত কাছে সাগর, সাগর হয় নাই, আবার সাগর সিনাতে সাগর সঙ্গমে আসিব। আপন দেহ দর্শনে হাসিয়া বলিল: এখন দেড় হাত গামছা হইলে হইবে!

বেচারীর জ্ঞাতি, বলিতে স্বজাতি বুঝে, এই বৃদ্ধা চেনা পর্য্যন্ত নহে; ভেড়ীর উপরে বহু দূর হইতে সর্ব্বপ্রথম, ঐ বৃদ্ধাকে এই দল প্রত্যক্ষিয়া ছিল; যে এবং তখন যখন আপনকারদের গতি ইহারা রুখিল, নিঃসন্দেহে এই কাজ শ্রান্তিদূর কারণার্থেই করা হয়,—অন্যকোন ক্রমে না; হস্তধৃত সানকি, কাটোয়া, ইহারা মাটিতে ফেলিবে কিনা তাহা লইয়া ইতস্তত করে, ইহা ভার হইল। অনেকেই স্বীয় গলা ভিজাইতে ঢোক গিলিতে আছে; ভেড়ীর উপরে এই শ্রান্তরা, পশ্চাৎ বিশাল আকাশ; ধূলা উড়িয়া খানিক অংশ মলিন করিল, আঃ আঃ তাহা মনোহর, এখানে যদি উল্লেখ করি শ্লোক নির্ম্মাণের তরে 'মা নিষাদ'-র মত কিছু আসিল। উহা অস্মদীয় ইহকাল হউক—ঐ বাস্তবতা।

তাহারা পূর্ব্বদিকে চাহিল, দেখিল কেহ একজন নদীর দিকে পা ঝুলাইয়া বসিয়া, এবং ঐ কেহ'র পশ্চাতে ভেড়ীপথ অনেকদূর অবধি বিলম্বিত আছে আর ঐ কেহ তাহাদের হাতছানি দিয়া থাকে; ইহাতে তাহারা নদী, ফেলিয়া আসা পথ, উত্তরদিকের জল পূর্ণ মাঠ, জল হইতে জাগা আলপথ, এক গাবগাছের মাথাতে লাল নিশান, তথা সর্ব্বত্র দেখিল; এবার প্রত্যেকেই নিজেকে বড় আপনার বোধ করিল। এবং ঐ কেহ'র সন্নিহিত হইল।

বৃদ্ধা চক্ষু তুলিয়া কহিল, তোমরা কি ঐ পথ ধরিয়া নামিবে? নামিও না, মধ্যরাতে অচেনা, লোকের কথা, যদি সাক্ষাৎ হয় তবে, প্রত্যয় করিও না।

অবাক হইতে হয় বা জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে চাহিলে হয়, ইত্যাকার বৃত্তি ইহারা ভুলিয়াছে; সকলেই দলপতির, কিভাবে যে সে অধিষ্ঠিত হইল তাহা হুঁশ নাই, দেহ ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল; যে এবং বারম্বার বৃদ্ধাকে নিরখিতে ছিল; এই জন্য কি সেই যে হাতছানি দিল—যাহাতে অনেক দিবস পর তাহারা আপনাদের কি প্রকার এক রকমের অনুভব করিল—নাভি হইতে যে জ্বালা পিচকারি ছুটাইতে আছিল তাহা নাই, এখন তাহারা ভিন্ন প্রকৃতির। নিশ্চয় মালুম হয়, অন্বেষণ, বলা যায়, ব্যতীত অন্য বৃত্তি তাহাদের আছে।

বৃদ্ধার ওষ্ঠ খাবি খাইল, যে এবং খানিক দম লওয়ত মৃদু হাস্যের চেষ্টার সহ নিবেদিল, আমি একটু ভূঁয়েতে টান হই, না হইলে সব বিশদিতে পারিব না, এতদ্বচনের পরেই বৃদ্ধা আপন গাত্র মাটিতে এলাইয়া দিল, দুই কর জোড় করি তাহার উপরে আপন গণ্ডদেশ স্থাপন করিল।

যে এবং খানিক পরেতে, সমবেতদের চোখ ঘুরাইয়া দেখিয়া ধীরে বলিল, এখন যদি আমার কাল হয়, তবে আমার পুণ্য। সত্যই আমি ভাগ্যবতী! তোমাদের, লোকেদের, মানুষের সামনে মরিব। তোমরা বাঁচিয়া বর্ত্তিয়া থাক এবং এক দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল।

এবম্বিধ নিথর অপ্রাকৃতিক পরিবেশে বৃদ্ধার উচ্চারণ প্রতিধ্বনিত হইল, খুব বিস্ময়ের, যে ঐ প্রতিধ্বনি প্রথমে ভাগ্যবতী পরেই দীর্ঘশ্বাস, মানুষের পরেই ঐ দীর্ঘশ্বাস যে এবং ঐ বাঁচিয়া বর্ত্তিয়া থাক বাক্যের পরেই আবার সেই দীর্ঘশ্বাস।

এবার সব নিশুতি, শুধু হাওয়ার শব্দ, বৃদ্ধা একটু স্বস্তিতে বা আরামে, হাই তুলিয়া, আঃ হাই যে তুলে তাহারে দেখিলে, যখন সে তুলিতেছে, তখনই উদ্ঘাটিত হয় যে কত কালকার কত গোপনতাই না সে জানে, আমরা কাছে ঘেঁষিতেই চাহি, কহিল, কাল যখন মধ্যরাত, এই পর্য্যন্ত জ্ঞাত করিয়া সে আপন বাম হাতখানি বাহির করত, উহার তর্জ্জনী দ্বারা ধূলাতে এলেক টানিল, থামিল, পুনঃ ভূমি লিখনে প্রবৃত্ত হইল, উচ্চারিল, বাবা গায়ে কাঁটা দেয়, আমি জাগা, দেখ এতাবৎ আমার সিঙ্ঘিড়া লাগিতে আছে, দেখিলাম, কে দুই জন ঐ জলা (জলপূর্ণ ধান্য ক্ষেত্র) পার হইতেছে, এত দ্রুত! খট্‌কা লাগিল; আমি শুইয়া পড়িলাম সবাইকে জাগাইতে চাহিলাম, দুয়েক জন জাগিল, তবে তখনই, যখন তাহারা আসিয়া গিয়াছে। আঃ কাল ঘুম।

আগন্তুকদ্বয় ভেড়ী পথে উঠিল, বলিল, উঠ। উঠ। খবর এই যে, ঐ যে গ্রাম...নং ইউনিয়ানের...মৌজার মধ্যে। ঢাকের বাদ্যি শুনিতে পাও না, ঐ দেখ রোশনাই বাজী কত আলো। এক তাজ্জব আলোর ছটা তখন আকাশে খেলিয়া অদৃশ্য হইল—যুদ্ধকালীন দূরপাল্লার সার্চ্চ লাইট—নদীর সঙ্গীরা সবাই বেটাছেলে, তাহারা সবাই চোখ মুছিয়া দেখিল। পুনরপি আগন্তুকদ্বয় যাহা প্রকাশিল, তাহা হয় এই যে, ঐখানে ভারী ধূম, যজ্ঞি বাড়ী, সাতদিন চলিবে, পত্তনিদার বাবুর মেয়ের বিবাহ। বাবুর ইচ্ছা, সবাই আসুক। ভেড়ী পথ দিয়া যাহারা যায়। খাইবে ছড়াইবে।

মদীয় সঙ্গীদের মনে কোন খট্‌কা লাগিল না, একে বাতাসের দাপট, তাহা ব্যতীত ব্যাঙের ডাক, মুখে হাত রাখিয়া কথা কহিতে হয়, উপরন্তু তাহারা অর্থাৎ আমরা ভুলিয়াছি আদতে মনুষ্য স্বর কেমন, তথাপি আমি কিয়দংশে নিশ্চয় বুঝিয়াছিলাম, কেননা ঐ আগন্তুকদ্বয়ের পায়ে জল দাগ ছিল না অথচ তাহারা জলা পার হয়, বা কাদার পাঁকাল গন্ধ ছিল না, অথচ তাহারা কাদা ভাঙে, উহাদের পদদ্বয় প্রায় আমার মস্তকের নিকট; তাই উহাদের কথা বিশ্রী ঠেকিল, আমার সঙ্গীরা আগ্রহিল, কিন্তু রাস্তা।

পাখীর ঠোঁট লাগা রাস্তা ঐ দেখ, এখন ভাটা পড়িতে আরম্ভিয়াছে, স্লুইস খুলিয়া থাকার জন্য ইহা ঘটে, বেনো জল, সিঁদাইবার জন্য স্লুইস বন্ধ নয়, তবে এত কিছু জল নহে, ধানই ডুবিয়াছে। রাস্তা সেস্ দেওয়া হয়, কোথাও ভাঙ্গা নাই। রাস্তা পোক্ত কিছুক্ষণেই বুঝিবে।

আমরা তো জ্ঞাতি নই।

জ্ঞাতি অজ্ঞাতি সবাইকে আন, তাহারা খাইবে ছড়াইবে। যে, সেই আমার জ্ঞাতি যে এই পথে যায়।

হা হা আমরা শুনিয়াছি বটে, যে ঠাকুরের কৃপা এক এক জনাতে এমনই আছে, যে তাহারা লোক খাওয়াইয়া নিজে জলস্পর্শ করে, লোক খাওয়াইয়া তাহাদের আনন্দ। তাহারা স্বর্গে যাইবে। হা তাহারা কোথায়!

আমরা শুনিয়াছি উহাই তাহাদের ব্রত। তাহারা দেখিতে যারপরনাই সুন্দর হয়, নিমন্ত্রিতদের জল খাইবার গেলাস দেয় (মাটির গেলাস) ভোজনরত ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসা করে, অনুরোধ করে, দীনদেরও কাঙাল বলিয়া মনে লয় না, হাতে পান দেয়, জোড় হস্তে জানিতে চাহে, পেট ভরিয়াছে ত! হা তাহারা কোথায়?

আমরা শুনিয়াছি একজনা ভোজী যদি, খাদ্যাংশের যদি কিছু আপন সন্তানদের জন্য লন, যাহারা অনুপস্থিত—তবে ঐ গৃহী তাহা দেখিয়াও দেখেন না, বরং আড়ালে চোখ মুছে, হায় মালসা—মাটির পাত্র, বাটি আকারে, অর্থাৎ মুখ আয়ত অশৌচ ও যজ্ঞি বাড়ীতে ব্যবহৃত হয়—ভরিয়া খাদ্য পাঠাইতাম যদি, তবে উহারা কত না খুসী হইত। হা তাহারা কোথায়?

এসময়, ইত্যাকার সাধু বচনে, ঐ দুই আগন্তুক ব্যক্তির প্রত্যক্ষ সকল হর মুহূর্তে বিকৃত হয়; এই ছোট এই বড়; যে তাহা আমার বুদ্ধিতে শুধু আসিল; তখনও আমি ভুঁয়ে শুইয়া আছি, আমার লোকেদের কুকুরও স্তম্ভিত, আমি অবলোকনিলাম উহাদের পা উল্টা দিকে অর্থাৎ পশ্চাতে ঘুরিয়া আছে; যে এবং ঐ পদদ্বয় সকল ভূমি স্পর্শ করিয়া নাই, শুনিয়াছি, দেবতা মহাভারত দময়ন্তী স্বয়ম্বরা যুধিষ্ঠিরের রথ। সন্ন্যাসী ইহাদের পা'ই মাটি মাটিতে থাকিয়াও স্পর্শ করে না।

হ্যাঁ বটে আমরা শুনিয়াছি, সেই মহাপুরুষদের আলস্যভঙ্গে যে অবসাদ নিষ্কাশিত হইয়া ঝরিয়া পড়ে, তাহাই আমাদের মতি: সুমতি কুমতি; ফলে কেন সেই মহাপুরুষেরা আপন অবসাদের উপর, এই মৃত্তিকায় পা ঠেকাইবেন, দেখ না কি আশ্চর্য্য, শস্যের জীর্ণতা না দেখিলেও এইবার, আমাদের পাপে যাহা ঘটিল, তাঁহারা মায়ায় আচ্ছন্ন হয়েন না; তেমনি কণ্ঠে বলেন, আনন্দ মে রহ!

এখন ঐ দিনমানের দল, বৃদ্ধার কথাতে প্রত্যয় করে, যেহেতু বৃদ্ধার বর্ণিত আগন্তুকদের পদদ্বয় উল্টামুখী; একমাত্র এই চিরাচরিত সত্য, তদীয়া দেহ, বাক্যকে জাগতিক বাস্তব করিল; ইহারা প্রকাশিল, যে মৃতদের গঙ্গাতে অস্থি বিসর্জ্জন হয় না, পিণ্ডদান হয় নাই, তাহাদের অনেকের পা মাটি ছাড়া তবে সে পা উল্টা! তাহারা আমাদের বিপথে চালিত করে! যে এবং বৃদ্ধাকৃত ভূমি লিখনের প্রতি নেহারিল!

বৃদ্ধা কহিল, ঐ আগন্তুকদের লোভনীয় আলাপে, আমার সঙ্গীগণ, বিবিধ প্লীহা চমকানো আওয়াজ করিল; আপনাদেরই হা হা রবে খেদাইতে লাগিল। একজনাতে কহিল, বুড়ী শুন, শুন! শুন ঐ বিবাহবাড়ী হইতে বাদ্যের আওয়াজ!

এ যেমন বা গাজন, আমি নাচি! আমার কি আনন্দ।

আমিও।

আমিও।

আমি ঐ ধোঁয়াটে আলোতে দেখিলাম, উহারা কাঁধে ঢেঁকি তুলিয়াছে, তাহাতে খর্জ্জুর বট ইত্যাদির ডাল, তাহারা উহাকে চড়ক গাছ করিয়াছে, আমরা এয়োরা কেশরাশি দ্বারা, এলাইয়া, উহাদের পথ পরিষ্কার করিলাম, গ্রামে ভারী ধুম, চৈত্রমাস! আঃ ঢেঁকি আমি এক টানা তিন প্রহর পাড় দিতাম, একদিনের তরে মোনা বেচাল হয় নাই—দুর্ঘটনা করে নাই! মুচিরা! এ সময় গাজনে তাহাদের বড় কাঁসিটি বাজাইত! সত্যই তাহারা, মদীয় সঙ্গীগণ, নাচিতে কালেই পড়িয়া যায়; সেই অবস্থাতে, এই শব্দ তাহাদের ঠোঁটে বাজিল, 'কাঁইদানা, আনা আনা, ঝাঁক্ কুড়া কুড়'—এই ধ্বনিতে জিলা অন্তরে শব্দ আরোপে অর্থ ব্যঞ্জক করা হয়, যেমন (উমা স্মরণে) 'মাগো রইবি কতক্ষণ তোরে দেবে বিসজ্জন' ইহাতে দুঃখ প্রকাশিত হয়—যে এবং ঐ বাজনার তালমানে ভূমি লুণ্ঠিত দেহ সকল আন্দোলিত হইল!

আগন্তুকদ্বয় অনুরোধিল, উঠ উঠ! শুকতারা উঠিবার সময় হয়!

আমার সঙ্গীরা ত ভূঁয়ে, অনেক দিবস অন্ন নাই, জোর নাই, আহ্লাদের ধমকে তাহারা অমন ধারা পড়িয়া রইল, উঠিতে হাঁক পাঁক করে, মাকড়ারা খুবই খুসী!

ভেড়ার দল যাহারা এখানে আসে, হায় এই কালচেটেগণ, কালে যাহাদের চাটিয়াছে—আপনাদের মর্ম্ম হইতে আন্তরিক সমবেদনা, 'বেচারী' শব্দে জানাইতে চাহিল কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে অত্যাদ্ভুত কৌতুকপ্রদ আওয়াজ বাহির হইল। জিহ্বা দ্বারা ঐরূপ বিকট রব তুলিল।

এখানে বলা প্রয়োজন, তাহারা নৃত্য করিল, রব তুলিল, ইত্যাকার অভিব্যক্তি সম্ভব নহে; জানি; আমরা এখানে, স্বাধীনতা লইলাম।

বুড়ী উঠ, বাবুরা লোক পাঠাইয়াছেন!

আমার কপালে নাই, আমি আমার মেয়ে বাড়ী যাইব!

তোমার মেয়ে, আনন্দে ইহারা অশ্লীলতা করিল, বোবা কে তাহার!

তোমাদের স্মৃতিভ্রংশ হইয়াছে, তোমাদের স্মৃতি সেই ব্যক্তির মতো যে, অনেক দিবস পর খাদ্য পাইয়া মুখ দ্বারা খাইতে থাকে। হাত ভুলিয়াছিলে, তোমাদের ঘর কোথায় তাহাও বলিতে পারিবে কিনা সন্দেহ হয়, কোর্ট তোমাদের সাক্ষী নাকোচ করিবে!

আমার সঙ্গীগণ, এবম্মুক্ত গঞ্জনাতে কিঞ্চিন্মাত্র ক্ষুব্ধ নহে; বরং তাহারা, ও হোঃ হোঃ রব তুলিয়া আকাশের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশে সোর লাগাইল। ইয়া হু ঐ বাদ্য ঢ্যাম কুড়াকুড় বাদ্দি বাজে সীতারামের খেলা! ইয়া—হু হু!

হঠাৎ ঐ জলার একান্ত হইতে, নিশ্চয় শিয়ালের ডাক জলা ভাঙ্গিয়া আসিল! আগন্তুকগণ তদুত্তরে মুখের পাশে হাত রাখিয়া হাঁক পাড়িল, ও হোহোও ওয়ে!

প্রতিধ্বনি হইল!

আমার অন্নহীন বন্ধুগণ, দড়বড়ি উঠিয়া মাজা দুলাইয়া নৃত্য করিতে থাকিয়া, মুখে বাদ্য ধ্বনি করে, আগন্তুকদ্বয় কহিল, ওগো উঠ চল! তুমি এই সুযোগ হারাইবে কেন, তুমিও ত অভুক্ত!

লপসী খাওয়ার সাধ আমাতে নাই!

লপসী! লপসী কথাটি তাহারা মহা আতান্তরে উচ্চারণ করে; তাহাদের মুখ আকোচ বীভৎসিল! চক্ষু আঁকাড়া চালের মত লাল, তত্রাচ রোষ সম্বরর্ণিয়া, অতীব মহাজন সুলভ, ধীর কণ্ঠে বলে, ছিঃ ছিঃ এমন কথা বলা তোমাদের নিকট আশা করি না, এহেন বদনাম, লপসী! তোমরা অতিথি, বিয়ে বাড়ী উহা, উহা কি জেলখানা! ইহাতে কন্যার অমঙ্গল সাধিত হইবে। লপসী ছিঃ!

পাগল! পাগল! আমরা কি চোর!

চোর যদি নহি তবে এ জাঁত দুর্ভোগ কেন।

পাগল!

আমরা ঘর হইতে ইন্দুর চলিয়া যাইতে দেখিয়াছি, আমরা রাত জাগি লক্ষ্মী প্যাঁচা দেখিব—গুপ্তিপাড়ায় রামচন্দ্রের মন্দিরের টঙে এক সুমহৎ লক্ষ্মী প্যাঁচা থাকিতেন, সন্ধ্যা সমাগমে তাঁহার ডানা

আন্দোলিয়া বাহির হওয়া ভুলিব না—সেই রাতে আমরা বিমূঢ় হইলাম, কতবার উলুধ্বনি আমাদের জিহ্বায় থমকাইল, কাঁসর! ছিঃ! জিহ্বা কাটিয়া বিস্তারিল, দেখ হাভাতের পাপ, ভুলিয়াছি যে লক্ষ্মী পূজায় কাঁসর নিষিদ্ধ! (কোথাও কাঁসর থাকে) আঃ চোরের মতই আমরা!

আমার সঙ্গীরা, তেমনি অভিব্যক্তিতে, তেমনি বাদ্যরব তুলিয়া, বাঁধের কলম কাটা ধার বহিয়া নীচে নামিল, চোখ ফিরাইয়া দেখি তাহারা ক্ষেতে জলে নামিয়াই ঘোষিল, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা!

এই কয়েকদিন নিষ্ঠাবতীরা উপবাস করিয়াছেন, অদ্য পারণ, অদ্য ঋতুস্নান, অদ্য অম্বুবাচীর নিবৃত্তি! আমি দিন তারিখ ভুলিয়াছি, তবে আমারে বামুনের মেয়ে যে আমাদের মতই, তাহার পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলে, নিঃস্ব হাভাতে হইল; সে কহিল, চাঁদ যখন ঐখান হইতে দেখা দিবে তখন জানিবে, ২ কলা সরিয়াছেন, চাঁদ ঘষা কেননা চ্যাগ্ড়া মেঘ, তারা নাই; দেখিলাম উহারা মহা আহ্লাদে চলিয়াছে জলা দিয়া, ঐ আলোতে বোধিত হই তাহারা বেশ দূর! কুকুরটি পশ্চাতে চলিতেছে! হঠাৎ হাহা করিয়া ত্রিভুবনকে এক বিকট হাস্য বিনষ্ট করিতে চাহিল, চারিদিকে অন্ধকার গাঢ় হইল, ব্যাঙ তারস্বরে ডাকিল, খলখল হাস্য প্রতিধ্বনিত হইল! আমার হাড় অবলম্বনে যে দুঃখীজন আছেন, তিনি কম্পিত হইলেন, কেননা হাড় নড়িল, বেচারীকে অভয়দান নিমিত্তে আমি বলিলাম ভয় কি আমি আছি; আবার এদিকে আমার এই আমসী দেহে সিঞ্চিড়া লাগিল! আমি ছড়াটি বলি!

আমার সাড়
টেঁকির পাড়
তারও পার!
আমার সাড়
ভাত মাড়
তারও পার!

আমি উঠিয়া বসিলাম এবার আমার কানে আসিল!

আমি, আমি খাব!

তাহার পরক্ষণে ঝুটপুট, পরক্ষণে নিঃশব্দ। সব স্তব্ধ! শুধু কুকুরটি, তাহার কণ্ঠস্বর বসা, যেমন আমাদেরকে; আমাকে সে ডাকিতে থাকাতে স্বর বিকৃত হইল সে কান্দিয়া উঠে, সেই শব্দ ভয়ঙ্কর—সেই জীব ঐ জলে উন্মত্তের ন্যায় চক্র দেয়! আর ডাকে, আমি কপালে হাত ঠেকাইলাম; নদী বৃক্ষ ইহাদের, যে মাটিতে বসিয়া তাহারে প্রমাণ করি বলিলাম, ঐ লালসা মরিল, তোমরাই আমাকে বাঁধিয়া রাখিলে—আমার সাধ্য কি আমি রুখিব!

তখন এইদল, দিনমানের, যাহারা এখন ভেড়ীর নিকটে দরজাস্থ হাভাতেদের—এইদের জিগীর বিষয়েতে—তম্বি করে এবং উহাদের উত্তরে তাহারা থ; সত্যই কি ইহারা রুখিয়াছে; আর সেই বাণ ফোঁড় চীৎকার নাই, ফেন দাও, ইহাদের মুখ কাহিল।

তখন প্রতিবাদকারীরা একে অন্যের প্রতি নেত্রপাতিল, তাহাদের গাত্রে অস্থিরতা খেলিতে আছে! তোমরা বল যে তোমরা ঐদৃশ ভাষা আর বলিতেছ না, তোমরা রুখিয়াছ যদি, তবে ঐ অদূরে মেয়েছেলেরা অস্বাভাবিক কোন কারণে এখনও অবধি! এই সকল বাক্যের ইতিমধ্যে কিয়ৎ অন্যমনস্কতা আছে; যে কি যেন বলা দরকার তাহা আঁচড়াইতেছে, যে মূলত যাহা এই হয় যে, তাহারা আইনকে রোগা করিও না—বলা যে হয়, তাহা ভুলিয়াছে।

আপনারা আমাদের ওষ্ঠ জিহ্বা দেখুন, কান পাতুন, এই শব্দ আমাদের রোগ! আমাদের ব্যয়রাম, কি হে মান কি না, ইহা আমাদের আর জনমের সুদ আসল, আমরা যদি এখন হাটের পালিতে বিশ্বাস করি, তবে ইহা আমোদের রোগ...এই টেঁকুর, সে আওয়াজ কি ভয়াবহ কর্কশ, কখনও বা কুমির কখনও বা হাড়ের, ঝড় ঝঞ্ঝা বহিতেছে!

বিশ্বাস করি! সেই হাট বটে কোম্পানীর, ইংরাজ প্রতিষ্ঠিত বা পরিচালিত ইহা অসমর্থিত, সেই পালি

সত্য! সত্য যদি নহে তবে উহার পার্শ্বস্থিত খালে সাগরের অত মাছ আসে কেন—জলে কামট নাই! আমরা সত্য বৈ মিথ্যা বলিব না, আর জনমের মেয়াদ! আমাদের এই রোগে কোন হাত নাই—যাহা শুনিলাম বেশী খাইলে বদহজমে হয়। এই শেষোক্তি তাহাদের মুখে হয়, যেমন তাহারা মৃদু হাস্য করে।

হুজুরগণ জানিবেন, আমরা বুদ্ধিভ্রংশ নহি, আমরা নিজেদের গালি দিয়া থাকি! যে এবং ঐ ইহারা গালি দিয়া উঠিল, বেশ হইয়াছে শালা মর মর বেজন্মার দল! এবম্বিধ অভিশাপে নিশ্চয়ই ঐ অপগণ্ডদের নিজেদের চোখে জল দেখা দিল! কেননা যে কথাই তাহারা বলে, তাহাতে এই সকরুণ আর্ত্তনাদ আছে যে, আমাদের বড় ক্ষুধা পাইয়াছে। ইহাতে তাহাদের চক্ষু ঝাপ্সাইল! হায় তাহারা আপন কাঁধ আপন কড়া হেরিলে অন্তর চোয়াল ঘর্ষণে এই দুঃখকে সামাল দিতে পারিত। প্রতিবাদীগণ এই স্বীকারোক্তিতে বড়ই জলে পড়িয়া গেল, নিঙড়ান খেদ উপজিল; যে কেন তখন, প্রথম যখন উহাদের জিগীর শুনিলাম, তখন বাসন সকল দ্বারা দ্রুত নিনাদ সংগঠনে ঐ শব্দকে ডুবাইতে মতিচ্ছন্ন—ইহা হীন ইহা ইতর বটেই—আমাদের হইল কেন!

হায়! মধ্যম অঙ্গুলি তোমার পরামর্শ সৎ, আমরা, যাহার আছে তাহার, মহাজনের, বাড়ী যাইব, তাহার কুকুরকে মহাশয় বলিব। ইহাদের সকলেই যে ঈদৃশী বিবেচনা করে এমত না; কিছু জন, মুখ অন্যদিকে ইহাদের ফিরান আছে, তির্য্যক চোখে ঐ আত্ম অভিশাপকারীদের বিলাপ বুঝিতে প্রয়াসিয়াছে, এবং ইহা করিতে ইহাদের অহঙ্কার হয় বিজেতার, যে, ঐ বিকট দর্শন অপর পক্ষ ধ্রুবই দাঁড়া ভাঙা কি না জানিবে! তাহারা আমরা যাবৎ এই স্থান ত্যাগ না করি তাবৎ চুপ থাকিবে কি! বস্তুত, এই প্রতিবাদ যে উহাদের জিগীর ইহারা থামাইতে আসিয়া ছিল, ফলে তখন এই মনোবৃত্তিতে স্বীয় গাঁ ঘর ঠিকানা থাকে তবে তাহা রেশ মাত্র; এমনও যে, ইহারা কাস্তের বাঁটের গল্প রসাইয়া বলিতে পারিত।

যে এক বামুন এক কামারকে কাস্তে গড়িতে দেয়, কামার আজ না কাল হইবে বলিত, কামারের সহিত হাটে মাঠে যেখানে দেখা ঘটে সেখানেই বামুনের তাগাদা; কামারের ঘরে গিয়া ত বটেই সে ব্যস্ত করিত—আমার কাস্তে! একদিন কামার কহিল, ঠাকুর কাস্তে ত প্রায় প্রস্তুত, দাঁত কাটা হইয়া আসিল! তবে মহা আতান্তর! বামুন জানিতে আগ্রহিল কি; না তো কাস্তের বাঁট! বাবলা কাঠের অভাব কোথা পাই। বামুন কহিল, ও এই কথা, আমি তোমায় কালই কাঠ দিব। ইহার পর দিবস হইতে, কামার বামুনকে তাগাদা দেয়, হাটে মাঠে পথে যেখানে সাক্ষাৎ হয়। বামুন রোজই বলে, কাল তোমার ঘরে পৌঁছাইয়া দিব। এইভাবে কামারের জ্বালাতে বামুনের পেখম বাহির হইয়া গেল, বামুন ঝালাপোড়া হওয়ত কহিল, দূঃ শালা কাস্তে আমার দরকার নেই!

এই গল্প ভুলিয়াছে এখন নিশ্চয়—এখানে মাত্র কয়েক জনই জানিত এমন সবাই জানিত, তবে এমন আছে যাহারা বেশ ভালভাবে রসাইয়া বলে। উহা হইতে নীতি টানিতে পারে। নীতি শুদ্ধ যুক্তি। ইহাদের মধ্যে সেই, ঐরা ভাবিল, যদি ফের ঐ দল বেগোড় করে, অমান্য করে তবে তাহারা বুঝাইয়া দিবে।

এখন সেই ত্রিভুবন লোপকারী, সেই অভিশাপ হইতে, খেদ মিশ্র ক্রোধ অন্তর্হিত ক্রমে হইয়া, পারিবেই বা কতক্ষণ, অজানিতেই বাক্য সকল তাহাদের, এতাবৎ জিগীরের যাচ্ঞা করণের সুর ধরিল, যে এবং নিমেষেই সেই লাঞ্ছনার স্বরভেদ করিতে প্রয়াসী হইল, কোমরের কষিতে, কাপড়ের গ্রন্থিতে আঁট দিল। একি তাহাদের গাত্রে কে সেই যে দরজাস্থদের মাঙ্গিবার গায়কী ঢালিয়া দিতে আছে।

এ সকলের অসহায় চেহারা রাগত জনেদের চোখে পড়ে নাই, তাহারা বেচারীগণের মধ্যে এমতই যাহারা ঘোরে ছিল, যে তাহাদের বাহুতে অযুত মরদের বল, তাহারা ক্ষিপ্ত মার্জ্জারের ন্যায় ফুঁসিল; তাহারা ঝাঁপাইয়া পড়িতে দাপটে অগ্রসরিল। ইহারা নিশ্চয়ই মনস্থিয়াছে যে দরজাস্থদের যদি না প্রহার করে, যদিও তাহারা এ চীৎকার করে না, যদিও অঙ্গুলির গল্প উড়িয়া গিয়াছে, তবু তাহারা বিরত হইবে না, কার্য্যত উদ্দেশ্য উহাদের সুর, আগতদের, কণ্ঠে বসিবে।

তাহাদের এক হাতে কাস্তে, অন্য হাতে এমন মুদ্রা যেমন এখনই তাহারা ধানের গোছ ধরিবে; কিন্তু যাহাদের কব্জা করিতে এই প্রবৃত্তি, তাহারা ইহা গ্রাহ্যে অবসর পায় নাই, তাহাদের সবাকার দৃষ্টি একদিকে নিবদ্ধ, তাহাদের আশ্চর্য্য স্বরভেদ ঘটিল, অহো অহো আহা আহা! পুণ্য এমন বচনে স্থানকে উচ্চকিত করিল।

এহেন আশ্চর্য্য বচনকে বিরোধীগণ, ধিক্ মূঢ়মতি! উহাদের পুরাতন ধুয়া বলিয়া জ্ঞান করিল; ইহাতে

বল ও শৌর্য্যে ঘা পড়িল, অহং অসন্তুষ্ট হইয়াছে, ইহা কি বা ঔদ্ধত্যের টিট্রিকার! তাহারা আক্রমণে বেসামাল; নিজেদের রাশ টানিতে অসমর্থ হইল, ধাবিত আছে, আছাড়ি পড়িল, হা দুর্দ্দৈব! তাহারা ভূমিতে সাঁটিয়া গিয়াছে সেখানেই, প্রায় যে স্থলে ঐ আশ্চর্য্যান্বিতরা, অবাক যে ইহারা যদ্যপি খানিক নিশ্চয় ঐদৃশ পতন দর্শনে গাত্র সঞ্চালন করে, সরিয়াছিল নিশ্চিত; তাহারা কপালে ও বুকে বিস্ময়ে হাত স্পর্শ করিতে আছে; ভূমিস্থ, যাহারা অবসন্ন, কেহ উঠিয়াও দাঁড়াইল; দরজাস্থদের দৃষ্টি অনুসরণে যাহা দেখিল, তাহাতে তাহাদের সর্ব্বশরীর ভেদিয়া আঁক শব্দ উদ্ভূত হইল, তাহারা চকিতেই সম্মোহিত, নিষ্পলক সেই দিকে চাহিয়া; কণ্ঠে, অহো ভাগ্য!

তাহারা এক ধান খাগড়াকে (গাছ) সিধা থাকিতে দেখিল!

ইহা এক সুমহৎ অতীব শীর্ণকায় সবুজতা! একটি জাগিয়া আছে!

প্রতিবাদকারীগণও উহা দর্শনে চমৎকৃত হইল! ঐ জিগীরকারীদের দৃষ্টিপাত অনুসরণে, বিবিধ শারীরিক আওয়াজ জড়িত, সাধুবচন, প্রশংসা মান মুগ্ধবোধে যাহা, সমক্ষের দৈব ঘটনাতে যাহা, তাহা ইহাদেরও অনুপ্রাণিত করিল।

অহো আমরা মুক্ত হইলাম!

এখন এই এমন ব্রাহ্মণ্য কথা তাহারা প্রায় শুনিয়াছে, যথার্থ জীবনে যথার্থ চিন্তা তাহারা শুনিয়াছে! সকলে, এমনও যে যাহারা মাটিতে তখনও পড়িয়াছিল—এখন স্তব্ধ! এই দরজার উপরে যে খড়ো চালা—হাত পাচেক লম্বা, হাত দেড় বা দুই আড়ে, মানে এক একদিকে, তাহার উপরে হঠাৎ এখন দেখা গেল, এইমাত্র চাড়া দিয়া উঠিল! চরাচরে যেন কেহ নাই, সমস্ত কিছু নির্ব্বিকার, শুধু এক অতীব গোপন নিঃশ্বাসের আওয়াজ ধ্বনিতেছে এইমাত্র, আর সমক্ষে ঐ বিচিত্র উন্মেষ!

মাগো আমরা ঐ সৌন্দর্য্য কেমনে সহিব! আমরা কি এমন যে তুমি উদ্ভাসিত হইলে! মাগো আমাদের আর খেদ নাই! মাগো তোমাতে আমরা ডুব দি!

ধরিত্রীর এই বৈভবে, এখন এই কয়েকদিন পূর্ব্বে অম্বুবাচীর নিবৃত্তি হইয়াছে—অম্বুবাচীতে দেবী ঋতুমতী হন! তীর্থস্থান কামাখ্যাতে এখন প্লাবিত হয়,—তখন মাদা হইতে চারা আসে—রোপিত হইবে! প্রত্যেকে আপনারে ধন্য বুঝিল! এক হাতের সহিত অন্য হাতের ঘর্ষণ করিল!

দুই পক্ষই যারপরনাই সম্মোহিত চিত্ত বৃত্তিতে আছিল; ইতিপূর্ব্বে আপন সহজাত ক্ষিপ্রতায় অনুধাবন করেই যে ঐ রঙীনরেখা, হলুদ ও নীলে মিশ্রিত যাহা, যাহার তুল্য পবিত্রতা কোন তন্ত্রেই নাই, এই লাট চরাচরে সর্প নয়, রোগ নহে, লাঠিয়াল নহে! অতএব শ্রদ্ধাবান হৃদয়ে আপনার জন্মের সকল পুণ্য দ্বারা ঐ একাধারে স্থূল ও সূক্ষ্মতাকে জড়াইয়া ধরিতে চাহিল; পুনঃ ব্যাকুলভাবে তাহারা কহিল, আমাদের অপরাধ, জানিত অজানিত, মস্তকের চুলের অধিক; মাগো তোমার কোলে যেন জন্মাই! আমরা খুদ কুঁড়ো, আমরা ছোট, আমরা অবোধ, অজস্র পাপ আমাদের, তবু শুদ্ধ বুদ্ধি এই যে তোমারে ভুলি নাই, তোমাতেই যেন বাঁচিয়া থাকি! এখানে তাহাদের শারীরিক শব্দ বর্দ্ধিত হইল!

যে ছেলেটির, একমাত্র সুন্দর নয়ন ছাড়া, সমগ্র শরীর বেপট কুৎসিত, সেই পরিষ্কার শুনিল, আছ শুকিয়ে, শুকিয়ে আছ! ইহা প্রতিধ্বনিবাচক, প্রতিধ্বনি কখনও বিপরীত হয় না; এই বালক ভেড়ী হইতে নিথর নদী অভিমুখে চাহিয়া ভারী মজার বালখিল্যতা করে, যে সে হাঁক দিবে, কতদিন শুকিয়ে আছ! (এইখানে 'শুকিয়ে' শব্দ শুষ্ক—শুকাইয়া হইতেও শুদ্ধ!)

তখনই মহাব্যোম জিজ্ঞাসা করে, শুকিয়ে আছ! ও ও!

বালক এখন বুঝিল ঐ জিজ্ঞাসা উদ্ভট নহে, অলৌকিক নয়! ঐ সেই পাল্টা, প্রশ্নকারিণী (উত্তর!) নিশ্চয়, সুতরাং তাহার মরিয়া আকর্ষণ হয়, যে একবার ফুকারিয়া উঠিতে যাহাতে সে পাল্টা শুনিবে; সেই পাল্টা কেমন ভাবে ঐ রেখাতে উচ্চারণ করে দেখিবে, মহাব্যোম তাহার কাতরতা গ্রাহ্য করিয়াছে! এখন প্রকৃতই এবম্বিধ মতিতে বহুদিবস অন্নহীন বালকের অধর কম্পিত হইল!

ততঃ অবিলম্বেই, উহার দলের সকলেই নিজ বিকৃতি সহ, একবার ঐ বালকের, পরক্ষণেই, ঐ গায়কের যে জন গান গাহে, প্রতি নিরখিল; ধান্য চারা দেখার বিস্ময় তাহাদের প্রহেলিকা করিয়াছে, ধূলা জলকণা যেরূপ সকল রহস্য বিদিত হওয়াতে স্থির, তদ্রূপ ঐ জনমণ্ডলী! এই স্তোভ অবস্থাতে কিছু সময় গিয়াছে; ধান্য চারা ইতিমধ্যে অনেকবার আন্দোলিত হইল!

হঠাৎ তাহাদের দ্বারা আকর্ণন হইল, সেই বড় আকুল জিজ্ঞাসা! এইতে তাহারা, প্রতিতে, চারিদিকে চাহিল, তাহারা বুকে হাত দিল; একদা ধান্য, চকিতেই মহাব্যোমের প্রতি; যে এবং তৎক্ষণাৎ নিজের জড়তা কাটাইয়া উত্তর করিল, না গো মা না, তুমি তাহার তরে চিন্তা করিও না! এহেন বীরত্ব ব্যঞ্জক জবানীতে আমাদের পৃথিবী, এখনও যে সৌরলোক অবধি পুরুষালি হইল! কোথাও এতটুকু ম্যাদাটে দ্যোতনা নাই, সর্ব্বত্রই দৈব সুষ্ঠতা দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে!

যে এবং ঐ চীৎকারকারীগণ সেই রাস্তার অস্বাভাবিকতাতে দৃষ্টি পাতিল; অহো ধান খাগড়া! উদ্‌গারকারিণী তেমনি আছে, তাহার একজনা নিবিষ্ট মনে উকুণ বাছিতে আছে, এবং অদূরে সেই ঘুরন্ত মেয়েছেলেটি; এখন সে নিশ্চয় এক ছড়া বলে, যে ছড়া আবৃত্তি করত কিশোরীরা একে অন্যের মুখোমুখী থাকিয়া হস্তধারণপূর্ব্বক বেগে ঘুরিতে থাকে: 'আনি মানি জানিনা, পরের ছেলে মানি না...' আমানি শব্দের মিল সূত্র হইতে! বেচারীর কত না সাধ ছিল মধ্যবর্ত্তী হইতে, কেননা সে স্মরণ করিতে পারে যে, যে জন শেষে থাকে তাহাকে যম সহজে হরণ করে! তাহার গতি! হয় রাস্তায় শকুনে তাহাকে খায়, নয় নদীতে, অবশ্য জোয়ার যখন বাঁধে আসিয়া লাগে! ভাটাতে তীর বহিয়া কেহ যাইতে সাহস করে না, কেন না অজস্র জলজন্তু!

সেই মেয়েছেলেটি মরিল।

এই মেয়েছেলেটি যাহার দেহ ফুলা, সে আকাশ বাতাস এবং নদীর প্রতি নেত্রপাত করিল, সে বল চাহিতে উহা করে নাই, ঐ সকল কিছু তাহার নিকট কখনও প্রশ্ন হইয়া বা বিশ্বাস হইয়া আসে নাই; ঐ বাক্য দম্ভ, যে 'রক্তগঙ্গা' ইহাকে রোমাঞ্চিত উদ্দীপিত করিল, সে জীর্ণ আঁচলখণ্ড, যাহা বন্ধনে নাই, তাহা কোমরে জড়াইতে পরিকর হইল, আশ্চর্য্য এ সময় আক্রমণ আদি কোন বৃত্তি তাহাতে আসে নাই। সে আপন অন্তরে উচ্চারিল, আমি বিশ্বাসঘাতকতা করিব।

জাল সাক্ষী দিব; সে লাট চরাচরের দিকে নির্ভীকভাবে তাকাইল; কিন্তু কেন যে এই আত্মপ্রসাদ, কেন যে ইত্যাকার মনোবৃত্তি তাহা সে জানিতে চাহিল না। শুধু সপ্রশংসা নয়নে ভেড়ীর নীচে ঐ প্রতিরোধকারী দলের দিকে নেহারিল—উহারা খাসা দেখিতে!

কাহাকে ধমকাইতে ঐ সব মনে রাখিল! কোন সেই সংসারের আয়পয় জন্য পরের কপাল এতাবৎ চুরি করিল! অথচ কখনও আত্মসাৎ করা গল্প সে কোনদিন অন্যকে বলে নাই! কোন স্মৃতির ঘাটতি সে পূর্ণ করিয়াছে! হায় তাহার কর্ম্মক্ষয় হইয়াছে! শুধু একটি শ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, আমার এই সানকিটা নদীতে ফেলিয়া দিও! ইহা দেখিলে পাখীরা চঞ্চু পর্য্যন্ত হারাইবে!

এই মেয়েছেলেটি মরিল; অবশ্য আরও অনেকদিন পরে; সেই রাস্তার পাশে, দলের সকলে বিমূঢ়ভাবে দাঁড়াইয়া উঠিল; স্বভাবত তাহাদের ভাবগতিক দেখিলে ইহা বিশ্লেষিত হইবে যে, তাহারা সকলে কিছু অন্যায় করিতেছিল; তাহারা অপরাধ করিতে আছে, অথবা অন্যতে অপরাধ অন্যায় সন্দেহজনক ছাড়া কিছু দেখে না—অথচ তাহাদের চেহারা এক অমোঘ গোপন সভ্যতার নিদর্শন! ইহারা ঐ মেয়েছেলেটিকে আড়াল করিয়াছে; আয়নাদার চূড়ী যাহার ছিল সে, গ্রন্থি খুলিতে চেষ্টা করে দাঁত দ্বারা, ইহার চক্ষুর্দ্বয় ভাস্কর্য্য সৌন্দর্য্য! উর্ব্বরা দেবী মূর্ত্তিতে যেমন হয়! সে প্রকাশিল, জনমের শোধ যেন গিঁট পড়িয়াছে!

ইহাতে ঐ মেয়েছেলেটি, মুমূর্ষু যে, যাহার গালে টোল পড়ে, সে মৃদু হাসিল। খুব বাঁচিয়াছি! অনেক বাঁচিয়াছি!

যে ঐ মুমূর্ষুর চুল লইয়া প্রলম্বিত করে, উঠায়, উঠাইয়া ছাড়িয়া দেয়, এবং যখনই উহার মুখে পড়ে তখন সযত্নে সরাইয়া দেয়, কখনও বিলি কাটে, সে আপশোষ করিল; আঃ কি চুল, হা কপাল এই কেশরাশি ছাড়িয়া যাস! মায়া হয় না, আঃ কি বা কেশরাশি!

এখন চুল কটা জটপড়া স্বাভাবিক!

কি গিঁট!

প্রতিনিয়ত ঐ গ্রন্থিতে যে বেচারী জল দিয়াছে, গ্রন্থি যাহাতে জম্‌পেশ হয়!

কি গিঁট। যেমন কড়া জান তেমন তাহার গিঁট।

ইহাতে মরন্মুখের গালে বেশী টোল খেলিল।

ছিঁড়িয়া আলাদা কর!

রাম রাম ইহার পরও এই শাস্তির পরও কি উহার আত্মা এখানে লাট অঞ্চলে ঘুরিবে চাহ।

কি বা কেশরাশি।

দুঃসময় আপৎকালে যাহার শরীরে প্রবেশ করিতে পারে নাই—পাঁজড়া সার মেয়েছেলে বেটাছেলের লজ্জা! বেটাছেলেরা ইহারে বড় জীবন্ত চোখে দেখিয়াছে; ইহারা প্রত্যাবর্ত্তনের পদশব্দে আপন কণ্ঠস্বর গোপনে গঠিত করিয়াছে। অতীব নীচ হীন জঘন্য মনে খতাইয়াছে, আমি আর ঐতে শহরের গলিতে ঢুকিয়া পড়িব, অন্যদের এড়াইব। শেষ নিশ্চয় দুজনে—এই দুইজন বাঁচিয়া যাইব। এবং উহারে ত্যাগ করা হয় নাই। কিন্তু অদ্ভুতভাবে সে বলিত, রক্তগঙ্গা বহিবে। কি অদ্ভুত বায়না ধরিত সেইটা লক্ষ্মণের পালা গান কর। গান অর্থ যাত্রা, এখন একেতে আবৃত্তি করিল, তাহার মুখের একপাশে হাত অর্থাৎ কর, কোন যাত্রার পালার পঙক্তিসমূহ। (ইহা মধুসূদন কৃত 'মেঘনাদ বধ' হইতে, পালাকার মধুসূদন হইতে লাইনকে লাইন আত্মসাৎ করে। ইহা লক্ষ্মণ উক্ত)

রঘুজ অজ অঙ্গজ দশরথ রথি
তাহার তনয় দাস, নমে তব পদে
চন্দ্রচূড়; খোল দ্বার প্রবেশি মন্দিরে
পূজিব চণ্ডীরে, নহে দেহ রণ, বিলম্ব না স'য়।

সঙ্গে সঙ্গে তৎক্ষণাৎ, অন্ধকারকে নিছাড় করিয়া আছে যাহারা, তাহাদের মধ্যে এই যাহার দেহ ফুলা একমাত্র সেই মহা বিক্রম জরিত দর্পে আস্ফালিয়া, ভূমিতে চাপড় মারার সহিত, মুখিয়া উঠিল, দেহ রণ...অন্য মেয়েছেলেদেরকে তাহাদেরই ক্ষীণ স্বর অনেক ভুবন দূর লইল, ইহাতে সকলেরই দেহ অভ্যন্তরে উদরে মোচড় নিঙড়াইল। তাহারা বক্র হওয়ত যাহা চাপিতে আছে। নদী-জল প্রতিফলিত আলো সকলের মুখেই বিলি কাটিতে থাকে।

তাহার টোল সত্ত্বেও কি পরম বালখিল্য খুসীতে সেই গল্পে শিশুদের মত হাত নাড়াইত, যে মেয়েছেলেটির হাতে আয়নাদার চূড়ী, কহিল, আহা সে বড় মজার গল্প! এক শিষ্য আর গুরুর গল্প; গুরু শিষ্যের বাড়ী অনেক দিন আসে না, শিষ্য চিঠি করে—চিঠি করে যোগে আধুনিক করিল!—পথ চেয়ে দিন কাটে; এমনি করে দিন যায়; হঠাৎ একদিন, সে কাহার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছে কে জানে, গুরু আসিয়া উপস্থিত; শিষ্যের ভারী আহ্লাদ; ভাল উপাদেয় দ্রব্য সামগ্রী আনে: ঘি বল দুধ বল সব! এক দিবস সে গুরুকে কহে, গুরুদেব আজ কয়েক দিবস হয়, আপনকার সেই ঘন-মাখনা প্রসাদ পাইলাম না ত, সেই ভোগ!

বৎস সেই ঘন-মাখনা আমি বাঁকা বিহারীকে, বৃন্দাবনে দিয়া আসিয়াছি। অর্থ ভক্ত স্বীয় প্রিয় খাদ্য, ইষ্টদেব বা অন্য কোন তীর্থে উৎসর্গ করে, যাবজ্জীবন আর উহা স্পর্শ করিবে না!

হায়, হায়, কিন্তু গুরুদেব আমার যে বড়ই বাসনা আছিল, তেমন ধারা প্রসাদ পাইব!

শিষ্যের জন্য গুরু খুবই ভাবিত হইল; অনেকচিন্তার পর কহিল, অনেক দুগ্ধ, ও গোবিন্দ ভোগ চাউল, বাটা চিনি ও ঈষৎ কর্পূর যোগাড় কর! (লড়াইয়ের, দ্বিতীয় যুদ্ধ, আগে অবধি ময়রার দোকানেতে কাশীর চিনি দেখিতে হলদে লাল দানাদার, আর বাটা চিনি খুবই মিহি ধুলিবৎ ঈষৎ খুব ফিকে লালচে।) গুরু আজ্ঞামত শিষ্য সকল কিছু যোগাড় করিল!

গুরু দুগ্ধ ঘন করিলেন, চাউল সিদ্ধ আলাদা করিলেন দর্শনে শিষ্য মাথায় হাত দিয়া বসিল, পূর্ব্বে গুরু এইরূপে ভোগ রন্ধন করেন নাই; গুরু সব শেষে বাটাচিনি দুগ্ধ ও চাউল (ভাত) মিশাইয়া তাহাতে কর্পূর দিয়া আপন ইষ্ট দেবকে ভোগ দিলেন, নিজে গ্রহণ করিবার পর শিষ্যকে প্রসাদ দিলেন।

শিষ্য উহার স্বাদ গ্রহণে চক্ষু বিস্ফারিত করত কহিল, তবে বুঝি গুরু শুধু আগুনটাই বৃন্দাবনে দিয়া আসিয়াছেন।

ইহা সত্যই খুব কৌতুকপ্রদ; কিন্তু কেহই ক্ষীণতম মৃদু হাস্য ব্যতীত কিছু করিতে পারে না। কিন্তু সে, এইটুকু নিখরচার খুসীতে; তাহার পেট চাপিয়া মাটিতে গড়াইতে আছে। ঐ গল্পকে সে কখনও আমার বলিতে সাধ করে নাই। কেননা সে খুসী হইতে চাহিয়াছিল!

সে মরিল। যাহাকে একদা অদ্ভুতভাবে ইহারা দেখিতে পায়—দূরে কূর্ম্মপৃষ্ঠ জমির উপরে কি যেমন কিছু ছেঁড়া খোঁড়া করিতে আছিল। এত ফাঁকা কোথাও কেহ দেখে না, সারা আকাশ কালো মেঘে ছাইয়া, সকলে দাঁড়াইয়া পড়িল। অল্পবয়সী কহিলেক, জন্তু মনে হয়, মাটি খুঁড় লাস টাস!

দুঃ উহা লোক!

বোধ হয় ভাত সেরে রাখিয়াছে!

মাটির সহিত এখনও বেদম লড়াই চলিতেছে। এখন দেখাইতেছে, অবিকল ধনুষ্টঙ্কারে মতন, দেহটি পুনঃ লাট খাইল! গড়াইতে ছিল, বসনের হুঁস নাই! এই দল অনেক কাছে আসিয়াছে, করুণ আর্ত্ত রব হইতেছে, অবলোকনিল; জমিতে একটি উনুন; ফাঁকা জায়গায় আশ্চর্য্য! কারণ ঐ জমির অনেক পথের পর নীচে মিঠেন জলের ডোবাতুল্য জলাশয়, চারিদিকে পোড়া কাটকুটা, হাঁড়ী হোলার টুকরা। ঐটি মেয়েছেলের এবার নিকটে যখন, তখন, সকলে দেখিল ঐ দেহের গড়াইতে থাকায় খোলামকুচি ভাঙার পট্ পট্ শব্দ! তৎসহ, ওমা মাগো! ক্রন্দন হয়, মেয়েছেলেটির হাত দুইখানি স্বীয় পেটে রাখা ছিল!

মেয়েছেলেটির কখনও জিহ্বা বাহির হয়, উহা ঠোঁটে বুলাইতেছিল, ইস্ জিহ্বা কি লম্বা! এবং পেটে হাত চাপিয়া বিকট আঁ আঁ করিতেছে! সে কখনও চোখ খুলিতেছিল! ইহার আসপাশ, হাঁড়ী হোলার টুকরা! তদ্দর্শনে ইহারা ম্লান হইয়াছিল; ইহারা অনুমান করিল, ঐ জন সবেমাত্র হাভাতে হইয়াছে, কেন না দেহগড়ন বেশ ভাল। প্রশ্ন করিল, তোমার কি হইয়াছে!

সেইজন দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া, দেহ বক্র করিল, ইহাই উত্তর। ইহাদের মুখ সকল সমবেদনাতে দুমড়াইল; কি পরিতাপ! কি করুণ! আঃ পেট বড় শত্রু!

ইহার কেশরাশি আজানুলম্বিত, তাই ইহার বড় মান ছিল, যে এবং আর এক কারণ, পাঁজী মতে আশ্চর্য্য যে, মাদাতে বীজধান ছড়াইবার সেই যোগ্যা, কেননা [সে] ঋতুমতী! ঐ জ্যৈষ্ঠের সকালে অনেক লাঙ্গল তাহাদের বাড়ীর সামনের আঙিনাতে, হালিকরা, [যারা] যাহারা করে চাষা, অতীব সন্তর্পণে আপন লাঙ্গল রাখে যাহাতে নিকোন স্থান খারাপ না হয়; সে ঘরে চালার দিকে বড় চোখ মেলিয়া ঝিল্লিরবের স্তব্ধতা অপেক্ষা করিতে আছে; পাখীদের কল[স্বর] বর্দ্ধিত হইতেছিল; সে বাসি মুখে এলোচুলে এ লাঙ্গলগুলি ছুঁইবে!

আবার অম্বুবাচীর পর তেমন এলোচুলে মাদা হইতে ধান তুলিয়া ভারে লাট দিবে, উলুধ্বনিতে সে হাসিত; এবার ক্ষেতে এলোচুলে প্রথম চারা রোপণিল! হালিকরা স্তুতিবাচক আওয়াজ করিল। জয়ধ্বনি! সেই সেই ক্ষেতে পোকা লাগে নাই, ইঁদুরের উপদ্রব কম! আবার শরৎকাল বহিয়া হেমন্ত আসিল, সে শীলনোড়াকে স্নান করাইয়াছে; শীলের উল্টো পিঠ এক ছবি; সে নারকোল কোরাইল, চাল বাটিল গুড় মিশাইল, পাখী পক্ষী পোকামাকড়, ইঁদুর, শেয়াল, চোর, মৃতদের, শত্রুকে, মেঘকে, লাঙ্গল কাস্তে টোকা বলদ, ইত্যাদিকে মা ধরিত্রীকে ও তিনজন ব্রাহ্মণের নামে সুন্দরভাবে সাজাইয়া দিল। মনিষদের কাস্তেতে, গ্রামের লোক তো বটেই, সেই হাত স্পর্শ করিল! যেহেতু তাহার আজানুলম্বিত কেশরাশি, আশ্চর্য্য পাঁজী ধরিয়া প্রকৃতি তাহাতে আসে! সেই মেয়েছেলেটিই এখনই মরিবে!

যাহারা, পুভর দ্য কালে'ক নামে যে বিখ্যাত আশ্চর্য্য ভাস্কর্য্য তাহারই লোকগুলির ন্যায়, দণ্ডায়মান; অবশ্য এখন দেখা যায় তাহাদের চোখে অন্তত বেশ সমীহ বর্ত্তমান—কোথায় আমরা সরিয়া গিয়াছি; এখনই আমার ইচ্ছা আসিয়াছিল, হ্র্যাঁদা সম্পর্কে আমাদের শ্রদ্ধা ব্যক্ত করি; তাঁহার l'homme qui marche ইহা ভাস্কর্য্য না কম্পন না সঙ্গীত। তাজ্জব আমি সেইখানে আছি, যেখানে ঐ তিন রূপের ফের হইতেছে, আঃ আনন্দ! তৎকৃত হস্তদ্বয়! আমাদের ভাবুক করিয়া থাকে!—যেহেতু ঐ ভদ্রদল আপনাদের সাইকেল হইতে নামিলেন; তাহারা তিলেক পশ্চাতের দিকে তাকাইয়া নিশ্চয় প্রস্তুতিতে ক্রমে অগ্রসরিলেন! ইতঃমধ্যে প্রত্যেকেই, একমাত্র ডাক্তার ব্যতীত আপন মালকোঁচা দেওয়া কোঁচা খুলিয়া হাতে লইলেন, ঐ কোঁচাসহ হাত যা হ্যাণ্ডেলধৃত!

বাবু মহাশয়!

ঐ ভদ্রজনরা এক পা আগাইয়া, সংস্কার বশেই, থামিল যাত্রা নিমেষ জন্য, আবার তখনই ধীর সাইকেলের চাকা ঘোরার শব্দ শ্রুত হইল! যাহা তাহারা টানিতে থাকে!

ইহারা সকল বিনীত হইতে চাহিল; তাহারা জ্ঞাত নহে যে তাহাদের দেহ এমত পর্য্যায়ে সিঁটাইয়াছে যে, যে কোন ভাব ব্যঞ্জনাই তৃণ হইতেও কাতর—অতএব উক্ত প্রয়াস তাহাদের সবিশেষ ঘৃণ্য করিল, তদ্বস্থায় আর্ত্ত কণ্ঠে পুনরপি ব্যগ্রতা নিবেদিল; ডাক্তারবাবু!

কর কি, পশ্চাতে ডাক কেন!

ঘাট মানিতেছি! আমরা আপনার জন্মান্তরে প্রজা, দাস, দয়া করিয়া বলিবেন কি, এই শায়িতা মৃত্যুর খাতক কি না।

ঠিক এখনই অন্য মেয়েছেলেরা, কহিল, ওলো, জাগিয়া আছিস না লো! তদুত্তরে এক সুন্দর কান্তির আলস্য ভাঙ্গার অতীব বাঙলা শব্দ আসিবে! তৎপরিবর্ত্তে, সেই মরণাপন্না মেয়েছেলেটির কোন সাড় নাই, এইরূপ প্রশ্ন তাহারই শেষ ইচ্ছা, দিদি গো পায়ে ঠেলিও না; যখন নূতন ঘর বাঁধিতে যাইব ঠিক তখনী ঐ ঐ ডাক দিস! আমাকে আমার মনে পড়িবে!

অন্যরা আলস্য ভাঙ্গার শব্দর জন্য ঠায় রহিল; ওলো, মিনষেগণ তিনবার তুড়ি দিয়া লাঙ্গল থুইল! জাগিয়া আছিস না লো!

এখানে রমণীয় আলস্য ভাঙ্গার কথা!

ওলো...জাগিয়া আছিস না লো!

লাঙ্গল ফলা পশ্চিমে উত্তর আছে তবে যাই (উত্তর হওয়া উচিত)।

ওলো...জাগিয়া আছিস না লো!

ইহার সঙ্গেই বেটাছেলেরা অনুনয় করিল ডাক্তারবাবু ডিক্রী জারি হইতে আর কত দেরী বা জারি হইয়াই গেল!

সেই কথা কি আমার বলার, তবু তিনি সাইকেল অন্যের হাতে দিয়া আসিলেন, কাছে আসিতেই ঠোঁট কম্পিত হইল, বালকরা যেমন করে তেমন শীতকাতর শব্দ করেন, গাড়ীর আওয়াজ! কি ঠাণ্ডা!

ওলো...জাগিয়া আছিস না লো!

সেই মেয়েছেলেটি মরিবে। আঃ চণ্ডালিনী!

যে যাহার হাতে আয়নাদার চূড়ী তাহার, গলদেশস্থ মাদুলী আকৃষ্ট করিল, কহিল, নিশ্চয় তোমার ফাঁড়া সকল ইহাতে যাইবে!

না এমনি,

আমায় ঠকাইতেছ, দাও না রাতটা আমি ঘুমাইব নিশ্চিন্তে।

ইহা দিবার নহে।

যে মেয়েছেলেটির দেহ ফুলা সেই জিজ্ঞাসিল, কেন? ইহাতে সে যাহার চূড়ী আয়নার, আয়নার দিকে চাহিল; এখন রাত্র, চারিদিকে আঁধার স্পষ্ট হইল, ঘুটিয়ারি শরিফে, পীরের দয়া পুষ্করিণীতে ভাসান তাহার ফুল ইত্যাদির মোড়ক ফিরিয়া আসিল, এবার সে দিক সকলের প্রতি চোখ রাখিয়া বড় আশাতে কহিল, বেনো জল সরিয়া যাইবে!

এইটুকু ব্যক্ত করিতেই তাহার স্বর মোচড়াইল এবং সে একটি শ্বাস ত্যাগ করিল, ইহা ম্লান; ইহা হতাশার নয়! প্রকৃতির সহিত তদীয় একাত্মতা কবে যে ছিন্ন হইয়াছে, তাহা সে জানিত না, বেনো জল সরিয়া যাইবে বা যায় এই বিশ্বাস, এই ভরসা এই সত্য তাহার আঁচলে গিরো দেওয়া ছিল; সেও প্রাকৃতিক এক সম্পর্ক তথা কিছু বৈ অন্য না; হায়, এহেন বীভৎস্য আকালকে সে বেনোজল বুঝিল!

কবে জানিনা তবে সরিবে, শামুক গুগ্‌লির খোলা—খড়পচা দেখা যাইবে; আড়া হইতে ঝাঁটা লইয়া আমি ঝাঁট দিব, কোথা হইতে আমাদের কুকুরটা ল্যাংচাইতে থাকিয়া আসিবে, আমি চাল কাঁড়াইব। এমন সময় শুনিব, খোকা হোক ডাকিতেছে। ইহা তাই। ইত্যাকার ভাবনা কিন্তু সে শুধু রঙ্গ করিয়া বলিল, কোলে আসিবেক তাই।

যে মেয়েছেলেটির দেহ ফুলা, তাহার দেহ রোমহর্ষে ঠিকরাইয়া যাইল! চূড়ী যাহার হাতে সে যোগ দিল, এততেও আমার বুকে দুধের কমতি নাই!

ঈদৃশী বিজ্ঞপ্তিতে, শ্রোতা পাশের ঘাস সহ ছোট গাছে হ্যাঁচকা টান মারিল; যে তদীয় বাসি নিষ্প্রভ চোখগুলি দীপ্ত হইল, যাহার ছটা নিম্নের জলস্তরে খেলিয়া ফিরিল, যে এবং কহিল, দেখাও! তৎসহ

সর্দ্দি টানার শব্দ হয়।

চল এই বেত ঝাড়টির কাছে! ইহাতে বুঝায় যে চূড়ীশোভিতার নারীসুলভ আড়াল প্রয়োজন হয়।

এখন তাহারা দুইজনে, বেতগাছের আড়ালে; চূড়ী যাহার হাতে সে বক্ষঃস্থিত বস্ত্র সরাইতে রুখিল, অন্যজন যাহার দ্রুত শ্বাস পড়ে তৎসহ ক্রমাগত নাক টানিবার শব্দ যে করে, জিজ্ঞাসিল, কৈ?

বাদুড় যাইতেছে, রসো কথায় বলে বাদুড় চোষা, বা দৃষ্টি পড়লেই গিয়াছি।

এবার আপনকার বাম হাত মেলিয়া, ডান হাতে সস্নেহ, চাপে, দুধ বাহির করিল! বেশ খানিকটা, অল্পই, যখন হাতে, তখন সে মহাগর্ব্বে সেইদিকে চাহিয়া আছে, বেত গাছের পাতার হাওয়া তাহার মুখে ঠেকিতে আছে, পরক্ষণেই সরিয়াছে, এখন তাহারে দেখিতে সাতিশয় রহস্যময়; সে একাধারে জটিল ও অভিরাম; অনাগতর খাদ্য লইয়া ইদানীংকার পৈশাচিক দুঃসময় ঠেলিয়া চলিতেছে! তদীয় হস্তকোষে সাদা তরলতা টলিতে আছে! এখন সে একবার আকাশমার্গে নেত্রপাত করিল, দেখিতে, যে নিশাচর কিছু আছে কি না! দুধে কোন প্রতিবিম্ব ঘটে না, লাট চরাচর অশরীরী হইয়া ভাস্বর যে! যে যাহার গালে টোল পড়ে, সে এখন নাক কুঞ্চিত করিল, কেননা কোন শরীর পচার গন্ধ আসিতেছিল, কিন্তু সমক্ষের ঐ হাতে এমন আকর্ষণ ছিল যে সে তখনই ভুলিয়াছে; অথবা সে ভ্রূক্ষেপ করিল না। হঠাৎ সে ঐ প্রসারিত হাত সাংঘাতিক জোরে কামড়াইয়া ধরিল, না প্রথমে সে অবশ্য জিহ্বা প্রলম্বিত করে! এই মেয়েছেলেটি হস্তটি মুক্ত করিয়া ছুটিল! দেখিল স্খলিত পদে অন্যজন সেই যাহার দেহফুলা সে, আসিতেছে।

ওগো জাগিয়া আছিস না লো!

ডাক্তারবাবু বেচারী কহিলেন আঃ থামো তোমরা, আমার পা ঠাণ্ডায় জমিয়া গিয়াছে, আমাকে উঠাও! তাহারা ইঁহাকে উঠিয়া দাঁড়াইতে সাহায্য করিল। তিনি পা [illegible]পাইতে থাকিয়া অগ্রসর হয়েন। তিনি ভয়ঙ্কর করাত মুখো শীত লইয়া দলেতে ফিরিয়া আসিলেন, সকলেই পা দাবাইতে লাগিল, হাঁচিতে লাগিল, সাইকেলের হ্যাণ্ডেল ছ্যাঁকা দিতেছিল, তিনজোড়ের হ্যাণ্ডেলে গ্রীপ নাই; তাহারা স্পষ্ট দেখিল, মুখ ও নাসা দিয়া ধোঁয়ার ফোঁসানি বাহির হয়।

গোষ্ঠীর সকলেই ভয়ে শুকাইতেছিল।

এত দেখছি ডবল নিমোনিয়া হবে! কি ঠাণ্ডা! হাঁচিলেন।

পাখাটা কি করি।

কি সর্দ্দি! সকলেই নাসিকা ঝাড়িতে উৎক্ষিপ্ত আছে! কি ঠাণ্ডা, মধ্যরাতের কলার বাস্না!

হ্যাণ্ডেলও কি ঠাণ্ডা!

যাহা থাকে কপালে, কাপড় দ্বারা হ্যাণ্ডেল যুত করত...চলুন। আর থাকিলে বুকে সর্দ্দি জমিবে।

আমার পায়ে এখন খিল ধরিয়া আছে!

ইহারা কহিল, বাবু মহাশয় আপনকার দিককারি আমাদের বড় কষ্ট হয়! ডিক্রি জারি করুন। শীতাঘাত কণ্ঠে ডাক্তার ঝাঁঝিয়া উঠিলেন, এরূপ মেজাজ উত্ত্যক্ত হইয়া না; আড়ষ্টতা কাটাইতেই যাহা, এই বক্তব্যে, মরণ, এখন বুঝিতে পারিতেছ না, শালা লাট মৌজা কালিয়ে আছে, দেখছ না, শীতে আমরা মুষ্টি খুলিতে পারিতেছি না, সর্দ্দি ও হাঁচিতে তাহারে আরও রাগান্বিত মনে হয়, বাবা হিমবাহ।

এই অভিযোগে, ঐ দীনেরা অবাকে একে অন্যরে অনুভব করিতে প্রয়াসিল! মেয়েছেলেরা কাঁদন গাহে, ওলো তোর কি এতটুকু, এক রত্তি হায়া নাই, এই বেঘাটে মরিতেছিস।

আঃ সন্দেহ হইতেছে, কি করিয়া বুঝিবে, তোমরাই ত হিমবাহ, তোমরা লাট মহলের ঠাণ্ডার ডিপো! যাহারে ভূতে পায় সে কেমনে বুঝিবে! পুনঃ কম্পিত হইলেন, সহযাত্রীরা এতক্ষণ ডাক্তারের কথার সহিত আওয়াজ মিলাইতে ছিল, এবার তাহারা তোতলাইয়া ঘোষিল, ভগবানে মেরেছে!

ওই গোষ্ঠীর লোকেদের দোষ নাই, ইহারা অসহায়; কঠিন না হইয়া উপায় ছিল না, অথচ মায়াদয়া তাহাদের সবই আছে।

আঃ সেই ব্যাঙ সেই ব্যাঙ! বাবু বাবু কোন ভাবনা করিবেন না, (ইহা বাবুরা আন্দাজিতে পারেন নাই, যে ঐ সেই ব্যাঙ যাহা ভগবান রামচন্দ্রকে ব্যথিত করে! তৎপর হইলাম বাবু আমরা) ইহারা বেশ ক্ষিপ্র

হইয়া উঠিল, ইহারা নিশ্চয় ইংরাজী শব্দ (!) বলিতে জিহ্বা ঘুরাইল এবং বৃদ্ধকে কহিল, জোর দাও ইহাতে বৃদ্ধ উচ্চ পর্দ্দায় গীত করিতে লাগে।

এবং মেয়েছেলেদের সহিত এখন কর্ত্তব্য অভিমানী পুরুষেরাও ছড়া কাটিল, ওলো জাগিয়া আছিস না লো।

এবং সামনের সুউচ্চ বাঁধ—ভেড়ী ঠাওর করিল! যে এবং কেমনে উহারে লইবে, উহারে ঐ সুউচ্চ ভেড়ীতে, ইহা—তাগদের কাজ! ঐ মৃতার ভার তাহারা কেমনে লইবে, তাহারা নিষ্ঠুর কিছু মতলব আঁটিল—যেহেতু এযাবৎ সততায় তাহাদের কায়িক বল কমিয়াছে—অনেকবার ফন্দি শ্রবণে, তাহারা যুগপৎ ছিছি করিল;

কিন্তু ছাপোষা গৃহস্থ ভদ্রমণ্ডলী এ পর্য্যন্ত শীতে কাবু হইয়া আছে, ঐ তাহাদিগের কম্পনের শব্দ! এখন উহাদের নিমিত্ত কোন উপায় ফাঁদিতেই হইবে; এবং তাহারা মৃতাকে লইতে পরামর্শতে বিবিধ অঙ্গভঙ্গী করিল; যেমন দেবদেবীতে সনাতন রূপ, ইহা তাহাদের মনরচা, শেষে গড়াইয়া লওয়াই যুক্তি করিল, অবশ্য তাহাদের করিতেই হইত। শেষ ইচ্ছা যেহেতু মৃতার। যে এবং গড়াইয়া লইতে কালে, জীবিতেরা, রোদন সুরে কিছু নিশ্চয় বলিতে আছে, তৎসহ আহা আহা আহা করিয়া উঠে।

কচু পাতা দাও না, মুখে ধুলা লাগে।

আহা গো; আহা হাতটা যে, সাবধান! এই বিভীষিকারা এক বীভৎসকে ঠেলিতে আছে।

সেই মেয়েছেলেটি মরিয়াছে, যাহার হাতের নোয়া পুরুষের অটুট পরমায়ু, পুরুষকে জীবিত রাখিয়াছে!

দরজাস্থ হাভাতেরা ঐ দৃশ্যে, ঐ উন্মাদিনীদের লক্ষিয়া, কিয়ৎ আত্মস্থ হইল; তাহাদের শারীরিক উত্তটত্ব সত্ত্বেও তাহাদের মধ্যে ভেল্কীবশত দৈবাৎ আর এক বৃত্তি বর্ত্তাইল; তাহারা বিকৃত অবয়ব বক্র করত আনতিল, স্বল্পকাল এইমত থাকিয়া, ক্রমে শীষটান গুঞ্জনের কালে, স্তবময় কণ্ঠে উচ্চারিল, হুজুর, বাবু মহাশয়, জানিবেন আমরা বিপরীত বুদ্ধির খাতক, এই পরম বিশ্বাস আমরা ভুলিয়াছি!

যেহেতু লাঙ্গল জীর্ণ কাষ্ঠে আমরা রন্ধন করিয়াছি, জোয়াল দ্বারা আমরা চালা ঠেকা দিয়াছি, ভাঙা পোয়ান চক্র পদ দ্বারা মাড়াইয়াছি, কাস্তে দ্বারা আগা খুঁচাইয়াছি, কাস্তের দ্বারা প্রজ্জ্বলিত কলিকা বা কোনরূপ আগুন, খুঁচাইতে নাই, এমনও সে কাজে গরম হইলে তখন জলে দেওয়া নিষিদ্ধ—উহাতে পান নষ্ট হয়।

আমরা মরিলাম; এ সন্ন্যাসীদের কাছে শুনিলাম, এই দেহ, এই জনম মহা পুণ্যের, কোটি জনমের শেষে আমরা, হায়—আমরা নিশ্চয় ঝিনুকে মাতৃদুগ্ধ পান করিয়াছি, কারণ বিবিধ। আমরা তাই রোদে দাঁড়াইয়া বহু পাপ করিলাম; যে রৌদ্রে ধান শুষ্ক হয়, হায় লাঙ্গল ভাঙিলেও লাঙ্গল, কাস্তে ভোঁতা হইলেও যে কাস্তে, জানিবেন আমাদের বুদ্ধির খেই ঐ কাস্তেই ছিল; আপনি এ গল্প নিশ্চয় জানেন, যে গরম হওয়া কাস্তে জলে ডুবাইলে শীতল হয়, তৎপ্রবর্ত্তিত জ্বরগ্রস্তা মাকে জলে ডুবাইয়াছে! কাস্তের ধর্ম্মই লাঙ্গলের ধর্ম্মই আমাদের! ইহা বিস্মৃত হইলাম।

বাবু মহাশয় ইচ্ছা করে আপনাদের কোলে মুখ লুকাইয়া এ জনমের শোধ কান্দিয়া লই, হায় আমাদের কারণে ঐ সতীগণ পাগলিনী হইল! এমতবচনে বিলাপের পর তাহারা হাহাকার করিতে লাগিল! ততঃ কহিল, কুক্কুরের লাঙ্গুল সোজা হয় না, আমরা সবংশে নিধন হইলাম, আমরা মনুষ্যপদবাচ্য আর নহি, পঞ্চায়েত করিবার সামর্থ্য নাই, আমরা ইহকালে পরকালে পতিত!

যদিও আগত ব্যক্তিরা উহাদের আবার সেই বিকটরূপ নেহারিল; তবু উহাদের ঐ স্বীকারোক্তি করণে, ক্ষণস্থায়ী সুস্নাত চেহারা তাহাদের মধ্যে মায়াবিস্তার করিয়াছিল, যাহাতে তাহারা বিমোহিত আছে; তদ্দারা চালিত হইয়া, মস্তক আন্দোলিয়া সান্ত্বনা দিতে বলিল, জানিও এমন মাস নাই যাহাতে মঙ্গলবার নাই, ভগবানের ইহা অভিপ্রেত নয়।—মঙ্গলবার নাই একটি বাঙলা হেঁয়ালি বলা ভাল, সপ্তাহ না বলিয়া মাস বলা হয়!

ভগবান!

এই মঙ্গলজনক নাম কি পর্য্যন্ত অসভ্যভাবে যে বিঘোষিত হইল, যে বিধর্ম্মীতেও এমন করে না,

ইহাতে ইহারা লজ্জাতে মাথা হেঁট করিল, অতঃপর এহেন ঘোর কাটাইয়া মৃদুমন্দ মাথা আন্দোলিয়া শুধু মনুষ্যোচিত, শান্ত কণ্ঠে নিবেদিল, ছিছি! তোমরা আপনার জড় আপনি কাটিতেছ, সামাল্ নিড়ানি। ইহা কথিত মাত্রই তাহারা এক প্রকার অসহায় বোধ করিল; নিশ্চয়ই যাহার কারণ হইল, যে তাহারা নিজেদের জবানীতে নিজেরাই আটকা পড়িল; তাই এখন বুঝা যায় যে, ঐ বিক্ষুব্ধদের শান্ত করণে, যাহা ব্যস্ত করে, তাহাতে দোমনা ভাব আছিল; এবং তখন নিজেরা অচঞ্চল তবুও তাহাদিগের ভ্রূদ্বয় কুঞ্চিত ছিল! আপনাদিগের বাক্য এখনও ধ্বনিত আছে; তাহা সবাকার দ্বারা সুস্পষ্ট ভাবে আকর্ণন হইল, এবং ঈদৃশী মনঃসংযোগেই বুঝিল, তাহাদের পেটও ডাকিতে আছে।

এবম্বিধ বাস্তবতা জ্ঞাত হইতেই ভয়ঙ্কর কোন ডর তাহাদের আচ্ছন্ন করিল, কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া হলপ করিয়াছে; সত্য বৈ মিথ্যা বলিব না, ধর্ম্মপুস্তকে হাত ঠেকান ছিল। এখন, ইহাতে আমাদের সকল পিতৃপুরুষ নরকে যাইবে!

তোমরা মিথ্যাবাদী চিটিনবাজ!

এই বিছুটি অভিযোগ, এই নীচ সনাক্তিকরণ হঠাৎ করিতে কেন যে উহাদের মতি হইল, তাহা পলকের জন্যই তাহাদের বোধে আসে নাই; এবারে মনে পড়িল; আঃ বেফাঁস তাহারা বলিয়া ফেলিয়াছে; আমাদের দেখ, অদ্য চার দিবস...ইহা উচ্চারিতেই থমকিল, চার দিবস না কতকাল!

হায় তাহারা সময় বোধ হারাইয়াছে, কাল পরশ্ব আর হিসাবে নাই, তবুও বিশেষ দর্পে পুনঃ ঘোষিল, চার কেন বেশী হইবে, তবু দেখ আমরা কথা বলিতে পারি, বৃদ্ধ বলিয়াছিল, এক কুকুরের কথা শুন, দেখ পশু ত বটে তবু দেখ, আমাদের নাই ত উহারও নাই, কুকুরটি স্বভাব তাজ্জব, ইহা নিশ্চয়ই শেষ জনম! আসছে জন্মে আমাদের মত হইবে! অম্বুবাচী ছিল, আশ্চর্য্য তখনই ঝিম্মির বৃষ্টি আধছটাক পড়িল—ইহা পুষ্পবৃষ্টি! বহু খাদ্য তবু বহু লাস তবু, সেই কুকুর মুখ দেয় নাই, কেননা যাহাদের ধড় এখানে সেখানে তাহা সব তদীয় প্রভুর মত দেখিতে! কুকুর ভুখা ছিল!

আমরা ধৈর্য্য ধরিব; কততেই না আমাদের থেকেও অধিক কষ্টে আছে, ইহা স্মরিলে কষ্ট লাঘব হয়! কততেই বিপথে চালিত হয়! এই সময়, প্রতিবাদকারীদের বিশ্বাস হয় দরজাস্থরা গাল পাড়িতেছে, যাহা শুনিতেও তাহারা বানচাল হইল না, তাহারা জিদ করিয়াছে মানুষের মর্য্যাদাকে কোনক্রমেই মার খাইতে দিবে না; যে এবং হার স্বীকার করিতে না চাহিয়া মহা অভিমানে, উপদেশিল, তোমরা মানুষের বদনাম হইতে বিরত হও, ভগবানে বিশ্বাস রাখ!

বলিহারি ঘুরেফিরে ভাই! এবং নিজেরাই কোমর দুলাইল।

শালা আমার, হাটুরে পাদরী! টোমরা হামার কটহায় মোটি করহ (মতি কর)।

পান বিড়িপ বিড়িঃ পান!

জানিও এই পৃথীবি রাণী মার্কা টাকা! (রাণী ভিক্টোরিয়া ১৮৭৮ ভারত সম্রাজ্ঞী হন, রাণীমার্কা টাকা নিখাদ রূপার।) ভগবান!

চাগ্ গরম!

রাণী মার্কা টাকার মত নিখাদ নিরেট উজর তিনি!

নে যাও নে যাও শ্বশুরে ডাঁহের (ডিহি?) মাল, নে যাও সম্বন্ধীর ক্ষেতের মাল।

জানিও ঐ টাকায় সব ওজনের ঘর, ভগবান যেমনি নিপট।

একেতে ইহা গাহিয়াছে, হরি তুমি পটল গাছ,

তোমার পটলেও গুণ;

তোমার শেকড়েতে গুণ!

প্রতি কথার পিঠে, তীব্র টিট্টিকারে তাহাদিগের ভাবাবেগ ভাঁটাইল! এইখানে আগতদল সাতিশয় পরিশ্রান্ত হইল এবং এখন অন্তঃকরণে পুড়িতে থাকিল; যুগপৎ ইহাদিগের চোয়াল কেঠো হইয়াছে, নিজেদের কোনভাবেই চাপিতে পারিতেছিল না; আপনাদিগকে সামাল দিতে দাঁতে দাঁত দিয়াছে, তত্রাচ কাটিল, বেজন্মার দল! যে এবং তৎক্ষণাৎ হামলার জন্য সকলে প্রস্তুত।

যাহা শ্রবণে হাভাতেগণ নির্ব্বাপিত চক্ষু কেবল বড় করিল; কোন প্রতিরোধ নাই! ইহাতে উহারা আরও ক্ষিপ্ত হইয়া কহিল, ইচ্ছা যায় দেখি চিমটি কাটিলে তোমাদের লাগে কি না! যে এবং ইহাদের

মধ্যে কে একজনা ধা করিয়া অগ্রসর হওয়ত অপর পক্ষের কাহাকেও ঘুঁষি মারিল! লাগিয়াছে কি না লাগিয়াছে অমনই, মজার এই যে, দরজাস্থ সকলেই ক্রন্দনে দিক সকল চৌচিরিল।

সাধারণত ক্রন্দিতকে বেজায় হাস্যোদ্দীপক লাগিয়া থাকে; কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে মানুষের শোক বোধে কখনই তাহা তেমন প্রতীয়মান হইয়া থাকে না; দরজাস্থদিগের উচ্চৈঃস্বরে কান্না আর একপদের, রকমের; প্রথম ধ্বসা ঘৃণ্য বিকৃত হয় অবয়বগুলি, উপরন্তু, কুৎসিত আওয়াজ, এবং তাহা ভেদ করত যারপরনাই অস্থিস্পর্শী করুণ কান্না—অলৌকিক যে তাহা ঠিক নবজাত শিশুর কান্না অথচ বয়সীর শোক জ্বরিত যাহা—লোক চরাচরকে মথিত করিতেছিল। তাহারা ডুকরাইয়া উঠে, তাহারা ফুঁপাইয়া থাকে! তাহারা অঢের খেদে নিশ্চয় বলিতেছিল, আমাদিগের কি এমনভাবে মারিতে হয়। দেখ আমাদের কেউ নাই! আমরা যমের অরুচি! আমাদের মা আঁতুড়ে নুন দেয় নাই কেন! হায়, লাথি ঝাঁটাই আমাদের ভাগ্য!

নিজেদের বল প্রমাণিত হইবার সঙ্গেই তাহারা ধ্রুবই যে ঐ ক্রন্দন ধ্বনিতে আতান্তরে পড়িল, তাহারা দুর্গতদের প্রতি চাহিল, নৌকা লাট খাওয়া ইহা না ঈশান কোণের মেঘ ইহা না যখন ঠাণ্ডা বাত্যায় কামিনদের খোঁপার চুল খসিত হয়, বৃহৎ গাছ উখড়াইয়া পড়াতে শিকড়ের জটিলতা ইহা না, এবং তখন বহু সন্ধ্যার নির্ভর শান্তভাব—আলেখ যে ইহাতে, ছবিতে, পোকা লাগে নাই! ঠাওর করা বৃত্তি নির্দ্ধারণেতে উৎসন্ন হইল. কোন সুরাহা নাই! কাঁদে যাহারা তাহারা ইতিমধ্যে বেশ খানিক ধষ্টাইয়াছে; এই সেই পৌনঃপুনিকতা চন্দ্রালোকে যাহারা বিকৃত হইয়াছে!

দরজাস্থরা আরও তীব্র করিয়া কান্দে, তাহারা যেমন শিশু হইতে কৈশোরের মধ্যে আছে, ইহাতে তাহারা প্রতিদিনকার কথা বলে, ব্যথা বেদনা শব্দগুলি নোংরা, ইহার কোন ফাঁক বহিয়া বয়স নির্ব্বিশেষের রকমারি মচ্‌কান পর্দ্দা শ্রুত হয়, (তবুও বলিতে বাধা নাই আমাদের জীবনের তীব্র অভিমান সকল হারজিতের জ্বালা ইহাদের যন্ত্রণাকে আরও নিঙাড় দিয়াছে! এই জন্যই যে সভ্যতা বলিলাম তাহা নয়!) ইহাদের পেট খাল নাই(!) বিড়ম্বনা! অথচ খাল, সেখানে, বাসওয়ালৎ-এ খোদিত চণ্ডিকা মূর্ত্তি উদরে যে এক ক্রূর কর্ম্মা বৃশ্চিক যেমন মিউজিমএ আছে, সেইটিতে আছে।

আঃ ব্রাহ্মণী তুমি সত্য তুমি সনাতন! যে তুমি শহর গঞ্জর পথ পরিত্যাগ করত সাগর অভিমুখে চলিয়াছ, দেবতাগণ দুন্দুভি বাজাইতেছেন, সূর্য্য তোমার রাস্তাকে চমৎকার করিতেছে, মেঘ তোমার ক্লান্তির অপনোদনের জন্য ছায়া বিস্তার করিতেছে, মধ্যে মধ্যে ঝিঝ্রিরে বারিপাতে, পুষ্পবৃষ্টিতে, দিক সমূহকে নয়নাভিরাম করিয়াছে, আর কয়েক প্রহরের মধ্যে সাগর সঙ্গমে তুমি প্রাণ বিসর্জ্জন করিবে! বহু পুণ্যের বলে তুমি স্মিত হাস্যে প্রকাশিলে।

আঃ বুঝিলাম ঠাকুর আমার হাত ধরিয়া আছেন; এবার অম্বুবাচী তাড়াতাড়ি পড়িয়াছে, বিধবার মান রাখিলেন, বাঁচিলাম! চারদিন নিরম্বু উপবাস, একান্ত না পারি বোন এই গঙ্গাজলের কেঁড়ে, টাক্‌না দিব; ঠাকুরকে ডাক বোন, সে পাপও না করিতে হয়! পুকুরের জল খাইতে লোভ না হয়! মঙ্গলময় আমায় এই চারদিনের মধ্যে, অম্বুবাচীর নিবৃত্তির মধ্যে, সঙ্গমে লইবেন; নৌকা বজরাও তিনি জুটাইবেন, বৃহৎ কাষ্ঠে দোষ নাই—আমি উঠিব! নৌকার লোক পুণ্য লোভে আমাকে সাদরে, ভক্তিতে, গ্রহণ করিবে। আঃ পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি আমায় মাঙ্গিবার অভিরুচি দিবে না, গিলিবার কথা শ্লেষোক্তি! উঠিবে না, আমার জন্যই ঠাকুর এবার তাড়াতাড়ি অম্বুবাচী ফেলিলেন, বোন পেট আর পেটের ছেলে পেটের বাড় মানুষের শত্রু নাই! আমি বাঁচিলাম! আমি জলে ঝাঁপ দিব।

বৃদ্ধা, ইহা ব্রাহ্মণীর কথা, বলিতে মরিতেও বড় জোর পাইয়াছিল।

ক্রন্দিতদের মধ্যে, দরজাস্থ যাহারা, এখন দেখা যায় কেহ কব্জি দ্বারা চোখ কচলাইতে আছে, দমকা দিয়া তবু কান্না আছে, কয়েদী যেমন বা, এই দমকা ধাক্কার প্রায় কুৎসিত দর্শনের সর্দ্দি পড়ে মাগো কি নরক! এইবার তাহারা জানাইল, হুজুর পাপ নিশ্চয়, অজান্তে করিলেও আমি, আমরা, করিয়াছি।

বিবেক দংশন! তবুও আগতরা কেহ থুতনিতে, কেহ দাঁতে তর্জ্জনী রাখে, এই অভিব্যক্তি উচ্চবর্ণের, অন্যায় করার বোধ তাহাদিগকে নির্ঘাৎ খোঁচাইতেছিল, এতদ্বস্থা, যাহা উজাইয়া যাওয়া অন্তত তাহাদের পক্ষে দুষ্কর ইহা বুঝিল; তবু উপায় বিচারে তাহারা হয় অস্থির, তবে ঈষৎ। অবশ্যই বুঝিতে দিতে চাহে

না যে তাহারা খারাপ কাজ করিয়াছে। এখন, সংস্কার নিয়মেই তাহারা গোঁয়ার রহিল; অথচ তাহারা মাথা তুলিতে পারিতে ছিল না।

এই ক্রন্দন যেন তাহারা পরকালেও শুনিবে। আপনাদিগের অভ্যন্তরে নারী কণ্ঠে কেহ বলিল, আহা গো, হ্যাদে দেখসে ছেলের পেট কোথায় পড়িয়াছে, দুপুরের রোদ পৌঁছায় না গো, তা কাঁদিবে না; রোদ পৌঁছায় না মানে এতই গভীর। এবম্বিধ আঙুল দেখানতে, সমবেদনা আছে এমত বাক্যে, তাহাদিগের চোখের পাতা পড়িতেই ভ্রূকুঞ্চিত হইল; ঐ করুণ আর্ত্তনাদ কি উহাদের, হাড়সার বক্ষ! হৃদয় নাই ফুসফুস নাই; এ ক্রন্দন পার্থিব হইয়াও বেজায় আলেয়া।

দুইটি স্বরে একই বিচ্ছেদের খেদ ধ্বনিতে ছিল অর্থাৎ সেই সম্পর্ক, সহজ তত্ত্ব। বৃদ্ধর গীত গোঙাইয়াছে এ সময়। কত বিবিধ ইতরোমির মধ্যে বসিয়া এই লেখা লিখিতেছি তাহা ভগবানই জানেন না। ইহারা ক্রন্দনমনস্কতা কিঞ্চিৎ কাটাইতে চোখে পড়িল, সেই ট্যাঁক খসা কাগজের মোড়ক যাহা খুলিয়া সেই শ্বেত গুঁড়া পদার্থ। তৎক্ষণাৎ প্রত্যেকের চোখ হাঁইয়া উঠিল।

ঐ ত অপরাধ! নিমেষে হাতে হাত কষিয়া লইতে কালে, হাঃ শব্দ করিয়া উঠিল, এবার মোড়লের কায়দাতে অথচ যাত্রাই মোচড়ে আরম্ভিল, ছি ছি কান্দিতেছে, ক্রন্দনে তোমাদের স্বত্ব নাই, দেখ দেখ কোথায় নামিয়াছে, ধিক তোমরা না ব্যক্ত করিলে, আমরা জানিতামও না, ধিক!

ইহা কি কুইনিন!

এখনও জ্বর হয় সেই দেহ সেই লোক এইরূপ চীৎকার করে।

একজন কৌতূহল বশে বা অন্য বৃত্তিতে, যখন সে মাটিতে তখন সে নিশ্চয় খানিকটা আঙুলে লইয়া গ্রহণ করে, সে ঘোষিল কুইনিন নহে।

উহা কুইনিন নহে। যে এবং ক্রন্দিত রবে হা হা করত জ্ঞাত করিল, মহাশয় বাবু গো উহা সোটা। (সোডি বাইকারব) সোটা।

আঁগ্ সোটা! বলিয়া ইহারা নিজেদের দুই হস্তকে ছিটকাইয়া উঠিতে দিল, পরক্ষণেই অবমাননাতে প্রতিতে ডান হাতের বাহু ভাঙ্গিয়া অর্থাৎ করটি বাম কাঁধে রাখিয়া মুখ ন্যস্ত করে, দেহ স্বল্প বক্র, বাম হস্ত ও পদ পশ্চাতে বিস্তার কৃত, এইভাবে, থাকে।

দরজাস্থরা আপনাদিগের পা ভূঁয়ে দাবাইয়া হা হুতাশিল, আমরা কোথায় নামিলাম, নরকেও স্থান নাই গো, যাহাতে উহা, ফেন, হজম হয় নাই, ফেনের জন্য অম্বলে মরি! এসকল কথা যদি রাবেলে শুনিতেন মানুষকে লইয়া কখনই তামাসা করিতেন না। কাহারও সম্পর্কে কিছুই বলিবার নাই।

ইস্ একথা কাহারেই বা বলিব, এই অপদস্থ কথার লেখা জোখা নাই, তথাপি মন মানিতে চাহে না, তুমুল আস্ফালনে তাহারা উরুতে চাপড় মারিল, তৎসহ মোরগ স্বরে চীৎকারিল, সোডা! সোডা!

হায়। কতদিন ধরিয়া ইহারা ফেন খায়।

ইত্যাকার বিস্মিত তাহারা তখনও হয় নাই যখন এই একাধারে প্রবঞ্চনা ও ত্রাসের যাহা। তাহা প্রতিবাদকারীরা দেখিল। নিম্নে কাহারা অস্থি সংগ্রহ করিতেছে, তাহারা আকাশে সার্চলাইট সম্পাতকে সম্বোধিল, এখানে ফেল্, পড় না শালা। কেহ হাড় ধুইতেছে। এদিকে বস্তা হইতে নরকঙ্কাল ও অন্যান্য হাড় সমূহ পড়িতেছে। এ কোন অশরীরী ম্যাকওবার বিভীষিকা! হায় আমরা কি এই পৃথিবীতে আছি, যেখানে জন্মমৃত্যু আছে, যেখানে কচি ও পক্ব এক মহিমার বহমানতা!

আর মেয়েছেলে উক্ত যাহা শব্দটির খেই, আমানি, তাহা কেনই বা আমরা হাতে পাইতে আছি না, নিশ্চয়ই আমরা নাই! ইহার পর কি সমস্ত রাস্তা ফেনে ভরিয়াছে!

সেই মধ্য রাত্রের হিম বাতাস আমাদের গাত্রে লাগিতেছে, আমরা চোখ মেলিয়াছিলাম, উপরে অগণন নক্ষত্র দর্শনে আমরা স্বস্তি লভিলাম; পাতা সকল আন্দোলিত হইতেছে অনুভবিয়া ভাল লাগিল; কিন্তু ইতঃমধ্যে আমরা বেশ স্পষ্ট দন্ত ঘর্ষণের শব্দর মত শুনিলাম, নিশ্চয় আমাদের কাহারও কৃমি আউরাইতেছে, পুনঃ চক্ষু বুজাইতে যাইব, পুনরপি ঐ শব্দ ঘটিল, না ইহা ত, ঐ শব্দ, কৃমিকৃত নহে, ইহা যে খুট খুট শব্দ!

ইহাতে আমাদের গা কেমন করিয়া উঠিল, আঃ ইহা অবাকের, এখনও আমরা আতঙ্কিত হই। আমরা

উঠিয়া চোখ কচলাইয়া চারিদিকে চাহিলাম, আঃ তাজ্জব দূরে একটি গো যান! মনে হইল, অনেক বস্তা! আমরা আকৃষ্ট হওয়ত স্তম্ভিত, কে একজন তখনও ঘুমে আচ্ছন্ন, তাহার নাক ডাকিতেছে, আমরা তৎ শ্রবণে কহিলাম যে, এমন নাক ডাকিতেছে যে কিছুই দেখা যায় না। আমরা মন সংযোগ করিলাম, কখন যে আমরা সেই গাড়ীর দিকে আগাইতে আছি, তাহা বুঝি নাই, এইটি ত গো গাড়ী নহে, ইহা ঠেলা গাড়ী। বস্তু কিছু বোঝাই আছে; কিন্তু কেমন এক জাতীয় গন্ধ, চাল ধান ত নহে!

আমি বলিতেছি চাল আছে।

কিন্তু লোক কোথায়, নিশ্চয় নৌকা আনিতে গিয়াছে।

দেখি না কি আছে। ঠেলায়!

না।

অন্যায়! এই অভুক্তদের মধ্যে কিছুতে চীৎকারিয়াছে।

অনেক শুধু প্রকাশিল, আমরা অনেক দিবস খাই নাই।

শেষোক্ত শব্দগুলিতে কান্নার ভাঙা আর্ত্তনাদ মিশ্রিতছিল, এখানে নৈতিকতা উৎপীড়ন হইল, সংযম পিত্তকে উদ্রেকিল, তাহারা ঠেলার যে ধার উঁচু হইয়াছিল, সেইরা ঐদিকটা বিক্ষোভে রাগে টানিয়া ছাড়িতেই এক বিকট শব্দ করত ঠেলা স্থির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খড় খড় শব্দ হইল, এবং ইহারা স্থান ত্যাগের জন্য যেক্ষণে পিছন ফিরিয়াছে দেখিল, দূরে নীচে কাহারা সাদা রঙের কিছু কুড়াইতেছে, এবং ঠিক এই সময় পশ্চাৎ কি যেন পড়ার শব্দ হইল। বিবিধ হাড় ও মনুষ্য কঙ্কাল! নরকপাল গড়াইতেছে।

খাও হা হা খাও!

এই সময় নীচে হইতে চোর চোর ধ্বনি উঠিল। তাহারা পালাইতে গিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। ঐ যাহারা কিছু কুড়াইতেছিল, তাহারা হাড় কুড়ায়, তাহারা ছুটিয়া আসিল। আমরা সকলে আপন সততা লইয়া খাড়া আছি, এবং আপন যে, যাহার বর্ত্তন মেলিয়া উপুড় করিয়া দেখাইলাম।

এ কি! সেই ব্যক্তির গলা আমাদের কানে আসিয়া পৌঁছাইল; যে সেই ডাকাতকে সনাক্ত করার ব্যাপারে শুনিয়াছিল। হাড়সার লোকেরা আসিয়া দারগার আজ্ঞায় অঙ্গুলি নির্দ্দেশে কহিল, আমরা অভুক্ত তবু সত্য বৈ মিথ্যা বলিব না, এই সেই ভয়ঙ্কর ডাকাত, যদিও আকালে এই কে চেনা দুষ্কর। চিনিতে পারি যেহেতু এই ব্যক্তি বলে আমাকে রোগা করিও না। সে কহিল, তাই বলিয়া সোডা!

এখনই এই সোডা কথাটি তাহারা অসংখ্যবার উচ্চারণ করিল, তখন তাহারা সেই বৈচিত্র্যে গ্রস্তা মেয়েছেলেদের প্রতি মহা আশাতে পর্য্যবেক্ষণিল, কিন্তু কোথাও তাহারা নাই, তাহারা স্থাবর না জঙ্গম, এক আলকাতরা আঁকা জীব!

ঘোর আপত্তিতে ইহা মন্তব্যিল, তোমরা কি! এবং নাসিকা কুঞ্চিত করে, কারণ টের পায় যে, ঐ দরজাস্থদের গাত্র হইতে ভাগাড়ের গন্ধ আসে অথচ যুগপৎ উহাদের কারণেই অভিনব মন কেমন জুয়াইল।

ইস্! যে যাহার গণ্ডদেশ চাপড়াইতে লাগে, এ কেমন আকাল! আমরা কি ঝড়ের মধ্যে, ধূলাতে আকাশ লাল, পাখীরা আমাদের কাঁধে টাল সামলিছে, বিবিধ উড়ন্ত পালকে দৃষ্টি পথ আচ্ছন্ন। ঠাকুর একি নির্ম্মম অট্টহাস্য। ইহারা ত কেহ প্রবাসী, নাবালক, বিধবা, মৃত, অন্যের বা ব্রাহ্মণস্য জমি অপহরণ করা ত দূরে থাক্, গল্প শুনে নাই—কি এমন কর্ম্মের এই শাস্তি! এ কি নিরিখ!

কোন ক্রমে এহেন সরলতা, মোহ আবেগ, উজাইয়া দৃঢ়তায় আখরিল, ধিক, অবশ্য তোমরা ধিক্কারের বাহিরে! ছিছি তোমরা কি রায়ত। প্রজাস্বত্ব ভোগ করিতে! তোমরা কি খনার বচনে চলিয়া থাক! হাল চষিলে কাস্তে ধরিলে অথচ সহজ কাণ্ডজ্ঞান কোথায় বিসর্জ্জন দিলে হে; জনম কেন তোমাদের সহিত শত্রুতা করিল জান, আমাদের সঙ্গেও বটে করিল কেন; উত্তর, বেইমানী! যে আকাশকে মেঘের জন্য হত্যা দিয়াছি, গৌরী কন্যা মাটির তলায় পঞ্চপ্রদীপ পুঁতিয়াছে,—উদ্দেশ্য বৃষ্টি! মেঘ আসুক বৃষ্টি হউক, আকাশকে স্মরণ করি। অথচ এখন আকাশকে বিদ্রূপ করিতে আছ।

শনি, কাল, তোমাদের সৎ স্মৃতিসকল হরণ করিয়াছে। যেমন এক রাজার পরিধানের বস্ত্রখণ্ড হরণ করে, তোমরা চিরতরে নীচগামী হইলে, সত্যই কি তোমাদের অম্বল হয়! হায় তোমরা খাইতে পাইলেও

সেই সৎ বংশজাত, মনুষ্য বংশজাত, বলিতে তোমাদের জিহ্বা আটকাইবে। এখন যদি পারিত বলিত, মনে কর দেখি, তোমাদিগের ঠাকুর বাবার কথা, কি ভীম দুঃসাহসী, কি আত্মবিশ্বাস বেপরোয়া তোয়াক্কাহীন।

আঃ বন হাসিল হইবে! পূর্ব্বে নদী, পশ্চিমে খাল, দক্ষিণে জলা, উত্তরে গোল-পাতা আর সিঁদুরী। ঘাটে বজরা, গহনার নৌকা, একানে ছোঁড়া যাহারা খামটা নাচিবে, হারমোনিয়াম বাঁয়া বেহালা বাজিতেছে। অজস্র খাদ্য, সিদ্ধি গাঁজা কুইনিন, দশ জন মোচওয়ালা শিকারী, দোনলা টোটা বন্দুক, গাদা বন্দুক; বিবিধ অস্ত্র। এখন ঢাক কাঁসর বাজিয়া উঠিল, শঙ্খ বাজিল, ঘাটে রমণীগণ উলুধ্বনি দিল, ব্রাহ্মণ পাঁজী পাঠে কাছি তুলিতে আজ্ঞা দিলেন, বদর, বদর! অফুরন্ত লাজ বর্ষণ হইল। একানে ছোঁড়ারা নাচিল। রায়মঙ্গলের ধারে 'ফরেষ্ট' অফিস তাহা পার হইয়া বনে প্রবেশিল।

কি দুর্গম বন! দিনেও মশাল জ্বলিল! ঢাক ঢোল কাঁসর, গুলির শব্দে, বাজীতে বন প্রকম্পিত! তোমাদের ঠাকুর বাবারা জানে, কত লোক ঐ বেত গাছ ও বিবিধ লতাগুল্মের মধ্যে পথ হারাইল, ঐ বন সত্যযুগের! পরে বিশল্যকরণীর বীজ ঐ বনে যখন পড়ে তখন বনদেবী আরও গভীর করিলেন, প্রাকৃতজন না টের পায়, কোথাও তিনি জলকে আহ্বান করিলেন, সুন্দরী বৃক্ষদের অভয় দিলেন, তাহাদের শিকড় উর্দ্ধমুখী হইল, মেরু প্রদেশ হইতে ব্যাঘ্রকে আহ্বান করিলেন, এই ব্যাঘ্র সকল বিশাল, এরূপ আছে: কয়েকজন ফিরিঙ্গী এমন ব্যাঘ্রকে ধরিয়া নিকটস্থ নোঙ্গরকৃত জাহাজে লইল, কাপ্তেনকে খবর দেয়, আমরা এক বিরাট বিড়াল ধরিয়াছি, কাপ্তেন ঐটি দর্শনে ডুক্‌রিয়া উঠিলেন, ইহা বাঘ! ইহা শ্রবণেই যাহারা ধরিয়া আনে তাহারা সরিয়া গেল। বনদেবী কোথাও ধূম্র সঞ্চার করিলেন, কোথাও জলে চন্দ্রালোকনিভ আলেয়া প্রচ্ছন্ন রাখিলেন, কচিৎ কেহ অন্ধকারে সেই জলপথে যায়, তাহা আতঙ্কিত হইবে, যেহেতু দাঁড় আঘাতে উহা ঠিক্‌রাইয়া উঠিবে।

যদিস্যাৎ কোন ব্যক্তি এই বিচিত্র বন মধ্যে প্রবেশের স্বপ্ন দেখে, তাই রাত্রে দিক প্রকম্পিতকারী কামান দাগার শব্দ হইবে, মহারাণীর লস্কর কত খবর করিল কিসের ঐ শব্দ! কোন জানান্ নাই—এই শব্দ বঙ্গ সরকারের ইংরাজ আমলে, এক মনোগ্রাফ আছে, বরিশাল গান (Barisal Gun)।

ভাটি প্রদেশের এই বন বড় তমসাময়ী, বহু কুঠার এখানে খোয়া গিয়াছে, যদিস্যাৎ কোন ব্যক্তি গুরুবল ইহাতে প্রবেশ করে, তবে মায়াধর অলৌকিক রামধনুতে বিমোহিত হইবে, যাহা দ্বারা এই বনের আটঘাট বাঁধা, সমতটের! এই বনের সৌন্দর্য্যের কথা দূর দূরান্তরের পক্ষীরা জানে, তাহাদের মধ্যে বয়োবৃদ্ধরা কাল উপনীত জানিয়া, ঐ রামধনু যাহা বনের মায়ায় অহোরাত্র থাকিয়া যায়, ঐ প্রভায়ে প্রাণ বিসর্জ্জিতে আইসেন।

এখানে বহু কুঠার খোয়া গিয়াছে; ঐ সকল পরিত্যক্ত কুঠারে ব্যাঘ্রগণ আপন নখ, হরিণ আপন শৃঙ্গ, উহাতে, ঘর্ষণ করে, ঐ খোয়া যাওয়া কুঠার যাহাদের, সেই সব, নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির উদ্দেশ্যে সঙ্গীগণ, তদীয় দাঁড় তীরে পুঁতিয়া তাহাতে এক পালি চাল পুঁটলিতে বাঁধিয়া ও শলা—চকমকি পাথর দ্বারা গঠিত—রাখিয়া উহারা নৌকা ছাড়িয়া দেয়! বদর বদর পাঁচ পীরের নাম লইয়া কহিত! সেই সুবিশাল জটিল বন যাহারা হাসিল করিল, লবণ, দাকাটা তামাক যাহারা লইয়া নয়কে হয় করে, তাহাদের সন্তান, তোমরা কি তাহাদের সন্তান!

জানিও পাঁজড়াসার হইলেও সন্তানের মৃত্যু নাই!

এই আখ্যান শুনিতে তাহারা, দরজাস্থরা, বেটেপ্ কিল কিলা শব্দ করিল; ইহা ঘটিয়াছিল, মহা দারুণ লাঠিয়াল গল্প ইহা! প্রথম ফসলের ধান বীজ কতবার হইয়াছে, প্রথম ফসলের খড় তাহাদের চালের কোথাও না কোথাও ছাওয়ান আছে! ঐ বিজয় কথা হইতে আত্মপ্রসাদ লাভ, ও সেই লাভ হইতে আত্মবিশ্বাসে উজ্জীবিত হওয়ার মত এ শরীরে আর পদার্থ নাই! পোরের ভাত হজমের ক্ষমতা নাই, তবুও এখন সেই সাবেক মর্য্যাদাতে এই পেশ করা যায়, জগতবাসী আমরা, এই বিকৃত দেহীরা সেই দেহীগণের, ভয়ঙ্কর বনরাজির অহঙ্কার যে সকলে বিচূর্ণ করিল, তাহাদের সন্তান। হায় শাপগ্রস্ত।

ইহারা আলস্য ভঙ্গিতে ভুলিয়াছে, এবং বিবিধ প্রকার পটুত্ব আর স্মরণ করিতে পারিল না, যাহারা বিশ্বাসে ঐ গল্পের মর্ম্ম হইতে এই পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টিপাত করণের জোর পায়—এখনও শুধু লবণের স্বাদ ইহারা ঘুমাইয়া থাকিয়াও জানে। কাল ইহাদের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছেন, কিন্তু একটি প্রতিভা লন

নাই, আত্মবিলাপ প্রতিভা!

অবশ্য যখন আমরা সমুদ্র আলোড়ন হইতে চক্ষু ফিরাইয়াছি, সেই চরিত্র আদর্শ করি নাই, এবং যখন আমরা আকাশের প্রতি চাহিয়াছি, তখনই যাহা বুঝা যায়, ইহা অধুনা মতান্তরে, তাহা আত্মবিদ্বেষ!

ইহারা, কালহতজনেরা নিবেদিল, আমরা মৃত, আমরা প্রত্যাগমনের পথ বিস্মৃত হইয়াছি, আমরা উদর ও চোখে আটকা পড়িয়াছি! শুদ্ধ ঝিল্লিরে বৃষ্টি আমাদের উপর আর হইবার নহে; আপনারা যে কহিলেন, একদা ত্রিভুবন আমাদের নিকট শিখিল, ধানকাটা মেঠোপথ আর সম্বৎসরের পথ, এই দুই পথ মনকে যেন বিচালিত না করে, আর আমরাই তাহা ভুলিলাম, বংশ মর্য্যাদা তুচ্ছ করিলাম, আমরা শহুরে ফেরেপবাজ!

আমরা কবে যে এই ঘর হইতে, এইদেহ, বাহির হইয়াছি; কবে যে নিশির ডাক আমাদের বাহির করিয়া লইয়াছে কে জানে, বাবু মহাশয় আমাদের কি আপনারা দেখিয়াছেন আমরা কোন পথে গিয়াছি! একথা বলিতে গড়ান সর্দ্দিতেও, সর্দ্দি নাকে বুদ্বুদ কাটে, তাহারা সুমহৎ।

কি পরম অদ্ভুতভাবে এই বিকট বীভৎস দেহের সহিত, ফেন দাও; মিলিয়াছে।

এহেন নৈরাশ্যের, আকুল, অশ্রুপূর্ণ বচন যাহারা কিছুদিন উপবাসী তাহাদের মহা কামড় দিল, তাহাদিগে আঁচড়াইল, তাহারা অত্রাহি হইল। হায় এক অট্টহাস্য সূচিত হইল, কীম্ভূত পরমাদ সঙ্ঘটিত হইল; তখনই ইহারাও আতুরিয়া উঠিল, একটু ফেন দাও মাগো।

হায় একি!

ইহাদিগের এই কাতরান স্বরের পক্ষে, অর্থ কোন মানসিকতা হইতে, ইহা কি প্রমাণ হয় যে উহাদের সুর উল্লেখিয়াছে মাত্র অথবা অন্য হেতুতে, কোন কিছু গুছাইয়া বলিবার নাই; যেহেতু ইহারা প্রথমে দারুভূত, প্রথমে ইহাদের কণ্ঠ শুষ্ক হইল, শরীরে বিদ্যুৎ দিয়া উঠিল, প্রবল মোচড় দিল, কাটা ছাগলের ধড় হইয়া নড়িতেছে, রক্তে ক্ষেত প্লাবিত, কোথাও খড় ভাসে, কোথাও ধান, বুনোদের, আদিবাসী সহিত তাহারাও নাচিতেছে।

ইহা ফসল কাটা উৎসব—তাহাদের উল্লসিত দেহে সকল সেই খণ্ডিত মুণ্ড, চমকিতে থাকা ধড়কে অনুকরণিছে; এ সময় তাহারা ছাগের বিবিধ ডাক নকল করে,—কালো করিয়া মেঘ দেখিলে, ছাগের কাতরোক্তি হইতে আরও রকমারি।

এ সময় ছাগের বিবিধ প্রকৃতি লইয়া অশ্লীলতা করিয়া রক্তধারাকে তাহারা বিদ্রূপিতেছিল; ঠিক সেই পরবের হুবহু অঙ্গভঙ্গী সকল, ঐ উক্তি 'ফেন দাও' নিজেদের বলার পরক্ষণেই, ইহাদিগের গা বাহিয়া ঐ শব্দ উঠিতে আছিল, তাহাদের বাম চক্ষু স্পন্দিত হইল, যে আপৎকাল তাহাদের হাড়ে সাঁদ করিয়াছে, ঐ সেই প্রবল প্রতাপান্বিতের কাহারও বা কোম্পানীর-কেহ বলা যাইত, কিন্তু পাঠক ভাবিতেন আমরা সংবাদ লিখিতেছি—সমন! বাঁশগাড়ি হইতে! যা বাকি।

আঃ আমরা উৎখাত হইলাম!

উচ্ছেদ হওয়া প্রজা প্রথমে মাটি আঁকড়িতে চাহে, যে নির্ব্বোধ কুটা ধরে তাহা হইতেও কোটি গুণ ভাঙা কপালে এই জন, বেচারী অনেক সত্য পাগলামি, অজস্র মিথ্যা ছলাকলা দেখাইবে, কোন ফল হইবে না, তাহারে মাটি হইতে টানিয়া তোলা হইবে, সে এখন ধূলা সকল ঝাড়িতে লাগিল। এখন ফাঁকা মাঠে হাহা স্বরে সে কাঁদিয়া উঠিল।

আগতরা যাহারা অদ্য কয়েক দিবস উপবাসী তাহারা উচ্ছেদ হওয়া প্রজার ন্যায় গাত্রে ধূলা না লাগিলেও যেন সর্ব্বত্রে লাগিয়া আছে এই মায়াতে আছে।

হায় উহাদের শাসন করিতে আসিয়া আমাদিগের এ কি দশা হইল, আমরা এ কি মুখে আনিলাম, আমরা পুস্তক ছুঁইয়া হলপ করিয়াছি মিথ্যা বলিব না—ইত্যাকার বাক্যের মন, ইহাদিগের রোগা গাত্র অভ্যন্তরে আঁচড়াইতেছিল; এমন প্রবচন যদি থাকিত, অনাহারীর মনই হাড় মাস আঁচড়ায়, তবে ইহাদের সম্যক বুঝিতাম।

কেননা প্রতি নিয়তই তাহারা আপনাকে, নিজেরেই, খিমচায়; তাহারা এই সময়ে, একে অন্যর প্রতি নিরখিতে ঢোক গিলিতে আছে; অন্যকে বর্ত্তমান দৃষ্টে তিতিয়া উঠিতেছে। এখানে মন বলিতে বিবেক। বুঝায়, মন যে বিবেকের সমার্থবোধক তাহা আমরা ভুলিয়াছি, হায় অবশেষে তাহারাও আপনকার

অসাক্ষাৎ চলিয়া গিয়াছে, এবং ঈদৃশ বৈকল্যের মধ্যেই সমক্ষের এক আটনে, এক এক পুঁটি মাছ আটকা পড়িয়াছে পর্য্যবেক্ষণিয়া প্রতিতে, হাঁ দিয়া উঠিল, যে আমরা এখনও মরি নাই, আমরা অসৎ হই নাই, আমরা মমকে আঁখি ঠারিব না!

আইস বেজন্মাকে আমরা আক্রমণ করি যে আমাদের বেড়ার ধারে দাঁড়াইয়া এই গল্প শোনায়: এক শাশুড়ী তদীয় বধূসহ নদীরঘাটে যায়, বধূর হাতে ছোট ঘট ছিল, সে ঘট জলে ডুবাইল, অসাবধানতা বশত ঘটখানি হস্তচ্যুত হইয়া ডুবিয়া গেল। বুদ্ধিমতী বধূ জল মধ্য হইতে হাত না তুলিয়া শ্বাশুড়ীকে জিজ্ঞাসা করে, মা কোথাও যদি কিছু থাকে তবে কি তাহাকে হারান বলেন (বৈদান্তিক তর্ক) শ্বাশুড়ী কহিলেন, কখনওই নহে! এতৎ শ্রবণে সে আশ্বস্ত হইয়া জানাইল, আপনাদের ঘট নদী গর্ভে আছে (ভদ্র সমাজে ইহা গুরু শিষ্যের কথা আমরা অন্যত্র বলিয়াছি)। যে পাষণ্ড এই অমঙ্গল কথা, ক্লীবের চাতুর্য্যের, অনন্ত জাগতিকভাবে, সুকুমার মতি বালক বা রমণীগণকে বলিবে তাহার নরক হইবে; আইস আমরা মোড়লকে বলি, এই সব কি বদনামের গল্প সাগর হইতে আসিতেছে! আমরা ইহাদের সিধা দিব না, তামুক দিব না (সিধা উচ্চপদস্থদের দেয় খাদ্য সামগ্রী)।

তাহারা এখনও নিঙড়াইতে আছিল, তাহারা কাঁদিতে হাঁইয়া ছিল, অবাক যে তাহাদের দেহ অনৈসর্গিক পাথুরে গুরুভারে জগদ্দল হইয়াছে, ইহা এ পর্য্যন্ত দীর্ঘশ্বাসে পরিণত হইল না; এখন ক্রমে বৃদ্ধির বর্ত্তমানতা ভাস্বর হইল, এই বিরাট নির্জ্জনতার মধ্যে তদীয় নাভিঃশ্বাস উঠিতে আছে, ইঃ মানুষ কত না কীট! সে ডুকরাইল, আঃ ব্রাহ্মণী! পেটের বড় শত্রু নাই, ভাবের ঘরে চুরি করিও না!

বৃদ্ধা এই আকালেও কি আমরা ডাইনে বামে জ্ঞান করিব!

তোমার মন তুঁষ! তুঁষপূর্ণ।

বৃদ্ধা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। অচিরাৎ বেটাছেলে ও মেয়েছেলেরা নির্ব্বিশেষে একে অন্যের অবয়বে সিঁদাইতে ঝটাপটি করে, সমস্বরে কাটিল, আমরা ভীত আমরা ভীত!

এই কাতরান ক্রমে প্রশ্ন হইয়া তাহাদিগের বক্ষে তর্জ্জিছে, বাঘা মরদ জোরে বারম্বার ঘোষিল, আমরা ভীত। আমরা কি ফেরে পড়িব!

ইহাতে এই সুবিশাল নিথরতা ইহাদিগের স্থির হইল। কর্ণ কুহরে জমিয়া উঠা সেই বিজনতাকে ঝিল্লিরব আড়াল করিয়াছে। তাহারা, অসহায়েরা, ঐ জড় সূর্য্যকে শুধু মাত্র, স্বীয় প্রকৃতি বশম্বদই বাধা দান করিয়া রহিল; মন বুদ্ধি অহঙ্কার ইহাদিগের নিম্নে জলের আলোড়নে যেখানে ঢেউ কাটিতেছে তীরে, যেখানে অজস্র কুটো উঠানামা করে সেইখানেই তাড়াইতে ছিল; আবার বলা যায়, বিশ্লেষিলে, যে নিশ্চিত তাহারা চোরা গোপ্তা এতাদৃশ কিছু ভাব শরীরে, মন পোষ মানাইতে ফিকির আঁটিতেছিল যাহা মাটি খেগো শিশুতেও করিবে না, সত্যই এমত বিকার অবিশ্বাস্য, যে মনে উদয় হইল এখন টিপ চালতে ভাত তাহাও সই।

টোকো ভাত তাহাও সই।

বক্তাদের প্রতি তখন বাদ বাকিরা, প্রথমে আপনাদিগের পদস্থ ধূলা দেখিল, পা দাপাইয়া ঝাড়িল, কঠিন হইয়া বলিল, ছিঃ ছিঃ এত নোলা! কোন সুলক্ষণা গৃহিণীর স্বর এমত বাক্যে শ্রুত হইল।

এখন ঐ কুটোর দোলানিতে তাহাদের নজর স্থির থাকে; ধীরে প্রমত্ত হাওয়াকে বাধাদানে মুখ মণ্ডল নড়িল, যে এবং এক ফাঁকে শোক সন্তপ্ত চিত্তে অনুচ্চ কণ্ঠে মানিল, পুরাতন চাউল বাড়ন্ত হইল।

পুরাতন চাউল, ঐ মানুষটি আমাদিগের মনোরমত্ব সংজ্ঞা হউক! আমরা লোকহাস্য করিব না! আমরা পৈতার গৌরব, নিজ গাত্রে থুতু দিব না। আমাদের জল চল! আমাদিগের ব্রাহ্মণের পদস্পর্শে প্রণাম করিবার হক্ আছে, আমরা উগ্রক্ষত্রিয়।

ইহা বলিতেই ঝাঁ করিয়া ইহাদের মনেতে অর্শাইল, পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ তহশীলদারের টিট্‌কিার, হা হা, যত ব্যাটা টামারিণ্ড টাইগার টি এইচ ই দি (তেঁতুলে বাগদী) তোমাগণের পৈতা! হা হা শালারা, শালা কুড়াইয়া খাওয়া হইতে বঞ্চিত হইলি!

তৎক্ষণাৎ তাহারা এখন, ঐ তহশীলদার চক্ষের বাইরে যাইতেই, আপন মুখগুলিকে কঠিন করিয়াছে, বাঁকাইয়াছে, এবং হ্যাঁচকা টানে বৃক্ষের পত্র ছিঁড়িল; এবং ঘোষণা করিল, আমাদের মেয়েছেলেরা গললগ্নীকৃতবাস হইতে শিখিয়াছে, আবরু মানে।

এবম্বিধ বাক্য উচ্চারণের সঙ্গেই তাহারা বিন্দুবৎ, যে এবং স্থির; কোন সে হেতুতে ইহা, তাহা তাহারা কিছুতেই খেয়াল করিতে পারিবেক না: তাহারা এই বিপর্য্যয়ে, ভাবিতে পারার তরিখা তাহারা ভুলিয়াছে, অনাহারে এখন কিছু মনে করিতে ভাবিতে যাইলে পেট নিঙড়াইয়া মোচড়া দিবে, কহিবে, শালা সেই গিন্নী, গৃহিণী মাছটির ঘাই! শালীর নথটা পেটময় খোঁচাইতে আছে, নথ একটি বৃত্ত যাহা স্বর্ণ বা অন্য ধাতু দ্বারা গঠিত; ইহা স্ত্রীলোকেরা নাসাপুটে ধারণ করে: মূর্ত্তি নির্দ্ধারণে আছে যে, নথ রিপু বৃত্তির রাশ টানিয়া থাকে!

কেহ যোগ দিবে, উহারে ধর মোর বাপ!

ঐ বাক্যপদ এই লাট মহালের এক মহা নিষ্ঠাবান মুসলমান পত্তনিদারের, ইনি ছ'সন্ধ্যা নেমাজ করিতেন। নেমাজ নিমিত্ত ইঁহারে পুণ্যাহ দিবসে—এই দিবসে জমিদার তাঁহার অধীনে সকলকে, পত্তনিদারকেও, ভিন্ন দেশীয় মনিস ও মাঝিকে পর্য্যন্ত! মান্য আলিঙ্গনাদি করেন। জমিদারের বাড়ীর রমণীগণ কি সুন্দর! বাবুর রৌপ্য আলবোলা, পাল্কী এবং ভেলভেটের তাকিয়া দর্শনে, ইহারা ইহকালে সুখী হয়—জমিদার গতবার বৈশাখ মাসে এক অতি উৎকৃষ্ট ইতালীয় জাজিম, নামাজ পড়িবার তরে, ও একটি বর্ম্মি লুঙ্গী সম্মানী দেন!

ঐ ভদ্রলোক যাঁহার বাড়ীতে ক্লক ঘড়ি আছে, সিল্ক ব্যবহার করিতেন না, গুণাহ হয়, সম্রাট আউরঙ্গজীবও করিতেন না, কেননা পলুগুলি উৎসর্গীকৃত নহে।

ইনি বৎসরের যে কোন সময়ে খানখা শরিফ যাইতেন, যাহা মেদনীপুর সদরে অবস্থিত: ইহা মহা পবিত্র স্থান! পুণ্যার্থীরা ইহাকে অযুত ভক্তিতে শ্রদ্ধায় দেখিয়া থাকেন! এই ভদ্রলোকের এক পুষ্করিণী ছিল, তাহাতে রুই মৎস্য আছে। ইহাতে এক হিন্দু গোমস্তাকে ছিপ ফেলিবার অনুমতি দিলেন।

ঐ গোমস্তা যতবারই মাছ ধরে ততবারই ঐ ভদ্রলোক বলেন, উহারে ছাড় মোর বাপ, উহার নথ দেখ, উহা গিন্নী, উহারে ছাড় মোর বাপ, উহা বড় নহে!

ইহাতে ঐ গোমস্তা কুপিত হইল, ছিপ ফেলিল যখনই ফাৎনা ডুবিল, তখনই বলিয়া উঠে, এই হারামজাদাকে আর ছাড়িব না! তৎশ্রবণে ভদ্রলোক কহিলেন, উহারে ধর মোর বাপ্! হারামজাদা মানে শূকরের শাবক, শূকর অপবিত্র!

ঐ ধমক ও এই রসিকতাতে সমবেতেরা সাবধান হইল; তাহারা এখন আপন আড়া ছাড়াইয়া আছে, ইজ্জত! এইরূপ স্থান সিদ্ধ যে প্রত্যেকের দেহ বেড়িয়া এক বিচিত্র দেহ ঝামরিয়া আছে, অব্যর্থ যে পায়ের নীচেও বিস্তারিয়াছে; অথচ এই দেহ সেই অবধারিত দেহর বর্ত্তমানতা! ইহার যুক্তি কোথায়, যেহেতু এই চাষারা ত সেই বিশ্বাস সম্পন্ন: এমন গালাগাল শত্রু পক্ষের, যে বাবু আমাকে মারিতে তদীয় পাম্পসু ছিঁড়িলেন—অথচ জুতা ছিঁড়ার জন্য আমাকে কিছু ভর্ৎসনা করিলেন না; চাষা নিজে যে ক্ষতিকারক! ইহা পার্থিব বা বৈষয়িক চিন্তা, কোথা হইতে এই অভিমান আসে! অথবা অর্থাৎ বাবু বিষয়ে চাষা সাবধান হইয়াছে! নিশ্চয় তবে সন্ন্যাসী দর্শন!

সাবধানতা হইতে সমীহ। ইহা নৃতত্ত্ব গঠিত ব্যাপার! তাহারা বয়সকে, মোড়লকে মান্য করিয়াছে; ইহারা ইহার সহিত অনৈসর্গিক বিষয় ত আছেই অর্থাৎ যখন সে একা; জন্ম সংস্কারাদি, আধিদৈবিক দুঃখ যক্ষ রক্ষ বিনায়ক গ্রহাদির আবেশহেতু ও ত্রিবিধ দুঃখ সকল রহিয়াছে! এই যুক্তি তাহার পারিপার্শ্বিকতা! আদত যুক্তি আলোচনা! ইহা গৌণ: এই গৌণকে মানিয়া ব্যাখ্যা হইতেছে; এবং পরোক্ষভাবে মুখ্যকে ওতঃপ্রোত করা হইল তথা এমত সিদ্ধান্ত: তৎসহ মীমাংসা করিতেছি! এখানে আরও প্রকাশ্য যে, কেমন ধারা আশ্রয়ে ঐ মন আসিল—যেটি দেহের বাহিরে ও একাধারে ভিতরে, কেন না চোখের সামনে রাখার জন্য আছে—তাহা বিশেষজ্ঞর অভিজ্ঞতা।

এখন আপনাদিগের ইত্যাকার ভ্রষ্টাচার সাতিশয় ধন্ধ মধ্যে প্রতিজনেরে লইয়াছে; তাহাদের অসাড়ে সেই ঝামরান দেহ ধূলিসাৎ হইল; তাহারা মরিয়াছে; এখন সবার হাতেই একটি করিয়া নরকপাল! যাহার দিকে তন্ময় নয়নে, নির্নিমেষে, উহারা প্রত্যক্ষিয়া আছে; ইহার সহিত লতাগুল্মের জ্ঞাতিত্ব নাই। বরং ইহার সহিত একের কি কোনদিন শোণিত সম্পর্ক আছিল; সুতরাং দেহে পক্ষাঘাত ঘটিয়াছে মনে

বৈকল্য পাচার করিয়াছে, তাহারা মৃত পতঙ্গও নহে! তাহাদের কণ্ঠে সর্দ্দি বসিয়াছে, অনুদাত্ত আওয়াজে এখন গলা খাঁকারি দিবার চেষ্টা করিল!

আঃ ঐ সেই কেশবতী মেয়েছেলে, যে আলস্য ভাঙ্গিলে যক্ষ রক্ষ যাবতীয় অশুভ ঝটিতি তিরোহিত হয়, যে আমাদিগের ক্ষেত খামার যে স্পর্শ করিলে মেঘহীন আকাশকেও ভয় নাই; সে আমাদিগের কল্যাণে ত্বরিতে আগমন করুক!

আঃ আমাদের কি ফেন দাও বলিতে হইবে!

আমাদের এই ঢেঁকিত্ব বিপর্য্যয় নাশ করুক, মোহ বিনষ্ট হউক! কেশবতী গো! তুমি আলস্য ভাঙ্গ গা তুল, তোমার নয়নের কাজর মুখে লাগিয়া থাক, রতি সুখ দেহ, তোমার আনন্দময় শরীর লইয়া এস!

আঃ আমরা কি উহা বলিব!

আঃ রমণী, কালক্ষেপ করিও না, বিদ্যুতের আগে, পুরুষের অধঃপতন রুখিতে, নস্যাতিতে তুমি ধাবমানা হও, তোমার আলুলায়িত কেশভার ভূমি স্পর্শ করুক! অয়ি সর্ব্ব বিমোহ বিনাশিনী, ঐ কেশভারে অন্ধকার শরণাপন্ন! তুমি তাহা জগতের নিমিত্ত আপন মস্তকে ধারণ করিয়াছ। দেখিও উহারা যেন ঐ কথা না বলে।

জয় রঘুবীর জয় মাধব!

যশোদা বাৎসল্যবোধে—যশোদার বাৎসল্য সাধকের স্বপ্ন! যশোদা কৃষ্ণকে কখনও ভগবান চিন্তা করেন নাই। এই বুদ্ধি ছিল, আমি না থাকিলে কৃষ্ণর কি হইবে! এই বজ্রাহতরা অদূরস্থিত বিপন্নাদিগরে নেহারিল মাত্রই সঞ্জীবিত হইল! আঃ আনন্দ দায়িনী! আমরা বিপরীত মনোভাবে ঘূর্ণায়মান হইলাম, আমরা প্রমত্ত দহতে আকর্ষিত আছি।

না কিছুই আমায় বিচলিত করিবে না!

ব্রহ্মমুহূর্ত্তে বস্ত্র খণ্ডিত করার আওয়াজ, যাহা সুতীক্ষ্ণ, লোকসমূহের অন্তরীক্ষ যে কত মাত্রায় গভীর তাহা নির্ণয় করিল! যে মেয়েছেলেটির হাতে আয়নাওয়ালা চূড়ী, সেই কাঙালিনী এক অদম্য হাঁকপাঁক ডানা ঝাপটান শুনিল, যে কোন চেষ্টাই সে এমত বোধে যে কাৎ হইল। নিম্নে ঐ কূর্ম্মপৃষ্ঠ উবল হইয়া যে জমি তন্মধ্যে ছোট ডোবা, যাহারে বেড় করিয়া কুশ ঘাস আছে।

এখানেই; এখানে এক হাঁস চরম ভীতিতে, নিশ্চয় আত্মরক্ষা হেতু, এতাদৃশ মরিয়া ব্যবহার করিতেছে; মেয়েছেলেটির পেট ঘিরিয়া কাপড়ের আলগা হইয়া গেল; অবশ্য সাধারণত এমনটি আপনা হইতে হয়, কেমনে যে প্রহরান্তরে ইহা ঘটিয়া থাকে তাহা সে বুঝিতে চেষ্টা করে না; ধ্বসিয়া পড়া অন্যান্যদের উদরের প্রতি সে পর্য্যবেক্ষণিল, ভ্রূদ্বয় কুঞ্চিত করণে স্বভাব তাহাতে আর নাই; তদবস্থ সে ঐ পারিপার্শ্বিকতাতে নজর করে, সে শুকতারা দেখিল; এখনও কোন সাড় আসিল না, সে পূর্ব্বদিকে চাহিল, কোন দ্বিরুক্তি নাই, সে হাই তুলিল; একবারও এমন রেখাপাত হইল না, হাঁস উড়িতেছে না কেন, হাঁস দলভাঙ্গা কেন! হঠাৎ কিছু যেন চক্ষের নিমেষে পালাইল, আঃ শিয়াল! এত মৃত মানুষ থাকিতে হাঁস!

যুগপৎ ঐ মেয়েছেলেটি আতঙ্কে আঃ শব্দ করিল; সে আসীনা ছিল; সে নিজ দেহকে না গ্রামকে, না কোলের শিশুকে, রক্ষা নিমিত্ত এক শুদ্ধ মানুষী ভঙ্গী অথচ করিল। এই ভেড়ী উপরে চারিদিকে মহাশূন্যতা—কত কাল ধরিয়া ফাঁকা—সেখানে সে সর্ব্ব বিচার ত্যজিয়া কাহারে বাঁচাইতে আশ্রয় করিতে মরিয়া হইল, চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক্ আর নাই!

এখানে এইভাবে, যেমন করা হইল, লেখা যায়—যদি লোকগল্প ধারা মানি, চোখ সে সূত্রধরকে দিয়াছে, জানালা করুক; আদতে বাহিরের জগত, কর্ণ সে দিয়াছে ঢাকিদের, তাহারা বাদ্যধ্বনি করুক; নাসিকা স্যাকরাকে যে নথ নির্ম্মাণ করুক; জিহ্বা, লুনিয়াদের আন্দাজ দিক, ত্বক দিয়াছে বৈদ্যকে, জ্বর বুঝাক!

এখন তবে কাহাকে ঐ মেয়েছেলে বাঁচাইতে বা কোন সেইকে বাঁচাইতে মন সূক্ষ্ম করিল।

প্রতিনিয়ত যে নিশ্চিহ্ন হইতে আছে। ঈদৃশী নিষ্ক্রিয়তা মধ্যে অর্থাৎ অবকাশ মধ্যে ঐরূপ ইচ্ছার দৃশ্য, নিষ্ঠুরতা বটে ইহা লেখা, তবু বড় সুন্দর! সৃষ্টি তত্ত্ব কত অসহায়! যাহা অসহায় তাহাই সুন্দর!

মেয়েছেলেটি অদ্ভুত জড়ান চেহারা, সে লতা, সে অবলম্বন করিয়াছে কিছুকে, কি অপূর্ব্ব ভাব

হস্তদ্বয় ঊর্দ্ধে উঠিয়া যাহাতে সাধারণ অভিব্যক্তি ধারণা চোট খাইবে, একে যখন নিজেকে বাঁচাইতে চেষ্টা করে, তাহা ইহা নহে। দেহ প্যাঁচান—অলৌকিক অশেষের সংজ্ঞা—ক্রমাগত উঠিতেছে। অনির্ব্বচনীয়। ইনোসেন্স। প্রকৃত বীরত্ব। এখন একটি হস্ত শিশুর ন্যায় ঐ ডোবার দিকে ইঙ্গিত করে।

ইহা এমন আকাল যেক্ষণে বৃক্ষপত্র পর্য্যন্ত হিংস্র হইয়াছে—ইহারা লবণাক্ত জল পান করিয়াছে, সুতরাং শিয়াল কুলের পার্শ্বস্থিত দন্ত দেখা যায়; এমত পাপক্ষয়ী ভোরে পৃথিবী একই আতঙ্কের; এই আতঙ্ককে কোন সে বৈচিত্র্য দ্বারা সুন্দর বলিয়াছে মরবাসীরা! যদিও মানুষী দেহ সকলেরই খাদ্য। মেয়েছেলেটির উদর কুঁকড়াইয়াছিল যে আমি নিজেই খাদ্য। যে তদীয় আর্ত্তস্বর অতি মাত্রাতে শ্রবণগ্রাহ্য না, কিন্তু তথাপি তাহা নিকটস্থদের ত্বাচ প্রত্যক্ষ হইল।

আর সকলে জাগিল; তারা আছে, নদীর শব্দ শুনিল, নিজেরা বুঝিল, তাহারা আছে; এবং সমক্ষে দেখিল; স্থাপত্য হইতে নৃত্যে এক বিস্ময়কর রেখা অতি সূক্ষ্মভাবে আছে। মানুষ নিঃসন্দেহে ধন্য, যে সে স্থিরকে এই মরণশীল হাড়মাসে নকল করিতে পারে; মানুষ নির্ঘাৎ মূঢ় ঐকে সে বৈপরীত্য জ্ঞান করে। এখন শায়িতরা হরিবোল দেয় নাই, ছোটজাত নিম্নশ্রেণীদের মধ্যেও অনেকের অভ্যাস থাকে।

মৃত্তিকার দিকে অন্যথা আপন বাহুপ্রতি চাহিয়া উঠে নাই যেমন তাহারা ঘুম ছাড়িয়া উঠে, ঐ দর্শনে উঠিলে দিন ভাল যাইবে। মৃত্তিকা তাহারে রক্ষা করে, বাহু তাহার নিদ্রার সাক্ষী। তাহারা প্রবৃত্তি হইতে মহা প্রবৃত্তিতে উঠিল।

অথচ একথা ঠিক যে নিদ্রা উত্থিতদের চেতনা প্রত্যক্ষ কিছুতে হইলেও, জাগিলেও, তাহারা আর দিকে এখন লক্ষ্য করিল; একটি ব্যক্তির মস্তক যে ভেড়ীতে উঠে নাই, যাহার পশ্চাৎ অজস্র উন্মুক্ত প্রান্তর পূর্ণ জল, যাহা কালচে রজত সদৃশ; ঐ লোকের ওষ্ঠের উপরে, আওয়াজ না করার নিষেধ তর্জ্জনী রাখিয়া করা আছে; যে এবং সেই ব্যক্তি যারপরনাই ঘষা অনুচ্চ স্বরে, তর্জ্জনী সরাইয়া, খুব আস্তে বলিতেছিল, অদ্য কয়েক দিবসের পর আমরা ভাগ্যবান; শী[illegible]কর কিন্তু সন্তর্পণে।

এই বাক্য যখন সে প্রকাশিতেছে; তখন সে অতীব বিশ্রী এক চেহারা ধারণ করে, সে কুটিল বর্ণের হইতেছিল, এবার তদীয় মুখমণ্ডল ভেড়ীর উপরস্থ সমতলতা যেখানে তাহার থুতনি ছিল—সেখান হইতে ঈষৎ নীচে নামিয়া গেল। নিশ্চয়ই তাহার গ্রীবা বেসামাল হইয়াছে, সে এই সুউচ্চ ভেড়ীর পার্শ্বে যে কলমকাটা গা, এতক্ষণ তাহাতে খাড়া ছিল।

জাগ্রতরা তদীয় মুখেতে দৃষ্টিপাত ক্ষণেক করিল; ইহাকে দেহী বুঝিতে তাহারা নক্ষত্ররাজির প্রতি নজর করিল; এই ব্যবহার সাধারণ, অন্য উদ্দেশ্য নাই; তবে আমাদের দিক হইতে ইহার অর্থ অজস্র খবর হয়! সমক্ষে শূন্য জলপূর্ণ প্রান্তর পর্য্যবেক্ষণিয়াছে, উহার দ্রুত শ্বাস অনুধাবনে, এখনও সকলে ধূলা ঝাড়িয়া উঠে নাই!

যে ব্যক্তি, পাছে বিলম্ব ঘটে মীমাংসাতে, ভেড়ীর পথে উঠে নাই, সে এখন আপনকার ধড়ের প্রায় উদর পর্য্যন্ত কলম হইতে উঠিয়া, ফিস্ ফিস্ স্বরে ও দুই হাতে কিছু বর্ণনা করে, বিষয় এই যে, কোন কিছু একটি বেশ বড় আকারের তাহা ডানা ঝাপটিতেছে; অতএব তোমরা কালক্ষয় করিও না! ডানা ঝাপটিতে আছে জল ছাড়ে নাই, সত্বর!

আর ক্ষুধা বৃত্তিটি কবে নিশ্চিহ্ন হইয়াছে, তথাহি—কতটা বা পরোক্ষ হইয়াছে তাহাদিগের তাহা খবর নাই; নিশ্চয়ই দুইদিন পূর্ব্বে, চাঁদ মধ্যরাতে উঠে, সেই সকালে পক্ষীর মিথুন দর্শনে তাহারা একে অন্যের দিকে, ঐ খবরের প্রতি নেহারিতে থাকিয়া, তাহারই মধ্যে সেই দৃশ্য দেখিতে আছিল; যে ইহা কি ব্যাপার যাহা বোঝে নাই, সহসা প্রত্যেকের পেট মোচড়াইল; তৎক্ষণাৎ এবং ভেড়ীপথের ধারে অগ্রসরিয়া ইহারা দণ্ডায়মান হওয়ত দুস্তর ফাঁকা নিরখিল; তারস্বরে গগন ফাটাইল, এবং যাহা প্রতিধ্বনিল, আঃ আমরা ক্ষুধার্ত্ত!

তাহারা প্রশ্ন করিল, তুমি কি বলিতেছ!

যে মেয়েছেলেটি ভীত ছিল, সে ঐ ব্যক্তির অভিব্যক্তি বুঝিল, এবং তাহার নিমিত্ত সে উত্তর দিল, নিশ্চয় কিছু খাদ্য!

এতৎ শ্রবণে জনাজাতের মুখে কালো চমকিত হইল! তাহাদের মধ্যে যে অকথিত কম্পন সঞ্চারিত হইল। তাহারা কোন এক আঁৎকানর শব্দ করিল। এই প্রতিক্রিয়া আশ্চর্য্য। যে দেহ তাহাকে ঐ শব্দে

আহ্বান করিতে এই দেহের দেহী হয়।

তাহারা তাহাদের অন্তরীক্ষকে জাগ্রত করিল, যথার্থ এই ক্রিয়া হইতে, সমস্ত স্তব্ধতা ঐশ্বর্য্যশালিনী হইল; এই মহাশূন্যতা তাহাদিগের ক্ষুন্নিবৃত্তি শুষিয়া কখন যে লইয়াছে তাহারা তাহা জানিত না; কেবল ক্লান্তি বোধ আছিল; দ্বিপ্রহরের কাঠফাটা রোদ যাহা পক্ষীকুলের কণ্ঠস্বর নিস্তেজ করে, তাহা সম্পর্কে কিছুই বোধ ছিল না, যে যাহার স্কন্ধে আপন গণ্ডদেশ চকিত নিমিত্ত শাণ দিয়া লইল, এখন প্রস্তুত।

সাবধানতা! এখনও সাবধানতাবশে ক্রমে তাহারা ভেড়ী পথ হইতে নামিল, সকলে মিলিত একটি গতি, একটি তাজ্জব কীট সদৃশ। তবুও নিশ্চিত যে এইখানে রামধনু বেগোড় হইবে না।

এই কীট রামধনুকে প্রভাবিত করণের সূত্রত্ব বহিতেছে; তাহারা ভোর হইতে জাত হইল, তাহারা অদ্ভুতক্রমে চলিতে আছে। যখন ডান দিকে টাল সামলাইবে তখন তারা গো পালক, যখন পিঠের উপর টাল ন্যস্ত করিতেছে, তখন পিতৃত্ব; এই ভাবে অনন্ত কাল যে চলন—তাহার কিয়দংশ, এখন যেহেতু ফরসা হইয়াছে মাত্র, পরিষ্কার মীমাংসা করা যায় যে উহাদের মধ্যে আছে। প্রখর তাপেই যাহা নিশ্চিহ্ন হয়।

গড়ানে ভেড়ীর গা বহিয়া যখন তাহারা নামে, তখন এতটুকু ঝিল্লি রবে কম্‌তি ঘটিল না; ইহা আশ্চর্য্য! এতাবৎ (স্মৃতি), মাঠে পা ঠেকাইতেই ঐ শব্দ থামিত; এখন ঐদৃশী ব্যতিক্রম। তাহারা কি তেমন মানুষ আছে! অবশ্য এই ব্যাপার সকলের দ্বারা প্রত্যক্ষ হয় নাই, তাহাদের কোন হুঁস নাই, তাহারা এমনই গতিতে আছে যাহাতে প্রত্যাবর্ত্তন যেন করিতে আছে।

এই ছোট ডোবা, উন্নত শীর্ষটান ঘাস ইহাকে বেড়িয়া আছে; যাহার পশ্চাতে ঐ আতুরগণ ঘাপ্‌টি মারিয়া রহে, তাহারা হাঁপাইতে ছিল।—এই মুহূর্ত্তে তোমাদের হাত ধরিবারে আমরা মরি; তোমাদিগের করের তালু যাহার কড়া (কার্য্যক্রমে নিম্ন শ্রেণীর লোকেদের হাতের তালুতে কড়া পড়ে,বাঁক যে বহন করে তাহার কাঁধে যে কুঁজ, এমনি বিবিধস্থানে; অনেক উচ্চশ্রেণীর মধ্যে পায়ের আঙ্গুলিতে কড়া পড়ে; সেতার বাদকদের মেজরাফ্ ধারণে হাতের তর্জ্জনীতে কড়া, এমনি বিবিধ) এখন কিছুটা তত কঠিন নহে, তাহা, সেই তালু স্পর্শিতে আমরা ইচ্ছুক।

তাহারা সকলে, কিছু নির্ণয়ে যত্নবান, তাই মাথা এদিক সেদিক করে; হঠাৎ সকলে খাড়া হইয়া উঠিল, বাহু প্রসারিয়া, একে অন্যরে ঘোষিল, তোমরা কি চোখের মাথা খাইয়াছ! এখন নির্দ্দেশিত অঙ্গুলি, মাগো কি সাংঘাতিক তীক্ষ্ণ ক্রমে সড়কি ঝটিতি, এটি, অঙ্গুলিটা, বঁড়শীর আকারে আসিল; প্রতি কণ্ঠে জিগির, শব্দার্থ জ্ঞানেন্দ্রমোহন স্থিরিকৃত করিয়াছেন, এখানে চীৎকার ধ্বনিল, ঐ ঐ।

এখনও আবছা আলো তাহাদের হাত বাহিয়া জলস্তরে সম্পাতিয়া ছিল; জলস্তরে তখনও স্থিতু ভ্যাবাচাকা খাওয়া কম্পন—এরূপ পদ বাঙলা, যাহাকে অন্য শব্দ যোগে, সঙ্গীত বাচ্য করা যায়, অবশ্য আমার মন সায় দিবে না—কৃষ্ণ কমল, দ্বিজেন ঠাকুর মহাশয় বাঙলা ইডিয়ম-এর মহা পক্ষপাতী; দ্বিজেনবাবু, রবিবাবুকে বাঙলা ইডিয়ম ব্যবহার করিতে বলেন, ফল কি ঘটে জানান নাই (পু প্রসঙ্গ) আমাদের কর্ত্তব্য অন্য: যে মন ঐ পদ ব্যবহার করে তাহার গঠন, গঠন বলিতে সব কিছু!

এই কম্পন বড় মনোরমা—ঐ হাঁস!

উন্নাত্তর জঙ্গলে (কানপুর ও লক্ষ্ণৌর মধ্যে) নিকট যে জলাশয় ছিল, তাহাতে অজস্র হাঁস, এখন প্রচণ্ড শীত, চাঁদ আছে; আমরা অগ্রসর হইতেছি, দুতিনটি মহিষের পশ্চাতে, কেননা জলাশয়ের পাড়ে চক্রবাক যুগল। শুনিয়াছি ইহারা একে অন্যকে বড় ভালবাসে, ঐ নর ও মাদার ভালবাসা লইয়া টিট্টিকার আছে: যেন চকাচকি। মোপাশাঁর গল্প বড় কষ্ট দেয়।—ঐ ভালবাসা দেখিতে যেই না মহিষের পাশ হইতে মাথা তুলিলাম, অমনি তাহারা, চক্রবাকদ্বয় কেমন এক শব্দ করে, হাঁস উড়িল, আশ্চর্য্য!

এই হাঁস অতীব ধীরে গ্রীবা বাঁকাইল। আশেপাশে শালুক।

গোতিয়ে'এর লেখার মধ্যে এমন এক জলাশয়ের কথা আছে, পদ্মের মধ্যে নৌকা ভ্রমণ—এখানে ennui শব্দের লাগসই!—কি মনমরা ব্যাপার! ইহা হইতে শিকার ভাল!

ক্রমে ঐ সকলের নির্দ্দেশিত হাত আনচান করিল। এখন খুব অবাকের যে তাহারা সকলেই দৃষ্টি ফিরাইয়াছে; ইহা করিতে মস্তক ঘুরাইল; হাত নির্দ্দেশিল; ঐ ভেড়ী পথ, ঐ ভেড়ী পথ-গা বাহিয়া ঢাল, নাবাল, তথা নীচু বা খাদ হওয়া জমি এবং পরক্ষণে এই কূর্ম্মপৃষ্ঠ ভূমির শুরু, তাহাদের পদ খাতে রাস্তা,

এবার তাহারা নিজ দেহ দেখিল, মেয়েছেলেরা বস্ত্রকে যথাবিহিত করিতে হাত দিল। এবং ঐ হাঁস! কি বা অপূর্ব্ব ঐ ধাঁধা! সমগ্র প্রক্রিয়া, জের, এক আধা অন্ধকার পাচারিয়া সম্ভবিয়াছে; কোথাও সুস্পষ্টতা নাই; শুধু ঐ, সেই, গীতে, তাহারা এই হিসাব এখানে উজাইতে, অন্য কোন সূত্রে শুধু পদশব্দই শুনিতে, থাকিয়াছিল! আঃ আপন বৃত্তি বুঝিতে, আলোর জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে।

ইহাদের হাত তেমনি ছিল; তবে উপস্থিত বাম হাত কপালে; ভ্রূতে, ঠেকান, ইহা লোকে যেমন করে সূর্য্য আড়াল করিতে—তেমনি করে; লক্ষ্য হইতে বিচ্যুত না হয়, তন্নিবন্ধন ডান হাতটি পূর্ব্ববৎ আজ্ঞায় থাকে! ততঃ আলো উঠিল, ব্রাহ্মণ্য পুণ্যে আবার শোভাময়ী হইল এই চরাচর! ও হাত সকল আশ্রয় করত হাঁসের গায়ে আলো পড়িল!

অল্পবয়সী ছেলেটি এখন নির্ভাবনায়, বস্ত্রখণ্ড অন্ধকারে ছাড়িলে সে যদি হারাইয়া যায়, যেহেতু আলো, আপন ঠেঁটি স্বল্পমাত্র বস্ত্রখণ্ড, কৌপীন হইতে বড়, পাছে ভিজিয়া যায় বলিয়া নহে, পাছে জলে খোয়া যায় বলিয়া খুলিয়া জলে ঝাঁপ দিল, হাঁস অলসতা ত্যাগ করে! ঝটিতি পাড়বর্ত্তীরা জলে সবস্ত্র নামিয়াছে! প্রসারিত হস্ততে ধরিবার অছিলা আছে; এখন, তাহারাও যখন জলে তখন আর নির্দ্দেশের প্রয়োজন নাই তাহা ভুলিয়াছে!

আজ কয়দিন অনাহারে থাকা ছেলেটি এই জলে, ঐ হাঁস পাকড়াইতে বেদম আলোড়ন তুলিল, তদীয় পা ক্ষেপণে জল বড় সাদা ফেনা হইতেছে—তদীয় পাছা সুঠাম, তাহা অদ্ভুত মজার! ঐ ফেনা ও ফোয়ারিত জল, ছুটিয়া উঠা বিন্দু সকল, যখন উহা ভেদিয়া যে মেয়েছেলে বিশেষকেই দেখা যায়, তখন সে, যদিও আকাল ধর্ষিত, ঐ মেয়েছেলে হয় অবাক লক্ষ্মীরূপিণী! আর কোন স্থানে প্রকৃতি নাই, এই প্রথম প্রকৃতি সৃষ্ট হইল। তাহা কি মহিমার এবম্বিধ যোগপাট! হাঁস, জলকণা, মেয়েছেলে!

এতদ্দর্শনে, তাহারা নিজেদের পুরুষ জানিল—বহুদিন বাদে বুঝিল; ক্ষুৎ কাতরতা যাহা ভুলাইয়াছে, আবার মহাফাঁকা ঐ ক্ষুৎকাতরতা নস্যাৎ করিয়াছে—দল সহসা নিরেট হইল, চমকিত জলে তাহারা মেঘের প্রতিবিম্ব দেখিল, কহিল, আঃ মেঘ দল! তোমরা কত শান্ত, কত সুন্দর, কত মায়াময়ী, তোমাদের জলে ব্যাঘ্র গাত্র কম্পিত, তাহাতে বাষ্প ছিটা উৎসারিত হয়, জিহ্বা দ্বারা কখনও ঐ জীব জল চাটে!

তাহাদের আ-কোমর জলে আছে; এসময় নির্দ্দেশিত অঙ্গুলি মুড়িয়া গেল, এখন মুষ্টিতে পরিণত হইল, এই মুষ্টিদ্বারা ঐ মরিয়া হাঁস নির্দ্দেশিত হয়; এবং সকলেই নিজ মুদ্রা দেখিল—এইরূপ মুদ্রা দিয়া তাহারা ইতঃপূর্ব্বে অঙ্কুরিত বীজ, কুঁড়ি, ফল ধরা নির্দ্দেশ করিয়াছে; কেননা মানুষের তর্জ্জনীতে এ ব্যাপারে আকাল আছে, নোনা আছে—তৎসহ যুগপৎ 'পাগল' শব্দটি বলিয়া উঠিল।

এখানে এবং নেপথ্যে পাগল কথাটি ধ্বনিত হইল! উলঙ্গ ছেলেটির পাছাটি বেজায় হাসির উদ্রেক করিবার; তাহাতে দিনের ফরসা ধরিতেছে; জলে তাহা সবিশেষ জৌলুষের হয়, এই বর্ত্তমানতা প্রত্যেকের মধ্যে উৎফুল্লতা আনিয়াছে; কিন্তু পাগল উচ্চারণের কমতি নাই।

আঃ ইতিপূর্ব্বে, যেমন ধাঁধার স্বরেতে পাগল বলিয়াছে তেমন ভাবেই—সেই যে গাছের তলায় কে এক জনা! সে তুমুল দাপটে চীৎকার পাড়িল; ইহাতে তাহারা স্থির; তাহাদিগের দৃষ্টি আঁধারে থাকিয়া যে চোখ জ্বলে তাহার সন্ধান করিল; পুনরপি আবার তদনুরূপ শব্দ মাঠ প্রান্তর ভাঙ্গিল, সকল থমকাইল! ইহা মনুষ্য কণ্ঠস্বর! মেয়েছেলেরা যে যাহার চুলে গ্রন্থি দিল—নিশ্চয় প্রেতাত্মা। ভয়চকিত স্বরে ইহারা 'কে' বলিয়া উঠিল।

পুনরপি একই আঁকাবাঁকা বেঢপ কণ্ঠস্বর উজাইল। তবে এখন উহার সহিত হাতেতে ডাকিবার ইঙ্গিত ছিল, যেটিতে পাতার ফাঁকে পাচারিয়া আসা চাঁদের আলো ঠিকরাইতে থাকে, ইহাতে কঙ্কালত্ব নাই।

বল তুমি কে! কি চাও! আমাদের ঝুলি নাই, এই দেখ টিন সকল উল্টাইলাম! কি চাও! আমরা আকালের খাতক!

তদুত্তরে, ঐ রহস্যময় ছায়ার ঘটনা কাকুতি আন্দাজ স্বর ঘটাইল, যাহাতে কয়েকটি বর্ণ স্পষ্ট, অর্থাৎ সে প্রকাশিতে চাহে যে, ভাল যে তোমাদের চক্ষু সকল জ্বলিতেছে না; যে তোমাদের হাতে সানকি আছে, আমিও মহামারীর খাতক! ...এই অবধি সে উচ্চৈঃস্বরে রোদনে কহিল। হা কি পাপ, না জানি কত পাপ!

ইত্যাকার বিবিধ উদাত্ত ও স্বরিত পর্য্যায়ক্রমে ধ্বনিতে তাহারা পরস্পরের প্রতি চাহিয়া উচ্চারিল,

আমরা ত ভিখারীর অধম, আমাদের ভয় কি!

এখানে মেয়েছেলেদের কণ্ঠে ধিক্কার শ্রুত হইল, ছিঃ ছিঃ এই ভোর রাতি, শৃগাল আর ডাকিবে না, এখন ঐ অমঙ্গলজনক কথা! আমার অতি বড় শত্রুও যেন না হয়, ঐ ভিখারী, আমরা আমাদের নক্ষত্র ধরিয়া চলিতেছি, ভয় কি বা! মানুষ ত! আমরা রোদনের দিকে যাইব। সেই মেয়েছেলের কণ্ঠ বেশী হইল, যাহার নিকট আয়নার টুকরা।

এবম্প্রকার ভর্ৎসনাতে বেটাছেলেরা, এক পা পিছু হটিয়া অগ্রসরিল। যতই তাহারা ঐ আলোছায়া মণ্ডিত শরীরের দিকে যায়, ততই ক্রন্দন উদ্বেলিতে থাকিল; তাহারা এক হস্ত উত্তোলিত করিয়াছে, মেয়েছেলেরা অঞ্চলের খুঁট ধরিয়াছে, ইহাতে এখনই প্রস্তুত যে রোদনকারীর চক্ষু মুছাইবে, ক্রমে যখন তাহারা প্রায় ঐ শরীরের নিকটস্থ হইল, নিমেষেই ঐ শরীর ফেউএর মত কয়েকটি জলদি ডাক পাড়িয়া ঝাঁপাইয়া পড়িল উহাদের কাহারও উপর; ইহাতে প্রত্যেকেই, একজন ব্যতীত, আঁক্ গোঙানি সহ পশ্চাদপসরণের বৃদ্ধি করিল।

এই ছোট কুঞ্জমত স্থানে, বৃক্ষ নিম্নে ভারী ত্রাসের অবস্থা ঘটিল; যে ব্যক্তিটির উপর ঐ শরীর ছিটকাইয়া আসিয়া পড়িয়াছে, সে, এমন মনে হয় যে পূর্ব্ব হইতে এই ঘটনার জন্য প্রস্তুত আছিল; সে সেই বৃদ্ধ যে গীত গাহে; সে একটি তৃণ দন্তে ধারণ করিয়াছিল, এবং সে, বৃদ্ধ, একটি হাত, যাহা লাঠি ধরা আছে সেইটি প্রসারিয়াছে; ঐ রহস্যময় শরীর, দেখা যায়, ঐ হাতের উপর ভাঙ্গিয়া বক্র হইয়া, নেতাইয়া পড়িল; ক্রমে ঐর হাত হইতে একটি বৃক্ষ শাখা, যাহা লাঠিরূপ, ধীরে খসিল; যে হাতে সে পড়িয়া আছে, বৃদ্ধের, যাহা ঐ শরীরের ভার সহিতে কাঁপিতে আছিল।

ভীতরা এই সংঘটনে থ হইল; বৃদ্ধ সাহায্যের নিমিত্ত বিশেষ গোঙাইতে আছে—ইহা বুঝিলেও কেহ গতি পাইল না; কয়েক মুহূর্ত্ত এই ভাবে কাটিতেই বৃদ্ধ বসিয়া পড়িবার উপায়ে আপন পদদ্বারা হদিশ করিতে লাগিল, ভিজা মাটিতে সে পিছলাইয়া পড়িল, ঐ হস্তে পড়িয়া থাকা লোক তখনও নিশ্চেতন!

এবার সকলেই নিকটে আসিল; কিছু বাদে প্রত্যেকের নাসিকা কুঞ্চিত হইতেছিল, একে অন্যের মুখের গন্ধ জানে, গলিত শবের গন্ধ তাহারা জানে; তাহারা চারিদিকে চাহিল, এক স্থানে কালো ছোট আকারের স্তূপের মত বৈ কিছু নাই। বৃদ্ধ কহিল, এই দেহীর কোন তাজ্জব ক্ষত আছে। কেমন এক গন্ধ!

অচৈতন্য।

আলো ফুটুক!

আলো যেক্ষণে সবে ফুটিতেছে; তখন ঐ শরীর একবার কোন ক্রমে আপন চক্ষু ক্ষণেক ভাঁটাইয়া একদিকে হস্ত নির্দ্দেশ করত জিহ্বাতে আড়াইল; তিন দিন। তোমরা! পরক্ষণেই এই জন চক্ষু মুদিল।

ইহার অর্থ সমবেতরা কিছু বুঝিল না, সকলে আপন উদরস্থ চুঞা শব্দকে একাধারে যেমন থামাইতে চাহিল, কেননা উহা নিকটস্থ দৃশ্যকে বেজায় তমসাবৃত করিতেছিল, তেমনই ঐ শব্দকেই আবার বুদ্ধি রূপে মানিল আর যদ্দ্বারা সম্মুখের সংস্থান বুঝিবে। প্রত্যেকেই আপন সর্বগ্রাসী ক্ষুধার আওয়াজ শুনিল, আবার প্রত্যক্ষিল, ইহার সহিত একে অন্যের কাছ ঘেঁষিল, নিশ্চয়ই এবম্প্রকার মননে, যে, আমরা গায়গায়ে থাকিলে, নির্ভাবনায় ইহা সিদ্ধান্ত করিতে পারিব—যে ঘটনা কি।

ঐ বৃদ্ধ এখন কিয়ৎ সেই হস্তোপরি নেতাইয়া শরীরকে বাগ মানাইয়াছে এবং ঐ দুই জনের মিলিত অবস্থা সম্প্রতিকার স্ফুটমান আলোতে এক মহান বাচকতার খেই হওয়ত উজরিল; তাহারা দেখিতেছিল, তাহাদের দেহ, সংস্কার বশত, বৃদ্ধকে সাহায্যের মানসে, স্থূল বিচারে, খানিক বাঁকা হইয়াছে, ও ডান হস্ত প্রলম্বিত এবং তাহার বাম হস্তধৃত বর্ত্তন প্রতি, চুঞা শব্দ প্রবর্ত্তিত, বারম্বার চকিত নেত্রপাতে তাকাইতে আছিল। অব্যর্থ যে তাহারা নিজেদের বর্ত্তমানতা, অস্তিত্ব ঠিক দিয়া লইতে আছে।

তাহারা কোথাও স্থানবাচক, ইহাই নির্ণয়ে শ্বাসরুদ্ধ, ইহাই জানিতে তাহাদের মুখ অর্দ্ধোন্মুক্ত, ওষ্ঠে লালা। এমনও ভ্রূকুঞ্চন ভবেতে ছিল, যে যাহাতে বলিয়া উঠিবে, অহো ভাগ্য! আমরা ধন্য। আমরা উদরের মোচড়ের খাতক—সেই আমরা এ কোন সংগঠনের দর্শক! ইহা কোন স্থিতির আরম্ভ! বা ইহা কোন শেষ সিদ্ধান্ত! ঐ দুই কোথায় একটি! ইহা কি আমাদের মধ্যকার কোন অবস্থা! এই সম্পর্ক! এই সময় ইহাদের চোখের পাতা অদ্ভুত রকমে উঠাপড়া করিয়াছিল, নিশ্চয় তিন দিন কথাটি তাহাদের নাড়া দিয়াছিল—মাত্র তিন দিন! অথচ হাঃ বলিয়া তুচ্ছ করে না।

গায়ক বৃদ্ধ কহিল, তোমরা এখন আমাকে বা ইহারে ছুঁইও না!

ইহাতে অদূরবর্ত্তীরা পূর্ব্বে কথিত ক্ষত শব্দ স্মরণে ভ্রূযুগ সটান করিল, গায়ক বৃদ্ধ তাহা অনুভবিয়া প্রকাশিল, তোমাদের শ্বাসের শব্দ আমি জানি, তবে ইহা এক মহৎ চেতনায় অচৈতন্য আছে, এই দেহ বিদ্যুতের কারখানা!

বিদ্যুৎ শব্দেই সকলেই পৃষ্ট হইল, এখন তাহারা সোজা খাড়া হইল, এবং ভোরের হাওয়ার দিকে মুখ রাখিয়া জিজ্ঞাসিল, অর্থ। বিদ্যুৎ; এবার ঐ সকলেরা ক্ষণেক আপশোষে থাকে, আঃ আমরা একদা মেঘের স্বত্ব ভোগ করিতাম, হায় এখন আমরা মেঘের কিছুই অনুকরণিবারে পারি না; আঃ মেঘ অদ্য আমাদের হইতে শত যোজন দূর!—এবং অতঃপর তাহারা বলিল, বটে আমরা এক অবাক গন্ধ পাই! কিন্তু তুমি কোন সম্পর্কে উহার সহিত আছ, তোমরা কি বিগত জন্মে পিতা পুত্র ছিলে! আঃ আমাদের বিস্ময়!

না।

তোমরা কখন কি দুজনে ভাই ছিলে, আঃ আমাদের বোধ!

না।

তবে এমন মহত্ত্ব তোমাদের কেমনে আসিল, আমরা বড় জানিতে ইচ্ছা করি। এবং এক বিচিত্র উদ্বেগ, দণ্ডায়মান যাহারা, তাহাদিগের মুখে চোখে ফিরিতেছিল।

বৃদ্ধ ভাঙ্গিল, বিদ্যুতের ঘর! ঐ দেহটি, বটে বিদ্যুতেরই!

ইহাদের জানিতে চাওয়া বৃত্তি, ভোরের হাওয়ার সহিত, বিবিধ কম্পনের সহিত মিশিয়া গভীর বৈদিক হইল, হে ত্রিকালজ্ঞ আমাসবাকার বড় ধন্ধ উপস্থিত, দেখুন আমরা জিজ্ঞাসু, আমরা মেঘ মন্ত্র করি! বিদ্যুতেই সেই ক্ষত যাহার গন্ধ পাই।

উহা বিদ্যুতের গন্ধ!

রহস্য!

তোমরা শোন, এই শরীরের প্রথম ঝাপ্‌টাতে, আমি প্রজাপতি ধরিবার সন্তর্পণতা লাভ করি; উহা করিতে বাল্যের সেই কালীন আঃ সর্দ্দি টানার শব্দ আজও মনে আছে, আজও আমি তেমন পারি, যে এবং তেমনভাবে বৃদ্ধ সর্দ্দি টানিল, আর যাহা অন্যদেরতে সংক্রামক হইল; একে অন্যের চোখে আশ্চর্য্য কোন মৃত্তিকার জলের খবর হইল!

এই সেই চমকপ্রদ অবর্ত্তমানতা! দারুণ ঘটনা। এমতভাবে সে দৃষ্টিপাত করিল যাহাতে ঐ বাক্য আছিল!

অভুক্তরা এই হেঁয়ালি ভাবেতে অতিমাত্রায় জাঁত চাপ বোধ করিল, এমনও মন আঁচিতেছিল, যে আমি কি ঐ সানকী বা টিন! আমি কোথাও অনড়, এবং কান্দিবার অভিব্যক্তি মুখ সমূহে স্পন্দিতিয়াছিল, এবং কর্কশ স্বরে চীৎকারিল, তোমার কথা পেটে রাখিও না, আমরা মহা ঘোরে আছি যে! বল, বল, তুমি যদি নাহি বল, আমরা উহারে স্পর্শ করত জানিব। এবং তাহারা স্পর্শ করিতে অগ্রসরিল, এবং করিল।

বৃদ্ধ মৃদু হাস্যে নিবেদিল, আমার গীতের অর্থ আমার নিকট এখন স্বচ্ছ হইল, আমি ঐটির অথৈ তল পর্য্যন্ত দেখি, আমি মদীয় প্রতিবিম্বও দেখিলাম! ঐ অথৈ তলে!

এখানে, ঐ দেহ স্পর্শ করিয়াছে যাহারা তাহারা 'আউ' ধ্বনি মহা খেদে ছাড়িল; তাহারা অসহায়! তাহা সকলের হাত, যাহা গ্রহণ কার্য্য নিমিত্ত পটুতা বাঞ্ছিত থাকে, বিষম কাঁপিতে আছে।

ইহাতে বৃদ্ধ নিদারুণ খুসী হওয়ত, স্বীয় মস্তক ঘুরাইয়া গাঢ় ধূম্র কান্তি বৃক্ষ ও দিকগুলি দেখিল, বুঝিল এই উপযুক্ত সময়, এবং সে অতীব প্রাচীন এক আলস্য পরিত্যজিল, কহিল, এই আদত বিদ্যুতের আশ্রয়, আবার ইহা অভিনব শরৎকাল; ইহা দুর্গা প্রতিমার মাটি!

জয় মাধব জয় রঘুবীর!

শ্রোতৃবর্গ বুনো অধীরতায় আর্ত্তনাদ করিল!

ইহা ক্ষুধা তৃষ্ণার পার, ইহাতে আমাদের অবর্ত্তমানতা! আমরা এইখানে নাই, বহুকাল নাই!

বৃদ্ধ কি কর, কোথা যাও, হেলে নাই, লাঙ্গল নাই, টোকা নাই—কি চামটে লপ্ত সম্মুখে! তুমি

আমাদের কোথা লইতেছ!

শুন। আকাল আমাদের সব ভুলাইয়াছে—আমরা হৃত সর্ব্বস্ব, আমরা ফিরিয়া পাইলাম। এ বড় আজব শরীর, বহুভাগ্যক্রমে তোমরা এই দেহ স্পর্শ করিয়াছ, হরিধ্বনি দাও!

ইহারা হরিধ্বনি করিল, ইহারা হর হর ব্যোম শব্দ উচ্চারিল এবং সভয়ে বৃদ্ধর প্রতি নিরখিল, ঐ মুখেতে তাহাদের দ্বারা এখন নিষ্ঠুরতা, বস্তুত যাহা দুঃসাহস, ঠাওর করা সম্ভবিল—আ যে তদবস্থ ইহা জিজ্ঞাসিল, এই ব্যক্তি কি উচ্চ জাতি! ইহাকে স্পর্শ করিয়া তবে কি পাপ করিলাম। তবু কেহ ঐ দেহ হইতে হাত সরায় নাই, নির্ঘাৎ তাহারা ঐ দুইটি মিলিত একটির অংশ হইয়া এক অনৈসর্গিক আনন্দ উপলব্ধি করিতেছিল!

তবে ঐরূপ পাপ আমাদের জন্ম জন্মান্তর হউক!

আমাদের আর আঁধার দিও না হে! কেন জানি না আমাদের অন্তরাত্মা বলিতেছে যে, এতেক হেনস্তা সহিয়া এই এক ছটাক জমির উপর দৃশ্যটি সাক্ষ্যাতিবারে তোমরা নিঘিন্ন অবস্থাতেও নিঃশ্বাস লইয়াছ, তোমরা ধন্য, আমাকে ভুল নাই, দিন তোমাদের বিকৃত করিয়াছে, রাত্র তোমাদের কালো করে নাই! দেখ সার্থক হও! ধন্য তোমাদের জন্ম। ঐ চূড়ীর আয়না তোমরা স্পর্শ কর! আঃ উহা মানুষের হাতে থাকিয়াও বৃথা হইল।

ধন্য তোমরা, এতেক আকাল সহিয়াও জানিতে চাহ! এ খবর গোপনে রাখিবে, দেখ, এই দেহের তাপে ঘাস সকল কিভাবে শুকাইয়াছে!

এ দেহ পুড়িতেছে!

আলেখ আগুনে!

বৃদ্ধের এই উক্তির সঙ্গেই ঐ অচেতন ব্যক্তি, চক্ষু চাহিল, উঠিয়া কয়েক পদক্ষেপ অন্তে হঠাৎ বসিল, একবার ডান কাঁধে পরক্ষণেই অন্যটিকে তদীয় প্রসারিত হস্ত দুইতেই সে বিভ্রান্ত হওয়ত চকিতে এই বিকট হাহাকার সহ, আপন দণ্ড গ্রহণ করিয়া, উঠিয়া ঐ, মসীকৃষ্ণ স্তূপের নিকট যাইল! উপস্থিত কিয়ৎ পদচারণা করিতে আছে।

ইহারা সকলে ক্রমে পিছনে সরিতেছে এতক্ষণ অর্দ্ধ উন্মুক্ত মুখে, উহার প্রতি তাকাইয়া থাকে, এখন প্রত্যেকেই অদ্ভুত ভাঁজে বসিয়া, দেহের পিছনে হাত রাখিল; ইহাদিগের সাড় নাই; সহসা এক ফড়িং উড়িতে তাহারা সম্বিৎ ফিরিয়া পাইল, তাহারা বৃদ্ধকে অনুকরণ করিল, যে একবার সেই বিশুষ্ক স্থান দেখে, আঃ ঘাস সকল শুকাইয়াছে ও পরক্ষণেই ঐ ব্যক্তিকে বুঝিয়া লয়!

হঠাৎ বৃদ্ধ বুদ্ধি করিয়া কহিল, বল আমাদের, কি করিব! আমরা!

আমি বাগদী!

আমরাও সকলেই কেহ উগ্রক্ষত্রিয়

অদ্য তিন রাত্র আমি বিনিদ্র! ঐ দেখ!—ঐ স্তূপের প্রতি নির্দ্দেশিয়া কহিল, আমি চেঁচাইয়া লই! ও সে এক জঙ্গল চীৎকারিল, এই চীৎকার বড় রমণীয়, শ্রোতারা মোহিত হওয়ত অনুকরণ করিল। এখন আর কিছু ফরসা হইয়াছে, তাহাতে সকলেই একটি কালো আকারের কোন বস্তু, যাহার চেহারা অনেকটা গাছের গুঁড়ির সমান, মাটিতে পড়িয়া আছে দেখিতেই, ইহারা উল্টে পালটা হইয়া গেল, উদর মধ্যেস্থিত চোরা আশ্রয় সকল মচ্‌কাইয়া উঠিল, এই আবছায়াতে মন কিছু সাঁদ করিল, যাহাতে চোখ বুজিয়া যায়, ইস্ কি বিভীষিকা! ইহারই আশেপাশে ঘোর কালো বর্ণের কিছু পক্ষা গুঁড়া বা কুচি হাওয়াতে সরিতে আছে, তৎসহ ভীষণ কালো ছোট্ট পালকের মত কিছু, নিশ্চয়ই পোড়া বস্ত্রখণ্ড নির্ঘাৎ, ফর ফরিয়া উড়িতে আছিল।

ঐ টুকরা সকল ইহাদের আক্রমণ করিল, কেহ আসীন থাকিয়াই সরিল, নাসিকা সকল কুঞ্চিত, উদর আলোড়িত, কেহ থুতকুড়ি কাটিল! তবু ইহাদিগের দৃষ্টি ঐ ব্যক্তির প্রতি, তাহারা জানিতে মরিয়া যে ঐটি কোন এমন গল্প যাহার স্পর্শে ঘাস বিশুষ্ক হইল, সমস্বরে জিজ্ঞাসিল, তুমি চুপ কেন, বল!

উহাদিগের বচনে করুণা, বড়ই ব্যথিতর মায়া, আছিল; যাহাতে ঐ বিদ্যুতের ঘর দণ্ডায়মান অবস্থাতে শিখাবৎ চমকিতে আছে, এখন সে আপনকার নিম্ন ওষ্ঠ ক্ষণেক লক্ষ্যিয়া দংশিল, এবং ঝটিতি সবেগে দড়াম্ করিয়া ঐ সেই স্তূপের নিকটের কৃষ্ণবর্ণ বস্তুর নিকট আছাড়িয়া পড়িল; এবং ঈদৃশী ব্যাপারে

সকলে হতভম্ব হওয়ত, নড়িতে যাইতে গিয়া বিশেষ কুণ্ঠিত কেননা ঐ ব্যক্তি মনুষ্যচিত্ত বিভ্রান্তকারী হাহাকার করিয়া উঠিল। ঐ রবের সহিত কণ্ঠ মিলাইতে তাহারা হাঁ করিয়াছিল মাত্র।

বহু জন্মের ক্রন্দন এক জন্মে কাঁদিতেছে! এই ক্রন্দনের ধমকে এখন মর্ত্ত্যলোক নির্ম্মল সৌন্দর্য্য ধারণ করে।

সূর্য্য উঠিতেছে!

কেহ ঐ ব্যক্তিকে সান্ত্বনা দিতে উঠে না; অবশ্য তাহা জানে না; এক্ষণে জনাজাতের হাত এক ভাঙ্গনে ঈষৎ ছাঁদ কাটে, যাহাতে কিছু ফুরাইয়া গিয়াছে এমনই যাহাতে বুঝায়, একমাত্র বৃদ্ধের দীর্ঘশ্বাসেই এবং ইহা খবর হইল; তবে কোন কিছু না করিলেও, এখানে বর্ত্তাইতে সকলের এক মনোরম জ্বর আসিয়াছে; এখন সেই অদ্ভুত গন্ধ আর নাই; সবই ঐ পতিত শরীর শুষিয়া লইয়াছে; সে কালো লপ্তুতে মুখ ঘষিতে আছে।

বৃদ্ধ এখন গীতের পদ সকল সুর করিয়া, গাহিল না, আবৃত্তিয়াছিল। আর তৎক্ষণাৎ ঘোষিল ওহে, ছ গণ্ডার (২৪ পরগণা) মনীস, বাদা-র লোক এখন তুমি আমাদের হাসিল কর, আমরা ডাহিনা বাঁতে থুত্কুড়ি কাটিলাম, হে হে..., এখানে সে সকলের প্রতি নিরখিয়া সায় লইয়া কহিল, আমরা নিজেদের উদরে এই থুতকুড়ি দিলাম, থুথু, বল!

এখন কি রাত্র পোহাইয়া গিয়াছে! আমি কি কোথাও আছি! এইটুকু তাহার ওষ্ঠ স্ফুট হইল, যে এবং মুখমণ্ডল এমতভাবে এখন নড়িতে আছে, যাহাতে স্পষ্ট যে বলিতেছে, তোমরা আমার কাঁধে কেহ আছে দেখ কি, তোমরা বুঝিলাম তাহারাই, যাহারা রাত্রকে আড়াল করিতে পার, আর তোমরা এই কর, আমাতে রাত না ঘনায়, যাহাতে আমার বুকে আমি জাগিয়া থাকি; আমার কাঁধের ভার আছে না নাই—তাই আমি বড় ধন্ধে, ঠাকুর একি পরিহাস! শাণিত কুঠারের পার্শ্বে কত না অদ্ভুতভাবে আমি ঝিমাইয়াছি, হাত আমার বিচ্যুত হয় নাই! ঠাকুর এখন আমার মনস্কতা অন্যমনস্কতা অতিদূর বিন্দু উজাইয়া গিয়াছে। ঠাকুর আমার বিহ্বলতা পাহাড় পাচারকারী শিকড়কে বেষ্টিত করিয়াছে; আমি এখন আপন কব্জি কামড়াইয়া কি জানিব আমি আছি! আমি কি পড়িয়া মার খাইব!

হঠাৎ ঐ অদ্ভুতদর্শন ব্যক্তি কাহাকেও আক্রমণ নিমিত্ত হুঙ্কার দিতে মরিয়া হইল, কিছু ভগ্নস্বর বাহিরিল। কি চমকপ্রদভাবে সে এক পাশ ফিরিয়া বীরদর্পে দুলিল, ও অবিলম্বেই সে কাহিল অবসন্ন; এখনও দিক সকলে বৃক্ষের অবছায়া তথাপি এমনও যে, তাহার পদদ্বয়ের মরদ গুল দেখা গেল, এই পদদ্বয় হাঁটু ডোবা এঁটেল হইতে খুব অনায়াসে উঠিতে পারে, যাহারা ইহা লক্ষ্যিল তাহাদের উদর প্রসূত শব্দ ছন্দিত হইল!

কে বটে তুমি, যে তোমার পায়ের তলে রাত্রদিন লাট খাইতেছে। কে বটে তুমি, যে তোমারে দর্শনে একদা কচুপাতার উপর জল বিন্দুকে নাড়া দিয়াছি মনে পড়িল; কে বটে তুমি, যাহার ঐ কপাট বক্ষ সালসার ছবিকে হার মানাইয়াছে! কে বটে তুমি, যে বক্ষ দর্শনে সপ্তমীর ঝড় থমকাইয়াছিল! আঃ আমরা তোমার দাস হইব!

হায় তোমাদের মত কি এখনও আমি কথা বলি! যদি বলি তবে আমারে হুঙ্কার লভিতে মদৎ দাও, হাঁক পাড়িয়া আমাকে জাগাও!

তুমি এতেক জাগিয়া আছ যে আমরা ঘুমাইতে পারি!

আঃ তবে যদি তাই—তবে আমার কানে ধুতুরার ফুল নিশ্চয় আছে!

এবম্বিধ জিজ্ঞাসায় সকলেই হস্ত পদদ্বয় হারাইল; তাহারা তখনও বিচারিল, এমন কোনও চোরা বালিতে ঐ জন আটকা পড়িয়াছে। এই সকলের পিণ্ডভূত দেহের চক্ষুগুলি বিরাট হইল! তাহারা বৃহৎ হাঁ রচিয়া আছে।

তোমরা কি আমার অঙ্গুলির টিপে লাল দেখ!

আমরা তোমার ওষ্ঠেতেও দেখি।

দেখ! সেকি! ঠাকুর আমি আর বিরাট হইতে পারিতেছি না, আমায় ছোটতে রাখ, আমি, আমার ঘর আমার উঠান, কেহ আমাকে ধুতুরা ফুল দাও আমি পরি!

গায়ক বল বল।

রহ, এখন আমি শুধু পিপীলিকার মুখের খাদ্য কণা প্রত্যক্ষ করি বটে, তবে উহাটি কি যে তাহা শুঁকিতে হইবে! উহা চিতা!

আমাদের পদদ্বয় নাচিতেছে, কিছু বল, উহার হাতে কিবা বিচিত্র পতাকা; হ্যাঁ পতাকাই একশোবার, আমাদের বাস্তুতে কোন এক আজব বাঁশগাড়ি করিবে; অথবা উহাকে কি বধ দিব! অথচ উহার মনোরম চীৎকারে আমরা গলা দিয়াছি।

আমি ভাবিতেছি, ধান্য দূর্ব্বা হইতে উহাকে আলাদা করিয়াছি মাত্র, উহা রূপা নয়, আমি তাই ডানা হাঁটা পথে ঘুরিলাম, আমারে, উহার বক্ষের রক্ত ক্ষরণ কাঁড়াইতে আছে, রসো, তোমরা কি রক্ত দেখিতে পাও।

তাই, বটে!

তাই আমি ষোল আনাতে আঠারো আনা সোনা লভিতে মুখিয়াছি! আমি সার্থক হইব!

আঃ উহা কত প্রকারে, কত রকমভাবে, এখনও ভ্রমিতেছে! আঃ ঐ চিতা প্রদক্ষিণ করে, গাজনের সন্ন্যাসীদের ন্যায় ধড় সঞ্চালন করিল, মস্তক নীচে উপর করে! রক্ত বিন্দু দেখে!...দেখ, দেখ উহার মুখে কালো ভস্মরাশি, তবু কিবা ফিট্‌কারি! ফটীকা, বটে বটে তবু কিবা কর্পূর! এমত উক্তির সহ প্রতিটিতে আপনকার, মেয়েছেলেরাও, বুকেতে হাত ঘর্ষণ করিতে আছিল, কেননা ব্যক্তিটির ইতিমধ্যকার চীৎকারে পক্ষীদের গতি ভূতচালিত হইতেছিল, যাহা বুক ফাটা!

বৃদ্ধ সেই বিশুষ্ক লপ্তের দিকে আপন চক্ষুকে হাঁয়াইয়া থৈ লভিতে যত্নবান, আসলে যাহার থৈ, সশরীরে পদচারণাতে আছে, এখন সেই পূর্ব্বে উল্লেখিত রহস্যময়, কালো লম্বা কিছু পড়িয়া থাকার পার্শ্বে, ঐ সেই গতিমান থৈ বসিল, বড় করুণ স্বরে জানাইল, অহো, মাধুর্য্য! এখন তোমার প্রত্যঙ্গ সকল, মাটির যাহা, তাহা মদীয় মুখমণ্ডল হইল, চক্ষু হইল!

তবে ত ঐ জন ক্ষ্যাপা নহে! ঐ তাহার হস্ত অঙ্গুলি কেমন আনন্দদায়ী রেখায়, সেই কালো লণ্ডভণ্ড কিছুর উপর দিয়া যায়! ঐ দুই অঞ্জলি ভরিয়া সে কিছু পান করিল, তবে ত ঐ জন ক্ষ্যাপা না, দুই হাতে নিশ্চয় মুখমণ্ডল চাপিয়াছে, আঃ ভাবান্তর সাক্ষাৎ হয়!

জয় রামকৃষ্ণ তারা তারা। অহো আমরা ধন্য, অহো আমাদের উচ্চ বর্ণে জন্মান সার্থক!

ঐ লোক ভূতগ্রস্ত নহে, কেননা, উহার প্রত্যঙ্গ সকলের চালনা সুছন্দিত, এবং দেখ, উহার তারস্বরের কোন এমত স্থান নাই যেখানটিতে অনুনাসিক স্বর জড়িত আছে।

হায় কে ঐ বেচারী কেন এমন সে তবে, তবে কি ইহা কোন যক্ষ যে যাহার মেয়াদ শেষ হইল! আমরা যক্ষের গল্প অনেক জানি যে, এই মাত্র কাহাকেও ধনী করিল ও এখন ছুটি।

আমরা ভীত হইলাম যদি যক্ষ হয়।

কি জগৎ বেচাকেনা নাই।

ছেতলা পড়া মোহরের মধ্যে একা বাস করা, শুধু দীপ জ্বালিতেছে।

যক্ষ নহে। ইহার হস্ত রক্তিম দেখ, উহার আঁখি পক্ষ সফেদ নয়, গাত্র বর্ণ কচি কলা পাতার তুল্য না, আর দেখ উহার বক্ষে রক্ত চিহ্ন! যদিও যক্ষের ন্যায় আদল...আঃ বিচিত্র যক্ষ বটে।

এতক্ষণে মহা করুণ শিশু কণ্ঠ ধ্বনিত হইল, গঙ্গাফড়িং সকল অভয় লাভ করিল, সেই ব্যাকুল স্বর ঘনীভূত হইল!...হা পাগলিনী, অরে পাগলিনী...দেখ ঠাকুর কাহাদের পাঠাইয়াছেন...আমি অতি অভাজন, জাতে ছোট নিঘিন্নে। তবু আমার কাঁদন তিনি শুনিলেন! পাগলিনী দেখ কাহারা উপস্থিত, আঃ হা তোমার চোখ কোথায়, চোখ কোথায় তোমার, ঠাকুর বল বল ইহার চক্ষুর্দ্বয় কোথায়, মৌজা জঙ্গল আদালত আমি ঢুঁরিব! আমি মাথার খুলি ফাটাইব, আমি কুঠার তাহাদের নিকট চাহিয়া লইব...পরগণা তছনছ করিব, সেই চোখ, কে সে বেহাসিল করিল? ঠাকুর এই পোড়া মুখ কিছু চাহে না,...আমি এই চুল ছিঁড়িলাম, আমি তামা তুলসী স্পর্শিলাম, জন্ম জন্মান্তর আমি তোমার সাবধান বাণী হইয়া থাকিব, লাট মহালে ঘুরিব!

সেই চক্ষু কোথায়...যাহা মদীয় বুক পর্য্যন্ত ছিল, আঃ হতোহস্মি! আমার বুকে ঠেকিবা মাত্র আমার মধ্যে সাজ সাজ রব পড়িত...এখন আমার সেই বুক কোথায়!

হায় কে সে হয়, যে ঐ বেচারীর আনকোরা পৌষ মাসে আগুন দিল!

ভগবান যদি তবে তাহার মুখে নুড়ো জ্বালিয়া দিব!

ছিঃ ছিঃ। ভগবানকে গাল!

ঐ ব্যক্তি অতীব রুষ্ট দৃষ্টিতে, এমত উক্তি করে যে তাহারে পর্য্যবেক্ষণিল; দলের লোকেরা সলজ্জাতে ছিছি করিল। ইহারা নিবেদিল, উহার বাক্য তুমি—বলিয়াই প্রতিজনেই আপনার গণ্ডদেশে মৃদু চপেটাঘাত ও কর্ণ নাসিকা মলিবার পর বিস্তারিল যে, আপনি ঐ অসভ্যতা ক্ষমা করুন, উদর আমাদের শুধু গ্রামহীন করিল না, তন্নিমিত্ত বুদ্ধি পর্য্যন্ত ধূলিসাৎ হইয়াছে! আপনি মধুর, মধুর কেননা দেহর প্রত্যঙ্গ জন্য খেদ করে—আত্মা বুঝায়, ইহাকে খোলামকুচি জ্ঞান করুন, ঐ বচন হয় ঢোঁড়া!...

ইহাতে স্বচ্ছ যে বৃদ্ধ, ঐ লোককে প্রহেলিকা মানিয়াছে। সুতরাং তুমির পরিবর্ত্তে আপনি সম্বোধিয়াছিল; এবং জিজ্ঞাসিল, যদিও শুনিলাম আপনি ইহাদের স্বজাতি, এই অধম বেদে, আমি বহু বাগদী দেখিলাম, তেমনি চাওড়া আড়া, তেমনি হস্তী চলন, গতি তবে—এখানেতে সে জোড় হস্ত করিল, প্রতিতে ঐ দিকে বড় সম্ভ্রমেতে নিরখিল, এবং পুনঃ সে আরম্ভিল, যে মহা রূপবান যক্ষ'এর ন্যায় আদল, মধ্যরাতে যে পথিকের পথ রোধ করে অতুল ঐশ্বর্য্য অকাতরে দিতে চাহে! আপনি কে বটে! আপনি প্রকৃতির কোন গোপনতা।

আমার ঐশ্বর্য্য! গোপনতা? এই দেহ পিপীলিকা কামড়াইলে কান্দিত!

সকলে সবিস্ময়ে অহো বলিয়া উঠিল, এবং সদম্ভে (!) প্রকাশিল, আমরা কথা খেগো আদতে, যদিও এই মহামারীতে আমরা শীর্ণ তবু আমাদের কর্ণ হাঁ করিয়াছে!

মদীয় চুপি সাড় মন নাই, লাঙ্গলের ভিতর বাহির নিরেট, একই!

আঃ নিখাদ নিপট সম্পূর্ণতা...আমরা বুদ্বুদের খোলস মাত্র!

এখন স্মরণে আসিতেছে,...এবং সে আর্ত্তনাদ মিশ্রিত হুঙ্কার দিল ও ঝট করিয়া তৎক্ষণাৎ হস্ত দ্বারা সামনেকার শূন্যতা বা অবকাশ হইতে কিছু ছিনাইয়া লইল, তৎক্ষণাৎ হস্ত আপন দৃষ্টিপথে প্রসারিত করিতে ক্ষণেই, উচ্চারিল, আঃ ঐ সেই!—বলিয়া অন্য হস্তেতে নির্দ্দেশ করিল, এ সময় দণ্ডটিকে পায়ে পায়ে আটক রাখে—আর এই আমি, হা হন্ত, আমি তোমারে এই স্কন্ধে লইয়া ক্রমাগত হাঁটিতেছি, আর কত হাঁটিলাম আমার স্কন্ধে ঐ।

কে ও।

শিবদুর্গা।

কে তুমি।

হরপার্ব্বতী।

আঃ।

মাথে চতুর্দ্দশীর চাঁদ, কাঁধে ধড়! এ কে!

কে যায়...। পাগলী আমার মা বাবা গাঁজা খোর। আহা! কানে দেখি ধুতুরার ফুল!

হঠাৎ আমি উত্তর করিলাম, যুধিষ্ঠিরের বাপ।

বৃদ্ধ কহিল, তাহারা বীর যাহারা এই আকালে ঐ ঐ কথা বলিল।

তৎসঙ্গেই আমার দেহ বজ্রে ভরিল, সিঙ্ঘিড়া খেলিয়া উঠিল, আমি কাহাকেও বধ করিলাম, আমি কাহাকেও মাপ করিলাম, আমার দেহের মধ্যে শঙ্খচূড় মাথা আছড়িতে আছিল, কহিলাম, পাগলিনী তুই কি ঘুমাস্!

স্কন্ধস্থিত পাগলিনী, আমার পিঠে দাগ নাই—তৎক্ষণাৎ অতএব ইহা পরিষ্কার যে সে লেঠেল ছিল—ভারী জবর নখ বিঁধাইল!

আমরা সে ক্ষত দেখিব, যেখানে জড় আলো অন্ধকার নাই, আমরা শুঁকিব লেহন করিব।

আমি অদ্ভুত ভরসা পাইলাম, গলা ফাটাইয়া কহিলাম, হ্যাঁ আমি যুধিষ্ঠিরের বাপ।

কেন তাহা কেন!

আমি তাহার থিকে বড়, কেননা, এই কন্যা আমার স্কন্ধে, আঃ নিশ্চিন্দি, নিশ্চিন্ত; আঃ নিশ্চিন্ততা বহনে আমার কাঁধে কুঁজ হউক। আঃ অবসর! ওরে তোরে আমি লইয়া খানিক বসিব, সিঙ্ঘিড়াতে এ দেহ ফুটির ন্যায় ফাটে!...

কোন উত্তর নাই।

আঃ এই কন্যা সাত মাথাতে কিনিলাম।

আমরা 'কেনা' শব্দকে আর এক অর্থে দেখি, দাস প্রথা বা বিজিত নহে, প্রতীক; পরিশ্রম সাপেক্ষ ইত্যাদি; সে লাঠিয়াল ছিল, সাত মাথা মারিয়া যে অর্থ অর্জ্জন করে—ইনাম পায়!

এই কন্যা বড় ফাঁকি বড় আলেয়া হে; আমার চালার ইন্দুর একদিন চলিয়া গেল ও হাঁড়ী ভাসিল, আমি কলার ভেলা ভাসাইলাম।

এই কন্যা বড় ফাঁকি, কহিল, এই দোলা বড় আহামরি, জন্ম জন্মান্তর এই দোলা থাক আমি তোমারে জড়াইয়া থাকিব; আমার তৃষ্ণা নাই—আমার ক্ষুৎপিপাসা আকালে খাইল, আমি ক্ষুৎকাতর নহি।

তদুত্তরে আমি ঐ বিশাল নদী দেখিলাম, হায় বিধি এ কি আমার পূর্ব্বজন্ম! আগামী জন্মের পূর্ব্বে, আমি পূর্ব্বজন্মে ঘুরিতেছি...হা বিধি একটু অন্ন দিতে পারিলাম না! আঃ যখন যে স্কন্ধে এলাইয়া, তখন তাহার শূন্য উদরের ফাঁকাত্ব আমার বুকে হাপরের বাতাস দিয়াছে, হা বিধি এক গ্রাস দিতে পারিলাম না।

এ কন্যা বড় ফাঁকি, কহিল, ধূম মোকদ্দমা হইবে, কত সাক্ষী সাবুৎ...তুমি চোর হইবে! মাগো তোর দোলা বেদম কর। আমি আঁকড়িয়া ধরি মন্দ তোমাকে!

এই সময় ঐ ব্যক্তি হা হা হা অনুদাত্ত হইতে উদাত্তে স্বর উঁচাইল, সেই কৃষ্ণতম কিছুকে অবলোকনিয়া বিস্তারিল, তোমারে স্কন্ধে তুলিলাম, তোমার খাইবার শক্তি পর্য্যন্ত, ভয়ঙ্কর কোন অপদেবতা অপহরণ করিয়াছে; দুর্গত হাভাতেরা হায় হায় করিল কেহ। আঃ বনবিবি একি সংগঠিলে, আঃ পীর বাবা একি! যতেক কিছু পানিফল ছিল, আমি চর্ব্বণ করিয়া তোমার মুখে দিলাম, কত স্নেহে কহিলাম, খাও, একটি কণা তোমার মুখে গেল না! স্কন্ধে তুলিলাম!

ইহাতে আমি, আমার অজানিতে এক মহাপ্রলয়ঙ্করী খেদ-বিষাদ চকিতে করিয়া উঠিলাম! যে কন্যা বড় ফাঁকি সে কোনক্রমে বড় কষ্টে চোখ মেলিতে আগ্রহ করিল, আমি পুনরায় স্নেহ মিশ্রিত শব্দে চীৎকার করিলাম, তাজ্জব যে তাহার লক্ষীতুল্য পদদ্বয় নাচিয়া উঠিল; আমি ভ্রূকুঞ্চিত করিলাম, চোখের জলে আমার চোখের চারিপাশ চুলকাইয়া উঠিল, কি খুসী, কেন!

বাঃ খুসী হইব না, তুমি খোলামকুচি চিবাইয়াছিলে।

বড় সুন্দররূপে সাজাইয়া তুমি তাহা দিলে যে।

আঃ সে কথা শুনিব।

উঠানে তুমি এক মনে, বৌবাটি খেল, হেঁসেল বসাইয়াছ, বক্‌বক্ কর, তোমরা, মাথার গামছা দ্বারা তৈরী চুল খুলিতে রহিয়া হাঁকিলে, বেলা যে যায়, আমার কি নাওয়া খাওয়া নাই, ধান ভানব না। যাও একটা ডুব দিয়া এস!

আমি তাহাতে ছুটিয়া আসিলাম; চমৎকার ঠাঁই হইয়াছে, কত না ব্যঞ্জন খোলামকুচির ভাত, খোলামকুচির সব! তৎক্ষণাৎ আমি মহা আনন্দে চিবাইয়া খাইলাম। তুমি তদ্দর্শনে থ, তোমার পরণের ঠেঁটি খুলিয়া পড়িয়াছে; তোমার, সমোত্তদের মতন, চোখ ফাটিয়া জল আসিল; তোতলাইয়া বলিলে, ওমা ও কি কর, মিছিমিছি খাইতে হয় না, তৎসহ ঠোঁট ফুলাইয়া দারুণ জোরে তুমি কান্দিয়া উঠিলে। আমি বলি, বৌ তুমি কান্দ কেন। তুমি ফুঁপাইতে রহিয়া বলিলে, লোকে কি বলিবে, আমি নূতন বৌ!

এ কি তুমি যে কিছু বল না!

সে আর কথা কহিল না, তাহার সাড়া নাই, আমি পথ চলিতেছি, যখন সেই জায়গায় আসিলাম, তখন সব শেষ; তবু উচ্ছিষ্ট পদ্মপত্রাদি বাতাসেতে উড়িতেছে, দুএকটি কুকুর জমি লেহন করে, পাখীরা জমি ঠোকরাইতেছে। এক একটি পাতা আমার প্রায় মুখের নিকট আসিল; তামাসা করিল! আমি পাথর হইয়া গেলাম, আমি মহা আক্রোশে কোনটি কখনও কামড়াইতে কোনটি কখনও ঘুঁষি মারিতে গেলাম।

সেই ব্যক্তি সকালের আলোর প্রতি মুখ রাখিয়া কহিল, দেখ আমি আমার কাঁধে নিজেই দীর্ঘশ্বাস ত্যজিতে পারিতেছি না। তোমরা কেহ পার! অবশ্য সেই জন আইস, যে দীর্ঘশ্বাসের অপচয় করে নাই—আমার কাঁধে ফেলিতে পার। দ্বিধা করিও না, আইস!

বৃদ্ধ যাইয়া, সেই কাঁধে দীর্ঘশ্বাস ত্যজিতেই, সেই ব্যক্তি চক্ষু বুজাইয়া, থর থর কাঁপিতে আছে! এবং

সে আপন ডান হস্তর অঙ্গুলি উঁচাইল; বৃদ্ধ প্রতিটি অঙ্গুলিতে শ্বাস ত্যাগ করিতেছে যখন সে কহিল, ঐখানে আমার রোদন অন্ধকার ভেদ করত যাইল।

আঃ আমার রোদন আকালকে ফুঁড়িয়া নৈনেত্তর করিল, শিশুর ওষ্ঠ ফুলিয়া উঠিল, জল জঙ্গল মাটি পাথর চিরিয়া দিকে দিকে ছুটিল, পৃথিবী এক মহা আর্ত্তনাদে পরিণত হইল, তাহারা দৌড়াইয়া এখানে আসিল, হাতে মশাল, জিজ্ঞাসিল, কে তুমি, তুমিই কি রোদন করিতেছিলে!

এখনও কি করি না!

এতদুত্তরে তাহারা একরূপ অস্বস্তি বোধ করত হা হা গোতাড়ন শব্দর পরে কহিল, বটে, উঠ, কেন কান্দ।

তোমরা কে।

আমরা ডাকাত।

ডাকাত রোদন শুনিয়া আসে!

ডাকাতরাই আইসে।

শ্রোতৃবর্গ ইহাতে, আঃ ঠাকুর বলিয়া ফুকারিল; এখন সেই ব্যক্তি কহিল, আমরা ঐ উচ্ছিষ্ট স্থানের মধ্য দিয়া চলিয়াছি; এ সময়ে আমার কাঁধে যে জন আলুলায়িত, সে কহিল, কি পুণ্যের স্থান, বহু জন এখানে খুসী হইয়াছে। খাইয়াছে, আঃ এখানে যেন মরি!

তৎশ্রবণে আমি দারুণ চীৎকার করি, যে কেহ সাক্ষী থাক যে আমি কত অপদার্থ!

আইস আমরা গোঙাই। আমরা এ কি হেরিলাম, এ কোন দশাসই জনা, খাতক যে আপন বধূরে বাম স্কন্ধে তুলিয়াছে; কি সৌভাগ্য!

দেখ মৃতদের প্রেত সকল আমাদের বলিতেছে, তোমরা ধন্য, তোমরা পরমদৈবী মিথুন কথা শুনিলে, একটিরে দেখিলে, তোমাদের কটোরা বর্ত্তন সকল আমায় লজ্জা দিবে না।

আমরাও ধন্য, ইহাতে আমরা মুক্ত হইলাম।

আমাদের কোন খেদ নাই, সাতজন্মের কাঙাল আমরা এক জন্মতে হইলাম, আমাদের হাড় লইয়া মেঠো ইন্দুররা খেলা করিতেছে, চন্দ্রালোক সম্পূর্ণ হইতেছে, কত হাঁড়ী জলে ভাসিতেছে, এক মাছ অসতর্কতা বশত লাফাইয়া হাঁ এক হাঁড়ীতে পড়িল!

আঃ দৈবী মিথুনের একটি!

আঃ পদশব্দ!

আমি বুঝিলাম আমার পিঠে জল পড়িল বা! স্বভাব বশত ঊর্দ্ধে চাহিলাম, ততঃ জিজ্ঞাসি, খুব ক্ষুধা পাইয়াছে?

না ঠাকুর মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন।

তোমারে কোলে করিয়া মদীয় ঘরে আনিলাম, হায় অথচ।

ক্ষুধা! আমার সমক্ষে বাড়া ভাত।

ভাত তবে! মানে! বাঃ। বুঝিলাম টিট্‌কারী কর বুঝি বা!

তুমি না আমার, এক কাঁসি ভাত, আমি খাইতে ত আছি।

ইহাতে মদীয় পদদ্বয়ের শিরাতে যে টান তাহা সহজিল; যে কন্যা বড় ফাঁকি তাহারে খেলা দিতে মন গোঙাইল, সেই চামটে ভূমি খণ্ড পার হইতে কালে, আমাতে সাহস সঞ্চারিত হইল, বল এ কথা কেন?

ইহারা, এমনও যে চপল মতি বালকও সমস্বরে কহিল, তুমি অজস্র পরিতৃপ্তির, উচ্ছিষ্টর মধ্য দিয়া হাঁট, আঃ বাঁচিলাম—জয় পঞ্চানন্দ ঠাকুর! এখানে পঞ্চানন্দর থান উদ্দেশ্য প্রণাম—আঃ ঘুমাইব! ইত্যাকার অজস্র উক্তির কম্পনের ভিতর দিয়া হাঁটিতেছে, এখানে তোমার মাথা নীচু হওয়ার কথা অথচ তোমার মন অন্য! তোমার পদদ্বয় বেসামাল তত্রাচ তুমি সিধা! তুমি ধর্ম্ম!

হ্যাঁ, সেই সন্ধ্যাতে, আমি মহা আনন্দের উচ্ছিষ্টর লপ্ত দিয়া হাঁটিতেছি, আমি আমার ছায়া উজিয়া যাইতে ইচ্ছা করি, আমার নক্ষত্র কি ছোট জাতের নক্ষত্র বলিয়া, ঐ সৌর সভা মধ্যে হইতে বহু দূরে, কখনও স্পষ্ট হইবে না। আমি হস্তস্থিত লাঠি মাটিতে কিলাইয়া গর্দ্দভ স্বর উঁচাইয়া চীৎকার পাড়িলাম!

চিল্লাও কেন, আমি ত এই যে!

সাক্ষী জাগাই!

রহিলাম।

তোমারে নহে।

হইলামই বা, আমিও ত, সেই সাক্ষী তুমি ভাব কেন পৃথিবী ঘামের ঘর, কাহারও ভুঁয়ে পড়ে, কাহারও ঘামে মেঘ হয়, অনাবৃষ্টির পরে মেঘ, যে মেঘে মা লক্ষ্মীর চুল ভিজে, তোমার ঘাম বড় আলেখ ঘাম, ধোঁয়া, রহ রহ উর্দ্ধে যে ঘাম যায় তাহা ছুঁইব! ওহে আলেখ ঘামের ঘর হে!

হা মেয়েমানুষের মন! সে ঘামে মাটির তৃষ্ণা মিটিয়া থাকে যে! কেন সেই ঘাম বুঝিলে না!

কপালে নাই, আমারে সেই গল্প বল, কপালে নাই, সেই যে শিব অন্নপূর্ণা!

ও সেই ক্ষেপী পাগলিনী এখনও মন মানাইবি! ভালো, এক ভিখারী সারাদিন ভিক্ষাতে এক কড়িও পাইল না, বড় ভগবানকে গালি দেয়, বাবা মাঠাকুরুণ আকাশ দিয়া যান! মায়ের বড় করুণা।

—মা মাগো, আমি, আমি কড়া নাড়ি, দরজা খোল!

করুণা মা করুণাময়ী, মনে পড়ে তুমি আমারে একবার এই গল্প শুনিতে সময়ে জিজ্ঞাসিয়াছিলে, বল, আমি কি কোন জন্মে শিবের ঘরণী ছিলাম, বল। উহা শুনিয়া আমি কি ভয় পাই! আমি সারারাত খুঁটি ধরিয়া কাটাইলাম, দশা প্রাপ্ত হইলাম! তারপর তুমি, যে তুমি ছুঁচে সুতা পরাইতে জান, এক চোটে পার! গ্রামবাসী কহিল এই কন্যা যে সে নহে, ইহার পদদ্বয় সুন্দর এই লক্ষ্মী! তুমি সত্বর আমানি আমার ঠোঁটে দিলে।

তুমি, কন্যা, বলিলে এই ত আমি গাঁজা কুটি, তবে, এই ত পচাই আনি তবে, তুমি না লেঠেল! তুমি না আমারে ট্যাঁকে করিয়া হুজৎ হাঙ্গামা পোহাইতে যাও, ভয় পাও।

হ্যাঁ, একবার, সেই যে, আমি দখল লইতে অগ্রসর, উহারা অনেকে। তুমি এলোচুলে এমন এক চীৎকার ফাড়িলে, যে সামনের তুমুল অশ্বত্থ তৎক্ষণাৎ নত হইয়া গেল।

আমি কি বলিলাম আ বলিলাম, বটে, ভয়! আমি, সবাই বলিবে এত বড় হিম্মৎ যে...হ্যাঁ, মা করুণাময়ী বাবাকে, বলিলেন বাবু মহাশয়, ঐ বড় কাঙাল ঐ যে ভিখারী যায় উহারে কিছু দিব। বাবা উত্তর করিলেন, দিবে দাও, তবে উহার কপালে নাই! তবু মা ঠাক্‌রুণ, এক কুমড়া ভর্ত্তি মোহর ঐ কাঙালের পথে ফেলিলেন, কাঙাল! তখন ভাবিল, এতক্ষণ চোখ চাহিয়া আসিলাম এবার চোখ বন্ধ করিয়া হাঁটিব, এবং কুমড়া পার হইল!

কপালে নাই! অথচ তোমার হাঁড়ীতে চাল দিলাম!—হাঁড়ীতে চাল দেওয়া অর্থ, অনেক পাত্র যখন কোন কন্যাকে কামনা করিত, তখন কন্যাপক্ষ প্রতি পাত্রের নামে একটি করিয়া হাড়ি রাখিত, কন্যার চোখ বাঁধিয়া দেওয়া হইত এবং তাহার মুঠায় চাল থাকিত, এবং সে ঐ হাঁড়ির মধ্যে যে কোন একটিতে ঐ চাল ফেলিত—এই খেদ, তোমারে পাইয়াও খোয়াইলাম!

এই খেদে দেখিলাম, উচ্ছিষ্ট পাতাগুলি থম্‌কাইল, এই দুষ্ট জায়গা শান্ত, সন্ধ্যা বিস্তারিল; ও আমি বড় অত্রাহি হইলাম, আমি যেন উঁচু কেহ গুরুবারে খেউরী হই না, এখন তখন হাত পা ধুইয়া থাকি, তত্রাচ আমার দীর্ঘশ্বাস পড়িল। মদীয় ওষ্ঠ যে রহস্য সজল হইয়াছে তাহা এই হয় যে, তুমি কি তবে পরপুরুষের স্কন্ধে, আমি কি বটে পরপুরুষ! তবু আমি এই কথা কাটি নাই; খানিক নিজের গতি শব্দতে মন আটকাইলাম! এই সময় সেই কন্যা যে বড় ফাঁকি, যে আমার স্কন্ধে গামছার ন্যায় আছে, সে আঃ বলিয়া অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিল; প্রশ্ন করিলাম, কি ঘটিল! কষ্ট হইতেছে!

না, পরব আসিয়াছে!

তবু।

কোথা দিয়া হাঁট?

কেন, মাঠ দিয়া।

সেই, যে কন্যা বড় ফাঁকি, চিমটি কাটিল, সে কহিল, হারে! কোন বুদ্ধিতে আমার হাতে সুতা বাঁধিয়াছিলে! বলিহারি! তুমি যে আমার বুক ফাল করিয়া হাঁট।

ছিছি ঘুম ঘোরে তবে, পায়ে আমার কুঠ হউক! আর হাঁটিব না! এই বলিয়া, সেই ব্যক্তি তারস্বরে

কান্দিয়া উঠিল, অতঃপর কহিল, কিছু সময় নীরবতা অন্তে সে বলিল, তুমি চট করিয়া দাগী হও, আমার জন্য পারিবে না।

পারিব, কিন্তু দাগী কেন?

তুমি পুণ্যের খাতক! স্বর্গ তোমার খামার বাড়ী! আমারে বহিতেছে সেই পুণ্যে—আর জন্মে তোমারে পাইব না,...তুমি বেশ স্বরগে, আমি পৃথিবীতে কলমী বাছি, তাই বলি দাগী হও!...হ্যা গা পারিবে আমারে ছাড়িয়া থাকিতে।

ঠাকুর, আমরা বড় দুঃখচেটে কাঙাল, তবু আমাদের পুণ্যে অদ্যাবধি নীলিমা, আমাদের দিবাস্বপ্ন হইল না; আমরা পৈতা ছিঁড়িয়া পড়িয়া থাকা অভিশপ্ত লাট মহালে অথচ ভ্রমিতেছি!

শালুকে আমাদের দাঁত কালো, আমাদের গলা বুনো ওলে ধরিল, গাত্র বেদনায়, আকছার ডুমুর গাছ দূরে সরিয়াছে!

বিদ্যুতের ঝিলিক কলমীদল পুড়াইল, মুথা তুলিতে সর্পকে উত্তেজিত করিলাম! আমরা ভাঙ্গা কুলা হইতেও নিঘিন্নে অভাগা!

আমারে ছাড়িয়া থাকিতে পারিবে।

তোমারে ধরিলামই বা কখন? তোমারে ভাত দিতে পারিলাম না, পরের উচ্ছিষ্ট পাতার মধ্যে দিয়া হাঁটি! হা বিড়ম্বনা!

চুপ চুপ! রহ রহ, ছি ছি, ওগো আমার মস্তকের উপরে হাত দাও! দাও!

আমিও তখনি হাত দিলাম!

হাতে কি ঠেকিল! হা শুধু মানুষ মারিতে শিখিয়াছি! বুঝিলে না? আমার বুক তোমার কপাল অবধি উঠিয়াছে আর আমি সতী নিশ্চিত!

এই কথা চিকনাইতে আমার গায়ে দেখ, দেখ, কে যেন বা কিসের যেন বুকে হাপর মারিল, সেই বাতাসে আমি একটা কাঁটা নটেও নই, আমি ত নয়ই! দেখিলাম আমার সমক্ষে একটি ধেড়ে ইঁদুর থ, আর একটি অনবরত চক্র দিয়া থাকে; পক্ষীগণ, দেখা হইয়াছে এমনেরা, টাল খাইতে আছে, যে আমি হই বালির জমাট সেইটি ঝরে। আমি রাগে ক্রুদ্ধ হইলাম, তিলেকের নিমিত্তই; আমি ঘুনসীর সুতা বলিয়া আমি, কুঠার টাঙ্গী ধরি বলিয়াই আমি, আমার নিকট সর্পও যাহা ঐরূপও তাহা! অর্থ কোন প্রয়োজন নাই, হায় কি কুক্ষণে ইহারে ক্রয় করিলাম, পুষিলাম, আমার বক্ষের উপর সে ঘুমাইয়াছে, এই কুলটা! অভাগী! রাগে কহিলাম, শালী খচড়ী তোর মনে এই ছিল! তোরে না আমি কোলে করিয়া ঘরে আনিয়াছিলাম!

এত পাপ বাব্বাঃ! এতেক মন মাতলা হে, বর চাও বটে।

ক্ষেপী পাগলিনী।

আঃ আঃ হরিধ্বনি কর! বৃদ্ধ কহিল।

এই পর্য্যন্ত শুনিয়া আপনারা জয় মাধব! বলুন।

ভয় পাইতে আছ!

ভয়। আমার ভাদ্র বৌ!

তাহা হইলে, বুক তরাসে যে।

উপসী!

ঝুট বটে!

স্বত্ব হারাই। কত স্বত্ব হাঁসিল করিলাম! করিয়া দিলাম।

স্বত্ব।

মরদের স্বত্ব।

মায়াতে আমি হরিলাম, এই বলিয়া সে গুঞ্জন ধ্বনিতে এই গীত ধরিল, চল লো সই, যাই, তুলিতে ধুতুরারই ফুল। ঠিক এমত সময় তাহার মাথায় একটি উচ্ছিষ্ট পাতা আসিয়া ঠেকিল; আঃ আমি ক্রোধে অন্ধকার হওয়ত, হাহা রব তুলিতে পর্য্যন্ত পারিলাম না, পিঠ আমার বাঁকিয়া উঠিল, আমি মাটিতে মিশিয়া আছি—তখনই বুদ্ধি হইল এই মাঠ ছাড়িয়া পালাইব, অগ্রসর হইতেছি।

সে কহিল, কোথা যাও।

নরকে!

পথ ভুল হয়।

হইবার কথা।

যুধিষ্ঠিরের বাপের, বল কি।

সেই কারণেই, ধর্ম্ম এখন পুণ্য বহন করে যে।

আমার কথার শেষের সঙ্গেই তাহার দুর্ব্বল পদদ্বয় নাচিয়া উঠিল! সে চুপ, বুঝিলাম সে এহেন খুসীতে কাহিল, হাঁপাইতেছে, কহিল, বিধি বাদ সাধিল, এত কাছে কান কত কি বলার ছিল, হায়।

তোমার নিঃশ্বাসের শব্দ ঐ ত অঢেল!

না, না আমি, চিমটি কাটা হইতে অনেক কথা জানি! তুমি কত অজানা তাহাও বলিতে পারি! দেখ দেখ ঐ একটি লোক!

তাই ত ঘুমায়, বেচারা।

আঃ ঢেঁড়াদার, উহারে জাগাও! একটু বাজাইতে বল!

আমি ঢেঁড়াদারকে, সে অদ্ভুতভাবে গাছের গুঁড়িতে ঠেসান দিয়া ঘুমাইয়াছিল, জাগাইলাম; সে চোখ মেলিল, সে খুব গম্ভীরভাবে সেই উচ্ছিষ্ট মাঠের দিকে চাহিল, এবং নিজের ঢেঁড়াতে নিগূঢ় অর্থপূর্ণভাবে কাঠিটা মৃদু আঘাতিল। হঠাৎ তাহা থামাইয়া হাই তুলিতে গিয়া এক বিচিত্র ভঙ্গীতে স্থির থাকিল, যে এবং তদবস্থ পুনঃ ঐ পাতা ছড়ান মাঠের দিকে বড় মায়িক চোখে নিরখিল; এখন দমকা সমস্ত দেহে মোচড় দিয়া আমাদের দিকে ঘুরিয়া জিজ্ঞাসিল, আমি কি জাগিয়া আছি!

নির্ভুল, যেমন আমার কাঁধে এই কন্যা আছে।

তোমরা কি সত্য।

তাহা না হইলে, সবই মিথ্যা হইত আকাল পর্য্যন্ত!

আঃ বলিয়া সে ঢেঁড়াতে কাঠি দিল, ও! তাহা হইলে আমি ঘুমাইতেছি না, আমি তবে সত্যিই জাগিয়াছি, বলিয়া সে মাথাটি অদ্ভুতভাবে ঘুরাইতে লাগিল, এবং উচ্চারিল, এখন সন্ধ্যা তবে! ছেলে, ছেলে কৈ।

ছেলে।

হ্যাঁ ছেলে, ছেলেটি! অঃ কত লোক; মন, বেগোড় করিও না, ঝুট বলিও না, মন তুমি সাক্ষী।

তোমার ছেলে।

ছেলেটির চোখ লাল, আঃ কি সুন্দর সুমুখঠেলা চোখ, পাতলা, চোখের জলে গালে দাগ বসিয়াছে, পাতলা পানা, পরণে গামছা, পেটটা সরার মত খাল, এবং তৎসঙ্গে ঢেঁড়ায় কাঠি দিল, পরক্ষণে কহিল, দেখিয়াছ।

আমি বলিলাম, না।

আহা বেচারী, মন আমার সহিত তঞ্চকতা করিও না, বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, মাথার গামছাটা ঠিক করিয়া পুনঃ বেড় দিল। ঢেঁড়ায় কাঠি মারিল, পুনঃ ছেলেটির বর্ণনা দিল, আঃ কেহ ত নাই, শুধু পাতা উড়ে, তবে, হা মন! ইহা বিস্তারিয়া ঢেঁড়াদার কিয়ৎ মরমে মরিয়া থাকিয়া আবার জানিতে চাহিল, আঃ মন তুমি পিতৃত্বের মধ্যে জাগিয়া উঠিলে কেন হে।

ছেলে! ছেলে! অনেক লোক! তুমিও ত ছিলে, পেট ভরিয়াছে ত! আচ্ছা মাইরী বল, মা কালীর দিব্যি বল, আমার কি পেট ভরিয়াছে...আমি কি খাইয়াছি! সত্য কি অগণন লোক...সত্যই...! বলিয়া সে দণ্ডায়মান হইল! প্রকাশিল, মন, মন, তুমি বেইমানী করিও না।

বটেই এখানে বিরাট কিছু হইয়াছিল, আমি বুঝি, পাতা সকল উড়ে, কাক দেখ!

তাই ত! তবে কেন মন আমারে বুঝায় যে উহা স্বপ্ন...আঃ ঐ ত পাতা উড়ে, নিশ্চয় ঐটিতে আমি খাই! তবে ত স্বপ্ন নহে, আমি ত দিকে দিকে ঢেঁড়া দিলাম।

কত জন সমাবেশ হইল, যাও, খাইও ছড়াইও!

টাট্টু ঘোড়ার উপর বসিয়া নায়েব মহাশয় বলিলেন, আইস্ তোমার মাথায় হাত বুলাইয়া দিব, তোমার

সততা আমার হাতে লেখা থাক, দূর দূর গিয়াছ। গিয়াছ। তোমার জন্যই ইহারা আসিল! কত্তাবাবুর মা উপর হইতে দেখিতেছেন! পরে হাঁকিলেন, ইহা কাঙালী ভোজন নহে, প্রতিজন এক আনা দক্ষিণা পাইবেক!

লোকেরা কত আনন্দ করিয়া খাইবে। সত্যই তবে, সত্য, তবে কেন মনে লয়, কেন বার বার মনে লয়, হা পোড়া কপাল!

এতেক বলিয়া ঢেঁড়াদার স্বীয় গণ্ডদেশে চপেটাঘাত করত নিজেরে গালি দেয়, মরণ দশা! ঘুমাইতে কেন গেল! হায় সব স্বপ্ন হইল! আমার মত দুঃখী আমার মত নিঘিন্নে, হায় কোন পাপে আমার সত্য স্বপ্ন হইল! আমি এই বলিয়া দশ থানা ঢেঁড়া দিব। কে বাদ সাধিল! ও গো মা জননী আমি নেমকহারাম নহি! আমি খাইয়াছি, আমি আমি খাইয়াছি! মন মিথ্যায় নরকেও স্থান হইবে না। তোমরা তোমরা খাইয়াছ।

না।

না! আহা বেচারী! তাহার, ঢেঁড়াদারের, চোখে জল আসিল! এত লোক খাইল তোমরা বাদ কেন, কপাল। তোমরা কি ভাতকে যাতা বল।

ছিছি।

আঃ জান ঐ ভেড়ী উপরে তাহারা দাঁড়াইল, কপাল! কি বা পাতলা চেহারা, কি চোখ। সেই ছেলে!

আঃ আমার অতি বড় শত্রু, শত্রুর শত্রুর তস্য শত্রুর যেন এমন না ঘটে, আমি আমার প্রথম গ্রাস মানত করিলাম!—সেই লোকটির মত নহে যে মানত'এর ভাত মাছে খায়।

খাদ্য মানত করে আবার খায়।

সে কহিল, হ্যাঁ হ্যাঁ বটে প্রথম গ্রাস পঞ্চানন্দ, দ্বিতীয় মা শীতলা, তৃতীয় দক্ষিণা রায়, চতুর্থ বন বিবি! পঞ্চমটি পাঁচ পীর তলা, ষষ্ঠটি পিশাচ সিদ্ধ! সপ্তমটি আঃ মনসামাই—এইভাবে সব। ভাত উৎসর্গ করে, নিজের আর কিছু রহিল না, তখন সে বোকা বনিল, চারিদিকে খাওয়ার মধ্যে সে, আঃ কতলোক আড়ং—তাহার মাথায় বুদ্ধি আসিল, নিজেকে আজ্ঞা করিল, ওরে তুই প্রসাদ পা, লোকটি নিজেই জয় জয় বলিয়া উৎসর্গীকৃত খাদ্য পরমানন্দে খাইতে থাকে! বটে আঃ ইহাতে প্রমাণ আমি খাইয়াছি।

ইহা শ্রবণে, যে ঐ কৃষ্ণতম অবশিষ্ট যে! ইদানীং আঃ ঐ যাহা আছ। তদীয় পা দুইখানি আনন্দে নাচিল এই কথা শুনিয়া! আমিও হাসিলাম।

মন কে কার গোলাম! আমি তোমার না তুমি আমার! এবং ঢেঁড়াদার গম্ভীর হইল।

ঢেঁড়াদার কহিল, তবে সে সৎ, পেটের জ্বালার মানত ভুলে না; হ্যাঁ ইহাতে প্রমাণ, জজে মানিবে যে আমি খাইয়াছি। অথচ বুকে কেন ঘাই মারে। শত্রুরও যেন এমত না ঘটে...দেখিলাম ছেলেটিকে, তাহার মা আর বাপ হাত ধরিয়া চাপিয়া, খাও বাপ খাও বলিতে আছে।

ছেলেটি থু থু করিল!

নায়েব মহাশয় টাট্টুতে আসিয়া জানিতে চাহিলেন, ব্যাপার কি বালক থু থু করে, খাদ্য ছুঁড়ে! খাদ্য কি গ্রহণ যোগ্য নহে। ইহাতে স্বর্গত মা ঠাকরুণ বড় কষ্ট পাইবেন—আমি চিন্তিত হইলাম!

গরীব কাঙালীর মা বাপ!

গোমস্তা কহিলেক, অন্যের বিঘ্ন হইতেছে! বরং উহারে লইয়া উহার পিতামাতা অন্যত্রে যাক।

না তাহা হইবার নহে—বিধি তাহা নহে, ওহে তোমাদের বিঘ্ন হইতেছে, এবং ইহা অনেক কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হইল যে, না।

সকল জনেরা ঘোষিল, না বাবু মহাশয় কোন বিঘ্ন নাই, খাদ্য ছুঁইয়া বলি, পরন্তু উহার জন্য আমরা কষ্ট পাই, আমরা খাই কেমনে, আমরা থ, বেচারা, হা কপাল!

ওয়াক্ বিষ্ঠা বিষ্ঠা মল মূত্র পুঁজ আমি খাইব না!

এই বালক কি এইরূপ!

না বাবু মহাশয় আমাদের অনেক সন্তান আকাল লইয়াছে, এই মাত্র জীবিত, যখন আমাদের কনিষ্ঠ সন্তান, অনাহারে মরিল, মরিবার কালে পান্তা না হয় ভাত খাইব বলে, সেই শুনিয়া এই বালক উদাস হইল।

হা দুঃখ! হা কর্ত্তা মা, একি বিঘ্ন! একি!

এখন কি করা! ঐ দেখুন!

আঁ আঁ ভাত বিষ্ঠা! রক্ত! খাইলে মরিব! নরক! নরক! বিষ্ঠা! ওলাউটা!

বাবু মহাশয়, বলিয়া কিছু অদূরে একজন হাঁটু গাড়িয়া বসিল, তাহাকে দেখা গেল, এবার হাত ঘুরাইতে থাকিয়া কহিল, আমি বুঝিয়াছি, বাবু মহাশয় আপনি উতলা হইবেন না, আমিও বিশেষ কষ্ট পাইতেছি—উহাকে বাতাস লাগিয়াছে, আপনি ক্ষণমাত্র বিলম্ব করুন এবং আমারে অনুমতি দিন, উহা বাতাস, যে সকলেরে বলি, অনাহারে যাহারা মরে তাহাদের...কেহ কেহর মন্দ বুদ্ধি হয়! এমনই ভাবে ভর করে! অনুমতি করুন!

না না উহাতে আকালের মাতঙ্গিনী ভর করিয়াছে, গোঙাইতেছে!

আকাল, আকাল।

এতদূর পর্য্যন্ত বিস্তারিয়া ঢেঁড়াদার গর্ব্বিত কণ্ঠে কহিল, তবে, তবে ত আমি খাইয়াছি...মন ছোটলোকী করিও না, যে ভর করিয়াছে অর্থাৎ যে আত্মা ভূত, বেচারীর নিশ্চয় ভাতের উপর ঘেন্না ধরিয়াছিল, তাই বলে ভাত নরক, গোমাংস!

নায়েববাবু আপনি ঠাণ্ডা হউন! আমার হাত যশ আছে! ভাত লক্ষ্মী, তাহার হেনস্তা সহিব না। আকালের ভূত। হেনস্তা! আমি রোজা (ওঝা), হা কত আশ্চর্য্য! হা আমরাও আকালের মাই খাইয়াছি, তবু ভাতকে। ছিছি মুখে আনাও পাপ। হে বালকের মাতা ও পিতা তোমরা খাদ্য গ্রহণ কর, জোর না পাইলে উহার খবরদারী করিবে কেমনে!

ইহাতে হতভাগ্য বালকের মাতা ক্ষীণ হাসিল, পুনঃ পুত্রকে খাওয়াইতে চেষ্টা করিল!

না খাব, না মাগো তোর রক্ত আমি খাই! বালকের উচ্চারণ—আহ্লাদের অনুনাসিক!

বাছা বাপ্ তুই না খাইলে ইহারা খায় কেমনে, আমার মুখ চাহিয়া খাও ধন!

বালকের জননী সাধিল, প্রকাশিল, হা সন্তান তুই কেন আমার পেটে আসিয়াছিলিস! বাবু মহাশয় অনেক পাপ!

এবং তদীয়, ঐ বালকের পিতা কহিল, আপনারা খাইতে থাকুন! আঃ ভগবানে ইহাকে মারিয়াছে! বড় দুঃখ! বাপ এতদিন পর ইহারাই খাদ্য কেমনে গ্রহণ করেন, দেখ, তোমার দুঃখে কেহ মুখে অন্ন তুলে না। বাপ তুই না খাইলে আমি আর তোর মা খাই কেমনে!

বাবু মহাশয় আপনি নিশ্চিত হউন—আমি উহাকে খাওয়াইব! উহারে খাওয়াইয়া তবে অন্ন গ্রহণিব।

নায়েব সেই রোজার নিকট টাট্টু লইয়া কহিলেন, তুমি দেখ স্বর্গগত মা ঠাকরুণ যেন খুসী হন। যদি খাওয়াতেই পার বকশিস্ করিব! খাদ্য উদ্বৃত্ত থাকিলে তাহা দিতাম!

আপনাকে শত কোটি প্রণাম! আপনি জানেন, ভূত ছাড়ান আমার কাজ, ইহাতে, ইহার জন্য কোন কিছু গ্রহণ করিলে আমার ক্ষয় (সিদ্ধি নষ্ট) হইবে, আমাকে দিয়া কাহারও উপকার হইবে না, ও রোজা নাম ঘৃণার হইবে; আপনি অন্নদাতা বড় মানুষ, আপনার কথা ফিরাইয়া লউন, এই আকাশ ছাওয়া মাই এর তলে বসিয়া বলি আমার লোভ নাই! ভাতে হেনস্তা! ঐ ভূত ছাড়াইব! একের পাপে পৃথিবী কি রসাতলে যাইবে?

তবে আমি খাইয়াছি!

নায়েব মহাশয় কহিলেন, এতেক ভরসা আমাতে প্রাণ সঞ্চার করিল, আহা ঐ মনোরম বালকটিকে যদি খাওয়াইতে পার, আমি নিশ্চিত, মা ঠাকরুণ শান্তি লাভ করিবেন; আহা ছোঁড়াকে গোষ্ঠের রাখালের ন্যায় দেখিতে; বেচারীকে প্রকৃতিস্থ কর! এতৎ বচনের পর তিনি মাথায় জোড় হাত ঠেকাইলেন। ইস্ ভাতের প্রতি অশ্রদ্ধা! তোমরা আরম্ভ কর!

এই কালে গলা ফাড়িয়া, বিকট চীৎকারে ভাতের প্রতি বিধর্ম্মীদের মত, অশ্রাব্য কালাপাহাড়ী মনোভাব অশ্লীল ভাষাতে বালকটি প্রকাশিতে আছিল, তৎ শুনিয়া খাদ্য গ্রহণের সুপ্ সাপ্ শব্দে বাজ পড়িল; সকলে হাঁ হওয়ত নিষ্কম্প রহে; হঠাৎ কোথাও মৃদু কাশির আওয়াজ; হঠাৎ কোথাও বিষম লাগার তড়কা খেলিয়া এহেন হিন্দু সনাতন ধর্ম্ম অনুষ্ঠানকে বিনষ্ট করিতে উদ্যত হইল; শিশু অল্পবয়সীদের হাস্য থামিল; সকলে কহিল, কি বা দুর্দ্দৈব! দেখ পক্ষী সকল টক্কর খাইতে আছে, কি

ভয়ঙ্কর গঞ্জনা! দেখুন আমরা এক কানেই অঙ্গুলি প্রদানিয়াছি, দেখুন বৃক্ষের পাতা সকল স্থির; দেখুন মিঠেন জলের স্তর কোথায় নামিল, ইস্!

যাহার বিষম লাগিল তাহার তড়কা শোনা গেল, উহার মাথায় জলের আছাড় দাও, উহাকে কণ্ঠে আলতোভাবে হাত বুলাইতে কহ! হায় আকাল, হায় আকালের কোপ!

প্রবীণ নায়েব মহাশয় উচ্চারিলেন, তাহা হইলে, এবং তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইল।

গোমস্তারা হাতে হাত কষিয়া নিবেদিল, মহাশয় যদি আজ্ঞা করেন তবে আমাদের দরওয়ানগণ ঐ বালককে এই শুভ মঙ্গলজনক যজ্ঞি কার্য্যের স্থান হইতে দূরে লইয়া যাইতে পারে, নিদেন ঐ ভেড়ীর উপরে; দেখুন ঐ বিষম লাগা লোকটি বুঝি যায়; কি অনাসৃষ্টি!

মহাশয় দ্বিমত করিবেন না, মহাশয় আমরা দেখিতেছি, মাতাঠাকুরাণী অশ্রু বর্ষণ করেন! ইহা এই জন্য উল্লেখ করে, যেহেতু এখনই এখানেতে ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি ছটাক খানেক হইল।

নায়েব মহাশয়, আপন হস্তের উপর সেই বরষণের কণাতে চোখ রাখিয়া প্রকাশিলেন, বেশ তাই কর। তবে দেখ, খুব মর্য্যাদায়, এই যজ্ঞে বিঘ্ন না ঘটে, একে ত ঐ বেচারী এখনও বিষমে কষ্ট পায়।

বল মন, আমার কথা ঠিক কিনা, এবং সে ঢেঁড়া দিল, এবং সেই ছেলেটির বর্ণনা করিল, ছেলেটি রাখাল রাখাল, আঃ স্বপ্ন ত নহে।

দরওয়ানগণ মোচে যত্ন দিল; রোজা উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার খাদ্য হাতে এক ছোট পুঁটলিতে বাঁধা, হুঙ্কারিল, আকালের দাঁড়া আমি ভাঙ্গিব, আমি উহাকে খাওয়াইব, আমার গুরু দেখুন, আমি অমুকের পুত্র, আমি অমুক! ঠাকুরদাগণ—ইহা ঐ দরওয়ানদের সম্বোধিয়া বলা, কেননা তাহারা জাতিতে ব্রাহ্মণ ও ছত্রী (ক্ষত্রিয়)—উহাদের খাদ্য বাঁধিয়া লইতে বলুন।

দরওয়ানগণ অতীব বিনীত ভাবে, পিতামাতারে তদ্রূপ উপদেশ দিল, আহা এ সময় যদি ঐ মন্দভাগ্য বালকের মাতার মুখখানি কেহ বটে দেখিত, সে নিশ্চয়ই বুকে মহাখেদে চাপড় মারিত, আহা! নিশ্চয়ই ইহা স্বপ্ন, নিশ্চয়ই ইহা স্বপ্ন, নাঃ তাই বা কেমনে, দরওয়ানগণ খুবই আলগা করিয়া ধরিয়া, যাহাতে তিলেক কষ্ট না পায়, নানা বচনে ও আওয়াজে তাহারা শান্ত করিবারে যত্নবান হইল, বেটা শান্ত হও! আঃ হঠাৎ আকালের কি শয়তানী! বালক ঐ বিরাট লোকেদের হাত ছাড়াইয়া ছুটিল, সে এক কাণ্ড! ভোজনকারীরা যে যাহার পাতা টিন সামলাইতে উন্মাদ! দরওয়ানরা এবং পিতামাতা দুইজনে, তাহারে ধরিতে পণ করিল; বালক যাহার মুখে ভাতের নিন্দা সে সর্ব্বময় উহাদের এড়াইতে লাগিল, শিশু অল্পবয়সীরা থ! আঃ হঠাৎ সেই বালক যাহারে ব্রজের রাখালের ন্যায় দেখিতে একস্থানে পড়িয়া গেল, ভাগ্যশঃ সেইস্থানের লোকেরা খাদ্য পাত্র হস্তে তুলিয়া থ, বুদ্ধিভ্রংশ হইয়া আছে। রোল উঠিল মার মার শালাকে। এ পর্য্যন্ত বলিয়া ঢেঁড়াদার এক গভীর নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। আশ্চর্য্য যে তাহার ঢেঁড়াতে, ডঙ্কা, উহা রণিয়া উঠিল। এবং আশ্চর্য্য তাহার চোয়াল নড়িল; সে ওষ্ঠ দংশন করিল, জান, সে কথা বিস্তারিতে আমার বুক ছেঁড়া খোঁড়া হয়, ইস্! ভেড়ীর উপর ঐ গাছের তলে, ঐখানে দরওয়ানরা বেড় করিল, মধ্যে বাপ ও মা বালকের হাত ধরিয়া খাড়া; আঃ বলিয়া ঢেঁড়াদার দুহাতে কাঠি সমেত মুখ ঢাকিল, এবার বলিয়া উঠিল, আরে বাবা! রোজা একটু আগুন করিল, শুষ্ক পত্রযুক্তডাল ধরাইয়া দৌড়াইয়া প্রদক্ষিণ করিল, থুতকুড়ি কাটিল, আগুনে পুড়াইয়া ঐ যে গাছ হইতে আধাশুষ্ক খেজুর ছড়ি বানাইয়া লইল, কহিল, দেখ কাঁটা! আর বলিবি! বালক তদ্রূপ বলিয়া চলিয়াছে! রোজার নিষেধ মানিল না, রোজা আমায় কহিল, ঢেঁড়া থামাইও না! রোজা হুঙ্কারিল, তবে রে, খেজুর ছড়ি কষিয়া মারিল! কাঁটা রক্ত ফিন্‌কি দিল।

বিশীর্ণ মাতা পিতা বাঁকিয়া গেল, কহিল, মহাশয় আর মারিবেন না। আমরা উহারে লইয়া অন্যত্র যাই।

ভাতের অপমান, তাই ত আমাদের এই দশা, আমি উহাকে খাওয়াইব—আকাল ছাড়াইব।

যাহারা খাইতে থাকিয়া এই পর্ব্ব দেখিতেই জড় হয়, তাহাদের চোখের জল, আমার চোখে জল, দরওয়ানরা সভয় হটিয়াছে, বালক যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করে, তবু কহে, ভাত বিষ্ঠা, গোমাংস! কাঁউকাঁউ করিয়া কুকুর পালাইল, পক্ষীসকল চীৎকারিছে, হায় তাহার গাত্র বাহিয়া রক্ত ঝরে!

বালকের মাতা পিতা ও নায়েব কহিলেন থাক, থাক!

আঃ ইতঃমধ্যে এক কাণ্ড ঘটিল, ঐ বালক মাতা পিতার হাত ছাড়াইয়া বিষ্ঠা বিষ্ঠা বলিতে ও কাঁদিতে থাকিয়া নদীর দিকে ছুটিয়া গেল; তৎসহ রোজা চীৎকারিল, তবে রে। ভাতের অপমান এবং সেও তাহারে তাড়া করিল কিছুক্ষণ, দুইজনে জলে, দেখিলাম। ইস্। আরে বাপরে! কি পাপ! ভেড়ীস্থ সকলে হায় হায় করিল। নায়েব কহিলেন, উহাদের খাদ্য পুঁটলি জলে ফেলিয়া দাও! হায় মা ঠাকরুণ হা কপাল। এবং সেই ঢেঁড়াদার সজোরে ঢাকে কাঠি দিল, এবং বালকের রূপ বিস্তারিল, অবশেষে উচ্চারিল, মন মন এসব কি সত্য! যে তুমি কাঁধে করিয়া একেরে বহিতেছ ইহা কি সত্য! না স্বপ্ন! আমার আর জন্মের পাপ! তোমরা কি জাগ্রত।

জাগ্রত স্বপ্ন।

হা আমি তোমাদের পশ্চাতে যাইব। ঢেঁড়াদার কহিল, তোমরা এমনভাবে ঠাকুরকে ডাক যেন আমি আমার অতি বড় শত্রুও না ভাতকে গালি পাড়ে, সাত জন্ম হাভাতে হই সেও ভাল! বলিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, আমরা বেশ খানিক আসিয়াছি, হঠাৎ ঢেঁড়াদার তারস্বরে বলিল, হা আমি বুঝিয়াছি তোমরা কে, হা তোমরা আমাদের দুঃখ দেখিতে আসিয়াছ, কি বল মন, চল যাই উহাদের পিছনে, আমি জাগ্রত স্বপ্নের পশ্চাতে যাইব। আমার পাপ খণ্ডাইব।

তখন সন্ধ্যা হইল, যে কন্যা বড় ফাঁকি তাহার নিঃশ্বাসের শব্দ আর নাই; আমি গগন ভেদিয়া আর্ত্তনাদ করিলাম, মাটি চাপড়াইলাম; আমার হাহা রবে দিক প্রকম্পিত হইল, হায় তোমাকে আমি হত্যা করিলাম; বিগত এই আট বছরের প্রত্যহের কথা আমাকে কামড়াইতে লাগিল—আমি উন্মাদের ন্যায় দাপটিয়া ফিরিতে লাগিলাম; বারম্বার কহিলাম তুমি কেন মরণকে হুঙ্কার দিলে না, আকালকে হুঙ্কার দিলে না কেন, যে তুমি হুঙ্কার দিলে অশ্বত্থ গাছ লতা হইয়া যাইতে দেখিয়াছি। প্রতিপক্ষ নেতাইয়া গিয়াছে, হায়! আমি লড়িব কি করিয়া, আমি রোদন করি এবং অশ্রুপূর্ণ লোচনে ক্রমাগত বৃক্ষ লতা পাতা প্রত্যেকেরে স্পর্শিয়া প্রশ্ন করিলাম, সত্যই কি সে মরিয়াছে।

তাহারা, ডাকাতরা আসিল, ঐখানে থমকিয়া দাঁড়াইয়া ধীরে আমাদের নিকট অগ্রসর হইল, তাহাদের মশালের আলোকে কিছু বুঝিয়া কহিল, তুমি কখনই ঐরূপ রোদন করিতে পার না।

দেখ, দেখ, একটা মেয়েছেলে।

বটে, প্রবঞ্চনা কর এই আকালে, তুমি ত রসিকনাগর দেখি, ঐটি কি সাধনসঙ্গিনী।

হা, এই বৃক্ষ কদম্বতরু বটে।

উত্তর দাও।

উত্তর খুঁজি।

কে তুমি সত্য কহ।

সত্য চুকিয়াছে।

ফের, তুমি কে।

সাক্ষাৎ পাপ, মরদের বদনাম।

বদনাম! বাহির করিয়াছ।

খাইতে দিব বলিয়া।

আমার এই উত্তরে তাহারা ভ্রূদ্বয় কুঞ্চিত করত আরও খানিক নিকটে আসিল, সমস্বরে কহিল, ছুঁড়ীর কি হইয়াছে।

মরিয়াছে।

মরিয়াছে। জানিলে কেমনে।

আমি বাঁচিয়া আছি, জবাবিয়া হাহা রবে ভাঙ্গিয়া পড়িলাম, তাহারা আরও আমার নিকটে আসিল, সবিস্ময়ে দেখিল যে, যে কন্যা বড় ফাঁকি তাহার একটি পা আমার হাতে; তাহাদের মশাল আরও নামিল, আমি নিজ হাতের পাতা আলতা দর্শাইয়া কহিলাম, আলতা পরাই, বাপের বাড়ী যাইতেছে ত, দেখ ত সিন্দূর ঠিক দিয়াছি, দেখ ত মশাল আনিয়া আলতা আমি ঠিক দিয়াছি কিনা।

তাহারা বুক ফাটা আঃ শব্দ করিল। জয় মা, জয় মা তুমি ত সহজ লোক ত নহ, সখা তোমার এ ব্যাপারে আমরা কি করিতে পারি, দেখ তোমাকে দর্শনে আমাদের হাত হইতে অস্ত্র সকল চ্যুত হইয়াছে,

আজ্ঞা কর।

আমি তাহাদের পানে চাহিলাম।

তখন তাহারা দৃঢ়তার সঙ্গে কহিল, অবশ্য আমরা বহু পাপ সঞ্চয় করিয়াছি, কিন্তু মা আমাদের পতিতোদ্ধারিণী না হইলে এখানে আনিবেন কেন, তোমাকে দর্শনে কি আমাদের পাপ ক্ষয় হয় নাই, আমাদের কি কোন জন্মের সুকৃতি নাই, দেখ, এযাবৎ আমরা পতঙ্গের উন্মাদনা লইয়া এই শরীর ধারণ করিতে ছিলাম, দেখ আমরা এখন আকাশের সমান্তরাল রেখা বিকীরণ করিতেছি, দেখ বৃক্ষের তৃষ্ণা আমাদের চক্ষুতে জানে। ঐ প্রকৃতি ধন্য! আহা আমাদের চক্ষের জল উহার পায়ে পড়ুক! আকাল, হা আকাল তুমি কোথাও নস্যাৎ হইয়াছ! ইহাদের বচনে আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইল, কহিলাম এবার সৎকার করিতে হয়!

বেশ নৌকা দেখি জলে ভাসান দিব।

না অধর্ম্ম হবে।

এই ব্যাপারে অধর্ম্ম এই আকালে।

ধর্ম্ম ত আকালের তরে।

তাহারা বিস্ময়ে ভ্রূ সটান করিল।

দেখ, বক্ষের আঁচড়।

রক্ত ঝরে যে!

যে কন্যা বড় ফাঁকি সে প্রবেশ করিতে চাহিল এই বক্ষেতে এবং পরক্ষণে এলাইয়া পড়িল। বলিয়াছিল, আমাকে দাহ করিও। অস্থি গঙ্গায় দিও।

সাধু সাধু।

আঃ কিছু দূরে এক মরা বৃক্ষ কাণ্ড আছে, আমরা কাটিয়া আনি।

চিতা নির্ম্মাণ হইল, অগ্নি সংযোগ হইল, মহা ধূম উর্দ্ধে উঠিল।

ইহাতে তাহারা আপন কপাল চাপড়াইয়া কহিল, হায় হায় আমাদের খেয়াল ছিল না, হায় পক্ষীগণ বড় কষ্ট পাইল, আঃ ধূম! ছি ছি এ পাপ রাখিব কোথায়।

তাহারা চলিয়া যাইবার পর এক দারুণ বৃষ্টি নামিল, চিতা ভাঙ্গিয়া গেল, আমি কাঁদিয়া উঠিলাম। অদ্য, অদ্য তৃতীয় দিবসে তোমাদের ভগবান আনিলেন। এখন তোমরা তোমাদের বিবেচনা মত কাজ করিতে পার। এইরূপ কথা সঙ্গে এই দল নিমেষেই তৎপর হইল! ডাকাতরা অজস্র কাঠ কাটিয়াছিল তাহা আনিল। চিতা সাজাইল। পরে অর্দ্ধদগ্ধকে, যে কন্যা বড় ফাঁকি, সেই ব্যক্তি সস্নেহে ঐ চিতায় তুলিল।

এবং একটি দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া অস্পন্দ আছে যখন তখনই হঠাৎ তাহার চক্ষু ঘূর্ণায়মান হওয়ত বিশাল হইল, যে এবং সে অল্পবয়সীর দিকে অগ্রসর হইয়া মারাত্মক জোরে এক চাপড় মারিল, তাহাতে অল্পবয়সী ছিটকাইয়া মাটিতে, মুখ হইতে ছত্রাক বাহির হইল; সে ব্যক্তি কহিল, এত লোভ! ছি ছি! অল্পবয়সী বৃক্ষ কাণ্ডের কর্ত্তিত চেলার গায়ে যে ছত্রাক ছিল তাহা খাইয়াছে, এই অপরাধ। বৃদ্ধ কহিল, এখন অগ্নি সংযোগ করুন। সুন্দর অগ্নি চমৎকার শিখা লইয়া উজর হইতে সেই ব্যক্তি কহিল, আমি কৃতজ্ঞ রহিলাম! আমার জন্য অপেক্ষা করা উচিত নহে, আমি উহার অস্থি বিসর্জ্জনের সহিত প্রাণ ত্যজিব। আর কাল ক্ষয় করা উচিত নহে। ইহাতে বৃদ্ধ কহিল, আঃ আমি যেন এইখানে মরি, আঃ সহজ সম্পর্ক এবং হঠাৎ চিতা হইতে একটি জ্বলন্ত কাঠ লইয়া আপন হাতে চাপিয়া বলিল, এই স্মৃতি থাক!

ইহাতে আশ্চর্য্য যে সকলে মহা আনন্দে আঃ উচ্চারিল।

আঃ!

এখন বনচাঁড়াল গাছের ঝোপের নীচে সেই মৃতদেহ, বনচাঁড়ালের পাতাগুলি বুজিল। তখন সেই মেয়েছেলেটির যাহার হাতের আয়নাদার চূড়ী ভাঙ্গিয়াছিল এখন যাহার একটুকরা তাহার নিকট সেই জোরে, স্মরণে, অনেক কথাই মনে খেলিয়া উঠিল, সে ঐ ঐ কথার দিকে চোখ রাখিয়াছিল যেহেতু অল্পবয়সী যে তাহার সহিত পালা কুড়াইতে আসে, সে বলিল, ও মরিয়াছে, ঠ্যাঙাটা লহ না।

মেয়েছেলেটি কাঁপিয়া উঠিল, ভ্রূ কুঞ্চিত হয়, ইহা কি তাহারই কথা! ভান করিল তাহার যেন বিশ্বাস হইল না।

তখন অল্পবয়সী কহিল, নাড়ী দেখ না। লোকেরা কি মিথ্যা বলিল!

এই প্রশ্নে মেয়েছেলেটি বেজায় অসহায় বোধিল, সে বৃক্ষ হইতেও নির্ব্বোধ হইল; আপন ঘোমটা, যেটুকু, তৎপ্রতি অদ্ভুত নেত্রপাতে দেখিয়াছে, পরক্ষণেই সে ঐ পড়িয়া থাকা লোকটির দিকে তাকাইল, যাহার শীর্ণতা বহুদিনের, ভিখারী কথাটির সম্যক উদাহরণ হইয়া আছে, ইহাতে মেয়েছেলেটির চোখ আশাতীত ক্লান্ত, যে এবং ঝাপসা এখন হইল; ইহাতে সে বুঝিল তাহার নিজের গায়ে রক্তমাংস (!) আছে, যে এবং এখন কোন কাল, ঋতু নিরূপিতে মন করিল; মৃত্যু সে অজস্র দেখিয়াছে, কিন্তু অনেকদিন এরূপ স্বাভাবিকতা পরিলক্ষিত হয় নাই, এখান হইতে কাহাকেও ডাকিলে, যাহারেই ডাকিবে, সে পৃথিবীর যে তল্লাটেই থাকুক, শুনিতে পাইবে।

একে ভিখারী তাহা বাদে মৃত্যু! মেয়েছেলেটি আশ্চর্য্যজনক ভাবে ঝটপটিয়া উঠিল, শত্রুপক্ষ তাহারে দুয়ো দিতেছে, হঠাৎ সে কাটিল, আঃ।

অল্পবয়স্কটি ঈদৃশ আওয়াজে ফাঁকা হইয়া গেল, তথাপি ঐ মেয়েছেলের প্রতি নিরখিল, সে ইত্যাকার রূপ কখনও দেখে নাই; একশোবার ইহা বটেই যে, ভাঙ্গা ছাড়া গতিতে আপনকার মস্তক নাড়াইয়া, একদা যৌবন একদা বার্দ্ধক্য দেখিল, মেয়েছেলেটির ঐ মূর্ত্তি সহ্য করিতে পারিতেছিল না।

তোমারে দেখিয়া আমি তোমারে চিনিতে পারিতেছি না, এই সন্ধ্যা, সমক্ষে মৃত, তোমার ঐ এক লাট জঙ্গল চেহারা, আমি ত্রাসিত আছি, আমি বড় ভাঙা কপালে, আমারে রক্ষা কর, তোমার উদর দর্শাও, আমি নিশ্চিন্ত হই।

হায় কে সেই যে তোমারে এই রহস্যরে হাসিল করিবেক; কাঁকালে কলসহীন মেয়েছেলের ন্যায় অপূর্ণতা আর কি বা হইতে পারে। তবে এই সেই জন—যদিও কলস না থাকে তবু ইহাকে দেখিলে কলস মনে পড়ে—সেই একই মনে হইলেই নিশ্চিন্দি; কিন্তু সেই চেহারা তোমাতে নাই, তুমি এখন তোমার রুক্ষ চুল রাশিতে কি ভয়াল পদ্ধতিতে অঙ্গুলি চালাইতেছ। আয়নার টুকরা আছে ত। বালকের চাহনিতে, এমনই যে, ভাবান্তরে এই মেয়েছেলেটির কানে এই ধরনের কথা ধ্বনিত হইতেছিল; অন্যমনস্কভাবে সে আপনকার অঞ্চল প্রান্তে হাত দিল, গিঁটি নাই, তখনই মহা বিদ্বেষে তাহা যেন ছুড়িয়া দিল; তত্রাচ তদীয় চোয়াল দুর্জ্জয় আক্রোশে নড়িতেছে; শুধু দন্ত যাহাতে আকাল স্পর্শ করে না, দন্ত ঘর্ষণের শব্দ হয়; তাহাতে যম পর্য্যন্ত নতমুখে আছে। সেই মেয়েছেলেটি স্বীয় দেহের মধ্যে এখন সর্প মিথুনের ইচ্ছা বৈ অন্য কিছু না, এই খুলিয়া যায়, এই প্যাঁচাইতে আছে। নিশ্চয় সে বলিতেছিল, আমি থাকিতে মৃত্যু কেমন করিয়া আসে। এবং এমন এক স্বরে ইহা উচ্চারিত যেন বলিল, রক্তগঙ্গা বহিবে। সে কি দূরে সরিতে চাহিল এহেন বিবেচনাতে।

বালক কোন ক্রমে বলিল, চল।

এই সময়েতে মেয়েছেলেটি কয়েকটি চুল, যাহা আপনা হইতে খসিয়াছে, লইয়া পাকাইয়া তিনবার থু থু করিয়া ফেলিল! এবং একটি শ্বাস সুদীর্ঘ করিয়া ত্যাগ করিল, এবং শান্ত চোখে, তথাপি কম্পন আছে, বালকের দিকে নেহারিল! মনে লয় যে সে নিজে এক মহা কর্ত্তব্য কর্ম্মের, প্রতিজ্ঞার অবমাননা করিয়াছে, তখন ধূলিকণা অবধি তদীয় বৃথা আত্মম্ভরিতা, গ্যাদাতে, টিট্‌কিার দিতে থাকিল। এবং রাস্তাতে পতন নিমিত্ত কাপড় কাদা লাগার প্রতি এখন আকর্ষিত হইল।

অল্পবয়সী ঐ দীর্ঘশ্বাস শুনিল; ইহাতে পদদ্বয় উঠিল, নামিয়া থাকে, যেন সে কোন কিছু বিশ্রী মাড়াইয়া অসহিষ্ণু; অন্যপক্ষে সবই পরিচিত অথচ কি পর্য্যন্ত ভয়ঙ্কর! বড় ছোট, বয়স হিসাবে, সবই ছত্রাকার হইয়াছে; সহসা তাহাতে ইহা আভাসিত হইল যে, ভাল করিয়া কুয়াশা আঁটিতেছে, এখন পৌষ মাস, আর কয়েক দিবস পরে মকর সংক্রান্তি। কাছের আলা হইতে, ধান কাটার সময়ে ছোট ছোট আলা যেখানে থাকিয়া ধান চৌকি দেয়, লোক তারস্বরে ফুকারিতেছে। হায় হায় করে।

এক বৃদ্ধ, সাগরসঙ্গম তীর্থযাত্রী মরিয়াছে— কাটা ধানের উপরে! সেও ছুটিয়া গেল। কেহই কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে পারে না!

কেহ বলিতেছে, কাহন খানেক খড় গেল; কেহ, এক রেক ধান গেল; কেহ প্রকাশিল, এখানে শুইতে

দিলে কেন! কেহ, অমঙ্গল হইল। কেহ বলিল, এই এক পক্ষীর গোলা পায়রা, ঝাঁক্‌ড়ে বিতাড়িত কর; কেননা উহারা ঐ মৃত তীর্থযাত্রীর প্রায় মাথার নিকটে ধান খায়।

কেহ বলিল, হায় গো ইহারেই কহে পূর্ব্বজন্ম, স্বর্গের দরজার নিকট আসিয়া মরিল!

সেই অল্পবয়সী ঠায় একভাবে ঐ মেয়েছেলেটির উদর নিরখিতে আছে অবস্থাতে ছিল; যেহেতু সে মাথায় ছোট অতএব সাধারণভাবে দৃষ্টি করিলে ঐ হয় তদীয় নাগাল! ইতিমধ্যে অবশ্য সে অন্যান্য দিকে ঝাঁকি দৃষ্টিতে চোখ দিয়াছে, কি বা শত্রু ভাবাপন্ন ঐ অচেনা অন্ধকার। ঐটি একমাত্র দিক বা স্থান ঐ উদর, বড় নির্ভাবনার! সে ঐ উদর ছুঁইয়া থাকিবে।

সমক্ষে মৃত দেহ, ইহার ধারে, আপনকার বিপরীতে অল্পবয়সীর হাঁদা চক্ষুর্দ্বয়—ঘনীভূত আবছায়া হইলেও এই মেয়েছেলেটি মালুম করিল; নিজ কর্ণে ঝিল্লিরব ভেদিয়া সর্প কর্ত্তৃক ব্যাঙ ধরার আওয়াজ—ইহাতে তাহার মনে লয় যে পায়েতে এঁটেল পাঁক, সাত বাস্‌টে হিম লাগাতে, উরুদ্বয়ে ঘা হইয়া গিয়াছে! পুনঃ সে ঐ অল্পবয়সীর চাহনি লক্ষ্যিল—বড় শরণাপন্ন যাহা।

যে এবং তদ্দ্বারা পরিচালিত, তদীয় উদর ডাকিবার হা হা শব্দে মোচড় দিয়া উঠিল; সে মাভৈয়া চারিদিককে ত্রাসিল; এই সেই মেয়েছেলে, অন্ধকার যাহার পদ নখ এস্তেক উরু ভেদিয়া ত কা কথা কেশ অবধি স্পর্শ করে না! আঃ সে নিজের উদর দেখিতে ইচ্ছা করিল, ইহা সৃষ্টিতত্ত্ব! ঝটিতি তত্ত্ব সে গঠিত, কল্পিত, নির্ম্মিত কাল্ট-এর রমণীত্বকে ইদানীংকার একই দেহতেই থাকিয়া ভর করিল। এবং দাঁতে দাঁতে ঘর্ষণে এমন শব্দ করিল, যে ইহা শ্রুত হইল, যে ইহা ত কথা ছিল না। এই ছোটলোকমী, এই অবস্থাতে যে এবং বড় খেদে ঐ ভিখারীর মরদেহের প্রতি নেহারিল।

তুমিও ইহারে চিন?

হ্যাঁ আমার ভাসুর হয়! স্বামীর বড় ভাইকে ভাসুর কহে, তাহার সহিত উপগত হইলে ভাসুরভাতারী বলে, ভাতার অর্থ স্বামী, ভর্ত্তা! এবং পরক্ষণেই স্বরকে প্রকৃতিস্থ করত কহিল, প্রতি হাভাতে কেন বলি সবাই আমার চেনা। কিন্তু কেন যে ঐ মৃতদেহ তাহারে টানিয়া রাখিয়াছে তাহা লইয়া সে তর্ক তুলে নাই।

সারা দুনিয়ার। ইহাতে সে নিশ্চয়ই সহজ হইতে চাহিল।

নিশ্চয়।

আশ্চর্য্য! তাহারাও তোমাকে দেখিলে চিনিতে পারিবে।

এই মেয়েছেলেটি একটু গাম্ভীর্য্য ধারণ করিল, এখন সেই নয়ন যাহা উর্ব্বরালক্ষ্মীর ন্যায়, বাঙলার সর্ব্বত্র পটোরা ঐ ধাঁচ মনে রাখে, হইয়াছে এই কারণ যে এই স্থান হইতে এক মহা সন্দেহ ঝামরাইয়া উঠিতেছে, সে দেখিল, তথাপি উহা মান্য না করিয়া উত্তর দিল, অবশ্য আমি যদি চেনা দি। আর সে তবে কেন এইখান হইতে যাইতে পারিতেছে না! কপালচুরি কথাটি তাহার কানে আসিল—যাহা সেই মেয়েছেলেটি যাহাতে আকাল প্রবেশ করে নাই সে বলিত। অন্যের গল্প সে আত্মসাৎ করিত। প্রথম যদি শুনে তাহা হইলেও বলিত, ও গল্প আমার, দিদি কপাল চুরি কর। কপাল চুরি কথাটার সঙ্গেই সে ঠাকুর ঠাকুর বলিয়া উঠিয়াছে। তাহার সমস্ত প্রত্যঙ্গ বেশ চঞ্চল হইয়া উঠিল।

ওই মেয়েছেলেটি যদিও জবাব দিতে ছিল তথাপি তাহার শ্রবণ শক্তি বহুদূর অবধি গিয়াছে; পাখীর বাসার শব্দ, এখনও যে বহুদূরের এরোপ্লেনের আওয়াজ সে শুনিতে পায়! বারম্বার মনে হইল কি ভয়ঙ্কর সন্দেহজনক এই স্থান, এত গাছ পাতা নদীনালা জীবজন্তু অথচ সন্দেহকে উৎখাত করিতে পারে নাই। সন্দেহ ভঞ্জনের নিমিত্ত যাহাদের আয়ুষ্কাল! একবার রোষে তাহার থুতকুড়ি কাটিতে ইচ্ছা আসিল, ইস্ এখনই লোকটির ঘাড়ে পড়িত। নিজেরে সামলিয়া সে আলস্য ভাঙ্গিল, আশ্চর্য্য! ঠাকুর খাইতে না পাই সে ভাল, তবে যেন এমন বেঘোরে মারিও না।

মাইরী জীবনে শালা ঘেন্না ধরাইয়া দিল। এহেন পাকা কথা অল্প বয়সীতে নিকটস্থ আঁধার ও মেয়েছেলেটির দিকে চাহিয়া বলিল; যাহার কারণ অবশ্যই বিচার হয়, সে গা ঝাড়া দ্বারা স্বীয় জড়তাকেই সাফ করিতে চাহিয়াছে।

ইহাতে মেয়েছেলেটি বিধি ছাড়াই, সংস্কার ও স্বভাব, নিঃশ্বাস সহজেই ত্যাগ করিতে পারিল, ইহাতে দেহ হইতে জ্বর যাইবে; কিন্তু দুই হাত এখনও দশাসই, উপস্থিত এক গুগোগ্‌লা ত্রিভুবনকে, সে

আপনকার কোলেতে সাপটাইয়া রাখিয়াছে; সে স্ত্রীলোক, প্রকৃতি, যাহা নিজস্ব জৈব ঘটিত নৈতিকতা; চৈতন্যে জানিয়াছিল।

পুনঃ এখন তাহা পূর্ণ মাত্রায় লভিতে আপন অভিজ্ঞতা স্মরণিল, আঃ ঐখান হইতে এক গীত আসে, ঐ মৃত গীতের উৎস।

বড় আশা করে এ দেহ পিঞ্জরে

বেশ শুনিতে ভাল লাগে, বড় নিঙড়ায়। কোথায় এই লহরা শুনিয়াছে।

হঠাৎ এক্ষণে তাহার ঐ মেয়েছেলেটির, যাহার কাছে চূড়ীভাঙ্গা আছে, ওষ্ঠদ্বয় মহা কোপে উঠিল নামিল, নিশ্চয় বলিতেছে, ও।

ঈদৃশ মননে অজস্র সম্পর্ক সকল বিশদ হইয়া গেল, তাহার নাভি টনটন করিয়া উঠিল; সমস্ত কিছু মাগো মাগো বলিয়া ছুটিয়া আসিতেছে, এক বিরাট আবর্ত্তের সৃষ্টি হইল, বস্তু সকল শব্দ, ক্রমে ইষ্ট মন্ত্র, নাভিতে মেরুদণ্ডে আঘাত করিল!

ইহাতে ঐ পড়িয়া থাকা মৃতদেহ হইতে ঘড়ঘড় নাভিঃশ্বাস শ্রুত হইল! একি ঘোর—ঠাকুরের কৃপা যে আমাদের মেয়েছেলে পাঠক নাই!—ঐ মেয়েছেলেতে উপস্থিত; সে অজ্ঞ হইতেছে, সে মূর্খ হইতেছে, কিন্তু তথাপি আপন মনে জাগতিক ভাবে কহিল, ও তামাসা। তামাসা। খানকীর ছেলে। বড় আশা করে এবং ঐ মেয়েছেলেটি, যে অলৌকিক, সত্বর আপনকার ট্যাঁকে হাত দিয়াছে, সেখানেতে একমাত্র মেয়েলী আকর্ষণ ছিল; অর্থ, ইহা 'আমার' এই বলার নিমিত্ত ছিল, সেই চূড়ী ভাঙ্গা টুকরা ছিল। সেইতে আয়না আছিল।

কিন্তু নিগূঢ় চৈতন্যে, এখানে সে 'আমি' বলিতে পারে; এই আমি সেই—যে মনবুদ্ধির ইন্দ্রিয়র ত বটেই, জয় মাধব। অগোচর, জাগিয়া থাকে; যে পেটে আসা শিশুকে রোদন শিক্ষা দেয়। সেই আমিতে এই নশ্বর দেহ রহস্যময় ভাবে বঙ্কিম হইল!

সেই, যে আমি এই মেয়েছেলেটিতে পৃথিবী নিদ্রাভিভূত, নিশাচর নাই, সাগর জলকণা, স্খলিত তারকা স্থির কেন না মা জঠরের শিশুকে কান্দিতে শিখাইতে আছে। কেননা তিনি যেন না বিস্মৃত হন, তিনি মা; তারা ব্রহ্মময়ী মাগো এই অনুভব লিখিতে মদীয় চোখ জলে ভরিল। এই শুদ্ধ অশ্রুই কারণ। জয় রামকৃষ্ণ। গো আনন্দময়ী আমায় নিরানন্দ কর না।

মেয়েছেলেটির কাছে অল্পবয়সীর ঐ মন্তব্য উল্টাইয়া পাল্টাইয়া অত্যাধিক অশ্লীল কথাতে স্পষ্ট হইল। এবং সে আপন ইজ্জত রক্ষা নিশ্চয় কর্ত্তব্য বুঝিয়া, অতীব রূঢ় দৃষ্টিতে বক্তার দিকে চাহিল, এবং ডালপালার মোট শুষ্ক লতার দ্বারা বান্ধিতে কালে, জিজ্ঞাসিল, এই সব কথা কোথায় শিখিয়াছ, জীবন ক্লেচ্ছা! এই সময় সে কিছুটা ভীত বা কায়িক দুর্ব্বল, নিশ্চয় ঐ ছোঁড়ার সোমত্ত ভাবভঙ্গী ও স্বর তাহারে, মেয়েছেলে, হিসাবে কণ্টকিত করে, যদিও সে ইদানীং এক স্ত্রী দেহের ঘষা গল্প মাত্র, তবু সৃষ্টিতত্ত্ব জাগিয়াছে এবং ঐ ভার মাথায় লইয়া রাস্তা খুঁজিতে বাধা প্রাপ্ত হয়।

কেন সেই যে সেই মাগ্‌খোর বলিল! এবং কিছুটা গলা চড়াইয়া কাহারও মৃত ভিখারী উদ্দেশে বলিল, আঃ শালা আমাদের রাস্তা খাইলে পেট ভরিবে! মামদোগিরি!

ছিঃ ছিঃ!

কেন শালা কি শুনিতে পাইবে! রাস্তা খায় কেন! আঃ এই যে ভেড়ী!

হা বটে! রাস্তা খাইবে! আঃ শালা!

আবার!

ও, তুমি তখন সেবা দিলে বটে!

ও উহাকে! উহারে, যাহারে বলে কর্ম্মক্ষয় হইয়াছে!

এই সব শব্দের মধ্যে বিরাট মাঠের হাওয়া ছিল, দূরান্তের হংস, সন্ন্যাসীর উদাত্ত কথা 'আনন্দ মে রহ!' আছে; সবই এখন সেই শীতের মোটা কুয়াশার পরত, স্তরে, সকলের মধ্যে ভাস্বর রহিয়াছে! এ সকল নিশ্চয় তাহাতে অল্প বয়সীতে, চোরা প্রবেশ করিল, ফলে সে শুধুমাত্র শীতের কম্পনেরে অনুকরণিল, চরিত্র চাহিল, জিজ্ঞাসিল, মানুষ মরে কেন!

বাপের জন্য! মায়ের জন্যেও! এই উত্তরে সেই মেয়েছেলেটির কণ্ঠস্বর এমন যে স্পষ্টতই বুঝায়, যে

সে চটিয়াছে!

ইহাতে অল্পবয়সী আপনার মধ্যে ও হাতের কোথাও দোষঘাট আছে বা নাই, সন্দেহ করিতে প্রয়াসিল, যদিও এখন আঁধার! এবং তাই স্বপক্ষে নিবেদিল, মনে হইল প্রথমে লোকটা লুকিয়ে লুকিয়ে ঘুমাইতে আছে, আমি ভাবি বটে ভাত ঘুম। আচ্ছা বাবা! তখন তুমি কি মূর্ত্তিই না ধরিলে, পৃথিবী যেন রসাতলে যাইবে, ঐ লোকটা কি তোমার সতীন! থুড়ি সতীন পো!

ঈদৃশী মন্তব্যে মেয়েছেলেটির গায়েতে কেমন সিঞ্চিড়া খেলিয়াছিল, সে তখনই হস্তধৃত ডালপালার মোট সামান্যই জব্দ করিয়া আরও ধীর গতিতে চলিতে আছে; এই ঝাপসাতে সে এখানে সেখানের নিগূঢ় অন্ধকার প্রত্যক্ষিল, যাহাতে সে অবাক স্বরে, বেচারী! বলিয়াছিল; পরক্ষণেই আপন ওষ্ঠ দংশন দ্বারা চাপিল; কেন যে ইহা তাহার কাছে স্বচ্ছ নহে; মোটাভাবে যাহা নিজের অপটু দেহের অস্বস্তি বুঝিল, নিজেরে জবাবিল, ভীমরতি!

এ ক্ষেত্রে উহার আওয়াজ নির্ঘাৎ নহে! প্রতিটি পদক্ষেপেই তাহার খটকা লাগিতেছিল, সে কোথাও বিকটাকার আশ্চর্য্য কেননা অল্পবয়সীর কথা কি বিশ্রী, ইচ্ছা গেল এখনই উহারে চাপড় মারিতে; যে এবং পরক্ষণেই সে অন্যমনস্ক হয়, নিশ্চয় সে মীমাংসা করিল, পেটে ভাত নাই তাই এত আমি কথা ভাবিতেছি।

ঐ অল্পবয়সী, যে হয় চপলমতী, তখন খাইবার শব্দ করিতে হদ্দ হইতেছিল, চাকুম চাকুম এবং অবশ্যই সে ঈদৃশী সুর করে যাহাতে জানা যায় যে সে সুরের মিল, ছন্দ মিল, খুঁজিতে উৎসাহী আছে।

মেয়েছেলেটি আপনকার সম্পর্কে নিজের উক্তিতে ঐ তাচ্ছিল্যেও স্বাভাবিক নয়; যেহেতু সে নিজের গোপনতাকে, যেন সে শয়তান, ইহা ফাঁস করিয়াছে! অতএব একবার মনেতে কহিল, দুঃ মরণ! আমি গাছ পাতা ছাড়া কি বা! আমার মাইতে দুধ কই! আমি বট বৃক্ষের কাণ্ডে, বক্ষ স্পর্শ করিব! এবং হঠাৎ থমকিয়া জিজ্ঞাসিল, কিসের সর সর শব্দ!

এখন নাই।

আবার দুজনে চলিল, মেয়েছেলেটি কহিল, ঐ শোন!

আঃ এই ঠ্যাঙা গাছটায়!

ঠ্যাঙা মানে। তখনই নিজের অভ্যন্তরে শুনিল, একদা ফেন দাও শ্রবণে তুমি অচৈতন্য হইয়াছিলে।

এই ত।

ও! এই সন্ধ্যায়, প্রায় গত, সব কিছু প্রকৃতি তত্ত্ব মেয়েছেলেতে ওতঃপ্রোত হইল! খানিক সে দাঁড়াইয়া পড়িল, কিছুক্ষণের জন্য, এবং রোগা অঙ্গুলি সকল গাত্রের বিবিধ স্থানে বুলাইয়া, যে নিশ্চিত এমন, কোন বিশেষ স্থানে, কিছুকে—অনুভূতি চেতনা বলাই ঠিক, গোট করিতেছিল; ইতিমধ্যে সে চকিতের জন্যই উর্দ্ধ কোণে তির্য্যক দৃষ্টিপাত করিল, অবশ্যই ইহার বাচিক অর্থ এই দাঁড়াইবার যে, মরণদশা! আমার কি যেন হইয়াছে। ছিঃ ভুলিলাম যে শুক্লা ষষ্ঠীর রাত দ্বিপ্রহরে ধান ক্ষেতে দাঁড়াইয়া, সবুজ ধান তিনটি মাথায়, তিনটির দুধ টিপিয়া বক্ষে, তিনটির দুধ টিপিয়া ভ্রূমধ্যে, চোখে, নাসার পুটে, কানের থুপিতে, জিহ্বাগ্রে! হায়! তখন কেহ যদি দেখিতে পায়, জিজ্ঞাসা করে, কে ঐখানে! এবং তাহারে তিনবার প্রশ্ন করিতে হইবে! তখন উত্তর দিবে মনেতে! মাটির চোরা দুধে যার বুক ভরে যায়!...হায় সেই কথা ভুলিলাম!

এবং সে আপনাকার বক্ষদ্বয় দেখিবারে সচল হইল, নিজের কর্ণেই স্বীয় কণ্ঠস্বর এবার শুনিল, ভীমরতি! কিন্তু পরক্ষণেই, আপন বুক দেখিল, সেখানে যেন নৈতিকতার বাস, সেই জোরেতে জিজ্ঞাসিল, কি বলিতেছ। ইহার মাদুলী নড়িল।

সেই যে, সেই, ঐ লোকটার ঠ্যাঙা! এই জবাবটুকু দিয়ে নির্ভাবনায়, অর্থাৎ ঈদৃশী বুঝায় যে সে খুবই বুদ্ধির কাজ করিয়াছে—আনন্দতে গাহিয়া উঠিল; হদ্দ কল্লি পদ্মদিদি, অম্বলে দিলি আদা!

হাঃ, লোকটার ঠ্যাঙাতে কি কাজ হবে! বল! লোকটা স্বর্গে যাবে! ভিখারী বেটা! অবশ্য পুণ্য যদি কিছু করিয়া থাকে! আমি ত উহার থলি হাঁতড়াই নাই।

কেহই হাঁতড়ায় নাই, হু! এসময় তাহার মনে আসিল যে তাহাদের লোকেরা যখন দরজাস্থ

লোকেদের ধমক দেয় তখন এরা জানিতে চাহে, আমরা কি করব, আমরা কি খাব।

স্বর্গ!

স্বর্গে লোকে ভাত দিয়া হাতে মাটি করে! শৌচের পর দেশীয় আচারে বাম হস্ত মাটি দ্বারা সংস্কার বিধেয়।

ফেলিয়া দাও ঠ্যাঙা গাছ! ভিখারীর না, সে পা কাটা নয়! সে যেমন বাঁচিল।

অল্পবয়সী বালক কেবল মাত্র ঐ বচনে থমকিয়াছে, এখন সে আরও জোর গতিতে চলিতে আছিল।

ছিঃ ছিঃ! এইমত ধিক্কার মেয়েছেলেটির দ্বারা উচ্চারিত হয়; কোন অন্যায় ঠাওর করিতে পারিয়া সে আপনি নির্ম্মল হইবে! এবং নিজেরে শুদ্ধ রাখিতে মতি ও জোর লভিল; অদ্ভুত ভ্রূ ভঙ্গিমায়, উচ্চবর্ণে যাহা শোভা পায়—নাসার পুট স্ফীত করত বলিল, তোরা জাতে কি! ছিঃ ঘেন্নাপিত্তি নাই! ইদানীংকার ঝাপসাতে ইহা ঝিল্লিরব উজাইয়া গেল।

অল্পবয়সী বালক সোমত্ত লোকের ন্যায় তড়পাইল, হা হা আমার বাপের শ্রাদ্ধের জন্য লই! এবং সে মহা ক্ষিপ্ত হওয়ত সেই ঠ্যাঙা গাছটা ফেলিয়া দিল!

লাঠি গাছটির পতনের শব্দে মেয়েছেলেটির গায়েতে রোমঞ্চ দিল, সে তৎক্ষণাৎ বস্ত্র খণ্ড দেহে সম্ভবত চাপা দিতে ব্যস্ত হইল! ইস্ কতদিন হইল সে মাথায় ঘোমটা দেয় নাই, অর্থাৎ দিবার প্রয়োজন বোধিত হয় নাই।

এই ঘোমটা না দেওয়ার কারণেতে মেয়েছেলেটির বেদম খেদ হয়, কতগুলি আলোকিত ঝাপ্‌সা ঘষা ছবির পরেতে এক সীম গাছ দেখিয়াছে, যাহা ঘরের চাল বাহিয়া উঠিতেছে, হায় এই মেয়েছেলে যদি উচ্চবর্ণ সম্ভূত হইত তবে নিশ্চয়ই তদ্দর্শনে গললগ্নীকৃত বাস হইত—অঞ্চলের প্রান্ত এক কোণ কণ্ঠ বেড়িবে হস্তদ্বয় দ্বারা ধরা, ইহা মহাভক্তিতে শ্রদ্ধার দেশীয় রমণীগণ করিয়া থাকেন! এখন এইপ্রকার মনোভাবেতে থাকিতে তাহাতে ক্বচিৎ হর্ষ উপস্থিত—চকিতে উপজিল, হায় তারপর একদিন হঠাৎ কপাল মন্দ হইল! এবার সে কিছু, ঐ লাঠির কারণে, গম্ভীর স্বরে বলিল, ভিখারীর জিনিষ ত বটে। ইহা প্রকাশিত সমর্থিয়া সে নিজেরে স্বতন্ত্র অনুভবিয়াছে।

তবে ত আমার গায় মাংস লাগিয়ে গেল! আমরা একেবারে লাট ম্যারানটিন! ইহা বলিতে সে, অল্পবয়সী যে, আপনকার মান বাঁচাইয়াছে।

সেই মেয়েছেলেটির নিকট সেই ব্যক্তির চোয়াল আভাসিত হইল; সেই যে মৃত পত্নীরে লইয়া বলিয়াছিল, সেই যে, সেইজন যে সেই তিনজন কুঠারধারীদের সাহায্য চাহে নাই, জানাইল, তোমাদের সাহায্য লওয়া যুক্তি সঙ্গত নহে।

তবে কি পচিবে! সোনার দেহ! কুঠারধারীরা মুখের পার্শ্বে হাত রাখিয়া প্রকাশিল।

যদি লেখা থাকে! আমার কোলে পচিবে।

বাধা কোথায়!

তোমরা পরস্ব লুণ্ঠন করিতে যাও।

মিথ্যা নহে! কিন্তু!

কিন্তু নাই!

আমাদের কি কর্ত্তব্য!...ইহারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শিল, পরে ঘোষিল বেশ সেই কথা জাহান্নামে যাক! পাপক্ষয় হইল ত এখন কি করিব, আজ্ঞা কর।

এতৎ স্মরণে মেয়েছেলেটি অধিকন্তু ইহার শেষে শুনিল, পদশব্দ! কিবা পরমাদ্ভুত ইহা, অন্তরীক্ষ সিঞ্চিড়া লভিল, যে এবং চোখ ছোট করত মন্তব্যিলেক, ভিখারী বটে! এবং এই কথাতে ঘৃণা ছিল না মায়া ছিল, ইহা স্পষ্ট হয় না; অথবা বালকটিরে ভর্ৎসনা করা হইল!

যাহা উক্তিতে তখনই অল্পবয়সী স্বীয় হাত প্রত্যক্ষিতে ইচ্ছিল; হাতের নিকটে কয়েকটা জোনাকি অতঃপর দর্শনেতে দৃঢ় হইল; হাঃ হাতে কিছু, ভিখারিত্ব, লাগিলে, তবে কি জোনাকি এতেক নিকটেতে আসিত! এবং নিজেরে তৎসহ দুঃখী সাব্যস্ত করণে অধিকারী হইল আর যে প্রথমেতে খানিক গোঁ গোঁ শব্দের পরে বলিল, কখন থেকে (!) শুকাইয়া আছি! বেচারী কতদিন কবে হইতে শুকাইয়া আছি, বলে নাই! পেটটা পড়ে আছে, পা চালাও না।

ক্রমে তাহারা নির্দ্ধারিত স্থানে আসিতেই, অন্যরা মহা আহ্লাদে ফাটিয়াছে, আরে আরে তোমাদের কি ব্যাপার! তোমরা কি হ্যাঁ। আমরা যারপরনাই ভাবি! ভাবি, বলি, উহারা মায়ে পোয়ে গেল কোথায়!

এখন এই 'মায়ে পোয়ে' এই বেভূঁইকে সুন্দর করিল, এখন তাই লাগিয়া কয়েকটি ভারী আমুদে হাই তুলিবার আমোদদায়ক শব্দ হইল! মেয়েছেলেটি ঐ কথাতে আপন অঞ্চল হাঁতড়াইয়াছে! এহেন আবছাতে জনাজাত নিজেই দারুণভাবে ওতঃপ্রোতিয়াছে, যাহা নিখুঁত, যাহা অবলোকনিবার! অল্পবয়সী এখন ঐ মায়ে পোয়ে শব্দে, শব্দটির যেন স্তন আছে, চাকুম চাকুম! করিতে থাকিল! হঠাৎ সুর করিয়া জানাইল, আমরা একটা বেশ মোটা গোছের ঠ্যাঙা পাইয়াছিলাম।

আমরা নহে। উহা পা কাটা ভিখারীর! মেয়েছেলেটি অবজ্ঞাভরে উচ্চারিল।

পা কাটা! ছিঃ ছিঃ! সেকি রে!

মৃত!

মৃত! দূর হ। হ্যাঁ লই আর কি! সাত জন্ম ভিখারী, হ্যাঃ পাত কুড়াই! দূর দূর...তাহা হইতে না খাইব সে ভি আচ্ছা!

তুমি কি প্রকার ছিঃ। গঙ্গাজল গঙ্গাজল গঙ্গাজল!

কি ভাগ্যে আনয়ন কর নাই...আগুনটির কি ব্যাপার! ইত্যাকার মনোভাব প্রত্যেকে ব্যক্ত করিল! সকলেই উনুনের উপরে রন্ধনের পাত্রর প্রতি তাকাইল।

আমার মন লয় ভাত টিপ হইবে! টিপ অর্থ সুসিদ্ধ না হওয়া চাল।

হেঃ খুদের আবার টিপ!

ঠ্যাঙাটা আনলে কি হইত, মামলা রুজু করিত।

হাত ধুইয়াছিল, ইহা অল্পবয়সীর উদ্দেশে বলা হইল।

ধুইব!

বলে ভিখারীর সামগ্রী! মামলা রুজুর কথা নয়!

এতক্ষণে শালা কোথায় ওয়্যাঁ ওয়্যাঁ করিতে আছে।

হ্যাঁ রাজার ঘরে জন্মাইবে নিশ্চয়, যদ্রূপ কষ্ট পাইল! দীনদয়াল তুমি তাই কর।

শালা, পালা না পাতকাঠি। আর অল্প একটু, এখনও সময় আছে। এবম্বিধ শেষের, অবহিত ছলের, উক্তিতে অনেকেই স্বীয় কাহিলতার মধ্যেও তাচ্ছিল্যভরে আগুনের প্রতি তাকাইল।

শালা জীবন হয় এক কেচ্ছা। খাওয়ার মাথায় ঝাড়ু মারি।

শাল্লা। হ্যাঁ তুমিও যেমন, সে এখন সোনার খাটে গা রূপার খাটে পা। ইহা প্রকাশিয়া একটি মেয়েছেলে সমবেতদের দৃষ্টি আকর্ষণিল, তথাহি সমবেতদের মনকে আঁখি ঠারিতে অবশ্য না, যাহারে বলা যায়, সহজ করিতে প্রয়াসিছে।

আগুনের শিখা নাই; এখন এক মেয়েছেলে উনুনে ফুঁ দিল, ইহা করিতে যাহার মুখ অনেকটা মাটি ঘেঁষিয়া, কিন্তু আঁচ খুব একটা উঠিল না। আর সেই অল্পবয়সী ছেলেটি উনুনের কাছে, ঘাড়ে, বসিয়া সে টিনের, একটি টিনে চাল মিশ্র খুদ ও জল দেওয়া—প্রতি ঠায় নজর করিয়া, এখন কর প্রসারিত করে, আওয়াজিল, ভাব। ভাব। (বাষ্প)। যে এবং পরক্ষণেই উর্দ্ধপানে তির্য্যক নিরখিল যে চাঁদের আলো ভেদ করিয়া আসিতে কত দেরী। এবার সে অঙ্গুলি ডুবাইল, এই কাজ এমত চাতুর্য্যে ঘটাইল, যাহা প্রমাণিবে উহা, ঐ অঙ্গুলি চালনা, আপনকার অজানিতে সম্ভবিল। হঠাৎ এই অন্ধকার মধ্যে তদীয় গণ্ডদেশে এক কেঠো চপেটাঘাত পড়িল; তৎসহ এই উক্তি শ্রুত হইল, নোলা একেবারে মুখাইয়া আছ; তর সহিতেছে না। আঙুল ডুবাইয়া খাইতেছ।

বল কি। শালা একে আগুন নাই, তাহার উপর এই কাণ্ড। কথায় কি যে অর্থ হয় তাহা খেয়াল নাই, মার মার শালাকে। ছিছি। এরূপ নোলা।

আর একে শাপমন্দ করিল; শালা শেয়াল কুকুরের ঘরে.. এ পর্য্যন্ত বলিয়া থামিল, বাক্য ঠিক হয় কি না বুঝিতে; কেননা এই কথা, সেই ব্যক্তি যে তদীয় এ কন্যা বড় ফাঁকি-রে চোখে রাখিয়াছে তখন, মহা অকোচে ঝঁজিয়াছিল, শালা বেজন্মা, পোড়াইবার কাঠ হইতে ছাতা খুঁটিতেছ (ছত্রাক—ব্যাঙের ছাতা) শালা শেয়াল কুকুরের ঘরে জন্মাইতে পারিলে না, এত লোভ! মনুষ্য জন্মে ঘেন্না ধরাইয়া দিলি। হায়

ইহা বড় উচ্চঘর আগত বিচার—হায় বেচারী! এমন রাক্ষুসে নোলা। তখন, এমত বাক্য যাহাদের বস্ত্র ছেঁড়া অথচ লজ্জা যাহাদের ভূষণ তাহাদিগের নিকট শুদ্ধ বস্ত্র রূপেতে পরিগণিত হইল; পুরুষগণ, হাকিমের কলম মানিয়া সুন্দর হইল।

জল যদ্রূপ ঠাণ্ডা এখন মনে হয় খুদ কটা চিবাইয়া শুইয়া পড়িলে হইত।

যতটা পালা আছে...তাহাতে হইবে কি! ভগবান জানেন!

এই পর্য্যবেক্ষণ কেহ গ্রাহ্য করিল না বুঝিয়া, সেই মেয়েছেলেটি পুনঃ উহা ব্যক্ত করিতে সে একটি শ্বাস টানিবার কালে, আপনার দেহের এখানে সেখানে যে চাঁদের আলো তাহা হইতে দেহকে সরাইয়া লইতে চেষ্টা করিল; আলোকে তাহার সমীহ হইয়াছিল—আলো! কেননা আগুনকে সে অনেকবার এই জীবদ্দশায় নমস্কার করিয়াছে—কিন্তু কেন এত যে, তাহা সে চুটাইয়া ভাবিতে জানে না, অথচ সে ধীর কণ্ঠে কহিল, ঐ পালাতে ধোঁয়ায় চোখের জলই পড়িবে। এবং ইহাটুকু বলিতে কেন অন্ধকার প্রয়োজন হইল! সে আঁচল দিয়া চোখ মুছিতেছে।

ইহা অন্যদের মর্ম্মতে লাগার সহিতই, তাহারা সবাই চাড়া দিয়া উঠিতে গিয়া জানিল যে তাহারাও অন্ধকারে মুখখানি অন্তত লইয়াছে।

তবে!

তবু ঐ 'তবে' শব্দে কোন জোর ছিল না। কেহ খেদ করে, আমারও মা বাপ বৌ ছেলে পিলে ভাই বোন সবই ছিল...তৎপরে এই মারী; এমন শুনাইল।

আর দণ্ড খানেক হইলেই হইত। যদি বৃষ্টি নামে তবেই।

আহা সেই...বলিয়া এক কাতর উক্তি থামিল। নিশ্চয় সে ঠ্যাঙার কথা স্মরিল।

যদিও এই কথাতেই, অজানিতে, প্রতিতে জিহ্বা কাটিল, লজ্জা পাইল; তথাপি সকলেই, এক মনগড়া বন্ধন ছাড়াইতে কিয়ৎ উদ্যোগী হইল—এখানে অন্ধকার। এবং একজনে ইহাদিগের মধ্যে এতেক পোদ, কি পর্য্যন্ত অগা যে, ভূমিতে আছে চাঁদের আলো যাহা, তুলসী পাতার মতন যাহা, তাহাতে থাবা মারিয়া ঢাকিতেছে—সর্ব্বত্র কৃষ্ণময়ী হউক। ঐদৃশ করিতে অথচ ভাণ করিতে আছিল এই লোকটি, যে সে খেলা করে; সে অন্য দিকে কোন কিছু হইতে নিজের মতি ফিরাইতেছে। হায় রামকৃষ্ণ।

এই আঁধারে উহার হাসির আওয়াজ, অন্যদের গায়ে চুনটিয়াছে; প্রতিজনই আপনকার টাল চকিতে সামলাইল; যে এবং অন্তরস্থ খারাপ চিন্তাকে তাহাদের মতে, তৎক্ষণাৎ গায়েবিল, এবং চন্দ্রালোক থাবাইতেছিল।

স্বর আসিল: ঐটি হাতের পাঁচ। বৃদ্ধের লাঠি গাছটি।

সে ত মৃত।

কিন্তু।

পা নাই, পায়ের মতনই ত।

আকাশ তাহার পা হইবে।

কে যে সেই ঠ্যাঙাটি আনিল তাহা এখানে যাহারা ছিল তাহারা দেখিতে চাহিল না; এখন সেই বিচিত্র ঠ্যাঙা সেই উনানে সত্বর ঢুকাইয়া দেওয়া হইল ইহাতে মেয়েছেলেরা সাবধানিয়া হাঁকিল, কর কি সব উল্টাইয়া পড়িবে যে! ধীরে কর।

এবম্প্রকার ধমকানতে ইহারা যে যাহার দেহ নিরখিল; পুনঃ উনুনের দিকে হাঁদার ন্যায় তাকাইল; নিমেষেই একে মাটিতে মুখ রাখিয়া প্রবল বেগে ফুৎকারিতে আছিল, তৎসহ মুঠো মুঠো পাতা এবং ইহাতে কড়া ধূম উঝাইয়া উঠিলেক, যৎ দর্শনে ইহারা এক চোরা স্বস্তি স্বাচ্ছন্দ্য অনুভবিল, আঃ চক্ষু ধাঁধাইয়া উঠিবে।

যে মেয়েছেলেটি টিনে কাঠি দিতেছিল, সে জানাইল, জল বেশী হইয়াছে, একটু বেশী ফেন হইবে বটে। এই বচনের সঙ্গে অতি জানা এক কথা শুনিল যাহাতে বুক দেহ ছাড়া হয়, তাহা হইলে, আমরা কি করব বাবু—যে যেখানে আছিল মুখ ঘুরাইয়া হদিশ করিতে প্রয়াসিল, যে কে কহিল।

এবং এই সময়েতে ক্ষণেক চমকপ্রদ অগ্নির দিকে প্রত্যেকেতেই চোখ বুলাইয়াছে; এবং প্রায় সমস্বরেই, তাহারা জানিতে চাহিল, তোমার সেই, বৃদ্ধ, ঘা কেমন। পরক্ষণেই স্বরভেদে প্রকাশিল, ঘা।

কেননা আমরা ঐ অপূর্ব্ব চিতা হইতে ঐরূপ ক্ষত লভিতে মরিয়া হইলাম, তুমি জবাবিলে, চিতাতে আর হাত দেওয়া ঠিক নহে এইতেই তোমাদের ক্ষত রহিল। বৃদ্ধ তাহাতে আপন ডান হস্ত কিছুটা তুলিয়া ধরিল, একারণ যে রশ্মি ছটা যাহাতে পড়ে; ঐ অপূর্ব্ব ঘা লক্ষিয়া সকলে সুদারুণ এক মোচড়ে নিঙড়াইল; আঃ অত্যাশ্চর্য্য পুরুষ। বৃদ্ধ যাহারে কহিল, বল! সে উত্তরিল, পাগল!

পুনঃ এই বেচারীরা সেই উনুনের দিকে প্রত্যক্ষিল। মেয়েছেলেরা ভিজা আঁচলের দ্বারা কজ্জা করত টিন নামাইতেছে; অনিচ্ছা সত্বেও তাহাদের দৃষ্টি ঐ লম্বমান ঠ্যাঙার, যাহার একদিক প্রজ্জ্বলিত, প্রতি গেল; অল্পবয়সী যেদিক জ্বলে নাই তাহা স্পর্শ মাত্রই কহিল, গরম।

সকলেই কেমন যেন ক্রমেই গম্ভীর হইতেছিল, আমরাই কি তাহারা যাহারা দরজাস্থদের কাতর প্রশ্নে—যে তবে আমরা কি রূপে মাঙ্গিব।—উত্তর দিয়াছে, সে আমাদের জানার কথা নয়। আমরাই কি তাহারা যাহারা হাঁসকে বৃক্ষে তুলিয়া দিলাম।

আঃ ঠাকুর স্ফুলিঙ্গের খাত ধরিয়া এই দুঃসহ মেয়াদ চলিয়াছে; স্ফুলিঙ্গের আশৈশব যৌবন বার্দ্ধক্য ঐ মহা অবকাশে। হায় আমাদের ভ্রূকুঞ্চন ভেককুল গলাধঃকরণ করত তুমুল কর্কশ স্বর তুলিতেছে। হায় অথচ আমাদের প্রতিবিম্ব আছে; আমরা দেখি।

জলোচ্ছ্বাসের কণা আরূঢ় বিদ্যুৎ সকল আমাদের খাক করিয়াছে!

মেঘ সকল কত কাছে আসে, ঈশান কোণের মেঘের তত্ত্বে আমরা হাবা, ইদানীং আমরা কাঙাল।

হায় আমাদের অঙ্গুলি সকল ক্রমে সূচ্যগ্র হইতেছে দুর্গা টুনটুনির চঞ্চুর ন্যায়।

আঃ আমরা মহা তরাসে নখ দাঁতে কর্ত্তন করিলাম।

হা ঠাকুর ঐ নদী, ঐ বৃক্ষ, ঐ জমি, উপর নক্ষত্র নিবাস ইতিমধ্যে আমরা, আমাদের অঙ্গুলি কোন পাপেতে চোখা হইতেছে।

আমরা পক্ষীর ন্যায় হইব, খুঁটিয়া খাইব।

আমরা মরদরা আমাদের কি লাঙ্গল ঠেলার কোন পুণ্য নাই!

আমরা মেয়েছেলেরা কি কেহ ঋতুমতী হওয়ত মোদস্থ ধ্যান তুলিলাম। চুলে কি আমরা গেরো দিই নাই।

ঠাকুর আমাদের সদর অন্দর মফঃস্বল সর্ব্বত্র কুক্কুর কান্দিতেছে; ঐ দেখ, ইস্! পথই আমাদের খাদ্যের পাত্র হইতেছে, আমরা যাহারা আলগোছে জল পান করিতে জানি। আমরা কালে ভদ্রের খোরাক পাইলেও কেহর বিষম লাগিল না। সপ্তমীর ঝড়ে বাবুইএর বাসা উড়িয়া আমাদের উঠানে পড়ে না। আঃ পূর্ব্বজন্মকৃত পাপ।

ভাত এখন পরিবেশন করা হইয়াছিল; সেই আহার্য্য হইতে ধোঁয়া নির্গত হইতে আছে, কেহ হাত দিয়া তাহা অনুভব করিতেছে যখন, হঠাৎ প্রতি কণ্ঠেই অথচ সকলেই এক দিকে মুখ ফিরাইয়া ছিল না; ধ্বনিয়া উঠিল, কে! এবং ঐ ঠ্যাঙার দিকে নেত্রপাতিল—যাহার অগ্রভাগ জ্বলিতেছে—যেদিক বগল দাবাতে থাকে, সকলের হাতই আহার্য্য তবে স্পর্শ করিতে পারিতে কিয়ৎ আড়ষ্ট হইয়াছে; নাও হে আরম্ভ কর, ইহা ঘোষিতে কেমন স্বর ভঙ্গ ঘটিল। এসময় সকলের নাসা কুঞ্চিত হয়, এই ঝাপসা আঁধারে একে অন্যরে নেহারিতে উসখুস করিল।

কেমন এক রূপ গন্ধ না।

বটে পুড়িতে আছে ঠ্যাঙার ধোঁয়া খুবই অবাকের যে হাওয়া উজাইয়া এই হাভাতেদের মধ্যে দিয়া এদিকে সেদিকে বিস্তার করিতেছিল; ইহা এবং নাড়ী উঠিয়া আসে যাহাতে, তদ্রূপ এক পচা দুর্গন্ধ বহিতে ছিল, অবশ্যই এমত যুক্তি প্রত্যেকেতে আসিল যে যাবৎ রন্ধন চলিতে আছিল, তৎকালে ত এমত গন্ধ বাহির হয় নাই, নিশ্চয় বাদলে পোকা, কিন্তু পোকা যদি তবে এতক্ষণ; অনেক পোকা ত আসে নাই।

এইক্ষণে অল্পবয়সী বলিয়া উঠিল, আঃ আমি দেখিয়াছি ঐটি বেশ গরম। এবম্বিধ উল্লেখে সকলেই হাঁ হাঁ করিতে যাইয়া থমকাইল, কেননা কি কারণে যে থমকাইতে যাইতেছে তাহা ঠিক বিশ্বাস নাই। তবে কি উহা রক্ত মাংসের পাতে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, গরম।

ঝটিতি এখন যে মেয়েছেলের ট্যাঁকে আয়নার টুকরা সে এবং আরও দুইজন উচ্চারিল, কে।

যে যেভাবে বসিয়াছিল ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, এক ভিখারী একটি পা নাই। যাহা অতীব স্পষ্ট ঐ ছায়া বড় মায়ার এক পায়ে বড় টলিতেছে! বড় দুঃখের! কহিতেছে, আমারে দিবে না।

আকাল জানিয়া যাহারা আঁৎকায় নাই, ঈদৃশ কাতরোক্তিতে প্রত্যেকে, পিণ্ডে, দলা পাকাইয়া গেল; সেই বিশ্রী গন্ধ এখন আসিতেছে, গাত্র কম্পিত হইল। কিন্তু এতাদৃশ ক্ষণেকে ঘোর কাটাইয়া উজাইয়া হুঙ্কারিল, শালা। আহার্য্য সকল আমরা জলে ধৌত করি।

অত্যাশ্চার্য্য পুরুষ বলিয়াছিল। এমন কেহ আছ, যে নৌকা ছাড়িতে, দূর দর্শনে, সন্ধ্যায়, পরিজনকে ছাড়িয়া যাত্রায়, নিরাশায় ইত্যাদিতে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ কর নাই, আইস আমার অঙ্গুলি সকলে সেই আনকোরা দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ কর।

যদিও আমাদের হেঁটে কাঁটা মাথায় কাঁটা তবু আমরা কি ইহা শুনি নাই। ইহা গাহিতে যে, বড় আশা করে এ দেহ পিঞ্জরে, তাহারা ক্ষিপ্ত হইতেছিল।

এবং আহার্য্য পাত্র পড়িয়া রহিল, তাহারা দ্রুত পদে উনুনের দিকে গেল, সেই প্রজ্জ্বলিত ঠ্যাঙা একে তুলিয়া আপন হস্তে চাপিতেই, দুঃসহ অভিমানে নহে, ঠ্যাঙা হস্তচ্যুত হইল, এবং এক অপূর্ব্ব গন্ধ নির্গত হইল।

তুমি সেই গীত গাহ, আঃ আমরাই সেই যাহাদের হাভাতেরা, দরজাস্থরা, বলিয়াছিল, বাবু তোমাদের কোলে মুখ লুকাইয়া কান্দিতে বড় ইচ্ছা হয়। আমরা সেই। আকালেও আমরা পাপ খণ্ডন করিয়াছি।

তোমরাই ঠিক আঃ জাতিস্মর তোমাদের ওষ্ঠের ছিছি, দেহেতে সিঞ্চিড়া হানিয়াছে, দেহের ছিছি অন্তঃকরণে পৌঁছিয়াছে, অন্তঃকরণের ছিছি অন্তর আত্মায় যেখানে তিনি!

আঃ মাধবায় নম জয় রামকৃষ্ণ। তারা তারা ব্রহ্মময়ী মা গো।


শবরীমঙ্গল

লেখক শ্রীকমলকুমার মজুমদারের 'শবরীমঙ্গল' উপন্যাসটির রচনাকাল সম্ভবত ১৯৫০ থেকে ১৯৫৫ মধ্যে। 'শবরীমঙ্গল' লেখকের প্রথম দিকের রচনার অন্তর্ভুক্ত। এখানে তিনি আদিবাসী জীবনের কাহিনীকার।

লেখকের প্রয়াণের পর 'শবরীমঙ্গল' উপন্যাসটির পাণ্ডুলিপি যখন আমার হাতে ফিরে আসে তখন লেখাটির অর্দ্ধাংশমাত্র পাই। শবরীমঙ্গল একটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস ছিল, অপ্রাপ্ত অংশগুলি বাদ হয়ে যাওয়ার ফলে এর ভাবধারাকে বজায় রেখে প্রকাশ করার পক্ষে অসুবিধে দেখা দেয়। তবুও লেখার আপাতত বিন্যাসকে লক্ষ্য রেখেই সামান্য সামান্য সংযোজনার কাজ আবশ্যক হয়। 'রবিবাসর'এর শারদীয় সংখ্যায় (১৯৮৩) 'শবরীমঙ্গল' প্রথম প্রকাশিত হয় কিন্তু তখনও পাণ্ডুলিপির কাজ সম্পূর্ণ হয়নি ফলে কিছু অংশ বাদ থেকে যায়।

'শবরীমঙ্গল' বই আকারে প্রকাশিত হওয়ার তাগিদে যদিও পূর্ব উপন্যাসের ধারাবাহিকতা উপস্থাপিত করা আর সম্ভবপর নয়...তবু গল্পের সেই পূর্বাপর মৌলিকতাকে অনুসরণ করে শুরু এবং শেষের সামঞ্জস্য বজায় রাখার প্রয়াস নিয়েই সম্পূর্ণ পরিচ্ছেদে—বইটি প্রকাশ করা হল।

লেখকের নিষ্ঠাবান পাঠক শ্রীরমানাথ রায়ের ঐকান্তিক আগ্রহে 'শবরীমঙ্গল' প্রকাশিত হল।

দয়াময়ী মজুমদার

"যা বুলবে...একটা...মাথা...দিয়ে বুলবে ত...লাও...বস।" রোমনির এ স্বরে কোন উষ্মা ছিল না শুধু ডাগর বুকটা কেমন টান টান হয়ে উঠেছিল। মাধালি, এই কথায় আর কোন কথা বলতে পারলে না, চেয়ে চেয়ে দেখলে মনে হল সে যেন বা চুরি করে দেখছে। এরপরেই রোমনি তার হাতটা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে কব্জির কাছে একবার, কিছু উপরে একবার শুঁকে, মুখটা অসম্ভব বাঁকিয়ে চুরিয়ে বললে, "উঃ...তুমি ভাবছ আমার মধ্যে বোঙ্গা ঢুকেছে...তা লয়—ইঃ গায়ে কি পাতা পোড়া গোন্দ হে—লাও চান করগা—, খাড়াও, খাড়াও একটু বিড়ি খাও—বলে সে আবার ঘরে ঢুকে বিড়ি আর পারকোমের পাশ থেকে হোলাটা বার করে এনে, ফুঁ দিয়ে আগুন সরিয়ে বিড়িটা ধরিয়ে তাকে দিল।

রোমনি বললে—"তুমি বস হে—আমি জল লিয়ে আসি—তারপর তুমি চান করতে যাবে"—বলে সিঁড়ি দিয়ে নেমে পূর্বদিকের চালায় দাওয়া থেকে একটা লোহার ডোল এবং একটি বড় ঘড়া নিয়ে বার হয়ে যাবার সময় বললে—"চলে যেও না...হে" তারপর আবার "ঘর খোলা বুঝলে" সদর দরজা পার হবার সময় আরো একবার বললে—"আমি এখনি আসছি—"।

রোমনি চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাধালি মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বিড়িতে আর কয়েকটা পর পর টান দিয়ে, হঠাৎ কি মনে হল নিজের হাতটা শুঁকলে, কাপড়টা শুঁকলে, সমস্ত গায়ে কাপড়ে পুরাতন চালের একটা গন্ধ এবং নির্মমভাবে যদি স্বীকার করতে হয়, তাহলে বলা উচিৎ গাঁদাল পাতার আদছায়া গন্ধ। তার খারাপ লাগল। কিন্তু বসে থাকা ছাড়া উপায় নেই। এমন সময়ে হঠাৎ তার রোমনির ঘরের অভ্যন্তর নজরে পড়ল, ঘরের উত্তর দিকেও জানালা, ঘরটি অতি পরিচ্ছন্ন সুন্দর, একপাশে একটা তক্তাপোষ। তাতে একটা তোষকমত পাতা, তার উপরে ছেঁড়া হলেও পরিচ্ছন্ন একটি পুরাতন শাড়ি পাতা, এবং ঘরের চালের ঠিক নীচে লাল সালুর পদ্ম করা ছতরি, খাটের তলে একটা কাঠের পাটার উপরে ডুগী তবলা এবং বোতল, সামনের দরজার ঠিক উল্টো দিকে দেওয়ালে একটি কুলঙ্গী, সেখানে একটা সুন্দর কাঁচের ল্যাম্প, পাশে কাঁচের গেলাস। পাশের দেওয়ালের কুলঙ্গীর উপরে দুপাশের পরী এবং নানারকমের ভাঙা কাঁচের চুড়ির শিকল বাহার দেওয়া। তার উঁচুতে টিয়া ব্র্যাটেড। মাধালি অবাক হয়ে চেয়ে দেখেছিল, পরিচ্ছন্ন সুন্দর নখের মত যা এখানে মিহি কাপড়ের মতই অসম্ভব। সে নিজের কাপড়চোপড় এবং যথাসম্ভব হাত পা সবকিছু খতিয়ে নিল। এ ঘর দেখে তার নিজের জন্য একটু লজ্জা লজ্জা হল। ক্ষুদখাগী বলে পূর্বের বিনয়প্রকাশ—এখন বিদ্রূপ বলে মনে হল, কেন এখানে এল, সে থাকতে পারল না, উঠে দাঁড়িয়ে ছোট দাওয়াটায় একদফা পায়চারী করলে, হাতের বিড়িটা টানতে গিয়ে ধোঁয়া যখন বার হলনা সেটাকে তখন দেখে উঠানে ছুঁড়ে ফেলে একদৃষ্টে সেই দিকে তাকিয়ে রইল। ভাবছিল এখানে সে আসতে গেল কেন! তাকে যেন কে এখানে তাড়িয়ে এনেছে। না-এসে তার উপায় ছিল না, প্রথমত বালির সোঁতায় রোমনির কথাবার্ত্তায় অযথা অবজ্ঞা ছিল, তার কাছে সে চোর হয়েছিল, বিশেষত যেন ধরা পড়ে গিয়েছিল; ফলে সে সত্যই ভীত বিমূঢ় হয়েছিল, সে কারণে এখন সে এখানে। মাধালি একবার সাহস করে ভাবলে, সে বললে বলেই সবটা ভূয়ো হয়ে গেল, দাঁত দিয়ে ঠোঁট কাটতে কাটতে সে আর কত কি ভাবছিল, কয়েকবার তার কপাল কুচকল, কিন্তু এর বেশী আর কিছু করতে পারলে না, শুধু একবার খোলা সদর দরজাটা তার নজরে পড়ল। তারপর উঠানে যেখানে অর্দ্ধভুক্ত বিড়িটা পড়েছিল, সে আস্তে আস্তে নেমে এসে বিড়িটা যখনই তুলতে গেছে, অমনি একটা শুকনো গলার স্বর শুনতে পেলে, 'রোমনি হে—'

মাধালি মাথাটা তুলে দেখল ছিটকানো আঙুলওয়ালা—বাঁকা পায়ের—দুটি পায়ের পাতা। লাল পেড়ে ধুতি, গায়ে তালিমারা একটি কোট—বগলে রোদবৃষ্টি সওয়া একটি ছাতা, উপরে আদলায় সন্তুষ্ট একটি মুখ। মুখ দিয়ে চুটার ধোঁয়া বার হচ্ছে। পেয়ে খুসী না মেনে খুসী। চোখ দুটি কড়ির মত অতি কষ্টে চেয়ে বললে—"রোমনি ঘরকে", বলেই সে কিছু গুণ গুণ করতে লাগল, এবং অন্য হাত দিয়ে

ছাতার হাতলে টোকা মারতে লাগল। তাকে দেখে মাধালি এক পা পিছিয়ে এসে বোকার মত দাঁড়িয়ে রইল।

লোকটি নিজের সন্তোষকে ব্যাহত না করে ঘাড় বাঁকিয়ে প্রশ্ন করল, "কি বটে হে ঘরকে নাই"?—এ কথার উত্তরে মাধালি শুধুমাত্র আস্তে আস্তে মাথা নাড়িয়েছিল।

লোকটা তাকে এবার ভাল করে দেখে এক পা উঠানে এসে এপাশ, সেপাশ আল্‌ত দৃষ্টিতে দেখে বলল "তুমি কে বট হে রোমনির"—বলে একটু পণ্ডিতের মত কাশতে কাশতে ছাতার হাতলটা তেমনি বাজাতে লাগল। তারপর গলা সাফ করে ভ্রূ তুলে বললে, "...রোমনির হি—হি" বলে বুড়ো চোখে মিষ্টি করে চাইল।

এই কথায় মাধালির ঘাড় হঠাৎ শক্ত হয়ে গেল, কখন যে তার বাঁ হাতটা কোমরে উঠেছিল তা সে বুঝতে পারেনি, কিন্তু পরক্ষণেই সে স্থান পরিত্যাগ করে এসে দাওয়ার পারকোমে বসল। অত্যন্ত অস্থিরভাবে তার পায়চারী করতে ইচ্ছা হচ্ছিল একবার লোকটির দিকে ঘাড় ফিরিয়ে পা নাড়াতে লাগল। তার মনটা অসম্ভব খাড়া হয়ে উঠেছে। কি কথা যে তার মনে ক্ষেপে উঠছিল এখন সে বুঝতে পারেনি। গায়ের যেখানে সেখানে চুলকতে লাগল। হঠাৎ এবার নজরে পড়ল ডুগিতবলা, পাশে কয়েকটি বোতল, ফলে মনে সহজ হল যে ঝুমুরওয়ালীর বাড়ী এটা। "আমি ইস্" বলে উঠল আর ভাবতে পারল না। "আমি এখানে বসে ছিঃ" এই কথাই তার বার বার মনে হল, "আমি তাঁকে খুঁজব, না আমি এখানে"। এতক্ষণ ধরে মনে হচ্ছিল তার দরকার নেই সে আলোর, সে স্বর্গের আলোর, সে সহজ হবে, সহজ হয়েই বাঁচবে। কিন্তু আবার মনস্থ করল—"আমি তাঁকে খুঁজে বার করবই। এ জায়গা অতি অন্ধকার, এ জায়গার হাত নেই পা নেই পাখির বাসার মত অনড়, বাঘের গুহার মত—হাওয়া এখানকার অত্যন্ত পাথর। সত্যি বড় অন্ধকার, এর থেকে সেই স্বর্গের আলোই ভাল। এই সূত্রে ক্ষণেকের জন্য রোমনির কথা মনে হয়েছিল, আলোর মত সেও দারুণ ভারী। যে রোমনি আপেল নয়, যে রোমনি ঝুমুরওয়ালী নয়, যে হাততালি দিয়ে ঘুরে ঘুরে নাচে হয়ত।

লোকটা ছাতা বগলে করে দরজার বাঁ পাশে উবু হয়ে বসে বারবার দরজার দিকে চাইছিল, এখন হঠাৎ সে লাফ দিয়ে দাঁড়াতেই আর একজন দরজায় এসে মাথাটা নীচু করে ঢুকল, সুদীর্ঘ অসম্ভব সুপুরুষ চেহারা, বগলে একটি চট, একটি পেকা, অন্য হাতে ধুন্দুল কানে একটি আদপোড়া চুটা, বুকের মধ্যে দিয়ে ধপ্‌ধপে পৈতে। সেই লোকটি ওকে প্রায় হাত দিয়ে প্রণাম করে বললে 'ঠাকুর কেমন?'

ঠাকুরের হাতটা থাক থাকের কায়দায় রেখে অত্যন্ত শক্ত করে চেয়েছিল মাধালির দিকে। অন্যপক্ষে মাধালি নবাগত লোকটিকে দেখে ক্ষুদ্র হয়ে গেল, শুধু বলেছিল "ভগবান"! যদি সত্যই তার ভগবানের সঙ্গে তার ভালবাসা থাকত তাহলে সে বলত, 'ভগবান এত কুষ্ঠ রোগীকে নিরাময় করলে। কিন্তু কুষ্ঠরোগকে চিরতরে লুপ্ত করলেনা কেন?' ছোট একটা হাঁ করে তার দিকে তাকিয়েছিল। একে সে খুব চেনে। হুড়তির রাস্তায় শাল গাছটার তলায় সে বসে থাকে—দূর থেকে দেখলে বড় কষ্ট হয় কাছে আসলে গা যেন আড়ষ্ট হয়ে উঠে, বিশেষত সে যখন বড় বড় লাল চোখে চেয়ে থাকে, তার কান দুটি যেন লটপট করে। মাধালি তার নামও জানে তার নাম অদ্বৈত মিশ্র। মাধালির মুখটা বেঁকে চুরে যাচ্ছিল, তার গা যেন ঘুলিয়ে উঠেছে, বিশ্রী গন্ধে সে অস্থির।

অদ্বৈত মিশ্রের গলা শোনা গেল—"কে হে তুমহি", বলে কাছে এসে ছাতি (ব্যাঙের) গুলো দেখে বললে—"রোমনি কুথা হে...?" মাধালির শরীর যেন এই কথার ঘায়ে যেন বেঁকে বেঁকে যাচ্ছিল। অদ্বৈত, ওঝার মতই ভালভাবে দেখতে দেখতে বললে—"হে তুই না রৈবতীর ঘুনড়ী ক্রেস্তানের ছেলে?" বলেই হাত তুলে দৃঢ় করা স্বরে যেই বলতে যাবে অমনি বগলদাবা থেকে পেকা আর চাটাই পড়ে গেল, পলকের জন্যে সেদিকে দেখে, মাথাটা তুলেই বললে—"তুই তুই এই পারকোমে বসে য্যাঁ—।"

ঠিক এমন সময় ভিজে কাপড়ে কাঁকে ঘড়া—অন্য হাতের ডোলের মধ্যে ছোট ঘটিতে দুধ নিয়ে উঠোনে এসে দাঁড়াল রোমনি। একটুও বুঝবার চেষ্টা না করেই ধমকে উঠল—"ঠাকুর পো।"

কুষ্ঠরোগী অদ্বৈত মিশ্র রোমনির দিকে ঘাড় ফেরাল, রোমনি এবার বললে—'ঠাকুর পো।'

অদ্বৈত মিশ্র শুধু বললে—'ক্রেস্তান' বলে নিজের পেকা আর চুটাটা তুলে বললে "ক্রেস্তান, এখানে

কোত্থেকে—হ্যা-হে।"

রোমনি ডোলটা এই দাওয়ায় সন্তর্পণে রেখে ঘড়াটা অন্য দাওয়ায় রাখতে যেতে যেতে বললে—"ও আমার বামুনরে, অত যদি বামনগিরি ত গঙ্গাড়ী হওগা, লয় কাশীবাসী হও!"

অদ্বৈত মিশ্র নিশ্চয়ই অপমানিত হয়েছিল, সে তৎক্ষণাৎ জবাব দিলে, "যাবই ত তোর ভরসায় আছি নাকি, তোর হাতে খাই বলে কি ভাবিস? অনেক পুণ্যের ফলে বামুন হয়," বলে সে ঈষৎ কাঁপতে লাগল এবং একটু বেশী যেন বলে ফেলেছে এই ভয়ে কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুতও হয়েছিল। সে আর না বাড়িয়ে পূবের ঘরের একান্তে গিয়ে দাঁড়িয়ে খুঁটিতে একটা ঘুঁষি বসাল।

রোমনি তার দিকে ফিরে ভীষণ রেগে গেল। তার ঠোঁট কাঁপতে লাগল কি বলে যে শুরু করবে তা সে ঠিক করতে পারছিল না। "থাক কুজাতের কাছে থাক কেনে, বেহুড়লে (অমানুষ) ভাত মারা—বামুনের নাকি আবার কুষ্ঠ হয়, বামন নাকি আবার, বলেই থেমে মাধালির দিকে চেয়ে অস্পষ্ট হাসি দিয়ে শুরু করে বললে—'তুমি চান করে এস গা,'—বলে দম নিলে। মাধালি যেন বেঁচে গেল। সে যখন দরজা পার হচ্ছে শুধু শুনলে—'পুবে বাধ আছে হে সেখানকে যেও' এরপর রোমনি তার পরণের কাপড়ের পায়ের কাছটা মুঠো করে নিঙড়তে নিঙড়তে বললে, "লজ্জা করে না বামুনগিরি ফলাতে, ম্যাগ কত।"

অদ্বৈত মিশ্র কাঁপতে কাঁপতে বসে বললে—"তাই বলে একটা ক্রেস্তান সে একা এখানে বসবে? এখানে রাধাগোবিন্দ আছেন—"।

"ও রাধাগোবিন্দ আছেন ত একেবারে মোতুরা হয়ে গেছে—" বলে গামছা দিয়ে চুল জড়িয়ে দেহটা বাঁকিয়ে মুখ অসম্ভব ঘাড়ের দিকে করে সে এই কথা বললে—"লাও লাও আর লিষ্ঠা দেখিও না।"

অশ্রাব্য ভাষায় অদ্বৈত বল্লে—"লে তুই লিষ্ঠার কি বুঝবি, হতিস যদি—" রোমনি মুখ ফিরিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে বল্লে—"দেখো ঠাকুরপো আমাকে রাগিও না বলে দিচ্ছি আমার শরীর লায়েক লাই, সারারাত খাটনি গেছে—বেশী বাড়াবাড়ি করনা—বলে দিচ্ছি—" বলে তেমনভাবে আবার চুলের পাট করতে লাগল।

"তাই বলে তুই আমায় ওর সামনে অপমান করবি—বল ত হে"—বলে লোকটা সাক্ষী মানল। লোকটা ঝগড়া বচসা দেখে আবার বসেছিল, ছাতা এখন আর বগলে নাই, মাটিতে ন্যস্ত। সে ছাতাটা ঘোরাতে ঘোরাতে বললে—"তা বটে গো বামুন বলে কতা—তাকে—।"

রোমনি বল্লে—"হি" বলেই পা দিয়ে মাটিতে একটা চোট দিয়ে উঠে তারদিকে ফণা তুলে দাঁড়িয়ে বল্লে—"দেখ জটা হারামজাদ্দা—লবাবুকে বলে তোকে জুতো—খাওয়াবো—ফের যদি কথা কইবি" তারপর অদ্বৈত মিশ্রর দিকে একবার চেয়ে দেখে আবার কর্মব্যাপৃত হল।

জটা করজোড়ে ঠক ঠক করে মাথা ঠেকিয়ে বল্লে—'অল্যায়-হয়েছে।'

"কেন এসেছিস—রে?"

"যেতে হবে—যে গো।"

রোমনি এবার হাঁসের মত চুল একটু ত্বরিত নাড়া দিয়ে জটার দিকে পলকের জন্য চেয়ে গামছা নিঙড়ে ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞাসা করলে—"কেনেরে যজ্ঞিটা কি?"

"লবাবুর মেয়ের সাদ।"

"ওঃ, আমার যাওয়া হবেনা" কিছু পরে অদ্বৈত মিশ্রর দিকে চেয়ে তাকিয়ে বল্লে—"বল্লাম ত শরীর লায়েক লয়—কয়েক লপ্ত ধান রুইলাম—এখন আমার পোয়াতি গতর" বলেই গম্ভীর হয়ে একটু সামনে পিছনে করে ধনুকের মত বেঁকে চুল ঝাড়তে লাগল। রোদ তার মুখখানি, দেহ যেন ফোয়ারা সঙ্গে সঙ্গে জলকণা (ত্রাসরেণু) ঝিমঝিম করে উঠে রামধনু নিয়ে যায়। এবার সুন্দর মুখখানি বাঁকিয়ে বল্লে—"শরীর লায়েক লয়—।" জটা এতক্ষণ তার ছায়াই দেখেছিল, এ সৌন্দর্য্য দেখে সে এঁটে সেঁটে বসেছিল।

রোমনি আকাশের দিকে মুখ তুলে চোখ ছোট করেই বল্লে—"দেখ ঝগড়া করা আমার স্বভাব লয় কিন্তু" বলেই নিজের কান খাড়া করে কথাটা শুনলে। বোধহয় কিছুটা আশ্চর্য্য সে নিজেই হয়েছিল, তবু এই মনটাকে তুলে ধরবার চেষ্টা করলে, মাথা কাত করে যখন দেখলে অদ্বৈত মিশ্র দাঁড়িয়ে দাওয়ায়

উঠেছে, তখন তার মনে হল, ঠাকুরপো তার এই উক্তিটাকে মান্য করলে না, ক্ষুণ্ণ হয়ে সে আবার বললে, একই কথা কিন্তু স্বর তার ঠোঁটেই চলাচল করেছিল। চুল ঝাড়া তার সম্পন্ন হয়েছিল, এলো চুলের গোছটা ধরে সে কি যেন ভাবতে চেষ্টা করলে, তার মনে হল কি যেন তার চাই। কথাটা তার আর মনে পড়ল না, মাধালিকেই মনে পড়ল। ঘরে ঢুকে কাপড় ছেড়ে, ছোট ঠেকায় কিছু চাল নিয়ে বার হয়ে এসে বল্লে—"জটাধর তুমি বসে কেনে আমি—"

"ওগো নাচনী ঠাকুরুণ গো—আমি গাড়ী আনছি—আমি"—"—"বুঝলাম কিন্তু শরীর বললাম ত" গলাটা অত্যন্ত নরম এখন যেন সে গান ধরবে। জটা উঠে দাঁড়িয়ে বল্লে—"বুঝ হে—লোক লোকুত কত, সব পথ চেয়ে আছে গো সব লষ্ট হবে—মন করহে—বুঝ বুঝ—"

"বুঝার কিছুই লাই—টাকা সিকেও আমিই পাব—"

"এবার খুব যাদুক যাদুক জিনিস পাবে গো একটা কথা বললাম তুমায়" বলে বেঁকে বেশী করে মাথা নাড়াতে লাগল।

"আমি চাল কাঁড়াতে গেলাম ঠাকুরপো—" বলে প্রায় দরজার কাছে গেছে তখন অদ্বৈত মিশ্রর গলা পেয়ে থমকে দাঁড়াল।

"আমি খাব না আমার চাল লিও না—"

রোমনি ভাবের ঘোরে তার দিকে চেয়ে বার হয়ে গেল।

অদ্বৈত মিশ্র অত্যন্ত ছোট হয়েছিল। এতক্ষণে সে যেন সুযোগ পেলে, সে নেচে উঠে বলল,—"যদি খাই ত আমি বামুনের ছেলে লই।" বলে হাতের বাজুতে পড়ে যাওয়া পৈতেটো কাঁধে তুলে, ধপ করে বসে পড়ে হাঁটু নাচাতে লাগল। বললে—"জান ওর মা আমার রোজ পা ধোয়া জল খেত বুঝলে, সে সত্যিই আর জন্মে বামুনের মেয়ে ছিল তাই আমাকে পেয়েছিল। আর বজ্জাত ধ্যাষ্টা সাঁওতালের মেয়ে তো, লতা আটকানো শিং, অনবরত মাথা নাড়া দেয়। আমারও এমন মায়া" বলে তার চোখে যেন জল এসে পড়ল, 'একে রোগ তারপর' বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। জটা আস্তে আস্তে উঠে এসে বাঁ হাত কোনুইতে ঠেকিয়ে ডান হাত গালে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

অদ্বৈত মিশ্র চুটাটি তুলে নিয়ে ট্যাঁক থেকে অযথা একটি কাঠি নষ্ট করে ধরিয়ে, চুপ করে রইল। জীবনে তার এখন দুটি প্রিয়, একটি হুড়তির রাস্তায় শাল গাছ-তলা, দুদিকে দুটি বিরাট আকাশ, এখানে একা বসে থাকা এবং ভিক্ষা করা। লাল রাস্তা শুধু চলে গেছে, কখন লোক যায়। যারা রকমারী কাজে যায় তারা এটা সেটা দেয়, কখন ধুলা উড়ে কখন পাতা পড়ে, কখন পাখি ডাকে। এই বাদামী জায়গাটায় বসে শুধু গুন্ গুন্ করা ছাড়া কোন কাজ থাকে না। সে পদাবলী সঠিক রাগেই গায় তবে চালটা অনেকটা রেনিটির মত। অদ্বৈতর দুঃখ নিচেকার ঠোঁটে কেঁপে উঠেছিল ব্যধিগ্রস্ত মুখটা তার কাল হয়েছিল। শুধু আপশোষ হচ্ছিল, রোমনির মা লুংডি তারই হাতে এই মেয়েটিকে দিয়ে মারা গিয়েছিল, সে ও আজ অনেক বছরের কথা হল। দিন নেই দুপুর নেই ঠাকুরপো ঠাকুরপো করে অস্থির হত। লুংডিকে প্রথম নষ্ট করলে বৃন্দাবন চাটুজ্যে, কলিয়ারীর হাজরেবাবু। তারই সঙ্গে অদ্বৈত লুংডির বাড়ীতে যেত। সেই থেকে লুংডির সঙ্গে তার আঠা। বৃন্দাবন অদ্বৈতকে খুনের ভয় দেখালে, তখন থেকেই তারা এখানে, অদ্বৈতর তখন কতই বা বয়স, বছর চব্বিশ, রোমনি আট, সেই একসঙ্গে এতকাল। রোমনিকে সে কেমন যেন চোখে দেখে, প্রথম প্রথম সে ভাবতে পারেনি যে রোমনি এত বিস্ময়কর হয়ে দাঁড়াবে, তাকে দেখতে রোদবৃষ্টি মাথায় করে লোকে আসবে। তার ঘরের রাস্তায় লোক চলাচল বেশী করবে, শুধু একবার চোখের দেখা দেখতে অনেকেই আসবে। অদ্বৈত যেখানে বাহু দিয়ে আগলাতে চায় সেখানে শুধু হিত কথা দিয়েই আটকাতে হয় কারণ বাহু তার ভগবান অযোগ্য করেছেন। রোমনিকে, একমাত্র লাল ব্যধিগ্রস্ত চোখ ভরে দেখা ছাড়া গত্যন্তর নেই। কখন মধ্যরাত্রে রেড়ির বীজ জ্বালিয়ে তুলে ধরে জানলা থেকে ঘুমন্ত ক্ষণিক-বীভৎস্য এবং অপার সৌন্দর্য্যমহিমাযুক্ত রোমনিকে দেখে, তার নিঃশ্বাসে কখন স্বল্প রেড়ির শিখা কেঁপে উঠেছে। অসম্ভব পাগল হয়ে উঠতেই অদ্বৈত মিশ্রর আনন্দ। খুঁটি ধরে আকাশের দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে সে আনন্দকে সামাল দিতেই হয়। পলকের জন্য তার মনে এই বিশ্বাস হয় যে অদ্বৈত মিশ্র কুষ্ঠরোগী শালগাছ তলার নিত্যকার ভিখারী বামুন নই, যে বামুন বৃন্দাবন চাটুজ্যে এবং লুংডির পাপ বহন করে। অদ্বৈত স্থির হয়ে বসে এই কথাই ভাবছিল। এমন সময়

তার কাছে এল জটার অনুনয়—"ঠাকুর লাচনী ঠাকরুণকে একবার বল—লগদ পাবে—যাদুক যাদুক জিনিস পাবে বৈকি।"

অদ্বৈত একবার তার দিকে চেয়ে দেখে বলল—"গ্যাছেও তো অনেকক্ষণ", বলে কি যেন ভাবল, তার গা ঈর্ষায় জ্বলছিল। সে ঠাওর করলে নিশ্চয়ই সেই ক্রেস্তানের সঙ্গে গল্প সল্প করছে যা ভেবেই দাঁড়িয়ে উঠে বলল—"চাল কটা আমি আর কাঁড়িয়ে আনতে পারতুম না—দেখ দেখি কাণ্ডখানা, সারারাত জলে দাঁড়িয়ে ধান রুয়ে এখন ও বলে" কোমরের আলগা কষিটা ভাল করে এঁটে বললে—"দেখি একবার" বলে অদ্বৈত মিশ্র চট করে বার হয়ে পড়ল। রাস্তায় এসে অবশ্য তার মনে হল, ঘর খোলা রইল, কিন্তু মনে হওয়া পর্য্যন্তই সে আস্তে আস্তে এসে দাঁড়াল কালিন্দীর বাড়ী।

এটা উঠান, একটা বুল গাছের ছায়া তার পাশে ধান মেলান। ঢেঁকিশাল থেকে ঢিপঢিপ করে শব্দ আসছে না। উঠানের সামনেই একটি চালা, ঠিক এর পাশেই ঢেঁকিশাল। অন্য সময় হলে অদ্বৈত এখানে এসে ডাকত কিন্তু এখন অতি সন্তর্পণে এখানে এল। সামনেই একটি ঝাঁপ মত, মাথাটা তুলে অদ্বৈত দেখলে রোমনিকে। ঢেঁকিতে পাড় দেবার বেশ শক্ত বাঁশের লাঠির মাথায় দুটি হাত রেখে আপনার মুখটা ন্যস্ত করে আছে। চালের ফাঁক করে অজস্র আলোকরশ্মি এসে এখানে সেখানে পড়েছে, রোমনি সেইভাবে থেকেই অদ্বৈতকে দেখতে পেলে, চোখাচোখি হতেই অদ্বৈত বল্লে—"আমি দেরী দেখে এলাম" একটু থতমত খেয়ে বল্লে—"জটাকে কি বলব?"

রোমনি শুধু বল্লে—"তুমি যাও আমি যাচ্ছি" এই কথায় অদ্বৈতকে আর দেখা গেল না। রোমনি আবার পাড় দেওয়া শুরু করলে, তার দেহটা পাড় দেওয়ায় ফলে থর থর করে কাঁপছিল তার কেমন যেন আরাম লাগছিল। সে চুপচাপ পাড় দিয়ে চলেছে, সে যেন প্রকাণ্ড মাঠের দিকে তাকিয়ে আছে—এমনভাবে থাকতে তার কেমন যেন আরাম লাগছিল। যখন কালিন্দীর মেয়ে তুড়সী (তুলসী), তার ম্লান মুখটা তুলে, একটি অবাক কথা বলেছিল—"ফুল যখন ফুটে তখন কোথায় যে ফুটে—।"

অবশ্য কথা এই সূত্রে বলার নয়, কথাটা বিয়ে সংক্রান্ত সত্য, কিন্তু তার আর কোন কথা জানা ছিল না। কিন্তু বলার ছিল অনেক, কারণ সে এক ঠায়ে সব কথা শুনেছিল, বুঝেছিল কারণ খোকার বাপের জন্য তার মন খারাপ হয়, খেজুর পাতার চেটাইকে তার অসম্ভব ঠাণ্ডা মনে হয়। সে আবার বললে, "ইঃ বাব্বা আমার মনে লেয় ই সহজ মানুষ লয়—মন করে দেখি—।"

ম্লান সুন্দর না খেতে পাওয়া মুখে এ সকল কথা যেন আকাশ ছুঁতে পারে। রোমনির দিকে সে মুখখানি তুলেছিল, রোমনির বড় ভাল লাগল তার মুখখানি। সে সবকিছু ভুলতে চাইছিল, স্বভাব ভুলতে চাইছিল, সে-ব্যাপার যেন তুড়সীকে অবলম্বন করলে হতে পারে বলে মনে হল, সে নিশ্চিত হল এবং প্রশ্ন করলে—"তোদের জামাই এতদিন আসে না কেনে—তোর কষ্ট হয়?" তুড়সী মুখটি নীচু করে কাঁড়া চালগুলো মুঠোমুঠো করে ঠেকায় তুলতে লাগল। তার হয়ে রোমনি ছোট একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে—"আমি কি খুব হে—" বলে আর বলতে পারল না, খারাপ এই কথাটা বলতে তার মুখ দিয়ে আটকাল—কাকে যে এ প্রশ্ন করবে সে ভেবেই পেল না। সে এখনও তো একেবারে খারাপ হয়নি, যদি বা হয়েছে তাও খুব ভদ্রলোকের সঙ্গে হয়েছে যারা তাকে প্রচুর দিয়েছে কিন্তু এখানে অনেকে শুধু তার গান শুনেছে। যারা জাতে ছোট তাদের সঙ্গে এখন সে রস রসিকতা করছে। হলেও সে লোচনী তার স্বভাবসিদ্ধ বদনাম আছেই। ছাগল যদি এখনই মরে তাহলে সে ছাগল যেমন বাবুরা বা ঠাকুরপো মুখে দেবে না তেমনি তাকে কেউ তেমন সমাদর করবে না। কিন্তু মনোভাবের থেকে তার কাছে শূন্যতার আমেজ বড় বেশী বলে মনে হয়েছিল। হয়ত তার একবার একথাও মনে হয়েছিল যে আমি লাচনী কি ঢেমনী এতশত এখন ভাবার কোন প্রয়োজন নেই। দূর থেকে নিজের মুখখানি দেখতে তার ইচ্ছে হচ্ছিল, যেমনটি দেখা যায় অত্যন্ত গভীর কুয়োর মধ্যে, চকচকে শান্ত মুখখানি। সব থেকে ভাল লাগছিল এই দূরত্ব, ঠাণ্ডা আরামদায়ক প্রতিধ্বনি সম্ভব। সে অনেকক্ষণ ধরে চুপ করেছিল তা সে নিজেই বুঝতে পারল, দেখতে পেলে তুড়সী তার দিকে চেয়ে আছে, মৃদু হেসে আবার পাড় দিতে লাগল। কিন্তু পাড় দেওয়া কেমন বেতালা হচ্ছে, তুড়সী সভয়ে হাত সরিয়ে নিয়ে বল্লে, "হেঁ আমার হাতটা যে যাবে গো" বলে হেসে বললে "হেই তিতির সাবধান গো, ব্যাধে লিবে কাঠালের আঠায় হে।"

এর উত্তরে রোমনি বল্লে—"যে রাতে পহেরা দেখা হয় তখন আমার এক কথা মনে হল, এখন সে

কথা বেজার—এখন আর এক কথা মনে আসে—তবে বটে আমার মন উঃ উঃ করে এখন ভারী আলিঢ্যালি করে—এখন মনে লেয় গতর আমার ভারী—মনে লেয় যেন দশ মাসের গতর—” বলে অসম্ভব লাজুক হয়ে গেল। যা তার প্রকৃতি নয়। মাথাটা তার বাঁকা হয়ে নীচু হয়ে গেছে চুল ঢলে পড়ছে। ভাঙা চুল কাঁধে, মাঝে মাঝে মুখ তুলে সে সোজা হবার চেষ্টা করছে। হঠাৎ সে কেমন অস্থির হয়ে উঠল, মাথাটা স্থির হয়ে রইল। সেই ভাবেই প্রশ্ন করলে—“সব কটা চাল হইছে?” বলে তুড়সীর দিকে তাকাল। তুড়সী ঘাড় নেড়ে উত্তর করল। রোমনি আর এক মুহূর্ত দেরী না করে ঠেকায় চাল তোলা হতেই সেটাকে কাঁধে নিয়ে তুড়সীর চিবুক ধরে বললে, “তোর দিব্যি রঙ্গিনীর দিব্যি, কাউকে বলবি না কেমন—!” বলে আর দাঁড়াল না, উঠানের বুল গাছের কাছে এসে তার মনে পড়ল যে গাছের পাশ দিয়ে উঁকি মারলে এখান থেকে বাঁধটা ঠাওর হয়, কিন্তু অন্য কিছু হয় না। কারণ খুব উঁচু ভেড়ী করা। তার মনে হল, নিশ্চয়ই মাধালি বাড়ী যায়নি, হয় চলে গেছে নয় সে ওখানে কাপড় শুকাতে বসে আছে।

মাধালির স্নান হয়েছিল। এখন তার শরীরটা বেশ ঝরঝরে হলেও ভিতর থেকে প্রতি রোমকূপে ঘুম ছুটে আসছিল। কাপড়ের একটি খুঁট কেন্দ গাছের সঙ্গে বেঁধে সে পাশের একটি গাছের আলগা ছায়ায় দাঁড়িয়ে ছিল। ঘাটে আর কেউ নেই, শুধু একটি বুড়ী ছাঁকনা জালে মাছ ধরবার চেষ্টা করছিল, জলজ ঘাসের মধ্যে দিয়ে তার লোল-কুৎসিত দেহটা ভূতের মত ঘোরাফেরা করে আর কতক হাঁস কাছাকাছি জলে ঘোরে ফেরে। মাধালি নিজের হাত দুটি বুকে বেঁধে মাছ ধরা দেখছিল। কাপড় তার অনেকক্ষণ শুকিয়েছে কিন্তু তা তার খেয়াল হলে ও খুলে নেবার কোন মন ছিল না। এই স্নানের পর সে আবার ‘মাধালি কিস্কু, রৈবতীতে ঘর’ এই পরিচয় ফিরে পেয়েছিল, এ কয়েকদিনের ঘটনা মনে হয়েছিল যে ধুয়েমুছে গিয়েছিল কিন্তু তা নয়। এক একবার হাওয়া আসে আর সে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ায়, পাতার শব্দ, কাপড়ের আওয়াজ এবং বিশেষত কাপড়ে লাল মাটির দাগ, সে খাড়া হয়ে উঠেছিল। কিন্তু কেমন করে ভাবতে হবে তা জানা ছিল না, বার বার সে শুরু করতে চেয়েছে বারবারই সে সফলকাম হয়নি। বিশেষত রোমনির বাড়ীর শেষ ঝগড়া তাকে যে কোথায় তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল তা সে হদিশ করতে পর্য্যন্ত পারেনি। সবকিছু টাকনা দিয়ে দিয়ে মনে আসছে, কিছুতেই সহজ সোজা হচ্ছে না। এমনিতে সে বড় একটা লম্বা যোগ করতে পারে না, তায় আবার গুছিয়ে ভাবনা। সর্বপ্রথম তার মনে হল, এই মেয়েটার হাত ছাড়াতে হবে, অবশ্য সে যদি স্পষ্ট করে ভাবত তাহলে সে নিশ্চয়ই একথা স্বীকার করতে বাধ্য হত যে, মেয়েটির খুব একটা দোষ নেই। মাধালির নিজেরই একান্ত প্রয়োজনে সে এসেছে। প্রথম রাত্রে সে এখানে হঠাৎ এসে পড়েছিল এবং পরে ধানক্ষেতে মাধালি রোমনিকে খুঁজেছিল। ধানক্ষেতে যদি নাই পেত তাহলে একথা স্বীকার করতেই হবে যে মেয়েটিকে যেমন করেই হোক খুঁজে বার করত, কারণ তার এই পৃথিবীতে ফিরে আসার চাবিটা একমাত্র ওই মেয়েটির হাতেই ছিল। এসব যুক্তির পরও আর এক কথা তার মনে অনড় হয়ে বসেছিল। এই বিরাট সুন্দরী মেয়েটি কোথায় যেন ফুলের ছায়ার মতই ম্লান। এই ভাবনাটাকে সে দুৎ বলে উড়িয়ে দিতেই চাইছিল, কিন্তু কি করেই বা সে তা করবে। মেয়েটিকে আটকাবার জন্যে বহুবারই ভেবেছিল—কিন্তু তাহলে আলোটাই বা তার কাছে কি? এখন মনে হয় অনেকটা মনকে আঁখিঠারা সূত্রেই হয়ত সে আলোর কথাই ভেবেছিল তা ছাড়া আর কিছু নয়। মাধালি এবার বাঁধা কাপড় নিয়ে পায়চারী করতে গিয়ে টান খেলে, সে দাঁড়িয়ে পড়ল। নিজের উপর তার বড় রাগ হল, সে কোনটা মানবে ঠিকই করতে পারছে না, একবার মনে হয়েছিল জীবন থেকে যে স্বর্গ বহুদূরে, তার যে আলো, আজ আর তার সে আলোর প্রয়োজন নেই। এখন তাকে যেন কে ঠেলছে, ক্রমাগত ঠেলছে।

রোমনি ঠেকা কাঁকে করে আর একটি গাছতলায় দাঁড়িয়ে ছিল, তার হঠাৎ কেমন যেন সরম হচ্ছিল। কি করে সে এগোবে তা ঠিকই পাচ্ছিল না। চুপ করে থেকে সে মনস্থ করলে—‘আমার আবার লজ্জা কি—আজ লাচনী কাল ঢেমনী হব।’ ভূতের রোজা যেমন করে মেরে সিধে করে তেমনি করে নিজেকে সিধে করে এগিয়ে এসে বললে, “নাহালে হে—কাপড় শুকাল?” বলে মেলে ধরা কাপড়ের পাশ দিয়ে তার দিকে চোখ রেখে এগিয়ে এল। এমনভাবে আসতে যেন তার সমস্ত দেহ কাঁপছিল, হাওয়ায় কাপড়

পায়ে পায়ে জড়াচ্ছিল, কতবার এইটুকু পথের মধ্যে কাপড় সঠিক করেছে, এসে দাঁড়িয়েই বললে, "কি কাপড় ত শুকিয়েছে যাবে না—"

মাধালি অনেকটা বাস্তব। অসম্ভব সাদামাটা তামাক পাতার মত বিরাটত্ব আছে কিন্তু তার সবুজতা গেছে, যেন অনেকটা লাঙল করেছে, মনে হয় কড়া ভেদ করে তার হাত জ্বলছে। এর জন্যে রোমনির চাল কাঁড়াতে যাবার কোন প্রয়োজন ছিল না, আঁকাড়া চালই এর পক্ষে সঠিক। রোমনি কিছু দূরে টানান কাপড়ের সামনেই দাঁড়িয়ে রইল, কাপড় ঝটপট করে উড়ছে রোমনির মুখে চোখে লাগছে, কখন পিছনের দৃশ্যও দেখা যায়। মাধালি কি যে দেখবে, রোমনিকে না অন্যকিছু। আগের ভাবনায় যৎকিঞ্চিৎ ভীত হয়েছিল তথা কতক লজ্জা হয়েছিল। রোমনি মুখে টানান আদশাদা কাপড়ের আলো পড়ে বিশেষত স্পষ্ট হয়েছে, এখন তার বোষ্টুমী খোঁপায় কিয়ৎ পরিমাণে কর্মব্যস্ততা লক্ষণ, ডান হাতটা চালের মধ্যে খেলা করে বেড়াচ্ছে। মাধালির মনে পড়ল, এই সেই মেয়ে যে তার বুকে ফুঁ দিয়েছিল।

রোমনি একটা অগাধ বিশ্বাস নিয়ে রসিকতা করলে—"কি হে—শুঁকে দেখবে নাকি আমি কে?" কিন্তু হাসিতে তার হরিণ-খুরো আওয়াজ হল না, নিজে যেন বোকা হয়ে গেল, মনে হল এতক্ষণ বাদে সে মাধালিকে দেখে ভীত হল। জনশূন্য স্থানে অল্প অল্প অন্ধকারে সে ত্রস্ত, আর মাধালি ক্রমাগত এগিয়ে আসছে অথচ মাধালি একই ভাবে দাঁড়িয়ে। তার গায়ে গাছের পাতার ফাঁক বেয়ে সূর্য্যের আলো কুচো কুচো হয়ে পড়ছে। অবিকল সে যে আয়না-বসান-চুড়ির এক টুকরো। মাধালি তার সহজ রসিকতায় মাথাটা দুলিয়ে বললে,—"ঠিক এমনিভাবে ছাকনা আমায়ও দিতে হবে হে—আমি মাছ পাব—" একথা রোমনিকে নিকট করার জন্য—না অন্য কিছু তা বুঝল না।

এ কথায় রোমনি হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়েছিল, কারণ এ কথার পিছনে চার পাঁচ দিনের দুঃসহ অতীত ছিল কিন্তু সে মাথাটা ত্বরিতে সেদিক থেকে ফিরিয়ে নিয়ে বললে—"ই বাব্বা—বড় ভাল হবে হে, চাল কটা—ছাতু আর মাছ খুব খুব পোয়াতি পসন্দ হবে—লাও ধর—ছাকনা চাইব লটাই-এর মায়ের ঠেন?"

মাধালি কঠিনভাবে তার দিকে চাইল, এভাবে তার সংকল্পকে উড়িয়ে দেওয়া তার খুব যে খারাপ লেগেছিল তা নয়। ঠোঁটের পিছনে স্মিতহাস্য থেমে গিয়েছিল—, কিন্তু মুখে চোখে যেন মর্মাহত ম্লানভাব হয়েছিল, এমনভাবে সে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর শুনলে, রোমনি বলছে—'লাও কাপড় শুকিয়েছে পরে লাও; মাথায় এক আঁজলা জল দিও হে, মাথা পাথর হইছে,—লাও আর লয় হে—" বলে সে মাধালির কেন্দ গাছে বাঁধা কাপড়ের খুঁটটা খুলে দিতেই কাপড়টা মাটিতে পড়ল, সে নীচু হয়ে কাপড়টা যেমন ধরতে গেল দেখলে কাপড় সরে যাচ্ছে, মুখটা অল্প তুলেই সেই ফিক করে হেসে উঠে, ওইভাবে একপা এগিয়ে একটা হাঁফ ছাড়তে ছাড়তে উঠে সহাস্যে বললে—"বাব্বা আবার রগড় জান দেখি!" বলে আঁচলের খানিক ভান করেই মুখে দিল। চোখ দুটি ক্রমে হাস্য থেকে সহজ হয়ে এল। এ কারণে যে যার উদ্দেশ্যে এ সকল কথা সে অত্যন্ত আপন মনে কি যেন বা বিড় বিড় করে বলছিল। রোমনি একবার কানে হাত দিল শোনবার জন্য কিন্তু তার পর মুহূর্তেই সে মাধালির দিকে এগিয়ে গিয়েছিল। মাধালি তখনও কাপড় কুঁচতে ব্যস্ত। রোমনি জিজ্ঞাসা করলে—"কি মন্তর পড়ছ হে?" বলেই মনে পড়ল এই লোকটার নাম করে একটা তুলসীগাছ পুঁতবে ভেবেছিল। মাধালি মাথাটা নাড়িয়ে একটু চুপ করে থেকে বললে—"আচ্ছা কুষ্ঠ কেনে হয় হে?" বলে অতি শিশুর মত লজ্জিত হয়ে তাকিয়ে রইল।

রোমনি আর হাসবার চেষ্টা করলে না, অসম্ভব গম্ভীরভাবে বললে—"পাপ?"

কথাটা এখানকার সমস্ত মুহূর্তের মধ্যে পাথর হয়ে উঠল। মাধালি স্বপ্নের মধ্যে যেন দৌড়তে লাগল, সে হাত দিয়ে দৌড়ায় না বুক দিয়ে দৌড়ায় তা তার জানা নেই। পাপ কথাটা যে পাপ করতে পারে, পাপ হতে পারে তা তার জানা ছিল না। ঝোড়ো হাওয়ায় যেমন মহুয়া ফুট ফুট করে গায়ে পড়ে তেমনি কি যেন তার গায়ে পড়ল, সে ক্ষণেকের জন্য অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিল, ভীত ভাল্লুকের মতই টলে গিয়েছিল। মাধালি নিজেই উচ্চারণ করলে "পাপ!" রোমনির দিকে একবার চাইল, তার এরূপ বিকারে যেন একটি সত্য স্পষ্ট হয়ে উঠল, যে সে এতক্ষণ ঐ কুষ্ঠ রোগীর ভয়েই এখানে দাঁড়িয়েছিল, সে একটু লজ্জা পেয়ে বল্লে, "কি পাপ তোমার মনে লেয়—"

কথাটাকে থামাবার জন্যে সে হঠাৎ বল্লে—"পাপের আবার কি পাপ কোন পাপ, পাপ পাপ—একি

মুরগী তার বড় ছোট হবে—? হলেও মুরগী মুরগীই” কথাটা খুব সাধারণভাবেই বলেছিল, গভীরতা গুরুত্ব দেবার কোন চেষ্টা ছিল না।

মাধালি কথাটা যেন হাত দিয়ে অনুভব করল। কথাটা তার কাছে সত্যি তাকে চার্চের আবহাওয়া এনে দিয়েছিল, বাঁধের জলজ শৈত্য এখনকার ভ্রমর-গতি হাওয়ার মধ্যে ছিল। অল্প আরামের মধ্যে সে প্রশ্ন করল—“এ লোকটার কি পাপ গো—?”

“তা কেমন করে জানব, ও জন্ম জন্মান্তরের পাপ—লাও চল আর দেরী লয়” বলে রোমনি একটু এগোবার জন্য প্রস্তুত হল। মাধালির পা যেন নড়ছিল না। আবার সেই কুষ্ঠ রোগীটাকে দেখতে হবে ভাবতেই তার গা কেমন করে উঠল। দুজনে কোন কথা নেই আস্তে আস্তে বাড়ীর দিকে যেতে লাগল। রোমনি যেন কথা খুঁজে না পেয়ে বললে—“তুমি তো বোঙ্গা গো, ইচ্ছা করলে পাপমুক্ত করতে পার না?”

“এ কথা কেনে?”

“রকম দেখে”

মাধালি একথায় প্রশ্ন করতে গেল—রকমের কি দেখলে, কেননা সে তার প্রশ্নে বেশ ক্ষুণ্ণ হয়েছিল এবার বাড়ির দিকে যতটা সে এগিয়ে আসছিল ততই তার মন ভয়ে কঠিন হয়ে উঠছিল, তার বোধশক্তি ক্রমশঃ বেড়ে উঠছিল। তার শরীর যেন হিম হয়ে উঠছে; রোমনি তার দিকে দুবার তাকিয়ে দেখেছিল, তাকে সজাগ করবার জন্যে কুঁড়ো হাতটি কাপড়ে সশব্দে ঝেড়ে নিয়েছিল। এবার তারা দুজনে এসে দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। অদ্বৈত মিশ্র দরজার দিকে এতক্ষণ চেয়েছিল, তাদের কাপড়ের প্রান্ত দেখেই ছেলেমানুষের মত মুখ ঘুরিয়ে বসল।

রোমনি উঠানে পা দিয়েই বললে—“জটাই বেলা পড়বার আগে গেলে খুব—”

জটাই কথাটা প্রথমটা ঠিক বুঝে নিতে পারেনি, তার নিজের চোখেই দৃষ্টি আটকে ছিল, যখন সে বুঝলে তখন তার চোখে নাকে জল ঘুকে এল, একবার মাথায় হাত বুলালে একবার বাঁ হাতটা ডান হাতের মধ্য দিয়ে চুলকাতে লাগল। গদ্ গদ্ ভাবে বললে, “—সে বেশ হবে গো, সন্ধ্যে লাগাত পৌঁছাব—।” তার নিজেকে সমর্পণ করে বললে—“আর আমি যখন আছি তখন ভয় ভক্কারী লেই, কি বল ঠাকুর—?”

ঠাকুর অদ্বৈত বাবু হয়ে বসা হাঁটু দুটি উঁচু করে ঘানি ঘোরা ঘুরে এদিকে ফিরে বসল। এইটুকুতেই সে সত্যিসত্যিই খুসী হয়েছিল। রোমনি এতক্ষণ কোনদিকেই চাহেনি, সে চালের ঠেকাটা পুবের ঘরের দাওয়ায় রেখে চুপ করে দাঁড়াল, কাকে যেন জব্দ করতে গিয়ে নিজেই জব্দ হয়েছিল বেশী, তার কষ্ট হচ্ছিল সে আপনকার ঠোঁট দাঁত দিয়ে চেপে কিছুটা লাঘব করল, তার নিজেরই মনে হল। শুধুই মনে হল চোখে যেন জল আসছে, দৃষ্টি ঝাপসা, ফলে বারবার চোখের পাতা ফেলতে লাগল। কিছু পরে দাওয়ায় উঠে উঠোনের দিকে তাকাল, দেখলে মাধালি সেইখানেই দাঁড়িয়ে আছে, ওর মুখের ভাব কেমন বিস্ময়কর। রোমনি নিজেই বুঝে নিলে যে তার এই কথা দেওয়াতে মাধালি নিশ্চয়ই কষ্ট পেয়েছে এরজন্যে কিয়ৎ পরিমাণ খুসী হয়ে সে শুধু বললে—“ও ঠেন দাঁড়িয়ে কেনে পারকেমে উঠি বস হে—” বলে সে অদ্বৈত মিশ্রের দিকে একবারও চাইবার চেষ্টা করল না। নিজের কাপড় ঝাড়তে লাগলে যেন অনেক কুঁড়ো লেগেছে। অদ্বৈত মিশ্র তার কথায় যতটা খুসী হয়েছিল, এখন ততটাই বোকা বনে গেল। মাধালির শরীরের দিকে তাকিয়ে নিজেকে বড় অকিঞ্চিৎকর বলেই মনে হচ্ছিল, কুষ্ঠ না হলেও এত পৌরুষ তাদের জাতে নেই, হাজার বন্য হন্যে থাবা এক হয়ে আছে। এখানে তাকে হার মানতেই হয়। কিন্তু তার এক যুক্তি দিয়ে জিততে পারে—, সে ব্রাহ্মণ আর সে ছোটজাত সাঁওতাল উপরন্তু ক্রিশ্চান। মাধালির ছায়াই যে কোন বামুন কায়েতের সর্বস্ব খসিয়ে নিতে পারে। অদ্বৈত মিশ্র ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিতে নিতে বললে, ‘ক্রেস্তান—’। এ কথাটায় শুধু তার ঠোঁট কেঁপেছিল।

মাধালির পা উঠান থেকে নড়েনি তার কারণ ভিন্ন, সে শুধু পালাতে পারেনি নাহলে মনে মনে অনেক বাসনাই তার হচ্ছিল। এতগুলো চাহনির মধ্যে সে বেঁকেচুরে গিয়ে, দাওয়ায় উঠে পারকোমের উপর বসেই উঠে পড়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে শুনলে—“উখানেই বস হে” সে বসে পড়ল। অন্যদিকে মুখ করে থাকলেও তার দৃষ্টিটা ছিল এইদিকে। এক এক সময় নিজের উপর আঁখিঠারা শাসন যে ছিল না তা নয়।

ওদিকের দাওয়ায় রোমনি আকা ধরাতে ব্যস্ত তারপর সে এ দাওয়া থেকে ডোলটা নিয়ে গেল, একবার সে ছাতিগুলো নিয়ে গেল, চাল ধুলে দুধ উথলে উঠল ছোট একটা হোলাতে ঢাললে, শাল পাতায় একটু গুড় একটু ভিজে চাল নিয়ে, ছোট হোলা, আর পাতাটা নিয়ে এসে কিছু বলতে দাঁড়িয়ে বললে, "চল ঘরকে—।"

মাধালি যেন বেঁচে গেল। কিন্তু প্রবেশ করেই, তার গলার স্বর সে যেন হারিয়ে ফেলেছিল, ও পাশে ছোট আয়নাটা তাকে যেন ঢুকতেই দিচ্ছে না, প্রত্যেকটি সাজ তাকে যেন অবশ্যই অপছন্দ করছে, মাধালি প্রায় রোমনির গায়ের কাছেই দাঁড়িয়েছিল, রোমনি একটু সঙ্কুচিত হয়ে শাল পাতাটা বাড়িয়ে দিয়ে বললে—"লাও মুখে দাও," বলে মাধালির হাতে দিল। মাধালি সেদিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে তার দিকে সভয়ে চাইল, রোমনি তখন দুধকে ঠাণ্ডা করার জন্য ফুঁ দিচ্ছিল। মুখটা তুলে বললে—"দুঃখ চাটির ঘরকে আর কি মিলবে হে, চাল কটা চিবিয়ে লাও।" বলে আবার দুধে ফুঁ দিতে লাগল। রোমনি সত্যিই তার কাছ থেকে কোন একটা কথা আশা করছিল, অন্তত ছোট একটু কাতর চাহনি। কিন্তু মাধালি অসম্ভব জড়সড়, সে রোমনির চোখের আয়তন দেখে কিন্তু ত্রস্ত হয়ে পাতাটা থেকে চাল কটা ডান হাতে ঢেলে নিয়ে আলগোছে মুখে ঢেলে দিয়ে ছাগলের মত চিবতে লাগল, পরে যখন তার ধারণা হল রোমনির দৃষ্টি একটু অন্যদিকে সে খপ করে গুড়ের দলটা মুখে ফেলে দিয়ে, বড় বড় চোখ করে চিবতে লাগল। এই সময়ে রোমনি আঙুল দিয়ে দুধটা ঠাণ্ডা হয়েছে কিনা দেখে বললে,—"লাও—খাও—"

মাধালি এক চুমুকে দুধটা খেয়ে বাটিটা কি করবে ভাবছে এমন সময়ে রোমনি বাটিটা নিয়ে আস্তে বাঁ হাতের তালুতে ঠুকতে ঠুকতে বললে—"আচ্ছা তোমায় এত সব করছি কেনে কি মনে লয়—" বলে ওর দিকে গভীরভাবে তাকিয়ে দেখতে লাগল। মাধালি এ প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না, প্রশ্নটা তার কাছে খুব খারাপ বলে বা অন্য কিছু বলেই বোধ হলনা, সে শুধু তার দিকে তাকাতে পারছিল না, তাছাড়া তার মধ্যে অন্য কোন বৈলক্ষণ দেখা যায়নি। সে অল্প হাঁ করে অসহিষ্ণুই হয়েছিল। রোমনির আর দেরী সইছিল না, নিজের ভিতরে কে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। সেখানে যেন জল নেই ড্যাঙ্গা নেই। পাতার মর্মরের জন্য কেন বায়ু সঞ্চালিত হয়না, এমনিকি ডানার জন্য কোন শূন্যতাও নেই বাতাসে। কেন যে এমন হয়ে উঠছে সে নিজেই হয়ত তা জানে না। তবু মাধালি তেমনি ভাবেই দাঁড়িয়ে, রোমনি নিজের দেহটাকে আর কিছু বড় করে বলে উঠল, "জানিস মা তুমি ধান দিয়েছ ছাগল দিয়েছ"—বলার শেষে তার মুখে অযথা হাটুরে হাসি খেলে গেল। তার কথাটা সে ভেবেছিল মাধালিকে খুব ফাঁকা করে দেবে, এবং সেই সঙ্গে নিজেকেও হয়ত বাঁচাতে পারবে। নিজের কাছেই জবাবদিহি করতে পারবে যে তার 'গা—পোড়া' ইত্যাদি লক্ষণ সে শুধু সারারাত ধান রুয়ার জন্য বটে, আর একবার স্পষ্ট করে চেয়ে দেখলে, মাধালি কাতরভাবে তার দিকেই চেয়ে আছে, কোলের ছেলে যেমনভাবে চেয়ে থাকে। কিন্তু রোমনি আর দাঁড়াল না এক পা আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল, তারপর দ্রুত ঘর থেকে বার হয়ে সে হেঁসেলে গিয়ে উঠল। হয়ত আশাও করেছিল ঘর থেকে বার হবার সময় মাধালি তার আঁচল ধরবে আর সে সেই পিছু টানে সমস্ত পৃথিবীটাকে আপন নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে জীবন দান করবে। এমন কি স্রোত হয়ে দেখা দেবে এমনকি ডানাকে সঙ্গীহীন আকাশে নিয়ে যাবে, কিছু নীল এনে মাটিকে আরও সবুজ করবে, আর তারার খবর এনে কল্পনাবিলাসী করে দেবে। মাধালি যেন জড় হয়ে আছে, তার ভিতরে কিছুই নেই। রোমনি উনুনে কাঠ ঠেলে, উবু হয়ে বসে গালে এক হাত রেখে চুপ করে বসে রইল।

অদ্বৈত মিশ্র রোমনিকে গভীরভাবে দেখলে। কিছু বলবার ছিল কিন্তু বলবার তার সাহস ছিল না অবশ্য তার বলার মধ্যে হয়ত যেচে সোহাগ নয়ত অন্য কিছু হঠাৎ তার দিকে মুখ করে রোমনি বললে—"ঠাকুরপো খেতে একটু দেরী হবে গো" আর কিছু পরে বললে "কেন বলছি জান—সেই ধান আর ছাগলটা দিলে, তাই এতশত, না কম দেড় টাকা সিকে হবে বটে?" বলে সরলভাবে তার দিকে চেয়ে, হাঁটুর উপর মাথাটা রাখলে, কেননা মনটাকে একটু ছাড় দিতে চাইছিল, নানারূপ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালনার কাজে তাই ব্যাপৃত থাকা। এখন নিজের প্রতি যে শ্রদ্ধা হওয়ার ভাব হয়ে আসছে তাকে আপনার দেহ দিয়ে ধরে রাখার ক্রমাগত বাসনা তার হচ্ছিল, দেহকে নিঃসাড়ে রাখলে সে শ্রদ্ধা যেন আসতে পারে।

রোমনির উত্তরে অদ্বৈত মিশ্র খুব খুসী হয়েছিল বলা ন্যায়সঙ্গত হয় না; শুধু সে এই কথায় আবার

তার থ হয়ে থাকা হাঁটু নাচিয়েছিল, সরল নিঃশ্বাস ফেলেছিল; এই কারণে যে, রোমনি তাকে অবজ্ঞা করেছে লাঞ্ছিত করেছে যেমন সত্য, তেমন ইদানীং এই উত্তরের দ্বারা তাকে কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য হয়েছিল তাকে মান্য করেছিল সত্যই তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতে পারেনি। সে যেমন একমুঠো মহুয়া, দুচারটে আমলকী পেলে খুসী হয় তেমন এখনও অর্থাৎ এখানে এই কথায় খুসী হয়ে নিজের পড়ে যাওয়া পৈতেটা কাঁধের উপর ঠিক দিয়ে রাখলে। অদ্বৈত মিশ্র খুঁটি ধরে উঠে দাঁড়াল, পুনর্বার রোমনির উত্তরকে নিজের কানেই বাজিয়ে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে অন্য কানে ইতিপূর্বে গঞ্জনাও শুনতে পেলে। চোখ নামিয়ে তাকাতেই দেখলে, ফুলের কেশরের মত রহস্যময় দুটি চোখ যেমন বা জলে চোখেরই প্রতিবিম্ব পড়েছে। ধোঁয়া যেমত বা হঠাৎ উঠে সমতল হয়ে আঁকা বাঁকা হয়ে যায় তেমনি রোমনির দেহ এবং হাঁসের মত বাঁকা ঘাড়ের শেষে মুখমণ্ডল। ওপাশে উনুনে হোলায় জল সব ফুটছে, এপাশে ছাতিগুলো পড়ে। সে সত্যই আকৃষ্ট হয়েছিল এবং সেই সঙ্গে অস্বস্তিও বোধ করছিল। যেহেতু হাতের উপর ন্যস্ত এই মুখখানি। বিরাশী পটিদারের আঁকা মত, অসম্ভব জবুস্থবু অনেক দুঃখময়। রোমনির মুখখানি পলকের জন্য নড়ে উঠেছিল, তৎসহ সমস্ত পৃথিবীটা যেমন নড়ছে তারই শব্দ এল। অদ্বৈত আর স্থির থাকতে পারলে না, সে সহ্য করতে পারল না, তার দুঃখভাব দেখে তার ঈর্ষা হয়, দাওয়া থেকে নেমে সে মুখ ফিরিয়ে নিম্নস্থিত একটা হোলা থেকে জল নিয়ে হাত ধুয়ে আবার উঠে এসে যেখানে বসল সেখানে ছোট করে ঠাকুরের পাট। বসে মাথায় জল ছিটিয়ে ছোট চন্দন পিঁড়িতে একটি বেল কাঠ ঘষতে লাগল। এক একবার অন্যমনস্ক হয় আবার ঘষে। অদ্বৈতের মন অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হয়ে রয়েছে, রোমনিকে ইতিপূর্বেও স্থির ধীর হতে দেখেছে, বহুবার দীর্ঘশ্বাস ফেলতে দেখেছে, কিন্তু কেমন যেন বা নতুন। নতুন বট পাতার মত বিস্ময়কর। সন্ধ্যার গেরি মাটির মত রঙ। একবার টুক করে তাকে দেখে নেবার ছুতো খুঁজতে লাগল। ইচ্ছা হল দাঁড়িয়ে উঠে রোমনিকে সে দেখবে।

রোমনির এমনিভাবে বসে থাকতে আরাম লাগছিল। তার বিশ্বাস সে যেন জন্ম জন্মান্তর এইভাবে বসে থাকতে পারে। একবার তার ঘুমে চোখ বুজে আসছিল, নিজের মিথ্যা যখন মানুষের মনে ক্রমে বসে যায় তখন মানুষে হাঁ হাঁ করে উঠে। ভাঙা কম্পনে যথাযথ বোধ আচ্ছন্ন করেই, নিস্তার পাবার নিঃশ্বাস যে কোথায় ওম হয়ে যায় তার খোঁজই পায় না। এমন সময়ে একটা ছাগল দরজা দিয়ে ঢুকেই, সোজা এই দাওয়ায় রোমনির কাছে এসে দাঁড়াল, সে চমকে উঠে। হঠাৎ ভেঙে, টাল না সামলাতে পেরে পিছনে হাত দুটি মাটিতে রেখে সেই সামলে সেইভাবেই বললে, 'মরণ' বলে পা উঠিয়ে আর একটু হলেই লাথি মেরে হটিয়ে দিতে গিয়েই নিজের বুকের দিকে নজর পড়ল, নিজেই ভীত হয়ে ঢোক গিলে আস্তে আস্তে একটা হাত উঠিয়ে নিজেকে সংযত করেছিল, তারপর ছোট একটি মুখ খারাপ নিঃশব্দে আওড়ে নিয়ে বললে—"ঠাকুরপো—হারামজাদাকে বাঁধত।"

অদ্বৈত সুযোগ পেয়ে তীক্ষ্ণ স্বরে উত্তর করলে, "তোর জ্বালায় কি একদণ্ড বসতে লারবো আমি।"

কখন থেকে রোমনি যে চীৎকার করে উঠবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল, তা সে নিজেই জানত না। নিজের ভিতর থেকে কে যেন লাফ দিয়ে উঠল, এই ভঙ্গিতেই চরকির মত ঘুরন্ত হয়ে সে অল্প উঠে, এক হাত কাপড় বুকে চেপে অদ্বৈতের পিঠের দিকে চাইল। বুকটা তার ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে, এখনও উদ্বেল কম্পন। নিজের ক্রোধটা তার নিজের মাথায় যেন ঠাণ্ডা হয়ে গেল, সামনে জটা অবাক হয়ে আছে। এ পাশের ঘরে দুয়ার হাওয়ায় নড়ছে সেখানে যাকে আশা করেছিল সে নেই। রোমনি উঠে একটু জল ঘাড়ে মাথায়, একটু ছিটে ছিটে পায়েও দিলে, ভিজে আঙুল পায়ের আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে দিতে লাগল। অদ্বৈত নিজের উত্তরে একটু দমে ছিল, এবং সেই ভয়ে সে অত্যন্ত সুর করে কৃষ্ণের অষ্টতর শতনাম আবৃত্তি করতে ব্যস্ত। রোমনি যেন কথা কইবার অবকাশ না পায়। রোমনি জল দেওয়া সত্ত্বেও ফেটে পড়ছে, একবার সে আবৃত্তি করতে শুরু করে দিলে। অনেকক্ষণ তার ঠোঁট উঠা নামা করলে। কিন্তু ভিতরে আরজন রক্তচক্ষু মেলে বলে চলেছে, শালা আমার সঙ্গে ঘুংসুড়ি ছক্কে পঞ্জা যে-আমি অন্ধকার খাই, যে-আমি ঢাল লেথিয়ে নদী পার হই, যে-আমি ফরাস কুঁকড়দি হাটের ভীড় কাছে আনি, আমার গা বেয়ে গাছলতো উঠবার চাগাড় দেয়—শালা—একদেহের হিমে লক্ষ্মী-পূর্ণিমার আগত হাঁসের ডানা খুলে যায়—বন্ধ হয়। রোমনি অসম্ভব বিচলিত হয়। ঘোর রাতের দিকে চেয়ে দেখলে, তার মনে হল, কাল রাত থেকে এমন গেছে যে আজ তার দেহ মনে যেন কে ভেল্কী খেলছে।

রোমনি উঠে, শিকে থেকে একটা ছোট হোলা নাবিয়ে নিয়ে খানিক গুড় বার করে অন্যমনস্কভাবে চাটতে লাগল। এখন ছোট ছোট দূর-কানাই শহর পাহাড়ে চোট খাওয়া হাওয়া আসছে, এ হাওয়া মাটিতে গড়িয়ে গড়িয়ে যায় উঁচুতে উঠে ধানগাছে খেলা করে, পাতা উড়ে, রোমনি হাওয়া অনুভব করলে। কিন্তু তার দেহের ভাঁজে এখন চোখের রক্তিমতা রয়েছে। সে সেদিকে আর মন না দিয়ে গুড়টুকু শেষ করে, হাতটা ধুয়ে আলগোছে জল খেলে, তার বিচার অল্প অল্প আছে। মুখের কষ কাপড় দিয়ে মুছে সোজা নেমে এল জটার কাছে। জটা বসে আছে, ঘরের কাঠামোর ছায়া এখন কৃষ্ণ গভীর। রোমনি কাছে আসতেই সে যেন আহ্লাদে পঞ্চমে অস্তি শূন্য হয়ে গেল। রোমনি চুল শুকবার জন্যে আঙুল চালাতে চালাতে বললে,—"হ্যাঁরে যস্তিটা কিসের—?"

"কেনে বললাম ত লবাবুর মেয়ের সাদ—।"

"বলিস কি—এই ত সেদিন বিয়ে হল—ক'মাস হলরে, মেয়েটা বারোয় পড়ল বটে—না?"

"তা বামুন বাড়ীর—বিটি ছানা।"

"তা বটে—লবাবুর বড় বিটিটাই বাঃ বাঃ ও হোরে—সে খালি পেটে ভাত খেতে পায় না গো—।"

"তা—লা। পাক ছাট্টি বামুন না জন্মালে এ মারাট্টা দেশে, বৃষ্টি হবে কি করে গো—খালি পাহাড়, আর শাল, পিয়াশাল—খাড়ি জমি—দেখ গা গঙ্গাড়ী দেশ—মা গঙ্গা লিজেই পৈতে—কত বামুন কত কোম্পানী হে—কি বল।"

এখানেই কথাটা থেমে গেল। দুজনেই কিছু বলবার চেষ্টা করেছিল, রোমনি এ কথায় বেশ স্বাভাবিক হয়ে থাকবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু অনবরত দরজা ধাক্কা দেওয়ার মতই শুনছে, সদর দরজা হাওয়ায় দুলছে ঘরের দরজাও দুলছে—তারই কটু আওয়াজ আসছিল। বিট্‌লের মত উড়ে যায় আবার ধপ করে পড়ে।

"বল গা যাদু—যাদু জিনিষ দিবে গো। ইয়ার শশুর ইউনিয়নের চারমান (চেয়ারম্যান) মনে লাই, বর আসছিল হাঁতী করি।"

এখানে এই সাধারণ কথা সত্যিই আবার তাকে পাগল করবার চেষ্টা করছিল। কোথায় যেন রোদবৃষ্টি একসঙ্গে হচ্ছে। তার নিজের মনে হল যাই একটু আমানির জল খাই, ভাবার সঙ্গে সঙ্গে সে এসেই হেঁসেলে ছোট আদ পোঁতা কলসী থেকে অল্প আমানির জল (কাঁজির মত) বার করে খেতে লাগল। আর নিজেই বলতে লাগল—'আমার শরীরটা ঠাণ্ডা হল।' কিন্তু তবু মন শান্ত নয়, হঠাৎ অদ্বৈতর কাছে এসে দাঁড়াল—অদ্বৈতর পূজা হয়ে গিয়েছিল, তার কাছে বসে পড়েই খপ করে পৈতেটা ধরে বললে—"এটা আগে ধর", বলে মুঠোটা এগিয়ে দিলে।

অদ্বৈত বোকার মত হয়ে গেল, সে রোমনির দিকে চেয়ে দেখল তার মুখের ভাব বৈশাখের ঝড়ে ছেঁড়া পাতার মত, হিতাহিত মানশূন্য সে বললে—"নিলাম পৈতে, কিন্তু তোর কি হলরে—এমন করিস কেনে?" রোমনি ক্রমাগত মাথা নাড়তে লাগল—"না আমি শুনব না।" অদ্বৈত অসম্ভব শঙ্কিত হলেও বোধ হারায়নি, গলা তার শুকিয়েছিল—সে কোনমতে চরণামৃতের পাথর নিয়ে মুখে আলগোছে ঢালতে গিয়ে কিছু মুখে এবং এখানে সেখানে পড়ল, কয়েকটি চাল চিবুকেও পড়েছিল—ঢোক গিলে, এক হাতে পূজার পাট একটু সরিয়ে রোমনির মাথায় হাত দিয়ে বললে—"রোমনি, রুমনি বলবিত বলবিত—"

"বল আমি বাপের মেয়ে কি না বল—?"

অদ্বৈত এ প্রশ্নে অবাক হয়েছিল, এ প্রশ্ন তাকে অনেকদূরে ছিটকে ফেলে দিয়েছিল। রোমনির হাত আলগা হওয়ায় সে নিজের ঘাড়ে হাত বুলাতে লাগল। অন্যান্য দিন ঝগড়ার পর—রোমনি এসে তাকে জড়িয়ে ধরে মান ভাঙায় ছেলেমানুষের মতই এবং এইটুকুর লোভে কুষ্ঠরোগী অদ্বৈত সাংঘাতিক ব্রহ্মতেজ দেখায়। আজও সে কিছু আগে রুষ্ট হয়েছিল কিন্তু রোমনি আসেনি। এখন সে যেন বা তাকে অনেক বেশী করেই পেলে। সে তাই প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে চুপ করেই ছিল। পূজার পাটের কাছে যে চড়াই পাখীগুলো নিত্য আসে, তারা যারা ত্রস্ত হয়ে পালিয়েছিল তারা এই নিস্তব্ধতার সুযোগ নিল। অদ্বৈত অনুভব করল রোমনি যেন চমকে উঠছে। এখন তার পায়ে দু এক ফোঁটা গরম অশ্রুবিন্দু পড়ল।

সে এবার তাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বললে, "রোমনি ভাত পুড়বেরে, উঠ"—কিছু থেমে বল্লে—"কোন শালা বলে তুই বাপের মেয়ে না—একশবার—যে বলবে না তার মুখ দিয়ে রক্ত উঠবে—বুঝলে হে জটা এর বাপ ডবল যোয়ান হঠাৎ কলেরায় মরে। অবশ্য লোকে বলে খনিতে পড়ে মরেছে সেটা হক্ কথা নয়"—বলে এদিকে মুখ ফেরালে, রোমনির মাথা প্রায় তার বুকের কাছে, এতে তার কল্পনাতীত গর্ব হয়েছিল। রোমনি দূরে কোথাও যায়নি। এই সত্য উপলব্ধিতে তার কোথাও কোথাও অবশ শরীরটা বলশালী হয়ে উঠেছিল সে আহ্লাদে বল্লে—"সামনে রাধা গোবিন্দ আছেন আর আমি অদ্বৈত মিশ্র পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠর শ্রেষ্ঠ বলছি" বলে পৈতে খুঁজে হাতে নিয়ে বাগিয়ে ধরে আবার বল্লে—"আমার মত ত কেউ জানেনা, তুমি বাপের মেয়ে।" বলতে বলতে সে যেন সংজ্ঞা হারাচ্ছিল। তারপরই বল্লে—"উঠরে ভাত গেল, ভাত যে গেল।" বলে তাকে সস্নেহে সজাগ করতে লাগল। রোমনি আস্তে আস্তে মাথা না তুলেই মুখটা ঘোরাতে দেখলে জানলায় কে একজনা। দেখে সে প্রথমটা বুঝতে পারল না লোকটি কে। একি সেই কপাটবক্ষওয়ালা লোক যাকে বারবার প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করেছে, ঝড় এনেছে, বারিপাত এনেছে, বিদ্যুৎ সংঘাত করেছে এমন কি প্রলয় আনতেও প্রস্তুত, যার জন্যে এতটা সময় কাঁচা কাঠের মতই জ্বলছে জল বার হয়েছে শব্দ উত্থিত হয়েছে এবং ক্রমাগত পুড়েছে রোমনি। গভীর একটি দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করে কোন রকমে উঠে দাঁড়াল। উঠবার পূর্বে তার মনে হয়েছিল যে এই কুষ্ঠরোগীকে জড়িয়ে থাকি যাতে তার মাথাটা ঘুরে যায়। সে শুনতে পেলে তার নাম কিন্তু সে সেদিকে মন না দিয়ে ভাত নামিয়ে ফেন গালাতে লাগল। অদ্বৈত কোনদিকে নজর দিতে যেন অপমানিত বোধ করলে, একবার তার মনে হল রোমনির এমনভাবে তাকে সাক্ষীমানা এমনভাবে স্বীকার করিয়ে নেওয়ার প্রয়োজন কি ছিল, বুঝতে গিয়ে বুঝতে না চেয়ে সাধারণভাবে বললে—"উ কি ওতটা মাড় ফেললি যে—ভাত থাকলে উ বেলাকে হত—" বলে ফেলে সে যেন লজ্জিত হল, কারণ দীন অবস্থা স্পষ্ট করার কোন হেতু ছিল না।

রোমনি কোন উত্তর দিলে না। ভাতটা রেখে একটু জল আর এক হোলায় চাপিয়ে সে হাত ধুয়ে এখানে এ ঘরে এল। লোকটি মাধালি বল্লে, "আমি কি একা থাকব?"

এই কথায় রোমনির রোমাঞ্চ হল। তার শরীরে ক্ষণেকের জন্য বিদ্যুৎ খেলে গেল। সে নিজেকে যথাসম্ভব সংযত করে বললে, "তা রাঁধবে কে?" বলে তাকে বুঝবার চেষ্টা করলে, এতক্ষণকার খেলিয়ে তোলা রাগ যেন উধাও হল। মাধালি রুগ্ন চোখে মুখটা ধীরে অন্য দিকে ফেরালে। রোমনি মনের মধ্যে কি এক জোর সঞ্চয় করে বললে—"তুমার ছাগল লিয়ে যাবে হে—আমি লিব না, আর ধানও লিবে—খেয়ে দেয়ে জোর করে লাও—"

"রোমনি তুমি ক্ষ্যাপা হইছ—"

"ক্ষ্যাপা আমি হইছি বটে—"

"এখন কান্‌ছ এখন লাফাইছ—ক্ষ্যাপা হও নাই?"

এই কথাকে আশ্রয় করে রোমনি কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছিল—"আমরা অমন ঢং করি, তোমার গায়ে লাগে কেনে?" ছোট ছেলেকে চিমটি কেটে যেমন আনন্দ পায়, এ কারণে যে পরে ভুলাবে বলে—তেমনি রোমনি আবার বললে—"চাল কত আছে, তোমার খ্যাল আছে হে—।"

"চাল ত না ধান", বলে ম্লান মুখে সে বললে, "রোমনি তুমি সত্যিই ক্ষ্যাপা হইছ—এ ঠেন বস বস—"

রোমনি এমনভাব করলে যেন মাধালি তাকে ধরে বসিয়ে দিলেই ভাল হয়, ফলে তার একখানি হাত তার দিকে কিয়ৎ পরিমাণে এগিয়ে গিয়েছিল। মাধালি আর কোন অনুনয় করছে না দেখে সে বললে—"বসহে কিন্তুক তুমার আলোয়ার গল্প শুনবার তরে নয়—" সে তাকে আহত করতে চায়নি শুধু কথাই বলতে চেয়েছিল তবু তার স্বরে কিছু রূঢ়তা স্পষ্ট হয়ে উঠল।

মাধালি বল্লে—"সে কথা বলবার লেগে তোমায় বলি নাই—তোমার মাথা বড় গরম হইছে, তুমি ক্ষ্যাপা রকম হইছ তাই—" তার ঠোঁটে অল্প হাসি ছিল।

"ক্রেশ্চান, আমার মধ্যে আলা সেঁধিয়েছে হে—"

"সে আমি বুঝছি..."

এই উত্তর তার, রোমনির কানের কাছে অনেকক্ষণ ধরে গুঞ্জন করে ফিরল, কোন কান দিয়ে ঢুকলে খুব ভাল হবে এই ভেবে সে একবার অন্যটি উঁচু করলে, একি শুধু উত্তর। কোথাকার একটি রঙিন রুমালের মত যেটা ট্যাঁকে গুঁজে সে আসরে নাচে সেই রুমালটির মত হাওয়া তার দেহে দেহে লাগল, চোখের পাতাটা অনেকবার পড়ল, সে ভ্রূদ্বয় কুঞ্চিত করে সত্যই বিস্ময়ে তার দিকে তাকাল, এ সময়ে সে এতই অধীর হয়েছিল যে হয় এক চুমুক মদ অথবা চুটায় দীর্ঘ টান দিতে চাইছিল যাতে সে তার দেহ জমে জমাট হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু এর পরমুহূর্তে সে শুনলে মাধালি কথা বলছে।

"রগড় করছো হে—যদি আমার কিছু না মনেই হবে তাহলে আমি কি এমন হই? শেয়াল ক্ষেপা হইছে—ত—তার ভয় থাকে না। আমারও ভয় কিছু নাই—"

রোমনি অত্যন্ত অপমানিত হল, স্বামী পরিবার ব্যসন ব্যাসন সবকিছু তুচ্ছ করে স্ত্রীলোক যখন অভিপ্রেত পুরুষের কাছে যায়, আর সেই পুরুষ তাকে যখন তুচ্ছ করে তখন সে স্ত্রীলোক যেরূপ উন্মাদ হয়, সেইরূপ সেও পাগল হয়ে উঠল। একবার তার ইচ্ছা হল সম্মুখস্থিত লোকটিকে আঁচড়ে কামড়ে দি, কিন্তু তা আর হল না—সে স্থবির হয়েছিল সে প্রাচীন হয়ে গেল। তবু ও দেহ নৃত্য ভঙ্গীতে শিথিল।

মনে হয় মাধালি তার অভিজ্ঞতাকে এড়াবার জন্য একা বসে বসে অনেকক্ষণ চেষ্টা করছিল। এখানে সে সত্যই একা ছিল না। ফুলমালার অমরতা এখানে ওখানে এই ঘরের রকমারি সৌখিনতা দুঃখময় জীবনের অপ্রতিহত প্রতিদ্বন্দ্বী নয় একমাত্র কোল হয়েছিল, ও পাশ থেকে আসা ভাতের গন্ধ, ফলে তদ্‌গত জীবনে কিছুই মনে পড়ে না। একটু শব্দে তবলা তার নিজস্ব শব্দেই রেশ রাখে। তেমনি সকল ইঙ্গিতই এখানে সৌখিনতা ওতপ্রোত করে। ঘরের বহু পুরাতন শৈত্য বড় আরামের, এইরকম সে চেয়েছিল মনকে এখানেই সে খাড়া করে রাখতে খুব চেষ্টা করেছিল। তার কারণ কুষ্ঠরোগের ভয় না, তার অভিজ্ঞতার আকর্ষণ থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্যে অর্থাৎ এখানে ডুবে যেতে—রোমনিকে ভালভাবে পেতে। রোমনির, তার বুকটুকু দেখে যা-কিছু মনে হতে পারে কিন্তু সেখানে কোন জোর ছিল না, সাহসত নাই, এখনও একটা পথ সে বেছে নিতে পারেনি। একবার রোমনির কথা মত মনে হয়েছিল ওতে আমার প্রয়োজন নেই, যে জমিতে বছর শালিয়ানা ধান হয়, যে রাস্তা দিয়ে ধান যায় যে মরাইয়ে আড়াতে ধান উঠে সেই জীবন চাই...এর জন্যে আমি পাপ করতে প্রস্তুত। আমার সরলতা এবং এটা সেটায় ত আর বীজ ধান নয়। পাপ করতে প্রস্তুত এবং রোমনিই তার সহায়। তাকে লাল রঙের একটা ফল বলে মনে হয়েছিল। এই সঙ্গে কিন্তু ক্রমাগত তার যত্নে তার দুঃখ হয়েছিল, এবং যখন সে শুনলে অদ্বৈতকে মাথা খুঁড়ে সে বলছে—"আমি বাপের মেয়ে কিনা বল" তখন কষ্ট হয়েছিল। সত্যিই মাধালির মনে হল তার ভিতরে কেউ আছে, এবং সেই-কেউ বড় নীচু হয়েছিল। তাকে সকল কথা বলতে, এবং এ কথাও বলতে সে সত্যই পাপ যা করবার সে নিজেই করে ফেলেছে, এখন সে তার নিজের বাড়ী যেতে চায়। তারপর পাদরী সাহেবের সঙ্গে দেখা করে যা হয় একটা কিছু করতে তাকে হবেই। মাধালি খুব সহজভাবে পুরুষ মানুষের মত দাঁড়িয়েছিল জানলার কাছে, অনেক ছেলের বাপ যেমন নিজের উঠানের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে ঠিক তেমনভাবে।

রোমনি ঘর থেকে তৎক্ষণাৎই চলে গিয়ে একেবারে হেঁসেলে উঠল, ছাতিগুলো কুড়োবার সময় তার অনেক কল্পনা ছিল। নতুন মানুষটির জন্যে ছাতি পুড়াবে তেঁতুল পাতা বাটা দিয়ে ছাতি রান্না করবে বেশ টকও হবে না অথচ ঝোল ঝোল হবে। ইচ্ছা ছিল ফোড়ন সেঁকে গুড়িয়ে ভাতের উপর ছড়িয়ে দেবে। কিন্তু আর কিছুই হলনা, সে সব ছাতিগুলো গরম জলে ফেলে দিয়ে, পদ্মপাতা ক'টা ধুতে যাচ্ছিল। অদ্বৈত বললে—"সে কি তেঁতুল পাতা আনব না, ছাতি রান্ধবি—!

"না থাক—।"

"কেনে—।"

কোন উত্তর না দিয়ে পাতাগুলো ধুয়ে পিড়িটায় গিয়ে বসে নিজের হাতের চুড়িগুলো দেখতে লাগল। কখন একটু খুন্তি নাড়া দিলে, একবার কি একটা দুঃসহ ইচ্ছা হলে দুলে দুলে নিজেকে স্থির করলে এবার উঠে আঙুলে একটু গুড় নিয়ে ফেলে পরে একটু নুন হাতে নিয়ে হোলায় ফেলে সেখানেই তারমধ্যে হাতটা ধুলে। অদ্বৈত অবাক হয়ে তার ব্যাপার দেখছিল। বেশ কিছু সময় গেল, রোমনি যেন সমস্ত কিছু

মন থেকে মুছে ফেলে দিয়েছে, উঠে ঘরে দাওয়ায় একটু জল ছিটিয়ে একটা পদ্মপাতা পেতে দিয়ে, জটাকে উঠানে একটি পাতা, হেসেলের পাশেই অদ্বৈতর এবং নিজের ঠাঁই করে নিলে। রোমনি মাধালিকে ডেকে নিয়ে এসে বললে—"বস"।

প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে বল্লে—"তোমার কই?"

রোমনি এ কথার জবাবে প্রায় বলতে গিয়েছিল 'থাক' বা 'তবু যা হোক মনে পড়ল।' কিন্তু সে কিছু না বলে বল্লে—"তুমি বস আমাদের হবে খন—আর ভাত দেব— মাড় ভাত লয় কিন্তুক" বলেই তার নিজেরই কষ্ট হল, এ বড় মানুষি তার শোভা পায় না কথাটাকে ফিরাবার জন্যে বললে,—"আর দুটা লাগতে পারে বলেই বললাম গো।" কথার শেষে সোহাগ ছিল। যাতে না মাধালির মনে লাগে। এখান থেকে ছাতির হোলা নিয়ে যাবার সময় একবার খুন্তিটার দিকে তাকালে একবার মাধালির দিকে তাকালে নিজেই 'ইস' বলে উঠল। ইচ্ছে হচ্ছিল তখন এই গরম খুন্তিটা নিয়ে দৌড়ে গিয়ে তার গায়ে ছ্যাঁকা দেয়।

উবু হয়ে মাধালি কেন সকলেই খেতে বসল। অদ্বৈত নানা রূপ মুদ্রা দেখিয়ে আচমন করে নিলে এবং মাধালি চোখ বুজিয়ে প্রার্থনা করতে করতে কেমন যেন লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, চোখ খুলে দেখলে সকলেই খাচ্ছে, কোন কথা নেই। মাধালি আড় চোখে রোমনিকে দেখতে গিয়ে কুষ্ঠ রোগীর দিকে নজর পড়ল। সে ভাত নিয়ে নাড়া চাড়া করতে লাগল। এমন সময়ে তার কানে এল জটা বলছে—"এমন ছাতি আমাদের দিকে হয় না।"

"কেনে তোদের এদিকে বনবাদাড় নাই—না কলিয়ারী নাকি—?" জটা রসিকতাটা বুঝে বললে—"তা লয় এক এক জন তুলবে বলে ভগবান এক এক জিনিস সেই অঞ্চলে দেয় যেমন" বলে একটু হাসল—বললে—"এমন রান্না বহুদিন খায়ই নি।"

"রোমনি মন করলে রান্ধে ভাল।"

মাধালির মনে হচ্ছিল তার একটা কিছু বলা উচিত। কিন্তু তার আগেই রোমনি বল্লে, "ওই ছাগলটা তুমার হে" নিজের বিস্ময়কর সাধারণ গলার স্বর শুনে আশ্চর্য্য হয়ে গেল। মাধালি ছাগলটার দিকে দেখে পরিষ্কার কণ্ঠে বললে, "কেটে রান্ধেলে না কেনে সবাই খেতাম—।"

অদ্বৈতর কাছে দুজনের কথা একটু বেলেল্লাপনা বলে বোধ হল এবং নিজের উপস্থিতির জন্য সে অস্বস্তিবোধ করল।

"বড্ড ভাল হত খেতাম লিতাম গো" জটা বললে।

রোমনি এরূপ উত্তর আশা করেনি সে একবার মাধালির দিকে দেখলে। তারপর কি একটা কথা বলতে গিয়ে থেমে গেল অযথাই হয়ত বলত—'সে খেলে ত গলায় গামছা দিতে হে।' থেমে গেল এই কারণে যে মাধালির স্বরটা যদিও রুক্ষ নয় তবু খুব নরমও নয়।

খাওয়া দাওয়ার পর যে যার পাতা তুলে সদর দরজার বাইরে ফেলে হাত মুখ ধুয়ে নিলে। মাধালি এসে পারকোমে বসল। রোমনি কোনমতে হেঁসেলে ঠেলে রেখে এঁঠো জায়গায় জলের ছিটে দিয়ে ন্যাতা দিয়ে মুছে নিয়ে গেল। সবাই যদিও পরিতৃপ্ত হয়েছিল, কিন্তু সকলেরই যেন বা তেমন পেট ভরেনি। তবু জটা ভদ্রতা করে একটি বাঘ-ডাক ঢেকুর তুলে বললে—"উঃ বড্ড দম সাম হল।" রোমনি ন্যাতাটা উঁচু করে নিয়ে যাবার সময় মুখখানি বাঁ কাঁধে চেপে রেখেছিল যাতে আঁচল না পড়ে যায়, দ্রুত পায়ে যেতে গিয়ে মাঝ পথে থেমে একটু হেসে বললে—"মর হারামজাদা, দেকো পসী—" বলে নিজের আদরের গালাগালে নিজেই দেহ সুসশুড়ি দিল।

জটা রোদ লাগবে বলে ছাতা খুলেই বসেছিল, সে হাত উঁচিয়ে বল্লে "ত মিছাই বলব না গো, দুটা চিবুতে দিলেই আমরা কুকুর হই গো, অধর্ম বলবো না সামনে বামুন আছে।"

রোমনি এখন চলে গিয়ে, উল্টো হাতে ঘটি ধরে হাত ধুয়ে জল খেলে। ভাত খাওয়ার পর সে যেন সম্পূর্ণ বদলে গেল। ভাতের মতই মনটা তার নরম। রঙ্গরস করবার জন্য দেহ মন ইলিবিলি করছে। দাওয়ায় উঠে একটু জল খেয়ে কাপড়ে মুখ মুছে বললে—"তুয়াদের বাড়ী আজ কত পান দুটা লিয়ে আসতে হয়। ঠাকুরপোর বুড়ো-হর্তুকী খেলে তো আর সয়না।"

জটা বললে..."হই...গো"।

রোমনি এই সব ছোটখাট কথাবার্তায় এখানকার ছ্যাঁচা কোটা আবহাওয়াকে ক্রমে ঠাণ্ডা করে আনতে

চাইছিল। কেননা প্রথমত স্নান দ্বিতীয়ত অন্নের তৃপ্তিতে পারকোমের লোকটি, বর্ষাস্নাত বৃক্ষের মতই খোলতাই হয়েছে। রোমনি রাগমান ভুলেছিল, রাগমান পুষে রাখবার জন্যে জন্মালেও এখন সেটার প্রয়োজন নেই। ভুলে গেল বারবার এই বুনো ক্রিশ্চান তাকে বহুবারই তাচ্ছিল্য করেছে। শুধু মনে হল তুচ্ছ তাচ্ছিল্য নিশ্চয়ই সে ইচ্ছা করে করেনি। মাধালির ওই ভাবের জন্যই তাকে কাছে টানেনি। দাওয়া থেকে নেমে এসে এই ঘরের দাওয়াতে উঠবার সময় বললে, "ভাত খাবার সময় চোখ বুজিয়ে কি ভাব?" বলে নিজেই অপ্রস্তুত হল, কারণ মাধালির মুখের লক্ষণের মধ্যে কোথাও পূর্বভাব ছিল না। সে-ই আবার ইন্ধন জোগালে কি?

মাধালির ঘুমে চোখ যেন ঢুলে আসছিল। সে কোনমতে চোখ খুলে একটু হাসলে, বললে—"তোমার কি মনে লেয়।" সে কথাটা জড়িয়ে জড়িয়ে বলেছিল।

রোমনি অবশ্য ইতিমধ্যেই ঘরের মধ্যে চলে গিয়েছিল। কারণ সে বেশ বুঝতে পারছিল যদিও অদ্বৈত পাথরের উপর হরিতকী রেখে পাথর দিয়ে ভাঙছে, তবু এদিকের ব্যাপারে সে সজাগ। ঘরের ভিতরে ঢুকেই সে অন্যদিকে মুখ করে বল্লে,—"আমার ত মনে লেয়—আর কথা—"

"তবু বল হে শুনি—"

এই প্রশ্নই রোমনির কাছে দশাসই, যে গর্ব মা তার শিশুকে স্তন দিতে দিতে অনুভব করে সেই গর্ব তার হয়েছিল। পায়রার মত বুক ফুলিয়ে ঘুরাফেরা করছে এমন সময় সময় শুনলে, আবার—"তবু বল হে শুনি—"

অদ্বৈত ভাবল মাধালি তাকে কিছু বলছে ফলে আওয়াজ পেয়েই সে যেন চমকে উঠল। জটা ভেবেছিল মাধালি তাকেই কিছু প্রশ্ন করছে সে তাই বললে—"কি আর বলি," এবং এই সঙ্গে ঘর থেকে একটি আদুরে গলায় উত্তর এল—'মরণ, বুঝে লাও—না—" কিন্তু একথা শোনার সঙ্গেই সে একটা ঢুলুনির ঝোঁক সামলে বিকৃত শব্দে বললে—"এ্যাঁ—।"

রোমনি তার এই ব্যাপার দেখে বললে "ঘুম না মরণ পারকোমে শুয়ে পড় না হে—" একবার তার বলতে ইচ্ছা করছিল—"এসে ঘরকে শোও না—" কিন্তু সে তা বলতে পারেনি। রোমনির অনুরোধে মাধালি তখনই কুকুরকুণ্ডলী হয়ে চোখ বুজালে।

কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই জটা ভিটার খুঁটিতে ঠেস দিয়ে চোখ বুজিয়েছিল। সে টপ করে চোখ খুলে একবার অদ্বৈত মিশ্রর দিকে চেয়ে হাসবার চেষ্টা না করেই বললে, "কি পাকা কাঁঠালে ঘুম ঘুমাইছে বটে লোকটা" মাধালি বেহুস ঘুমে নাসিকা গর্জনের শব্দ শোনা যাচ্ছিল আবার জটা বল্লে—"বামুনের সামনে এভাবে ঘুমান—পাপ—লয়—"

এ কথাতে অদ্বৈত কোন কথা বলার প্রয়োজনবোধ করলে না, একইভাবে তার সম্মুখে গোলকধাম পাতা নিজেই কড়ি চেলে যাচ্ছিল। এমন সময়ে রোমনি ঘরের চৌকাঠের উপর একটা পা দিয়ে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে মুখ দিয়ে মাধালির দিকে ইঙ্গিত করে বল্লে—"আজ চার পাঁচদিন ঘুমাইনি" বলে সে ঘুমন্ত মাধালির দিকে একবার আড়ে চাইল, সে কিছু দেখতে পেলে নিশ্চিন্ত হবার জন্যে আবার দেখলে সুন্দর পায়ের উপর হাঁটুদ্বয়, যে ছেলে সবে হাটতে শেখে তার মতই। সেখানে কোন কড়া নেই; কালো হয়নি। এমন নিষ্পাপ। সব শরীর তার লোভে লালায়িত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সামনেই ঠাকুরপো ও পাশে জটা, বুদ্ধিমতী রোমনি কোনমতে নিজেকে সামলে নিলে।

অদ্বৈত হাতের কড়িটা চেলে, ঘুঁটি গুণে ঘরে বসিয়ে এবার এইদিকে ঘাড় ফিরিয়ে মাথাটা শুধু নাড়ল, জটাও ঠিক অনিচ্ছা সত্ত্বেও চোখ খুলেছিল। ভাবটা এই—তাতে কি! রোমনি একটু কঠিনভাবেই দুজনের দিকে তাকাল। তারপর চুলের গুচ্ছিতে দড়ির টান দিতে দিতে কি বলতে গিয়ে থেমে ওই ভাবেই দাঁড়িয়ে একটু দৃঢ় করে নিয়ে বললে—"সহজ মানুষ লয় ঠাকুরপো—" তার গলার স্বর যথেষ্ট নামান খুব স্পষ্ট, কারণ মানুষটি যে ঘুমায় সে জ্ঞান তার ছিল। আবার বললে—"লোকটা ক্রিশ্চান সত্যি কিন্তু পাপ মুখে বলা সাজে না, লোকটা হরি-হন্যে—" আবার বল্লে—"পাপ মুখে বলা সাজে না হরি-হন্যে—"

অদ্বৈত হাতের কড়ি ছেড়ে অন্যমনস্কভাবে ঘুঁটি সরিয়ে সোজা হয়ে বসল। তার মুখে একটা তাচ্ছিল্যের ভাব ছিল, মনোভাব এরূপ যে এসব কথা তোমার মুখে কেন ভাগবৎ কথা এবং তৎসংক্রান্ত

যত কিছু তাতে আমার জন্মগত অধিকার। তবু সে এভাবে বসে থাকা খারাপ দেখায় বলে মাথা নাড়ল। জটা এখন আর চোখই খুলেনি, ভয়ঙ্কর ঢুলছিল। রোমনি আর দরজা জুড়ে ছিল না। ফলে অদ্বৈত বিজ্ঞের মত উচ্চারণ করলে "হরি-হন্যে" "আহা" আবার কড়ি চালতে লাগল।

বৈকুণ্ঠধামে একটাই ঘুঁটি উঠেছিল। এমন সময় রোমনি এসে দাঁড়াল। মুখে হাতে হলুদ মাখা, পায়ে আলতা ঠোঁটে আলতা, হাতের তালুতে আলতা আর মাঝে মাঝে রৌপ্য নির্মিত গহনা। হাতে ছোট একটা পোটলা, দরজার পাশের দেওয়ালে সেখানে খানিক সাদা খড়ির ফল, ফুল লতা পাতার কেয়ারী ছিল সেখানে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। কি যেন ভাবছিল, মাধালি খাটে হাতের উপর মাথা দিয়ে শুয়ে অঘোরে ঘুমাচ্ছে। রোমনি বুঝলে অদ্বৈত তার দিকে চেয়ে আছে, ভাববার পর মুহূর্তেই সে আস্তে আস্তে পিঠটা ঘষতে লাগল বললে—"যেমন গরম তেমনি ঘামাচি—" দাওয়া থেকে নেমে এসে পরে স্বাভাবিক কণ্ঠে বললে—"ঠাকুরপো আমি গেলাম, দোর খোলা থাক—"

অদ্বৈত একটু খুসী হয়ে—"হিঁহিঁ" শব্দ উচ্চারণ করে বললে,—"উয়াকে।"

"না—থাক—আর দেখ—পারকোমের লিচে মৌআঁওলা আর কাঁচ গিলাস আছে—উয়াকে বোলো—দেখ গিলাসটা যেন ভাঙে না—আর" বলে কিঞ্চিৎ সময় নেবার চেষ্টা করছিল। জটা উঠে ছাতাটা বন্ধ করে কাছাটা চটাপট ঝেড়ে, জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁটটা বুলিয়ে দাঁড়াল, এবং অসভ্যভাবে ঊর্দ্ধে তীর ছোঁড়ার মত করে একলাফে আড়মোড়া ভাঙলে।

রোমনি তার রকম দেখে বল্লে, "মরণ দাঁড়া না, পাড়া কাঁপিয়ে আলিস্যি ভাঙছে কি রে? লোকটা ঘুমাইছে না—শালা—ছোট জাত হলে যত ব্যায়রাম" কিন্তু আদতে সে নিজেই হয়ত চেয়েছিল মাধালির ঘুম ভেঙে যাক, একটু তবু দেখা হবে। কিন্তু রোমনির অল্প মান হয়েছিল খাবার পর অতবড় কথাটা বলে যে লোক খাটে বসে থাকতে পারে ঘরের ভিতর না এসে যে লোক ঘুমাইতে পারে, তার সঙ্গে দেখার দরকার নাই। একথা ভাবা রোমনির পক্ষে সত্যিই একটু অবাকের ব্যাপার তবু সে ভেবেছিল। এবং আর এক মুহূর্ত দেরী না করে সে আর ভিটা বার হয়ে গেল।

এর কিছু পরে তুড়সী এসে বল্লে, "জন্ম-জন্ম তোমার পা চাটি—ঠাকুর সেই লোকটা উঠলেই আমায় খবর দিতে রোমনি বলেছে।"

অদ্বৈত বললে—"কেন আমি কি লোকটা—।"

"আমি বলি তুমি বামন মানুষ—ডোম ডাকতে কুকুর মরলে তুমি যাবে—আমায় ডাকতে যাবে কেনে আমি বরং উখানে বসি গো—।"

অদ্বৈতর মর্য্যাদায় এ কথাটা সত্যই আঘাত করেছিল। সে কোন উত্তর না দিয়েই বাঁ হাতটার উপর আদশোয়া হয়ে আবার কড়ি চালাতে লাগল। তুড়সী ভিটেটায় উঠে উবু হয়ে বসে বললে—, "ঠাকুর রুমনির একটা বিয়া করাও—"

অদ্বৈত থাকতে না পেরে গম্ভীর ভাবে বললে—"তোকে বুঝি বলে গেল—।" সরল মেয়েটি হিহি করে হেসে মুখে শতচ্ছিন্ন কাপড় দিলে, একটা পা তার মাটিতে পড়েছিল, সারি দেওয়া পাঁজড় তার হাসিটা খেলছিল বললে—"তা কেনে,—হেদাইছে—" "হুঁ, হেদাইছে—" বলে আবার কড়ি ছাড়ল ঠোঁট নাড়িয়ে কড়ি গুনলে। যত গুনুক তবু যেন সে রাগে দিক ঠিক করতে পারছিল না, পায়ের জীর্ণ আঙুলে মোচড় দিলে—হাতের আঙুলেও মোচড় দিলে, বললে, "তোরা কি জানিস, আর কার লেগে তোদের মন হেদায় না, চেটাই-এর তরে তোদের মন হেদায়, মরলে ঝরলে আবার সাংগা করিস—মন—হেদায়।"

"এবার তা হবে না গো, ভাতার মরলেক—আমরা আর বিলিতি নুন খাব না গো—পাথুরে খাবো হে ঠাকুর (কর্কট বা সৈন্ধব)" বলে সরলভাবে চেয়েই রইল।

অদ্বৈত এত সরল কথায় আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল মহা আক্রোশে সে বলতে শুরু করলে—"হি"—শালা এ ভুঁইয়া দেশ মাংভু—সিংভু' কথাটা আস্তে আস্তে ফুরিয়ে গেল। সে বলতে চেয়েছিল অসতীর জায়গা। কিন্তু অন্যদিকের দাওয়া যেন ভরাট হয়ে উঠল। মাধালি "উঃ উঃ" শব্দ সহকারে উঠে বসে, চোখ দুটো ছোট ছোট ছেলের মত ঢলঢলে, খাটিয়ায় বসে হাই তুলে, হাতে একবার পিঠে চুলকে, সোজা হয়ে বসে, এদিক সেদিক চাইতে লাগল। হঠাৎ উঠে ঘরের দরজা ধরে ভিতরের দিকে তাকাল,

তারপর দাওয়ার খুঁটি ধরে, কাকে যে কিছু জিজ্ঞাসা করবে তা ঠিক না পেয়ে বোকার মত দাঁড়িয়ে রইল। মাধালির দিকে তুড়সী সম্ভ্রমে চেয়ে এক পা ভিটে থেকে নামিয়ে পরে আর একপা নামিয়ে, শতচ্ছিন্ন কাপড়টা দিয়ে পা ঢেকে হাতের উপর হাত দিয়ে বাজু ধরে পায়ের আঙ্গুল দিয়ে মাটি খুড়তে লাগল। মাধালি এখনও ভেবে পায়নি কোথায় সে? সামনের মেয়েটিকে ছিন্ন কাপড়ে রোমনির মতই মনে হয়েছিল, কিন্তু তা যেন রোমনির ভারেই ছেঁড়া। সেও তুড়সীর মতই অনেকটা, মাটিতে পা ঘষতে লাগল।

এমন সময় অদ্বৈত মিশ্র বললে—"তুড়সী উয়াকে বল ঘরকে কেউ নাই" তুড়সী অদ্বৈত মিশ্রের কথা ভাল করে বুঝে নিয়ে লজ্জিত কণ্ঠে বললে—"রুমনি গাইতে গেছে গো—বাবু—।"

বাবু কথাটায় অদ্বৈত অত্যন্ত চটেছিল। সে আবার বললে—"যখন যাবে ছাগলটা যেন লিয়ে যায়।"

তুড়সী সে কথা না বলে, বললে, "পারকোমের তলাকে মৌআঁওলা আছে—গিলাস ভাঙে না জানি।"

একথা শুনে অদ্বৈত মিশ্র রাগে উঠে বসেই দড়াম করে কড়ি ছাড়লে। এত যত্নে এ মৌআঁওলা তৈরী, মৌআঁওলা লোকটা খাবে? এক বোতল।—যা এক পাই চার আনায় বিক্রী হয়। অদ্বৈত হঠাৎ গলার স্বর রুক্ষ করে বললে—"লে—যা—এবার—ঘরকে—যা।"

"আমায়—যে—।"

"আমিত আছি—যা—তুই।"

তুড়সী ধীরে ধীরে অনিচ্ছাসত্ত্বেও চলে গেল। রোমনি তাকে অনুরোধ করেছিল গিয়ে যেন মাধালির সকল কিছু হাবভাব বৈলক্ষণ দেখে কিন্তু সে কাজে আর থাকা হল না। তুড়সী চলে যেতে মাধালি যে কি করবে ভেবে পেল না, আবার শুয়ে পড়বে না বাড়ী যাবে কি করা উচিত তার। তুড়সীর কথামত পারকোমের তলা থেকে বোতল আর গেলাসটা বার করে সে ভীত হয়ে পড়ল, বড়লোকের গা ছোঁয়া যেমন রোমাঞ্চকর ব্যাপার তেমনি। কিন্তু নিজেকে আর ভাবতে না দিয়ে প্রায় অর্দ্ধেকটা ঢেলে এক চুমুকে খেয়ে নিল। অদ্বৈত একবার দেখেছিল, এরূপ পাহাড়ী ব্যাপার সে দেখেনি। দারুণ কূটমদ লোকটা কিভাবে এক চুমুকে খেয়ে নিলে। এমনকি এক বোতলই পুরো খাবে একথাও সে ভেবেছিল। মাধালি আবার উঠে বোতল যেখানে ছিল সেখান থেকে একটা চুটা নিয়ে হোলা থেকে ধরিয়ে বসে টানতে লাগল।

অদ্বৈত মিশ্রর যার প্রতি এতাবৎ ঘৃণা ছিল, এখন তাকে আর এক রকমের বলে বোধ হল। তখন অনেকে ছিল, তাই সে তার স্বভাবকে সোজা করে রাখতে সাহস পেয়েছিল, এ ছাড়া যাকে নিয়ে আড়াআড়ি তার থাকাকালীন মানুষের মতিভ্রম হওয়াই স্বাভাবিক, তখন সে খুব ভাল করে এইভাবে লোকটিকে দেখবারও প্রয়োজন বোধ করেনি একবার শুধুমাত্র দেহ আর তার ছায়া দেখেছিল। এখন পুরোপুরি দশাসই চেহারা দেখে সে ভীত হয়েছিল, তার উপর লোকটি মৌআঁওলা খেয়ে হাতী যেমন শুড় তোলে তেমনি মাথা তুলছিল তখন অদ্বৈত বড় ভয় পেয়েছিল। একবার মনে হল, তুড়সীকে যেতে বলে ভাল করেনি। অদ্বৈত চোর হয়ে রইল, দুয়েকবার পৈতেটা ঠিক করে নিল।

এমন সময় মাধালি একহাতে বোতলটা তুলে গেলাসটাও সেই হাতে নিয়ে হুড় হুড় করে উঠানে নেমে এল, আর একটু হলে তুলসী মঞ্চে ধাক্কা লাগত, দুয়েকটা পায়রা উড়ে গেল। মাধালি এসেই অদ্বৈতর সামনে সজোরে বোতলটা আর গেলাসটা বসিয়ে দিয়ে খুঁটি ধরে অল্প দুলেছিল। অদ্বৈত জড়সড় হয়ে গেলাস আর বোতলটা ধরে স্থির করে, গেলাসধরা বাঁ হাতটা একটু উঠিয়ে রাখলে। মাধালি নিজেকে সজাগ করবার জন্যে যখন স্থির করছিল, ঠিক সেই সময় পাশের পূজার পাট থেকে একটু জল নিয়ে বাঁ হাতে যতটা পারলে মাখিয়ে দিয়ে বিড় বিড় করে গোবিন্দ নাম উচ্চারণ করলে। মাধালি এই ক্রিয়াটুকু দেখেছিল, কিন্তু কেন যে করা হল তা সে বুঝতেই পারেনি। শুধু বল্লে—"ঠাকুরপো খাও—লাও।"

ঠাকুরপো নামটা ধরে ডাকা অদ্বৈতর কোনক্রমেই ভাল লাগেনি কিন্তু কোন কিছু বলতেই সাহস হল না, এমনকি মুখটাকে গম্ভীর করবার সাহসও পায়নি! তবু বললে "লিচ্ছি—হে—"

"আগে লাও খাও—"

অদ্বৈত আর দেরী করলে না, সে তার পাথরটা নিয়ে তাতে মৌআঁওলা ঢেলে চুমুক দিলে। খানিকটা বেগুনী তরল চঞ্চলতা পাথরে কাঁপতে লাগল।

"মদটা ক্রেস্তান লয় কি বল ঠাকুরপো—"

ঠাকুরপো নামটায় সে আবার জ্বলে গিয়েছিল। বেশী জ্বলেছিল মাধালির ইঙ্গিতে। সে ভাবতেই পারেনি এইভাবে লোকটা তাকে ধাক্কা দেবে, এ ছাড়া আর সে শঙ্কিত হয়েছিল তার বলিষ্ঠ বাহু দেখে, লোকটি এর পর কি করবে না ভেবে পেয়ে মদের দিকে তাকাল কিন্তু ছুঁতে আর সাহস হল না।

"লাও—খাও হে—খাও—ও আমি এমনি বললাম"—বলে সে বড় বড় চোখ মেলে চেয়ে রইল।

অদ্বৈত তার গলার স্বরে খানিক আশ্বস্ত হয়েছিল। পাথরটা তুলে নিয়ে একটু খেয়ে বললে—"আমি অল্প অল্পই খাই—"

মাধালি এবার এখানে বসে পড়ল। মুখটা তার তুলসী মঞ্চের দিকে, অত্যন্ত চিন্তিত মনে বললে, "ঠাকুরপো তোমাকে কখন সাপে কেটেচে—?"

অদ্বৈত এইবার তার মাথার দিকে চেয়ে চুটা ধরালে। এবং একটা টান দিয়ে হেসে বললে, "না"— একটু সাহস করে বললে "কাটলে তো ঘরে উঠে যেতাম—" "না—কাটলেও অনেকে বাঁচে কিন্তু আর মানুষ থাকে না—" একটু পরে বললে—"ঠাকুরপো তুমি তো ভগবান দেখেছ—" বলে একটু স্তব্ধতা অনুভব করে অদ্বৈতর দিকে মুখ ফেরালে।

অদ্বৈত চোখ দুটি নিম্মীলিত করে মুচকী হাসলে।

"ভগবান, মদের চাট্, কি বল—।"

অদ্বৈত মাথা নাড়লে।

"সত্যিই সে তুমি দেখনি—"

"না—তুমি দেখছ—হে—"

মাধালির বিরাট বুক আর মাথাটা ঝাঁকানি দিয়ে "না-না" বলে উঠল। বিকৃত কণ্ঠে বল্লে, "না—তবে আমি দেখবই—আমি ছাড়ব না"—অদ্বৈত মিশ্র এই সুযোগই খুঁজছিল। প্রথমেই তার মনে হল, কি ভাগ্য রোমনি নেই, ভগবানের কি কৃপা যে তুড়সীকে আমি যেতে বলে দিয়েছি—এইটুকু রুক্ষ ভ্রূযুগল উড়িয়ে রুগ্ন নাক স্ফীত করে সে ভেবে নিয়েই ব্রাহ্মণসুলভ খলতা এনে তাকে আস্তে আস্তে বল্লে—, "আমি শুনছি তোমার হরিভাব—তুমি চার-পাঁচ রাত ঘুমাওনি—তুমিই মানুষ—"

মাধালি এমনভাবে তার দিকে চেয়ে রইল যেন সে অবিশ্বাস করছে। এ ধরনের চাহনিতে অদ্বৈত কোনক্রমেই পিছিয়ে গেল না, সে শিকারীকে শিকার দেখাবার মত ভঙ্গী করে আঙ্গুলে নির্দেশ করে বললে, "ছেঁড় না ক্রেস্তান ভাল করি ধর—।" এ কথা শুনে মাধালি যেন ফুলে ফেঁপে উঠল। "তোমায় তো তার লেগে রাতদিন ডাকতে হবে গো। বনডহরে ডাকতে হবে, তুমি কি যে সে লোক—" বলে ফাঁকা রাস্তায় হাস্যের আদল তার মুখে দেখা গেল।

মাধালি বললে—"আমার কিন্তু ভয় করে, সে ঠেন রাতদিন নাই—।" মাধালির কণ্ঠে শিশুসুলভ আওয়াজ।

অদ্বৈতকে বিচক্ষণভাবে কথা বলালে—"রাতদিন তিনি দিবেন—।" মাধালি বললে—"আমার মনে লেয় আমি পাপ করি—আলোয়াতে আমার"...অদ্বৈত অত্যন্ত অধীর হয়ে উঠল, মাছের মতই এক পিছল মাথা নাড়িয়ে বল্লে—"এভাব হয়, ক্রেস্তান শুধু বিশ্বাস লাও, এই বাত্রায় যাকে পেলে—, এই কাঞ্চনে যাকে পেলে—তাকেও বুঝেছি, বাজিয়ে নেবার জন্যে এ ঠেন এনেছেন—", বলে খুব বোঝদার ভাব করলে। "কেনে এ কথা—?"

"এ ঠেন ত যারা তুমার মত, সে যাই মনে লিক তবু বলব, তুমার মত লোকের লয়, এ ভারী এড়ো জায়গা এ ঠেন খাঁটি সোনা মিলবে না হে, কাঁচকে গিরো দিওনা—বুল্লাম, বলি দেখ দেখ—" মাধালি কি বলতে যাচ্ছিল তাকে থামিয়ে মুখের ইঙ্গিত করে—"গো—পুণ্য যা কিছু ওই দুয়ারের মাটিতে গো" আর একটু সাহস পেয়ে বল্লে—"তাই গো পূজায় লাগে" বলে মাটিতে চাপড় দিয়ে বললে—"এ বড় পাহাড় ঠাঁই, কূট জায়গা—খারাপ—।"

"খারাপ কেনে—"

"বড় বুনো—এরা কি কিছু মান্য করে—"

"ঠাকুরপো—তুমি এ বুনো দেশে এলে কেনে; তুমার ত গঙ্গাড়ী ভূঁই ছিল—হে—"

"কিন্তু ইয়ার মাটা আমার লষ্টু করলে—"

মাধালি হেসে ফেললে, বললে, "তুমি কি বিটিছানা হে—"

অদ্বৈত বুঝলে লোকটা মদে মোটেই ঘায়েল হয়নি। এখন মরিয়া হয়ে জোর করে বললে—"সে তুমি যাই বল, ইয়াদের মনে কিছু নাই ইখানের বিটি সব সমান গো—" অদ্বৈত ভুলে গিয়েছিল মাধালি এখানকার লোক।

"ইয়াদের মনে কিছু নাই বলি তুমি এলে কেনে হে—?" তারপর মাথা ঝাঁকানি দিয়ে বললে—"ঠাকুরপো আমার ঘর রৈবতী—" "সকলের কথা বলি না এই রোমনি ইয়ার মন পোষানি জানেনা—কত লোক খাদালে গেল কত ইতিউতি হল।" মাধালিকে চিন্তিত দেখে বললে "তুমি সৎ পথে আছ তাই বলি, না হলে আমি ভিখারী, এখন আমি তার খাই তার পরি—তার নামে বুলব কেনে তুমার লোকেই কি বুলবে, তুমার চার্চ কি বুলবে।"

চার্চ বলতেই মাধালি যেমন বিভ্রান্ত হল, কথার গুরুভার তাকে ক্রমশঃ নিঃশেষিত করতে লাগল, কিছু পরে ঘুমন্ত কণ্ঠে বললে—"তুমি তাহলে ভগবানকে দেখনি—?"

অদ্বৈতর মনে হল মাতালের সঙ্গে মাতাল হয়েই কথা বলা ভাল। তবু শেষ চেষ্টা করলে—"তোমার সে কথায় দরকার কি, ঝুমুরওয়ালীর বাড়ী ডুগী বাজাও হে—ওসব কথার ব্যাপার কেনে—?"

"সব ঢং ভাল ও ঢং ভাল লয়—।"

অদ্বৈতকে ভাল করে দেখবার জন্যে সে আপনকার মাথাটা একটু সরিয়ে পিছু হাটিয়ে নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে দেখলে। অদ্বৈত তার এইরূপ দর্শনে অত্যন্ত অসহায়বোধ করে কিছুটা পিছিয়ে গেল। নিজের দেহের কোন অংশ যে বাঁচাবে তা ঠিক নির্ণয় করতে পারলে না, কিছু বিমূঢ় হয়ে বিপদ অপেক্ষা করতে লাগল।

মাধালি সজোরে নিজের উরুতে একটি চপেটাঘাত করে—বিড়বিড় করে কি যেন বলে—স্পষ্ট করে বললে—"বুঝলি হে ঠাকুরপো—।" কি বুঝলাম, কি বুঝলাম তার প্রয়োজন নেই। ত্রাসে, লজ্জায় তার চেপটা মুখ ফুলো চোখ বসা নাক, সবকিছু যেন তীক্ষ্ণ করযোড় হয়ে উঠল। নিজেকে বাঁচাবার জন্যে সে যেন প্রায় বলতে যাচ্ছিল "রোমনি তোমার জন্যে আমার কাছে কাঁদলেক কথা কিয়দংশে সত্যি কিন্তু..."

"ঠাকুরপো ভেবনা আমি মৌআঁওলা খেয়ে মাতলাম্— তুমার কুষ্ঠ বলে তুমায় ঘৃণা করেছিলাম, তাই কাছে এলাম কিন্তু যেদিন তুমাকে কোলে নিতে পারবো, আমি পাব,—আমাকে পাগল ভাব, আর যাই কর—কিন্তু তুমি বড়"—আর বললে না সোজা গিয়ে ঘরের দাওয়ায় বসে বলল—"রোমনি আমাকে ফেলে গেল কেন?"

নিজের নীচতার জন্য অদ্বৈত সত্যই মর্মাহত হয়েছে সে ভাবতেই পারেনি মাধালি তাকে এরূপ কথা বলে অমানুষ বানিয়ে দেবে। সে থাকতে না পেরে আর একটু মদ খেলে, কোথাকার এক বেদনা তাকে আচ্ছন্ন করল, সকলেই তাকে আলগোছে ব্যবহার করেছে এক রোমনি ছাড়া। কিন্তু লোকটার কথা তাকে ক্রমাগত ছোট করতে লাগল।

"ঠাকুরপো সেই মেয়েটাকে ডেকে লিয়েসো গো—"

বলার সঙ্গে সঙ্গে অদ্বৈত দরজার কাছে গিয়ে কাপড় দিয়ে মুখ মুছে হাঁকলে—'ই হে তুলসী—।"

সাড়া এল—"ই ও—।"

তুড়সী দরজায় দাঁড়াল, শতচ্ছিন্ন কাপড় যা গায় জড়ান তার ভিতর দিয়ে একটি হাত চিবুকে ধরা। পাখীর বাসার মতই ভীরু দুটি চোখ—অদ্বৈত দাওয়ায় উঠে বসেছিল, এইটুকু কাজ করতে পেরে সে খানিক বেঁচে ছিল, এখন তুড়সী আসতে, যে সে যেন ভালবাসে নিঃশ্বাস ফেলতে পারলে, মৌআঁওলার ধক চোখটাকে বেশ করে খুলেছিল। তুড়সী এখন চৌকাটের উপর দাঁড়িয়ে। মাধালির তাকে দেখে বড্ড কষ্ট হল, যেহেতু এখন দক্ষিণায়ণে সূর্য্য তাই ওখানে নেই। তাকে দেখে মনে পড়ল কবে যেন কাকে কি বলেছিল, সেই বাক্যের মধ্যে যে বুকপোড়া রূপটি ছিল এবং সেই সঙ্গে চোখের জল গালে শুকনোর যে আরাম সেও ছিল। সে কথাটা কি কাকে বলেছিল তা অনেক মাথা ঝাঁকানি দিয়েও স্মরণ করতে

পারলে না, সম্মুখের দৃশ্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে রইল।

তুড়সীর বড় লজ্জা হচ্ছিল, সে তার দারিদ্রর জন্য নয়—ইন্দ পরবে এক ছুড়কো বউকে তার স্বামী কাপড় ধরেছিল, কাপড় কি অদ্ভুতভাবে কি অসভ্যভাবে কেড়ে নিয়েছিল। বৌটা সেই এক হাট লোকের মধ্যে যেমন মুখ গুজড়ে শুয়ে পড়েছিল, আদভেজা মাটিতেই, তারপর ধৈ ধৈ করে ধানক্ষেতে ছুটেছিল। তার অবস্থাটা অনেকটা সেইরূপ সেও যেন কোথায় বিবস্ত্র তার যেন পালাতে ইচ্ছে করছিল। এখন মাধালি কথা বলছে।

মাধালি উঠে বল্লে—"ঠাকুরপো চললাম, রোমনিকে বল—" এরপর তুলসী মঞ্চের কাছে হঠাৎ বলে উঠল, "কিছু কি ফেলে গেলাম না ত হে—" বলেই মনে হল এখুনি হয়তো ছাগলের কথা উঠবে—তাই তাড়াতাড়ি সে বল্লে, "না—কিছু না—চললাম হে"

তুড়সী এতক্ষণে দরজা থেকে নেমে গিয়েছিল। মাধালি তুড়সীকে বল্লে—"চলনা হে আমার সঙ্গে এতটুকু—"

অদ্বৈত ফাঁকা উঠানের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে, এখন এখানে আবার পায়রা বেড়ায়।

বাচ্ছা কুকুরের মত শতচ্ছিন্ন কাপড়টা দাঁত দিয়ে টানতে টানতে কভু বা ছেড়ে দিয়ে কখন জলদি পায়ে কখন ঠায় এই বিশাল লোকটির সঙ্গে পুবদিকে এগিয়ে চলল। এবারে নাবাল—তারপর ধানক্ষেত। এখানকার ধানগুলো বেশ লায়েক হয়েছে; চাষীর দুর্ভাবনা এর পিছনে নেই।

তুড়সী বললে—"রৈবতী যাবে ত হে—হুইটিলা—তারপর পাঁহুড়ী—তারপর রৈবতী—"

রৈবতী কথাটা শুনে মাধালির প্রচণ্ড বুকটা কম্পিত হয়ে উঠল। সে ধানক্ষেতের দিকে চেয়ে দেখল, তার অসংখ্য বার মনে হল, রৈবতী বড় দূর, অনেক রাত হবে যেতে, একা কি যেতে পারবে। এ সকল কথা তার যেন কেন মনে হচ্ছিল তা ভেবে পেলই না। একবার আস্তে আস্তে কপালে হাত বুলালে। অজানিতে হয়ত বা রোমনির কথা রক্তে খেলে যাচ্ছিল। হঠাৎ সে দেখতে পেলে তুড়সী তার ম্লান মুখখানি ঘন ঘন তারদিকে ফিরিয়ে ছোট ছোট্ট হাঁ করছে, কখন ঠোঁট দুটি ফাঁক করছে। মাধালি বল্লে—"যাইরে—" বলে ক্ষেতে নেমে গেল। একটু যখন এগিয়েছে তখন খুব দ্রুত কেউ নাবাল থেকে ক্ষেতে নামলে যেমন শব্দ হয় তেমনি শব্দে ঘুরে দাঁড়াল। এমন কিছু খাড়াই থেকে নাবাল জমি নয়। পরিষ্কারভাবে উঠে গেছে, মাঝে মাঝে ছোট ঝোপ ঝোপ গাছ তবু দ্রুত শব্দ মাধালি প্রশ্ন করলে, "কি—হে—?" তুড়সী বললে, "আমার হাঁস কটা গো উই টিলায় আছে লিয়ে আসি গা—তাই যাই—চই চই চই চই বলে ডাক করলে—"

মাধালি চারদিকে দেখতে দেখতে চলেছে। অতি দূরের চিল হঠাৎ কাছে আসলে যেমন বিস্ময়, বহুদিনের পর সাখিলা দেখলে, তেমন তেমন বিস্ময় তার হয়েছিল শুধু তার মনে হল আকাশ কি চিরকাল এতদূরে ছিল। একবার মনে হল সমস্ত কিছু সে তার দু হাতের আঁজলায় ভরে, যত সবুজতা আছে—যত রুক্ষ টিলা আছে, যত শুদ্ধতা সকল কিছুকে নিয়ে সে উর্দ্ধে কাউকে উদ্দেশ্য করে অর্ঘ্য দিতে পারে। সমস্ত কিছু যেন তার নিজস্ব এ কথা স্মরণ করে সে অতিশয় তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিল। হঠাৎ তার চোখে পড়ল ছোট একদল হাঁস, ওদিকে আল দিয়ে যাচ্ছে। সে বলে উঠল—"তুয়ার হাঁস—।" বলে সে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল।

সমস্বরে তুড়সীও বলেছিল—"ওয়াই আমার হাঁস গে—"

তুড়সী তেমনিভাবে দাঁড়িয়ে এক পা একটু ভেঙে। কাপড় টানাটা এখন একটু দ্রুত। খিড়কীর রাস্তা বা পায়ে চলা রাস্তার মত বিশীর্ণ, রাস্তাই যেন বা খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে তার অনন্ত রহস্য নিয়ে, চুলগুলো বাতাসে ইতিউতি। "আমি যাই হে" আবার বললে তার কিছু বলার ছিল কিন্তু লজ্জায় সে যেন বলতেই পারছে না। একবার বল্লে—"আমি যাই গো—" বলে কোনক্রমে আস্তে ফিরে ছাগলছানার মত বেপটু পায়ে সে চলতে লাগল। লোকটিকে তার ব্যাধ মনে হল না। হলে যেন সে খুসী হত।

মাধালিও কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গিয়েছিল। একশবার তার মনে হয়েছিল কুষ্ঠরোগীকে সে

কথা বলা ঠিক হয়নি, ও কথাটাই তাকে বড় নিজস্ব করেছিল, মোহগ্রস্ত করেছিল। সহসা সে দেখতে পেলে তুড়সীর পিঠটা যা পুরো খোলা ছিল, কাঁধটা উঁচু হয়েছিল। মেরুদণ্ডের হাড় ঘৃতকুমারীর পাতার মতই বেঁকে উঠে গেছে, আর দুপাশে অপর্যাপ্ত দুঃখ, এক ফালি কাপড়ের উপর পল্কা ঘাড়, তাও যেন ভেঙে পড়বে। শুধু একটু অন্ধকার তার মনে এসেছিল। শ্রাবণ মাস শেষ করে কত বুড়ী পুরীধাম সেরে, কাঁথার বিরাট ঝুলির ভার যেমন বহন করে ক্রমে ক্রমে পা ফেলে যেমন রোদ বৃষ্টির যেমন কটু ছায়াও তার কাছে প্রীতিকর নয়, তেমনি তুড়সীর পিঠ অনেক ভার বয়। মাধালি ভ্রূ কুঁচকে ভাবলে, তারই বা এত মনে হচ্ছে কেন? সুখ করে এত অপদার্থ কুটো নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন কি, পাখীতে যে মত নিয়ে যায়। কিন্তু এখনও তুড়সীর পিঠটা তার দিকেই— সামনেই ছিল।

মাধালিকে জানতে না দিয়ে তুড়সী মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়াল। সে ভেবেছিল মাধালি এখন অনেক দূর; আর সে এখান থেকে কটি কথা বলতে পারবে। মাধালি যেমন অন্যমনস্ক, স্থিরদৃষ্টি, জলের কিনারে সাদা বক যেমন হলদে ঠোঁট স্থির করে রাখে। এবার মাধালি তির্য্যকভাবে তুড়সীর দিকে চাইতেই তার নিজের ভিতরে কে যেন ছিটকে গেল। কণ্ঠের ডহর স্ফীত হয়ে উঠল; এই বাক্য সেখানে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হল—"মা—" বন থেকে বার হবার মনোভাব আবার দেখা দিল এবং অনেক পরে ঠোঁটটা পট পট করে উঠেছিল।

তুড়সী আর দাঁড়ায়নি খর পায়ে ধানক্ষেত থেকে উঠে পড়েছিল, কেননা তার হাঁসগুলো ওখানে জড় হয়েছিল। তুড়সী হাঁসগুলোর কাছে গিয়ে চক্ চক্ শব্দ করে ধীরে ধীরে পা ঠুকতে লাগল। হাঁসগুলো আস্তে এগিয়ে ছোট ঝোপে গেলে, তুড়সী নৃত্যের ভঙ্গীতে পা বাজাতে লাগল এবং সেখান থেকে মুখ না ফিরিয়ে বললে, "তাকে কি বলব হে—, কি বলব?"

মাধালি এখান থেকে তার হাঁস তাড়ান দেখছিল, ঢ্যাঁঙা শালের তলায় সংসরঙ জঙ্গির উপরে ক্ষুদে ঝোপে যখন হাঁস, কখন তারা অন্যদিকে যায় হঠাৎ তার মধ্যে দিয়ে সে-কথাটা এল। মাধালি এক নিমিষেই বুঝতে পারল কার কথা। ভাবের ঘোর তার কোন বাদ সাদলে না। তার শরীরটা ঝিমঝিম করে উঠল, সে সমস্ত শরীরটাকে ধীর করে রাখলে।

তুড়সী একটি নিসিন্দের পলকা ডাল ধরে তার নীল-বেগুনী ফুল কখন হাতের তালুতে কখন বা শীর্ণ মুখে বুলাতে বড় বড় চোখে উদ্‌গ্রীব হয়ে রইল। এখনও উত্তর আসেনি, একটি হাঁসের পিঠে পা দিয়ে ধীরে ধীরে ঘষতে লাগল, এমন যে তারই প্রশ্ন, সেই উত্তর পাবে। ফলে তারই অভুক্ত শরীর কিছু খেতে চেয়েছিল।

মাধালি কি এক উত্তর দিতে গিয়ে শুধু অস্বস্তিবোধ করেছিল। তার মনে হল তার হাতে একটা লাঠি থাকা উচিত ছিল যাতে ভর করে দেহটাকে কিছুক্ষণ বিশ্রাম দিতে পারত। তার নিজের দেহটাকে শীতে স্নানের সময় যেমন করে হাত দিয়ে জড়িয়ে থাকে তেমনি জড়াতে ইচ্ছা হল। জোনাকির আলোর মত টাকা-ভোর উষ্ণতা একবার এখানে একবার সেখানে, দেহের সর্বত্রে পালিয়ে বেড়াতে লাগল। এটা উষ্ণতা না তার উত্তর? কিন্তু সে কিছুই বলতে পারেনি শুধু স্থির হয়েছিল।

তুড়সী বললে "কি বলব গো ?"

বেশ কিছু সময় গেল। উত্তরের মধ্যে তার মনে ভেসে উঠল, সবুজ কদম্ব ছাঁটা ধানক্ষেত, দূরে লাল বসে-থাকা-হাতীর মত একটি টিলার একটিমাত্র ফণী মনসা গাছ। আর এই সুবিস্তৃত স্তব্ধতার মধ্যে একটা লোক। একটাই তুড়সীর কাছে উত্তর হয়ে এল, কিন্তু এত বড় কেউ-নেই এর কথা কোন কথায় বলবে। এমন সময় একটা ট্যাঁটারী ট্যাঁ ট্যাঁ করে এ ধানক্ষেত পার হল। তুড়সী আর পিছন দিকে চাইতে সাহস পেলে না, হাঁসগুলোকে, তেমনভাবেই তাড়া দিতে দিতে চলে গেল।

মাধালি একটি হাত দিয়ে মুঠো করে নিজের বুকে ঠুকতে লাগল। চারিদিক অসম্ভব ফাঁকা, শুধু মাঝে মাঝে পাখীর দলবদ্ধ কখনও বা নিঃসহ দৌড় ছাড়া আর কিছু নেই, সে এসে এখানে দাঁড়াল। সেখানে একটি ছোট ক্ষেত ঝরানি জল ঝরঝর করে পড়ছে খুব আগ্রহ সহকারে সে দেখলে, ধানের গাছ নড়া আর ব্যাঙের বসে থাকা, তবু তার মনে হল এই বেশ—জলে তার পা ডুবালে—জলে পাহাড়ী ঠাণ্ডা সকল কিছু যে এইভাবে তার নিজস্ব হয়ে উঠবে, এবং তার পাট্টাতে এ কথার উল্লেখও আছে। কিছু পরে তুড়সীর প্রশ্ন তার কানে বাজল এবং সেইসঙ্গে তার একটি অপূর্ব মুখ চোখের সামনে ভেসে উঠল।

বুকটা যেন দশাসই হয়, তা বলে সে ইচ্ছে করলে এই ছোকরা ধানক্ষেত, মাড়িয়ে চলে যেতে পারে। সে বললে—"আমি পারি—"

"তাতে ত ধান সব লষ্ট হবে—" আর এক গলায় সে উত্তর করলে। এরূপ নিজের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কওয়া তার নতুন নয়। অনেক অনেকক্ষেত্রে তাদের কইতেই হয়। তার এরূপ বেধড়ক শক্তি আসার জন্য ধুনুরী পাখমারা ছিপের আটায় বটের যেমন ঝটপট করে, তার ভিতরটা তেমনি করতে লাগল। তার মনে হল সে কি ভাবল—ছিঃ ছিঃ করে উঠল মন—সে বসে ধান গাছের গায় হাত বুলিয়ে দেয়। নিজের গালে সেগুলোকে ধরে বুলাতে ইচ্ছা হল। যেমন করে বিলাতি সারেন অগ্রহায়ণ মাসে ধানক্ষেতে কাস্তে হাতে নেমেই, হেলে পড়া ধানের শীষগুলাকে তুলে গালে ঠেকিয়ে আদর করতে করতে তার বিলাতির চোখের জল ঝরঝর করে পড়ত, কি প্রাণের ছিল ধানক্ষেত। সে ধানক্ষেতেই মরেছিল, তার রক্তে অনেক ধান লাল হয়েছিল। আঁকড়া চালের উপরে, তার রক্ত আছে। বিলাতির ধান বড় দুলাড় ছিল। এক মনে সে এই পুরানো কথা ভেবেছিল।

টিলায় উঠে মাধালির শরীর কেমন অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। কতটুকু রাস্তা চড়াই পাখী এক উড়াতেই পার হতে পারে। গরুর গাড়ীর চাকায় যেমন কাদা লেগে থাকে তেমনি অবসন্নতা তার গায়ে লেগেছিল। সে এখানে খর জমিতে বসে পড়ে, একটি শ্রান্ত নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করলে এবং একবার পাহুড়ীর দিকে দেখেছিল। গ্রামের ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে, এপাশে কুসুডিহি—ছেলেদের গোলমাল আসে, সেগুলি যেন হাতে গড়া মাটির পুতুলের মত, ইঙ্গিত আছে কিন্তু স্পষ্টতা নেই। এই এতবড় ফাঁকার মধ্যে সে ক্রমশঃ স্থির হয়েছিল। সারাদিনের হিসাবটা সে মিলিয়ে নিলে। আকাশে অনেক মেঘ চলে গেল। ক্রমশঃ বাদুড় পাড়ি দিতে লাগল। তার কাছে বিরাট স্ত্রীলোকটি ক্রমাগত পাথর হয়ে গেল। কোন সূত্রেই যার এতটুকু ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। একইভাবে চিরকাল যা নীল হয়ে থাকবে।

সে রৈবতীর শেষপ্রান্তে, যার যেখানে অনেক রেড়ীর গাছ সেখানে কিছু আকন্দ গাছ সেইখান দিয়ে উঠল। এখন তাকে দীনতা আচ্ছন্ন করেছিল। এতক্ষণ যেন বা কয়েকটা শিকার করা খরগোস, তার লাঠিতে বেঁধে দর্প ভরে সে ফিরছিল, খরগোসের ল্যাজ, পা তার পিঠে লাগছিল। যে শিকারের ভাগ সে সকলকে কিছু কিছু দেবে এমন মনে ছিল, সকলেই খুসী হবেই। পরিদৃশ্যমান সকল কিছু যা সে আপনকার ভেবে উৎসর্গ করতে গিয়েছিল, সেগুলিই শিকার করা খরগোস। এখন দেখলে তার কাঁধে কোন ভার নেই, সে আপনকার কাঁধটায় একবার হাত বুলালে। আধা অন্ধকারে ক্রমাগত পথ চলার সে গর্ব উধাও হয়েছিল। একবার তার যুগলের আর্ত্ত চেহারাটা মনে হয়েছিল। সে কেমন ঝিঙের আঁকড়ি লতার মত বেঁকে যায় আর ভিক্ষা করে, তার চোখে কোথাও লোভ নেই শুধু কাতরতা, আগাছার মধ্যে দিয়ে চুলা নিড়ানির শব্দের মত, কি যে বলে। তার থেকেও সে দীন, অত্যন্ত খেদে একবার রেড়ীর গাছের ডাল ধরে সে ঝাঁকানি দিলে, এই ঝাঁকানি দেওয়ার মধ্যে তার বলা হয়েছিল যে কে তুমি অশরীরী মধ্যপথে আমার একমাত্র কাপড় ভাসিয়ে নিয়ে গেলে, যেমন হাঁইসদো কতটুকু নদী বা, ঢালের সময় বুজড়ীনা কত কষ্টে দুই পাই ধান রোজগার করে মাথায় কাপড়টি রেখে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলেছে। কত পাথর পায়ে এসে মৃদু ধাক্কা দিলে কত গাডঢায় পা পড়ল, সে পা দিয়ে ভেবে ভেবে চলেছে হঠাৎ এক গাডঢায় পা পড়ার সঙ্গেই হাত সরে গেল, কাপড় মোচড় খেতে খেতে দুরন্ত বাতাসে কোথায় চলে গেল তেমনি বহু কিছু শুষ্ক এবং মৃত ছিল, শোক ছিল অর্থাৎ চোখের জল উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারত— কিন্তু ঝাঁকানি দেওয়ার পরই এক তিলের জন্য তার মনে উঠল দীনতা না আকাশের অতি দূরের তারার দিকে চেয়ে থাকায় যে দীনভাব আসে তাও ছিল। এ সময়ে তার কানে গ্রাম্য গোলমাল আসছিল— কখনও কুকুরের ডাক।

সামনেই বিরাট চালা করা, স্থাপত্যের অন্ধকার, ন্যাজরথীয় অন্ধকার বটে এবং জলপাই বনের অন্ধকার। সেখানে কিছু আর্ত্তনাদ ছিল, কে একজন এল, হাতে লণ্ঠন, নিশ্চয়ই জনমাণ্ডি হবে, দরজা খুলল। লণ্ঠন থেকে সেজের বাতি জ্বালাল, এবং খানিক হাঁটু গেড়ে বসল। তারপর কুঁজ হয়ে যেমন বড় শীত করছে এমনভাবে চলে গেল।

মাধালির একবার মনে হল চার্চ এত সামনে এসে গেল কি করে? নিজে স্বাভাবিক সহজ হয়ে দাঁড়াতেই টপ করে নিজেই নিজের হাত যেন বা মাটিতে পড়ে গেল। সে এক রত্তি হয়ে গিয়েছিল সে

যেমন সরষের দানার মতই ছোট। সে চমকে উঠল, অনেকে তার পিছনে উপস্থিত আছে মনে হল কিন্তু কারুকেই সে খুঁজে পেলে না। নিকটের কাঁঠাল গাছে ও পাশে শিশু, দূরে বটে ক্লীব অন্ধকার বসে আছে, আবহাওয়া ইতস্তত নড়ছে। অতর্কিতে গায়ের পাশ দিয়ে ভ্রমর চলে গেলে, লোক যেমন পাক দিয়ে উঠে, তেমনি তার সর্বশরীরটা করে উঠল। সেজের আলো, জল আর উপরে তেলের উপর জ্বলছে, এত শান্ত আলো তবু মাধালির কাছে অসম্ভব প্রখর হয়ে উঠেছিল, তার কোনক্রমেই মুখোমুখি হতে সাহস হচ্ছিল না, ভয়ে ত্রাসে সে ক্রমশই ক্ষয়িষ্ণু হয়েছিল। এবং অন্যদিকে বিভ্রান্তকারী অন্ধকার সে বলে উঠল—"বাদুড় কি সমস্ত অন্ধকার আকাশ থেকে আমাদের উপর ফেলেছে, কি ভয়ঙ্কর আঠা আঠা অন্ধকার! সাপের দাঁত যা শুঁষে নিতে পারলে না, বাঘের নখে যে আন্ধার নিলে না, ডিম থেকে শুরু করে, উড়া থেকে তার মৃত্যু পর্যন্ত শুনেও এ আঁধার অনড়—", বলেই সে নিজের বুকটা লড়িয়ে হাত ঠুকে বল্লে—"আমি ভীতু নই, আমি মায়ের দুধ খেয়েছি?" তার মুখের কষ বেয়ে গাঁজা আসছিল—"আমি কাউকে চোখ খুলে দুঃখ দিইনি। আমি কবরী পাতার পিছনে রূপার খোল দেখে আশ্চর্য্য হয়েছি তার থেকে গুটি বার হয়েছে প্রজাপতি উড়েছে দেখেছি। হাঁস—জল থেকে কেমন করে ডানা ঝাড়া দেয়। আগুনের হল্কাকে ঠাট্টা করে ছাগলছানা কেমন করে লাফায়, কেমন করে লোকে কাঁদে, অনেক কান্না দেখেছি—আমি তোমাকে মনে রেখেছি—! আমিত কোন অপরাধ—" বলেই গরুর মতই অস্বস্তিতে ঠোঁটে জিব চাটতে লাগল। কার মত অপরাধ সে উল্লেখ করবে—যেমন ভীম তোড়ের ছাতা পরবের মেলায় বড় মেলা। আমরা অনেক ক্রিশ্চান সেখানে যাই, অনেক মাদল বাজল বহুলোক নাচল। কালেক্টর ঘোড়া ছুটিয়ে মেলায় এসে পড়ল, একটা খবর দিলে না, সাহেবটার ঘুমের লষ্টাই হচ্ছিল, কালেক্টর লাথি লারে চাবুক মারে ঘোড়া ছুটায়। সঙ্গে তার চামরদার এসেছে সে চামর দুলায়, লাচের মধ্যে দিয়ে গো, কত মশাল পড়ে টাল—কত হাঁড়িয়ার কলসী ভাঙল তার চাবুকে কত মাদল বাজল গো। একটা মেয়েদের একদল হাত ধরাধরি করে নেচেছিল, তারা সব হাত না ছেড়েই ছুটতে লাগল। একটা শাল গুঁড়িতে আটকে গেল। কিন্তু কেউ কারুর হাত ছাড়েনি, দুপাশের যারা আটকায়নি তারা প্রজাপতির ডানার মত এগোয় আর পিছায়। সাহেব তাঁদের ভেঙে দিলে, ফরেষ্টরও ছিল সে একটা বেছে দিলে সাহেব তুলে নিলে, চামরদার চামর দুলিতে দুলাতে পিছে পিছে ছুটল—আমি তেমন কিছু চোখ খুলে করিনি—আবার জিবটা বুলালে—"হ্যাঁ দারগা যেমন সরঝার গ্রামে পাল্কী নামালেক, চৌকিদার গ্রামে হাঁকলে,—"দারগা হে—, যত কোরা, মুক্তা, ডোম, বাউরী—মাটি খুঁড়ে যা পারলে নিয়ে এল, যে পারলে না, বল্লে—"এই শালাদের বানধ্—চোর শালারা—মার শালাদের," মার খেয়ে তারা ধুলো ঝেড়ে দাঁড়াল। দারগা বললে—'শালা পূর্ণিমার আগে সিকি দুয়ানি দিবি—তামা—লুবনা—।" আমি এমন কখনও করিনি। লোচন ঠাকুর লেঠেল দিয়ে দখল করতে গিয়ে বিলাতি সারনকে তার জমিতে মারলে। সুবাই যেমন আমাকে তার নোক চুল দিয়েছে।

কখন যে সে-চার্চের ভিতরে চলে এসেছে, তা তার জানা না থাকলেও একবার এ ব্যাপার বিস্ময়ের বলে মনে হল, গা তার রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল, এক একবার সে মাথা নাড়া দিয়েছে, অনেক কথা অনেক ঘটনা তার মনে আসছিল, সে নানারকমভাবে অঙ্গভঙ্গী করে সে সকল কথা ঠেলে রাখতে চেষ্টা করছিল তার কাছে কল্পনাতীত যা তার কাছে দুরাশামাত্র, দেহে যদি চোখের মতই পাতা থাকত তাহলে সম্ভব হত! মাদুরের কাঠি তার হাঁটুতে লাগছিল, ক্রমশই সে অধৈর্য্য হচ্ছিল। এতগুলো বছরের এই প্রথম, সে মায়ের কোলে এসেছে (বুঝেই নি), যখন হেঁটে এসেছে তখন অনেক লোক ছিল। মোটা মোটা দাম্ভিক গলা এই চার্চের নিসিন্দের বেড়ার কাছে আসতেই তেল ফুরিয়ে যেত। এখান থেকে বার হবার পর অনেকটা দূরে গিয়ে, ছেলেদের চেঁচামেচি, পাখীদের আওয়াজে আবার স্বাভাবিক গলার স্বর ফিরে পেত, তবু তারা লোক, সে একা নয়।

একা এই প্রথম, হাঁইসাদো উড়ন্ত কাপড়ের মত একটি নদী, তার সোঁতায় বাঘের পায়ের ছাপ দেখে দিনমানে যে ভয়, সে ভয় আর এক। তাকে যেন কে ছুঁড়ে ফেলে দিতে চাইছে; সে বল্লে—"গাছ লতা পাতার যদি কোন দুর্ভাবনা না থাকতে পারে, আমারও নেই।" বাইবেলের এক সূত্র, ঋজু একটি বাক্য সে আবৃত্তি করতে চেয়েছে, অন্তত একটা গান—"তব পবিত্র নাম গাহে পাখী হে রাজন (জৌনপুরী)"—গানটা তার কানে গুঞ্জন করে উঠল। কিন্তু স্পষ্টত কোন কথাই তার মনে উঠল না।

এমত সময় হঠাৎ অল্প গাছের পলকা ডালে, যখন কারকেতা পাখী এসে বসে তখন সমস্ত গাছ নড়ে উঠে তেমনই একটি অস্ফুট কান্নার স্বরে সে চমকে উঠল। সে পিছন ফিরে দেখলে, ক্রন্দনরত দুটি চোখ, তার নিজের ছায়া মেয়েটির উপর পড়েছিল, মাধালি মাথাটা সরিয়ে নিয়ে অবাক হয়ে দেখল, নাসা স্ফীত করে দেখল।

এই মেয়েটি শবর, এখন তার খোপা বাঁদিকে টানুনী কারণ সে তীর ছোঁড়ে। অনেক পাখী খরগোস, ইঁদুর মারে । ছেঁড়া কাপড়ের মধ্যে তার দেহ ঐশ্বর্য্যে, ঘাড় কাত করে আছে, তার চোখে অজস্র জল। মাধালি ভাবল, "আশ্চর্য্য! এত জল কোথায় পায়।" দূরে ছোট বারান্দা মত জায়গা, একজন বেশ বৃদ্ধ লোক, তাকেও মাধালি বেশ স্পষ্টই দেখতে পেলে। মেয়েটি স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে; এরূপভাবে সে তার শিকারের দিকে তাকায় না। মাধালি নির্বোধের মত তখনও সেইভাবে বসে। মনে হয়েছিল, তার মত ভঙ্গী করে সেও বসে থাকবে। করতে গিয়ে মুখ ফিরিয়ে বসেছিল। কিন্তু কিছুতেই পারলে না। শুধুমাত্র তাদের উপস্থিতির জন্য কিয়ৎ পরিমাণে স্বস্তি পেয়েছিল। কিছুক্ষণ পূর্বের হিম নেই। সকালের রোদ আছে। মেয়েটির কান্না তৎসহ গোঁঙানি তাকে বিশেষরূপে সজাগ করেছিল। সে নিজের আধা জাগ্রত অবস্থায় যেমন এখানে প্রবেশ করেছিল, তেমনি আধা ইচ্ছার অবস্থায় উঠে দাঁড়াল, থামে থামে আলো পড়ে সমস্ত ঘরটি অদ্ভুত রহস্যের সৃষ্টি করেছে, অনেকখানি উচ্চতাপর্য্যন্ত থামের গায়ে খোদাই করা, লতা লতান আছে, পাতার ছায়া ছিল। পাখীর আহ্লাদ ছিল। এ সকল নক্‌সা যেমন বা ফুল দিয়ে কেনা। আলো পড়েও যে গভীরতা গভীরই আছে। মাধালি মেয়েটিকে—অপরাধ যাতে না হয় এমনভাবে দেখে নিয়েছিল, সেজের আলোয় দেখলে ঠোঁটটা কাঁপছে, সেজের আলোয় এক ফোঁটা জল কাঁচ হয়ে উঠেছে। এই কাঁচ মাধালিকে এক নূতন আশা দিয়েছিল,—"আমি যদি টুকুন হতাম, উখানে বসি ক্ষেত খামার করতাম। উটা আর এক চার্চ গো, ঐখানে আমি স্থির হয়ে বসতাম তাকে ডাকতাম"। সে শূয়ার যেমন নাকমুখ তাগিয়ে বোকার মতো চেয়ে থাকে তেমনি চেয়ে রইল খানিকক্ষণ। এর পর থাম কাটিয়ে সে বাইরে এসে দাঁড়াতেই—বুড়ো লোকটি চাতালের থাম ধরে উঠে দাঁড়ালে, কক্ষের আভ্যন্তীর্ণ আলো সে যেন মাথায় করে নিয়ে উঠল। "উয়ার কি হইছে গো—"

"উয়ার বরটা মধু পাড়তে পড়েছে, গলাদি রক্ত বার হয়—ইটা আমার বিটি গো—, বড্ড কাঁন্দে হে—এখন ঠাকুরকে মন গো—দেখকি—বেপার করে—" খুব গোপনতা রেখেই সে বলেছিল, সমস্ত কথাটা ভাল মত প্রকাশের নিমিত্ত সে দুলে দুলে তার মুখের কাছে এসেছিল। তার ভ্রূর চুলগুলি খাড়া হয়ে উঠল, তালের আঁঠির মুখখানিতে ঘাম ছিল।

এ সকল কথা মাধালি একা শুনেনি সে থামটা জড়িয়ে ধরে শুনেছিল। সেই ভাবেই সে প্রশ্ন করল,— "কতদিন হল গো?" "তা গেল আন্ধারে হইছে—" (অমাবস্যায়) তারপর নিজের মনেই বললে—কত মুরগী আর যে বোঙ্গাকে দিব" (প্রকাশ থাক—বোঙ্গা এদের দেবতা নয়)—

এ কথার উত্তরে মাধালি চুপ করেছিল, হঠাৎ অপটুবুদ্ধি হল, সে জিজ্ঞাসা করলে, "তুয়ারা ত ক্রেস্তান লয় কি হে—?"

বুড়ো এ প্রশ্নে কানে রাখা চুটাটা একবার আছে কিনা দেখে নিয়ে মাথাটা নাড়লে, তারপর সাহস করে বললে—"মশায় পাদরী বাবা বলেছে, উয়াতে কিছু নাই—তুমি তাঁকে বল গা—রুজ আসি আমরা—আমরা যে বড় কাঙাল গো, আমাদের কেউ নাই—হে—" পরিষ্কার বল্লে—তারজন্য তাদের মনস্তাপও নাই, "শুনছি বড় জাগ্রত হে—বিটিছানা বলবে হে,—ডাগর জাগ্রত গো—পাদরী ঔষঁধ দিনছে—হে—" "কিছু ভাল হইছে হে—" বলে বুড়োটে ভাব মুখে আনলে "ফিঙে ধনুক হাতে না লিলে ভাল কেমন করে বলি,—বিটির পেটে ছানা না এলে ভাল বলি কেমিনে—তবে ভাল বটে—"

"তুমার বিটিছানা কি বলি ডাকে—হে" সলজ্জভাবে মাধালি বাধ বাধ গলায় প্রশ্ন করলে।

"তা কেমনে জানব গো,—সব কি সুঝা যায় হে, ডানা ঝাপটাইছে ত ভারী উড়ছে তারই মধ্যে ছোঁ মারলেক, তখন ভাবি—কখন ভাবলেক গো"—এই কথার পরে নিজের মাজায় দু হাতের ঠেস দিয়ে, দেহটাকে কিছুটা সোজা করে ভিতর দিকে চেয়ে আবার মুখখানিকে মাধালির দিকে ফিরালে। কক্ষের আলোকে সে যেন নড়িয়ে দিয়েছিল। মাধালি বুঝলে যে অন্ধকার হেতুতে সে ভীত হয়েছিল, ঠিক সেই অন্ধকার তার সর্বদেহে লিপ্ত হয়েছে তবু বুড়ো, ব্যাঙের মত গা ভাসিয়ে দিয়ে আছে, বুড়োর মুখে

আদ্দেক ভাগে আলো, আধা কালো—চোখে ওঝার মত চাহনী এখানে খানিক কম আলো হল। মেয়েটি কক্ষের অনেক থামের রহস্য ভেদ করে এসে দাঁড়াল, তার পায়ের শব্দ ছিল না। ব্যাধের পায়ের শব্দ হয় না। এসে মুখ তুলে চাইলে।

মাধালির আবছায়া তার মুখটা মনে পড়ল। অনেক দিনের আগে, হাতে ভারী বর্শা, মাধালির সঙ্গে পেকা ছিল না, অন্য একটা গাছে—একটা কদমগাছে ফুলে ফুলে চক্কর খাচ্ছে তার তলার দাঁড়িয়ে এই মেয়েটি হাতে তার হরিয়াল, আর কাঁধে তীর ধনুক। এই বৃষ্টিতে হরিয়ালটা উঁচু করে ধরে দুলাতে দুলাতে বলেছিল—"জোড় খাওয়া (মিথুনের) হরিয়াল গো—খুব স্বাদ হবে হে, একপাই ধান দিস রাজা গো"—এক একবার তার কানের শুষ্ক শাল ফুল দেখা গিয়েছিল, ওরা শাল ফুল অনেক রাখে যা কানে দিয়ে এলে, শিকার ভাল মিলে।

এখন সে মেয়েটা বললে, "বুল্লাম—গো ঠাকুর বাবা, পেটের জ্বালা আমায় এখানে দিলে কেনে গো—" বলে ডুকরে উঠে থেমে বললে—"বুল্লাম হে—কালো হরিণ কানের থেকে বড় বড় যার চোখ, বুরখা বুরখা (বর্ষা) যার চোখ তাকে আমি মেয়ে এনে—দুবো—গো—মানুষটা বড় দুখাইংছে ঠাকুর—"

বুড়ো লোকটি এবার থাম ধরে, দাঁড়িয়ে অল্প হাঁফাতে লাগল মেয়েটি নিজের গলার লাল বুটিটা ধরে বল্লে—'যদি ফিলিপ পাদরী পাই গো বহু জঙ্গল তার পা ধুয়াবো" বলে সিঁড়িতে নামল। তীর ধনুকটা তুলে নিল কাঁধে রাখলে। এক পা এগিয়ে যেতে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। মুখে আলো পড়ল, হাত জোড় করা; একটি বন নড়ান শ্বাস ত্যাগ করে জিব ওষ্ঠে বুলিয়ে—তর্জনী একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত বুলিয়ে সামনে শূন্যে কি লিখলে, তিনবার চাতালে লিখলে তারপর অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

মুখের মধ্যে মেয়েটির গর্ব ছিল—যা মাধালিকে স্তম্ভিত করেছিল। ভগবানের প্রতি বিশ্বাস স্বামীর প্রতি ভালবাসা—। মাধালি থামে হেলান দিয়ে ভাবতে ভাবতে বললে "একটা শবর মেয়ে, ক্রেশ্চান নয় সে কেমন চুপ করে এখানে বসল এমনভাবে কথা বললে, যেন তার সঙ্গে দেখা হয়েছে। আর"—বলে একবার ভিতরের দৈর্ঘ্যের দিকে তাকানোর সঙ্গে পায়ের শব্দ পেয়ে ভাল করে বুঝে নেবার পূর্বেই, একটি হৃষ্ট পুষ্ট চেহারা এখানে এসে দাঁড়িয়ে মাধালির দিকে দেখলেন তারপর সেই এলবার্ট জুতা খুলে একপাশে রেখে ভিতরে গিয়ে হাঁটু গেড়ে মাদুরেই বসলেন। এঁকে দেখে মাধালি কেমন এক সাহস পেল।

ইনি অনেক পরে কক্ষের রহস্যকে না ব্যক্ত করে ধীরে ধীরে বার হয়ে এসে বললেন, 'মাধালি'—

মাধালি কিছু বলবার আগেই হাঁটু গেড়ে বসে, কিছু বলবার জন্যে মাথাটা দুলাতে লাগল, বললে—"বাবা আমার চোখে জল নেই কেনে—"

"মাধালি—তুমি কোথায় ছিলে?"

এই প্রশ্ন মাধালিকে, আকাশ পথে বহু বহু দূরত্ব, বালির সোঁতা বন-ধানক্ষেত চড়াই-উৎরাই; সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছু দেখিয়ে কে যেন বা ফিরত দিয়ে গেল। বল্লে—"বাবা আমি বোধহয় বাঁচব না, আমি বড় ডরাইছি দুখাইছি, আমি অন্ধকার দেখছি—"

"মাধালি—"

"আমাদের খাবার নাই কিছু নাই—আবার এই দুখ্ কেনে—আমার ভিতরে কুকুর সেন্দাইছে—কার্তিকের কুকুর মত—" বলেই তার নিজের কানে যখন এ কথা গেল তখন দেখলে কোথায় যেন শিউলি ফুল পাতায় পাতায় পড়ে, কুয়াশা আর আলো অনেক কুকুর এবং এক কুক্কুরী পিছে ছুটে—লজ্জায় মাথা নীচু করে তবু বললে—"আমার জোর নাই; হাড়ী হোলা জ্ঞান নাই, আমি জ্যান্ত ব্যাঙ খাই—।"

"হে ঈশ্বর, হে ঈশ্বর" উক্তিতে তাঁর বারবার ঠোঁট কাঁপতে থাকল। "মাধালি উঠ" বলে পাদরী তাকে উঠালেন, তার মুখটা আলোতে স্পষ্ট করে দেখে নিয়ে বললেন, "তোমার চোখে জল কেনে—? এসব কথা বলছ কেনে?" বাইবেলটা তাঁর নিজের বুকেই ধরা ছিল, তিনি কিছুই বুঝতে পারছিলেন না, মাধালির জন্ম থেকে তাকে জানেন। লাঙ্গলের মত সহজ-সরল শক্ত ছিল বাপ, তারই ছেলে মাধালি, একাই খড় বোঝাই গাড়ীর চাকা দমে গেলে তুলতে পারে, খেতে পারে, ছুঁতো করে লোকের সঙ্গে মারপিট করে, কত সালিসী করতে হয়েছে। কতবার দূরে দাঙ্গা হাঙ্গামা হলে—সব্বাই কেন তিনিও ভেবেছেন মাধালি নেই ত সেখানে? সেই মাধালি মৃগীর মত মুষড়ে মুষড়ে উঠছে। অনেক অসংলগ্ন

কথাই বলেছে, অবশ্য অসংলগ্ন কথা বলা এদের ধারা; একবার বললে "আমার চোখে জল নাই।" কথা শুনে পাদরীর মন দূর আকাশে চলে গিয়েছিল, বাইবেলধৃত হাত কিছুটা কম্পিত হয়েছিল, অন্য হাত একটা অবলম্বন চেয়েছিল। কারণ তার মধ্যে কোন নয়, সমগ্রগীতের বেদনা ছিল। কিন্তু পরক্ষণেই আর এক প্রশ্ন—। মাধালি সে প্রশ্ন করেছিল মেয়েটির দুঃখ দেখে নিজের নয়। তারপর তার নিজের কথা।

মাধ্যলি আস্তে আস্তে সমস্ত কথাই বললে, পর পর এখন গুছিয়ে সে বলতে পারলে সেটাই আশ্চর্য্য। সে কার জামা, সে দুখানা হয়েছে (বাইবেল) তার মাথা উঁচু হয়েছে...তার স্তন্য পানের ইচ্ছা হল। প্রত্যেক সময়ই যে রোমনির কথা বলেছে..."আমার মনে হয়েছে আমি তাকে সবকিছু দিতে পারি...আমার তুড়সীর পিঠ দেখে...মেয়েটির চোখের জল দেখে আমি বড় কষ্ট পেয়েছি! আমি সুবাইকে ক্ষমা করেছি। আমি বনে বনে ঘুরেছি আমি কুষ্ঠ রোগকে বলেছি" এরপর সে তার মুখচোরা ভাব কাটিয়ে উঠে হাতে যেন ফল ধরে আছে এমন ভঙ্গীতে নাড়াতে নাড়াতে জিজ্ঞাসা করলে "হে বাবা হে বল, আমার পেট ভরার খুসী নাই, কিছু নাই—এ কে এলো হে...বিটি ছানার পেটকে সন্তান আসে, আমার ইখানে কে সেন্দাইল আমি তাঁর ছবি দেখছি সেই জোরে বলি কে...এল...?"

পাদরীর গোল মুখখানিতে কোথাও কোথাও আলো পড়ে, অদ্ভুত রূপ ধারণ করল, মুখ যেন লুপ্ত হল, তিনি যেন জাতি হারালেন। একবার এ প্রশ্নের উদ্দামতায় ধীরে যেন চোখ বন্ধ করেছিলেন। ঠোঁটে উক্তি ছিল তাই ক্রমাগত কম্পিত। বেশ কিছুক্ষণ পরে অল্প জিব দেখা গেল। সম্মুখেই দশাসই শাল কাঠের তৈরী লোকটা। আলোয় মনে হয়, হাত বশ নেই এমন যে হাত তারই তৈরী মাধালির অবয়ব। মাধালির হাতটা এখন তেমনিভাবে ছিল, সেই হাত ক্রমে খুলে বিস্তৃত, এ হাত নিয়ে সে কিছু করেই।

সাহস করে পাদরী তার দিকে একবার তাকালেন। এ কি সেই মাধালি কিস্কু, ঘুংরী কিস্কুর ছেলে, এতদিন যেন সে ছায়া হয়ে ঘুরে বেড়াত, বহুদিন পূর্বে একবার ঠিক দুপুর বেলা এই চার্চে মাধালি খেলতে খেলতে ঢুকে পড়েছিল; একটি থাম ধরে উচ্চৈঃস্বরে কি কান্না! কতবার তাকে দেখলেই সে কথা পাদরী সাহেবের মনে হত, কেন সে ভীত হয়েছিল? এর গাম্ভীর্য্য না বিরাটত্ব কি তাকে এখানে একা করে দিয়েছিল। এখন সেই মাধালি একটি প্রশ্ন তার হাতে; যার মধ্যে পৃথিবীর সমস্ত গুণ বর্ত্তমান। অবশেষে ডানার অক্ষরে লেখা আকাশের মত, পাদরী এই প্রশ্নের গুরুভার কোনক্রমে একটি শ্বাস নিয়ে ক্রমে পরিত্যাগ করেছিলেন। না জানি এ প্রশ্নের এর উত্তর আর কি বিরাট। যে প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্যই সময় কালের সৃষ্টি!

পাদরী মাধালির হাতের বিরাট পেশী একটু ধরে নাড়া দিয়ে আস্তে আস্তে বললেন, "মা...ধালি"—এই আহ্বানের মধ্যে অনেক দেখাশোনা ছিল। ও পাশের সবুজ ঘাসে বেড়াতে বেড়াতে একদিন ফিলিপ পাদরী বলেছিলেন—"অহঙ্কার নয়...আমার গায়ের রঙ পর্য্যন্ত কালো হবে, আমি এ সাঁওতাল, মুণ্ডা কোল এদের জীবনের মধ্যে একটা গর্ব এনে দেবো", জীবনে সত্যই তিনি গর্ব এনে দিয়েছিলেন। কারণ এরা সকলেই তাঁর নাম জেনেছে, এ জন্যই গর্ব।

প্রকৃতির সঙ্গে উড্ডীয়মান হংসের কত ব্যবধান আমার সঙ্গে; দূরবিসর্পী চিলের ডাক যে মত, মাটিধৃত বস্তুর মত হয়ে আসে দূরন্ত তীক্ষ্ণ হয়। তেমনি হিমতীক্ষ্ণ হয়ে আসে এদের নড়াচড়া মধ্যরাতে আমার কাছে তাদের গোপনতা এনে আমার সর্বাঙ্গে হাত বুলায় আমি রোমাঞ্চিত, আর আমি তাঁকে ডাকি। এই অগণন, ত্বকের উপরের গোপনতা। কোথাও তুমি কুড়ুলে হাতের ভর দিয়ে শ্রান্ত, কোথাও তুমি ঝড়ে পাখীর-বাসা-পড়ে-যাওয়া দেখতে ব্যাপৃত, কোথাও তুমি নবাগত উৎফুল্ল স্রোতে পাতা ফেলে দিয়ে অবাক হয়ে থাক, হে গোপনতা! কত গাছ সুদীর্ঘ হয়েছে, বিশুষ্ক পলাশ কোথাও, কোথাও জলকে রঙীন করেছে, কিন্তু তুমি তোমার পূর্ব পুরুষ ঘাড়ে করে অক্লান্ত ভাবে চলেছে। জীবনকে ফেলে দিয়ে বনাঞ্চল অতিক্রম করেছে, এই তোমার কাজ, বহুবারই আকাশের দিকে চেয়েছে, শ্যেন তোমার দৃষ্টিকে নিপীড়িত করেনি, এখন তুমি উপলব্ধির জন্য বসে আছ তোমারই তারা যারা...প্রভুর নাম শুনে তাকে দেখতে বেরিয়েছিল। যারা তাঁর ক্রুশবিদ্ধ খবর জানে না আজও যাঁকে তারা খুঁজে বেড়াচ্ছে, এমন খোঁজাই আছে; শুধুই তোমরা খুঁজছ। পূর্বে (আর্য্য সীমারেখা) কসাই-এর আর দূরে, পশ্চিমে সুবর্ণরেখার আরও পারে যারা, উত্তরে কৃষ্ণসার মৃগভূমি (?) নিম্নে ব্রহ্মণী যেখানে অস্থি বিসর্জন দেয়, অথবা মহানদী গ্রীষ্মে যা পার হতে সাগর কুড়ার (ছোট নীল কাল পাখী, যার ঠোঁট বাঁকা) চোখ গলে

যায় ইতিমধ্যে যারা শাল সাম্ভার নিমের বনে বনে, যারা একটা দুটো গ্রন্থি জেনে স্থির। কতবার পথহারা ইতিহাস, বিষাক্ত সাপ হাতে করে, অনুশীলন করতে করতে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেছে। তোমরা দেখেছ খানিক পরই মনে হয়েছে রৌদ্রের ঝিলিমিলি ছাড়া ও কিছু নয়। নিজের অস্তিত্বকে তুমি ধরেছিলে, তোমার নিঃশ্বাস, তোমার ত্বক তোমার জিহ্বা ক্রমাগত চেয়েছে একজন আসুক তবে আমরা কাপড় পড়বো।

অজস্র দরজা, শোলাপত্র নিয়ে দূর কোন নদী তটে একাকী গালে হাত দিয়ে বসে আছে, বলে পাদরী ফিলিপ নিরক্ষর শূন্যতা থেকে কিছু পরে, হাত বাড়িয়ে কিছু ধরতে চেয়ে অথবা অনুনয় করতে গিয়ে বললেন—"হা এ জীবন এ দুঃখ মর্ম্মরের ভূমিকায় নেমে এসো...হে"। আর একদিন বলেছিলেন,—"তুমি দেখছ সুবর্ণরেখার ধারে বহু পাথরে আঁকা, কোথাও মেরুদণ্ড নেই, কোথাও ফ্রেম নেই। লোকশিল্প ঠিক তাই, কোথাও ফ্রেম নেই—নেই...মধ্য হতে সে ধরে আছে আলো অন্ধকারে বিচার সে জানে না। এদের জীবনেও সেই ফ্রেম নেই, ছোট ছোট যে সন্ধ্যা দেখেছে সার বেধে পথ চলতে চলতে, যা সে আকাশের গা থেকে কুড়িয়ে নিয়েছে, সেগুলোর তার Cult! মিথুন দেখলে যে মন নমস্কার করে, সেই মনে আর এক জনকে এনে দিব; সেই মন কখনও বিদ্যুৎ এক চাকা এক আর ফুল এক, এই বলে ক্ষান্ত হবে না। তার দৃষ্টির মধ্যে অন্য ইন্দ্রিয়ের খেলাটা এনে দিয়ে নয়। সেই মন গভীরতা এনে দেবে, সে যাতে সারল্যকে বিশ্বাস ভাবতে পারে। স্যরল্য এদের নেই, স্বভাব আছে, যে সারল্যকে সাধুবাদ দেয় সে আরও সরল। দেখ এই গভীরতা তাকে অনন্তের উপলব্ধি এনে দেবে নিশ্চয়ই।"

কোন সমাজ, কেউ এদের ভালবাসেনি সবাই কাজ নিয়েছে এখন যেমন নিকটস্থ কোম্পানী, সমূহ কলিয়ারী আর আর সব এবং কোথায় চা বাগান। এরা এদের হাত দুটোই দেখেছে এরা শুধু কাজই করবে, ভারই বইবে, এরা কুলি বই অন্য কিছু নয়। মেমসাহেবরা নাকে রুমাল দিয়ে এদের পাড়ায় আসে, ভালবাসা জানায়, এরা খুসী হয়ে মাদোল বাজায় সারাদিন খুসী মনে উপোস করে "পেট না ভঁরল মন ভঁরল হে।"

এক একদিন এই পাহাড়ী অন্ধকারে ফ্রান্সিসের সঙ্গে কত কথাই হয়েছে, সে সকল কথা এখনও তার মনে আছে। তারপর ফৌজী সাহেব যখন ক্রমাগত মড়ার মাথা আর স্ত্রীলোক খুঁজতে লাগল ফিলিপ পাদরী তাদের সতর্ক করলেন, তারপর সাহেব মরল। পাদরী এল না...কোন এক বন্য নদীর তোড়ে তাঁর কোট ভেসে এল। ফ্রান্সিসের ফিলিপের প্রতি ভালবাসা ছিল প্রগাঢ়, তিনি সে আঙরাখা হাতে নিয়ে হঠাৎ যেন সঙ্গীহীন হয়ে পড়লেন, জল সম্ভবত পড়েছিল। যে আঙরাখাটা এনেছিল সে সামান্য লোক বোধহয় এক আধ পাই বা আদলা আশা করেছিল। ফ্রান্সিস বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে রইলেন, সেই লোকটা আর তার দুয়েকজন সঙ্গী আপ্‌না থেকেই লাইনবদ্ধভাবে চলে গেল।

ফ্রান্সিস মাধালির দিকে তাকালেন। লাল মখমলের মত পোকা ধরে নিয়ে, কেউ চিক্কন সবুজ মশার মত পোকা ধরে নিয়ে, অথবা মাছিড়া অথবা ধানের পোকা নিয়ে, সামনের টেবিলে বসে কাঁচ নিয়ে দেখেছেন। যারা জানতে চায় তাদের কিছু কিছু বলেছেন। কখনও অল্প তুঁতে মিশিয়ে দেবে, কখনও তামাক পাতার জল দিও। আর যারা এসেছে, সাতসকাল বেলা যাদের এত রোদেও চোখে পড়ে না, পাঁজড়া কারো কারো যেন নিষ্ঠুরতার চিহ্ন, হাজার বছরের সৌখীন নিঃশ্বাস যেন বা এই সিঁড়ি দিয়ে ক্রমাগত উঠে উঠে যায়। ফ্রান্সিস ঔষধ দিয়েছেন আশা দিয়েছেন কাউকে বাঁক ঠিক করে দিয়েছেন ফিরবার জন্যে; বাঁক বেহারাদের বলে দিয়েছিলেন কষ্ট হচ্ছে বলে গঞ্জনা দিও না, প্রভু তোমার মঙ্গল করবেন। বাঁকের পাঠায় বসিয়ে রুগী নিয়ে তারা ঐ সূর্য্য ঘড়ির পাশ দিয়ে যখন তারা রাস্তা ধরেছে, ক্ষেতে নেমেছে, টিলা পার হয়েছে তখন নিঃশ্বাস ফেলেছেন। দু এক জন এমন এসেছে, স্বপ্ন বলতে উপলব্ধি বলতে, 'আমি বোধহয় সেই গাধা ছিলাম গো, তাই না' যেমন ঘুনরী এসে বলেছিলো—"বাবা আমার মনে লেয়" আঙ্গুলে আঙ্গুলে জড়াচ্ছিল, লজ্জায় মাথা তার নীচু থেকে থেকে মুখ তুলছিল, শেষে বললে "বাবা গো জানিস আমার মনে লেয়, আমি বহু পূর্বে সেই নৈকা কাঠ ছিলাম, যেখানে প্রভু ঘুমাঁইছিল, অল্যায় বললাম হে..." কিন্তু মাধালির প্রশ্ন আর এক, "আমার চোখে জল নেই কেনে—" এহেন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে তাঁর জানা ছিল না।

মাধালিকে একদিন যখন খুঁজে পাওয়া যায়নি, তিনি মাকড়ী এবং আর আর লোককে বহু জায়গায়

হাটের পর থেকে খোঁজ করতে বলেছিলেন। অন্য কোন ভাবনা হয়নি, খাবার সময় অনেকবার অন্যমনস্ক হয়েছেন, সামনের আলোতে পোকার পিঠে তাঁর উত্তর পেয়েছিলেন, এখন চাষের সময়, দুএকজন বাদে মাহারারা পর্য্যন্ত চৌকীদার পর্য্যন্ত হামে হাল; ফলে গরু খোয়া যায় লোধারা চুরি করে। মাধালি হয়ত গরু খুঁজতে গেছে, বুনদাই মাধালির কোন কথা বলতে পারেনি। বলেছিল, "মাদা থেকে ধান তুলে আঁটি বেঁধেছিল, কাল পোতা হবে বলি, আমি চোখের জল ফেলেছি আর ধান রুয়েছি।" এখন সেই মাধালি, শুধু চার্চে নয় অসম্ভব প্রশ্ন নিয়ে—"আমি কি মরি যাব হে...?"

"মাধালি ছিঃ একথা বলছ কেনে...!"

মাধালি এ কথার উত্তরে কি বলবে ভেবে না পেয়ে ধীরে ধীরে খানিক মুখ তুলে দেখলে সাহেবের তার দিকে মুখ, ভীরু পোকার মত মুখখানি...দেখে সে বললে—"হানি লেলযাইঞ্জা ইকুয়ামাত্র, তিনি জানেন, ধান কাটতে কাস্তেতে আঙুল কাটায় আমি রক্ত চুষিছি গো, নিজের রক্ত, ব্যথায় আমার চোখে জল নাই...বল কে আমার ভিতরে গেল, এত আলো কেনে—আমি ক্ষ্যাপা হইছি কি" পাদরী ফ্রান্সিস কোন মতে বললে—"তুমি পা ধোও, ভিতরে চল...আমরা..."

"না—" বলে সে মাথা এপাশ ওপাশ করলে।

তাকে বুঝাবার চেষ্টা করে পাদরী খুব মৃদু স্বরে বললেন,—"কেনে মাধালি..." এমন মনে হয় স্বর বেশী হলে মাধালী বোধহয় কষ্ট পাবে।

গাছের মাথায় চাঁদের আলো পড়েছে, অন্ধকারকে কুর্চ্চিফুলের গন্ধ কিছুটা হাল্কা করেছে, মাধালি একটু যেন জোর পেয়ে বললে—"আমার বড় ডর করে গো বাবা—।"

পাদরী ফ্রান্সিস এই কথায় ভীত হয়েছিলেন না রোমাঞ্চিত হয়েছিলেন তা ঠিক নিজেই বুঝতে পারলেন না শুধু বললেন —"আমি ত আছি...ডর কেনে...?"

"আমি উয়ার মধ্যে গেলে কি আর খেতে লিতে পারবো?" মাধালির গলায় চোরা আহ্লাদ, সে যেন ভিতরে ভিতরে সিদ্ধ হয়েছে। তবু কবেকার দেখা, লোচনের লোক বিহারী মাণ্ডি আর গৌরহরি আলে দাঁড়িয়ে কালী মুচী ঢোল দিচ্ছে, একজন কোঁড়ার জমিটা লোকটা রোগা, মাঘের শীতে চিরকাল ঢোল বয়ে বেড়ায় তাই কম্পিত, তবু কোঁড়া লোকটার কপালে ঘাম, চোখে জল। আরও কত লোক জমা, কয়েকজন বললে "এ অন্যায়" ঢোলের শব্দে তাদের গলার শব্দ শোনা গেলনা। এক এক ডাক হয় আর লোকটা বেঁকে যায়, শেষে ৮ টাকায় জমি নীলাম হয়ে গেল। সেই ঘটনা স্মরণে মনটা সেই দিকে রেখেই সে বলেছিল—"আমার সব কিছু নীলাম হবে গো বাবা।" শুধু তার মুখটা পাদরীর দিকে দেখার জন্যে হঠাৎ ঈষৎ এইদিকে ফিরেছিল। মাধালি যেন রঙ্গ করছে, এমন তার হাস্যকর গলার আওয়াজ।

ফ্রান্সিস পাদরীর চলে যাবার ক্ষমতা নেই। তিনি স্পষ্ট করে বললেন—"...দেখ মাধালি মাথা ঠিক কর, শান্ত হও," তারপর গলা পরিষ্কার করে বললেন "তুমি প্রার্থনা কর...।"

মাধালি এই গলার স্বর অনুভব করলে, সেখানে কোন প্রশ্রয় ছিলনা, ফলে সে সোজা হল। নিজের একবার মনে হল, তাহলে আমার মধ্যে কিছু হয়নি। পাদরীবাবা কিছু বুঝতে পারছে না, প্রশ্ন করলে—"আমি যে বনে বনে ঘুরলাম, চাল ছাগল দিলাম...আমি যে...।"

"আমি কি বলছি তা সত্য নয়, তবু প্রার্থনা কর..."

মাধালি যেন শ্লেষ জুড়ে বললে, "আমার মধ্যে আলো এল হে আর আমি ওখানে যাব, এখন প্রার্থনা করব...বল কি গো বাবা"...

মাধালির এরূপ কথাকে ফ্রান্সিস ধৃষ্টতা বলতে পারলেন না। কারণ তিনি জানতেন, এদের প্রকাশ ভঙ্গী আর এক প্রকারের ফলে তিনি কিছু বলবার পুর্বেই মাধালি বললে—"বাবা আমরা তাহলে কি করব। আমরা কেমন করে রাত কাটাব?"

"মাধালি আমার মনে হয় তুমি ভগবানকে ডাক..."

মাধালি সত্যই কিছু মনস্থ করতে পারেনি। তার কতক কথাই মনে আছে শুধু এইবার মনে হল কাকে যেন বলেছিল—"আমি তাঁকে দেখবই।" ভাববার সঙ্গে সঙ্গেই তাই গায়ের শিরা গরু খাওয়া ঘাসের মতই তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। অল্প আলোয় হাতটা একটু তুলে আবার বেশী করে তুলে দেখে। অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে বলল—"দেখ দেখ বাবা"—তার চোখ বিস্ফারিত হয়।

"আমি দেখেছি চল"

মাধালি পা ধুয়ে আস্তে আস্তে আবার কক্ষে প্রবেশ করল। সঙ্গে ফ্রান্সিস দুজনেই হাঁটু গেড়ে বসে। মাধালি হঠাৎ তার ভারী গলায় বললে, "তিনি কি আমায় দেখা দিবে," তার গলার স্বরটা এখানে অনেক কিছু তচনচ করলে, সে এদিক ওদিক চেয়ে পাদরীর দিকে চাইল।

মাথা নাড়িয়ে ফ্রান্সিস উত্তর দিলেন।

এখন অনেকটা সে স্থির। বার বার তার চোখের সামনে ব্যাধ মেয়েটির গর্বান্বিত মুখমণ্ডল ভেসে উঠল। একবার তার মনে হল সারা গ্রাম যখন শুনবে, তখন তারা কি অবাক হবে, মাকড়ী তার গালা কুটতে কুটতে অথবা নাখোন যখন গরু বাঁধবে শুনবে কি অবাক হবে। তার বুনদাই দুঃখী মেয়েটি সে যখন শুনবে, তখন নিশ্চয়ই বলবে—"চল লুকিয়ে আমরা জহর থানে একটা সাদা মুরগী দি, কিন্তান আমরা তাতে...কি, কেউ জানবে না।" এইসব ভাবনার মধ্যে সে একবার এ ভাবনা বন্ধ করলে, হয়ত নিজেকে শাসাল "ছিঃ এখন আমি তাকে ডাকছি। এখন আমি তার কাছে এসেছি"—আর সে হুঙ্কার দিয়ে উঠল—"হে প্রভু!" গলার স্বর এই দুঃখীর মন্দিরে খোড়ো ঘরে যেন প্রতিধ্বনি উঠেছিল তার মনে হল। এ হুঙ্কার সে নয়, অন্য কেউ দিয়েছে সে পিছন ফিরে দেখবার আগেই কি এক কথায় সে আবিষ্ট, মোহগ্রস্ত হল। অনেকদিন আগে বিলাসীর বউএর হামাগুড়ি দেওয়া ছেলে কুয়ায় পড়ে গিয়েছিল, বউটা কুয়োয় মুখ রেখে হো হো করে কাঁদতে লাগল, কুয়ো থেকে তার অসম্ভব জোরে কান্না প্রতিধ্বনিত হয়েছিল, আশে পাশে যারা ছিল তারা একের পর একজন কুয়োয় মুখ দিয়ে কথা বললে, অল্প অল্প ধোঁয়া উঠছে, জল থেকে—দেওয়ালে অজস্র গাছ থেকে, এক এক ফোঁটা জল খসে পড়ে, জলে চক্কর দিচ্ছে। বিলাসীর বউ কত কথা বলেছিল—"হেলা সিঙ বোঙা! হেলা সিঙ বোঙা।" কিন্তু কেউ নয়, উপায় সকলেই বলেছিল, কেউ নামেনি। সেও নয়, সে নামতে পারত, কুয়োয় জল কত হবে শীতকালে বড় জোর এক গলা!—কুয়োর প্রতিধ্বনি তাকে উলঙ্গ করে দিলে। সে নিজে যতবার এর উত্তরে বলতে চেয়েছে, তার নতুন অভিজ্ঞতার কথা কিন্তু তাতে কোন ফল হয়নি। দায়িত্বজ্ঞানহীনতা তাকে কোণঠাশা করেছে। (আগের প্রার্থনায় বলেছিল আমি পাপ করেছি) যেমন তার মনেও পড়ে তেমন সে ভুলেও যায়। সে দেখল ডাকা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

অতি সন্তর্পণে সে নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করলে। একবার নিজের অজানিত ঘাড় ফেরালে, আবার ফেরালে। দেখলে সেখানে পাদরী নাই, অসহায় বোধ করবার পূর্বেই সে নিশ্চিন্ত হল, খুসী হল। এমন কি তার মুখে তৃপ্তির আনন্দ হল। মনে হল এই ঘরটা যেন তার মধ্যেই আছে, সে এখানে নেই! এতক্ষণ বাদে সে সত্যই হাত জোড় করল। এইটুকুই হয়ত চেয়েছিল, সে যেন অনেকক্ষণ এখানে বসে থাকতে পারে। এখানে তার শ্বশুর ঘরের থেকেও বেশী আরামের মোরাই-এর পরবের থেকে বেশী আমোদের এ কথা সে জোর করে ভাবলে। এখানকার আলো এখানকার থাম সব যেন আপনার। নিজের মনে চুপ করে থেকে সে বললে—"আমার"—সঙ্গে সঙ্গে মোরগ-ডাকা ভোরের সাধুতার কিছু যেনবা সে পেয়েছিল।

এমন সময়ে বাহিরের চাতালে, কাদের গা ধোয়ার শব্দ হচ্ছিল, একবার মনে হল কোন প্রান্তে পাখীর ডানার শব্দ। তারা কি অদ্ভুতভাবে আসছে, মুখে যেন হাত ঢাকা দিয়ে, ইঁদুর ফোকর দিয়ে মুখ যেমত বার করে, দেওয়াল ঘেঁষে একজনকে অতি সন্তর্পণে ডিঙি মেরে মেরে ঢুকে পড়ল, ক্রমাগত হাতটা নিজের কাপড়ে মুছছিল, একে একহাট লোকের মধ্যে নিজের কুমড়োর উপরে এক পা রেখে, বুকের উপর হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে ভারিক্কী চালের কথাবার্ত্তা বলে বহুলোক তার কাছে অচল পয়সা দেখাতে আসছে, সে এখন ইন্দুরের মত দেওয়াল ধরে এসেছে। তারপরই আর একটি মুখ, গাছের ছালের মত ফাটা ফাটা শরীর বেঁকে গেছে জীবনটা বয়ে বয়ে, একহাত দরজায় দিয়ে, দেহ কম্পনে ঝিঁঝির ডাক বেশ স্পষ্ট। শুধু মুখটা ছাগলের মত নড়ছে; আর কটর কটর করে শব্দ একটা পাখীর মত। শব্দগুলো লাল পিঁপড়ের মত গায়ে এসে পড়ছে আর সে যেন গা থেকে ঝেড়ে ঝেড়ে ফেলে দিচ্ছে। ছাগলের মত বুড়ী মুখের উপর অনবরত সেজের আলো ভাঁজ হয় আবার খুলে যায়, মাধালি নিগৃহীত হয়েছিল, তার মত বাচ্ছা—আগলান—পায়রার মত ফুলে উঠল, কেন তুমি এতদিন, নিঃশ্বাস ধরে আছে জীবন ধরে আছে? এই রুক্ষ নোংরা কথাটা তার মধ্যে দিয়ে নিঃশব্দ হুঙ্কারে পরিণত হল। তাকে ডাইনী ছাড়া আর

কিছু মনে হল না, মাধালি ধড়ফড় করে উঠে যেন পালাতে চাইল আর দরজা আছে অলটারের এককোণে কিন্তু তালা দেওয়া, সে ভীষণ রেগে গেল! মুখ দিয়ে অসংযত কথাও প্রায় বার হচ্ছিল, সে ঘুরে দাঁড়িয়ে শক্তি সঞ্চয় করে একেবারে থামের এপাশ সেপাশ দিয়ে একেবারে বুড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল দাঁতে দাঁত দিলে, বুড়ী দুটি হাত দরজায় রেখে দাঁড়িয়েছিল। সে জোর করে একহাত ফেলে দিয়ে যেই চাতালে এল, শুধু কানে এল, "মাধালি"—মাধালি মুখ দেখাতে পারল না—আবার শুনলে "বেঁচে থাক—"

বুড়ির গা থেকে বাসি বাসনের টক গন্ধ আসছিল। "বেঁচে থাক" কথাটা শুনে সেই গন্ধটা উড়ে গেল। সে থাম ধরে, তার মন যারপরনাই মুষড়ে গিয়েছিল, মাথাটা তার নীচ হয়ে গিয়েছিল। কতবার সে দেখেছে রৈবতীর পিছনে পলাশঘেরে উত্তরে আছে একটি টিলার একপাশ পলাশঘেরা, টিলার জমি সমতল: সেখানে কিছু ঘাসের চিহ্ন তখনও যদিও ফাল্গুন তবু ঘাস ছিল, এই বুড়ি তার মধ্যে হাঁটু জড়িয়ে ধরে বসে, সামনে একটি উলঙ্গ বর্ত্তমান খেলা করে—হাতে তার একটি ছোট পাতা সমেত ডাল, দু চারটে সাদা ছাগল ঘুরছিল। ছানাগুলি লাফিয়ে বেড়ায়, পড়ন্ত বেলার আকাশের সামনে হাজার হাজার লাল উদ্ধত নখ, এখানে তারা। ছেলেটি দৌড়ায়, ছাগলের পিছে ছোটে, বুড়ি শুধু ঠিক দেয়, 'না' বলে করো না, দৌড়িও না, পড়ে যাবে। এই গাছের ছাল-ওয়ালা জীবটিকে ছেলেটি কি আপন ভাবে, গলা ধরে আদর করে। বুড়ী নীতিজ্ঞান নিশ্চয়ই শেখায় না, শুধু নিজের ভালবাসা বুজায়। এই দৃশ্য দেখার পর মাধালির ইচ্ছে করল, সেই পলাশঘেরে দিয়ে সারা টিলা চাটতে। মাধালি হাতে হাতে কষেই, এদিক মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াল। বুড়ির মুখে আলো নেই এক হাত এখনও তার দরজায়, শরীরটা বেঁকে এদিকে ফিরে আছে, তবু অন্ধকারে বুড়ীকে দেখা গেল, শরীরটা তার এখানে—চোখ দুটি যেনবা দু ক্রোশ পিছনে। তবু উজ্জ্বল, ঠোঁটে যেন হাসিও ছিল। মাধালি বলতে চাইলে—"তুমি আলোতে ফিরে দাঁড়াও, আমি দেখি—।" তার সঙ্গে কথা কইল তাকে খুসী করবার জন্যে—"তুমি যে হঠাৎ—"

"আমি রোজ আসি—"

মাধালি দমে গেল। তার ইচ্ছে হচ্ছিল যে হাতটা সে সজোরে সরিয়ে দিয়েছিল তা যেন আস্তে আস্তে বুলিয়ে দেয়—"তুমি—ভিতরে—যাবে না?" "আমি যাইনা, আমি শুধু দেখি লোকে কেমন তাকে ডাকে—" বলে আবার ছাগলের মত কটর কটর করতে লাগল। এ কথার পর বুড়ী আবার ফিরে তাকাল!

মাধালি এখানে আর থাকতে পারল না, চাতাল থেকে নেমে, চলতে লাগল। রাস্তার দুপাশে ছোট ছোট নুড়ি হয়েছিল কিন্তু লোকের পায়ে লাগবে বলে, ফ্রান্সিস সেগুলো তারপরদিন নিজ হাতে লজ্জিত মস্তকে এক পাশ করে দিয়েছেন, কেউ কেউ দৌড়ে এসেছিল সাহায্য করতে কিন্তু তা তিনি দেননি। একবার মনে হয়েছিল নুড়িগুলি থাক, কারণ পায়ে লাগলে সর্বদা নিজেকে মনে পড়বে, আর সকলেই সেই মনে পড়া মন নিয়ে চার্চে আসতে পারবে। তারপর সন্ধ্যাবেলা মনে হয়, না অনেক দুঃখ তারা পাচ্ছে, আর দুঃখ দিয়ে লাভ নেই এইটুকু দুঃখই যথেষ্ট! একপাশের নুড়ির উপর দিয়ে চলাটা সে বেছে নিল, নিজেকে একটু কষ্ট দিতে পেরে কল্পনাতীত পেট ভরা আরাম লাগছিল, আর নিগ্রহ করতে ইচ্ছে হল, একবার যেমন খেজুর কাঁটা ফুটেছিল তেমনি ফুটে যাক! সূর্য্য ঘড়িটার কাছে এসে মাধালি থমকে দাঁড়াল সেটা যেন বিদ-দিরির মত খাড়া, সোজা আর একটাও ছিল আরও দূরে।

এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যায় ফ্রান্সিসের কুঠি। কে একজন বসে আছে, ও পাশে ফ্রান্সিস জমিতে একটা লণ্ঠন, এবং আর একটু দূরে লতা পাতা জ্বলছে, যাতে বর্ষাতি পোকা ওখানেই থাকে ঘরে না যায়। মাধালির একবার মনে হল বাড়ী চলে যাই, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল, না পাদরীর কাছে যাই। অনেক পথ হাঁটার কাদা পায়ে শুকিয়ে যেন গিয়েছিল, এখন সে যেন পরিষ্কার করেছে, এমন কি আঙ্গুলের ফাসাতে জল পর্য্যন্ত নেই, অতিশয় ঝরঝরে। সে ক্রমে এসে কাছেই দাঁড়াল। শুধু পাদরীর সহৃদয় গলার আওয়াজ আসছিল, স্পষ্ট, আর মাঝে মাঝে আলোর হল্কা উঠতে ভীত পাখীদের চীৎকার—। কে একজন এখানে বসেছিল মাধালিকে দেখে, তড়াক করে উঠে নিজের চঞ্চলতার রাশ টেনে এক এক পা এগিয়েই কুঠির পাশে যেই গেল অমনি সে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস বললেন, "সুবাই তুমি কি ভাবিয়াছ কি...তুমি সেদিন—"

মাধালির গায়, মাঝে মাঝে, কাঠের আগুনের উত্তাপ লাগছিল, মাঝে মাঝে উন্নীত শিখার আলো তাকে স্পষ্ট করছিল। ফ্রান্সিসের গলায় কোপবর্জ্জিত উষ্মা ছিল—বললেন "আমি শুনেছি, যারা তোমার জমিতে কাজ করেছে, তাদের তুমি অচল পয়সা দিয়েছ অনেককে, বলেছ কাউকে, আর পয়সা নেই, দু'পয়সাও দাম পাবে—না," সুবাই নীচে দাঁড়িয়েছিল, এক হাতে বারান্দার রেলিং ধরে, সে কি বলবার জন্য মুখ উঁচু করতে গিয়ে নামিয়ে নিলে।

"তারা হুড়তির রাস্তা ধরে কাঁদতে কাঁদতে চলে গেছে, আমি তাদের পিছনে গিয়েছিলুম যখন সে খবর পাই—হুড়তির সেই কুষ্ঠ রোগী বামুন বললে—"তারা এক গঙ্গা বেলায় সে রাস্তা পার হয়েছে, আমি তোমায় চালান করতুম—"

"কথাটা সত্য নয় হুজুর—"

"আবার মিথ্যা বলছ—"

"হুজুর তারা আমাকে মেরেছিল, মাধালি না থাকলে আমি মরতাম হে, হুজুর দিনের আলো আমার রক্ত দেখেছিল—"

এ কথার উপরে যে লোকটি এখনও মালা জপছিল সে মালা ঘুরাতে ঘুরাতে বেঁকে ফ্রান্সিসকে কিছু বলেছিল। এইটুকু স্তব্ধতায় মাধালির অবস্থা...আবছা কার কথা যেন মনে হল। কিন্তু কিছু মনে করবার পূর্বে সে শুনলে—"তুমি তাদের কিছু কর নাই আর তারা তোমায় মারলে? তুমি চেয়েছিলে তাদের কলিয়ারীতে ফাঁকি দিয়ে নিয়ে যেতে, বুড়ীদের বলেছিলে, ওপারে কাশীধাম, মরলে স্বর্গে যাবে। এখানে গিধনিতে খাবে! তারা অনেক পুরুষ...তারা অনেক মেয়ে ছিল...তাদের তুমি বঞ্চিত করতে গিয়েছিলে। সুবাই আমি বলছি, মানুষকে এত কষ্ট দিও না, নরকে যেতে হবে—"। "তারা কেউ কচি পোনা লয় হুজুর, আপনি আমার মা, বাপ, কোম্পানী—"। "আমি কারো কোম্পানী নই—"।

"হুজুর আমি দু বেলা খাই, নিজের আয়নায় মুখ দেখি, তাই লোকের হিংসে"—। "হিংসে, তুমি ফুলড়ার হাটে ফের জুয়া বসিয়েছ, সেখানে টাকা দু আনা মোটা লাও, অচল চালাও, লা সোম সব কিছুর বলন বেশী নাও—"।

"ওরা ধূলা মিশায় যে—" শিশুর মতন বললে।

"তোমার মত ওরা কোলিয়ারী দেখেনি, ও ভাল কথা—তুমি সুবাই ভয় দেখাও তোমার কোম্পানীর সাহেব আনবে, এমনকি লোচনবাবুর লোককেও বলেছে—ডাক হরকরাকে বলেছে তোমার চিঠি হাটে দেয় কেন—"

"সাহেব বাবা, গ্রেস্টাং করে লাও—এত পাপ আমি রাখব কোথায়—?"

ফ্রান্সিস হঠাৎ এ কথায় অপমানিত হলেন। কেমন যেন অবাক হয়েছিলেন, তিনি নীরব দেখে লোচন গোস্বামী বললে, "দেখ্ সুবাই, দেখুন হুজুর আপনি বলেন তো আমি ওকে একদিনে ঠাণ্ডা করে দি, আমি শুধু করি না—যে আর মারধর করতে ভাল লাগে না—" অবশ্য কারণ এ নয় তার লোকবল কম ছিল, "তুমি ডাক হরকার, এই নিতাই উঠত"।

তার কথায় এবার একজন উঠল, ছাদ থেকে টানানো আলোয় তার মুখটা দেখা যায়, মুখে তার দাঁড়ি, রেলিং ধরে দাঁড়াল। সুবাই তাকে দেখে অবাক হবার বা ভীত হবার মোটে চেষ্টা করল না—। সুবাই একই জায়গায় দুটি হাত দিয়ে মুখটি বেশ কাত করে রেখে দাঁড়িয়ে রইল।

নিমাই হরকার বললে—"তুমি আমাকে বল নাই, পাদরীর চিঠি তার কুঠিতে যায়, গোঁসাই রাজার চিঠি বাড়ীতে যায়, আমাদের চিঠি বাড়ীতে দিবি," আমি তাতে বললাম, "বাপু হে খুব ঢ্যাংয়া হইছে হে, দেখান না দেখান না ঝড়ে লিবেক," ইকথাকে তুই বললি—"আমি উঁনচু জাতি, দুধানে লিখা (ঁকালী এবং পুরী) আমায় আপনি আপনি বলি কথা কবি, চিঠি চপাটি ঘরকে দিবি—না হলে টাংগা মারব শালা—"

"লাও কি বুললাম কি বুঁঝল—"

"কি বুঝল? আমি উবুলাকে বললাহে—কেনা জম্মে হবে না গো পূব্ব জন্ম চাই, উ শালা এসে ঝটসানি আমার গামছাটা ধরল। কত চিঠি হয় ইধ্‌কে উধ্‌কে গেল গো, ডানের ঠিকানা বাঁয়ে গেল"—

"দেখুন—"

"যাক সুবাই তোমায় আমি বলছি, তুমি যা কয়লা আড়তে দাবী কর কর, যদি কোনদিন আমি শুনি

তাহলে—আমি দেখব তোমার কত বড় কোম্পানী, মানুষকে ঠকাবার সীমা আছে—" "পাদরী বাবা, তুমি শুনলে বলি তোমার গাঁয়কে আমার বসতি দাও, বুঝ আমি লোক কেমন, আমি যদি অসৎ হই তাহলে আমার জমিতে গাছ হত না গো, বললাম একটা কথা—" সুবাই এ কথা বেশ ভাল জানে যে হাতেনাতে ধরতে না পারলে পাদরী কোন কথাই বলবেন না।

মাধালি এসে সাথে দাঁড়াল, এসে শুধু বললে—"সুবাই" এতক্ষণ থেকে সে আসরে নাববে কি না ভাবছিল, ভাবছিল তার দায়িত্ব কতটুকু। সুবাই তাকে দেখেই—কিছু আগে তার উদারতার কথা বলে তাকে একটু প্রসন্ন করবার চেষ্টা করছিল। মাধালি ওখানে দাঁড়িয়েছিল দেখে সে নিশ্চিন্ত হয়েছিল যে মাধালি এর মধ্যে আর আসবে না কারণ সে প্রসন্ন হয়েছে। কিন্তু এখন তার প্রায় বুকের কাছে এসে দাঁড়াবে তা ভাবতে পারেনি। মাধালি বললে,—"তুমি পাদরীর পা চাট," বলে তার সেই ফতুয়ার এক প্রান্ত ধরে সিঁড়ির কাছে নিয়ে এল—। ডাকহরকরা খুব খুসী হয়েছিল হাতের উল্টো দিক দিয়ে দাঁড়ি চুলকাতে লাগল! লোচন গোঁসাই আতিশয্যে পা নাচাতে লাগল। শুধু ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—

"মাধালি ছিঃ কর কি—"

"বাবা গো ই লোকটা সৎ লয়—"

"তাতে তোমার কি আমি—"

"আমার ইচ্ছা তুমার পা চাটুক—উয়ার ভাল ঘুম হবে—" খুব সরল বিশ্বাসে মাধালি বলেছিল। এখনই তার ফতুয়াটা ছেড়ে দিল—

"সুবাই তুমি যাও—"

"পাদরী বাবা, মানুষকে বড় যাতনা গো—"

"ওর তাতে দোষ নাই ওর কোম্পানী উয়াকে শিক্ষায়—"

"ও তো আড়কাঠি গিরি না করলেই পারে—"! লোচন বললে "লোকটা করে না হেন কাজ নেই—"

"সুবাই তুমি যাও—"

সুবাই ল্যাংড়াতে ল্যাংড়াতে চলে গেল। অনেকক্ষণ বাদে শুধু শব্দ এল, হেট হেট। তখন ফ্রান্সিস তাকে বললেন—"ছিঃ তুমি ওর কোট ধরলে কেন মাধালি, তুমি মুখে বলতে পারতে, তুমি ওকে বুঝতে পারতে—কিন্তু তুমি ওর কোট ধরবার কেন—"

মাধালি সিঁড়িতে অপরাধীর মত দাঁড়িয়েছিল। নিজের হাতখানা যে কোথায় রাখবে ভেবে পেলে না, আঙ্গুলগুলা নাড়ালে, এবং পরে পাদরী ফ্রান্সিস যেমন আঙ্গুল মটকায় তেমনভাবে মটকাবার চেষ্টা করলে। একবার ভাবলে, "এতে কি অন্যায় আর আমিত উয়াকে বাঁচাইছি হে..." ভাবলে সেই গল্পটা তাঁকে বলে। ওদিকে ফিলটার দিকে চাইল, ফুট ফুট করে শব্দ আসছে। ফ্রান্সিস পাদরীর ঠিক পাশেই সেই টেবিল, সেই লেশ সেই ফুলদান দেখেই মন যেন হঠাৎ জেগে উঠে কোনদিকে ছুটতে চাইল, সমস্ত গা রোমাঞ্চিত হল! সে জোর করে ফ্রান্সিসের দিকে চাইল, তিনি এখন উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, তার মুখে টানান—ল্যাম্পের আলো পড়ে স্পষ্ট। তার ঠোঁট যেন উঠছে নামছে, মাধালি শুনলে হুড়তির সেই কুষ্ঠ রোগী, তবু সে জোর করেই দাঁড়িয়ে রইল। তার চোখে মুখে কাতরতা, যেমন মাকড়ীর বৌ দাওয়ায় একটা ছেঁড়া কাপড় মুড়ি দিয়ে শুয়েছিল। উঠানে অনেক ধান মেলান, তাদেরই ছাগল বেশ অনেকটা খেয়ে গেছে, তখন মাকড়ী এসে উঠানে মহা সোরগোল করে নাচতে লাগল, গাল পাড়লে। মাকড়ী বৌ কোন রকমে উঠে, এক হাতের উপর ভর দিয়ে বসে, জ্বরে হুঁ হুঁ করতে করতে বলেছিল 'আমার না জ্বর'। সেই কাতর মুখের ভাব তার মনে আছে। অনেক কষ্টে সেই কাতরতা এনেছিল।

তুমি বল তোমার মধ্যে কি আছে, তুমি বলেছিলে উপবাস করেছ, ভিন্ন স্ত্রী লোককে মা বলে মনে হয়েছে, নিজেকে কামিজ বলে বোধ হয়েছে শুধাও তোমার চোখে জল নেই কেনে—আর আমার সামনে তুমি—তুমি কে? তুমি না ক্রিশ্চান—তুমি আগে যা এর পরেও—আর কখনও কর না—

মাধালি ইতিমধ্যে অনেকবারই হাঁ করেছিল; কিন্তু কিছু বলতে পারেনি। অনেকক্ষণ সেইভাবে দাঁড়িয়ে থেকে একটি পা শুধু আর এক ধাপে তুলেছিল। শেষে বললে—"আমি কি এদের মত অন্যায় করব মনে লেয়?" এদের বলতে ফ্রান্সিস ঘাড় ফিরিয়ে একবার লোচনের দিকে তাকিয়ে বড় লজ্জিত

হলেন, বললেন—"মাধালি—"।

মাধালি সরলভাবে বল্লে—"কি মনে লেয়—না—"

"না—তাকে ডাক—ফ্রান্সিস ইচ্ছা করেই অনুতাপ ইত্যাদি কথা বল্লেন না। "বেশ" বলে যাবার জন্য মুখ ঘুরিয়েছিল, কিন্তু আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে মাথাটা নীচু করে বললে, "পাদরীবাবা আমাদের প্রভুর শেষে কি হয়েছিল যেন—সেই বনের পর—" বলে মুখখানা তুলে মিটমিট করে চাইতে লাগল।

ফ্রান্সিস তাকে বুঝবার জন্যে স্পষ্ট করে চাইলেন, সত্যই কি ভুলেছে না কি? আবছায়া মাধালি, আর পিছনে কাঠের আগুন, তাকে দেখে বড় নতুন বলে মনে হল। এ প্রশ্ন যেভাবেই করা হোক, তার উত্তর কিছু মুহূর্ত পূর্বে ঘটে যাওয়া বাস্তবতার মতই ভয়ঙ্কর। সেই লিখিত উত্তরটুকু বলতে তার কেমন ঠোঁট ভারী হয়ে উঠল। তিনি ক্রমে রেলিংয়ের কাছে এসে দাঁড়ালেন—আঙুলগুলি একই জায়গায় কোন বাজনার রিডের উপর খেলছে। একটি ছোট নিঃশ্বাস, "তিনি ক্রুশবিদ্ধ হলেন—।"

মাধালি এ কথা শোনার পূর্বাহ্ণে হাত চেপে ধরে চোখ জোর করে বন্ধ করেছিল—।

যেমন বাপে ছেলের সঙ্গে খেলার সময় সাধারণত করে থাকে। ছেলে বলে, "এ কি দেখছ বটে—" বাপ আরো জোর করে চোখ বুজে থাকে। মাধালির কানে শুধু আসছিল—কাঠ পোড়ান আগুনে নিকটস্থ অন্ধকার পোড়ার আওয়াজ মধ্যে মধ্যে উত্তপ্ত হাওয়া। বেপট পাখীর স্বর ছিল না, শুধু নিম্নস্থিত লণ্ঠনে ক্রুদ্ধ পোকার শব্দ, এই ছিল। তারই মধ্যে ফ্রান্সিসের কণ্ঠস্বর বিরাট কিছু শুনবার জন্যে একীভূত মাধালি, যেন কিছুই শুনতে পেলে না, সে ক্রমে আপনকার দেহকে আলগা করে দিলে, সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সিসের দিকে বোকার মত চেয়ে রইল। নিশ্চল পাদরী রেলিংয়ের থামে মাথাটা হেলান দিয়ে, বিলম্বিত দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন। চৈত্র মাসে মধ্যরাতে কসাই নদীর সোঁতা দিয়ে হাওয়া বয়ে যাবার গাম্ভীর্য্য এখানে ছিল। মাধালি ভেড়ার কিছু গলাধঃকরণের মতই মুখটা নাড়াতে লাগল, কিন্তু আর জিজ্ঞাসা করবার স্বাধীনতা পেলে না। বোঝার আয়তন দেখে খুব ভারী বলে, সে দম বন্ধ করে শক্তি প্রয়োগ করে তুলতে গিয়ে দেখেছিল—হাল্কা, তাতে যেমন অবাক হয়েছিল এবার এখানে তেমন হল। শুধু বললে—"আমি যাই—"

ফ্রান্সিস মাথা নাড়লেন। মাধালি ঘুরে দাঁড়িয়েই দেখল, একটি ছোট ভীড়, সে তাদের কাছে আসতেই পক্ষীশাবক যেমন তার মাকে দেখলেই ঠোঁট ফাঁক করে চ্যাঁ চ্যাঁ করে এরাও তাই করতে লাগল। সে দৌড়ে গিয়েছিল সে এখনও সহজভাবে নিঃশ্বাস নিতে পারে নি, সে ছাড়া আর যারা এসেছিল, কেউ কেউ কাপড় দিয়ে গামছা দিয়ে গা, গতর মুছছিল—সে তড়বড় করে আসতে সকলেই কিছু কিছু আশ্চর্য্য হয়েছিল। তাকে দেখে, মাঝবয়সী একটা ছেলে, গ্রামের মধ্যে দিয়ে ছুটতে ছুটতে গিয়েছিল মাদলের শব্দ আসছিল, বাঁশীর আওয়াজ আসছিল।—"ও—হো—মাদ্হালী—আইল হে—গে—" "হো—মা-ধা-লি আইল—।"

এখন রাত, তাই প্রায় লোকই সদর দিয়েছিল, অনেক লোকই ঘরে দরজা দিয়েছিল। গ্রাম্য কুকুরগুলো বড্ড চেঁচাচ্ছিল। পিটারের আওয়াজে একটি মাদল থামল। এক এক সদরের কাছে গিয়ে, ধাক্কা মেরে বলেছিল—কিন্তু ভিতরে কুকুরের চীৎকারে তার গলা আদচেনা হয়েছিল, সে তবু মাধালির স্বজনদের বাড়ী তিনবার করে বলেছিল, বিলাহী তার লাঠি নিয়ে এসে উপস্থিত। "কে বট হে" বলে সদর খুলে দাঁড়াল; ছেলেটা, পিটার খাজুরী বললে, "মাধালি হে, পাদরী কুঠিকে—" বলে তার অবিশ্বাস আন্দাজ করে ঘোড়ার মত মুখ হেঁচকা দিয়ে বল্লে—"হে—হে"। সে গেল লৈবীর ঘরকে দাওয়ায় চুটায় আগুন দেখা যাচ্ছিল, সে হাঁক শুনে তৈরী হয়েছিল—"মান্ধালি গো"—তারপর গেল মাধালির বাড়ী হাঁকলে—"লুহানীরে, লুহানী, আইল হে মাধালি—হিক্, খুলরে খুল—দুয়ার আঙিনায় আয় হে—ও লুহানী।" লুহানী চ্যাটাইয়ে বসেছিল, ঘর অন্ধকার শুধু পাশের আড়ায় (বেড়া ঘর—ঢাকা বারান্দার মতন) একটা ছাগল, মুরগীর খুট খুট শব্দ ছাড়া আর কিছু নেই চালে পায়রার অস্বস্তি, লুহানী বসে কাঁদছিল, এ ছাড়া ভাল করে কাঁদবার তার সময় কই! সারাদিন কাজ, তারপর ধান রুইতে যাওয়া নয় ঘরের কাজ। মান্ধালির নাম শুনে সে আরো জোরে কাঁদতে গিয়ে হাঁ করেই রইল। কোন রকমে উঠে পড়ল, এখন গরমকাল কাপড় ছিঁড়ে যাবার জন্য ছোট গামছাপরেই ঘুমায়, সে উঠে গামছা পরেই দরজা খুলতে যাচ্ছিল। হঠাৎ তার সম্বিৎ ফিরে পেতেই, বুকে দুটি হাত দিয়ে ঢেকে বল্লে, "যাই হে—" এত উত্তেজনা হয়েছিল যে তা অবর্ণনীয়, কান্না এখনও পাজড়া থেকে উঠে উঠে গা চমকাচ্ছে, 'উহুঁক, উহুঁক'

শব্দ হচ্ছে, গামছা কখন যে খুলে পড়ল তা তার খেয়াল নেই; সে ঘরে ঢুকতে গিয়ে উঁচু চৌকাঠ বেধে পড়েই যাচ্ছিল। ঘরে কোনরকমে ঢুকে কোন প্রকারে কাপড়ের কষি দিয়ে বাঁ হাতে আঁচলটা উঠিয়ে কাঁধে ফেলে দরজা খুলেই বললে—"হি গো পিতর খুজুরী—কি—হে—" সঙ্গে সঙ্গে মুরগী উঠে বসল, ছাগলটা বার হয়ে যাচ্ছিল। একটি পা দিয়ে দরজা আটকে হাতের প্রদীপটা তুললে, পিটার তখন হাঁফাচ্ছে, আর মাথাটা ঘোড়ার মত নাড়ছিল। লুহানী এ সুসংবাদ না দুঃসংবাদ বুঝতে পারলে না, প্রদীপের শিখা কাঁপছে, একটা দুটা চুল এপাশ ওপাশ হয়। দরজা থেকে পা কখন সরে গিয়েছে, ছাগল বার হয়ে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে একটা মুরগী। আলো মাটিতে পড়তেই মুরগীটা ঠোঁট মারল। পিটার বল্লে, "লাও হে আলো জ্বালাই রাখ, চোখের পাতা পড়ে নাই।"

দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট চেপে, মাথাটা তিতিরের মত ঘুরিয়ে বললে—"আমি যাবহে পিটার, আমার বুকে মেঘ ডাকে, লাও ঝটপট এ গুলোকে তুলে দাও হে—" বলে প্রদীপটা চৌকাঠে রেখে এল, এ গুলাকে ধরতে। মুরগী তাড়া দিতে সেটা ঘরে ঢুকে পড়ল।

ছাগলটাকে ধরতেই ব্যা ব্যা করে উঠল, পিটার তাকে এক ঘুঁষি মারলে, লুহানী তাকে একটা ন্যাজ মলা দিলে; তবু যাবে না, তখন কান ধরে যেই ঘরে ঢোকাতে গেছে অমনি প্রদীপ পড়ে গেল, লুহানী বললে—"হায় গো তেল গেল, মাধালি আইল কি জ্বালাব গো"। "আর তেল নাই...যা যাবি, হিক...তেল হবে।"

তারা ছুটল।

এখন সকলেই এখানে। লুহানী চোখ মুছছিল, মাকড়ী, বিলাহী আগে এসেছিল, তারা পাদরীর কথা শুনেছিল। কিন্তু লৈবী শুনেনি, সে যেমন অনেকদিন পর হাটে মাঠে দেখা হলে লোকে লোককে করে, মুখের কাছে গিয়ে হাউ হাউ করে যেন ছেলেকে ভয় দেখায় তেমনি দু তিনবার, কখন সবিশেষ কখনও স্বপ্নালোকে করেছিল, কারণ সে আনন্দিত হয়েছিল।

মাধালি তার কোন হোউতে প্রতিধ্বনি করল না দেখে, কুকুরের মত মুখটা একপাশ করে আর একবার খুব জোরে হোউ করল। মাধালি চুপ। সে প্রত্যেককে পয়সার মত গুনে গুনে দেখে নিল। সামনের যারা ছিল তাদের দৃষ্টি ঘুরে গেল, মাধালির ছায়াটা আস্তে আস্তে এবং সম্মুখের লোকের ছায়া—মাধালি দেখলে ঘুরে গেল। গলার আওয়াজ আসছিল বুঝলে লোচন গেল, মাধালির কেমন এক অপূর্ব আনন্দ হচ্ছিল, সে আস্তে আস্তে মুখটা নড়িয়ে নড়িয়ে কি যেন বলতে গেল, কাঠের আগুনের আলোয় পাশের কুচ্চি ফুলগুলো নিথর স্তম্ভিত, গন্ধ আসছিল, কারণ এখানে অনেক পরে পরে উত্তাপ আসছে। মাধালি কোমরে হাত দিয়ে, একটা হাঁটু ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে বললে, "মার নেকাদো আবানপে" এই বলে বা পরব শুরু হয় "এখন তোমরা সবাই ফুলে সাজ" আর সকলে শাল ফুল পরে নাচ গান শুরু হয়, বাড়ীটিও তারা, মুণ্ডারা ফুলে ফুলে সাজায়, পরের দিন লাটুবুমের বাপ সারাদিন উপবাস করে তারপর দিন জিমবিরিতে (এক প্রকার জাল,) মাছ ধরে ডাল, ভাত, মাছ আদিঙে উৎসর্গ করে খায়, তারপর কানে শাল ফুল গুঁজে এসে, মৃদু মৃদু হাসতে হাসতে বলেছিল, "মার বেয়াদো বেয়ান পে" (mar nadi baanpe)

মাকড়ী নিজের বুকটা একহাত দিয়ে ঘষতে ঘষতে বললে..."সে কি হে ক্ষ্যাপা হইছ নাকি...কুথাকে ছিলহে..." বলে নাকে খুঁ খুঁ করে আওয়াজ করল। লুহানী তার বোকার মত চোখের জল মুছতে চাইলেনা, হাওয়ায় দুএকটা চুল তার মুখে গিয়েছিল সে দাঁত দিয়ে ধরেই ছিল, উদ্বেগে তার বুকটা খালি হয়েছিল, মেঠো হাওয়া বুকে খেলা করে। সে যেন ঝাঁপ দিয়ে মাধালির ঘাড়ে পড়ল, হাত কাঁধ মুখ সব ঠিক ঠিক জায়গায় আছে কিনা দেখতে লাগল। "তুয়ার ভাত আমি গঙ্গাচিলকে দিলাম, আমি বুলবুলিকে দিলাম তারা খবর আনবে বলি, আনলে না হে," কান্নার জলের থেকে দেহ চমকানি তার বেশী ছিল, তার দেহ যেন কেঁপে কেঁপে উঠেছিল। "আজ দুপুরে বুলবুলি আসি বললে...আসবে, আসবে তুই এলিস হে"। "আমি এলাম বটে"—তারপর আর সকলের দিকে চেয়ে বললে, "বুকে আমি আকাশের তারা লিয়ে এলাম, তারা লিয়ে এলাম। সে তারা সান্ঝে জ্বলে, যে তারা সকালে জ্বলে..."

মাকড়ী এবং আর সকলে, কেউ এক পা পিছিয়ে গেল, কেউ অন্যের নিকটে সরে এল। কে একজন লৈবীর এই বিমূঢ় অবস্থায় পা মাড়িয়ে ছিল, সে মাধালির দিকে চোখ রেখে "আঃ" বলে নীচু খানিক

হতে গিয়ে উঁচু হয়ে দাঁড়াল। মাকড়ীও তদ্রুপ কোনুই দিয়ে কাকে "হিঃরে" বলেছিল, লুহানী ভাই-এর হাতের মধ্যে থেকে মুখটা দেখবার চেষ্টা করেছিল, এবং আবেগ এখন খানিক প্রশমিত হয়েছে এই কারণে সোজা হয়ে দাঁড়াল, কে একজনা পিছন থেকে তার আঞ্চলটা তুলে দিয়ে আহ্লাদের আতিশয্যে বলেছিল, তখন বললাম "যাবে কুথাকে লিশ্বাস যায় কিন্তু মানুষ ফিরে আসে—"। এখানকার প্রচলিত কথাটা বলে খুব গর্বের সঙ্গে চতুর্দিকে চাইলে, এবং নিভে গেল।

মাধালি একপা সরে এসে আগুনের দিকে চেয়ে বললে, "থালার চাঁদ লয়গো (থালার যেমন প্রতিবিম্ব পড়ে) এ তারা আনচলে বান্‌ধা যায়..."

এখানকার সমবেত লোকের কাছে একথা অতি সরল, তবু তারা সকলেই বড় উদ্‌গ্রীব হয়ে রইল। শুধু লুহানী বললে, চল হে ঘরকে দুটা ফুটাই মুখ দিও। তারপর...তার আর সহ্য হচ্ছিল না, দুঃখিনী কোথায় যেন বা তার ভাই-এর মুখখানি শীতের হাওয়া লাগা শুকনো পাতার মত দেখেছিল,...আর সকলে নমস্কার করেছিল মাথা ঝাঁকিয়ে। মাকড়ী বললে,—"কথাকে বুঝলাল না—"

"কি করি বলব বা..." বললে মাধালি রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে সব কথা বলতে লাগল।

এখন চাঁদের আলো বেশ। মাঝে মাঝে দুএকটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে উঠছে, কোন কোন দাওয়ার চুটার আগুন থেকে প্রশ্ন আসছে,..."মাধালি আইল—কি—গো।"

কাদের একটা গরু আসছিল, অন্য ক্ষেত্র হলে-হেই করে সবাই খেদিয়ে দিত কিন্তু মাধালির কথায় তারা এত বিমোহিত হয়েছিল যে, গরুকে খেদাবার কথা মন পেলে না, ছোট ভীড় দুভাগ হল। যারা মাধালির দিকে ছিলনা তারা গরু পার হবার জন্য দাঁড়িয়েছিল, পার হতেই খরপায়ে এসে যোগ দিলে, শেষে একজন গরুর ন্যাজ মলে দিল। মাধালি এসে বলতে লাগল বনের কথা—তার ঠোঁটের বিরাম নেই একটু উল্টাপাল্টা হয়েছিল কিন্তু ফিরে ফিরতি সাজাতে চাইল না।

মাকড়ী প্রশ্ন করলে..."ধান তুমাকে দিলে কে?..."

মাধালি কোন উত্তর দেওয়ার আগেই, বিলাহী এবং অন্যান্যরা মুখ বেজার করলে। এ অবাস্তব প্রশ্ন বলেই তাদের মনে হয়, ফলে এ ওর দিকে চাইলে।

"ধান ছাগল আমার স্যাঙা দিলেহে, ঠেকা দিলেহে, তাকে বললাম ঘরকে ধান নাই"।

"ছাগল, মুরগী শুয়ারগুলা না খেয়ে মরে..."

'ও' বলে অপ্রতিভ হয়ে আবার বুক ঘষতে লাগল, আর ময়লা তুলে আঙুল ঘষে ফেলতে লাগল।

লৈবী কাকে যেন চীৎকার করে বললে, "শুনহে শুনহে...বড্ড কথা গো..."

মাকড়ী একটু রেগে—"ইঃ" শব্দ করেছিল। তারপর দাঁড়িয়ে পড়ে বললে, "আর লয় গো—লুহানী তাকে ঘর লিয়ে যা...কাল শুনব।"

লৈবী বাঁদরের মত নিজের হাত উল্টে পাঁজর চুলকাতে চুলকাতে বললে, "কেনে তুমি ঘরকে যাও আমরা শুনি।"

আর সবাই বললে—"আমরা শুনব হে...।"

মাকড়ী বললে—"বেশ তুরা যা আমি ঘরকে যাই"...বলে সে দল ভেঙে গেল, কেন্ন যে তার একথা ভাল লাগল না, তা সেই জানে না। শুধু যেতে যেতে বললে—"হিঃ আমি দশ বেলা বাইবেল শুনি, দুবেলাকে চার্চে যাই...আর হেঃ মিছাই"

আর যারা ছিল তারা মাধালির ঘরকে এসে দাঁড়াল, লুহানী ঢুকে যেন আরো আহ্লাদে অস্থির হয়ে পড়ল, শেকল খুলতে গিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে,—"ইখানকে সে বুলবুলিটা ও মুনুষ তেল নাই...হে...।"

পিটার বললে—"ই—হো গে"...বলে ছুটে চলে গেল।

লুহানী বললে—"এস পারকোমটা টানি লাওনা হে" বলে ঝনাৎ করে শিকল খুলে দিলে। কে একজন ঘরে ঢুকতেই অজস্র চঞ্চলতা শুরু হল, লুহানী বললে, "হি ইঃ গুলা সব নিদলাই হে, তুহইকে দেখবে বলি নিদ নাই...আদর করহে ই গুলাকে...হাকপাড় আলো নাই..."

কিছুক্ষণ পরে বেটে পাঁচিলের উপর দিয়ে দেখা গেল আদছোটা পায়ে কভুবা সাবধান হয়ে হাতের কোষে কি নিয়ে এসে, অতি সন্তর্পণে ঢুকল লুহানী, বললে, তেল যখন পড়ি গেল তখন বুঝলাম—'তুহি লাঙল যতবার লায়ক আছ।" সব সময়ে তার মুখে আনন্দের হাসিটি লেগেছিল। পিটার খাজুরীর হাতে

তেল দেখে বললে...“ লাও মরণ, এখন” অর্থাৎ অন্ধকারে চকমকি খুঁজি কি করে, কিন্তু দেরী না করে ঢুকে পড়ল।

পারকোমে কেউ বসেনি, মাধালি পাঁচিলের উপরে দুহাতের ঠেস দিয়ে একটি পা পাঁচিলের দেওয়ালে তুলে দিয়ে কি যে বলবে ভাবছিল। এরা এখানে মাকড়ীর নামে সবাই আভাসে আভাসে প্রশ্ন করেছিল। কিন্তু সবাই মাথা নাড়িয়ে ঝাঁকানি দিয়ে এইটুকু বলবার চেষ্টা করেছিল বুঝা গেল না, বিলাহী মাধালির দিকে চেয়ে বললে—“হাতটা সে ঠেনথিকা লামাও হে বুলা যায় না” বলে সকলের সায় চাইবার আগেই সবাই “ঠিক ঠিক” বলেছিল “হাত লামাও হাত লামাও”। বিলাহী মাধালির বিষয় সর্বপ্রথম সচেতন হতে পারার জন্য নিজে বেশ তার মত করে আত্মপ্রসাদ লাভ করলে।

মাধালি বলল—“লা তেমন কিছু নয়...”।

লৈবী সাহস করে বললে, “উয়াকে কিদিম কাটকোম কেনে লতাতে ও কিছু কিছু করবে না” বলে প্রশংসমানদৃষ্টিতে তাকালে।

হঠাৎ আলো এসে মাধালির মুখে পড়ল, সবাই “কোথাকে আলো” আসছে জানবার জন্য ফিরে তাকিয়ে দেখলে, চৌকাঠের কাছে প্রদীপ জ্বলছে আর লুহানীর দু একবার সত্বর যাওয়া আসা। একবার সে আলোর সামনে দাঁড়িয়ে বললে...“দেখছি” বলে কেমন তার লজ্জা হল। দরজার পাল্লায় দেহ ঠেকিয়ে এক হাতে কড়া ধরেছিল, সে যেন অর্দ্ধেক হয়ে গেছে; শুধুমাত্র মুখখানি। পাল্লার গায় মিলিয়ে, ডান পাটি চৌকাঠের বসানে দিয়ে দেহের বলে পাল্লা নাড়াতে লাগল। একবার সরে যায় আর বার বার আসে, নীচ থেকে পড়া প্রদীপের আলোয় সে যেন পাগল পাগল। সেইভাবেই বললে “আলোতে এসো দাদা, দেখেনি”, তার কথায় মাধালি কেমন ছেলেমানুষ হয়ে গিয়েছিল, সে নিজে যেন মাধালি নয় তার পাশে অথবা অন্য কোথাও সে হয়ত আছে, এমনভাবে খুঁজতে লাগল। তারপর শুনলে অনেকেই একই সঙ্গে অনুরোধ করছে “যাও হে”, “আহা আহা”।

মাধালি প্রায় আলোর কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। লুহানীর পিছনে একটা মুরগী একবার চোখ বুজে আবার খুলে। তবু ভাল এর দিকে তাকান যাবে সে ভাবলে। তার লজ্জা করছিল, তার বোকা বোনের এ কি আবদার! লুহানী তেমনি ভাবেই পাল্লা নাড়ছিল, এবার কড়া থেকে হাত ছেড়ে, নিজের পিছনে কিছু হাতড়ালে, এবার পেলে, মুঠো করে এনে আস্তে আস্তে চোখ মুছলে। তারপর বললে, “আমার কি কপাড় হে, একটা কাপড় নাই...কতো লুংগা হইছে গো।” মাধালি নিজের উরুতের উপর কাপড়টা তুলে বললে, “হি...যাক...আমি কথা কইবো তুই চাল ফুটা...।”

‘ধোঁয়া চাল বেয়ে আসে’ এখানকার ভীড় অধৈর্য্য হয়ে পারকোমে বসে পড়েছিল। মাধালি ফিরে এসে নিজের জায়গায় দাঁড়াতেই তাদের খেয়াল হল, বোধহয় লৈবী বললে—“উঠরে উয়াকে বসতে দাও হে...আগে উয়া...বসুক...।”

“না না গো তোমরা বস গো আমি বলি”...তারপর সে আরম্ভ করেছে। বিলাহী একটা চুটা দৌড়ে গিয়ে প্রদীপে ধরিয়ে নিয়ে এসে সুস্থির হয়ে দাঁড়াল। আর একজন গল্পের মধ্যে উঠে একটা চুটা প্রদীপের মুখে ধরে, একবার টানতে গিয়ে টানল না; আপনা থেকে ধরতেই তৎপরতা সহকারে এনে অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে মাধালির কাছে ধরলে। মাধালি কথা বলতে বলতে ঘাড় নাড়িয়ে জানালে, খাবে না। যে ছেলেটি দিতে গিয়েছিল সে পিটার খাজুরী, সে মনঃক্ষুণ্ন হল। তখন মাধালি তার কাঁধে হাত দিয়ে বললে, “আমি খাব না হে, আমার ভাল লাগছে না,” পিটার সরলভাবে প্রশ্ন করলে—“সত্যি।”

ধোঁয়ার মধ্যে ইতিমধ্যে—লুহানী অনেকবার দরজায় এসে দাঁড়াল তাকে মাধালি ডাকছে মনে করে, তার কথার উত্তর দিয়ে মাধালি আবার গল্প শুরু করলে। সবাই মাঝে মাঝে আকাশের দিকে চাইছিল আর কথা শুনছিল। গল্প শেষের সঙ্গে সঙ্গে সবাই বললে—‘তারপর’...?

“তারপর তোমাদের সঙ্গে দেখা হল হে আবার...।”

“এখন কি করবে...?”

“আমি জানি না”

“তুমি তাহলে বল যা খুসী তাই করবে।”

“না—না আমগাছকে আমই হবে গো, কাঁঠাল গাছকে কাঁঠাল, আমি শুধু তাকে দেখবার চেষ্টা

করবো, দেখবার জন্যে আকাশ বাতাস করবো—।"

পারকোমস্থিত লোকেরা এবং যারা দাঁড়িয়েছিল তারা ভীত লজ্জিত হল, একজন সাহস করে বললে,—" তুমি ত তার দেখা পেয়েছ—।"

মাধালি মুখভার করে বললে—"না পাই!"

"আচ্ছা যদি দেখা পাও তাহলে—তাহলে কি বলবে"—?

"তিনি আমাদের হেড কাজী জানেন—হে—"

"আমি তাকে শুধু দেখব—।"

বিলাহী বললে—"আমি দেখা হলে এক জোড়া বলদ চেয়ে লুব, এ বিঘা নিস্বর, বেশী লয়—বড় কষ্ট আমার হে—" যে উৎসাহ নিয়ে বলেছিল সে উৎসাহ অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। মাধালির নীরবতা দেখে কেউ আর কথা বললে না, দু একটা চুটায় তখন ধোঁয়া বার হয়।

এমত সময়ে লুহানী মুখটা বার করে বললে—"এস হে—পিটার এক ডোল জল লিয়ে আসবি হে।"

পিটার আবার ডোলটা নিয়ে চলে গেল এবং কিছুক্ষণ বাদে ফিরে এল। সবাই চুপ করে বসে, মাধালি শুধু ছোট উঠানে পায়চারী করে বেড়াচ্ছে, আর মাঝে মাঝে আকাশের দিকে চাইছে।

লৈবী, অনেকক্ষণের নিবে যাওয়া চুটা হাতে নিয়ে পারকোম থেকে নেমে এঁকে বেঁকে প্রদীপের কাছে গেল। চুটা ধরিয়ে এক কোণে চিক করে থুতু ফেলে এসে পারকোমে বসল। একবার দেখলে, পারকোমে কে কিভাবে বসে আছে কার মুখ কতটা গম্ভীর, কিন্তু অল্প আলোর রেশ—তারা কতটুকুই স্পষ্ট। সে নিজে পা ঝুলিয়ে বসেছিল; একটু পরে বললে—"আচ্ছা মাধালি, তুমি দেখ সব জমিতে দুটা ফসল নাই, পৌষ মাসে অনেক পাখী ধানক্ষেতকে আসে, কবে তারা ইঠেন বাসা বান্ধবে?"

মাধালি এ কথার অর্থ বুঝতে পেরেছিল। সে এই কষ্টে মাথা ঝাঁকানি দিলে, সে যেন পলকা ডালের মত কাঁপল, অধীর হল। কিছু বলবার জন্যে আবেগে বেঁকে নিজের হাঁটু দুটা জোর করে মাথা দোলালে। সমবেত সকলেই বুঝল এবার ঠিক কথা সে বলবে, এখন সে বালি খুড়ছে, জলে চিকচিক বালি ধুয়ে, এবার থিতবে এবং সে আঁজলা করে তুলবে। মাধালি ঝপ্ করে দাঁড়িয়ে উঠে লৈবীর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলে; লৈবী তার চুটার দিকে চেয়ে অত্যন্ত গর্বিত বোধ করল, কিন্তু সে তার চুটাটা তাকে দিতে পারল না, কারণ মাধালি লাঙলের পিছন থেকে চুটা চায়নি, আকাশের পিছন থেকে চেয়েছিল। সে সত্বর উঠে ট্যাঁক থেকে একটু তামাক বার করে দৌড়ে লুহানীর কাছ থেকে একটা শালপাতা চেয়ে এনে প্রদীপের সামনে বেশ করে মুড়তে লাগল, এবং এক একবার মাধালির দিকে চেয়ে "এই—তৈরী—হল" হাসি মুখে বলে শেষ মুখ বন্ধ করে—ছুঁচোর মত মুখটা তুলে, ধরিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে জ্বলন্ত মুখে ফুঁ দিতে দিতে এনে মাধালিকে দিলে। মাধালি সেটা গাঁজার কল্কের মত ধরে অসম্ভব তারসপ্তকে ঘাই মারা টান দিয়ে, ধীরে ধোঁয়া ছাড়ল—এবং অন্ধকারে অথবা আকাশে মিশে গেল।

লৈবী নিজের চুটায় একটা টান দিয়ে বললে—"এবার আমরা ইন্দুর মারব কি হে—?" একথার সঙ্গে সঙ্গে সকলে হেসে উঠল, কেমন একটা গড়গড় হড়হড় শব্দ হল সবাই আর একভাবে বসলে। কারণ এ গল্প সবাই জানত। সেই গল্প বলার জন্য সকলের জিব ভেড়ার জিবের মত নড়ে উঠল। মাধালিও সে গল্প জানত। তবু শোনার জন্য প্রস্তুত হল, এ গল্প—যেমন গান নিত্য শোনা যায় নিত্য শোনে তবু শোনে। লৈবী বললে "তুমি বল হে—।" বিলাহীকে কে যেন সুড়সুড়ি দিল সে গা টা দুলিয়ে বলল—"লা—তুমি—বল হে—।" "তুমি বল, তুমি বল" করতে একটু গোল হল। তারপর লৈবী গলা পরিষ্কার করে বললে "ইন্দুর মারার দশা কি না, হেই তামাড়ীর হাটকে উধারে, দাছিনে, চটাহি গাঁয়ে আর তার পাশ পাশ গাঁকে, আকাল হল। ভারী চড়া রোদ উখানকে, জল নিজে মাছ হল, বক লিলে, চিল লিলেক, যারা আকাশ থাকে, তারা উড়ে গেল। লোকে যা পেলে তাই খেলে, একটা লোক চুরি করে তামাক পাতা খেয়ে মারা গেল।"

এ কথায় এরা একটু বিষাদের হাসি হাসল। এই সময়ে লুহানী মাধালি ডাকছে মনে করে "হাই" বলে সাড়া দিলে।

"—আর এক লোক জাতিতে কোঁড়া, জোত জমি ছিল, "সে দেখল তার গলার স্বর চিঁহিঁ করলেও ঘরে যেন গুমগুম আওয়াজ—কারণ সে হাঁড়ির মুখে কথা বলছিল, কারণ সে জালার মুখে কথা

বলেছিল, এ জালা সে এনেছিল বহু দূর থিকে, দেখলে ইন্দুর পালাচ্ছে তার ভারী রাগ হল, বললে—"তোমরা নুন খাও নাই—আজ আমার সময় শ্যেওড়া গাছ, আর তোমরা পালাইছ—বলে ইন্দুর মারবার জন্য তার অল্প দেহে ঠাংঙা লি ছুটল—। ছুটতে ছুটতে সে কোথায় চলে গেল—। আকালের চড়াই ঝি ঝি ডাকে।"

গল্পটা খানিক খানিক তারা ভীত হয়ে শোনে, পুরো গল্পের একটুখানিই তাদের। তবু তারা শোনে। মাধালি নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বললে—"কি জানি আমাদের দশা কেমন হয়, দক্ষিণের কুকুর উত্তরে যাবে। পশ্চিমের কুকুর পূবে যাবে"

"দেখ বৃষ্টি নাই, কিছু বৃষ্টি হইছে তাতে বা কি—অন্য ধারকে জল নাই, হাত আজলায় ধান বিকাবে, আর কথা দেখ, লাজের জায়গা ছোট বলি কাপড় অল্প হয়—তাই জুটে না, যদি জুটে অনেক দিন চলে, হে—হে—পাতুয়ারা পাতা পরে আমরা ঠেঁটি পরলাম নয় বল এ সবের কি হবে, আমার মনে লেয় তুমি যদি হে...হে...পাও—তবে আমাদের সব হবে, বুনো জাম কষা হবে না..." মাধালি এ কথায় ভীরু হল। সে কি কথা বুঝতে পারলে, একবার সকলের দিকে চাইলে, একবার পাদরী সাহেবের ধানক্ষেতে দাঁড়িয়ে, কোন কথা মনে পড়ল। কিন্তু এই ক্ষেত্রে সে বলতে চাইল, কিন্তু বলতে পারলে না, প্রথম এ গল্পে অগাধ জল; অনেক বৃষ্টিতে ভেজা গা যেমত ভারী হয়েছিল তেমনি হল। পারকোমে একগাদা ভারী নুড়ি, এরা সঠিক উত্তর না পেলে নড়বে না—এ ঠেলে যাওয়াই দুষ্কর। একবার রাজা গোঁসাই, ঘাটাল থেকে কুমোর আনতে গিয়েছিল, পাঁচ বিঘে নিষ্কর, ঘরদোর, পাঁচ সালের খোরাক, মেয়ের বিয়ে সব কথা লিখিত, গৌরহরি ফিরে এল, জুতো খুলে ছাতা মাটিতে রেখে হাত জোড় করে বললে—"তারা বলছে, তারপর কি হবে, আকালের দেশ ছিঁড়ে খুঁড়ে খায়, হাঁড়ী হোলা জালা কিনবে কে? চাক আমার কুঁড়ে রাঁড়, আমার বিধবা মেয়ে হয়ে থাকবে। ওখানে ত আছে মানবাজার, বাবু ডিহি ত আছে।" (অনেক কুমোরদের বাস)

এখানে শ্বেত পেঁচা বাসা বাঁধে না। মাধালি চুপ করে থেকে সে আশ্বাস দিলে। এমন সময় লুহানী ডাকলে—"মাঢ় ভাত জমাইছে গো—লাও বস হে" সবাই বললে—"হে—হে যাও যাও—খাও গা।" বলে মাটিতে বসার অভ্যাস বশত নিজেদের কাপড় ঠেঁটি ঝাড়তে লাগল। এদের যদিও প্রশ্নের উত্তর মেলেনি, তার জন্যে কিছু মনেও নাই, এরা খুসী হয়েছিল, বুকটা ফুলে উঠেছিল। একজন বিলাহীর গামছাটা দেখে, আহ্লাদে মুখ নীচু করে শুঁকে বললে—"লৈতুন।" ইতিমধ্যে মাধালি প্রদীপটা নিয়ে অভ্যাসমত সবদিক দেখে ঘরে ঢুকল। তারা চলে গেল।

লুহানী ডোল থেকে জল নিয়ে গামছা ভিজিয়ে ছিল, মাধালির গা হাত পা মোছাতে লাগল এবং এ কয়েকদিনের তার উদ্বিগ্নতার কথা, রাত্রে জেগে থাকার কথা ঘুমকে উঠে আসার না খাওয়ার কাঁদার সব কথাই বলেছিল, "সব কথাই আমার মনকে লাথি মারল—কোন পাপে এমন হল? ভাবি—"

ছোট ছেলের মত মাধালি দাঁড়িয়ে রইল, সে যেন দেওয়াল আর লুহানী যেন হাতের বাহাদুরী দেখাচ্ছে। বহুদিন এমন গা মোছা পর্ব হয়েছে। আর একদিনের কথা বিশেষ;—যেদিন লুহানীর বরের কথা এনে এখানেই দাঁড়িয়েছিল, এমনি গা মুছিয়ে দুটা ভুট্টার দানা আর জল দিয়েছিল, একটা চুটাও দিয়েছিল। ভুট্টার দানা আর জল খেয়ে সে যেন কাঁদবার জোর পেয়েছিল এবং আস্তে আস্তে লুহানীর চোখে আঙ্গুল দিয়ে ঘেঁটে দিয়েছিল। পাতা যেমন পড়বার আগে স্থির হয় তেমনি স্থির হয়েছিল। "সেই লুহানী আহা সে যদি এমনিভাবে তার বরকে পেত।" ইতিমধ্যে লুহানীর গা মোছানো হয়েছিল, সে গামছা ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। আর একটা মুরগী উঠে দাঁড়িয়ে তার পা টান করলে, সুট করে একটা লেংটি পালাল। লুহানী মাধালির পা টিপতে লাগল। মাধালি প্রথমে চায়নি কিন্তু অবাধ্য লুহানী বললে, "আমি কার পা টিপব গো!"

"লাও—লাও খাও হে"—বলেই কথাটাকে বাধা দিয়েই মনে পড়ল প্রার্থনার কথা জিব কেটে বল্লে, "খাড়াও—খাড়াও, তাঁকে বল হে—যা মানুষে অনেক পুণ্য করলে পায় সবাই যেন পায়"।

বোনের কথায় তার চোখে জল এল, মাঝে মাঝে তার গোঁয়ার ভাব আসত। পূর্বে বলত—"দুঃশালা সরষে চমকান ছড়ান ভাত, আর ভুট্টার খৈ-এর স্যাঁকা বড়া—দুৎ"—।

মাধালির মার চোখে জল আসত, লুহানীর চোখেও কতবার জল এসেছে, আজ আকালের গল্পের

পরও সে স্থির। সে বলেছে "এই যথেষ্ট—প্রভু আমেন—। বড়া কি শিশির শিশির"—।

"না বড় ভাল হাতে গরম—তুই খা বুন্দাই।"

"না গো"—বলে তার পীড়াপীড়িতে নিতে বাধ্য হল। মুখে বড়া চিবুতে চিবুতে বলেছিল—"তার লেগে আর আমার মন নাই—এখন তুই থাকরে—" "মন নাই" কথাটা বলতে কষ্ট হলেও সে পাথর হয়ে বলেছিল। "যদি চৈত মাস হইত, আমি সজনে রানতাম তুই খেতিস অনেকবেলা ধরে, আমি দেখতাম—আমার মনে হয় আমি কিছু দিতে পারি নি"—বলে, বাঁ হাতের উপর কি যেন লিখতে লাগল।

খাওয়া দাওয়ার পর মাধালি এসে পারকোমে বসল। লুহানী বল্লে—"উথাক কাল সকালকে তুলবা"—বলে উঠে প্রায় পড়ে যাওয়া আঁচলটা দেহে চক্কর দিয়ে পিঠের কাছে এনে দুহাতে ডোল থেকে জল গড়িয়ে ধুয়ে, একটা চেটাই নিয়ে চুটা ধরিয়ে নিজের একটা ও মাধালির জন্য একটা ধরিয়ে এনে মাধালিকে দিলে। আবার উঠে বল্লে—"মাদল বাজাও হে, তুয়ার মাদল ছুঁতে নাই?" চেটাই পেতে বসেই দেহটাকে বেশ করে তলিয়ে দু এক টান দিয়ে চুটা রেখে মাধালির পা টিপতে লাগল।

মাধালি আস্তে আস্তে চুটায় টান দিচ্ছিল, এ কয়েকদিন রাত্রে সে ঘুমায়নি তার মনে নেই। এক এই প্রথম শান্তভাবে সে বসেছে। মাঝে মাঝে ফেউ-এর ডাক এবং সেই সঙ্গে কুকুরের ডাক আর সব প্রায় চুপ। মাধালি কিছু বলবার জন্যে মুখ খুলে থেমে গেল, কার কুশল তার জিজ্ঞাসা করবার ছিল, লুহানী বুঝল সে কিছু বলতে চাইছে, বল্লে "আর কুথাকে টিপি দুবো হে দাদা—" মাধালি এ কথায় ঘাড় নেড়েছিল। কিন্তু লুহানী সে কথা মানে কি ভেবেছিল লজ্জা করছে, সে ধড়মড় করে উঠে বলিষ্ঠ হাত যেটা পারকোমের বাটে ছিল, সেটা টিপতে লাগল। সুবিধে হল না, সে আঁচল কাঁধ উঁচিয়ে সামলে, পারকোমে একটা হাঁটু রাখলে এবং অন্য পা টেনে নিয়ে ঠিক মাধালির পিছনে বসে টিপতে লাগল। টিপতে টিপতে তার মাথাও নীচে নেমে যাচ্ছিল। মুখটা তুলে দেখলে, জিজ্ঞাসা করলে, "হেই বাবা, তুমার নাকের ফুটায় কি আন্ধার গো—"

মাধালি আজ এই সরল খুনসুড়িতে হাসল না, সে যেন দয়া করে লুহানীর মুখের দিকে তাকালে, লুহানী ডান হাতের উপর শুয়ে বাঁ হাতটা তার কাঁধের পুট টিপছিল, লুহানী এই সুযোগ নিয়ে বল্লে—"হেই দাদা তুই বিয়া কর হে—।"

মাধালি হাসতে গিয়ে কার কথা মনে করে গম্ভীর হয়ে পড়ল। অনবরত একটি টেবিলের উপরের ভাঙা ভাঙা ছায়ার কথা মনে হচ্ছিল, সে ছায়া একটা ফলের, সে ছায়া লাল। তাকে জোর করে কিছু বাধা দিতে হল না। সে আস্তে আস্তে মাটির দিকে চেয়ে বল্লে, "না আমি বিয়ে করব না।"

লুহানী অবাক হয়ে চেয়েছিল, তার উপরের ঠোঁট উঠানামা দেখে, সে বিদ্যুৎবেগে হাত থেকে মাথাটা সরিয়ে নিয়ে আলো পড়া মাটির দিকে চেয়ে কি মনস্থ করে এদিক ফিরে বললে, "কেনে" যেন যন্ত্রের মত বলেছিল। সে ভাবতেই পারেনি, এ কথা সে বলতে পারে, অত্যন্ত অসামাজিক কথা। সে উঠে নিজেকে ঠিক করে তার কাঁধ দুটি মৃদু চাপ দিতে বল্লে—"কেনে গো দাদা—?"

"আমার নূর ভেঙ্গে গেছে—সগর ভাঙ্গছে—আমি গেছি—।" কথাটায় কোন জোর ছিল না। লুহানী এখন তার পিঠে লঘু কিল মেরে আরাম দেবার চেষ্টা করছিল। সে তার কথা সম্ভবত বুঝতে পারেনি, দুহাতে সে কিল বসিয়ে চলেছে। এবং তখনই বললে "খুব ভাল মেয়ে দেখছি, দুখাড়ার বোনকে, সে অনেক গল্প জানে", "জানুক—লুহানী আমি বিয়ে করব না—আমি ভগবানকে ডাকব—।" লুহানী এবার বুঝে মুষ্টিবদ্ধ দুই হাত ঈষৎ উঁচু করে রেখে, হাঁ করে রইল, তাকেই যেন পরিহাস করা হয়েছে এমন ভঙ্গী ছিল। এক মনে কি যেন ভাবছিল, কাঁধের পুট দিয়ে গালটা মুছে বললে, "ভগবানকে ডাকব—। ডাকবে—" বলেই আবার কিল বসাতে শুরু করলে, ভাবটা এ রকম 'কি বোকার মত কথা হে।'

"না আমি শুধু ডাকব—।"

"মাকড়ী বিলাহী এরা কেউ ডাকে না—বিহানবেলাকে গীত সংহিতা পাঠ করে রুজ—শুনছ না" বলে ভ্রূ কুচকালে তারপর ঝুঁকে বলে—"তবে? লাঙল দেয়, "লা" চালান দেয়—মোম—"

"লুহানী আমার বড় মার কোলে শুতে ইচ্ছা হইছে, দুধ খেতে ইচ্ছা হয়—।"

"দেখলে চিনবি না মাকে" লুহানী পুরাতন কথায় যেতে পারল না।

মাধালি বললে "এই ত মরল, আমার তাকে মনে নাই সে কেমন ছিল?"

লুহানী এ কথায় তার গা টিপে দেখলে, যেমন সে ফুটন্ত হাড়ী থেকে চাল দেখে সে টিপে দেখলে, কথাটা শক্ত। শেষ দু একটা কিল উল্টোপাল্টা মারলে, অনেকক্ষণ বসে রইল। বোকার মত বললে, "খুব হবে ডাক।" মাধালি উত্তর দেবার জন্যে একবার মুখটা ঘুরাবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তারপর ফিরিয়ে নিয়ে বললে—"আমি তাকে দেখতে চাই—।"

লুহানী ভীত হয়ে পড়ল, সে মাধালির কাঁধে হাত রেখে ধীরে ধীরে নেমে চ্যাটায়ের কোলের উপর দুটি হাত দিয়ে টান হয়ে গেল। আমি পথে পথে ঘুরব, আমি ঘুমাব না, আমি দেখবো তাকে যদি দেখা পাওয়া যায় আমি নিশ্চয়ই পাব—কি বলিস তুই—" "তুমি যদি পাও তাহলে আমাকে দেকাবে—" বলে তার চোখটা ছলছল করে উঠল। সে আর মাধালির মুখোমুখি হতে পারছিল না, একটু সরে এসে পারকোমের বাটে হাত রেখে তারই উপর মুখটা রেখে চুপ করে রইল। কিছু বাদে বললে..."আমরা জন্ম দুঃখী আমরা কি—"

তারা এমন ক্রিশ্চান খাওয়া সব এক, ভালবাসা এক কিন্তু পাপের পরিণতি যেমন বিভিন্ন ফলে একটু আলাদা হয়েছিল। আগে হলে বলত—"লিয়ে এস আমরা দেখি—" দেখতে পাব কিনা সন্দেহ থাকত না।

"আমাদের খেতে নিতে দাঁত পড়ল, আমরা"—বলে সে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললে কিন্তু ভাইয়ের এরূপ সংকল্প তাকে একাধারে বিস্মিত করেছিল এবং ভীত করেছিল, নদীতে ডুব দিতে চেয়ে থাকলে যেমত হয়। পলকের জন্য সে চার্চ সঙ্গীত শুনতে পেয়েছিল, মাকড়ী বড়িয়ার পায়রাগুলো যেমন উড়ে আর নামে তেমনভাবেই দূরাগত সঙ্গীত আসে। সে শুনেছিল লৈবীর ছেলের যখন ব্যাপ্তিজম হয় সেদিনের রোদ কি সুন্দর ছিল।

"আমি তাকে ডাকব তাকে দেখবই—"

"তুই লাঙল দিবি না আর—লা আনবি না—?"

"আমি খাব না—আমি কিছু করব—"

লুহানী, এক্ষেত্রে কি বলা উচিত ভেবে পেলে না, সে শুধুমাত্র সোজা হয়ে উঠে বসেছিল। একবার চূড়ীগুলা ঘুরালে, একবার চুল সরিয়ে দিলে তারপর বললে, "না হে দাদা তুই তাকে ডাক—আমি সব যোগাড় করব—" বলেই সে যেন উদ্বেলিত হয়ে উঠল, শেষ কথাগুলো উত্তেজনায় সর্দ্দিযুক্ত হয়েছিল। একটু সামলে বল্লে—"আমি যদি দু আনা বেশী পাই তাহলে মাড় ভাত হবে হে, তুই ডাক।" মাধালি চুপ করে বসে। লুহানী একবার তার দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখলে, প্রদীপের কম্পিত আলো তার মুখের খানিক অংশে পড়েছে। তার চেহারাটা ম্লান যেমন মাকড়ী বড়িয়ার হুমকীতে তার খাতক বোকার মত হয়ে থাকে, লুহানী বললে, "ভাবিস নারে আমার রূপার জিনিষ আছে" সে যেন ভাবছে পৌষেই ধান উঠবে তখন আবার শোধ হবে। মাধালি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললে—"লুহানী রে—"

"কেনে—"

"সূর্য্য যেখানকে ডুবে সেখানে যেতে কতদিন যায়—"

লুহানী বুঝলে! চুপ করে থেকে বল্লে—"বেশ তুয়াকে, খাওয়ার জন্য আমি স্যাঙা করব—"

মাধালি কথাটা প্রথমত বুঝতে পারেনি। কারণ লুহানী খুব স্পষ্ট করে বলতে পারেনি। একটি হাত মাটির উপর রেখে দেহের ভর তার উপর দিয়ে সে একভাবে বসেছিল। তার চোখের সামনে একদিনকার কথা মনে হল, পিটার খাজুরীর বোন—স্বামী মরে যাবার অনেকদিন পর ছেলে পিলে যখন ল্যাংটা হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল, লোকের তাড়া খেতে লাগল খাবার জন্য তখন আবার স্যাঙা করলে। তাদের মধ্যে এটা কিছু লজ্জার কথা নয়। তবু ক্রিশ্চান হওয়ার পর যেন কোথায় সকলেরই বাঁধ বাঁধ ঠেকে। লুহানী যে হঠাৎ এমন কথা বলতে পারবে সে নিজেও ভাবেনি। এবার সে জোর করেই স্পষ্ট করে বললে, "তুই ভাবিস না তুই ভগবানকে ডাক; আমি স্যাঙা করি তোর পেট চালাব।"

মাধালি একবার গরু তাড়া দেবার মত করে বলতে যাচ্ছিল বোধহয় অস্পষ্টভাবে সে বলেছিল, 'হেই হেই'—বলতে বলতে অন্যমনস্ক হয়ে বোনের মাথায় হাত দিল। লুহানীর চোখে জল এসেছিল, সে

দাঁত দিয়ে ঠোঁট চাপলে, তাতে হল না, একটি আঙ্গুল কামড়ে ধরল। মাধালি বল্লে, "উ কথা বলিস না— তুই ক্ষ্যাপা হইছিস কি" এ কথার মধ্যে বেশ একটা বুক চিতান ভাব ছিল। সে লুহানীকে কি বলবে ভেবে পেলে না—শুধু বললে—"লুহানী আমায় ডেভিডের গল্প বলবি রে—"

কোন সাড়া নেই, একটু নীচে এলো চুল হাওয়ায় কাঁপছে। এই অন্ধকার আর এক অক্ষরের কালো। যে কালোর মধ্যে সমস্ত শিশিরে যে নম্রতা ছিল তা প্রাতের বিস্ময়ের থেকে আরম্ভ করে অগণিত তারার বিদ্রূপ ছিল। লুহানীর প্রতি টান বেশী করে এসেছিল কলিয়ারীর বীভৎসতার, যেখানে ভাইবোনকে— ঘুসকী বলে, স্বামী স্ত্রীকে রাঢ় বলে, সেখানে এ উয়াকে চোর বলে। "লুহানী আচ্ছা ডেভিড থাক, তুই আমায় প্রভুর শেষ দিনের কথা বল—"

লুহানী চোখ মুছে একটু ভাঙা গলায়, সুরু করল,—"যীশু সকলকে নিয়ে জলপাই কুঞ্জে গেছিলেন হে, জলপাই তাই টক" বিলাহীর বৌর বোন সে মাথায় কাপড় দিত, কার কাছে সে গল্পটা শুনেছিল, লুহানী এবং আর আর মেয়েদের একদিন চার্চের পর তারা সবাই জোট হয়েছিল, তাদের সে গল্পটা বলে, মাকড়ী বৌ-এর মাথা থেকে কুঁচি তেলের গন্ধ আসছিল, আচারের মত গন্ধ। সে বললে—"জুডো বড় লিম খারাম গো, সেই চুমু খেয়েছে, দেখি জলপাই বল্লেক—'উঃ আমি আর মিষ্টি হব না, টক হব— ইঃ এত খল এত পাপ—"

"তারপর জুডাস এল প্রভুকে চুমা দিয়ে চিনালে—সেখানকে তাকে খুব মন্দ করলে—"

"মন্দ করলে—?"

"সে আমি মুখে বলব না—তারা বড় সাহেবের মত ছিল—"

মাধালি গালে হাত দিয়ে শুনছিল—বলে—"তারপর—"

"তারপর পিটার বল্লে—আমি চিনি না—"

এখন মাধালি পা দুটো ঝুলিয়ে পারকোমে শুয়ে পড়েছিল। চোখ বুজিয়ে শুনছিল মাঝে মাঝে তার চোখ খুলেছিল, আকাশ তৎক্ষণাৎ অতীব দূরে সরে সরে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে একবার সে মুষড়ে গিয়েছিল, কেননা যদি সে ঘুমিয়ে পড়ে; আর কাল সকালে ধান বওয়ার কাজে লাগে—মেলায় মেয়েরা ঘুমায়, ঐ যাত্রার মেলায়—পৌষমাসে শীতের দাপটে কিবা, হাড়িয়া খেয়ে লুটায়, কত মাদল বাজে বড্ড লাচ, বড্ড মেলা। যাদের গোছ ভাল, তাদের বাড়ীর মেয়েরা গাছতলায় হেলান দিয়ে কি ঘুমায়, হাতের বুড়ো আঙ্গুলে হার তুলে, দুই কানের দুই পাশ ধরে—কি ঘুম, কি ঘুম, মাদল বাজে ঘুম ভাঙে না চুলে টান পড়ে কিন্তু হাত ছাড়ে না। "আমি যদি ঘুমাই তেমন সজাগভাবেই ঘুমাবো।"

লুহানী গলা ভাঙা স্বরে তখন বলছে—"তিনি ক্রুশে বিদ্ধ হলেন" বলার সঙ্গে সঙ্গে মাধালির খুব অল্প একটু বিকার হল, তার গায়ে কেন একটু চুল নড়ে ফিরে; জুড়ে আছে। নিজে সে হাওয়া হাওয়া বল্লে— "তিনি ক্রুশ বিদ্ধ হলেন—তিনি—"

লুহানী একবার তাকে দেখল, বুঝল সে ঘুমিয়ে পড়েছে। ভায়ের ঘুমন্ত মুখখানি একবার দেখে সে চোখ বুজিয়ে কি যেন বললে এবং পারকোমের বাজুতে মাথা দিয়ে আলোর দিকে চেয়ে রইল।

কাঁড়ার ঘন্টায়, মোরগের গলায় ভোর হল। যেখানকার যত মোরগ ছিল সব ডেকে উঠল। লুহানী চোখ মেলে তাকালে, যদিও এখন অন্ধকার তবুও কাদের একটা ঢেঁকির শব্দ আসছিল। একবার অন্যদিনকার মত ধড়মড় করে উঠে বসেছিল, কিন্তু আজ আর চোখের জল ফেলে দিন সুরু করতে হয়নি। একবার ইচ্ছা করেই ঘাড় কাত করতে যাচ্ছিল, যাতে করে এখানে বসেই সে মাধালিকে দেখতে পায়। কিন্তু কালকের কথা মনে পড়ে তার ভারী লজ্জা হল। ভাবল আর সে ফুলে হাত দিতে পারবে না। মাকড়ীর বাড়ী গিয়ে আরসি দেখতে পারবে না। নিশ্চয়ই মাধালি বুঝল—আমার স্যাঙাতে ইচ্ছা আছে। কিন্তু মেয়েটির এক জোর ছিল, নিজের প্রতি বিশ্বাস ছিল, নিজে সে ভাল মতই জানে সে নিজের জন্যে বলেনি। সে আর দেরী করল না, এখুনি দিন করতে হবে, বাড়ী ঘর খুব পরিষ্কার করতে হবে কারণ তার ভাই কোনদিন তাঁকে এখানে নিয়ে আসবেই। এ কথা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে সে উঠে ঠোঁটটা ছেড়ে এসে হুড়কো খুলে দেখলে। পারকোমে কেউ নেই, উপরে তারা জ্বলছে। পায়রার মত আকাশটা। তার মনে হল নিশ্চয়ই বাইরে গেছে। শিকল তুলতে তুলতে একবার এদিক ওদিক চেয়ে তারপর শিকল

দেওয়া হল না, এসে পারকোমের উপর বসল, কাঠ দড়ি অসম্ভব ঠাণ্ডা। মাধালি কোথায় গেল—সে কি চার্চে গেছে—।

এমন সময়ে উদাত্ত কণ্ঠে মাকড়ীর প্রার্থনার আওয়াজ এল, সে রোজই খুব ভোরে জোরে প্রার্থনা করে যাতে সবাই শুনতে পায়, তাতে যারা শোনে তাদের যতটা না মঙ্গল হবে তার থেকে তারই বেশী মঙ্গল হবে এই ধারণা। লুহানী উঠে সদর দরজা খুলে এদিক ওদিক চেয়ে দেখলে, বিশেষ কেউ নেই, সামনের বাড়ীর দরজায় প্রকাণ্ড একটা কুকুর শুয়ে। লুহানী বড় বিপদগ্রস্ত হল, সে ঠিক করলে আর কিছুকাল দেখি। বলে সে ঝাঁটা নিয়ে ঝাঁটা দিতে লাগল। ছাগল মুরগী বার হয়েছে, এ ঘর নিকোবে, এর পর আর কত কি হবে।

সে এখন, নেতা দিয়ে উঠান মুছ্‌ছিল, কখনও দেহ বিকলাঙ্গ, কখন সহজ। এ সময়ে তার মুখ দেখলে মনে হয়, সে কিছু বলে চলেছে; এবং মাঝে মাঝে নিশ্চয়ই ভুল হচ্ছিল, কারণ সোজা হয়ে নেতা স্থির রেখে সে বললে "না! তা লয় হ্যা" বলে আবার কাজ, আবার মোছা, এবং কখনও মুরগীকে হেই, ছাগলকে হই এই জীবগুলো এখনও বাইরে যায়নি কেন না এখন আঁধার! লুহানী বুঝেনি যে তাদের পাঁচিলে যেখানে পুরাতন শিম গাছ, সেখান দু তিন জন স্ত্রীলোক এসেছিল। একজনের হাতে ঝাঁটাও ছিল, আর জনের পায়ের কাছে ডোল, হাত কাদা মাখা কারণ এখনি হয়ত ঘর নিকিয়ে এসেছে, আর একজন ছোট অল্প বয়সী মেয়ে কোমরে তার গোবর কুড়াবার ঠেকা ছিল। এরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে পাঁচিলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিল, এখন উঠান শুকায়নি বলে তারা বাইরে দাঁড়িয়েছিল। কিছু বাদে, গৈরা পাহাড়ের পাশ দিয়ে এদের পিছনে সূর্য্য উঠবে। এরা কেউ কথা শুরু করতে পারছিল না। এ ওর কানে কি বললে, ছোট মেয়েটা কান ভিড়িয়ে দেবার জন্য চেষ্টা করতেই কোমরের ঠেকা তাকে বাধা দিলে, সে মাথাটা হেলিয়ে দিয়েছিল। এইভাবে কিছুকাল গেল। তারপর একজন আঁচল টেনে বললে, "হেই লুহানী।" অল্প ডাক, প্রথমত সে চমকে উঠেছিল এবং সে 'হে হে' করে উঠল, লুহানী ভেবেছিল এটা ছাগলের গলার আওয়াজ তাই 'হে হে' বলে তাড়া দিয়েছিল এবং এই সঙ্গেই বিদ্যুৎ বেগে ফিরেছিল। তার তাড়া দেওয়ার শেষ "হে" টা টুক করে বেরিয়ে গেল। নিজেই নিজের বাহুর উপর মুখ রেখে খুব খানিক হেসে বললে; "এই বাবা, সাত সকালে কি—'

মাকড়ী বৌ ছিল। বললে "মাধালি কুথা আমরা দেখতে আঁইছি।" লৈবীর বৌ বললে, "ক'ই গো—"

আর একজন বৌ এসেছিল ইতিমধ্যে, এক হাতে ছেলে পাঁজা কোলে করা, ছেলে হাঁক পাক করে। সে স্ত্রীলোক শুধুমাত্র মাথা নেড়ে সায় দিয়েছিল। মেয়েটি এমনভাবে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল যেমন করে সে কিদিম কাঠ কোম দেখে অর্থাৎ বিস্মিত চোখ। মাকড়ী বৌ বললে,—"কুথা—সে—!"

লুহানীর সে কথায় কান ছিল না, তার কাছে কোলের ছেলেটি বড় বেশী হয়েছিল। সে ঝপ করে উঠে হাত দুটি নুল করে কাঁধ দিয়ে আঁচল সামলে ডিঙি মেরে ডোলের জলের মধ্যে হাত ঝটকা মেরে খর ডিঙি পায় এসেই ছোট ছেলেটিকে আচম্বিতে কোল থেকে নিয়েই, হেই হেই করতে লাগল, ছেলেটি কেঁদে উঠল। ঘুরে নাচের মত করতে লাগল। থমকে দাঁড়িয়ে বলল—"আছে—আছে—বটে" কারণ মাকড়ী বৌ আবার ইতিমধ্যে প্রশ্ন করেছিল—

লুহানী এখন খাড়া দাঁড়িয়ে শ্রম কাতর দ্রুত নিঃশ্বাসের মধ্যে নানান আওয়াজ, ছেলেটির সঙ্গে কথা বলতে লাগল। এবার সে চিমটি কাটল, ছেলেটি হো হো করে কেঁদে উঠল। তার মা—"আ-বে" বলে হাত বাড়ালে, সে না দেবার ছলে যখন দেহ বাঁকিয়েছে আবার মাকড়ীর বউ প্রশ্ন করল—"শুনলাম—সে—মানুষ হইছে—"

লুহানী ঘুরে চোখ বড় করল। একবার আদর ছলে তার মুখে—"ওত" শব্দ ছিল। হাত দুটি তাকে দোলা দিচ্ছিল। বেশী কাঁদছে দেখে ছেলেটিকে উর্দ্ধে তুলে ধরে, মুখ উঁচু করে তার পেটে মুখ লাগিয়ে—"ভুরুক" শব্দ করে এবার মুখ নামিয়ে বললে—"বললেক সগর ভাঙছে—।"

একমাত্র মেয়েটি লুহানীর কাছে হেসে পাঁচিলে গাল ঠেকিয়েছিল সেখানে মুখ রেখে হাসছিল। মাকড়ী বৌ কোনুই ঠেলা দিলে সবাই সকলের মুখ চাওয়াচায়ি করে গালে হাত দিয়ে—"আঃ হা" বলে দুঃখ প্রকাশ করে আবার সোজা হয়ে দাঁড়াল। মা-টি জিজ্ঞাসা করল আদরব্যস্ত লুহানীকে—"সে-কিছু

দেখেছে হে—”

লুহানীকে এ প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই শিশুটিকে উর্দ্ধে ছুড়ে দিয়ে সেই দিকে তাকিয়েছিল। শিশু হাতে পড়তেই সে হপ্ করে একটা শব্দ করে, অসম্ভব দম নিতে নিতে একটা কথা বললে—“সে—দেখে-ছে-ব-টে—”

“মানুষ বটে—সে হে—” বলে মাকড়ী বৌ খানিক গম্ভীর আহ্লাদ প্রকাশ করল। লুহানী মাথা নাড়িয়ে সায় দিলে আর সকলের মাথা তিতির পাখীর মত নাড়াতে লাগল।

আর একজনা যার হাতে ঝাঁটা ছিল সে বললে,—“সে কি আম্ মাদের মত খায় দায়”—বলে প্রশ্নটা সঠিক হয়েছে কি না সবায়ের সায় নেওয়ার জন্য আসপাশ দেখলে।

—“হি ইটা কি কথা গো? সে আমাদের মুতন সব করবেক আমাদের সঙ্গে কথা কইবেক লিবেক...দিবেক...”

লুহানী কাঁধটা একটু উঠিয়ে মায়ের কোলে ছেলেটিকে দিয়ে, আবার তার হাত বাড়িয়ে—‘আ—য়—আ’ বললে. “তা লয় গো—সে যা বললে; লিবেক দিবেক না—লাহল দিবে না—। খাবে কি—পিয়াশাল—ভাত—ছাগল নয়—(বছরে দুবার ফল দেবে না।) আমি বলছি—তুই ডাক—আমি চাল আনব আকা ধরব হাটকে যাব—”

সবাই মুখখানা একটা হাঁ করে, গরগর করে অবাকের শব্দ করে একের পর একজন বলে—‘ই বাবা; শুধুই...বলেছিল’—! মাকড়ী বৌ বললে, “তুই বিটিছেনা—তুয়ার আর ধার কত—রে—দু পইসা—দু আনা পাবি—বে—বেশী কি—পয়সা শাল পাতা কি—হে?”

লুহানী সবে বাচ্ছা দেওয়া পাখীর মত ফুলে উঠেছিল। তার মুখটা এখন প্রথম রোদের আভায় মাজা বাসনের মত সবুজ চিকনাই। সে পাঁচিলের কাছে সরে গিয়ে একটা হাত রেখে, ওদের দিকে চেয়ে সাহস করে চাইবার জন্য তাকাল, মুখগুলো পড়ে নিল। ইতিমধ্যে সে একটা পা আদা ভাঙা করে, পাঁচিলের মাটির দিকে চেয়ে আঙ্গুল ঠুকতে লাগল। শুধু মনে হল এই শ্রাবণ ভাদ্র তারা ভাত খায়, এরপর যদি চাট্টি শুধু ভাত মেলে কখনও টক আমলকি, কখন পিয়াশাল কখন ডুমুর কখন কিছু কিছু এইত ভাগ্য। তাই তারা রোজ এমন হয়েছে, ভাত ভালবাসে [illegible] চাল—জোন্ ডারা ত যদি যদি! একবার সে কাতর মুখটা তুলে কি একটা বলতে গিয়ে বললে, “দিদি গো কষ্টত আছেই একটা ভাই বটে—সে যদি—”

“সে যদি বলে—হা রে তুই বিটিছেলে মরদের পেট, সারা দুনিয়া ঢুকবেক তুই পারবি কেনে—” বলেই সে নিজের কানে কথাটা গেলে অমনি মাকড়ী বৌয়ের বড় কষ্ট হল। সে নিজের গলায় রূপার চেন-হার ধরে ক্রুশটা সে একবার দেখতে লাগল। “লুহানী না বুঝলেই ভাল, কথাটা, আমি কষ্ট দেবার জন্য বলিনি”। কারণ মাধালিকে কাজে লাগানোর ইঙ্গিত প্রচ্ছন্নভাবেই ছিল।

“তা বটে দিদিগো তবে—তিনি ত তাকে দিতে পারলে গো।” বলতে সবাই নিস্তার পেলে, সবাই আবার মিলেমিশে যেতে পারলে, মাকড়ী বৌ এর আর আর সকলেরই মনে হল আজ রবিবার, শুধু তাই নয় এখন তারা সকলেই চার্চে। সত্যিই তারা সকলেই উৎফুল্ল হল। মাকড়ী বৌ বললে, “বেশ রে বেশ, আমি তুকে—” কি দেবে ভেবে পেল না এবং মুখ থেকে বার হল—“কাঁটাহরের বীচি দিব—।”

কাঁটালের বীচি অতি যত্নের জিনিস, কুটুম্ব এলে ব্যবহার হয়। সবাই অবাক হয়েছিল। এ কথা দিয়ে মাকড়ী বৌ একটু ভীত হয়েছিল, কারণ মাকড়ী অতি বৈষয়িক, তার হাতের মধ্যে সব কিছু এমনকি এক মুঠো তুঁষ পর্যন্ত দেবার ক্ষমতা কার নেই। আর যারা তারা বললে, “ভেবনা আমরা যা পাব, একমুঠা তোমার” ছোট শ্বাস ত্যাগ করে একথা বলেছিল। মা-টি বললে—, “হে—হে—যাকে দেখতে এলাম, সে কুথাকে মাঠে নাকি—?”

লুহানীর এতক্ষণ বাদে তার কথা স্মরণ হল। লুহানী তার গালে তর্জনীটা দিয়ে বললে—“হে লা দেখ গো—মন নাই...দাদা আমার গেল কুথাকে—?”

কিছু অন্যমনস্ক হয়ে সে বললে—“বটে—বটে”—বলে পিছন ফিরে এ পাশ ও পাশ দেখলে। তারপরই দ্রুত পায়ে বার হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু দরজা খুলা, সে দরজার শিকল তুলে বার হল, রাস্তায় নেমে এদের সকলকে হাসাতে চেষ্টা করে বললে, ‘যাই’ বলে যেতে গিয়ে বললে, “তুরা যে মাঠে যাবি,

তাকে দেখলে হাঁকবি—রে কেমুন?' বলে খর পায় সে চলে গেল।

ইতিমধ্যে এ বাড়ীর কাছে মাকড়ী এসেছিল। পরণে তার গামছা, হাতে তার গরুর দড়ি। বৌকে দেখে বললে, 'হে তুই না মাঠে গেলি—? ই খানে কি—'

"আসছিলাম মানুষ দেখতে।" "ই কি কথা—মাধালি বল!" ইতিমধ্যে গরুটা অনেক দূর চলে গিয়েছিল, অসাবধানতাবশত সে বেসামাল হয়ে গিয়ে, এমন মজার হয়েছিল যে তার স্ত্রী হেসে ফেললে। মাকড়ী খুব ভালভাবে চটতে পারলে না, শুধুমাত্র দড়িটায় একটা হাঁচা টান মেরে 'হি রেঃ' বলে গরুকে শাসিয়েছিল মাত্র। তার স্ত্রী এমনভাবে আছে, মনে হয় যেন দাঁত দিয়ে নিজের জিবটাই শুধু চেপে ধরে আছে যাতে না হাসি পায়। স্ত্রীলোকরা সবাই পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিল।

"ই খান কে—ঠায় সময় লষ্ট করছিসবে,—হা কপাড় ঘর গাছালি নাই কি?" গলার স্বরের একটু তারতম্য হয়েছিল—

"হে কেনে গো?" সরলভাবেই মাকড়ী বৌ বললে।

এ প্রশ্নে মাকড়ী একটু ভীত হয়ে মুখ কাঁচুমাচু করে গরুর দিকে চেয়ে বললে—"এখন মধু আসে নাই—" বলে আড়ে অন্যান্য স্ত্রীলোকদের দিকে চাইতে চেষ্টা করল তারা তার কথা কিভাবে নিচ্ছে জানবার জন্যে।

"তুই জানলি কি করে, নিমে মধু আছে, মৌমাছি ঘুরে কেনে, সজিনায় ঘুরে কেনে। নিম গাছকে ফল টুপটাপ পড়ে, মৌমাছির শব্দে শব্দ লাই, সজিনা ফুল সাদা বুঝায় না—"

সে রুখে থাকলেও আবার গরুতে তাকে বেঁকিয়ে দিচ্ছিল, দু একবার জোর করে রুখবার চেষ্টা করে এ কথার উত্তর না দিয়েই, হুরুর পুরুর করে চলে গেল, ফিরে তাকাবার সময় ছিল না।

আর আর মেয়েরা তার দিকে প্রশংসমান দৃষ্টিতে চাইল, মাকড়ী বৌ একটু অন্যমনস্ক হলেও—উত্তর দিতে পেরে খুসী হয়েছিল, আপনা থেকেই বললে, "যা বুলবেক তাই বুঝে লুব—? তা হয় না, হ্যাঁ মন্দ করি ঝাঁটা কর লাথি কর মানব কিঃ? যাই ঘরকে—" বলে সে আর দাঁড়াল না, চলে গেল।

লুহানী অনেকবার টাল খেয়েছিল, শুধুমাত্র কাঁদবার সময়ে সে আঁচলে গিরো দিয়ে রেখেছিল। নিজের ছায়া কখন সামনে হয়েছে কভুবা পিছনে পড়েছে। তখন তখন ভয়ে সে নিজেই আছে কিনা বিচারের জন্য পিছন ফিরে ছায়া দেখে নিয়েছে। গতি শ্লথ হয়েছে, কিন্তু আঁট কমেনি; কত মহুয়া গাছের কটোরে মুখ দিয়ে "হো" বলছে কারণ প্রত্যেক আনাচে কানাচে খুঁজা দরকার। মুক্তারা একবার শবর ছেড়ে চুরি করেছিল, বলি দেবে বলে, মুক্তারা ধান তুলার সময় বলি দিত যাতে পরশালে ধান বেশী হয়। ঘরের লোক পুঁটলি খুঁজেছিল, হাঁড়ি কলসী দেখেছিল। পাহুড়ীর রাস্তায় বেড় করে সোরঝার মধ্যে যে ঢিবি পাহাড় মত আছে, সেখানে কতবার নিসিন্দে গাছে, হাত ঠেকাতে ঠেকাতে সে এগিয়ে গেছে। কতবার তার কণ্ঠস্বর এইবেলায় প্রতিধ্বনিত হয়েছে। আরো উত্তরের নাগালে, যারা এখন ধান পোঁতে, যারা সবুজ ধান বাঁকে করে নিয়ে আসে, তাদের জিজ্ঞাসা করেছে, অনেকবারই এদের চোখে সে বহুদূরে চলে গেছে। শুধু তার সাদা কাপড়ের জন্যই এরা বলাবলি করেছে—"ইখনও ও খুঁজছে গো, মানুষটা পাই পইসা হইল গো।" রোদ এখন মাথায়, মাথা তার রিমঝিম করছে, এলো চুলে মস্ত গিঁট দিয়ে যখন সে মনস্থ করল, গ্রামে খবর দি।

আবার পাহুড়ীর রাস্তার ধারে আরো দক্ষিণে একবার মন হল দেখি, কারণ এ জায়গা ছোট ছোট শাল মহুয়ার। জমি আছে পাশে ক্ষেত ঝরানি আছে পাথরের গা দিয়ে গেছে। লুহানী ভেবেছিল এ জায়গা শান্ত, সব ক্ষেত বোনা হয়েছে; এখানে যদি থাকে। শাল গাছ পার হয়ে আসার সময়ে ছাতি (ব্যাঙের) দেখেছে, ভেবেছে সেই যদি না এল—ছাতির কি দরকার, ক্ষেত ঝরানির ধারে এলো, দুধারে পাথর সোঁতাতেও পাথর। এক পাথর থেকে এক পাথরে লাফাতে লাফাতে চলেছে। আর পাথরে লাফাতেই হঠাৎ চোখ তুলে, দেখলে সামনে বেশ বড় ঢিবি পাথরের উপর কে একজন বসে আছে। একটা বালিশের মত পাথরে হেলান দিয়ে, পা ছড়িয়ে, সে চিনতে পারল না। সে বেঁকে একটু আঁজলা জল ঝপ করে মুখে দিয়েই অবাক হয়ে ডাকতে গেল কিন্তু গলা শুকনো মুখ ধোয়া জলে মুখে নুনের স্বাদ গিয়েছিল—নির্বাক, শব্দ বার হল না, পরে গলা খাঁকরি দিয়ে জিব খেলিয়ে ডাকল—"হে-ই—হেই হো—"

এখনও মুখে তার জল সে অবাক হয়ে রইল অনেক হাঁড়িয়া খেয়ে যেমন লোকে টুপভুজঙ্গ হয় তার অনেক সময় পরে একটু চোখ খোলার শক্তি পায় তেমনি। লুহানী একবার এদিক একবার ওদিক করে। পরে হামাগুড়ি দিয়ে উঠে এসে মাধালির কাছে গিয়ে দুবাহু ধরে নাড়া দিতে দিতে বললে "হেই মোর দাদা গো—" বলেই নাকের কাছে হাতটা দিলে মাধালি লাল চোখে তার দিকে তাকাল। দুহাত গালে দিয়ে আদর করেই পাশে বসেই তার খোঁজার গল্প শুরু করলে, "মাকড়ী বড়িয়ার (বড়িয়া মানে দোকানদার) বউ বললে, "খাবে কি?—আমি তখন সরঝার রাস্তায় হে—" বলে গালে হাত দিয়ে বল্লে—"সব ধান কলাই মিশেল হল গো—সব ভুল্লাম।" আবার আর একভাবে বসল। যেন একটি বিশেষভাবে বসার মধ্যে তার সকল কিছু আটকে আছে, বল্লে "একটা বেলা হল গাছকে ছায়া এবার উধারকে যাবে প্রায় ভুক লাগে নাই? বাই স্যাব তুই খাবি না—" বলে দুহাতে দুহাত জোড় করে এক হাঁটুতে গলিয়ে দিয়ে বড় বড় চোখে চেয়ে রইল। আবার হাত ছেড়ে দিয়েই হাঁটু নাচাতে নাচাতে বল্লে, "রাঁনতে হে ঘরের ছায়া উঠোন ভরি যাবে—থেপে আজ কাজে গেলাম না—কিরে বোবা হইছ নাকি—না ভগবান বলছে—ইটা তোমার বুন নয়—ইটার সঙ্গে কথা কও না—।"

"আমি ঘরকে যাব না হে, আমি বুঝে লিব—"

"সে কি—খেতে হে—"

"আমি আজ ঘরকে যাব না— তুই কাউকে বলবি না হে আমি কোথায়—"

নিজের দিকে আঙ্গুল দিয়ে বলতে গিয়ে বল্লে, "আমি মিছাই বলব—উ বেলাকে—।"

মাধালি উত্তর না দিয়ে চুপ রইল। লুহানী কিয়ৎপরেই তার পায় ঠেলা দিয়ে বললে, "ক্ষেপা হইছ নাকি—?" মাধালি উঠে ভালভাবে বসে একটি হাঁটু দুহাতের মধ্যে রেখে ঈষৎ দুলতে লাগল। তারপর মুখ দিয়ে দেখালে পাথরের উপরে—কয়েকটা গেরী মাটির দাগ এবং গেরী মাটির ঢেলা, বল্লে, "আমি এগুলা মুঠা করে ভাবলাম, আঁচড় কেটে ভাবলাম—আমি বুঝলাম না কোন রাস্তারে—পুবে না পশ্চিমে—উপাশের জঙ্গলে না কসাই-এর ধারে—আমি ভাবতে লারলুম; বুঝতে লারলুম; পাখীদের পথ নাই দেখ দেখ—।"

লুহানী পাখীর দিকে লক্ষ্য করল। একটার পরে একটা জল খায়—। কোন কথা খুঁজে না পেয়ে বললে "কিন্তু" অর্থাৎ সে বলতে চেয়েছিল তাইলে—। "আমার ডানা চাই আমি পথ দেখি লুব—" বলে চুপ করে দূরের দিকে চেয়ে রইল।

কিন্তু এমন কথা লুহানী জোর করে বলতে পারলে না—"তুই ঘরকে চল আমি ডানা তোকে দিব" অনেক মেলা খেলা মনে পড়ল, অনেক গাছ বন গিরি গহ্বর যেখানে সহজেই তার মনে হয়েছে অনেক ঐশ্বর্য্য আছে। পাহাড়ী জলে যখন সরের মত ভেসে যায় আর তাতে রামধনু রঙ থাকে, সে গরু চরাতে চরাতে অন্যদের কাছে শুনেছিল সূর্য্য একটু একটু করে পৃথিবীর মধ্যে লুকাচ্ছে, সেই গুলোই ফাটল বেয়ে ঝরে আসছে, তবু অনেক আছে, সে একটি পা মুড়ে তার উপরে বসে একটি হাঁটু ভেঙে উঁচু করে তার উপর হাত রেখে বসে রইল। মাধালি একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, "আমি শালা খুঁজে লুব," কথাটা যেন হেঁতেল। লুহানী ভয় ভয় তার দিকে চাইল, মনে হল এমন কথা বলছে থানা, দারোগা হবে ফৌজদারী হবে। বললে, "চল না হে দাদা তুয়ার পায়ে ধরি ঘরকে চল।"

মাধালির আর একটু বীরত্ব করবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু হঠাৎ লুহানীর পা ধরা দেখে লজ্জিত হল। কারণ সে সত্য সত্যিই এমন কিছু বলেনি, আর কথাকে চাপা দেবার জন্য যেন জোর করে বলেছিল—অথবা গুপ্ত কথা এবং তার সংকল্প এক সঙ্গেই আছে। সে পা সরাবার জন্য চেষ্টা করল। লুহানী যেন একটু জোর পেয়ে বললে—'তুই উঠ—"

"লুহানী তুই যদি এমন করিস আমি যেখানে নিঃশ্বাস নিতে পারব সেখানে চলে যাব—"

লুহানী উঠে বলল—"তাহলে আমি খাব না, আমার কেউ নাই বলি তুই খেলা করছিস না—?"

"আমি বলেছি তুই খাবিদাবি না...তুই যা রানধা গা...আমি যাব...তবে রাত হবে..."

লুহানী বললে—"তিন বার বল..."।

লুহানী তখনও ফেরেনি, লুহানীর ঘরে মাধালির খবরের জন্যে যারা উঠোনে জমায়েৎ হয়েছিল তারা একটু অপ্রতিভভাবেই খাড়া হয়ে দাঁড়াল, লৈবী, একবার বিলাহীর, একবার পিটারের দিকে

আশান্বিত হয়ে চাইলে, কারণ একটা লোক তাঁকে (ভগবানকে) পাবার জন্যে সব ছেড়ে বনে বাদাড়ে ঘুরছে একি...কম কথা। লৈবী আর বিলাহী এরা দুজনে যখন বাড়ী ফিরছিল তাদের কথাবার্তার আওয়াজে মাকড়ী বাড়িয়া বেরিয়ে এসে বললে, "এস হে এস"। লৈবী সহায় আছে বুঝে, বিলাহী তার উরুতের পাশে চাপড়ে অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে শুরু করলে—"হ্যাঁ দেখলাম বটে শুনলাম বটে বল কিহে"—বলে সে নিজেই চকিত হয়ে লাফাল, কত রকম অঙ্গভঙ্গী করে বলতে লাগল, "ভয়ে বুক ঠেংআলে, সে এখন জামা (আত্মা যেন দেহ আর আমি যেমন জামা, আত্মাই সব) হই আঁছে কি বলিস হে..."

বলে বুক ফুলিয়ে লৈবীর দিকে চাইলে; সাধারণত আদত-জামার প্রতি যে তার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা তার কথার মধ্যে বেশী মাত্রায় ছিল। লৈবীও কিছু কিছু অঙ্গভঙ্গী করেছিল যাতে করে সমস্ত ব্যাপার অতি পরিচ্ছন্ন হয়, প্রকাশ পায়।

মাকড়ী যেমনভাবে হাটে দাঁড়ায় তেমনিভাবে, নিজেকে সোজা রেখেছিল; শুধু তার চোখ ঘুরছিল একবারও তার ঔৎসুক্য হলনা গল্পটা ভাল করে শুনতে শুধু চুটায় একটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললে—"মার মাদ পা আদপে" একথা আমাদের বললিস কেনে? আমরা মুক্তা? আমরা ক্রেস্তান না"...

এরা দুজনে মুখ চাওয়াচায়ি করেছিল। সত্যি কথা জেনে নেওয়া হয়নি, এবং একটা অশান্তি বোধ করছিল। এতে করে মাকড়ী বেশ সাহস পেলে বললে "কেনে সে বলবে হে," বলে চুটায় টান মেরে ফেলে দিল যেন তাদের সমাজকে অত্যন্ত ছোট করা হয়েছে। আর আর যে যে কথা অর্থাৎ মাধালির অভিজ্ঞতা তাকে সোজাসুজি যাচাই করতে পারছিল না। কোথায় তার সমীহ হচ্ছিল। এছাড়া ধর্মের প্রতি একটা বাধ্যবাধকতা ছিল এবং নিজেকে সে পরিচ্ছন্ন ক্রিশ্চান বলে ভাবত। সুতরাং মাধালির বা পরবের কথাটাই সে ধরেছিল। এই মুণ্ডা সামাজিক কথাতেই সে আশ্রয় করেছিল। আবার বললে—"সি কেনে ই কুথা বুলবে," বলে হাতে হাতে বাজালে তারপর চোখ কপালে তুলে বললে "পাশেই গির্জ্জাথান" বলতেই আবেগে তার কষ বেয়ে জল এল, সে ত্বরিত মুখ নীচু করে গামছার খুঁট দিয়ে মুখ মুছেছিল।

লৈবী লোকটা আজ ভাত খেয়েছিল। কাঁঠালবীচি পোড়া দিয়ে, তার মনটা ভাল ছিল,সে যদি এখন মরে তাহলে তার দুঃখ করার কিছু নেই, বললে "রে রে তুমি এত চটহ কেন হে?" বলে বিলাহীকে সাক্ষী মানল।

"ঠিকে ঠিকে ঠায় ঠার কথা বলহে, শুনবেক" বলে মাড়কী দুহাত উঁচিয়ে তাকে আস্তে কথা কইতে বললে। "না না বস বস" বলে সবাই বসার আগেই নিজে বসেছিল। তারাও বসেছিল। মাকড়ী একটা চেলা নিয়ে মাটিতে দাগ কাটতে কাটতে বললে,..."বহু লোক রোজ বাইবেল পড়ছে, ডাকছে তারা তাঁর দেখা পেলেনা আর পেলে শুধু মাধালি?" বহু লোক বলতে সে নিজেকেই বুঝাতে চেয়েছিল।

"বহু লোক...কি উয়ার মত বনে গেছে?"

"হাঁ বনে গেনছে কি কুথাকে গেছে...তা বড্ড কুথা বললে হেঁ..."

"বড্ড কথা না কেনে..." বলে বিলাহীর দিকে আবার সাহায্যের জন্য তাকাল।

বিলাহী শুধু বললে "ই কথা কেনে...।"

মাকড়ী—"দ্যুৎ" বলে বিলাহীর হাঁটুটা অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে ঠেলা দিতেই সে সামলাতে না পেরে একপাশে পড়ে গেল। বিলাহী উঠে দাঁড়িয়ে ধুলা ঝাড়তে ঝাড়তে 'ঘরকে গেলাম' বলে যাবার জন্য পা বাড়ালে। মাকড়ী উঠতে উঠতে "তাঁর দেখা কি চাট্টিখানি কুথা...আর হে। পেলেই বা কি তুয়ার ধান কি বেশী হবে..." বলেই বুঝতে পারল খুব একটা নীচু কথা বলে ফেলেছে। সে তৎক্ষণাৎ বললে "মানে কি"...বলে চোখ করল "মানে এই যে" এরা কি বলতে যাচ্ছিল মাথা নাড়িয়ে বললে... র র র মানে এই যে অনেক কষ্ট হবেক তবে তার দেখা পাবে চেটাইএ পিঠ নাই পেটে ভাত নাই"...যখন দেখলে এরা তার কথা বেশ মেনে নিয়েছে, বললে, 'কুথাকে হাঁড়িয়া জুয়া খাইছে"—পড়েছিল এসে বললে আমি জামা হইছি—হো"—বলে দেহ যেন আকাশে ছুঁড়ে দিল।

লৈবী এবং বিলাহীর দু'জনেরই একই কথা মনে হচ্ছিল, কিন্তু মাধালি লোকটার প্রতি বিশ্বাস না

রাখলে চলে না, সে তাদের তাঁকে দেখাতে পারে। অথচ সামনের লোকটি, এ সব সময়ে বাইবেল শোনে শুনতে জানে, ব্যাপার করে। দশ হাটের লোক মাকড়ীকে দারগার মত শ্রদ্ধা করে। তবু লৈবী তার খুসীতেই বললে, "তুমায় কি মনে লেয়—কথা সব খরয়া জমি—"

"খরয়া! লোহাড়ী কালা কথা, কোন ফুল সূর্য্য যখন দক্ষিণে তখন ফুটে যখন উত্তরে তখন ফুটে—, দেখ সূর্য্য এখন দক্ষিণে যাইছে তোমার..."

"হা হা তবে—"

"তুমি এক সময়ে ত ফুটবে হে হয় এখন নয় তখন" বলেই মাকড়ীর সত্যি ভয় হল 'তখন' বলাতে, ফলে সে কথাকে ঘুরিয়ে নিয়ে বললে, "আমরা মদু পুড়িয়ে লিব, বাবুই দড়ি ডুবাব, আগুন দিব—মদু জ্বলছে, পাহাড় এক আছে তেমন, মদু একভাবে জ্বলছে—হ্য বলব তুমি বটে বড্ড বটে" বলে ধুলায় হাত ঠেকিয়ে মাথায় ঠেকালে এবং সেই বেঁকে থেকেই দুটো উরুতে হাত দিয়ে মুখের ভয়ঙ্কর ভঙ্গীতে কেটে কেটে বললে, "যদি দেখি মদু ফট্‌ফট্ করছে" বলেই ঘোড়ার মত চিহি করে উঠে দাঁড়িয়ে বললে "তাহালে— তাহালে—।"

"বুঝব মদুতে জল আছে—"

"বুঝ বুঝ" বলে মাকড়ী মাথা নাড়ালে।

এরা মাকড়ীর ভাবগতিক দেখে, একবারও বলতে সাহস পায়নি যে এখানে মদুতে (মধু) জল কেউ দেয় না। অনেক হাটুরে কেমন কায়দায় মধু কেনে সব মধু ফট্‌ফট্ করে, আর সঙ্গে সঙ্গে—'শালা—চোর—বুনো' বলে।

মাকড়ী বললে—"তাঁকে পাওয়া খুব সোজা না হে, প্রথম দেখ, সত্য কথা বলবেক, এইখানটা নেয় একটা গিদ্‌রা থাককে এই দেখ...দুই হল—তারপর—নরম হবে—"

এরা দুজনে মাথা দুলিয়ে সম্ভবত কথা থামাবার জন্য সায় দিয়েছিল।

এইমাত্র পিটার এসেছে তার বিলাহীর সঙ্গে আবার কথা হয়েছে। মাকড়ী বলেছিল—'মাধালি একদিনও বাইবেল শুনে না, মার পিটা করে কারণ ভগবান তাকে যে ছাতি দিইছে তা হাটে মাঠে লষ্ট করে। কুথাকে হাঁড়িয়া খাইছে—আজ আবার—'

এরা বলেছিল—"সব সত্য কিন্তু সকল সময় সে তাঁর কথা বলছে—তাঁকে ডাকবে বলেছে—আমাদের দেখাবে বলেছে" শেষ কথাটা পিটার একাই বলেছিল—"দেখনা আজও নাই বাড়ী—লুহানী খুঁজছে"—মাকড়ী একটু মুষড়ে পড়েছিল, একবার সে দূরের দিকে চেয়ে রইল তবু জোর করে বললে—"দেখাবে—হে"।

এমন সময়ে মহিষের উপরে ছেলেটির বাঁশী তারা শুনলে, সবাই জিজ্ঞাসা করেছিল, "মাধালি দেখেছিস, লুহানী সে কুথায়?" কিন্তু এরা বাঁশীই শুনেছিল, হঠাৎ এখন ছেলেটা মুখখানা ফিরিয়ে বলে উঠল—"লুহানী আসছে"।

সকলে এসে রাস্তায় দাঁড়াল। কেউ দক্ষিণের দিকে, কেউ উত্তর দিকে এক একবার দেখতে লাগল, এমন সময়ে দেখলে দক্ষিণ দিকে ক্ষেতে পড়া রাস্তার উপরে কে একজন—তার কাপড় হাওয়ায় উড়ে। পিটার ভাবল দৌড়ে যাই, কিন্তু পা বাড়াতেই থেমে গেল। ইতিমধ্যে দু একজনা জমা হয়েছে, মাকড়ীর বৌ এসে দাঁড়িয়েছিল। মাকড়ী তাকে কি ছুতায় ঘরে পাঠাবে ভাবতে ভাবতেই লুহানী কাছে এসে পড়ল, সে যেন আর চলতে পারছে না, ঢালু রাস্তাই কতো যেন নামিয়ে আনছে—মুখে যেন ফেনা, তাই উঁচু দিকে দৃষ্টি আবার কখনো কখনো নামাচ্ছে। এরা সবাই একটু নড়ে চড়ে আবার স্থির।

লুহানী যখন এদের প্রায় পাশ কাটিয়ে যায় তখন মাকড়ী তাকে ডাকলে "হে লুহানী"—বলে কাছে দাঁড়াল, তালুর শেষ ভাগ দিয়ে মুখটা মুছলে, ঘাড় কাত করলে। মাকড়ী কি যে প্রশ্ন করবে বুঝতে পারল না। কেননা সকলেই বুঝেছিল—লুহানী কোন কোন জমিতে ধান রুয়া হচ্ছে সে খবর দিতে পারে কিন্তু মাধালির খবর দিতে পারে না। তবু মাকড়ী তার স্বাভাবিক কর্ত্তব্যজ্ঞান থেকেই হাতে বুক ডলতে ডলতে বললে—"তুহার ছাগল মুরগী সব তুলেছিস রে—" একটু আমতা আমতা করেই জিজ্ঞাসা করেছিল।

লুহানী মরণোন্মুখ কুকুরের মত আউ আউ শব্দ করলে, নিজের দেহটিকে ছোট মোচড় দিয়ে। এ

শব্দে সকলেই আহত হয়েছিল। মাকড়ী আর প্রশ্ন না করতে পেরে এক পা পিছিয়ে গেল, এ কারণে যে অন্য কেউ প্রশ্ন করুক। পিটার প্রশ্ন করল—"কাক দেখেছিস, সবঠেন খুঁজেছিলিস হে—?"

লুহানী আবার ঠিক তেমনি আওয়াজ করে দুপা পিছনে সরে এমনভাবে পদচালনা করতে লাগল মনে হয় সে নাচছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার ক্রন্দনের যত রূপ আওয়াজ হয় সবই বার হল একের পর এক কিন্তু চোখে জল ছিলনা—ছিঁচকাঁদুনের মত আওয়াজ হতে থাকল। মাকড়ী বৌ-এর মুখটা বিকৃত হয়েছিল।

মাকড়ী বলে উঠল..."হা কপাড় হে—গেল কুথাকে—"

মাকড়ী বৌ এবার এসে লুহানীকে পিছন থেকে ধরেছিল যাতে করে একটু সহানুভূতি অন্তত দেখানো যায় এবং তার চুলের গোছ হাত দিয়ে তুলে ধরে ছেড়ে দিল, বললে—"হরর...কান্দিস না...সে আসবে রে"।

"না গো সে বড় মানুষ হইছে...কাল তার খাওয়া দেখি বুঝলাম...সে ছোট দলা খায় সে...সে..."

"তুয়ার সঙ্গে কি ই সব কথা লিয়ে ঝগড়া হইছিল..."

"ঝগড়া হবে কেনে" মাকড়ী বৌ শাসন করে বললে, "তুমার যেমন কথা"

"আহা হতে ত পারে, তবে কুথাকে গেল...কি কথা হইছিল?"

লুহানী বললে, "আমি তাকে বুললাম...তুই লাঙ্গল করবি না...বুললে না"।

"বলে কি ...বলে কি" মাকড়ী বললে।

"বললে আমায় গল্প বল...আমি ডেভিডের গল্প...বলতে লাগছিলাম...বলে না না—প্রভুর শেষ কথা বল।"

"দেখ...বুঝলাম না..." পিটার বললে।

"আমি বুললাম...তুমি তাকে ডাক...আমি গতর খাটব...তাতে যদি না চলে...আমি স্যাঙা করব—"

"এ্যা...এ্যা"

"স্যাঙা করব।"

পুরুষ মানুষ সকলেই ভিতরে ভিতরে বড়া ভাজার মত উল্‌টাতে পাল্‌টাতে লাগল। কেউ অথচ কোন দেহভঙ্গী করলে না তবু দেহ যেন কেঁপে উঠেছিল। তারা আনন্দে ধুলা মাখলেও, একের প্রতি অন্যের বেশ রাগ হয়েছে, লুহানীর একথা অনেকটা পুরুষ মানুষকে চাওয়ার মত, সব থেকে তাদের মাকড়ী বৌ-এর উপস্থিতির জন্য অস্বস্তি বোধ হয়েছিল।

তার প্রতি বক্র দৃষ্টি হানার উপায় ছিল না, এ কারণে যে লুহানীকে সে ধরে তখনও দাঁড়িয়ে ছিল, যে লুহানী ছেঁড়া ছেঁড়া চন্দ্রালোকে আলুথালু বসনে নিভৃত কোন শালবনে দাঁড়িয়ে মোহিনী মায়া সৃষ্টি করছে দুটি হাত তুলে 'আয় আয় বলছে' এবং মাঝে মাঝে ছোট পায়রা-পা রঙের জিবটি বার করে শিম ফুলের মত ঠোঁটটি বুলায়।

এখন সন্ধ্যার অন্ধকারে, চারিদিক জব্দ। আর একটু আঁধার হলে এরা কিছু একটা করতে পারত, পিটার সে তার পিঠটা একটু চুলকালে আগুনে কাঁঠাল বীচির সর্বক্ষণ চুপ করে সে ফট্ করে ফাটল এবং পরপর সকলেই সুযোগ নিলে, বিলাহী এবং মাকড়ী এবং যাদের ঘর ছাপোষা তারা যাদের বিয়ের ফুল ফুটেনি তাদের উপর মাথায় একধারে ঈর্ষান্বিত হয়েছিল। লুহানী এমন নির্লজ্জ হবে তারা ভাবতে পারেনি।

আমি বুললাম, "তুই তাঁকে ডাক, আমি"

"আহা তুয়ার কি কাল! কি দশা গো—ওহে ইয়ার কথা আঙ্গুল ডুবান কথা (অর্থাৎ পাইতে যেমন বুড়ো আঙ্গুল ডুবিয়ে ব্যাপারীরা একটু ধান মেরে দেয় তেমন নয়) ইয়ার ধান শুকনা—জল ছিটানো লয়—"

পুরুষরা সকলেই এ কথায় যেন ধরা পড়ে গেল, কেউ কেউ সত্বর বলেছিল, "আহা বড্ড বিটীছানা গো, ইয়া বাঘে ঘাড়ে পা দেয়—ইয়া ফিলিপ পাদরীকে সত্যই দেখেছে—ভগবান ইয়ার পটমে ইয়ার হাঁড়ি হোলায়", ইত্যাকার সাধু কথা বলে, এক একবার লুহানীর মুখটা দেখবার চেষ্টা করল। দাঁড়িয়ে

থাকা মুখখানিকে, তারা শায়িত অবস্থায় দেখল, তার চোখে সামান্য প্রদীপের আলো দুঃসহ চোখ বুঁজে আছে।

লুহানী সারাদিন উপোসী, ফলে তার মুখ থেকে কেমন একটা পচা গন্ধ আসছিল, মাকড়ী বৌ বললে—"তুই সারাদিন খাস নাই, ওহে ইয়াকে একটু জল নিয়ে এসে দে" তারপর ভয়ে ভয়ে বললে, "একটু গুড় হবে—হে।"

গুড় দিক আপত্তি নেই—কিন্তু—নিজে দ্রুত পায়ে গিয়ে—একটু গুড় আর জল আনতে গেল, পাছে বেশী গুড় যায় বলে নিজেই গেল।

কে একজনা প্রশ্ন করলে "তুই কি ভাব, তুই সাঙা করলি আর সে-য়া ভগবানকে পেলেক"—

কথাটা যেন বন থেকে বুনো মহিষের মত বার হয়ে এল, কার ধান ক্ষেত কার ভুট্টা এসব জানে না চিনে না। "আমার শিং যে পথে আটকাবে না সেই পথেই যাব, একথা তার বলা হল না।" কারণ লুহানী এই প্রশ্নের জন্য তৈরী ছিল না, তার যেন অসাবধানতাবশত গায়ে বিচুটি লাগল। সে কাতর দৃষ্টিতে সকলের দিকে সাহস করে চেয়েছিল কিন্তু কেউ কোন লাগসই উত্তর পেলে না। নিঃশ্বাসের শব্দ পর্যন্ত নেই।

এমন সময়ে একটু গুড় শাল পাতায়, যা শাল পাতায় সিঁদুরের মত সামনে ছিল, এবং এক ঘটি জল এনে দাঁড়াল বাঁ হাত দিয়ে পাতাটা নিয়ে লুহানীর মুখের কাছে ধরে বললে, "লে লুহানী কসাই-এ ঢল আসে ঢল চলে যায়—'লে খেয়ে লে" লুহানী একবার গুড়ের দিকে তাকিয়ে সত্যই কেঁদে ফেললে, বললে,—"সে সারাদিন ধূলা খেলে গো। আমি কি মতে গুড় খাব হে—"

মাকড়ী বৌ এবং সমবেত প্রত্যেকে সত্যি কষ্ট পেয়েছিল, সকলের চোখেই মানুষটা ভেসে উঠেছিল। পাগলের মত এটিলা সেটিলা করেছে মাঝে মাঝে বন ঝরানি ক্ষেত ঝরানির তোড়ে জলকে সে পায়ে দিয়ে চমকে চমকে পা ধুয়েছে আবার চলেছে, আর কাকে যেন খুঁজছে, হাটে যেমন লোকে পাই পয়সা খোঁজে। লুহানীর দুচোখে জলের ধারা, তবু সকলের অনুরোধে পাতাটা চেটে চেটে খেয়ে ঘটিটা চেয়ে নিয়ে আলগোছে খেতে যাচ্ছিল, কিন্তু মাকড়ী বৌ বললে—"গলা তোর রোদ লাগা—আলগোছে খাস না—হাতে—খা"... লুহানী একহাত কোষবদ্ধ করে নিজেই জল ঢালতে লাগল। মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে, হাতে মুখ মুছে, আঁচল দিয়ে মুখ মুছলে। তাতে তাকে মনে হল একটু সুস্থ এবং সে পূর্বেকার প্রশ্নের উত্তর মাকড়ী বৌএর দিকে চেয়ে দিল—"আমি স্যাঙা করব" এইটাই কথা নয়; এমনভাবে গলা করেছিল যেন গলায় বুনো আলুতে জ্বালা করছে—।

"স্যাঙা করবি কেনে—"

এদের মধ্যে যদিও স্যাঙা করা আছে, এখন কেমন একটা শুধুমাত্র আলুনি বোধ হয়, এই অপর্যাপ্ত শাল-চিত্রিত জমি সমূহে যারা এবং যারা বালক বালিকা তারা অন্তঃসত্ত্বা দেখলে, ইতরতা করে হাসে না, শাল ফুল দেখলে তারা কখনও যেমন হাসে না। কেন যে স্যাঙাতে সকলেই অবাক হয়েছিল, তার কারণ বোধহয় স্যাঙাতি বড় কষ্টের হয় সাধারণত, কিছুটা পুরুষ মানুষকে ঘর বেঁধেই বড় হাঁড়ি কিনতে হয়। হাটে যদি হয় সে বোঝা মাথায় আনতে হয়। অবশ্য এখানে শঙ্কা ছিল না, একের ভয় আর একের ঘাড়ে যায়। মাকড়ী বৌ বললে—"স্যাঙাতি যদি বড় হাঁড়া না কেনে—তখন"?

সবাই এই বুদ্ধিসম্মত কথায় আবার হেসে উঠেছিল, সবাই মাথা নাড়াল, মাকড়ী বললে, "তখন"...

এরা কেউই লক্ষ্য করেনি যে পাদরী ফ্রান্সিস এত কাছে এসে পড়েছেন, তিনি নিত্য যেমন সকলের খবর করেন আজ দুতিনবার খবর করেছিলেন, মাধালির খবরের আশায় অনেকক্ষণ কুঠিতে বসেছিলেন, এখন অধৈর্য্য হয়ে এসেছেন। এখানকার ভীড় তাঁকে সমীহ করল, একটু সরে গেল। তিনি তাদের বিমূঢ়তা দেখেই বুঝেছিলেন, মাধালি ফিরে আসেনি। উদ্বেগ তখন অল্পবয়সী মেয়েটিকে দেখে দুঃখে পরিণত হল। তিনি ডাকলেন, "লুহানী"।

লুহানী হু হু করে—"বাবা"

মাথায় হাত দিয়ে সস্নেহে বললেন, "ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে...।"

"হ্যাঁ।"

"তাহলে জেনো...সে ফিরে আসছে।"

সবাই চুপ করে রইল।

"সে আমার মনে হয় আমাদের ভুলে গেছে, কেন সে চলে যায় বাবা...তার কি দুঃখ ছিল...অমিত তার সঙ্গে বাটাদারি করিনি।"

"তা বটে..."

"কুথাকে গেছে...পরাণ ঘাটওয়ালের কাছকে...হয়তো দেকো।"...

"দেকো বলনা...নাম বল..."

আর একজন বললে, "ইয়া স্যাঙা করবে বুলছে...তাকে খাওইবে, এ শুনে সে আবার গেছে..."

"খাইবে স্যাঙা করি?" পাদরী বললেন।

"অল্যায় হবে বাবা..."

পাদরী অবাক হয়ে বুনো মেয়েটির দিকে চেয়ে রইলেন, মহিষের শিঙের মত কঠিন, শক্ত, এখন মুখটি তুলে দাঁড়িয়ে রইল। এখানে এতই আঁধারে তার গর্ব যেন তার পা বেয়ে উঠছিল, নিশ্চয়ই সে কখন না কখন স্যাঙা করত; কিন্তু এই কারণে তার স্যাঙা করাটা অনেক অনেক ত্যাগের মাধুর্য্য দেখা গিয়েছিল। লুহানীর মনে হয়েছিল, কারণ এরা যে ভাবে কথাটা নিলে তা অগ্রাহ্য করেই মনে হয়েছিল, সে নিশ্চয়ই এমন একটা কিছু করেছে, যা ঢেকিতে পাড় দেওয়া, মাথায় মাল বওয়া, কাপড়ে সাবান দেওয়া এবং ভাইকে প্রত্যহ খেতে দেওয়া...কারণ মাধালি এক একদিন এত খেয়েছে যে অবশেষে সে হাঁড়ি ধোয়ানি খেয়েছে, এবং চার্চে যাওয়ার থেকে খুব বেশী। নিজের দুর্বল মুঠো সে এই আতিশয্যে বেশী করে চেপে ধরেছিল। "যদি মাধালি সেই পথে যায়...আমার খুব চোখে খুব জল আসবে" পাদরী ফ্রান্সিস একথা বলেছিলেন।

"আপনার কি মনে হয় সে কিছু লাভ করেছে..."

সবাই এ প্রশ্নে বাঁকাচোরা হয়ে গেল। বিশেষত তার স্ত্রী, সে ভাবল সে কিছু বলে এবং একটু ঠোঁটে কথাগুলো সাজিয়ে নিয়ে বললে, "বীজ পুঁতলে গাছ কি গজেই হবে হে...এ কি কথা বল"...

"ঠিক কথা"—পাদরী বললে।

"বৃষ্টি না হলে, লদীতে কি ঢল নামে" আর জন বললে।

"আচ্ছা লুহানী সারাদিন খায়নি, আমার উঠানকে চারটা কলাই সিধা লিয়ে এসো হে পিটার চল...লুহানী ভগবানকে ভুলনা"...

"না...বাবা..."

তারা চলে গেল, মাকড়ীর বৌ সকলের সামনেই বলতে গেল—"কি যে কুথা বল...?"

আর মাকড়ী বলতে গেল—'তুই আমার কথা কাটিস কেনে'...একসঙ্গে দুজনেই দুজনের কথা বলেছিল।

মাকড়ী নিজের গলার আওয়াজ টের পায়নি, তার মনে হয়েছিল তার স্ত্রীর গলার আওয়াজ অত্যন্ত বিকট, সে এত লোকের সম্মুখে নিজেকে হেরে গেছি ভেবে কুপিত হয়েছিল। মাধালির কথায় এই যোগ তার কাছে ক্রমশঃ বিরক্তিকর বোধ হয়। যেমত ঐ সুচানীর যখন বয়স হল, তখন কোথাকার এক পাহাড় তার দেহের মধ্যে আশ্রয় করেছিল, উদ্ভিন্ন যৌবনা সুচানী তার পিঠে বুকে সমান যৌবন ছিল সে গাছের কাছে গেলে গাছ পর্যন্ত রোগা হয়ে যেত, তার বড় বোন তা দেখে রেগে যেত তাকে মন্দ করত, মা আর বাপ রাগ করত, মাকড়ীর বিরক্তি ও সেইরূপ বা হয়ত কালে কালে শাপ হয়ে দাঁড়াবে। সবাই-এর সামনে পাদরী মুখে না বললেও, যেন বিশ্বাস করেন একথা সকলেরই মনে হয়েছিল, মাকড়ী চটপট স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললে—"তুই বাইবেল শুননা"!

"কোন ভালতে নাই...তুই..."

"শুনে ত ভারী হইছে...এখন নিজেকে ক্ষেপাইছ, উয়া কি করে ভগবানকে পাবে, ভগবান তুমার বয়ান করা..."

"আমি কখন বুললাম রেরে...আঙুল ডুবান কথা শুন বিটিছানার" বলে ভারী বিরক্ত হয়ে বললে, "বিটি ছানা তুমরা এ কথা কথা কেনে..." "দেখে...সামলাও হে ল্যাজে পা সরাও হে...ইঃ ইঃ শ দুশ শুনতে পার বল তুমার কথা কথা, আয়নায় দেখে লিয়ে কথা কও" এবার ঠিক ঠিক উত্তর মনে পড়ল—

ভারী দম্ভ প্রকাশ করে বললে, "উ বুঝ তুমরা হে বিটিছানা আলাদা কিহে, আমার কাটলে দুব্বো ঘাস দিব...হাত, মা হলে হত্তুকী দিব...বেলগুটি খয়ের দিব, তোমার টোটকা আলাদা, মিঠাই খেতে আমার মানা—বেশ বল না...ক্ষিধা পাবেহে বেশী বল না..."

সকলে হেহে করে উঠেছিল, একজনা বললে—"লুহানীকে লিয়ে যাও হে ঘরকে"—

মাকড়ী বৌ বললে—"আমি উয়াকে লি যাব, বলে," বললে "চল লুহানী তুয়ার ঘরকে আমিও থাকেব, দেখি বিটিছানা না হলে কি রকম চলে হে" বলে সে আর দাঁড়াল না।

দল ভেঙে ফিস ফিস শুরু হল, পিটার চলে গিয়েছিল লুহানীদের সঙ্গে দলের প্রত্যেকেই সামনে এই বচসা কখন থামবে একথা ভেবেছিল! কারণ সব বড় প্রশ্ন লুহানীর আবার স্যাঙা করার প্রশ্ন। লুহানী চলে যেতেই এখানে একটা স্বস্তি এল, একজনা, সম্ভবত লৈবীর গলা শোনা গেল, "স্যাঙা ত করল, কিন্তু মাকড়ী বাড়িয়া উয়ার লোকটা যদি আবার এসে উয়ার দরজায় দাঁড়ায়"—সকলেই এ কথাটা মন দিয়ে শুনলে; মাকড়ী এ কথা শুনতেই নিজে বিরক্ত হওয়ার কারণে এই কথা চাপা দিতে চেয়েছিল, কিন্তু কথার মধ্যে কি যেন ছিল; ডিমেলী মুরগীর মত কোঁ কোঁক করে খড়ের গাদা থেকে নেমে এখানে ঘুরে উখানে যায় এখনি ডিম পাড়বে বলে। তেমনি শব্দটা তার কানের কাছে এসে ঘুরছিল।

"যদি তার হাতে আয়না থাকে, ঘুমসীতে বাঁধা বালা থাকে, কাছায় বাঁধা টাকা আর গহনা থাকে, কাঁধে লৈতুন কাপড় থাকে...লৈতুন কাপড়ের আঁচলে মশল্লা থাকে তাহলে তার দরজাকে এসে বলে, 'আমি এলাম হে, ধূলা মেখে'...মনে নাই শীতের কোড়া যেমন এসেছিল, আসার আগে হাটে দাড়ি কামিয়েছিল, মাথায় তেল দিয়েছিল..."

পর পর এত কথায় সকলের মন একটু একটু তৈরি হয়েছিল, সত্যই যদি লুহানীর মানুষটা আসে তাহলে, সে কি ঘরে যাবে, না আমতলায় লয় পাদরীর কুঠিতে রাত কাটাবে! অর্থাৎ তখন লুহানীর দশা কি হবে।

ফলে মাধালির কথাও এসে পড়তে পারে।

মাকড়ীর কথাটা আরাম লাগলেও বলেছিল, "দু উয়ার কাগজ আছে...কাগজ"...এ কথায় লৈবীর দিকে সকলেই একবার তাকাল।

প্রত্যেকেই লুহানীর স্যাঙা করা নিয়ে অনেক ভেবেছে, নিজের হাঁটু দুটো জড়িয়ে ধরে অল্প অল্প দুলেছে আর ভেবেছে, আবার নূতন করে সংসার। কেউ ভেবেছে যদি ভাল দুচারটা গীত জানতাম, চার্চের গান নয়, কেউ ভেবেছ যদি বাঁশী জানতাম...। যে কদিন মাধালি আসেনি সকলেই নিজেকে ভুলিয়ে লুহানীর বাড়ীর ধার দিয়ে গেছে। মাধালি আর কত খাবে, এইত সে আজ কদিন ঘরে নেই। না খাবার জন্যে হিসাব সোজা হয়েছে, আশা করা সহজ হয়েছে এবং দেখছে কখন সে, যদি উনুন ধরিয়েছে পাতার ধোঁয়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে কখন দরজায় কখন টিলাতে বসে সমস্ত আকাশ বাতাসকে বিষাদে পরিপূর্ণ করেছে। চুল তার গোদা চিলের ডানার মত হয়েছে; কেউ কেউ তার আশপাশ দিয়ে যাবার সময় গান গেয়ে উঠেছে, গানটার মধ্যে কুঞ্জবন ছিল, সাজানোয়া ছিল, বাসা বাঁধার কথা ছিল, কেউ কেউ বাঁশী বাজাবার চেষ্টা করেছে, কেউ উরুতে তেল দিয়ে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করেছে। সে শুধু ভাই-এর জন্য কেঁদেছে।

মাধালি নিজের কথাই ভাবছিল। এই বিরাট খোলার মধ্যে ফুল তোলা ব্যাপৃত মন যেমন বহু বহু দূর যায়, সেই সকল দূরত্ব এখানে এক হয়ে আছে। আর সে অতিক্রম করছে, যেখানে বসেছে, তখনই তার এক কথাই মনে হয়েছে, তার যেন ভিতরটায় কিছু নেই। শুধু সে সত্যই কুকুরের মত হয়ে আছে। কে যে একথা কোন সূত্রে বলেছিল তা আর খেয়াল হয়নি, কানে-খোলা মাঠের হাওয়া যখন সন্‌সন্‌ করছে, সে দাঁড়িয়ে একথা ভাবতে চেষ্টা করেছে; শাল গাছ আর রাস্তা আর ক্ষেত সব কিছু তাকে যেন বিস্ময় দেখায়নি। যতবার সে একটু বসতে গেছে ততবারই অভুক্ত দেহের মধ্যে কি যেন লাফিয়ে উঠেছে। সত্যিই সে দুঃখিত চিত্তে কেমন একটা শব্দ করেছে, বিলাহীর ছেলে যেমন অন্য কোন বলশালী ছেলের সঙ্গে লড়বার সময় শুধু কান্নার শব্দ করে আর লড়ে তেমনি শব্দের অনুকরণ করে পাশের ঢেলা দূরে ছুঁড়ে ফেলেছে, আবার উঠে দাঁড়িয়েছে। "আবার এক জায়গায় কিছু এমন দেখি যা আমাকে বিমোহিত

করে” অন্যপথে চালিত করে তা তার সত্যই মনে ছিল না। এই কুকুরকে বয়ে বয়ে বেড়াতে তার ভাল লাগছিল। তার মন সবসময় অভ্যেসবশত এ কয়েকদিনের কথায় একটি মানুষকে সব সময়ই তুলে রেখে ভাবছিল। যে তার দিকে অসম্ভব ভাবে চেয়ে থাকে, যেমন করে চেয়ে থাকে, বন্য মহিষ যখন তার শিঙে লতা পাতা জড়িয়ে যায়, ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাস ফেলে আর নীচু মাথা থেকে উপর দিকে চেয়ে থাকে। আবার একটু তার দিকে চাইলেই পাহাড়ের মত দূরে দূরে যায়। পাহাড়ী রাস্তায় নেমেও ছিল কিন্তু কি জানি কি ভেবে ডান পা দিয়ে বাঁ পা কে এবং বাঁ পা দিয়ে ডান পা কে লাথি মেরেছে—এবং অন্য পথ ধরেছে।

কোথায় তার নিজের কাছে দ্বিগুণ হবার ইচ্ছে হয়েছিল এবং সেই ইচ্ছাকে ফলবতী একা সেই মেয়েটিই করতে পারে, এবং সেই জোরে সে ভগবানের রাস্তায় যেতে পারে। একথা যেমন আংশিক সত্য, তেমন তার থেকে বেশী সত্য আর কিছু ছিল যা তার গায়ের উপর লাফালাফি করে বেড়াচ্ছিল। তবু মাধালি এখানেই মাধালি যে লাথি মেরে চলে এসেছে, কিন্তু নিজেকে বাড়িয়ে নিতেই হবে। যার জন্যে সে রৈবতী ছাড়ল, সেখানে কেউ তার কোন কথা জানে না। এই একটি দিনে সে নিজের সমস্ত কিছু ভুলেছিল, এখন কত শুকনো কথার মত তার ঐ দিনগুলো হয়ে আছে। তার সেই জ্বর চাই, এই ভয়ঙ্কর রক্তকে থামাবার জন্য তার জ্বরের একান্ত প্রয়োজন, কত পাতাকে বার বার সে দেখেছে, হয়ত ওখানে কিছু লেগে থাকতে পারে, কোথাও কিছু নেই। আবার আড়চোখে সে যখন দেখছে, ক্ষেত ঝরানির পাশে একটা সোনা ব্যাঙ, মাথায় তার ধানের মত রেখা চুপ করে বসে আছে পাশ দিয়ে সুস্থির নিঃশ্বাসের মত জলপ্রপাত, জলজ ঘাসের মধ্যে ব্যাঙাচি অদ্ভুতভাবে মুখ খুলছে, আবার বন্ধ হচ্ছে, নিবিষ্ট মনে মাধালি দেখছিল।

হঠাৎ সে মাধালিকে কোন সময় না দিয়ে বড় হাঁ করে কি একটা পোকা খেলে, মাধালির নাভির নিকটবর্তী স্থান চমকে উঠল, অসম্ভব ক্লান্ত হয়ে গেল সে পা ছড়িয়ে বসে কি যেন এক আরাম আনন্দর জন্য অস্থির হয়ে উঠল, সারা দেহে যদি কেউ পালক বোলায় যেন শান্ত হতে পারে। তার ইচ্ছা হল বিদ্যুৎবেগে এক হাতের ভর দিয়ে সে উঠে পালায়। তবু তার চোখে ভাসছিল যে খেল,...“আর আমি সেই আমি পাগল হলাম, যে আমি! নদীর ধারাকে ফুলের সঙ্গে এক করে ভাবতে পেরেছি, যে আমি মেঘকে আকাশের গা থেকে এনে শালপাতার পাশে কাঠবেড়ালীকে দিয়েছি! কারণ তাদের কাঁদবার জল নেই।” কখন সে বিদ্যুৎবেগে উঠে পড়ে পিছনের শালবন ফেলে ঢালু রাস্তা দিয়ে টলতে টলতে নেমে গেছে...সে কথা তার অনেক বাদে খেয়াল হল। ভেল্কীকার যেমন হাটে ভেল্কী দেখাবার আগে তার ডুগডুগী বাজায় তেমনি সারা দেহে এখনও কে যেন ডুগডুগী বাজাচ্ছে আর সে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলছে। মেলায় একদল লাচনী এসেছিল, তাদের কাছে গ্যাসের আলো ছিল, এ আলোর থেকে বেশী আকর্ষণীয় তাদের...হাত ধরে ঘুরে ঘুরে নাচ, তাদের একটা কানা লোক ডুগী তবলা বাজায় সেও যেন স্ত্রীলোকের মত তার মুখেতে যাদু এসেছিল। গান শুনে সমবেত লোকেরা আহ্লাদে এ ওর ঘাড়ে পড়েছে, জড়িয়ে ধরেছে, আর নানারূপ জন্তুর শব্দ করেছে আবেগে, বনেও অত প্রকার জন্তু নাই যত প্রকার আওয়াজ। আজ এই মুহূর্তে চুল শুকানো রোদে তার মধ্যে সেই অসহ্য চীৎকার সে শুনতে পেলে, সে টাল সামলাতে না পেরে, ছোট সেগুন গাছের ডাল ধরে ফেলেই বেঁকে গিয়ে সোজা হয়ে উঠল, হাঁফাতে লাগল ‘সেবার বনেও আমার এ রূপ হয়নি আজ কেন এমন হয়’ বিল্লি আঁচড়ে তার রক্ত যেন ক্ষত বিক্ষত। দাঁতে দাঁত দিয়ে মাধালি একবার একটি সুন্দর নিঃশ্বাস ফেলে, সে নিঃশ্বাস একটি প্রশ্ন এনেছিল, ‘তুমি কতদূরে!’ এ নিঃশ্বাস ছেড়ে দিয়েই সে বোকার মত এদিক সেদিক তাকাতে লাগল কোথায় গেল, যার মধ্যে একটি শিশুর করযোড় ছিল। দূরে ধুতুরা, অদূরে আকন্দ, কোথাও আর কিছু নেই। তারপরই—কি ফুল হলুদ হয়ে আছে, চ্যাবড়া মনসার ফুলের মত। কালো ভ্রমর বসে, মাধালি দুবার দেখেই ফিরিয়ে নিল ভ্রমরের নড়া তাকে হিম করে এনেছিল, সে বুঝতে পারছিল তার দেহে থেমে যাওয়া চাকা আবার ঘুরবার জন্যে শব্দায়মান হয়ে উঠছে। সে আর দাঁড়াল না। নিজেকে আর কুকুর ভাবতে তার আর ইচ্ছা নেই। সে ভাবল...‘না আমি দৌড়াই...আর আমি কোন দিকে চাইব না, আমি আকাশের দিকে চেয়েই পথ চলব।’

অনেক দূর পর্য্যন্ত সে কোনদিকে তাকায়নি একবার তার মনে হয়েছিল যে ফ্রান্সিস পাদরীকে

জিজ্ঞাসা করেছিল যীশুর শেষের কথা কিন্তু তার গলার আওয়াজটা তার মনে নেই, সামনে আর একটা লোক ছিল যার কথা মনে হতেই সে সব ভুলে গেল, দুঃখিনী লুহানীর কথা সে মনে করেছিল, তার অঙ্গীকার শুনতে পেয়েছিল, তার রাত্রের গল্প যীশুর শেষের কথা। কিন্তু সে গলায় কোন আশ্চর্য্য ছিল না, হয়ত মাধালি এর জন্য খুসী হয়েছিল। তার কারণ আড়ে আড়ে নিজের ভিতরটা বৃদ্ধের মতই চোখ নিয়ে চেয়েছিল, চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে ভীত হয়েছিল।

আবার সে দেখল মাটি দিয়ে একটা পাখী (শালিক) লাফিয়ে লাফিয়ে যাচ্ছে, পাখীর লাফান মাঝে মাঝে ঠোঁট খোলায় সমস্ত জমি যেন সোজা হয়ে উঠে ফড়িংকে বাধা দান করছে, এমনকি চোরকাঁটা যেন তাকে ধরবার চেষ্টা করছে, এবার ফড়িংটাকে শালিক ধরে অসম্ভব ব্যগ্রভাবে নাড়া দিলে ফড়িঙের পুচ্ছ পাখনা কাঁপছে, আবার নাড়া দিলে শালিকের চোখের পাশ দিয়ে যে হলুদ রেখা যেন লাল হয়ে গেল। আর মাধালিকে ক্ষেপিয়ে তুললে, বিকারগ্রস্ত মাধালি প্রকাণ্ড স্বর উত্থিত করতে গিয়ে পারল না, সে আর তার রক্তের গতিরোধ করতে পারল না, সে হাতের মুঠোয় যা পেলে, দু' একটা ছোট পাথর তাই মুখে পুরে দিলে এবং চোখ বন্ধ করল। তারপর অনেকক্ষণ কেটে গেছে, যখন সে ক্ষেত ঝরানিতে অনেকক্ষণ গা ডুবিয়ে বসেছিল, আর সব সময়ে আশা করেছে "এখান থেকে আমি আর উঠব না, আমি এখান থেকে তাঁকে ডাকব।" ক্রমাগত জলস্রোত বহুলোকের আওয়াজ শুনতে পেয়েছে, কখন বলেছে "আমি কি মেঘের শব্দ যেমন কেঁপেছি, সবুজ ধান ক্ষেত আমার মনে হয়েছে একটা নরম মই-দেওয়া জমির মত, সমস্ত কিছুতেই আমাকে স্মরণ করিয়েছে আমি পুরুষ ছাড়া কিছু নই; সৌভাগ্যবশতঃ জল ছিল, আমি বেঁচেছি!" নিজের ক্ষমতা যা নিজের দেহকে অত্যন্ত দুর্বল করেছিল, সে ক্ষমতাকে সে শুধু ভয়ই পেয়েছে, 'যে তুমি আমার মধ্যে প্রবেশ করেছিলে যার আমি জামা হয়ে আছি; সত্যি কি তা মিথ্যে। যদি তাই হয় তাহলে আমি কি করে এমন পাগল হলাম।" ক্রমশ এখানে অন্ধকার করে আসছিল মাধালি, যেন প্রাণ ফিরে পাচ্ছিল, এই নির্মল পৃথিবীকে আর তার দেখতেই হবে না।

কাপড় আর খুলতে সাহস হল না। নিজের দেহ তার কাছে ক্রমে ভয়প্রদ অন্তত সে ভাবছে হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে আর দেরী না করে ক্ষেতের পথ থেকে উঠে; দক্ষিণের পথ ধরল এপথে বহুদূরে কুমারী নদী। আমি আর এক মুহূর্ত থামব না বলব না। বৃষ্টি তাকে যেন আর সমস্ত কিছু ফিরিয়ে দিয়েছিল। রাস্তায় যেতে যেতে তার ফ্রান্সিস পাদরীর কথা মনে হল, বাবা কেন আমার কথা কিছু প্রত্যয় করল না, এ কথা বারবার তার মনে হয়েছে, বেশ আমি তাঁকে লাভ করি এবং আমি দেখাব, মাধালির রাগ হয়নি অভিমানই হয়েছে, বারবারই তার মনে হয়েছে। "আমি তাঁকে ডাকব"...কিন্তু কোথাও সে বসতে পারল না, আজ তার ভয় হলেও বনের অভিজ্ঞতা তাকে খানিক সাহস দিয়েছিল। রাত যখন উঠল তখন রাত হয়েছে, তবে বেশী বাজেনি। দু একটি গ্রাম থেকে লোক প্রশ্ন করেছে, 'কোথায়' সে কিন্তু কোন উত্তর দেয়নি।

কুমারীতে ঢল ভালভাবে ছিলনা মাঝে মাঝে বড় বড় পাথরগুলো জেগেছিল। নদীর শব্দ ভেদ করে মাঝে মাঝে পাপিয়া জেগে উঠছে, আর হাওয়ার সোঁ সোঁ শব্দ, মাধালি পাথরের উপর পা দিয়ে দিয়ে ঠিক মধ্যখানে গিয়ে যখন চারিদিক দেখে তার গা যেন হিম হয়ে গেল, সে দেহর জন্য সারা পৃথিবী যেন ব্যাকুল হয়ে উঠল। এই পৃথিবীতে ছিল অনেকেই, যারা বলেছে, আমরা সমস্ত ধান নদীগর্ভে দেব, আমরা তোমাকে চাই। আমরা অভুক্ত আছি চিরকাল থাকব কিন্তু তোমাকে চাই। মাধালি কাল পাথরটার উপরে আস্তে আস্তে বসে পড়ল। ঘামে তার শরীর ভিজে ছিল, দম নেওয়া নিঃশ্বাস তখন পড়ছে। ঘুমন্ত হাওয়া কানে সোঁ সোঁ করে বাজছে। মাধালি জলে পা ডুবিয়ে দিল, জল পান করে আবার বসল।

সে স্থির হল। রৈবতীর কথা তার মনে হল, "ফাঁকা রাস্তা ভিন গাঁয়ের গরুর গাড়ী যাচ্ছে, চালক হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছে, কুকুরগুলো চীৎকার করছে কোথাও কেউ নেই। লুহানী হয়ত এখন সেই ছোট গামছাটা পরে চেটাইয়ে বসে কাঁদছে, মাকড়ী নিশ্চয়ই কিছু বিশ্বাস করেনি, বেশ আমি এবার সমস্ত দেহ ছড়িয়ে ক্ষতবিক্ষত করে যাব, দেখি তারা বিশ্বাস করে কিনা।" বলে...শুয়ে সে একবার আক্রোশে নিজের গালটা ছাড়িয়ে নিতে চাইল, কিন্তু একটুতেই এত জ্বালা যে, সে নিজের গালে হাত বুলাতে লাগল। "কিন্তু এতে কি হবে" সে ভাবল। একবার মনে হল, কাকে একটা কি বলে এসেছে..., সঙ্গে সঙ্গে ভীত হয়ে চোখ বুজলে, কতকগুলো কথা মানুষের মত চেনা যায়, যা ক্রমশঃ মাথা চাড়া দেয়। সে যেন আর ভাবতে

পারল না, তবু অনেক বাদে মনে হল 'ভগবান' কথাটা খুব বড় হল না কেন, আকাশের থেকে পৃথিবীর থেকে—যাতে আমি জন্ম ভোর উচ্চারণ করতে পারতুম। রৈবতী থেকে কসাই, কসাই থেকে দামোদর থেকে সুবর্ণরেখা ফিরে যেতুম তবু নাম শেষ হতনা, আমার ভয় থাকত না সমস্ত সময়ই আমি একটু একটু উচ্চারণ করতুম।' নিজে এই কথাটা ভাবতে পেরে খুব ভাল লাগল, কাঁধের কাছ দিয়ে মুখটা মুছতে একবার তার গা সে শুঁকে দেখেছিল।

সে যেন কখন ঘুমিয়ে ঢুলে পড়েছিল তা সে জানেনি, যদিও সে অল্পক্ষণের জন্যই ঢুলেছিল তবু তার মনে হল অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। অনেক তারা ম্রিয়মাণ হয়েছে একবার মনে হল, সে যদি না জাগত তাহলে বড় ভাল হত। একটা দিন কেটে যেত এবং সে ইচ্ছে করলে রৈবতী ফিরে যেত বলত, 'আমি সারা রাত তাঁকে ডেকে ফিরেছি, তোমরা পাদরী বাবা আমার কথা মান।' আনন্দে সে অস্থির হল, কিন্তু তারা যদি বলে, "বেশ তুমি মানলাম তাঁকে ডেকেছ, বেশ এখন তুমি বল কি সত্য পেয়েছ। আমাদের ধান যাতে বাড়ে, তা কর, আমাদের ছাগল মুরগী চরতে চরতে হঠাৎ বসে পড়ে"...মাধালি এ প্রশ্নে নিজেই বোকা বনে গেল; নিজেকে ধিক্কার দিলে। যদিও সে জানত নদীর এই তোড়কে, বাঘ ভারী ভয় করে তবু ভাবলে যদি তুলে নিয়ে যেত! "কে আমাকে রক্ষা করলে। আমি তাকে একবারও ডাকলাম না।" সে হাঁটু গেড়ে বসতে গেল, যেন অসুবিধা বোধ করলে, ঢালু পাথর এতে সে ঠিকভাবে বসতেই পারল না, শুধু সময় ক্ষেপের জন্য এখন একভাবে চেষ্টা করেছিল। এমনি বসে সে ডাকবার যুতই পেল না, যতবারই ডাকতে যায় ততবারই তার মন বিক্ষিপ্ত হয়। আর ব্যাঙ আর ভ্রমর আর শালিকের চোখের সে ভয়ঙ্কর রেখার কথা মনে হয়—জলস্রোতের তোড় এখন প্রথম রাতের থেকে কম, তখন যেমন পাথরের গায়ে লেগে জলকণার মেঘ সৃষ্টি হয়েছিল এখন তেমন নেই। মাধালি চুপ করে রইল। "ভগবান মনে করতে গেলে এত বেশী খারাপ কথা মনে পড়ে তা সে জানত না, ফ্রান্সিসদের তাই হয়"—ভেবেছে তার অভিজ্ঞতা কারো কাছ থেকে জানতে হবে।

জল-শব্দ ভেদ করে পাখীর শব্দ এল। এখন সমস্ত দিকে ধূসর ভোরের হাওয়া মাধালির বড় ভাল লাগল। অনেকদিন পর আবার সে সারা রাত জাগল, এক জায়গায় বসতে পেরেছে, এবার এই ভোরের আলোয় নিঃসঙ্কোচে সে ভাবতে পারবে। সে একবার গির্জার কথা মনে করবার চেষ্টাও করেছিল প্রার্থনার শেষে সে যেমন একটি কথা বলে এসেছে তেমনি আজও বললে 'আমেন'। প্রার্থনার অর্থ তার কাছে কিছুই নয়, চোখ বুজতে হয় আর 'আমেন' বলতে হয়।

এ ব্যাপারে সে কাউকেই লিপ্ত হতে দেখেনি, মাকড়ী শুধু লা থলেতে তুলেছে আর মাঝে মাঝে দাওয়ায় খোলা বাইবেল থেকে দু এক লাইন পড়ে, আবার কাউকে নুন বেচতে গেছে। অন্যান্য আর সকলে ভাত পাচ্ছে না বলে বিমূঢ়, কাঁদবার সময় পায় না তারা কি জানবে—! যদি সত্যি কাউকে সে চোখের সামনে দেখত ফ্রান্সিসকে সে গির্জা ঘরেই দেখেছে, বাইবেল হাতে দেখেছে, মৃত্যুর শিয়রে, কবরের পাশে সেখানে মাটি পাহাড় হয়েছে পাদরী সাহেবের গা খসে গেছে, আর সকালের আলোয় কি সব বলেছে, নিজে একটু মাটি ফেলেছে। ছোট ছেলেরা মাটি ফেলবার জন্যে হুড়োহুড়ি করেছে, ফিকফিক করে হেসেছে। সেদিন লুহানীকে বলেছিল, "আমার মাটির সময় কাউকে যেতে দিবি না।" নীচে চেটাইয়ে যে লাশ বাঁধা তার গায়ে অজস্র মাটি পড়েছে। তবু ধন্যবাদ দিয়েছে যে ভগবান আমাদের ডাকবার ক্ষমতা দেয়নি তাঁকে অজস্র ধন্যবাদ দিয়েছি। রোদ আসার সঙ্গে সঙ্গে মাধালি যেন সাবালক হয়ে উঠেছে। রাতব্যাপী যাকে ছোট করতে ভরসা হয়নি তাকে এখন, হাতের মধ্যে সে চেপে ধরতে পারে, কিন্তু যা কিছুই ভাবুক ভীত হয়েই ভেবেছে...। এই নদীর মধ্যে বসে সে তার দেহটাকে দেখে নিয়ে কেমন যেন ক্ষেপে উঠল, যেমন ধানচোরকে ধরে লোকে দু ঘা দেয় তারপর গায়ে থুতু দেয় তেমনি সেও নিজের গায় থুতু দিতে গিয়ে থেমে গেল।

যখন বেলা বড় তখন সে এসে থামল যেখানে, সেটা হুড়তির পথ বুলডার হাটে পড়েছে। একবার ভাবল সে এ পথে যাবে কিনা, হুড়তির পথেই অদ্বৈত মিশ্র বসে থাকে। অদ্বৈতের কথা মনে করতেই তার খালি পেটটা কেমন চমকে উঠল। একবার ভাবল পূবের ধান ক্ষেত দিয়ে পাহুড়ীর বাঁয়ে রৈবতী যাই। কিন্তু তার ফুলডা হয়ে সুবাই-এর ওখানে যেতে হবে, কারণ একমাত্র তার কাছে সে জানতে পারবে সে কি একটা ভাল কথা বলেছিল, যা সে সারাদিন মনে রাখতে পারত।

কিন্তু এ পথ মই-দেওয়া রাস্তার নরম। জলের মত থেমে গেছে, পায়ের তলায় তা যেন ক্রমাগত অনুভব হয়; দ্রুতগতি স্রোতে যেমত দেহের কোন সাড় থাকে না তেমনি কিছু নেই। তার পা একটি শুষ্ক পাতা বৈ অন্য নয়, এ দেহে যেন শাপ কিছু করে না, ছোট পাথরে শুধুমাত্র ঠেকে আছে, দু প্রকারের নিঃশ্বাসের মধ্যে। মাধালি চোখ ছোট করে, জিবের মত সাদাটে লাল রাস্তার দিকে চাইলে অনেক শাল অনেক—ফাঁকা শালের তলায় কে একজন বসে আছে, কালো ছাতাটা গাছের ডালে ঝুলান। নীচে একটা স্বরবর্ণের মত! মনে হল লোকটি মুখ ঘুরালে। সঙ্গে সঙ্গে মাধালি যেন হিহি করে কেঁপে উঠল, নিজের হাতটাও সে দেখছিল পাশে ছোট বনে ফুট ফুট করে পাতা ভাঙে, ভালই হয়েছে কতগুলো নগ্ন শরীর দেখা যায়নি—একবার একবার কোথাও তাদের হাত দেখা যাচ্ছে। মাধালি সে দিকে তাকিয়ে চমকে উঠেছিল। আবার সাহস করে দূরের গাছতলাটি দেখল।

রোমনির কথা তার মনে করতে হল। এ কথাই একদিন প্রতিনিয়তই কোন না কোন সূত্রে বলছে। এমনকি যখন প্রার্থনারত মেয়েটিকে দেখেছিল গির্জাঘরে, যার চোখের জলের ফোঁটার মধ্যে বাস করতে ইচ্ছা হয়েছিল, দেশে আকাল নেই দিন সেখানে বালকের মত মানুষের হাত ধরে থাকবে, সে ক্ষেত্রেই মনে হয়েছিল, রোমনির কথা। মাধালির মনে হল রোমনি বলে কি কিছু আছে সত্যই, না সে ভূত—! যা সে নিজে বিশ্বাস করে না, চোর ডাকাতের মতই, গৃহী হয়েও বিশ্বাস করে না। সত্যিই সে ভূত হলেও যে কোন মুহূর্তে যখন তখন দেখা দেয় কি করে। প্রতি মুহূর্তে দেহ বিস্তার করে, চুলে আঙ্গুলের সোহাগ দিতে বলছে, আর কিছু নেই! মেঘ গর্জনে যখন উন্মত্ত, ব্যাঙ যখন মুখ ব্যাদন করেছে, ভ্রমর যখন তার দেহটা ঢেঁকির মতই নামিয়েছে উঠিয়েছে, অথবা সেই ভয়ঙ্কর শালিক। এ সকল কথা তার চোখের সামনে এসে তাকে বিমূঢ় করেছিল হঠাৎ হোঁচট খেতেই দেখলে, যে, ঢালু জমি বেয়ে বেশ কিছু পথ অতিক্রম করে এসেছে, দেখেই সে যেন আঁৎকে উঠেছিল। সে অনেকটা দৌড়ে এসে পশ্চিম দিককার এই ছিটে জঙ্গলে বসে হাঁফাতে লাগল। নিজে যে এমন হন্যে হয়ে কেন বেড়াচ্ছে তা তার অনেকবার মনে হয়েছিল, এবং জোর করে অনেকবার আজ সকালের আলোয় শিকারের দৃশ্য সে দেখেছে, আজ শুধু তার চোখের পাতাই পড়েছে তা টের পেয়েছে। রাতে এ নদীর উপরে যা তার করা উচিত নয়, সে ভেবেছে এই নদীর দেবতারা অনেক সত্য যুগের কথা জানে এরা তা বলতে পারে কিন্তু যতবারই স্রোতের দিকে তাকিয়েছে মনে হয়েছে সোমত্ত গাভী যেমন সোরঝার চরানির মাঠে পাথরের উপর রোদ পড়েছে দেখে লাফালাফি করে, অস্থির হয় ন্যাজ তুলে দৌড়তে দৌড়তে এসে গুঁতোয় তেমন এই জলরাশি। প্রশ্ন করতেও পারেনি উত্তর পায়নি, একমাত্র পারে এ সকল কথার উত্তর দিতে বিরাশী পাটিদার নিশ্চয় পারত, সে অনেক দেশ দেখেছে। মাধালি অনেক রকম করে এ সকল কথা ভাবতে চেষ্টা করলে, কারণ সর্বক্ষণ তার দেহের চারিপাশে গাছতলার অক্ষরটি ঘুরছিল। এত বাস্তব হয়েছিল যে সে নিজের মাথা বাঁচানোর জন্য হাত দিয়ে তা তাড়াবার চেষ্টা করলে উপরে ডালে পাতা ঘেরা পিঁপড়ের ডোলটি দেখে মনে হল, "ডোলটি ভেঙেদি আমার গায়ে পিঁপড়ে পড়ুক সে ঢের ভাল, পিঁপড়েগুলো কামড়ে আমায় অস্থির করে তুলবে; তবু অদ্বৈত মিশ্রর থেকে...কুষ্ঠ রোগীর থেকে তো ভাল।"

নিজে ভীষণ জোরে ঘুঁষি মারল, তার যেন কাঁদতে ইচ্ছা হচ্ছে। এই লোকটির জন্যেই রোমনি আজ দুক্রোশের পথ যেন... বিছের চোখের মত হয়ে গেছে, ভেদ করা অসম্ভব। মাধালি ছেলেমানুষের মতো কোপ প্রকাশ করলে, লোকটা আমায় ক্রেস্তান বলেছে...কোন সময়েই স্পষ্ট কথা বার হলনা, ঠোঁটের পিছনে ভু ভু শব্দ হল। কারণ নিজেকে আয়না বিনা এত স্পষ্ট দেখা যায় তা সে ভাবতেই পারেনি, সে দাঁড়িয়েছিল, অদ্বৈত মিশ্র বসে সে তাকে বলেছিল...কথার আওয়াজ—"যেদিন আমি তোমাকে জড়িয়ে ধরতে পারব, সেদিন ভগবান পাব," কথাটা তাকে পুড়িয়ে দিলে! শুধু ওখানে সে বসে আছে বলেই কথাটা মাধালিকে বড় বেশী যন্ত্রণা দিতে লাগল। বুক তার এখনও চওড়া, কোনরূপ ভ্রূ কোঁচকান তার সহ্য হয় না। সে শুধু যদি মাটিতে দাঁড়িয়ে বলে, ওই বেলটা দেখেছি তার মানে আমার ওটা, কোন লোক এ থানায় নেই যে তার কথা সমীহ না করে। কোন লোকের পাশ দিয়ে গেলে সে ধন্য হয়। সেই মাধালি কিছুতেই নিজের অঙ্গীকার ছাপিয়ে উঠতে পারলে না, তার কারণ রোমনির সামনে আড়াল করে ভয়ে নিজেকে জড়াতে ইচ্ছা হয় তার নখের ভিতরে যেন কাঁটা ঢুকেছে, তার গলার ভিতরটা স্কন্দ

খেলে যেমন গলা জ্বালা করে তেমনি এবং সেই কারণে লোকে হলুদ মাটি খায় (সাজি মাটি) তেমন তার ইচ্ছা হল। হঠাৎ সে দাঁড়িয়ে উঠল, "পিছন দিক থেকে গিয়ে বামুনের গলাটা টিপেদি", তার গা কেঁপে উঠল..."না একটা হেঁতেল যদি পাই আমি তখনি গাছতলার অক্ষরটাকে শেষ করেদি। হেঁতেল না হোক একটা মোটা ডাল। কত লোক কাঠ কাটছে, একটা ডাল দিবেনা আমাকে কি চিনবে না, না হয় কুড়ুল দিক আমি কেটে নেব!"

অদ্বৈত মিশ্রর ঠিক সামনেই রাস্তার ওপারে চালের নীচ থেকে উঠা দোনা ফুলের ঝোপ, নিসিন্দে আতা, অনেক অনন্ত মূল এক সঙ্গে বেয়ে উঠেছে, মাধালি এখানে এসে দাঁড়াল, হাতে মোটা একটা কচি গুঁড়ি দাণ্ডা। কাঠুরেরা বলেছিল এমন কাজ করনা, বনদেবতা রুষ্ট হন। কচি গাছ কেটনা, তারা কুড়ুল দিয়েছে এবং বলেছে তারা...হে বনদেবতা, বলে আকাশের দিকে চেয়েছে তাদের চোখ ছোট হয়েছে, সে উত্তরে বলেছে—"আমি মাধালি কিস্কু"। প্রথম কোপ তার মাটিতে পড়েছে দ্বিতীয় কোপ পিছলে গেছে, তখন পরিশ্রমে অভুক্ত দেহের কথা স্মরণ করে কাঠুরেদের দিকে তাকিয়েছে। কাঠুরেরা যোড়হাত করে এ নির্মম দৃশ্য দেখছিল; তাদের দিকে তাকিয়ে মাধালি হেসে জোর কোপ মেরেছে, ডালটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পাখী থমকে এঁকে বেঁকে গিয়েছিল। আবার কুড়ুল মেরে উপরের খানিকটা বাদ দিয়ে মাপসই করে দেখে নিয়ে, কুড়ুল ছুঁড়ে দিয়ে, "হাঁ" বলে একটা আরামের শ্বাস ত্যাগ করে, পাতা আর পলকা ডাল ছিঁড়তে ছিঁড়তে এগিয়ে গেছে। বেশ করে দেখে নিয়েছে যুতসই কিনা, তার হাতে শিরা ফুলেছে মাংস পেশী শক্ত হয়েছে, মেরুদণ্ড বর্দ্ধিত হয়ে মাথায় সেঁদিয়েছে। সামনে দেনা ঝোপ এখানে দাঁড়িয়ে দুহাতের মধ্যে দাণ্ডা, পায়ে তার পিঁপড়ে উঠেছে বুঝতে পেরেও অনড় নিবিষ্ট। পা দিয়ে সে পিঁপড়ে সরিয়ে দেবে এমত সময় নেই। পাতার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে আছে, রাস্তার উপরে খানিক দূরে শাল গাছের তলায় অদ্বৈত মিশ্র, প্রতীয়মান গাছে হেলান দিয়ে পথের দিকে চোখ নামিয়ে পাশ দিয়ে অজস্র মোটাসোটা শিকড় নেমে গেছে ছেঁড়া ছাতা ঝুলেছে। মাধালি একবার স্থির করলে এবং বললে "এত দেখার কিছু নাই", খুনের রক্ত তাকে স্থানচ্যুত করেছিল বলে সে পিছনে তাকালে, কেউ কোথাও নেই। রাস্তায় সম্ভবত কেউ নেই। সে এবার ওদিকে তাকালে, অদ্বৈত বিরাট একটা হাই তুললে, তুড়ি দিয়ে আবার আর একভাবে বসল। তার রুক্ষক্লিষ্ট মুখ এবার স্পষ্ট তার চোখে পড়ল, অদ্বৈতর ঘাড় ঈষৎ কাত করা দুঃখময় মুখটি দেখে যে গায়ের উপর দিয়ে রক্ত চলাচল করছিল এবার রেরে করে যে মাধালি এগিয়ে যাবে ভেবেছিল সেই মাথাটার পালক আহত হাওয়া এসে লাগলে পিছন থেকে হাতটা নিয়ে এসে দাণ্ডা ফেলে দিলে, একপা একপা করে পিছিয়ে গিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে মাধালি নিজের বুকের দুটি পেশী একত্রিত করেছিল, মাধালি—"তুমি উড়ে গেলে হে! ভগবান আমাকে তুমি...অমন দুঃখ দাও!" একবার পিছন দিকে তাকাল ঝোপের তলায় দাণ্ডা পড়ে। নিজের কথা এতক্ষণ পর ঘুরে এসে নিজের কানে বাজল, আর চক্ষুর্দ্বয় স্ত্রী লোকের মতো বিহ্বল অসংযত হয়ে উঠল, দুচোখের দৃষ্টি একীভূত করতে পারলে না।

সুবাইর বাড়ীর পথে সে এসে ধানক্ষেতের পাশে বসেছে, এখন শান্ত হাওয়া মাধালির কতবার মনে হল কামরণীর কথা কিন্তু কোনওক্রমেই সে তাকে ধরতে পারল না, এতবার আর বুঝে পাচ্ছে না, নিজের শিশুর হওয়ার কথা...হোড় (সাঁওতাল) দের মতো আজও বুনো আছে, কয়েকটা নিত্য প্রয়োজনীয় ছাড়া তার যেন নিজের কোনও ক্ষমতা নেই। হাওয়া থেকে সকলেই এক নিঃশ্বাস নেবে এক জল খাবে, সারি করে ধরে যাবে, এই সত্য কোনকিছু আলাদাভাবে, অন্তত এই বয়সে এমনকি কোন তারার দিকে চাওয়ার যো নেই। নিজের ফেলে আসা পথকে সে সামনে কখনই আনতে পারে না। একটা অচেনা গাছ দেখলে অচেনা পাখী দেখলে, হোড় ভীত হয়ে তার স্ত্রী পুত্র ভুলে যায়। অনেকদিন আগে যখন, প্রথম সাদাটে হাঁস এসে, সরকার বাঁধে এসে পড়ল, সে খবর পেয়ে লক্ষ্মীপূর্ণিমার আলোয় বহু লোক দেখতে এল। সেই রাতে কার ঘুম হয়নি, শুধু ক্রিশ্চানরা বললে ও কিছু নয়; মুণ্ডা সাঁওতালদের অনেক মুরগী কাটা পড়ল অনেক ছাগল বলি হল। একা নতুন কিছুতেই ভীত হয়, নিঃসঙ্গতার বেড়ে ত্রাহি ত্রাহি করে উঠে। জগমাঝি বলবে একবার। জগমাঝি বলবে ওটা কর অথবা পাগুড়া বলবে তেমনি, নিঃসঙ্গতায় মাধালি বড় অস্থির হয়ে উঠেছিল, কিছু না বুঝে পাওয়ায় ক্রমশ সে একা হয়ে আসছিল। নিজে কোথাও সাজিয়ে গুছিয়ে নিতে পারছিল না। এক মুহূর্তের জন্য যদি সে কোন সাজান গুছান কিছু দেখতে পারত;

যেমন লোকে ঠেকা বুনে...যেমন লোকে কাপড় বুনে। উঠে আর যাবার কোন জোর ছিল না! কারণ দাওা হাতে নিয়ে হাতের দিকে চাইতে সে পারছিল না, অতি কষ্টে সে দাওা ধরে ছিল, যাতে এখন জ্বলছে, হাতে হাত ডলেছে তবু সে জ্বলা যায়নি। চিকে খেলার ঘুঁটির মতো তার সব ঘুঁটি মার গেছে। সোজাসুজি ধিক্কার দেবার মতো মন তার নেই; বেদনায় তবু ফুলে ফুলে উঠেছে। মাঝে মাঝে ফ্রান্সিসের কথা তার মনে এসেছে, হাটের চোর যেমন সকলের পায় পড়তে চায় মুখে বলে, 'আমি খাইনি আমার মাথার ঠিক নেই করেছি, হাত শালা আমার বজ্জাতি করেছে আমার দোষ নেই।' হাত দুটোর উপরে চেপে বসে রইল। একথা মনে হওয়ায় কিন্তু কোন জোর পেল না। শুধু অন্যমনস্ক ভাবে, ছাড়া ছাড়া ধানের চারা যেখানে, সেখানে এ সকল কথা প্রকাশিত হয়েছিল সেই দিকে চেয়ে রইল। এক একবার অদ্বৈতর বসে থাকা তাকে ধিক্কার দিতে শিউরে উঠতে লাগল। তার ইচ্ছে হল কাঁদি!

মাধালি আর তাই সুবাই-এর বাড়ীর পথ না ধরে, রৈবতীর জন্য অন্য রাস্তা ধরবার জন্য তৈরী হয়ে যখন উঠে দাঁড়াল তখন গায়ে তার কিসের উষ্ণতা ছিল, সে একবার নিজের গা অনুভব করে দেখলে এ যেন রোমনির গায়েরই বলার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হল, "যাই উয়াদের বাড়ী" কিন্তু মনেই হয়েছে, অস্থিরতার গায়ে আগুন ফুটেছে, এবার সে ইচ্ছা করেই অন্য কারও শিকার দেখতে হয়ত চাইত কিন্তু তা একবার তার মনে উঠেনি, রোমনি তার হয়ে পড়েছে। এক একবার মনে হয়েছে কি করে একথা ভুলতে পারি—মনে হয়েছে আর কেউ ত জানে না কিন্তু এত সত্ত্বেও সে সঙ্কুচিত! এই টিলায় উঠেই আকন্দগাছ সরিয়ে যা দেখল তাতে সে থমকে ছিল, রক্তের চঞ্চলতা নেই, মুহূর্তের জন্য তার আত্মগ্লানি। অদ্ভুত একটা হাওয়া যেন সে অনুভব করলে, টিলার সমতলে, কয়েকটা উলঙ্গ ছেলেমেয়ে—একটিমাত্র ছেলে দাঁড়িয়ে হাসছে—স্নানের আনন্দ দেখে সে যে হাসছে, আর হাতের কব্জি দিয়ে কফ মুছছে আর জনা তিনেক মেয়ে জনা তিনেক ছেলে মাটিতে পাছা, এখান থেকে দেখা যায়, এখন এরা খেলায় মত্ত, মূর্খতাও ছিল। মাধালি সামনের দৃশ্যে যুগপৎ বিস্ময়ে এবং ভয়ে—, কোনদিন নুন খেয়েছে কিনা সে ভুলে গেল। পরক্ষণেই সে যেন বেঁচে গেল, সে দৌড়ে গিয়ে সজাগ কুকুরের মত হাঁউ হাঁউ শব্দ করে উঠতেই ছেলেরা তন্নতন্ন করে যে যেদিকে পারলে ছুটে পালালে। মেয়েগুলো বিদ্যুৎবেগে একটা উপুড় হয়ে ওর দিকে চাইতে চাইতে কোনক্রমে উঠে কাঁদতে কাঁদতে শুধু বললে 'উয়ারা' বলে চোখ মুছতে লাগল। মাধালি উর্দ্ধে একটা লাফ দিয়ে বীরত্বে উঠে মাটিতে পা দিয়ে বললে, "হ হিরো। হি রে" তারাও ছুটে পালাল। এটুকু মাধালি বুঝেছিল এখানে আর এক মুহূর্ত থাকলে সে নিজেই পাগল হবে কারণ আকন্দ পাতায় তাদের ছবি আছে কারণ কাঁকরে কাঁকরে কি যেন আছে, একটি মেয়ের ছোট সেগুন পাতার মত ছেঁড়া গামছা টুকরো, যা তার লজ্জা বাস ছিল, ঘুনসি থেকে খুলে পড়ে প্রকাণ্ড সাপের এক টুকরো খোলসের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছিল। মাধালি কাপড়টা তুলতে গিয়ে, একটা লাথি মেরে, ঝটিতি নেমে এল।

পাঁচিলের পাশ দিয়ে দেখলে, উঠানে একটা পারকোমের তলায় কার বুট জুতো খোলা, উপরে একটা লোক বেঘোরে ঘুমাচ্ছে। সামনে ঘরের চালার তলায় দরজা তাতে তালা দেওয়া, পয়সাওয়ালা লোকের বাড়ীতে যেমন তালা থাকে। এপাশে একটা চালা, তাতে দাঁড়ি পাল্লা ঝুলছে ওপাশে আস্তাবল ঘোড়ার জরাজীর্ণ পুরাতন সাজ, এখনকার সাজ একটা চট কিছু দড়ি একটা হরিণের ছাল, মাধালির তাকে দেখে অসম্ভব করুণা হল, হয়ত ভালবাসত কারণ লোকটা সাংঘাতিক। সুবাই একবার উঃ করে ঘুরে শুল, মাধালি প্রায় তার কাছেই গিয়ে ডাকল, "সুবাই—সুবাই" এবার তার গায়ে হাত দিয়ে ঠেলে দিলে সুবাই মুখ তুলে চাইবার সঙ্গে সঙ্গে নিজের চাবিতে হাত দিয়ে সুবাই তাকে দেখে হতচকিত একটু ভীতও হয়েছিল, হয়ে ওঠে দাঁড়াল। মাধালি তার মুখের দিকে চেয়েই মনে হল এখানে তার আসা উচিত হয়নি, তার যাওয়া উচিত ছিল পরান ঘাটওয়ালের বাড়ী। সুবাই তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বললে—"হে হে বন্ধুয়া বস—আমার কি বরাত গো, শালা শঙ্খচিল এই উখানেকে যখন বসল তখন বুঝলাম ভাল কেউ দশাসই আসবে হে—তাই বার হই নাই নাহলে মেলা কাজ ছিল—"

মাধালি সরল অথচ কঠিনভাবে তার দিকে চেয়ে রইল, তার কথা সে একটি বিশ্বাস করলে না, এ

ভদ্রতা মাত্র। শুধু নিজের ঘাড় চুলকাতে চুলকাতে বল্লে "এলাম হে—" মাধালি বসে তাকে শুধু হাত দিয়ে থামতে বলে বললে, "তুমাকে কাল আমি অযথা করেছি তাই—"

"রে রে দু দুঃ ক্ষেপা হইছ" বলে ল্যাংড়া পায়ে খানিক আগে পিছন করে বললে—"হে আমার অতশত নাই—। আমি দু ধামে লিখিত কায়েত" বলে তত, আনন্দিত হল যেন সে মাধালিকে কলিয়ারীতে পাঠাতে পারবে, বললে "লাও লাও—আমার অত নাই—এইখানে আমি ছোট জাত হে—তা আমি ভজা মুচির ঠোঁটে খেয়েছি, তাকে মান্নি করি হে—তোমরা মুচি বললে হবে? লোচন বললে হবে শালা, তুমি শালা কে—রাজত্ব, কোম্পানীর শালা—"

মাধালি তার অধৈর্য্য ভাব দেখে অন্যমনস্কভাবে বললে—"কাল আমার মন বেজার ছিল।" "বুঝি না" বলে আবেগে পারকোমে একটা পা তুলে দাঁড়াতে গিয়ে আবার নামিয়ে নিয়ে বললে, "তুমি আমায় সকালকে কেমন ব্যবহার করলে, আমি ঠোঁট কাতরালাম তুমি মুখ ভরে খাবার দিলে এমন।" হঠাৎ গলার আওয়াজ ছেড়ে ডাকল "হে হুরা হুরা—ওলাওটা হোক তুয়ার, শালা ছোট জাত কানের মাথা খাইছ হে" বলে হেসে বললে, "উয়ারা ছোট জাত উয়াদের কানের মাথা থাকে না—" এই রসিকতায় মাধালির মুখের ভাব কোন পরিবর্তন হল না দেখে সুবাই পকেট থেকে কিছু বিড়ি বার করলে, এমন সময়ে হুরা হাতে এক তড়পা কাটা খড় নিয়ে এসে দাঁড়ালে। সুবাই খুব মনোযোগসহকারে হাতের তালু থেকে একটা ভাঙা বিড়ি ফেলে দিলে এবং একটা বিড়ি কানের কাছে আঙুল দিয়ে ঘুরিয়ে দেখে নিয়ে মাধালিকে দিতে গিয়ে দেখলে, হুরা হাঁ করে দাঁড়িয়ে, বললে, "শালা ছোটজাত কতবার বলেছি কায়েত বামুনের ঘরকে রকম আলাদা কেউ এলে শালা দণ্ডবৎ করবি। বলার সঙ্গে সঙ্গেই হাঁদা লোকটা তড়পা সহ কুর্নিশের মত বেঁকে দণ্ডবৎ করলে। "না শিখলে কে শিখাবে—যা হোলাটা লিয়ে আয়—জল লিয়ে আয়?" মাধালি এখন অন্যমনস্ক ছিল, তার শুধু মনে হচ্ছিল, কিছু পূর্বে দেখা ব্যাপার নিয়ে কথা কইতে, কারণ এই ব্যাপার তাঁকে পূর্বেকার কথা ভুলিয়েছিল। নিজের আড়াটা ফিরিয়ে আনতে বিড়িটার দিকে একবার চেয়ে দেখল।

"ইয়া পোড়া বিড়ি ইখানে মিলেনা হে—হাওড়ার বিড়ি হে..."

হুরা হোলা এনে দিল, মাধালিও বিড়িটা ধরিয়ে একটা টান দিলে। সুবাই হুরাকে নিজের ট্যাঁক থেকে চাবিটা দিয়ে বললে, "ভাল করে হাত ধুই, চাবি খুলে খৈ লিয়ে আয়—পয়ড়া চৌকীটা লিয়ে যা...।"

হুরা যখন মাধালির পাশ দিয়ে যায়, তখন সুবাই অল্প দ্রুত পায়ে দৌড়ে গিয়ে হুরাকে ধরে তার কানে ফিস ফিস করে কি বলে তাকে ঠেলা দিয়ে আবার এদিকে এসে নীচের চোয়ালটা ছাগলের মত নাড়াতে নাড়াতে দুই হাতের তালু দিয়ে চাপড়ে চাপড়ে এক গমক হেসে উঠল। "বুঝলে হে বন্ধুয়া আমি কি খুসী কি বলব গো...আমার আনি আট আনি এক সাড় হইছে হে..."

পরক্ষণেই খুব ভারিক্কী হয়ে বললে, "হে হে হে দেখ দেখ" বলেই নিজের দুগালে চাপড় মেরে বললে "বুললাম যে সাড় নাই এখন এবেলা কত" বলে রোদের দিকে চেয়ে বললে "এবার আসলে কোন রাস্তাকে এখুন আরে কথা বলহে? তুমি আসছ আমার ঘর সোনা হঁই গেল।"

"বেশী...বলনা হে ক্ষিধা পাবে গো" বলে অনেকদিন বাদে একটা স্বাভাবিক কথা বলেই বিমনা হল।

এ কথায় সে যেন লাফ দিয়ে উঠে, আবার উবু হয়ে বসে, খাটের বাজুতে একটা আঙুল কথার সঙ্গে সঙ্গে তাল দিয়ে রাখতে রাখতে বললে, "দেখ হে" তার কথাটা যেন আগে থেকেই মানছে না, এমনভাবে মাথা দুলাতে দুলাতে বললে—"সে ডর আমার নাই—একপাহাড় ক্ষিদা পাকা পেট আমার কয়লার খাদন হোক...আমি পরের বাড়ী যাব না হে...মাটি কামড়াব না সত্য কথা বলব হে হে..." কথার মধ্যে অহঙ্কার ছিল। হুরা এখন চৌকী এনে দিল। সুবাই চৌকীতে বসে বললে, "তুমার কথা বলিনা...আনলোক যাদের ক্ষিধা পায় পরের কলা দেখে—হে হে আমি তা লই।"

মাধালি তবু বললে, "আমার বরাত তাই গো।"

"হে হে কি বল দেখ আমি অন্য সমুখে লীচু আসনে বসি না হে—তুমি আর কথা..."

মাধালি তার দিকে নিজের অন্যমনস্কতা থেকে কি এক প্রশ্ন এনে মধ্যে মধ্যে তাকে দেখতে লাগল...সুবাই ভাবলে মাধালি তার কোটের দিকে তাকাচ্ছে বললে "ই কোটটা কোম্পানী আমাকে দিইছে"...বলে হেসে বললে "খুব খাইছ বুঝি...চোখ ভারী ডাগর লাল..."

মাধালি তার লাল চোখদুটিকে কাতর করে বললে, "না।" সুবাই হঠাৎ বিরাট হয়ে গেল, "দেখ দেখ" বলে অঙ্গভঙ্গী করে গালে চাপড় মেরে বলল, "পটমে ধান আছে সে সকল কথা ভুল হে, কায়েত বলি এত কথা গরম, আর কে মানুষ লয় হে" বলে আবার গালে চাপড় দিল।

কথাটা বলে নিজে আবার সুরু করবার জন্যে কথাটা বুঝে নিল। আঙ্গুলে গুণে গুণে নিল। মাধালি তার গোণার দিকে অবাক হয়ে দেখেছিল। সুবাই বিড়বিড় করে কিছু বলে, জোরে 'হ্যাঁ' বলে ঠিক দেয় যখন এমন সময়ে হুরা একটা অসম্ভব ছ্যাতলা পড়া ছোট হাঁড়ি এনে দিল, মুখ তার মাটি দিয়ে বন্ধ; মাটি জলে ভেজা হাঁড়িটা সে আস্তে আস্তে পকেট থেকে ছুরি বার করে মুখের মাটি তুলতে তুলতে বলতে লাগল "এখন কেমন না জানি কি হয় আমার হাত যশ আর তোমার ভাগ্য, ইয়াতে মহুয়া কাঠ কয়লা আছে, পিয়া মৌ সোঁদা করাহে...দেড় শাল হল" বলে মাটি খুলে, গন্ধ নিয়ে বললে, "আঃ ইয়া কোম্পানীর লেগে রাখা ছিল", বলে হাঁড়িটা তার নাকের কাছে নিয়ে গেল। তারপর কোষে নিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে মাটিতে ঢেলে দিয়েছিল—বললে "ইখানে আর ঘাস হবে না ইয়ার কত ধক হে—ওহো—যা বুলছিলাম।"

"আমি আজি দুপুরকে ফিরছি ঘোড়ায়, দেখি ধান ক্ষেতে মাথায় একটা হোলা লিয়ে কে যায়। আমি ঘোড়াকে বললাম খাড়া খাড়াও, দেখি তুয়ার বোন আসছে, চোখে জল, মাথাকে বিড়ার উপরে হোলা দুটো পদ্মপাতা, হাতে খেজুর ছড়ি মাঝে মাঝে কাক ঘুরে বুঝলাম ভাত আছে। বুল্লাম লুহানী দুটা কথা বল, আমি ছেলে হয়ে জন্মাব গো, আর জনমে। একথা শুনে অমনি কান্দিস কেনেহে বললাম কান্দিস হে, পরের ধান ক্ষেত, আনসঙ্গরা (অমঙ্গল) লাগবে হে...কান্দিস না হারে হা...বন্ধু আর কানতে লাগল হে, আমি হাড়ে মাংস এক হলাম, বন্ধুয়া তুমি আমার জুতো মারনিই কেনে, আজ আমায় কোম্পানীর দিওয়া এই বুট মার গো—মানভূমে জন্মায় তারা মানুষ লয় গো...লুহানী বললে, তুমার কি দোষ, খাড়াও কালিয়ার একটা কুথা আছে, এ কুথাকে শুনে আমি চোখে জল রাখতে পারলাম না। ঘোড়া আমার বৃষ্টি বলি ছায়াতে মুখ নিলে ও হো হো কিস্তান হলে কত ধর্ম ছেড়ে দেখ দেখ, শালা কোড়ামুণ্ডা যত ছোট জাত" বলে মাঠের দিকে চেয়ে হাকল "হে কালী রক্ষিণী..."

"ধরম ঠাকুর সিঙ বোঙা মে শালা যেখানে আছে দেখ, কি ধাম গো ধরম বলি কোম্পানীরা গোরা" বলে কাঁচের ভাঙা কাপে অল্প মদ ঢাললে। নিজে একটু একটা পাথরের বাটি নিয়েছিল এবার চুমুক দিল।

মাধালি জানবার জন্যে উৎসুক হলেও প্রকাশ করবার ক্ষমতা ছিল না, মদের গন্ধে তার ক্ষিধে বেড়েছিল। এমন সময়ে, হুরা একটা ছোট ঠেকায় ভুট্টার খৈ আর তার উপরে শালপাতায় কালতিল মৌরি একটু গুড় এবং অন্য হাতে জলের ঘটি আনল। সুবাই তার হাত থেকে ছোট ঠেকা নিয়ে মাধালির কাছে তুলে ধরলে "লাও হে বন্ধুয়া দুঃখ্ চাটির ঘরকে আর কি মিলবে। একটু তিল আর গুড় লাও...আর...হা...হা...সে ঘরে বৌ নাই...শুধু একটা বেটা..."

লুহানীর কথা শুনে মাধালি ভীত হয়েছিল, এরপর কি যে শুনতে হবে তা মনে করে খানিক পিছিয়ে খৈ আর গুড় তিলমৌরী দেখে সে যেন সন্ধ্যায় ফিরে আসা মুরগীর মত একটু একটু করে ফিরে নিজের মধ্যে এল। এবং বুঝল তার ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে। গলাটা ভিজিয়ে একহাত ধুয়ে একটু গুড় তারপর সব গুড়টা মুখে ফেলে, হাতের তালুতে তিল মৌরী বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে মেড়ে, আর তালুতে ঢেলে নিয়ে মুখে ফেলে দিয়ে গরুর মত আরামে চিবতে লাগল।

"তাই মনে নিল, যখনই তুমি এলে, গাজনের সন্ন্যাসীর চোখ তোমার লাল, তুমি কাঁটা ঝাঁপ বটি ঝাঁপ দিবে...তোমার বুন এসে বললে, সকল কুথা...বললে ভাত তার লেগে, আমি মাথায় করি ঘুরি তার দশা এখন অন্য" মাধালির মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, "আমায় বললে সত্য সত্য করে বল সে মানুষটা আছে না গেছে। আমি বুললাম, একথা কেনে? বুললে—নাত আমি স্যাঙা করব—। আমি ত বেশী ঘামলাম গো, বুললে তবু তুমি নাকি বন্ধুয়া ভগবানের নামে গেছ ধর্মের নামে গেছ এ বিঘাতে কি হয়, স্যাঙা করব, তুমাকে খাওয়াবে এমন দেখি নাই, এ কায়েত বামুনের ঘরকে মিলে না গো ইয়ার জোরে আজও চাঁদ মুখ উঠে গো—আমি বুল্লাম—দে তুয়ার পায়ের ধূলা দে তিলক করব গো—দশ থানায় তোর নাম গাইব গো—।"

"সে কি ভাত মাথায় করি আমার জন্য সারা পথে ঘুরে—"

"হি গো—সি কোথায় না কুথায়"—আঙ্গুলে গুণে বললে—"উত্তরে জঙ্গলে বেরা,—বুঁদ ট্যাড়—পশ্চিমে হাইসাদো নদীর পার—সব ধান ক্ষেত বল কি; কেমন শুনবে হে পাখী, ছ্যাঁ—লওয়া বাজের পিছু যেতে লারে তবু ছায়া যে ঠাঁই পড়ে সেই ঠেন সেই ঠেন ধায়—" এরপর মদে একটু চুমুক দিয়ে দেখলে মাধালি, ঘটি থেকে আলগোছে জল খাচ্ছে, সুবাই এবার বললে "সবাইকে আমি ঘটি দিই না গো, তুমার কথা আলাদা", বলে কিছু জেনে নেবার জন্য চোখ ছোট করে বলতে গিয়ে বললে—"ই বাবা কি ভাগ্যি দেখকে হি হি—" বলে থেমে গেল।

পরান ঘাটওয়ালা এসে দাঁড়িয়ে মাধালিকে দেখে অবাক হয়ে বললে, "সি কি কথা হে কুথাকে ছিলে...আমার কাছে কত লোক গেল। মনে নিল এত বড় পাহাড় লোকটাকে লিলে এখন পৌষ মাস লয় যে মুণ্ডা ওড়া (গ্রাম) খুঁজবে—কি কথা বল—"

"বুলবে বুলবে সহজ মানুষ লয় কোল জোড়াহে চাস ত পরাণ উয়াকে ধর...লোকটা ধম্ম পথে গেছে—কি আর বুলব—কি বুনদাই হে, বিটিছানা বলে উয়া ধম্ম পথে থাক্ আমি স্যাঙা করি খাওয়াবো" বলে গালে হাত দিয়ে মেয়েদের মত অবাক হল। "ভাত লিয়ে, ভাই-এর লেগে কত দেশ চিনলে হে কি বুলব—বিটিছানা বটে দিব্য হে—দাঁতে কিছু হলে আনচান—"

"কুথাকে ছিলে হে কুথাকে"...পরান পাশে বসেই তার হাতের আদপোড়া বিড়িটা নিয়ে, একটু বেঁকে হোলায় চেপে ধরলে, ধরতে একটা টান মেরে বললে "সমাচার কি হে কুথাকে ছিলে—?"

"সব ঠাঁই দক্ষিণ কারওয়ান—সারারাত ছিলাম—"

"বল কি...সে রাস্তা বড় ভয়ানক রাস্তাহে, যারা ভাটিতে গিয়েছিল, সেই শালা মেড়ো আড়কাঠি যাদের লিয়ে গেল হে, আগুনত ধরে না—সিঙ বোঙা এবার বৃষ্টি দিলেক, দুটা নূতন লদী হল, সেবার ত সে অসুর বলেছিল হে আমরা দিনের আগে রেতের আগে আমরা বড়, আমরা কলার কাঁদির মত যারা মানা করতে গেইছিল রাতদিন ভাটি চালিও না গো, জল শুকায় ধান হয় না; তারা ভারী খচ্চড় অসুর ছিল কয়লা পুড়লে তারপর সিঙ বোঙা লিয়ে গেল বাবা সব কটাকে পুড়ালে ভাটি ভাঙলে—লোহা হল না। এবার ভাটিখানা মানুষ পুড়ালে যত গ্রামের মানুষ—সিঙ বোঙা বল্লে, "আমি পারব ইয়াদের ঠেকাতে ইয়ারা কোম্পানী ইয়ারা গোরা যারা মেরেছিল তারা দল বেঁধে দেশে ফেরে, যে ও পথে যায় রাতে দেখতে পায় কত লোক—গেলে বলে—লাফাতে লাফাতে দেশ ফিরেছে, তারা ভূত...তুমি সেখানে ছিলে...দুঃ" বলে অবিশ্বাসের ভাব দেখিয়ে কি জেনে নিতে চাইলে—যখন উত্তর দিচ্ছে না তখন বললে, "উখানকে রোজ থাক? অবশ্য তোমার ভয় নাই তুমি ক্রিস্তান আমি বাবা ও পথে কে দিনে মাড়াই না," বলে আড়ে আড়ে চাইল সে জানতে চেয়েছিল রাতে উত্তরের দিকে আসে সে কি না।

"তুয়ার ঘাড় মটকাবে তুই না আড়কাঠি—"

"আমি সুবাইকে একটা কথা জানতে এলাম—তাই এলাম হে...বুল...আমি তুমার বাপ বলে মান্নি হয়..."

"আচ্ছা পরান তুমি, সুবাই তুমি কখন ভগবান দেখেছ?" তার এ প্রসঙ্গ তোলা উচিত ছিল বলেই সে তুলেছিল—।

পরান বললে, "না—"

সুবাই প্রথমেই বললে, "হো। ভগবান বিশ্বাস না করলে কবে—ঘোড়া থেকে পড়ে যেতাম হে..." এ প্রশ্নে আত্মহারা হয়ে বললে—"আমি ভগবান দেখি নাই বটে তবে গয়াকে যখন পিণ্ডি দিলাম তখন দেখলাম...তারাই ত ভগবান বটে—।"

"যে ভগবান লয় আদত ভগবান"

"তবে বিষ্টুপদ চিহ্ন দেখেছি।"

"দুৎ লাও খাওহে উসব কথা থাক্—পরান খাও, হুরারে একটা বাটি জলে ধুয়ে লিয়ে আয়...আমাদের উসব কথা কেনে...উয়া লোচন গোস্বামী আছে উয়া হুড়তির অদ্বৈত মিশির আছে..." কি যে বলা উচিৎ, অথবা এমন ভাব করলে তোমাদের সঙ্গে কি বা কথা কইব।

অদ্বৈতর নাম শুনে মাধালি চমকে উঠেছিল।

"উয়াত ভিক্ষা করে" পরান বল্লে "আজ সে লয় ভিখারী, আরে উয়াত পুরুত ছিল, ব্রেন্দা চাটুরজ্জীর বাড়ী দুর্গা পূজাতে আসত, তার বৌ উয়ার রূপ দেখে ফেঁসে গেল হে...লোকটার পতন হল সে জানে...হে হুরা বাটি আন—"

"আমি মদ খাবনা"।

"সে কি হে ওপথে মাতাল যায় না...!"

"কিযে কথা বল—দেখেছে কি না সেই—কথা," বলে পরান মাধালির কাপটা তুলে নিলে—"আরে তাদের ঘরে ভগবান আসা যাওয়া করে বলেই ত এত দাপট হে...তুমি মদ খাবে না..." "থাক থাক, তুই পরান তুই খা আমি ঘর ছেড়েছি..." বলে যে গর্বটা আসবে ভেবেছিল সে...গর্ব কিছু এল না, মনে হল পরানের সঙ্গে গোপনে কথা আছে, একবার পরানের দিকে কাঙালের মত চাইলে। কিছুতেই বলতে পারছিল না, 'সুবাই আমি উঠি।' অথচ এই সুবাইকে তার কিছু কথা জিজ্ঞাসা করার ছিল জানবার ছিল কিন্তু লুহানীর কথায় খানিকটা ভুলিয়ে দিয়েছিল, কোন এক রাস্তা থেকে মন ফিরিয়ে সে ছোট কথা জানবার জন্য প্রশ্ন করতে গিয়ে আবার মুখ ফিরিয়ে নিলে ভিতরে ভিতরে নূতন কেনা কলসের মত ফাঁকা, শুধু ভিতরে কিছু ছাই খালি পড়ে আছে আর কিছু নেই, এখানে বসে সে সকল সময়ই দূরাগত চিলের শব্দ, সে মাঠের ডাক ছেঁড়াছুঁড়ির শব্দ শুনেছে, রক্তে যে জিজ্ঞাসা ছিল, তাকে শব্দের জিজ্ঞাসা দিয়ে বড় করা সম্ভব বলে বোধ হয়েছিল। এবার সে মুখ ফিরিয়ে পরানের দিকে চেয়ে সুবাইকে প্রশ্ন করলে, "সুবাই...আমি তোমাকে কি বলেছিলুম হে...

"কুথাকে গির্জা কুঠিতে...?"

"না না"...গলাটা তার অসম্ভব কঠিন হয়েছিল...।

"ওহে হে হে ধানক্ষেতে যখন আমায় উয়ারা মারতে উঠল ও তখন ও শালারা কি হারামীহে বুঝলে পরান আমায়" মাধালিকে দেখে বলল "আমার ত খেয়াল ও দাঁড়াও"...বলে উঠে দাঁড়িয়ে দু পা পিছনে সরে গিয়ে বললে, "তারা এল এসে ভ্রূ কুঁচকে বললে...তারপর কি হল ও হ্যাঁ—"

"তোমার মনে নাই" মাধালি অধীর বলেছিল।

"পাঁচ ঝামালির কাজ আমার, সব কি মনে রাখা যায় হে—"

পরান এ ঘটনাটা শুনেছিল, সে বললে, "হারে কুথাকে কতবার খাইছে লিখতে গেলে সরকার লাগবে হে—"

"দেখ পরান আমি হ্যাঁ আমায় থাপড় মারল" বলে নিজের গালে বসালে, "তারপর আমার মুখ থেকে পয়সা ঝরি পড়ে অনেক খোয়া গেল হে" বলে নীচের চোয়ালটা এ পাশ করলে—"তুমি এসে বাঁচালে দাঁড়াও হে রক্ত দেখলে মনে পড়বে"—বলে নিজের দাঁতে হাত দিলে।

মাধালি ঘৃণায় মুখ বিকৃত করে বললে "থাক"।

সুবাই অসহায়ভাবে মুখ করে বললে "ঠিক কি বলেছিলে আমার মনে নাই হে বন্ধুয়া তবে" বলে ঘটি থেকে হাত ধুয়ে, আবার বিড়ি বার করে ওদের দিয়েছিল।

মাধালি বললে, "সুবাই তুমি আমাকে খুব ভয় কর না হে—"

"মান্যও করি বটে—"

"তোমাকে আমি বড় ভয় পাই"

সুবাই অত্যন্ত গর্বিত অনুভব করে কি বলবে তা ভেবে পেলনা, শুধু শুধু মুখ নীচু করে চোয়াল নাড়াতে নাড়াতে তাকে দেখতে লাগল। ও সে কোনক্রমেই ধারণা করেনি, দশাসই লোকটি এখন যার মুখ ম্লান তার ঘাড় শক্ত হয়ে উঠেছে, সে ক্রুদ্ধ হয়েছে।

"দেখ সুবাই, কলিয়ার, তুমি সব পার" বলে সে আর বলতে পারলে না, মাধালির সব সময়ে মনে হচ্ছিল লোকটা ইচ্ছে করেই কথাটা মনে করতে চাইলে না, সে যেমন তার বুনজামাইকে হাঁসিল করে তাদের অস্থির করেছে, আজ তার কথাটা হারিয়ে দিয়ে সে তাকেও ভয়ঙ্কর জায়গায় টেনে নিয়ে গেল, শিশুদের তাড়িয়ে যে গর্ব ছিল, বনের কথা সোঁতার কথা বহুবার মনে এসেছে; কিন্তু কোন বৈলক্ষণ তার হয়নি। কিন্তু সে সুবাইকে যা বলেছিল তাতে, খুব উঁচু বলার ভাব ছিল, আর কিছু না বলে সে এক

পা এগিয়ে গিয়ে বললে, "সুবাই তুমি মায়ের দুধ বেচতে পার তাই তুমি..."

সুবাই ঠিক এত রাগের কারণ বুঝতেই পারল না, সে উঠে দাঁড়িয়ে ল্যাংড়া পায় এদিক ওদিক করে বললে, "মাধালি কি ঘাট ককুলাম হে" পরান ঘাটওয়াল ও সুবাই-এর দোষ বুঝতে পারল না, তবু কোন কথা সে না বলে চুপ করে রইল।

মাধালি নিজে অন্য প্রকার হয়ে আস্তে আস্তে এসে জলের ঘটি থেকে একটু জল নিয়ে মুখে চোখে দিয়ে বললে, "একটা কথা বললাম আর মনে রইল না।"

সুবাই বললে; "কি করব হে পাঁচ ঝামালির কাজ হলে"—একটি মুষ্ঠি অনুনয়ে আর হাতের মধ্যে ঘুরাতে লাগল—"এত বড় কথা আমায় কেউ বলে নাই এমনকি রাজা গোঁসাই লয়—যাক তুমি—"

"অন্যায় বলি নাই, তুমি মানুষ বেচে পয়সা দেখছ হে—তাই ভাল কথা তুমার মনে নাই?

"লোকে তাই বলে, কিন্তু জানেনা এঠেন..."

মাধালি উঠে পড়ল বললে—"আমি চললাম হে"

"দুটা খেলে পারতে..."

"না"

"তবে খৈ দুটা লাওহে...খাও নাই সারা দিন...নাও" বলে ঠোঙাটা তার কাছে নিয়ে এল।

পরান বললে—"লাও...লাও..."

মাধালি একখানি কোঁচার খুঁট বার করে বেঁধে খানিক কাপড় বার করে ট্যাঁকে গুঁজে দিলে পুঁটলি ঝুলতে লাগল।

পরান রাস্তায় এসে বললে, "তুমি উয়ার উপর এত চটলে কেন হে—"

"বললাম ত...এখুন আমি কি করি"

"সি কুথা কি দরকার?"

"না হলে আমি বাঁচিনা।"

"তুমি আমার ঘরকে চল—"

"ঘরে যাইব তবে ঘর ছাড়লাম কেনে? আমার আর এদেশে ভাল লাগে না, আমার মন চায় দূর কোথায় যাই...আমি কিছু বুঝি তোমার ভেড়া নিয়ে লোক বাঁকুড়া যাবে..."

"পরশু"

"তুমি আমাকে কাজ দাও...হে"

"সে কাজ বড় কষ্টের হে, পথে ছায়া নেই রাতেও রোদ..."

"সে তুহি ভেবনা হে, আমিত জেগেই আছি আমি যাব..."

পরান ঘাটওয়াল বললে, "কিন্তু লুহানী, আঁচলে থাকার সময় তার, এখন সে মাথায় হোলা লিয়ে খেজুর ছড়ি হাতে, চৈতী হাওয়ার মত কসাই সোঁতায় পালায় বুঝ যাতনা তার হে।"

"আমি রগড় ভাবি নাই পরান। রগড় করিনা, ইয়া তার কপাড় হে...কপাল!"

পরান কপাল কথাটাকে এত বড় বিরাট ধানক্ষেতে চড়াই উৎরাই, কোথাও ফেলে দিয়ে আসতে পারলে না, একটু রাগতভাবে ভাটুইয়ের গুচি তুলে, হাত দিয়ে কাঁটা ফেলতে ফেলতে বললে, "এ তুই মিছাই বল্লিস, ই কথা লয়..." ভাগ্যকে অনেক উড়িয়ে দেবার চেষ্টায় কথা রক্তে এলেও সে মনে করতে চাইল না।

"আমি জানি হে অনেক ঠেনে আমি যাতনা দিচ্ছি।"

"এটাই বুঝই যদি কর কেনে? একটা মরদ যোয়ান তুই, সে স্যাঙা করি তুয়াকে খাওয়াবে হে তুয়ার ভগবান লাভ কি দরকার" বলেই সে হতচকিত হয়ে সংশোধন করে বললে, "আমার মনে লেয় এসব লাভ কি ডিহি জঙ্গলে ঘুরা হে...দুবেলাকে বাড়ী বসি ডাক..."

"আমি ত তাকে বলি নাই। আর যদি বাড়ীতে বসে হইত তাহলে, সেয়া মাঠে কেনে দেখা দিবে, চালাতে চালাতে চিতি সাপ উঠে আকাশে চিতি সাপ নাই"...পরান মাধালিকে কি ভাবে গ্রহণ করবে তা বুঝে পাচ্ছে না, অতি গরম কিছু খাদ্যের মত ফেলতে পাচ্ছে না। কি একটা কথা বলবার জন্যে পরানের স্বর এল কিন্তু কথা ছিল না।

"আমি তাঁকে আঞ্চলে বাঁধবো হে, আমি..."

"ক্ষেত খামার নাই, ভাত নাই ডাল নাই সে পথে হে..."

"আমি তুয়ার ধান ছাগল শোধ দিব হে...তুই আমায় কাজ দে..."

"আমি তো তুয়ার কাছে মাগি নাই"

"তা হোক, তুই ভেড়িয়ালের কাম দে আমি চার আকাশে তাঁকে ডাকব—দেখা পাব কিনা দেখব।"

আগে সূর্য্যি ডুবত হুড়তীর ওধারে, এখন একটু সরে এসেছে। মাধালির মুখে আলো পড়েছে—পরান মাধালিকে দেখে ভয় পেল, লাল চোখ কর্চা চুল, অত্যন্ত অচেনা হয়ে গেছে, এ মাধালিকে বড় ভয় হল, আর একটু পরেই আঁধার হবে। উঠানের পারকোমে শুয়ে হঠাৎ মধ্যরাতে চোখ খুলেই আকাশ দেখলে যেমন শরীর হিম হয় তেমনি হিম হয়েছিল। সঙ্গে কেউ নেই, দূরে দূরে অনেকেই রাস্তায় অনেক টিলায় কোথাও পোকার মত কোথায় স্পষ্ট। পরান ভাবল, সঙ্গে যদি একটা ভেড়াও থাকত তাহলে কোন ভাবনা ছিলনা, ক্রমশ ভয়ে সে যেন আড়ষ্ট হয়ে গেল, মনে হল তার বাড়ী ঘর যেন নেই, বৌ ছেলে পিলে ছাই হয়ে গেছে। অথচ সবে কাটা মুরগীর পেটে ডিম দেখলে যেমন দুঃখিত হয় তেমনি দুঃখও তার বন্ধুর জন্য হল। এ বন্ধুত্ব আজকের নয় শিয়ারল পাহাড়ের মধ্যে যে কাল পাথর আছে তাই ছুঁয়ে, কুমারী নদী ছুঁয়ে, জঙ্গলের দুপাশ থেকে দুজনে ডেকে বন্ধুত্ব, তবু ভীত পরান। গলা তার শুকিয়ে গিয়েছিল বললে, "আমার ঢেরাকাজ গো—আমি যাই..."

মাধালি এখানে বসে রইল, তার পর উঠে আবার সেই নদীতে কোনক্রমেই সে নিজেকে স্থির করতে পারলে না, সমস্ত সময় অদ্বৈত মিশ্রর চেহারা তাকে দু হাতের মুঠোয় করে ফেলেছে। পরানের কথা লুহানীর কথা তার ভাববার অবসর নেই, নিজেই নিজেকে এমন এক জায়গায় ফেলেছে, যে হাত পাচ্ছে না, কি তাকে সে বলেছিল তাও তার মনে নেই, আগে পাব না আগে জড়িয়ে ধরব। শুধু সে এ কথা বলেছিল এই জন্যে রোমনি আমাকে খুব বড় ভাবুক, আমি যে সে নই, কেনই বা সে এ কথা মনে করতে গেল। এখন ত আমি হাড়ের মত হয়ে আছি আমার গায়ে আর কিছু নেই, এই টিলা পার হবার সময় সে থমকে দাঁড়াল, কি যেন তার মনে হল। চারিদিকে চাইল, বোধহয় সেই ছেঁড়া এক রত্তি নেকড়ার জন্য তার মায়া হয়েছিল। তারপর আকন্দ পাতা হাত দিয়ে সরিয়ে ঢালু বেয়ে নেমে গেল। বার বার গত রাতে একটি মনে হওয়া কথা তার কাছে এল, ভগবানের কথা ভাবতে গেলে এত খারাপ কথা আসে কেন। এখান থেকেই এই প্রশ্নের, বাপ মা ভাই বোন বিচার করতে পারত। সাকিম কোথায়, থানা কি কিন্তু সে সব সময়ই হেঁটে চলছে; শুধু যেন নিঃসঙ্গতার ভয় ঠেকাবার জন্য তার চোখ ভাসে...। মাধালি হঠাৎ কিসের আওয়াজ পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। পিছনে চাইতে সাহস হচ্ছিল না—অনেকটা দূরে, উৎরাই নেমে গেছে, সেখান থেকে ভয়ঙ্কর আওয়াজ আসছে, মাধালি, এক পা বাড়াতেই এমন দমে গেল যে, মনে হল, লুহানীর কথা, মনে হল 'ঘরে ফিরে যাই!' শুধু অনেকের গোঙানির আওয়াজ বকের বাচ্ছার গলার মত কখন, কখন নাবালের ধানক্ষেতের হাওয়া মিশে আরও লোমহর্ষকারী হয়।

আস্তে আস্তে তারা উৎরাই থেকে ক্রমে উঠল, সবাই মাতালের মত টলতে টলতে আসছে, মাধালি তাদের দেখে এত ভীত হয়েছিল যে পাশের মহুয়া গাছে, আক পাক করে উঠতে চেষ্টা করল, ক্রমশঃ তারা কাছে আসছে, চাঁদের আলোয় দেখল একজন শুধু উল্টো দিকে ফিরে আস্তে আস্তে হাঁটছে, সঙ্গে সঙ্গে সেই আওয়াজ সঙ্গে সঙ্গে মাধালি ও কি কতক স্বর উত্থিত করলে যা হো নয় হোড়কাজী নয় মুক্তারী...ভূতের মন্ত্র নয়। "হেড়ং কোটা ভুরু বুড়াহি ইক"—বলে তালপাতার সেপাইর ছিলা ছেঁড়া ধনুকের মত হয়ে গিয়েছিল। তারা তার গলা শুনতে পায়নি, আস্তে আস্তে চলে গেল।

ভয়ে তার কেমন বিকার হয়েছে, সত্যই তার গা রোদে পোড়া কাস্তের মত কোথাকার এক দুর্দান্ত বন এসে তার কোলে চড়ে বসেছে, আর তার দাড়ি ধরে বলছে 'আমায় তুমি কুঁসুডিহি দিয়ে এস।' মাধালি নিজেকে আর গালাগাল দিতে পারলে না, একটা একটা করে খৈ চিবুতে চিবুতে রাস্তা হাঁটতে লাগল।

এ ভীড় দূরে যায়। হাওয়ায় তাদের ভৌতিক স্বর আসে। মৃত পরিজন নিয়ে ঘরে ফিরে যাওয়া কতবার সে দেখেছে। কখন পুরাতন অন্ধকার অতি প্রাচীনতম ভীতি এভাবে জিহ্বা প্রসারিত করে আসে নি। এই পূর্বপুরুষ, তুমি ছাইকে চঞ্চল করে এসে বাসা কর। তোমাদের যেমন আমরা গৃহে নিয়ে আসি

কতখানি আমাদের কি চিহ্ন থাকে—আমরা যেমন তোমার ছাই নিয়ে আসি, সেই কৌটায় দুঃখ কি থাকে। আর তার জানা ছিল না—শুধু তোমাদের জন্য আজও আমরা এখানকে বসে—।

মাধালির কোলে সেই দুরন্ত জঙ্গল, সেই ব্যাঙ সেই শালিক, সেই ভ্রমর এমন কি কুমারী নদীর টিলার সেই কাপড় প্রত্যেকটা মানুষের মত বলছে কসুঁ ডিহি চল সেইখানে যে মেয়ের নিঃশ্বাসে চৈত্র মাস। মাধালি বিমূঢ় হয়ে দাঁড়াল! সে ভীড় দূরে চলে যেতে, সে লম্বা লম্বা পা ফেলে ছুঁড়ে ছুঁড়ে খৈ গালে ফেলতে লাগল। এখন ছুড়তী গ্রাম বেশ দূর, শুধু রোমনির কথাই তার মনে হল তার এইভাবে যাওয়া রোমনি কেমনভাবে নেবে। সে নিশ্চয়ই বুকে ফুঁ দিয়ে বলবে, সেই যোয়ান গো, আঙুল কামড়ে কথা বলবে প্রজাপতির ডানার মত তার দেহটা খুলে খুলে যাবে। অন্ধকারে দেখা চুটার আগুনের মত তার চোখ জ্বল জ্বল করবে। ভাবতে ভাবতে মাধালির গায়ে অস্থির হওয়ার ধুলো এসে লাগল, বোধহয় বৃষ্টি আসবে..., ধূলায় সে চমকে দেখল, সে যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে সেটা শাল গাছ যার তলায় অদ্বৈত মিশ্র বসে থাকে, সে চমকে উঠেছিল। অদ্বৈত মিশ্রর গায়ের গন্ধ যেন এখানে ভরে আছে...দেখে ভয়ে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শিথিল হয়ে এল, এখানে দাঁড়াতেই তার পা থরথর করে কাঁপতে লাগল। আর একবার মুঠো দুটো শক্ত করে সে জায়গাটার দিকে চেয়ে দেখল, হাওয়ায় শালপাতা সেখানে চক্কর দিয়ে মোটা মোটা শিকড় পার হচ্ছে।

লোচনের পূর্বতন দরওয়ান, রাম ভরসের জুতার আওয়াজের, যার ভয়ে এক মুণ্ডা বলেছিল, "হেলো সিঙ বোঙা আমায় ইন্দুর করে দাও আমি পালাই" মাধালিরও তাই মনে হয়েছিল। তার হৃৎপিণ্ড যেন স্থানচ্যুত হয়ে উপরে গলার কাছে এসেছিল। অজস্র জোনাকী শালগাছতলাটি আরো ভীতিপ্রদ করেছিল এবার সে বলে উঠল, "লুহানীর স্যাঙা করবার দরকার নাই আমার জন্যে—আমি যাই।" সে দৌড়ে ধানক্ষেত দিয়ে, ভূতের মত হেঁটে চলল, কানে তার ভেসে এল ঘুমুরে শিক্ষারত আওয়াজ একবার থামে আবার হয়। নিসিন্দে গাছ ধরে ধরে সে আরো একটু একটু করে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল। চালাটা অনেকটা নেমে এসেছে, জানালাটা এপাশে হলদে কাপড়ের মত মেলে আছে, কে যেন আসে সরে যায়, তার দেহের অংশমাত্র দেখা যায়, যা আন্দোলিত, আবার উতলা, দাদরার ছ্যাঁচড়ামি যেন পুরো দস্তুর ঝঙ্কৃত হচ্ছে। বোকা মাধালি হাঁ করে, রক্তের ভার নিয়ে সেইদিক তাকিয়ে রইল, একটা খৈ সে মুখের মধ্যে পুরে দিলে, মুখ তার তৈরি ছিল না...এই খৈটার জন্যে। "হাঁ ভগবান..." এই প্রথম সে বলে মাথা নীচু করে মাথা নাড়তে লাগল। আবার মাথা উঁচু করলে লাফ দিয়ে তার যেতে ইচ্ছে করল মনে হল, তাকে ছিনিয়ে নিয়ে আসি, কিন্তু ঐ পর্যন্তই! কাঁধটা তার বলদের মত উবল হয়ে রয়েছে মাথাটা ঘাড় নীচু করে থাকা কুকুরের মত উঁচু! তবু ঘুমুরের আওয়াজ তাকে এখান থেকে ছিঁড়ে নিয়ে যাচ্ছিল—হঠাৎ হলদে আলোটা অদ্বৈত মিশ্রর মুখ সদৃশ মনে হল, হতেই অস্ফুট আওয়াজ হল, তার কাছে এত দিনের বিশ্রী লাগাটা আবার মনে হল, সেই বেলাড়ীর রাস্তায় সে দাঁড়িয়ে আছে, আর একটা সাঁওতাল মেয়ে ছুটছে, পিছনে গয়ালী পাণ্ডা নগ্ন, শুধু পায়ে টহলদারী, মাথায় রেশমী চেলীর পাগড়ী ছুটতে ছুটতে এল সাঁওতালী মেয়েটাও ছুটছে, সামনে বাঁধের পাড়ের মত লম্বা ঢিবি তার উপরে পলাশ গাছ, নীল আকাশ মেয়েটি খাড়া ঢিবি বেয়ে উঠতে গেল পাণ্ডা পা ছুঁড়ে এক পায়ের আবার একটু ছুটে অন্য পায়ের জুতা ছুঁড়ে খুলে ফেললে। মেয়েটি কোনক্রমে ঢিবির উপরে উঠেছিল, কিন্তু তার আঁচল খুলে মাটিতে লুটায়, পাণ্ডা দৈত্যের মত উঠে আঁচল ধরে ফেললে, মেয়েটি ভাববার আগেই একটানে বিবস্ত্র হয়ে সেই পলাশের মধ্যে লজ্জা নিবারণের জন্যে দাঁড়িয়ে চীৎকার করবার জন্যে হাঁ করেছিল—গয়ালী পাণ্ডা তাকে ধরল। গয়ালী পাণ্ডার অসভ্য নগ্ন দেহ যার জন্য সে এক মুহূর্ত লজ্জিত নয়, নেমে এসে জুতা তুলে পাশে ঝরানির খাদে নামল চান করতে করতে ভজন গাইতে লাগল। এই অসভ্যতা মাধালির মনে কাঠ হয়েছিল।

জানলার দিকে চেয়ে বলেছিল—"হা...এখন কি মাধালি কিস্কু—!" সে একবার তবু বলেছিল, "তোমাকে আমি বয়ে বেড়ালাম বাঁক যেমন কাঁধে বয়, তুমি লাচনী ঢেমনী...। তোমার জন্য আমি সর্বস্বান্ত হলাম...! তুমি না তুড়সীকে পাঠিয়েছিলে" অবশ্য একথা মাধালি বলেনি অন্য কেউ বলেছিল। নিজের হারকে সে অনেকটা পথ কিছুতেই মেনে নিতে পারে নি। মানুষের গায়ের রক্ত যেন ভোরের পাহাড়ের মত ঠাণ্ডা, অথবা পদ্ম পাতার মত। ফাঁকা রাস্তার মত এমন কি মানুষের রক্ত হয়। শুধু হাওয়া

যাওয়া আসা করে শুধু পাতা উড়ে, মাঝে শৃগালে খর পায়ে চলে যায় তাও চকিতের জন্য। এতক্ষণ বাদে মাধালি যেন অসম্ভব অন্যরকম বোধ করল, নিঃশ্বাস তার ভিন্ন নাম দিয়ে সরল গতি আনছে, মান নেই হার নেই—জিত—নেই। শুধু শরীর ভোরের হাওয়ার থেকে হাল্কা, হাঁসের বাচ্চার মত সে সরল চোখে সকল কিছুর দিকে চেয়ে আছে, এখন মনোযোগী হয়ে, ভান করে যে ঠোঁটের দিকে চেয়েছিল, সে ঠোঁট এবার ঘুরে অন্যদিকে খেতে শেখাচ্ছে। প্রথমে সে মনে করেছিল; যে কুমারী নদীতেই যাবে, কিন্তু না গিয়ে সে পাঁহুড়ীর পথে নেমে পড়ল, একবার মনে হল তুড়সীকে একটা সাড়া দিয়ে আসি কিন্তু মনেই হল। মনে হল তুড়সীর স্বামী ঘরে আসে না, একটা পরণের কাপড় ছিঁড়েছে এতদিন; রোমনির থেকে তার তাত বেশী। তুড়সী যেন নূতন করে আম্মা নিয়ে যাওয়ার পালা অভিনয় করলে।

সে ভয়ের ব্যাপারী শুধু ভয় ভয় আর ভয় নড়ে চড়ে, আঁচড়ে নিঃশ্বাস মুঠো করে রাখা যায়, মাধালি তা ভুলে গেছে। মাটি উদ্ভূত বাষ্পময়ী অন্ধকারে, নিরন্তর মৃতের হৃদপিণ্ডের উপর দিয়ে হাঁটা কবে শেষ হবে। অভুক্ত দেহে কাপড় আলগা হয়েছিল, অনেকক্ষণ, ঠিক করে পরতে গিয়ে মনে হল আমি যদি এইভাবে থাকি, আমার চঞ্চলতা আসবেই না। যেমন করে অন্যের বাড়ীর দরজায় হাঁকে, তেমনি ডাকলে 'কেউ কি আছে?' যেন চর্তুদিক থেকে প্রতিধ্বনি আসতে লাগল, সে এদিক ওদিক বড় বড় চেয়ে দেখলে। সে আবার এদিক ওদিক বড় বড় চোখে চেয়ে দেখলে। বলতে লাগল যে "আমার গলার এতবড় আওয়াজ পড়ল, হে ভগবান তাকে আমার সঙ্গী করে দাও—আমি বড় বন্ধুহীন গো..."

পাঁহুড়ীর দক্ষিণে একটা ঝরানি নদী আছে, মানুষ গভীর সাপের মত আঁকা বাঁকা হয়ে যাওয়া খাদ, পাথর উঁচু উঁচু হয়ে রয়েছে তার পাশ এখন জলে বয়ে যায়। লুহানীর খোঁজার বাকী নেই, বহুদিন পর বহু লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছে, তারা আশ্বাস দিয়েছে 'তুমি কেঁদনা, সে আসবেই, মাদল ছেড়ে শব্দ কখন যায় না।' এরপর তার পায়ের কাছে তিনটে শুধু পাতা পর পর এসে পড়েছে, সে ভাত ধুয়ে নিয়েছে যাতে ভাত হড় হড়ে না হয় গন্ধ না হয়, একটু নুন আর সরষের খোল ছিল তার ট্যাঁকে, আর খানিকটা পায়রা সিদ্ধ করে কাঁচা পোড়ান ছিল এটা পিসীর দিয়েছে। একটা দীঘির ধারে হোলা রেখে, তালিতে এবং শব্দ করে কাক তাড়াতে তাড়াতে দীঘির জলে নেমে, পদ্ম পাতা তুলেছে, রোদে যে পাতা শুক্ন্ তা ফেলে দিয়ে, অসাবধানতাবশতঃ হাতে কালি লেগেছিল, কার গায়ে সে কালি দেয় বলে ও ছেলে মানুষের মত হেসে, শূন্যেই হাত বাড়িয়ে হাসল, এবং নিজের মুখের কাছে হাত নিয়ে নিজেকেই কালি দেবার ভয় দেখিয়েছিল। বেচারী ভারী খুসী হয়েছে তিন পাতা এসেছে বলে। সেও ত অভুক্ত, কষি কতবার বেঁধেছে কতবার ঢল হয়েছে। এখন আবার খেজুর ছড়ি ঘুরাতে ঘুরাতে ঝরানির পাথর টপকে টপকে যাচ্ছিল। তার মাঝে মাঝে শিশুর মত অশ্রুহীন কান্নার শব্দ করছিল। দুপাশে কোথাও পাথর উঠে গেছে কোথাও মাটি, এখানে বহু দূরের এক আদটা শব্দ মৃদু বেজে উঠছিল। এবার সে এসে পড়ল, এমন এক জায়গায় যেখানে ঝরানি সোজা বয়ে গেছে।.সে থমকে দাঁড়াতে গেল, তবু তার নিজের ঝোঁকেই আর একটা পাথরে পা পড়ে গেল। সাপে জল খাওয়া দেখলে মানুষ যেমন নিভে যাওয়া প্রদীপের মত চুপ করে থাকে তেমনি লুহানী, স্থির হয়ে রইল, তবু তার হাতের খেজুর ছড়ি খানিক ডুবে থাকায় স্রোতে একটু দূরে চলে গিয়েছিল। লুহানী হঠাৎ নীচু হতে হোলা সামলে, খেজুর ছড়ি ফেলে দিয়ে হাতে জল তুলে চোখে মুখে দিলে, মুছবার সময় নেই, দেখলে, কে একজনা লোক প্রকাণ্ড ঢালু পাথরে শুয়ে চারিদিকে খৈ ছড়ান, পাখীতে খাচ্ছে। কি বলে সে ডাকবে—বললে, "হে মাধালি—মাধালি" বলে, এইটুকু পথ, পাথর ডিঙিয়ে এসে বললে, "আমার দাদা গো..."

মাধালি চোখ খুলে দেখলে, হোলার তলায় সিক্ত মুখ মণ্ডল; দেখেই সে উঠে বসল, লুহানী তার কাছে এসে কি অসম্ভব মাছের মত করতে লাগল। হোলাটা তার হাতে তুলে দিলে বিড়েটো দিয়ে মাধালিকে হাতটা বাড়িয়ে দিলে যাতে সে সহজে উঠতে পারে। উঠে এসেই, তার কাঁধে মুখ রেখে কাঁদতে লাগল। বললে—"আমি কি পাপ করলাম গো গির্জা খানে", বলে যেন ফেটে পড়ল।

মাধালি, শান্ত ফ্রান্সিস পাদরী যেমন কোন মর্ম্মাহত লোকের গায়ে তার হাত বুলাতে থাকেন, লোকে বলে পাদরীর হাত ভোরের হাওয়ার ঘর, তেমন ভাবেই মাধালি লুহানীকে শান্ত করবার চেষ্টা করলে,

লুহানীর চুল তার হাত বেয়ে পড়েছিল, সে চুলে অযত্ন জমা হয়েছিল। মাধালির তো দেখে বড় কষ্ট হল। লুহানী বললে "কুথা বলহে, না ভগবান বুলছে ইটা তোমার বুনদাই লয়..."

মাধালি চুপ করে রইল। লুহানী হঠাৎ মুখটা উঠিয়ে চারিদিকে চাইল, সামনে আতা পুট্রাস আর ডুমুর গাছে পাখী বসে, অন্যান্য দিকে কেউ নেই, দশাসই মানুষটির কানের নাগাল পেয়ে সেখানে মুখ রেখে অন্যদিকে চোখ ঘোরাতে ঘোরাতে জিজ্ঞাসা করলে—"তাঁর দেখা পাইছ..." মাধালি তার মুখের দিকে মুখ ফিরালে...মেয়েটি দুই হাঁটু এবং দুই হাত পাথরের উপর ভর দিয়ে আছে, নিরীহ প্রাণীবৎ! উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে কিছু জানবার জন্য, বললে, "দেখা পাইছ, কেমুন দেখতে হে..." এ কথায় মাধালি মাথা নাড়িয়ে জানাল সে দেখেনি, একটি দীর্ঘশ্বাস তার পড়েছিল।

"এঃ মিছাই...তুমি দেখ নাই হয়"; বলেই তার পাশে বসে একটা হাত নিয়ে আঙ্গুলে ঘুরাতে ঘুরাতে বললে "বল না হে, কেমন দেখতে..." "ভগবান নাই; আর...দেখব কাকে" কথা বলা হল না। লুহানী ঝটিতি তার মুখ চেপে ধরলে, তার চোখ অসম্ভব বড় হয়ে উঠল, তার এরূপ অতর্কিত আক্রমণে মাধালি পিছন দিকে হেলে পড়েছিল। লুহানী হাতটা তুলতে তুলতে বললে "হিরে বাপের উপর রাগ করে, হে...সেয়া চিঠি করবে হে, আসবে..."

"আমার মন লেয় না..."

"লেয় না কেনে, দেখা হবে, হে এ হাট লয় উ হাটে দেখা হবেই হে..."

বলেই পদ্মপাতা পেতে, ট্যাঁক থেকে, নুন আর সরষের খোল বার করে বললে, "মুখ ধোয়, দুটি খাও...গো"...।

মাধালি আস্তে আস্তে উঠে, বোনের কথা ভেবে মুখ ধুয়ে এসে বসল। লুহানী তাকেই দিলে বললে—"লাও, দুটা ধূলা খাও..., দুদিন মাথায় লিয়ে ঘুরি কাঁন্দি—কাক তাড়াই...মুখের ভাত মুখে দাও গো..." বলে মাধালির দিকে অপত্যস্নেহে তাকাল।

"তুইও ভাত চাট্টি মুখে...দে...না হলে আমি খাব না—"

লুহানী আর একটা পাতা পেতে নিয়ে, "লাও...তার ভাত তাকে দাও হে..." বলে চোখ বুজালে...মাধালি ভাত ছুঁয়ে তাকে উৎসর্গ করে অল্প ভাত একটু ছড়িয়ে দিলে পাখীরা যাতে পায়, লুহানীর যেন মাধালির থেকে বয়সে অনেক বড়, একটু তার অভিমান হয়েছিল এখন তা বুঝা গেল বললে, "কে খৈ দিলে",..."খৈ সুবাই কাড়িয়ার" বলে অন্যমনস্ক হবার চেষ্টা করলে, তারপর বললে, "দেখ লুহানী পাখী যখন কাছে আসবে তখন তাকে দেখা যায়—" "খুব ডাকতে হয়, দেখ কি কপাল, বুড়া জগাই মুচি তুয়াকে যখন পাই না পাই না, তখন তার কাছে গেলাম, বুড়া পিয়ারা গাছতলায় বসে ঢুলছিল, বুললাম—জগাই একটা ঢেরা দিবি, বুড়া চোখ খুলে বললে, হে তুই শুনি স্যাঙা করবি, আমার দেড় বিঘা জমি, বাবু বাড়ীতে বছরে একটা কাপড় পাই লুৎতন, পুরান কাপড় পাই গুনতি নাই (১টা) আমায় বিয়া কর। আমি গালে হাত দিয়া বলি মরণ, সকল সময় রোদ বৃষ্টি দেখ নাকি হে, বুড়া বলে—না না সুখে থাকবি। আমার দুই ছেলা তোকে মা বুলবে, তার বৌরা তুয়ার পা টিপবে দেখ"—বলে লুহানী চোখ মুছলে।

মাধালি শুনে কিছু বলবার মত খুঁজে পেলেনা, লুহানী তার দিকে তাকাল, তার মনে খুব একটা গর্বই হয়েছিল। বললে—"লোকে নানা কথা বলে, আমি বলি ভাই আমার ধম্মপথে গেছে, ইহার থিকা বড় কি আছে, তোরা খুস হও, পশু পাখী এরা খুসী হবে গো, গরীব দুঃখী তারা খুসী হবে, পাদরী বাবা রোজ তোমায় খুঁজে—সব ঠেন ঘুরে,...মাকড়ী রাগ হইছে, বলে 'বাইবেল পাঠ না করলে ঈশ্বর চিনবে কি করে—হে...ঈশ্বর তোর সামনে দিয়ে চলে যাবে তুই বেটা, বলবি কুথা কুথা' উয়ার বৌ বলে 'তা কখন হয়, ইয়াকি হরিয়াল পাতার সঙ্গে মিল থাকবে? যে লোক বসে বসে পৃথিবীর গায়ে এত কথা লিখলেক; তাকে বুঝা যাবে না...বাপ চিনে লিবে, ইটা আমার বলি'..., একথা শুনিত মাকড়ী বড়িয়া পাতা পোড়ার মত চটপড় করে বুললে "পথ কে দেখাবে..."

মাধালি বললে, "মাকড়ী বড়িয়া কথার জবাব কি জান, আমি বুলতে লারলাম, কোন রাস্তারে দেখনা মাটি দিয়ে কত রাস্তা কষেছি আমি গিরিমাটি মুঠো করে ভরলাম, গিরিমাটিগুলো মুরগীর ছানার মত হাতের মধ্যে দিপ্ দিপ্ করল। বুঝলাম না সেগুলো কি বলে, উপাশে জঙ্গলে না কসাইএর

তীরে...দেখলাম পাখীর পথ নাই...দেখ দেখ"

লুহানী এতক্ষণ উদ্বেগে উবু হয়ে বসেছিল, সে পাখীর দিকে চাইল, যে পাখী আতা গাছে, যে পাখী জল খায়, যে পাখী যে পাখী প্রচণ্ড ডানা প্রসারিত করে পায়ের আলস্য ভাঙালে...

"আমি ডানা লুব, আমি পথ দেখে লুব..."

লুহানীর এ কথা শুনে অত্যন্ত নয় ছয় হল। এমন কথা বলতে ইচ্ছা করল—"আমি তোকে ডানা দিব।"

অনেক মেলা খেলার কথা তার মনে এল, অনেক গিরি গহ্বর, যেখানে সহজেই তার মনে হয়েছে এখানে ঐশ্বর্য্য আছে, পাহাড়ী বুনো জলে, যে সরের মত কি ভেসে যায়, তাতে রামধনু রঙ থাকে, লুহানী গরু চরাতে চরাতে শুনেছিল, সূর্য্য পৃথিবীকে বড় ভালবাসে একটু একটু সে তার মধ্যে লুকাচ্ছে, সেই আলোগুলোই বর্ষায় রামধনু রঙ ধরে বার হয়ে আসে...সেই ফাটলের মধ্যে গেলে হয়ত পথ আছে।

মাধালি বললে "আমি শালা খুঁজে লুব"—কথাটা তার যেন হেঁতেল। লুহানী একটু ভীত হয়ে তার দিকে চেয়ে রইল, যেন এ কথায় থানা দারগা হবে! লুহানী তাকে বিশ্রাম দেবার জন্য বল্লে, "হ্যা গো...লৈবীর বৌ বুঝলে, বাইবেল পড়ে নাইত কি শুনছেত, পাখীরা মাই দেয় না বলে, বলে কি আর মা লয় গো...ভারী জব্দ হল মাকড়ী!"

অন্ধকার হয়েছে দুই ভাই বোন চলেছে, লুহানীর উৎসাহের আর সীমা নাই। মাধালি পিছে পড়লে আবার খর পায় তাকে ধরে নেয়। ভেবেছে, আজ রাতে কলাই সিদ্ধ, কাল যেটুকু তেল আছে মাধালিকে মাখতে দেবে!

লুহানী বললে, "চল আমরা গির্জা থানে যাই, তুই ডাকবি...আমি দেখব..." মাধালি...দুঃখময় মুখটি যেন দেখতে পেলে, রাজী হল।

"কখন তুয়ার গলায়...মায়ের স্বাদ থাকে..."

লুহানী, অসম্ভব গর্ব অনুভব করলে, কাপড় ইতস্ততঃ ঠিক দিতে ভুলে গেল, শুধু বলেছিল, "মা...মা...।"

"এমন হয় লুহানী আবার আমি, হামাগুড় দিয়ে আবার আসি, মায়ের পিঠ দেখলেই কান্দি...আবার আবার"

মাধালির কথা লুহানীর শূন্যতার সঙ্গে জুড়ে গেল। সে সুদীর্ঘ সুড়ঙ্গ, একমাত্র শুদ্ধ স্বর বেজে উঠে ক্রমে লুপ্ত হল। ফিরে পাওয়ার যাদু সে জানে, সেটা বিষাদ ছাড়া অন্য কিছু নয়। লুহানী দেখলে, এখানকার অন্ধকার অনেকটা বাতি না দেওয়া গির্জা থানের মত, মনে হল এখনি জন, যে বাতি দেয়, সে আলো জ্বেলে দিয়ে যাবেই।

তারা দীর্ঘ পথ অতিক্রম করলে, এসে দেখলে, সেই বুড়ী যে আচারের মত হয়েছে, যে ভিতরে ভিতরে পচ্‌ছে। সে কবর স্থানে পড়ে কাঁদছে, যেখানে তার ছেলে আছে, স্বামী আছে, এখান থেকে দেখে মাধালির মনে হল, ধৌরী তেলের উপর যেমন টিকটিকি পোকা মাকড়, নানা হাড় থাকে, এই জীবগুলির কালচে তেল...এদের গা থেকে তেল চুঁইয়ে পড়ছে। তেমনি একটা টিকটিকি অন্ধকারমাখা উল্টা পাল্টা আর কাঁদে তিন লাসের তলায় তার ছেলে সাত লাসের তলায় তার স্বামী। মাধালি আর লুহানী দুজনে এ দৃশ্য দেখল। মাধালি শুধু একবার কি ভেবে স্মিত হাস্য করেছিল। দুজনে নমস্কার করলে বললে, "হারে...হায়রে"

লুহানী বললে, "মানুষ মরে কেনে..." বলে ছোট এক দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলে। দুজনেই এ রাস্তার অনেকদূর দিয়ে যেতে পারত, কিছুটা খাদ্য যেমন হাসি আনে তেমন দুঃখ করার সাহসও দেয়, কিসের জন্যে তাদেরও দুঃখ করার ছিল। তারা এই পথ দিয়ে এসেছিল, তারা যখন গির্জাথানে মাথা ঠুকে দাঁড়াল, তখন দেখলে পিটার তাকে এই আবছায় গালে হাত দিয়ে সংযত আনন্দে তবু বললে "মাধালি...আমি ঘুমাইনি—তুমি কিছু পেলে..." পিটারের গলায় যেন চার আকাশের ক্ষুধা ছিল।

মনিষের পিঠ থেকে সকাল আকাশে উঠে গেল, সূচের পিছনে সুতার দৈর্ঘ্য বনানীর সূক্ষ্মতা রয়ে গেল, সকলেই ধন্যবাদ দিলে, মাকড়ীর গলা শোনা যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে গরু তাড়ানোর আওয়াজ,

সামনে এখন ঘুমন্ত ছেলেটি।

সামনে দাঁড়ান রাখাল ছেলেটি, দুটি জোন্‌রা চিবোন হয়েছে, হাতের বাঁশীটা এখন স্বর তুলবার চেষ্টা করছে। মাকড়ী তাকে বললে, "মাধালি এসেছে কিনা, একটা সাড়া দিবিরে..."

কাদাটে রাস্তা দিয়ে গরুগুলি যায়, পিছনে রাখাল বাঁশীতে কিসের একটি আওয়াজ তুলেছিল। মাকড়ী দাঁড়িয়ে, তার মনটা ভাল ছিল না, অভিমান তার এত হয়েছিল যে সে একা হয়ে পড়েছিল, এখন সে দুপুরে গরু দেখার ছল করে, এক টিলায় গিয়ে বসে থাকত, আর লোকেরা সকল জায়গা থেকে খবর এনেছে—তাকেই মাকড়ী মন্দ করেছে, শুধু মনে হয়েছে, মানুষটা সত্যই ধর্ম পথে গেল, এর পরের কথাটা সে ভাবতে সাহস করেনি, দুঃস্থর ঘরের শূন্য হাঁড়ী হোলো যেমন চিমটি কাটে সেইরকম তাকেও কে চিম্‌টি কাটতে লাগল।

একদিন, কেউ বড় একটা কারো বাড়ী যায়নি, তার কারণ অনেক অংশে লুহানী। কেউ না কেউ কিছু না কিছু ছুতা করে আলগা থাকতে চেয়েছে। এমনকি নিজের বাড়ী থেকেও। মাকড়ী ভেবেছে, হায় হায় এতগুলা ছেলে পিলা। বিলাহী এবং আর অনেকে মূর্খের মতই ভেবেছে এবং ছোট নিঃশ্বাসে ভাবনা থেকে অব্যাহতি পেয়েছে। যারা আরও দুরদান্ত তারা স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করেছে, লুহানীকে নিয়ে কলিয়ারী পালাবার কথাও ভেবেছে। আজকে সকলের আসার কথা...কেন না, জগা মুচিকে সায়েস্তা করা উচিৎ; সুতরাং সকলেই যাবে।

রাখাল ছেলেটি দেখল, লুহানী দেওয়াল নিকচ্ছে বললে, "মাধালির কি খবর..."

"ই দেখ কে বসে" বলে একটু সুশসুড়ি পেয়ে "আঃ" বলে উপর দিকে তাকালে, খড় চুইঁয়ে জল পড়ছে। সদর দরজার ছায়ায় মাধালি বসে খড় থেকে ঝরে ঝরে পড়া জলবিন্দু দেখছিল। রাখাল ছেলেটি একবার দেখেই মুখ তুলে বললে, "আসছে হে" বলেই নিজেকে টেনে নিয়ে এগিয়ে যাওয়া গরুর পিছনে ভীত হয়ে ছুটল। একবার সে মুখে বাঁশী তুলেছিল।

মাকড়ী নিজের মধ্যেই বার বার ডুব দিলে, খানিকটা গীতসংসহিতা বলে গেল। খানিকটা থমকালে। নিজেই মাধালির হয়ে অনেক প্রশ্ন তুলেছিল, এবং [illegible]করা উত্তরও দিয়েছিল। ভেবেছিল যদি সে এদিকে আসে তাহলে তার সঙ্গে কথা কইবে, মাধালির ভুল ভাঙিয়ে দেবেই।

যখন খড়ের জল বেশ শুকিয়েছে, তখন মাধালি এই পথ দিয়ে গির্জা যাচ্ছিল, কারণ লুহানীর ইচ্ছা সে গির্জায় যায়—শুধু মাথাটা ঠেকিয়ে আসবে, ভিতরে যাবেনা কেননা তার কাপড় বাসি। আর সে কিছু পালা সংগ্রহ করে আনবে, এ কদিন সংগ্রহ করা হয়নি। মাকড়ী বাড়িয়ার ওখানে এখন অনেকেই ছিল, কারণ মাঠের কাজ নেই, বনে-যাওয়ার-কাজ সবাই মিলে একসঙ্গেই যাবে। এখানে সেই মিলটা হয় মাকড়ীর চালার দাওয়ায় বসে। একটি ছেলে, দুলে-দুলে বাইবেল পড়ছিল, তার মাথার কিছু উপরে দেওয়াল, একটা ছোট ভাঙ্গা আয়না গাঁথা।

মাধালিকে দেখেই সকলেই "ওই যায়" বলে উঠল, সবাই দাঁড়িয়ে উঠেছিল, কিন্তু তাকে কেউ ডাকতে পাচ্ছিল না। শরীরটা তার রুক্ষ শুকিয়েছে, কিন্তু কোথায় যেন তার মাংস লেগেছে। মাকড়ী বৌ ধান ঝাড়ছিল দাঁড়িয়ে। কুলাটা এগিয়ে কাত করে, একটু অল্প পিছনে সরাল। সে-ই-সে অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইল, কুলা থেকে সব ধান নীচে পড়েছে, কুলাটা সেই ভাবেই ধরে দাঁড়িয়ে, নীচে যে ছেলেটার গায়ে তুষ পড়ছিল আর আনন্দে নাচছিল সেও মায়ের মুখ দেখে কিছু বলতে গিয়ে ফিরে দাঁড়াল। মাকড়ী বৌ আজ অনেক দিন পর মাধালিকে দেখে বিস্মিত হয়েছিল, মনে হয়েছিল লোকটি চেনা চেনা! গলার স্বর প্রথমে আটকে যাতা স্বর বার হল, তারপর ডাকলে, "মাধালি ঘুমরির ছেলে মাধালি—হে"—বলেই কুলো ছুঁড়ে ফেলে দিলে, মুরগীগুলো কোঁ কোঁ করে দূরে গেল। সে দৌড়ে পাঁচিলের কাছে এসে বললে, "মাধালি এস হে এস হে" বলেই দাওয়ার কাছে যে পারকোম ছিল খাড়া করা, সেটাই টেনে ওপাশে কাঁঠাল গাছটার তলায় এনে পেতে দিলে। হাঁফাতে লাগল।

মাকড়ী একটু বিরক্ত হয়েছিল, ছেলেটা বাইবেল পড়া থামিয়েছিল, তার রাগ পড়ল, সে ছেলেটাকে মারতে তেড়ে এল, ছেলেটা সুরু করলে। মাধালি এসে, মাকড়ী বৌর বিনীত অনুরোধে পারকোমে বসল। একবার ছেলেটির দিকে চাইতেই মাকড়ীর বড় গর্ব হল, বললে "জোরে পড়, না হলে মারব রে"

মাধালি ছেলেটিকে দেখছিল, ছেলেটি খুব পাখোয়াজ, একবার সে তার বাপকে বিশেষ জব্দ করেছিল, ছেলেটার হাত পা বাঁধা, কি যেন দুষ্টুমি করেছিল, বাপ তার সামনে খেতে বসে স্বভাবমত জোরে প্রার্থনা করছিল, হয়ে যাবার পর, ছেলেটা বললে, "তুমি বেঁধে রাখলে প্রভু দিবে কি করে খেতে, বলছ ত বড়, সবাইকে দিও!" সে কথা ভেবে মাধালি একটু হাসল। মাকড়ী বৌ স্বভাবত নরম গলায় বললে, "কুথাকে ছিলেহে, সিদিন তোমাকে দেখার লেগে গেলাম, দেখলাম না...বল কথা বল..."

"কি বুলব"

"তবু"

"আমি মাধালি কিস্কু হই আছি...কিছু জানি না..."

এই কথায় সকলেই চুপ হল, মাকড়ী বৌ বেচারী সে ভাবল নিশ্চই আমাদের চাইছে, তার অভিমান হল। মাকড়ী এই কথায় একটু হাত পা ফেলতে পারল, কিন্তু নিজে কিছু প্রশ্ন করতে সাহস করল না, কালো সিং এর কানে কানে বললে "তুই কিছু জিজ্ঞাসা কর..."। এছাড়া আর যারা এসেছিল, তারাও ফিস ফিস করতে লাগল, তাদের কারও গলায় অবজ্ঞা ছিলনা, তবু এই শব্দ মাকড়ী বৌকে বেশ ভাবিয়ে তুলেছিল, মাধালির মনে হল, তার বাপ যখন মারা যায় পাঁচিলের ধারে এখানে ওখানে এমনি আওয়াজ সে শুনেছিল। সে সকলকে আবার বললে, "আমি মাধালি কিস্কু আছি।"

"এত রাত বেরাত করলে, ধানের গোড়া লাগল, আর তোমার কোথায় গোড়া লাগল না"...

কিছু কিছু করে বেশ কিছু লোক এসেছিল, অনেকেরই কানে এই প্রশ্নটা যায়নি, মাকড়ী বৌ এবং লৈবীর বৌ এরা একথার জন্য শুধুমাত্র নাক ফুলিয়েছিল, মাধালি হেসে বললে "তুমি যেমন কালো সিং, উ যেমন মাকড়ী বাড়িয়া আমি তেমন মাধালি কিস্কু—"

মাকড়ী কালো সিংকে আবার ঠেলে দিয়েছিল। তাই বললে "না তুমি ঘুরলে বলেই আমি বলি"—

"এ থানায় দশ থানায় আমার কাছে নূতন কিছু নাই, শুধু ডিম এক...এখন তুমাদের বড় নূতন বলি মনে লয়—"

মাধালির অবশ্য বেশ ভাল লাগছিল, এত লোক তার জন্য ঘিরে, তাকে যেন এরা তার সকল দিকে আটকে রাখতে চাইছে, একবারও মনে হলনা যে অন্তত কয়েকজন তাকে বাঘ ঘেরা করছে। মাকড়ী বৌয়ের কিন্তু তার চেহারাটা দেখতে খুব ভাল লাগছিল চোখ লাল চুলের উপরে অসংযত রাত্রের স্মৃতি ছিল, তবু তার মনে হয়েছে কাঁধে যদি একটা গামছা থাকত। আবার মনে হয়েছে যদি একটা আঙরাখা থাকত তাহলে তা হলে সত্যিই, সাধুর মত দেখতে হত। যে সাধু মানুষের ভাল করেন। সে একটা নিঃশ্বাস ফেলেছিল, খুব ছোট কিন্তু তাতে একটা ফুল নড়ে উঠে।

মাকড়ী নিজের শেষ তেমন কোন অভিজ্ঞতার সূত্র পেলে না, তাতে বাঘও ছিল না, ভোর বেলাও ছিলনা। সে দাঁড়িয়ে দাওয়ার একটা বলনা ধরে একবার তার ছেলেকে ধমক দিলে "তুই পড়্না" বলেই মাধালিকে বললে "দেখ তুয়ার রকমটা কি ভাবি, লুহানীটা এক রকমের তার কপাল মন্দ সে তুমাকে বলেছে, খাওয়াবে আর তুই এত কি পাইছ যে মাঠে মাঠে ঘুর তোমার সরম হয়না হে...আর পাঁচ পঞ্চাশটা লোক তার গায়ে ভীড়তে চায় এমন কি জগা মুচি..." বলে ইচ্ছে করে নিজের দেহকে কাঁপাতে লাগল, এমত যেন সে লুহানীর অপমানে, ঘোলা হয়ে গেছে। সবাইকে সম্বোধন করে বললে "বুঝ বুনদাই ঠোঁটে লিয়ে আসবে, আর তুমি বসি খাবে তুমি ভগবান পাবে?"

"প্রার্থনা জানে না বাইবেল দেখে নাই—ভগবান পাবে..."

অনেক অনেক সময় হয়েছে যখন মাকড়ী বৌ স্বামীকে শান্ত করেছে, কিন্তু এখন সে বুঝতে পারল...এখানে না দাঁড়ানই ভাল, বার বার মাধালির ম্লান মুখটা তাকে ব্যথিত করেছিল। সে আর যারা স্ত্রীলোক ছিল, তাদের একজনের কাপড়ে হঠাৎ টান দিয়ে, চলে গেল। একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, অনেক লোক সেখানে জমা, অনেক অন্যান্য বাড়ীর কুকুর এখানে সেখানে গোঁ গোঁ করছে, এক এক বার খাঁক করে উঠে এবং মুরগীগুলো ভীত হয়।

"আমি লুহানীকে খাবার যোগাড় করতে বলি নাই, আমি স্যাঙা করতে বলি নাই।"

সকলেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও রোদের দিকে চাইলে, যেন চলে যাবার সময় হয়েছে। এরা সকলেই

মাধালির উপস্থিতিতে আবেগ উপলব্ধি করেছিল যদি কোন জীবনের সুরাহা হয়; দাঁড়ি পাল্লা পাই আর খাজনা অভিশপ্ত দিন যদি নির্ঝঞ্ঝাট হয়! ফড়েদের জুয়াচুরির কথা ফাদারকে বললে হয় কিন্তু ফ্রান্সিস মহাজনদের বকাঝকা করলে, তারা মাল নেবে না, এমন কারো সাধ্য নেই এক হাট হাত গুটিয়ে বসে থাকে অথবা নিজেরাই দূর শহরে সামগ্রী নিয়ে যায়। সকলেই অস্বস্তি অনুভব করছিল।

একজন বললে, "রুহ হে লোকটা রাত বেরাত করল, আমার মনে লেয় নিশ্চয়ই কিছু সিদ্ধাই পাইছে এখন লুকাইছে..."

মাধালি, পারকোমে একটা হেলান দিয়ে রাখা কুডুলে ঠাণ্ডা অনুভব করতে করতে বললে—"কিছু পাই নাই শুধু জমি দেখেছি শুধু আকাশ দেখেছি—" "তবে কিসের লেগে বোনকে স্যাঙা করতে বুলাহে—" বলে মুখটা আহ্লাদে ভরিয়ে দিয়ে মাকড়ীর দিকে চেয়ে দেখলে যে সে তখন ফুঁসছে, এবং সে একটু রগড় করে সমস্ত ব্যাপারকে হেয় করতে চাইলে সাধারণ মাধালিকে তার স্মরণ হলনা, বললে "দেখেছি আঁড় তাড়ায় ছোঁড়া মোরগ লতাপাতাকে মুরগী ভাবে ঠোঁট তাকে জব্দ করে যেন তার ঘাড় ধরেছে" বলেই সে তার নিজের উরুতের পাশ চাপড়াতে গেল...তৎক্ষণাৎ দেখলে, বিরাট দেহটা নিমেষেই কুডুলটা হাতে তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। মাধালি তার হীন রসিকতা বুঝতে কিঞ্চিৎ মাত্র সময় নিয়েছিল। অন্যান্য সকলেই একমুহূর্তে তাকে সবাই চেপে ধরল। মাকড়ী ভীষণ স্তম্ভিত হয়েছিল, বিশেষত কালো সিংয়ের নোংরা কথায় এবং মাধালির এইভাবে দাঁড়ানতে। বুঝল, মাধালির এখনও সেই মেজাজ আছে, তার ঠাকুরদা যে যুদ্ধ করেছে ইংরাজের সঙ্গে এবং বিচারে ফাঁসি হয়েছে, সে গল্প আরও সত্য হয়ে উঠল। বারুদের বিরুদ্ধে শুধু তীর ধনুকে যারা লড়েছিল, ঠাকুরদাদার বাবা যুদ্ধ করেনি তবু নিশ্চয়ই কিছু ছিল যার একটু পেয়েছিল, মাধালির সেই একটা গর্ব ছিল। সে গর্ব বোধ হয় সত্য।

মাধালি কুডুলের দিকে একবার তাকিয়ে দেখলে, নিজের ভিতরে যে কম্পন ইতস্তত হয়েছিল, তা রোমকূপ দিয়ে বার হয়েছে; কুডুলটা যার তাকে দিলে, এবং সেই কালো সিংয়ের কাছে এল, বললে, "তুমি দেকোপুসী, তুমি এসব কথার কি বুঝছ হে? তুয়াদের কে ঠাকুর দেখেছিল তার মরণ হঁইছিল তুয়াদের আর কি বুলব, তুয়াদের না...যানে...ঢুকতে দেয় না, জুতা...কষে!"

মাধালি একটি কথাও অসঙ্গত বলেনি...কুঁদটাঁড়ের ভুখাই একবার বাঁকুড়া গিয়েছিল হঠাৎ দেখেছিল এক বামুন ছোট ছোট ঠাটে চেলি জড়ান কালো মূর্তি কি আনছে, কালো পাথরে তিলক ফোঁটা করা। বামুন হাঁকছে, "নারায়ণ আছে" একজন চামর দোলাচ্ছিল, বললে, "ছোট জাত দেখ না, পাপ লাগবে গো।" ভুখাই ভয়ে চোখ ফেলেছিল। তারপর তার মৃত্যু হল। মন্দির আর ভগবান ছোট জাতের কাছে বীজাণুর মত। সে বীজাণু দৃষ্টিতে ভর করে আসে!

মাধালি নাকটা টিপে ঠিক করে নিয়ে বললে, "আমি যদি কিছু না বুঝতুম রে, তাহলে তুয়াকে, আমি...শকুন খোরাক করে দিতুম..."। কালোসিং তখন রক্ষা পেয়ে নিজের কান নাক মুলছিল। আর মাঝে বলছে, "তুই আমার বাপ তোর খাইরে...মার খেগো লোক মানুষ লইতো...তুমি পেয়েছে হে কোম্পানী ভগবান তুয়ার—"

মাকড়ী মাধালিকে একবার আড়ে দেখেছিল, যেমন আলো দেখে নিলে, যেমন আলো দেখলে ঘরে বন্ধ পশু-পাখীরা চোখ খুলে। তার অহঙ্কার ছিল, গির্জায় যদি কেউ বেশীক্ষণ চোখ বন্ধ করে থাকে তাহলে তার মনটা টনটন করে, সে আবার চোখ বন্ধ করে। প্রথমে মাধালির কথাকে সে উড়িয়ে দিলে, কিন্তু দর্পকে সে মোটেই সহ্য করতে পারছিল না। অন্যান্য লোকের ভাবগতিক দেখে, ভীষণ রেগে গেল, ভাবলে, কাউকে আর এক আদলা ধার দেবে না; কিন্তু আদতে তার বলার কথা ছিল—"এ রাগ যার সে ভগবান পায়নি।" মাকড়ী থেমে যাওয়া ছেলেটা, সজাগ করবার জন্য মাটিতে একটা চাপড় দিয়ে বললে "তুয়া পাঠ ছাড়লি হে..."

মাধালি গম্ভীরভাবে বললে, "মাকড়ী তুয়ার রাগ কেনে আমি বুঝতে লারলাম, আমি যদি ধম্ম পথে যাই...তুয়ার কি ক্ষতি হে..."

"ক্ষতি আমার কি...আবার কি হে...তবে গির্জা আছে, পাদরী আছে..."

"তুমিও আছ—" লৈবী বল্লে।

"আমার কথা ছেড়ে দাও, আমি ত কীট বটে তুয়ার ব্যাপার কি...দিনরাত্রি মাঠে মাঠে গির্জায় সকাল

সন্ধ্যা আছে, আকাশ জোছনা সব আছে...তুমি ঘুর মিছে।"

মাধালি চুপ করে রইল। সে কি যে উত্তর দেবে ভেবে পেলে না, বারবার তার মনে হয়েছিল তার অভিজ্ঞতার কথাই বলে। কিন্তু যেন জোরই পাচ্ছিল না এবং কথা সে সাজাতে গুছোতে পারছিল না। মাকড়ী একটু বুঝল তার যেন মেরুদণ্ড আছে, একবার দেখে নিল তার স্ত্রী আছে কি না। কারণ স্ত্রীকে তার সমীহ করতেই হয়। বললে, "হে কেঁন্দে ভাসাতে হয়—হবে কসাই-এ ঢল আনতে হয় তবে।"

"কিসের জন্য কান্দব—"

"তাকে ডাকিনি বলে কান্দব"...বলেই তার গলাটা পাদরীর মত গম্ভীর হয়ে উঠল—" সুখে-দুঃখে হাঁড়িতে যেদিন নাই সেদিন তাকে ডাকতে হবে, যেদিন আছে সেদিন ডাকতে হবে হে—" বলে সে আসতে আসতে উঠে দাঁড়াল। " তাকে ডাকিনি বলে কান্দব—"

"তুমি কান্না কাকে বল হে..." বলে নিজে নিজের কথায় ভারী হয়ে উঠল। এই প্রশ্ন মাকড়ীকে একটু বিভ্রান্ত করলে, একবার মনে হয়, থেমে যাওয়া ছেলেটিকে ধমক দি...এরপর কাপড়ে হাত ঝাড়তে ঝাড়তে বোকার মত হেসে বললে, "কান্না যদি বুঝতে হয় তাহলেও তুয়া ঠাণ্ডা হইতে ভেব না হে তুমি অনেক ডাক তাই তোমায় বলি..." বলে গম্ভীরভাবে তার দিকে চেয়ে বললে, "আমার কথা ছাড়াই লোকগুলো, ধান তল্লাস করতে কান্না শুকায়, ইয়ারা কান্না কুথাকে পাবে ইয়াদের জীবনটাই তো কান্না হে।"

"পাপ করলে, লোকের কষ্ট..."

"ইয়ার পাপ বাটাদারের পাপ নাই"...মাধালির গলা ত্রাসের সঞ্চার করল।

মাকড়ী দেখলে প্রসঙ্গ বড় বৈষয়িক হয়ে পড়ছে; কিভাবে তাকে আবার ঘুরিয়ে সোজা রাস্তায় আনা যায়। নিজে হঠাৎ অসংযত কথা বলে ফেলার জন্য বড় লজ্জা হচ্ছিল, নিজেই নিজের বক্তৃতাকে সে পথ বন্ধ করল। একবার ভাবল বলে, "তোমার মুখে পাপপুণ্যের কথা সাজে না; কারণ, তুমি এখনও ভয়ঙ্কর হয়ে আছো। তোমার অসুবিধা হলে তুমি হাট ভেঙে দাও। সেবার হাটে যখন পাদরী অনন্ত জীবনের কথা বলেছিলেন, কে একজন দুঃখী ভিখারী বলেছিল, কথাটা সে বুঝে নি, "এমনিতে খেতে পাইনা তার উপর অনন্ত জীবন। মরতে পারলে বাঁচি!" সেই রুগ্ন লোকটাকে তুমি এমন মেরেছিলে যে ফ্রান্সিস পাদরী থরথর করে কেঁপেছিল, তোমার হয়ে তিনদিন তিন রাত প্রার্থনা করেছিলেন, উপোষ রেখেছিল। কেননা প্রভুর কথাকে তুমি রগড়ে পরিণত করেছ! সুতরাং তোমার পাপের ফলে আজ পাঁচখানা গাঁয়ের লোক আমাদের দেখলে বলে, "তোদের কপালে অনেক দুঃখ। তোরা অনন্ত জীবন পাবি।" এসব কথা বলতে গেলে এখানে বচসা হবে'—মাকড়ীর ঠোঁট কেঁপে উঠেছিল কিন্তু বড় বড় হাঁ করে যেন কথাগুলোকে ভিতরে ঠেলে দিলে...।

মাধালি আস্তে আস্তে গিয়ে কাঁঠাল গাছটা ধরে বললে, "দেখ বড়িয়া মহুয়া চিন সব চিন, মানুষের কথা চিন না...আমি চিনি...যে হাঁড়িতে চাল নাই সে হাঁড়িতে পাপ আসে না ছেঁড়া লোকের মধ্যে পাপ ঢুকে না...। বিরাশীর কথা আমিও বলি, দেখ না আড়াটার মধ্যে পাপ ঢুকার পথ নাই—"

কোনমতে মাকড়ী বললে, "থাক ভাই আর কথা লয় একটা চুটা খাও—, তুমি যা বুঝ বুঝ" মাকড়ী রাগে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করে বললে, "তোমার সঙ্গে কি কথা কহিব হে কি হে কবো—পাপ নাই—"

মাধালি এখানে এত লোকের সামনে হঠাৎ যেন লজ্জিত হয়ে গেল। কি এক কথা তার গলায় বারবার এসে থেকে গিয়েছিল; যে কথা কোনসূত্রেই কারও কাছে বলতে পারে নি। রোমনির কথা, ফলে নিজের কামের কথা, এবং সে এখন তা হাতের মুঠোর মধ্যে এনেছে, সে কথা বলবার বাসনা তার হয়েছিল। সকালে উঠে ফ্রান্সিসের কাছেই সে যাচ্ছিল, সে কথা বলার জন্যে। কিন্তু এরা ডাকতেই সে চলে এসেছে। তার শেষ কথাগুলির সঙ্গে মাকড়ী বেশ খুসী হয়েছিল, সে তার ছেলেটিকে বলেছিল, "সে পড়...সুখী তারাই...সুখী তারাই যাদের অন্তঃকরণ নির্মল..." এ কথা শুনতেই এখানে সে প্রশ্ন করেছিল নিজেকে, কোথায় যেন সে নিজে কোম্পানীর বুটের মত বিশ্রী ভয়ঙ্কর তার মধ্যে সব জানোয়ার নাচে কোঁদে, এর জন্যে সে তো অনুতপ্ত হয়েছে যখন সে বুঝেছে। এক হাতে কাপড়টা টানতে টানতে টিলার পর টিলা অবনত মস্তকে সে অনেক পথ এসেছে। কোন বিশ্বাসে পাথরে রক্ত আছড়ে পড়েছে। ধীরে

মাথাটা তুলে বললে—"আচ্ছা মাকড়ী বড়িয়া এমন হতে পারে, খোদ ইয়ার পাপ, বাটাদারের পাপ নাই" মাকড়ী তাকে সমস্ত বিষয় অস্বীকার করবার চেষ্টা করেছে। নিজেকে সে নত করার জন্যে একটু লজ্জা হল, ভিতরে কে যেন লাফ দিয়ে মাথায় উঠল। "তুমি আমার কথা বুঝনি" "এই তুই থাম একটু" বলে ছেলেটা থামালে। ছেলেটি বাইবেল থেকে মাথা তুলে বাপের দিকে তাকাল।

"আমার কাম ছাড়া আর কিছু নাই...আমার ভয় ছাড়া আর কিছু নাই।"

এক সত্য ভয়ঙ্কর, মাকড়ী এবং লোকেরা সকলেই যদি অন্নহীন, তবু তাদের কাম আছে, যদি বনে বনে ঘুরে ভয় ছিল। এরা শুধু চোখ বড় বড় করে মাকড়ীর দিকে চাইলে। কিন্তু মাধালি উত্তর করলে, "আমার শালা মেঘ ডাকলে কাম হয়, আমার শালা ব্যাঙে পোকা ধরলে হয়, ভাবলাম শালা আমিও কোথাও পোকার মত ভয় পেলে হয়, আমি মাগী চাই এ কেনে বল...আমি জানি পাদরী তা বলবে না, আমি জানি বিরাশী বুলতে হয়ত পারে কেনে হইছিল।"

"তুয়ার মাথা খারাপ! লাও আয়নায় মুখ দেখবে, চল চলহে...আজ হাল তোড়ার হাটে"

মাধালি এ কথায় ক্ষিপ্ত হয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল, এবার সে নিজের স্বীকার নিজেকেই ছোট করেছে। কোনমতে নিজেকে সংযত করে বললে—"ওহে সেই জায়গাটা পড়ত হে...কি বললি তারা পায়"

ছেলেটি আবার সেই স্থানটি দুলে দুলে পড়ল। "নির্মল অন্তঃকরণ তারা পায়"...

মাকড়ী বৌ কিছু দূরে দুধ দুইতে দুইতে মাধালিকে দেখছিল আর বুঝবার চেষ্টা করছিল।

মাকড়ী তৎক্ষণাৎ বললে, "রুইলেই ধান হয় না, হে, সময় লেয় বাজে কথা ছাড়"

"তাই বটে" বলে, যেই দরজার দিকে যাবে বলে মুখ ঘুরিয়েছে, দেখতে পেলে, গলিত মোমের একটি মুখ আর খানিক ধড়; দেখেই মাধালি দু পা সরে গেল।

অদ্বৈতকে দেখে সমবেত জনসমাজ ত্রস্ত। সকালের আলো যেন বা অক্ষম, প্রত্যেকের মুখ ঘৃণায় কি যেন বা কূট অনৈতিক গন্ধে সিঁটিয়ে গেল। মুখের মধ্যে যেন জ্যান্ত সাপের মাথা ঢুকে গেছে। কুড়িয়ে খেতে, বাসি পচা খেতে যাদের মুখ ব্যাজার হয় না, তাদের গা ভয়ে গুলিয়ে উঠল।

অদ্বৈত মিশ্র এদের এভাবে দেখা দিয়ে নিজেই বড় লজ্জিত হয়ে মুখটা নীচু করলে, তারপর মুখটা আস্তে আস্তে তুলে বললে, "কি হে..."

"ঠাকুর পো..." মাধালি বলে উঠল।

"তবু ভাল চিনতে পারলে হে"

মাকড়ী এবং অন্যান্যরা যে কার জন্যে ভীত হবে তা ঠিক বুঝে নিতে পারল না। ছেলেটা দেখেই ভীত হয়ে বাইবেল পড়তে আরম্ভ করলে, সমবেত লোক তারা ঠোঁট কাঁপিয়ে "প্রভু প্রভু" বলতে লাগল। একমাত্র মাকড়ী বৌ গরুর দিকে চেয়ে দুধ দুইছিল সে লক্ষ্য করেনি।

মাকড়ী থুতু ফেলে বললে, "কি চাও হে ইখানকে" মাকড়ীর থুতু ফেলা দেখে আর সকলে যে সেখানে পারলে থুতু ফেলল।

মাধালির চোখে জল এসেছিল, অদ্বৈতর দিকে চেয়ে সত্যিই তার গাল বেয়ে জল পড়ল, অদ্বৈতর দিকে তাকিয়েই বললে—"উয়া আমার কাছে এসেছে..." বলতে বলতে অল্প একবার মুখ ফিরিয়েছিল। তারপর হঠাৎ কি হল, সে পারকোমটায় উঠে ডিঙিয়ে নেমে দৌড়ে গিয়ে; অদ্বৈত মিশ্রকে জড়িয়ে ধরল। আর বলতে লাগল, "ঠাকুরপো তোমায় সত্যি কতদিন দেখিনি গো" বলতে বলতে কাঁদতে লাগল, এবং তার একটা হাত মুখে, পিঠে বুলাতে লাগল। ভয় ত্রাস থেকে অপরিসীম বেদনা তার মধ্যে ভেঙে পড়েছিল, অনেকদিন প্রতীক্ষা মানা দেহ যেন আর একটি দেহকে পেল, সে যে কিভাবে তার আনন্দকে উপভোগ করবে তা ভাববার সময়ই পেলে না। নিজের দেহের উষ্ণতা সে বুঝতে পারলে, এই উষ্ণতায় তার আহার নিদ্রা আর কামনা আরাম সমস্তই এক হয়েছিল। পলকের জন্য সুস্থতা যদি পেত তাহলে হয়ত বলত, "ভাত কাপড় চাই না...কিছু চাই না এই উষ্ণতা চাই। এমনিভাবেই পাথর হয়ে যাই!" জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভারতীয় রমণীর সৌন্দর্য্যে এত আনন্দ দিতে পারে না।

অন্যান্য সকলেই দরজার এ দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত, তারা দেহ ছেড়ে যেন চলে গিয়েছিল, এ মিলন দৃশ্যকে তারা একান্ত করে দেখছিল কিনা তা নিশ্চয় করে বলা যায় না। মাধালি তখন তার পিঠে হাত বুলিয়ে চলেছে, এক একবার উঠা নামাতে তার এক একটা কথা বলা হয়ে যাচ্ছিল। সে অনেক কথা

অদ্বৈত সে কথার মধ্যে ছিল, রুগ্ন ভিখারীর কথা এর মধ্যে ছিল এবং আরও অনেক কথা যা সে নিজেই এখন মনে করতে চাইছিল না।

মাকড়ী বৌ এ সকলের নিঃস্তব্ধতা দেখে বার দুয়েক ঘাড় ফিরিয়ে দেখে দুধের কেঁড়েটা রেখে উঠে দাঁড়াল, এখান থেকে ভালভাবে দেখা যায় না যে দরজায় কিছু হচ্ছে, প্রথমে তার মনে হল সেই ভয়ঙ্কর দারগা এসেছে, তারপর মনে হল দেখি। পা টিপে টিপে এগিয়ে গিয়েই স্তম্ভিত তার চুলটা শুধুমাত্র খসে গেল। মুখ বিস্ময়ে আদখোলা হয়ে রইল। একটু পরে বলল, "মা-ন্-ধা-লি...না?" বলতেই তার গা শিউরে উঠল। তার গলায় আর সকলে সম্বিৎ ফিরে পেয়েছিল; মাকড়ী আবার থুতু ফেলে বললে, "মাধালি...মাধালি..." বলতে বলতে এগিয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে আর সকলে তার পিছু পিছু এগিয়ে গিয়েছিল।

মাকড়ী কোনমতে সাহস সহায় করে "হেই হেই" করে উঠল, বলল—"মাধালি ক্ষ্যাপা হইছ নাকি ছাড়...ছাড়" কেউ কেউ তার সঙ্গে গলার স্বরমাত্র দিয়েছিল। কার দিকে যে চেয়ে কথা বলতে হবে এ কথা তারা ভুলে গেল।

বনডহর পেরিয়ে—হুড়তির পথে বহুক্ষণ দাঁড়িয়েছিল, কি যে সে করবে...যাবে কি যাবেনা, ভেবে পায়নি। অনেক কথাই মনে পড়ছিল—এবার সে নিজের ঝোঁকেই পা বাড়াল। বারবার যখন সে ভাবছিল নাম তার মাধালি কিস্কু, রৈবতীতে ঘর, তখন খরপায়ে চৈতী হাওয়ার মতই রৈবতীতে এসে পৌঁছে গিয়েছিল। বহুক্ষণ পর্যন্ত কোনদিকে তাকায়নি। খেয়াল হল পথের ধারের অচেনা মুখের চাহনীতে, তাদের দৃষ্টি দেখে মনে হয়েছিল এখানে আসাটা তার উচিৎ হয়নি। তবুও সে এগিয়ে এসেছিল...দূরের বহুলোকের কথাবার্ত্তার আওয়াজ, নানা গলার স্বর, ছোট ভিড়—একটু একটু করে সে এগিয়ে শালগাছটার আড়ালে গিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছিল, চমকে গিয়ে সুন্দর দেহটা তার এঁকে বেঁকে গেল আপনা থেকেই মুখ থেকে তার বেরিয়ে এল "হেই" শব্দটা দরজার সামনে থমকে যাওয়া ছোট ভিড়, যেখানে সবাই শব্দটা লক্ষ্য করেছিল, এখন তারা সেদিকে চেয়ে হাঁ হয়ে রইল। সকালের রোদ মুখখানি তার অজস্র ফোয়ারার মত অপূর্ব দেহের সৌন্দর্য্য... এলোচুল হাওয়ায় উড়ছিল...আর ডাগর চোখে ছিল তার ভয়...বিস্ময়...আরো অপূর্ব্বের কিছু!

মাধালি এতক্ষণ কোনদিকে চাহেনি, চোখ তাকাতেই রোমনিকে দেখে তার নিজের চোখের দৃষ্টি আড়ষ্ট হয়ে গেল। মাধালি যেমত ভীত, হাত দুটো তার আপনি খসে পড়ল—।

অন্ধকারের এক মেঠো রাতের মহুয়া-মাতাল মাধালি ধান ক্ষেতের অগণন গোপনতাকে যে হিমতীক্ষ্ণ রোমাঞ্চিত করেছিল, পলাশকে যে রঙিন করেছিল, ঝড় তুফান হয়ত বা বজ্র হানতেও সে চেয়েছিল কিন্তু এখন তার গা বৃষ্টিভেজা এমত মনে হয়েছিল। শুকনো পাতার মতই সেইদিনের কথা গুলো তার মনে রয়ে গেছে, সে কথার মত সত্য তার আর কিছুই ছিল না, সে জানত তার ইচ্ছাকে পরিপূর্ণ করতে এই মেয়েটিই পারে এবং এই জোরেই সে হয়ত আলোর পথে যেতে পারত...এখন সে অনেক অস্থির। মাধালির ভেতরের ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া রক্তটা আবার কিসের উষ্ণতায় কম্প্রমান হয়ে উঠল, সে এক দৃষ্টে রোমনিকে দেখেছিল। রোমনির ডাগর চোখে আজ মাধালি তার আপনকার ছায়াটা স্পষ্ট সে দেখেছিল, যে ছায়ায়...সাগরের গভীরতা...চিরকাল নীল হয়ে থাকে, যে ছায়ায়...আকাশ নেমে আসে...মাটিকে দেয় আরো সবুজতা!

ফলে মাধালি তখন ভীত, সে জড়সড়; সে হয় বিমূঢ়!

গ্রন্থপরিচয়

অন্তর্জলী যাত্রা। সুবর্ণরেখা। কলিকাতা ৯।
চতুর্থ মুদ্রণ ১৪০৪, পৃ. ৮+১৬৮, মূল্য ৫০.০০
উৎসর্গ: 'স্ত্রীকে'
দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রসঙ্গে:

কমলকুমার মজুমদার প্রণীত অন্তর্জলী যাত্রা-র দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হল। গ্রন্থ প্রকাশের কয়েকদিন পূর্বে কমলকুমার মজুমদার পরলোকগমন করেন। এই দ্বিতীয় মুদ্রণ তিনি দেখে যেতে পালেন না এ আক্ষেপ চিরকাল থাকবে।

ইন্দ্রনাথ মজুমদার

প্রথম প্রকাশ: ১৩৬৯

গোলাপ সুন্দরী। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা ৯।
তৃতীয় মুদ্রণ মাঘ ১৪০২, পৃ. ১১২, মূল্য ২৫.০০
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ: সুনীল শীল
উৎসর্গ: স্নেহের সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে/দয়াময়ী মজুমদার
গ্রন্থারম্ভে দয়াময়ী মজুমদার জানিয়েছেন:
'গোলাপ সুন্দরী' গল্পটি বই আকারে প্রকাশিত হল।

আমার স্বামী, স্বর্গত শ্রীকমলকুমার মজুমদার লিখিত 'গোলাপ সুন্দরী' গল্পটি প্রথমে 'এক্ষণ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, পরে কৃত্তিবাসে পুনর্মুদ্রণ হয়। এই গল্পটি বহুদিন যাবৎ বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। 'গোলাপ সুন্দরী' গল্পটি, বই আকারে প্রকাশিত হওয়ার ব্যাপারে শ্রীমজুমদারের অন্তরঙ্গ-ভক্ত শ্রীমান সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বিশেষ সাহায্য করেছেন।

বইটি প্রকাশিত হওয়ায়, মনে হয় বহুমনের প্রত্যাশা পূর্ণ হবে... ॥

দয়াময়ী মজুমদার

গোলাপ সুন্দরীর পটভূমিকা—সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। রচনাটি বর্তমান সংগ্রহে 'গোলাপ সুন্দরীর পটভূমিকা' হিসেবে মুদ্রিত।
প্রথম সংস্করণ : বৈশাখ ১৩৮৯

অনিলা স্মরণে। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা ৯।
তৃতীয় মুদ্রণ ডিসেম্বর ১৯৯৭, পৃ. ৮+১০২, মূল্য ২০.০০
প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী
উৎসর্গ : স্নেহের প্রণব বসুরায়কে/দয়াময়ী মজুমদার
প্রথম সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪

শ্যাম নৌকা। এক্ষণ, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৯৭১-এ প্রকাশিত।

সুহাসিনীর পমেটম। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা ৯।
চতুর্থ মুদ্রণ মার্চ ১৯৯৮, পৃ. ৮+১৫২, মূল্য ৫০.০০
উৎসর্গ : একান্ত অনুরক্ত/স্নেহের শুভ (মুখোপাধ্যায়)-কে/দয়াময়ী মজুমদার
প্রথম সংস্করণ: কলকাতা বইমেলা ১৯৮৩

পিঞ্জরে বসিয়া শুক। সুবর্ণরেখা। কলিকাতা ৯।
প্রথম প্রকাশ: দোল পূর্ণিমা ১৩৮৫, পৃ. ৮+১৯৮, মূল্য ১৪.০০
উৎসর্গ : মাধবায় নমঃ/শচীন চৌধুরী/স্মরণে/আজ এ মরজগতে আপনি নাই!/কাব্যতত্ত্ব ও আর্টচর্চার পদ্ধতি আমাকে/আপনি বলিয়াছিলেন—তাহা/আমার মনে আছে।
প্রকাশকের নিবেদন: 'পিঞ্জরে বসিয়া শুক' প্রাক্-প্রকাশ কালে লেখক পরলোকগমন করেন। গ্রন্থের প্রচ্ছদপট অঙ্কন করে তার ব্লকও উনি দেখে গিয়েছেন। রঙ-এর ব্যবহার সংশোধনের জন্য তিনি মূল চিত্রটির প্রুফ চেয়ে নেন। কিন্তু দুঃখ এই সম্পূর্ণ গ্রন্থটি তিনি দেখে যেতে পারলেন না। পিঞ্জরে বসিয়া শুক 'এক্ষণ' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

খেলার প্রতিভা। জার্নাল সত্তর ৬-৭ তৃতীয় বর্ষ সপ্তম সংকলনে প্রকাশিত।

শবরীমঙ্গল। স্বরলিপি। কলকাতা ৯।
প্রথম প্রকাশ: জুলাই ১৯৮৪, পৃ. ১৩৬, মূল্য ১২.০০
প্রচ্ছদশিল্পী: সব্যসাচী বর্দ্ধন
উৎসর্গ: স্নেহভাজনীয়/রমানাথ রায়কে/দয়াময়ী মজুমদার।
গ্রন্থারম্ভে প্রকাশক জানিয়েছেন: কমলকুমার মজুমদারের লেখার যে স্টাইলের সঙ্গে আমরা পরিচিত, এই উপন্যাসখানি তার থেকে কিছুটা আলাদা। ১৯৮৩ সালের শারদীয় 'রবিবাসর' পত্রিকায় এটি প্রথম প্রকাশিত হয়। পত্রিকায় মুদ্রিত অংশটুকুর সঙ্গে কিছু কিছু সংযোজন নিয়ে বইয়ের আকারে এটি প্রথম প্রকাশিত হল। উপন্যাসখানি ছাপার সময় প্রুফ দেখা এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আন্তরিক এবং সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করে বইখানি দ্রুত-প্রকাশে সাহায্য করেছেন লেখক-সহধর্মিণী দয়াময়ী মজুমদার।



কমলকুমার মজুমদারের জন্ম ১৯১৪ সালে।
কাজ করেছেন নানা জায়গায়। বাংলা সরকারের জনগণনা বিভাগে, গ্রামীণ শিল্প ও কারুশিল্পে, ললিতকলা একাডেমিতে এবং সাউথ পয়েন্ট স্কুলে।
লেখায় তাঁর অন্যতম পরিচয়, কিন্তু একমাত্র নয়। বহু বিচিত্র বিষয়ে ছিল তাঁর সাবলীল বিচরণ। ছবি, নাটক, কাঠের কাজ, ছোটদের আঁকা শেখানো, ব্যালে নৃত্যের পরিকল্পনা, চিত্রনাট্য রচনা—কী করেননি! কখনও ভেবেছেন চলচ্চিত্রে গানের ব্যবহার নিয়ে, পাশাপাশি লিখেছেন ছাপাখানার জগৎ নিয়ে 'বঙ্গীয় গ্রন্থচিত্রণ'। কখনও তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় রহস্যপত্রিকা, কখনও বিজ্ঞানপত্রিকা। বাংলার টেরাকোটা, রামায়ণ ইন ফোক আর্ট বা বাংলার সাধক-এর মতো ডকুমেন্টারি চিত্রনাট্যও তাঁরই তৈরি। প্রথম গ্রন্থ 'অন্তর্জলী যাত্রা', প্রকাশিত হয় ১৩৬৯-এ। পরের বছর—'নিম অন্নপূর্ণা'।
মৃত্যু: ১৯৭৯।

....

প্রচ্ছদ সমীর সরকার

কমলকুমার মজুমদারকে কেউ বলেছেন বাংলা কথাসাহিত্যের দুরূহতম লেখক, কারও মতে তিনি প্রবাদপুরুষ, কেউ তাঁকে দেখেছেন পুরাণপুরুষ রূপে। তাঁর সম্পর্কে এই মূল্যায়ন নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে, কিন্তু উপন্যাস-গল্পে জীবনমায়া রচনায় ও একান্ত নিজস্ব গদ্যশৈলী সৃষ্টিতে আজও তিনি বিশিষ্ট ও ব্যতিক্রমী লেখক। তাঁর লেখা উপন্যাসসমূহ সংকলিত হয়েছে এই গ্রন্থে।

